

বিশ্বসাধনা

প্রথম বর্ষ : দ্বিতীয় খণ্ড
কার্তিক - চৈত্র, ১৩৬৪

756.

002/3



[illegible]

ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ଚିତ୍ରମୁଚ୍ଚୀ

অজ্ঞান সন্ধ্যা আকাশ	২১৬	আশায় আশায় : শিল্পী অমিত সুবাসাথায়	২৪-২৫
অভ্যাস : শিল্পী জিতেন আচাতি	৩১১	আশায়-আশায় : শিল্পী চ্যাককর সিং	৩০১
আবদন উলস : শিল্পী বীর সতকার	২৭	ইসকিউবটায়	৪১
আধুনিক ভাষে বিখিত কুশিয়ারাধিত 'আজীর লড়ক'	১৫৪	ইদিল-বরা বৌকোর...জয় বেথবর বো বোই	৪৬৫
আবের দুখল : শিল্পী অরবী চন্দ্রবতী	৪৫৪	ঊহাত আভের লাল বোল-আগু	৩২১
আসুদাতি বৌদ্ধবিহারের প্রাঙ্গণ কামরা বাদসহা	৩১৪	উপাসনা পূব : শিল্পী অমিত শ্রীবাসী	৩৪১
আসুদাতি বৌদ্ধ জিয়ারে...তিসকী পিরমায় উলস জিন	৩১৪	পুলকর্ণি	১১১
অসহস্রাবত বোল উলস ঙ্গ লেখক	৩১১	কাবি প্রেমেন্দ্র সিং	২৪১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কলাভঙ্গের ব্যাখ্যা : শিল্পী অস্তিত্ব জীবনী	৩৪৬	প্ৰদাহিনী : শিল্পী বিবাহের ভেতর	২৪৪
কাঠের পুতুল	২৪৭	‘পদ্ম হৃদ বেরী’ জড়িতের বাদিনী-বোনের কৃত	১০২
কৃত্তিক সন্ধ্যার আকাশ	১১০	পতঙ্গভিষাঘের মলিন	৩৬৬
কান-কুসুম	১০০	পাতা-মহাঘর : শিল্পী রতন বাসন্ত্য	৩১৮
সান্না কিসের : শিল্পী রতন বাসন্ত্য	২৪	পোকাবাড়ির পুতুল	১২৬, ২২৭
জাঁকো কামেল	৬৬	শৌখিন সন্ধ্যার আকাশ	৩২০
বেতুর-বাল	৩১২	আম্বা : শিল্পী — অস্তিত্ব ভণ্ড	
পর্জন্যের ঘরিন	৬০০	আপ নরতর একাংশ	৭৮
পথে ইতি-বেগ	৩১১	আলমের প্রান্তে বহুদ বসন্ত-বাড়ি টেরি বসে	৭৬
চন্দ্রগ্রহণ : — শিল্পী জীবনম চন্দ্রাপাখার	৩১৬	আটমস্তর তারক—বন্দোবস্তি অকসে প্রান্ত	১৪৬
চা-বাগান	১৭৬	জেনের ভিতরে	৭০
চান্দা-শিউ-এর টাকের ব্যস্তিগল : শিল্পী সোপাল শেঠ	২১৮	জান্নান সন্ধ্যার আকাশ	১৮৮
চৈত্র সন্ধ্যার আকাশ	১০৬	কুমকলি	১১৪
“ছিন্ন বাহু হুই কেতে সোপাল কহতে ধৌ...”		ঈশ-বিবরণের ভণ্ড শবিকরণ মলি কাটতে	১৬৬
শিল্পী জেব্রীকুল	৩০৭	বাসন্ত-ই-শের একটু বন্দোবস্তি নৃত্য	৩৬০
জঙ্গলপটল ও বনজগৎ	৩০৬	বাসন্ত-ই-শের আটম ‘আনুষ্ঠানিক পরবর্তী-নৃত্য’	৩১১
জলক জল : শিল্পী জয়কিষর সিং	১২২	বালিনের পথে হোসেন্দেবের মল বুদ্ধমায় আনল ও লেব	২০৮
জর্জ বার্নার্ড শ : — শিল্পী এল্ডেনেল শিয়ারেল	৩১৮	বালিন নরতর কেতে আসলকাতার সোয়ার	৩০১
জর্জ বার্নার্ড শ : শিল্পী বোলেভ সিল্পন	৩১৭	বিহায় তোক : শিল্পী ষীশ্বর সিন্ধাই	৩১৩
জর্জ বার্নার্ড শ : শিল্পী উইলিয়াম অবেকটাইন	৩১৩	বুড়া-বীলকটে অলর পলন কিংবুডি	৩১০
জর্জন আকাশেরি অল আটম-এ নবর্জনা	১৭৬	বৌবায়ের ত্রাটুকার	১২১
জর্জকেতে জর্জকটাইনগের বিজাননায়	৩১৮	বোমার বিলত জাটুটাই-আলি	২০৮
জোনা রাত : শিল্পী জীবনম চন্দ্রাপাখার	২৪-২৬	বোমার বিলত...নরত অল জড় টাইকে	২০৭
‘জ্যাক-বুটকা’ হুইর একটু কৃত	২৩০	জোমের বো : শিল্পী অল-বুটকার সুখাপাখার	১৬৬
জাশিয়া : — পটলবল সন্ধ্যার প্রচার বিভাগ	৩১৬	জোমিয়ার লায়-কৃতিক-বল	৩০৮
জিম থেকে ব্যাটা কোটার পর	৬৬	জুগাখী পরিকল্পনার অষ্টম তিলপড়া-জ্যার	৩০৮
জিম শীলক	৬৬	জরজী : শিল্পী অলিত সুখাপাখার	৩০৮
জেনেল	১০২	জরজী : শিল্পী সৌর দত্ত	৩০৭
জুকার : শিল্পী রতন সুখাপাখার	১৬২-১০	জাঘ সন্ধ্যার আকাশ	৩১২
জুজিগের কালীমায় : শিল্পী বৌদী জটায়	৩৬	জাফা : শিল্পী জরত নায়	৩১৩
জবন অকসে জবিকফের ভণ্ড অট্টালিকা	১৭০	জুগীকে বোম-প্রতিযোগক ইলেকলন বেগা হুই	১৭
জিবের শেব : শিল্পী ষীশ্বর সিন্ধাই	৩১৩	জুগীমায় অলত হাতের ষীতের কটকট	৩০৮
জুটপাত : শিল্পী জেব্রীকুল	২৩৬	জুগীম সৌখিনজুগীমের আটমস্তর বিবর্জন	৩০০
জুজিত কিয়র পর্বতমালা	২৭১	জুগ-জিহাট	৩১৪
জুজিগের...বীহারিকা	৩১৭	জিহাটকা...কলম বেজিহে জাট জড়িত সন্ধ্যা	২০৬
জুজ একাকী : শিল্পী সন্ধ্যা রায়	১৬৭	জুজিয়ার লায়-কৃতিক-বল পুত-নৃত্য শিল্পীর লোকনৃত্য	৩০৬
জীয়া : শিল্পী জবজীশ্বর জে	১০২-১০৩	জুজিয়ার লায়-কৃতিক-বল বিবর্জন-নৃত্য শিল্পীর লোকনৃত্য	৩০৬
জীলপাড়া জল	১৭৬	জোজ-আলিগাট জুগী ও জি	৩৬
জীলপাড়ার জলসে পুটার	১৭৬	জোজ-এলোম (জাফালে লেবক)	৭৭
জেনেল	১০০	জ এ : জেনেল : শিল্পী এইচ. জি. জেনেল	৩১২
জেনেল, কানের টাল ও আট	৩০	জুজিয়ার অস্তিত্ব	১০০
জেনেলের জীলপাড়া উপজা	৩০৬	জুজ-পরিবর্তনা	১০৬
জৈবিত্যের প্রান্তক ‘জ’ ব্যায় : শিল্পী জীল রায়	২৭৬	জাফা ‘জাফা’ হুই জীবিকামায় বহু	৩৭
জৈবিত্যের লেবক জুজ পলকতলা বৌকা : শিল্পী জরত শ্র	২৭২	জিহা : শিল্পী জিহা নায়	৩০৮

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ସେମ୍ ପାଠ୍ୟ : ଗିରୀ : ଗିରୀ ଦେବତୀହୁଏ	୨୫୨, ୨୫୩, ୩୫୫, ୩୫୬, ୩୫୭, ୩୫୮, ୩୫୯, ୩୬୦	ପୂର୍ବସୂଚି : ଗିରୀ ଶତ୍ରୁମତୀ	୩୫୮
ଶିବିକେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା	୩୬୦	ପଞ୍ଜିର ଗ୍ରନ୍ଥ : ଗିରୀ ଦେବତୀ	୩୬୨
ଶିବିକା କେଶବୀଟି କେଶବୀ	୩୬୧	ସୋମାସୁର-ଆତ୍ମାଶାନ୍ତି...ବିଶ୍ୱାସ	୩୬୩
ଶିବିକାସୁର କବି-କବିତା	୩୬୨	ସୋମାସୁର : ଗିରୀ ଦେବତୀର ଗିରୀ	୩୬୪
ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ...କାବ୍ୟାଦି ବାସନା ଏକାଂଶ	୩୬୩	ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମତେ ବାସନା ଏବଂ କଳ୍ୟାଣୀର ମୁଖ୍ୟତା	୩୬୫
ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ଏବଂ ଗିରୀ ଦେବତୀ	୩୬୪	ଶିବିକା-ଆତ୍ମାଶାନ୍ତି ଏକାଂଶ	୩୬୬
ସୁଇଟ୍ ସମାଜ : ଗିରୀ ଦେବତୀର ଗିରୀ	୩୬୫	ଗିରୀ ଦେବତୀର ଗିରୀ	୩୬୭
ସଂସ୍କୃତି : ଗିରୀ ଦେବତୀର ଗିରୀ	୩୬୬	ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ଏବଂ ଗିରୀ ଦେବତୀ	୩୬୮
ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ : ଗିରୀ ଦେବତୀର ଗିରୀ	୩୬୭	ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ଏବଂ ଗିରୀ ଦେବତୀ	୩୬୯



বসুধারা

প্রথম বর্ষ • ত্রিতীয়া অংশ • প্রথম সংখ্যা

কার্তিক, ১৩৬৪

❖ সূচীপত্র ❖

বিষয়	পৃষ্ঠা
আর্থিক সংগঠনের মূলমন্ত্র (প্রবন্ধ)—নির্মলকুমার বসু	১
ভক্ত-নৈব্যাহিক শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম (প্রবন্ধ)—ডক্টর শ্রীমতীপ্রবিদ্য দেবদুর্গা	৫
কল্যাণন (বৃহত্তীর্থনকথা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৬
ডাকাতের জীবনচিত্র (আত্মকাহিনী)—ডাকাত ডক্টর	১০
বুটেলের পিকা-সমস্ত্রা (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য	২৫
কথা (কবিতা)—বটকৃষ্ণ রায়	২৭
কর্ণ-শিখাচ (গল্প)—দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য	২৮
পুরোনো কথা—বদ্য দত্ত	৩১
মনোবেকন (গল্প)—রামদাস মুখোপাধ্যায়	৩৩
বাক্যলীর নাম ও উপাধি (প্রবন্ধ)—ভূপেন্দ্রচন্দ্র সাহিড়ী	৩৮
ছিটে-ফোটা : আতি হতে শত বর্ষ পূর্বে—চাক্‌চন্দ্র ভট্টাচার্য	৪১
চরের আশা (কবিতা)—হরপ্রসাদ মিত্র	৪৩
কটকী পাড়ি (গল্প)—প্রতিপদ রায়গুপ্ত	৪৭
ইল-মুহুরী পালন (গতি প্রবন্ধ)—ভৈরব ভট্টাচার্য	৫১
লাবি (গল্প)—হানিবেক্স পাল	৫৮
অর্ধ বারিড শ (জীবনী)—ডবলী মুখোপাধ্যায়	৬৫
অনমানল ও চিত্রকলা (প্রবন্ধ)—ভাষ্যরচাচার্য	৭০
নতুন ইয়োঃপ : নতুন মাংস (গতি ভ্রমণকাহিনী)—মনোজ বসু	৭৩
রূপসাগর (উপহাস)—সুবোধ ঘোষ	৮০
কালীপূজা (প্রবন্ধ)—হরেকৃষ্ণ সাহা রায়	৮২
মাড়-সাধনায় বাঙালী (গতি প্রবন্ধ)—ননীপোশাল গোখারী	৯২
'বসুধারা'-সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসুর আত্মজীবনী (গতি)	৯৭

বিষয়

গৃহস্থালী

অনুসন্ধানের, জাদুঘর, কবিতা

সাহিত্যিকথা

ভাষাভাষা, লেখকপুস্তক, ভাষাভাষা

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

ভাষা ভাষা, পুস্তক — ভাষাভাষা, ভাষাভাষা

ভাষাভাষা, ভাষাভাষা, ভাষাভাষা — ভাষাভাষা, ভাষাভাষা

কৃষি প্রসঙ্গ

ভাষাভাষা, ভাষাভাষা, ভাষাভাষা

নতুন সাহিত্য

পুস্তক, ভাষাভাষা

মঞ্চ-পর্দা

ভাষাভাষা, ভাষাভাষা

খেলায় মেলা, ভাষাভাষা — ভাষাভাষা

শেষ পাতা, ভাষাভাষা, ভাষাভাষা

ভাষাভাষা, ভাষাভাষা, ভাষাভাষা, ভাষাভাষা, ভাষাভাষা, ভাষাভাষা, ভাষাভাষা, ভাষাভাষা

• প্রচ্ছদ-শিল্পী : অজিত গুপ্ত •

—

* মডার্ন ডেস্কেটবিস *

• শ্রী ১১১ ও ১১১ কোল উৎসাহের প্যাণ্ডেল এবং গুণগুণগুণ।

৬৫-এ, ডব্লু, সি, বালাজী স্ট্রীট • কলিকাতা - ৬ • ফোন - ৫৫ - ২৫৪৯

বসুধারা

প্রথম বর্ষ • দ্বিতীয় অঙ্ক • দ্বিতীয় সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩৬৪

❖ সূচীপত্র ❖

বিষয়	পৃষ্ঠা
রবীন্দ্রনাথের কবিতার আত্মকৃত্তিক পরস্পর (প্রবন্ধ)—কালিদাস রায়	১২৫
কল্যাণন (বৃন্দভীষনকথা)—অচিন্ত্যকুমার পেন্ডুপ	১৩১
রিকবার গান (উপক্ৰাস)—বিকৃত্তিকুমার মুখোপাধ্যায়	১৩৭
তবুও (কবিতা)—শঙ্করীল দাস	১৪৬
ভক্ত বান্ধাও ন (সচিত্র ভীষনী)—ভবানী মুখোপাধ্যায়	১৫৫
ভগচরী পাহাড় (কবিতা)—প্রভাকর মাকি	১৫৭
ছিটে-ফোটা : 'হুচি'—চক্রেচন্দ্র ভট্টাচার্য	১৫৯
বাংলার নবভাগরণের কথা (প্রবন্ধ)—যোগেন্দ্র বাগল	১৬৩
বৈঠকী : ভৌতিক—অ. ক. ব.	১৬৭
নহর-পরিকল্পনা (সচিত্র প্রবন্ধ)—বিহতর শর্মা	১৬৯
শিকারের টান (শিকার-কাহিনী)—ব্রজেনকুমার মুখোপাধ্যায়	১৭৫
ভাঙারের ভীষনচিত্র (আত্মকাহিনী)—ভাঙার ভট্ট	১৮৭
শিচকমিতী (গল্প)—প্রভাত দেবশরকার	১৯৭
নতুন ঠেংঘোষণা : নতুন মাগুন (সচিত্র রমণকাহিনী)—মনোজ বসু	২০০
কলহ (গল্প)—জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২১১
জলসাগর (উপক্ৰাস)—হরোধ ঘোষ	২১৫
গৃহস্থালী : বঃগাভাঃ—'ভৌপলী'	২২৭
বিক্রাস প্রসঙ্গ : অগ্রহায়ণ সংখ্যায় অকাণ (সচিত্র)—কামিনীকুমার দে	২২৫
নতুন সাহিত্য	
পৃথক-সমালোচনা : প্রজ্ঞাপারমিতা—সম্ভাষণকুমার বে ; কণম ?—নায়ায়ণ চৌধুরী	
অন্ধ-পর্জী : চিত্রলোক (সচিত্র)—পন্নোভ	
ব্যঙ্গচিত্র—রবীন্দ্রকৃষ্ণ	
খেলায় খেলা—বৃথির	
শেষ পাতা (সচিত্র রসরচনা)—শিবরাম চক্রবর্তী	
। আলোকচিত্র : রামকিষর সিংহ, হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, ভগবতীশঙ্কর দে ও সন্দোহ রায় ।	
• প্রচ্ছদ-শিল্পী : অজিত গুপ্ত •	



সত্যবীৰ অফিস

কলিকাতা

টি.জি.আড্ডি

এও নক্ষ

৪২ নং কলকাতা স্ট্রীট
কলিকাতা ৬



৪২ নং কলকাতা স্ট্রীট

টি.জি.আড্ডি

২২৬-চিওরজ্ঞান এডিনিউ • কলিকাতা ৬

বঙ্গসুধারা

প্রথম বর্ষ • দ্বিতীয় খণ্ড • তৃতীয় সংখ্যা

(পৌষ, ১৩৬৪)

❖ স্মৃতিপত্র ❖

বিষয়

সংক্ৰেটিশের মৃত্যুশয্যা (ঐতিহাসিক কাহিনী)—নিবনাথ শাস্ত্রী
কল্যাণদন : বুদ্ধজীবনতথ্য।—অতিথ্যকৃমার শ্রমভণ্ড
হিট-ফিট : চিত্রশিল্পী করল ঐচ্ছানিক অধিকার—চাকচাক ডট্টোয়ে
বিকশার গান (উপভাস)—বিকৃতিবৃদ্ধ নৃপোপাখ্যায়
মিত : সন্ধ্যা : মিত (কবিতা)—অদিতকৃমার
ভাক্তারের জীবনচিত্র (আত্মকাহিনী)—ভাক্তার ভট্ট
শেষিতে গিচ্ছিত্তি পূর্ণতমালা (সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্ত)—নীরহ রাঘ
কপশাপর (উপভাস)—স্বপ্নোৎসব
কবি প্রেমেন্দ্র নিয় (সচিত্র প্রবন্ধ)—অদিতকৃমার
বৃত্ত (গল্প)—অপূর্বমণি দত্ত
ভাবতীষ পুতুল (সচিত্র প্রবন্ধ)—অদিত নৃপোপাখ্যায়
নতুন ইংরেজ : নতুন মাতৃ (সচিত্র ভ্রমণকাহিনী)—মনোজ বহু
গগন (গল্প)—জ্যোতির্ময় ঘোষ
অর্থ বারোভাগ (সচিত্র জীবনী)—ভবানী নৃপোপাখ্যায়

গৃহস্থালী : বঙ্গোবাস—‘হৌপলী’

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

পৌষ সত্যের আকাশ (সচিত্র প্রবন্ধ)—কামিনীকৃমার দে
পৃথিবী ছাড়িয়ে (সচিত্র প্রবন্ধ)—অধ্যাপক ডক্টর মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ ব্রহ্ম
কৃষি প্রসঙ্গ : আলু (সচিত্র প্রবন্ধ)—অরেন্দ্র রাঘ

অনুলোক

সদীতাচার্য কলৌ মির্জা—চৈত্রি দ্বিপা

সদীতঃপ্রবীর দ্বিতী-কাহিনী—‘মৌতন’

পশ্চিমবঙ্গ-পরিচয় : বীরকুম (সচিত্র)—মনোজ বহু

নতুন সাহিত্য :

দ্বিতীয় বঙ্গ—রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র (পুস্তক-সমালোচনা-মূলক সচিত্র প্রবন্ধ)—বিনয় ঘোষ ...

পুস্তক-সমালোচনা : কলকাতার কাছেরে—জগদীশ ডট্টোচার্য ; রবীন্দ্র-কাব্যালোক—নারায়ণ চৌধুরী

মঞ্চ-পর্বা : চিত্রলোক—গগনভাট

বেলায় বেলা—মুদ্রিত

শেষ পাতা (সচিত্র রসরচনা)—শিবরাম চক্রবর্তী

• আলোকচিত্র : বিবিধিং ঘোষ, স্বপ্নেন্দ্রনাথ বাগচী, অদিত নৃপোপাখ্যায়
ও স্বাক্ষরিত সিংহ ।

• প্রচ্ছদ-শিল্পী : অদিত গুপ্ত •

এই গ্রহের ক্রন্দন

দীপক চৌধুরীর নতুন উপগ্রাস

‘এই গ্রহের ক্রন্দন’-এর মাধ্যমে কুমারী তথা বহুর অভিজ্ঞতার সম্বোধন চোখে পড়ে। নিজের অভিজ্ঞতার কাগজে তথা হাতে একটা মন্ত বড়ো প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম বস্তুকে পৃথিবী পৃথিবী দেখেছে সে অনেক মজিদ, অনেক ভেদ, অসাধ্য সাধ্য ও সত্যের সন্নিহিত ছিল।.....একজন মানুষ অভিমানের মত খেয়ে খুঁস হয়ে আছে, আর অন্য একজন মানুষ বিলেতে চল মন্তর ভাঙনি: প্রাণে স্বাধীনতার হাতি পান করছেন সিন্ধুতে। এ ভাঙনের মধ্যে কোনো পর্য্যটনই দেখিনি তথা বহু। বহু অভিমানের নিজস্ব ভাঙন ভাঙলটির শাখি তার চোখে খাতি মতা।.....বহুভিত্তি লেখকের অভিন্ন চৈতন্যকে দেখা যাবেই শিরশে বৃহৎ উপগ্রাস। ১০০ টাকা।

দীপক চৌধুরীর অগ্রাঙ্গ উপগ্রাস.....শতাব্দীর ৫০০ টাকা। কুমারী তথা ৫০০ টাকা।

বক্তাব্যবস্থা প্রকৃত
কালিদাসের মেঘদূত

অপূর্বরতন ভাঙড়ী
মন্দিরময় ভারত

এই গ্রন্থ পাঠক সত্য বাক্য-এক নতুন করে আনন্দিত করে। ভাঙড়ী ও পাঠক সত্য বাক্য-এক নতুন করে আনন্দিত করে। ভাঙড়ী ও পাঠক সত্য বাক্য-এক নতুন করে আনন্দিত করে।

ভাঙড়ী শির ও পাঠক সত্য বাক্য-এক নতুন করে আনন্দিত করে। ভাঙড়ী ও পাঠক সত্য বাক্য-এক নতুন করে আনন্দিত করে। ভাঙড়ী ও পাঠক সত্য বাক্য-এক নতুন করে আনন্দিত করে।

শব্দভাণ্ডার চম্পাধ্যায়ের		মহাশব্দভাণ্ডার		বৃহৎশব্দভাণ্ডার	
পথের দাবী (উপগ্রাস)	৬'০০	মহাভারত	১০'০০	শেষ পাণ্ডুলিপি (উপগ্রাস)	৩'২৫
শ্রীকান্ত (মণ্ডিত)	২'০০	রামায়ণ	৬'৫০	বায়োমাসের ছড়া (কবিতা)	৩'০০
পরিধীতা (মণ্ডিত)	১'৫০	চলচ্চিত্র (অভিধান)	৬'০০	হাফেজ শোখের	
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের		পরশুরামের		ধির বিজুরি	৩'০০
একে ভিন ভিনে এক	৩'০০	মীলতার ইত্যাদি গল্প	৩'০০	কসিলা ২'৫০	জুজু ৩'৫০
সরোজিনাথ পত্নীর		গল্পকল্প ২'৫০	গড়লিকা ২'৫০	প্রজ্ঞাতী (উপগ্রাস)	৪'০০
কাব্য-সংগ্রহ	৫'০০	কল্পকল্পি ইত্যাদি গল্প	২'৫০	দীপক চৌধুরীর	
দোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির		বৃহত্তরমালা ৩'০০	কল্পলী ২'৫০	কুমারী তথা (উপগ্রাস)	৫'০০
পৌরাণিক উপাখ্যান	৩'৫০	অনন্দিবাঈ ইত্যাদি গল্প (বহু)		শতাব্দীর (উপগ্রাস)	৫'৫০
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের		অগ্রাঙ্গের বাবের		বিলস মিহিরের	
প্রাগৈতিহাসিক	২'৫০	পথে-প্রবাসে	৩'৫০	অগ্রাঙ্গ (উপগ্রাস)	৫'৫০
সরোজিনাথ সেনের		কামিনী-কাকস	৩'০০	বৃহত্তরমালা (উপগ্রাস)	১'৫০
বিজ্ঞানের ইতিহাস	১০'৫০	সাহিত্যে সত্য	২'০০	সরোজ বহুর	
				পদাধিনী	২'৫০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বহিন চাইল্ড্রেন স্ট্রিট, কলিকাতা ১২

বঙ্গুধারা

প্রথম বর্ষ • দ্বিতীয় অংশ • চতুর্থ সংখ্যা

মাস, ১৩৬৪

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাণীনতার ধরন (প্রবন্ধ)—বাতপেনের বহু	৩৬৭
আলমস সফট (প্রবন্ধ)—কালীচরণ ঘোষ	৩৬৯
বাণী দিন, বাণী দিন ! (গল্প)—অমরেন্দ্র ঘোষ	৩৭৪
আট ও আধুনিকতা (প্রবন্ধ)—হেমেন্দ্রকুমার রায়	৩৭৯
রিকশার গান (উপভাস)—বিক্রিতকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৩৮২
ভাকারের জীবনচিত্র (আত্মজীবনী)—ভাকার ভট্ট	৩৮৭
ছোটো-ফোটা : উদ্ভট স্নোক (সমস্রাপূরণ)—চাকচাক ভট্টাচার্য	৩৯৩
হিকু, বৌদ্ধ ও বৈদ্য ধর্মের সরস্বতী—নরেন্দ্রনাথ বাগল	৩৯৪
কৃতকলি (গল্প)—শুশীল রায়	৩৯৯
কমানিয়ার সাংস্কৃতিক-রস (সচিত্র প্রবন্ধ)—শ্রীমতী বাণী বেকী	৪০৫
বাঁচোয়া (গল্প)—কালীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪০৮
বেজুর-নহুল (সচিত্র রমান-রচনা)—তুলসীধাস সিংহ	৪১১
ভালো ক'রে ঘুংগো (কল্প গল্প)—লেবক : হাইকেল রসচন্দ্রকো । অত্ববাদক : অধ্যাপককুমার গুপ্ত	৪১৬
বিশ্বকর্মার উদ্দেশ্য : কবিতা :—হরপ্রসাদ দত্ত	৪১৯
নিখিল-বন ভাষা-সম্মেলন—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২০
ঐরামপুরে কবি-সম্মেলন (সচিত্র প্রবন্ধ)—নিজস্ব প্রতিনিধি লিখিত	৪২৩
বিশেষত বাঙালী শিখন (প্রবন্ধ)—উষ্টর নিমাইসখন বহু	৪২৪
ঘর (গল্প)—ভারতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৪৩০
ককব'খন (কৃতকবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৪৩৪
ভিনটি উল্লেখযোগ্য সম্মেলন (প্রবন্ধ)—ঐবিশ্বরূপ শর্মা	৪৪০
নতুন ইয়োঃপ : নতুন মাতৃ (সচিত্র সমস্রাজীবনী)—মনোজ বহু	৪৪৪
পল্লিমাধ্যমের রূপি ও পল্লিমাধ্যমের পরিচয় (প্রবন্ধ)—ঐশ্বরীকুমার	৪৪৯
রূপমাগর (উপভাস)—হৃদোদ ঘোষ	৪৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রজাতন্ত্র-দিবস কোড়পত্র :	
অঙ্গতির পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ : সচিব প্রবন্ধ)—বর্ণিত মুখোপাধ্যায়	৪৬৫
বরদী ১২৪৭	৪৭০
বিজ্ঞান প্রসঙ্গ : মাদ সত্যাব আকাশ (সচিব প্রবন্ধ)—কামিনীকুমার দে	৪৭১
স্বরলোক : সঙ্গীত-আলর পরিচয় : সচিব প্রবন্ধ)—অ. ক. ব.	৪৭৩
নতুন সাহিত্য :	
নিকার আশ্রয় ও গাভীকি : পুস্তক-সমালোচনা-দ্বন্দ্ব প্রবন্ধ)—ফটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৪৭৬
পুস্তক-সমালোচনা : শিকারী-জীবন—নত	৪৭৯
মঞ্চ-পর্বা : চিত্রলেখ—নন্দন	৪৮১
খেলায় খেলা—বুড়ির	৪৮৬
শেষ পাড়া : রসরচনা :—বিবরাম চক্রবর্তী	৪৮৯

১. আলোকচিত্র : ভিত্তে আভি, রতন লগুপ্প, গৌর দত্ত ও তামসিকর সিংহ ।

• প্রচ্ছদ-শিল্পী : অজিত গুপ্ত •

‘বসুধারা’র নিয়মাবলী

গ্রাহকসম্পর্কে

বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশিত হয় । ১৫ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে দ্বিতীয় ভাঙণের সম্বন্ধ লইয়া ভাঙণের উত্তরসহ আবেদনের জ্ঞানাইতে হইবে । নচেৎ উক্ত সংখ্যা বিনামূল্যে দেওয়া আদায়ের পক্ষে সম্ভব নয় । ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে বাংলা মাসের ২৫শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে । চিঠিপত্রে এবং মনি-অর্ডার-রূপে গ্রাহক-নথরের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১২ টাকা । গ্রাহক হইলে চাঁদার হার—বার্ষিক (সভ্য) ১২০ টাকা এবং যাত্রাসিক (সভ্য) ৬০ টাকা । ভিঃ শিঃ বোগে পত্রিকার গ্রাহক হইলে গ্রাহকসেই ভিঃ শিঃ খরচ বহন করিতে হয় । মনি-অর্ডার বোগে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে এই অতিরিক্ত খরচ আত্ম মিতে হয় না । ভারতের বাইরে পত্রিকার চাঁদার হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য ।

রচনাত্মক সম্পর্কে

রচনাব নকল গ্রাফিক্স কাগজের একপৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরের রচনা পাঠাইতে হইবে । উহা হারাইবার দাবিই আনয়্য গ্রহণ করি না । রচনার সঙ্গে উপযুক্ত ভাষ্যমূল্য না থাকিলে অনমনোনীত রচনা ক্ষেত্রত দেওয়া হয় না । ইহার সহিত লেখকের নাম ও ঠিকানা থাকা আবশ্যিক, নচেৎ রচনা গ্রাহ্য হইবে না ।

পত্রিকার লেখা প্রকাশ করা বা না-করা সম্পাদকের বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে । যাবতীয় চিঠিপত্র এবং ট্যাক্স-পত্রাদি নিয়মিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে ।

অফিসিয়াল প্রেক্ষাপটের সম্পর্কে

কমপক্ষে ১০ কপি করিয়া পত্রিকা লইতে হইবে । অবিক্রীত সংখ্যা কেবল লওয়া হয় না । এতেলি-কমিশন : প্রতি সংখ্যায় চার আনা অর্থাৎ ২৫ নয়া পয়সা (পতক ২৫ টাকা হিসাবে) ।

এতেলি সম্পর্কে বিশদ নিয়মাবলীর ক্ষুদ্র পত্র লিখিতে হইবে ।

কার্যদায়ক—বসুধারা, ৪২, বঙ্গবাসিন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯

বঙ্গুধারা

প্রথম বর্ষ • দ্বিতীয় অঙ্ক • পঞ্চদশ সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৬৪

❖ সূচীপত্র ❖

বিষয়

পৃষ্ঠা

বাংলার নবজাগরণের কথা (প্রবন্ধ)—গোপেশচন্দ্র বসু

৪২১

বহিষ-সাহিত্যে প্রেম (প্রবন্ধ)—দলয় গঙ্গোপাধ্যায়

৪২৮

ভাষাবোধ ভীষ্মচরিত্র (আত্মকাহিনী)—ভাস্কর ভট্ট

৪৩৩

চিন্তা (গল্প)—মহাপ্রভা ভট্টাচার্য

৪৩৪

জর্জ বার্নার্ড শ (জীবনী)—ভবানী মুখোপাধ্যায়

৪৩৬

শৈলী : মিঃ কথা ও মিঃ কথা—ম. ক. ব.

৪৩৮

পুত্রোন্মেষ : কথা—বম সত্ত

৪৩৯

আমবা ও বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)—সমরেন্দ্রকুমার সেন

৪৪০

অশ্রুত (গল্প)—শিদির সেন

৪৪১

শোকের মনস্তত্ত্ব (প্রবন্ধ)—ডাঃ পদ্মপতি ভট্টাচার্য

৪৪২

স্বর্গসিদ্ধিলাভী (গল্প)—বিনয়প্রসাদ মজুমদার

৪৪৩

শিকারের টান (শিকার-কাহিনী)—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

৪৪৪

রিকশার গান (উপজ্ঞান)—বিক্রান্তিকুমার মুখোপাধ্যায়

৪৪৫

গ্রাউণ্ডহিটলিক মনস্তত্ত্ব (সচিব প্রবন্ধ)—কৃষ্ণেন্দ্র ভট্টাচার্য

৪৪৬

গোমো (কবিতা)—কুমারকুমার মলিক

৪৪৭

উদ্ভাস (কবিতা)—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

৪৪৮

নেপেছি তাকেই (কবিতা)—আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

৪৪৯

ছোট-গোটা : ধাঁধা—চাকচন্দ্র ভট্টাচার্য

৪৫০

স্মরণলোক : সন্নীতপ্রবীর গুড়ি-কাহিনী—'গৌতম'

৪৫১

নতুন সাহিত্য :

পৃষ্ঠক-সমালোচনা : দমকালীন সাহিত্য—ডুডুজয় মাইতি ; গড় স্রীপও—ককশাপত্তর রায়

পশ্চিমবঙ্গ-পত্রিকাসমূহ : জলপাইগুড়ি (সচিব প্রবন্ধ)—মনোজিৎ বসু

নতুন ইংরেজি : নতুন মাহাত্ম (সচিব প্রবন্ধ-কাহিনী)—মনোজিৎ বসু

বিষয়	পৃষ্ঠা
ক্যাল-চিত্র—বেবতী ভূষণ	৫৮৭
বিজ্ঞান প্রসঙ্গ : ফাটন সন্ধ্যায় আকাশ (সচিত্র প্রবন্ধ)—খাদিনীকুমার দে	৫৮৮
তপসংগর (উপহাস)—হরেন্দ্র মোহ	৫৯০
ককাদেন (বুদ্ধভীষনকথা)—অভিপ্রাকুমার সেনগুপ্ত	৫৯৭
মঞ্চ-পর্দা : চিরলোক—শেষটী	৬০৩
খেলায় মেলা (সচিত্র জীভা-সংবাদ)—মুন্সিফির	৬০৪
শেষ পাতা (রসরচনা)—শিবরাম চক্রবর্তী	৬১০

। দ্বিতীয় দফার নকল, বিজ্ঞান নাগ, অবনী চক্রবর্তী, মৌর্যমন্ডল চট্টোপাধ্যায়, ডবল নাগ

ও বাণী সরকার কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র এবং মূর্তিসমূহের প্রস্তত

হাতির দাঁতের কাকপিল্লের একখানি চিত্র ।

● প্রবন্ধ-শিল্পী : অজিত গুপ্ত ●

‘বসুধারা’র নিয়মাবলী

প্রাক্কলনের সম্পর্কে

বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশিত হয় । ১৫ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে সন্ধান লইয়া ডাকঘরের উত্তরসহ আমাদের জানাইতে হইবে । নচেৎ উক্ত সংখ্যা বিনামূল্যে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় । টিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে বাংলা মাসের ২৫শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে । চিত্রিত্রে এবং বনি-অর্ডার-স্থানে গ্রাহক-নামের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১২ টাকা । গ্রাহক হইলে চায়ায় হার—বার্ষিক (সভ্য) ১২০ টাকা এবং বাৎসরিক (সভ্য) ৬০ টাকা । ডি: পি: যোগে পত্রিকার গ্রাহক হইলে গ্রাহকদেরই ডি: পি: খরচ বহন করিতে হয় । বনি-অর্ডার যোগে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে এই অতিরিক্ত খরচ আর দিতে হয় না । ভারতের বাইরে পত্রিকার ডাকের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য ।

রচনার সম্পর্কে

রচনার নকল রাবিয়া কাগজের একপৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরের রচনা পাঠাইতে হইবে । উহা হারাইবার হাতিব আনন্ড গ্রহণ করি না । রচনার সঙ্গে উপযুক্ত ডাকমাণ্ডল না থাকিলে অননোনীত রচনা কেবল বেওয়া হয় না । ইহার সহিত লেখকের নাম ও টিকানা থাকা আবশ্যক, নচেৎ রচনা গ্রাহ্য হইবে না ।

পত্রিকার লেখা প্রকাশ করা বা না-করা সম্পাদকের বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ।

হাবতীয় চিত্রিত্রে এবং টাকা-পয়সা নিরূপিত টিকানার পাঠাইতে হইবে ।

অক্ষয়লা ওজেন্ডেসের সম্পর্কে

কমপক্ষে ১০ কপি করিয়া পত্রিকা লইতে হইবে । অধিকৃত সংখ্যা কেবল লওয়া হয় না ।

এজেন্সি-কমিশন : প্রতি সংখ্যায় চার আনা অর্থাৎ ২৫ নদা পয়সা (শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে) ।

এজেন্সি সম্পর্কে বিবরণ নিয়মাবলীর অন্তর্গত পত্র লিখিতে হইবে ।

কার্যপক্ষ—বসুধারা, ৩২, কন'গার্লিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

বঙ্গুধারা

প্রথম বর্ষ • ত্রিভীক ৭৬ • ২য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৬৪



❖ সূচীপত্র ❖

বিষয়

পৃষ্ঠা

আত্মজাতি বৌদ্ধবিহার ও লোহিত-সঙ্গদায়েত নামা (সচিত্র প্রবন্ধ)—বিক্রমলাল নাথ

৬১৩

ডাক্তারের জীবনচিত্র : আত্মকাহিনী :—ডাক্তার ভট্ট

৬১৭

অবাব : গল্প :—অজিত সরকার

৬২৩

বিকশার গান : উপন্যাস :—বিক্রমলাল নাথ

৬৩০

কৃত্যক্তি (গল্প)—পঙ্কজ রায়চন্দ্র

৬৩৪

জর্জ বার্নার্ড শ : জীবনী :—ডবলিউ মুখোপাধ্যায়

৬৪১

মহাশিবরত্নে মেলন তীর্থে : সচিত্র ভ্রমণ-বৃত্তান্ত :—অজিতকুমার শ্রীমানী

৬৪৬

ককাদান (কৃত্তমীকথা) :—অজিতকুমার শ্রীমানী

৬৪৮

মহাবিশ্বের স্তম্ভ-সঙ্কলন (প্রবন্ধ)—সলিল বসু

৬৬১

শিকারের টান (শিকার-কাহিনী) :—অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

৬৬৪

জিটো-ফেট : বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মা ও মেয়ে—চাকচাক ভট্টাচার্য

৬৭০

পুরোনো কথা : শাওরার লগ—সম দত্ত

৬৭২

তপসাগর (উপন্যাস)—কুবের ঘোষ

৬৭৪

মহোলিয়ার সাংস্কৃতিক-দল (সচিত্র প্রবন্ধ)—শ্রীমতী বাণী দেবী

৬৮৮

পথটন (কবিতা)—সুন্দরকান্ত মলিক

৬৯৩

নতুন ঔষধোৎস : নতুন মাথল (সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী)—মনোজ বসু

৬৯৬

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ : চৈত্র সন্ধ্যায় আকাশ (সচিত্র প্রবন্ধ)—কামিনীকুমার দে

৭০৪

আত্মকথা : রোগ ও তার প্রতিরোধ (প্রবন্ধ)—ডাঃ পণ্ডিত ভট্টাচার্য

৭০৭

মজুল সাহিত্য

পুস্তক-সমালোচনা : চীন থেকে ভারত—কালিদাস নাথ ; মিষ্টমল—হরপ্রসাদ মিত্র ;

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় পর্বাংশ)—মুতাজুজ মাইতি ; বাঙ্গালী আমল—কল্যাণকুমার

দাসগুপ্ত ; কলকাতা—স্বদেশীয় রায় ; শৌখিন-শাওনের পালা—মনোজিত বসু

...

মৃগ-পর্বাংশ : আগামী আকর্ষণ ; পুচুরো পবন—পদ্মনাভ । হানমতী গার্লস স্কুল (চিত্র-

সমালোচনা) :—বেবকুমার মুখোপাধ্যায় । শচীন দেববর্মণের লক্ষ্যনা (সচিত্র)—নিমিত্ত প্রতিনিধি

বেলায় মেলা—দুর্গিষ্ঠ

...

শেষ পাতা : সচিত্র রসরচনা)—শিবরাম চক্রবর্তী

। বীরেন মিত্র, দীপকর নিয়োজী, জীবনানন্দ চট্টোপাধ্যায়

এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রচার-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত আলোকচিত্র ।

—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কল্যাণ—

● সাত বামনের দেশে	৩০০	● বুন্ধু ভুতুম	৭৫
● উমনো বুমনো	২০০	● ময়ূরপঙ্খী নাও	৭৫
● পৃথিবীর আন্তান	১১২	● কলাবতী	৭৫
● স্বপ্নে পাওয়া দেশ	১৩৭	● গ্যাঙোর গ্যাঙ্	৭৫
		● মিউ মিউ	৭৫

यथाशुक्लवस्त्रैः शीतनीं गच्छिज—

ইনি কে ?

* শ্রীৰামকৃষ্ণ * দ্বায়ী বিবেকানন্দ * বিভাসাগর * মাইকেল মধুসূদন * রাণী রাসমণি
* শ্রীমদ্বিষ্ণু * ববৌন্দাধ * নেতাজী সুভাষ। প্রতি বহি—'১০ নং। পৃষ্ঠা ১।

টেলিগ্রাম—আর্ট টিউনিং
৫৫৭, গ্রে টিউ, কলিকাতা ৬

আট উত্তর

টেলিফোন—৪৪-৩৪১২

শাখা: ৪৪।১বি, বেলিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

THE FOLLOWING INFORMATION IS PUBLISHED IN
COMPLIANCE WITH RULE 8 OF THE REGISTRATION
OF NEWSPAPERS (CENTRAL) RULES 1956

Name of the Newspaper—BASUDHARA

1. Place of Publication—42, Cornwallis Street, Calcutta-6.
2. Periodicity of its Publication—Monthly.
3. Printer's Name—Kshetra Nath Roy.
Nationality—Indian.
Address—2A, Nebubagan Bye Lane, Calcutta-3.
4. Publisher's Name—Kshetra Nath Roy.
Nationality—Indian.
Address—2A, Nebubagan Bye Lane, Calcutta-3.
5. Editor's Name—Prof. Charu Chandra Bhattacharyya.
Nationality—Indian.
Address—3, Bipradas Street, Calcutta-9.
6. Names and addresses of individuals who own the newspapers and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.
Jayanta Basu—11, Mahendra Gossain Lane, Calcutta-6.

I, Kshetra Nath Roy, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.



বন্ধুধারা

প্রথম বর্ষ

কার্তিক, ১৩৬৪

২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা

আর্থিক সংগঠনের মূলমন্ত্র

নির্বলকুমার বসু

ভারতরাষ্ট্রে মোটামুটি অভাবের সংসার চলিতেছে। এ কথাটি ভাল করিয়া বোকার দরকার। জগতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ভারতের অধিবাসীর সংখ্যা সাত ভাগের একভাগ। অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর লোক যদি সারিবন্দী হইয়া ছাটিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে প্রতি সাতজনের মধ্যে একজন করিয়া ভারতবাসী দেখা যাইবে। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ আয়তনে ভারতের প্রায় আড়াইগুণ বড়, অথচ ভারতের লোকসংখ্যা ৩৭ কোটি, আমেরিকার ১৬'২ কোটি। সোভিয়েৎ রুশিয়া আয়তনে ভারতের সাতগুণ, কিন্তু তাহার লোকসংখ্যা ২০'৭ কোটি মাত্র। অবশ্য রুশিয়ার উত্তরাংশ শীতের প্রকোপে চাষের অযোগ্য; তবু সেখানে যে-সকল অঞ্চলে চাষ সম্ভব, সেখানেও জনসংখ্যার চাপ ভারত অপেক্ষা অনেক লঘু।

ভারতে মানুষের সংখ্যা নিয়ত বাড়িতেছে। মোটামুটি ধরা যায়, বৎসরে আমাদের বৃদ্ধির হার শতকরা ১-এর মত হইবে। দশবৎসর অন্তর যে আদমশুমারি হয়, তাহাতে দেখা যায় জনসংখ্যা প্রায় ১০% করিয়া বৃদ্ধি পায়। ১%-এর বৃদ্ধি

ভয়াবহ নয়। পৃথিবীর বহু সভ্য দেশেই বৃদ্ধির হার ইহা অপেক্ষা বেশি বই কম নয়। কিন্তু যেখানে সংসারের খাত্তর অনটন আছে, সেখানে বৃদ্ধিমান্রাই দারিদ্র্যের চাপকে আরও বর্ধিত করে।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে ভারতে অন্ন-বস্ত্রের অভাব আছে। তাহা ছাড়া ঘরবাড়ি, চিকিৎসা বা শিক্ষারও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদের রাষ্ট্রে পাঁচসালা পরিকল্পনার দ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা যে অত্যাশঙ্কক ইহা তর্কের দ্বারা কাহাকেও বুকাইতে হয় না। কিন্তু তবু একটি বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে, এই ব্যবস্থার দ্বারা অভাবের মোচন হইবে তো? আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সঙ্গে আর্থিক স্বাধীনতাও কায়মনো ব্যস্তিত পারিব তো?

কিছুদিন পূর্বে ওয়ারেন টমসন নামে একজন বিখ্যাত জনসংখ্যাভবিষ্যবিদ ভারতবর্ষে বেসরকারী অনুসন্ধানের জন্য আসিয়াছিলেন। আদর্শ এবং তাহার সংসাধন তো এক বস্তু নয়। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় আমরা যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহার কিছু কম পাইয়াছি। শুদ্ধি পাওয়ার জন্য যতখানি

মূল্য লিখে হইয়াছে, হয়ত স্তম্ভ ব্যবহার দ্বারা অপচয় কিয়ৎপরিমাণে নিবারণ করা যাইত। সে-সকল অপচয়ের কথা বাদ নিলেও নোটের উপরে দেখা যায়, ভারতের সম্পদ যে-ভাবে রক্ষা পাইয়াছে, জনসংখ্যার গতিও সেই হারে, বা তাহা হইতে অত্যন্ত কম হারে রক্ষা পাইয়াছে। অর্থাৎ খোরাক যেমন বাড়িতেছে, খাটবার লোকের সংখ্যাও একই হারে বাড়িতেছে। চমৎকৃত করিলে দেখা যায়, আমরা যেখানে ছিলাম, প্রায় সেখানেই পাড়াইয়া আছি।

যদি ভোগসামগ্রী উৎপাদনের হার খুব বাড়ানো যায়, জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারকে তাহা অনেকাংশে ছাপাটয়া যায়, তবেই পরিভ্রম্য কনিবে, নয়তো নয়। এই অবস্থা তৃত্বাবে স্বভাব করা যায়। যদি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা জনসংখ্যা বাড়িতে না দেওয়া হয়, উদ্ভিদমণ্ডা উৎপাদন বাড়িতে থাকে, তাহলে সম্পদের বৃদ্ধি সম্ভব। পূর্বে যোগে যে-পরিমাণ রোগভোগের দ্বারা, তৃত্বিক বা মহামারী অথবা নিচক চিকিৎসার অভাবে মারা যাইত, আজ তাহা অপেক্ষা কম মরিতেছে : ভবিষ্যতে আরও কম মারা যাইবে। কল, জন্মের হার কনিলেও মৃত্যুর হার স্তম্ভিকিৎসার কল কনার দস্তন নোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি সংকুচিত হইবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সুদূর ভবিষ্যতে কি হইবে বলা যায় না, আশু ভবিষ্যতে বৃদ্ধির নাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনা কম।

অন্ত উপায় হইল, ভোগের সামগ্রীর উৎপাদন যদি অতি দ্রুত হারে বাড়ানো যায়, তবে সমস্তার খানিক সমাধান হইবে। কিন্তু যে হারে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে বড়টুকু বা বেশি আয় মানুষের হইতেছে, তাহাও মানুষে সকল করিয়া নূতন মূলধন সৃষ্টি করিতে পারে না। সকলের প্রয়োজন আছে সত্য। কিন্তু ভারতের অধিবাসীরা এমন দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে যে অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রায় সবটুকুই খোঁজা-খোঁজা-খোঁজা প্রয়োজনীয়তা মিটাইতেই খরচ হইয়া যায় ; মূলধন সকল করার কথা কেহ ভাবে না।

হুত অবস্থাপন্ন পরিবারবর্গ বা শ্রেণীবিশেষ সকল করিতে পারে, কিন্তু সমগ্র ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য। উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য যে-পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন তাহা ভারতের অগণিত অর্থহীন জনসমূহের সন্মুখে দ্বারাই শুধু সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে না। অতএব অস্বাস্থ্য শ্রমের সফিত অর্থদান করা ছাড়া বোধ হয় আমাদের গতি নাই। আজ সমগ্র গৃহীত্রে যে দৃশ্য প্রচ্ছন্নভাবে চলিয়াছে, তাহাতে ভারতকে দেখা বা দানের সহায়তা নিতরাত্রে পরিণত করিতে অনেকেই আগ্রহান্বিত হইবে। খণ বা দান গ্রহণ করিলেই কোনও অমার্জনীয় অপরাধ যে হয় এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই মানুষ এমন একটা বাধ্যবাধকতায় পড়ে যে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করা দুষ্কর।

বাঙলাদেশে বহু অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যেও এমন এক একজন লোক দেখা দেন, বাহাদুরের কারণে সকলের মাথা সহজে উন্নত হয়। নাম করিব না, কারণ তিনি এখনও জীবিত আছেন। এই দেশেই এক দরিদ্র লেখক জন্মিয়াছিলেন যিনি সার্বজনীন অভাবের সহিত হাসিমুখে সংগ্রাম করিয়া একখানি সাম্প্রতিক সংবাদপত্র চালাইতেন। তাঁহার প্রতি দ্বন্দ্বাসম্পন্ন মনৈক ভূষামী একসময়ে কোনও শর্ত না করিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে ছাপাখানা কিনিবার জন্য অর্থসাহায্য করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় তাঁহাকে এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন যে, আপনার নিকট অর্থ লইয়া পত্রিকা চালাইলে হয়ত আপনার অন্তরের প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারিব না ; অতএব সহায়তা না লওয়াই ভাল।

পণ্ডিতমহাশয়ের আত্মসম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আত্মবিবাসও অতিশয় উচ্চ কোটির ছিল বলিয়াই তিনি অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং স্বাধীনতাকে সম্পদ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। আজ ভারতবর্ষের সম্পদ ও

মূলধন গড়িয়া তোলার জন্য দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ আমাদের ভাগ্যস্বীকার করিতে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু ঠিক যে পরিমাণ উৎসাহ হওয়া উচিত ছিল, তাহা যেন হইতেছে না। কারণ মনের যে অবস্থা থাকায় অনায়া পণ্ডিতমহাশয় ধর্মীয় নিঃস্বার্থ দানকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, ভারতের জনসমূহের মধ্যে সেই আত্মনির্ভরতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

কারণ কি? কারণ বহু থাকিতে পারে; কিন্তু একটি কারণকে স্বীকার করা যায় না। মানুষ নিজের কাজ হতে নিজে করিতে শেখে ততই তাহার আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। আমরা স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ইংরেজরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। কখনও জিতিয়াছি, কখনও হারিয়াছি। রাষ্ট্র ও ধনতন্ত্রের কবল হইতে মুক্ত করিয়া শুধু চরখার চাহায্য ও বেসরকারী সাহায্যের দ্বারা দেশকে নতুনভাবে আত্মনির্ভরতার দ্বারা গড়িবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহার আর্থিক ফলাফল যাহাই হউক না কেন, একদম চেষ্টার দ্বারা আমাদের শিরশাড়া শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভারত স্বাধীন হইবার পর হইতেই যেন আমরা একান্তভাবে গভর্নমেন্টের উপরে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছি।

কারণও আছে। স্বাধীনতালাভের মুহূর্তে যখন হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়া আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া ফেলিল, তখন বেসরকারী প্রচেষ্টার দ্বারা, কংগ্রেসের সমগ্র গঠনশক্তির দ্বারা তাহাকে নিরোধ করা গেল না। ইংরেজের নিকট হইতে রাষ্ট্রশক্তি হস্তান্তর হওয়ার পরই, শাসনযন্ত্রের সহায়তায়—দুইটি বস্তুর রাষ্ট্র গড়িয়া—আমরা স্বাধীনতার আশাস লাভ করিলাম। বাতগ্রস্ত রোগী যদি লাঠির সাহায্যে বিছানা ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করে, তবে সে লাঠির ভরসা সহসা ছাড়িতে চাহে না। ভারতেরও যেন তেমনই হইয়াছে। যে রাষ্ট্রশক্তি হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের মুহূর্তে কার্যকরী হইয়াছিল, উত্তরকালে দেশ গড়ার ব্যাপারেও যেন

আমরা তাহারই উপরে অত্যন্ত নির্ভর করিতেছি; বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপরে ততটা নির্ভর করিতে পারিতেছি না।

ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মূল উত্তরোত্তর অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিক রাষ্ট্রের সংখ্যা বতই বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রত্যেকের পক্ষে কেন্দ্রের সহায়তার তাগিদও তত বৃদ্ধি পাইতেছে। বন ছোট হইয়া যাইতেছে, এবং কেন্দ্রের কাছে সহায়তার প্রতিশ্রুতিতে আমরা যেন আত্মনির্ভরশীলতা হইতে আরও দূরে সরিয়া যাইতেছি। এই অবস্থায় লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, কে কোথায় কিছু গুছাইয়া লইবে, তাহারই জন্য যেন প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমগ্র ভারতের স্বার্থ সম্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। প্রতি ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যেও দরিদ্রতমের স্বার্থ সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ না করিয়া, যাহারা অধিকতর কোলাহল করিতে পারে, বা যাহাদের সংগঠিত সমর্থিত, তাহারাই অত্যাচারের সংসারে যতটুকু পারে নিজের দিকে টানিয়া লইতেছে।

কিন্তু মুক্তির উপায় কি? আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, আত্মনির্ভরশীলতার অভ্যাসকে বর্ধিত করিতে হইবে। তাহার অর্থ ইহা নয় যে রাষ্ট্রের সহিত অসহযোগ করিতে হইবে। তাহার প্রকৃত অর্থ হইল, একদিকে বেসরকারী সংগঠনকে যেমন বর্ধিত করিতে হইবে, তেমনি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের সহিত একতানে কাজও করিতে হইবে। সরকারী এবং বেসরকারী কর্মযোগের মধ্যে সেতুবন্ধন, এবং উভয়ের মধ্যে মাত্রা নিরূপণ করিয়া উপযুক্ত সঙ্গীতের ব্যবস্থা করাই আজ আমাদের আর্থিক সংগঠনের এক বৃহৎ সমস্যা।

কিন্তু তদপেক্ষা একটি সাধনার ঐকান্তিক প্রয়োজন আছে। সরকারী ও বেসরকারী কর্মধারার মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনা বাস্তব বস্তু; প্রয়োজনীয় হইলেও বহিরঙ্গের ব্যাপার। তাহার দ্বারাই অন্তরের পরিবর্তন অনিবার্হভাবে সাধিত হইবে, এমন ভাবিবার কোনও সম্ভব কারণ নাই। যন্ত্রের দ্বারা

বাঁকাকে সোজা করা যায়, কিন্তু যন্ত্র এখন পর্যন্ত জীবন্ত মস্তপ্রত্যাহার স্থান লটেতে পারে না।

সেই জীবনের অভাব, অথবা যন্ত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, জীবন্ত মস্তের হারাতি সম্ভব। উল্লেখ্য প্রমুখ বর্তমান যুগের অধিগণ মানুষকে এক নূতন মস্তে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গান্ধীজীরও তাহাই সাধনা ছিল। দরিদ্রতমের স্বার্থকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া তাহারই পোষণকল্পে সরকারী বা বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করিতে হইবে, ইহাটি তাঁহার উপদেশ ছিল।

যদি দরিদ্রতম জনগণের স্বার্থপুষ্টিকে আমরা ভারতরাত্ন-সংগঠনের, তাহার অধিক বাবস্থান্যের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করি, তবে অপরূপ শ্রেণী যদি তাহাদের স্বার্থপুষ্টির জন্য আত্মোৎসর্গ করে, যদি তাহাদের প্রতি ঐক্যতার মত দৃষ্টিকে কেন্দ্রীকৃত করে, তবে ক্রমে সকল আপাতবিরাধ বা উপস্থিত সংকীর্ণতার অবসান ঘটয়া মানুষ নূতন ভাবে ভারতভূমিকে পূণ্যভূমিতে পরিণত করিতে পারিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার জন্য প্রয়োজন—মূলমস্তের ধ্যান, ধারণা এবং কর্মযোগে তাহাকে নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা। যদি বুদ্ধিবৃত্তভাবে আমরা এই পথে অগ্রসর হই, তবে

প্রথম আমাদের গতি অক্ষমভাবে প্রথ হইলেও উত্তরোত্তর অভ্যাসের দ্বারা অবশেষে আমরা আর্থিক মুক্তি এবং সংগঠনের সার্থকতায় পৌঁছিতে পারিব, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দরিদ্রতমের স্বার্থপুষ্টি করিতে গিয়া আমরা তাহাদের যেন অপরের উপর অধিক নির্ভরশীল না করি, তাহাদের মুক্তি আত্মবলের ভিত্তিতেই যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহা আত্মবলের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা কখনও সত্যকার মুক্তি হইতে পারে না।

॥ সর্বমাস্তবশঃ স্মৃৎ সর্বং পরবশঃ ধুংখম্ ॥

এবং ইহাও সত্য যে যদি আমরা আত্মশক্তির উদ্বোধনকে আর্থিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ আশ্রয় করি, তবে সাধনপথে ত্যাগস্বীকারকে মানুষ তপস্যার রূপে গ্রহণ করিতে পারিবে। অজ্ঞতা ভ্রাতৃগণের আত্মানকে মানুষ হারিস্রাহুঃখ বোধ করিয়া উত্তরোত্তর বিরক্ত, অথবা বিরূপভাবাপন্ন হইয়া উঠিবে। মূলমস্তের সংযোগে অভাবকে তপস্যায় পরিণত করা যায়; তখন মানুষ যে চেষ্টার দ্বারা অভাবকে অতিক্রম করিতে পারে, সেই দিকে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইবার শক্তি লাভ করে। নচেৎ অভাব অভাবের রূপেই বহুগুণাংশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।



ভক্ত-নৈসর্গিক শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম

ভক্ত-ঐক্যপ্রতিমাল চৌধুরী

ভক্তিবাসের সঙ্গে প্রাথমিকের একটি অনৈক্য স্বতঃসিদ্ধ—
এই অনৈক্যের কারণ। এবং এই পাত্র-হুটোর আলোচনা বিষয়ও
যেন বিপরীতগামী। কিন্তু অভ্যাস হুণের বিরহ—আমাদের
এই ধারণা নির্মূল করার সম্ভব বসন্তে ভক্ত-নৈসর্গিক শ্রীকৃষ্ণ
সার্বভৌমের ভর হয়েছিল। ১৩৫৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১১২৩-
২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ‘পদ্য-বৃত্ত’ রচিত হয়। তিনি কৃষ্ণনগর
নবদ্বীপের রাজা হুয়াম রায়ের সভাকবি ছিলেন। এই
হুয়াম রায়ের রাজত্বকাল ১৩৩৭-১৩৫০ শকাব্দ।

শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম তাঁর সিদ্ধান্ত-পিতৃব্যপিন নামক গ্রন্থের
প্রথমে প্রারম্ভেও সচিবানন্দ-বিগ্রহ ধ্বংসোদ্যমকে প্রগতি
ভানিয়েছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ কৃষ্ণ-পদ্যবৃত্ত ২৭৩টি বিভিন্ন
ছন্দের কবিতায় সম্পূর্ণ। কিন্তু তাঁর এই গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর
পদ্য-বৃত্তের মৌলিক পার্থক্য এই যে, কৃষ্ণ-পদ্যবৃত্তে তিনি
স্বাধ-পরিভাষা ব্যবহার করেননি। এই গ্রন্থ তিনি রচনা
করেন ১৩৩৩ শকাব্দে। পদ্য-বৃত্তের ১২ বংসর আগে রচিত
এই গ্রন্থে কবি তাঁর ভক্তি-স্রোতধারাকে সহস্র সহস্র পথে
প্রবাহিত হতে দিয়েছেন—তার উপর কোনও সেতু বা অস্ত
উদ্দেশ্য বাধা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অস্ত্রব করেননি। তাঁর
অন্তরুর গ্রন্থ মুদ্র-পদ-মায়ুহী। নাম থেকেই এটি ব্রহ্মকট
যে, এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ
গ্রন্থের পরমাণু-নিরূপণ অধ্যায়ে তিনি এক আচাণ্য বলছেন
যে, ধর্ম ও ধর্মীয় অভ্যাস হেতু আচার্য্য জ্ঞানরূপতাও নিরাকরণ
করা যায় না; চতুঃসং গ্রহণ করে না—আর, জিজ্ঞাসাও রূপ
গ্রহণ করে না—

“নন তথাপি নান্দ্রো জ্ঞানরূপতানিরাকরণং ধর্মধর্মিণ্যাব-
ভেদানিত্যত আত্ম—

ভিজ্য হি ধর্মিণ্যে ধর্মো নো চেদেকং কথং তথা।

নো গুণ্যতি রূপং চক্ষুঃ রূপং বা রূপনঃপ্রিয়ং।”

এই মনোবী বাঙ্গালী নৈসর্গিক কবির স্রেষ্ঠ ধ্যান অবস্থা তাঁর
পদ্য-বৃত্ত কাব্য। গ্রন্থের পরিভাষা এবং তর্কপটুতা এমন
সুন্দরভাবে আর কোনও কাব্যে কখনও প্রাপ্ত হয়নি।
অথচ রচনানৈলী বোধাও কদাকার বা রূপ হয়নি।

পদ্য-বৃত্তের কবিতা-সংখ্যা মাত্র ৪৬। এই ক্ষুদ্রাঙ্কতি
কাব্যে কবি শ্রীকৃষ্ণের মধুরা-বাণ কালে গোপীপূর্ণ, বিশেষতঃ,
রাধার বিরহ-বেদনা অস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন। বর্ণন-
প্রণালীর অস্ত্র তিনি কালিদাসের নিকট ভণী—বেদভূত-স্বাতীত
কাব্য বসেই এ গ্রন্থেরও নামকরণ করেছেন তিনি পদ্য-বৃত্ত।

এখানে কোনও গোপী (বা রাধা) বিরহবিধুরা অবস্থায়
একদিন বনুনা-তীরে শ্রীকৃষ্ণের পদ্যক দেখে মুহুর্তা হয়ে পড়েন।
শ্রীকৃষ্ণের পায়ে হাশে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে ধরত, বহু, অল্প
প্রভৃতি চিন্তা রয়েছে—অন্তে নুপুর নেই—কৃষ্ণের সন্ধানভূলা
এই পদ্যকিকে গোপী হৃত করে পাঠাচার ভক্ত রতনস্বর
হলেন এবং বাবার পদ, হুবিধা প্রভৃতি এবং সেখানে গিয়ে কি
করে কি কথা পদ্যক বলবে—তাও গোপী এই দূতকে বলে
দিলেন।

এ ক্ষুদ্র গ্রন্থেও কবি পূর্ববর্তী কবির মতের সমালোচনা
করতে বিধা করেননি। আবার সে কবি অস্ত্র কেউ নন—
কৃষ্ণের স্রেষ্ঠ ভক্তকবি শ্রীল রূপ গোস্বামী। রূপ তাঁর হৃদ-
বৃত্তের ‘নির্ণয় গোপীপদভূলা’ প্রভৃতি কবিতার বলেছেন যে,
শ্রীকৃষ্ণের বিরহে পর্বাভূলা গোপীসেব চোখের ভলে বনুনা
স্বীতা হয়ে উঠেছেন—“কিরেণা বনুনা কুণ্ডলনয়না নেত্রাপুষ্টি-
ধ্বংসে”, কিন্তু কবি এই পদ্য-বৃত্ত গ্রন্থের “কীদৈবাত্তে
তরিতনয়না” প্রভৃতি কবিতায় বলেছেন, যে কবি ঐ কথা
বলেছেন, তিনি ভুল করেছেন, ঐ কথা মুক্তিকৃৎ নহ—“কা বা
পীনা ভবতি বচনং কল্পিতপ্রতি বৃত্তম্”। কবির মতে কৃষ্ণের
বিরহে কেও ভূলা হতে পারে না। বাস্তবিক বনুনা স্বীতা
হয়েই আছে—। কবি ৩১-সংখ্যক স্লোকে একটি অস্পষ্ট ভাবের
অবতারণা করেছেন—এখানে তিনি বলেছেন কান্দোবের
পাচটি পদ—প্রত্যেকে ব্রহ্মস্বরূপ পদ প্রাপের এক একটি
করে সহায় করবে—“এককেন ব্রহ্মস্বরূপাংগম্যৈককমম্”।

কোন কোনও স্থলে কবি অতি সন্দেহভাবে অর্ধাঙ্গ-রাস
অলম্ব্যমুখে সার্বজনীন সভা প্রচার করেছেন। ১১-সংখ্যক
স্লোকে তিনি বলেছেন—বালকীড়া প্রায়ে জীভাঘলের প্রতি
আসক্তি প্রচলন করে—“বালকীড়াঃ রচয়তি মুহুর্ভুত তদাশু-
বাগঃ”। ৩৪-সংখ্যক কবিতায় তিনি বলেছেন—মেকের
সভাই এই যে, তাঁরা গ্রন্থভয়ে আরোপিত প্রেম কিছুতেই
ছাড়তে পারেন না—

“সীতিঃ প্রেম গ্রন্থভয়মগতঃ নৈব নক্যাং বিদাহুঃ”।

কোথাও কোথাও অল্পপ্রাসের প্রয়োগ অতি সুবৃহৎ—যেমন
একাদশ স্লোকে—

“কৃষ্ণকৃষ্ণেরমসকর্মেরাহুল গোহুলে বা”।

হাবীন ডায়তে কৃষ্ণাধ সার্বভৌমের মত মনোবী
বাঙ্গালীর কীতি-পাখা সমস্ত ভগ্নও মুগ্ধিত করে ভুলক—
অপমাননীর কাছে এই প্রার্থনা।

কঙ্কণচর্চন

অশ্রুতরূপে

এগারে

সারথি রথ ফেরাল না।

রাজ্যদেশে সিদ্ধার্থকে প্রণোদকাননে নিয়ে গেল। শিশুতরুরা কুহুমিত হয়ে রয়েছে, মধ্যস্থলে পদ্মশোভিত সরোবর। চতুর্দিকে প্রমত্ত কোকিলের কুহরণ।

ভুধু তাই ?

চতুর্দিকে নৃত্যপরা বরাদানা।

যেন নবব্রতধারী বিশ্বভীত কোনো মুনিকে জোর করে নিয়ে এসেছে অলকায়, এমনি বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল সিদ্ধার্থ। এ কি প্রণোদপুরী না কি দশাননপীঠ ?

বিবাহসভায় যেন নতুন বর এসেছে, অঙ্গনারা ছুটল সিদ্ধার্থকে অভ্যর্থনা করতে। কান্ধ চোখে কৌতূহলে ঢকল, কান্ধ বা বিশ্বে উৎসুক। শুভ লক্ষণে স্তম্ভোভিত, কে এ মূর্তিমান মীনকেতু। ঐতিবিকচ বিশাল নেত্রে বরাদানারা সিদ্ধার্থের রূপমায়ুরী পান করতে লাগল। কেউ-কেউ মল্ল-মল্ল নিবাস ছাড়তে লাগল, কেউ-কেউ বা শূকর করল জন্তন করতে। কান্ধ চোখে বা স্থির দৃষ্টি। মুখে কথাও নেই হাসিও নেই। তাদের প্রত্যেক কানাবেশ।

কিন্তু সিদ্ধার্থ নিশ্চিন্তনিশ্চল।

পুরোহিতপুত্র উদারী মেরেগুলোকে তিরস্কার করে উঠল, 'তোমরা সর্বকলাভিজ্ঞা অথচ সানান্ত রাজকুমারের প্রণয়-উৎপাদনে অসমর্থ! তবে

কিসের তোমাদের রূপ, তোমাদের চাতুরী, তোমাদের নৈপুণ্য! তোমরা কি ব্রীড়ামুখী নববধূ না কি উদাসিনী গোপবালা! তোমাদের এই সারল্যের এই নিশ্চেষ্টতার অর্থ কি?'

রমণীকুল নিশ্চিন্ত হয়ে রইল।

'শাস্ত্রা স্বধিপুত্র স্বগ্রন্থকে আকৃষ্ট করে হরণ করেনি?' উদারী উত্তপ্ত হয়ে উঠল: 'স্বতাটী ধ্যান ভাঙেনি বিশ্বামিত্রের? আর মন্থালগৌতমের কথা হলে গেছ? সম্রাসী, কিন্তু বারবনিভা জজ্ঞার ব্রীতিলান্বনের জন্তে অর্থের মানসে মৃতসেই পর্যন্ত অ্যাহরণ করেছিল। আর তোমরা এই কোমলমতি তরুণ রাজপুত্রের চাকল্য ঘটাতে পারবে না? রাজার কাছ থেকে কেন তবে বেতন নিয়েছ? কেন তবে এসেছ এই নির্জনে? জ্বীনামের অযোগ্য তোমরা, কি জ্বাবদিহি সেবে রাজ্যকে?'

শক্তি ভাব ত্যাগ করল সকলে।

হাস্ত লাগল লীলালাদিভা ভ্রতর কটাক্ষ বহুবিধ অঙ্গবিক্ষেপ শুরু করল। কুমার তবুও অবিকৃত। কেউ মন্তগন্ধযুক্ত মুখ কুমারের কর্ণমূলে রেখে অক্ষুণ্ণবরে বলছে, শুধু একটি গোপন কথা; কেউ বা বলপূর্বক আলিঙ্গন করে বলছে, কার ধ্যান করছেন? যদি ভজন্য করবার কিছু থাকে তবে আমরা। প্রথমে কেউ বা বিদ্যামুগ্ধিত রাত্রির নত বিরাজ করছে, কেউ বা ধরেছে বিত্ত-বিকশিত পদ্মশ্রী। চারদিক থেকে প্রলোভনের বিভিন্ন উর্দা নিক্ষেপ করছে রমণীরা। হি হি, একটি নারীকেও

আপনি পরাক্রম করতে পারলেন না, নিজেও অনুভবকৃত হয়ে রইলেন। কেউ-কেউ করতে লাগল শানিত বিক্রম।

‘মস্ত পিঙ্কের কৃষ্ণন শুভ্রন। তার কৃষ্ণন শুনে আরেকটি পিঙ্ক প্রতিকৃষ্ণন করে উঠেছে। অমৃতমুক হয়ে থাকেনি।’ যৌবনচঞ্চলারা নানা ভাবে আক্রমণ রচনা করল।

তবু কুনারের এতটুকু বৈরব্যা নেই।

হায়, এরা কি জানেনা যৌবন অচিরজীবী! এরা কিসের গর্ভ করছে? এরা কি তবে কাউকে বোণে অভিকৃত হতে দেখেনি? দেখেনি ভরাণে বিকল হতে? এরা কি সর্বাঙ্গহারী মৃত্যুর বিষয়ে অনভিজ্ঞ? নিশ্চয়ই, তাই। তাই এরা নিরুপদে এননি হস্ত লাভ ক্রীড়াকেলি করছে, করতে পারছে। যে সচেতন ব্যক্তি ব্যাধি ভরা ও মৃত্যুর বিষয় জেনেছে, সে, হাসবে দূরের কথা, হুহু হয়ে একদণ্ড শুতে বা বসতেও পারবেনা। যে তা পারে সে চেতনাশূন্য গড় বস্ত্র ছাড়া কিছু নয়।

সকলকেই মরতে হবে এই বোধে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আবৃত করে স্থির হয়ে রইল সিদ্ধার্থ।

উদারী বললে, ‘রাজা জানেন আমিই তোমার যোগ্যতম বন্ধু, তাই এ কাননে আমাকে নিযুক্ত করেছেন। সৌহার্দ্যবশত তোমাকে কিছু বলতে চাই।’

‘বলো।’

‘যা অহিতকর তা থেকে নিবৃত্ত করা, যা হিতকর তাতে প্ররোচিত করা ও বিপদ উপস্থিত হলে পরিত্যাগ না করা—এ তিনটিই মিত্রতার লক্ষণ।’ বললে উদারী। ‘মৃত্যুরা তুমি সম্প্রতি পুরুষার্থ থেকে বিমূখ হয়েছ বলে তোমাকে যদি উপেক্ষা করি তবে আমার পক্ষে তা বন্ধুর কাজ হবে না।’

‘বলো কি করতে হবে।’ প্রশ্ন করল সিদ্ধার্থ।

‘এসব রমণীদের প্রতি তোমার এই অদ্যক্ষিণা অশোভন। তুমি ভরুণ ও মৃন্দর, মৃদর্পন ও

বলবান। সমস্ত জগৎ যাতে আসক্ত সেই ভোগ্যবস্তু, সেই নারী, তুমি জ্বায়েত করায়ত্ত করেও অবহেলা করছ। বন্ধু, নম্র হও, আশুগতা স্বীকার করো। যদি বাসনা অমৃতব না-ও করো তবু ওদের মান রাখতে একটু না-হয় কপট হও। কপটতা ধারাও নারীদের আকাঙ্ক্ষার আত্মকূল্য করা বিধেয়।’

সিদ্ধার্থ স্তব্ধ হয়ে রইল।

‘দুর্গত ভোগ্যবস্তু পেয়ে কে তার অনাদর করে? তাকিয়ে দেখনা ইন্দ্রের দিকে। কানোপ-ভোগকেই পরম পদার্থ মনে করে গৌতমপত্নী অহল্যাকে কামনা করেছিল। চন্দ্রের পত্নী রোহিণীকে প্রার্থনা করেছিল অশুভ্য। উত্তরের ভার্য্য মমতাকে ব্রহ্মপতি। আর ব্রহ্মপতির ভার্য্য জুগতিকে চন্দ্র। তুমি সবই জানো, তোনাকে কি বলব? ব্যসম অতিক্রান্ত হলেও যযাতি অম্বর। বিধাতীতে লুক হয়েছিল, আর ত্রীমঃসর্গ করলে সর্বনাশ হবে জেনেও মাত্রীতে পাহু। পুরাতালের মহাদ্বারা কামবশত গহিত ভোগও গ্রহণ করেছিলেন, গুণসম্পন্ন বস্তুর তো কথাই নেই। একমাত্র তুমিই দলছাড়া সৃষ্টিছাড়া হয়ে থাকবে? তুমিই একমাত্র বিশ্ববিধানের বহির্ভূত?’

সিদ্ধার্থ বললে, ‘তুমি বন্ধুর মতই উপদেশ করছ। কিন্তু আমাকে যে দোষে অপরাধী বিবেচনা করছ আমি তার মীমাংসা করছি। শোনো। বিষয়কে আমি অবজ্ঞা করছি, দেখছি সমগ্র জগৎই বিষয়াসক্ত, কিন্তু জগৎ অনিত্য জেনে বিষয়ে আমার মুখ নেই। জরা ব্যাধি আর মৃত্যু—এই তিন বস্তু যদি না থাকত তাহলে বিষয়কে মনোহর মনে হত, আমিও তাতে অহরহু হতাম। নারীদেহকান্তি যদি চিরস্থায়ী হত তাহলে মানতাম তোমার যুক্তি। কিন্তু বখন জরার কবলে পড়বে তখন নারীর রূপ নারীর কাছেই অপ্রিয় হয়ে উঠবে। তুমি যে বললে মহাদ্বারাও কামাসক্ত ছিলেন এ চুঃখেরই দৃষ্টান্ত, কেননা তারাও কামঃপ্রাপ্ত হয়েছেন। ষাঁদের

আর সকলের মতই ধ্বংস আছে, আসক্তি আছে, আত্মসংযমের অভাব আছে তাঁদের কিশোর মাহাত্ম্য !

উদারী সন্দেহাত্মক চোখে তাকিয়ে রইল।

সিদ্ধার্থ বললে, 'তুমি বলেছ ছলনা করেও নারীদের অধঃবর্তন করা উচিত। আমি মনে করি কোনো বস্তুতে তুমিই ছলনা করা উচিত নয়, লক্ষ্যসাধন-হেতুও নয়। যেখানে অসারল্য সেখানেই আমার অকর্ষিত। পরম্পর যদি পরম্পরকে শুধু ছলনাই করে তবে পুরুষ নারীকে ও নারী পুরুষকে দর্শন করাও অপ্রতিভ। তুমি তাই কানভোগে প্ররোচিত করে আমাকে প্রতারিত করছ। আমি তেবে অথক হজ্জি অর্থস্থায়ী ভোগের মধ্যে তুমি সারবস্তু দেখছ। যেখানে তীর্থ আতঙ্ক, যেখানে সমস্ত মাহুয নৃত্যপাথের পথিক, সেখানেও তোনার বিষয়াসক্তি। তাই, তোনার মত ধীরচৈতা, দৃঢ়চৈতা আর কে আছে ?'

চকল হয়ে উঠল উদারী কিন্তু মুখ নিয়ে কথা সরল না।

'ভরা বিপদ ও ব্যাধিতর চিন্তা করে আমি অত্যন্ত বিকল হয়ে পড়েছি। দেখতে পাচ্ছি সমস্ত জগৎ ঘন অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে। কোথাও আমার এতটুকু শান্তি নেই ধৈর্য নেই। চতুর্দিকে মৃত্যু আর নশ্বরতা দেখে আমার হৃদয় রোদনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে, বলো, কি করে আসবে আমার রতিমতি ?'

মালাচূষণহৃষিতা কামিনীরা তখন আর কি করে! তাদের সমস্ত প্রণয়কলা নিষ্ফল, সমস্ত কটাক্ষনিদ্রা স্বাদশূন্য। মম্বথকে নিজ অন্তরে গোপন করে ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে চলল নগরে।

রাজা শুনতে পেলেন কুমারের ভোগবৈমূখ্যের কথা। মন্ত্রীদের নিয়ে বসলেন পরামর্শ করতে। উপায় চিন্তা করতে-করতে স্নান হয়ে পড়লেন, কিন্তু বিতুকার প্রতিবেদ ভোগেচ্ছা ছাড়া আর কিছুই স্থির করতে পারলেন না। যেহেতু কুমার পরাশ্রয় সেহেতু আরো ইন্দ্রিয়-ইন্দ্রন সংগ্রহ করে।

'হে ভূরিপ্রজ্ঞা আমি জ্ঞানহীন, আমার নিকট ধর্ম প্রকাশ করুন।' বললেন জড়করি। 'হে অযত্নসমুদ্রজ্ঞাননেত্র, শান্তিপদ প্রকাশ করুন, যাতে আমি এই জগতে জ্ঞান ও জরা থেকে মুক্তির উপায় জানতে পারি।'

ভগবান বৃদ্ধ বললেন, 'হে জড়করি, কান ও লোভ পরিহার করে, বৈরাগ্যই যুগ্ম এই চিন্তায় তোমার যেন গ্রহণ-বর্জন কিছু না থাকে। সর্ব-প্রকার নামরূপে যে নিষ্পৃহ সেই অনাস্রব। ভবিষ্যতের চিন্তা পরিত্যাগ করে। তোমার পক্ষাতেও যেন কিছু না থাকে। আর মধ্যভাগে অনাসক্ত থাকো।'

'হে প্রাণবানোত্তীর্ণ, যাতে অবিষ্টার ধ্বংস হয় সেই জ্ঞানবিনোদ প্রকাশ করুন।' আনুমান উদয় অহুনয় করল।

ভগবান বললেন, 'তোগাভিলাষের উচ্ছেদ, মানসিক বৈরাগ্যের পরিহার, জড়তার নিরাকরণ ও হৃদয়িতর প্রতিরোধ—এইই জ্ঞানবিনোদ। উপেক্ষা ও চিন্তের জাগৃতি দিয়ে সংযত হও—সেই সংযতচিত্তে যে ধর্মবিচার তাইই জ্ঞানবিনোদ।'

'প্রভু পৃথিবীর সংযোজন কি? কিসে মানুষকে পুনর্জন্মের শৃঙ্খলে বদ্ধ করে?'

'ইন্দ্রিয়সুখই জগতের সংযোজন। ভোগ-বাসনাই পরজন্মের শৃঙ্খলসেতু।'

'সেই শৃঙ্খলের স্লামাসজ্ঞান হবে কিসে?'

'শুধু বিতর্কে। বিচারবুদ্ধিতে। সিদ্ধান্তে। উপলব্ধিতে।'

'তবে নির্বাণ কি?'

'তুকার বর্জনই নির্বাণ।'

আনুমান মেঘরাজ এগিয়ে এলেন। জিগমেস করলেন, 'জগৎকে কিরূপ দর্শন করলে মৃত্যু হতে জ্ঞান হয়?'

'জ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জগৎকে শূন্যময় নির্বীক্ষণ করে।' বললেন বৃদ্ধ, 'বন্ধিত কল্পনাকে অগ্রাহ্য করে। শূন্যতাই অব্যাহতি।'

শুভবোধই যদি সত্যবোধ, তবে নিরর্থক নিষ্ক্রিয় হয়ে আসলে নিম্ন থাকলেই চলে ?

না। বৃদ্ধ বললেন, 'উদ্ভিষ্টে নপ্পনশ্চেয়া ধম্মঃ সূচরিতং চরে।' উখিত হও, প্রমত্ত হয়ে না। আর কল্যাণধর্ম কুশলকর্ম করে। ধম্মঃ চরে সূচরিতঃ। মহা-উপাসিকা বিশাখাকে বললেন, 'কন্তব্যং কুসলং বহু।'।

পুষ্পগুচ্ছ থেকে ফুল চয়ন করে মালাকর নানা-রকম মালায়রচনা করছে, তেমনি তোমার কর্মগুচ্ছ থেকে সঙ্কমগুলি আহরণ করে পুণ্যানন্দ সঞ্চয় করে।

কে বিশাখা ?

যাচা

বিশাখা সাবেকের ধনকুবের ধনজয় শ্রেষ্ঠীর মেয়ে। তবে পা নিয়েছে যৌবনে।

সদীপের নিয়ে বনভোজনে গিয়েছিল বিশাখা। কেরবার সময়, নগরের কাছাকাছি এসেছে, অশ্বের-ধারে বৃষ্টি নামল। ফটকের নিচে আশ্রয়ের আশায় সখীরা ছুটল দ্রুতপায়ে। কিন্তু বিশাখার ঘরা নেই, মরালমধুর গতিতে চলেছে এগিয়ে।

কে এই মেয়েটি! আহা, গতিভঙ্গি কি মনোহর! যেন গরবিনী রাজহংসী!

তুমি কে? পাশের থেকে কে একজন প্রশ্ন করল।

আমি জাবস্তীর শ্রেষ্ঠী যুগারের পুরোহিত। পাত্তীর সন্তানে কিংহি এখানে-ওখানে।

কার ভক্তে পাত্তী ?

যুগারের ছেলে পূর্ববর্ধনের ভক্তে।

কিন্তু যে মেয়েটিকে তুমি চিহ্নিত করেছ সে মেয়েটি দেখতে তত রূপসী কোথায় ?

কিন্তু অঙ্গছন্দটি দেখেছ। যৌবনভরসে ঘন হলছে। শুধু দেহের লাবণ্য নয় ব্যক্তির ছটা।

মেয়েটির কাছে এগুলো পুরোহিত। জিগধেস করল, 'মা, তুমি কি বুড়ো হয়ে গিয়েছ ?'

'বুড়ো হয়ে গিয়েছি ?' বিশাখা তুরু ঝুঁচকোলো।

'নইলে তুমি ছুটতে পারছনা কেন ? তোমার সখীরা কেমন কিপ্রপায়ে ফটকের নিচে এসে দাঁড়াল, আর তুমি স্থবিরের মত ধীর পায়ে ভিজতে ভিজতে এলে !'

'এলান তো এলান।' জুড় কটাক হানল বিশাখা। 'আমার কি কাপড়-জামার অভাব যে এক প্রস্থ ভিজে গেলে কোনো লোকমান হবে ? কাপড়-জামা বাঁচাবার ভক্তে আমি ছুটব ? জানেন না কুমারী তরুণী যুগপারের মত ভদ্র ! ক্রত ছুটতে গিয়ে যদি পড়ে যায়, যদি পড়ে গিয়ে আমার অঙ্গ-হানি হয়, তবে সকলের চোখে আমি হেয় হয়ে যাব। যৌবনের সভা থেকে আসন আমার উঠে যাবে। তাই অত্যন্ত সতর্পণে ধীর পায়ে এসেছি।'।

'বৎসে, তোমার বাক্য অত্যন্ত মধুর।' পুরোহিত সম্মোহিতের মত বললে, 'বাচনভঙ্গিও শুনল। তোমার শিক্ষাগুরু কে ?'

ভক্তির প্রসঙ্গে হুই চোখ গাঢ় হয়ে উঠল বিশাখার। বললে, 'ভগবান বৃদ্ধই আমার জ্ঞানগুরু। আগে আমরা ভক্তি নগরে ছিলান, সেখানে, আমার যখন সাত বছর বয়েস, তখন আমি ভগবানকে বন্দনা করবার সুযোগ পাই। তিনি তৃপ্ত হয়ে আমাকে কত সহজগতীর উপদেশ দিয়েছেন। তাই আমার নিবাস-প্রবাস।'

বিশাখাকেই পূর্ববর্ধনের বর্ণরূপে মনোনীত করল পুরোহিত।

কোটিপতি ধনজয়ের কথা ? যুগার উন্নত হয়ে উঠল। কুলপতি যুগারের পুত্র ? ধনজয়ের আনন্দ আর ধরনা।

সুভদিনে বিবাহ হয়ে গেল। এবার বিদায়ের পালা। স্বস্তরালয়ে পাঠাতে হবে কন্যাকে।

ধনজয় ব্রহ্মাঙ্ককোমলকণ্ঠে বললে, 'মা, আমার কাছে তুমি এতদিন গচ্ছিত ধনের মত ছিলে। আসলে তুমি তোমার স্বস্তরকুলেই রয়, স্বস্তরালয়েই তোমার আসল ঘর। মা, কটি উপদেশ তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, সর্বদা মনে রেখো।'

কান খাড়া করল বিশাখা।

‘না, ঘরের আশ্রম বাইরে নিয়ে না। বাইরের আশ্রম হয়ে এনে না। দিলে দিয়ে, না দিলে দিয়ে না। আর আত্মীয়ের বেলায় না বিলেও দিয়ে।’ সুখে বোসো, সুখে খেয়ো, সুখে শুয়ো। অগ্নির সেবা কোরো, আর গৃহদেবতাকে প্রণাম করতে কখনো যেন হুল না হয়।’

পাশের ঘর থেকে কান পেতে সব শুনে নিল মৃগার।

ধনঞ্জয়ের আটজন আত্মীয় আবহুিতে থাকেন। তাদেরকে ধনঞ্জয় বিশাখার জামিন করল। বিশাখা যদি কখনো কোনো অজ্ঞার করে ঐ আটজন প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিচার করবে, দরকার হলে প্রতিকারও করবে। মহানন্দারোহে আবহুিতে প্রবেশ করল বিশাখা। এত সাজ-সজ্জা আবরণ-অভরণ কেউ কোনোদিন দেখেনি। ধনঞ্জয় একেবারে ঢেলে দিয়েছে। বড় দরজা ছিল তার ভাওরের, সব মুক্ত করেছে একদিকে।

কিন্তু, এ কি, শব্দরবাহুিতে পৌঁছে প্রথম রাতেই গৃহ ছেড়ে চলেছে কোথায় নববধূ?

চলেছে আস্তাবলে।

নেখানে কি?

আর্তনাদ শুনেছে বিশাখা। এক গভীরী অশ্রীর প্রসবধূগার আর্তনাদ। দাসীকে সঙ্গে নিয়ে একটা প্রদীপ হাতে করে চলে এসেছে আস্তাবলে। অশ্রীকে গরম চলে হান করিয়ে তেল মালিশ করতে বসল বিশাখা। গভীর রাতে সুপ্রসব হয়ে গেল।

সাত দিন ধরে ভেঁড় দিলে মৃগার। ভোজের শেষদিনে কজন সন্ন্যাসী এসেছে। তাদের অভিশাপ নববধূকে একবার দেখে।

তারা জৈন, মহাবীরের উপাসক। তারা সর্ববাসমুক্ত দিগম্বর।

যে ঘরে তারা বসে ছিল, সে ঘরে মৃগার নিয়ে এল বিশাখাকে। বললে, ‘না, এঁরা মুক্ত-পুরুষ, তুমি এঁদের বন্দনা করো।’

একমুহূর্ত চকিত নেত্রপাত করল বিশাখা, তারপর কর্ণধরে বিচার করে উঠল, ‘ছি ছি, কি চুপ, কি সজ্জা! এইসব নির্লজ্জ নগ্ন সন্ন্যাসী মুক্ত-পুরুষ? ছি ছি, এদের সামনে কি করে আনাকে আশ্রয় করলেন?’ মৃগারের নিকে রোষভীক চকু হেনে দ্রুত অস্থিত হল বিশাখা।

সন্ন্যাসীরা অপমানিত জর্জরিত হল। তিরস্কার করে উঠল মৃগারকে। ‘দেশে আর তোনরা পাখী পেলেনা? গৌতমশিষ্টা এক কুলকণা মেয়েকে নির্ধাচন করলে? এতুনি এ মেয়েকে বিভাভিত করে।’

অস্থির নিজে দহ হলেও বিশাখার জন্তে মিনতি করতে লাগল মৃগার। বললে, ‘বিশাখা অনভিজ্ঞা। ও অজ্ঞানবশতই কটুকথা বলেছে। ওর হয়ে আমি নার্জন চাইছি। করুণা করে একে ক্ষমা করুন।’

সন্ন্যাসীরা ক্ষমা করলেও মৃগার করবে না।

সোনার বাটি থেকে সোনার চানচে করে ক্ষীর খাচ্ছে মৃগার, এক বৌক তিনু তিকাপাত হাতে তার সামনে এসে দাঁড়াল। মৃগার দেখেও দেখল না, আপন মনে ক্ষীর খেতে লাগল।

অলিলে ঠাড়িয়ে দেখছিল বিশাখা। এ যেন সহস্র বাইরে। নিচু হয়ে হুঁকে পড়ে তিনুককে উদ্দেশ্য করে বললে, ‘ভাস্তে, আপনি এখন যান। আমার শব্দর এখন বাসি খাচ্ খাচ্ছেন।’

স্পষ্ট শুনে পেল মৃগার। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার জ্বলে উঠল। বাড়ির বউয়ের এত বড় স্পর্ধা, শব্দরকে অপমান করে! চাকরকে ডেকে বললে, ‘বিশাখাকে এতুনি বাড়ির বার করে দাও।’

চাকরদের কার সাহস নেই বিশাখাকে সরাসরি গিয়ে বলে। কিন্তু কর্পরস্পরায় কথাটা বিশাখার কানে গেল। সে নিভেই চলে এল শব্দরের কাছে। বললে, ‘বাবা, আপনি নাকি আনাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন?’

মৃগার শুক থেকে সমর্থন করল।

‘কিন্তু জানবেন আমি দাসী নই, আমি অনাথার

মত এ বাড়িতে আসিনি। হুকুম দিলেই বেরিয়ে যাব আমি তেননি পথের ভিক্রম নই। যতদিন আমার মা-বাবা বেঁচে আছেন ততদিন সাধা নেই আমাকে এ বাড়ি থেকে কেউ ত্যাগ—উঁরাই আমাকে পাঠিয়েছেন এ বাড়িতে, তাঁদেরই কাছ থেকে আপনি আমাকে প্রার্থনা করে এনেছেন। তা ছাড়া বাবার অটর্জন আত্মীয় আমার বিচারক আছেন, তাঁদের সিদ্ধান্ত না পাবার আগে আপনার এ আদেশ হারি করবার অধিকার নেই।’

‘বেশ তো, তাকে সেই অটর্জনের।’ মুগার ক্রিপ্ত হয়ে উঠল। ‘সেই অটর্জনের বিচারে তুমি যদি দোষী হও এই দণ্ডে তোমাকে বার করে দেব।’ এল সেই অটর্জন। জায়ে-দর্শনে সুপণ্ডিত। কুটতর্কে কুবুদ্ধি।

‘আমার পুত্রবধূ আমাকে অন্তর্চিন্তারক বলেছে।’ মুগার অভিযোগ করল। ‘টাকা দর খাজান, আমাকে বললে, আমি বাসি খাজি।’

‘মা বিশাখা, এ কি সত্য?’

‘আমি কি বলেছি বুঝুন। এক ভিক্ষু ত্রিকে করতে এসেছে, আমার খুশরনশাই তা লক্যের মধ্যেই আনছেন না, একমনে দীর খাচ্ছেন।’ বিশাখা বললে স্পষ্টভাবে, ‘আমি ভিক্ষুকে বললাম, ভগ্নে, আমার খুশর নতুন করে পূণ্য সঞ্চয় করতে রাজি নন, তিনি তাঁর পুরোনো পূণ্য ভাঙিয়ে খাচ্ছেন। মানে, তাঁর অতীত জন্মের পুণ্যের ফলে যে খাজ তিনি পেয়েছেন তাই ভোগ করেই তিনি তৃপ্ত থাকতে চাইছেন। এতে দোষের কথা কী বলেছি!’

‘কোনো অজ্ঞায় করেনি বিশাখা।’ পণ্ডিতেরা রায় দিল।

‘বেশ, মনে নিলুম।’ মুগার অজ্ঞ কথা পাড়ল। বললে, ‘কিন্তু এ বাড়িতে এসে প্রথম রাত্রে বিশাখা তার স্বামীকে অগ্রাহ্য করে অভিলষিত অন্নস্থানে গিয়েছিল—বলুন, এ অজ্ঞায় নয়?’

‘হ্যাঁ, মা, এ সত্য?’ ভিখগেস করলে বিচারকেরা।

‘আমি কোথায় গিয়েছিলুম শুচুন।’ বললে বিশাখা, ‘আমি গিয়েছিলুম আন্তাবলে, এক গভীরী অরীর প্রদববেদনা লাভব করতে। তার যত্নগায় তাকে শুজ্ঞা করতে। বলুন এতে কি কোন অবাধ্যতার কথা ধরে, না কি আন্তাবল কার অভিলষিত স্থান?’

‘বিশাখা নির্দোষ।’ বিচারকেরা বললে একবাক্যে।

মুগার তবু ছাড়বার পাত্র নয়। বললে, ‘আমি শুনেছি এ বাড়িতে আসার আগে ধনঞ্জয় স্নেহী তার মেয়েকে কি উপদেশ দিয়েছিল। যে মেয়ে ঐ সব উপদেশ পালন করতে প্রস্তুত, বলুন, সে কি ভালো?’

‘কি উপদেশ?’

‘ধনঞ্জয় বললে মেয়েকে, ঘরের আত্মন বাইরে নিয়েনা। বলুন এ কি সত্বপন্থ? যদি কোনো প্রতিবেদী এসে আত্মন চায় তাকে তা দেওয়া হবেনা?’

‘মা বিশাখা, এ সত্য?’ বিচারকমণ্ডলী প্রশ্ন করল।

‘সত্যি কিন্তু অর্থ অজ্ঞ।’ বললে বিশাখা। ‘এখানে আত্মনের অর্থ গুপ্ত কথা। আমার বাবা বললেন, ঘরের গুপ্ত কথা বাইরে প্রকাশ কোরো না। এমন কি দাসদাসীর কাছেও না। গুপ্ত কথা প্রকাশ হলই আত্মকলহ শুরু হয়, আত্মকলহ থেকেই গৃহভঙ্গ।’

‘কিন্তু তোমার বাবা যে বললেন বাইরের আত্মন ঘরে এনোনা, এ কোন ধরনের সত্বকি?’ মুগার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, ‘বাড়ির আত্মন যদি নিবে যায় তবে বাইরে থেকে না আনলে চলে কি করে?’

‘মোটাই সে অর্থ নয়।’ বিশাখা হাসল। ‘আসল অর্থ, বাইরের গুপ্ত কথা দাসদাসীর। যা বহন করে নিয়ে আসে তা ঘরের মধ্যে প্রকাশ না করা, আলোচনা না করা।’

‘কিন্তু আবার যে বললেন যে দেয় তাকে দিয়ে, যে স্নেহনা তাকে দিয়ে না, তার কি তাৎপর্য?’

মুগার আবার কুণ্ঠে উঠল। 'আবার বললেন কিনা, দিলে কিংবা না দিলেও দিয়ে। এ সব কোন দিশি কথা ?'

'এর অর্থ অত্যন্ত সরল, সুস্পষ্ট।' বিনয় অথচ দৃঢ় ভঙ্গিতে বলল বিশাখা। 'বাবা বললেন, যে ধার নিয়ে ধার শোধ করে তাকেই ধার দেবে। যে করেনা তাকে দেবে না। কিন্তু আদায়ের বেলায় ধার শোধ করুক আর না করুক সর্বদাই তাকে দান করবে।'

'কিন্তু সুখে বসে সুখে খাওয়া সুখে শোওয়ার অর্থ কি ?'

'যেখানে গুরুজন উপস্থিত নেই সেখানে বসবে। গুরুজনদের খাওয়া হয়ে গেলে খাবে। গুরুজনদের নিমিত্র হবার পর শয়ন করবে। গুরুজনদের সুখ-বিধান করবার পরেই গৃহস্থবধূর সুখ।'

'আর অতিসেবা করা গৃহস্বেরতাকে প্রণাম করা—এ সবের কি অর্থ ?'

'বস্তুর শাস্ত্রী আর স্বামীই এখানে অগ্রি। আর গৃহস্থারে উপস্থিত প্রব্রজিতকে ঋণভোজ্য দান করাই গৃহস্বেরতাকে প্রণাম।'

বিচারকমণ্ডলী সমন্বরে ঘোষণা করে উঠল, এ সব সং কথা শোভন কথা। বিশাখা সন্তুষ্টমুখেই পেয়েছে। বশুণ আর কোনো দোষ আছে আমাদের বেয়ের ?

লক্ষ্য অধোবদন হল মুগার। বললে, 'না, আর কোনো দোষ নেই।'

বিশাখা ক্ষুণ্ণ হয়ে দাঁড়াল। বললে, 'বস্তুর-নশাই যখন আমাদের এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তখন আমি বাইনি। তার আগে আমি বিচার চেয়েছিলাম; বিচারে আমি নির্দোষ সাব্যস্ত হয়েছি। এখন আমি এ-বাড়ি ত্যাগ করব। বিচারের আসে চলে গেলে সবাই আমাদের অপরাধী ভাবত। এখন আর কেউ তা ভাববে না।'

মুগার বিশাখার দুহাত চেপে ধরল। বললে, 'না, আমাদের ক্ষমা করো।'

বিশাখা বস্তুরকে প্রণাম করে বললে, 'এ ক্ষমার কথা নয়। শিশুকাল থেকে আমি বুদ্ধের উপাসিক। বৌদ্ধভিক্ষুদের সেবা করাই আমার প্রাণের বাসনা। আমি বুদ্ধশাসিত ভিক্ষুসঙ্ঘেই বাস করব এখন থেকে।'

'কিন্তু তেই কি তুমি থাকবে না গৃহে ?'

'ধাকতে পারি যদি এ বাড়িতে আমাকে ভিক্ষু-সেবার অমুমতি দেন।'

'তাই দেব।'

জৈন-সন্ন্যাসীরা আপত্তি করল কিন্তু মুগার তা কানে তুলল না।

শিশুর বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করল বিশাখা। বস্তুরকে বললে, তথাগতকে এসে অভিবাদন করুন। জৈন-সন্ন্যাসীরা বোধে দিল। বললে, শ্রমণ গৌতম ভীষণ মায়ারী। তার দাননে গিয়ে দাঁড়াবে না। ঘরের বাইরে থেকে তার কথা শুনবে।

কতক্ষণ আর শুনবে বাইরে দাঁড়িয়ে ? মুগার বুদ্ধের পা জড়িয়ে ধরল।

বিশাখাকে বললে, 'তুমি আমাকে নতুন জন্ম দিলে। এ জন্মে তুমিই আমার জননী।'

বিশাখার নতুন নাম হল মুগার-মাতা।

নগরের পার্শ্বে সহস্রপ্রকোষ্ঠযুক্ত বিহার ও সঙ্কুটি প্রতিষ্ঠিত হল। বিশাখা গৃহে ও বিহারে ভিক্ষুদের পরিচর্যা ত্রুতে আত্মনিয়োগ করল। পূর্বাভ্যে ঋণভোজ্য ও ঐষ দান করছে ভিক্ষুদের, সায়াহ্নে অষ্টবিধ পানীয়। তারপরে সেবা-অন্তে শুদ্ধগত মনে ধর্মকথা শ্রবণ করছে।

বুদ্ধকে বিশাখা প্রশ্ন করল, কেমন এ স্থান ?

বুদ্ধ বললেন, গ্রামে অরণ্যে জলে বা স্থলে যেখানেই অর্ধংগণ বাস করেন সে স্থানই রমণীয়। সে স্থান চিত্তায় হৃদয় শান্তিতে হৃদয় সাধনায় হৃদয়।

[কথন :]

ডাক্তারের জীবনচিহ্ন

• ডাক্তার ডট •

৪৪

হালশত্যালের কাছ ছেড়ে কিছুকাল আমি বেকার বসে রইলাম। ঠিক বসে থাকা নয়, কোথায় বসে প্রাকৃতিক ভ্রম করা যায়, কোথায় বা একটা ডাক্তারখানা খোলা যায়, কোনো বাড়ি ডাক্তারখানাতে প্রত্যাহ বদলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে কিনা—ইত্যাদির সম্বন্ধে নিম্নুক্ত হয়ে রইলাম।

তা ছাড়া বাইরে ডাক্তারি করাও আমার তখন থেকে শুরু হয়ে গেল। অবশ্য সে হলো অতিক্রান্তই বেগানের ডাক্তারি। ভটীপতিয়া, আতীতহট্ট আর বহুবাহুবরা সবাই আমাকে ডাকে, কারণ সবাই জানে যে এতে পয়সা লাগবে না। আতীতহট্টের সংখ্যাও আমার কম নয়, আর ভাণ্ডাওনে বহুব সংখ্যাও কম নয়। তাদের মধ্যে যেকোনো পথের দিলেই আমি চুটে যাই। তাদেরও সুবিধা হয়, আর আমারও ব্যকে বলে প্রাকৃতিক তাই বল হতে থাকে। ডাক্তারি রাখের ওখানে গিয়ে যে-সব নতুন নতুন ওষুধের নাম শিখেছি সেগুলিকে সুবিধা পেলেই ঐদর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে ছাড়ি না। তারা নিজেদের পাড়ার ডাক্তারখানাতে সেইসকল প্রেসক্রিপশন দিয়ে রাখে, কিন্তু ডাক্তারখানার লোকেরা অবাক হয়ে প্রেসক্রিপশন চিরিয়ে দেখে, বলে যে এ-ওষুধের নামও কখনো শোনেনি। বোধহয় বাড়ির লোকেরা এখন এ-কথা আমার কাছে মালিশ করে, তখন আমি একটা নুচকে ছেলে বলি—“তোমরাও যেমন, তাই পাড়ার বন্ধি ডাক্তারখানাতে ওষুধ কিনতে গেছে। চৌরসীতে বড়ো বড়ো ডাক্তারখানায় যাও, দেখানো ঠিকই মিলে যাবে।” হয়তো কোনো একটা ডাক্তারখানার ঠিকানাও বলে দিই।

কিন্তু এতে আতীত হলে আমার একটা বদনাম রটল। আমি নাকি সচ আবিষ্কৃত নতুন নতুন ওষুধ দিয়ে তাদের উপর এক্সপেরিমেন্ট চালাই, কিংবা দাবী দাবী ওষুধ দিয়ে তাদের জ্ব করি।

এ কথা একদিন আমার গালাবুর্ কানে গেল। তিনি আমাকে তেঁকে বললেন—“ওহে বড়ো ডাক্তারবাবু, তোমার ডাক্তারিতে যে বদনাম হচ্ছে। এমন সব ওষুধ তুমি পাও যা বাস্তবে কোথাও পাওয়া যায় না, কিংবা পাওয়া গেলেও তার

অনেক বেশি দাম নেয়। সে-কোনো কিংবা সস্তার ওষুধ তাই পাও না কেন?”

আমি বললাম—“তাঁর কি উচিত? কেন? আতীত-বহুবের রোগ হলে যে ওষুধটিকে সব চেয়ে কাজের বলে আমি পেট ওষুধই দেখা। তাতে না হয় বেশি কিছু দাম পড়বে, কিন্তু রোগটা তাড়াতাড়ি সাববে। বেশিদিন দুগতে হবেনা।”

“তুমি এ-সব নতুন নতুন ওষুধ শিপলে কোথা থেকে? ভার্মলে থেকে নাকি?”

“তা কেন, ডাক্তার রাসে নিজে ঐদর ওষুধ প্রেসক্রিপশন করেন, তাতে তাঁর কত রোগী আরাম হয়ে যাচ্ছে, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি।”

“ও, তাই হলো! কিন্তু তুমি তো বাপু এখনও ডাক্তার হার হওনি। তাঁকে অনেক চর্চা দিয়ে দাবা দেখাতে পারবে, তারা তেমনি অনেক দাম দিয়ে ওষুধগুলো কিনতে পারে। কিন্তু এরা তা পারবে কেন? দাবা কিনা রসে ডাক্তার দেখাবে, তারা অল্প দামের ওষুধই চাইবে! তোমার পুথিতে কি অন্যান্যের ওষুধের কথা কিছু লেখা নেই?”

এ কথা শুনে কোনো দাবা না দিয়ে আমি বনামুদ্র হয়ে চলে গাচ্ছি দেখে তিনি আমার চেঁকে বললেন—“ওহে শোনা! শোনা, তুমি বরাং এক কাজ করো। কি কি নতুন ওষুধ শিপেছ তাই লাগিয়ে আমার বাতটা আগে ভালো করে শাও বেধি। এই হাটুর বাথটা কিছুতেই সাববে না, লাট্ট না নিয়ে চলতে পারি না, বেড়াতে বেরিয়ে অনেক কান্নাকাতি বলে পড়তে হয়। সারাও আমার এই বাথটা, দেখি তুমি কতবড়ো ডাক্তার। তুমি যেদাম থেকে যা মনেতে বলবে আমি তাই আনাবো।” আচ্ছ থেকেই শুরু করো।

খুশি হয়ে আমি নানাব্যব চিকিৎসা নিয়ে পড়লাম। কয়েকটি ইন্ডেক্সন বিলাম, সঙ্গে সঙ্গে মালিশ ও সৈকতাপ। হাটুর বাথটা কমে গেল। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি বললেন—“ওহে, ঐ হাটু ছেড়ে যে আমার এই হাটুটাও বদলো। এ কি রকম চিকিৎসা হলো?”

আবার উৎসাহের সঙ্গে আমি দ্বিতীয় হাটুর চিকিৎসা লাগলাম।

কিন্তু অতঃপর আমার ভাগ্যানিহতা অধিরেই আমাকে এ বিষয়ে বেশ একটু শিকা দিলেন।

ইতিমধ্যে কলকাতার বাইরে আমার এক অস্বাভী চাকরি ছুটে গেল। মাত্র এক মাসের চাকরি। বিহার প্রদেশের কোনো রাজ্যের ছেলের অগ্রপ্রাণন হ'বে, সেই উপলক্ষে সেখানে প্রায় একমাস-ব্যাপী উৎসব চলবে। চতুর্দিক থেকে বহু মানুষ সেখানে জমা হবে, রীতিমতঃ মেলা বসবে, নাচগানের আদর বসবে। মহা সমারোহের ব্যাপার। কিন্তু সেখানে ভালো একজন ডাক্তার থাকার দরকার, বেশি মানুষের ভিড়ে হঠাৎ করে কি হয়ে পড়ে বলা যায় না। সেখানে রাজ্যের একটি দাতব্য ডাক্তারখানাও আছে, আর একজন স্থানীয় ডাক্তারও আছে, কিন্তু কেবল তার উপর নির্ভর করা এখন চলে না। কলকাতার একজন শিক্ষিত ডাক্তার সেখানে উপস্থিত থাকলে ভালো হয়। ওষুধের সবই আছে কিন্তু কোনো বিশদ ঘটলে সংক্ৰামণ সামলে নিতে পারবে এমন একজন হৃদক ডাক্তার চাই। নাইনে নিলবে পাঁচশো টাকা। তা ছাড়া বাওয়া থাক। ও দুজন চাকর দিলবে নিখরচায়। একজন প্রফেসর আমাকে স্নেহ করতেন, তিনি আমাকে ডেকে এই চাকরিতে নিলেন; বললেন—“বাও দিনকতক বাইরে ঘুরে এসো, অনেক কিছু দেখাও হবে, আর মোটা টাকাও কিছু হাতে আসবে।”

তখন দলাবাবু খুব খুশি হলেন। বিহারের সব আর্থগাই তাঁর জ্ঞানিত। বললেন—“ও আর্থগাই খুব বাস্তবিক, হস্ততা বিশেষ কিছু ডাক্তারি তোমাকে করতেই হবে না। কিন্তু দেখো, ওখানে গিয়েও সাবী-সাবী নতুন ওষুধ কয়লাস করে বোশো না।”

ছোট কোট চড়িয়ে ডাক্তার সেজেই আমি যাত্রা করলাম। তখন অল্পান মাস, বিহারে দাঙ্গা মীত। একটি মোটা ওভারকোট কিনে নিতে হলো।

সারাকান্ত ট্রেন কাটিয়ে নির্দিষ্ট স্টেশনে গিয়ে নানলাহ ডেরেকাল, তখন লুপে স্বর্ধ্যাঙ্গর হচ্ছে। স্টেশনে নেমে চারিদিকে ছেহে মনটি খুশিতে ভরে উঠল। মাঠের মাঝে মাঝে ইতস্তত বিকস্প খাপসার ঘর, এই তো আমার ছেলেবেলাকার সেই পরিচিত মেনটি। জ্ঞান হবার পরে প্রথম স্বর্ধ্যাঙ্গর তো এখানেই দেখেছিলাম। বেশিদিন আগের কথা কি!

গম্বুজ স্থান কাছে নয়, স্টেশন থেকে প্রায় আট ক্রোশ দূরে। আর্থগাটির নাম এখানে নাইবা বললাম। সেখানে যেতে হয় গঙ্গার পাড়িতে, কিংবা পাড়িতে, কিংবা হাড়িতে। আমাকে নিয়ে বাবার অল্প রাজা পাখি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

গঙ্গার পাড়িও বিস্তর এসে জমা হয়েছিল, কলকাতার কেনা টাঙ্গের বসে কিন্তু মালশত্রু নিয়ে বাবার অল্প।

পাখি থেকে মুখ বাড়িয়ে ভূই পানের দুল দেখতে দেখতে চললাম। বাতাসে শাকা খাবার হুমিই আশ্রয় আসছে। ঝাঁক ঝাঁক বাটার ও বাগিরির দল এক ক্ষেত থেকে অল্প ক্ষেত উড়ে বহছে। রাইরা চলছে শিখান গায়ে, লাঠি হাতে, মাথার ডানের দুরন্তঃ জড়ানো। রত্নান বাঘরা পরা মেয়েরা হুতো থেকে জল তুলে বড়ো বড়ো ঘেঁলা মাথার নিয়ে চলছে। এইসব দেখতে খুবই ভালো লাগছিল। মনে ছিলই সেই কিছুদিন আগেকার বালাকালে আমার কিসে এলাম। বয়স এখনও তেমন বেশি হয়নি আমার।

গম্বুজস্থানে গিয়ে বখন পৌঁছলাম তখন দুপুর হয়ে গেছে। পাখি তো বরাবর বেতে পারেনি, দুই-চার স্থানে খেয়ে বিশ্রাম নিতে হয়েছে। রাজার গ্রামটি খুব বড়ো। মাকখানে রাজার প্রকাণ্ড প্যালেস, গড়ের মতো খুব উঁচু পাঠালি দিয়ে খোঁরা। এই প্যালেসকে ঘিরেই হুহুংগ্রাম গ্রামখানি গড়ে উঠেছে। গ্রামের লোক অধিকাংশই গোয়ালি আর ভূঁইয়া, গরু মহিষ আর লাগ্ন নিজেই তাদের কারবার। প্যালেসের থেকে একটু তলাতে রাজার দাতব্য ডাক্তারখানা। সেইখানেই তার পানের একটি আলংসা ঘরে আমার থাকবার স্থান হয়েছে। সেখানে দুটি চেয়ার, একটি টেবিল, একখানি বাটিয়া সেতে বেগা হয়েছে। আমাকে অভ্যর্থনা করলে বেশ ভদ্র চেহারাির একজন লোক। তার মুখের মধ্যে বিশেষ ঔষধা উপর দিকে চোম্বানো হুপুট ঘোঁচের গুচ্ছ। সে আমাকে এক লম্বা সেলান টুকে বললে—“বহুদ, আমিই এখানকার ডাক্তার, আমিই এখানকার কম্পাউণ্ডার। আমার খুবই ভালো ছিল, এখানে অনেক বাইরের লোকের ভিড় করে গেছে; আগনি আসতে আমার কষ্ট করে গেল। এখানে বিলাতী ভালো ভালো ওষুধের সবই মিলাবে, বখন বেটি চাইবেন। রাজা এখানকার মস্তে পরা বরজ করে ওষুধ কিনতে কিছু কর্তব্য করেন না। কিন্তু সে-সব ওষুধ গ্রাহ্য পড়েই থাকে, এখানে তার কোনো দরকারই হয় না। আগনি কি একবার বেহে রেখেন, কি কি ওষুধ এখানে আছে?”

কিন্তু ওষুধের ষ্টক মেববার অল্প আমি একটুও ব্যগ্র নই, আমার শুধর খুব কিসে পেয়েছে। সকাল থেকে এক কাপ চা পর্বর বাওয়া হয়নি। স্টেশনে চা বেহে নিতে পারতাম, কিন্তু নতুন বেশ মেববার ঔষুধকে সে কথা মনেই হয়নি। আমি সেই সোচটিকে বললাম,—“ও-সব এখন থাক। আগে আমাকে এক কাপ চা বাওয়াতে পারো?”

বুড়টির নাম জননাম দুর্গাপ্রসাদ। সে চাষের কথা শুনে বেগম ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। ইতস্তত করে বললে—“একটু ভাড়া নে হুজুর, আমার মাকে ভেঁকে আনি।” এই বলে সে ছুটে চলে গেল।

পাশেই একটি খোশার বাড়িতে ওরা বাস করে। সেখান থেকে সে তার বুড়ী মাকে ভেঁকে মানলে। “কি হুজুর তার চেহারা, আর কি হুজুর বাফাটি! বেশ ভরপুর বিগট মেহ, মাথায় হুপের ফেনার মতো এলোমেলো এক মাথা পাকা চুল, সামনের দাঁত করেকটি গড়ে গেছে। কিন্তু সেই লোকলা মুখে কি সেহুমাথা একটি দিষ্ট হাসি! আমি মনে তার কত কালের পরিচিত। খুব কাছে এসে কণ্ঠে হাতে রেখে এক মুখ হেসে বললে—“কেবা বাওগে বেটা?”

আমি চাষের কথা বলতেই সে তার ছেলেকে বললে—“চাষের ভক্ত আর হাস্যম। কি আছে? বেনিয়ার মোকান থেকে দু পয়সার চা কিনে নিয়ে মাথ, আমি এখনই বানিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমার বানানো চা কি ও ছেলের পদম্ হবে?”

আমি বললাম—“খুব হবে। তুমি এক মোটা গরম তল নিয়ে এসো, আর চা নিয়ে এসো, আমি নিজেই বানিয়ে দিচ্ছি।”

বুড়ী বললে—“ছি ছি বেটা, ঘরে দিয়ে চা বাবে কেন? আমি গরম থাটা দুখ এনে দিচ্ছি, আমার মিকের গক আছে, আর চিনি এনে দিচ্ছি, তাতেই চা বানিয়ে পাও।”

অগত্যা আমাকে তার কথাই মনেতে হলো।

দুখ-চা খেয়ে তো প্রাণ ঝাঁকলো। কিন্তু তার পর যাওয়াযাওয়ার কি ব্যবস্থা?

বুড়ী বললে—“তারও কোনো ভাবনা নেই, হাঙ্গবাড়ি থেকে তোমার মজ্জা সিংহ পাঠিয়ে দিচ্ছে।”

সে আবার কি ব্যাণার?

বুড়ী পানের ঘর থেকে ছুটি বড়। বড়ো বাহ্যেপা এনে আমার সামনে ধরে দিলে। একটিতে আছে প্রচুর পরিমাণে আটা, ভাল, মি, আলু, কলা প্রভৃতি আনাজ তরকারি। আর একটিতে লাজু, পেঁড়া, ধরবেণ, মিঠাই, কিশমিশ ও বালান্দ পেঁড়া, দুই-তিন বকরের আচার, ভাঙে-ভরা দই।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম—“এত সব জিনিস কে বাবে?”

বুড়ী হেসে বললে—“তুমি বাবে বেটা, তোমার ভক্ত এসেছে। যা পাঞ্জব তাই বাবে।”

আমি বললাম—“এসব ঠাণ্ডে কে? আর ভাতের ব্যবস্থা কই?”

বুড়ী বললে—“আমি হেঁদে সেধো, আমরা ব্রাহ্মণ আছি। আর বড়া আহম্মি কি ভাত খায়? আমি খুবি তরকারি পাখিয়ে দেব।”

আমি বললাম—“ও-সব পুষ্টিত্ব আমার পোখাবে না। হুজো ছুটি ভাত আমার চাই। আমরা ভাতখোর বাঙালী, ভাতই পেতে ভালোবাসি।”

বুড়ী বললে—“আচ্ছা, তারই ব্যবস্থা করছি। আর ভাঙ্গি-উরি?”

আমি বললাম—“ও-সব কিছুই আমার চাই না। ভাতের মধ্যে ছুটা আলু-টালু আর কাঁচকলা ফেলে মিও, আর একটু ভাল বানিয়ে মিও, তাতেই আমার চলে যাবে।”

সেই ব্যবস্থা হলো। ভাত, আলু-কাঁচকলা ভাত, একটু মি, আর ভাল। তারপরে একটু দই, একটু কিছু আচার, আর ইচ্ছা হলে কিছু বাহ্যেপা মিটায়। শেষে বিহুট ছিল, দুইবেলা তাই গিরে দুখ-চা। এই হলো আমার কৈনিন্দ পাড়ের বরাদ্দ। বাহ্যেপা-ভরা সিংহ প্রত্যাহই আসতো, ওরা সেটা নিয়ে নিতো। কেমনভাবে অতো জিনিসের সম্ব্যবহার করতো তা বলতে পারি না। ওরা তো মাত্র দুজন প্রাণী। দু-একদিন বুড়ী বর করে ভাঙি তরকারি আমাকে বানিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সে কালে এক হিঙে ভরা ম্যাখ। মুখে সেওকা বায় না। আমি ভাবতাম, কাল বসি খেতে হয় তো লম্বা চিবিয়ে খেসেই হয়, তরকারিগুলোর মধ্যে এমনভাবে চুকিয়ে সেওকা কেন? কিন্তু এমন খেতেই ওরা অভ্যস্ত, আর এতেই ওদের ভক্তি।

এদিকে আমার কাল বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। কাল কেবল দুবেলা প্যাণ্ডি-কোট চুকিয়ে নিজের চেহারা দেখানো। গ্রামদুখ লোক দুবেলা ভিড় করে আমাকে বেবতে আসতো, বলকাতা থেকে নতুন এক ভাঙ্গার-সাহেব এসেছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত গাড়ির গাড়িরে তারা বেবতেই থাকতো, জু-পার্ভেলে গিরে খেবন তলাত থেকে গাড়িরে দর্শকেরা বাহ-সিং দেখে।

রোগী আসতো প্রতি দুই-একজন মাত্র। কারো পেট দুখান্ধে, কারো নির বরল করছে, কাভো বা হাতে পায়ে আঘাত লেগে থানিক কেটে ছিঁড়ে গেছে। তার ব্যবস্থা দুর্গাপ্রসাদই করতো, আমাকে কিছুই করতে হতো না। বেগমাম বে এসে সবকালের বাফা এমনিতেই ভালো থাকে, বিশেষ কিছু অস্থববিহুখ হয় না।

ভাঙ্গারখানার ওসুখের ঠেক সেগলাম। ছুটো আগমারি আছে, সত্যই তা ওসুখ ভরা। কিন্তু বেশির ভাগই কেবল

টিচার। নানারকম টিচারের বডো বডো বোতলে আলমারি ভরে আছে। সের কার্ফাকশিয়ের বই খুলে এ থেকে গ্রেই পঞ্চম অধ্যায়ক্রমে বডো-কিছু টিচার আছে সবই ৩৫ করে কনিয়ে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া আছে সোডা বাইকার্ফ, আর পুটল সাইট্রিট, আর ক্যালিয়াম, আর ম্যাগ্নেসিয়াম। এইভাবেই নিয়ে যা: ভাস্করি করতে পারে কলো। বিবারণ-মিকচার বানাও, হুম্বল মিকচার বানাও, কোম্পাশের আরক বানাও, যা তোমার খুশি। টিচার তো সব ইকমই হয়েছে। আর হুইনিংও অবশ্য আছে। কিন্তু তা ছাড়া কলোয় হলে তার কিছু করবার উপায় নেই, নিউমোনিয়া হলে ঐ টিচার দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার উপায় নেই, ডিপন্টি হলে কিছু করবার উপায় নেই, টাইকয়েড হলেও কিছু না, আর মেল হলেও কিছু না। অশ্বাশ্বেনের মস্ত করকটা ছুঁকটি আছে বটে, কিন্তু ব্যবহারের অজ্ঞানে তাতে মরণে পড়ে গেছে। ইনসেকশন সেবার কোনো-কিছু ওষুই নেই, একটা হাইপোভার্মিক শিরিষ পর্যন্ত নেই। তেমন যদি কোনো কঠিন রোগ এসে পড়ে তাহলে বসে বসে আন্যক হাত কামড়াতে হবে। নিজের নিজস্ব ব্যবহারের ভাস্করী ব্যাপটি ছাড়া আর কোনো কিছুই আমিও সঙ্গে আনিমি। কলকাতা থেকে এসে নতুন কিছু জানতে চাইলে ভোক্তাশোধ করে তা আসতে-আসতেই এক মাস সময় পার হয়ে থাকে। হুগাংপ্রাথকে এ কথা বলার পরে তাজিসিয়ার সঙ্গে একটু হেসে বলল— “এতেই তো একমাস চলে এসেছে বাবু, আপনিও এতেই টিক চলিয়ে কেমন।”

চালিয়ে যত্ন নেই কিং, আমি তো কিছুই করছি না।

তখন আমার কাছ হলো চারিখিক সেখ-গুনে ঘুরে বেড়ানো। অরপ্রাণের উৎসবটা কেমন চলছে তাই মাঝে মাঝে সেখ বেড়াতে লাগলাম।

রাফাভিটি যে এক বড় ভূর্ণের মতো। তার কটকের ভিতর দিয়ে ঢুকই এক উদ্ভূত প্রাণ, শ্রাব মাথ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। তার তিন বিক ছির মোটা মোটা ধাক্কু স্তব্ধ অটালিকা, প্রশস্ত বায়ান্দার দেয়া মহলের পর মহল চলে গেছে। অটালিকাগুলির নিচে থেকে উপর পর্যন্ত বাল্যবর্ণের লজ্জাপাতা দিয়ে শাখিরে বেলা হয়েছে। অ্যাম্রিভ হয়ে আশপাশের শেগলি হতে বড়ো বড়ো জমিরেরা এসেছে, তাদের মস্ত এক একটা মহল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মাঝখানে কোথাও বা বেলা বসেছে, কোথাও বা চরকিবাসি হচ্ছে, কোথাও কাঠের খোড়ার খুঁশি বুরুছে, কোথাও কেসোয়ারী চুড়ির বাজার বসে গেছে। আর

স্থানে স্থানে শামিয়ানা খাটিয়ে চলছে বাইজীর নাচ আর গানের জলসা।

একদিন এক বাইজীর নাচের আসরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

সন্ধ্যার পরে অনেকগুলো ডে-সাইট জ্বালা হয়েছে, তার নীচে বসেছে নাচের আসর। সেখানে বেতায় ভিড়। বাবু-ভাইরা আসরে পাতা তাজিয়ার উপর সারি দিয়ে বসেছে, তাদের শিখনে বসেছে সাধারণের লস। উৎসৃতি খুব দ্রুত লয়ে তবলা বাজাচ্ছে, সাতেরীবাদক বাইজীর শিল্প শিল্প যুগেছে, আর ছুই হাতে প্রচুর চুড়িপরা এক কীর্ণাকী বাইজী স্তম্ব নাচের ভরীতে ঘুরছে বাখিরে ও হাত নেড়ে নেড়ে নানারকম লাস্তজনক ডাঙ বাঁদিয়ে একটি গান গাইছে। গান পাওয়া মানে তার হুটি মাত্র কলিই নানারকম হুতের তান ও ব্যক্তনা দিয়ে বাজার বাজের পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। কলি হুটি আমি মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। সে বলছে—

“মলিকিনারে বগলা বৈঠে মছরি চুনচুন খায়

পিডা মছরি কাটা মারে তড়প তড়প ঝিউ বায়,

—ই। তড়প তড়প ঝিউ বায়।”

এই হলো তার গানের বক্তব্য। শ্রিতহাতে চেয়েবর মুখের নানা ভরী লফারে সে এই বগলায়ই গান গাইছে। আর প্রতি সনের শেষেই কর্কমগুদী মূখ হয়ে “হায় হায়” করে তালিম জানাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাইজী একটি তপার বেকাবি হাতে নিয়ে এগিয়ে থাকে। গাইতে গাইতে বাবুভাইদের সামনে দিয়ে গাড়াচ্ছে, তাতে প্রচুর প্যালা পড়ছে। উৎসাহ পেরে বাইজী আস্তে বেশি করে গলার কলরুত দেখাচ্ছে।

এখানকার মাথেরা কত অর্জেই ভুট হয়! একঘেরে সৈনধিন জীবনে এই ৬সের এক পরম বৈচিত্র্য, এতেই ওয়া মহা খুশি। এমন গান আর বৃষ্টি শোনেনি।

উৎসব সেখ-গুনে দিয়ে গিয়ে নিছের খাটিয়াসিত্তে গবে পড়তাম। বসতে হলে গেছি, হুম্বল চাকর পালা করে বিবায়ার সর্গাই আমার কাছে মোতামেন থাকতো, সেখানে আমি যেতাম আবার সঙ্গে সঙ্গে যেতো। রাতে একঘরন করে বেরোতে আবার কাছে গুতো, আমি হতম্বল পর্যন্ত না ঘুমোই আমার পা হাত ঝিপে গিতো। বাতল করলে শুনতো না, বলতো যে এটা শুনের মস্তর। অগত্যা আমি কমল হুড়ি দিয়ে কলতাম, এর উপর থেকে বত পাঠো টেপো। তাই টিপতো। তাতে বেশ আনাম হতো, শ্রাই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম।

কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার ভাস্করি দেখাখার জ্বোণ

এসে গেল। স্বয়ং রাজা-বাহাদুরেরই উপর। তারে খবর এলো তিনি অসুস্থ। রাতেই ছুটলাম তাকে দেখতে। পেটে কবিক বাধা পরেছে। সম্ভবত কিছু অধিক মাতাতে লাঞ্ছনা উৎপন্ন হয়েছিল। পেটটি ফুটবলের মতো টাইট হয়ে উঠেছে, বায়ু পর্বত নিঃসরণ হচ্ছেনা। কি আর করি, পেটে সেক গিটে বললাম, আর দরতরম ব্যাধ-নিবারক টিংচার আছে সমস্তই নিশিয়ে এক গুণ তৈরি করে পাঠিয়ে দিলাম। ডাবল্যাম পেটের কঠি ওঠেই কমে যাবে।

কিন্তু সকাল হতেই খবর এলো, ব্যাধা কিছুমাত্র কমেনি। গিয়ে দেখি, বাড়ির সমস্ত লোকজন উবিষ্ট হয়ে উঠেছে, রোগীর দর বেতায় ভিড় করেছে। কেউ সেক বিচ্ছে, কেউ হাত বুলাচ্ছে, কেউ পা টিপছে। সবাই লুপ্ত। এদিকে রোগীর অবস্থাও খুবই অপমানজনক। তাঁর মুখ চোখ শুকিয়ে কেমন হয়ে গেছে, দাঁতের দিনেও কপাল দিয়ে ঘাম করছে, বম্বাশ তিনি দাক্ষ ছুটকট করছেন, একমুহূর্ত স্থির নেই। চেপে বেগা বায়না এমন সন্ধিন অবস্থা। ব্যাধার দেহেই আমি আর ঠাণ্ডালাম না; বললাম—“এখনই আমি এর গুণ নিয়ে আসছি।” বললি ডাক্তারবাবা ছুটলাম।

মনে করলাম, আমার ব্যাগে একটি মলিয়া অ্যান্ডুল আছে, এখনই তা এনে ইন্ডেকশন দিয়ে বেবে। কিন্তু ব্যাগ খুলে দেখি সেই অ্যান্ডুলটির মুখ ভাঙা, পেটি শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। আমার তো মাথা ঘুরে গেল, এখন তাহ'লে কি উপায় করি! এখানে তো কিছুই দিলে না।

ভেবেচিন্তে দেখলাম, একমাত্র উপায় আছে জুপ দিয়ে পেট ধোলাই করে দেওয়া। তা ছাড়া আর কোনো কিছু করবার রাজ্য নেই। দুর্গাপ্রসাদকে সেই কথা বললাম। দুর্গাপ্রসাদ দ্বিভ কেটে বললে—“ওরে বাসু রে, রাজা-বাহাদুরকে জুপ দেওয়া বাড়ির কেউই ওতে রাজি হবে না। নিত্যন্ত অসুস্থ অসুস্থ ব্যাধার, কে ও কাজ সাহস করবে? আর জনসেই রাজা-বাহাদুর খেসে যাবেন, কারও তাহ'লে জান থাকবে না।” আমি বললাম—“তা হোক, আমি নিজেই জুপ দেবো, তুমি জিনিসগুলো এনে ধাও।”

দুর্গাপ্রসাদ কোথা থেকে এক টাটকা জুপক্যান্ড ও তোবড়ানো রবার-টিউব এনে হাজির করলে। আমি তাই বুঝে নিয়েই ছুটলাম।

রোগীর ঘরে গিয়ে বললাম—“খানিকটা গরম মল এনে ধাও, আর তোমরা সবাই এখান থেকে সরে ধাও। একজনও থাকতে পারে না।”

গরম মল এলে আমি সকলকে ডাকিয়ে মরজা বস করে

দিলাম। আগের থেকে কোনো কিছুই না জানিয়ে রোগীকে পাশ দিয়ে শুতে বলে আমি খোঁরীতি জুপ গিটে শুক করলাম। অন্তরিক হৃৎসার কারণেই হোক, বা ডাক্তারের উপর বিশ্বাস থাকার মতই হোক, রাজা-বাহাদুর কিছুমাত্র বিরক্তি করলেন না।

পুরোপুরি জুপ দেবার পরেই পেট থেকে প্রচুর বস্ফ মল নির্গত হতে শুক করল। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পেটের বম্বাশ কমে গেল, তিনি আরাম বোধ করতে লাগলেন। তখন বাড়ির লোকজনদের হেঁকে দিয়ে আমি সরে পড়লাম। তখন বৃষ্টিতে পালালাম, মলিয়া ইন্ডেকশন বে সেওয়া হয়নি সে খুব ভালো কাজই হয়েছে, ঐ বস্ফ মলগুলো তাহ'লে পেটের মধ্যে থেকেই যেতো। ইন্ডেকশনে ব্যাধার সাময়িক নিষ্কৃতি হতো বটে, কিন্তু মলিয়ার গুণ ফুরিয়ে গেলেই আবার বম্বাশ শুক হতো, তখন আরো মূশকিল হতো।

এর পর চারদিকে কিন্তু মুখে মুখে গল্প রটে গেল যে রাজা-বাহাদুর নির্ধাত মারা যাবার শেষ পৈঠাতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, ডাক্তার-সাহেব বহু লাগিয়ে সেই অবস্থা থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছে। এমন গৈবতব্রহ্মসম্পন্ন ডাক্তার গ্রামে কখনো বেগা যাবনি, এ লোকটি বা বলবে তা একেবারে অকাটা। সবাই এসে অনর্থক আমাকে নাড়ি বেগাতে শুক করলে, যেমন করে জ্যোতিষীর কাছে ওরা করতেনা দেখায়। কোনো কিছু কথা না বলে হাতটা আমার সিকে এগিয়ে দিয়ে চূপচাপ চেয়ে বলে থাকে, কথা বলবার যদি হয় তো তুমি বলো, আমি কিছু বলছি না। যদি খিজালা করি—“কি হয়েছে তোমার?” তাহ'লে সোজা বলে দেব—“নাড়ি ধরুকে সময় লিখিয়ে।” অর্থাৎ নাড়ি ধরলেই তো আচ্ছন্ন সব তুমি বুঝতে পারবে, তাহ'লে আমি আর নিজের মুখে বলি কেন? কি করি, নাড়িটা একবার হাত দিয়ে চেপে ধরতেই হয়। তার পর থাকে বলি—“কিছুই অসুখ তোমার নেই, সব ঠিক আছে”, সে শুকখাৎ হুপি হয়ে চলে যায়। বাইরে গিয়ে বলে বেড়ায়, ডাক্তার-সাহেব নাড়ি ধরে বলে দিয়েছে তার সব ঠিক আছে। আবার থাকে বলি—“তোমার দেহ এক দৃষ্টা দেবচি কেন?”—সে অমনি হুপি হয়ে বলে, ডাক্তার-সাহেব নাড়ি ধরে ভিতরকার খবর বুকে ফেলছে। “তাহ'লে এর কি প্রতিকার করতে হবে? কোনো হাটওয়াই যেতে হবে?” আমি বলি—“না না, তার পরকার নেই, ভালো করে দু'মি খেলেই সেরে যাবে।” পুষ্কির গাভের মাতা সেই মিন থেকেই সে বাড়িরে দেয়। এখন আমি যে কথাই বলতে থাকি তাই ওদের বিশ্বাসের সঙ্গে

ছিলে দ্বার। সরল বিশ্বাস এমনি তিনি। অতএব প্রথমে আমার কিছু কাজ না থাকলেও পরে কামের নামে বেড়ে গেল। যদিও তা ব্যক্তিগত।

তুমি তাই নহ, অতঃপর দুঃ-দুঃখ থেকে কল্ম আসতে শুরু হলো। কিন্তু আমার সে কল্ম গ্রহণ করা উচিত নহ। দ্বারা আসে তাদেরই আমি বলি, আমি স্বাভা-বাহ্যদ্বয়ের চাকরি নিয়ে এখানে এসেছি, তাঁর হস্তম ছাড়া আমি কোথাও যেতে পারি না। এই তখন সকলেই বিস্ময় বোধ।

কিন্তু বানিকট: দূর গ্রামের এক ভটিষা, সে হালা-বাহ্যদ্বয়ের কাছেই অস্তরোধ করে পাঠালে, ব্যক্তি সে পল্লী, তাঁর ভক্ত্যাকর দিয়ে সে ইলাহ্য করতে চায়। স্বাভা-বাহ্যদ্বয় তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন। তখন সেই ভটিষার আমাকে নিয়ে হাবার ভক্ত এক হাতি পাঠিয়ে দিলে। দুর্গাপ্রসাদ বললে, চার-পাঁচ কোশ দূর যেতে হবে। আমি বললাম, দেখানোই যেতে হোক, আমি এটা বাবো না। তাকেও আমি সঙ্গে নিলাম। সেও দেখলান তাই চার, দুনি হয়ে সঙ্গে চলল।

হাতিতে উঠতে কেমন ভয় করতে লাগল, সে কথা আমার এখনও মনে আছে। জীবনে কখনো হাতিতে চড়িনি। হাতির উপর হাওলা নেই, তার পিছন থেকে পড়ি ধরে উঠতে হবে, আর পিঠের উপর পা স্থিরে পড়ি ধরে বসে থাকতে হবে। বদবার হাওয়া পিঠের সঙ্গে ঝাঝ। কিন্তু চড়ে দেখলান যে ততের কিছু নেই, হাতি বধন চলতে থাকে তখন পা বেলে, তাতে বেশ আমোদ হয়।

ভটিষারের কাছে গিয়ে বসন্ত ভটিষারও তার হাতখানি বাড়িয়ে দিলে। পায়ে হাতে তার অনবরত এক দুর্গাভ তেল মালিশ হচ্ছে, হাত-পা-গুলো সর্বদা তেলে চক্চকু করছে। সর্বদাই তার ব্যথা, যেখানে গঠি আছে সেখানেও ব্যথা, আর যেখানে কোনো গঠি নেই সেখানেও ব্যথা। ব্যক্তিও ব্যথা, পিঠও ব্যথা, পেটের ব্যথাও ব্যথা। একে কোন্ ভাতের ব্যক্তি বলি? ব্রিট্যান্ডিটম্, না আর্জাইটিস, না গাউট, না অন্য কিছু? মাইগ্রাইটিস্? ক্রাইমোসাইটিস্? এক্সত ব্যক্তি বাউট, না আর কিছু? বই-এর কোনো সংজ্ঞার সঙ্গেই যে মিলছে না।

কিছাশাব্য করে জানলাম, লোকটির গতিবিধি খুবই সংকল্প। দিনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বাইরের বাড়িঘরকে, আর ঘরে সেখান থেকে ফিরে যায় ঘর। দণ-সুচি ছুটের বেশি তার হাটা নেই। ব্যথার ভয়ে সে হাঁটতে সাহসই করে না। দুজন দুশাশ থেকে ঘরে থাকে, তবে ঐটুই সে কোনোগতিকে হাটে। আরো ধর নিয়ে জানলাম যে

প্রত্যহই সে কিছু মাংস খেতে থাকে, তাই ৬৪ সর্ব চেয়ে গ্রহণ থাকে। পেট পুরে যায় আর ঠান্ডায়ে সর্বক্ষণ বসে থাকে।

আমি তখন গম্ভীর হয়ে বললাম—“এ রোগ মালিশে সারবে না, এতে কয়েকটা ইন্জেকশন লাগবে, দেহের মধ্যে ছুঁতে পড়ায়ই সিতে হবে।”

সে তাতে খুবই রাগি। আমি তখন বললাম—“আরো দুটি কাম কিছু করা চাই। প্রথম কথা হলো, বর্তই কঠি হোক, রোগ বানিকট: ক’রে হাটতে হবে, মাংসের সাহায্য নিয়েই হোক বা লাঠির সাহায্য নিয়েই হোক। বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে বাজার গিয়ে একটু ক’রে হাটতে হবে, ক্রমশ হাটার মাত্রা একটু একটু ক’রে বাড়তে হবে। আর দ্বিতীয় কথা, মাংস খাওয়াটা একেবারেই ছেড়ে দিতে হবে।”

“তার বললে কি খেয়ে আমি বাঁচবো? আমায় তো খাচ্ছি খাই না।”

“দুখ থাকবে, বহি থাকবে, বর্তটা ইচ্ছা হয়।”

“বহি থাকবে? তাতে যে ব্যক্তি আরো জোর ক’রে চেপে ধরবে।”

“নেই, আমার ইন্জেকশনের গুণে সব হুসন হয়ে যাবে।”

“বহৎ আচ্ছা, যেমন আপনার মেহেরবানি।”

ব্যক্তির ইন্জেকশন সেখানে আর কোথায় পাওয়া? আমার ব্যাপে ছিল কয়েকটা মিছ-ইন্জেকশন। রোগের কোষের নীচে তারই একটা ইন্জেকশন দিয়ে নিলাম, আর দুর্গাপ্রসাদকে ইসরাতে দেখিয়ে নিলাম কেমন ক’রে এই ইন্জেকশন সিতে হয়। তার পরে বললাম—“আজ আমি নিজে এটা দিয়ে দেখান। কিন্তু এর পর থেকে আমি আর আসবোনা, দুর্গাপ্রসাদ একদিন অস্তর এসে এমনি ডাবে দিয়ে থাকে। আমার কথাগুলো ঠিক-ঠিক চললে এতই ভালো হয়ে থাকে।”

আমি বধন উঠে আগছি তখন ভটিষার আমার হাতছুটা ধরে টাক। সিতে এলো। আমি হাত সরিয়ে নিয়ে বললাম—“টাকার ভয়ে আমি আগিনি, টাকা নেওয়া আমার হুসন নেই। তুমি আমার সেরে গেলো, তার পর বা সিতে হয় স্বাভা-বাহ্যদ্বয়কে মিঃ।”

আমাদের কথা এই যে—বিশ্বাসের জোরেই হোক, বা ইন্জেকশনের গুণেই হোক, বা ব্যক্তির পরিবর্তনেই হোক, ছুটটা ইন্জেকশনের পরে তার ব্যক্তির ব্যথা অনেক কমে গেল। সে সুস্থ হয়ে চলাকোলা করতে লক্ষ্য হলো। দুর্গাপ্রসাদ তাকে ইন্জেকশন দিয়ে আসতো, খোদ করি কিছু

আদায়ও করতো। কিন্তু ইন্দ্ৰেশ্বরন শেষ ছয়ার পরে সে রাজা-বাহাদুরের কাছে আমার মন্ত ভেট-বস্ত্র কিছু নেওয়া মিঠাই আর ছুটি আকবরী অপরকি পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এর পর আরো এক রোগীর এমন অসুস্থ চিকিৎসা করলাম। তারাত আসে রাজা-বাহাদুরের অম্মতি নিয়ে আমার মন্ত পাঠি পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেও এক মূলে অমিয়ারের বাড়ি, বেশ পরমাওয়াল লোক তারা। সেখানে অমিয়ারের পুত্রবধূ অসুস্থ, তাকে দেখতে হবে।

রোগিণী আগামতক এক চামর মুচি দিয়ে বাড়িয়ার উপর গুয়ে আছে। কেবল সোনার পইছা পরা ষা হাতটি বাইরে বের করে রেখেছে। শুনলাম সে অস্বপ্নাভা, খাবী ব্যাভীত মন্ত কার্তিকেই তার মূলে দেখাবার উপায় নেই। চামরের চাঁচা খুলে তার মূণ-চোখও দেখা দাবে না, কোনো কিছু পরীক্ষাও করা দাবে না। কেবল ঐ নাড়ি ধরে আর উপর-উপর পরীক্ষা করে রোগ চিনতে হবে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

কেবল নাড়ি ধরে কতটুকুই বা বোঝা দাবে? শুনেছি কবিরাজেরা ওভেই অনেক কিছু বুঝতে পারেন, কিন্তু আমরা অসুস্থ সে বিজ্ঞা শিখিনি। তবে এইটুকু বুঝলাম যে ওর নাড়ি কিছু দ্রুত এবং দুর্বল। আতুলগুলো টিপে দেখলাম, খুব এনিমিয়া আছে বলে মনে হলোনা। উপর থেকেই বৃক পিঠি পরীক্ষা করে এইটুকু বুঝলাম যে হাটে বা মূলমূলে কোনো দোষ নেই। পেট টিপেও সিভার পিলে প্রভুতি কিছু হাতে চেষ্টা না।

অতঃপর শুনলাম রোগের বিবরণ। রোগিণী দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। অল্প একটু খুৎখুৎে জর হয়। কিন্তু খেতে পারে না। সর্বাঙ্গে আড়ট ব্যথা, গাভের গোড়ায় ব্যথা। একটু একটু পা কোলে। বহল মাত্র কুচি-বাইপ, অথচ এর মধ্যে ছুটি সন্ধান হয়ে গেছে, আবার সে দুইমাসের গর্ভবতী। শেষের সন্ধানটির বহল বেড় মছর, এখনও সে মায়ের দুধ টেনে খায়।

এ কি অস্তিওয়ালেনিয়া? ক্যালসিয়ামের অভাব? শুনেছি যে বেয়েট অস্বপ্নাভা, সন্তবত রোগের মূণও কখনো দেখতে পার না। সর্বমুণ ওকে কাশড়চোশড় মুচি দিয়ে ঘরের মধ্যে ঘোমটা টেনে থাকতে হয়, সূর্যের আলো ওর গায়ে লাগে না। তাতেই কথাটা আমার মনে হলো। তার পর আরো শুনলাম যে ঔষেদিক ছু খেতে নেওয়া হয় না, স্থানীয় বৈদ্যরা মানা করে দিয়েছে। তাতে নাকি রক্তধি হবে, যদি ধরে দাবে।

আমি তখন বললাম—“ইন্দ্ৰেশ্বরন সেওয়া ছাড়া এ রোগ সারবে না। আর যেমন যেমন আমি ব্যবস্থা করে দেবো তাই যেমন ভোমাসের চলতে হবে।”

তারাত নিজেদের মধ্যে অনেকজন পরামর্শ করলে। তার পর এসে বললে—“কোথার ইন্দ্ৰেশ্বরন সেবন বলুন, সেইটুকু ভাখা। আমরা বের করে দেবো। আর আপনি যেমন যেমন করতে বলবেন ঠিক-ঠিক তাই করবো।”

যাসে আমার ছিল পুরো এক শিশি ক্যালসিয়াম ওস্টেডিন। তখন সব এই ইন্দ্ৰেশ্বরনটি বেরিয়েছে। তার থেকে খানিকটা সিরিখে টেনে নিয়ে কোমরের নীচে ইন্দ্ৰেশ্বরন দিয়ে দিলাম। বলে দিলাম, এটা একদিন অস্তর দিতে হবে, দুর্গাপ্রসাদ এসে গিলে দাবে।

তার পর অস্ত্রাণ ব্যবহার কথা। আমি বললাম—“প্রথম কথা, ওকে প্রত্যাহ সকাশে দুই ঘণ্টা করে ছাসের উপর রোনে বসিয়ে খালিগায়ে তেল মাগিন করতে হবে। গায়ের কাশড়-চোশড় সব খুলে ফেলতে হবে, দেখানে একজন পরিচারিকা ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না। দ্বিতীয় কথা, ওকে প্রত্যাহ এক সের দুধ খেতে দিতে হবে, তার মধ্যে প্রত্যেকবারেই, খানিকটা করে চুমুর মল মিশিয়ে দেখে, তাহলে আর যদি ধরতে পারবে না। তৃতীয় কথা, শেষের সন্ধানটিকে শুনের দুখ বাওয়া একবারে ছাড়িয়ে দিতে হবে, মায়ের কাছে থাকে যেন শুতে সেওয়া না হয়। এগুলি নিশ্চয়ই করা চাই।”

সেখানেও আমি টাকাকড়ি কিছু দিলাম না। দুর্গাপ্রসাদ ইন্দ্ৰেশ্বরন দিয়ে আসতে লাগল। দশদিন পরেই শোনা গেল যে রোগিণী অনেকটা হুহু হয়েছে। তার খুৎখুৎে জর ছেড়ে গেছে, গায়ের ব্যথা কমে গেছে, গায়ের ফুলো শুকিয়ে গেছে। প্রত্যাহ সে বাড়ির ছায়ে দিয়ে রোগে শোমে বসছে।

এমনি আরো দু-একটি কঠিল রোগিণী আমি ওখানে দেখেছিলাম। আমার চিকিৎসায় প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু উপকার হয়েছিল।

কিন্তু তা যে সবটা আমারই কৃতিত্বে কিংবা কেবলই আমার ওখের গুণে এমন কথা নিশ্চয়ই নয়। বস্তুত নিজেই আমি এমন দ্রুত উপকার হতে সেগে অতি আশ্চর্য হয়ে যেতাম। হাতের কাছে যা বলে এমন সব সার্বাণ্ড ওখুৎেই এখানে বেশ কাছ হচ্ছে, অথচ কলকাতায় তো এমন হতো না। কিন্তু তার পরে আরো ক্রম ক্রমে এই অভিজ্ঞতা আমার কদাশো যে বানী হানী অনেকগুলো ভালো ভালো ওখুৎে বিশেষ যে তাকাতাড়ি রোগ সারে এমন মনে করা কুল।

অথচ কলকাতার আশ্রয় প্রার্থী সেই কাল ক'রে থাকি। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যাতে শিখিয়ে পড়তে না হয় সেইজন্যই হুজুরা সেখানকার ভাকারদের তা করবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তা নইলে প্রকৃতপক্ষে খেয়তি আর ওষুণ্ড রোগ দায়েনো যায়। কিন্তু তার মত ওষুণ্ড ছাড়াও কয়েকটি জিনিস বিশেষ ক'রেই থাকা চাই। প্রথমত চাই রোগাটিক চিনতে পারা। না চিনে বহুদূর ওষুণ্ড দিলেও তাতে কিছু কাজ হবে না, কিন্তু চিনতে শেবে সামান্য ওষুণ্ড দিলেও রোগ নিশ্চয় তাতে দূর্য্য হবে—রিক বেনে ডেসেবেল্যাকার চোত-চোর খেলার মতো। লুকিয়ে-বাকো ডোরকে বহুতল খুঁজে না মিলাছে ততক্ষণ সে লুকিয়েই থেকে যাবে, কিন্তু একবার ছুঁয়ে দিতে পারলেই সে 'মরে' গেল। অবশ্য এখানে অসুখ্য রোগের কথা নয়, মাথা রোগের কথাই বলছি। তাই শামী শামী ওষুণ্ড হাতের কাছে না থাকলেও ভাকারের পক্ষে তাতে খবড়াবার কিছু নেই। অগতঃ আকস্মিক ওষুণ্ডের অভাব নেই। বৃক্ষ প্রয়োগ করতে পারলে তার সবই উপকারী। আর দ্বিতীয় কথা, রোগীর তরফে ধানিকটা বিবাস থাকা চাই। এতদ্বারা বেনে সরল বিবাসিত রূপে তাতেই অনেকখানি কাজ হয়। কলকাতার পিকিত মোকদের মধ্যে এ জিনিসের খুবই অভাব। তারা নিজেরা ওষুণ্ডের ওগাওণের খবর নেয়, আর তারা কথায় কথায় ভাকার বাতাই ক'রে বেড়াই। কয়েকই ভালো ভাকারের দ্বারা ভালো চিকিৎসা হলেও সেখানে নানারকম গওগোল পাকায়, রোগ সারতে দেবি হয়। সরল বাহুবলের মধ্যে চিকিৎসা করা সম্ভব, চালাক বাহুবলের মধ্যে চিকিৎসা করা খুব কঠিন। কারণ চিকিৎসা তো কেবল দেহেই নয়, মনও বে রহছে তার সঙ্গে মূড়ে। যেখানে আকাঙসা অহঙ্কুল হচ্ছে না, যেখানে মনের মধ্যে রহছে সন্দেহ এবং অবিবাসের শ্যাচ, যেখানে ভাকারের উপর নির্ভরতা থাকার বলসে তার কোন কথাটা অন্যথা আর কোন কথাটা বার গিয়ে বাবা তাই নিয়ে বিচারের জার নিক্ষেপই হোতে রাখি, সেখানে চিকিৎসার ব্যাপারে প্রতি পকেই কৌশল খেতে হয়।

এক দাস পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা-বাহাদুরকে জানান যে এবার আমি বিদায় নিতে চাই। এই কথা শুনেই সেও তিনি সদ্যাকো তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করতে বসলেন। দেখা করতে গেলে এদিক ওদিক নানারকম কথার পরে বললেন—“আমি একটা কথা বলছিলাম। আপনি তো এখানে ভালোই কাজ করছেন দেখছি, চারিদিকে সবাই আপনার স্হাতি করছে। আরো একটা দাস যেন আসে।

তিনি খেতেই যান না। দুর্গাপ্রসাদকে বরং এর মধ্যে ভালো ক'রে একটু কাজ শিখিয়ে দিন। আরো এক দাস পরে যাবেন।”

আমাকে একই উনি ছাড়তে চাইছেন না। হিসাব ক'রে দেখলাম, আরো একটা দাস কোনোগতিক এখানে কাজের দিতে পারলে আমার হাতে নগদ দ্বাভার টাকা পুঁজি হবে। প্রত্যাবর্তা খুবই মোভনীয়। কিন্তু আমার তখন বাড়ির মিক টান হয়েছিল। নিরাশির আর ভাতে জাত শেষে আমার অকটি এসে গেছে। তা ছাড়া এখানে কোনো আয়োজ্যপ্রমোদ নেই, কোনো বৈচিত্র্য নেই, মন খুলে হুটো কথা কইবার পর্যন্ত যত্ন নেই। বাটমীর সেই পান্টো খালি খালি মনে পড়ে থাকে—“তড়প্ তড়প্ জিউ বাহ”। আমার তখন বাতবিকই সেই অবস্থা।

আমি বললাম—“আর আমার থাকার ব্যবস্থা হবে না। দুর্গাপ্রসাদকে সব ব্যতীই শিখিয়ে দিয়েছি। ওকে কয়েকটা শিখিত আর ইন্ডেকশনের ওষুণ্ড আনিবে দেবেন, তাহ'লেই ও এখন বেশ চালিয়ে দিতে পারবে।”

পরের দিন আমি বিদায় নিলাম। আমার পাওনা টাকা ও বাতায়াত্তর বরচ ছাড়া রাজা-বাহাদুর আমাকে ছুই গ্রহ পুতি-ডাল ও একটি সোনার মাটি উপহার দিলেন।

দুর্গাপ্রসাদের মা পুঁটুলি ক'রে থাকার দেখে দিলে, আর হাড়ির মধ্যে দিলে উৎকৃষ্ট এক সের পাওনা দি। বি তার নিষের হাতের বানানো। ছলছল মলভরা চোখে আমার মাথায় হাত মুলিয়ে সে বললে—“ভাতের সঙ্গে তুমি এই খিউ নিয়ে গাবে, বেটা। এই গরীব বৃত্তী মাকে তখন তুমি ইয়াব করবে।” তার পর থেকে অনেকদিনই আমার মনসকে ভেসে উঠেছে সেই অক্লিমি জেহদমল চোখে চাঙা পলকপ-বর্তিত অবিয়সিধ মুখে অপরূপ এক মাতৃবৃত্তি।

দুর্গাপ্রসাদ স্টেশন পর্যন্ত এসে আবার গাড়িতে তুলে গিলে। তারও মৃগটা সেলাম ঠাঁচুমাচু।

সেখান থেকে ক্রৈতা বখন ছাড়ল তখন বেনে আমি হাঁফ ছেড়ে বাটলাম।

সাত

কলকাতার বিত্রে এসে দামাবাবুর কাছ থেকে আরো কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে পাড়ার মধ্যে ছোটোখাটো এক ভাকারবানা বুললাম। দরদরতা প্রাকৃতিস ত্রক ক'রে দিলাম। কিন্তু কিছু অর্থ উপার্জন করতে ত্রক করলাম। অবশ্য উপার্জন যে প্রত্যাহই হুজুরা তা নয়, কিন্তু তবু খাঁটি পেতে বসে থাকবার একটা

জাগো তো হলো। পড়ার পাঁচজনে আনতে পারলে যে আমি একজন নতুন ডাক্তার, অর্থাৎ বাইরের কেউ নয়, পড়ারই বাসিন্দা। সকাল-সন্ধ্যার দু-একজন ডক্টরলোক এমনিই আসা-যাওয়া করতে লাগলেন; বহরের কাগজখানা তুলে নিয়ে পড়তে লাগলেন, সাপ্তাহিক পত্রিষ্ঠান নিয়ে কিংবা ইউরোপের যুদ্ধের স্বর নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। সে সময় গ্রন্থ অর্ধাৎ বৃত্ত চলছে।

সরকারী ডাক্তারেরা অনেকই যুদ্ধের কাজে গিয়ে যোগ দিচ্ছিলেন। দেশে ডাক্তারের টান পড়ার আমি স্বাভাবিক রকমের এক সরকারী চাকরি পেয়ে পেলাম। শিক্ষকতার কাজ, অ্যানাটমির ডিসেকশনের। ডাক্তারী ছাত্রদের অ্যানাটমি দেখাতে হবে, ডিসেকশন দেখাতে হবে।

ভালোই হলো। সকালে দশটা পর্যন্ত ডাক্তারখানায় বসে ডাক্তারি করতাম। তারপর খাওয়ারাওয়া শেষে চাকরিতে যেতাম সাইকেলে চড়ে। বিকালে যেতাম ডাক্তার রায়ের বাড়িতে, তাঁর রোগী দেখার কাজে সাহায্য করতে। সন্ধ্যার কিরে আবার ডাক্তারখানায় বসতাম।

কাছের মাতা আমার অনেক বেড়ে গেল। আলস্তে কাটাবার মতো একদুখুঁতও আর সময় রইলনা। সারাদিন খরে বিবিশ্ব স্বকম কাজে ব্যস্ত তো থাকতেই হব, আবার রাত্রে বাড়ি কিরে গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ছেপে অ্যানাটমি পড়তে হয়। শিক্ষকতা করা সময় কাজ নয়। কাল দিয়ে ছাপে কি পড়াবো, তার তত্ত্ব আমি থেকে প্রস্তুত হওয়াই চাই। নইলে সেখানে কিছুই বলতে পারবো না, ছাত্রদের কাছে অপদয় হতে হবে। অ্যানাটমি এখন ছিনিস যে প্রত্যাহ পাঠ্য অংশটুকু কালিয়ে না নিলে বলতে গিয়ে বেধে যায়, দু-একটা কথা ভুল হয়েই যায়। তবে অ্যানাটমি পড়েছি, সে-সব তখন ভুলেই গিয়েছি। তা ছাড়া আমি দেখলাম যে ছাত্র হয়ে পড়া আলাদা, আর শিক্ষক হয়ে পড়ানো আলাদা। ছাত্রের বেলাতে ঠাকি চলে, কিন্তু শিক্ষকের বেলাতে ঠাকি চলে না। আমি তো দেখলাম, যা কিছু পড়ে জানছি তা যেন নতুন করে শিখছি। আগে ছাত্রাবস্থায় এত কথা খুঁসির কখনই পড়িনি, নিত্যক ঠাকি গিরে পান করে গেছি। কিন্তু এখন আর তা চলবে না। পরীক্ষকের চোখে খুঁসো দেখা যায়, কিন্তু ছাত্রদের চোখে খুঁসো দেখা যায় না, আর তা উচিতও নয়। তাতে নিজেকেই খেঁসো হতে হয়। অতএব আগেকার চেয়েও গুরুতরভাবে আমাকে ছাত্র হতে হলো, পড়ারার তত্ত্ব আমাকে অনেক বেশি পড়তে হলো।

প্র্যাকটিকালের দিকে তখন আমার ততটা মন নেই,

পড়ানোর দিকেই বেশি মন। অনেক শেখা হচ্ছে, শেখানো হচ্ছে, ছাত্রদের কাছে আমার পড়ানোর ব্যাপ্তি ছুটে থাকে, অল্প রালের ছেলেরা আমার রূপে এসে ভিড় করতে, আমি কোনো ডিসেকশন বোঝাতে থাকলে চারিখিক থেকে ছাত্রের পল হুঁকে আসছে। এর মধ্যে আলাদা একরকম সৌরব আছে, বিশেষ একরকম মাদকাস্তি ও মাদকাস্তা আছে। এর তুলনায় প্র্যাকটিকাল তো এক পরনের উকুপ্তি। লোকের কাছে থেকে ছুটে। পড়ার আদরের তত্ত্ব সত্য কন্ঠিকিতিকির করতে থাকা, অনবরত তাদের ডোবাখ করতে থাকা। যারা তা করতে পারে তারা তরক্ক, কিন্তু আমার তো কোনো পাবার ভাবনা নেই। বাড়িতে দলবাবু রয়েছেন, তার উপর একটা সরকারী চাকরি পেয়ে গেছি। তার উপর ডাক্তার রায়ের কাছে থেকে প্রত্যাহ মানারকম রোগী দেখা আর প্রেসক্রিপশন করার শিক্ষা আমার যথেষ্টই হচ্ছে। অগ্রান্ত ডাক্তারদের মতো লোকের সোরে সোরে ঘুরে বেড়ানো নাই-বা আমার হলো। আমি তার খোড়াই 'কেবার' করি।

স্বতন্ত্র পড়ার প্র্যাকটিকাল জমাবার দিকে আমি ততটা গা দিতাম না। ডাক্তারখানাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রোগীরা এসে তাদের অবস্থা বেরতাম, কিন্তু লম্বটা বাজার পরে কেউ ডাকতে এসে কিছুতে যেতাম না, তাহলে আমার চাকরির কাজে বেতে দেখি হয় যাবে। রাত্রি আটটার পরে কেউ ডাকতে এসেও যেতাম না, তাতে আমার পড়ার ব্যাঘাত হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেটু হা হয় তাতেই যথেষ্ট।

একদিন খাওয়ারাওয়া শেষে সাইকেলে চড়ে নিজের কাজে চলছি। আমার বাবার বাজার পড়ে হিন্দুস্থানী দারোগহানদের কলোনির মতো এক খোলার বস্তি। হাংগাটা আমার ডাক্তারখানার কাছাকাছি। অনেক হিন্দুস্থানী সেখানে এক একটি ঘর ভাড়া নিয়ে একত্রে বাস করে। প্রেসের দারোগহান, কাগজের হকার, পোট-কমিশনারের জমাখার, কুলী, অফিস অফিসের বেয়াদা প্রভৃতি সব রকমই আছে। হু-চারজন স্ট্রীলোক এবং তাদের ছেলপুলেরাও আছে, অর্থাৎ বাবা দেশ থেকে স্ট্রীপুর্ নিয়ে এসেছে তাদের সঙ্গার। এদের মধ্যে অনেককেই আমি চিনি, কারণ অস্থ-বিশ্ব হলে কেউ কেউ এরা আমার ডাক্তারখানাতে আসে, গুরুতর নিয়ে যায়।

আমি এখন ওদের বস্তির দিকে চেয়ে চেয়ে দাঁড়া 'অভিক্রম' করে থাকি, তখন ওখান থেকে একজন লোক ছুটে এসে আমার সাইকেল চেপে ধরলে। ব্যস্তমস্ত হয়ে বললে—“নামুন ডাক্তারবাবু, আমাদের ডারি বিশদ।”

“কি হয়েছে?”

“একজন রোগী মারা যাচ্ছে। পিণ্ডুগিরি আসুন।”

“আমার এখন সময় নেই, সরকারী কাজে যাচ্ছি।”

“তা হবে না, আপনাকে আসতেই হবে। নইলে শাইকেল চান্না।”

তার ভোরে-অবসরকালে কোনোমতে এড়াতে না পেরে অগত্যা দেখানো যেতেই হলো।

ঘিরে দেখি এক কলেরা রোগী। তার প্রায় শেষ অবস্থা। নাড়ি তো পাওয়াই হয়না। হাত-পায়ের অঙ্গুলগুলো চুপ্‌চুপে গেছে। চোখ কোঠারে বসে গেছে। অস্ট্রি ডাক্তার গলার শেষ কাতরানি কাতরানি।

অনি রোগে উঠে বললাম—“আপো খবর লাগেই কেন? এখন আর কি করব?”

সেখানে তখন অনেকগুলি লোক জড়ো হয়েছে। তারা বললে—“দুখন ডাক্তারকে খেঁচিয়েছি, বাবু। তারা ওষুধপত্র চিহ্নিল। শেষকালে মরার দির গেল। বললে—আমাদের ঋণা হবে না, হাসপাতালে পাঠিয়ে লাও। কিন্তু এ অবস্থায় কেমন করে নিয়ে যাই, মরতে হয় এখানেই মরুক। ওরা তো কিছু করতে পারলে না, আপনি যদি কিছু পারেন তো করুন।”

ঐ কথা শুনে আমার কেমন রোখ চোখে গেল। ঐতাবার চোঁটা এখনও অবতর করা যেতে পারে, মরছে মরুক বলে হাল ছেড়ে নেওয়া ডাক্তারের পক্ষে উচিত নয়। কলেরা-ওয়ার্ডে কাজ করে আমার এটাই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে এমন নবগণের নাড়িছাড়া অবস্থাতেও রোগীরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত টিকে থাকে, এবং তখনও সেলাইন ইন্সেকশন পিরার মধ্যে দিতে পারলে কেউ কেউ সে অবস্থা থেকেও বেঁচে যায়। চোঁটা করে দেখতে ক্ষতি কি?

আমি ওদের বললাম—“চোঁটা করে দেখতে পারি, কিন্তু ঐভাবে কিনি সে কথা বলতে পারব না। কিন্তু তার মত অনেক ভোড়াভোড় করতে হবে।”

ওরা বললে—“বা করবার সবই করুন। আপনার হাতে ছেড়ে দিলাম।”

চাকরিতে সেদিন আর বাওয়া হলো না। ওদের বললাম—“খুব বাড়ী একটা হাঁপাতে পরব মল চড়াও। আমি বহুপাতি নিয়ে আসছি। দুখন লোক আমার সঙ্গে এসো।”

বিলম্বিত তখন ডাক্তারবানার। বোতলে সীল-করা রবারের কলেরা সেলাইন কয়েক খোঁসে আমার গ্রন্থতই থাকতো। আর কলেরাতে পিরা কেটে সেলাইন সেবার

বহুপাতিও আমার ছিল। সময় যোগাড় করে নিয়ে গিয়ে ওদের সেই হাঁপির মধ্যে ভূমিরে দিলাম টেরিলাইজ করতে। সেলাইনের বোতলগুলিও একে একে সেই গরম মলে ডোঁধালাম গরম করে নিতে। এইলকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগল।

তার পর হলো আমার সেলাইন সেবার কাজ শুরু। সেখানে কোনো বদবার ভাবনা নেই। রোগী এক নড়বড়ে খাটিয়ার উপর পড়ে আছে। আমি অন্য এক খাটিয়া আনিতে তার পাশে বসলাম। আমাকে সাহায্য করবার মতো কেউ নেই, একাই লব-কিছু করতে হবে। এলিক পিরার মধ্যে ছুঁচ ঢোকাযো কি, কোথাও কোনো শিরাই খুঁজে পাওয়া যায়না। সময় পিরা চুপ্‌চুপে গেছে। কোথায় যে পিরা মিলবে তা হাত চোঁপে ধরা সত্ত্বেও উপর থেকে দেখতে পাচ্ছি। চামড়ার উপর ছুরি চালিয়ে কেটে তার নীচে পিরা খুঁজে বের করতে হবে, তাছাড়া উপায় নেই।

আম্বাঝ করে কতই-এর সামনের দিকে এক আতপাথ চিরে ফেললাম। সেখানে পিরা নেই। উপরে নীচে আরো কিছু বেশি করে কেটে চামড়াটা অনেকখানি ঠাক করে ফেললাম, এবং তার মধ্যে পিরার সন্ধান করতে লাগলাম। অতঃপািন আতপাথ মধ্যে একটা কোনো পিরা নিচের বেরিয়ে যাবে। দেখি চোঁটা করে।

খুঁজতে খুঁজতে খুব লক একটি পিরা বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু তার মধ্যে মোটা ছুঁচ ঢোকানো যাবেনা, পিরাটিকে কেটে মুখ ঠাক করলে তবে চুকতে পারে। কিন্তু সে পিরা এমনই লক যে, কাঁচি দিয়ে কাটতে গেলে হস্ততো সব পিরাটাই কেটে যাবে। অতি সতর্পণে কাঁচি চালানলাম, তবু কিন্তু যা ভেবেছিলাম তাই হলো, সবটা পিরাই কেটে গেল। আমি তখন তার কাটা প্রান্তটিকে কনুসেপুল গিরে জোরে চেপে ধরলাম; ওয়েই একমনকে বললাম শিখন থেকে সেটা ধরে থাকতে। তার পর ওই পিরাটাই উপরের দিকটা ভিন্টেই করে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার চোঁটা করলাম স্টেটিকে অর্ধ-ছেদন ঘাতে করতে পারি। রোগী তো সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে, এত কাটাছুরি সত্ত্বেও তার দেহে কোনো লাড় নেই। কিন্তু আমার হাত তখন ধবুধবু করে কাঁপছে, কাঁচি চালাতে গিরে আবার ঘনি সবটা কেটে বেশি। নিঃশ্বাস রোধ করে হাতকে খুব সতর্ক করে ঐকমাত্র কেটে দেখলাম। ঐকমাত্রই কেটেছে বটে, কিন্তু ওস্তই আবার কাজ চলে যাবে। মোটা ছুঁচটা ওর ভিতর গিরে কোনোপাকিতে ঢুকিয়ে দিতে পারব, আর বেশি কেটে কাজ নেই। কিন্তু এসেদের

নূর তো খুবই সংকীর্ণ, তার ভিতরে সেলাইনের ছুঁচ প্রবেশ করতে আমি বায়ে বায়ে ব্যর্থ হতে লাগলাম। ব্যর্থকৃতক চেষ্টা করতে করতে একবার মনে হলো ঢুকছে। শিরায় মধ্যে ছুঁচটি ঠিক ঢুক গেলে হাতে তা টের পাওয়া যায়। তা ছাড়া শিরায় উপর আবুল রাখলে তার ভিতর দিয়ে কিছুকিছু ক'রে সেলাইনের প্রান্ত বয়ে যাচ্ছে তাও অশ্ভব করা যায়। এখন তা অশ্ভব হলো। তখন আমি হাঁক ছেড়ে গাঁতলাম।

এইসব করতে করতে আমি আরো আধ ঘণ্টা সময় নষ্ট করছি। ডাঙো হাত-সাতাই থাকলে এ কার্য তিন মিনিটেই হয়ে যেতে পারতো। তা হোক, আমি যে পের পৰ্যন্ত সক্ষম হতে পেরছি এই যথেষ্ট। কিন্তু ঐ প্রক্রিয়া করতে করতে আমি গলমগ্ন হয়ে উঠেছিলাম। কণাল দিয়ে টপটপ ক'রে ঘাম পড়ছিল। সেটাও তো ঠিক নয়। শাটের হাতা দিয়ে ঘামটা মুছে ফেলে ওদের একজনকে বললাম—“আমাকে একটু বাতাস করতে পারো?”

সেলাইনের নলটি ধরে আরো আধ ঘণ্টা আমাকে চুপচাপ এইভাবে বসে থাকতে হলো। ক্রমে ক্রমে দেখলাম রোগী মেন গ্রাণ ফিরে পাচ্ছে, সে স্বচ্ছভাবে চোখ বেলে দু-একবার চেয়ে দেখলে, তার নাড়ি কিংবা এলো, কবজির কাছে তার নাড়ির স্পন্দন স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যেতে থাকল। কিন্তু তা হলো চার বোতল সেলাইন তার শিরায় মধ্যে প্রবেশ করার পরে।

চার বোতল শেষ হয়ে গেলে আমার মনে হলো আর বেশি বেওয়া উচিত নয়। আমি শিরায় ভিতর থেকে ছুঁচ টেনে বের ক'রে নিলাম, তারপর কতখান বদ্ধ ক'রে চামড়া সেলাই ক'রে নিলাম। সেই সময়ে রোগী একটু-আগটু কাউন্টরাঙ্ক করতে লাগল। তাতে বুঝলাম যে এবার তার দেহের লাড় ফিরে এসেছে। তার পর দেখলাম সে নিজেই হা করে একটু মল খেতে চাইছে।

কলারতে সেলাইনে এমনি আশ্চর্যভাবে রোগীকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনেন। হাসপাতালেও তাই দেখছি, এখন নিখের চিকিৎসার বেলান্তেও তাই দেখলাম। আমি তো খুশি হয়ে উঠলামই, কিন্তু রোগীর আত্মীরেতা তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হয়ে উঠল। তারা বলাবলি করতে লাগল—“ডায়াস এই ডাক্তারবাবুকে জোর ক'রে ধরে এনেছিলাম, তাই ও বেঁচে গেল।”

সন্ধ্যার সময় রোগীকে বেথতে সেলাম। তখন সে ডাঙোই আছে, যদিও এখনও তার লাড় বদ্ধ হয়নি। মলের শিশাসাও খুব জোর, তাকে ডাবের মল দিতে বললাম।

কিন্তু রায়ে বাড়িতে খাওয়াশওয়া সারবার পরে আমার মনে হলো, এখন আর একবার তাকে দেখে আসা উচিত। এখনও তার রোগ প্রগেদিত, কি হয় তা বলা দায় না। কাজেই তো, একবার ঘুরে আসা দাক।

গিয়ে দেখি বা ডর করেছিলাম তাই, আমার নাড়ি মনে গেছে। যদিও আগের মতো অবস্থা মেটেই নয়, রোগী এবিকে বেশ হুহু আছে, কথাবার্তা বলছে, কিন্তু এখনই আমার সেলাইন দেওয়া দরকার, নইলে এর পরে সামলানো যাবে না। আমি ওদের বললাম—“গ্যাসের আলো যোগাড় ক'রে আনো, আমার ইন্ট্রেকশন লাগবে।”

আবার সেই রাতিকালে সেইসব হুশাতি সংগ্রহ ক'রে আনো, আমার সেইসব হাতামা করা। এবার কণপাউটারকে সঙ্গে নিয়েছিলাম, আমাকে সাহায্য করার মজ। কিন্তু এবার কিছু কষ্ট পেতে হলোনা, অল্পেই শিরা পাওয়া গেল, অল্পেই কাঁচ সমাধা হলো। এবার সেলাইনের লাঞ্ কিছু মুকোজ মিশিতে লিলাম। কাঁচ পেরে এখন বাড়ি কিরদাম তখন ঘড়ির দিকে চেয়ে সেপি রাত তিনটে বেয়ে গেছে।

পরের দিন সকালে গিয়ে দেখি রোগী খুবই সুস্থ। আর কোনো আশঙ্কা নেই। দুদিন পরে সে অল্পগব্য করল।

সেদিন এখন দেখতে পেছি তখন দারোয়ানেরা একজোটা হয়ে আমাকে ধরলে—“একটা মজা নাগুবের মান ষাঁড়িরে মিলেন, আপনাকে কি দিতে হবে বলুন?”

আমি একটু হেসে বললাম—“দিতে হবে তো অনেক টাকাই—”

“আমরা যে গরিব, আপনাকে বুশি করার মতো—”

“তবে আর জিজ্ঞাসা ক'রে লাভ কি আছে, যা দিতে পারো তাই দিও।”

“কিন্তু আপনাকে একবার বেতে হবে আমাদের প্রেসে। আমাদের কর্তাবাবু আপনাকে ডাকছেন। তিনি নিজেই আলতেন, কিন্তু বুড়া নাহুহ আসতে পারেন না, তাই বলে পাঠালেন। বেশি দূর নয়, কাছেই আমাদের প্রেস।”

গেলাম তাদের সঙ্গে। কলকাতার এক বিখ্যাত ব্যবসায় কাগজের মন্তব্যেতা প্রেস। ষাঁকে ওরা কর্তাবাবু বলছে তিনি বাইরের ঘরে বসে ছিলেন, আমার খবর পেয়েই ডাক্তারগি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। “তুমিই সেই ডাক্তার, বরা মাসুহকে ষাঁড়িরে দিচ্ছে?” বলতে বলতে তিনি দু-হাত দিয়ে তৎকণাং আমাকে কুকে আগুট ধরলেন।

আমি তো হতভম্ব। হঠাৎ এমন বাড়াবাড়ি যেহের

অভ্যর্থনা পাবে, এ আমি কখনাই করিনি। আমি অগ্রসর হয়ে কোনো কথাই বলতে পরলাম না।

তিনি তখন বললেন—“ঐ দারোহানটি আমারের খুব কাজের দোক। ও তো হাংই দিয়েছিল। আমরা পেয়ে বলে ওর দেশে ওর দেশকে আমরা টেলিগ্রাম করে বিদায়। তার পর তুললাম, কে একজন ডাক্তার এসে নিরা কেটে ইন্ডোবন্দন দিলে। আমরা বললাম, হ্যাঃ হ্যাঃওর ওপর ছবি ঢালাচ্ছে, মিডিমিডি কিছু পরলা আগেরের মতলবে। তার পর তুললাম বেঁচে গেছে। অথচ যে ডাক্তার আগে ওকে দেখছিল সে নিজে এসে আমাদের বলে গেল, ও কিছুতেই বাঁচবে না, লক্ষ্যং এনিম্যাটিক কলেক্স। তবেই তো আমরা টেলিগ্রাম করেছিলাম। তোমাকে আর কি বলে ধরবার সেবা? কিন্তু তুমি আজ থেকে আমাদের বাড়ির ডাক্তার হলে। এবার থেকে দরকার হলে তোমাকেই ডাকবো।”

‘আমার মাথার হাত দিয়ে তিনি আমার হাতে কুড়ি টাকার হুংখনি নোট ঠুকে দিলেন। বললেন—“এ কিছুই বেওয়া হলে না, কিন্তু ওরা দতাই খুব গরিব।”

এখন আর তাঁর পরিচয় দিতে বাধা নেই, তিনি হলেন তখনকার দিনের ‘অমৃতভাষার পত্রিকা’র এডিটর গোলাপবাব।

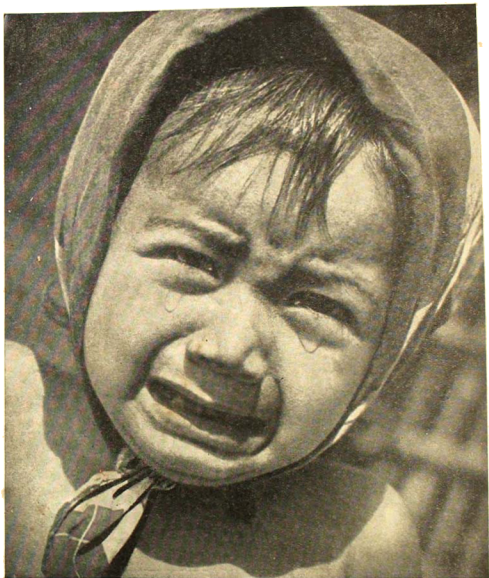
একবার আমার মনে হলো, এত কম টাকা! তার পরেই কিন্তু তুললাম, টাকার প্রহটা এখানে কিছুই নয়। এত যে উদ্ধৃতিত স্বাধাতি তুচ্ছ, তাও এখানে কিছু নয়।

তার চেয়েও অনেক বেশি দুলা আমার মিলে গেছে। সে হলো আমার নিজের মধ্যে গভীর আত্মতৃপ্তির সঙ্গে একটা হৃৎক আত্মপ্রত্যয়। টাকার চেয়ে এরই দাম অনেক বেশি। এমন মরণাপন্ন কলেক্স-রোগিটিকে সাহায্যে পেরে পেরিক দিয়ে আমি এক লাফে অনেকখানি এগিয়ে গেছি। আমি বুঝতে পারছি যে আমার মধ্যে একটা শক্তি এসেছে, ইচ্ছা করলে এক ছোঁ কলসে আমি এমনি করিন করিন রোগ আরোগ্য করতে পারি। সেই বিবাসটি আমার মনেই মধ্যে লজা হয়ে উঠেছে। বিভার চেয়ে তার প্রয়োগ অনেক বেশি বজা ছিনিস, কারণ বিজা জানলেও তার প্রয়োগ শকলের হাতে সার্থক হবনা। আমি কেবল পান-করা ডাক্তার নই, এখন ফলতে পারি আমি সত্যিকার ডাক্তার।

আমার মনের মধ্যে আশ বা এসেছে তার নাম ডাক্তারী চেতনা। ডাক্তারি শিখলেই ডাক্তার হওয়া যায় না, বতকণ পর্যন্ত এই চেতনাটি না আসে। বতকণ পর্যন্ত সে চেতনা না আসে ততকণ পর্যন্ত বিজা জানলেও নিজের উপর আশা থাকে না, মোর করে কিছু বলা যায় না। এখন ডাক্তার কেবেছি দাসের দশ-পনেরো বছর গ্র্যাকুটিনের পরেও নিজের উপর কোনো আশা আসেনি। আবার এমন লোককেও কেবেছি তারা পাল করবার দুই-এক বছরের মধ্যেই নিজের উপর আশাবান হয়েছ, নিশ্চয়গে তারা গ্র্যাকুটিন করছে।

সেদিন থেকে মনেপ্রাণে আমি ডাক্তারি হল্যাম। থাকে বলে বিয়াল মেডিকেল-গ্র্যাকুটিনার। [কন্ড]





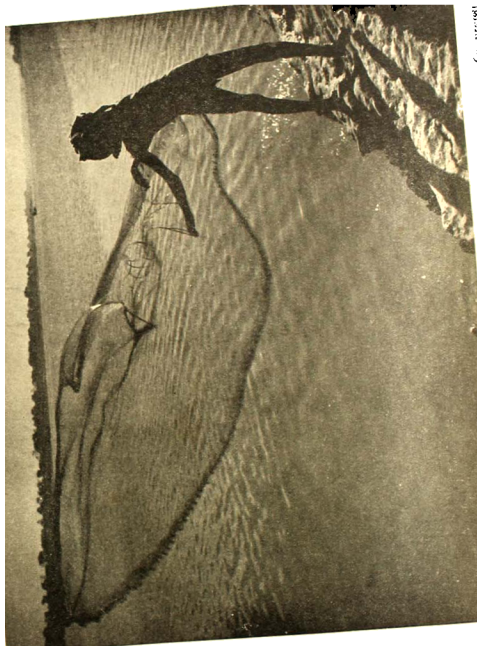
কান্না কিসের ।

[ফটো : রতন দাশগুপ্ত]



জোছনা বাত

[কটো : জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়]





বুটেনের শিক্ষা-সমস্যা

অধ্যাপক জিনিয়াস ভট্টাচার্য, এম. এ. (এড.),
এম. এ. (লন্ডন), টি. টি. (লন্ডন)

শিক্ষার সঙ্গে সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির যে নিবিড় যোগাযোগ আছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। আজকের বুটেনে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত তা কতদূর সমাজ ও রাষ্ট্রকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাচ্ছে, এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষার মন্বত্বিকমূলক আঙ্গ মুক্তি নেওয়ার চেষ্টা চলছে আভিভ্যক্তের ভট্টাচার্য থেকে। তাই সেই ক্ষীণ দ্বারা আজ হবছে প্রসারিত। বীনের নৃতির যাত্রাও তাকে পৌছিয়ে যেবার সার্থক চেষ্টা চলছে। আর সে দাবি নিয়েছে রাষ্ট্র।

একদিন ছিল ধর্মের সঙ্গে শিক্ষার ছিল যোগাযোগ সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ—পূজা থেকে তার হয়েছিল উদ্ভব। কিন্তু আজ কর্মই হয়ে উঠেছে ধর্ম। গণতন্ত্র বহন করে এনেছে স্বতন্ত্রের অঙ্গ।

আজকে রাষ্ট্র যে শিক্ষাধারার প্রবর্তন করেছেন তা দ্বিবেদী রূপ নিয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজের প্রয়োজন বিবেচনা করেই এই দ্বিবেদী পরিকল্পনা। জীবনের একটি স্তর (১১ বৎসর বয়স) পর্যন্ত সকলেই ধস্ত হবে—একই স্বকম জ্ঞান আহরণ করে। শিশু বিনামূল্যে পড়ানো হবে একই শিক্ষা-পদ্ধতিতে আর তখন ধরা পড়বে প্রত্যেকের আপন বৈশিষ্ট্য। তারপরে সেই বৈশিষ্ট্যগুলিই দেবে তাদের জীবনপথের সঙ্কেত। প্রত্যেকের বুদ্ধি ও ব্যক্তির প্রবণতা ও প্রাণবন্তি অস্বাভাবী এক একটি দ্বারা এক একটি সমষ্টি অভিব্যক্ত হবে। তাই এসেলে বিদ্যালয়গুলিকে মোট তিন পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে—প্রাথমিক স্কুল, মধ্যম এবং Technical ও Commercial স্কুল।

১১ বৎসরের পর থেকে যেমন এই ব্যবস্থা তেমনি শিশু-শিক্ষার স্কুল ও নানারকমের ব্যবস্থার ক্রম নেই। হার্কেনটি, কিওরপাটেন ও এমনি অনেক শিশুতীর্থ গড়ে উঠেছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা আজ এসেছে আবৃত্তিক ও অর্ধজ্ঞানিক। কিন্তু তাতেও শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান হয়নি। রাষ্ট্রের নির্দেশ শিক্ষার ব্যবহার থেকে কার্যকর বঞ্চিত না করা। কিন্তু যে সময়ে এখনও প্রোগ্রেসের প্রাচীর খাড়া রয়েছে সেখানে

ধনী-নিধন নির্বিশেষে প্রত্যেককে সমান শিক্ষার ব্যবহার নেওয়া কি সম্ভব?

ফলে আভিভ্যক্ত ও ঐক্য ধানের আছে তাদের শিক্ষার ব্যবহার অনেক বেদী। শিক্ষা-পদ্ধতির নিয়ম আরও এই অভিজ্ঞতাদের হাতে রয়েছে। ফলে ভালো ফলে ভর্তি হওয়া, ভালো শিক্ষা পাওয়া এখনও এসেলে পরিচালনা-সম্প্রদায়ের কাছে প্রাপ্য কথা। এমনকি ১১ বছর বয়সে বহন উচ্চতর বিদ্যালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে নির্বাচনের প্রকৃতি তখনও অনেকাংশে এই সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা না এসে পড়ে না। বুদ্ধিবৃত্তি পরিমাপের যে ব্যবস্থা এসেলে আছে তার ওপর ভিত্তি করে এই যে শিক্ষার্থী-নির্বাচন, এর ওপর আজ বাস্তবের আঘাত কখন আসছে। ধরা এই বুদ্ধি পরিমাপের বিকল্প হিসেবে বুদ্ধি সম্পূর্ণ অব্যাহত নয়। তাঁদের মতে এই বুদ্ধি পরিমাপক প্রকৃতি এতটা প্রাধান্য দেওয়া হয়ত বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ সেখা দিয়েছে যে এইজন পরিমাপ অস্বাভাবী প্রকার বুদ্ধি ও প্রবণতা নিয়েও বিদ্যালয়-জীবনের বিভিন্ন দায়ের অনেক অমূল্যক বয়স প্রদানিত হয়েছে।

যাকে গ্রামার-স্কুলের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হল সে হয়ত ভবিষ্যৎ বিদ্যালয় জীবনে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারল না। আবার অনেক ক্ষেত্রে এর বিনয়ীতও ঘটতে দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে পাঠ্যবইয়ের ওপর ইংল্যান্ডের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী Eric James-এর মন্তব্য বিশেষ লক্ষণীয়। “The distinction between a classical curriculum and any other was not based on any clear idea of what was suitable for boys of a given intelligence but rather on what was appropriate to a social status.”

আজ এই সামাজিক প্রতীক-বিভাগের প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। জীবনমানের বৈষম্যই অনেক সময় যোগ্যতা, ব্যক্তির ও অনেকের মতে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাবিত করে। অনেকের ক্ষেত্রে পরিবেশ বাস্তবের বুদ্ধি, ব্যক্তির এমন কি ভাবী সম্ভাবনাকেও নিয়ন্ত্রিত করে। তাই বর্তমানে এই সামা

প্রতিষ্ঠিত না হলে ততদিন শিক্ষা-সমস্যা সমাধান হইবেও
কঠিন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটি সমস্যা হ্রোত এনেছে এসেপের
অস্বাভী পারিবারিক জীবন। কথায় কথায় বিবাহ-বিচ্ছেদ
কোন স্থানী হ্রদ পরিবার-জীবনকে ব্যাহত করে তোলে না।
কলে যে-সব শিশু কিশোর সেই সংঘাতের পরিবেশে দিন বাপন
করতে থাকে তাদের মানসিক ব্যাধিও হয় দুর্বল, ও অনেক
কেন্দ্রে বিকৃত। তাই কখনোই কুটনের সমাজ-বৃদ্ধা জীবন
হয়ে পড়ছে। যেমি বিকার (Juvenile delinquency)
যুগান্তর কুটনের রাষ্ট্রের সামাজিক ব্যাধি করতে চাইছে।

আজ গুণতর কুটন শিক্ষাক্ষেত্রেও পৌছে গেছে—কিন্তু
কতদূর সেই অসুখ এসেপের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রভাবিত
করেছে সে-বিষয়ে এখনও সংশয়ের অবকাশ আছে।

বলা বাহুল্য, এসেপে শিক্ষার্থীর ভাবী জীবন অনেক
পরিমাণে নির্ভর করে, সে কোন স্থলে শিক্ষার্থী জীবন বাপন
করেছে তার ওপর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে গ্রামার-
স্কুল বা পাব্লিক-স্কুলের ছাত্রের জীবনে উচ্চপ্রতিষ্ঠিত হবার
সুযোগ পায়। কিন্তু ক'জন ভদ্রিত-মজুরের ছেলেরা
এখনকার গ্রামার-স্কুলে প্রবেশবিধার পায়? নীতির দিক
দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তি ও পরীক্ষার সমালোচনা হল যে-কোন শিক্ষা-
নবিত্তে প্রবেশ করার একমাত্র পথে—কিন্তু ব্যতবে ও নীতি
সব সময় হাত ধরে চলে না। তাছাড়া যদি বুদ্ধিবৃত্তির প্রব্রী
ওঠে তবে বলতে হয় মাতৃস্বের স্বপ্ন পত্রিক ক্রমশঃপত্রিক
ভক্তে পরিবেশ কি পাই নয়? যারা ধীন, দারিদ্র্য বাসের
জীবনের নিত্যসঙ্গী তাদের পত্রিকিক ও মানসিক ব্যাধি হ্রদ-
ভাবে গড়ে উঠবার সম্ভাবনা কোথায়?

কলে এসেপের গ্রামার-স্কুলগুলোর প্রবেশদ্বার গ্রাফ
অভিজ্ঞতা শব্দের কাছে সরলভা হয়ে আসে—যার তারই
সুযোগ নিয়ে এসব কুশল পরিকাঠী শিক্ষা শেষ করে কর্ম-
জীবনেও উচ্চতরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে অভিজ্ঞতায়
কায়ম থাকে নিম্নিত গভীর ব্যপ্য। গ্রামার-স্কুলের ক্ষেত্রেই
এই সন্ট লেখা দিয়েছে—সর্বসাধারণের কাছে তার স্বাধীন নৃত
নয়। আর পাব্লিক-স্কুলের ত্রে কথায় নেই—নায়েই তারা
পাব্লিক—কিন্তু তাদের মাঝে আসন পেতে হলে সরবর্তীর
বহুপূর হলেই চলবে না, ক্ষমতার ও কৃপাদৃষ্টি থাকা চাই। কুটনে
এখনও এক্স স্কুল অনেকগুলোই আছে; যেমন—হারো,
ইটন। হারো স্কুলে বাবার সৌভাগ্য হ্রদছিল। দিয়ে শুলান
এখানে আসন পাবার আগে শিক্ষার্থীর মনঃকৃত থেকেই
অভিজ্ঞাবকরা তার নাম লিপিরে থাকেন। শত শত নাম

নামগণীতে তালিকাভুক্ত রয়েছে। কারও অভিজ্ঞাবক লর্ড
বশের, কারও বা Baron। একটি পাব্লিক-স্কুলে মানসিক
বা শিক্ষাব্যয় হয় তা নির্বাহ করা কেবল রাজ্য-রাজধানীর
পক্ষেই সম্ভব। (অসহমাল নেংকও ঐ হারো স্কুলের ছাত্র
ছিলেন।)

এই সামাজিক সমস্যা ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে আর আরও
অনেক সমস্যা লেখা দিয়েছে। তা হল শিক্ষার অগ্রগতি
উপলব্ধিকে ঘিরে।

রাষ্ট্রিক প্রয়োজনের সঙ্গে পা কলে চলতে গিয়ে
শিক্ষার আর যেন আর কোন নিম্নিত লক্ষ্য নেই। তার যে
নিম্নিত একটা গতিপথ থাকতে পারে সে সম্পর্কে বিহ্রম লেখা
দিয়েছে। হয় ও হ্রদজ্ঞানকে পাত্রীহ্রদীতে প্রাণান্ত দিতে
গিয়ে হ্রদীর দিক ও শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যের দিক থেকে
যেন কখনোই দূরে সরে যাক্কে এ যেন। এমনি করে শিক্ষা
যদি রাষ্ট্রের হ্রদে চুলতে থাকে তবে তা কতদূর ছাত্রের কল্যাণ
আনতে পারবে কে জানে? নিত্য নৃতন পথেপথানুলক
পরীক্ষার চাপে পড়ে এসেপের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক
সময় বিকৃত হয়ে পড়ে। এসেপে সামাজিক কর্মবৃত্তী ব্যাহত
হয়।

আর কুটনের শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন পরীক্ষা হ্রদেছে—
কেউ জানেনা শিক্ষার ওঠাই কোন্ অনির্দিষ্ট ঘাটে গিয়ে
লাগবে। এও একটা কম বড় সমস্যা নয়।

কুটনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য আছে
সন্দেহ নেই, আছে নানারকমের সরকারী ও বেসরকারী
শিক্ষাভদন। শিশুরে ভক্তে রয়েছে মার্গারি, কিগারমার্টেন,
মর্টেনগরি স্কুল, কিশোরদের ভক্তে Modern, Technical,
Commercial, Grammar, Public ও এমনি আরও
কত রকমের প্রতিষ্ঠান, বহুতরের ভক্তে Polytechnique ও
Extramural studies-এর ভক্তে নানা বিভাগভদন, ভাণ-
শিক্ষার কেন্দ্র ও ছোট্টটাই Tuition centre। কলে এসেপে
যে বার কঠিনতা শিক্ষা গাভ করতে পারে। যে-কোন দেশের
উন্নতির পক্ষে এর প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। তবে
এই বৈচিত্র্যময় শিক্ষাধারার হ্রদকথানে সংহতি ও সামঞ্জস্য
আনা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

শিক্ষকের অবস্থা প্রায় সব দেশেই সমান। এসেপের
অগ্রগতি উপলব্ধিকার কুটনার শিক্ষকতা ও বিশেষ করে
বিভাগের শিক্ষকতার মধ্যে আছে নৈরাগ ও সিনাপনের
হানি।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সম্পর্ক, লেখানোও লেখা

দিয়েছে সন্ডট। একদিকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সুযোগ ও অল্পদিকে নৈতিক শিক্ষার অবনতি এই সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে। তাই দাঙ্গা মাংসার অনেক নতুন করে ভাবতে হুক করেছে—পাসন-শৃঙ্খলার কথা।

একদমই ছিল এখন পাসন-শৃঙ্খলার স্বর ছিল—“Spare the rod and spoil the child”; নাকি সে হুক পরিবর্তিত রূপ নিয়ে হল—“Spoil the rod and spare the child”। কিন্তু আবার সে সম্পর্কেও আঙ্গ সংশয় দেখা দিয়েছে।

এদেশে সাধারণ শিক্ষিতের হার খুব বেশী হলেও সেই অল্পপাতে উচ্চশিক্ষিতের হার অনেক কম, কারণ বিতলয় জীবন পের করেছে অধিকাংশ কেহেই কর্মজীবন হুক হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্ত্র যে-কোন মহাবিদ্যালয়ে যাত্রা প্রবেশ করে তাদের সাংখ্যার হার খুবই কম। কলে সাধারণের জীবনদর্শন বলে কিছু নেই। শিক্ষা যদি বাস্তবের উপযোগে সহায়তা না করে, তবে সে শিক্ষার সাপেক্ষতা কতদূর সহজেই অগ্রহণ করা যায়।

আঙ্গ সব বেশেই এক দুসন্ডট দেখা দিয়েছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। দুটনও সে সন্ডট থেকে জ্ঞান পাগনি। তাই বে পারায় শিক্ষা চলে এসেছে আঙ্গ তার সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কেবল বস্তুতাত্ত্বিক দৃষ্টি নিয়েই সে লোকের দিকে অগ্রসর হলে চলবে না—আঙ্গ তার সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে মানবিকতার।

কমা

বটকুক দাস

কে চায় তাহ'লে কমা ? বাস্তব সে দান
অনাবিল স্বর্ণের সুধমা
আমাকে না দেয় যদি,—তাহ'লে-তো কমা
কল্পনার মতোয় নিস্ত্রাণ।

করুণা চাই না আমি। কী হবে আমার
ঠাণ্ডা, হিম, শীতল বরফে ?
পুরনো পায়ির সব মনস্তার খোপে
কে চায় জীয়াতে বলা আর ?

জানব দাবির দায়ে হ্রদয় অন্তর্ভি,—
কুষ্ঠরোগে শরীর গলিত ;
ঘৃণা দাও, ঘৃণা দাও—কমা যদি মৃত,
তবুও দয়ায় বেই রুচি।

ঘেয়ালে অনেক হঠকারিতার ভুল
ভৌতিক ছায়ার মতো নড়ে।
বাও তুমি ফিরে যাও। চাই না শিরের
রঙচঙে মাটির পুতুল।

কর্ণ-পিণ্ডাচ

ঐশ্বর্যশেখর শর্মাচার্য

বসন্তের সংবাদ দিয়েছেন,—ভৃগু শাস্ত্রী গঙ্গার
কর্ণ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। মনটা বিচলিত
হয়ে উঠল; শেষকালে আত্মহত্যা করলেন
ভৃগু শাস্ত্রী !

ত্রিবেণীর সেই ভৃগু শাস্ত্রীকে জানেন তো ? তাঁকে
না চেনে এমন লোক কমই আছে। যে তাঁকে
কোনদিন দেখেনি, সেও জানে তার ভূত, ভবিষ্যৎ ও
বর্তমান সবই ভৃগু শাস্ত্রীর নখদর্পণে।

বেণীঘাটের গা ঘেঁষে প্রকাণ্ড বাড়িখানা প্রেতের
মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। শ্রাণা পড়ে গেছে, ছাড়া
ঘরে গেছে সে বাড়ির গায়ে,—কালো কালো ছোপ,
টানটানী আঁকাবাঁকা কুংসিত কত দাগ। উত্তর
দিকের আলসে ভেদ করে উঠেছে একটা বটগাছ।
অস্তকার রাত্রে এদিকে যেতে ভয় হয়; মনে হয়
দৈত্যদানব বাস। বোধহয়।

অথচ পনেরো বছর আগেও বাড়িখানা দাঁড়িয়ে
থাকত ধবলগিরির মত। হম্মনস্তুপ্রসাদ ঠুনঠুনওয়ালার
প্রাসাদ—সুপথারের মোখে আর বিচিত্র কারুকার্যে
শোভিত ঘরগুলি। এখন প্রাসাদ নয়, এটা এখন
ভৃগু শাস্ত্রীর আশ্রম। ভূপাকার সব পুঁথিপত্র;
কতক আলনারিতে কতক মেঝের উপর, কতক বা
ঝাকের ওপর তাকে তাকে সাজানো।

ভৃগু শাস্ত্রী বাড়িখানা নিশ্চয়ই কেনেন নি।
এটা হম্মনস্তুপ্রসাদের দান। তাঁর একমাত্র কন্যধর
মহাবীরপ্রসাদের নাকি জীবনদান করেছিলেন
ভৃগু শাস্ত্রী। তিনি ডাক্তারী কিংবা কব্জেরজী কিছুই
জানতেন না, কবচ-মাহুগীও দিতেন না, এমন কি
শাস্তি-স্বস্ত্যায়নেরও ধার দিয়ে যেতেন না; কিন্তু
কার চিকিৎসায়, কার ওষুধে রোগী সারবে কিংবা
কার ক্রিয়াকর্মে সুস্থল হবে তা বলে দিতে পারতেন।

এমনই অলৌকিক শক্তি ছিল তাঁর। আমরা
ভাবতাম,—ত্রিকালদৃষ্টি !

মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতেন
ভৃগু শাস্ত্রী। তারপর আপন মনে বলতে থাকতেন,
—অঃ, ছেলেটা তো খুব ভুগছে দেখছি। আচ্ছা,
আপনার বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা তেঁতুল-
গাছ রয়েছে না ? শ্রাবণমাসে এক শনিবার দিন
ছেলেটা সেই তেঁতুলগাছটার তলার আছাড় খেয়ে
পড়ে গেছিল কি না ? আপনার কেনা বাড়ির
পাড়টা আপনার গিন্নীর পছন্দ না হওয়ায় তখন
বেশ কথা কটাকাটি হচ্ছিল, এমন সময় ছেলেটার
চীংকার শুনে ছুটে গেলেন।—কেনম ?

আপনি তো তাঁর কথা শুনে স্তম্ভিত। সত্যিই
আপনার ছেলে এরকম তেঁতুলতলায় পড়ে গেছিল।
গিন্নীর সঙ্গে বাড়ির পাড় নিয়ে বগড়াঝাটের
কথাটাও সত্যি। সেই থেকে ভুগছেও ছেলেটা।

আমাদের আশুদা তো এসব কথা বিশ্বাসই
করতেন না। তিনি গেছিলেন ভৃগু শাস্ত্রীকে যাচাই
করতে। আশুদার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে
ভৃগু শাস্ত্রী বলেছিলেন,—মাজা ছেড়ে যাচ্ছে বাবা !
শেষে কুল-কিনারা পাবে না। এখনও সাবধান
হও। শাস্ত্রীর কথা শুনে আশুদার চোখে-মুখে
কাকূতির আভাস দেখা দিয়েছিল। কিসের মাজা
সে কথা আমরা বুঝতে পারিনি। যাক, ভৃগু শাস্ত্রী
তখন অস্ত কণা পেড়েছিলেন,—আচ্ছা বাবা, তোমার
বৌভাতের দিন খুব রুটি হয়েছিল না ? বস্তুরবাড়ি
অনেক দূরে পশ্চিমের এক শহরে; লক্ষী-বাস্তীজীর
গান হয়েছিল তোমার বিবাহ-বাসরে। ঠিক তো ?
তুমি বাবা, মাথাধরায় খুব ভুগছ; দীননাথ
ডাক্তারের ওষুধ খাও ভাল হয়ে যাবে।

এটা তো ছিল কৃমিকা। তারপর গুনেগেঁথে পঁচিশ টাকা আগাম কি নিয়ে আপনার পূর্ণজন্ম, পরজন্ম আর বর্তমানের ইতিহাস বর্ণনা করতেন হুগু শাস্ত্রী। অকুরত্ব ঠার ভাণ্ডার,—হুগুসংহিতার সকল খণ্ডই নাকি ঠার কাছে রয়েছে। লোকে বলে ঘরের ঘন আগলাচ্ছেন হুগু শাস্ত্রী; সিন্দুক-ভরতি অগ্নুন্তি টাকা!

হুগুসংহিতার রূপ দেখে বিস্মিত হতাম। এ রূপ থেকে কি ক'রে ভাগ্যলিপি উদ্ধার করেন হুগু শাস্ত্রী? আর মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন সব কথা বলতে পারেন! নিশ্চয়ই অলৌকিক শক্তির অধিকারী তিনি। ঠার এই অলৌকিক শক্তির মোহই আমাকে পেয়ে বসেছিল। হুত কিংবা ভবিষ্যৎ জ্ঞানতে ঠার কাছে যাইনি। গিয়েছিলাম ঠার সেই চাবিকাঠিটা আনতে। ঠার সিন্দুকের চাবিকাঠি নয়, নিয়তির রহস্যভেদের চাবিকাঠি।

কত কথা শুনেছিলাম,—অসাধারণ মানুষ তিনি। মনে মনে ঠার কত ছবি এঁকেছি,—ত্রিকালজ্ঞ ঋষির মূর্তি! কিন্তু আপনার স্বপ্ন ভেঙে গেল; এখনও মানসপটে ঠার সেই মূর্তি ভেসে ওঠে; কি করণ ঠার মুখখানি! বিবাদকালিনা ঠার চোখে-মুখে। কি নোঁরা,—গায়ে ময়লায় ছোপ পড়ে গেছে। কি বিজ্রী গন্ধ ঠার গায়ে। কাছে বসা যায় না। ত্রিকালজ্ঞ? না, না,—পিশাচসিদ্ধ!

তবু গিনরাত ঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি; কত ভোবামোদ করেছি। ভাবতাম,—নিজেকে এমন করে লুকিয়ে রাখতে চান হুগু শাস্ত্রী। সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ এটা।

কিন্তু হুগু শাস্ত্রীই হুল ভেঙে দিলেন। তিনি বললেন,—বাবা, পরের ভবিষ্যৎ ঘাঁটতে ঘাঁটতে নিজের ভবিষ্যৎ মাটি করেছি। ঘরের দিকে তাকাইনি বাবা! ঠ্রী গেল, পুত্র গেল, আত্মীয়স্বজন সবাই গেল; এঁ একটা মাত্র ছেলে অবশিষ্ট রয়েছে। একেও নিয়ে যাবে পিশাচ! আমি বড় একা বাবা!

বিস্মিত হয়ে হুগু শাস্ত্রীর মুখের দিকে তাকাই। নিশ্চয়ই আমাকে হুলনা করছেন তিনি! চোখে তাঁর জল টলটল করছে। না, না, এ হুলনা নয়!

হুগু শাস্ত্রী বলেছিলেন,—আমার সবই ছিল বাবা! এ বাড়িঘর, টাকাকড়ি ছাড়া আমার সবই ছিল। মনের শান্তি ছিল বাবা! মনের শান্তিটাই আসল জিনিস। টাকাকড়ি শান্তি দিতে পারে না। উঃ, অজ্ঞানার কথা মনে পড়লে বড় হৃৎক হয়; তাকে বড় অবহেলা করেছি। অজ্ঞান সবই সহ্য করেছিল। কিন্তু যেদিন বড় ছেলে সন্ত মারা গেল, সেদিন আর সহ্য করতে পারিনি। ছোট ছেলে; রাস্তায় বেড়িয়েছিল, হঠাৎ একটা মোটরের ধাক্কায় সর্বনাশ হয়ে গেল। উঃ!

তিনি বলতে লাগলেন,—অজ্ঞান চীংকার করে উঠল,—ওগো শীর্ষগির এসো! সন্ত যে গাড়ি চাপা পড়েছে। কিন্তু কে কার কথা শুনে। আমি তখন হুগুসংহিতার রাজত্বের রূপের মধ্যে তন্ময় হয়ে রয়েছি।

হুগু শাস্ত্রী কুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন,—খেয়ালই নেই বাবা! কখন যে অজ্ঞান আগুন ধরিয়ে গেছে; দাউ দাউ করে আগুন জ্বল উঠেছে, আর পুঁথিফুলি পুড়েছে। পাগল হয়ে গেছে অজ্ঞান! চীংকার করছে আর হাততালি দিচ্ছে! পুত্রশোক বাবা! পুত্রশোক!

তিনি বললেন,—পুঁথিপত্রের শোকেই আমি পাগল হয়ে উঠলাম; আমার আবার পুত্রশোক? হাতের কাছে ছিল একটা কাঁদার গেলাস; ছুঁড়ে মারলাম অজ্ঞানার মাথায়। পালিয়ে গেল অজ্ঞান,—রক্তের দ্বারা আমার সচেতন করে হুললে। ছুটে গিয়ে দেখি,—লোকে লোকারণ্য; সন্তর পাশে অজ্ঞানার অসাড় দেহ! অজ্ঞান মরে গেছে।

হুগু শাস্ত্রী বলতে লাগলেন,—এ পথ বড় বিজ্রী পথ, বাবা। ছিলাম জ্বলের মাস্টার; কায়রেশ সংসার চলে যেতো। জ্যোতিষও জ্ঞানতাম কিছু কিছু! এক নেপালী সাধুই আমার সর্বনাশ করলে;

পড়লাম ভৃগুসংহিতার মোহে। স্বর-সাধনাও শিখেছিলাম। হস্তমন্ত্রগ্রন্থসমূহের ছেলেও বেঁচে গেল তার সৌলভে। কিন্তু আমার সর্বনাশ করল এই বাড়ীটা। টাকার লোভে আসল ভিনিসটাই হারালাম; অচেনাকে ভুলে গেলাম, ঝেলেদেবও ভুলে গেলাম।

বিদ্রিষ্ট হয়ে প্রশ্ন করি,—কি করে এমন হ'ল ?

তিনি উত্তর দেন,—বৃথাতে পারলে না ? টাকাই টাকার লোভ বাড়ায়। রাতদিন পুঁথিপত্র নিয়ে ভুবে থাকতাম, সংসারের দিকে ফিরেও তাকাইনি।

চুপ করে তাঁর কথা শুনে লাগলাম। তিনি বলতে লাগলেন,—পরের ভবিষ্যৎ ভাবতে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ ভুলে গেলাম বাবা ! শুনে তো তার পরিণাম ! এখন অজানাই আমার কাল হয়েছে !

—কেন ? তিনি তো অনেকদিন হয় মারা গেছেন !

—হ্যাঁ, মারা গেছে। কিন্তু সে আনাকে ছাড়েনি বাবা ! তার বীভৎস রক্তমাখা চোখ-মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কানে গুন্‌গুন্ করে তার কণ্ঠস্বর ! আমার কর্ণ-পিশাচে পেয়েছে। যখন কারও কথা ভাবি, কিংবা কেউ আমার সামনে আসে, কে যেন কানে কানে বলে দেয় তার কথা,—তার ভবিষ্যৎ কে যেন গুন্‌গুন্ করে বলে দেয়।

—বেশ তো, তাতে আপনার সুবিধেই হয়েছে।

পাগলের মত হেসে উঠলেন ভৃগু শাস্ত্রী। তার-পর বললেন,—হ্যাঁ, সুবিধেই হয়েছে। পাগল হবার আর বাকী নেই। রাতদিন কানের ভেতর ঘেনর-ঘেনর করছে কর্ণ-পিশাচ ! ঘুনোলেও রক্ষে নেই।

মনে মনে ভাবি,—এও কি সম্ভব ? শুনেছি কর্ণ-পিশাচের সাধনা করলে এমন লোকের তুচ্ছ ভবিষ্যতের কথা বলা যায় ; কানে কানে বলে দেয় কর্ণ-পিশাচ। বিনা সাধনায় ভৃগু শাস্ত্রী সিদ্ধিলাভ করেছেন ; জোর বরাত তাঁর !

ভৃগু শাস্ত্রী বললেন,—কি ভাবছ বাবা ? তোমায় বারণ করছি এ-পথে এগিয়ে না। সর্বনাশ হবে। আমি পাগল হয়ে যাব। এ কর্ণ-পিশাচ আর কেউ নয়, বাবা ! অজানা আনায় শাস্তি দিচ্ছে।...উঃ, আমার সন্ত !

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ভৃগু শাস্ত্রী বললেন,—আমার কথা কিছুই বলেনা বাবা। চোখের সামনে শুধু রক্ত দেখি ; মাঝে মাঝে মনে হয় গঙ্গায় ডুব দিয়েছি ; শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বড় কষ্ট হয়।

সহানুভূতি দেখিয়ে বলি,—ছেড়ে দিন এসব। আপনার তো কোন অভাব নেই। পরের অদৃষ্ট নিয়ে নাই-বা চিন্তা করলেন ! এ ব্যবস্থা ছেড়ে দিন।

তিনি বললেন,—ছেড়ে তো দিয়েছি বাবা ! কিন্তু সে আমার ছাড়ে কই ? কেউ সামনে পড়লেই কানের মধ্যে বকর-বকর করে ওঠে কর্ণ-পিশাচ। না বললে রক্ষে নেই।

ভৃগু শাস্ত্রীর কথা শুনে কষ্ট হয়েছিল। বুকেছিলান, লোকের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি ঘাঁটিঘাঁটি ক'রে ভক্তলোকের মাথা খানাপ হয়ে গেছে ; তার উপর হ'ল-দুটা অপমৃত্যু চোখের সামনে।

তিনি বলেছিলেন,—গঙ্গায় ঝাঁপ দেবো বাবা। প্রেতের মত এই বাড়ীটা আমার রাতদিন বিক্রম করছে ! অন্তকে তাঁর মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেবো ! তাকেও গিলে ফেলবে কর্ণ-পিশাচ !—তুমি এসেছো বাবা ! তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। আমার নিভৃতি দাও বাবা। কিন্তু পারবে না। পারবে না। নিজের জালে নিজেই বদ্ধ হয়েছি। আর কাউকে তাতে জড়তে চাইনে। তুমি পাগিয়ে যাও ! তোমায়ও খরে ফেলতে পারে ! হাঃ-হাঃ-হাঃ !

ভৃগু শাস্ত্রীর সে বিকট হাসি আজও কানে ধ্বনিত হচ্ছে। সত্যি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন ভৃগু শাস্ত্রী ! মনে মনে প্রশ্ন জাগে,—কর্ণ-পিশাচ কি তাকে ছেড়েছে ? শাস্তি পেয়েছেন কি ভৃগু শাস্ত্রী !

পুরোনো কথা

যম দত্ত

কাহার ঠাকুর আগে যাইবে

সুখের গ্রামে বৈষ্ণবামুনদের বাড়ি জগৎসংসব হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে ঠাহাদের অবস্থা হীন হইয়াছে। বাড়ির ঢালে খড় নাই, একটু ছোর বর্ষা হইলে বেওয়ায় জায়গায় ধসিয়া পড়ে। তিনটা করিয়া জগৎসংসব করেন ঠাহারা। লোকও যথাসাধ্য টাকা দিয়া, জিনিস দিয়া সাহায্য করে। তিন দিনে তিনটি পাঠা পড়ে—সকলকে অন্ন প্রসাদ দেন। ঠাহাদের পূজা যে সেড়শো দুশো বছরের উপর হইতেছে সে সময়ে গ্রামের কাহারও সন্দেহ নাই। ১১৯৯ সালের চিঠায় ঠাহাদের চণ্ডীমণ্ডপের জায়গা ‘দুর্গামণ্ডপ—নিষ্কর’ বলিয়া লিখিত আছে।

ঐ গ্রামের দ্বারিকা পরামাণিক দোবরা তিনির ব্যবসা করিয়া অনেক টাকা রোজগার করেন। ঠাহার বাড়িতে দুর্গাপূজা আরম্ভ করিলেন। পাড়ার সব লোককে আহ্বান করিতেন; পাছে খাইতে বলিলে কেহ ঠাহারা নবশাক বলিয়া না খায় এজন্ত মালসা করিয়া মিঠায় দিতেন—বাড়িতে যে কয়জন লোক সেই কয়জনের লক্ষ আলাদা আলাদা মালসা দিতেন। ঠাহার এক ছেলে বলিল যে ভাসানের সময় এবছর কিছু ধুখান করা হউক—এবার তো অনেক টাকা লাভ হইয়াছে। সন্ধ্যার পর গ্রাম ঘুরাইয়া বাড়ি পুড়াইতে পুড়াইতে রোশনাই করিয়া ঠাকুরের ভাসান হইবে।

ঠাকুরের ভাসান দেখিতে অনেক লোক জমা হইল। তাহার পর ঠাকুর লইয়া রেসেলা বাহির হইল। কিছুদূর যাইবার পর পরামাণিকদের ঠাকুরের রেসেলার সহিত, বৈষ্ণবামুনদের ঠাকুর লইয়া যে ১০১৫ জন লোক আসিতেছিল তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কাহার ঠাকুর আগে যাইবে।

পরামাণিকদের মেজ ছেলে বলিল, ‘আমাদের ঠাকুর আগে যাইবে। বড় ছেলে বলিল, এ বিষয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হউক—বাড়ি তো কাছেই। দ্বারিকা পরামাণিককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ‘এই সামান্য বিষয় লইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে তোমরা ঠাকুর কেলিয়া চলিয়া আসিলে? এর জিজ্ঞাসা করিবার কি আছে? বৈষ্ণবামুনদের ঠাকুর বহুদিনের ঠাকুর; তিনি আগে যাইবেন।’ মেজ ছেলে আপত্তি করিল, ‘আমাদের রেসেলার লোককে ঠাড়াইয়া থাকিতে হইবে যে?’ দ্বারিক বলিল, ‘কিছু টাকা হইয়াছে বলিয়া তো বেটারদের মাথাগরম হইয়াছে। আনি নহিলে তোমরা ঠাকুরপূজা বজায় রাখিতে পারিবে না—না তোমাদের মনের ভাব জানিতে পারিয়া আর টাকা দিবেন না।’

ঐ বলিয়া বৃদ্ধ দ্বারিকেন লঠন হাতে করিয়া বাড়ির বাহির হইলেন। বৈষ্ণবামুনদের প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া ঠাহাদের অগ্রসর হইতে বলিলেন। নিজের ঠাকুরের রেসেলা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। সর্বত্র দ্বারিক পরামাণিক, তাহার পর বৈষ্ণবামুনদের ঠাকুর; তাহার পর পরামাণিকের রেসেলা।

পথে অন্নপা তেলী ওরফে অন্নদা হালসাবারের সঙ্গে দেখা। অন্নদা জিজ্ঞাসা করিল, ‘পরামাণিক মশায় নিজের ঠাকুর কেলিয়া যে বড় বৈষ্ণবামুনদের ঠাকুরের আগে আগে যাইতেছেন?’ পরামাণিক বলিলেন, ‘ছেলেবেলা থেকে এই ঠাকুরের ভাসান দেখিয়াছি, আগে আগে গিয়াছি, এ ঠাকুর আমায় নহে? দুই ঠাকুরই আমার। আর তোমার অন্নদা বয়স হইলে কি হইবে, ভাসানের নিয়মকানুন জান না। যে ঠাকুর বহুদিনের, সেই ঠাকুর আগে

যাইবে—ইহাই হইতেছে ভাসানের নিয়ম । মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন ।’

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ কোন নিয়ম করিয়াছিলেন কিনা আমরা জানি না ; কিন্তু কোন সুখী লোকের নিকট হুনি নাই । তবে যে পুরাতন ঠাকুর আগে যাইবে—এ নিয়ম প্রতিপালিত হইতে দেখিয়াছি ।

বাবু ভো বাবু—ভগ্নবাবু

উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভকালে কলিকাতা শহরের তত্ত্বাবধার মতন বাবু কেহ ছিলেন না । ইনি চাটখোলা দত্তবংশের সুবিখ্যাত মদনমোহন দত্তের বংশধর । ইনি হেজুয়ার পুত্র ও তৎসংলগ্ন জমি ১ লক্ষ টাকায় মটারী কমিটিকে বিক্রয় করিয়া তৃতীয়পক্ষের হীকে হীরার চন্দ্রহার ও গোটে কিনিয়া দেন । সেকালে সোনার গহনা মাটির নীচে পরিবার রেওয়াজ ছিল না—অধন অল্প স্বর্ণের অলঙ্কার পরা নাকি নোয়ের । সুবর্ণবণিক সমাজে কিন্তু এ প্রথা প্রচলিত ছিল না—একজ্ঞ তাঁহাদের ধুব নিন্দা হইত । তত্ত্বাবধার তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী বায়না ধরিলেন যে তিনি সোনার গোটে পরিবেন—তত্ত্বাবধার উপর হীরা বসাইয়া গোটে ভৈরবী করাইলেন ও হীকে দিলেন । তিনি এইভাবে সমস্তার সমাধান করিয়া দিলেন ।

তত্ত্বাবধার তাঁহার স্ত্রীর সহিত ব্যাচনগরের বাগান-বাড়িতে টাকার ছিনিমিনি খেলিতেন । তাঁহার স্ত্রী রাত্রিতে ভালবাসিতেন ; তত্ত্বাবধার, শাকভাজার সহিত রূপার নিকি-চুয়ানি রন্ধন করিয়া লোকজনের পাতে দিয়া দেখিতেন কাহার ভাগ্য কি পড়িল ।

এক ব্রাহ্মণের কানের যন্ত্রণা হয় । ইক্কিমসাহেব বলিলেন যে তিনি যদি ভাল ইস্তাখুল আতর কানে দেন তো কানের যন্ত্রণা সারিয়া যাইবে । ব্রাহ্মণ রাজা বৈজ্ঞানাথের নিকট আতর প্রার্থনা করিলেন । রাজা তাঁহাকে পাত্র লইয়া আসিতে বলিলেন । ব্রাহ্মণ একটি বোতল লইয়া আসিল ; রাজা তাঁহার বুদ্ধির অভাব দেখিয়া বলিলেন, ‘আমি শিপি

পুলিয়া দেখিলাম যে আতর কিছু খারাপ হইয়া গিয়াছে—ইহাতে আপনার কানের অমুখ সারিবে না । আপনি যদি ভাল আতর পাইতে চাহেন তো তত্ত্বাবধার কাছে যাইন ।’ ব্রাহ্মণ তত্ত্বাবধার কাছে আতর পাইবার প্রার্থনা জানাইলেন ও রাজা বৈজ্ঞানাথ তাঁহার কাছে আসিতে বলিয়াছেন এ-কথাও বলিলেন । তত্ত্বাবধার ব্রাহ্মণকে সেদিন তাঁহার ঐখানে অহারাতি করিতে বলিয়া বড়বাজার হইতে ১ সের ভাল ইস্তাখুল আতর আনাইয়া ব্রাহ্মণের বোতলে ভর্তি করিয়া দিলেন, আর বলিলেন, ‘এই আতরে আপনার কাজ হইবে কিনা একবার রাজা বৈজ্ঞানাথকে দেখাইয়া লইয়া যাইবেন । কারণ তিনি কোন আতরে কানের যন্ত্রণা সারিবে এ-সম্বন্ধে আমার অপেক্ষা ভাল জানেন ।’ তখনকার কালে এক ভরি ইস্তাখুল আতরের দাম ৮ টাকা ছিল ।

নবাব ওয়াজিহ আলি শাহের নুতন চিড়িয়া খানা

অযোধ্যার শেষ স্বাধীন নবাব ওয়াজিহ আলি শাহকে ইংরাজ রাজ্যচ্যুত করিয়া কলিকাতার সন্নিকটে মেটিয়াবুরুজে বন্দী করিয়া রাখেন । ইনি এইখানে একটি ‘চিড়িয়াখানা’ স্থাপন করেন । একটি একটি করিয়া পাখী কিনিয়া চিড়িয়াখানা স্থাপন করিতে গেলে অনেক সময় লাগিবে, একজ্ঞ তিনি একটি পাখীর সংগ্রহ কিনিবার চেষ্টা করেন । কলিকাতায় রাজা রাধেন্দ্র মল্লিকের পাখীর সংগ্রহ দেখিবার মতন ছিল । নবাব বাহাদুর এক লক্ষ টাকায় এই পাখীর সংগ্রহ ক্রয় করেন । পরে নানান দেশের রকম রকম পাখী সংগ্রহ করিতে থাকেন । যে-কোন লোক নুতন রকমের পাখী আনিলে তিনি তৎক্ষণাৎ বহুমূল্যে সেই পাখী কিনিতেন ।

গুইরামের মামা এইরূপ অনেক নুতন রকমের পাখী আনিয়া দিয়াছিল । নবাবসাহেবের এক কথা—‘নয়া চিড়িয়া লে আও’; কি করে—গুইরামের মামা গগনভেদী, মাচাল, বনেশ প্রভৃতি আনিতে

লাগিল—নবাবসাহেবও বহুমূল্যে ডাহ। কিনিতে লাগিলেন। গুইরামের মামা দেশে কোঠাবাড়ির পত্তন করিল। শেষে আর নতুন রকমের পাখী জোগাইতে পারিত না; নবাব তাহাকে বলিলেন, 'তোম্ বৃদ্ধা হো। গিয়া, নয়া চিড়িয়া লে আনেকো। নহি সস্তা।' কি করে? গুইরামকে একটি গৃহিনীর পালক ছি'ড়িয়া ও রং করিয়া 'নয়া চিড়িয়া' বানাইয়া তাহার মামা নবাবসাহেবকে বিক্রী করিতে পাঠাইলেন। দাম বলিয়া দিলেন ৫০ টাকা। গুইরাম এই 'নয়া চিড়িয়া' নবাবসাহেবকে বিক্রী করিতে গেল; দামও বলিল। নবাব তৎক্ষণাৎ এই 'নয়া চিড়িয়া' কিনিলেন। গুইরাম মনে মনে হাসিতে লাগিল। নবাবসাহেব সবই বৃদ্ধিলেন। গুইরাম যখন টাকা লইয়া কিরিতে উদ্ভূত, নবাবসাহেব গুইরামকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আনি

আহা—খুশ নহি—আনি সব বৃদ্ধিতে পারিয়াছি; তবে তোমাদের টাকার দরকার সেইজন্য টাকা দিয়াছি; এরকম "নয়া চিড়িয়া" আনিও না। আনি তোমার এই নয়া চিড়িয়া চিড়িয়াখানায় না রাখিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি, এই দেখ গাছের ডালে তোমার নয়া চিড়িয়া বসিয়া আছে।'

আমরা আমাদের বাল্যকালে গুইরামের মুখে এই গল্প বহুবার শুনিয়াছি। নবাবসাহেবের উদারতার কথা বলিতে বলিতে গুইরাম কঁপিত; বলিত—এরকম লোক মারা পৃথিবীতে আর ছুইটি নাই।

নবাব ১৮৮৪ বা ১৮৮৬ সালে পরলোক-গমন করেন। ইহার চোদ্দ পুত্র বিজয়সিংহ কাদের মিউটিনির সময় ঈংরাজদের সহিত যুদ্ধ করেন ও নিজ নামে মোহর ছাপান। হুই-একটি মোহর এখনও পাওয়া যায়।

মনোবেশনা

জীরামপদ মূখোপাধ্যায়

প্রথম বেদিন বাড়ীটার পাশ দিয়ে হাই—সন্নমদচক বিশ্বধ-ধনি বা'য় হয়েছিল, বাঃ—চমৎকার!

শহুরে ইটকাঠখেরা চিপির মধ্যে মনোরম একটি মুক্খিকহ। প্রসঙ্গ নয়, তবু পরিপূর্ণ। পথের ধার থেকেই স্কক হেবেডে বাগানটা—চমৎকার একটি ফুলবাগান। গোলাপ বেলা করবী ছুই রজনীগন্ধা উপর কামিনী জবা সন্ধ্যাবিরি খোলাখেলা আসর। নববর্ষ অহুগ্রাণ-সিক্ত সীমন্তের মত লাল-টকটকে লক পথ—কেছারী করা গাছের মাঝখানে দিয়ে একে বেক চলছে, মাঝখানে ছোটমত কখন। কখনবা পাশে পাথরের বেঁকি পাড়া—কখনবা ধারে রঙীন কলুপাতার বাড়—আর খল জলে চকচকে পল্লপাড়া ভাসছে। বাগানের মালিক বে কখনরিক তাতে লম্বেই নাই।

পথ দিয়ে যখনই হাই—খামিকক্ষণের জন্ত থিড়াই, খানিক চেয়ে দেখি—ইটের স্নাক্ষে নখনের সৌন্দর্য। তারিক কবি সৌন্দর্য-রসিক মাছখটিকে। কল্পনা কবি—একটি নিদাঘ-

পুদিমার সন্ধ্যাবেলা আর রাহিতক; অতঃপর পৃথিবীতে বহুবিবোধিত ভীষমে এরা অপ্রয়োজনীয় অংশ হইতো, কিন্তু বহুই তো জীবনকে সব সময়ে পরিপূর্ণ দুল্য দিতে পারে না। এরা ছাড়া—বসন্ত—অশ্রুকাহ—কিন্তু মন্থর-দুঃস্বপ্নের মতখান দিয়ে সৌন্দর্য-সৌন্দর্যের রেখাভঙ্গীই ছাগিয়ে চমৎকতির স্বাভাবিক হইতে পারে। এরা বিস্ময়ের জন্ত—রসলোকে পৌছে দেবার সোশান।

একদিন ভাগ্যক্রমে বাড়ীটার সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেল। সেদিন বাড়ীর বর্তমান মালিক হংসেশ্বর মিত্রের সঙ্গে আলোচ হইছিল ফুলবাগানে বসে।

কিছুক্ষণ পরে উনি বললেন, ঘরের ভিতরে এসে বসবেন না? সারাক্ষণ তো বাগানেই কাটালেন।

আমরা চারজনেই সমথরে বললাম, বেশ লাগছে এখানে—উঠতে ইচ্ছে করচে না।

এই কথাই হংসেশ্বর মিত্র হাসলেন। খুশিভরা স্বরে

বললেন, সবাই তাই বলল। বাবা একছত্র কবিতাও দেখেননি—অথচ বাজীর সঙ্গে মানান করে এমন একটি কুলবাগান তৈরি করিয়েছিলেন।

বললাম, এইটাই তাঁর প্রের্ত কবিতা।

হা বলছেন! এখানে এসে বলল সে কথা বার বার মনে হয়।

এমন সময়ে একটি ছুক বাজীর ভিতর থেকে এসে জানাল—চা তৈরি।

হংসের মিত্র সবিনয়ে বললেন, তাহলে এবার উঠতে হয়। কতদূর ব্যাপারগুলি সারতে হবে তো—

হংসের মিত্রের বাড়ীতে গাড়ী লেগেই এসছি আমরা।

*

গাড়ী দেখার পাশা আর চা-পর্ব শেষ হলে হংসের মিত্রই বললেন, চলুন বাগানে গিয়ে বসিগে, যা গুমোট—ফানের হাওয়া গায় বেনে আগুন খরিয়ে দিচ্ছে।

এ কথা সে কথাই বেশ ক্ষুণ্ণতার পরিবেশ সৃষ্টি হল। খোলামনা কুলবাগানে বসে আমরাও সহজ হয়ে উঠলাম।

প্রাথমিক পরে চায়ের চুম্ব দিলেন উনি।

আবার চা!

কতি কি—আমরা তো সায়েব নই যে নিয়ম মেনে চলব। যদি কিছু মনে না করেন তো একটি গল্প শোনাবো আপনাদের।

চা এক কিছু হাভা অধ্যক্ষিক এলো। টে আনাদের সামনে টেবিল দিয়ে বসলেন হংসের মিত্র, গল্পের সঙ্গে এ-ও চলেবে কিছু, না হলে গল্প ভরমাত পরব না। অবশ্য সংক্ষেপেই বলব কাহিনীটা। বত ভাল গল্পই হোক—আত্মজীবনী বা মনোবিশ্লেষণ থেকে অপরোক্ত কথিতকর হয় না। অথচ দেখুন—আনাদের বাংলাভাষ্যের সাধারণ লেখকরা তাদের সাধারণ কর্ম ও কথার সাম্রাজ্যীকরণে জিনিসটিকে ‘বাবি’ করে তোলেন! থাক সে কথা।

একই বেদে আয়ত্ত করলেন : আয়ার শিতাম্ব প্রথমে আসেন এই শহরে। তখন জমির দাম ছিল নামমাত্র আর মাংসের মজরুটা ছিল উঁচু। হুঁচাব কাঠা ভরিতে বাস্তবজীবনের পত্তন তারা পছন্দ করতেন না। প্রায় হাবিয়ে জমি কিনে ফেলতেন তিনি। জমি তো কিনলেন কোঁকের মাথার—সামান্য মুদ্রিগিরিতে ধীর সংসার চল, তাঁকে কোঠা বালাখানা ভুলতে যে কি অসম্ভব পরিভ্রম করতে হয় তা কুলতোষী জানে। ঠাকুরা বললেন—তাঁর মনের আশা

সকল হবেন। মাথা ঠান্ডার মত হুঁখানা ঘর কোনমতে ভুলতে-না-ভুলতে পরমাণু তাঁর শেষ হয়ে এলো। ঠাকুরমাকে বললেন, অন্ততকে লেখাপড়া শিখিও ভাল করে—যা টাকা ইলক ওয়েই কোনমতে হয়ে বাবে। ভাল চাকরি একটা নিতে পারবে যদি কোঠা-বালাখানা সব উঠবে—আমিও ধর্ম থেকে বেঁচে পুঁথী হব। আর নারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিও বাড়ীতে। তাঁর নিতাপুত্রার মন্ত্র একটি কুলবাগান দিও সামনে। বাসে পেন্সিল দিয়ে ছক কেটে রেখেছি একটা—বাড়ীটা সেইমত যেন হয়।

বাবা লেখাপড়া শিখে বিলম্ব গিয়েছিলেন—সেখান থেকে ব্যাকটিকারি পাগ করে ফিরে এসে ঠাকুরমার পত্র সাক্ষ্য করেছিলেন। এই বাড়ী বাগান যা কিছু দেখছেন সমস্তই সেই প্রান অস্থায়ী হয়েছে।

মেঘ জোড়ামণার বললেন, আশনার বাড়ীতে কোন বিগ্রহ দেখলার না তো?

হংসের মিত্র হেসে বললেন, গল্পের আসল কাহিনীটা হাত দিয়েছেন—, সেই কথাই বলব এবার। বাবা শিশুভক্ত সন্তান ছিলেন, কিন্তু মনেপ্রাণে যা সত্য বলে বিশ্বাস করতেন—তা থেকে এক কুলও মচতেন না। তাঁর বালাকালে মর্হি সেবেপ্রাণ, কেশব দেন প্রকৃতি শিক্ষিত মাংসেরা যে আশোলাল সৃষ্টি করেছিলেন ধর্মের ক্ষেত্রে—সেইটাই বাবার কাছে পরম সত্য বলে মনে হয়েছিল। এর উপর বিলম্ব থেকে ফিরে এসে সে দেশের সঙ্গে ভুলনা করে এসেদের অশিক্ষিত মাংসের ক্ষুধা ও হুংকার তাঁকে ধর্মের পীড়া দিয়েছিল। তাঁর মনে বহুদূর ধারণা করেছিল—এ সমস্তই ধর্মের গোঁড়ারি। যে পুণ্ডরী কসচাচী, শাস্ত্রজ্ঞানপুত্র, সাংসারিক কর্তব্যে উদ্যোগী—তাঁদের কাছে মাথা নোয়াতে চাননি উনি। ঠাকুরমাকে বলেছিলেন, বাবার সব ইচ্ছা পূর্ণ করব—তুই হুংকারের বীজ বুনব না ভিটেয়। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করব না।

ঠাকুরবা অনেক কাগলেন—অল্পপ্রাণ করলেন—বাবা রইলেন অটল। একে একে সবই গড়ে উঠল—সবর অম্বর হুঁটি মেল, বাড়ীর শিহনে ছোট পুত্র, ফলের বাগান—সামনে ফুলের বাগান—তুই বেবেতা প্রতিষ্ঠিত হলেন না।

ঠাকুরমা বললেন, ভাল করলি, অস্ত। বড়ের বীজ কোন সময়ে কেনন করে ভিটের পড়ে—চারি গাছ একটু একটু করে বড় হয় কি করে—কেউ জানে না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তোরা হবে থাক—তোদের বাৎসরিক হোক, সমস্ত আপদ বাল্যই নিয়ে আমি যেন বেঁচে পারি।

বাবা শিখার মূল্যকে সব চেয়ে বড় মনে করতেন।

আমাদের ক'তাইকে এই পৰ্বই নিয়ে বাবার ডেটা করে-
ছিলেন। আমরা কেউ ইতিমধ্যে, কেউ ভাতার, কেউ
প্রকলার—কেউ-বা বিক্রম-ম্যান। এইসবকে যদি শিক্ষা
বলে করেন—তাহলে আমরা শিক্ষিতই, কিন্তু—

চাঁপ চূপ করলেন হৃৎসের মিত্র।

যেহ চোঠামশাই বললেন, এ ছাড়া শিক্ষার স্ট্যাণ্ডার্ড-ই
যা কি ?

হৃৎসের অহ হেসে বললেন, কি জানি, সকলে যা বলেন
তাই হয়তো ঠিক। যখন যখন কম ছিল এর বেশী ভাবতেও
পারতাম না। আশ অত্যাচলে পৌছে ভাবি—চুপরের স্বর্গ
সব চেয়ে উজ্জ্বল হলও—আপনাকে সেবার বাধা ওঠই যথো।
অনেক চাওরা—অনেক শাওরা কেমন যেন ছায়াবাকি বলে
মনে হয়। তবু এই ফুলবাগানে এসে মনে তারি তৃপ্তি
পাই।

একটু থেবে বললেন, সেবার মত ফুলবাগান করতে
বলেছিলেন ঠাকুরদা, বাবা সেবতা প্রতিষ্ঠা করেননি, তবু
কখন যেন সেবতা এসে আসন পেতে বলে আছেন। সে-
সেবতা বাতিপুলের সেবতা নয়, তাঁকে চোখ সেবা যায় না,
হাত দিয়ে চোঁরা যায় না অথচ মনের সঙ্গে তাঁকে এক করে
নিতে বাধ্য পাই না।

যেহ চোঠামশায়ের মুখখানা গভীর হয়ে উঠল। বললেন,
আপনাতা কি আত্মহীনিক ভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ?

—যেটেই না। যেবে ঠাকুর—কেশব সেন বাবার মনকে
নাড়া দিলেন—নোষাতে পারেন বি। উনি মাত্রে মাত্রে
বলতেন, খোলস কোনটাই ভাল নয়—বীথন তো! সেকালের
ঐ-বিভাবের মত বাবার মনোভাব ছিল। বাড়ীতে
সত্যনারায়ণের শিখনি হয়েচে—রেকাবী করে আমরা কলমুল
নিয়ে গেছি, খেকেছনও, কিন্তু সে প্রসঙ্গ মাঝে ঠেঁকিয়ে
ডক্তি-গঙ্গদ হননি। ব্রাহ্মমন্দিরে বক্তৃতা শুনেচে যেতেন
প্রায়ই—চক্ষু বুজে উপাসনা করেননি কোনদিন। বলতেন,
চক্ষু বুজলে শুধু অন্ধকার দেখি—এই আমার মত যোগ।
ধারা আলোয় সন্ধান পান—ঊঁরা সবত মধু ব্যক্তি।

—আপনি ঠাকুর-সেবতা মানে? চোঠামশাই প্রশ্ন
করলেন।

আমি? জানি বইকি। যে মনের ঘোরে বাবা ওদব
মতায় করে নিয়েছিলেন—সে মন আমি পাইনি। ছেলে-
বেলায় ঠাকুরমার ন্যাওটা ছিলাম—ঊঁর প্রভাব অসীকার
করি না। আপনাতা তখন আতর্ষি ছেবেন—কন কলমে পণ্ডি,
বাবার অম্বায়ে একটা পোণাল-মুষ্টি এসে আলমারির মধ্যে

মুকিয়ে রেখেছিলেন। বাবা মাতা ওঁহায় পর সেই মূষ্টি
প্রতিষ্ঠা করেছেন না।

তাহলে এখন আপনাতা পুরোপুরি হিন্দু। চোঠামশায়ের
মুখখানা স্বাভাবিক হয়ে উঠলো।

হ্যাঁ—না হলে আপনার সঙ্গে সখ্য পাতাবার সাধন হয়
কখনো? বলে উঠেচ-বরে হেসে উঠলেন। হাপতে হাসতেই
বললেন, ঠাকুর-সেবতার পুরো আর অচোর নিয়ম পালন
যদি হিন্দুদের পরিচয় হয় তাহলে আমরা হিন্দু বইকি।
কিন্তু আত্মকালকার দিনে এ নিয়ে কারট-বা মাথাব্যথা!
আমেন তো—ধর্মের 'ডেক্লিনেশন' বললে গেছে 'আত্মকাল'।
সেবতার অলঙ্কা মহিমা নিয়ে দূরে সরে থাকতে পারেন না
আর, মাতৃমের সঙ্গেই তাঁদের মাথামাখিতা বেই।

মাতৃমের সঙ্গে মাথামাখি!

নয়? মাতৃমের মধ্যেই তো তাঁর প্রকাশ। নবিত্র-
নারায়ণ, তুখা-নারায়ণ, সর্গকৃত নারায়ণ— বলে পুনরায়
উচ্ছ্বাস করে উঠলেন।

চোঠামশায়ও সে হাসিতে বেগ দিলেন। বলা বাহুল্য,
ইতিমধ্যে উনিও আত্ম হইছিলেন। ধর্ম নিয়ে মাথোব্যথা
ঊঁরও নাই—আমাদের মত নবা ছেলেরের তো নাই-ই।
তবু হিন্দুদের নেপা আমাদের জাতিমের অভিমানে সঙ্গে
অস্বাধীভাবে জড়িত। এখানে প্রথম বিভাগে স্থান পাওঁয়ার
মত নর না গেলে যোগ্যতার হানি হয় যেন।

বিবাহের কথাবার্তা একরকম দ্বিগ হয়ে গেল।

পরে এসে চোঠামশাই নিজের মনেই আশ্চর্য প্রকাশ
করলেন, প্রথমে ভেবেছিলেন মাঝিকের ঘর, কিন্তু গোপাল বিগ্রহ
আছে, আর তাঁর ওপর ভক্তি বেশ ভর কেটে গেল। যেটেটি
হলকণা ভারি। এ সখ্য ডোং গেলে সত্যিই কই হতো।

*

কথাকালে আমার চ্যাটুত ভাই অননীর সঙ্গে
হৃৎসের মিত্রের কনিষ্ঠা কস্তা নীলিমায় মত পরিণয় হয়ে
গেল। এই সখ্যপুত্র পরে হৃৎসের মিত্রের ফুলবাগানে
সিঁরে বদবার সৌভাগ্য আমার আরও কয়েকবার ঘটেছিল।
আতর্ষের বিষয়, অলঙ্কাপ্রসারিত ঘটনার হয়ে ওঁলের
বনিম্বাধী বাণের দ্বীতিনীতির সঙ্গে এই ফুলবাগানের অস্বাধী
বন্ধনটা স্পষ্ট হয়ে উঠল জনন:।...সেই কথাটিই জানিয়ে
প্রসঙ্গটা শেষ করব।

মিত্রের ছ'বছর বলে সেদিন মিত্রবাড়ীতে থাই—সেদিনও
ছিল ঐমের অপরাহু। বলা বাহুল্য, সেদিনও আমরা—আমেন,

আমি আর হোসেনর মিত্র ফুলবাগানে পাথরের বেড়িতে বসে আলোচ্য করছিলাম।

বাগানের চারদিকে চেয়ে চেয়ে মনে হাজিছিল—হৃৎকর অগোচর সেই ভাবগতি যেন এ নয়। অবশ্য গোলাপ বেলা রজনীগন্ধার কোথারী, কামিনী আর হাজি হানার ভালো কুঁড়ির সমাবেশ, মক টগর গছতালের মাথার অস্ত্রদূর্বের লাল আভা, লাল হলুদ এবং হলুদ-লাল শেখানো সজ্জামণির জ্বলন্ত নমন হাওয়ার আলপনা সবই অটুট রয়েছে, অবশ্য কোথায় যেন কিসের অভাব। হৃৎকর বীতিমত হৃৎকর হয়েছে আর ফুলগাছের কোমলকণ্ঠে কিছু মাগাছা মাথা তুলেছে, পথের ধুলোয় গাছের পাতাগুলিও বিবর্ণ...

হোসেনর মিত্র আমার মনের কথাটি যেন জেনে কেলেন। একটা বর্মী-চুটী ধরিয়ে কলসেন, বাগান কেবলু তে, কিন্তু এর পরমাণু আর বৈদ্যুনি নয়।

সন্ধ্যায় চাইলাম ঠর গলে।

বললেন হেসে, অচিরের দিনটার কোন কাঁড়টা মাগুনের সব চেয়ে সাংঘাতিক হল তো? বলবে, জীবনধারণ সমস্যাটা। সেটাও সব ক্ষেত্রে মারাত্মক নয়। যে যেমন নাগুণ—সে তেমন করেই বাচতে চাইছে, বাচছেও। কিন্তু ইকনমিক ক্রাইসিসটা মাগুণ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। সাংঘাতিক কাঁড় নয় এটা? হাজার শান্তি-স্বস্তি—কথট মাদুলি পাতল করেও এর থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না।

হুতলাব না।

তাহলে গল্পই বসি। বুড়োরা গল্প করতে ভালবাসে জান তো? অবশ্য শোনার মত সময় আর বৈধ যদি থাকে—না-না, বনুন। যখনই সময় আছে আবার।

গল্প এমন কিছু নয়—আশুজীবনের ভাবের-কাটা শুধু। আমার ভাইয়েরা গিলী বোঝাই কলকাতা করে করে জীবনটা শেষ করে আনলে—তারের কথা তত ভাবি না। তারাও ভাবেন। এই শহরের গন্ধভিটের কথা। তাদের ছেলেমেয়েরাও কিনাদের জলাধারায় মাগুণ—রীতিমত চালাচলে হালের ক্যাশন-দুবত, তারাও ভাবেন। কোথায় ভিটে আগলে পড়ে আছেন তাদের সেকেনে এক কোঠামনাই—কি ভাবে কাটছে জীব জীবন! ওরা জানে, দুঃস্বপ্নে একমুদ্র আত্মীয় আছেন—এই পণ্ডিত। ক্রিয়াকর্মী সন্ধ্যা হলো তো দু-একদিনের জন্য এক জায়গায় এসে থিলাল, না হ'ল ন'বাসে-হ'বাসে—কখনও বা প্রয়োজনে মাঝে মাঝে একখানি পড়ে আত্মীয়তা বন্ধনটা বীকার করে থাকে। আজ বিশ্বমানবতা নিয়ে আমরা যখন মগল—তখন বিশেষ করে ছোট্ট একটা গটকে বাধা-

মমতার মণ্ডলা দিয়ে মমবৃত্ত করার চোঁটা হাতকর নয় কি? দুঃখ সেকলও নয়, কিন্তু ছেলেরা-মেয়েরা—মাঝা কাছ রবেছে, বাসের শিক্ষা দিতে কার্পণ্য করিনি, বেকার হবার ভয়টাও থাকলে কম, তাদের মতিগতি এই বাধাটা কেন যে কাটিয়ে উঠতে পারছে না—ভাবতে পার কি? ওই ইকনমিক ক্রাইসিসের ভূত ওদের বাঁধেও চেপে বসেছে। যে আয়ে লাসার সম্মানে চলে, তার চেয়েও বেশী টাকা ওরা চায়—ওদের এমন বণিক-মনোভিত্তি হল কেন বাবা?

চেয়ে বইলাম ঠর কুহ মূখের পানে।

চুকটটা কখন নিজে গিয়েছিল—খানিকটা ছাই করে পড়ল হাতের নাতা শেষে। সেটা পুনরায় ধরিয়ে—সেঁ।রা ছেড়ে বললেন, আসলে খুঁটাটা এই ধরনের। মাগুনের স্তম্ভ ধরনের অভিন্নতা আছে—অবশ্য বহুতরককে নষ্ট করছে নির্বিকার্যে। এ হল অশকর। কর্ণের নাথ্যে এরাই পুজার আসন জুড়ে বসেছে আজ—যম আটকে আসছে মাগুনের। এমন করে কি বাঁচে নাগুণ—তার বুদ্ধভিত্তিকে নষ্ট করে শুধু অর্থসংগ্রহের স্বপ্ন হয়ে? এমন সময় চা জলবাধার নিয়ে এলো ঠর মেজ মেয়ে। কুহের আক্ষেপান্তিতে হাঁপিয়ে উঠেছিল—বস্তির নিঃশাস কেনে বাঁচলো।

সেদিন ফুলবাগানটা দুঃখিতর তার নিয়ে চেপে বসেছিল যেন—সে তার বহুতর পর্বত নাতা দিয়েছিল।

•

মীলিমা-বৌদি এতদিন বললেন, ঠাকুরপো, একবার বাবার কাছে যেতে পারবেন? কাল রবিবার—

ফলায়, তার স্তম্ভ এত অগ্রহর কেন বৌদি, আশান্বয়ের বাড়ী বেতে আবার ভালই লাগে—ঐ ফুলবাগানটির দ্বন্দ্ব।

নিঃশাস কেনে বললেন বৌদি, সকলকারই ভাল লাগে, কিন্তু ঠাকুরপো—সে বাগান ব্রি আর থাকে না।

কেন?

কলকাতার একটা বড় ব্যাংক ~~মালিক~~ শহরে ব্রাক বুলেতে চায়। আমাদের বেশে ওই ব্যাংকটির অগ্রের গল্প। ওরা নিষেধ করতে বিধি: কুহের—জানকি কেনে বোটা টাকা। কাকামিরি, দাদারা সবাই ব্রাকী হয়েছেন। একটা বোটা ইন্কাম তো?

আশান্বয় বাবা?

বাবারই অমত শুধু। দাদারা সবাই একঝোঁট হয়েছেন—আমাকেও চিঠি দিয়েছেন বাতে বৃত্তিরে বসি ব্যাংকে। আশনি কি বলেন ঠাকুরপো, এটা ভাল নয়? স্বেয়োগ যখন

আসছে—সেটা ত্যাগ করা ঠিক নয়। সেই কথাই গুছিয়ে লিখে দেব চিঠিতে। কল ধাবেন তো?

বদাম, একটা কথা বলব বৌদি—কিছু মনে করবেন না তো? আপনার ভ্রাতৃস্বের অবস্থা তো তেমন নয় যে, বোটা আর না হলে চলবে না। ওরা দবাই ভাল চাক্রে, ঠোঁটের ইচ্ছামত আছে—

বাধা দিয়ে নীলিমা-বৌদি বললেন, উপরটা সব জিনিসেরই চক্কে মনে হয় ঠাকুরপো, কিন্তু বড়বাজার পরচও তো কম নয়—চালচলন, দোকান-দোকানিতা কিছুই খাটো করার ক্ষেত্র নেই। বাবা কিন্তু এতদূর বোঝেন না।

একটি নিখাল ছেলে বললেন, কাকারা চিরকাল বিনেপে—সেপের জমিদারীর আদ্য উত্তরা নেননি, প্রত্যাখ্যান করেন না। খুড়তুত ডাইরাও যে বার কর্মক্ষেত্রে—ভ্রমের পর্বত বেপের মাটি মাড়াননি—একা বাবা ভোগ করেছেন সম্পত্তি আর গায় আদায় সব সামলেছেন। এগিকে জমিদারি শেষ হয়ে আসছে—একটা বাধা আর না হলে—বুকেই তো পারছেন বিশদটা।

পদ্ম নিয়ে পরের দিনই রওনা হলো।

বৈঠকখানা ঘরে বসিয়ে বাজীর একটি ছেলে অভ্যর্থনা করলে। বলল, বাবা মনুষ্য—ওপর থেকে নামতে পারেন না। পরের পাঠিয়েছি।

খানিকক্ষণ পরে ভেক পাঠালেন হুসেবর মিত্র। উপরে উঠে গেছি প্রথম একটি ঘরে আরাম-কোয়ার্ডের অত্যন্ত স্নান ভবীতে শুয়ে যাচ্ছেন। দু'চোখ বোজা—সান্নাৎ একটা ছোট টুলে একটা তপাল গড়গড়া বগানো, লডানো নলটা হাতে ধরা রয়েছে, কণ্ঠ থেকে অন্ন অন্ন খোঁচা উঠছে—স্বাভাবিক তামাকের গন্ধে ঘরটা ভরপুর। বন্ধি দিকের বড় জানালা হুটো বন্ধ।

বাবা!—দুইকটির ভাকে চোখ মেলে চাইলেন। সোজা হয়ে বসে বললেন, এসো বাবা—বোসো। পরীক্ষিতিক হুশাল তো? অবিশ্যি নীলু বেরাই বেঘান সব ভাল আছেছেন?

হ্যাঁ। একখানা চিঠি দিয়েছেন বৌদি।

চিঠিটা হাত বাড়িয়ে নিলেন। ছেলেকে বললেন, মনি, চাটটা নিচ্ছে তো?

চা বেয়েছি। আপনি পদ্ম পড়ুন, উত্তর নিয়ে আমি ধাব।

উত্তর নিয়ে ধাবে? হুব-ভুকুরি ব্যাখার বুঝি? ব'লে হাসলেন। নীলুর ওই বড়ো চিরকাল—সামান্য কথাটুকু ওর কাছে ভীষণ জরুরি। আচ্ছা যেথি—কি ব্যাখার? মনি, আবার চললো?

উনি পদ্ম পড়তে লাগলেন—ব'লে-ব'লে। ঘরের সন্ধ্যা দেখতে লাগলো আমি। একসময়ে মনিকে চুপি চুপি বললো আচ্ছা, বন্ধি দিকের বড় জানালা হুটো কেন খুলে নেননি?

মনি ভাড়াবাড়ি উঠে তর্জনী ঠেকিয়ে আমাকে নিষেধ করলে ওই প্রশ্নর তুলতে। এই সময়ে পরশপাঠ শেষ করে মূখ তুললেন হুসেবর মিত্র। মনির ইচ্ছিতটা সম্ভবত প্রে চোখে পড়ছিল, নতুবা কেন বললেন, জানালা হুটো খুলে সাও তো, মনি।

মনি জানালা খুলতেই গোপালির সিঁদু অলোহ বাইরেটা অপরূপ হয়ে দাঁড়াল।—মিত্র ফুলের গন্ধে ভরে গেছে ঘর।

হুসেবর নিয়ে বললেন, বাও বাবা, ওই জানালায় ধারে উঠে গিয়ে একবার ভাল করে দেখে নাও চারিদিক—তোমার চিঠির উত্তর আমি লিখে রাখছি। দেখা হলে, জানালা হুটো বন্ধ করে দিও, মনি।

আমরা জানালার ধারে গিয়ে পাড়ালো—উনি বলল ফুলে নিলেন না, তুলে নিলেন গড়গড়ার নল।

জানালা দিয়ে আকাশ দেখলো—অপরূপ। বাগান দেখলো, কিন্তু যা দেখলো তা বর্ণনা করা শক্ত। রাস্তার দিকে উঠে করে কারাগারটির তিনের বেড়া থিয়ে থোকা হয়েছে বাগানদিকে—সেইদিক পূর্ব দিয়ে আসার সময় তা নম্রের পড়নি। ভিত্তির পড়েছে রাশি রাশি ইট। সন্ধ্যানি রজনীগন্ধা বেলা গোলাপ—এমন কি রইনি কচুপাতার কাঁচ কিছুই দেখা যায় না। অশ্রুকাণ্ড বড় ফুলগাছগুলি—যেমন কামিনী টগুর করবী গছরাও প্রকৃতি ইটের সনানিকক্ষে গলা বার করে আকাশপানে তাকিয়ে আছে। তাদেরই পাখা-মুখে মুঠোছে কিছু ফুল—তারই গন্ধ শেষ নিঃশ্বাসের মত ঘরের মধ্যে পৌছে গেল। বৈঠকখানা ঘরো এগিকে।

পাশে ঝড়িয়ে ছিল মনি—ওকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, অই ইট কেন?

মনি সিস্কিস্ক করে বলল, সেটা সন্ধ্যাই দেখাশুড়া শেষ হয়ে গেছে ব্যাবের সঙ্গে—, বিক্তি: মেটিরিয়াস্ ওয়াই কেলোছে।

জানালাটা বন্ধ করে দিলে মনি, গিরে এসে বসলো চোয়রে। হুসেবর তখনও আপন মনে গড়গড়া টেনে চলেছেন।

বেশ খানিকক্ষণ ধরে গড়গড়া টেনে—ইচ্ছিতখাবের সাজসেজ উপর নলটা নামিয়ে বেখে আমার পাশে চেয়ে অন্ন হলে বললেন, আশা করি—চিঠির জবাবটা তুমিই লিখে পারবে নীলুকে।

বাংলালীর নাম ও উপাধি

ঐহুপেত্রচন্দ্র লাহিড়ী

সংস্কৃতের মংসের নামের দুইটি ভাগ থাকে—বাস ও অধা। অধা ভাগের মধ্যে প্রধানতঃ মংসের সাংস্কৃতিক পরিচয় থাকে। যেমন—নামের আদিতে ম্যাধু বা ভন শব্দ ইষ্টপদের, মংসম ইষ্টমংসপদের, আর রান শিব ইষ্ট প্রভৃতি হিন্দুদের পতিভাষ্য। আর অস্থানাম মংসের স্থান, বাণ, কৃষ্ণি, বাসস্থান এবং অন্তঃস্থ বিষয়ের পরিচয় বহন করে। ম্যাধু আনন্দ বা রান বহু বলিতে আমরা আনন্দ-পরিবারতুল্য ম্যাধু নামক ব্যক্তিকে, অথবা বহু-পরিবারতুল্য রান নামক ব্যক্তিকে বুঝি। সেজন্য অস্থানাম, বাহ্যকে আমরা বলি—নাম-উপাধি। তাহার মধ্যে মংসের কৌশলিক এবং অন্তঃস্থ বহু কথা লুকাইয়া আছে। বাংলালীর নাম-উপাধি সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

বাংলালীর প্রচলিত নাম-উপাধিগুলি কতগুলি বিশিষ্ট শ্রেণিতে ভাগ করা যায়; যেমন :

১। টেটম-বাচক :—পৃথিবীর বহু জাতির মধ্যেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই এক একটি চিহ্ন বা লঙ্ঘন দ্বারা নিজের পরিচয় দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। এইসব চিহ্নগুলি প্রাচীর হয় জীবজন্তু, বৃক্ষলতা বা কলদুল। এইসব চিহ্ন অতি এসকল পরিচয়-কল্পকে গভীর প্রভা করে,—তাহারা জীবজন্তু হইলে তাহা বহু করে না; বৃক্ষলতা হইলে, কাটে না; কলদুল হইলে, তাহা ধরে না। এইসব চিহ্নকে টেটম (loem) বলে। বাংলালীর ব্যবহৃত বহু নাম-উপাধিই যে টেটম হইতে উদ্ভূত তাহাতে সন্দেহ নাই। যথা—বাগ (বাঘ), হাতী, সিংহ, কুর্মা (কূর্ম), গজ, ডালুক, বেড়া ও বও প্রভৃতি পশু-বাচক উপাধি, হাল প্রভৃতি পক্ষী-বাচক উপাধি, চ্যাং, চেংগি, টাকি, ট্যাংগা প্রভৃতি বংশ-বাচক উপাধি উল্লেখ করা বাইতে পারে। মেদিনীপুর জেলার সেলস রিপোর্টে (১২৫১) বাহির ও অন্তঃস্থ বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত জীবজন্তু ও ভবিষ্যৎজাতি হইতে পৃথীত বহু টেটম-বাচক উপাধির উল্লেখ করা হইয়াছে; যথা—কলা, আনু, নুলা, বেগুন, লাউ, গুড়, বাঘ, হাতী, গজ, মহিষ, বেড়ী, বোয়াল, কই, ঘোড়াই (ঘোড়া) ইত্যাদি। অনেকের মতে হিন্দুদের পৌরোহিত্য-গুলিও টেটম-সম্বৃত; যেমন—ভরবাঘ (পক্ষী), পায়াল

(পায়রা), কাম্প (কঙ্কণ), বাস্ত্র (বাচুর), কৌশিক (পৈঙ্গা), মৈত্রেয় (বাড়), পাণ্ডিত্য (বাড়) ইত্যাদি।

২। কৃষ্ণি-বাচক :—নাম-উপাধির মধ্যে কৃষ্ণির উল্লেখ বহু প্রদেশেই প্রচলিত আছে; যথা—মিস্ত্রী, ইহিনিয়ার ইত্যাদি। বাংলায় প্রচলিত নিম্নলিখিত নাম-উপাধিগুলিও কৃষ্ণি-বাচক—তালুকদার, লম্বুর, ওজাগর, কবিরাম, কাহনগো, গোমকা, মেধিক, তত্ত্বাবহ, বাহিন্দর, বাজই, গোলদ্বার, টিনডেল, ঘটক, উকিল, দালাল ইত্যাদি। যে-কোনও শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বহন-হাভন কৃষ্ণি গ্রহণ করিলে ভট্টাচার্য অথবা চক্রবর্তী উপাধি গ্রহণ করিতেন। সেজন্য এই দুইটি উপাধিও বহুক্ষেত্রে কৃষ্ণি-বাচক। আধুনিক কালে অনেক পৌরোহিত্য কৃষ্ণি-বাচক এই দুইটি উপাধি ভ্রাপ করিয়া চাটার্জী, ভাড়াঙ্গী, মৈত্র প্রভৃতি সাধারণ উপাধি গ্রহণ করিতেছেন।

৩। বাসস্থান-বাচক :—নামের মধ্যে গ্রাম বা বাসস্থানের উল্লেখ ভারতের বহু প্রদেশেই দেখা যায়। বঙ্গিল ভারতে অনেক ক্ষেত্রেই নামের আভ্যন্তরে বাসস্থানের উল্লেখ করা হয়; যেমন—চাঁদুক প্রকাশ (টি প্রকাশ) অস্ত্রের প্রাচীন প্রধানমন্ত্রী), চিত্তর (বাগী) শব্দগুণ নাম্বার (স্রার), সর্বগলী (বাগী) রাধাকলন, ইত্যাদি। বাংলায় কিন্তু বহু-ক্ষেত্রে অন্ত্যনাম বা উপাধিটি গ্রাম বা বাসস্থান-বাচক; যথা—চন্দ্রি (চন্দ্রাহাতি গ্রামবাগী), ভট্টাচার্য (গ্রাম), বাসচন্দ্র (মাগচন্দ্র গ্রামবাগী), করতাই (করতা গ্রামবাগী)। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত বহু উপাধিই বাসস্থান-বাচক; যেমন—ভাড়াঙ্গী (ভাড়াঙ্গিরা পরগনা), লাহিড়ী (লাহেড়িরা পরগনা), সাগর (সীতোর ?), ইত্যাদি। রাষ্ট্রী ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত বহু উপাধিও সম্ভবতঃ বাসস্থানমূলক; যথা—বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় নামক স্থানের উপাধ্যায়-ওকা, বাহা হইতে সংক্ষেপে বাহুবে নামের স্রষ্ট হইয়াছে। এইরূপ চট্ট বা চাট্টি নামক স্থানের উপাধ্যায়-ওকা—সাঁটুবা, মুখটি নামক স্থানের ওকা—মুখো, ইত্যাদি। কুলীন ব্রাহ্মণদের বহু উপাধিই গ্রাম বা বাসস্থানের নামাঙ্কন হইয়াছিল।

৪। পণ্ডিত্য-বাচক :—যেমন—ভোগদা, কৃষি, দাল (ময়), শীতলা, চাকবা ইত্যাদি।

৫। বিদ্যা বা প্রণাস-বাচক—চতুর্ভূজী, ত্রিবেণী, চতুর্ভূজা, সার্বভৌম, শিবোত্তম ইত্যাদি।

ভাষাগতভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, বাঙালীর নাম-উপাধির অনেকগুলি সংস্কৃত; যেমন—উদ্ভা, আচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র, বহু, মিশ্র, ব্রহ্ম, দত্ত, দেব, দাস, পাল, নাথ, নন্দী ইত্যাদি। কতকগুলি সংস্কৃতমূলক; যেমন—চাকমা (চক), তামলী (ভাঙ্গলিক), নাইয়া (নাবিক), রায় বা রাও (রাজা), চৌধুরী (চতুর্ধারী), রত্নিত (রাজপুত), সাহা বা সাউ (সাহু), হুহু (হুও), দলুই (দলপতি)। আবার কতকগুলি মূলতঃ আর্যবী ও ভারতীয় হইতে আসিয়াছে; যেমন—আইন, খা, ভোগদার, লঙ্ঘর, মজুমদার, শঙ্কর, সরকার, হুগী, বন্দী ইত্যাদি। ঐতিহাসিক বিচারে এগুলি বাংলার মুসলমান রাজবং এবং আর্যবী ও ভারতীয় প্রজাবংসের দ্বারক। পঠান রাজবংশে পঠান নবাবদের হিন্দু সেনানায়কগণকে খা উপাধি দেওয়া হইত। তাহা হইতে খা চ্যাট্টাখী, খা ভাট্টা প্রভৃতি উপাধির স্রষ্ট হইয়াছিল। বর্তমানে তাহাদের অন্ত্যভাগ লোপ পাইয়া খা উপাধিতে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু ভাষাগতভাবে বাঙালীর বিশেষতঃ প্রচলিত নিরাকৃতনামের বহু উপাধিরই মূল অর্থ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বর্তমান নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে স্থির হইয়াছে যে, বাংলার আদিম অধিবাসীরা ছিল আদি অস্ট্রেলীয় নরগণের অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের ভাষা ছিল এক অমুনাদুল ভাষাধাত্মিক, যাহাকে ভাষাতত্ত্ববিদেরা নাম দিয়াছেন অস্ট্রিক ভাষা। ইহা সম্ভব যে বাংলার এইসব আদিম অধিবাসীরা ক্রমে আর্ব-সংস্কৃতির প্রভাবে আসিয়া সংস্কৃতমূলক আত্মনাম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের টটেম-বাচক অনার্ব অন্যান্য বস্তু রাখিয়াছে। খর্ব ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে এইরূপে মানুষের আত্মনাম ত্যাগ করিয়া কৌলিক অন্যান্য বস্তু রাখিবার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ইউরোপীয় জাতির ঐষ্ট্রীয় প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে জন, ম্যাথু প্রভৃতি একটি করিয়া ঐষ্ট্রীয় আত্মনাম (Christian name) গ্রহণ করিয়াছে। আশ্বাসের দেশেও বহু হিন্দু ঐষ্ট্রীয় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বাইবেল, জন, ডেভিড প্রভৃতি ঐষ্ট্রীয় আত্মনাম গ্রহণ করিয়াও দত্ত, বানার্জী প্রভৃতি কৌলিক নাম-উপাধি বস্তু রাখিবার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এই প্রক্রিয়া এখনও চলিতেছে। আসামের উপজাতিরা হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাবে আসিয়া সংস্কৃতমূলক আত্মনাম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু কৌলিক অন্যান্য বস্তু রাখিয়াছে। যেমন—গাভো-জাতীয় লোকদের নাম গজল সাংমা, নবীন ডানু, বিনোদ বাবাক, ইত্যাদি। ঐষ্ট্রীয় গ্রহণ করিলে তাহারা সংস্কৃতমূলক আত্মনাম ত্যাগ করিয়া ঐষ্ট্রীয় আত্মনাম (ইংরাজী সংস্করণ) গ্রহণ করে, কিন্তু কৌলিক অন্যান্য ত্যাগ করে না;

যেমন—ডেভিড সাংমা। বাঙালী চিত্রকরের অন্যান্যদের মধ্যে আর্বপূর্ণ ভাষাগুলির অনেক দশ বৎসকতঃ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে গবেষণা হইলে বাংলার প্রাক-আর্ব ভাষা ও সংস্কৃতির অনেক তথ্য বাহির হইয়া পড়িবে।

এ বিষয়ে আর একটি বিষয় লক্ষ্যীয়। প্রাচীন কালে নামের মধ্যে নাম-উপাধির কোনও পৃথক দেওয়া হইত না—হত সমাজের উচ্চতরে এসব উপাধির প্রচলনই ছিল না। শুধু সাহিত্যে নয়, সলিম-দস্তাবেজও নাম-উপাধির উল্লেখ অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। প্রাচীন কাব্য, নাটক, তাম্রাশাসন ও পট্টালীগুলিতে উল্লিখিত বহু নামই উপাধি-বিহীন। এ বিষয়ে আরও লক্ষ্যীয় যে, অধুনা প্রচলিত সংস্কৃতমূলক প্রায় সব-কটি উপাধি এককালে নামেরই অংশ ছিল। মহারাজ ভোগবর্ধন-প্রদত্ত শিখানপুর শিল্পিত প্রায় দুইশত ব্রাহ্মণের নাম আছে (ঐষ্ট্রীয় শৃঙ্গম শতাব্দী)—ইহার কতকগুলি নাম পরীক্ষা করিলেই এই কথা প্রমাণিত হইবে; যথা—বিকৃষেয়, জ্বিহাস, অর্বসত্ত, শাস্ত্র, বিকৃ পাতিত, গাছী দাস, বজ্জুও (হুহু), ইত্যাদি। এইরূপ অর্জিত, শরণাল, ভজনশী, ফেনবত্ত, মণিভট্ট, স্তম্ভপ্র ইত্যাদি প্রাচীন নামেরও উল্লেখ করা যাউতে পারে। এইসব নামের অন্ত্যভাগ প্রথমে নামেরই অংশ ছিল। কালক্রমে অন্ত্যভাগ বিচ্ছিন্ন হইয়া মিশ্র, ভট্ট, দাস, পাল, দাস, নন্দী, দত্ত, উদ্ভা, পণ্ডিত, দেব প্রভৃতি উপাধিতে পরিণত হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রথমে শিতার সঙ্গে পুত্রের নামশাস্ত্র বস্তু রাখিবার ভগ্ন শিতার নামের অন্ত্যভাগ পুত্রের নামের আধিক্যের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইত; যেমন—অর্জিতের ছেলের নাম হইল ভূজিমিত্র; ভূজিমিত্রের ছেলের নাম হইল ভূজিমিত্র। এইভাবে দুই-এক পুত্রই চলিবার পর নিম্ন কণাটি নাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই পরিবারের কৌলিক উপাধিতে পরিণত হইল। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মণিও উপরের তালিকার উপাধিগুলি প্রাচীনতঃ ব্রাহ্মণের নাম হইতেই লওয়া হইয়াছে, তবুও পরবর্তীকালে বাংলায় এগুলি শুধু ব্রাহ্ম, বৈদ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণের বর্ধনমূহের নাম-উপাধি রূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু পশ্চিম ভারতের নাগর ব্রাহ্মণের মধ্যে এখনও উল্লিখিত নাম-উপাধিগুলির প্রচলন আছে। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণেরা অল্প জাত হইতে তাহাদের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বস্তু রাখিবার ভগ্ন কোনও নাম-উপাধি ব্যবহার না করিয়া ‘পর্দা’ এই সাধারণ উপাধি গ্রহণ করিতেন। আরও কিম্বা-কর্মের সময় ব্রাহ্মণেরা উপাধির উল্লেখ না করিয়া ‘অন্যুৎসেবর্ধা’ এইভাবে নামোচ্চারণ করেন।

শুধু প্রাচীনকালে কেন, প্রায় বেঙ্গল বংশের পূর্ব ইন্ডিয়ান রাজবংশের প্রথম ভাগেও বাংলায় নাম-উপাধিকে কোনও

ওকস কেহো হইত না। জা: হুরেখনাথ সেন কিছুদিন পূর্বে ১৭২০ সালের কতকগুলি মলিন-পত্রেরের হইতে কয়েকটি নাম কুছিয়া সেখাট্যাহিসেন—বাঙ্গালীরা তখন বৈষ্ণবনাথ, বখা:মাহেন, পকানন, চন্দ্রনাথন ইত্যাদি নামের পুরোভাগই সহি করিয়াছেন, উপাধির উল্লেখ করেন নাই। আজকাল কেহ উপাধি বাচ দিয়া শুধু নামের আভ্যুত্থান সহি করেন না, করিলে সন্দেহ তাহা প্রাক্ত হই না। বহ: নামের আভ্যুত্থান বাচ দিয়া শুধু উপাধি, অথবা আভ্যুত্থানের প্রথম অক্ষর সহ উপাধি সহি করিলে অনেক ক্ষেত্রেই কাজ চলে। ইংরাজ আমলে ইংরাজদের কোম্পেনিই যে এদেশে নাম-উপাধির ব্যবহার প্রচুর এবং ওকস লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অন্য নাম হিসাবে নাম-উপাধির ব্যবহারের এই ওকস-প্রধান শুধু অব্যবহৃত নহ, অনেক বিক দিয়া কৃত্তিকর এবং অগ্র-দ্রুত। প্রাক্তিত নাম-উপাধির অনেকগুলি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, জেন্স, মালী, বাগদী ইত্যাদি 'জাত'-বালক। তাহা নামের মধ্যে দিয়া আভিভূত এবং কিয়ৎপরিমাণে অশুভ্রতাকে বিচাটয়া রাখিয়াছে। বহু নীচজাতের লোকের নিজেই হীনতাভাজক নাম-উপাধি গোপন অথবা ত্যাগ করিয়া উচ্চজাতের মিশ্রিতর চেষ্টার কথা শ্রাষ্ট পোনা দায়।

আজকাল এই নাম-উপাধি এত প্রাচুর্য লাভ করিয়াছে যে, রাণেরের আসল নাম তাহার নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজদের কাহারও নামোচ্চারণের সময় মি: ও মিসেস কথাগুলি সাধারণত: নাম-উপাধির সহাই সংযুক্ত হয়। তাহার ফলে লোক আসল নামের পরিবর্তে নাম-উপাধির দ্বারাই পরিচিত হইয়া পড়। আজকাল ঐ ও স্রীমতী—মি: ও মিসেস-এর স্থান অধিকার করিয়াছে। ফলে—বকুতায়, সাহিত্যে এবং সাংবাদ্যের ঐক্য, স্রীমতী, স্রীমতী প্রভৃতি কথাই আবির্ভাব ঘটাইয়াছে। সংস্কৃত 'স্রী' শব্দের সহিত অসংলগ্ন উপাধিগুলির যোগনা যে প্রতিদ্বন্দ্বী তাহা নহ, তাহা ব্যাকরণ-বিকল ও ভ্রষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে তাহা হাস্যকর। নাম-উপাধির এই প্রাচুর্যলাভের ফলেই বহুদা মোহন দাস এবং বেশকছু চিত্তরঞ্জনা—বহুদা গাধী এবং বেশকছু দাস নামে এবং রবীন্দ্রনাথ—ভাবুর বা টেঙ্গোর নামে দাসা পুথিতেও পরিচিত হইয়াছেন। অথচ গত শতাব্দীর শেষভাগেই বহিন, দেবচন্দ্র, বীনকু নিম্ন নামেই গ্রন্থি লাভ করিয়াছিলেন। যদুদেব বহিও 'বহুদেব' কবি' বলিয়া নিজেই নামোচ্চারণ করিয়াছেন, তবুও তিনি 'স্রীমদুদেব' নামেই বাঙ্গালীর অন্তরে স্থানলাভ করিয়াছেন।

সম্রাট যেনে নাম-উপাধি বর্জন করিবার পক্ষে এক আন্দোলনের স্রষ্টা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে কংগ্রেস-

সেক্রেটারি স্রীমান নারায়ণ উদ্যাহ উপাধি 'আগর ৫৭৯৯' তাগে করিয়াছেন। হিন্দুদের নাম হইতে তাহার উপাধি অংশ বাচ দিবার প্রকটা প্রচেষ্টা কেজ্রী শরকারের বিবেচনানি আচে বলিয়া পোনা গিয়াছে। বাস্তবিকই আজকাল এসব উপাধি ধারণের কোন প্রয়োজন আছে কিনা তাহা বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, নাম-উপাধিগুলি আদিম মাগধের কতকগুলি সংস্কার এবং পরবর্তীকালে তাহার জাতি, বাসস্থান এবং কৃত্তির উপর ভিত্তি করিয়া গঠিয়া উঠিয়াছে। টেটম-বাচক উপাধিগুলি তো মাগধের আদিম কীরনের লক্ষ্যবস্তু। কৃত্তি ও বাসস্থানমূলক উপাধিগুলিও আজকালকার যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরর্থক হইয়া গড়াইয়াছে। এ যুগে মাগধ আর কোনও নির্দিষ্ট গ্রাম বা বাসস্থান অথবা কৃত্তিতে আবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র দেশে বানো কৃত্তিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। গ্রামীণ সভ্যতার ক্রমবিস্তার, বৃহৎ শিল্পের প্রসার এবং অশ্রুবিহারের ফলে পরিবার বোধ ও জাতের বন্ধন ভাঙিয়া বাইতেছে। বহু 'ভাস্কর্যবান' হাল ধরিয়াছেন, 'সার্বভৌম' হুতার বেশান ধুনিয়া ধরিয়াছেন, 'ভাতুড়ী' পাচপুঙ্খ ধরিয়া তাগলপুর্বে বাস করিতেছেন—তার আদি বাসস্থান পাকিস্তানে অবস্থিত ভাতুড়িয়া পরগনার নামও লোপ পাইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত মওহরলালের নাম-উপাধি 'নেহক', তার কাশ্মীরবাসী পূর্ণপুঙ্খদের বাসস্থানের নিকটবর্তী কতকগুলি নহর হইতে উদ্ভূত। আজ বহুপুঙ্খ ধরিয়া এলাহাবাদের আনন্দচন্দন-বাসী নেহক পরিবারের নামের অশ্রুত্যাগ তাহা একান্ত অর্থহীন। বিবাহের পর নারীর শিতার কৌলিক উপাধি ত্যাগ করিয়া স্বামীর উপাধি-গ্রহণের প্রথা আছে। আজকালকার ব্যক্তিগত-স্বাধীন যুগে এই প্রথা নারীর আত্মসম্মানবোধের পক্ষে হানিকর। উপাধি বর্জন করিলে আর তাহার প্রয়োজন হইবে না। আমাদের নাম-উপাধিগুলির বানান এবং উচ্চারণ-বৈধবা আধুনিক যুগে আমাদের নৈনর্গিন কাঙ্ক্ষার্থে বানো অর্থবিধার স্রষ্টা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, টেলিফোন অথবা অন্ত কোনও বর্ণাঙ্কমিক তালিকা প্রস্তুত করা অথবা তাহা হইতে নাম বাছির করা কঠিন এবং সময়সাধ্য হয়। টেলিফোন-পাইতে এক মুখোপাধ্যায় উপাধিটির স্থানান্তর, স্থানান্তর, স্থানান্তর ইত্যাদি কত বহু বিভিন্ন বানান এবং ভুল! তাই নামের মধ্যে অতীতের কতকগুলি অর্থহীন চিহ্ন ধারণ করিয়া আমাদের নাম এবং কাঙ্ক্ষার্থক ভাষাক্রমে পরিবার কোনও সার্বভৌমতা নাই। বিশেষতঃ, সভ্যতারের হিন্দুদের নাম প্রায়ই সংস্কৃতমূলক হওয়ায়, তাহার সঙ্গে 'স্রী' শব্দের যোগ কৃত্তিবদ্ধ হইবে। সেজন্য নাম-উপাধির বিলোপ—সমগ্র ভারতে হিন্দুদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ স্রষ্টা করিয়া ভারতের একাত্মতার সহায়ক হইবে।

ছোট-খোঁট

• * * চারুচন্দ্র ওট্টোচার্য * * •

আজি হতে ষত বর্ষ পূর্বে

১৮৫৭ সাল। বিজ্ঞানের ঐতিহ্যসে এ বছরটা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ সালে জন্মালেন হেনরিক রডলফ হার্জ, জন্মালেন রনাল্ড রস, জন্মালেন ওয়াশটন গ্লিড। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে এক এক নতুন অধ্যায় খুলে দিয়ে গেছেন। এ বছর এঁদের জন্মশতবার্ষিকী। আমরা এঁদের জয়ধ্বনি করি।

হার্জ

ম্যাক্সওএল অক্টবে দেখিয়েছিলেন যে আলো ছড়িয়ে পড়বার ক্ষেত্রে যে ঐশ্বর কল্পিত হয়েছে সেই ঐশ্বর দিয়েই তড়িৎ-চুম্বকীয় ডেউ চলেবে। এর পর কয়েক বছর গেল। ১৮৮৭ সালে হার্জ এ সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। হার্জ তড়িৎের সাহায্যে ঐশ্বরে ডেউ তুললেন। এখন এরা যে সাধারণ আলোর সমগোত্রীয় তা প্রমাণ করতে হবে। হার্জ এক যন্ত্র তৈরি করলেন। ওইসকল তরঙ্গে আলোকের অনেকগুলি ধর্ম দেখা গেল, কিন্তু হার্জের তৈরি যন্ত্র শূন্য ধরনের ছিল না।

তা হোক, আজ আমরা যে বেতারে সংবাদ পাঠাচ্ছি, ঘরে ঘরে রেডিও শুনিছি, এসবের ইতিহাস লিখতে হলে আরম্ভ করতে হয় হার্জের পরীক্ষা থেকে।

রনাল্ড রস

পানামা খাল কাটার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন বিখ্যাত এজিনিয়ার জেনারেল গরজাস। তিনি কিন্তু ১৯১৪ সালে মার্চ মাসে রনাল্ড রসকে

লিখছেন,—আমরা যে পানামা খাল কাটতে পারবুম সে শুধু আপনারই আবিষ্কারের ক্ষেত্রে।

কিন্তু এ কথা মানে কি? রস হলেন ডাক্তার; তাঁর আবিষ্কার চিকিৎসা সম্বন্ধে; সেই আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এজিনিয়াররা পানামা খাল কাটতে পারলেন কি করে? কথাটা এই।—

যে ফরাসি এজিনিয়ার স্ত্রুয়েজ পাল কেটে যশস্বী হয়েছিলেন তাঁর ওপর তার পড়ল পানামা খাল কাটার। বহু লোকজন গেল, কিন্তু কাজ একটুও এগল না। যে যায়—বিছানা নেয়, ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বর আক্রান্ত হয়। অনেক লোক মারা গেল। তখন যুক্তরাজ্য সরকার স্থির করলেন ওই জায়গাটা থেকে মাঝে ম্যালেরিয়া পীতজ্বর তাড়াতে হবে। খাল কাটা পরে।

লাভের? মানে ফরাসি দেশের সৈন্য-বিভাগের একজন ডাক্তার এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ম্যালেরিয়াও জীবাণুঘটিত ব্যাধি, ম্যালেরিয়া জীবাণু মানুষের দেহের রক্তে বাসা বাঁধে, মশা কামড়ালে মশার রক্তে কিছু জীবাণু চলে যায়, মশার দেহে তারা বাস্তুত থাকে; তখন সেই মশা একজন নৃশূ লোককে কামড়ালে তার ম্যালেরিয়া হবে।

রনাল্ড রস ইংলণ্ডে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাস করে চিকিৎসা বিভাগে চাকুরি নিয়ে এসেছেন আসেন। তিনি শাসক সম্প্রদায়ের লোক, এলেন শাসিতদের দেশে, কাজ করুন আর না করুন মাইনে তড়ুতড়ু ক'রে বাড়বে, আরানে চাকুরিজীবন কাটিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে পেনশন ভোগ করবেন, টাকাটা যাবে ভারতবর্ষ থেকে; পরিজন করবার কোনো দরকার

নেই। এই রকম তো হবার কথা। কিন্তু রস ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির, আর তাঁর মতো ছুঁচার জন ইংরেজ মাকে মাকে এদেশে আসত বলে ও-জাত ভারতবর্ষে প্রায় হুশো বছর রাজত্ব করতে পেরেছিল।

ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখে রস ম্যালেরিয়ার কারণ সম্বন্ধে অতুসন্ধান আরম্ভ করলেন। তিনি ঠিক করলেন, লাভের। যে পথ ধরেছিলেন তিনি সেই পথেই এগিয়ে যাবেন। বাঙ্গালার হাসপাতালে মশা নিয়ে তিনি পরীক্ষা করতে থাকলেন; বহু পরীক্ষা হল, কিন্তু কোনো কিছু তিনি ধরতে পারলেন না। তখন তিনি ভাবলেন, যে-জাতীয় মশা নিয়ে তিনি কাজ করছেন হরত তারা ম্যালেরিয়া জীবাণুর বাহক নয়। সেকেন্দারাবাদে এসে তিনি আর-একজাতীয় মশা পেলেন, তাদের নিয়ে কাজে রত হলেন।

পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু কিছুই পান না। ২০ আগস্ট, ১৮৯৭ সাল। ম্যালেরিয়া রুগীকে কামড়ছে এইরকম মশা মাত্র হাটো বাকি। অপরদ্বয় কাল—চোখ ক্লান্ত, দেহ অবসন্ন। রস একটা মশাকে ব্যবচ্ছেদ করে তার পাকস্থলী পরীক্ষা করলেন; হঠাৎ তাতে একটা নতুন কিছু তিনি দেখলেন। কিন্তু আগে এতবার তিনি হতাশ হয়েছেন, আর সেদিন এত ক্লান্ত যে, সব ফেলে রেখে তিনি বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে ঘণ্টাখানেক ঘুমলেন। ঘুম থেকে উঠে তাঁর মনে হল, তিনি মস্তবড়ো একটা সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন। তিনি কবিতা রচনা করতে পারতেন, আনন্দে একটা কবিতা লিখে ফেললেন; তার শেষ ক'লাইন ছিল এই,—

I know this little thing
A myriad men will save.
O death, where is thy sting?
Thy victory, O grave?

এর পর তিনি কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি

জেনারেল হাসপাতালের পরীক্ষাগারে তাঁর গবেষণা চালিয়ে গেলেন। শেষ অবধি লক্ষ্য করলেন, আনোফেলিস-জাতীয় জী-মশাই ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে।

রস তাঁর আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন।

জুয়ালাটার রীড

১৯০০ সালে যুক্তরাজ্য কিউবা দখল করল। কিন্তু দখল করলে কি হবে, পীতজ্বরের প্রাদুর্ভাব এত বেশি যে সে-স্থান বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। যুক্তরাজ্য সরকার এ রোগ নিবারণের জন্য একটা কমিশন নিযুক্ত করলেন, আর রীড এই কমিশনের সভাপতি হলেন। অতুসন্ধান আরম্ভ হল; মনে হল যেন স্টেগোমায়-জাতীয় জীবাণু ওই রোগ ছড়ায়। কিন্তু তা প্রমাণ করতে হবে।

পীতজ্বর-রুগীর রক্তে এক রকমের জীবাণু দেখা গিয়েছে। স্টেগোমায়-জাতীয় মশা যদি ওই রুগীকে কামড়ায় তবে ওই মশার দেহে কতক জীবাণু চলে যাবে। এখন ওই মশার রক্তে জীবাণুরা যদি দ্রুত বেড়ে চলে আর এই অবস্থায় ওই মশা যদি কোনো সুস্থ লোককে কামড়ায় তবে সেই লোক পীতজ্বরে আক্রান্ত হবে, এই রকম কল্পনা করা হল। কিন্তু মানুষকে নিয়ে তো পরীক্ষা করতে হবে, কে এই পরীক্ষায় নিজের জীবন বিপন্ন করবে!

কমিশনের দু'জন সভ্য জেস ল্যাম্বিয়ার ও জেমস ক্যারল বললেন,—আমাদের উপর পরীক্ষা হোক। দু'জনেই সংসারী, বাড়িতে জী-পুত্র আছে, কিন্তু সভ্য আবিষ্কারে তাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করলেন। স্টেগোমায়-জাতীয় মশা পীতজ্বর-রুগীকে কামড়ে কয়েকদিন পরে এঁদের কামড়াল। দু'জনেই রোগে আক্রান্ত হলেন; ল্যাম্বিয়ারের মৃত্যু হল।

সভ্য আবিষ্কৃত হল। নিজের মরণের মধ্যে দিয়ে ল্যাম্বিয়ার অমর হয়ে রইলেন।

ম্যালেরিয়ার, পীতজ্বরের কারণ জানা হল।

এখন যে সব মশা ওই রোগ ছড়ায় তাদের ধ্বংস
করবার উপায় উদ্ভাবিত হল। আজ পৃথিবীতে
সীতল্বর নেই বললেই হয়। ইটালি গ্রীস পানামা
প্রভৃতি বহু দেশ মালেরিয়া ত্যাগ করেছে। কিন্তু
যে ভারতবর্ষে ব'সে রস তাঁর আবিষ্কার ক'রে
মানবজাতির কল্যাণসাধনের উপায় নির্ধারণ করলেন,
সুটিশ শাসনে সে ভারতবর্ষের অবস্থা পূর্ববৎই রইল।

অবিভক্ত ভারতে প্রতিবছর প্রায় পঞ্চাশ হাজার
লোক মরে মারা যেত, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা
ছিল মালেরিয়া।
বাণীন ভারত মালেরিয়া ত্যাগে বহুপরিকর
হয়েছে; অল্পকালের মধ্যে বিশেষ সুকলও
পেয়েছে। আজ পশ্চিমবংলায় মালেরিয়া অনেক
কমে গিয়েছে।

চরের আশা

হরপ্রসাদ দ্বিৱ

ভাঙা ছাদ, পোড়ো বাড়ি,
সেকালের দ্বাদশ দেউলে—
নামার অক্ষত স্মৃতি
সুবিশাল ঘূর্ণর অশথ।
কিনারা ভাঙছে নদী—
সেই তীরে কর্ণিক ভ্রমণ,
তারপরে কিরে চলা
শেষ হলে এ বনতোজন।

মাঝে-মাঝে দেখে যাই
দূর দূর জীবনের ছবি।
মাঝে-মাঝে শুনি গান
দূরে দূরে পুরবী ভৈরবী।
প্রাণের প্রান্তর থেকে ভয়-প্রেম-মৃত্যুর প্রয়াণ।
অশেষ অমিল মিলে
বাতাসেতে প্রকৃতির গান।

তাকে বুকে নিয়ে যাই
দেখে যাই
এই ভাঙা ছাদ,—
নদীর তাজন, আর
ওপারের খেয়াহারা চর।

কটকী বাড়ি

শক্তিপদ রায়চন্দ্র

—‘কনে আন, লগ্ন বয়ে যাচ্ছে।’

ওপাশ থেকে কে খবরটা রিলে করে—‘কনে আন—’

সিঁড়ি-বারান্দা ছাঙ্গ-ঘর কোথাও তিল ধারনের জায়গা নেই। কেবল মাথা আর মাথা। গিসগিস করছে লোকজন—তারাই মধ্যে অবাধ গতিতে টেলেটলে হেসে গড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের দল। কেউ বা কনের বন্ধু—ব্রাহ্মণ, কেউ বা তার ছোট-বোনের বন্ধু, কেউ বা মামের পরিচিত। এ ছাড়া আত্মীয়বর্গ তো আছেই। অবশ্য তারা এই আলোর-ককনকে সাজবোনের আওতায় কানা হয়ে গেছে। বিয়েবাড়ি তো নয়, যেন শাড়ি-গহনার সোকানের চলন্ত এক্তিবিমন।

—‘কেমন আহিস রে?’

বালিগঞ্জের মিনতি স্তম্ভবাজারের বাসস্তীকে দেখে জিজ্ঞাসা করে : অবশ্য ছুজনের চোখই কাঁটার মতো বনবন করে ঘুরছে ছুজনের শাড়ি-গহনা-ব্রাউজকে কেন্দ্র করে। মিনতি ইচ্ছা করেই যেন গলার চকচকে হারটা অনাবৃত করে এগিয়ে আসে—

‘ওনা, কী হাল হয়েছে তোর? ছেলেপুলে?’

চাসে বাসস্তী—‘হরনি, বেশ আছি। তোর?’

হুই বন্ধুতে অনেকদিন পর দেখা, ছাড়াছাড়ি সেই ফুলেই।

ব্রাহ্ম টেনে উঠেই বিয়ে হয়ে গেল মিনতির। নিজের রূপ, বাবার রূপা—কোনটারই অভাব ছিল না। স্ত্রীরা স্তম্ভবাজারের মিনতি বালিগঞ্জের এক ডাক্তারের ঘর আলো করতাই চলে গেল। বাসস্তীর মনে হয় যেন সেদিনের কথা। মিনতির হালকা পাখার ডর করা চালচলন আজ মধুর হয়ে উঠেছে, বেশবাসে এসেছে আভিজাত্যের ছাপ। গায়ে এক-বা গহনা, শাড়িখানাও তেমনি ঝাঁকালো। দূরসম্পর্কের

আত্মীয়ের বাড়িতে নয়। করে যেন বিয়ের নেমন্তন্ন রাখতে এসে থাওয়া করেছে ওদের।

মিনতিও ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। ক’বছরেই কী হাল হয়েছে বাসস্তীর। ছেলেপুলে হয়নি—না হোক, এমন হতবৃত্তিও ছিল না। মাক্সা-মাক্সা হং, নিটোল শাফা, তেমনি হাসিখুশি ছিল ও। আজ?

বলে ওঠে মিনতি—‘বরুণবাবুর খবর কি? আজকাল শুনি নামকরা গাইয়ে—রেডিওতে মাঝে মাঝে শুনি ওর গান।’

বাসস্তী ওর দিকে চাইল। কি যেন অতীতের স্বর্ণ-সৌরভ-ভরা একটু নির্জন জগতের সন্ধান নেমেছে ওর মনে। বরুণের কাছেই গান শিখতো মিনতি। ওর মনে বরুণের রক্ত আজও কোথায় একটু দুর্বলতা আছে। বাসস্তী নিজেকে এইমিত দিয়েই যেন ভাগ্যবান বলে মনে করে। কিন্তু... অন্তরিক?

সামান্স আর বরুণের, তারও কোন দ্বিধতা নেই। নিজেই খেটে সংসার চালায়। অভাব-অভিযোগের কথা বরুণ জানতে পারে না; জানতে চায়না বাসস্তী। ছোট একটা নেয়েদের ফুলে চাকরি করে নিজ, আর বরুণ পানের টুইশানি করে যা পায় তাতে কোন-রকমে সংসার চলে—সারা মাস অনিশ্চয়তার মাঝে। প্রতিটি মাসেই এই অবস্থা। এর কোন রকমকেন হয় না। একলা থাকে কাজের মধ্যে—খেটে-বাগড়া। মাহুঘের সমাধি—তাই অভাববোধটা একটু—বেদনাধারক হয়ে ওঠে না। কিন্তু সেটা যে কত তীব্র তা এইখানেই এসে অনুভব করতে পারে বাসস্তী। এমন জানলে সে আসতোই না; লতার পাতার সম্পর্ক—বড়লোক আত্মীয়ের সম্পর্কে আসতে বরুণ বার বার তাকে নিবেদন করেছিল; পরিচয় দিতেও যেন ওরা লজ্জা করে।

সত্যিই নেন্দুয়ানিভুক্ত প'রে এসেছে একটা সাধারণগোছের শাড়ি, আর গহনা কলতে ছাড়ে চারগাছি চুড়ি, একটা কল্লণ আর পিটপিটে হার—কানে টিমটিম করছে ছোটো কানপাশা—সমুদ্রে এককালি বীপের অস্তিত্ব—ও যেননা-ধাকাত! না বলেছিল, 'আনিই একবার ঘুরে আসবো একলা। না গেলে খরাপ দেখায়। তোমার গিয়ে কাজ নেই।'

বাসন্তী-ই জেন ধরেছিল। নিজের জমানে কয়েকটা টাকা দিয়ে কিনে এনেছে একটা শাড়ি; পিসীমার হাতে দিতে, একবার নেড়ে দেখে বলে ওঠে পিসীমা, 'তুই আবার লৌকিকতা করতে বেশি কেন বাপু!'

আশান্তরে চেয়ে ছিল বাসন্তী, পিসীমার পছন্দ হবে হরতো, কিন্তু সে সব কোন আলোচনার দিকেই না গিয়ে যেন ব্যঙ্গ করলেন তাকে—অর্থাৎ 'এসব লৌকিকতা করা তোমার সাজে না—মুরোদ তো বোকা গেছে'। কথা কইলনা বাসন্তী। তখনই বন্ধনের কথা মনে হয়েছিল। সত্যিই বলেছিল সে।

আবার মিনতিকে দেখেও মনে হয়—সত্যিই, বিয়েবাড়িতে এসে আনন্দের চেয়ে দুঃখই যেন বেশী পেয়েছে সে। বলে মিনতি—

'এত খাতিস্ না, বাসন্তী। কী হাল হয়েছে দেখেছিস? দেখি ওদিকে—মিসেস মাস্তাল এসেছে।'

ভিড়ে যিশিয়ে গেল ওপাশে—কোন লোহার ব্যবসায়ীর বৌএর সঙ্গে গয়নার বানি নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছে সে। উলুপানি, পাঁখের নুঁকে চারিদিক মুগ্ধ। বরষাক্রীড়াও ভিড় জমিয়েছে ছানদাতলায়। অবাধ হয়ে চেয়ে থাকে বাসন্তী—বিয়ে একেই বলে! আবুকে মানিয়েছেও চমৎকার। আকাশী জুগের বেনারসী, গা বেন গয়নায় মুড়ে দিয়েছে; চারিদিকে চাদের হাট—রূপ শাড়ি আর গয়না। তার মাঝে বাসন্তীর কোন ঠাই নেই। না রূপ—না রূপার তার পরিচয়। রূপ? সে এককালে ছিল। আজ দারিদ্র্যের আগুনে পুড়ে কালো আঁরা হয়ে গেছে।

—'তুই এখানে? বেশ বাহোব! পিসীমা এসে হয়েছে। 'খুব মজা দেখছিস? না? আর—'

টেনে নিয়ে চললো হাত ধরে। এত লোকজনের মধ্যে বয়ঃ কত্রী তাকে নিয়ে চলেছে—তার খাতির যেন রাতারাতি বেড়ে উঠেছে। বাসন্তীও মনে মনে গর্ববোধ না করে থাকতে পারে না।

—'নে, এসব দেখাশোনা করতে হবে তো, বাটরের লোক আলগা আসবে-যাবে; নিজের লোক না হলে, এ-কাজ কাকে দিই বল?'

পিসীমা তাকে টেনে এনে কনের ঘরে বসালো—রাশি রাশি জিনিস পেয়েছে আবু। শাড়ি তারই ঠিকানা নেই, টেবিল-ল্যাম্প বই কলম গহনা 'টি'-সেট আইসক্রীম-সেট—অগ্রও কত কি, যেন ভিপার্টমেন্টাল স্টোরের হালপত্র একটাই জমা হয়ে উঠেছে। পিসীমা নির্দেশ দেয়—

'কে কি দিচ্ছে তাদের নাম-ঠিকানা, হিসেব লিখে রাখ। এসব পাওনা তো নয়—রূপ বাড়ানো, আবার সবাইকেই দিতে হবে তো। গায়ে রাখতে পারিনা বাছা, পরেরটা খেয়ে হজম করা আমার স্বভাব নয়।'

পরক্ষণেই মোটা মেঘবহল দেখানা নিয়ে ঘুরে কাড়ালো; কাকে যেন বলছে—

'নীচের ভাঁড়ার থেকে সন্দেশ দুই ওগুলো বের করতে হবে না? যদিও না চাইব সেইখানেই গোলমাল—নায়েহাল হয়ে গেলাম বাছা! কারও কি চোখ আছে কোনদিকে—সব যে মেতে উঠেছে।'

জিনিসপত্রের জুপের আড়ালে খাতা পেঙ্গিল হাতে করে যেন স্বপ্ন দেখছে বাসন্তী। মির্জাপুরী বেনারসী বাঙ্গালোর মুন্সিাবাদী কইকী শাক্তিপুত্রী কোন কিছুই বাদ নেই। ওই শাড়ির ভিড়ে বাসন্তীর আটটাকা পিস্ রামজীবনপুত্রী তাঁতের শাড়ি যেন নেহাত বেমানান ঠেকে। টেবিল-ল্যাম্পটার দিকে চেয়ে রয়েছে কাশ্মীরী-কাজ-করা কালো ওয়ালনাট কাঠের সুন্দর মিনারার ল্যাম্প, ওপাশে কয়েকটা কলম শেকার্স-পার্কায়ের—ভেলভেটের

বান্ধগুলো ককমক করছে। এখন সম্পূর্ণ অন্ধ কোন এক বিচিত্র খাদ-গন্ধ-ভরা জগতে সে।

বন্ধনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—ভিড়ে কথাবার্তা বিশেষ বলতে পারিনি। ভিড়ির কোণে ঠাড়িয়ে মিনতির সঙ্গে কথা বলছে সে। হাসিতে কেটে পড়ছে মিনতি—

‘কই একদিনও তো যাননি? তা যাবেন কেন? নামকরা গাইয়ে—’

স্তব্ধ হয়ে উনছে বাসন্তী। আসল সংবাদ ওরা কেউ জানে না। শিখল মূল—রাভাঘরুই সার। কানেন্ট শোনা যায় নামকরা গাইয়ে—মিনতিকে দেখলে বোকা যায় কতদূর নামকরা সার্থক হয়েছে কতটুকু, গায়ে রাংরঙি নেই বললেই হয়, পরনে তোলা আটপৌরে শাড়ি একাকার হয়ে গেছে—মুখে চোখে মালিঙ্গ-হতাশার ছাপ।

নামকরা গাউয়ে! কথাটা নিজেও করেকবার শুনেছে বাসন্তী—মনে মনে হাসি পায়।

মিনতি যেন বসলে পেছে—অতীতের সেই মধুবসন্ত বেলা কুমারীজীবনের স্বপ্ন আজ মনে পড়ে বার বার। মুখে চোখে সেই সজীব ড্রামলিমা যেন ক্ষণিকের দ্রুতও ফিরে আসে। বাসন্তী ওর দিকে চেয়ে আছে দূর থেকে—বন্ধনও আবছা আলো—এই আনন্দেরকালোহলে যেন বসলে গেছে। বাসন্তীর চোখের সামনে ছুজনের মনের ক্ষণবসন্ত-স্পর্শের সজীব স্ফাবলতাটুকু পুটি এড়ালো না। চেয়ে রয়েছে ওদের দিকে।

মিনতির পরনে একটা কটকী শাড়ি, ঘনকালো মেজে—নীল লাল গোপিনীদের দল কলসী কাঁখে চলেছে—আঁচলটা সেই মূর্তির ভিড়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। মনের সুর—তাঁব—শাড়ির আঁচলার ছবির সঙ্গে হুবহু যেন নিলে পেছে। একটি বৃহত্ত্ব!...

চমকে ওঠে বাসন্তী। বন্ধনও যেন কেমন আনমনা হয়ে উঠেছে। ছত্তর অতীতকে সেও বোধ হয় ভুলতে পারেনি। নইলে আজও ওপার থেকে হাওয়ার ভেসে আসা ডাক শুনে উৎকর্ষ হয়ে ওঠে

কেন? বাসন্তী যেন কোথার বেমে খাচ্ছে! মনে মনে তার জেগে উঠেছে হিংসা,—নিজেকে দৃঢ়তর করে প্রতিষ্ঠা করবার কৌণিক।

চোখের সামনে জেগে ওঠে—সেই স্নগৌর নিটোল দেহ নিয়ে ঠাড়িয়ে রয়েছে মিনতি আর বন্ধন, পরনে গুর রাধাসঙ্গিনীদের মূর্তি আঁকা ঘন নীল লাল—রামধনু রক্তের আঁচলা স্টোচ্ছে!...বার বার চোঁটা করেও ভুলতে পারেনা সে। চোখের সামনে তৃণীকৃত শাড়ির ভিড়ে জ্বলে রয়েছে অমনি করেক-খানা শাড়ি—গোলাবী, নীল, ঘি-রক্তের মেজে—নানা রকমারি আঁচলা; একখানা কালো শাড়িও রয়েছে ওপাশে, কালো কটকী শাড়ি—হুবহু ওমনি রা, ওমনি আঁচলা—মিনতির মতোই।

ভিড়ে কোন্‌দিকে ওরা হারিয়ে গেল। বরষাভীড়ের খাওয়াদাওয়া চুকে গেছে—কনোজাটীরা এখনও অনেক বাকী, তারপর বাড়ির লোক—আত্মীয়-স্বজন। পিসীমার এদিকে কড়া নজর।

—‘আজ রাতে কিরবে না?’

বন্ধন বাসন্তীর কিরবার মুখে বাসন্তীকে দেখে এগিয়ে আসে। বাসন্তী তখনও রুঁদ নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। ভিড়, গুমেট গরম আর গোলমালে বৃকতে পারেনি, এতক্ষণে বেশ অসুস্থান করে হাঁপিয়ে উঠেছে সে—খিদেও লেগেছে তেমনি। এসে অবধি ছাঁকপ চা ছাড়া আর কিছুই ছোটেনি—খেটেই চলেছে দিনভোর—রাত এগারোটো অবধি।

পিসীমা বলে ওঠে—‘না খেয়ে যেতে পারি না। ভাড়াটা এসব স্বগাট মিটোবে কে?’

অর্থাৎ চার্জ বুকে না নেওয়া পর্যন্ত ছাড়তে চায়না পিসীমা। বলে ওঠে পিসীমা—‘কাল ছপুয়ে বাবে ও!’

চোখের সামনে বার বার জেগে ওঠে বাসন্তীর সেই ছবিটা—মিনতি হাসছে, পরনে ওর কালো কটকী শাড়ি, আঁচলা স্টোচ্ছে মাটিতে। মনটা

অকারণেই কেমন যেন চকল হয়ে ওঠে। বৈকালে বাড়ি ফিরে যান সেবে সামান্য প্রসাধনও করেছে; বিয়েবাড়ি থেকে এনেছে বিয়ে-বাওরা রজনীগন্ধার কিছু গুচ্ছ। কেরোসিন কাঠের টেবিলের উপর একটা কাচের গলাসে রেখেছে জল দিয়ে—সৌরভে ঘরটা ভরে উঠেছে। ওর সন্তুষ্টিটার ভগ্নে মাদ। ফুলগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। নতুন শাড়িখানার পাট খুলতেও মায়। লাগে—বার বার ওটার দিকে তৃপ্তিতে চেয়ে থাকে—কেমন মানাবে চমৎকার। পারা-ওঠা ঘা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ভাঁজ খুলে আঁচলার দিকটা বার বার দেখেও আপ মেটে না। চমৎকার লাগছে। হঠাৎ দরজার কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উঠলো। কি ভেবে শাড়িখানা বিছানার তলে গুঁজে রেখে—দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। এ সময় কে আসতে পারে? বরুণ কিরবে সেই সন্ধ্যাবেলাতে। হয়তো আর কেউ।

—‘তুই! বৌদি যে?’

চকল পিসীমার ভাইপো মদন আর সঙ্গে পিসতুতো ভাইএর জী। একটু অবাক হয়ে গেছে বাসন্তী—‘হঠাৎ এসময় এলে যে বৌদি? বিয়ে-বাড়ির হাঙ্গামা চুকে গেল সব?’

‘বৌদির মুখ গভীর, ধমধমে; বেশ কড়া সুরেই বলে ওঠে—‘মদন, তুই একটু ঘুরে আয়—দোকান থেকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসবি।’

ইচ্ছা করেই মদনকে সরিয়ে দিল সে। একটু ঘাবড়ে গেছে বাসন্তী। বৌদিই কথাটা পাড়লো—কাল রাতে বালিগঞ্জের মিনতির দেওয়া শাড়িখানা পাওয়া যাচ্ছে না। কটকী শাড়ি—

‘আকাশ থেকে পড়ে বাসন্তী—‘কেমন শাড়ি? আমার তো খেয়াল হচ্ছে না।’

বৌদি ওর দিকে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে আছে—

‘তোমার হাতেই হিসেব ছিল, এখন খেয়াল হচ্ছেনা বললে তো চলবে না।’

যেন ধরা পড়ে গেছে বাসন্তী—মেজতে পড়ে

রয়েছে শাড়ির নোড়কের বালি-রঙের কাগজটা, পাটে পাটে ওর ভাঁজের চিহ্ন, বৌদি ওই কাগজ-খানার দিকে চেয়ে রয়েছে ত্রিখক দৃষ্টিতে—কি যেন ধরে ফেলেছে সে। বাসন্তী মরিয়া হয়ে ওঠে—

‘গরীব বলে কি চোরও নন্দেই করে অপমান করতে এসেছে বৌদি?’

‘ও কথা বলিনি, ভাই। হারিয়ে গেছে—তোমার জিন্মা থেকেই—তাই বোঝ নিতে এসে-ছিলাম।’

বাসন্তী উৎকণ্ঠে বলে—‘অচ্ছ কোথাও তো যাওনি? যেতে সাহস হয়নি। এসেছ গরীবের বাড়িতে তাকে চোর সাব্যস্ত করে অপমান করতে। সব পারো তোমরা।’

বৌদি কোন কথা বললো না। হঠাৎ দরজা ঠেলে কে যেন ঢুকছে! যেন গেল বাসন্তী। বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়ছে বরুণ। বাসন্তীর শেখরিকার কথাগুলো শুনতে পেরেছে সে। কি একটা ঘটেছে, ঘরে পা দিয়েই বুঝতে পারে। বৌদি আর বাসন্তী দুজনেরই মুখচোখ ধমধমে। কি যেন বেশ সুখ-মুখী বোকাপড়া করতে উদ্রত হয়েছিল তারা। তাকে আসতে দেখেই খেনে গেছে। ইতিনধো মদন এসে পড়তেই বৌদি চলে গেল। স্বক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাসন্তী। মুখচোখ রাঙা হয়ে উঠেছে কি-এক দুঃসহ বেদনায়। গজগজ করতে করতে চলে গেল হাতাঘরে—

‘বড়লোক! বড়লোক হয়ে ধরাকে সরা দেখছেন—’

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে বরুণ; কি যেন একটা মান-অপমানের প্রশ্ন উঠেছে। বিছানাতা ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে, তোশকটা তুলে রাখতে গিয়েই অবাক হয়ে যায়—নীচে থেকে বের হয়েছে একটা নতুন শাড়ি। কাল রাতে মিনতি পরে এসেছিল এমন শাড়ি—কি যেন নান। বৌদির মুখেও এমন শাড়ি হারানোর কথা শুনতে পেরেছে সে বাইরে দাঁড়িয়ে। শাড়িখানা তুলে নিয়ে কি ভাবছে—হঠাৎ

দরজার দিকে চাইতেই অবাধ হয়ে যায়—দাঁড়িয়ে আছে বাসন্তী উগ্রভাষা নাগিনীর মতো—চীৎকার করে ওঠে—

‘বল, তুমিও চোর বল! একজন এসে বলে গেল, তুমিই বা বলবে না কেন? অমন শাড়ি কেনবার মুরাদ তো নেই আমার!’

—‘বাসন্তী!’ রাগে অপমানে ফুলে উঠেছে বরুণ। ছিঃ ছিঃ, এ যেন বিশ্বাসই করতে পারেনা সে। ওদের অভিযোগ সত্য: বাসন্তী এতদূর নেনে যাবে কল্পনা করতেও শিউরে ওঠে। বাসন্তী ফুঁসছে—‘মারবে নাকি?’

‘না! যাদের জিনিস তাদের ফিরিয়ে দিয়ে আসবো।’

‘আনি কিনেছি ও-শাড়ি। কেরিওলার কাছ থেকে—’

‘এ জিনিস কেরিওলার কাছ থেকে না।’

কোন কথা না বলে রাস্তায় বের হয়ে এল বরুণ; বাসন্তী পাথরের নৃতীর মতো দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে—মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। কি যেন এক অসহায় ভাব ওর চোখে।

—‘শোন!’ অসহায় কণ্ঠে অনুন্নয় করে ওঠে বাসন্তী। শেষ সম্মানরক্ষার জন্য কীণ একটুকু আর্জনাও—কান দেয়না বরুণ। মাথার রক্ত উঠে গেছে তার। এই তার পরিচয়! তার জী কিনা চুরি করতেও পেরেছে! লক্ষ্যায় নাথা কাটা যায় তার। ওর সামনে দাঁড়াতে সাহস করে না—কে জানে উদ্ভেজনার মুহূর্তে গায়েও হাত তুলে বসবে হয়তো বরুণ।

পিসীমার বাড়িতে গোলটেবিল বৈঠক বসেছে। বৌদি তদন্ত করে গিয়ে মন্তব্য করছে—‘আনি ঠিক বলেছি। ওই-ই নিয়েছে।’

পিসীমা বলে ওঠে—‘ভাগ্যিস, ওইটুকুর উপর দিয়েই গেছে—কোন গয়নাগাটিতে হাত দেয়নি। নাগো মা, কী ঘোরা!’

সুবিনয়বাবু চূপচাপ বসে ছিলেন; বলে ওঠেন—‘হয়তো গোলামাল অস্ত্র কোথায় করেছে তোমরা, ও খেচারাকে চোর ঠাওরেছো।’

—‘ধাম দিকি।’ পিসীমা ধনকে ওঠে।

হঠাৎ বড়ের বেগে বরুণকে ঢুকতে দেখে অবাধ হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে সকলেই। ওরা কেউ অভিযর্থনাও জানাল না—পিসীমা ফিরেও চাইল না। বরং উন্টে গলার হাস, হাতের চুড়িগুলোর দিকে সাবধানী দৃষ্টি দিল। বৌদি উঠেই চলে গেল তখনই। বাপাটো বরুণের দৃষ্টি এড়ালো না। পিসেমশাই বলে ওঠেন—‘বোমো বরুণ—’

বরুণ শাড়িখানা এগিয়ে দিয়ে বলে ওঠে—‘এটা নিয়ে গিয়েছিল বাসন্তী।’

বৌদি এগিয়ে আসে পিসীমার ডাকে—‘দেখ তো বাছা, এইটাই কিনা? কটকী শাড়ি—তেমনই রং।’

বৌমার মুখচোখ খুশির আনন্দে কলমল করে ওঠে। তার সন্দেহ সত্যি হয়েছে। এখন তার সভ্যজ্ঞান-লাভের চরম পরিচয়—‘হ্যাঁ, এইটাই। কী চোর বাবা!’

বরুণ শাড়িখানা ফেলে দিয়েই নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে, বৌদির কণাটা কানে এসে গরম সীসের মতো জ্বালা ধরিয়ে দেয় সর্বাত্মে। সত্যি তো প্রতিবাদ করবার কিছুই নেই—ও-কথা বলার অধিকার ওদের আছে। বাসন্তী-ই সে সুযোগ দিয়ে গেছে।

মনটা ভারি হয়ে উঠেছে। বাড়ি কিয়তেও ইচ্ছে নেই। একাই বসে আছে দেশবন্ধু পার্কের কাঁকা নাটে। জনহীন হয়ে আসে চারিদিক। গাছের মাখায় পাখ-পাখালীর কলরব খেনে গেছে। সারা মন যেন মুচড়ে ওঠে তার।...বাসন্তী—তার জী কিনা—চোর!! বাড়ি ঢুকতেই ইচ্ছে করে না—ইচ্ছে করেনা ওর মুখ দেখতে। যেদিকে হাঁচোখ যায় চলে যাবে সে। পড়ে থাকে ওই হীন নীচপ্রকৃতির সঙ্গে আপোষ করে দিনাতিপাত করার দ্রাবি—এর থেকে মুক্তি পেতে চায় সে।...

হঠাৎ কার কঠোর অস্পষ্ট কাকলিতে চমকে উঠল বরুণ। আবছা চাঁদের আলোয় নির্জন পার্কের বেকিতে বসে আছে স্বামী-স্ত্রী।

—‘আঃ, কী স্থাণ্ডা তুমি গো!’

মেয়েটি হাসতে হাসতে স্বামীকে নিরন্তর করে সরে বসল একে দেখে। বেশভূষা দেখে মনে হয় বেশ সুখেই আছে ওরা। মেয়েটির মুখে চোখে তৃপ্তির আভা।

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে বরুণ।

বাসস্তীর মলিন মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, ওকে তো কিছুই দেখনি বরুণ! তার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন আর শিল্পের নামে আহুপ্রবক্তা করে সে ভিলে ভিলে বক্তিত করেছে বাসস্তীকে জীবনের সব আনন্দ আর পাওয়ার মাধুর্য থেকে। বার্থ বক্তিত বাসস্তীর জন্ম আজ নিজেকেই মনে হয় দারী। অক্ষম সে—স্ত্রীকে শাস্তি স্বপ্ন ঐশ্বর্য দেবার সামর্থ্য তার নেই—সেই অক্ষমতাকে সাধনার সঙ্গী তাগ হিসাবে বহন করে নেবার অভিনয় করে চলেছে। মনকে চোখ ঠারছে দিনরাত। এ তারই অপমান—নিজেকে বাঁচাবার জন্মই বাসস্তী হয়তো এই পথ নিয়েছে। স্ত্রীকে সাজাবার শখ-মাখ কোনদিনই তার সাধো কুলোয়নি।

রাতের বাতাস ওর সারা দেহমনে ঝড় তুলেছে—কি এক অগ্নিগ্লানির ঝড়—কি যেন চূঃসহ অপমানের জ্বালায় ভরে উঠেছে মন। নিজের উপরই রাগ হয় বেশী। ভিলে ভিলে অবিচার করেছে সে বাসস্তীর উপর, ভালবাসা—সমবেদনাও দিতে পারেনি ওকে। পার্ক থেকে উঠে কি যেন ভাবতে ভাবতে পথে নামল সে।

বাড়ি ফিরে এসে ধমকে দাঁড়ালো। রান্না হয়নি, উনোন জল হয়ে পড়ে আছে—রাঁসায়র হাট করে খোলা—মেজেরে ভয়ে আছে বাসস্তী। হঠাৎ স্বামীর পায়ের শব্দে উঠে বসলো। আলোতে ওর দিকে চেয়ে চমকে ওঠে বরুণ। ওর মুখে কুটে উঠেছে রাজাজোড়া দৈহ্য-অপমানের ছায়া। স্বামীর দিকে মুখ তুলে চাইতে পারেনা বাসস্তী। যদি ভালো করে চাইতো সে, দেখতে পেতো বরুণের চোখেও অমনি অসহায় অপমানের তীব্র জ্বালা। এগিয়ে আসে বরুণ—

‘বাসস্তী!’

কাছে টেনে নেয় তাকে। বাসস্তী কান্নায় ভেঙে পড়ে—অঝোরে করছে তার চোখের জল। অন্তরের ব্যথা, নিরাশার বেদনা অপমান চোখের জল হয়ে করে পড়ছে। বরুণ ওকে কাছে টেনে নেয়। এ অপমান তাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে—বাসস্তীর দৈহ্য সে পূর্ণ করে দেবে তার সামর্থ্য দিয়ে।...কথা বলতে পারেনা বাসস্তী—ওর বুকে মুখ লুকিয়ে সব গ্লানি জ্বালা জুড়োতে চায়।

বাসস্তীর চোখের সামনে থেকে মুছে গেছে—কালকের আবছা আলোয় দেখা সেই উছল-যৌবনা মিনতিক—তার দানী আঁচলা-লুটোনো শাড়িপরা লাস্তমরী রূপ। বরুণ চেয়ে রয়েছে তার দিকে—হৃদয়েরই স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে কঠিন বাস্তবের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

বাসস্তীকে আজ নতুন কোন বেদনাতরা শ্লিষ্ট রূপে আবিষ্কার করলো বরুণ—কমা-শ্রীতি-মেশানো দৃষ্টি দিয়ে...বাতাসে বাসী রজনীগন্ধার সৌরভ তখনও নিলোয়নি।



হরিণঘাটায় হাঁস-মুরগী পালন

সব হাঁস-মুরগীই সোনার ডিম পাড়ে না! কিন্তু, যারা হাঁস-মুরগী পালন করেন ঠাণ্ডা চেষ্টা করলেই ভালো হাঁস-মুরগী থেকে বড়, ভালো ও বেশি ডিম পেতে পারেন।

যেই মুরগীর উন্নতির ক্ষেত্রে রোড আইল্যান্ড রেড ও 'হোয়াইট লেগহর্ন' জাতীয় মুরগী নিয়ে যে গবেষণাটি হরিণঘাটা পক্ষী-পালন-কেন্দ্রে চলছিল, সেটি সফল হয়েছে। বিশেষ থেকে আনন্ধানী করা খাকী ক্যাথেন জাতীয় হাঁসের ডিম থেকেও বহু হাঁস পাওয়া গেছে। এতে ক্ষেত্র ভালো জাতের হাঁস-মুরগীর সংখ্যা বেড়েছে অনেক। দেশের গো-মহিষ ও হাঁস-মুরগী পালনের উন্নতির ব্যবস্থার ফলেই গড়ে উঠবে

- হরিণঘাটার পক্ষী-পালন-কেন্দ্রে হাঁস-মুরগীর সংখ্যা সার ৪০০০।
- এই হাঁস-মুরগী থেকে গড়ে দশ ডিম পাওয়া যাচ্ছে, জাতের মত কোন পক্ষী-পালন-কেন্দ্রে তা পাওয়া যায় না।
- ১০০০-১২ হাজার ১০০০০ হাঁস দুটী ও ১,৫০০০০ ডিম বিক্রি হয়েছে।

**সোনার
বাংলা**

জনস্বাস্থ্যের জাতার্থে পশু-বন সুরক্ষায় কর্তৃক প্রচারিত

হাঁস-মুরগী পালন

১৬৪৬ গুণাচার্য

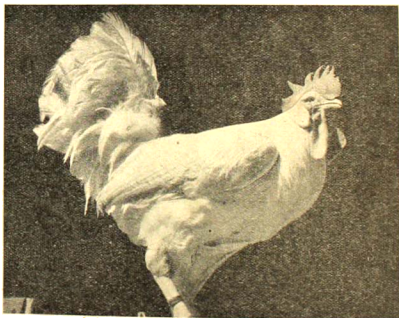


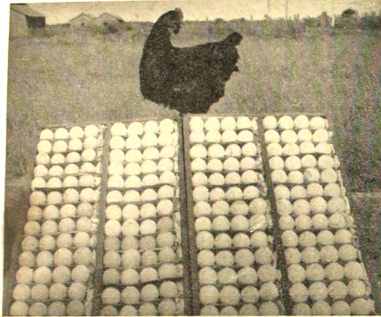
পুত্রপত্নীর ভীষনদ্বারা লক্ষ্য করে যে অশ্রিণীম আনন্দ
পাওয়া যায় তার পরিপূর্ণতা আসে নিজের হাতে তাদের
পালন করে। এদের স্বপ্ন ও ভ্রাম্যের লাবী হলে, তারাও
কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কার্পণ্য করে না। অমানবের সেপের
মধ্যস্থিত গৃহপালন প্রোটিন-জাতীয় খাবার কথা প্রায় কুলে
গেছেন। বাজারে নড়ে-বাংলার অদ্বিত্য সেপে সময় সময়
হাঁস-মুরগীর ভিন্নের কথা চিন্তা করেন, কিন্তু তাদের দিক থেকে
সেটাও খুব কম নয়; অথচ সেহেঁকে স্বপ্ন ও কর্মট রাগতে
হলে প্রোটিন-জাতীয় খাবার একান্ত প্রয়োজন। গরুর দুগে
প্রোটিন আছে; কিন্তু দেখানো সেই একই প্রহ। প্রথমতঃ
অদ্বিত্য, দ্বিতীয়তঃ

ডেঙ্গাল। বর্তমানে
সেপের খাদ্য, অর্থ
ও স্বাস্থ্যের অবস্থা
অত্যন্ত জটিল। এই
অবস্থায় হাঁস-মুরগী
পালন নতুন সমাধানের
সন্ধান সেপে অণা-
করা যায়। এতে খরচ
বেশ কম, ভেমন কম
সময়ে ভাল ফল পাওয়া
যায়, যেহেতু স্বাস্থ্যগারও
দরকার হয় না। তবে
প্রচুর পৈর্ষ ও অতিরিক্ত
জার প্রয়োজন। ডিম
প্রোটিন হিসাবে গৃহ
উচুকের বলা যেতে
পারে। একটা ডিম
আপদের দুগের কাছ
করে; আর মুরগীর
বাংলার ভো ভুলনাই
হয় না। হাঁস-মুরগী

পালনে বেকার সমস্তার যে অনেকখানি সমাধান হতে পারে
তার দুটোই আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলি।

হাঁসপালন অমানবের সেপের অতি প্রাচীন প্রথা।
প্যাডার্নারে মনী-গরীম-নিখিলে অনেকটাই চাঁচারটে হাঁস-
পালন একই জন্মের ব্যবস্থা থাকলেই কবে থাকেন। হাঁস
হাঁতেও অনেকদিন। গৃহস্থের রত্নাল বৃদ্ধি করে বলে অনেকটাই
এদের পছন্দ করেন না। হাঁসপালনের ব্যাপক প্রচলন
বাংলায় নেই। মাত্রাতিরিক্ত মনোভেদে হাঁসপালন খুবই
প্রসাধন্য করেচে। কলকাতার বাজারে বড় বড় মাত্রাতিরিক্ত
ডিম এদের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।





মোট-খাঁটাত মুগী ও ডিম

ভারতীয় সমাজে মুগীপালনের প্রচলন অতি আধুনিক বলা হতে পারে। কিছুদিন আগেও গর্ষের অংশশাসনে মুগী হিন্দুদের অশুভ ছিল। অমুনা উদারমতাবলম্বী অনেককেই বাহ্যের পক্ষে মুগীর ভিন ও মাংসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মুগীপালনে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। ভারতীয় মুসলমান, খ্রীষ্টান ও হিন্দুদের মধ্যে কেহ কেহ মুগী পালন করে আসছেন বহুদিন ধরে। কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রথা, সবার জ্ঞান ও বৈধের অভাবে ব্যর্থতা অনেক ক্ষেত্রেই নিরাশার রূপ নিচ্ছে। অনেক বলেন, মুগীপালনে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কা বেশী। উদ্দেশ্য মুক্তি-মুগীপালনে প্রথম দিকে লাভ হতে পারে, কিন্তু মড়ক লাগলে স্তূহ ক্ষতি। বর্তমান পরিস্থিতি, পণ্যপালন ও পণ্ড-উন্নয়নের মান আনন্দের সেশও এমন করে এসে পৌঁছেছে যে, সকল পণ্ড-চিন্তামূলকই পুত্রতার সঙ্গে বলবনে মুগীর মড়ক আশ আর বড় সমস্যা নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মুগে টীকা, রোগ-প্রতিরোধক 'অ্যান্টিবায়োটিক' সাদৃশ্য-স্বাদীয় ওষধ ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে বলা বাহ মুগীপালন লাভজনক।

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে মুগী পালন করতে হলে আধুনিক 'পোলট্রী কার্ণ'গুলিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আমেরিকা এবং ইউরোপের প্রতিটি 'মিশ্র গো-শালা'র মুগী পালন করা হয় এবং সম্পূর্ণ পুষ্টি ও ভাষে উন্নত ধরনের মুগী পালন করা হয়। এখানে মুগীর বাগদান, খাদ্য, পরিচর্যা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। মড়ক এখানে অজ্ঞাত, লাভ সুনিশ্চিত ও অশ্বিনীময়। পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরীক্ষামূলক-

ভাবে যে 'পোলট্রী কার্ণ'গুলি পরিচালনা করছেন তাদের মধ্যে মেসিনীপুর, রানাবাটি, বেসল ভেটেরিনারী কলেজ, হরিণবাটা গোশালা ইত্যাদির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসব কার্যের কর্তৃপক্ষটি ও ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলার জলবায়ুতে মুগীপালন খুবই লাভজনক। জায়গা ও মূল্যবন অল্পপাতে মুগীপালন করেকটা ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন-বিস্তৃত প্রথা (extensive system), সঙ্কুচিত প্রথা (intensive system), অর্ধসঙ্কুচিত প্রথা (semi-intensive system) ও সম্পূর্ণ বদ্ধ প্রথা (battery system)। বিস্তৃত প্রথার আভ্যন্তরীণ কোন মাশ থাকে না। সঙ্কুচিত বা অর্ধসঙ্কুচিত প্রথার প্রতিটি মুগীর সমস্ত কর্মক্ষেত্র চার বর্গফুট পরিমাপ স্থান চাই। বদ্ধ অবস্থার 'বিশেষ খাঁচা'র (battery) কেবলমাত্র ভিন-বেগুলা মুগীকে রাখা চলে। এ অবস্থায় পুষ্টি-স্রী মিলনে ব্যয়-বুদ্ধির কোন সম্ভাবনা থাকে না। খাঁচাটা এমনভাবে তৈরি যে, ভিন দিকের থেকে গড়িয়ে নির্দিষ্ট স্থানে আসে। যে-সব মুগী ভাল ভিন বেহে কিন্তু মৃত্যোদ্যে বনত; ভিনগুলিকে

ভেঙে ফেলে, তারের পক্ষে এই প্রথা খুব কার্যকরী। সর্বদা বহু থাকায় মুগ্ধীর স্বীকৃতি অনেক কমে যায়। এক বাৎসর ভাল ভিন্ন সেবার পর মুগ্ধীগুলি প্রায় অকেন্দ্র হয়ে যায়।

সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জীবনযাত্রা ব্যাহত না করে ১৮টা মুগ্ধীর মতো একটা ছোট পরিচরনা করা যায়। এই পরিচরনা ছোট বা বড় করা যেতে পারে। মুগ্ধী-পালন কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—বাল্যস্থান, বাচ্চ, কলগুটি, রোগ-প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং হুই মুগ্ধীর মান গ্রহণ।

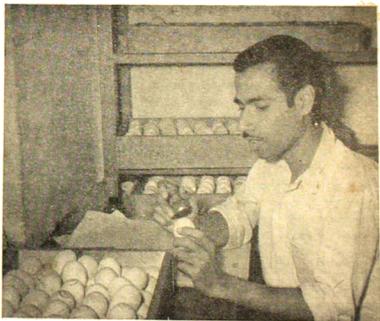
মুগ্ধীর মধ্যেও প্রেস্ট-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সেই মুগ্ধীর রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশী, কিন্তু এদের আকার ছোট ও ভিন্ন সেবার ক্ষমতাও খুব কম। বাংলার অলবাহুতে কুম্বাসাদরী অঞ্চলের 'লেগ-হর্ন' ও 'রোজ-মাইল্যাণ্ড' জাতীয় মুগ্ধী পালন করাই লাভজনক। রোজ-মাইল্যাণ্ডের রং ঘোর বাদামী, সেই মুগ্ধীর খোক আকার বড়; বাৎসর সেতপো থেকে দুগ্ধা তিমি বেশ। লেগ-হর্নের রং লাল, আকারে বেশী মুগ্ধীর চেয়ে কিছু বড় কিন্তু বছরে দুগ্ধে বেশে আড়াইগো তিমি বেশ। যে-কোন এক-

জাতীয় মুগ্ধী দেখে নেওয়া ভাল, কারণ দুই প্রকারে বিলনে প্রেস্ট-বৈশিষ্ট্য থাকে না।

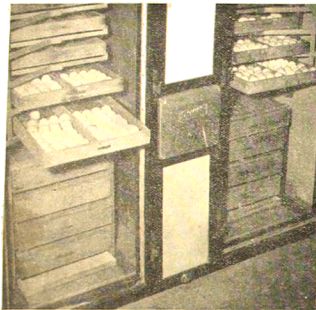
বাল্যস্থান: ছা মে র উপর অবধা ঠাণ্ডা উঠানে দ্বি-বর্গফুট পরিমিত আয়তন হলে ১৮টা ভাল জাতের মুগ্ধী পোষা যেতে পারে। বিকৃত অবধা সঙ্কটিত প্রথা এই হিসাবে বেশী সাখ্যায় মুগ্ধী পোষবার অল্প খোলা আয়তন ভাল করে তারের আল দিয়ে খোয়া দরকার। রাত্রিবারের অল্প দুই-তাল-বৃত্ত টিনের গৃহ-আকার এক কাঠের পাটাতন লাগানো ঘরের ব্যবস্থা থাকবে।

কম আয়তন দ্বি-বর্গফুট পরিমিত স্থান দুই ভাগে ভাগ করে বাল্যস্থান ও বেড়াবার স্থান করতে হয়। উত্তর দিক ঘেঁষে ছয় ফুট লম্বা, দুই ফুট চওড়া ও ছয় ফুট উচ্চ একটা ঘরে মুগ্ধী রাখিবাল করতে। সামনের দিকে একটা দরজা, থেকে থেকে দুই ফুট উচ্চ কেঁচা এবং বেড়া থেকে ছাব পর্বত আল দিয়ে ঘিরে দিলে ঘরে আলো-বাতাসের স্তব্ধ হবে না। বাকী তিন পাশ ও ছাদে কাঠ অবধা টিন সেওয়া যেতে পারে। ঘরের মধ্যে তিন ফুট উচ্চত দুই ইঞ্চি চওড়া, দুই ইঞ্চি পুরু ও ছয় ফুট লম্বা তিনখানা কাঠ লম্বালম্বি ভাবে লাগিয়ে দিলে গ্রামে মুগ্ধীগুলি এর উপর বসতে পারে। ঘরের কোণে আড় করে ছয়-পাতটা ছোট গামলায় কিছু বালি রেখে দিলে মুগ্ধীগুলি এর মধ্যে ভিন্ন পাড়তে অভ্যস্ত হয়। বাকী খোল-আঠারো বর্গফুট আয়তন ছয় ফুট উচ্চ করে তারের আল দিয়ে ভাল করে ঘিরতে হবে। ছাদটাও আল দিয়ে এঁটে দিলে মুগ্ধীগুলি সর্বদা আবদ্ধ থাকে। যেতে পাকা না করে বাজির হলে ভাল হয়। পাকা মেসেতে ছয়-আট ইঞ্চি পুরু করে শুকনো মাটি সেওয়া চলতে পারে।

বংশগুটি: ষাটা নতন করে হুক করবেন তাঁদের পক্ষে



দ্বি-পটিকা



ইনকিউবেটর

ঈতকালে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটান দেওয়া যায়। ডিম সিদ্ধ এমন একটা দেশে খুবটী ক্রিয়ন। তার গারে 'গ্যামাজিন' পাউডার ছড়িয়ে পোকা ঝটোন্স দূর করন। ডিম দেওয়া শেষ হলে, গভর্নমেন্ট ফার্ম থেকে বাচ্চা তৈরী করার মতো ৮১০টা ডিম (fertilised egg) এনে একটা গানসার শুকনা বাগির উপর সাজিয়ে দিন। ডিমের ওপ পটীকা সহজ নহ। সাধারণত উচ্চল আলোয় বিপরীত দিকে ডিমটা ফুলে পরে ডিমের ডিমেরকার বহুতা পটীকা করা হয়। প্রথম সাত দিনে এতপাশে একটু ঠাণ্ডা আরণা (air box) ছাড়া বাকী অংশ সমান বন্ধ থাকে। এই অবস্থায় ডিমের আকার ইত্যাদি ভালভাবে বেছে নিয়ে খুসীটাকে 'তা' দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হয়। সাতদিন বাদে সত্তর্পণে ডিমগুলিকে অগ্ন্যপভাবে পটীকা করতে হয়। এই সময় ঠাণ্ডা আরণটি ছুঁ আকারে বড় হয়, হৃদযটির গোলাকার অবস্থা সহজে বোকা যায়। ডিমের চারপাশে মাকড়সার আলোর মতো চতুর্দিক-বেষ্টিত আবরণ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যরণ ডিমের সাতদিনে এইরূপ কোন পরিবর্তন হয় না। একশ দিন বাদে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে। ইতিমধ্যে

ডিমগুলি নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নেই। প্রত্যাহ জ্বাঝ করে পাঁচ-ষট্টি মিনিটের অন্ত খুসীটিকে উঠিয়ে এনে একমুঠা গম, ছোলাচূর্ণ ও কুসর মিশ্রণ ও কিছু কাঁকর মিলেই চলবে। কুসর পাশ খুসের কাছে রেখে দেওয়া ভাল। ডিম কেটে বাচ্চা আশনা থেকেই বেহিমে আসে। বাচ্চা কোটার পর পেতে না দেখা পর্যন্ত (৪৮ ঘণ্টা) তাদের আটকে রাখতে হবে। এই সময় তাদের কিছু খাবার দরকার হয় না। তারপর খয়ের মধ্যে মা ও বাচ্চাগুলিকে ছেড়ে দিন। বাচ্চাদের অন্ত 'পার্ক-লিডার অয়েল' দুই-চার চামচ ও এক ছটাকের মতো ছাড়া পাতলা করে ঘেমে একটা লম্বা সর খোলার মধ্যে রেখে দিন। দেড় মাস পর্যন্ত বাচ্চাগুলো মাকের সাথেই থাকবে। তারপর মাকে ঘুরিয়ে দিন। ছোলাচূর্ণ, হুন ইত্যাদি ও কিছু কাঁচা শাক মাটিতে ছড়িয়ে দিলে বাচ্চাগুলো খেতে পারবে। এই সময় বাচ্চাদের

রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বিশেষ নম্বর দেওয়া উচিত। ২০ সপ্তাহ বয়সে 'কক্সিডিওসিস' রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। একটা এম্ব্রিওন বড়ি অথবা সালফামেন্ডাসিন একপোয়া মলে কিছু শুঁড়া খুসের সাথে মিশিয়ে পর পর ৩ দিন এদের খেতে দিন। এতে কক্সিডিওসিসের ভয় দূর হবে। যাবে মাকে মলের সাথে অল্প পরিমাণ পটাসিয়াম-পারমাংগানেটে গুলে খেতে দেওয়া ভাল। ছয় সপ্তাহ বয়সে রাষ্ট্রকেত ও কলসার টীকা দিলে নিষ্কর করে বমা দায় বে ব্রী-বাচ্চাগুলো অধু পটীকে ৬৭ মাস বয়স থেকে ডিম দিতে শুরু করবে। বড় আকারে খুসী পাক্স করতে হলে ডিম ফুটাবার আধুনিক বর 'ইনকিউবেটার' খুবই কার্যকরী; এতে একসাথে অনেকগুলি ডিম ফোটানো সম্ভব। কেরোসিনের আলো অথবা ইলেকট্রিকের সাহায্যে এই যন্ত্রব্যয় ভাল ১০১ ব্যাঃ রাখা হয়। ডিমগুলি থাকে তাকে সাহায্যে থাকে। প্রত্যাহ ডিমগুলিকে ঘুরিয়ে দিতে হয়। বলা বাচ্চা, ডিম কোটাবার সময় প্রতে ৩২ দিন প্রায় নির্দিষ্ট। বাচ্চা কোটার পর 'কল্যায় মাদার' নামক খয়ের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা রেখে দিলে বাচ্চাগুলি তাকাতাড়ি সতেজ হয়।

খাত : মুরগীর খাত খুব সাধারণ, গৃহস্থের পক্ষে পাওয়া শক্ত ব্যাপার নয়। সংসারের বাড়তি ও ছাতি অংশ থেকে এদের খাত খোঁজা করা যায়। খাতে কিছু শর্করা, ডিটাইন, প্রোটিন ও লবণ থাকা প্রয়োজন। খাতের সঙ্গে কিছু ঝাঁক চাউ, কয়েক ঝাঁক পেটের শক্ত খাত ওড়িয়ে দেয়। তরকারির খোসা, শাকপাড়া, মাছ-মাংসের পরিত্যক্ত অংশ, ভাতের খাত, চালের ক্ষয়, গমের ছুটি ও উজ্জিষ্ট খাত গুছিয়ে রাখলে বাজার থেকে খুব কম খাত কেনার প্রয়োজন হয়। পাচকশক্তি ভাল, ছোলা, মটরফুল ও কিছু ভাঙা চাল দলেই খাতমত্তা বিটে যায়। প্রতিটি পূর্ববর্তী মুরগীর জন্য প্রত্যাহ সন্ধ্যা-বিকাল একমুঠো করে ঐসব মিশ্রণ মাটিতে ছড়িয়ে মিলে তাদের খাওয়া ও বেড়ানো দুই-ই হবে। হপ্পরে কিছু ঝাঁক শাকপাড়া ছড়িয়ে দিলে ও অত্যন্ত বিনিদ্রগুলি দিলে ঘন অবস্থায় (প্রতিটি মুরগীর জন্য ২ ছাঁক পরিমাণ) একটা পারে রাখলে তারা ইচ্ছেমতো বেতে পারে। পাড়ায়েরে টাটকা শাদু ভেঙে বেওয়া চলতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে, এই খাতগুলি যেন ২৪ ঘণ্টার বেশী পড়ে না থাকে। খাতপাত্র পরিষ্কার না থাকলে, রোগ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন জল একটা পারে সব সময়ের জন্য থাকবে।

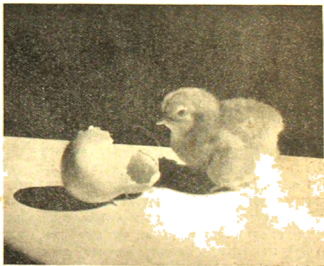
বাহ্য ও ব্যাধি : মুরগীর বাহ্য ও ব্যাধির বৈশিষ্ট্য এই যে, মাছ ও গৃহশাসিত জীবজন্তুর অধিকাংশ সংক্রামক রোগ থেকে এরা মুক্ত। এদের দেহের তাপ (১০৭° ফাঃ) এত বেশী যে, এইসব রোগের বীজাণু-গুলি এদের শরীরে প্রবেশ করে বিকৃত পারিশ্রমিক অবস্থার বণ-বৃদ্ধি করতে ভেদন হুঁশোগ পায় না। এদের রোগ-বীজাণু ও ভাইরাসগুলি হাঁস-মুরগীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। মুরগীর রোগগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—পৃথিবীভিত্তিক ও সংক্রামক।

রোগ প্রতিরোধ করতে গেলে মুরগীর বাহ্য সযত্নে সচেতন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আলো-বাতাস-দ্রুত ঘর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বীজাণুনাশক দ্রব্যের ব্যবহার, বেশী জীড় করে না রাখা, উপযুক্ত খাত ও সময়মতো টীকা দেওয়া বাস্তবকার্য অপরিহার্য নয়। রোগের

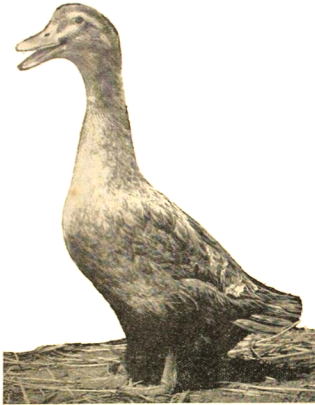
প্রাচুর্যের স্রবস্ত্র-সীকার সাহায্যে বাই-কেড, কলেরা ও বসন্ত রোগের সংক্রমণ বন্ধ করা যেতে পারে। মুরগীর সংক্রামক রোগগুলির মধ্যে বাই-কেড, বসন্ত, কলেরা, পুণ্ডারাম ব্যাধি ও কন্ট্রিডিগিনস-ই আমাদের দেশে মড়ক আকারে দেখা দেয়।

মুরগী সযত্নে প্রত্যেক অতিষ্ঠতা ও পৈথ্য রোগ-নিবারণের প্রধান সহায়ক। পচিমবঙ্গ সরকারের পত্র-চিকিৎসা বিভাগ মুরগীর রোগ সযত্নে খুঁই সচেতন। কোন সময়ে কোনভাবে পালের একটা মুরগী মারা গেলেই তৎক্ষণাৎ তাকে ভাল করে মুড়ে নিকটবর্তী পত্র-স্বাস্থ্যপাতালে দ্রুতবেগে শরীকার জন্য পরামর্শে উত্তিত। দ্রুত মুরগীর ঘর ভালভাবে বীজাণু-নাশক দ্রব্যের দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে, হাঁসপাতাঘের নির্দেশমতো ব্যবস্থা অবলম্বন করলে সংক্রামক রোগ বিস্তার-লাভ করতে পারে না। মুরগীর টীকা সযত্নে পচিমবঙ্গ পত্র-চিকিৎসা বিভাগে বিস্তারিত খবর পাওয়া যাবে।

হাঁসপালনের সুবিধা হল—এরা অত্যন্ত বিকৃত পারিশ্রমিক অবস্থাতেও অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে এবং সংখ্যায় কম হলেও কয়েক বছর পরে ডিম দেয়। এদের পাওয়া-পাওয়া বা বাসস্থান সযত্নে খুব বেশী চিন্তার প্রয়োজন হয় না। এক কথায়, এরা গরীবের পরম উপকারী বস্তু।



ডিম থেকে বাক্সা বোটার গর

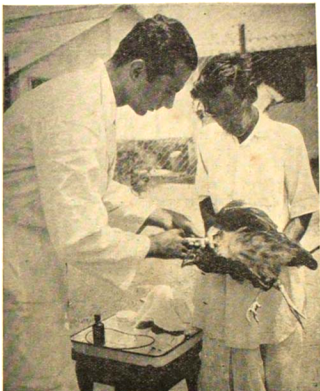


ধাঁকী ক্যায়েল

পত্রপকীর মধ্যে এরা খুব বেশী বৃদ্ধিমান, অভিমাত্রী, প্রবৃত্তক ও নিয়ন্ত্রণবর্তী। আমাদের দেশের উপহৃত হাঁসের প্রেক্ষিত্ব-গতির মধ্যে ধাঁকী ক্যায়েল ও সাধা ক্যায়েল-ই ডিমের অল্প উপযোগী। সচরাচর যে-হাঁসগুলি দেখা যায়, এরা মিশ্রজাতীয়। 'ইতিহাস রানার' পোতা ও ডিমের অল্প জনস্বখ্যাত। কিন্তু এসের পালনে প্রচুর ব্যয় ও দক্ষতার প্রয়োজন। হাঁসের অল্প হাঁসপালনের রীতি এখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মেসিনীপুর কার্বে ধাঁকী ও সাধা ক্যায়েল প্রচুর লাভজনক হয়েছে। এরা বছরে গড়ে ১০০টি ডিম দেয়। ডিমের আকারও বেশ বড়। হাঁসপালনও কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে; যেমন—বাদখান, খাঁড়, বংশবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যরক্ষা ও হানগ্রহণ।

হাঁসের বাদখান অতি সাধারণ। জলাশয়ের স্থিতি থাকলে রাতিবাসের মতো একটা ঘনবৃত্ত ঘর হলেই চলবে। শব্দর অকলে অথবা জলাশয়ের অভাবে সাতারানি আটকে রাখবার মতো একটা খাঁচার প্রয়োজন। এরা ভাল উড়তে পারে না। সুতরাং ঘুরপীর খাঁচার মতো বড় ও উঁচু ঘেরা আবধার প্রয়োজন নেই। প্রতিটি হাঁসের অল্প অন্তত দু'বর্গফুট পরিমাণ জায়গা তারের জাল দিয়ে চারপাশ ঘিরতে হয়। ঘেরে পাকা অথবা ইট-পাতা হলে সহজে পরিচার করা যায়। খাঁচার একপাশে রাতিবাসের অল্প ঘর এবং একপাশে একটি চৌবাচ্চার প্রয়োজন। চৌবাচ্চা ১ ফুট পতীর হলেই চলবে। জল দ্বাংতে বিনে অন্তত একবার ঘলে নেওয়া যায় তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। চৌবাচ্চার পাড় মাটি থেকে ১ ফুট উঁচু করে

পাঁখিতে হর এবং চৌবাচ্চায় তলা মাটির প্রায় সমতায় থাকবে, পারে না। মুরগীর খেতে পরিমাণে কিছু বেশী খাওয়ার স্বাভেত সহজে মল নিষ্কাশন হতে পারে। পাড় থেকে ঢালু প্রয়োজন হয়।



মুরগীকে রোগ-অভিযোগক ইন্সপেকশন বেগা হাঙ্গ

করে গথ করে দিলে, হাঁস ওই গথে ওঠা-নামা করতে পারে। চৌবাচ্চা খুব বেশী বড় নয়কার নেই; চার-ছ'টা হাঁসের জন্য ৬ বর্গফুট হলোই চলবে।

হাঁসের খাদ্যও মুরগীর মতো প্রোটিন, ভিটামিন, শর্করা ও কিছু লবণ প্রয়োজন। মুরগী ও হাঁসের খাদ্য প্রায়ই সমান। তবে হাঁসকে কিছু খান, শামুক-ভাঙা ইত্যাদি দিতে হয়। এদের খাদ্যে কিছু মল মিশিয়ে না দিলে, শুকনো খাদ্য খেতে

হাঁসের ডিম মুরগীর সাহায্যে কেঁটাবার রীতি প্রচলিত আছে। মাটাশ-দিনে ডিম থেকে খাতা বেরিয়ে আসে। বাগবুড়ির প্রথা মুরগীর থেকে তফাত নয়।

হাঁসের স্বস্থ-বিস্থ হয়না বললেই চলে। ভালমতো খেতে দিলে ও একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে এরা বহুদিন বেঁচে থাকে। মুরগী ও হাঁসের রোগ প্রায় এক। স্বতন্ত্র লগ্নলে এদের বাঁচানো খুব কঠিন।

ধাবি

মানবেন্দ্র পাল

টুঙ্গের নিজের বোনের অভাব ছিল না, তাই বই-এর পাতায় কিংবা ক্যালেন্ডারে হৃদয় ছুঁছুঁতে ঘেরে ছবি দেখলে তাকে কোন বলে ভাবতে ইচ্ছে করত না।

অভাব ছিল তার বউ-এর। ছোটবেলা থেকে তখন এসেছে 'খোকা' হায়ে বিনে করতে'—কল্পনায় দেখে এসেছে 'চিকন চিকন চুলগুলি তার কাঁড়তে লেগেছে', এমনি আরও কত। রতনখার গল্পের রাজকুমারীর সঙ্গে তার যে কল্পনায় কতবার মিলেছিল হয়ে গেছে তার হিসেব নেই। 'বউ' বললেই তাই তার মনের সামনে ভেসে ওঠে রাগা-টুকটুক একধারি মূখ,—সে মূখ শুধু হাসে নিঃশব্দে, কথা কয় না।

তাই কোনো বই-এর পাতায় হৃদয় কোনো ঘেরের মূখ দেখলেই টুঙ্গ হৃদয় থেকে পড়ে—কণ্ঠ নিখোলে দেখে, মনে মনে ডাববে—এ দৃশ্য তার বউ হত!

হৃদয় বউ হত—

ভালো যে কি হত, তেরো বছরের টুঙ্গ তা জানে না। জানেনা মনেই কোনো রক্তবাসে পড়া ঘেরোক সামনে কেবল তাকে স্নিগ্ধ ভাবতে পারত না। সে-বেয়ে বেন তার কল্পনার রাজ্যের রাজকুমারীটি ন।

এ পার্শ্বকাটা যে কতকড়া সত্য তা টুঙ্গ বোঝে এই রাগটাকে কেনেই।

পাশাপাশি বাড়ি। রোজ বিকেলে টুঙ্গের মা আসেন রাহুর মাঘের সঙ্গে গল্প করতে। মাঘের আচল-বরা ছেলে টুঙ্গ; এই ফুলে কোথায় মাঠে বাবে, বল বেলাবে, ছোট্টাটি করকে—তা নহ, মাঘের সঙ্গে শুধু ঐ রাহুর বাড়ি। সেখানে তার একমাত্র সখী রাহু।

রাহু রোজ বিকেল হলেই চেয়ে থাকে সামনের বাড়ির দিকে। ঐ যে টুঙ্গ জানা পরছে—ঐ যে মালীমা লুল আঁচড়ে বিচ্ছেদ,—এখনি আসবে তাহলে। ও তাড়াতাড়ি ক্যারাম-বোর্ড সাক্ষিবে বলে, আশ টুঙ্গকে দেখ দিতে হবে।

টুঙ্গ আসে, কোনোদিন খেলে ক্যারাম, কোনোদিন লুতো। কোনোদিন বা রাহু টেনে নিয়ে যায় ওর হাত ধরে নিজের ঘরে। নতুন কোনা পল্লের বইটা আলমারি থেকে বের করে পাশাপাশি বলে পাতা ওলটায়।

পাতা ওলটাতে ওলটাতে আর উদ্ভাসিত হয়ে গল্প করতে

করতে রাহু আনন্দগরা হয়ে যায়। হঠাৎ একদমের বাবে, শেষে টুঙ্গ অগ্রথিকে তাকিয়ে কী ভাবছে। তার কথা একটা বর্ণও বোধহয় টুঙ্গের কানে বাধনি।

গল্প অভিযানে বালিকার চোখ জারী হয়ে আসে। কোনোরকমে টুঙ্গকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে—এই—

টুঙ্গ চমকে ওঠে। লজ্জিত হয়।

রাহু জিজ্ঞেস করে—আমার কথা কিছু শোনেনি তো?

টুঙ্গ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। বলে—একটু পরে শুনব।

এই বলে ঘর থেকে বেহিয়ে যায়।

বেহিয়ে যে কোথায় যায় তা কেউ জানে না। অন্তরকড়া বাড়িটার কোথায় গিয়ে টুঙ্গ আশ্রয় দেয় কে তার খোঁজ করবে? যা তো গল্প মশগুল। এক পারে রাহু। কিন্তু সে বেচারিও অভিযানে লুপ্ত। টুঙ্গ উঠে গেলে সেও চূপচাপ চলে আসে মাঘের কাছে। মাঘের কোলের কাছে হৃদয় থেকে বলে মতবাক্যে শোভার মতো দাঁ করে জীসের কথাগুলো গলাধঃকরণ করবার চেষ্টা করে।

একটু পরে হঠাতো টুঙ্গের মাই খোঁজ করেন—টুঙ্গ কোথায় রে? এই বলে নিষেই তাকেন—টুঙ্গ—টুঙ্গ!

সে ঘর গিয়ে পৌছয় সে-বাড়ির চিলে কোঠায়। অমনি সেই নির্জন ঘরে টুঙ্গের বুটো কেঁপে ওঠে। লজ্জা পায়—মনে হয় বুকি বরা পড়ে গেছে। তখনই সেখান থেকে নেমে আসে বোতলায়। ভালো ছেলোটর মতো মাঘের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

—ডাকছ?

—হ্যাঁ, কোথায় ছিলি?

—ছাতে বেড়াছিলাম।

না, বেড়ায়নি। এই বরেন্দ্রেই টুঙ্গ খুব বৃন্দ ব্যাপারেও দ্বিধা বলতে শিখেছে। সে তখন ছিল ঐ চিলে কোঠায়। দাঁড়িয়ে ছিল ঠার। কী কেন দেখছিল দু চোখ ভরে।

মা কলেন—মজ্জার ঘরে আসছে, চূপ করে একতালিয়ার বোসো-না। ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

টুঙ্গ ভালো ছেলের মতো বলে পড়ে। তারপর একবার রাহুর পানে। রাহু তখন উঠে পড়ে। মাকে বলে—সঙ্গে হল, লম্বীর মাকে আসো আলোতে বসি।

ঘরের কানে সে কথা বার না। গেলে একটু অবাক হতেন। সঙ্গে-আলার কথা কি আবার কাউকে বলে দিতে হয়?

এমনি প্রায় রোজ। একটু ভাক গেলেই টুইল পালিয়ে বাঘ আর কোথাও নয়, একেবারে সেই চিলে কোঠায়। সে-বধর তো কেউ জানে না।

নীচ থেকে একটু পরে কেবলই ডাক শোনা বাঘ—টুইল—টুইল!

টুইল চোরের মতো পা টিপে টিপে নেবে আসে।

একদিন অমনি বেলায় ঝাঁকে কোন্ সময়ে টুইল সরে পড়েছে। রাহুর কি খেয়াল হল, খুঁজতে লাগল। ভাবল, কোথাও পালায় রোজ কেবোবে আজ।

খুঁজতে খুঁজতে চিলে কোঠায় গিয়ে হাজির। দরোজা ঠেঁসানো ছিল। আঙে আঙে সতর্কপণে দরোজাটা খুললে। তারপর ভরের মধ্যে ঘূঁটা বাড়িয়ে উকি মারল।

বেশল, টুইল সত্যিই রয়েছে। একমনে বেগুনে টাঙানো পুরনো এতটা ছবির পানে হা করে তাকিয়ে কী বেন দেখছে।

—টুইল!

টুইল অমনি চমকে উঠল। ঘূঁটা লাল হয়ে উঠল। কী বেন অপরূপ করছিল, ঘরা পড়ে গেছে।

—কী দেখছ?

টুইল চুপ করে রইল।

—বলো-না কী দেখছিলে?

টুইল বললে—ঐ ছবিটা।

রাহু বললে—ওটা তো একটা ঘরের ছবি।

টুইল বললে—হ্যাঁ, ভারী হুম্বর। আমার খুব ভালো লাগে দেখতে।

রাহু হাসল একটু। —এই দেখতে বৃষ্টি ছুঁই রোজ আস এখানে।

টুইল মাথা নিচু করে রইল।

এবার রাহু ছবিটা ভালো করে দেখতে লাগল। তারের বাড়িতে এ ছবিটা যে কতকাল ধরে রয়েছে তার ঠিক নেই, কিন্তু কোনোরকম তো ভালো করে দেখেনি!

আজ দেখল। সত্যিই বড়ো হুম্বর দেয়টি। কেন একটা ছল ফুটে আছে কুশাশ-ঢাকা বাগানে।

টুইল ততক্ষণে আবার তাকিয়েছে। মুখ কণ্ঠে বললে—রাহু, এ নিচরই কোনো দেশের রাজকন্তে।

রাহু কিছুক্ষণ কী ভাবল। তারপর বললে—হুতও পারে। কেউ হয়তো ঘর পড়ে ছবি করে রেখে দিয়েছে।

টুইল চুপ করে রইল। রাহুও চুপ। কারও মুখে কথা নেই।

কতক্ষণ কেটে গেল। রাহু বললে একদবার—টুইল, তুমি ওকে বই করবে?

টুইল বললে—হ্যাঁ। কিন্তু ওর বাড়ি কোথাও কী করে জানব?

রাহু কিছুক্ষণ চুপ করে কী ভাবল। তারপর একদবারে বিজ্ঞের মতো বললে—আচ্ছা, মাকে জিগেল করে রাখব।

ততক্ষণে অন্ধকার বেঘে এসেছে। সেই চিলে কোঠায় ছোট্ট আলো শির আর আলো আসছে না। সে-বালের অনেক উজ্জ্বল টাঙানো বহুকালের সেই ছবিখানি কখনও এদের পুষ্টির বাইরে চলে যেতে লাগল।

রাহু বললে—চলো এবার আমরা নীচে বাই। পিচ্চিটা বড়ো অন্ধকার।

টুইল বললে—তোমার মাকে কিন্তু জিগেল কোনো মনে করে।

রাহু মাথা নাড়লে। বললে—আচ্ছা।

কিন্তু জিগেল করা আর হয়নি। মাঝখানে দু-একটা ঘটনা ঘটে গেল। সাময়িকভাবে টুইলের বাবাকে স্বেতে হল বাইরে। বাড়িতে ডালাচাখি পড়ল।

টুইল বড়ো হুত লাগল। প্রথম প্রথম কিছুকাল রাহুর লগে কাটা হাতের লেখায় ডিটিপনের আদানশর চলল। তারপর বাড়িখানি নিচরই তা বহু হয়ে গেল। তখন টুইলের নতুন পরিবেশ—নতুন বহুজন। ওরা-বাও বলগেছে। দীর্ঘসেহের ওপর নতুন বোবনের ইসারা দেখা দিয়েছে। কথা বহু—একমাথা ঘন কালো চুল—মুখের ওপর ফুটে উঠেছে তাকপোর ভাবল আভাল।

টুইল ম্যাট্রিক পাস করে চলে এসো কলকাতায়। কলেজে ভর্তি হল। তারপর কাটল আরও চার-ট বছর। বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে টুইল ফিরল বেগে। মা বাবা সবাই এসে পেছন। বহদিন পর নিষেধ বেগের পুরনো সেই পরিবেশটাই ফিরে পাবার গোডে টুইল চকল হয়ে উঠল। রাহুর কথা যে মনে পড়েনি তা নয়, কিন্তু বেশি জাবেনি। এতদিনে সেও নিচর অনেক বড়ো হয়েছে। দেখতে লোড হহু—কিন্তু দেখা কি দিলে? এতদিনে নিচরই বিয়ে-বা করে চলে গেছে খওরবাড়ি।

অনু দীর্ঘদিন পর সত্যি-সত্যিই একদিন টুইল গিয়ে ডাকল—মাসীমা!

হাঙ্গনে বলে হুট তরুণী বকিনচন্দ্রের 'রক্তকান্তের উইল' নিয়ে আলোচনা করছিল। হুট/২ অপরিস্রিত পুরুষের কর্তব্যর ভ্রমে চমকে ফিরে তাকালো।

একটু লাজুক হাসি হেসে টুইল বললে—চিনতে পার ?

রাহু চিনতে খুবই শেগেছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে কী ভাবাব সেরে ভেবে গেলেন।

কোনোরকমে একটা আসন পেতে গিয়ে 'বহু' বলে একছুটে চলে গেল রায়গারে। বললে—হা, শিগ্গির এসো, লেবে বাও কে এসেছে।

বাইরে বাবান্দার গাড়ির গাড়ির টুইল গুনতে পেল রাহুর সেই চাপা পুলকে ভরা উচ্চাঙ্গ।

—এসো-না হা! আর হাত ধুতে হবে না।

রাহুর হা এসেন। খুব খুশি হলেন। বললেন—তুই কত বড়োটা হয়ে গেছিল বাবা! এই বলে কাছে টেনে নিয়ে আদর্শিত করলেন।

রাহু হর থেকে গাড়ির গাড়ির দেখতে লাগল, কিন্তু নিজে কোনো কথা বলতে পারল না।

চলে আসবার সময় রাহুকে একটু একলা গেয়ে টুইল বললে—কী! তুমি যে কথা বললে না আমার সঙ্গে ?

রাহু এবারও কোনো কথা বলতে পারল না। কানের দৃশ্য শুধু লাগে হয়ে উঠল।

নির্বোধ টুইলকে রাহু বোকাবো কী করে যে, তার লম্বায়ে বড়ো সমস্ত—কী বলে ডাকবে সেই বাগ্যানাটিক। টুইল বলে? ছিঃ! আচ্ছ সে কত বড়ো হয়ে গেছে—নাম ধরে হেন আর তাকে ডাকা হবে না।

কিন্তু এ লম্বাচ বেনিদিন হইল না। নাম ধরে-না ডায়েলও টুইল সত্যি সত্যি। আসত ও প্রত্যেক শনিবারে। ডায়েল চাকরি ছুটির নিবেছে কলকাতায়। মনের কোণে নবীন আশা তখন রঙীন হয়ে উঠেছে।

হু-একবার চুপ করে বসে থেকে রাহু আবার পড়ছিল বি.এ.। টুইল এসে শির্ষ চান্দ্র বললে একমিনিট—এই তো চাই। আবহা ছিলাম একমিনিট বালাসাই—হুতো হয়েও বেন কোনো বিক ফিরে আবার কেউ কাউকে ছাড়িয়ে না গাই।

রাহু কোনো কথা বলতে পারেনি। নিঃশব্দে শুধু দুখটা লাগে হয়ে উঠেছিল।

কথাটা খুবই সামান্য। তবু এই ভেতর থেকে রাহু বেন কেমন করে হুঁতে পেল একটা পরম নির্ভরতা—সোজা-সোজা একটু আশা। পড়তে লাগল দিনরাত। বাতায়ন শুক করলে প্রকোষারদের বাড়ি। বাতায়ন ভর্তি করে মোট বিলে।

কিন্তু এতেও মন ভরল না, পরিবার সিন ধন টুইল আসে তখন অকস্মাই রাহু একগালা বইখাতা নিয়ে লাজুক হাসি হেসে এসে পাঁচের টুইলের কাছে।

—ইকনমিক্সটা একটু বুকিয়ে রাখেন ?

টুইল চেয়ারে না। খুশি হয়ে বললে—নিশ্চয়ই।

এমনি ভাবে লম্বায়ে লম্বায়ে এগিয়ে চলছিল ওরা। ছুটিতে। নানা কথা অবত উঠেছিল এইই মধ্যে। বাবা হুন্দরকে ভোগ করতে পারেনা তারা চিরদিনই হুন্দরের মতো কলচুই-কুই বড়ো করে দেখিয়েছে—হুটিয়েছে। নাপালের বাইরের পদচলটি ধন পাওয়া যায় না, তখন ইচ্ছে করে, হর থেকে ইট ছুঁতে পাশাভিত্তিগো খসিয়ে দিতে। সেইসঙ্গে হুডগায়া ডোমরাটাও যদি হর ডায়েল।

ইকনমিক্সের বইটা সাহসে বুলে এক নির্জন মুহূর্তে সেদিন রাহুই প্রথম বললে—ডায়েল, তুমি এখানে আস বলে পাড়ার ইতিমধ্যে চাকলা উঠেছে।

টুইল হেসে বললে—আমি যেখানে বাই সেখানে পাড়া ভাগিয়ে ছুটি। লজীব নই না হলে জোয়ার আসে না। জোয়ারে ধলন আসে তখন নলীর তীর একটু ঢলল হয় বৈকি। রাহু বললে—তোমার কাব্য রাখো। যা বসেছিলেন, তুমি বেন কিছু হর কোতো না।

টুইল বললে—মনে একটু করতে হয়ে বৈকি। নইলে জনের জীবন দেখার উল্লাহটা যে কমে যাবে।

রাহু বললে—কী জীবন লেবে ?

টুইল কিছুক্ষণ ভাবিয়ে হইল রাহুর পানে। তারপর আচ্ছ আচ্ছ বললে—সে জীবন তো আমার একা যেওনা খোডা পাবে না। তোমাকেও পাঁচাতে হবে আমার পাশে। রাহুর মাথাটা নিচু হয়ে পেল লম্বায়ে। চুপ করে হইল। টুইলও নির্ধাক। মনের ভেতর ওর শুধু ঢললতা। বাইরে তার প্রকাশ বই।

টোবিলের ওপর ইকনমিক্সের খোলা পাড়াটা শুধু বাতাসে উড়তে লাগল।

একমিনিট অধি টুইল এসেছে। রবিবারের বিকল। রাহু এসে নিচু পলায় বললে—এই, শুনে বাও।

টুইল বেন ওর কর্তব্যের একটু আদর্শ হল। বললে—কোথায় বাব ?

—এসো না—

এই বলে রাহু এগিয়ে চলল। অবাক বিষয়ে টুইল চলল শিছু শিছু।

ঘোড়ায় এসে একটা সিঁড়ির মুখে রাহু পাড়ালো। তেতলার সিঁড়ি। টুইলের মুখের বিকে তাকিয়ে রাহু একটু কৌতুকমাধা হাসি হাসল। টুইল সে হাসির অর্থ ধরতে পারল না।

পায়ের আঁহলের ওপর ভর দিয়ে পাড়িয়ে রাহু সিঁড়ির সরেজোয় শেকলটা খোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু অনেকদিন বন্ধ থাকার শেকলটা বড়ো এঁটে গিয়েছিল, খুলতে পারল না।

তখন রাহু আবার একবার তাকালো টুইলের পানে।
—এই, খোলো জো।

টুইল একটানে খুলল। কান্না করে শব্দ হল। আন্তরে উঠল রাহু। কিস্কিন্ধ করে বললে—আন্তরে!

এই সেই ছিলে কোঠা। অনেকদিন অনেককাল এই ঘরে টুইল আগেনি। আলবার প্রয়োজন হয়নি। সেই ছোটবেলার আসত লুকিয়ে লুকিয়ে। তারপর দীর্ঘদিন পর আঁহ আবার চলেছে সেই ঘরে সম্বর্ণণে।

বড় অদ্ভকার সিঁড়িটা। এমন অদ্ভকার তখনও ছিল। সিঁড়ির কোণে কোণে পুরনো ডাঙা বায়র যুগ—কাপড়ের পুঁটিসি। রাহু এগিয়ে চলেছে। পেছনে টুইল। কেউ কোনো কথা বলছে না।

ছিল কোঠায় এসে রাহু হেসে বললে—কিছু মনে পড়ে?
টুইল বললে—কি?

—ভুলে গেছ? তোমরা পুঁকব মাহুয় এমন নির্দয়ই বটে। একটি ঘেয়েক বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে, এত শিশুটির ভুলে গেলে!

টুইল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

রাহু তখন আঁহল দিয়ে দেখালো একটা ছবি। খুলো পড়ে ছবির কাচটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। তবু চেনা যাচ্ছে।

এতক্ষণে টুইল বুঝতে পারল। হেসে উঠল হো হো করে। —ওঃ, এইরকম এখানে আনলে আমাকে!

রাহু কিছু বিশেষ হাসল না। ওর চোখভুটো তখন কেমন চক্চকু করছে।

বললে নিচু গলায় শাবিত করে—মনে আছে? একে একদিন বিয়ে করতে চেয়েছিলে? আমায় বলেছিলে এর খোঁজ নিতে। খোঁজ নেব?

টুইল আবার হাসল। বললে—না, আর দরকার নেই। ছবি দেখে এখন আর মন ভরে না, রক্তমাংসে গড়া মাহুয় চাই।

এই বলে লম্বা সেই নির্জন গ্রাম-অদ্ভকার কক্ষে টুইল রাহুকে টেনে নিল কাছে। রাহু এতটুই বাধা নিল না।

সে বেন এমন একটা আনন্দমর্পণের ভরতে দিন দিন ধরে ব্যাহুল হয়ে ছিল।

কতক্ষণ কেটে গেল।

একসময়ে রাহু কাপা গলায় বললে—ছাড়া—

টুইল বললে—না।

রাহু তেমনিভাবে ওর কানে মাথা রেখে বললে—ছাড়া, এখনি যা খুঁজবেন। সঙ্গে হল।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নীচ থেকে ডাক এল,
—রাহু—

রাহু চমকে উঠল। বললে—সর্বনাশ। ট্রিক যা জেবেছি। এই বলে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে গেল পাড়ালো। বললে চুপি চুপি—আমি আগে চলে যাই। আপনি একটু পরে আসবেন।

এই বলে রাহু পাড়ির আঁচল টিক করে মাগে আন্তরে নিঃশব্দ সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল—বেন ও কতবড়ো অপরায়ণ করে পাগিয়ে যাচ্ছে।

এই দাক্ষণ মুহূর্তেও টুইলের মন ভরে উঠল। আশ্চর্য হৃদয় ঐ রাহু—আশ্চর্য মিত্র।

তখনো দেখা যাচ্ছে রাহুকে—তখনো সিঁড়ির বাঁকে অদ্ভ হয়নি। একটু ছায়ায় বড়ো নিঃশব্দে পারে পারে নামছে রাহু। মেয়েরা বড়ো সাবধানী। ওদের লাক্ষ্যমানভার ওপর নির্ভর করা যায় বলেই চকল পুঁকুর দল এত অদ্যন্ত হয়ে পড়ে।

টুইল পাড়িয়ে দেখতে লাগল রাহুকে। খোঁশাটা নিখিল হয়ে গিয়েছে। রাহু নামছে।

বড়ো ভালো লাগল টুইলকে। ভোগের সময় চোখ অন্ধ হয়ে যায় যে। তাইতো সে মেয়ে তখন লয়ে যায়, তখন দূর থেকে তাকে বেখতে ইচ্ছে করে—ঘুরিয়ে ভিত্তিরে নানা ভাবে—নানা কল্পনায। মধুর অতীতটা বেন ছায়া কোল অবিখ্যাত বর্তমানের বুকে। ইচ্ছে করে ভাবতে—ঐ যে বিলাসিনী বেশেবাসে ঐ যে সম্বর্ণণে ঢেকে রেখেছে আপনাকে—একদিন ও রহস্ত ও নিঃশব্দে উল্ঘাটন করেছিল একান্তে, অতি গোপনে—ভীক লক্ষ্য তারই কাছে।

বাড়িতে একটু আনোজানি হল। এ ব্যাপারটা নয়। আরও অল্প ব্যাপার। যেডলো ঘটল ছ'মাস পরে। ছ'মাস পরে দুজনে এগিয়েছে অনেক দূর—সাহলও বেড়ে গেছে।

এ বাড়ি ও বাড়ি কথা চলতে লাগল, এদের দুজনের বিয়ে হয় কিনা।

আপত্তি আর কি ? বয়েগের তফাতটা বড়ো কম । তা হোক । একদলের ছেলেমেয়ে । এরা তো আর যাদের দাসী আনবার চক্রে বৌ আনতে চাননা । বৌ-এর ভেতরে এরা এখন খোঁসে বাসবী—যে আলোচনা করতে পারবে, বুঝি দিতে পারবে, সঙ্গ দিতে পারবে—আনন্দ দিতে পারবে ।

কাছেই এসে মিলনে বাধা কি ?

কিন্তু—

কিন্তু বাধা একটা স্ত্রী হল ।

টুন্স আসে শনিবারে শনিবারে । ইদানীং সেবেল, রাহু যেন পড়ার মন দিয়েছে খুব । পরীক্ষাও আসছে । প্রাইম আফ্রান দেখা দায় একটি প্রফেসর আসে । রাহু খুশি । ঘটর পর ঘটী তাঁর কাছে সাহিত্য বুঝে নেয় ।

সপ্তাহে মাত্র একটা দিন টুন্সের । তাও যদি প্রফেসরের সঙ্গে অর্ধেক সময় রাহুকে কাটাতে হয় তাহলে টুন্সের ভাগ্যে রইল কতটুকু ?

এক শনিবারে টুন্স এসে না-আনিরিয়ে চুকে পড়ল রাহুর পড়ার ঘরে । প্রফেসর এক ছাত্রী হুকুনেই চমকে উঠল ।

রাহু একটু লজ্জিত হয়ে বললে—কতক্ষণ এসেছি ?

টুন্স বললে—আনন্দ কম ।

রাহু কিছুমাত্র বিমিত না হয়ে বললে—তুমি বোসো, আমি একটু পরে বাড়ি ।

এই বল তৎক্ষণাৎ আবার আলোচনার মধ্যে তলিয়ে গেল । বোধহয় রাহুর হৃৎ ছিল না ।

টুন্স সেদিন প্রকোপেই রাহুকে একটু ঠাট্টা করেছিল,—কী ব্যাপার ?

রাহু নিঃশব্দেই বলেছিল—পরীক্ষা আসছে, বা ভর করতে কি বলব । তোমার আর কি, মিথ্যা পাল করে তো বস আর পর ।

এর পর একদিন সন্ধ্যার সময় টুন্স বেড়িয়ে ফিরেছে, একটু দূরে বেগল ভট্টালা বসেছে কলেজের চাকরের । পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে কানে এল একটা তীক্ষ্ণ হীন মন্তব্য । প্রফেসরের সঙ্গে রাহুকে জড়িয়ে একটা হুংসিত আলোচনা চলছে ।

শোনাবার টুন্সের নুকটা চমকে উঠল । যাঘাটা যেন ভিত্তিমিত করে উঠল । রাহুকে সে বিশ্বাস করে—প্রফেসরের ওপরও তার সাক্ষ্যের অবকাশ ঘটনি, কিন্তু তবু—তবু এ ধরনের আলোচনা—সে কি তবে তাকেই ব্যাধ করে ? কে না জানে টুন্সের সঙ্গে রাহুর সম্পর্ক আশ তোমার গিয়ে দাঁড়াতে চলেছে ?

সেদিন টুন্স আর সঙ্গ করতে পারল না । সেখা এসে রাহুকে বললে সব কথা ।

রাহু লম্বা ভাবে বললে—বিশ্বাস করো, ঠর সঙ্গ আমার অন্ত কোনো সম্পর্ক নয় ।

টুন্স একটু দারালো হাসি হাসলে । বললে—কিন্তু তোমার অন্তরঙ্গ কাল-ক্রেতাই যে মানতে চায় না ।

রাহু কবীর দিয়ে বললে—না রাহুকে সে, আমি তাদের অন্তে বাধা ঘামাই না । আচ্ছ আমি এর কাছ থেকে অবাঞ্চিত ভাবে যে সাহায্য পাবি, তা ফিরিয়ে দিতে পারব না ।

টুন্সের নুকে আবার কেমন ঘা লাগল । বললে—অবাঞ্চিতভাবে ! ভুললোক তাহলে খুব নিঃস্বার্থ বেখচি ।

রাহু এবার কোনো উত্তর দিলে না । চুপ করে রইল ।

একটু পরে টুন্সই প্রথম কথা বললে ।

—সেখানে রাহু, যে পুরুষেরা ছল করে বেড়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে, তাদের প্রব্রয় দিলেই, বেয়েদের কিছু না দিয়েও অনেক কিছু বেড়াই হয়ে গেল । আর তোমার সঙ্গে এরকম সম্বন্ধ না থাকলে, বলতে আসতাম না ।

একদুহুর্ন্তে রাহুর মুখখানা লাল হয়ে গেল কোঁসে । হুঁসে উঠে বললে—তোমার মন এত ছোটো । হি !

এই বলে রাহু তৎক্ষণাৎ ঘরের মধ্যে ঢলে গেল ।

অত্যন্ত ভারী মন নিয়ে টুন্স ঘিরে এল কলকাতায় । ইচ্ছে করেই পরের সপ্তাহে আর বাড়ি গেল না । আশা করেছিল, এই দুইখানা দাওয়ারা অন্তে সেপ থেকে কোনো একটি পরিচিত ব্যাকুল বেয়ের অত্যাশ-মত জনের আকৃতি-ভরা একটি পত্র আসবে । কিন্তু দুর্ভাগ্য—তেমন কোনো চিঠি গোটা সপ্তাহের মধ্যে এল না ।

চিঠিত বনে শনিবারে টুন্সকেই বাড়ি ছেতে হল । দশাশমের রাহুরের বাড়ি গিয়ে সেবেল, রাহু পড়ার করে নেই । জানতে পারল, কলেজের একটা কাংগানে রাহু গিয়েছে । একা থাকনি । প্রফেসরটি অতি অসহিষ্ণু । তিনি নিজে এসে রাহুকে নিয়ে গিয়েছেন । এবং বাড়িতে বলে গেছেন, দত রাহুই হোক, কাংগান শেষ হলে তিনি নিজেই গিয়ে যাবেন ।

দাসীমা বললেন—হুঁনি আসবে আশ, তাই ও একটু আপত্তি করেছিল, কিন্তু ওর আপত্তিমানাই ওনলে না । নিয়ে গেল ।

সে রাহুে টুন্স আর রাহুর অন্তে অপেক্ষা করলে না । বাড়ি চলে এল । কিন্তু এখানেও নিশ্চিন্তি নেই । অন্ত অন্ত বার বাড়ি ফিরে এসে কতক্ষণ চুপ করে বসে থাকে জানিবার ধারে ।

কত মধুর শ্রুতি—রাহকে নিয়ে ডবিত্ততের কত রত্নী কল্পনার মধ্যে দিয়ে হাত বেঁচে গিয়েছে।

কিন্তু আজ ?

আজ যেন সেই রাহুর শ্রুতি তাকে তীব্রভাবে বিধ্বংস করেছে। রাহু তার নিশেধ মানল না। হু পা দিয়ে বাড়িয়ে গেল।

এই-ই হু।

কোথায় কখন অলসের কাহ শব্দে কার জনর-বিনিময় ঘটে যায়—বাইরের ঘটনা—সৌকিক সম্পর্ক তার কতটুকু খোঁচ রাখে !

হুটা বছর কেটে গেছে।

রাহুর বিয়ে হয়ে গেছে। আছে এখন কলকাতায়।

বিয়ের সময় চিঠি লিখেছিল নিজের হাতে,

—তবু বিয়ে হচ্ছে আমার, তবে চুপি চুপি তোমাকে জানাই, বার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তিনি একজন ডাক্তার। আমারের কলকাতার সেই নির্বোধ প্রবেশার নয়। তুমি এসো। চিরদিনের জন্যে পর হয়ে থাকার আগে একবার শুধু তোমাতে বেবেতে চাই।

তবু শুধু বায়নি। এমন কি নিজেও এখন বিয়ে করলে তখন রাহুকে আনালেও না। হু বছর আগে ও নাকি প্রতিজ্ঞা করেছিল, এ জীবনে রাহুর আর মূখ কর্তন করবে না।

কিন্তু বিধির বিধান—

ডাবানীপুরে বাস থেকে নামতেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল রাহুর সঙ্গে। বিশেষ বয়সায়নি। সেই মুখ—সেই চোখ। তবু মনে হল রাহু যেন ভাটিয়ে গেছে—মিটিয়ে গেছে এর মধ্যে।

তবুকে সামনে পেয়েও রাহু অনেকক্ষণ কথা বললনি। একদৃষ্টে শুধু তাকিয়ে দেখছিল।

—কেমন আছ ?

রাহু একটু হাসল।

—তুমি কেমন ?

তবু হু কাঁধে একটু তুলে বললে—ভালোই।

এতক্ষণ রাহু যেন একটু সামলে নিল। বললে হেসে,

—এ নিক ?

তবু বললে—এক বছর বাসায়।

রাহু বললে—তা বেও, তার আগে চলো আমার বাসায়।

তবু ভাড়াভাড়া বললে—ওরে বাবা, আমা বড় ব্যাধ, বরক তোমার ঠিকানাটা দিয়ে থাও, আর একদিন যাব।

রাহু একটু হাসল। বললে—তুমি যাবে ! আমি তোমাকে চিনি না ?

এই বলে সেই রাহুর মধ্যে বণ করে টুবুলের হাতটা চেপে ধরলে।

—চলো—যেতেই হবে।

তবু নিম্ন করে অথচ তীব্রভাবে বললে—খুব দুখে আছি, সেইটুকু বুঝি মেরে করে না সেদিনে ছাড়বে না ?

রাহুর হু চোখ অকস্মাৎ মলে ভরে উঠল। ঠোঁটের ওপর হাঁতের কাষড় দিয়ে কোনোভাবে মলে পড়তে দিলে না।

এগিয়ে চলল।

বাড়িটা কাছেই, একটা গলির ভেতর। অন্ধকার, গ্যাসলৈতে। তা হোক, তবু রাহু ঘর করে সাক্ষিয়েছে দুটি ঘর। চিরকাল পরিবার পরিচ্ছন্ন। আজ নিজের সংসার দেখেছে, যনের মতো করে সামলাবে বৈকি।

—বোসো।

—বিছানায় ?

—হলেই বা। এই বলে নিজেও বিছানার একপাশে বসলে।

হুমনেই চুপচাপ।

তবুকে জিজ্ঞাস করলে—তিনি কোথায় ?

রাহুর যেন চমক ডাঙল। বললে—বোসো, ভেঁকে আনছি। পাশেই ওর চিস্পেনসারি।

এই বলে রাহু বেরিয়ে গেল।

নির্জন ঘরে বসে রইল তবু একা। এটা রাহুর সংসার।

—সেই রাহু ! সেই চিলে কোটা—সেই—

অকস্মাৎ তবুকের দৃষ্টি পড়ল রাহুর বিছানার সামনের দেওয়ালে। চমকে উঠল—সেই ছবিটা না !

কত মুহূর্ত রাহুর মতো বসে রইল তবু। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ছবিটির পাশে। সেই আশ-কোটা গোলাপের মতো ছোট একখানি কচি মূখ। বেবেলেই ইচ্ছে করে বুকে টেনে নেও—চুমু দেয়।

আজ হঠাৎ কী খেয়াল হল তবুকের। একটা টুলের ওপর থাকিয়ে ছবিখানা গাড়ল। না, মূলে নেই। রাহু ঘর করেই রেখেছে।

বাল্যের প্রেমসীকে তবুকে আজ এই প্রথম নিজের হাতে পেল। ভালো করে খুঁজিয়ে ফিঁড়িয়ে দেখল—কোঁটো নয়, বহুকালের পুরনো একটা ক্যালেন্ডারের ছবি। দুই থেকে দেখলে মনে হয়—ঐক যেন একটা জীবন্ত শেখকলা।

রাহু বিমল এই সময়ে।

—একটা প্রেসক্রিপশন লিখছেন, এখনি আসবেন। ওনা, ওকী ! ছবিটা নাখিচ্ছে কেন ?

টুপল ছবিটা হাতে নিয়ে রাগের শিক তাকিয়ে একটু হেসে বললে—এটা আমি নেব।

রাগ সহসা গভীর হয়ে গেল। ব্যস্তভাবে বললে—না না, এটা রাখো।

টুপল একটু অবাক হল। বললে—কেন?

—এমনি।

—সামাজ্য একটা ছবি আমার দিতে পার না?

রাগ সহসা হাসে উঠল। বললে—না। রাখো।

টুপল বললে—না, রাখব না। এটা আমার।

রাগ অকস্মৎ ছুটে গেল টুপলের কাছে। প্রাণশপথ শক্তিতে ডেউ কবল ছিনিয়ে নিয়ে। বিস্ময় পালন না।

এমনি সময় ঢুকলেন তার স্বামী। হাসতে হাসতে বললেন—কী হল?

রাগের মুখখানা তখন লাল ধবধব করছে। ডোপ বেকে কখন নিঃশব্দে ভল গলিতে বকান্ড গাল-চুটি ডিঙিরে বিয়েছে।

সেই অবস্থায় স্বামীর শিক ফিরে আসল হয়ে বললে—সেখা না, ছবিটা কেচে নিয়ে যাচ্ছে—

টুপলেরও কেমন ভিন চড়ে গিয়েছিল। ছেলেবেলার অমনি অনেক ভিনিস নিয়ে এরা মাতামাতি করেছিল। আজ ঈর্ষানু পর কোথা থেকে যে সেই ছেলেবাপুটি আবার ফিরে এসেছিল কে জানে!

রাগের স্বামীকে আসতে দেখে টুপল অপর্যাপ্ত লজ্জিত হয়ে ছবিটা ছেড়ে দিলে। রাগ সেই ছবিটা কুক নিয়ে শুৎশপাৎ কোথায় যে লুকসো আর সেখা পাওয়া গেল না।

কেতবাব সময় ট্রাম লাইন পর্বত এগিয়ে দিতে গিয়ে রাজেনবাবু বললেন—কিন্তু মনে করবেন না, বিকাশবাবু। রাগ একটু ঐহকম ধরাই। বড্ড একজনের আর ভেদী। মিনে মিনে ওর যেতাডটা যেন কেমন হয়ে উঠছে। তা ছাড়া—

এই পর্বন্ত বলে রাজেন ডাকার একটু খামলেন।—ওটা টালিগঞ্জের টাম। ছেড়ে বিন। হ্যা, বলছিলাম তাচ্চাড়া ঐ ছবিটা শু কিছুতেই কাছ-ছাড়া করে না। সব সময়ে চোপের সামনে রাখে। এখন তো আবার অন্তঃস্ববা কিনা। ছবির শিক তাকিয়ে হরতো ভাবে অমনি একটা হুম্বর মেয়ে ঘি হয়—

এই বলে ডাকার একটু হাসলেন।

পরের ট্রাম আসতে ঘেরি হয়নি।

ট্রামটা থালিই ছিল। সমস্ত পথটা আজ কেবল টুপল ভেবেছে রাগের কথা। রাগ ছবিটা দিল না।

ছবিটা সত্যিই বড়ো হুম্বর। তারও সরকার ছিল। অলকাও যে সহান-সম্ববা। অমনি ফুটফুটে একটা ঘেরে ঘি তার হত!





১ এগোরা।

আদাম শাস

As soon as I could afford to dress presentably, I became accustomed to women falling in love with me, I did not pursue women : I was pursued by them.—*Shae*

২০শে জুন ১১৩০ তারিখের এক-
গানি চিঠিতে শ লিখেছেন—“আমার
কোনো প্রেমলীলা নেই। যাকে যাকে
যেদেরা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে,
আমিও প্রাচীন আইরিশ ডক্টরে তাদের
ব্যথারিতি অত্যাধিক প্রদর্শন করেছি।
কিন্তু এইসব ব্যাপারে আমার তরফে
বিলম্ব কিছু ঘটেনি। অতএব যে
জীবনীকার, তুমি যেমন যে উন্নত বচর
বয়স পর্যন্ত আমি ছবি, গান, ভগ্নেরা এবং
গল্পের মধ্যে জীবন কাটিয়েছি এবং
প্রয়োজন-সূচক বেকছি। এই উন্নতি-
বচরে আমার মার অস্তিত্ব এক বিপদ।
চামি আমার মনে কোঁড়ল উত্তেক
করতে লাফানো করত। সে ঘটনাটি
যেমন যদি জানার আগ্রহ থাকে তাহ’লে

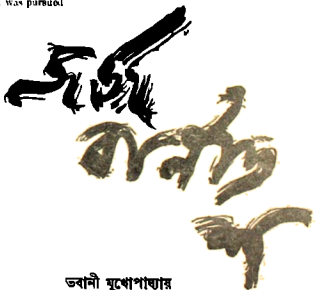
আমার *Philanderer* প্রথম পাঠ করো—সেই মহিলাটি
‘জুদিয়া’ আর আমি ‘চারটাইল’—আমি আমার *Philan-
derer*—সে চরিত্র বোকার স্বভাব তোমার নেই। আমি
পাকা লেকশনারি টাইল, সবাইকে এবং সবকিছু বুঝি, আর
আমি কেউ বা কিছু নয় :—ইতি তোমার বি. বি. এস.”

এই পুরে শ লিখেছেন—“Also I was entirely free
from the neurosis (as I class it) of Original Sin.”

শ’র মার ছাত্রদের মধ্যে মিলে জেনী প্যাটার্সন অত্যধ
মেজাজী এবং উচ্চারণ প্রকৃতির রমণী ছিলেন, *Wooler’s
House* ব্রাকি সাগটারিগাল এবং *The Philanderer*
নাটকের জুদিয়া ক্রাভেনের চরিত্রে এই মহিলাটিকে শ
রূপায়িত করেছেন।

মিলে প্যাটার্সনকে ধার্য ক্রাভেন উল্লেখ করে বর্ণিত
শ’র চরিত্রে তার বয়স পনেরো বা ততোধিক ছিল। শ’র
তার একটি বাড়ি ছিল। যে সম্পদ ভ্রাতৃসংস্রবের তিনি বিপদ
ছিলেন তিনি তার স্বল্প প্রচুর সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন।
জেনীর চুলের রঙ ছিল ঘন বাদামী, গায়ের রঙ হলুদ, এবং
ঘন কালো চোখ। কথাই বা গানে তার স্বরধ্বনি ছিল হৃদয়।
তা ছাড়া তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন। তার সব চেয়ে বড় পোষ
ছিল তার উগ্র মেজাজ।

এই উগ্র প্রকৃতি সবেই জেনীকে শ’র ভালো লাগেছিল।
একমাত্র কমেজাজ ছাত্র জেনীর মার কোনো ভেদে ছিল
না। তাই হোক, জেনী বেশ সংক্ৰান্ত-সম্পন্ন মহিলা।



ভাবনী যুগোপাখ্যার

পুত্রের কাছে জেনীর আকর্ষণ প্রচণ্ড, বিশেষতঃ যে পুত্রই নারী-স্ব-বিকৃত। জেনী পুরোপুরি মেয়েটী প্রকৃতির, মেয়ে এবং পুত্র সকলেই তাঁকে ভালোবাসে। লুইজা এমিতাবেথ আর লুইজা টাকে ভালোবাসতেন, মনে মনে হুত আশা পোষণ করতেন যে তর্জ বার্নাড শ' এই ধনী বিধবাবিধে বিয়ে করবেন, অর্থনৈতিক ঝিক খেতে শ'র নিরাপত্তা লাভ হবে। জেনীর সঙ্গে শ'র বিচ্ছেদে পরও কিছু বছরের অবসান ঘটেনি,—কিন্তু অবশেষে যখন জেনী শ'র মা বা বোনের কাছে শ' সম্পর্কে নিশ্চা এবং গম্যাপাস হুক করলেন তখন আর কিছুই বচায় রাখা সম্ভব হল না। জেনী প্যাটারসন শ'কে ভালোবেসেছিলেন অতি নিবিড়ভাবে নিচ্চাই, কিন্তু স্বস্থ উপভোগ করলেও শ' টাকে ভালোবাসতে পারেননি।

যে সময় জেনীর সঙ্গে শ'র ঘনিষ্ঠতা হয় তখন বয়স হিসাবে তিনি যৌন-বুদ্ধি—নারী-সংসর্গ-বিহীন নিশ্চাপ মাপন। উন্নিত বছর বয়সে শ' প্রকৃত কোমারী হুকা করে চলতেন। পুত্র এবং নারী বছর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেতে, কিন্তু লবিগ্রোর হুগেরজনীর অবসান আসার হলেও শ'র বাস্তবিক লক্ষ্য তখনও কাটেনি। উইলিয়াম আর্চার *The Dramatic Review* পত্রিকার সঙ্গীত-সমালোচকের পদ সংগ্রহ করে দিয়েছেন, ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫ তারিখের পত্রিকার বিত্তীয় সংখ্যায় শ'র প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। প্রথম প্রখন নারসই-বুদ্ধ প্রবন্ধ লিপলেও পরে বেনোমা প্যাট্রা গ্রান-ও লিপতেন। সেপটম্বর মাস থেকে পত্রিকা লেখকদের টাকা দেওয়া বন্ধ করলো, শ' কিন্তু বিনামূল্যের লেখক হিসাবেই তাঁর মতামত লিপতে লাগলেন। আর্চার ইতিমধ্যে *The Pall Mall Gazette*-এ আর একটি কাজ যোগাড় করে দিলেন। এই পত্রিকার সম্পাদক উইলিয়াম স্টেড। উইলিয়াম আর্চার খুব খারদা করে এই কর্মটি সংগ্রহ করে দিলেন। স্টেডকে বললেন, “আমি বড় ব্যস্ত, তাই এই বইটির সমালোচনা লেখার ভার বার্নাড শ'কে বিরোধি।” শ'র সমালোচনা এত হৃদয় হল যে, অতঃপর তাঁর ইচ্ছামতো বহু-পুত্রী বই টাকে সমালোচনায় গড় দেওয়া হতে লাগল।

এই সমালোচনা কর্ম ছাড়াও নানাবিধ খুচরা সাংবাদিকতাও করতে লাগলেন। *The Magazine of Music*-এ ১৮৮৫-র শেষের সিকে নিয়মিত প্রবন্ধ লিপেছেন।

বার্নাড শ' ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৭ পর্যন্ত ভারের রেখেছেন। এই ভারেতে এই কালের মোটামুটি সকল খুঁজিনাটি বিষয়

শ' লিপে রেখেছেন। জেনী প্যাটারসনের সঙ্গে পরিচয় দীর্ঘদিনের হলেও ভারেতে তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫। এই ভারেতে শ' তাঁকে জে. পি. বা মিসেস প্যাটারসন বলে সর্বত্র উল্লেখ করেছেন, কোথাও জেনী বলে উল্লেখ নেই। জেনী হুদকী ছিলেন সে কথা আগে বলা হয়েছে; এই দৌলত-গীলতা, স্বাম্যুয় বাসন্তীকী যে-কোনো যৌন-বুদ্ধি তুগের কাছে দুর্বল্যীয় আকর্ষণ। কলে ভারেতে বার বার জে. পি. শ' কথা লিখিত হয়েছে। ভারেতে দেখা যায় এই কালটিতে উভয়ের বার বার দেখা হয়েছে, একত্রে আহারাদি হয়েছে, গানের মতলিসে সময় কেটেছে এবং মাকে মাকে মতারাতে জে. পি. শ' বাড়ি থেকে কিনতে হয়েছে। ওঠা জুলাই ভারিখে দেখা আছে—“৮-২০ মিনিটে জে. পি. শ' বাড়িতে গিয়ে দেখি সে নেই। কয়েকজন বছর সঙ্গে দেখা হল, এদের অনেককাল দেখিনি। বটখানেক তাদের সঙ্গে কাটিয়ে মিসেস প্যাটারসনের বাড়ি গেলাম—প্রায় রাত একটা পর্যন্ত ছিলাম। অতি সাহসিক আশাচার চল।” একে সপ্তাহ পরে—“মার হাঙ্গ মিসেস প্যাটারসনকে দেখলাম, পার্জের পথ ধরে ওয় বাড়ি গেলাম, ‘সাপার’ গেলাম, অমুত কথাবার্তা, প্রেম-নিবেদন।...রাত তিনটেয় বাড়ি ফিরলাম, এখনও কোমারী স্বস্ত।”

এই ঘটনা দীর্ঘ-লিখিত,—একতরকা, এবং বার্নাড শ'কে ঈতিমত্তে ফিরল করে তুলেছিল। কামোমাদিনী বিবহার কাছে আত্মসমর্পণ তাঁর হুত থিবা ছিল, রাত তিনটার পর এই রমণীর বাড়ি থেকে স্বস্ত অবধায় ফিরে আসার স্বর্থ হুস্ত। কিন্তু এই দূততা হুইল না,—২২শ জুলাই ভারিখের ভারেতে দেখা আছে : “রাত তিনটা পর্যন্ত সেখানে ছিলাম, নুতন অভিজ্ঞতার ২২তম জগদবিধ পালিত হল।”

দীর্ঘদিনের চোঁয় জেনীর বাসনা সাক্ষ্য লাভ করল। “বাড়ি কেবার সময় বারপ্রাণে যখন বিদায়-সভা-ধ্বংস পালা চলছিল—আমাদের আশাচারে পাশের বাড়ির হুদার খুদ জে. ও বার, তাঁর উপস্থিতিতে আমদা ঈতিমত্তে সহু হয়ে পড়লাম। গজীর রাতের এই অভিসারে অল-উদ্বেতই তিনি হুকেবেন।”

মিসেস প্যাটারসনের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতার কলে বার্নাড শ'র যনে প্রাণবিক প্রতিফলি আদ্যমানি। কিন্তু এই নরলীলা কিছুকাল নিয়মিতভাবে চলল। জেনীর পক্ষ থেকে আত্মলতা ও আগ্রহ থাকলেও এই ব্যাপারে শ' ছিলেন নিরাপক অথ তিনি সমুদয়ে পরিচুত। এইমাতীয় প্রেমের

এই পরিণতি। প্রেমিকা অধ্যবসায়ী বিবধা আর তার তরুণ প্রণয়ী, সে প্রেম সার্থক হয় না।

যজ্ঞবন্তী অল্পসিক শ'র আগ্রহ দেখা গেল, অল্প রমণীর মধ্যে তরুণ শ' খেচিক্রোর সন্ধান করেন। কিন্তু হিসেব প্যাটারসনের শ'কে সহজে ছাড়ার পাত্রী নয়, তিনি নিখমিত শ'র মার কাছে হাতামাত্র করেন, মাঝে মাঝে তলহের সুরপাত হয়।

নববর্ষের প্রথমভাগে শ' একদিন জে. পি.'র বাড়ি গিয়ে যে অবস্থায় পড়লেন তা এককথায় হাস্য করেছেন—'Revulsion'। তিনদিন পরে আবার গেলেন; দেখলেন মিলেস প্যাটারসনের সঙ্গে একজন পুত্র, লোকটার উদ্ভেদ ভালো নয়—এক কালে তাড়ায়, বেশ পর্যন্ত লোকটাই চলে গেল—ট্রেন ধরতে হবে।

জেনী কিন্তু ক্রমেই মাথা হেঁচতে থাকেন; শ' লিখেছেন—
"There was a violent scene at the square. Wrote to J. P. on my return that our intercourse must be platonic."

কিন্তু এইমাত্রই রমণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা সহজ, কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন করা সহজ নয়। জেনী হৃদয় বৃক্কছিলেন যে তাঁর রাগ এবং হুমায় কলসী হৃদয় সম্পর্ক নষ্ট হতে চলেছে, তাই তিনি কয়েক সপ্তাহ সংহত রইলেন। জেনী কিছুদিনের অল্প অল্প চলে গেলেন, কেবল দিন বার্নার্ড শ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। দেখলেন, আর ঐরূপে কোনো সম্পর্ক রাখা অসম্ভব।

তিন সপ্তাহ পরে ঐরূপে যোগাড়া পর্বত গেলেন, পরে বাড়িতেও প্রবেশ করলেন, কিন্তু কোনো কিছুই গমলো না, কিছুই ভালো লাগলো না। স্টেটসিক ব্যবস্থা ক্রমেই ভেঙে পড়ছে,—শ'র প্রচণ্ড উপানীতাই এর প্রধানতম কারণ।

শ'র ভায়েকিত কয়েকটি নতুন নাম পাওয়া যায়, ফেবিয়ান-সোসাইটির গ্রেস গিলক্রাইস্ট আর একটি হৃদয়ী মেয়ে জেরালডাইন স্পার; শ' বলেছেন—"Rather in love with Geraldine."

কিন্তু এই জেরালডাইনের সঙ্গে যদিও শ'র বিবাহ হতে পারত, তবু সেই প্রেম স্থায়ী হয়নি, ঘোরে ঘোরে ভায়েকির পাতায় তাঁর নাম মুছে গেছে। 'এলিস, জেনী, গ্রেস, জেরালডাইন, অ্যানী বেসার্ট একে একে শ'র জীবনে এসেছেন, নাট্যাভিগিতি চক্রের মতো বীষ ভূমিকায় অভিনয় করে আবার মিলিয়ে গেছেন। এই ভাবেই আবির্ভাব ঘটলো বিশ্বস্ত অভিনেত্রী ফ্রোয়েল কার-এর। হামারকিন্সে উইলিয়াম মরিলের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা। ডাঃ উইলিয়াম

কারের মেয়ে ফ্রোয়েল, উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর ব্যাতি ছিল প্রচুর। অনেক টাকা তাঁর নষ্ট হলেও, যে পরিমাণ অর্থ মেয়ের তত্ত্ব রেখেছিলেন তাতে বেশ আত্মদেয় কটে ঘাস। এই অর্থই মেয়ের অনর্থক মূল, কারণ ফ্রোয়েল জীবন শেষে শৌখিন নাট্যাভিনেত্রী হিসাবেই কাটিয়েছেন। জীবিকার তত্ত্ব কর্ষ করতে না হওয়ায় তাঁর অসিকতার উন্নতি সম্ভব হয়নি। শ'র ভগিনী লুসির মতো এই রমণী বিশেষ চতুরা ছিলেন, তিনি এমেরি নামধারী ছদ্মক অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছিলেন, সেকটি ছবত বৈধিগি স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করতে পারেননি, মানে মানে সরে পড়েছিলেন। ফ্রোয়েল এমেরী—সংক্ষেপে এক. ই. (শ' ভায়েকিত লিখেছেন F. E.) পরমানন্দে কলাচর্চা এবং সাংস্কৃতিক কর্মে আত্মোৎসর্গ করলেন। একটু স্টোরেট চমৎকার কবিতা অঙ্গুষ্ঠি করতেন ফ্রোয়েল। জি. বি. এস.-এর সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হওয়ার পর ডব্লু. বি. ইয়েটস-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়, ইয়েটস সঙ্গীত অশ্রুত করলেও ফ্রোয়েলের কণ্ঠে আত্মিক সুরতে ভালোবাসতেন।

এই ফ্রোয়েল এমেরি ১৮৯২-এ আত্মজীবনী বিবেচনায় *Arms and the Man* প্রদর্শন করেন, জি. বি. এস.-এর নাটকের এই প্রথম রীতিমতো অভিনয়। অল্প ১৮৯২-এ রথাল বিবেচনায় ফ্রোয়েল 'রাকি সারটোরিয়ান'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। রাকি অর্থাৎ জেনীর চরিত্রাভিনয়ে ফ্রোয়েল হৃদয় বিশেষ আনন্দ পেয়েছেন, কারণ জেনী প্যাটারসনের হাত থেকে বার্নার্ড শ'কে তিনিই মুক্তিদান করেছেন। শ'র জীবনেও এই প্রথম নির্দিষ্ট অধরাগের সূচনা, এলিস লাকটের প্রেম বালাপ্রথম, জেনী প্যাটারসন বিরক্তিকর; ফ্রোয়েল কার বৈশাখী স্বভাব মতো প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষ কাগজের টুকরোর মতো জেনী, গ্রেস, জেরালডাইন প্রকৃতিকে উড়িয়ে দিয়েছেন।

শ' এতদিনে *The Star* পত্রিকার সঙ্গীত-সমালোচকের কাজটি পেয়েছেন। ফ্রোয়েল সঙ্গীত ভালোবাসেন, উভয়ে একত্রে বহু কনসার্ট ও সঙ্গীত-সভায় উপস্থিত থাকতেন, জেনীর হাত থেকে নিকিতি পাওয়ার তত্ত্ব শ' যেন এখনই কিছুই সন্ধান দিলেন। জেনী বিনয়ত শ'র মাঝে আসতেন, যখন তখন শ'র ঘরে হানা দিতেন, ওর চিঠিপত্র পড়তেন—কাঙ্ক্ষার ব্যাঘাত হত—*Pall Mall Gazette*-এর স্তম্ভ প্রাপ্ত পুস্তক-সমালোচনা লেখা নিয়মতো হত না, তাঁর ফল স্টেড তাগিদ দিয়ে পর দিতেন। শ' তাঁর ভায়েকিত লিখেছেন—
"মে. পি. এখানে ছিল, কিছু কাঙ্ক্ষ করা কঠিন করে ফেলেছে।"

...“ডে. পি. সারাদিন এ বাড়িতে ছিল।” একলা সন্ধ্যায় “ডে. পি. এগেছিল, হাগ করলো, ঝাংলো, আমার মাথা লক্ষ্য করে একটা বই ছুঁড়ে মারলো” ইত্যাদি।

৪টা ফেব্রুয়ারি ১৮৮০—এই বিচিত্র প্রেমলীলার অবসান ঘটলো; ভায়েকিতে লেখা আছে—“সন্ধ্যায় আমি এক ই. ব’র কাছে গিলাম, অনেক পর তেজী এসে হারিহ। অতি কুংসিত নাটকীয় পুস্তক অবতারণা করলো, কিন্তু ডে. পি. অতি বীভৎস ভাষায় আমারে আক্রমণ করলো। অবশেষে আমি এক ই.-কে ঘর থেকে সরিয়ে দিলাম। বলপ্রয়োগ করে ডে. পি.-কে নিবৃত্ত করলাম, নইলে সে তাকে আঘাত করতো। বাড়ি থেকে ওকে বিদায় করতে দুটি চট্টা লাগলো। ব্রমটন হোয়ারে ওর বাড়িতে একটার আগে পৌছাতে পারিনি, আর সেখান থেকে আমার বাড়ি কিরিয়ে হাত তিনটার পর। তীব্র স্নাত এক অবলম্বন হয়ে গড়েছিলাম, কিন্তু তথৈ হারাইনি, আচরণও এতটুকু অভ্যস্তা প্রকাশ করিনি। ৪টার আগে পোহা হল না। অতি অশান্ত রাত্তরী।

“ডে. পি.-কে নিয়ে কমা প্রার্থনা করে একটা চিঠি লিখিয়েছি। সে আর কখনো এমন বিরক্ত করবে না। এক ই.-কে এই চিঠিটা পাঠিয়ে দিলাম, সাধনার জন্ত।”

এই প্রান্ত শেষ, এর পর কয়েকবার উভয়ের সাক্ষাৎ হয়েছে, কয়েকবার পর-বিনিময় ঘটছে। কিন্তু বীভৎস প্রেমলীলার অবসান ঘটছে। বার্নার্ড শ’কে ডে. পি. কমনেনি, কিন্তু ১২২৫-এ মৃত্যুর সময় তাঁর বিবরণ-লিপ্তি নিয়ে ডাইগোকে না দিয়ে শ’র আত্মীয়কে দান করেছেন।

ডে. পি. শ’কে নাটক-রচনার বিষয়-বস্তু দান করেছেন। হেনরেক পীয়ারসনকে শ বলেছেন—“মিসেস প্যাটারসন আমার ‘ফিলিডার’ বইতে, *The Philanderer*-এই প্রধান অঙ্ক ডে. পি. আর ফ্রোয়েল কারের সেই বীভৎস ভাষার লুপ্ত। আমি কিন্তু সেই সময় রাগিনি।...এর পর আমারো ডে. পি. যে পরধারা ও টেলিগ্রাম বর্ণন করছে তার উত্তর আমি দিইনি। আমার উইলো ওর নামে একগো পাউও রেখেছিলাম, ও কিন্তু সে টাকা গ্রহণ করতে পারেনি, কারণ আমার অনেক আগেই দেহাবসাদ করেছি।”

শ’ অতঃপর “amiable woman with semi-circular eyebrows” ফ্রোয়েল কারের প্রেমে আবৃত্ত হলেন। তাঁকে চিঠিতে লিখছেন—“This is to certify that you are my best and dearest love, the regenerator of my heart, the holiest joy of my soul, my treasure, my salvation, my rest, my reward, my darling youngest child, my secret glimpse of heaven, my angel of Annunciation...”

কিন্তু এই চিঠির মধ্যে কতখানি আত্মবিক্রম আছে বলা কঠিন, কারণ শ’ এই একই চিঠি কারবন-কপি করে এলেন টেজী বা মিসেস প্যাট্রিক ক্যাম্পবেলকে পাঠাতে পারতেন। শ’র বন্ধু হেনরেক পীয়ারসনের এই ধারণা।

মিসেস প্যাটারসনের মতো ফ্রোয়েল কারের সঙ্গে বার্নার্ড শ’র প্রেম বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ফ্রোয়েলের প্রেম এখনই কলহবাহী, ইয়েটসের সঙ্গেও দীর্ঘস্থায়ী প্রেম হয়নি, ইয়েটসের বিবধা স্ত্রীর মতে বরং আরো কম সময় উভয়ের মধ্যে প্রেমলীলা চলছে। তবে ফ্রোয়েলের একটি গুণ—প্রেমলীলার অবসান ঘটলেও বন্ধুত্বের অবসান ঘটেনি, বার্নার্ড শ’ বা ইয়েটসের সঙ্গে অনেকদিন পর্যন্ত বন্ধুত্ব অটুট ছিল। সিংহলের এক ‘সেবাস্থ আশ্রমে’ ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে মি: ক্লিফোর্ড ব্যাক্স-এর সঙ্গে ফ্রোয়েল চলে যান, সেখানেই ১৯১৭-এর ২২শে এপ্রিল ক্যান্সারে তাঁর মৃত্যু হয়। ফ্রোয়েল মি: ব্যাক্সকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—“G. D. S. had been most faithful friend to me...”।

বর্তমান রবী শ’র প্রেমে পড়েছেন তাঁরা সকলেই হয় বিশেষ হৃদয়ী, নয় অতিশয় বুদ্ধিমতী, কিংবা উদ্বিগ্ন ও ভেবে অধিকারী।

কিন্তু একটা ঘটনা সব-কিছুই ছাড়িয়ে গিয়েছে, যতটো সেই সময় শ’র তেমন অর্থ-সামর্থ্য থাকলে এই প্রেমের পরিণতি ঘটতো পরিণত। সেই বেরেরটির নাম যে মরিস, উইলিয়াম মরিসের মেয়ে।

। মরিস ।

সুখের সোপান

“You certainly do warm both hands at the fire of life.”—*Sydney Webb*

যে মরিস অতি হৃদয়ী ছিলেন। উইলিয়াম মরিস আরো অনেক কবির মতো অতি সুপুঙ্খ ছিলেন, তাঁর স্ত্রীও হৃদয়ী ছিলেন। মরিস বয়সে শ’র চাইতে-বাড়ী বয়সের বড়ো হলও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। উইলিয়াম শ’কে বিশেষ ভালোবাসতেন। *William Morris—as I knew him* নামক হৃদয় প্রবন্ধে শ’ তাঁর প্রতি প্রভা এবং অগ্রদূত প্রকাশ করেছেন। উইলিয়াম মরিস আত্ম-বিস্মৃত, সোভালিস্ট মহল্লাও তাঁর কথা হতে কেউ জানে না, অবশ্য একশা তাঁর *News from Nowhere* গ্রন্থের বিশেষ প্রচার ছিল। তাঁর কল্পনাময় কার্ণার্কস-অগ্রপ্রাণিত নয়, —অতি প্রাচীন।

উইলিয়াম মরিস ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, সংস্কৃতিবান মানুষ। তিনি তেমন চতুর ছিলেন না, কিন্তু মহৎ ছিলেন। Aesthetic

কচির মস্ত মরিশের খ্যাতি প্রাপ্ত, শ নিম্নেও একজন আত্ম-স্বক্ৰিয় (self-reliant) নাগ্ন, স্বভাব: উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতার স্বরূপাত হল। শ'র পক্ষম এবং শের উপস্থাপন *Unsocial Socialist*-এর প্রাথমিক পক্ষে মরিশ বিশেষ প্রীত হন এবং সেই কারণেই পরিত্রায়ে তত্ত্ব আগ্রহবিত হন। শ দেখলেন হাইওম্যানের চাইতে মরিশ উৎসবের মধ্যে, হাইওম্যান আর মরিশে তুলন কলহের স্বরূপাত হল। কলহের কোনো ভিত্তি নেই, কিন্তু ফেডারেশনে প্রায় এই ধরনের স্বপ্না চলে। সংবাদিকা থাকা সবেও মরিশ দলবল মিশ্রে ফেডারেশন ছেড়ে দিয়ে *The Socialist League* স্থাপন করলেন। সেখানেও কলহের শক্তি হল না,—মরিশের অনেক অর্থ নেই হল। মরিশ অবশেষে আরো কন সভা নিয়ে *Hammersmith Socialist Society* স্থাপন করলেন। ১৮৯৩-এ মরিশের মৃত্যু হয়, সেই সময় পর্যন্ত এই সভায় খাটি সাম্যবাদ আলাপিত হতে লাগল। হাইওম্যান ডেমনস্ট্রাটিক ফেডারেশনকে পোস্তাল-ডেমনস্ট্রাটিক ফেডারেশনে রূপান্তরিত করলেন।

শ এবং মরিশের মধ্যে আরো প্রগাঢ় হল 'নরদ্বা' সংক্রান্ত আলোচনার পর। নরদ্বা ছিলেন আমেরিকা এবং যুরোপের সংস্কারপত্রের মতে বিখ্যাত কল-সমালোচক। আধুনিক শিল্পের প্রায় সকল নেতৃস্থানীয় শিল্পীকে তিনি নক্সা করে দিচ্ছেন। মরিশকে বলতেন 'morbid degenerate'। শ এবং মরিশ জানতেন নরদ্বা 'আর্ট' বোঝেন কন। নরদ্বার *Entrating (Degeneration)* নামক গ্রন্থ (বর্তমানে এর নাম *The Sanity of Art*) সমালোচনা-কালে শ তীব্র হৃদয়বলে তাকে ছিন্নভিন্ন করলেন। কলে মরিশ অত্যন্ত আনন্ধিত হলেন, এবং মরিশের স্বস্তর মল্ল শ প্রবেশ করলেন। মরিশ অতিশয় গোড়া মাত্র, চলারের পরবর্তী সাহিত্য তিনি গ্রাহ্য করতেন না, আর বার্নি জোন্সের ছবি। বার্নি তোপ তাঁর বন্ধু। এই প্রীতির সঙ্গর্গে মৃত্যুকাল পর্যন্ত আট্ট ছিল।

মরিশের সংসারে তাই বার্নার্ড শ'র অবস্থা প্রবেশ, আর সকলে শুধু রবিবারে আসেন, শ'কে সব সময়েই আসার অবিকার বেগা হল। শ বলেছেন *Shavian* কথাটি উইলিয়াম মরিশের তৈরী। একজি-মধ্যযুগীয় পাণ্ডুলিপিতে তিনি এই প্রয়োগ দেখেছিলেন। এই বিশেষণটি বার্নার্ড শ'র মন:পুত হল। তিনি বলেছেন—"It provided a much needed adjective: for Shavian is obviously impossible and unbearable."

'স্নেহমতট হাউস মিটিং'-এ উভয়ে বক্তৃতা দিতেন, তখনকার কালের চিত্তাঙ্গীল দৃশ্যকরা হলে হলে এই সভায় যোগ দিতেন। এতরকম এক সভায় বার্নার্ড শ'কে দেখে একজন চিত্তাঙ্গীল দৃশ্য বলেছিলেন—"a raw aggressive Dubliner, with a thin flame-coloured beard beneath his white illuminated face"। তাঁর নাম এড্. জি. ওয়েলস।

মিসেস মরিশ রবিবারের সাম্যবাদী সম্মেলনে যোগ দিতেন না, বা সভায়ে যে ভোক্তপদ: বসতো তাতেও উপস্থিত থাকতেন না, বড় মেয়ে তেলী মরিশ অল্প থাকতেন—শ তাঁকে অনেক পরে দেখেছেন। ছোট মেয়ে যে মরিশ কিন্তু এইসব সভায় উপস্থিত থাকতেন, ভোক্তপদ: তিনিই পৃথক্যমিত্রের কৃমিকা দিতেন। তাঁর সৌন্দর্য এবং রংগীর তলীতে পোশাক-পরা আকৃতি শ'র মনে একটা অতীন্দ্রিয় প্রেরণা সকার করে। শ'র জীবনে ইতিমধ্যে যে বৌদ-সম্পর্কিত প্রেম ঘটছে তাঁর দৃষ্টি এই অকরণ তুলনীর দ্বা।

উভয়েই যখন প্রাচীন তখন মরিশের গ্রন্থাবলীর শেষখণ্ডে একটি পরিচ্ছেদ লিখে বেওয়ার তত্ত্ব তিনি অগ্রহণ করেন। সেই অগ্রহণে শ রক্ষা করেন এবং এই দ্বয়ে উভয়ের পুরাতন প্রেরণের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করেন। শ'র প্রবন্ধ পড়ে যে মরিশ বলেছিলেন—"Really, Shaw!" কিন্তু বক্তৃত্বের সবে পরামর্শ করে সেই অংশ তিনি বর্জন করেননি, কারণ পরে একদিন কেউ হৃদয় এ বিষয়ে লিখতে পারে, সে লেখা বার্নার্ড শ'র বহুতে লিখিত হওয়াই বাহ্যনীয়।

এই বিচিত্র প্রবেশ বার্নার্ড শ লিখেছেন:

"এক রবিবার সন্ধ্যায় বক্তৃতা এবং ভোজন পর্ব শেষ হওয়ার পর দ্বারাবিহীন ভবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে বিশদ-সম্ভাষণ জানানোর উদ্দেশ্যে পিছনে তাকলাম, তিক সেই দৃষ্টান্ত জাহিনি-কম থেকে বেরিয়ে যে মরিশ হল-এ এসে পাড়লো! আমি ওর দিকে তাকলাম, তার হৃদয় পেশোক এবং ঘনোয়ম আকৃতির দিকে তাকলাম; যে আমার দিকে স্পষ্ট তাকিয়ে রইল, বেশ সজর্গ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তার সে নীরব দৃষ্টিতে যেন সম্ভতির ইঙ্গিত। ভাংকশাং আবার মনে হল কর্মলোকে এক অতীন্দ্রিয় বাগদান (mystic betrothal) লিপিবদ্ধ হল, অল্প বধো-বির দূর হওয়ার পর এট মিলন পার্থক্য হবে। অসফল্য, দারিত্র্য এবং দুর্গমার সঙ্গ থেকে আমার নিষ্ঠুর ভক্তির সম্মুখ। আমার প্রতিভা সম্পর্কে আমার অবচেতন মনে এতটুকু সংশয় ছিল না। কিংবা অসৌক্যিকভাবে আমার মনে হল যে তার ঐয় মূল্য সম্পর্কে দিতেছি।"...

[স্বাক্ষর]

জনমানস ও চিত্রকলা

ভাস্কর্য্যার্থ

প্রতিবাহুরই কলকাতায় নানা চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। স্ফুটিত-অভিন্নানী হৃৎসংকলন কলারসিক, তথাকথিত নামকরা অটো-ক্রিটিক এবং নামকলায় সুরকারী কর্মগৌরীরা এসকল অঙ্গুষ্ঠানের প্রীতর্পন করেন। কিন্তু সর্বসাধারণের ভিত্তি তেমন জন্ম না। এর কারণ বিস্তরণ প্রদর্শন মনোকে ধলোচ্ছন্ন—“শিল্পীর জনসীমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। যেখানে রস-পরিবেশন ও সৌন্দর্য্যস্বপ্নের দিকই তাঁদের প্রধান দৃষ্টি থাকা উচিত সেখানে আনন্দিক, শৈলী ও ব্যক্তিমার স্ফুটন নিয়েই বেশী মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন, ফলে সাধারণের চোখে শিল্প হয়ে গাঢ়িয়েছে উদ্ভট অভিনবর।” এমনকি জনসাধারণ ও চিত্রশিল্পের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁরা ছবির নব বৃত্তে পারেন না বলেই এইসকল আনন্দোৎসবের আকর্ষণ অক্ষত করেন না।

সত্যি কি তাই? এর অঙ্গুষ্ঠান কারণ হয়তো এ ধরনের চিত্র-প্রদর্শনী দেশের ঐতিহাসিক দ্বারা বা ঐতিহ্যগত সূত্রে আনন্দ পাইনি। সত্যাত্মকসরী ইংরেজ আপন শিল্প-সংস্কৃতির সৌন্দর্য্য প্রদর্শন ও প্রতিষ্ঠা করে ১৮৪৫ সাল থেকে যে শিল্পশিক্ষার রীতি ও নীতি প্রবর্তন করে এসেছেন, প্রধানতঃ সেই নীতি অঙ্গুষ্ঠারীই শিল্পকলা শিক্ষা ও শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়ে আসছে। কলে প্রতীচা-ঐতিহ্যবাহী এই ধরনের প্রদর্শনীর সঙ্গে ইংরেজি-শিক্ষিত হৃৎসংকলন ছাড়া দেশের জনসীমার সঙ্গে যোগসড় হাণিত হু না।

কিন্তু ইংরেজ শাসনের আগে আমাদের দেশে কি শিল্পকলা-শিক্ষার ছিল না? বড় বড় শিল্পকে কেন্দ্র করে তখন বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল, আর সেই শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা-বাদশা। যেমন আকবরের সবচেয়ে ছিলেন নীর সৈয়দ আলী এবং আবদুল গামান শিরাজী। এঁদের স্মৃতিও ছিল কতপুণ্ডরিকীকৃত। এঁরাই মূল শিল্পীরাষ্ট্রের প্রবর্তক। তাঁদের পাল্পীষ্ট অঙ্গুষ্ঠান করে এসেছে অনবর। গাভোয়ালের প্রখ্যাত শিল্পী মোদাওয়ান এবং নরনস্বরের উত্তরপুণ্ডরায়ামবাসীর স্বধা অনেকেই জানেন। মোদাওয়ানের ১৮০০ সালে সৃষ্টা কটে। রায়মদওয়ান উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বেঁচে ছিলেন। তাঁদের রচিত শিল্পের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় ছিল। ভারতীয়

মন যে শিল্পীর মন—পুতুলে, গটে, পুথার, মাটির মায়ে, আলপনার তাঁর পরিচয় আরও চিরে আসছে। কিন্তু প্রদর্শনীর ছবি আরও তারা বোকে না।

তার পর ইংরেজরা থেকে এল ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ—আরও অনেকে। তারা নিয়ে এলো তাঁদের স্বাপত্য ‘Mother of all arts’। সঙ্গে এল তাঁরও ও চিত্রকলা। “কিন্তু বহুতর বৈদিক যুগ থেকে দেখা যায় আমাদের শিল্পদৃষ্টির সঙ্গে ইংরেজদের কোন একটা বিশেষ যুগের পর যেন আর মিল নেই, যেমন মিল নেই জীবনব্যতীরা—জীবনব্যতী পদ্ধতির।” তাই ঐ সময় রচিত চিত্রকলার সঙ্গে জনসাধারণের ব্যবধান বেড়ে গেল, আর হুঃখ-গরিভা-হুঃখা, রাজপুত্রের উপেক্ষা তারা হাতে খোঁচ করা ও হাত পাতা ছাড়া হাতের কাজ সবই হুয়ে গেল।

এই আনন্দলোক বা রসলোকের পাথর লক্ষ্য না হিলে, ছবির আনন্দ যে কোথায় তা বুঝিয়ে না হিলে ভারতীয় শিল্পীর শিল্পস্বপ্ন জনসাধারণের মনে কি করে লাড়া জাগাবে? এ ব্যাপারে রাশিয়ার প্রেস্তো অঙ্গুষ্ঠান করলে আমরা অনেকটা সফলকাম হতে পারি। এ প্রদর্শনে রবীন্দ্রনাথ ‘রাশিয়ার চিত্রিত্তে লিখেছেন—“সৈনিক, ছাত্র, সেনানায়ক, রাজমিত্রী, মোহর, মূলী, রত্নী...এদের মতো আনন্ডিলের পক্ষে চিত্রকলার রহস্ত প্রথম দৃষ্টিতে ঠিকমতো বোকা অসম্ভব। যেখানে দেখানো ছবি বেখে এরা ঘুরে ঘুরে বেড়াই, বুঝি তার পথ হারিয়ে। এই কারণে সব মুষ্টিঝামেই উপহুত পরিচায়ক বেখে বেওয়া হয়েছে। মুষ্টিঝামের শিক্ষা-বিভাগে কিংবা অন্তর তবগুস্তন রাষ্ট্র-কর্মশালায় যে সময় বৈজ্ঞানিক কর্মী আছে তাদেরই মধ্যে পরিচায়ক বাছাই করে বেওয়া হয়। যারা বেখেতে আসে তাদের সঙ্গে এদের যেনো নাওয়ার কোনো কারবার থাকে না। ছবিত্তে যে বিপরীতা প্রকাশ করছে সেইটে বেখলেই যে ছবি দেখা হয়, দর্পকোরা যাতে সেই কুল না করে পরিদর্শনিতার সেটা জানা চাই।

“চিত্রবস্তুর সংস্থান (composition), তার বর্ণ-কল্পনা (colour scheme), তার মনন (drawing), অবকাশ (space), উজ্জলতা (illumination), যাতে করে বিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা পড়ে সেই, তার বিশেষ আদর্শ—এসকল বিষয় আরও অধ

লোকেরই জানা আছে। এতদে পরিচায়কদের দ্বন্দ্বমতো শিকা থাকা চাই, তবেই স্বর্ষকদের ইংলুকা ও মনোযোগ সে মাগিরে রাখতে পারে। আর একটি কথা তাকে বুঝতে হবে, নৃত্যিঘ্যানে কেবল একটিমাত্র ছবি নেই, অতএব একটি ছবিকে চিনে নেওয়া স্বর্ষকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়, নৃত্যিঘ্যানে যে-সব প্রেক্ষীর ছবি প্রকৃতি আছে তাদের প্রেক্ষিত রীতি বোকা চাই। পরিচায়কদের কর্তব্য করকটি করে বিশেষ চাঁদের ছবি কেছে নিয়ে তাদের প্রকৃতি বুঝিয়ে দেওয়া। আমোচ্য ছবিগুলির সংখ্যা খুব বেশী হলে চলবে না, এবং সমগ্রও বিশ খিনিটের বেশী হওয়া ঠিক নয়। ছবির যে একটি স্বকীয় ভাষা, একটি ছন্দ আছে—সেইটাই বুঝিয়ে দেখার বিদ্য। ছবির রূপের সঙ্গে ছবির বিষয়ের ও ভাবের সম্বন্ধ কী, সেইটে ব্যাখ্যা করা দরকার। ছবির পরম্পর বৈপরীত্য দ্বারা তাদের বিশেষর বোকানো অনেক সময় কাজে লাগে।”

এই কথা রানিয়ার জনসাধারণের পক্ষে যেমন সত্য তেমনি সত্য ভারতীয় জনসাধারণের কাছেও।

আজ বিশ শতাব্দীতে জ্যেষ্ঠ, মার্কস ও আইনস্টাইনের যুগে কোন একটি চিত্রে চাই করে বুঝবার উপায় নেই। চিত্রকরেরা যেসকল সত্য চান করে (চীঘতে ইতি চিত্র) চিত্র রচনা করেছেন তারা তো আত্মকের নয়, কালকের নয়, ভাড়া যে যুগ-যুগান্তরের। আধুনিক বিজ্ঞান স্থান-কালের সীমা ভেঙে দিলেও মানুষ মিলতে পারছে না। কিউবিজম, ইমপ্রেশ্যনিজম প্রকৃতি ইচ্ছা-ম-পথী শিল্পীদের হান ও কালের হ্রস্বিষ্ঠ সীমানার মধ্যে চিত্রশিল্পীকে সীমিত করার চেষ্টা চলছে।

এইসকল আত্মকেন্দ্রিক শিল্পীর অস্বচ্ছ দৃষ্টির আবেগ ও স্থান-কালের আচ্ছাদন ভেদ করে সর্বসাধারণ হাতে চিত্রের বৈশিষ্ট্য ও তার ‘স্পিরিচুয়াল কনটেন্ট’-এর সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন তার অল্প কেবল পরিচায়ক নয়, গ্রামে গ্রামে প্রামাণ্য প্রদর্শনী এবং পথের পথের স্থায়ী মজিয়ায়, এবং ফুলেও শিল্প-শিকার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য। ভারতের নানা কলাকেন্দ্রের বিভাগবিশ্ব প্রীতিচারণ ও অগ্রান্ত সময়ে প্রদর্শনিসমূহে পরিচায়ককে কাল করবেন। গ্রামে গ্রামে বিভাগলয়সমূহে ম্যাজিক-ল্যাপ্টার্ট সহযোগে বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে।

আর একটি কথা, মূল যুগের বহুকাল আগে থেকেই ভারতে শিল্পচর্চা হয়ে আসছে। হাছারো বছর আগে আমাদের দেশের শিল্প ও সঙ্গীতের লক্ষ্য ও কাঠামো নির্দিষ্ট হয়েছে। বাৎসরিকের কাম্যমের প্রথম অবিকরণের তৃতীয়

অধ্যায়ের চিত্রাকার বর্ণনায় পণ্ডিত ছবির ছাতি অঙ্গ নির্দেশ করে দিতেছেন—

বর্ণনাতা: প্রমাণনি ভাবাব্যবহারকম্।

সাপ্ত: বর্ণিতাত্ত ইতি চিত্র: স্বরূপকম্।

কাম্যমের রচনাকাল কারও মতে ঐষ্টপূর্ব ১১১, কারও মতে ঐষ্টপূর্ব ৩১২। বর্ণনায় পণ্ডিত কাম্যমের চিত্র রচনা করেন ১১ থেকে ১২শ ঐষ্টপূর্বের মধ্যে। ‘লক্ষ্য’র চিত্রসীপ অধ্যায়েও শাস্ত্রকার চিত্রশাস্ত্রের অবস্থা-চতুর্দশ শতাব্দীর রূপ ও ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য নির্বি করছেন। এবং তখন মনে হয় চিত্রকলা আমাদের দেশে পথের বেলা ছিল না, আমাদের জানের ও কর্মের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল।

বর্ণনায় পণ্ডিত হৃদযুগ বা চিত্রকর ছিলেন—ভৃগুযুগ ছিল চিত্রচর্চার একটি বড় কেন্দ্র; এমনি আরও করকটি স্থানে চিত্র-চর্চা হত। ছবির বিষয়বস্তুতে বেশ: হার প্রমোদ: সেবুতি রচনার প্রয়াস, আর বৌদ্ধযুগে বুদ্ধের জীবন নিয়ে নানা রচনা। ধর্মগুরুদের কাণ্যনেই সাধারণ জনমন্দের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, ভারতের ভেদিতকটি কেবত: নানা রূপ আবির্ভূত হয়েছে—মহাকাশে বেবতারই ধ্যানরূপ নহায়া হ্রস্বিষ্ঠ। শিল্পীরা সেই ধ্যানরূপকে ইতিহাসের নানা পরে বৃত্তিকা ও পাশাপে রূপায়িত করেছেন। সাধারণ মানুষের শিল্পচেননা ও শিল্পবোধ সেই রূপায়িত রূপের পর যুগ চলছে—তারপর হ্রস্বদের ঘনাক্ষত্রে বিশেষ শাসন ও শোষণে সর্বসাধারণের জীবন বিপর্যত হয়ে গেছে। আজ সেই কি বিশেষ কোন শিল্পের ভাবার সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় নেই।

তাইতো আজ আমাদের বারোবারী পুজার ও অগ্রান্ত মূর্তিতে বেবতাবের অভিব্যক্তি বেশ: হার না। জনসাধারণ দেবীমূর্তিকে একটি রূপমাত্রায় রূপমূর্তি রূপে দেখেই য়ী। অবনীশ্রবণের কথা—

“তবে ধর্মপাণ্ড কর্তব্য করিয়া কেহ যেমন ধর্মিক হয় না, তেমনি শিল্পশাস্ত্র বুঝ করিয়া বা তাহার গতির মধ্যে আবদ্ধ রহিয়া কেহ শিল্পী হয় না।...মুক্তি ধর্মিকের আর ধর্মপীর তত্ত্ব ধর্মপাত্রের নাপণ। তেমনি শিল্পশাস্ত্রের বৈশাধি শিল্প-শিক্ষার রূপ, আর শিল্পীর তত্ত্ব ভাল, মান, অমূল, লাইট-পেড, পার্শ্বকটিভ আর অ্যানাটমির বহুমুক্তি। সেবাসেবকভাবে প্রতিলক্ষকম্ বৃত্ত এ কথা অর্থ কি শিল্পীকে বলা নয় যে যখন পুজার রূপ প্রতিমা গঠন করিয়ে কেবল তখনই শাস্ত্রের মত মাথিয়া চলিবে, অগ্রপ্রকার মূর্তিগঠনকালে তোমার বহা অভিকটি গঠন করিতে পার।”

কেবল আমাদের নয়, পৃথিবীর তপাকবিত প্রগতিশীল

সেইও এইরকম সমস্তা দেখা দিয়েছে। বিশেষ অগ্রতম প্রেঁত চিত্রশিল্পী পিকাসো (Picasso) একবার গ্রন্থ করা হয়েছিল : অংশ কি জানেন যে জনসাধারণ ও শিল্পীর মধ্যে ব্যবধান বেঁচে চলেছে ? তিনি উত্তরে বলেছিলেন : হ্যাঁ খুবই জানি, সম্ভবতঃ বর্তমানে তাই হতেই। তবে এর যৌব জন-সাধারণও নয়, চিত্রকর বা শেটারসেরও নয়। আধুনিক চিত্রশিল্প জনসাধারণ যে সব সময়ে উপলব্ধি করে থাকেন বা বুঝে থাকেন তা নয়, তার কারণ সেটিঃ সমস্ত তাঁদের কোনদিনই কিছু বুঝেনো হয়নি। ("They were taught to read and write to draw and sing but no one ever thought to teach them how to look at a painting or told them what poetry, life, form and rhythm they could discover in it.....In order to educate the public I think it would be useful to print a number of cheap coloured reproduction of my works.")

পরীতে পরীতে আমাদের প্রদর্শনী ছাড়া প্রেঁত চিত্রকরের চিত্রে সত্য পুরাতন প্রকাশ ও বহল প্রচার একান্ত আবশ্যিক। তবে তা ভারতের নতুন সমাজের দেশে সরকারী উচ্চাঙ্গ ব্যতীত সম্ভব নয়।

একটা সাধারণ কথা আছে—“হৃদয় সে—যে চক্ষু চান, প্রাণে লাগে।” সেই হৃদয়ের তপ হুগে হুগে কমলায়। কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণ এখন শিল্পচৈতন্য হারিয়ে ফেলেছেন এখন অবনীন্দ্রনাথ, রামিনী রায়ের ছবিও উল্লেখ মনে লাগে আগতে পারে না। এদের শিল্পের মূল অতীত ঐতিহ্যে নিহিত, বর্তমানের আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট আর ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, রামিনী রায় ভগ্নপ্রাণের গলা-আনন্দনের স্বজন আবার ভারতের মাটিতে শিল্পদলকে বহিষে নিতে এসেছেন; এ কোন বিশেষ ক্রান্তি, বিশেষ স্থানের, বিশেষ কালের সন্দেহ নয়; এদের প্রণয়িত চিত্র রায়বন্দন, এংলো, লা ভিকির ছবির মতো চিত্রকালের সন্দেহ। অতি দুঃখের কথা, আজ এই কথাটিই শিক্ষাসো-বাসিনের অগ্রদূতবীরা কুলতে ফেলেছেন। আমাদের

পক্ষান্তারের আর সত্য, শিব ও হৃদয় কি আচ্ছন্ন হতে চলেছে ? এ প্রশ্ন আর অনেকের মনেই জেগেছে। এ মধ্যেই এ দুগেরই অতি আধুনিক শিল্পী সালভাডর ডালি (Salvador Dali) বলেছেন :

"At first Picasso and Matisse knew how to draw. But today their imitators do not know how to paint and are totally incapable of depicting, even indifferently, a human countenance. This is extremely serious, for it threatens to plunge an entire generation into darkest artistic barbarism. Modern artists have a horror of the dazzling perfection of the masters of the renaissance. Nobody dares look Raphael in the face. Consequently they prefer to go back and take as models ideals more or less barbarous. Paradoxically in order to produce modern art today they confine themselves to turning out caricatures or the most remote periods of Roman, Cretan, African art—literal copies or the scrawls in prehistoric caves."

সুতরাং অতি আধুনিক শিল্পীরা সাধন। ঢালাকি দ্বারা যখন কার্য হয় না। শিল্পের সত্য দরখাস নেই। মস্তুর হৃদয়ের অবদান হয়েছে, আবির্ভাব হয়েছে বহুদূরের। মাতৃস্ব হৃদয় ও কাল হস্তের সাহায্যে অল্প ক'রে বাহিরের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে সচেষ্ট হলেও, অন্ধরের দিকে মাতৃস্ব দুর্লভ্য প্রাচীর পড়ে তুলছে। এক ঘেঁটে আর গৃহিণীর সব রঙ এনে মিশতে পারছে না। বৈচিত্র্যকে বাচিয়ে রাখলেই সুসজ্জবের সত্যতার ক্রমবিকাশের উর্দগতি অব্যাহত থাকবে।, সুতরাং প্রত্যেক দেশে আশ্রয়প্রার্থীর বাহন হিসাবে যেমন খিঞ্জি তাহার পরী হয়েছে, তেমনই সখী হয়েছে শিল্পের ভাবার। মাতৃভাষা মাতৃভাষার সখেই শিল্পী আয়ত্ত করে। সেই ভাষা দেখা যেমন সহজ, জনসাধারণের শ্রুত তা বুঝতেও তেমনই কঠিন হয় না।

মতন ইয়ারোপ: মতন মানষ

মনোজ বসু

বসে—সমসম থেকে সওয়া পাঁচ ঘটা। সামান্য পথ, কেউ আনলে আনে না। এক সৌচ দিয়ে পৌঁছন। গ্রাম থেকে কলকাতা আসতাম, গাড়ের লোক ভেঙে পড়ত। সাবশানে বেও গো, সামাল হয়ে থেকে। আঁককে শহরের ক'ছন—হাটের পুঙ্খ নেড়ে সংক্ষিপ্ত সত্বেষণ সেয়ে সেনের খোপে ঢুক কংগর মূখে ধরে বসলাম। বড় গরম—পিচবারের পাখা নাচছে প্রাণপণে। পাঁচ-সাত হাজার ফুট উপরে উঠে তবে কিছু আরাম পাওবা গেল। পূর্ব থেকে টানা গতিয়ে। পাইলট সিন পাঠাল—সেখুন, ঐ সেখুন, গাড়ের নিচে ছায়াঙ্ক বীপ। সিন পনেরো আগে মথলপুরে দড়া করতে গিয়ে গায়ে হেঁটেছি ঐ বাথের উপর। এলিয়ার সবচেয়ে লম্বা বীপ। আবার একটু গরম দবর আসে ক রাষ্ট্রপুর ঐ বীয়ে সেখুন। আবহাওয়া ভালই—কিন্তু ব্যারোটার মূখে বেশ খানিকটা সেনা দেবে। লোকের কড়াট চুঁকিয়ে ফেলুন তার আগে।

অতি উত্তম প্রত্যাব। ব্যারে হাজার ফুট উপরে মূরগি-পুড়ি ইত্যাদি খোপে বিখ্যোজ্ঞ সেয়ে চেয়ার মানিয়ে মৃত্তা মূল-কক্ষ মূচি দিয়ে চোখ বুজছি—ভোরবার বোলন হোক, খুদ অমবে ভাল। হলও বটে কিছু, মিনিট পাঁচেক কিকিং নাড়াচাড়া সিনে আবার বেমন-কে-তেমন। পাইলটের উপর চাই সেলাম, এটাইটুর মস্ত এতদূর আশা বেওয়া কেন? নগদ পনেরো টাকা ব্যায়ে ইনসিওর করে এসেছি। পথে যদি মারা পড়ি, যেটা টাকা। পুরোপুরি না মরেও হাত-পা-চোখ-কান কোন অঙ্গের হানি ঘটলে পড়তা কবে টাকা দেবে। কিন্তু কবে পৌঁছতে তেমন-কিছু পাওনা ঘটবে, এমন তো মনে হয় না।...

বসে এক লম্বা শহর। সমুদ্রের কিনারা ধরে চলেছে। ইলেকট্রিক-রেল শহরের সঙ্গে ছুটে বেন মূল পার না। সমস্তটা সিন শহরের এম্বো-ওম্বো করছি। টিকা নিঃসৃত তো? ইনকায়ে-ট্যাঙ্কের সার্টিফিকেট? টাডেলাব্ল চেক? কী

মুশকিল, জিনা ব্যাকি এগনে যে তিনটে সেনের! সেতু ভরম ফোটা চাই আর সেতু দুটো টাকা। বিশেষ বাওয়া কী ককুমারি! প্রতি ব্যারেট মনে মনে কামন্দা খাট। এই বা হল—কলগি আর পা: ব্যাডাডিয়ে সেনের চৌহদ্দির ব্যাটের। কিন্তু কিসে এসে মনে থাকে না, ব্যাটেরের পৃথিবী হাতছানি বের আবার। সিনে-সিন কড়াচুটি ব্যাডতে। এই ভাড়াডিয়ে নিহন হল শুধু মার হু-প সত্তর টাকা মিতে পারবেন সেনে। পুরোপুরি সিন-প নন, অথবা আড়াই-প-ও নয়—হিসাবতিতাব করে ওবা টিও কংসেচন হু-প সত্তর। সব বোকা: পরিত্যাগ করে বাবুত ও পলসারী হায়ে মুরলেও



সেবা চিত্র

ভাত হুলায় না। বেহেতু মেনে থাকেন, সাহসী চুচামিশ পাউণ্ড ওজনর মাল নিতে পারবেন কিনা মাতুলে। নেহাৎ-পাক হুটা গরম হাট তো দেখেন—তবে আর চুচামিশের কত বাকি রইল, হিসাব করে দেখুন। হুলানে ব্যাগ কিনতে হল অতঃপর—সেখানে ছোট, ডিতরে অচল তাৎপা। অবহেলার হাতে ছুটিয়ে নেব, তবে হুমতা ঐ বস্তুর ওজন না-ও করতে পারে!

সারামিন এই সমত করে, হাত দশটায় সাটো-জুর এছরেগেট হামির হলান। অনেক এসেছেন—তারি হু-জন ওগীও তাকে মশা। ছবির পতিচালক ছবীকেশ মুখুন্ড এবং গানের পতিচালক হেনকুমার মুখুন্ড। কেননতরো ব্যাশার—বড় হয়েও হু-জনের একটু হেমাৎ নেই। লোকারণ্য—সাহেব-মেমও বিহর। কতক থাকে, কতক বিলাস নিতে এসেছে। আনন্দের কলারোল, চোখের কোণেও জল।

কাস্টমের হামামা চুকিয়ে বাইরে এসেছি সকলে। আলোয় ঝাঞ্ঝারে নিগাল-করা মাঠ। স্থপার-কনস্টেলেসন বিনানের অভিকায় নেতের উপর লাল-সবুজ আলো জলছে। ছুটোছুটি এদিকে সেদিকে। ক'মিনিট পরে দরজা খুলে দেব, উঠ বেও তখন দিটের নবর অস্থায়ী। আমার আবেগ জন—আধ-অন্ধকারে মুখ চাহার হচ্ছে না—টুক করে হানিকতার বেড়ার দার বেঁধে পাড়াল। বেড়ার ওদিকে বিভ্রমকেন্দ্র তরুণী। মুখ বাড়িয়ে দিল ওদিকে—সানো, কী কাও দেখুন দিকি!

দরজা খুলেছে। সাত সমুদ্র পারে বাবার বাত্মীল। দিলদিল করে মেনের গর্ভের ভিতর অদুত হয়ে থাকে। কল্যা উড়ছে কাকের পাখির পাখনার মতো। ভরল্লনি।

তিমটে কানরা। টুবিট অর্থাৎ সিঁচু কাসের খাত্তী আমাদের মাহেরটায়—মেনের বিশাল পাখা দুল্লিগধ বেথানে অবলম্ব করে আছে। সহযাত্রী হাও কলনেঃ বাংলা বলুন, আমি বৃত্তে পারি। আরও ভাল বাংলা শিখে দেবো এই ক'দিনে আপনার সঙ্গে থেকে।

চূপ, চূপ, লাউচ-স্মীকারে কি বলছে! এগারোট-পাঁচ—এবারে ইওনা হচ্ছে। সাত্বে দশ ঘন্টার কাছাকাছি। সাত্বে বাতো হামার হুট উপর দিয়ে দাব, কিন্তু মেনের ভিতরে তিন হাজার হুটের চাপ থাকবে। মেনে বানচাল হলো লাইক-ভেট পরবে, উই যে সকলের মাথার উপরে তোলা রয়েছে। কেনন করে পরবে, যেখানে হচ্ছে হাতে-কলমে; এরমানে পরে বেপায়ে।

বাহ্যস্থান-অগ্রী এক বুঝা বস্টা গদায় করে হাসতে

হাসতে এসিয়ে আসে। হামামা কিছু নেই। এইটে পরে কাচের জানলা খুলে টপ করে লাক দেখেন; এবং তরতর করে নিচে নামবেন। হামার তিনেক হুট নিচে গিয়ে তবো বোতাম টিপবেন। তা হল ঠেপে খুলে উঠবে, আগে টিপল কাহ হবে না কিছু। কারদাট। তনে নিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল। আকাল থেকে লন্ড দিয়ে হিসাব করে তিন হাজার হুট নেমে এসে বোতাম টিপতে হবে। পর্যন্ত সমুদ্রে গাছের পাখার কিছা কাটাধনে যেখানেই পড়ুন না কেন, মাপম হবে ধপ করে যেন আরামের শয্যা এসে পড়লেন।

এক মহিলা আতকে ভরেন। বলো কি গো, মেনে সত্যি সত্যি পড়ে বাবে নাশি হুঁবে?

আতকেই পড়বে, জা কে বলছে? আবার পড়বে না, তা-ও কেউ হলপ করে বলতে পারে না। কাছা মেনে রাখলেন, মেনে পড়ে তো বাইরে গেল।

গর্জন উঠেছে, প্রপেলার সব ক'টা ঘুরছে। কথাবার্তা ভুবে গেল। হুম্বী এয়ার-হোস্টেল ট্রে এনে মামনে ধরল। এলাচ-লবক-লাভেল ও তুলা। আমরা কি নতুন বাসি মেনে যে তুলা নিয়ে কানে ভরতে দাব? আওয়ারে ডালা ধরে বাবে, সে রকম কান নয়।

পুনরু দেখা দিল হোস্টেল, রাসে রাসে কমলার হল বিলোচ্ছে। আলো নিভেছে। মোনাকির মতন একটা-ছুটো শীপ আলো কারো কারো মাথার উপরে। বই পড়ছে। তা-ও নিতে গেল দেখটা। নিশিয়ারে ঘোর হয়ে উঠার ফেসে হুটেছি। পাখার গল্পর থেকে লাল আগুনের হতা রেজছে। ভরাবহ। নিচে—অনেক নিচে আমাদের বগতির পুখিবি। মাটি নয়, জল—আরব-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ছুটেছি।

সকলে দিখি হুমুন্ডে, আমার ঘুম নেই। ঠাণ্ড হাসছে কারো জালার ঠিক ওপারে—সিঁক্‌হীন আকাশে সুবোম্বি চাঁদ আর আমি। বসে বসে ঘুমতে হবে এ কেনন জালা! এয়ার-হোস্টেল একাধি সেকাধ নিয়ে চলাচল করছে নিঃশব্দ ছায়ায় মতো। কানে আসে চার ইঞ্চির সবগুলো প্রপেলারের একটানা আঙাঝা।

চোখ বুজে এসেছে কখন। টের পাচ্ছি, বিবদ তুলছে মেনে—নাগরবোমার মতো। হ-হ করে নেনে থাকে ধক্কির দিকে, লালনে নিয়ে আবার উঠেছে। এসোনেলো আবহাওয়া—বাতাসের গল্পের পড়ছে আর কি! মাটির দেশের ক'টি ছেসেছের আশেপাশে অবস্থার ঘুম হচ্ছে না—অভবীক্‌র স্ত্রান মা-অননী গোলা দিচ্ছেন: হুয়া, হুয়া!

৪৩-টাৰ হাসত হাসত ছুটছে পাশাপাশি—অ্যাংগাৰ আলো পাতলা চাপৰে মতো গায়ে লেপটে পড়েছ সকলো। ডাৰি ফুৰা এক মেয়ে বিচাৰ হাৰে যুগুছে—তীক্ষ্ণ নাথ, কমল-কমির মতো চোপ, এক মাথা কক ঘন চুল মুখখান। আধেক ঢেকে ছুটিয়ে আছে। একটা হাত পানের নিচের মাথুখটিৰ গায়ে গিয়ে পড়েছে—আলসে পড়ে আছে অমনি ভাবে। নিচের আয়ত-সমুদ্রে তোলপাড় চলেছে হৰতো এখন। পৃথিবীৰ নানান মেনেৰে জন পকাপ নরনারী আমতা—মাদা হুগেৰ, গোলাপ-ফুল হুগেৰ, কালো হুগেৰ, মোৰ কালো হুগেৰ—বিচিত্র মাথুখের ছোট একটা পরিবার সেশেশাখৰ পাড়ি দিয়ে ছুটছে।

ভোৱেৰ আগে ঘুম ভাঙে পেছে। উকিৰু কি দিয়ে আবার চোখ বুজি। কেউ ধৰ্মেনি, আমি একলা তেগে উঠি কেনে কৰে? লক্ষা মাগে না? ভাঙাৰ উপৰ দিয়ে বাজি, জল গাৰ হয়ে এসেছি। তরকিত বাসুকা—বাণির পাহাড়ও দেখতে পাই। আয়তৰে মক। বকচুমির উপৰ দিয়ে মেনে গড়িৰে গড়িৰে বাজে, এমনি এক এক বার মনে হয়।

সামনের গাৰিতে বাও ও তাঁর হী। কঠেপটে একটুকুৰা বাংলা ছাড়লেন, ঘুম কেনে হল?

তাই শুনে গম্বিখ থেকে একজন বলেন, কলকাতা থেকে আসছেন আপনি?

তিনিও বহু, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ফ্যাক্টৰি আছে শালিধাৰে। অনেকবার ইউৰোপ ঘূৰেছেন। এবাৰও এই বেঘিৰে পড়েছেন মাল ভিনেকের মতো।

ভুললোক বললেন, আপনায় লৰে বাংলা বদলার মন্ত উনি ছাড়াপাহু কৰাছেন, তাইতে টেৰে সেলাম আপনি বাঙালী। কিছু মনে কৰবেন না—সেবা পড়ে কিছু মনে হয় বিশ্বৰ কম বয়স আপনায়।

তবে তো না দেখেই ভাল ছিল—

কথাটা বলে স্কলগাম, কিছু মনে কৰবেন না।

অনেক মুখ শুনে শুনে এখন আর কিছু মনে কৰিনে। শটিকৰ্ডা মেশিনেৰেও তিক এই গতিক—বুৰলমবে ঐ মন্তাই অৰ্পন হয়ে থাকেন। ঐদিক মাথৰ আমায়েৰে সংগৰ কৰে খেতে হয়—সেখা না নিয়ে উপায়ই বা কি?

ভোৱেৰ চা এনে দিল। সব টোটে আৰ আপেল। ওৰে বাবা, কী লাইন হয়ে গেছে ওদিকে। আয়ত নেই, চায়েৰ পাট সেয়ে ত্তাৰগেৰে ওমিক্কাৰ তাবনা ভাবা বাবে। কাছা বদলাবলি হচ্ছে—বেই সৰেছি, টুক কৰে এলুজন আমায়

জাৰগায় বলে পড়েছেন। কিত্তে এসে অতএব আমি বসেছি তাঁর মাথলার—যাতের ঐ বস্ত্রী মেহেটাৰ পাশেৰে দিটে। হাসছে আর বকবক কৰছে, আর দেৱাৰ দিগারেট ওডাকে জানলার দিকে এক তকণ ছেলেৰে লৰে। একটা গেম হল তো আবার থাৰাছে, ছেলেটোৰ হাতও তাঁৰে সিকে আৰ একটা। ছেলেটোৰ লৰে আলোপ হল থামিক পৰে—সিদ্ধুবেৰে ঘৰ, ঘৰহুয়াৰ ছেড়ে এসে বসেৰে এক জাহাজে চাকৰি কৰে, তাৰেই কাৰে লগন বাজে। এখনকাৰ বড় কাৰ বেগছি, মিনিটে মিনিটে মেশলাই জ্বলে তক্কাৰ দিগারেট ধৰিবে বেগবা—এক সেই কাহিতে নিজেৰটা ধানো। তিনটে প্যাৰকেট সপেতে সপেতে ছাই। একবার হঠাৎ আনায় নিকে কিত্তে দিগারেট বাজিৰে মেহেটা বলে, ইচ্ছে কৰুন—

ধৰাবাৰ, চলবে না।

অবাক হয়ে তাকাল বেনে একটু। সঠিক বলতে পারব না, মনে হল সেই বকম। আকাশেৰে নিচে এমন বুদ্ধবাকও আছে ধৰা পিগারেট চল না!

তখন অস্ত কথা পাড়ে : লগন বাওহা হচ্ছে?

উৰ, প্ৰাণে নেনে পড়ব। রাউটু কাহিৰে সকলবেলা বাসিন।

মেহেটা উল্লাসভরে বলে, আমিও বাসিনেৰ। দিগি থাকি, ছ-মাল গাৰ বেগে কিৰছি।

গতিচাৰ নিজে : বাসিনে উঠবেন গিয়ে কোথা?

সে তো জানিনে। আকাশেৰে অব আটল লাওহাত পাঠিয়েছেন, তাঁরাই বেগবেন।

আ, লেখক আপনি? মিনিটে শুনেছিলাম লেখকেজা থাকেন—সেই আপনায়? আর কে কে আছেন মনে? কী আশ্চৰ্য, এক সেনে বাজি—লেখকহলৈৰ লৰে?

কাছৱায় বেককাষ্ট, ৰোমে লাক। প্ৰাণে ভিনায়। কখন ভৰে থানাশিনায় বানোবক। তাই বেখুন, কত ছোট হয়ে গেছে পৃথিবী। পা স্কলেতে পৰিনে। এইটুই জাহায়ায় আর কুলায় না, এহ-গ্ৰহাখৰেৰে এবাৰ খোজ পড়েছে।

কাছৱায় এৱেজোমনে প্ৰথমেই বড় বড় লেখাঙলোয় নম্বৰ পড়বে : অভিজিতা আনান্বেৰে পৰম বহু। শিড়ি গিয়ে উঠেছেন, বিশ্বৰ এমনি ভাল ভাল কথা বেঙায়ে শিটা। উঠে গেলেন সোতলায়। দতবড় বহুই হোন, অতঃপৰ আর নিচে নামবাৰ এক্তিয়ার নেই। মেনে ছাড়বাৰ সময় হকুম আসবে—সেনে গিয়ে তখন নিৰ্ভিৰ পাখ খোশে গিয়ে উঠবেন। আপাতত আৱায় কৰে বহন অথবা যোজাফিৰা কৰুন

উপরতলায় হুলস্থল। মিশরের কত দিকে কত উন্নতি সেই কাগজপত্র পাঠ করুন, এসে নিয়ে ঘান কিছুবাক্যবস্তুর দেখানোর প্রচল। কিংবা জাননা দিয়ে বক্তৃতির মধ্যে সাশা সাশা অগণ্য জ্ঞানানুকোঠা নিরীক্ষণ করুন—নতুন কাংকো ঐমিতিক বেড়ে আসছে। এদের কোন বাধা নেই। আঘাত পেয়ে পেরে মিশর এখন ভারি শক্তক।

বেলা দশটা। চুখখাসাগর পাড়ি দিয়ে এলাম। টুকরো টুকরো বীণ ছড়ানো এখানে-সেখানে। অদূরে ডাঙার মতন দেখা যায়। ঘন নীল জলের গা ছুঁয়ে আকাংক্ষা ঐ বৃষ্টি হল-রেখা। আর মেঘ—ডাঙার গায়ে মেঘ লেপটে রয়েছে বেন। পিছন সারিতে জলসার কাছে একটা মাথগা পেয়ে থাকা বের করে টুকছি। বিশেষে বাঙার সময় খাতা কৈশে নিয়ে হাই। একটা নয়, অনেকগুলো—কিরে এসে ভাগমাথগ পাঠকদের জ্ঞানাতন করব বলে।

হা হু-গোণে গজ, গিখে রাখছি আমার খাতায়। হেন-কালো বাদিনের সেই মেয়ে পাশে এসে বলল। আঘাটা একটু বাজাবাড়ি বকনের ভাল, তবু হুকুমী মেয়ে। আর হুমিই হলি। লেখক জেনে গলে গিয়েছে। বলে, সিলি থেকে সুনছি লেখকেরা হান্ধেন আমাদের দেশে। খী ডাঙ্গা, সেনের মধ্যে আপনাদের পেয়ে গেলান।

বলছে, বই কতগুলো আছে? ওরে বাবা, আমাদের দেশে তো সাধা করে মণ-পনেরোটার বেশি কেউ বড় গিখে উঠতে পারে না। কি টুকছেন? মিথবেন তো আমাদের স্বর্জন দেশ নিয়ে?

বিজ্ঞান্য করি, বর কতদূর বাদিন থেকে?

কে জানে! তিন-শ মাইলের কাছাকাছি হবে। যাইনি কখনো। ছোট্ট মাথগা—ওরা স্বাধীন্যী করেছে বলেই বর—এর আত্ন নান জনতে পাচ্ছেন।

বালা-ইংরেজি শিখছে তো তুমি। শিখলে কোথা? সলক্ষে মেয়েটি বলে, না না, কী যে বলেন! বাদিনের ইচ্ছাসেই একটু-আটটু বা শিখেছি। ক-অনই বা জানে! আপনাদের দেশে লেখছি সবাই প্রায় ইংরেজি বলতে পারে। বালা বলে। আর আপনি আমার ইংরেজির তারিক করছেন? দু-শ বছর ইংরেজ কীংবে চলে ছিল, আমাদের দায়ে পড়ে শিখতে হয়েছে। তোমাদের সে ব্যাপার নয়—

খাতার সর্বশেষ পাতাটা বের করে বলি, নাম কুলা তোমার, গিখে রাখি। মিশ—

মিরকে। মিশ নয়, মিসেস। বিয়ে হয়েছে, আমার ছেলে আছে।

তব্ব হল। আর কথা বলছে না। আগের সারিত সেই ছোকরা সিগারেট বের করে ঘাড় বৈকিয়ে একটা দিকে মিরকের হাতে গুঁজে। মেয়েটির অনেক সিগারেট নিয়ে খেয়েছে, একটা তার পোখ গিয়েছে। মিরকে দেখতে চোখে, কিন্তু বুঝতে পারে না যেন কিছু। হাতে নেড়ে সিগারেট গরিয়ে দিল। আমার বলে, ইংরেজি জানি বলেই আসতে হল এক মাসের ছেলোটা কেসে। সিলিতে আমাদের ব্যাপার-বাদিনের অফিস, সেইখানে চাকরি নিয়ে এলাম। ছ-মাস হবে গেল। কাল দেখতে পার ছেলে। দেখবেন আমার ছেলে, দেখবেন কি রকম?

চামড়ার উপরে চিত্র-বিচিত্র ড্যানিট-বাগ, সিলিতে কেনা। সেই ব্যাগ খুলে মোটা এক লেফাঙ্গা বের করল। তার ভিতরে পরম বরে রাখা কোটা-গ্রাক। দুখ চোখে মিতকে ছবি দেখেছে। বলে, আমার ছেলে! গেল নালে এই কোটা পাঠিয়েছে। আরও বড় হয়েছে এই এক মাসে—কি বলেন? আচ্ছা, ছেলে আমার চিনতে পারবে? কাছে আসবে না? কীভাবে—খুন হবে কেনে?...

আবার একটা বীণ—সব্বা এক কালি ডাঙা। তার ঠিক উপর নিয়ে থাকছি। ডাঙার উপরেও জল দেখা যায়। নিজের নীল জল—বড়, খুব বড় নীধির মতন। মাঝে মাঝে গাছশালা। ঘরবাড়িও দেখা যায় অতি ক্ষুদ্র খেলাঘরের মতন। দৃষ্টান্ত সাধা মেঘ কিছু দূরে—সাধা তুলো পাহাড়ের মতন করে গাধা দিয়ে গেছে বেন।

বীণটু ছাড়িয়ে আবার জল। জলের সমুদ্রের মাঝে হঠাৎ এক এক সাধা মেঘ। ওগুলো বীণের টুকরো। অকুল জলের উপর মেঘগুলো আল্পহ খুঁজে খুঁজে হঠাৎ ডাঙা পেয়ে সেখানে গড়িয়ে পড়েছে। শুনে পড়ে যোগ পোহাচ্ছে।

জলের উপরে উঠছি—উঠছি। বরফের টাই নাকি ওগুলো? বরক নয়—ঠাহর করে দেখুন, মেঘ। ললা ললা মেঘ জলের উপর কেনন করে ছড়িয়ে গেছে। জলে ভাসছে মেঘ। লেবুর রস ও স্নাওউইট দিয়ে গেল আর একবার। সত্যিই ডাঙা—নিচে দেখছি, জল নেই আর, ডাঙার উপর দিয়ে থাকছি। ঘন মেঘের আচ্ছন্ন—মেঘ কেটে গিয়ে ঘর-বাড়ি স্বাভাবিক দেখাচ্ছে পরস্পরে। অনালয়।

এবার-হোস্টেল বলল, হা-গা—ঐ যে, দেখুন ভাইনে তারিখে। আলসের সর্বোচ্চ হুড়া। সবাই নিরুৎসাহ। মিরকে আর সেই ছোকরা আবার গল্প ময়িরেছিল—সিটের হাতার উপর বসে ছোকরার কীংবের উপর নিয়ে মিরকেও

আনলাফ তাকিয়েছে। কিছু দেখা যায় না। শুধু মেঘ আর মেঘ। কিতমিকে সারা মেখে সমস্ত ঢাকা। শহরের দিকে দেখা যায় পাতলা মেঘের আড়ালে। ইয়োরোপের ঠিক কোন অংশ? সেন নিচু হয়ে চলছে, ঐশল্যের কড়া আওধাখ একটু বেন সূচু হয়েচে। কেতখানার পাখাড়ের উপরে খরে খরে নেমে গেছে। দীর্ঘখাপ্ত পাখাড়ের সারি—বড় সাতা—টালির ছাতওয়ালা বাড়ি—অগণা মানান-কোঠা। সেন আরও নেমে এসে দীরে দীরে চলছে। হকমে হকমে কি সমস্ত ফুল ফুটেছে। ঘোড়া মল এখানে-ওখানে। পাতলা খোঁড়ার মতন মেঘ এক এক বাজ দৃষ্টির শায়েন দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। দুয়বিকীৰ্ণ শহর। কোনে এসে পড়লান তবে?



গোথ এয়োট্রানে (মহানল দেখক)

পূৰ্ব-অৰ্ধমির রামধানী বার্লিন। বার্লিন-শরকারকে আমরা স্বীকার করিনে, ওখানে ভারতের আখাদি নেই। আছে পশ্চিম-অৰ্ধমির রামধানী বহু শহরে। তবু কিছু ব্যাপার-বাণিজ্যের চুক্তি হয়েছে বার্লিন-শরকারের সঙ্গে। তিরি কবে কলকাতা—তিনে আছার ওয়া তিনটে অফিস খুলেছেন। মিরকেকে বেগছেন, সে হল গিলি অফিসের। বেগেটি একা নয়, আরও এক অৰ্ধম তরুণ একত্ৰ বেশে যাচ্ছে, তার নাম ফ্রিল (Frisch)। সে হল বণে অফিসের। মিরকে আশাতত কিতছে না—তারকে ভালবেসে ফেলছে, এইরকম বলছে বুধে বুধে। বাচ্চাটা একটু বড় হলে ছেলে ও বামী সঙ্গে নিয়ে আবার কিতবে। ফ্রিল যাচ্ছে দু-মাসের ছুটি নিয়ে। অত্ৰ কামরাধ বগলছে, এতকল তাই গরিডর হুয়নি। রোম ছেড়ে আকাশে উঠেছি, কেত্ৰ এসে তখন সে আলাপ করল। তোকা তোকা বিংশথ ছাউছে।

কোকেকে মানলে এত সব? মিরকের কাছে বৃত্তি? কতটুই বা আলাপ হল মিরকের সঙ্গে! সে কী মানলে? ঐ ডক্তলোকের সঙ্গে তোমাধ নিয়ে গল হল অনেক।

এক বাঙালী—প্রাণতোষহুয়ার সরবেল। সেদ-সেট্রোনিয়ায কোম্পানির চাকরে—গলগে নিকানবিধি ব্যবধ যাচ্ছেন। তিরি কাহরার হিসেন কবে মজর পড়নি। তিনি আগে ভিনভেন; কিছা হা ওব্যাগে ছাপা নাম গীটা ছিল, সেই খেকে ধরে ফেলেছেন। অবোধ অৰ্ধম ছৌতাকে পাশে পেয়ে

বাঙালী সাহিত্যিকের লগছে দস্তামিখা বলে তাকে একেবারে থ লাগিয়ে দিয়েছেন।

সতি, অভিজুত হরে গতি আনার বাঙালী পাঠকনের অগ্রহ দেখে। কী ভালবাসেন, কত শামান্তে ভুট ওয়া! বিবেশে গিয়ে তাই আমি বাঙালী কেউ অছেন কিনা, সেই খোদ আগে কবি। পাকো বকন মেনে বলে আছি, বাঙালী পেলো আর কিছু বেপতে হবে না, দায়ভার ওতাই ঠাখে নিয়ে নেবেন। এখারের অমণেও তাই দেখছি। প্রাণে প্রথম পরখ হল, তার পরে ভেনেডা, প্যারি, ত্রালেগল, সি-হাপ, লওন সর্বত্র। এতদিনের এত যোরাযুরির ডিতরেও আমার বিশ্বাসে এতটুই চিড় খেল না। বাঙালীর কাছে নামটা বললেই—বাল, পলকের মধ্যে পরিবারের লোক বনে গেছি, যেয়েমের সেই ষাওরানোর গীড়াগীড়ি। দুই বিশপ বৃত্তি, কে বলে আর তখন!

অচিরে ভনে গেলাম ফ্রিসের সঙ্গে। লড়াইয়ের সময় ১৯৪৩ অব্দে সে ইক্সলর ছেলে—গলগে বহুর বফ। সেইসব ডয়ানক দিনের গল করছে। রাহি হলই তোদাপড় সেগে বাহ, ছুভন-হাডাম করে বোমা খাটে বার্লিন শহরের উপর। সজাবোলা দেখলেন হালানকোঠা, সজাবোলা হয়তো দেখলেন সেখানে ইট-সোফা-কফিন্টের গালা। ফ্রিসের ব্যাপকে দৈত্ৰলসে নিয়ে কাছা-কাছা মূলক পাঠিয়েছে। মিটিটারী ব্যবহার তড়াভাকি ছেলেকেও সবিয়ে দিল অনেক দুয়ে—চেকাগোভা-কিয়ার এক তরাটে। যা আর বোন ছিল—তাদেরও নিয়ে

পেছে কোথাও। ঘরবাড়ি পরিবার-পরিজন—কুড়ির আগুটায়ে সবই ছিটকে পড়ল বেনে। কনসেন্ট্রেশন-ক্যাম্পেরও একটু আশ্রয় নিলে এসেছিল ক'টা দিনের তরু—মাথায় হয়ে বাহুবল কী বরণা হিতে পাবে, সে আপনার ধাতুপায় কাশবে না মশায়, জানোয়ারও এত হিংস্র হয় না মাছবের মতো। তারপর লড়াইয়ের অস্ত্রে কিসে এলাম বার্লিনে। নিজের ভাবনা—আবাস্যের হামার বৃত্তি জড়ানো—কিন্তু এসে দেখি, এ কোন ভাবনা? চিনতে পারি নে। উদ্যবহ জলদূষণ। প্রথম দু-তিন মাস পানিপানের মতন ঘুরে বেড়াভান এ-রাষ্ট্রায় ভ-রাষ্ট্রায়। এমন মশা কারো বেনে কখনো না হয়। মা-বাপ-বোন সবাই একে একে কিয়ল বার্লিনে—মাগ্নয় ক'টিকে পাওয়া গেল, কিন্তু পুরানো সন্সার আর কমল না।

খ্রিস্টিয়ানো লিখে ছিল বার্লিনের, তারের বাড়ির। বলে, বাড়ি দেখে মন খারাপ হবে। থাকি অতি সামান্ত ভাবে। বার্লিনে বাড়ির বজ্র টান। ভাঙা ঘরে মাথা ঝুঁকে থাকি। নতুন বাড়ি পাওয়া যাবে কোথা?

রাশিয়ায় কিন্তু দেখে এসেছি আশ্চর্য ব্যাপার। ধর্মসেই চিহ্ন প্রাচীর কোথাও থাকতে দেখিনি। নতুন করে আরও ভাল করে ঘরবাড়ি বানিয়েছে। একটু-আগটু ইচ্ছে করতই রেখেছে ভগ্নাবশেষ দিনের বৃত্তি হিসাবে।

খ্রিস্টান কণ্ঠ বলে, তাত্ত্বিক আর আমরায়! তাত্ত্বিক বিপরীত ভাষা—যেন কত স্মৃতি! আমরায় তো দুই ভাগ হয়ে বাড়ি, শব্দকে সদকা। বার্লিন শহরেরও দুটো ভাগ। এমনও ছিল, একটা বাড়ির দুটো ঘর পূর্ব-বার্লিনে, দশটা ঘর পশ্চিম-বার্লিনে। বাজু এখন, যাকে দেখাবে পায়ে।

প্রাণে নামিয়ে দিয়ে আবাস্যের মেন হুশ করে লওন-মুখো উড়ল। কষ্টক্রেষ্ট আপাতত একদিনের ভিলা মিলেছে, রাতটুকু কাটিয়ে সকালবেলা বার্লিন চলে যাব। নেমন্ত্রণ নিয়ে এসেছি, অতল পরমা বরচ করে নিয়ে যাচ্ছে, যাব তো বটেই—কিন্তু এখন পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমের ভিলা মেলেনি। এই সোভিয়েট সেন্সরসো ডারি সতর্ক, মাছবের উপর বড় বেশি



আগ পর্যন্তের এখান



জানের মধ্যে নতুন বসন্ত-বাড়ি ইতিহাস

সাহেব। ঠাকুরটি ওয়ে নিয়ে যাবে যাবে অমনি ভিলায় শীল
মারবে, সে পারে এরা নয়। সেল বিনামূল্যেই—জাল,
বেদতিহাস, ইল্যো ইত্যাদির মধ্যে সেলেন খুলে বসনি।
কিন্তু বসন্তের বিজয়। কখনো আছে অবস্থা। অনেক
জানপোকার মধ্যে নতুন টিপে মারবে চেয়েছিল ওদের—সহিয়া
সক্তি যদি মরে—বিজয় করে বগল বাজাবে, বহুত মাতুল হাঁপ
হেঁচ হাঁচবে। তাই দেখেছি, ভিলা দিয়েও পাসপোর্টের
ছবির সঙ্গে বাজাবার মিলিয়ে দেখে, সক্তি মাতুলই এই কি না।
অথবা ভাল। টা : পদে : ও মালপত্র নিয়েও হরেক প্রদ্র—
পার্সি এবং পোটলপুটিলি খুলে দেখিয়ে যাও। আর লগনে
দেখুন না—মালবার সময় কাগজে প্রদ্র করছে : কুটিল-মুহা
নেই নিষ্ঠুর ভোমার কাছে ? আগনি ঘাড় কেড়ে দিন, বাস,
হয়ে গেল। কখনো বলবেন, কুটিল-মুহা আছে ভোমার কাছে ?

যদি বলে বলেন, আছে কিছু—বহুত লোনাভুক্তি করে,
অনেক বগেত। প্রদ্র : এই বহু বাজা পেতে, শিফা হোমার
বাক্তিগত জিনিস ? এখনো ওই বলে মরে পড়বার হুগোল
করে শিফা : অক জিনিসপত্রও আছে, এমনিতার
বলে আশা করি নিজের সুবিল এবং ওদের কামেলা
খটবেন না।

আমাদের কিছু সহজে ছাড় হয়ে গেল। কলম-পিত্ত-
খাওয়া কয়েকটি লেখক আগোহায়ে নেমন্ত্রণে যাচ্ছে, থাকবেও
একটা রাহি শুধু, সকালবেলা লটবহর নিয়ে লড়ে পড়বে
—ইত্যাদি বিবেচনা মধ্যে কর্তৃপক্ষের কল্যাণ হোমোজ বোঝে হয় ;
বাজপেটবার গারে হুগোই খাড়া মেয়েই সেবে সিলেন,
খুলবার হুগোল হল না। কাউন্টবারের একশিক ছেলে গদা
করে অল্পের নিয়ে পড়লেন। [সমাপ্ত]



PHONE • B.B.1717

GRAN-CALOPTICO

মাথার যন্ত্রণায় ফুসিয়েছেন
একবার চকু পরীক্ষা করার না করন?



ক্যালকাটা অপটিক্যাল

কোঃ গ্রাহেডেট লিমিটেড

প্রতিষ্ঠান : ডাঃ কার্ডিক চন্দ্র বসু এম.বি.

৪৭, আমবাথী স্ট্রীট • কলিকাতা-৯

কপদ্মাগর

দুর্বোধি ফোঁস

পৃষ্ঠপত্রিকার পং.

কলকাতায় রেসের মরত্ম পড়তেই গালুড়িতে আর একটা দিনও থাকে না। যে ঘরেন বোস, তারই ছাী সুনয়না যেন গালুড়ির আলো-ছায়ার মধ্যে নিজের জীবনটাকে সঁপে দিয়ে বসে আছে। কলকাতায় যাবার জন্ত সুনয়নার মনে কোন ব্যাকুলতা নেই; যদিও সুনয়নার মা আজও বেঁচে আছেন, এবং প্রায় প্রতি মাসেই একটি করে চিঠি লেখেন; অস্তুত এবার পূজোর সময় কলকাতায় এসে একটা মাস আমার সঙ্গে থেকে তারপর চলে যাস, সুনী; এমন কিছু সাত সমুদ্রের তের নদীর ওপারে তো থাকিস না। গালুড়ি থেকে এবেলা রওনা হলে এবেলার কলকাতাতে পৌছাতে পারা যায়। তবে কেন? কিসের অস্তুবিধা? বাধাই বা কিসের? ঘরেনের যদি সময় না হয়, তবে তুই তো একলাই চলে আসতে পারিস।

সুনয়নার জীবনের উপর মায়া করবার মত মাত্র একজনই মানুষ আছেন। তিনি হলেন সুনয়নার মা; আর থাৱা আছেন, তাঁরা আপনজনের মত। সুনয়নার জেঁতুতো দাদা পরেশ আছেন, যিনি সুনয়নার লেখাপড়ার খরচ থেকে শুরু করে বিয়ে দেবার খরচ পর্যন্ত সব দায় স্বীকার করে খুঁড়ুতো বোনের জীবনের উপর অনেক দয়া করেছেন। আজও সুনয়নার মা এই পরেশেরই কলকাতার বাড়িতে আছেন। বিধবা খুঁড়িনাকে দয়া করলেও শ্রদ্ধা করেন পরেশদা। আজও সুনয়না ইচ্ছে করলে পরেশদার বাড়িতে এসে একটা বছর থাকতে পারে; এবং থাকলে বাড়ির কোন মানুষ একটুও বিরক্ত না হয়ে বরং খুশিই হবে। কিন্তু কলকাতায় আসবার জন্ত

সুনয়নার মনে কোন ইচ্ছা আছে কিনা সন্দেহ। আশ্চর্য হয়েছেন পরেশদা। তিনি বছর হলো বিয়ে হয়েছে সুনয়নার; বিয়েতে আট-দশ হাজার খরচ করে ফেলতেও একটুও কুণ্ঠিত হননি পরেশদা। যেনে জীবনের উপকার করতে গিয়ে এতটা করলেন পরেশদা, সেই মেয়ে এই তিন বছরের মধ্যে কলকাতায় আসবার মানও করলো না। মনে মনে বেশ ক্রোধও হয়েছেন পরেশদা। মানুষও এমন করে উপকার ভুলে যায়; এত অকৃতজ্ঞ হয়! কাকা বেঁচে থাকলে, কিংবা সুনয়নার কোন আপন দাদা থাকলে, সুনয়নার জন্ত এর চেয়ে বেশি কি আর করতেন? বিয়ের পর পরেশদাকেই সব চেয়ে বেশি পর বলে মনে করে কেললো সুনয়না, কী হুংখের কথা!

পরেশদা কল্লাও করতে পারবেন না, কেন সুনয়নার মন কিসের বিব্রনে এত কঠোর হয়ে গেল? ধারণা করতে পারেন না পরেশদা, তিনি নিজেই ভুল করে একটা ভুল সন্দেহ নিয়ে সুনয়নার জীবনের একটা কঠোর অভিমানকেই অকৃতজ্ঞতা বলে মনে করছেন। এবং সুনয়না জানে, আর কলকাতায় গিয়ে না'র কাছে কিংবা পরেশদার সাননে গিয়ে দাঁড়াবার কোন অর্থ হয় না। সুনয়নার মুখে হাসি দেখলেও ওঁরা কিছু বুঝতে পারবেন না; চোখে জল দেখলেও না।

এই গালুড়ির আলো-ছায়া থেকে সরে গিয়ে পৃথিবীর কোন জনতার চোখের সামনে গিয়ে মুখ দেখাতে যেন ভয় করে সুনয়না। দরকার নেই। গালুড়ির এই ছোট বাংলা-বাড়ির একটি ঘরের ভিতরে শুধু আয়নার কাছে মুখ ভুলে দাঁড়িয়ে

ধাকতে পারলেই হলো। এই আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে চিনতে পারে সুনয়না। কেন হঠাৎ চোখ ছুটো। হলহল করে ওঠে, কেন টোন্টের উপর অদৃষ্ট হাসি সিরসির করে ওঠে, আর কেনই বা একটা ক্লক ফ্রুটি মাঝে মাঝে চোখ ছুটোর উপর ছটকট করে, সবই বুঝতে পারে সুনয়না। কখনো নিজের এই জীবনের উপর প্রবল মায়া, কখনো নির্মম তৃণ! এবং কখনো বা একটা উল্লাস সুনয়নার চোখ মুখ আর টোন্টের উপর খেলা করতে থাকে।

পরেশদার দোষ নেই। কিন্তু উপকার করতে গিয়ে, সুনয়নার জীবনে একটা উৎসবের আনন্দ এনে দিতে গিয়ে, আট-দশ হাজার টাকা খরচ করে কি-ভয়ানক অভিশাপের মধ্যে সুনয়নাকে ঠেলে দিয়েছেন পরেশদা! গালুডি স্টেশন পার হয়ে, লাইন ধরে আধ মাইলের বেশি যেতে হয় না, যেখানে পাড়িয়ে আছে যে সুন্দর চেহারার বাংলা-বাড়িটা, সেই বাড়িটাকে দেখেই কি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন পরেশদা? বাড়ির ফটকের ছ'পাশে ছ'সারি দেওদার; ছায়াটা যেনন মিষ্টি, তেমনই মিষ্টি বাংলা-বাড়ির চারদিকের যত লতার ফুলের রূপ আর গন্ধ। এ-হেন মিষ্টি চেহারায় বাড়ির মাছুষটার চেহারাও তো কম মিষ্টি নয়। বীরেন বোসকে দেখলে সবার আগে সবাইই মনে এই সন্দেহ দেখা দেবে যে, মাছুষটি হয় কবি, নয় দার্শনিক। এমন চমৎকার একটি জায়গাতে, এমন সুন্দর একটি বাংলা-বাড়ি তৈরী করে নিয়ে যিনি জীবনের নীড় গড়ে দিয়েছেন, তাঁর মনের রুচি আর শব্দের প্রকৃতি সহজেই বুঝে ফেলাতে পারা যায়। তা ছাড়া, পরেশদা নিজে এসে নিজের চোখে দেখে গিয়েছিলেন, কী চমৎকার কারবার করে বীরেন বোস। কারবারের বাৎসরিক অঙ্কিটের হিসাব পর্যন্ত জেনে গিয়েছিলেন পরেশদা। বাটশিলা, চাইবাঙ্গা আর পেলুগুড়িতে স্টোন-টিপ ও লাইম-স্টুট মালাই করে বীরেন বোস। গালুডি থেকে ঢাব হাইল ঘুরে একশো বিঘা জারগা জুড়ে বীরেন

বোসের ইজারা নেওয়া কোয়ারি। একশো মজুর কাজ করে; আর, চারটি ট্রাক দিবারাত্রি ছুটোছুটি করে থাকে। সে বীরেন বোসের সঙ্গে সুনয়নার বিয়ে দেওয়া, নৌভাগ্যের অমুগ্রহ বলে মনে করেছিলেন পরেশদা। অস্বীকার করে না সুনয়না, সুনয়নাও যে বিয়ের আগে একদিন কলকাতার বাড়ির ছাদের উপর পাড়িয়ে পশ্চিমের আকাশে সূর্যাস্তের ছবি দেখতে দেখতে বুকের ভিতরে একটা নিবিড় নিঃবাসের বিষয় সামলে রাখবার চেষ্টা করেছিল; সত্যিই তো, বীরেন বোসের মত মানুষ সুনয়নাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, এর মধ্যে নৌভাগ্যের অমুগ্রহ ছাড়া আর কি রহস্ত থাকতে পারে?

পরেশদা কি বীরেন বোসকে চিনতে আর বুঝতে চুল করেছিলেন? না, একটুও চুল করেননি। বীরেন বোস তার জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে একটি কথাও বাড়িয়ে বলেনি, এবং মিথ্যাও বলেনি। বিয়ের পর গালুডির এই বাড়িতে এসে, দেওদারের ছাড়ার কাছে পাড়িয়ে যেন জীবনের এক সকল স্বপ্নের আনন্দে রিক্ত হয়ে সুনয়না নিজেও বুঝতে পেরেছিল, গালুডির এই নিরালা বাংলা-বাড়ির স্থলের মধ্যে কোন ভেজাল নেই, মিথ্যা নেই। বীরেন বোস ভালবাসতে জানে, ভাল কথা বলতে জানে, আর কাজ-কারবার নিয়ে খাটতেও জানে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, এ-হেন বীরেন বোস একদিন, বিয়ের পর মাত্র হুঁটা মাস পার হয়েছে সেই দিন, সুনয়নারই হাত ধরে রেল-লাইনের পাশে বেড়াতে বেড়াতে যে কথা বললো, সে-কথা একেবারে নতুন রকমের একটা জীবনের ইজারা কথা। —এই মাটি-বেচা জীবন আর ভাল লাগে না, সুনয়না।

আশ্চর্য হয়েছিল সুনয়না—তার মানে?

বীরেন—বড় বেশি পরিশ্রম। দিনরাত মজুরদের পিছনে লেগে থাক; মাসে পশবার এদিক-ওদিক ঘোড়াদোড়ি কর; টেণ্ডার নিয়ে সাধাসাদি কর;

বিল আদায় করতে হিমসিম খাও ; তবে গিয়ে বড় ভোর হাজার-দু'হাজার টাকা মাসে রোজগার করা যায় । এ অবস্থায় চলল টাকার মুখ আর কখনো দেখতে হবে না ।

সুনয়না—এর চেয়েও বেশি টাকা রোজগার করার পরকার কি ?

বীরেন বোস হাসে—তুমি বোধ হয় প্লেন লিভিং আর হাই থিংকিং ভালবাস ।

সুনয়নাও হাসে—এসব তবু কথা বৃথা না । তবে এটুকু বৃথা যে, যেননটি আছি, তেননটি থাকতে পারলেই ভাগ্যির কথা ।

বীরেন—না সুনয়না । এতে সুখী হওয়া পারে না ।

সুনয়না—সুখী হচ্ছেই তো আছি ।

বীরেন—তুমি বুঝবে না, সুনয়না ।

সুনয়না—বুঝিয়ে দাও ।

বীরেন বলে—আমি বরং বলবো যে, হাই লিভিং আর প্লেন থিংকিং হলো আনল সুখের জীবন ।

সন্ধ্যার অবস্থা অন্ধকারে রেল লাইনের পাশে পাশে স্থানীর হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে এই প্রথম চমকে ওঠে সুনয়না । বীরেন বোসের কথাগুলিকে একটু বেশি অদ্ভুত মনে হয়েছে ; তার চেয়ে বেশি অদ্ভুত মনে হয়েছে বীরেন বোসের গলার স্বর । বীরেন বোসের মুখের ঐ তবু কথার মত বীরেনের গলার স্বরটাও যেন কেমন এলোমেলো ; এবং বীরেনের নিঃশ্বাসের বাতাসে অদ্ভুত একটা গন্ধও যেন টলমল করছে ।

বীরেনের মুখটাকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে সুনয়না । বীরেন বলে—এখনও বুঝতে পারলে না সুনয়না ?

সুনয়না—না ।

সুনয়নার গলা জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নেয় বীরেন—আমি ভালরকম পরস্যা করতে চাই সুনয়না । মাসে দু-এক হাজার নয়, দু-এক লাখ হলে তবে খুশি হতে পারি ।

সুনয়না—আজ বিকেলে কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?

বীরেন—একটা পরামর্শের কাজে গিয়েছিলাম ।

সুনয়না—কি বেয়ে এসেছ ?

বীরেন হাসে—ঘা খেয়েছি, সেটা খাওয়া কি দোষের ?

সুনয়না—না, দোষের নয় । কিন্তু আমার সামনে খেলেই তো পার ।

বীরেন—তুমি কিছু মনে করবে না ?

সুনয়না—আমার সামনে খেলে একটুও আপত্তি করবো না । কিন্তু...

বীরেন—কি ?

সুনয়না—তুমি আবোল-তাবোল কথা বলতে পারবে না ।

বীরেন—তার মানে ?

সুনয়না—এই যে, এখন যে-সব কথা বলছে ।

দু-এক লাখ টাকার কথা, বড়লোক হবার কথা !

টেঁচিয়ে হেসে ওঠে বীরেন—এটা যে আমার স্বপ্নের কথা, সুনয়না । আমাকে বড়লোক হতেই হবে । মাটি-বেটা এই সামান্য টাকার রোজগারে আমি সুখী হব না, তুমিও সুখী হতে পারবে না ।

সেইদিনই কলকাতার বাড়িতে চিঠি দিয়েছিল সুনয়না ।—আমি এখন কলকাতায় যেতে পারবো না, মা । কবে যেতে পারবো, তাও বলতে পারছি না ।

গালুড়ির এই তিন বছরের জীবনের মধ্যে শেষ দুটো বছরের জীবনটাই সুনয়নার জীবনের একটা মোহ । অতি অদ্ভুত ও অতি নির্মম একটা মোহ । সেই মোহ দু'বছর যের সুনয়নার চোখে মুখে বিচিত্র হাসি, বিচিত্র আলা আর অদ্ভুত উল্লাসের নিহর জাগিয়ে সুনয়নার জীবনটাকে ব্যস্ত করে রেখেছে । কালিকা মাইনস্-এর নিশীথ রায় হলো সুনয়নার জীবনের নতুন মোহ ।

মনে পড়ে সুনয়না, বেদিন নিশীথ রায়কে এই বাড়িতে চা খেতে জেকেছিল বীরেন, এবং নিশীথও

যেন সেই চা খেতে এসে ধক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেদিন নিশীথ রায়কে একটা নতুন অভিশাপের আবির্ভাব বলে মনে হয়েছিল সুনয়নার। নিশীথের সঙ্গে একটি কথাও বলেনি সুনয়না; কিন্তু নিশীথ রায় সেজন্য নিজেকে একটুও অপমানিত বোধ না করে এবং ধীরেন বোসের হাতে দু'হাজার টাকার একটা চেক দিয়ে চলে গিয়েছিল।

—কিসের চেক? জিজ্ঞাসা করেছিল সুনয়না।

—শেয়ার কেনা-বেচা করবো, সেইজন্যে নিশীথ রায়ের কাছে থেকে টাকা ধার নিলাম।

ঠ্যা, ধীরেন বোস তার নতুন ইঞ্জার নেশা আর অহংকারে মাটি-বেচা কারবার অনেকদিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর, রেসের মরুভূমে রেস, এবং শেয়ার মার্কেট। মাসের বিশটা দিন কলকাতাতেই পার করে দেয় ধীরেন। গালুড়িতে যখন কিরে আসে, তখন দু-চারটে হুইকির বোতল ছাড়া আর কোন সম্পদ সঙ্গে নিয়ে আসে না। সেই হুইকি কুরায়; এবং আবার কলকাতার রেসের কিংবা শেয়ার মার্কেটের আন্ধান এসে ধীরেন বোসের আশা আর কল্পনা উতলা করে দেয়। আবার কলকাতা যাবার জন্য ছটকট করতে থাকে ধীরেন বোস। আবার টাকা চাই। কিন্তু কোথায় টাকা?

—তুমি যদি নিশীথ রায়কে নিজের মুখে বল, তবে কিছু বেশি টাকা ধার পাওয়া যেতে পারে।

নেশার আবেশে ছল-ছল ছুটো লাল চোখের অলস দৃষ্টি তুলে সুনয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে একদিন আবেদন করেছিল ধীরেন। আর, সুনয়নার দু'চোখে যেন ছুটো আগুনের আলো দপদপ করে উঠেছিল।

কিন্তু সুনয়নার চোখের সেই চাহনিকে বেন প্রচণ্ড একটা অবহেলার কঠোর হাসি দিয়ে তুচ্ছ করে চেতিয়ে ওঠে ধীরেন—গালুড়ির টিয়ার-মার্কেটে রামগোপাল চৌহানকে চেন।

সুনয়না—না।

ধীরেন—বেল থেকে স্লিপার দাগাই করে, কনট্রাক্টর রামগোপাল চৌহান, আমার বন্ধু।

সুনয়না—বুঝলাম।

ধীরেন—রামগোপালকে বলা আছে, কোথাও বেড়াতে যাবার জন্য যখনই তোমার গাড়ির দরকার হবে, তখনই পাঠিয়ে দেবে।

সুনয়না—আমার গাড়ির দরকার নেই।

ধীরেন উঠে দাঁড়ায়—দরকার আছে। তোমাকে আজই একবার কালিকাপুর যেতে হবে।

সুনয়না—কেন?

ধীরেন—নিশীথকে গিয়ে বলতে হবে, অন্তত তিনটে হাজার টাকা আমার খুব দরকার।

দাঁত দিয়ে টেঁটে চেপে, ভুরুটি করে চোখের চাহনি প্রায় হিংস্র করে নিয়ে সুনয়না বলে—আর একবার ভেবে নিয়ে বল।

ধীরেন—কিছু ছাড়াবাবর নেই। আমার ওসব ভাবাবাবর গরজ নেই।

সুনয়না—নিশীথ রায়ের কাছে গিয়ে আনি টাকা চাইলে নিশীথ রায় যদি অন্যকে অপমান করে?

ধীরেন হো হো করে তেঁদে ওঠে—অপমান? নিশীথ রায় তোমাকে অপমান করবে? ছিঃ, তোমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে নিশীথ রায়?

সুনয়না সেদিন যেন নিজের অন্তটাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার জন্য একটা আক্রোশ নিয়ে কালিকাপুর মাইনস-এর মানোজার নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। টাকার জোরে পরস্পর মুখের দিকে হাঁ করে তাকাবার আনন্দ পেতে চায়, সে মানুষকেও এইরকম ভুরুটি দিয়ে ঘৃণা করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছুটে গিয়েছিল সুনয়না।

কিন্তু সুনয়নারই অসুস্থের পরিহাস। ঘৃণা করতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সুনয়না। সুনয়নার কথা শুনে কি-ভয়ানক চমকে উঠলো নিশীথ

হায়! ভয় পেয়ে ধরখর করে কেঁপে উঠলো নিশীথের চোখ দুটো।

—আপনি কেন এসেছেন? সামান্য টাকার জন্য আপনি এতটা পথ কষ্ট করে এখানে ছুটে এসেছেন, ভিঃ। একটা চিঠি দিলে আনিই তো গালুড়িতে গিয়ে, শীতলবাবু সঙ্গে দেখা করে...

নিশীথের গলার সেই তরতর ভাষার শব্দ শুনে নিশীথের ভীষণ চেহারার দিকে সুনয়না হাঁ করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

প্রশ্ন করে সুনয়না—আনার এখানে আসা কি অসম্ভব হয়েছে?

নিশীথ—নিশ্চয়। ধীরেনবাবু শেষারের কারবার করেন, তাঁর টাকার দরকার পড়ছে; কিন্তু সেজন্য আপনি টাকার যোগাড়ে ছুটোছুটি করবেন কেন?

সুনয়না—তাহলে আনি চলে যাই।

নিশীথ—নিশ্চয়। আনি নিজে গিয়ে টাকা দিয়ে হাসবো, যদি অবশ্য টাকার যোগাড় করতে পারি।

সুনয়না—আপনি টাকা দেবেন কেন?

সুনয়নার প্রশ্নে বিব্রত হয়ে নিশীথের মুখের চেহারা এইবার ককণ হয়ে যায়। —ঠিকই বলেছেন। আর টাকা দেবার ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু...

সুনয়না—কি?

নিশীথ—কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, আর টাকা দেওয়া উচিত নয়; তবে আমি দেব না।

সুনয়না—সেটা আপনি ভেবে দেখুন।

নিশীথ—আপনি যদি আমাকে মিছিনিছি কোন সন্দেহ না করেন, তবে এবারের মত টাকা দিতে পারি।

সুনয়না—কিসের সন্দেহ?

নিশীথ হঠাৎ নিরুত্তর হয়ে যায়।

সুনয়না বলে—না, কোন সন্দেহ করছি না।

নিশীথ—শুনে হুঁশি হলাম।

সুনয়না—তার মানে?

নিশীথ হেসে ফেলে—ভয় ভেঙে গেল। আপনি আমাকে ভুল বোঝেননি।

চলে যায় সুনয়না; এবং পরদিনই নিজে গালুড়িতে এসে ধীরেনের হাতে তিন হাজার টাকার একটা চেক ধরিয়ে দেয় নিশীথ। তারপর, আর পনরটা মিনিটও দেরি করেনি ধীরেন। চেক হাতে নিয়ে যেন একটা দ্রুত স্বপ্নের নেশায় আকুল হয়ে কলকাতার ট্রেন ধরবার জন্য স্টেশনের দিকে ছুটে চলে যায়।

আর, সুনয়নার হুঁচোখ থেকে ঝরঝর করে একটি নীরব কান্নার বেদনা জল হয়ে করে পড়তে থাকে।

—এ কি করছেন? চোঁচিয়ে ওঠে নিশীথ।

—আপনি কি ভয়ানক ভুল করলেন, বুঝতে পারছেন? আস্তে আস্তে বলে সুনয়না।

—না।

—ধীরেন বোসের স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখবার দায় স্বীকার করে নিলেন।

—না, কখনো না; হতে পারে না। আপনি আমাকে বিপদে ফেলবেন না।

—আপনি বিপদে পড়ে গিয়েছেন। আমার দোষ নেবেন না।

—কিসের বিপদ?

—এই যে এত রাত হয়ে গিয়েছে; অথচ আপনি এখনও এখানে আমার সামনে একা বসে আছেন। গালুড়িতে কিংবা বাবার এখন যে আর কোন গাড়ি নেই।

—তাতে কি জ্বলছে? আমি এবি গিয়ে স্টেশনে বসে থাকবো।

—কিন্তু আমি যে যেতে দেব না।

সুনয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোন প্রতিক্রিয়ার ভাবা কিসকিস করেও উজ্জ্বল করতে পারেনি নিশীথ। কী অদ্ভুত রকমের একটা আক্রোশ নিয়ে জলজল করছে সুনয়নার চোখ দুটো।

সেই সঙ্গে সুন্দর গড়নের ঠোঁট ছোটো কী নিবিড় আবেশে গোলাপের পাপড়ির মত ফুলে উঠেছে।

নিশীথ বলে—আমাকে যেতে দিন।

সুনয়না—না।

নিশীথ—কেন?

সুনয়না—আপনার যাবার ইচ্ছা নেই।

নিশীথ—কে বললে?

সুনয়না—আপনি নিজের মনকে ভ্রমের মা করুন।

যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে নিশীথের মুখটা। কী ভয়ঙ্কর সত্য কথা বলে নিয়েছে সুনয়না! সুনয়নার এই অলম্বল চোখের দৃষ্টি বেন নিশীথের হৃকের তপ্ত নিঃশ্বাস আর শোণিতের সব ফ্রন্দনের খেলা একেবারে স্পষ্ট করে দেখে ফেলেছে।

না, সে হাতে কালিকাপুর ফিরে যেতে পারেনি নিশীথ। সকাল হতে যখন এই বাংলা-বাড়ির দেওদারের ছায়া পার হয়ে হনহন করে বেঁটে স্টেশনের দিকে চলে গেল নিশীথ, তখন শুধু মনে হয়েছিল, ইতঃ আশ্চর্য্য করবার পর নিশীথ রায়ের একটা রক্তমাংসহীন প্রেতচ্ছায়া ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। সুনয়নার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারেনি নিশীথ। আর, সুনয়না শুধু অপলক চোখ তুলে নিশীথ রায়ের সেই পলাতক মূর্তির দিকে তাকিয়ে এই দেওদারের ছায়ায় কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

নিশীথ রায়কে ভালবাসে সুনয়না, এক কথা কারও মুখে শুনেও পেলো সুনয়না। আশ্চর্য্য হয়ে হেসে ফেলেবে। পৃথিবীর কোন মানুষকে ভালবাসতে পারে সুনয়না, এই কথাটা সুনয়নারই কাছে আজ সব চেয়ে বেশি অবিবাসের কথা হয়ে গিয়েছে। নিশীথ রায়কে ভালবাসবার কথা কোনদিন মনেও হয়নি সুনয়নার। জ্ঞা? সে তো আরও অসম্ভব। মায়া? তাই বা বলা যায় কি করে? ফলবাস্তব হয়ে একলা ঘরে খাটের উপর শুয়ে একদিন ছটফট

করেছিল নিশীথ এবং সেই নিশীথের গলা জড়িয়ে ধরেছিল সুনয়না। কিন্তু জানে সুনয়না, সে মায়া নিশীথ নামে একটা মায়াধের জ্ঞা নয়। নিজেরই একটা স্বার্থিক, সুনয়নার একটা ইচ্ছার সামান্যকে জড়িয়ে ধরে ছিল সুনয়না।

এক বৃক জলে ডুবে যাবার পর আরও গভীরে তলিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, এমন আকোষণ কোন মানুষের জীবনে সম্ভব নয়। কিন্তু সুনয়নার জীবনে সেই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে। ডুবলে একেবারে জলের গভীরে ডুবে যাওয়াই ভাল। হাঁটুজলে নাকানি চুবানি খাওয়া আরও তৃঃসহ ব্যাপার। নিশীথ রায়কে যেন এই ডুবন্ত জীবনের চিরসার্থী করবার জ্ঞা একটা। প্রতিজ্ঞা নিয়ে সুনয়নার জীবন একটা উল্লাসের বিকার বরণ করে নিয়েছে। নিশীথ রায় সুনয়নাকে ভয় পায়, কিন্তু নিশীথকে ভয় পাইয়ে সুখী হওয়াই যেন সুনয়নার জীবনের সাধ। সুনয়নার দিকে মাঝে মাঝে যেভাবে তাকায় নিশীথ, তার মধ্যে চুপা ছাড়া আর কোন ভাবের ছায়াও থাকে না। কিন্তু সুনয়নার হৃকের ভিতরে যেন একটা অট্টহাসির শব্দ বোজে ওঠে—দেখি, কত চুপা করতে পারে।

টাকা চায় না সুনয়না; কিন্তু নিশীথ রায় টাকা দেয়। কোনদিনও আপত্তি করে না সুনয়না। টাকা নিতে লজ্জাও নেই বোধ হয়। বরং নিশীথ রায়ের শরীরটার মত নিশীথ রায়ের টাকাকেও যেন নিজের ইচ্ছামত খেলা করবার বস্তু বলে মনে করে ফেলেছে সুনয়না। ধীরেন বোস নামে একটা মানুষ, যাকে ইহজগতের সব মানুষ আজও সুনয়নার স্বামী বলে জানে, সে মানুষ ইচ্ছে করেই সুনয়নার জীবনকে একলা করে দিয়ে হেসে শেয়ার আর হুইপির জগতে গিয়ে ঠাই নিয়েছে। আশ্চর্য্য্য করতে পারেনি সুনয়না; পাগল হয়ে যেতেও পারেনি। তাই বোঁচে থাকবার জ্ঞা নিশীথ রায়ের টাকা আর নিশীথ রায়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে। এই সত্য বুঝতে পারে নিশীথ, এবং এই সত্য স্বীকার করে সুনয়নার মন। নারী

ও পুরুষের মধ্যে এর চেয়ে পঙ্খিল সম্পর্ক আর কি হতে পারে ?

সুনয়না জানে, হাঁপ ছাড়তে চায় নিশীথ। টাকা নাও, কিন্তু আর এস না ; নিশীথের চোখ ছটা যেন নীরবে বিহার দিয়ে এই কথা বলে নিতে চাইছে। কিন্তু সুনয়নার অন্তরাখাও যেন নীরবে খিলখিল করে হেসে ওঠে ; এবং নিশীথকে একদিন ম্পষ্ট করে বলেও দিয়েছে সুনয়না : টাকা চাই না, দিও না ; কিন্তু আমি আসবোই। সাধিা থাকে তাড়িয়ে দিও।

—একদিনের জন্যে চিরকালের জ্বল করে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি সুনয়না ? বিড়বিড় করে একদিন সুনয়নাকে নিজের ননের একটা মুখচোরা চুপার অভ্যাস জানিয়ে দেবার জন্য একটু সুধরতা করেছিল নিশীথ।

সুনয়না বলে—জ্বলটা এত বিশ্বাস হয়ে গেল কেন ? কারও সঙ্গে ভালবাসা হয়েছে বোধ হয় ?

কি করে বোঝাবে নিশীথ, হাঁ, মানুষের জীবন যে ভালোবাসাই খোঁজে : ভালবাসাহীন এই গলা-ভড়িয়ে-থরা জীবন যে একটা ভয়ানক শাস্তি। অজীবন সহ্য করার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। কিন্তু সুনয়না যেন না-বোঝবার জন্য পণ করে বসে আছে।

শুধু একদিন, কে জানে কোন্ ভাবনার ব্যাধার ছটফট করে উঠেছিল সুনয়নার মন। কালিকাপুরের পুরনো কালের সেই ছোট পুকুরটা, রূপসাগর ঘার নান, তারই ভাঙা ঘাটের পাথুরে সিঁড়ির উপর নিশীথের পাশে দাঁড়িয়ে একটা লাল শালুকের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আনন্দের নত বলে উঠেছিল সুনয়না—ভালবাসতে পারলে ভালই হতো, নিশীথ।

ভয় পেয়ে চমকে ওঠে নিশীথ—তার মানে ?

সুনয়না—তার মানে, সরে যেতে পারতাম। তুমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে।

নিশীথ—অদ্ভুত কথা বলছো।

সুনয়না—কেন ?

নিশীথ—আমি তো জানি, মানুষ কাউকে চুপা করলে তবেই তার কাছ থেকে সরে যেতে পারে।

হেসে ফেলে সুনয়না।—তবে তুমি আমার কাছ থেকে সরে যেতে পারছো না কেন ? তুমি তো আমাকে যথেষ্ট ঘেরা কর।

মাথা হেঁট করে বিড়বিড় করে নিশীথ—ঘেরা করি না বোধ হয়।

সুনয়না—তবে কি ?

নিশীথও হাসতে চেষ্টা করে—বোধ হয় ভয় করে। শুধু মনে হয়, তোমার ক্ষতি করছি, নিজেরও ক্ষতি করছি।

সুনয়না—আমার ক্ষতি করেছে বৈকি। কিন্তু তোমার কি ক্ষতি হয়েছে, বুঝতে পারছি না। অবশ্য, টাকার দিক দিয়ে কিছু ক্ষতি হয়েছে ঠিকই। কিন্তু...

নিশীথ—কি ?

সুনয়না হাসে—তোমার কি এই ধারণা যে, আরও কম টাকাতে সুনয়নার নত একটা মানুষকে যখন-তখন এভাবে এরকম একটা রূপসাগরের নিরালা ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে যা-ইচ্ছে-তাই বলা যায় ?

চোঁচিয়ে ওঠে নিশীথ—আমি টাকার ক্ষতির হিসেব করছি না।

সুনয়না—তবে কিসের হিসেব করছো ?

নিশীথ—কাকির হিসেব।

সুনয়না—কাকি ?

নিশীথ—নিশ্চয়। ভালবাসার চিহ্ন নেই, তবু এরকম মেলামেশা...কোন অর্থ হয় না ; নিছক একটা কাকি নিয়ে পড়ে থাক।

সুনয়না—তাই বল। ভালবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে, আর ভালবাসবার ক্ষেত্রে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ।

নিশীথ—ঠিক কথা।

সুনয়না—তা হলে কাউকে ভালবেসে ফেল।

নিশীথ—ফেলেছি বোধ হয়।

সুনয়না—তবে তাকে বিয়ে কর।

নিশীথ—নিশ্চয়ই করবো।

সুনয়না—বেশ হ্যাঁ। কিন্তু তাতে আমার কি আসে যায় ?

আবার চমকে ওঠে নিশীথ—তার মানে ?

সুনয়না—আমার যা দরকার তা পেতেই থাকবো। আমাকে সরিয়ে দেবার সাধি তোমার হবে না।

নিশীথ—আমার সাধি না হোক ; কিন্তু আর একজনের সাধি যে হবে না, এতটা ধারণা করছো কেন ?

সুনয়না—আমাকে বড় বেশি দুর্বল বলে মনে করছো, নিশীথ। খুব ভুল করছো।

নিশীথ—তুমি আমাকেও বড় বেশি দুর্বল বলে মনে করছো।

সুনয়না—দৃষ্টি কথা।

নিশীথ—কেন ?

সুনয়না—আমাকে তুচ্ছ করবার সাধি তোমার নেই ; তাই তুমি দুর্বল।

নীরব হয়ে যায় নিশীথ।

খিলখিল করে হেসে ওঠে সুনয়না—আমার কথা ভাবতে তোমার মনে যে ঘণা লাগে, সেই ঘণাকেই যে তুমি ভালবাস। এত বিদ্বান হয়ে এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পার না কেন ?

নীরব নিশীথ রায়ের মাথাটাও এইবার হেঁট হয়ে যায়। একটুও মিথো বলেনি, বাড়িয়েও বলেনি সুনয়না। যে নারীকে বেশিক্ষণ কাছে রাখবার জন্ত কোন আগ্রহ অনুভব করে না নিশীথ, যে-নারীকে চিরকালের সঙ্গিনী বলে কল্পনা করতেও বুক কঁপে ওঠে, সেই নারীর হাত ধরবার জন্ত কতবার নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছে নিশীথ রায়ের এই ভদ্র শরীরের একটা বস্তা। পরনারীর মন, প্রাণ ও দেহের সঙ্গে এতেন ছরছাড়া সম্পর্কের অনুভব যে নিশীথ রায়ের বৃক্কের পীড়নের স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। অস্বীকার করতে পারেনা নিশীথ।

সুনয়না বলে—আমি একটা অজুরোধ করবো, তখন ?

নিশীথ—বল।

সুনয়না—তুমি বিয়ে করো না।

নিশীথ—এ কথা বলবার অধিকার তোমার নেই।

সুনয়না—নেই ঠিকই : কিন্তু তোমার ভালব

জন্তই বলছি।

নিশীথ—যে বেয়ে আমাকে ভালবাসে থাকেও বিয়ে করবে না, আমাকে এরকম পরামর্শ দেওয়া মানে আমার ক্ষতি করা।

সুনয়নার চোখের দুটি দণ্ড করে জ্বলে ওঠে।—আজ পর্যন্ত তোমার কোন ক্ষতি করিনি ; কিন্তু যদি বিয়ে কর, তবে ক্ষতি করবো। না করে পারবো না। আমার ইচ্ছে না থাকলেও তোমার ক্ষতি করে ফেলবো, নিশীথ।

আর কোন কথা না বলে, কালিকাপুরের রূপমাগরের সেই নিরালা থেকে যেন একটা যন্ত্রণাক্ত মূর্তি নিয়ে ছুটে চলে গিয়েছিল সুনয়না।

তারপর আর সাতটা দিনও পার হয়নি, আবার কালিকাপুরে এসে ম্যানেজার নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের সামনে গাড়ি থেকে নেনেই একটা নির্মম বিষ্ময়ের আঘাতে সুনয়নার প্রাণটাই যেন কিছুক্ষণের মত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিশীথের মালী হেসে হেসে খবর দিল—সাহেব বিয়ে করতে গিয়েছেন।

কার সঙ্গে বিয়ে ? কোথায় বিয়ে ? মালীর কাছে প্রশ্ন করে কোন উত্তর পায়নি সুনয়না। উত্তর পেয়েছিল কালিকাপুর থেকে ফিরে এসে, গালুড়ির এই বাংলা-বাড়ির ভিতরে ঢুকে নিজেরই ঘরের টেবিলের কাছে এসে। বীরেন বোসের নামে একটা হলদে খামের চিঠি এসেছে। বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি। রাজপোখরার শীতল সরকারের মেয়ে নীরাঞ্জিতার সঙ্গে নিশীথ রায়ের বিয়ে। ছাপার অক্ষরে লেখা চিঠির এক প্রান্তে হাতের লেখার একটি অমুরোধও রয়েছে : তুমি না আসতে পার, অন্তত : সুনয়নাকে পাঠিয়ে দিও, বীরেন।—ইতি শীতল সরকার।

আয়নাতে নিজের মুখের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে সুনয়নার নিজেরই বুক ধরধর করে কেঁপে ওঠে। সর্বনাশ; নিজেরই এ কি ভয়ানক ক্ষতি করলো নিশীথ রায়! নীরাজিতার সঙ্গে নিশীথের ভালবাসাবাসির মূর্খ অহংকারটাকে এই সুনয়না যেসে একমুহূর্তে চূর্ণ করে ধূলো করে দেবে। সুনয়নার চরিত্রহারা রক্তমাংসের আক্রোশগুলিকে কি ভয় করতে ভুলেই গেল নিশীথ রায়? আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেরই চোখের আঙুরের জ্বালাটাকে দেখতে থাকে আর কাঁপতে থাকে সুনয়না।

আর একবার রামগোপাল চৌহানের গাড়ি চেয়ে পাঠাতে হয়, এবং কালিকাপুরেও বেতে হয়। কিন্তু তখন কিরে আসতেও হয়। না, ফেরেনি নিশীথ রায়। নীরাজিতাকে সঙ্গে নিয়ে কালিকাপুরে

কিরে আসতে আরও সাতটা দিন ঘেরি করবে নিশীথ। কালিকা মাইন্স-এর কেরানীবাবুর কাছে থেকে খবর নিয়ে জানতে পারে সুনয়না, সাক্ষিতে বউভাতের অনুষ্ঠানের পর, আরও পাঁচটা দিন ওদিকেই পার করে নিয়ে ম্যানেজার নিশীথ রায় মঙ্গলবার এখানে ফিরবেন।

আর মাত্র তিনটে দিনের অপেক্ষা; সেই অপেক্ষার যন্ত্রণা সহ্য করতে গিয়ে একটা ঘণ্টাও বোধ হয় ঘুমোতে পারেনি সুনয়না। এবং ঘুমহারা চোখের সব যন্ত্রণা বিছাতের ছালার মত কিলিক দিয়ে হেসে উঠলো। তখন, যখন মঙ্গলবারের বিকালের আলোতে সুনয়নাকে গালুড়ি থেকে কালিকাপুরে নিয়ে যাবার ক্ষুদ্র কন্ট্রোল্টর চৌহানের গাড়ি বাংলা-বাড়ির দেওয়ারের ছায়ার কাছে এসে দাঁড়ালো।

[সমাপ্ত]



কালীপূজা

শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা রায়

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বাঙ্গালী হিন্দু উত্তর-পশ্চিম ভারতে, পাঠাবে নানা কারণে নানা কার্যব্যাপসে ছড়াইয়া পড়েন। যেখানে যেখানে বহু বাঙ্গালীর বাস সেখানেই উৎসাহে কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। এইসব কালীবাড়ির বিশেষত্ব যে, ইহা শুধু কালী-বন্ধির নহে, স্থানে স্থানে কালীর সহিত অন্যান্য দেব-দেবীও আছেন; এইখানে হর্গাপুজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতিও হইয়া থাকে। নিরালস্য, নবায়ত্ত বাঙ্গালী আহার ও আশ্রয় পাইয়া থাকেন। যথো যথো এই কালীবাড়িতে যাত্রা ও বিহেটায় হয়; কোন কোন কালীবাড়িতে বাংলা বই-এর পাঠ্যপুস্তকও আছে। ইহা বিশেষে আগত বাঙ্গালীর পরামর্শের সহিত মিলিত হইবার কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে সকল ভ্রমের বাঙ্গালী পরামর্শের সহিত অব্যাহত যোগাযোগ, গান-বাহানা করিতেন বা তাল পাশা-দাবা খেলিতেন। বাঙ্গালী ডেপুটী বাঙ্গালী কেরানীর সহিত মিলিত লক্ষ্য বা সংঘাত বোধ করিতেন না। এখন কিন্তু সম্পদ অসম্পূর্ণ আভিভূত হুঁসিয়াছে। ২০০ টাকা বেতনের কেরানী ১৪০ টাকা বেতনের কেরানীর সহিত মিলিতে লক্ষ্য অগ্রহণ করেন। ইংরাজ চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইংরাজী snobbery ছড়াইয়া গিয়াছে।

রাঙলগিতির কালীবাড়ি এইরূপ একটি বিখ্যাত কালীবাড়ি। ইহার সর্বত্র আলোচনা বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই কালীবাড়ি আশ্বাষ ইংরাজী ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আসানসোলার লালুবাঈ তাঁহার এক পলাতক ডাউংগের সম্মানে এই কালীবাড়িতে আনিলেন; অনিলেন যে তাঁহার ডাউংগে পেশোয়ারের গিয়াছে—সেখানে হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিলেন। ১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত এই কালীবাড়ি ভালভাবেই চলিয়াছিল। ঐ সালের ব্যাপক দাঙ্গা, নরহত্যা, গৃহবাহ ও লুণ্ঠের সময়ও এই কালীবাড়ি অক্ষত ছিল। জাহার পর পশ্চিম পাকিস্তানে হইতে সমস্ত হিন্দু ও শিখ বিতাড়িত হইলে ইহার অবস্থা হীন হইয়া পড়ে। তদবধি, কালীর আক্রমণের সমর 'হোমালারেয়া' এই কালীবাড়ি লুণ্ঠ করে ও ভূতি পোড়াইয়া

যেয়। এখন নাকি সেখানে একটি কলাইবাগা স্থাপিত হইয়াছে।

সিমলা ও দিল্লীর কালীবাড়ি ঐ ঐ জাগার বাঙ্গালী সভ্যতার ও কুটির আশ্রয়স্থল—সকল বাঙ্গালীর বাঙ্গালী হিসাবে যোগাযোগ করিবার কেন্দ্রস্থল।

বাঙ্গালীর কালী-প্রীতি হইতে একটি প্রবাদের সূত্র হইয়াছে: "যেখানেই বাঙ্গালী, সেখানেই মা-কালী"। তাহার উপর আশ্চর্য্য কোন কোন রসিক লোক যোগ করিয়াছেন—"আর মলাসদি"।

আশ্চর্য্যকর মামরা কালীপূজা বলিতে দীপাবিত্তা অমাবস্তার রাত্রিতে শ্রীশ্রীমামাপূজার কথাই ব্রূরি। বৎসরে চারি বার কালীপূজা হয়: দীপাবিত্তা অমাবস্তার ত্রয়োপূজা; সরস্বতী-পূজার পূর্বের অমাবস্তায় রটনী কালীপূজা; সান্বিতী-চতুর্দশীর পরদিন অমাবস্তায় ফলহাবিত্তী কালিকাপূজা আর শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাব্তীর পরের কোনো অমাবস্তার কালীপূজা। অমাবস্তা এইসব কালীপূজা বড়-একটা হয় না। শ্রীকৃষ্ণ চিন্তাহারণ চক্রবর্তী মহাশয় একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে—

"দীপাবিত্তা কালীপূজাই সর্বাঙ্গেকা প্রশিদ্ধ ও জনপ্রিয়। কিন্তু এই পূজার পূর্ব প্রাচীন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন কোনো স্মৃতিগ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। তত্ত্বদায় প্রকৃতি প্রশিদ্ধ তাত্ত্বিক নিবন্ধগ্রন্থিতে কোনো উৎসবেরই উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১৬২২ শকাব্দে [=ইং ১৭৭৭ খ্রি:] রচিত কালীনাথের অপেক্ষাকৃত আধুনিক শ্রাব্যসমর্থবিধি গ্রন্থে এই পূজার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কালীনাথ পুরাণ ও তত্ত্ব হইতে নানা বস্তু উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন—দীপাবিত্তা অমাবস্তার দিন কালীপূজার অর্থহীন প্রসঙ্গ। ইহা হইতে সন্দেহ হয়, অসামান্য শতাব্দীর শেষের দিকেও এই পূজা তখন প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। এই কারণেই বোধহয় নবীয়ার মহাযাগে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সকল প্রত্যাক এই পূজা করিতে অসম্মত গিয়াছিলেন এবং জনাইয়া বিখ্যাজিলেন যে, পূজা না করিলে গুণসং ভোগ করিতে হইবে। এই আশ্বাসের ফলে প্রতিবৎসর দীপাবিত্তার দিন

নদীয়ার দল সহস্র কালীমূর্তি পুজিত হইতে থাকে ।” [বাংলার পালশাখণ্ড, পৃ: ৩১]

রাছবাছড়ির মনোমোহন ঈশ্বরবর্মা তাঁহার *Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal 1757-1916* পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে:—“The Nadia Raj, 3,151 square miles, corresponding with Nadia (Sadar and Ranaghat sub-divisions with a very small portion of southern Meherpur), 24 Parganas (Darasat and Basirhat sub-divisions, exclusive of Sundarban), Jessore (Bongson and south-east Salar), Khulna (West Satkhira). At the time of the Permanent Settlement included also Salsetta and the riparian strip east of the Saraswati.”

নদীয়াজায়ের এলাকা ৩,১৫১ বর্গমাইল বিস্তৃত ছিল। এমতে প্রতি বর্গমাইলে ৩টি কালীপূজা হইত। দোকসংখ্যা তখন নিম্নলিখিত কম ছিল। ১৮৭২ সালে প্রতি বর্গমাইলে বাংলার জন-ঘনত্বের পরিমাণ ৪২০ জন। ইহার সওয়াশত বৎসর পূর্বে জনসংখ্যা যদি ইহার অর্ধেক ধরা যাত তো দুই অস্তর হইবে না। এমতে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা ২১২ জন—আর কালীপূজা ৩টি। যদি প্রত্যেক বাড়িতে ৪ জন করিয়া লোক ধরি, তাহা হইলে ৫২৪০টি বাড়িতে ৩টি কালীপূজা; ১৬১৫টি বাড়ির মধ্যে একটিতে কালীপূজা হইত। ইহার মধ্যে অনেক মুসলমানের ঘর নাই—মুসলমানদের বাস ছিল এই অংশতে আরও বাড়িয়া যাইবে।

চিহ্নাহরণবাস্তু লিখিয়াছেন:

“৪৩তী কালীপূজার কিত্ত প্রাচীনতর উল্লেখ পাওয়া যায়। সুস্মৃতি, স্রীমাং, পৌরানন্দল, কামিনাথ সকলেই ৪৩তী চন্দ্রবীর বিন কচবীর মতর করের মধ্যে কালীপূজার উল্লেখ করিয়াছেন।”

পূর্বে যে ৪৩তী কালীপূজা সম্বন্ধে প্রচলিত ছিল তাহার পর্বোক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। আকবরের সময় বাংলা ও বিহারের রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ই. ১৫৮২ সালে রাজা চৌদরমর এই দেশে আসেন। সরকার মুরের রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য তিনি উত্তর-রাঢ় হইতে উত্তর-রাঢ়ীয় কার্যে কাজপ-পত্রীয় ঈকর্ষ দত্তকে লইয়া যান। ইনি ও ইহার আত্মীয়-স্বজনদের বংশধরগণ তখনই চারিগত বৎসর ধরিয়া ভাগলপুর জেলায় বসবাস করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে ৪৩তী কালীপূজার প্রচলন আছে। ভাগলপুরের ‘বংশধরী’

ইহাদের বংশধর; তাহারা এখনও প্রতিবৎসর দুমুখানের সহিত ৪৩তী কালীপূজা করিয়া থাকেন।

রাজা চৌদরমরের আসল তফসীল ভদ্রা মাদীভাষায় লিখিত ও পূর্বাঞ্চল ঈকর্ষ দত্তের বাংলায় সহিযুক্ত বহু কাগজ এখনও ভাগলপুর কলেজবিত্তে ভবন-তাল্লা-বদ্ধ হইয়া আছে। সেকালের বাঙ্গালীরা চলিয়া গিয়া পাগড়াত অল্প ভাষায় লিখিত হইলেও এবং সেই ভাষা জানা পবেও নিজ মাড়ভাষা বাংলায় সহি করিতেন। আর আত্মকাল আমরা ইংরাজীতে চলিয়া গিয়াছি, ইংরাজীতে সহি করি। এ বিষয়ে আমাদের কঠিন ও রেগেছাড়ের পরিবর্তন হইয়াছে।

কালীপূজার ব্যাপকতা—বাংলার সর্বত্রই দেখা যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদর্শ ও প্রভাপ ইহার পদ্ধতিতে থাকিলেও এইতপ বহল কালীপূজার প্রসার—কেনব জাতিয়া নদীয়া-রাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বা নদীয়া রাজ্য হইতে দূরে দেখানেও কালীপূজার প্রসারের মূল কারণ আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালীর জন্মের প্রতি একটা স্বাভাবিক টান ছিল ও আছে। ইহার নানাবিধ ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণ থাকিতে পারে—তথা সংগ্রহ করিয়া বিশ্লেষণ করা স্বত্বেক।

কালীপূজা তারিক পূজা। অনেক মনে করেন যে তারিক উপাসনার উৎপত্তি বাংলাদেশেই প্রথম হইয়াছিল। এ বিষয়ে একটি প্রাচীন ঘটনও শোনা যায় যে—

“মৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা মৈথিলে প্রকটীকৃত।

কিঞ্চিৎ কতিয়হারাত্রে কলিবে প্রসার পতা।”

শিব-পূজা সতীর দেহ বিকৃতকর্তে পুজিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে পুজিত হইলে, সেই সেই স্থান দেবীর পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত হয়। পশ্চিমে বেঙ্গলিষ্টানের অন্তর্গত লালুবেলা রাজ্যের হিঙ্গুলাজে সতীর ব্রহ্মরূপ পুজিত হয়, আর পূর্বে কামরূপ-কামাখ্যার সতীর মৌনি পুজিত হয়। দেবীর ৫১টি বা ৫২টি পীঠের মধ্যে প্রায় ২০টি পীঠ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। ইহা ছাড়া বহু উপ-পীঠ বাংলায় আছে; কোনো-কোনোটি মহাপীঠ বলিয়া হাবি করে। প্রত্যেক স্থানেই পবিত্র পূজা ভরমতে হয় ও ছাগাদি পত্রলি হয়।

বাঙ্গালী হিন্দু বেশীর ভাগ শাক্ত-মতাবলম্বী ছিল ও আছে। ঈশ্বরচন্দ্রসেবের নামপ্রচারের পূর্বে এই অল্পপাত আরও বেশী ছিল। বর্তমানে শাক্তর অল্পপাত কত, এই প্রশ্নের সমাধান সহজ নহে। কারণ শাক্তদের নিজ দত্ত প্রকাশ করিবার পক্ষে নিষেধ আছে। মুসলিমভাষায় আছে—

“ইহর শাক্তবী বিদ্যা ও গুণা দুঃসম্ভব।”

উদাহরণে ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহার দেখিয়াও উদাহরণ শাক্ত কিনা হইল। শাক্তদের নিজ সম্প্রদায় বলিতে নিম্নে আছে। স্থানান্তরিত হইতে যে—

“অতঃ কৌলো বহিঃ পৈতৃক জনমণ্যে তু বৈকবঃ।

কৌলো হুগোপনমহি নারিকেলফলাদ্যং।”

শাক্ত ও বৈকবের বর্তমান অঙ্গশাস্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ আলাচনা হয় :

“শাক্ত : বৈকব = ৩৭ : ৩৩ বা মোটামুটি ২ : ১।

আমাদের উপরোক্ত হিসাবে হুই কুল খাছুক না কেন, শাক্তরা যে বৈকবদের অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। শাক্তরা বৈকবদের অপেক্ষা ২৩৭ বেশী না বহিরা বহিঃ আমরা উদাহরণে ১৫ গুণ বেশী ধরি তাহা হইলে উদাহরণে অঙ্গশাস্ত্র এইরূপ পাঠ্য :

শাক্ত : বৈকব = ৩ : ২।”

পূর্বে এই অঙ্গশাস্ত্র আরো বেশী ছিল বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মূল তন্ত্রগ্রন্থ বাহ্যিক বহু তান্ত্রিক নিবন্ধ-গ্রন্থে বাক্যগুলি কর্তৃক বাক্যের বহুদিন হইতে সঞ্চিত হইতেছে। ভূই-চাষিগণ বহুলপ্রচারিত নিবন্ধ-গ্রন্থের নাম করিলেই ব্যাপারটি বুঝা যায়। ইহা ছাড়া বহু সংকলিত পুস্তক-পুস্তক বাংলায় বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। বেশীর ভাগই অ-স্বতন্ত্র। নিবন্ধ-গ্রন্থগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল। যথা :

১২। ব্রহ্মানন্দ গিরির তন্ত্রাঙ্কুর ও শাক্তানন্দতন্ত্রিকা ;

৩১৪। পূর্ণানন্দ গিরির স্ত্রীতন্ত্রচিন্তামণি, শাক্তকর্ম ও শাক্তানন্দতন্ত্রিকা ;

৬। (দৌড়ার) শব্দাচার্যের তন্ত্রাঙ্কুরতন্ত্রিকা ;

৭। অগ্গদানন্দ সিন্ধুর কৌলার্জন-নীতিশাস্ত্র ;

৮। সর্বানন্দ সর্বোদাস-তন্ত্র ;

৯। স্ত্রীকৃষ্ণ বিভাবতীশের তন্ত্র ;

১০। ব্রহ্মানন্দ অগ্গদানন্দীর তন্ত্রাঙ্কুর ;

১১। রামকৃষ্ণ বিভাবতীর প্রাণতন্ত্রিকা ;

১২। ১৩১৪। হরকৃষ্ণ ঠাকুরের হরকৃষ্ণবীথি, শিলা-চন্দ্রাবলী ও পুরুষতন্ত্রিকা।

ইহার মধ্যে কয়েকটি ঐশ্বর্য ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে বা ১৮শ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত। কেহ কেহ বলেন যে এগুলি তাহারও বহুপূর্বে রচিত।

বাংলায় তন্ত্রাঙ্কুরের প্রাচীনতা সম্বন্ধে একটি গল্প শুনা যায়। অঙ্গশাস্ত্র শিবাবতার শব্দাচার্য পূর্ব-ভারতে মঠ স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গাসাগর সময়ে আসেন।

তথায় ব্রহ্মানন্দ নামক এক তান্ত্রিক সাংসদকে বিচারে আস্তান করিলে, ব্রহ্মানন্দ বলেন, “কিসের বিচার ? আপনাত হো এখনও দেখিতেছি আমার ও তোমার জ্ঞান দ্বয় নাই।”

শব্দাচার্য তাহার পর পুরীতে গোবর্ধন মঠ স্থাপন করেন। বসিষ্ঠ-দৌড়ার এই ব্রহ্মানন্দের ব্যঙ্গপরূপ এখনও তটপাড়ায় বর্তমান ; উদাহরণ ব্রহ্মানন্দ হইতে ১২৮। ১২৯ পৃষ্ঠায় অঙ্গশাস্ত্র।

শাক্তের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে ; উদাহরণ স্ত্রী-কুল ও কালী-কুলই প্রধান। নিকটবর্তী স্ত্রী-কুল ও কালী-কুলের কয়েকটি দেবীর নাম উল্লিখিত আছে। যথা :

“কালী তাত্রা ছিন্নমস্তা ভুবনা মহির্মহিনী।

ত্রিগুণা বরিতা দুর্গা বিজয়া প্রত্যঙ্গিয়া তত্র।

কালীকুলঃ সমাখ্যাতঃ স্ত্রীকুলঃ ততঃ পরম্।

দুর্গাবতী চ মাতঙ্গী বিজয়া সপ্তমতী ত্রিপুরে।

বরুমতী মহাবিজয়া স্ত্রীকুলঃ পরিত্রাণিতঃ।”

যে কোনও কারণই হউক বাংলাদেশে কালী-কুলের দেবতারের প্রাধান্য বরাবরই বেশী দেখা যায়। ইহার মধ্যে আবার কালীর প্রাধান্য খুব বেশী দেখা যায়। ইহার কারণ সম্বন্ধে তত্ত্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞ কেহ কেহ বলেন যে কালীপূজায় সহজেই সিদ্ধিলাভ হয়, এতজন কালীপূজার এত বেশী প্রচলন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে—

“কালী-মূর্তিই স্ত্রীচরণের স্রেষ্ঠ বিকাশ (perfect manifestation)। স্বতী-বিত্ত-লব্ধ সবার কর্মই তিনি। একমিকে যা অনির দ্বারা ধ্বংস করছেন এবং আর একমিকে বর ও মন্ত্র দিচ্ছেন। এই হল স্ত্রীচরণের লীলা। এতজন অজ্ঞানই ভারতে শক্তিপূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়।”

বাংলার বহু গ্রামে কালী-মূর্তি নির্মিত গ্রাম-দেবতা হিসাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। নৈমিত্তিক কালীপূজাও বহু গৃহস্থের বাড়িতে হইয়া থাকে ও বহুকাল হইতে হইয়া আসিতেছে। সংখ্যা হিসাবে দ্রিলে বাকালীর মাতীয়া উৎসব দুর্গাপূজা অপেক্ষা কালীপূজা খুবই বেশী। ইহার একটি কারণ দুর্গাপূজা ও দিনের পূজা ও বহুবাসনা ; কালীপূজা একমাত্রিক পূজা ও বহুবাসনা। আবার এমন গৃহস্থবাটি দেখিবারি যেখানে জনস্বামীপূজার সমস্ত আগে হুলাচার হিসাবে কালীপূজা হইয়া পরে জনস্বামী পূজা হয়।

স্ত্রীকৃষ্ণ চিত্তাঙ্কুর চন্দ্রবতী মহাশয় উদাহরণ ‘তন্ত্রকথা’ পুস্তিকা পিণ্ডিয়াছেন যে—

“অস্ত্রাঙ্গ শাক্ত দেবতার উপাসনাও অনেক স্থলে কালীর মূর্তির উপরই অঙ্গশাস্ত্র হইয়া থাকে, যত্নে মূর্তি প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হয় না। তাই দুর্গাপূজা, অঙ্গপূর্ণাপূজা,

গগনধারীপূতা প্রকৃতি বাংলার উৎসবের সময় প্রতি কালী-মন্দিরে উৎসবের খটা পড়িতা হাঃ। তারা, ঘোড়শৈ প্রকৃতি দেবতার উপাসকেরাও এই দেবতার মূর্তির সম্মুখেই অনেক ক্ষেত্রে বীজ ইষ্টদেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন। বংস-বিভিন্ন সময়ে কালীর বেতন আভরণপূর্ণ উৎসব-বহুল বিশেষ পুজার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তারা প্রকৃতির দেহের দেহিতে পাওয়া যায় না। ঐ সব উৎসবের দিনে তারা ও ঘোড়শৈ উপাসকেরাও কালীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিয়া থাকেন।"

কালীর বিভিন্ন রূপের বিস্তৃত বিবরণ তত্ত্ব-সাহিত্যে পাওয়া যায়। গুহকালী, ভূতকালী, শশানকালী, বেতকালী, মহাপালী, দক্ষিকালী, রক্ষাকালী, নৃত্যকালী প্রকৃতির উপাসনার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। ভাষ্কর্য্যের উদ্ভটীকরণ বহু গ্রামে চৈত্র ও বৈশাখ মাসের রক্ষসপক্ষ পনিবারে বা মঙ্গলবারে পাড়ার পাড়ার রাস্তার তেমাথার ঘোড়ে রক্ষাকালী পূজা হয়। কোনও কোনও জায়গায় ঢাক-ভোল বাজে, আবার কোনও কোনও জায়গায় বাজে না। রাত্রিতে মহানিশার পূর্ণা হইয়া রাত্রি শেষ হইবার পূর্বেই বিলম্বিত হয়। একই গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার বিভিন্ন রম্মিতে এই রক্ষাকালী পূজা হয়। ইহা সর্বসাধারণের চারার সর্বসাধারণের পূজা।

বাংলাদেশের নানা স্থানে নানা নামে এই দেবতা (কালী) পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে স্থানের নামে ইহার নাম—যেমন ঢাকার ঢাকেশ্বরী, বংশোত্তরে বংশোত্তরী ইত্যাদি। অনেক স্থলে সিদ্ধেশ্বরী, তরুণেশ্বরী, আনন্দেশ্বরী, মুক্তেশ্বরী, ভবতারিণী প্রকৃতি নামেও পরিচিত। দত্ত শতাব্দীর সংবাদপত্রে উল্লিখিত কলিকাতার বাগবাজার, হুগলির অন্তর্গত কালীপুর

ও তারুণেশ্বরের সন্নিকটবর্তী এক গ্রামে অবস্থিত তিনটি সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমার কথা ব্রহ্মব্রহ্মনাথ ব্যাখ্যাণাথার সংকলিত 'সংবাদপত্রে দেবতার কথা' গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। কলিকাতার নিমতলার আনন্দেশ্বরী প্রসিদ্ধ। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ভবতারিণী বিরাটমান। আড়িয়ার গ্রামে বুড়ো-শিব-তলার মুক্তেশ্বরী আছেন। আমতাঙ্গার মঠে তরুণেশ্বরী আছেন। পানিহাটী গ্রামে জগদীশ্বর ব্যাখ্যাণাথার প্রতিষ্ঠিত গুহর মন্দিরে তারােশ্বরী কালীতরুণ আছেন। চন্দ্রকটুগড় মুসলমান কর্তৃক ধ্বংস হইলে তদৈক ব্রহ্মচারী এই মূর্তি গুহাতীরে আনয়ন করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই মতে এই মূর্তি ৩০০০০০ খ্রিস্টাব্দের পুরাতন।

কীরগ্রামের 'যোগাডা'র বিখ্যাত বিবরণ কবি কৃষ্ণবাসের নামে প্রচলিত 'যোগাডার বন্ধনা' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। হুয়ান্স অরীয়াবন ও মহীয়াবদকে বধ করিলে তাঁহাদের উপাস্তা দেবী 'ভূতকালী' তাঁহাকে হানাত্তরিত করিবার জন্য হুয়ান্সকে অস্ত্রোৎসব করেন। হুয়ান্স তাঁহাকে পিঠে করিয়া বর্ম্মানের কীরগ্রামে লইয়া আসেন। ইহার পুজার নরবির প্রয়োজন হইত—কৃষ্ণবাসের গ্রন্থ হইতে এইরূপ আভাস পাওয়া যায়। কীরগ্রাম অন্ততম নীতস্থান বলিয়া পরিচিত। প্রতিবৎসর বৈশাখী সংক্রান্তির দিন এইখানে বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে। কবিকর্ণপুরের চৌদমল, কবিনেত্রের কালিকামল প্রকৃতি গ্রন্থে এই দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্থানে স্থানে মূর্তি নষ্ট হইয়া থাকিলে ঘটে কালীপূতা হয়। মূর্গিমল্লার জেলার কান্দি নগরে এক প্রত্নরথও দক্ষিণাকালিকার রূপে বহনিত হইতে পুজিত হইয়া আসিতেছেন। মন্দিরটি ২০০১২০ বৎসরের পুরাতন। প্রবাদ বিশ্বাস করিলে এই দেবতা হিন্দুধর্ম্মের ১০০০ বৎসরের পুরাতন।

বাড়-সাধনার বাতালী

জীনগোপাল গোবামী

গুণের জগদগুরু যেমন বাংলার বুক চিরে নিত্য প্রবাহিত, তেমনি বাঙালীর জীবনে ধার্মিকতার একটা বন্ধ ঘোড় মুগ্ধ-মুগ্ধ ধরে করে চলছে। এই ধার্মিকতাই আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এদেশে দত্ত বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মমতের বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে, আর কোনও ধর্ম তা হয়নি। কোনও ধর্মকেই

বাঙালীর চিত্ত কোনওদিন অগ্রাহ্য করেনি। জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, খ্রীষ্টান সকল ধর্ম-অনুশাসন বাঙালীর মনকে লব্ধ করে দিয়েছে এবং প্রত্যেক যত্নে বাঙালী তার মনের রঙে রঞ্জিত করে গ্রহণ করেছে। মূগে মূগে তাই বহু ধর্মকে আশ্রয় করে বহু সাধকের আবির্ভাব হয়েছে

এই বাংলায় বৃক্ক, আর এইসব সাধকবৃন্দ বাংলায় এক-এক
মিক আলোকিত করে রেখেছেন। এইসব বিভিন্ন সাধকদের
মধ্যে মাতৃ-সান্নাধ্য বাঙালী সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে কিছু
আলোচনা করবার প্রয়াস পাব।

বাংলাদেশের কতগুলি গভীর প্রাণের কায়না ছিল।
দুঃখের মধ্যে ঈশ্বরবাহু পৌরী সোমের পরের ঘরে চলে বেত,
তাকে ধূসিগেমা সাধ করে খোমটো-চাকা বুতী বধু অভিন্ন
করতে হ'ত, থাকে ছেড়ে খোমটোর ভেতর থেকে হুমর
হুমের দু'খানি সমাগ চোখ পথের দিকে তাকিয়ে থাকতো,
মায়ের রাতও হুখে কাটতো না,—কোলের সম্মান ছাড়া না
বস্তু সেখা শাপলিনীর মতো কেন উঠতেন,

‘উমা আমার এসছিল।

অপ্ন দেখে দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,

চৈতন্যরূপিত কোথায় লুকাল।’

এই ভাবে অনেকদিন ধরে মা চোখের জল কলে
কাটাতে। তারপর মেয়ে বধন ফিরে আসতো, তখন কত
আনন্দ!—

‘মায়ার উমা এলো, বলে রাশী এলোকেসে ধায়।’

এই পরমহুসার বাৎসল্য ভাবকে আমাদের সাধকরা ধর্মের
ছায়ায় স্থান দিচ্ছেন। বৌকো মা বলে ভেতর রামপ্রসাদ,
কমলাকান্ত, রামদুলাল কত বেদনাই না জানিয়ে গেছেন।
অশ্রুজলে গড়া এইসব ব্যাখ্যা-বেদনার কথা আমাদেরই
ধূনিবাণী আভিনার কথা।

বৈষ্ণবসাহিত্য রামপ্রসাদ সেনের বাড়ি ছিল হাম্বিশহরের
অন্তর্গত কুমারহাট গ্রামে। শোনা যায়, কোনও বড় জমিদারের
সেবকায় প্রথমে তিনি দুঃখের কাশ করতেন। তিনি কাজ
করতেন আর সময়ে সময়ে হিসাবশাস্ত্রের অধ্যাপ্য পুষ্-হারা
পথিকের মতো দুই-একটা গান দিয়ে মনের বেদনা দূর করতেন।
জমিদার একদিন হিসাবশাস্ত্র পরিদর্শনের সময় খাতার মধ্যে—
“মায়ার সে মা তপিলদারী। আমি নিয়কহারাম নই শবরী।”
প্রকৃতি পদ পড়ে চমৎকৃত হন এবং রামপ্রসাদকে ৩০ টাকা
বৃত্তি দিয়ে ঘরে গিয়ে তামা-সদীত সিঁধতে উপদেশ দেন।
বিকল-মূক শাস্ত্রের মতো রামপ্রসাদ তখন প্রকৃতির কোলে
ফিরে ওঁর ব্যাখ্যা ও বেদনার ধনকে গানের ছন্দে রচনা করে
জগৎকে হুহী করলেন।

রামপ্রসাদের গানে কালিকাদেবী স্তূতিবহী জননীর মতো
স্থাপিত হয়ে উঠেছেন। কবি মা-সদল শিশুর ছায় মধুর
গুণে কখনও ওঁর সঙ্গে রগড়া করেছেন, কখনও বা মায়ের
কানে বলেছেন হুধামাখা মেই-কথা, আবার কখনও জননীর

কিঞ্চ ছেলের মতো তাকে কতো ভাবেই না বিরক্ত করেছেন।
এই যে অভিন্ন—তা মেই, তক্তি ও আত্মসমন্বয়ের
কথা-মাখা, শিশু যেমন মায়ের কাছে মার খেয়ে ‘মা-‘মা’
কলে কেনে আবার মায়ের কাছেই যেতে চায়, রামপ্রসাদও
সেইরকম সাংসারিক দুঃশক্তি সম্বন্ধে মায়ের গান যেনও
‘মা-‘মা’ বলে কেনে আবার তাকেই আঁকড়ে ধরেছেন।
এই যে নির্ভর-নিষ্ঠ হৃদযাবণ, তা মর্ত্যের হয়েও বর্ণের।

রামপ্রসাদ কালীপূজা করতেন। সেই বিগ্রহের পদতলে
বসে তিনি অনন্তরূপের চান্না অঙ্গভব করতেন। যে ভোগ-
নৈবেদ্য পূজার দিতে, তা দেখে তিনি নিজেই না-হেসে
খাকতে পারেননি—

‘জগৎকে খাওছাচ্ছেন বে মা,

হৃদযুর পাখ্য নানা।

ওরে কোন লাভে খাওছাচ্ছে চাঁদ তাদ,

আলচাল আর দুই-জিহানা।’

কখনও ফুল-বেলপাতা মায়ের পায়ে দিতে দিয়ে তিনি
নিউরে উঠেছেন—‘ম্যা—এসে অসম্পূর্ণ—

‘বনের গুল, বেলের পাতা, মারো আর নিব মায়ের নাখা।’

রামপ্রসাদ অম্বরের ভক্তিপুশে মায়ের নিত্যপূজা
করেছেন বলে তাঁর গান স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল সাধনার সহায়ক হয়ে
আছে। ভাষায় যে রূপ তিনি এঁকেছেন, তা শুধু রূপ নয়,
মায়ের এতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে—

‘চলিয়া চলিয়া কে আসে,

গলিত চিত্রের আসব আবোল।

বামা রূপে ক্রতগতিতে চলে বাবানলে

ধরি করতলে গজ-গয়ালে।

কে রে কালীর শরীর রুহিরে শোভিছে—

কালিনীর জলে কিংবদন্তি ভালে।

কে রে নীলকমল, শ্রীমুখ-মণ্ডল

অর্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে।

কে রে নীলকমল, যদি নিতান্ত

নবর নিকর তিমির নাশে।

কে রে কেশব ছটাং, তক্তিত মটাং

ঘন ঘোর হুবে উঠে আকাশে।

সিতি হুজুর, সবর জগর

ধর ধর ধর কাঁপে তরালে।

মাসো কোপ কর ঘুর, চল নিমগ্নর,

নিবেদ্যে শ্রীরামপ্রসাদ গালে।’

এইসব গান স্বগায়কের কাছে জনলে মন-প্রাণ এক

অপূর্ব উদ্ভাসের ভরে যায়। সেই মহীশূরী মূর্তি—বা কালীশূর ভয়ে কিংবদন্তের প্রায় পোতা। পায়,—বিদ্যাতের মতো তার ভ্রমের ছটা সাধকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করে দেয়,—অলিখ পান করে যিনি বিগলিতকথা,—রণে ভ্রান্ত হয়ে আসব আবেশে যিনি বর্ণনায় কেবল, তিনি তাঁর পাত্র উজাড় করে রানপ্রসাদকে সেই ভক্তির আগ্নেয় দিগন্তে দিলেন। তাইতো রানপ্রসাদের মধুর কণ্ঠে কথারিত হয়ে উঠেছে—

‘মন মাতালে মাতালে করে, বস মন মাতালে বলে।’

মাঝের ছেলে রানপ্রসাদ মাঝের মেসার একবারে মাতালে হয়ে উঠেছেন। তাই নাও ছেলেকে কোলে ভড়িয়ে ধরেছেন। মাতৃসাদক রানপ্রসাদ গেলেন ঘরের বেড়া ধাঁধতে। কিন্তু ধাঁধ ফিরিয়ে দেবার অস্ত্র তো একজন লোক চাই। ডাকলেন তিনি নিজের মেয়েকে। মেয়ে সে ডাক জনসে: জিনা কে জানে, কিন্তু মেয়ের কথা মনে হতেই রানপ্রসাদ তার মধ্যে মাতৃমূর্তির স্বরূপ দেখে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন—

‘মাগো! কত মার হইবো বলে,

তুই কি আর আলমিমে রে?’

পাঠক চিন্তা করে দেখুন,—কোথায় বা সেই মহানির্বাকের বিদ্রূষ ব্রহ্মবাদ, আর কোথায় বা সেই দামলের আচার মহাপ্রতিবাদ? বাংলার প্রাকৃত পত্তিমতবাব্দে নির্বিকল্প ব্রহ্মবাদ বা পত্তিবাদ মানবীয় গ্রেনে পর্যবসিত হয়ে যে অন্তরণ মাতৃ-আলোকে বাঙালীর মনগ্রাণ করে গিয়েছে, তার জোড়া কোথায় আছে, জমি না। ব্রহ্মময়ী তাই ভক্তের কাতর আঙ্গানে মানবীয় রূপে এসে রানপ্রসাদের ধ্যান ফিরিয়ে দিলেন। একদিকে কল্পভূমিষ্ট জগদ্ধাতা, আর অপরদিকে সাধকপ্রেমী রানপ্রসাদ—তাইয়ে বিলে ঢলসো বেড়ার ধাঁধ। ধাঁধ তো শেষ হ’ল, রানপ্রসাদ চললেন বাড়ির ভেতর। কিন্তু এ কি! কে—কে ঐ মৃতকেশী মেয়ে দৌড়ে পালায়? রানপ্রসাদের অন্তরাখা ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তিনি দৃষ্টান্ত লাগলেন তাঁর কল্পকে। কেবল, কল্পা ঘরে বসে কাঁচ করছে, সে বাসের ডাকও শোনেনি, বেড়া ধাঁধতেও যাননি। কিছুই আর স্মৃতে বাকী হইলো না। কেঁসে উঠলেন রানপ্রসাদ—বেড়া খোলবার কালে না এসে, তিনি যে বেড়া ধাঁধবার কালে এসেছেন, এই তাঁর চরম দৃষ্টি—

‘সে যে মৃতকেশীর দল বেড়া

তার কাছতে বসে বোঁদো।’

বাণা-বেদনার ভরা এই যে অভিমানের স্বর, এর মধ্যেই

বাঙালীর মাতৃ-সাধনার নিজস্ব রূপটি ধরা পড়েছে। জগদ্ধাতাই তো মৃতকেশরশ্মি। তাইতো তিনি সশ্রম মুক্ত করে নিয়ে যান। আবার তিনিই বেহ্মময়ী জগজ্জননী। তাইতো সংসারের বেড়া ধাঁধে তাঁরই প্রেমের জগতে আমাদের আশ্রয় কেন।

রানপ্রসাদের পুর আরও অনেক মাতৃ-সাধনার নাম করেন এবং তাঁরাও গান রচনা করে গেছেন।

রাম বহু ছিলেন একজন কবিওরালা। কিন্তু তিনি ছিলেন কালীর একজন মহাভক্ত। ঐর বাড়ি ছিল হাওতা জেলার সালিখা গ্রামে। তাঁর উমা-সংগীতগুলি বেহ্মরসে উৎখলিত—

‘তুমি যে কোয়েছ আমার গিরিরাশ, কতদিন কত কথা।

সে কথা আছে পেললম মন হবার পাখা।

আমার লখোঁধর নাকি উল্লের জালায়।

কৈসে কৈসে বেড়াতো।

হোয়ে অতি স্মৃতিক, সোনার কাকিক

খুলায় পড়ে লুটাতো।’

গিরিবার ভরণ-পোষণে মক্ষম ব্যক্তিরের মনে শেলের মতো এই গান বেঁধে, আর তাঁদের চিত্তপটে তখন নিজের ঘরের কাকিক, গণেশের ছবিই চিত্রিত হয়ে ওঠে।

আর একজন সাধক—রাম কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। বাড়ি ছিল অধিকা-কালনা। সেখানে থেকে তিনি বর্ধমান জেলার কোটালহাট গ্রামে এসে বাস করেন। বর্ধমানের মহারাষ্ট্রা তেজেশ্বরজীর তিনি ছিলেন সত্যগতিত ও ভক্ত। ঐর রচিত জামা-সংগীত রানপ্রসাদের গানের মতোই মর্মস্পর্শী।

ত্রিপুরা জেলার কালীকঙ্ক গ্রামে বাড়ি ছিল রামদুলাল রায়ের। ইনি ছিলেন একজন মাঝেরই সাধক। তাঁর গানগুলিও তাই অপ্রভলে মাথা—

‘ধনাশা, জীবন আশা গেল না, সকলি গেল মা।

কৌমার যৌবন গত, বরা আগমন হ’ল।

... ..

অক্ষিরও গেল মা ছোঁটিং, ব্রবণের গেল স্ত্রিতি,

মনের গেল মা স্মৃতি, চরণের গতি আছে কাঙ্ক্ষা-

অভিলাষ, অবর্ণনে দেখার আশ,

ঘরণনে অস্তা বলে কি মার হ’ল।’

বর্ধমান জেলার চুপীগ্রামের বেগোদান হুদুনাথ রায়ও ছিলেন মাতৃভক্ত। তাঁর রচিত গানগুলিও ভক্ত ও সাধকের কর্ণে বকুই মধুর।

ত্রিপুরা জেলার বরমাখাতের ভবিষ্যার বিদ্যা হলেন আলি মুসলমান হুদেও ছিলেন মাঝেরই সাধক। তিনি অনেক

ঘরত করে কালীপূজা করতেন। তাঁর রচিত অনেক ক্রাম্য-সংগীতও আছে—

‘ধারে পথন এবার ফিরি, এসোনা মোর আগিনাতে !

সোহাই মাগে ত্রিপুরারি, যদি কর মোর-স্বধরি,
সামনে আছে তল-কাছারি, মাইনের মতো রসিক দিব,
জানিন কি ত্রিপুরারি।

আমি তোমার কি দার দারি, ক্রাম্যবাদের খাল তালুকে
বসন্ত করি।

বলে মুখা হলেন আলি, যা করে মা জয়কালী,

পুণ্যের ঘরে মৃত সিরে পাণ নিয়ে বাও নিলাম করি।’
আত্মকুশি ছিলেন একজন পটুশিল্পী। তিনি হিন্দু-
ভাবাধার হয়ে যান ও দেশকালে এক কবির সল গেলেন।
ধর্মমত তাঁর ঘাই থাক, তিনি মায়ের লক্ষ্যে যে-সল গান
করেছেন তাতে পবিত্রতার স্ফাণ্যাই প্রবাহিত হয়—

‘আমি ভজন-সান্নান জানিনা মা, যেহেতুে কিতরী।

যদি হয় ক’রে কৃপা কর যে সিরে মাতরী।’

এ ছাড়া বাংলার অনেক রাজকুমারীও ছিলেন মায়েরই
সামক। এঁদের মধ্যে কুমারগণিগণিত কুমার, শিবচন্দ্র ও
শম্ভুচন্দ্র ও মাইটোরের মহারাজ রাজা রামকুমার নাম সবিশেষ
উল্লেখযোগ্য—এঁদের রচিত অনেক ক্রাম্য-সংগীত আছে।

পূর্ববাংলার দুইটি তাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ খুব গ্যাতি আছে।
একটির নাম সর্বাধিকার। তার প্রবর্তক মেহেরের সামক
সর্বাধিক। অল্প দূর হ’ল বিস্তার ঠাঁহরদের পূর্বপুরুষ
স্বাধীনস্বের।

মৈমনসিংহ জেলার আলোপসিংহ পরগনার পণ্ডিতবাড়ি
গ্রামে বিজয়স্বের ঘরে দেবী কুমারসে এসে স্বাধীনস্বের
পত্নীতপে মাতৃসীমা দেখিয়ে গেলেন। নিমন্ত্রিতগণ আহ্বারে
বসেছেন—বৌ-স্বপে দেবী করছেন পরিবেশন। এমন সময়
তাঁর মায়ের ঘোমটা গেল পড়ে। হুই হাতে খাণ্ডের বালা।
এমন লক্ষ্মিবিবারণের উপায়? হঠাৎ আরো দুইখানি হাত
বের করে ঘোমটা তুলে গিলেন। কাতো কারো চোখে
তা পড়লো। সকলে জানলেন স্বাধীনস্ব-গৃহিণী মানবরূপে
দেবী। সেদিন থেকে এই ষাংয়ের সন্ধান বিস্তার গুরুঠাঁহরের
বাপকে অর্ধকালী বলে বলে। প্রেম-লক্ষ্য বাংলাকে ধস্ত
করতে সিরে দেবীর শুধু ‘মা’ হয়েও আপ বেটেনি। প্রবন্ধিনী
হয়েও তিনি এসম্পকে ধস্ত করে গেছেন। তাই বিজয়স্ব
গেলেন তাঁকে কুমারসে, আবার স্বাধীনস্বের ঘরে গেলেন
তিনি পত্নীতপে।

পণ্ডিতস্বেরের বীরস্ব মেঘার আটলা গ্রামে ছিল সর্বাধিক

চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। অকালে তিনি যারা গেলেন। পনেরো
বছরের ছেলে কাম্যচরণ তখন কি করবেন, অবস্থা ভাল
নয়, সন্সার চালানো দায়। কি আর করা দায়, কাম্যচরণ
এক কালীবাড়ির পুজারী হলেন। বাহ্যিক, এই করে
কোনরকমে দিন চলতে লাগলো। কিছুদিন বেশ, পরে
তিনি নিজ গ্রামের কাছে তারাপুরের তারাপীঠে গৌরোহিত্য
দায়িত্ব করলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন মায়ের
দিক-সামক। তারাপুরেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি
অতিবাহিত করে গেছেন। তাঁর বহু আলৌকিক কীর্তি
আরও লোকমুখে বিবাহিত হয়।

আর একজনর কথা না বললে এই রচনা অসম্পূর্ণ হয়ে
যায়। তিনি হচ্ছেন ঠাঁহর শ্রীশ্রীরামকুমার পরমহংস।

মাতৃ রামমণি ছিলেন সাক্ষাৎ অসম্পূর্ণ। তাঁর কর্মজীবনের
শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে দক্ষিণেশ্বরের কালী-মন্দির নির্মাণ, আর এই
মন্দিরের পুজারী ছিলেন দিক-সামক রামকুমার। মন্দিরে তিনি
মায়ের পূজা করতেন; কিন্তু নিয়ম-কানুন মেনে পূজা তিনি
কোনদিনই করেননি। তিনি বলতেন,—“মহ-তত্ত্ব তো কিছুই
জানিনে, শাহের বিধানমতো পূজা করবো কি করে?”
এ কি সত্য? কখনই নয়। মহ-তত্ত্ব তিনি বুঝে জানতেন;
কিন্তু যে পুজার সর্বস্বারা ‘মা’-তাক নাই, সে পূজা তো সার্থক
হয় না! তিনি ছিলেন যে মায়েরই একনিষ্ঠ ভক্ত, শুধু নয়
আওড়ালে কি সে-মায়ের প্রাণপ্রতিমা হয়? তাই তিনি
পুজার বসেছেন তো পূজা করেই চলেছেন, আরতি করছেন
তো, তার আর বিদায় নেই। একবারে বিস্তার হয়ে যেতেন
তিনি। ভাবাবেশে ‘মা’-‘মা’ করছেন, গুঁড়ো গিলে চুষ
করছে। গুটিকয়েক কুল-বেলপাতা গিঁথে আর লক্ষ্যত ময়
পড়েই তিনি পূজা করেননি—মন্দিরের সমস্ত ভগ্নিসল জেলে
তিনি মা-কালীর পূজা করে গেছেন।

রামকুমার দিনরাত পড়ে থাকতেন মায়ের মন্দিরে। মায়ের
সামকস্বা করা, তাঁর পূজা ভোগ অসংখ্য পথান—কাতের
বেদ আর বিস্তার নেই। মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে কথা
বলেন; কিন্তু মা তাঁর কোনই উত্তর দেন না। মায়ের
সামনে বসে শুধু এক কথা—‘সেখা সে মা, সেখা সে!’ কিন্তু
তবু মা সেখা দেন না। রামকুমার বৈধ হারিয়ে ফেললেন। তবে
আর এ-জীবনে কাঙ্ক্ষ কি? মা-ই যদি ছেলেকে মা দেখলো,
তবে ছেলে বাঁচে কি করে? সামনেই ছিল স্বপ্ন। টেনে
কিলেন তিনি নিম্নের লগায় বসিয়ে বিতে। সঙ্গে সঙ্গে এক
আলৌকিক কাণ্ড। সারা ঘর মনে আলোয় আলো হয়ে গেল।
সেই আলোর মধ্যে গাড়িয়ে আছেন জগজ্জননী মা-কালী,



কলিকাতার কালী মন্দির

[আলোকচিত্র-শিল্পী : মোঃ হুসাইন]

আর তিনি আশীর্বাদ করছেন তরু রামকৃষ্ণকে । রামকৃষ্ণের সাধনা হল সার্থক—মাথের রূপ রূপন করে তিনি হলেন ধন্য ।

উপরে যা বলা হ'ল, তা থেকে স্পষ্টই বোকা যায়, বাঙালীর মাতৃ-সাধনার একটি বিষয় রূপ আছে । বাঙালী রূপসিদ্ধ সহজিবা লাভক, তাই বাইরের বেড়ি-খোঁড়ির পথ পৃথিবীতে করে মাতৃ-সাধনার অপূর্ণ পথ সে নিম্নের মনের স্তবে রচিত করে নিয়েছে । এইজন্যই বাঙালীর মাতৃ-সাধনার বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে । বাঙালীর মানন-মন্দিরে চিত্তহীন

মাথের যে রূপ সলা বিরাজিত, সে-যে মুগ্ধহী মাথের চেয়ে কত বিশাল, তা কি বলে শেষ করা যায় ?—

ও অথ যা বেবি চাদুও অথ কুতাপহারিনি ।

অথ সর্বদেবে দেবি কালরাত্রি নমোহস্ত তে ।

অথহী মনসা কালী ভক্তকালী কপালিনী ।

হুগী শিবা কমা রাজী বাহা কপা নমোহস্ত তে ।

কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণী ।

ধর্মকামপ্রদে দেবি নারায়ণি নমোহস্ত তে ।

‘বন্ধুধারা’-সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসুর আমেরিকা যাত্রা

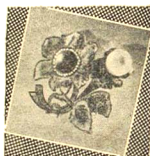


শ্রীনির্মলকুমার বসু

ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণক্রমে অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু গত ২১শে সেপ্টেম্বর বিমানযোগে লন্ডন হইয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিভাগে তিনি ছয়মাস কাল Visiting Professor রূপে অবস্থান করিবেন এবং ভারতীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ, বিশেষতঃ গান্ধীবাদ সম্পর্কে কয়েকটি নির্দিষ্ট বক্তৃতা দান করিবেন। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস হইতে জুন মাস পর্যন্ত তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে Visiting Professor রূপে অবস্থান করিবেন এবং ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও পাঠ্যক্রম নির্ধারণে সাহায্য করিবেন। তাঁহার বর্তমান কার্যচর্চা অস্থায়ী তিনি ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে আমেরিকা সমগ্রদেশে ভ্রমণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবেন, এইরূপ কার্যক্রম স্থিরীকৃত হইয়াছে।



সত্যসীরা অতিষ্ঠ
জুয়ালস



টি, সি, আড্ডি এণ্ড সন্স

৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬





অলঙ্কারের গোড়ার কথা

বেলা দে

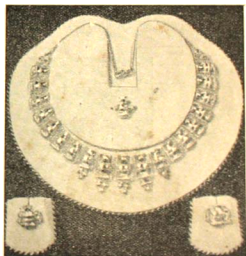
অলঙ্কারের ইতিহাস মানুষের ইতিহাসের সমসাময়িক বলা যায়। সেই থেকে আজও পর্যন্ত অলঙ্কারের রকম নকশার চলছে। গাছের লতা-পাতা আর মূল দিয়ে মানুষ নিজেকে সাজিয়েছে। প্রথম যুগের মানুষ বাস করতো বনে-রসুলে। বস্ত্র পত্র ছিল তার খাতি, তবুও সেই যুগে অলঙ্কারের গোড়ার অলঙ্কার দিয়ে মানুষ নিজেকে সাজিয়েছে। হাতে। সেই অলঙ্কার হতো নুওর মালো, হাতের বোলক ইত্যাদি। এমনি করে অলঙ্কারের শুরু হলো।

অলঙ্কার প্রেমের প্রথম প্রতীক। পুরুষ নারীকে প্রেম নিবেদন করে অলঙ্কারের সাহায্যে। অলঙ্কার নারীর সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয় বহুভাবে, তাই তার এত আদর। অলঙ্কার মানুষের এক বিরাট সভ্যতার প্রতীক—মানুষের কৃতিত্বোপ ও কল্মনাশক্তির এক নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায় এই অলঙ্কার-সৃষ্টির মধ্যে। বহু প্রাচীন সৃষ্টি বা ডিজি দেখলে মনে হয় অলঙ্কারের সাহায্যে প্রথম বোধহয় অমনপদ্ধতি শুরু হয়। মানুষের সভ্যতা-বিস্তারে এই গহনা-শিল্প এক বিরাট শক্তি বান করেছে। প্রথমেই খরা হাক প্রকৃতির গুণের কথা—সেই যুগের মানুষের বাসনপত্রের জামিতিক রেখার সাহায্যে এক ছন্দোমায়ুর্ধ্বের অপূর্ণ গতি দেখা যায়। এই রেখা-হয় ছন্দোমায়ুর্ধ্ব থেকেই তাত্ত্বিক গহনার সৃষ্টি করে। ত্রিভুজ থেকে ও অলঙ্কার তৈরি হতো। পক্ষিপাখারতের কোনো কোনো ছায়াগায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিজ্ঞানের সোলক, ধুকধুকি ইত্যাদি পাওয়া যায়।

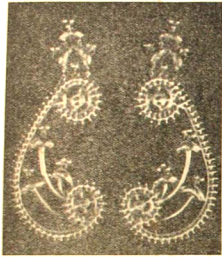
তার পর আনন্দের বেশে পাখির গহনার প্রচলন হলো। পাখা-পরাই প্রচলন প্রথমে পক্ষিপাখারতের সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে ছিল। ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষে পাখার ব্যবহার চলতে থাকে। আজ যেমন পাখা আমরা দেখতে পাই, পাখার শৈশবাবস্থাও তেমন হচ্ছে ছিল না। পাখা প'রে মানুষ লো, হাতের স্রীবর্ধন ব্যবহার এক অযুত ক্ষমতা আছে এই

পাখার। তাই নতুন নতুন নকশা এসে পাখার সৌন্দর্য বাড়ালো। বহু দূলা দিয়ে তখনকার লোকেরা পাখা কিনত। পাখির স্তম্ভ সৌন্দর্যের এমনি মোহ ছিল। কিন্তু মানুষের সৌন্দর্যপিপাসা হন অলঙ্কার-সৃষ্টির মধ্যে যে নিপুণ কল্মনাশক্তির বাস্তব রূপ বান করেছে, তাকে সে চাইল সীর্ষকালের বা তিরকালের সভ্যতে একটি স্থায়ী আসন দিতে। তাই গহন খাতুর মধ্যে আপন রূপের পূর্ণ বিকাশ খুঁজে পেলো।

কাংক্র-রূপ অপেক্ষা লৌহ-রূপে গহনার বিশেষ উচ্চি হয়। এই সময় থেকে গহনা শুধুমাত্র অঙ্গের সূষণ ছিল না, তাকে সীতাবস্তে নিপুণ শিল্পের পর্বেও বরা বেতো। তবে অলঙ্কার-শিল্পের ইতিহাসে, সেই আশ্চর্য থেকে আজ পর্যন্ত ডিগ ডিগ



বেলাদে, কানের টাপ ও আঁঠি



কান-ঘুসকা

সময়ে ডিগ্রি ডিগ্রি করির পরিচয় পাওয়া যায়। কখনো বা স্থলটির সৌন্দর্য আমাদের নুহ করে, আবার বিকৃত জটিল জড়তার মাধ্যমঃ গ্রামি বোধ করি। মহেচ্ছাভাঙতে যে-সব গহনা পাওয়া গেছে সেই ধরনের গহনা এখনও এ দেশে চলে। তবে মহেচ্ছাভাঙতে প্রাপ্ত অলঙ্কার কাংক্র-মৃগের অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক। সে সময়ে এখনও পর্যন্ত তেমন ঐতিহাসিক গবেষণা হয়নি।

আমাদের প্রাচীন বাংলার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, দেশজলের অলঙ্কারের বহু একালের চেয়ে অনেক বৈধি ছিল। কানে বড় বড় হুওল, গলায় এক বা দুই-তিনগাছি হার, অনন্য, চুড়ি, বালা, পায়ের মল, কোমরের বিছা, হাতে রতনহুচ—এসব প্রচুর পরিমাণে চলতি ছিল। আবার ‘শ্রীকবিরাজের’ (গৌড়ীয় মূসে) কণ্ঠে হুবর্ণের হার, কানে হুওল, নাশায় গজমতি, হাতে কঙ্কণ, কটিতে মৃত্ত বসি, পায়ে মঞ্জীর প্রভৃতি অলঙ্কারের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

পূর্ববঙ্গের দেশক বিষয়গুণ—হাতে সোনার বাউটি, সোনার ঘাপড়া, শিলমণি কাচ, কণ্ঠে হাঁহুলি, কানে সোনার মলমকড়ি, শিতলের খাটু ও মোটিন-খোঁপা নামক এককরম খোঁপা তৈরি করে, তাতে কিছু একটি গহনা দেওয়া হতো বলে উল্লেখ করেছেন। তবে নাকছাবির কোনো নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় না। এই মিনিসিটি কি ‘স্ক্রুই’ পরবর্তীকালে বাংলাদেশে প্রচলিত হলো জা বলা শক্ত।

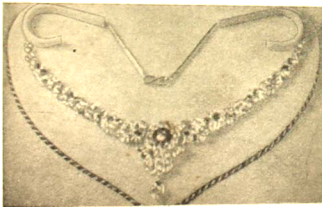
‘মহম্মদনিসংহের-গীতিকার’ মল্লার কাহিনীতে রাখিবিরে কাতরা মল্লার বারোটা হাস কি ভাবে কাটিয়েছিলেন এবং নিজের সখাকর অলঙ্কার পর্বত শেষে বিক্রি করতে বাধ্য হলেন—লোককবি তাও লোকগীতি বা ছড়ার মধ্যে দিয়ে বর্ণনা করেছেন—

“নাকের নখ বেচিয়া মল্লার আঘাট হাস খাইল।

গলার যে মতির হার তাও বেচ্যা খাইল।

শাওন মাসেতে মল্লার পায়ের খাটু বেচে।

এত দুঃখ মল্লার তপালোতে আছে।



হাতের বাঁধু বাঁধা দিয়ে ভাত মাস খায়।
পাটের শাটী বেঁধে; মলুয়া অধিন মাস খায়
কানের ফুল বেঁধে; মলুয়া কৃত্তিক বেঁধেটিল।
অজের দাত সোনা-পানো সবলটী বাঁধা দিল।
শত এখি অজের বাম হাতের কড়ক বাঁধি।
আর নাহি চলে পিন মুষ্টি-চালের লাগি।”

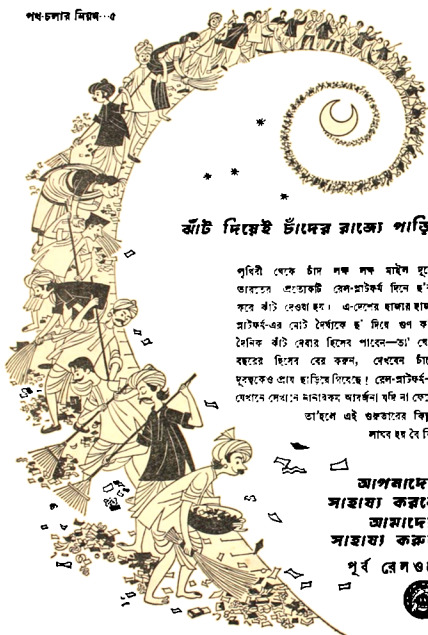
বাংলাদেশের সময় যে সব্বকণ্ঠসী ছিল, এই পরীক্ষাখণ্ডটি তার নিদর্শন। সেকালের কোনো কোনো গল্পে সোনার দড়া, সোনার বাঁট, সোনার বাসনপাতেরও উল্লেখ দেখা যায়। এমন কি, সোনার বাঁটে পান খাওয়ার কথাও জানা যায়। এ ছাড়া গল্পমন্ডির মালা, হীরার কণ্ঠি বা হার, সোনার দাঁত খোঁচানী কাঠি প্রভৃতি অলংকারপত্র যে কতরকমের ছিল তার উল্লেখ নেই। বাংলার সময় মেয়েরা হীরার হার, সোনা ও চতুর্ভুজ অলংকার গুলি সাজ করত যেমন তাও জানা যায়।

সেকালের অলংকারের মধ্যে ‘মেথলা’ বা ‘চক্কা’র’ ছিল প্রধাম। বিশেষ করে নারি কোমরে কাপড় বাঁধবার চক্ক এর পরবার ছিল যেই। কিন্তু নান্যায়-যুক্তি হয়ে ক্রমে সেটা একটা প্রধাম অলংকার বলে গণ্য হলো। তবে অলংকার তিনিদটা সেকালের আধুনিক যুগের মধ্যে শুধু মেয়েরাই ব্যবহার করতো না। পুরুষেরাও এই বিষয়ে মেয়েদের দলের সমান পালা দিয়ে চলত এবং প্রায় মেয়েদের মতোই সাজ গরম পরতো। এ বিষয়ে আরও এখন আর মিল নেই। আর যদি পুরুষেরা কানে সুঁচস, গলার চাঁদ, হাতের মালা পরে চলতেন, তাহলে মিশ্রমুখি ভাষায় ভিত্তি ভাবে যাবে সেই ভাষায় দেখবার চক্ক। কিন্তু সেকালে ছিল এটাই স্বাভাবিক।

একটি প্রশংসিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ দলদ্বায়-শিল্পী টি. বি. মাজিউরী
সব্ব কড়ক নিমিত্ত অলংকারে।



দি **বেঙ্গল ডেকরেটর**
২২০-চিওরজন এভিনিউ • কলিকাতা-৬



ঝাঁট দিয়েই তাঁদের রাজ্যে পাড়ি !

পৃথিবী থেকে ঠান লক লক মাইল দূরে !
ভারতের প্রত্যেকটি রেল-স্টাটিক্স দিনে হ'বার
করে ঝাঁট দেওয়া হয়। এ-দেশের হাজার হাজার
স্টাটিক্স-এর মোট বৈশ্বাক হ' দিয়ে গুণ ক'রে
দৈনিক ঝাঁট বেহার হিসেব পাবেন—তা' থেকে
বছরের হিসেব বের করুন, দেখবেন চাঁদে
চুপকৈ ও ত্রাষ ছাড়িয়ে গিয়েছে ! রেল-স্টাটিক্স-এর
যেখানে সেখানে মানাবকর আবর্জনা যদি না ফেলেন
তা'হলে এই গুরুত্বের কিছুটা
লাভে হয় বৈ কি !

**আপনাদের
সাহায্য করতে
আমাদের
সাহায্য করুন
পূর্ব রেলওয়ে**



স্বাস্থ্যকথা

ভাইরাস

ডাঃ পদ্মপতি ভট্টাচার্য

আমরা যেটা মুটি এখন ঐটুই ভেবেছি যে আমাদের কোষে রোগের সৃষ্টি হয় নানাবিধ জীবাণুদের দ্বারা। এ কথা আগে আমরা জানতাম না। রোগের প্রকৃত কারণ সবচেয়ে কতই উদ্ভট রকমের জ্ঞানা-কল্পনা করতাম। রোগসৃষ্টির প্রকৃত সম্বন্ধানটি আমরা জানতে পেরেছি পরে সেদিন নাত্র, এখনও পর্যন্ত পুরো একশো বছরও হয়নি। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্য পূর্ব-প্রথম এই কথা আবিষ্কার করেন যে প্রত্যেক রোগেরই নির্দিষ্ট কিছু বীজ (germ) আছে, তার থেকেই বিভিন্ন রোগ জন্মায়। সেই বীজগুলিকে আরম্ভকাল আমরা সাধারণভাবে জীবাণু কিংবা বীজাণু বলে থাকি।

কিন্তু ঐটুই বললেই সব কথা বলা হলোনা। রোগের বীজ এক রকমেরও হলো, এক ভাঙেরও নয়। তার মধ্যেও আবার বহু রকমারি আছে। অনিষ্টকারী রোগবীজের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের জর আছে। কোনোটি বা উদ্ভিদ, কোনোটি বা প্রাণী, কোনোটি দুই-এর অধ্যবর্তী জরের মিশ্র।

রোগের বীজকে এখন আমরা চার রকম বস্তুর ভাবে ভাগ করে নিতে পারি। যথাক্রমে এর জর-বিভাগের কথা সংক্ষেপে আমাদের ভেঙ্গে রাখা দরকার।

প্রথম জাতি হলো প্রোটোজোয়া (protozoa)। এরা আমাদের প্রাণীরাজ্যেরই অন্তর্গত, কিন্তু এদের বিশেষত্ব এই যে, এরা মাত্র এক সেল বা এক-কোষবিশিষ্ট প্রাণী। দুটি কোষ এদের কখনই থাকবে না, এক কোষ থেকে দুটি কোষ হলেই এরা দুটি আলাদা আলাদা প্রাণীতে ভাগ হয়ে পড়ে। ম্যাগনেট্রা রোগের প্যারাসাইট এই প্রোটোজোয়া জাতির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাশা রোগের অ্যামিবাও তার অপর একটি উদাহরণ। এরা হলো প্রাণী, অতএব প্রাণীদের মতোই এদের সবকিছু আচরণ। এরা ভালো ভালো খাদ্য খায়, খেয়ে পুষ্ট হয়, আর পুষ্ট হলেই বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। আমাদের কোষে আশ্রয় পেলে এরা নির্দিষ্টপ্রকার রোগ জন্মায়।

পরের জর হলো ছত্রাক (fungi)। এরা উদ্ভিদ-জগতের অন্তর্গত। আমরা সকলেই জানি বগাকালে কত ভিনিসের উপর কত বকনের ছাতা ধরে। এই ছাতা-ধরার ব্যাপারটা ছত্রাকের দ্বারাই হয়ে থাকে। ছত্রাক অনেক সময় খুবই অনিষ্টকারী, পাচনশালাতে খারাপ ছত্রাক পরলে যে তার দ্বারা কত অনিষ্ট হয় তার কোনো ইচ্ছা নেই। যতপূর্বক রোগ-করা মানাব্যবস পত্র, ধান গম প্রভৃতি সমী গাছবন, আলু বেগুন প্রভৃতি তরকারি সবজিই ছত্রাক লেগে নষ্ট হয়ে যায়। লোকে বলে পাছে পোকা লেগেছে। কিন্তু তাত্তিক পোকা নয়। চাবীরা সে কথা জানে, তাই আগের থেকে তারা তুঁতের জল প্রভৃতি দিয়ে ছত্রাকের আক্রমণ নষ্ট করার জন্য প্রাণপণ করে। মাছের সেহুও তেমনই ছত্রাকের আক্রমণের দ্বারা মানারকম রোগের সৃষ্টি হয়। হাতে গায়ে দাঁড়া হওয়া ছত্রাক-ঘটিত রোগের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অনেক রকমই চর্মরোগ ছত্রাকের দ্বারা হয়ে থাকে। অবশ্য ভালো ভাতের ছত্রাকের দ্বারা অনেক উপকারী কাজও হয়। পাউকটি প্রস্তুত করতে যে 'কিউ' ব্যবহার হয় তাও ছত্রাক। আরম্ভকাল পেনিসিলিন প্রস্তুত হচ্ছে একজাতীয় ছত্রাক থেকেই।

তার পরের জর হলো ব্যাকটেরিয়া (bacteria), যাদের প্রকৃতপক্ষে জীবাণু কিংবা বীজাণু বলা হয়। এরা সকলেই উদ্ভিদরাজ্যের অন্তর্গত। প্রাণীরাজ্যের প্রোটোজোাদের অপেক্ষা এরা আকারে ছোটো, কিন্তু সাধারণ বায়ু-বাহুর সাহায্যে এদের বেগবে পাওয়া যায়। এরা ফলে ফলে সর্বত্রই মুক্তভাবে জোটে বেঁধে অথবা বিকশিত হয়ে থাকতে পারে, বায়ুর জরও নিক্ষিপ্ত হয়ে কিছুক্ষণ ভাসতে পারে। এদের দ্বারাই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশিরকম রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে, হুতরাং এরা আমাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। মারাত্মক বম্বা রোগ এক ধরনের বীজাণুর বা জীবাণুদের দ্বারাই জন্মায়। তা ছাড়া কলেরা, টাইফয়েড, শ্রেণ, নিউমোনিয়া, ডিপথেরিয়া, ঘণিকানি, রক্তদূষি প্রভৃতি বহুবিধ সংক্রামক ও মারাত্মক

রোগ এই জীবাণু-গোষ্ঠীর দ্বারাই জন্মায়। কিন্তু জীবাণুমায়াই আমাদের পক্ষে মহা অনিষ্টকারী, এমন ধারণা করা ভুল। অনেক রকমের ভালো জাতের জীবাণু আছে যারা উপকারী। বহু জীবাণু আছে যারা মাটির সঙ্গে মিশে বায়ু থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে এবং তা পাচনশালায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য হয়। মাটির মধ্যে এইভাবে জীবাণু কর্তৃক নাইট্রোজেন না হজমালে উর্বরতার অভাবে কোনো পাচনশালাই ভালোভাবে বাড়তে পারতো না। আমরা ভাবিতে যে পান দিয়ে থাকি, তার থেকে এই জীবাণুগাই নাইট্রোজেন নিয়ে পাচনশালাকে সুরবাহা করে। তা ছাড়া দুধ থেকে যে বই প্রস্তুত হয়, রগ থেকে যে তড়িৎ প্রস্তুত হয়, দু'কোণ থেকে অ্যালকোহল প্রস্তুত হয়—এগুলি হতে পারে জীবাণুদের ক্রিয়াতেই। আমাদের পেটের মধ্যেও অনেক উপকারী জীবাণু বাস করে, তাদের আমরা অন্ত্রবাসী 'ফ্লোরা' বলি। তারা খাবার ভিতরকার অনেক অসকারী জিনিসকে নষ্ট করে দেয়, এবং বাতাসি থেকে ভাইটামিন সংগ্রহে যথেষ্ট সাহায্য করে। অনিষ্টকারী জীবাণুকে তারা অনেক ধ্বংস করে। জীবাণুই জীবাণুর শত্রু।

কিন্তু রোগদায়ক জীবাণুদের নিয়েই ইতিমধ্যে আমাদের সংসারে বেশি ভিয়ার কারণ ছিল। টাইফয়েড নিউমোনিয়া প্রভৃতি দহ-কিন্তু জীবাণুগণিত রোগ আমাদের ব্যাপকভাবে আক্রমণ করতো। এবং অনেকেরই প্রাণহানি ঘটাতো, অথচ ওর কোনোটার বিরুদ্ধেই উৎকৃষ্ট রকমের কোনো ওষুধ আমাদের আনা ছিল না। বিজ্ঞানীরা তাই অসহ্য অসুস্থতানে রত ছিল—জীবাণু-ধ্বংসকারী অম্লীয় ওষুধ কেন্দ্র করে পাঁচটা ধার। এখন ক্রমে ক্রমে নানারূপ সাপেক্ষ-যুক্ত ও অ্যান্টিবাইোটিক ওষুধ আবিষ্কার হওয়াতে প্রায় সকলপ্রকার জীবাণুরই ধ্বংসকারী অম্লোষ অস্ত্র আমাদের হাতে এসে গেছে। এমন কি বলা রোগের জীবাণুর পক্ষেও মারাত্মক ওষুধ একাধিক রকমের মিলে গেছে। হৃৎযন্ত্র রোগপীড়িতরা কোনো জীবাণুকেই এখন আর আমাদের ভয় করবার কোনো কারণ নেই।

সেবকালে কিন্তু বাকি রয়ে গেছে চতুর্থ রকমের রোগবীজ, বাসের গোষ্ঠীর নাম ভাইরাস (virus)। এদের দ্বারাও আমাদের দেহে নিরাস্ত্র কন প্রকারের রোগ জন্মায়, এবং তার অধিকাংশই আমাদের পক্ষে একবারে মারাত্মক। এই ভাইরাসদের দ্বারাই স্ট্র হু সাধারণ সর্দি, ইনফ্লুয়েন্সা ও গলাশূলোপা বাম্পস্ রোগ, এবং হারপিস্ রোগ। এগুলি তত সাংঘাতিক নয়। কিন্তু আবার এদের দ্বারাষ্ট জন্মায় হাম, পানিবল্লভ, আগল বদন্ত, পোঙ্গিও রোগ, টাইফাস্ রোগ,

জলান্তর ও ইয়েলো ফিভার। এই তালিকার মধ্যে সবকয়টি রোগই অতিশয় সাংঘাতিক।

এই মারাত্মক-জাতীয় অতিদুষ্ক ভাইরাসগুলি প্রাণী-রাজ্যের অন্তর্গতও নয়, আবার উদ্ভিদরাজ্যের অন্তর্গতও নয়। এরা তার চেয়ে আরো নিম্নস্তরের জিনিস। এমন কি এদের একজন অপ্রাণ জড়বস্তুও বলা চলে। আমাদের প্রোটিন খাবারের মধ্যে যেমন সর্বাংশেই 'সুদৃঢ়'ম গ্রোটিন মিলকিউল বা পরমাণু থাকে, এরাও সেই মিলকিউল-জাতীয় জিনিস। বস্তুত, এমনটিতে দেখলে এরা নিরীহ জড়বৎ গ্রোটিন পরমাণু ছাড়া আর কিছুই নয়। রাসায়নিক ক্রিয়াতে গ্রোটিন পরমাণু যেমন ক্রিস্টাল বা ক্রিস্টায়েল (crystal) পরিণত হয়, ভাইরাস-গুলিও তেমনি এক একটি রাসায়নিক ক্রিস্টায়েল। হৃদয়ের যেমন দৃশ্য দৃশ্য চুহকোণা ক্রিস্টায়েল প্রস্তুত হয়, ভাইরাসগুলিও অনেকটা সেই ধরনের চুহকোণা ক্রিস্টায়েল। এই ভাইরাসের ক্রিস্টায়েলকে গিনির জলের মধ্যে বা স্লেয়ার মধ্যে রেখে দিলে, তার কোনোই পরিবর্তন হবে না। কিন্তু কোনো প্রাণীদেহের সীমন্ত কোষের মধ্যে যদি এর কোনো একটিকে একবার ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আর বন্ধা নেই, একটিমাত্র ক্রিস্টায়েল থেকে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে এক লক্ষ ক্রিস্টায়েল জন্মাবে। হৃৎযন্ত্র: এমন জিনিসকে জড়বস্তু বলব, না প্রাণবস্তু বলব? যদিও তাকে অপ্রাণ জড়বস্তুই বলাত হবে, কিন্তু প্রাণীদেহে প্রবেশ করলে সে-জিনিস জড়িত বিঘাত, এবং তার পরবর্তী কার্যকলাপ তখন গতিশীল প্রাণবস্তুর মতোই। আমাদের রক্তের মধ্যে তার কিরূপ হতে থাকে অতি ভয়ঙ্কর। কিন্তু কেবল এর একটা স্থিতি এই আছে যে, কোনো ভাইরাস যদি একবার কারও রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে তার শরীরে নির্দিষ্ট প্রকারের রোগ জন্মায় এবং কালক্রমে সেই রোগটি আরোগ্য হয়ে যায়, তাহলে অতঃপর ঐজাতীয় ভাইরাস সেই ব্যক্তির রক্তের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করলেও আর ঐ রোগটি সেখানে জন্মাতো পারবে না। কারণ তার রক্তের মধ্যে তখন ঐ ভাইরাস-বিরোধী এমন এক অ্যান্টিবডি (antibody) তৈরি হয়ে থাকবে যে ঐজাতীয় ভাইরাস মাত্রকেই তা নষ্ট করে ফেলবে। এই কারণেই কারও একবার বসন্ত হলে আর তার বসন্ত হয় না, একবার পানিবল্লভ বা হাম প্রভৃতি হলে আর তা সর্বদা হতে পারে না।

ভাইরাস এত 'দৃঢ়' জিনিস যে তাকে ঘরা-ছোঁয়া-ধাব না, মাইক্রোস্কোপ দ্বারা সাহায্যে দেখাও যায় না। আবার কতক কতক ভাইরাসকে সর্বাংশেই 'দৃঢ়' সিলিটের দ্বারাও আটক করা যায় না। ফিল্টার বস্তিই 'দৃঢ়' হোক, তার ভিতর দিয়ে

ওরা গ'লে যেহিঁয়ে যায়। মাইক্রোস্কেপের ভিতর দিয়ে দেখা যান্না এই কারণে যে, এরা হৃদয়তম আলোকরশ্মির চেয়েও বেশী হৃদয়, তাই সাধারণ আলোকরশ্মি এদের ভেদ করতে পারে না। এদের দেখবার জন্য তাই হৃদয় রকমের অতিহৃদয় ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোস্কেপের ব্যবহার হয়। আর সাধারণভাবে জীবাণু-কাল্পচারের মতো এদের কাল্পচার করাও যায় না। এদের কাল্পচার করতে হলে জীবন্ত প্রাণীকোষের ব্যবহার। একটি ভিন্নক অতি হৃদয়ভাবে গুটী ক'রে ঘনি তার মধ্যে ভাইরাস চুকিয়ে দেওয়া যায় তবেই তার মধ্যে ওর কাল্পচার হতে পারে। ভাইরাস-কাল্পচারে তাই করা হয়ে থাকে।

ভাইরাস যে কতই হৃদয় তার একটা মোটামুটি আন্যায় দেওয়া থাকে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাইক্রন (micron) নামক এক অতি হৃদয় রকমের মাপ ব্যবহার করা হয়। সেই মাপ অনুযায়ী আন্যায়ের সাধারণ চোখে দেখবার মতো একটি ঘরোয়া মাটির দেহের ব্যাসের মাপ হলো ১,০০০ মাইক্রন। সেই মাপ অনুযায়ী একটি প্রোটোজোয়ার মাপ হবে ১০০ মাইক্রন। তাই হলো: এত হৃদয় যে মাইক্রোস্কেপ ব্যবহার সাহায্য ছাড়া কোনো প্রোটোজোয়ারকে আন্যায় চর্চাকে দেখতেই পারেনা। আন্যায়ের দেহের ভিতরকার রক্তকণিকার মাপ হলো মাত্র ১০ মাইক্রন, অর্থাৎ ৬৩ চেয়ে আরো হৃদয়। জীবাণুও ৬৩ চেয়ে আরো হৃদয়, তাই মাপ সাধারণত ১ মাইক্রনের বেশী নয়। কিন্তু এই ভাইরাসদের মাপ হলো তার চেয়েও অনেক কম, মাত্র ১/৮ থেকে ১/১০ মাইক্রন পর্যন্ত। এতেই বোকা বাবে ভাইরাসদের হৃদয়তার সীমা কতই হৃদয়।

কিন্তু আকারে ওদের হৃদয়তা এমন হলেও আচরণে ওদের ভীততা অতি প্রচণ্ড। কলর, জলাভয় ও পোলিও প্রকৃতি মারাত্মক রোগে তার আন্যায় প্রত্যেক প্রমাণ পেয়ে থাকি। কিন্তু এইদল ভাইরাসকে নষ্ট করার মতো ওহু আক পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। মাত্র দুই-এক রকমের হৃদয় বড়ো ভাইরাসকে এখনকার নতুন নতুন অ্যান্টিবাইয়োটিকের দ্বারা নষ্ট করতে পারা সম্ভব হয়েছে।

আকারের ভিন্নতায় অনুসারে ভাইরাসের গোষ্ঠীকে আবার চার রকম বিভাগে বিভক্ত করা যায়। ওর এক বিভাগের ভাইরাসদের বলা হয় 'থিক্টেনিসিয়া'; এরা হলো জীবাণু ও ভাইরাসের মধ্যবর্তী দল। এদের দ্বারা টাইফাস নামক রোগের সৃষ্টি হয় (টাইফাস রোগটি টাইফয়েড থেকে অনেক মালয় উপদ্বীপে এ রোগ অনেক দেখা যায়)। রোবোমাই-

সেটনের দ্বারা এ রোগের ভাইরাস খিনেই হচ্ছে। পরবর্তী বিভাগে থাকে হৃদয় আকৃতির ভাইরাস। এগুলি হৃদয় হওয়াতে সাধারণ মাইক্রোস্কেপ ব্যবহার সাহায্যেই দেখতে পাওয়া যায়। চোখের ট্র্যাকোমা (Trachoma) রোগ ও Parrot-disease নামক রোগ এদের দ্বারা জন্মায়। অগ্নিওমাইসিন ও টেরামাইসিন প্রকৃতির দ্বারা এ-রোগ আরোগ্য হয় এবং ঐ ভাইরাসগুলি খিনেই হয়। তৃতীয় বিভাগের ভাইরাস পূর্বাঙ্কগুলির চেয়ে অনেক ছোটো, তাই মাপ ব্যাস ১/৮ মাইক্রনর চেয়ে বেশী নয়; ইনফ্লুয়েন্সা রোগের ভাইরাসগুলি এই বিভাগেরই অন্তর্গত। আর চতুর্থ বিভাগের ভাইরাস ওর চেয়ে আরো অনেক ছোটো, তাই মাপ ব্যাস ১/৮ মাইক্রন মাত্র। পোলিও রোগের ভাইরাস এই হৃদয়তম বিভাগের অন্তর্গত। শেখোক্ত দুই বিভাগের হৃদয়তম ভাইরাসগুলিকে আন্যায় পর্যন্ত কোনো ওহু ব্যবহারেই নষ্ট করা সম্ভব হয়নি।

অতিহৃদয় ভাইরাসের উপর কোনো জিমাঈন জন্ম প্রয়োগ করতে পারা হৃদয় দুঃসাধ্য। তার কারণ ওরা জীবাণুদের মতো সুকলভাবে রক্তাঙ্গির মধ্যে লুকায়িত হয় না। ওরা সর্বদাই থাকে সেহন্যায় হৃদয় কোষগুলির অভ্যন্তরস্থ। কারোই রক্তের প্রতিরোধক্ষমতা ও ওদের উপর ক্রিয়া করতে পারে না, আর আন্যায়ের সঙ্গে বা কোষগুলিকে নষ্ট না ক'রে কোনো ওহু ওদের ধারে কোল শোঁতেও পারে না। ভাইরাসকে নষ্ট করতে দিয়ে দেহের জীবন্ত কোষগুলিকে নষ্ট ক'রে কোলা অবজই বাহুদীয় নয়, তাতে রোগকে মারতে দিয়ে রোগীকেই মারা হবে। এই কারণে ইনফ্লুয়েন্সা ও পোলিও প্রকৃতি রোগের কোনো উপদ্রুত ওহু আন্যায় পর্যন্ত আবিষ্কার করা যায়নি। কিন্তু মাশা করা হচ্ছে যে হৃদয় হৃদয় একটা উপায় কিছু মিলে থাকে, যাতে এইসব অতিহৃদয় ভাইরাসকেও নিরাসনে নষ্ট করতে পারা সম্ভব হবে।

তবে আশান্ত একটা সুবিধার কথা এই যে, ভাইরাস থেকে ভ্যাক্সিন প্রস্তুত করা সম্ভব। অগ্নের থেকে সেই ভ্যাক্সিনের প্রতিরোধক ইন্ডেক্সন গিলে সেই ভাইরাসের রোগটিকে নিরাসন করা সম্ভব হয়। ইনফ্লুয়েন্সার বিরুদ্ধে এবং পোলিও রোগের বিরুদ্ধেও ভ্যাক্সিন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে, এবং তার দ্বারা বহু মানুষকে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারা হচ্ছে। আরো এক কথা, দলভি-আরোগ্য প্রাপ্ত রোগীর রক্ত-নির্থে আফ্রা রোগীকে ইন্ডেক্সন গিলে, তার দ্বারাও চিকিৎসা স্থল দিচ্ছে।

বিজ্ঞান

তত: কিম্

ব্রীহস্পতি উদ্ভাট্য

‘চির-পুথানো চাপ্

চিরদিন এমনি থেকে আমার এই সাধ।’

কিন্তু তা অংশ হল না। গগনে একশতঃ আর রয়েল না। তার সোনার কোঁ শিরেছে। আর তা স্থিতি করেছে মানব। ভয় মানবের ভয়!

নিউটনের সূত্র

কথ্য: একটু গোড়: থেকে আরম্ভ করা যাক।

সংস্কারের এক সজ্জায় নিউটন বাগানে যেন আছেন, আকাশ চাপ উঠল। নিউটন চিন্তা করতে লাগলেন, কেন এই চাপ পৃথিবীর চারদিক ঘুরে, আর একই শবে ঘুরবে। এই চিন্তার মধ্যে তিনি গাছ থেকে একটা আপেল ফল পড়ার শব্দ শেলেন। তার মনে নানা প্রশ্ন উঠতে লাগল।

উৎসাহিত প্রতি বস্তুর প্রতি পৃথিবীর একটা টান আছে। এ কথা এর আগেই লোকে জানত। এখন নিউটন চিন্তা করতে থাকলেন, এই আকর্ষণ কি চন্দ্র অবধি পৌঁছেছে, আর তাহাই ফলে কি পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্র ঘুরছে। একটা নতুন ভাষায় ছিল যেনে যদি সেটাকে যোগানো হয়ে তবে চিলটা বুঝাকারে ঘুরতে থাকে, তিলের প্রতি আকর্ষণই সেটাকে যোগায়। নিউটন স্থির করলেন, এই মহোত্তর চন্দ্রের উপর পৃথিবীর যে আকর্ষণ সেই আকর্ষণই চন্দ্রে পৃথিবীর চারদিকে যোগাচ্ছে, আবার পৃথিবীর উপর সূর্যের আকর্ষণের ফলে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। যে নিয়মের বলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড চলছে, নিউটন সেই নিয়মের সন্ধান পেলেন।

নিউটন-আবিষ্কৃত মহাকর্ষ নিয়মটি হল এই,—

ব্রহ্মাণ্ডে প্রতি পদার্থ অপর পদার্থকে আকর্ষণ করছে, তাদের মধ্যে ব্যবধান হতই হোক না কেন। এই আকর্ষণ-বল পদার্থ দুটির ভরের উপর নির্ভর করে, আর তাদের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি হলে এই আকর্ষণ একটা নির্দিষ্ট নিয়মে হ্রাস করে কমে।

প্রকৃতিতে বস্তু বস্তু বলের সঙ্গে আনন্দ পরিচিত তার মধ্যে এই মহাকর্ষ বল সবচেয়ে ব্যাপক। এর ব্যাপকতার কোনো সীমা নেই। ব্রহ্মাণ্ডে তদ্রূপ প্রাদুর্ভূত একটি নক্ষত্র আর আমাদের এই পৃথিবীর মধ্যে আকর্ষণ আছে; পৃথিবী কেন, আমরা বেঁধের সঙ্গেও একটা আকর্ষণ বিদ্যমান। অবশ্য আমার দেহের সঙ্গে আকর্ষণের দ্বারা খুবই কম, এত কম যে তাকে বর্তমানে মধ্যে আনা চলে না, কিন্তু তার অস্বিকারীকার করতেই হবে। সূর্য থেকে আলো আসছে, মাঝে অনেক পদার্থ দিয়ে আমরা সেই আলো অবরোধ করতে পারি, তবুও চূড়ান্ত বস্তুকেও আঁড়াল করতে পারি, কিন্তু কোনো বস্তুকেই এই মহাকর্ষ বল ধোঁস করতে পারি না।

নিউটন সিদ্ধান্ত করলেন, আকাশে বৃষ্টি, চন্দ্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি যে সব গ্রহ রয়েছে তারা এক সময় সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, আর সূর্যের সঙ্গে মহাকর্ষের বলে তারা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। অনেক গ্রহের এক বা একের বেশি উপগ্রহ আছে। ধরা যাক, আমাদের এই পৃথিবী। এক-কালে এই পৃথিবীর কিছুটা অংশ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে দিয়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। এই হল আমাদের চন্দ্র। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব হল দু’ লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল।

পদার্থের ভর ও গতি সংকে নিউটন কতকগুলি নিয়ম প্রকাশ করলেন। সে সবের মধ্যে একটা নিয়ম হল এই,—
গতিযুক্ত একটি পদার্থ (সোটা) সরল রেখায় অনন্তকাল ধরে চলবে, যদি না বাইরে থেকে সে কোনো বাধা পায়।

নিউটনের এই সিদ্ধান্তটা আর একবার বাচাই করা যাক। ঘাট ঘিরে একটা বল শিটসুম, বল ছুটল, কিন্তু কই, অনন্ত-কাল ধরে অনন্ত দূরে সে তো চলল না। চলবে কেন! নিউটনের যুক্তি একটা যুক্তি কথা রয়েছে,—‘যদি না বাইরে থেকে সে কোনো বাধা পায়’। এখন ওই বলকে দু’টি বড়ো-বাখার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রথম বাধা হল বায়ুমণ্ডল, আর দ্বিতীয়—পৃথিবীর আকর্ষণ। আচ্ছা, পৃথিবী তো তার

উপন্যাস বাহুগুণকে নিয়ে যুদ্ধের চারদিকে ঘুরছে, এই বাহু-
নগ্ন পৃথিবীর উপরে কতদূর বিস্তৃত? অস্ত্র আলোচনা থেকে
একটা মোটামুটি হিসেব পাওয়া গেছে,—চার-পাঁচ শ' মাইল।
আজ্ঞা, একটা তিল উপরের দিকে ছুঁড়ে যদি ওই ভরটা পায়-
করে দিতে পারি, তা হলে তো বাহুর ভক্ত বাগা চলে যাবে;
এখন থাকবে শুধু মহাকর্ষশক্তি; এ শক্তির জো বিলোপনাধীন
সম্ভব নয়। থাকু ওই একমাত্র শক্তি। এর কল ওই তিল
পৃথিবীকে যেটন করতে থাকবে, আর অনন্তকাল ধরে তা করবে,
যেমন চন্দ্র পৃথিবীকে যেটন করছে। কথাটা এতদিন খাতা-
কলমে ছিল, কারণ বাহুরের আয়তনের মধ্যে এমন কি শক্তি
আছে যা ওই তিলকে উপরদিকে চার-পাঁচ শ' মাইল পার করে
দেবে! আজ বিজ্ঞানের কৃতিত্ব এই, সে ওই রকমের শক্তির
সন্ধান পেয়ে তাকে কাজে লাগাল। এ হল ভেট-নামিত
শক্তি। এ সংঘে আলোচনা এখন থাক। এই শক্তিকে
এরোপ্সেনে ব্যবহার করে বিজ্ঞানী তার গতিকে অনন্ত
রকম বাড়িয়ে দিয়েছে। আর এই শক্তি, ছোটো একটা তিল
নয়, বরং হস্তশক্তি সমেত অনেক বড়ো ও অনেক বেশি ভারি
একটা অড়পিণ্ডকে পাঁচ শ' মাইলেরও উপরে ঠেলে তুলল।
সেখানে বাহুর যোগ নেই, কাম করছে একমাত্র পৃথিবীর
আকর্ষণ। কলে সে পৃথিবীকে যেটন করে ঘুরতে রাইল।
এই হল আমাদের 'শিঙীচাঁপ'। কিন্তু 'শিঙীচাঁপ' কথাটা ঠিক
হবে না। শিঙী বীরে বীরে বাড়তে থাকে, এ নবীন চাঁপ তো
বাড়বে না। একে 'যুগে চাঁপ' বলাই ভালো। এইরকম
ভাবে ওই যুগে চাঁপ কতদিন ঘুরবে? কেউ বলছেন, দু'-এক
সপ্তাহ, কেউ কেউ বলেন, না, তার চেয়ে অনেক বেশি।
কিন্তু চিরদিন নয় কেন, আমাদের চিরস্বপ্নের বড়ো চাঁপ যেমন
ঘুরে বেরাচ্ছে। সেই কথাটার এখন আসছি।

উপন্যাস বাহুতত্ত্ব

বর্তই উপরে উঠা যাবে বাহুর দলব বীরে বীরে ক্রমতে
থাকবে, ভারপর দেখা দেবে বিরাট শূন্যতা। কিন্তু এই প্রান্ত
সীমানার অবস্থাটা আলোচনা করা থাক। শূন্যতা একবারে
হঠাৎ দেখা দেবে না। বাহু যেখানে শেষ হল বলছি, ধরা
যাক দু'-শ' মাইল উর্ধ্বে, সেখানেও নিত্যকার বাহুতত্ত্ব থেকে
ছটুকে-বেরনো কিছু কিছু অভিজ্ঞান কণিকা রয়েছে। তারপর
যদি থেকে শুধু ভরস বেরিয়ে আসছে না, আসছে কতক
কতক অ্যাটমের শ'শ, বিজ্ঞানী থাকে বলেন নিউক্লিউস।
এদের রয়েছে মহাকাশগতিক গতি; এরাও খুব কণিকা;
এদের মধ্যে বেশি শক্তির ধারা তারা পৃথিবীর বাহুতত্ত্বের

মধ্যে চুক আমাদের কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। এখন ওই
যুগে চাঁপ বাহুতত্ত্বের ভেদ করে এসে প্রত্যক্ষ বেশে ঘুরতে থাকল।
চাঁপ হলেও যুগে জো বটে, কিছুটা বাগা সে পাচ্ছে, কলে তার
গতি বন্ধীকৃত হতে থাকবে, বীরে বীরে বাহুগুণের মধ্যে
প্রবেশ করবে, ভারপর ক্রমশ এত বেশি উত্তপ্ত হবে যে
সে পুরে ছাই হয়ে যাবে, দু'-এক টুকরা খাতব পদার্থ পৃথিবীতে
এসে পৌঁছতেও পারে। এখন এটা ঘটবে কতদিন পরে,
আমাদের এই যুগে চাঁপের বাহু কবে শেষ হবে? তা নির্ভর
করছে প্রাচুর্যে দেখা যে ঘুরতে আরম্ভ করেছে
সেইখানটার অবস্থার উপর।

কৃত্রিম উপগ্রহ

শূন্য কৃত্রিম উপগ্রহ পার্শ্ববর্তী চোঁা আমেরিকাও ভরছিল,
রাশিয়াও করছিল। আমেরিকা বে-বহু নির্ধাৎ করছে তার
একটা মোটামুটি বিবরণী আগেই প্রকাশিত হয়েছে, দিও
তার তৈরি উপগ্রহ আম ও আকাশে বিচরণ করেনি। বিবরণী
থেকে পাওয়া যায় যে, পর পর তিনটি মেরে রকেট তিনটিটাকে
উর্ধ্বে ঠেলে তুলবে। প্রত্যেক কেট রকেটে কোন্ কোন্
জালানি থাকবে তারও উল্লেখ আছে। কৃত্রিম উপগ্রহটির
বাস হবে প্রায় ২০ ইঞ্চি, তারে হবেক রকমের হস্তশক্তি
থাকবে, সমকটার মোট ওজন হবে প্রায় ২২ পাউণ্ড।
প্রথমে কেট রকেট ওটাকে প্রায় ৪০ মাইল উপরে ঠেলে
তুলবে, সেখানে তার বেগ হবে কটার ৩৪ হাজার মাইল
হারে। এখানে প্রথম রকেটের ইন্ধন শেষ হবে, এইবার
দ্বিতীয় রকেটের কাজ আরম্ভ হবে। এখন কিন্তু বাকি অংশটা
একটুখানি হেলে উঠতে থাকবে। এ ১০০ মাইল উচ্চতায়
উঠবে, এখন তার বেগ দাঁড়াবে বর্টার প্রায় ১১,০০০ মাইল
হারে। দ্বিতীয়টির কাজ শেষ হল, এখন তৃতীয়টি ওই
অড়পিণ্ডকে নিয়ে উঠবে বর্টার ১৮,০০০ মাইল হিসেবে।
নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছবার পর তৃতীয় রকেটটি ওকে পৃথিবীর
দলে সমান্তরালে ছেড়ে দেবে। এখন দু'-টোই উপকৃত
আকারে পৃথিবীকে কোকসে রেখে ঘুরতে আরম্ভ করবে।

রাশিয়া আগে কিছু প্রকাশ করেনি। গত ওঁা অক্টোবর
সে তার আ ছাড়ল; বাহুরের তৈরি এক চাঁপ পৃথিবীকে
যেটন করতে থাকল। কিছুদিন আগে ফ্লোরিৎ অ্যাটমের
আভ্যন্তরিক শক্তি আদরণ করে বাহুর একটা পেটো শহরকে
মুহুর্তমধ্যে ধ্বংসপূর্ণে পরিণত করেছিল। জানরাণ্ডে তার
অগণিত ক্ষতভর চলেছে। আজ অস্তরীক তার আর-এক
অপায়াত কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করল।

এই কৃত্রিম উপগ্রহটি সম্বন্ধে সব ববর এখনও পাওয়া যায় নি, তবে মোটামুটি যা জানা গিয়েছে তা এই।—এর ব্যাস প্রায় ২০ ইঞ্চি, ওজন ১৮৭ পাউন্ড। উপগ্রহ আকারে খুবচে থাকার পৃথিবীর উপর উচ্চতার তারতম্য খট্টে, গড় উচ্চতা মোটামুটি ৪৬০ মাইল। পর পর তিনটা সাতকের সাহায্যে ৬০° উত্তর দিকে, প্রথম স্তরে বেগ হুইফল ঘণ্টায় ৪,০০০ মাইল, দ্বিতীয় স্তরে ১২,০০০ মাইল ও তৃতীয় স্তরে ১৮,০০০ মাইল হয়ে। সাতকে আসামি হিসেবে কোন কোন লম্বা ব্যবহার করা হয়েছে প্রকাশ নেই। প্রথমে এই উপগ্রহ উপগ্রহ আকারে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে; এখন পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত কাছে আসবে তখন প্রান্তর বায়ু ও ভূ-চিহ্নটো বোঝা পাবে; আসার এখন অপেক্ষাকৃত দূরে থাকে তখন সে বোধ প্রায় চলে যাবে; কলে পথটা ক্রমশ বৃত্তাকার হতে থাকবে। কিন্তু সমস্ত পথটা একেবারে পর্যাভূত না হওয়ার উপগ্রহ শাইরাসে (পেঙ্গোলো ডাবে) ঘুরতে ঘুরতে বায়ুঘর্ষে প্রবেশ করবে, তখন এ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এখন যে বেগে সে পৃথিবীকে বেঁটন করছে তার প্রচণ্ডতা এই থেকে বোঝা যাবে যে, একবার প্রদক্ষিণ করতে তার সময় লাগছে মাত্র ২৮ মিনিট।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তিনিসটা যদি স্বাভাব্য ভাবে পৃথিবীতে ফিরে না আসে, যদি কোয়ার শবে পুড়ে যাওয়া অনিবার্য হয়, তবে এ স্তো উপগ্রহকার কোনো গবরই বহন করে আনতে পারবে না। ঠিক কথা। তবে কিছুটা ব্যবস্থা হয়েছে। তিনিসটার মধ্যে যে সব বস্তু আছে তার মধ্যে প্রধান হল দু'টি ট্রান্সমিটার—ইথর-তরঙ্গ-প্রেরক ঘর। ৭'৪ ও ১৫ মিটারে ওই বস্তু অবিসান তরঙ্গ পাঠিয়ে চলেছে; পৃথিবীবাণী নানা স্থান থেকে তা শরছে। যে স্তরে ওই কৃত্রিম উপগ্রহ চলেছে সেই স্তরের প্রান্তিক অকস্মাতেই তরঙ্গের রূপ বদলাবে; হুতরাং ওই পরিবর্তন বেধে সেধানকার অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যাবে। অপর ধারণা করতে পারবে শুধু তারাই যারা ওই কোড-টা তৈরি করছে। কিন্তু হুথিৎ হুত্বি ওই উপগ্রহটিকে ইচ্ছামত ফিরিয়ে আনা চলত। রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা সে সম্বন্ধে গুপ্তিগত করছেন। বর্তমানে তরঙ্গের রূপ বেধে যে গবর তাঁরা ভেদেছেন তা এই,—গননকার উচ্চতা ও বায়ুর ঘনত্ব এসবের বেরকম কল্পনা করা হচ্ছিল, তার চেয়ে অনেক কম। আর একটা প্রশ্ন এই। ট্রান্সমিটারকে চালাচ্ছে স্তো ব্যাটারি। ব্যাটারি এখন শেষ হবে তখন! তখন কি সূর্য-রশ্মির শক্তি একে চালাবে? কে জানে!

কৃত্রিম চাঁদটি যুগে। এর স্তব্ধতা পরা থাকে আশ্বাসের তরঙ্গ-গ্রাহক ঘরে 'পো পো' শব্দ দিয়ে। এখানে একটা কথা আশ্বাসের অর্থ বর্ণতে হবে। পৃথিবী পাক পেতে পেতে সূর্যকে বেঁটন করছে, হুতরাং ওই কৃত্রিম চাঁদ এখন পৃথিবীর উপর যেখান দিয়ে থাকে, পরের বাত্রে সেখান দিয়ে যাবে না। জানা গেছে যে, যে-কক্ষে এ ঘুরছে তা নিরক্ষরেখার সঙ্গে ৬৬° ডিগ্রী কোণ করেছে। কলে দুই মেকগ্রাহ চাঁদা পৃথিবীর সব ভাগটা থেকে একে বোঝা যাবে। বালি চোখে বা দূরবীক্ষণ দিয়ে দেগতে হলে, প্রত্যক্ষ বা সত্যায় এর দিকে তাকাতে হবে; কারণ রায়ে পৃথিবীর চাঁদা একে ঢেকে রাখবে, আর দিনের প্রথর হুথালোকে এ পরা পড়বে না।

বিজ্ঞানের এতরকম অবদানের মূলে কোন বিজ্ঞানী আছেন তাঁর নামটা জানতে আশ্বাসের বস্তুই ইচ্ছা হয়। নাম করতে গেলে একটা দলেরই নাম করা উচিত, তবে তারই মধ্যে যদি একজনকে বেছে নিতে হয় তাহলে নাম করতে হবে পিটার ক্যাপিভা-র (Peter Kapitza)। তারের সম্বন্ধকার একজন সেনাপতি'র পুত্র হলেন ক্যাপিভা; উদাস হিসাবে বেশ থেকে চলে এসে কমুনিষ্ট দেখান্দা করেন। পরে লর্ড রাবার্টসোর্ডের সঙ্গে মৌলিক গবেষণার হত থাকেন। রাবার্টসোর্ড এখন প্রথম অ্যাটম ডাফলেন, ক্যাপিভা তাঁর সহযোগী ছিলেন। খ্রিষ্ট বছর বয়সে তিনি রয়্যাল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। এত কম বয়সে আর কেউ বোধ হয় ওই সোসাইটির সভ্য হন নি। ১৯৩৪ সালে তিনি রাশিয়ায় বেড়াতে এসেন, সেখানে বৈজ্ঞানিক উন্নতি বিরতম হচ্ছে দেখবার অস্ত্রে। কিন্তু স্টালিন তাঁকে ইংলেণ্ডে ফিরে যেতে দিলেন না। ক্যাপিভা এখন থেকে রাশিয়ায় বাস করে সেখানেই তাঁর গবেষণাকারী চালিয়ে যেতে থাকলেন। কৃত্রিম উপগ্রহ প্রকৃতি ব্যাপারে যে কমিটি নিযুক্ত হয়েছে ক্যাপিভা হলেন সেই কমিটির সভাপতি।

কোনো দেশের বিজ্ঞানী যদি তাঁর স্বাধীনতামৈত্রিক মতামতের অস্ত্রে বিজ্ঞান অংশীদার বাধা পান, তবে তা ওই দেশেরই দুর্ভাগ্য। জার্মানি তো আফেরিকার আগেই অ্যাটম-বোমা ছাড়তে পারত, কিন্তু হিটলার এসবকে গবেষণাকারীদের বেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন, যেহেতু তাঁরা ছিলেন ইহুদী। কমিউনিস্ট ব'লে কোলিও-স্করী যদি তাঁর গবেষণার কাজে হুথোপ-হুথিবা না পান তবে তা তো ক্রান্তের অপুৎকীয় ক্ষতি। ক্যাপিভা কেবলিৎই মায়ুস, কৃষ্ণ সরকার কি তাঁকে সেখানে রাখতে পারত না?

ভারপন্ন কি?

মাগুয়ের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ তো খুবতে রইল।
এরপর কি?

মাগুয়ের বাসনা সে চাঁদে যাবে, মঙ্গলগ্রহে যাবে।
অনেকে মনে করেছেন এই কৃত্রিম চাঁদ স্থির রাখা সে
ওই পথে এক পা অগ্রসর হল। কখনো একটু বিচলিত করে
দেখতে হবে।

আকাশ ভেদ করে বাওবার ইতিহাসে আগে দেখা দেয়
ক্ষেপণাত্র। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানির কামান যে বেগে
শব্দ চলে (অর্থাৎ ঘণ্টার ৩৭০ মাইল) তার পাঁচতরু বেগে
ছুটল। যত্নসূচকভাবে এরোপেন ১৯০৪ সালে প্রথম দেখা
দেয়। সে এরোপেনের একালের চলন্ত পাখা বায়ু কার্টিয়ে-
কার্টিয়ে ছুটত। দীরে দীরে একালের উন্নতি হতে থাকল,
১৯৪০ সালে বায়ুযুদ্ধের এরোপেনের বেগ শব্দবেগের অর্ধেক
এসে পৌঁছল। এরপর এরোপেনে চালানোর পদ্ধতি বদলে
গেল। বায়ুযুদ্ধের দ্রব্য ইচ্ছন হিসেবে ব্যবহৃত হল, তার
থেকে নির্গত গ্যাস স্রব নলের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে
এসে এরোপেনে চলার শক্তি যোগাল। ১৯৪২ সালে এইভাবে
নির্মিত জার্মান রকেটের বেগ শব্দবেগের চ'ত্তবে এসে
পৌঁছল। আর এই ১৯৪৭ সালে তার বেগ শব্দবেগের
২৬ গুণ হয়েছে।

চন্দ্র উপগ্রহ পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে। সেখানে ভূ-
পদার্থ পাঠানোর কথা আগে ধরা থাক, মাগুয়ের বাবার কথা
পরে হবে। আজকের এই কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবী হতে
নিম্নস্থানে পৌঁছতে মাত্র কয়েক মিনিট নিল, কিন্তু ওই
ভূপদার্থকে যদি চাঁদে যেতে হয় তবে পৃথিবীর চাঁদ মোটামুটি
কার্টিয়ে কেসতে তার অনেক সময় লাগবে, কয়েক-কায়েই
ডাকে বহু পরিমাণে ইচ্ছন নিতে হবে। বহু পরিমাণে ইচ্ছন
নেওয়া মানে জিনিশটা আরও ভাবি হওয়া; আর ওজন
বেড়ে বাওয়া মানে আরও বেশি ইচ্ছন নেওয়া। ইংরেজিতে

থাকে বলে vicious circle, সেই vicious circle-এ
ব্যাপারটা চলবে। বর্তমানে যে ইচ্ছন ব্যবহার করা হচ্ছে
তা দিয়ে কোনো ভূপদার্থকে চাঁদে পাঠানো হতে সম্ভবপর
হবে না। হতে আরও শক্তিশালী ইচ্ছন ব্যবহার করতে হবে।
কথা উঠেছে, আটলান্টিক পশ্চিকে কি কাজে লাগানো যায় না?
তা পরীক্ষাশেষক। সে সম্বন্ধে বিশেষ করে ভাববার কথা
এই, রকেটের যে পোলের মধ্যে আণবিক বিস্ফোরণ চলতে
থাকবে তা ওই বিস্ফোরণের শক্তি সহ করতে পারবে কিনা।

এতো হল শুধু রকেট পাঠানো। এতেই অন্তর্ভুক্তি বাধা
অতিক্রম করতে হবে। মাগুয়কে নিয়ে বাবার কথা পরে
আসবে। মাগুয়ের পক্ষে অভিবিক্রম আর একটা বিপদ
আছে। একটা উদাহরণ ছুটে এসে থাকে ঠাণ্ডা করে
দেওয়া অলসব নয়। আমরা এক পা অগ্রসর হইনি বটে,
কিন্তু বেশব বাধা সামনে দেখা যাচ্ছে তা কার্টিয়ে চলা সম্ভবপর
কিনা একমাত্র ভাবীকালে বলতে পারি।

কিন্তু আর একটা ভাববার কথা দেখা দিতেছে। যে
রকেটটি উপরে উঠল, তাকে উপরে না পারিয়ে সোজা চাড়া
হল, আর তাতে খুব চাঁদ না দিয়ে ছাইভোজেন বোমা
দেওয়া হল। নির্দিষ্ট দিকে চলে নির্দিষ্ট স্থানে সেই বোমা
পড়ল। তাহলে! একদিকে সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র, অপরদিকে
নাসিক যুক্তরাষ্ট্র হ'লিক থেকে কাছটা চালাতে থাকল। তখন
তো নিশ্চিত মনে জানানোর ঠাক দিয়ে নথ নথ বকে-বকে
ও মূত দেখা চলবে না। তখন

‘স্থানের আরম্ভ সময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার,
স্বপ্ননের ধ্বংস যুগান্তের
রহিল অসীম হস্তাশন।’

তা হোক গে। আর পায় যাচ্ছেনা! এ সত্তাহেও
২৬ টাকা মূল্য চাল কিনতে হয়েছে।

কার্তিক সন্ধ্যার আকাশ

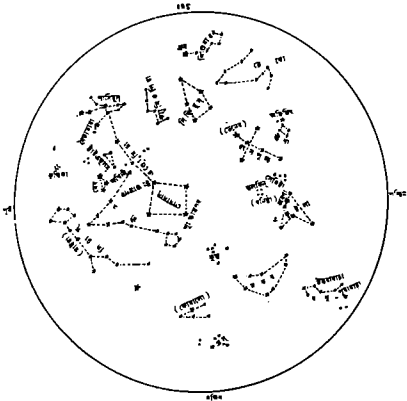
ঐকামিনীকুমার দে

আকাশ বেশ পরিষ্কার। গতরাত্রে নক্ষত্রমণ্ডলসমূহকে
যে অবস্থানে দেখিচ্ছি—এখন তাহার তাহার প্রায় ৩০ ডিগ্রী
পশ্চিমে আদিত্যে এক পূর্বাংশে নূতন নক্ষত্রমণ্ডল দেখা
দিয়েছে। আগে পূর্ণচন্দ্রিতি মণ্ডলসমূহ একবার দেখিয়া লই।

কার্তিকে সূর্য তুল্যরশ্মিতে, তুল্যরশ্মি সূর্যের সন্ধ্যাই
অন্ধ সিরাছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে তুচ্ছিকরশ্মিও অনেক
নীচে; ধূসরদিকে দেখা যাইতেছে। ধূসরদিকের যে
পাটতি তারা একটি প্রহরিকের আকারে আছে, তাহারে

পশ্চিমে চারাগণ অত্যাচ্ছন্ন বেঘের মতো; এখানে পালি চোখে অগোচর জাহার ভিত্তি খুব বেশি। ধহর উপরে কিছু পূর্বদিকে মকর এবং তাহার উত্তর-পূর্ব দিকে হৃৎকরাশি মধ্যরেখা অতিক্রম করিতেছে। পেগাসাসের সমস্ত চতুর্ভুজ-আকৃতি এখন অনেক উপরে, আর কিছু সময় পরে ইহা প্রায় মাঝের উপর আসিবে। ৮ই কাতিক রাতে প্রায় ২টার

কাতিক দৃষ্টিতে দৃষ্টমান দিগ্বিশু, ক্যানিওপিস, এণ্ড্রোমিডা, পাদিগ্লু, পেগাসাস, মিটাস্ মণ্ডলের নাম গ্রীক পুরাণের গল্পের সহিত জড়িত। দিগ্বিশু রাজা, ক্যানিওপিসা রানী এবং এণ্ড্রোমিডা তাঁহাদের পরমাত্মকরী কন্যা—কন্যার রূপের তুলনা নাই, রানী একজন খুব গর্ববোধ করেন। রানী বলেন, দেবরাজের সভার অমর্যাসেরও এমন



এই চতুর্ভুজের পশ্চিম বাহ ও দক্ষিণে প্রথম প্রভার ফোমালটো (Fomalhaut) তারা মধ্যরেখার উপর থাকে। পেগাসাসের দক্ষিণে যীনরাশির পাঁচটি কৌণপ্রভ তারা একটি পঞ্চভুজ-আকারে অবস্থান করিতেছে। এখান হইতে যীনরাশির অল্প তারাসমূহ পশ্চিমে এক রেখার চলিয়া নিম্না আবার উত্তর-পশ্চিমে এণ্ড্রোমিডা-মণ্ডলের দিকে দিরাছে। একইসা, জলকিন্, সেমিটা, হংসপুঙ্খ, বীণা মণ্ডলকে পশ্চিমাকাশে দেখিতে পাইজেছি। হার্কিউলিস্ নীচে নাথিরাছে।

রূপ নাই। ইহাতে অমর্যাগণ বাসিয়া অস্থির। দেবরাজকে বলিলেন—রানীকে শান্তি দিতে হইবে, তাহার অহংকার হূর্ণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে দেবরাজ মিটাস্-রাক্ষসকে পাঠাইলেন, রাক্ষসের মিটাসের ভীষণ অত্যাচার চলিল—চারিদিকে দাহ্যকার। এণ্ড্রোমিডাকে বাস্তবদিশ-রূপে পাইলে তবেই মিটাস্ চলিয়া গাইবে। অগত্যা এই বদিতরূপে এণ্ড্রোমিডাকে পাহাড়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইল, বীর পাদিগ্লু এক অভিযান-মেখে পশ্চিমাগ্নি ঘোড়া পেগাসাসে

চড়িয়া সেই বশে ফিরিবেছিলেন। নারীর আতঙ্কন জনিয়া তিনি নাথিবা পড়েন এবং সিটাস্‌ আশিমে তাহাকে বধ করিয়া এণ্ড্রোমিডাকে উদ্ধার করেন। ইহাড়া আকাশে নক্ষত্র-মণ্ডল ইহাড়া বিরাজ করিতেছেন।

সিকিৎসু-মণ্ডল মথারণা অতিক্রম করিতেছে। তাহার পূর্বদিকে ক্যাসিওপিয়া-মণ্ডলে পাঁচটি তারা W-এর আকারে আছে। এখানে ছয়টি তারা লইয়া কেহ কেহ একটি 'চেয়ার' কল্পনা করেন। রাণী চেয়ারে উপবিষ্টা, তাহারই পাশে 'বিশব' রাজা। শীপগ্রভ তারার মণ্ডলকে সিকিৎসু নাম দিয়া যেন রাজার অঙ্গার অববাহী প্রকাশ করা হইয়াছে।

এইবার আমরা পূর্বাংশে অবস্থিত মণ্ডলদ্বয়ের সহিত পরিচিত হইব। পার্দিবুস্‌। আবার দেখিরাছি—পেগাসাস্‌-চতুর্ভুজের উত্তর-পূর্ব কোণের তারাটি এণ্ড্রোমিডা-মণ্ডলে। বর্ণক্ষেত্রিক ঘূড়ি মনে করিলে, এণ্ড্রোমিডার এই তারা এবং আর দুইটি তারা ঘূড়ির লোমের উপর। তার পর চতুর্থ একটি তারাতে গিয়া ঘূড়ির লোম শেষ হইয়াছে। এই তারাটি পার্দিবুস্‌-মণ্ডলে। ছায়াপথের উপরে পার্দিবুস্‌-মণ্ডলের কতকগুলি তারা ধরুর তীরের মতো ক্যাসিওপিয়া-মণ্ডলকে লক্ষ্য করিয়া আছে। এই মণ্ডলে আল্পস্‌ বা দৈত্যতারা প্রসিদ্ধ (ক্রিস্‌সাহায্যে ইহাকে চিনিতে পারা যাইবে)। দুইমিনি একুশ ঘণ্টা অধর ইহার উজ্জলতা করিয়া প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হয়। আর একটি শীপগ্রভ তারা দৈত্যতারার চারিদিকে ঘুরিতেছে। যখন ইহা দৈত্যতারা ও আনন্দের মাঝখানে আসে তখন দৈত্যতারার উজ্জলতা ঢাকা পড়ে। প্রাচীন জ্যোতিষীরা ইহার উজ্জলতার পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া ইহার নাম দিয়াছিলেন দৈত্যতারা—যেন দৈত্যের মতো আকৃতি বসল করে।

আগষ্ট মাসে যে উভাণ্ডত হয়, তাহাড়া পার্দিবুস্‌-মণ্ডলের দিক হইতে আসে বলিয়া মনে হয়। এইজন্য এই উভাণ্ডদ্বয় পার্দিবুস্‌ নামে পরিচিত।

টাইএক্সল্‌ ও মেঘ। এণ্ড্রোমিডার পূর্বদিকে তিনটি তারা এক ত্রিকূলের আকারে আছে; ইহাড়া টাইএক্সল্‌ (Triangulum) বা ত্রিকূল নামক একটি ছোট মণ্ডলের তারা। ইহার কিছু পূর্ব-দক্ষিণে মেঘরাশি। এখানে তিনটি তারাকে এক ছোট মণ্ডলকণী ত্রিকূলের আকারে দেখা যাইবে। এই ত্রিকূলাকৃতি মেঘরাশিকে চিনিবার সাহায্য করে।

ইহাদের মাঝের তারাটি অশ্বিনী। টাইএক্সল্‌য়ের পূর্বদিকের মেঘরাশির আর তিনটি শীপগ্রভ তারা এক কাষগায় মেঘা যাইতেছে; এখানে ডব্লী নক্ষত্র। এখন মেঘরাশি প্রায় সোঝা পূর্বদিকে। সিটাস্‌। পেগাসাস্‌-চতুর্ভুজের পূর্বদিকের বাহকে দক্ষিণে বাড়িয়া গিলে এই বাহুর ষিগুপ্ত দুই একটি মাঝারি উজ্জল তারা দেখিতে পাওয়া যাইবে। দিকট আর তেমন উজ্জল তারা নাই বলিয়া ইহাকে বেশ উজ্জল মনে হয় ও ইহা সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা সিটাস্‌-মণ্ডলের সর্বোচ্চল তারা। ইহার উত্তরে পাঁচটি তারা একটি প্রস্তরোপক চিকুর আকারে রহিয়াছে। পূর্ব-উত্তর দিকে প্রায় তিনগুণ দূরে পাঁচটি তারা পঞ্চভূজ-আকারে দেখা যাইবে। ইহাকে গ্রীক পুরাণে বর্ণিত সিটাস্‌-মণ্ডলের মন্তক বলিয়া কল্পনা করা হয়। দুই আকৃতির প্রায় মাঝখানে মাইরা (Mira) বা 'আন্দর-তারা'। এই লাল রঙের তারাটি তখনও বেশ ভালোভাবেই দেখা যায়, আবার ইহার উজ্জলতা এত কমিয়া যায় যে তখন ইহাকে বালি চোখে দেখাই যায় না। এগারো মাস অধর ইহার উজ্জলতা একবার করিয়া বাড়ে। সিটাস্‌ একটি বৃহৎ মণ্ডল—পূর্ব-দক্ষিণ আকাশের অনেক দূরত্বা ছড়িয়া আছে। উজ্জল চন্দ্রালোক না থাকিলে, ক্রিস্‌সাহায্যে এই মণ্ডলকে চিনিতে অবশিষ্ট হইবে না।

সন্ধ্যার কিছু পরে পূর্বদিকে একজারগায় ছত্র-মণ্ডলটি তারার ভেলা (মাথারপত: ছয়টি তারা দেখা যায়)—সাতভাই কৃত্তিকাকে দেখা যাইবে। কৃত্তিকাশির প্রথম প্রজার তারা বোধিগীও উদিত হইবে। এই মাসে পূর্বমার চন্দ্র কৃত্তিকা-নক্ষত্রে থাকে, সেইজন্য মাসের নাম কার্তিক। কৃত্তিকাশির পরিচয় অগ্রহাষণ মাসে দেওয়া হইবে।

প্রথম প্রজার অভিজিৎ, শ্রবণা, তেমনব, কোমালো তারাকে আর একবার দেখিরা হই। সূর্যের অবগম্যে কৃত্তিক, ধরু, মকর, কৃত্ত, মীন, মেঘ—ইহাদেরও আর একবার ভালো করিয়া দেখি। চন্দ্রের শ্রবণপথে ধরুশাশির পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল, এক্সিলা-মণ্ডলের শ্রবণা, বনিটা, শতভিষা, পূর্বাভ্রশ্রবণা, উত্তরাভ্রশ্রবণা, রেবতী, অশ্বিনী, ডব্লী, কৃত্তিকা নক্ষত্র প্রকাশমান থাকে।

গ্রহদের মধ্যে শুক্র ও শনির পূর্বাংশে দেখা যাইবে। শনি কৃত্তিকারদিকেই আছে। শুক্র মাসের প্রথমদিকে কৃত্তিকে এবং শেষভাগে ধরুশাশিতে থাকিবে।



ଦଃସାଲୀର ଅଭିନନ୍ଦନ



ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ରେଳଠାର

কৃষি প্রদর্শন

শাকসবজির চাষ

‘চাষাভাই’

চূর্ণাশুষ্কার পেসে শরৎকালের বিলাস দেবার সময় এসেছে—আকাশে বাতাসে ঈতের একটা আবেশ; হাওয়া আর অহটা ভোলো নেই। ঈতের শাকসবজি লাগানোর এই হোল প্রণয় সময়। ঈতের সবজির চাষে ভূমি খুব পরিষ্কার এবং আগাছা-মুক্ত রাখতে হয় এবং বর্ষার পর এই সময় থেকেই মাটি ক্রমেই শুকনো হয়ে উঠতে শুরু করে। এই কারণেই আগাছাও তেমনি ব্যাপকভাবে এই সময় বিস্তার লাভ করতে পারে না। কিন্তু আবার এই একই কারণে অনিতে সেচ দেবারও প্রয়োজন হয় এই সময়ে।

পূজার অবকাশ থাকা পুরো উপভোগ করেছেন তাঁরা। হতাশ হবেন না, কারণ এখনও ঈতের সবজি লাগানোর খেতে সময় আছে।

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে বেশ সব সবজি লাগানো চলতে পারে তার কথা বলা হোল—

কার্তিক : বরবটি, বেগুন, বিলাতী বেগুন, বীন (বিলাতী শীম), শাক, পেঁয়াজ, মুলো, ফুলকপি, বাগাকপি, ওলকপি, শালগম, গাজর, লেটুস, মটরশুটি, লাউ, কুমড়া, লশা, তরমুজ, ছুটি, ধরদুহা ও মিষ্টি আলু।

অগ্রহায়ণ : আলু, বেগুন, বিলাতী বেগুন, শাক, পেঁয়াজ, মুলো, ফুলকপি, বাগাকপি, ওলকপি, শালগম, গাজর, লেটুস, মটরশুটি, লাউ, উচ্ছে, পটল, তরমুজ, ছুটি, ধরদুহা।

বরবটি, লাউ, কুমড়া, লশা, তরমুজ, ছুটি, ধরদুহা, উচ্ছে : গোল গর্ত করে ১ ফুট গোবর দার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে কিছু দূরে দূরে ৪৫টি পুই বীজ বসাতে হয়। প্রত্যেক গর্তে ২১টি সন্তোষ চারা রেখে বাকিগুলি উঠিয়ে কেলেতে হবে, নইলে কোন গাছই জোরালো হবে না এবং ভালো ফল দেবে না। গর্তগুলো ১৫ হাত থেকে ২ হাত ব্যাসের এবং হাতখানেক গভীর করে সুপিয়ে তৈরি করা উচিত এবং গর্তগুলো ৩০ হাত অন্তর করা উচিত। তরমুজ, ছুটি, ধরদুহা মাটিতেই লাভার এবং ফলগুলো বাতে শুকনো থাকে

সেবস্ত নীচে অনেক সময় বড় গিরে দেওয়া হয়, বাকী সব মাচায় তুলে দেওয়া প্রয়োজন। ঘর, বাড়ির চাদ বা টিনের চালেও গাছ উঠিয়ে দেওয়া যায়। গাছ সন্তোষ না হলে সামান্য পরিমাণ অ্যামোনিয়াম সালফেট ভালো ভুলে ছাঁকিয়েত করে দেওয়া যায় অথবা হাতে করে বাকিটো পইলও দেওয়া যায়। এ ছাড়া সামান্য পরিমাণ হাড়ের গুঁড়া অথবা স্তন্য-কলকোট দেওয়া চলে। বরবটি বা শীম ভাতীয় গাছ বাতাল থেকে নাঃটোজেন গ্রহণ করে তাদের শেকড়ের ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে। কাজেই তাদের বেলায় কেবলমাত্র হাড়ের গুঁড়া বা স্তন্য-কলকোট দিলে এবং কাঠের চাই অথবা সামান্য পটাশ দার দিলে এতেই ফল পাওয়া যায়।

গাছ বড় হলেই রাসায়নিক দার দেওয়া উচিত এবং গোবর বা কম্পোস্ট দার দেওয়া ভালো।



ওলকপি

বেঙুন, বিলাতী বেঙুন : এক হাত অল্প বের হাত দুই দুই লাইনে চরা লাগাতে হবে। বিলাতী বেঙুনের তরু তেঁকুনার প্রয়োজন। বিলাতী বেঙুনে কঠোর ছাই অভাবে পটাপ সার তিলে বেশী ফলন পাওয়া যায়।

ফুলকপি, বাঁধাকপি : চরা দেড় হাত দুই লাইনে ১ হাত অল্প লাগানো হয়। আরও ঘন লাগানো যায়।



ফুলকপি

গাছ বড় হলে সামান্য পরিমাণ খটল এবং হাড়ের গুঁড়া অথবা তার পরিবর্তে ক্যালসিয়াম সার দেওয়া চলে। ফুলকপিতে অ্যামোনিয়াম সালফেট কম দিলে ফলফট সার বেশী এবং বাঁধাকপিতে ঠিক তার উলটো ঘটে হয়।

ফুলো, ওলকপি, শালগম, পাছর, লেইস : পোনে এক হাত অল্প লাইনে বসাতে হবে। এসে বোদা,

গাছ বড় হলে, কিছু খটল অথবা খুব অল্প পরিমাণ অ্যামোনিয়া সার এবং কঠোর ছাই অথবা পটাপ সার জুলির (জলনাসী) মধ্যে দিলে দিতে হয়। ফুলো সাধারণতঃ ছিটিয়ে বোনা হয় এবং জন্মেই গাছ উঠিয়ে কতকগুলোকে বড় হবার জন্য জমিতে রাখা হয়।

মটরগুঁটি : এক হাত দুই লাইনে একবিঘত অল্প বীজ বসাতে হয় এবং গাছ বড় হলে প্যাকটি অথবা বাশের চাচ দিলে কাকরি করে দিতে হয়। মটরগুঁটি নীম-জাতীয় গাছ।

পটল : ৩৪ হাত অল্প গর্তে ৩ হাত দুই লাইনে লতার ইকরো লাগাতে হয়। লাউ-কুমড়ার মতো পটলেরও পুতন এবং শ্রী ফুল আলাপ। এইসব ফলের ফলন অনেক বাড়বে যদি বাড়ীতে মৌচাক থাকে, কারণ পরাগ-সন্ধানী মৌমাছি নিজেদের অজান্তেই একই জাতের গাছের ফুল ফলে দুই শ্রী-ফুলগুলিকে নিষিক্ত করে। অনেক সময় তুলির সাহায্যে পুরু-ফুল থেকে পরাগ নিয়ে শ্রী-ফুলের গর্ভভূতের উপর দিলেও অনেক বেশী ফলন পাওয়া যায়।

ছিটি আলু : পোনে দু'হাত থেকে দু'হাত অল্প লতার ইকরো লাইন বসাতে হয়।

আলু : এক হাত থেকে পোনে দু'হাত দুই লাইনে পোনে এক হাত অল্প বীজ-আলু গোটা অথবা চোখ বেখে কেটে লাগানো হয়। আলুর প্রচুর সারের প্রয়োজন এবং একর-প্রতি বাঙ্গালীতে ১ মণ নাইট্রোজেন, ১ মণ পটাপ এক ২ মণ ফসফেট প্রয়োজন। আলুর মাত্র মিশ্র সার বাহারে পাওয়া যায়।





পুস্তক-সমালোচনা

৷ ভারত জিজ্ঞাসা ৷

[খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ১৮৮৭। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০০০০। প্রকাশক : বিজ্ঞান, ১০০-এ বামবিহারী এডিন্টি, কলিকাতা ২০। মূল দ্বিগ টাকা।]

গ্রন্থকার ভারতীয় সংস্কৃতির অমূল্যমহিত তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি শিক্ষাস্থের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার বেশে যেমন একদিকের যজ্ঞাতি-প্রেমের রসে দিল, তেমনই সত্যের প্রতি নিরীকণত সংকীর্ণতা বোধ হইতে বিশ্বকিলাভ করিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে লিখিত গ্রন্থের সমষ্টি হইলেও, এগুলির মধ্যে একটি সাধারণ ভাবগত ঐক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

সেই মহাশয় বাস্তবিক হইতে বরীন্দ্রনাথ, বুদ্ধ হইতে বিবেকানন্দ, তিলক হইতে স্বাভাষচন্দ্র—সকলের বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। সকলগুলি ২-সম হইয়াছে, ইহা বলা

চলে না; তথাও বাস্তবিকও নহে। তথাপি এইসকল মননীয় বা করণীয়গণের আলোচনাগ্রন্থে তিনি পাঠ্যসংস্কৃতির মূল যোগ্যের অঙ্গসম্মানের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়।

ভারতীয় সংস্কৃতির পুণ্ডিত বর্ণন দিল্লীর পুস্তকখানি গ্রন্থকর্তা সম্বরণ। প্রাচ্য-পশ্চাত্যের সমান তুলনাও ইহাও বলা চলে না। তথাপি উভয় বিষয়ের উপরে যে আনন্দিক আলোকপাত গ্রন্থকার দ্বারা বিদ্যাবৃদ্ধি হইতে করিয়াছেন, তাহার মূল পুস্তকখানি বাংলায় পাঠকের নিতট আনন্দবিশ হইবে।

—নির্মলকুমার বসু

দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোম্পানি

প্রাইভেট লিমিটেড

পুস্তক-বিক্রেতা (স্থাপিত ১৮৮৬)

৪৪-৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ফোন : ৩৪-৩৮৭৫



চিত্রলোক

পদনাত

হারানো স্বর

আলোচ্য প্রজ্ঞাভরণ-এর পক্ষে উত্তমস্থায় প্রযোজিত। চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা : অতর কর। সংগীত পরিচালনা : হেমন্তমহার মুখোপাধ্যায়। ভূমিভূমণ : হুটিয়া সেন। উত্তমস্থায়, শাহাঙ্গী সন্তোষ, সীমক মুখোপাধ্যায়, উৎপল নন্দ, শিশির বটব্যাল, প্রীতি মধুমহার, ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী, শ্রাবণী চৌধুরী, নবাবতা কাজরী ওঃ এঃ আতা অনেক।

বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী অলক মুখোপাধ্যায় স্বভিন্নঃণে বোলে আকাশ হতে আসে চিকিৎসার ভণ্ডে। কিন্তু তার তারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের জড় আচরণে তার স্বভিন্নঃণি কিসের পাথর কোনো লক্ষই নেবা দায় না। হাসপাতালের আরেকজন চিকিৎসাবিদ্বি রমা বাম্পোপাধ্যায় তার প্রতি লক্ষ্যকৃতীল ব্যবহারের ভণ্ডে অগুরোণে আনায়। এর ফল হয় উল্টো। চিকিৎসকটি রমার প্রতি অনিষ্ট আচরণ প্রকাশ করে তার কাছে অন্যকার হৃদয়কণ কর্তে বারণ করে। কতৃপক্ষের জড় আচরণে রমা হাসপাতালের কাছে ঈষক নেয়। ইতোমধ্যে প্রবল কড়ললের জুরোণে স্বভিন্নঃণিইন অলক হাসপাতাল থেকে শালিঃে ঘুরতে ঘুরতে রমার বাড়িতেই এণে ছাঃির হয়। জাতিবিব্রল অলকের কাতর অগুরোণে রমা তাকে হাসপাতালে না পাঃিরে সখে করে নিয়ে চলে যায় পলাপপুরে। সেখানে থাকেন তার বাবা। বাবার কাছ থেকে অহুহতি মিরে হাতুহীন রমা বিচিঃ-মানসিক-হোণগ্রঃ অলকের স্বভিন্নঃণি কিসিরে আনর কাছে আনয়িঃাণ করে। অপর অলককে শুধু চিকিৎসাঃ নয়, পঠীয় প্রেমো ও নন্দতার সজীবিত কর্তে সে পঠিপূরঃে বঃনে ধরা দেয়। শিন কেটে চলে হাসি ও আনন্দের মণ্যে নিরে। কিন্তু ভাগ্যের শিঃুর পরিহাঃে এই আনন্দ স্বীঃবায়ী হোলেো না। রমার সাময়িক অঃপণিঃিতঃ হঃমোণে বাইরে একা গিরে পথে মোটাঃ-জুঃটিনায় পঃঃে অলক। আঘাত পায় সে সামাজ্যই। কিন্তু সেই আঘাতেই সে কিসে পায় তার হারানো অজীতকে। আবার সেইসঙ্গে বঃমনকে বিঃবৃত হয়। সে

কিসে যায় কোলকাতায় তার পূঃবজীবনে। আকস্মিক বিপদে বৈঃহাঃা না হঃে রমাও চলে আসে কোলকাতায় অলকের সখ্যানে। বহু চেষ্টায় খুঁতে পায় তাকে। বৃকতে পায় অলকের এই বিঃবরণ কণটতা নঃ। সাময়িক দুঃহ হান নেয় রমা, কিন্তু কণটিঃে নয়। পঃর্জনন হঃে অলকের জাঃী মালাকে আসে পতঃে। অস্বাস্থ্যভাবে সে চেষ্টা করে অলকের পলাপপুরঃে স্বভিঃে কোরতে। এই প্রঃেষ্টায় বাধা আসে অলকের বাপুঃতা সজার কাছ থেকে। সজা অস্বাস্থ্যঃ হয় রমার গ্রঃাসে। অবশেষে অলকের মায়ের সাহাঃ্যে সে রমাকে গিরিরে কোল অলকের সাঃিধ্য হতে। রমা কিসের দায় পলাপপুরে। এদিকে রমার চলে যাওয়ার লুঃাঃ তনোো অলক। তঃেও স্বঃতা কিছু হোতো না। কিন্তু কখন সে শোনে রমা গিরেতে পলাপপুরে, তখন তার মনের মধ্যে কিসের কেন একটা খোঁজা লাসে। মনে হয়, তার জীবনের হারিঃে-যাওয়ার কতকগুলি মিরের রহঃ্ত গুপ্ত হঃে আছে পলাপপুরে। তখনই সে রওনা হয় পলাপপুরঃে উঃমঃে। এখানে এসে তার স্বভিঃ সজীবিত হয়, মনে পড়ে রমার কথা। তখনই সে কোটে রমার কাছে। ছুটি ছঃঃ আবার কাছে আসে। ছিরবীণার তঃীতে আবার বেঃে ওঠে হারানো স্বর। মোটাঃটি এই হোলেো কাহিনী।

চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপঃন্তক চট্টোপাধ্যায়। খুব সন্তঃত একাধিক ইংরেজী চিত্র-কাহিনী থেকে না বলে নেওয়ার ভণ্ডে কোনো সাঃণাঃ কাহিনীকারঃের নামোঃরণ নেই। স্বঃিতা সেনের হঃলঃঃত অভিনয়ই ছবিটির একমাত্র প্রসাদঃণ। হাসপাতালের ডাক্তার-চরিত্রে উৎপল নন্দ বেরকম অভিনয় করেছেন তঃতে লোকের মনে সখেঃে ভাঃা বাভাবিক যে—আসলে কে যোঃী, তিনি না অলক। কতকগুলি আঃণায় অযাভাবিকতা থাকার ভণ্ডে ছবিটিকে যোঃবুঃত বলতে বাঃে। আলোকচিত্র-গ্রঃণ অযাভাবিক-রকম ভাঃো। তবে দৃঃশট-রচনাঃ কাটা হাঃেরে ছাপ লক্ষ্য করা গেল। বিশেষ করে যে কুলপাঃের নিঃত অলক রমার

কবীতে দাম্পত্য পরিবে যিহে দেই দুস্তর পরিবেশ ঘন
বায়েজারী সর্বকর্তা পুকার পাখ্য সাজানোর কথা মনে
করিয়ে বের। অনেকের ঘোড়ার দাঁকা খাওয়ায় দুখ ঘোটেই
পাখ্যাবিক নয়। উন্নয়নকার্যে অভিনয় হয়েছে ঘোড়াখুটি।

ওগো শুভছো

এমকজি প্রোডাকশন-এর সঙ্গে হুদীল বহু মল্লিক
প্রযোজিত। সম্পাদনা ও পরিচালনা : কমল সন্ধ্যাপাধ্যায়।
কাহিনী : পাচু-গোপাল মুখোপাধ্যায়। সংগীত-পরিচালনা :
অমিল বাগ্‌টি। রূপায়ণ : কালী সন্ধ্যাপাধ্যায়, ভাষ্কর
সন্ধ্যাপাধ্যায়, অরুণ গাঙ্গুলী, অরুণ রায়, অরুণকুমার, ভানু
নাথ, নবীন হালদার, অভিত চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী,
জুয়ে, পদ্মা, জয়ন্তী সেন, হুমিতা সন্ধ্যাপাধ্যায়, গোড়া সেন,
বাহী গাঙ্গুলী, শীতল সন্ধ্যাপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

মনোহর বোল-কোম্পানির বড়বাবু, ললিতা তার স্ত্রী।
কণোত-কণোজীঘ মিলালা নীচের মতো তাদের দুজনের
সংসার। মাঝে মাঝে হঠাৎ অভিনয়ের কড় ওঠে—কিন্তু
মিলিত বাহ একের বাহবন্ধনে অপর দ্বারা সেওয়ার মধ্যে
মিলে। কিন্তু কল্যাণে যে একদিন দেখা যিহো তাদের সুখের
সংসারে। মনোহরের দুই সহকর্মী এক চিঠি দিয়ে বললো
অফিসে লেগি-টাইপিস্টকে। এই বাহপারের প্রতিকার করবার
আখ্যাস দিয়ে মনোহর টাইপিস্ট মানসীর উদ্দেশ্য লেখা। তার
সুখেই আরো দুট হোলো এমন কাজের চাপে মনোহরের
বোল সেরি হতে লাগলো অফিস থেকে ফিরতে। বন্ধুর
পরামর্শ ললিতা মনোহরের অফিসেই চাকরি নিলো—উদ্দেশ্য
তার উপর নতুন রাখা। মনোহর হঠাৎ তার পরিচয়
জানিয়ে দিলো মালিক বোল-সাহেবের কাছে, যদি না তার
নিয়ম থাকতো এক-অফিসে বাসী-স্ত্রী কাজ করতে পারবে
না। অনেক চোঁক করেও মনোহর ললিতাকে নিষেধ করতে
পারলো না চাকরি নেওয়া থেকে। কলে, ঠেং হারিয়ে
মনোহর বাড়ি ছেড়ে উঠলো গিয়ে বন্ধু নীলুর বাড়িতে।
তাতেও রেহাই নেই। একই অফিসে পাণ্যপানি কলে খাচ্চ
করতে করতে পরস্পরের কাছ থেকে নিজেকে লুইয়ে রাখার
প্রচেষ্টা প্রাণান্তকর হয়। মাঝে মাঝে বানচাল হবারও

অন্ত সকলে চলনই। গান হুশানি হুশীত হলেও, প্রথম
গানটির সঙ্গে টেটনভা না বোলার সঙ্গে বড়ই দুইকটু হয়েছে।
সবকিছু মিলিয়ে 'হাসানো হর'কে আর পাচটা বাংলা চবির
থেকে একটু ভালো বলা যেতে পারে, তার বেশি নয়।

উপক্ৰম ঘটে। এর মধ্যে ঘটনা উঠলো চলেই এমন বোল-
সাহেব বিলেত দাবার আগে তার অফিসের সব কর্মচারীদের
নিমন্ত্রণ করলেন। শুধু তাই নয়, হুমু বিলেন সকলকে
সমীক আসতে হবে। মনোহরের মাধ্যমে বাহ জেড
পড়লো। ললিতা মিলেশ বোসের সঙ্গে তার বাড়িতে
ব্যারাকপুরে চলে গিয়েছে। অপর মনোহরকে সমীক যেতে
হবে। বন্ধু নীলুর পরামর্শমতো পকাশ টাক। পরিগ্রহিক
আয়োজনার প্রবেশ অভিনয়ী রীণা মল্লিককে নিয়ে গেল সে।
ললিতা ভীষণভাবে চমকে গেল মনোহরের ভাড়া-করা হাউ
সেখ। মনোহর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুযোগ খোঁজে ললিতাকে সব কথা
খুলে বলতে, কিন্তু সুযোগ মেলে না। অবশেষে বাড়ি ফেরার
ভাগ্যলগ্ন অর্থেই হয়ে রীণা মল্লিক সব ঠাস করে নিলো।
তখন ললিতাও সব স্বীকার করলো বোল-সাহেবের কাছে।
মিলেশ বোসের হাজিরকমে কাকর চাকরির গেল না। সব কুল
বোকাবুদ্বিগ্ন পালা শেষ হোলো। এই হোলো কাহিনী।

ছবিটি হাসির মনে, এটি ইচ্ছা হতো ছিলো প্রযোজক এবং
পরিচালকের। কিন্তু চিত্রনাট্যকারের অশুভুতার প্রভে এটি
একটি হাস্যকর ছবি হয়েছে। কোনো কাণ্ডোমানস্পন্ন বাহাল-
মায়ের অফিসে যে এইরকম ভাবে কাজকর্ম চলতে পারে তা
জানা ছিলো না। বাংলা ছবির অধিকাংশ কৌতুক-
অভিনয়তাকেই এই ছবিতে দেখানো হয়েছে, যদিও তাদের
শুধু মনের মধ্যেই আগমন। ললিতা ছবিটি দেখতে দেখতে এতো
বেশী বাহবস্ততার সম্মুখীন হতে হয়েছে যে মাঝে মাঝে মনোহর
কেগেছে পরিচালকের মাধ্যমে ঠিক আছে তো? ঘটনা-
বিব্রলে কেনোয়কম মনোহর নাহি। বেন কতকগুলি দৃশ্য
ঝোড়োখাণি দিয়ে লাখানো। পরিচালক কমল গাঙ্গুলীর
থেকে সম্পাদক কমল গাঙ্গুলী কতো যে বেশী তিরিকর্মী তার
পরিচয় সারা বই ছুঁছে। আলোকচিত্র-গ্রহণ অতি সাধারণ
ছয়ের। গানগুলির মধ্যে পুহলো অনেক ছয়ের বেশ পাওয়া
গিয়েছে। কালী সন্ধ্যাপাধ্যায়, মজু দে, ভাষ্কর সন্ধ্যাপাধ্যায়
ও অরুণকুমার বেশ বাস্তবিক অভিনয় করেছেন। অগ্রঃতনের
অভিনয় চলনই। কলাকৌশল ও অস্ত্রঃত আধিক্যের মধ্যে
এমন কিছু নেই যে, অস্ত্রঃত তার মৌল্যে ছবিটি কিছু প্রদংশা
দাবি করবে।

। আ গা নী আ র্ ক ব ণ ।

বাংলা ছবির বাজারে এখন পুরো মরহুম। প্রত্যেক ঠাট্টায়েতেই এগিয়ে এসেছে অনেকগুলো করে ছবির কার। বাজতর অর্থ নেই শিল্পী ও কলাকৃশণীদের। বিধবস্ত ও অস্বিকের দিক থেকে অনেক কিছু নতুনই দেখতে পাবেন চিত্র-রসিকেরা; এমন আশা করা অগ্রহণ্য হবেনা। বিশ্বের সর্বব্যাপ্তে পর পর কতকগুলো চমৎকার অর্জন করার ফলে বাংলা ছবির নির্মাতারা নতুন ভাবে অগ্রপ্রাণিত হয়েছেন। তাঁদের নবোদয় প্রাণের জোয়ার এমন দিয়েছে বাংলা ছবির বাজারে। দিক দিক তাই কর্মবাজতর লাড়া। এ কথা বললে অগ্রহণ্য করা হবে না যে, এইসময় নির্মিতব্য ছবির মধ্যে অল্প কয়েকটি আত্মজীবনিক দাবী অর্জনের সম্ভাবনা অস্বস্তিত হলে। বাংলা চিত্র-রসিকদের কাছে আগামী আকর্ষণ হিসেবে নির্মিতব্য কতকগুলো ছবির পরিচয় নিচে দেওয়া হলো :

শিকার

সত্যনাথের 'আমের ঘর' ছবি তুলে শ্রাননাথ কিশোরের প্রচেষ্টা গোপাল বর্দন ও পরিচালক মনস চক্রবর্তী যে স্থান অর্জন করেছেন তা আরো বেড়ে বাবার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁদের পরবর্তী ছবি 'শিকার'-এর মধ্যে। এর কাহিনী লিখেছেন রাসবিহারী লাল; আগামের ঘর অল্পসংখ্যক মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে তোলা হবে ছবিটি। দুর্গম অল্পসংখ্যক প্রান্তিক পরিবেশের মধ্যে দ্বিগুণ জন্তু-জানোয়ার শিকারের ঘটনাই এই-ছবিটির মূল কাঠামো। ঘনজলিবিট অরণ্যাবীর মধ্যে যেখানে মানুষের পক্ষ বাওয়া হুস্তিম, সেখানেও গিরে ছবি তুলবেন এর নির্মাতারা। অবশ্য এই কাজের জন্য সাহায্য দেওয়া হবে ফেলিকটোরের। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফেলিকটোরের করে চিত্রগ্রহণের প্রচেষ্টা খুবই অভিনব। এর আগে বাংলা ছবিতো তো কেউই, এমনকি কোনো ভারতীয় ছবিতোও, ফেলিকটোর ব্যবহার করা হয়নি। ছবিটির বিভিন্ন চিত্রে উত্তমসুন্দর, অক্ষতী, ভারতী, নির্মলহুয়ার, নমিতা সিং, বিহির ভট্টাচার্য, চন্দ্রাবতী, অক্ষপ্রকাশ, হুস্তি বিহর ও ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি শিল্পী অংশগ্রহণ করবেন। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সম্পূর্ণ ছবিটি নয়নমোহনের বহুবিচিত্রবর্ণদৃশ্য পেভাকলায়ে তোলা হবে।

বোপাযোগ

বিষকবি রবীন্দ্রনাথের কোনো কাহিনী চিত্রায়িত হওয়া আমাদের চিত্ররসিকদের পুঙ্খিত দ্বার হবেনা। প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক নীতিন বহু জন্মেবের 'বোপাযোগ' উপজাতি

চিত্রগ্রহণে এখন সত্যনাথ তাই মূল হয়েছেন। ছবিটি প্রযোজনা করছেন শ্রীমতী আশা মুখোপাধ্যায় 'রীত্ প্রোডাকশন'-এর তরফে। সর্বজনপরিচিত এই উপজাতিটির চিত্রগ্রহণে ধারা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে অদিত্যবর্ণ, বসন্ত চৌধুরী, উৎপল সন্ত, জহর, ভারতী, মধু বে প্রভৃতি শিল্পীরা আছেন। এ ছাড়া অতা বাব নামে এক নবাগতা শিল্পীকে দেখা যাবে সুশীলী চিত্রে। ছবিটিতে ভ্রমোজনা করছেন গোপাল বাণজগু ও হরিপ্রসন্ন বাণ। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিচালনা করবেন শান্তিনেব ঘোষ। আগামী বছরের সময় যাতে ছবিটি মুক্তি পায় তার আগে পরিচালক নীতিন বহু ক্রমশঃগতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

মেঘমল্লার

সবীতমুখর ছবি 'চুলি' তুলে প্রমোদা হুস্তিগ্রহণের 'আর প্রোডাকশন'। কিন্তু তার পরবর্তী ছবিতোলাতে যেমন সত্যনাথ আসেনি তাঁদের। সেইরকম পুরনো ব্যাতি হুস্তিগ্রহণ করার প্রচেষ্টার 'মেঘমল্লার' নামে আরেকটি সবীতমুখর ছবি তোলার কাজে হাত দিয়েছেন তাঁরা। নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের দেখা এই চিত্রকাহিনী পরিচালনা করছেন 'চুলি'-ব্যক্ত শিল্পী মুখোপাধ্যায়। চিত্র-তথ্যগ্রহণ আছেন ভারতী, রেখুকা, নীতিমা, তপসী, পদ্মা, সান্ধী, ঈশা পাল, সাহাধী, অদিত্যবর্ণ, নীতিশ, বীশক, প্রমোদহুয়ার, আশীষহুয়ার, অদিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পী। সবীত পরিচালনা করছেন 'চুলি'-ব্যক্ত রাজেন সত্যকার। নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে অংশগ্রহণ করছেন হীরাবাই বরোদেকর, সরস্বতীবাই রাণে, চিত্রা গাধিকী, এ. কানন, প্রমুদ, বীরা, ছবি ও প্রতিমা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হুস্তি শিল্পী।

মুপুর

রত্ন-বোম্বাকের গল্প লিখেই নাম করেছেন নীহাররজন গুপ্ত। হুস্তা: তার কোনো কাহিনী চিত্রায়িত হচ্ছে ওনলে কেউ যদি ধরে নেয় যে, ছবিটির বিষয়বস্তু নিচেরই রত্ন-বোম্বাক-মূলক, তাহলে অজ্ঞা হবে কি? অজ্ঞত 'মুপুর' নামে নীহাররজন-গুপ্তি যে কাহিনী চিত্রায়িত হচ্ছে তার সম্পর্কে এ বাখা করা যেতেই অজ্ঞা হবে না। কারণ 'মুপুর'-এর চিত্রকাহিনী ঠিক এই ধরনের। অবশ্য এতে বোম্বাকের সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাক-এরও দেখা পাওয়া যাবে। ছবিটি পরিচালনা করছেন 'হুস্তা শিকাগা'-এর পক্ষ থেকে বীশীশ নাথ। চিত্র-তথ্যগ্রহণ আছেন সান্ধী, সত্যাবাঈ, মধু, জহরী, সরস্বালা, আশীষহুয়ার, বিকাশ, নীতিশ, জাহ,

জাহ্নবী, কমল মিত্র ও চুপি বিশ্বাস। প্রবন্ধগুলির দাবিও নিম্নেছেন
ওজাস আলি আকবর খাঁ।

उत्तरार्ध

কথাশিল্পী পরংচন্দ্রের কোনো কাহিনী চিত্ররূপাক্ত হইবে না, বাংলা ছবির বাজ্যে এমন দিন সত্যি বিহীন। কারণ বাংলা ছবির কাহিনীর সৈন্ত এতদিন তিনিই বিদ্যারে এসেছেন এবং আরো অনেকদিন ধরেই যেটোবনে। বর্তমানে পরংচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বন করে অবশিষ্ট ছবি তোলা হাফে। তার মধ্যে একটি হলো 'চন্দ্রনাথ'। সর্বপ্রথম কথাশিল্পীর বর্ণপঠিত এই কাহিনীর প্রয়োজনা করতেন শচীন বারিক—ঈদ হাসিক প্রভৃতির পক্ষে। পরিচালনা করতেন কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। উত্তরকম্বার ও হুজিরা অভিনীত এই ছবির অল্পাত চিত্রে সংগ্রহ করতেন মলিনা, চন্দ্রাবতী, হাফলম্বী, বেহুকা, পদ্মা, জহর, মীতিন, ইয়রিন, কমল বিহি, তুলসী, তাম্বুকা, রত্ন রায় ও তুলসী চন্দ্রাবতী প্রভৃতি শিল্পী। শব্দত

পরিচালনা করছেন ইব্বীন চট্টোপাধ্যায়। ছবিটির কাজ প্রায় সমাপ্ত। অনতিবিলম্বেই মুক্তি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

লৌহকপাট

অবশেষে (চাকচক্ষ্য চকবর্তী) বিবর্তিত কার্যকাহিনী 'লৌহকণাট' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সাথেই আলোড়ন তুলেছিল বাংলা সাহিত্যে। সম্ভ্রুতি 'লৌহকণাট' চিত্রকথামূলক হাফে শুনে সকলে নিশ্চয়ই সাত্তাহে অপেক্ষা করবের চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে পড়িবেন আলোড়ন জোলে তা দেখাবার জন্যে। ছবিটি পঠিতোলা করছেন 'কাহুলীভালা'-খ্যাত তপন সিংহ। প্রবোধনা করছেন এল. বি. কিশোর ইন্টারকাস্ট্রালাল। সুরারোপ করছেন হুলাসার শব্দত. মল্লিক। বিভিন্ন চরিত্রকে পর্দায় সূচিতের তুল্যবনে নির্দেশহকার, বাণা: শিহ, মঙ্ পে, ছবি বিলাস, কলম মিয়, অমর নরিক, রহর বায় ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটি ক্রত সমাপ্তির পক্ষে এদিয়ে চলেছে।

। पृष्ठे खबर ।

একাধিকজন পরিত্রাণ বহুর ধরে যাক ও পরায় সন্তে সংস্কৃত
ধাকবাক পর নটরূপ অহীন্স চৌধুরী সন্ততি অবসর গ্রহণ
করেছেন। এই উপলক্ষে মিনার্ভা-রসময়ক অভিনেতৃ-সংস্কার
ভরক থেকে এক বিদ্যায়-সংস্কারের আয়োজন করা হয়। চিত্র ও
মঞ্চের বিশিষ্ট ব্যক্তিসের উপস্থিতিতে এই সংস্কার-অনুষ্ঠানের
শৌর্যহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র
রায়। সংস্কার রজনীতে বিশেষজ্ঞলাল রায় বিরচিত নাটক
'শাঙ্করাহা' অভিনীত হয়। নটরূপ অহীন্স চৌধুরী নাটকের
নাট্য-মুখ্যায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর বিদ্যারী অভিনয়ে উপস্থিত
দর্শকমণ্ডলীকে মোহিত করেন।

দক্ষিণ-ভারতের ব্যাভিনায়া চিত্র-প্রযোজক এম. ডি. রমন তাঁর নবতম চিত্র 'আশা'র মূলিক উপদেষ্টক কলকাতার এক সাপ্তাহিক সন্দেশে লিখিত হন। আলোচনা প্রদেয় তিনি বলেন যে, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান এতো উন্নত যে তার কাছে পৌঁছানো ভারতের অন্যান্য রাজ্যের থেকে রীতিমতো দুঃসংগ্রহ। তিনি আরো বলেন যে, সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় অর্জন করে বাংলাদেশ বিশেষ দরবারে ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ স্থানে বসিয়ে এক অপরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বিশ্ব-ঐতিহাস-সংস্কারী বাংলা ছবি 'অপরাজিত' যাতে
ইংলন্ডের চিত্রশিল্পীরা দেখবার সুযোগ পান, তার জন্যে এটি

মানসের শেবে লগ্নে ছবিটির সাধারণ প্রশংসার আবেগন করা হয়েছে। জানা গেছে যে, ইউরোপের অন্তান্ত দেশের চিত্র-পরিবেশকরাও ছবিটির পরিবেশন-বহু লাভের ভক্তে আগ্রহ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত 'লোকসভা উপদেষ্টা সমিতি'তে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা সদস্য নির্বাচিত হইছেন : শ্রীতরানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমহীশ চৌধুরী, শ্রীমল্লীধর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকীৰ্ত্তী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকোমল ঘোষ এবং শ্রীমতী অমলি শর্মা । এ ছাড়া সরকার-মেনালীত কয়েকজন ব্যক্তিও এর মধ্যে আছেন ।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যাতে অধিক সংখ্যক শিশুদের উপযোগী ছবি তৈরি হয় তার জন্য প্রধানমন্ত্রী নেহরু চিত্র-নির্মাণাশয়ের কাছে এক আবেদন জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, প্রয়োজন হলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য সেবার ব্যবস্থাও করা হবে।

আত্মজাতিক চলাচল প্রতিবেদিতার অঙ্গপ্রাণিত হইবে
বেশল যোগান শিকার অ্যাসেসিয়েশন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার
বেশলসিতে বাংলা ছবি পরিবেশনের কথা বিশদভাবে চিন্তা
করছেন। জানা গিয়েছে যে, ইতোমধ্যে চীন, জাপান,
বর্মী, থাইল্যান্ড এ সিঙ্গেলেছিয়া প্রকৃতি দেশের চিত্র-পরিবেশনের
দশে এক্ষেত্রে যোগাযোগ চালু করা হইছে।

খেলার মেলা



হুগিটির

ফুটবল :

এবারের মতঃ কলকাতার ফুটবল মহত্ব প্বেষ হোলো। তবে এ যে বখাতদুল্লত সমাপ্তি তা অবতই বলতে পারা যায়। কারণ ডাকাতঃ সবচেয়ে নানী প্রতিযোগিতা আই.এফ.এ. ইন্ডের প্বেষ প্বেষের হুটি খেলাই এখনো অসম্পূর্ণ, এবং কবে যে সম্পূর্ণ করার আয়োজন হবে তাও আনালের সম্পূর্ণ অজাত। তবে দুইদর নম হয়, এ বছরের ইন্ড কাইনাল ও সেমি-কাইনাল হুগিতই থাকবে। কারণ এর মধ্যেই ইন্ডবেকল ও মহামেডান শোটিঃ জানিয়েছেন, তাঁদের সংগ্রহ-করা ভালো ভালো পাতিছানী খেলোয়াড়রা পাতিছানে ফিরে আসেছেন এবং বাইরের খেলোয়াড়রাও কলকাতা ছেড়েছেন। হুতরাঃ উলের পক্ষে খেলা অসম্ভব। ইতিমধ্যে ভারতের অন্তর বিখ্যাত প্রতিযোগিতাগুলিও শুরু হয়েছে। এগুলিতে মহামেডান, ইন্ডবেকল প্রভৃতিরও নাম রয়েছে। এমিক দিয়ে কাইনালে-ইন্ড-খাকা রেলওয়ে শোটিঃ বেল ধানিকটা মুনকে পড়েছেন। কারণ এই কাইনাল খেলা যদি তাঁরা বেলাতে পারতেন তবে মোট দু'বার তাঁদের কাইনাল খেলা হোতো। এর আগে রেলওয়ে দল ১৯৪৪ সালে একবার ইন্ড পান। অবতঃ কোনাঃ হলঃকই এর ততঃ ঘোষণায়েণ করা যায় না। সেমি-কাইনালে মহামেডান ও ইন্ডবেকলের মধ্যে স্যারিটি-খেলার টিকিট পর্বত বিক্রি হয়ে দিয়েছিল। কিন্তু খেলার দিন পর্বত-মামোদান প্রভৃতি অহুবিধার জন্য খেলা অনিদিষ্ট কালের অন্ত বন্ধ থাকে। কারণ সেমি অধিকাংশ পুলিশই কলকাতার বাহ্যে কর্মব্যত ছিল। কিন্তু টিকি ভারপরই যে কেন খেলাটি হোলো না, তার কারণ বহুভাব্যত। অসুপকারতঃ সহঃ অসম্ভব মধ্যে পুলিশের পক্ষে কোন মাঠে হাজির হওয়া সম্ভব হল না, এ কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। অজীভের দূরঃ হুঃজে, পুলিশ অত্যন্ত কর্মব্যত থাকা সযেও,

কলকাতার মাঠে বেল হুঃভাবে বখেই পুলিশের উপস্থিতে কাইনাল খেলা অগুপ্তিত হযোছে, এ উমাঃহরণ বিরল নয়। তবে আশই কেন জোর করে অসমাপ্তকে সমাপ্তর মধ্যে খেলা হচ্ছে তার কারণ জানি না। যে ইন্ড-খেলা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা, এইরকম তুচ্ছ কারণে সমকল পতিপতিতে তার পরিসমাপ্তি বখেই আগসালের নয় কি? হাক, আশা করা যায় আগামী বছরে কর্মকর্তারা এর অন্তঃ ঘোষণাকৃত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

আন্তঃবিবিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার এবারের 'আন্তঃতোষ ইন্ডি-বিভবী কলকাতা দলকে উৎসিত অভিনন্দন জানাই। প্রতিযোগিতাটি অগুপ্তিত হয়েছিল বেরিলিতে। কলকাতা মাঠের হুবিখ্যাত খেলোয়াড় জীহুদী গোখারী এবার বিবিদ্যালয় দলের অধিনায়ক নিহুত হয়েছিলেন। জীহুদী গোখারী ব্যক্তিগত জীডানৈপুণ্যের কথা আমাদের অবিলিত নয়। তিনি এবারেও তাঁর হুনায অমুঃর রেখেছেন। কলকাতা বিবিদ্যালয়ের হয়ে তিনিই এবার ১০টি গোল দিয়ে সর্বোচ্চঃখার গোলদাতার মর্যাদা পেয়েছেন। বিশেষতঃ তাঁরই জীডানৈপুণ্যে কলকাতা বিবিদ্যালয় এবার ইন্ডি লাভ করতে পেরেছে। অন্তঃ প্রযোজনীর মুহুর্ত তাঁরই লাহায বিপক্ষকে খারেল করেছে। অবতঃ দলের অন্তঃ খেলোয়াড়রাও সবিশেষ অহুঃপ্রাণিত না হয়ে খেললে, ফলাফল কী হোতো বলা যায় না। ট্রেনেণ করে, বৈদিক-পঞ্জি-প্রযোণকারী পাঠ্য বিবিদ্যালয় দলের বিরুদ্ধে কলকাতা-দলের দুঃ মহোবলের সঙ্গে খেলা অহুঃ প্রঃখার দাবি রাখে। অধিনায়ক জীহুদী গোখারীর খেলোয়াড়্যচিত্তিত মহোভাব সতাই অসুঃ। তিনি বিবিদ্যালয়ের পক্ষে নির্বাচিত হওয়ার পর ক্রঃ-সকলকারী আই.এফ.এ. দলে খেলার

হযোগ পান। কিন্তু তিনি সে হযোগ পরিত্যাগ করে লক্ষ্যমীম
অনিয়মের পদ বরণ করে নিয়ে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।
আন্তর্জাতিক কণা, দূরবীক্ষণবিজ্ঞানের খেলোয়াড় নির্বাচন হয়ে
গিয়েছে এবং তার মধ্যে প্রিন্সী গোখারী একজন, তা জানা
সত্ত্বেও কেন যে আই.এক.এ নিখরচা-মণ্ডলী প্রিন্সীমীমকে
নির্বাচিত করলেন তা ঠিকঠাক জানেন। কাইনালে কলকাতা
দল বোম্বাইকে এক সেলে হারিয়ে ট্রফি পেয়েছেন এবং
হলকিনে কলকাতাকে (১০-০), আলিসডকে (৭-০), মলকপুরকে
(২-১) ও পাকিস্তানকে (২-১) হারিয়ে কাইনালে উঠেছেন।
কাইনালে পুরস্কার-বিতরণীতে আচার্যের কলকাতা বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের দৌর প্রিন্সীমীম স্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মতি
পুরস্কার পান।

ব্যাকমিটন :

এবারের পশ্চিম-ভারত ব্যাকমিটন প্রতিযোগিতায়
বোম্বাইবাসী বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন এ. ডি. চুং-এর খেলা দেখেছেন।
ঐ প্রতিযোগিতায় এ. ডি. চুং কাইনালে ভারত-স্রেষ্ঠ নাম
নাটকসমূহকে অন্যতমসঙ্গে পরাজিত করেছেন। এই
প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের চ্যাম্পিয়ন কিন কোবেরো ও এ. ডি.
চুং-এর ভাই ডেভিড চুং অংশগ্রহণ করেছিলেন। সব থেকে
উল্লেখযোগ্য বিষয়—ভারতের তিন-নম্বর খেলোয়াড় অমৃত
সেওয়ানের কাছে যুক্তরাষ্ট্র-চ্যাম্পিয়ন কিন কোবেরোর পরাজয়।
আন্তর্জাতিক দলবদ্ধ জানাই নেওয়ানকে। তবে যাকে যাকে
সেওয়ান এরকম বিশ্বজয়ের মতো জিতে থাকেন।

কাইনালের ফলাফল : ফেলু সিফলস—এ. ডি. চুং ১৫-১০,
১৫-৭ পরেট নাটকসমূহকে পরাজিত করেন। ফেলু ডাবলস
—কিন কোবেরো ও হানসেন ১১-১৫, ১৫-৫, ১৮-১৭
পয়েন্টে এ. ডি. চুং ও ডেভিড চুং-কে পরাজিত করেন।

সাঁতার :

কিছুদিন আগে কলকাতার বেশ বড় ব্রহ্মবীর দুটি
সাঁতারের অস্থান হয়ে গেল : একটি স্রাবনাল হুইমিং
অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনা ও অপরটি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়
সাঁতার প্রতিযোগিতা। এবারে স্রাবনাল হুইমিং অ্যাসোসিয়েশন
প্রত্যেকবারের মতো সাধারণ প্রতিযোগিতা হিসেবে না করে,
সংসারতীর্থ প্রতিযোগিতা হিসেবেই এটিকে করার চেষ্টা
করেছেন। তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয়েছে। তার সমস্ত
উপকার দানাই। প্রায় সব-কিছু ক্ষেত্রেই তাঁর
প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গিয়েছে। সাতটি বিক্রেত রেকর্ড ভাঙ
হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে



শ্রীমতীম তালুকদার

২০০ মিটার বৃক-সাঁতার : এই বিভাগে বোম্বাই-এর
উদীয়মান সাঁতারু শ্রীমতীম হরিহরান ছিলেন। তিনিই কিছুদিন
আগে এই বিষয়ে নতুন ভারতীয় রেকর্ড (২ মি: ৫৭.২ সে:)
করেছিলেন। কিন্তু তিনিও প্রথম হতে পারেননি। তাঁকে
পরাজিত করেছে স্রাবনাল স্রাবের সন্ন্য ব্রহ্মবীর
তালুকদার। স্রাবের পটুতা ১৫ বছরের এই ছেলেটি শুধু
প্রথমই হয়নি, উপরন্তু নতুন ভারতীয় রেকর্ড (২ মি: ৫৩.৫ সে:)
করেছে। বাঙালীর গৌরব এই কিশোর সাঁতারু উত্তরোত্তর
উন্নতি করুক এই কামনাই করি। এর সমস্ত আন্তর্জাতিক
প্রশংসা পাবেন স্রাবনাল স্রাবের কর্তৃপক্ষ। এঁরাই বর্তমানে
ছেলেটির সম্পূর্ণ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু এই কিশোর-
প্রতিভার প্রতি বেঙ্গল হুইমিং অ্যাসোসিয়েশন এখনো পর্যন্ত
নম্বর বেয়ার হুদয় পাননি। এই ধরনের তব্রিহত-
সম্ভাবনামূলক সাঁতারুদের এখন থেকেই বিশেষ থেকে
ভাল 'কোচ' আনিতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।
ছেলেদের বিভাগেও ভারত-বিখ্যাত মহিলা সাঁতারু ভলি
নাথিককে ১০০ মিটার শির্ট-সাঁতারে বাংলার কিশোরী
সাঁতারু সন্ন্য চন্দ্রের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।
বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সাঁতারের ইতিহাসে ভলি নাথিকের

এই প্রথম পরামর্শ। শিই-গাঁতায় নাজির-ই এতদিন রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন। এখন সেই রেকর্ড ভেঙে সম্রা চন্দ্র নতুন ভারতীয় রেকর্ড (১ মি: ৩০'৪ সে:) করেছে। কিন্তু ১০০ মিটার বুক-গাঁতায় ভলি গার আগের রেকর্ডকেও হানি করেছে। গার আগের রেকর্ড (১ মি: ৩৭'৬ সে:); বর্তমান রেকর্ড (১ মি: ৩৭ সে:)। ভাইজি-এ ভারতের শ্রেষ্ঠ তথা এশিয়ার খ্যাতনামা ডাইভার কে. পি. ঠাকুরের চমৎকার ভাইজি-এর সঙ্গে আরেকজনের ভাইজি: সকলকে মুগ্ধ করে। সে হোসো শ্রীকান্তি সন্ন, গার বয়স মাত্র ৮ বছর।

এবারে আশ্ব:বিশ্ববিদ্যালয় গাঁতায়ের কথা। ১৯৪১ সালের পর (স্বর্গীয় ১৫ বছর) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সল আবার এসেছর গাঁতায় ও গুহাটার শোলা দু'বিধারই চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছেন। কলকাতা হলর এ কুত্তির অধীকারী। এ কুত্তির সঙ্গে 'বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস-বোর্ডের' কিছুমাত্র উদ্ভব নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কুত্তী গাঁতায়ের উপস্থিত অংশীদারের মত যে পৃথক কোনো সুইমিং-পুল বা গারও কিছু দরকার নে-কথা উদ্ভবর চিন্তার বাইরে। অত: আনন্ডা বেশ জানি যে, 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস-বোর্ড' ইচ্ছা করলেই এ-সমস্ত সমস্তার সন্ধান করতে পারেন। এবারের গাঁতায়ের বাঙ্গালী চ্যাম্পিয়ন হতেছেন অধিনায়ক শ্রীশাঙ্ক কর্মকার ও শ্রীকমল সাহার মত। চন্দ্র নুর্গে, বিশেষ ক'রে মিডলে বিলে প্রতিযোগিতায় ক্রী-স্টাইল ও বুক-গাঁতায়ের গার যে অসামান্য কুত্তির দেখিয়েছেন তা সত্যিই কোনদিন ভোলবার নয়।

এবারে কলকাতা হলর অধিনায়ক-নির্বাচন ব্যাপারে একটু গওগোলের দৃষ্টি হয়েছিল। অধিনায়ক শ্রীশাঙ্ক কর্মকারের থেকে শ্রীকমল সাহার ৩বি আগের, কারণ তিনি সব স্টিক দিয়েই শ্রীকর্মকারের চেয়ে বেগা অধিনায়ক। স্বতরাং তিনি অধিনায়ক হতে পারেননি স্ব'লে, একমাত্র মিডলে বিলে ছাড়া অন্য কোনো বিভাগেই যোগদান করেননি। বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস-বোর্ড-এর অধিনায়ক-নির্বাচনের সিক দিয়ে খুবই অসুখ হয়েছে। উপস্থিত লোককেই অধিনায়কর বেগা উচিত ছিল। কিন্তু শ্রীশাঙ্ক আরও অসুখ করেছেন কোনও বিভাগে যোগদান না করে। গার ময়, অর্থাৎ বাঙ্গালদেশের ময়। সেক্ষেত্রে গার ব্যক্তিগত শরদ্বারার বিঘর বেশী করে মেঘাটা মোটেই সুকিসুক হইনি।

এবারের সবচেয়ে কুত্তী গাঁতায় হলর যোষাইএর মূরেন হইয়াবানী। তিনি এবার ১০০ ও ২০০ মিটার বুক-গাঁতায় এবং ১০০ ও ২০০ মিটার বাটার-স্টাই এই চারটি বিভাগেই প্রথম হয়েছেন। এবারের প্রতিযোগিতায় যে একটিমাত্র রেকর্ড হয়েছে, সেইটাই করেছেন হইরিয়াবানী। অভিনন্দন জানাই থাকে। শ্রীশঙ্ক বাম্বাজের পর একসঙ্গে এতগুলি বিভাগে প্রথম হওয়ার দৃষ্টান্ত হইরিয়াবানী ছাড়া বিরল। তবে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, অহুটানের সময় আবারের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দস্যবকেই অহুপাতিত ছিলেন বরাবর। আশ্চর্য! মনে হয়, এ একমাত্র কলকাতাতেই সম্ভব।



শেষ পাত

শিবরাম চক্রবর্তী

“জীবন হচ্ছে ভিসিপি মতই পাঁচালো আর ক্ষণভঙ্গুর। আর পেনসিলের কায় বাড়তে বাড়তে ক্ষয় যায়।” (উদ্ধৃতি)

যেমন বাড়ন্ত তেমনিই কমণীয় :

বিয়ে করাটা হচ্ছে তেঁটা পেলে নদীতে কাঁপিয়ে পড়ার মতই বুদ্ধিমানের কাজ।

ভালোবাসার দাঁত আস্তে আস্তে বসলেও, আসলে তা হচ্ছে কঙ্কণের কামড়।

জৈনিক কাব্যমালোচকের মতে, অনেক আধুনিক কবি নারীর বিষয়ে বিশেষ কিছু না জেনেই নারীদের নিয়ে বেশ কবিতা লেখেন।

অনেক কবিরাজের মতই নাড়িগ্রাহনে টনটনে ?

মশারা দেখা গেছে মানুষের চোখের সামনে কিছুতেই আসতে চায় না।

নিভাস্তই চকুলজ্জা—তা ছাড়া কি !

‘যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই’—
চলতি প্রবাদ।

আজ্ঞে, তারই নাম Nepotism !

ছুনিয়ার হাওয়া বদলাচ্ছে ধারা মালুন করতে পারছেন না তাঁরাই না শেষটা হাওয়ার মত বেমালায় হয়ে ধান !

আর্জেন্টিনায় এর পর থেকে অবিবাহিতদের মাসিক একদিনের বেতন আটপুড়ে ট্যাকসো দিতে হবে।

তারলেও উন্নতিশ বিনের বেতন ট্যাকে থাকবে, ট্যাকসট থেকে যাবে ! মন্দ কি ?

টাকা জমাবার অভ্যাস খুবই ভালো। বাপ-পিতামহের বেলায় ভালো আরো।

জৈনিক ডেলি-প্যাসেজারের মতে, অজ্ঞকাল রেলগাড়িতে যা ভিড়, তাতে নিতান্ত ভরসা না চলে ট্রেন-ভ্রমণ না করাই উচিত।

সেদিক দিয়ে ধরতে গেলে শুধু জানাইঘটির যাতায়াতই কেবল চক্ক-রই !

‘নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি’—একটি প্রবন্ধের শিরোনামে।

একটুও বদলায়নি মশাট ! দৃষ্টি বলতে, কালিদাসের কালের থেকে অবিকল সেই একরকম। ফ্যালফ্যেলে !

একজনের প্রশ্ন :

‘আদর্শ আয়বায়ের একটা হিসেব দিতে পারেন ?
কিভাবে জমাখরচ করবেন ?’

প্রয়োজনমত আয় করুন, প্রিয়জনমত ব্যয় করুন। জমার ঘর ফাকা থাক। জমালায়ে বদাচ যাবেন না।

জনান্তিকে শোনা :

‘ভানো, স্বপ্নরমণাই আমাদের বিয়ের সময় কেনা থেকে গোয়ার বাড়না আনিরেছিলেন?’

‘ঘাতে সম্প্রদানের সময়ক্রান্ত টুপ্ করে আওয়ালাটা না কারও কানে যায়?’

একজনের জিজ্ঞাসা :

‘ভিনে তা না বিয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক উপায়ে ছানা পাবার অমর কোনো কারণে আপনাদের জানা আছে?’

আছে বইকি। হুধ থেকে।

নাটো-শক্তিপঙ্কজের জটনৈক জেনারেলের মতে অচিরেই নতুন কোনো মহাবুদ্ধি বাধার আশঙ্কা নেই। বাধা না পেল, পুরনো বুদ্ধিই যেমন চলছে চলবে।

‘ইংরেজ ভারতবর্ষকে যদিও ডালা-কু দিয়ে গেছে, কিন্তু চাবিকাঠি নিজের হাতে রেখেছে। এবং আবার পা বাড়াবার জায়গাও রেখে গেছে।’ (উদ্ধৃতি) পা-নাই-স্থান?

‘‘তৎকালীন লীগ সরকার থেকে বীরা নৌকা গড়বার ভার পেয়েছিলেন তাঁদের অনেকে ছুল করে নৌকা না গড়ে নিজেদের বাড়ি করে ফেলেছেন।’’ (উদ্ধৃতি)

রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী-ই এর জন্তে দায়ী।

ম’সিয়ে গনডিউস নামে এক করাসী ভ্রমলোক ন’বার বিয়ে করার পর নব্বইবছর বয়সে এই সেদিন তাঁর প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে আবার উধাও হয়েছেন বলে জানা গেল।

আবার কেঁচে গনডিউস!

বিদ্যাপর্বত থেকে নেকড়েরা পালে পালে নেমে গ্রামে গ্রামে লোকজনদের খুন-জখম করে বেড়াচ্ছে বলে প্রকাশ।

ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন, সে খবর এতদিনে তার টের পেয়েছে বোধ হয়!

জনান্তিকে শোনা :

‘বলাই বাহুল্য! মিলিটারী সন্নী চাপা পড়লে কেউ বাঁচে আবার?’
যেন বাহুবল্লরী চাপেই কেউ বাঁচতে পারে।

সম্পাদক—শ্রীচাক্রকর ডাটাগাথ

কে. পি. বহু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১, মহেন্দ্র সোমসারী সেন, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীকেশবনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত
এক তৎকর্তৃক ৪২, কনওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত

বঙ্গুধারা



প্রথম বর্ষ

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪

২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের কবিতার আনুক্রমিক পারস্পর্য

কালিদাস রায়

রবীন্দ্রনাথের কবিতা-রচনার ঐক্যমূলক লইয়া আলোচনা করিতে গেলে তাঁহার কবিতার ভাবপাথর অসুচ্ছন্নর কথা আগে বলিতে হয়। প্রথমতঃ তিনটি Normative Science-এর (Logic, Aesthetics & Rhetoric) অমূল্য তিনটি অমূল্যের কথা বলিতে হয়। কতকগুলি কবিতা লুক্কি-লুক্কি-মূলক অমূল্যের (Logical Sequence), কতকগুলি আবেগ-মূলক অমূল্যের (Emotional Sequence) এবং কতকগুলি আলংকারিক অমূল্যের (Rhetorical Sequence) রচিত। একাধিক অমূল্য অনেক কবিতার অমূল্য হইয়া আছে।

কবির 'চৈতন্য'র বৈরাগ্য, স্নেহ-প্রাণ, বঙ্গমাতা, মানসী, ইত্যাদি কবিতা, 'নৈবেদ্যের' লুক্কি, অমূল্য, ভ্রমর ও ইত্যাদি স্নেহ, তাহা ছাড়া, বঙ্গাঙ্গন, কুসুম, প্রভৃতি বর্ণনামূলক ইত্যাদি কবিতা লুক্কি-লুক্কি-মূলক অমূল্যের রচিত। একটি কবিতা ('বৈষ্ণব-কবিতা') মনো-বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়। কবির প্রতিপাদ্য 'বৈষ্ণবের গান' শুধু বৈষ্ণবের জন্য নয়, সকলের জন্য।

অভিলাষ, প্রেমালীলা, বিরহ-মিলন,

কুসুম-পাখা—এই প্রথম-বঙ্গ... ইত্যাদি—

কবির স্নেহের উপভোগ্য হইতে পারে না। এই স্নেহ-বঙ্গমাতা দীন মর্ত্যবাসী মন-মানসীর তত্ত্ব প্রেমভাষা মিটাইতেছে। ভক্তির পারমাণবিক উৎসবক্ষেত্রে হইতে পূর্ণ থাকিয়া 'বৈষ্ণব-কবিতা'র হই-একটি তান তানি তন্ত্র বসন্তে আমাদের অন্তর ও পুলকিত হয়, আমাদের কৃষ্ণের

পরিবেশের প্রতিটি বিভব মানুষ মগ্নিত হইয়া উঠে। ঐ গানে আমাদের বঙ্গের সজীবী প্রাণের জলন্ত প্রাণবান্যের প্রকাশদানের ভাষা লুক্কি-পাখা, অতএব কি কবিতা বলি শুধু স্নেহের জন্যই 'বৈষ্ণব-কবিতা' ? বৈষ্ণব কবিতা শব্দকট্টর, প্রাথমিক কবি। তাঁহার প্রাথমিক-ভাষা কবিতাও সঙ্গীতী ছিলেন না, তাঁহারও আমাদের মতো সংসারীই ছিলেন। তাঁহারের মধ্যে মানসী প্রিয়তমা ছিল। কবি তাই তাঁহারের উচ্চারণে বলিয়াছেন—

"সত্য কণ্ঠে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,

কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচর্চি,

কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান

বিরহ-প্রাণে ? তবু কণ্ঠের মনো,

বাণিকার অঙ্গ-অধি পাড়িল মনে ?

নিশ্চয়ই তুমি বাণিকার চিত্তবর্জিত ব্যাকুলতা তোমার শিখার চোখের হইতেই আতপ করিয়াছ। তাই যদি হয়, তবে কেমন করিয়া বলি তোমার কবিতার তোমার মানসী প্রিয়তার অধিকার নাই,—অধিকার আছে শুধু বাণিকার ?

আমাদের কৃষ্ণ-প্রাণের পুষ্প বিকশিত হয়—সে পুষ্পের মালা কেবল স্নেহ-ভাষা—কেবল স্নেহ-ভাষার প্রিয়তমা।

বেদভাষা মাতা পিতা পাত্রি, পিতৃ-পিতৃ

প্রিয়তমা, প্রিয়তমা মাতা পিতা পাত্রি

তাঁহি দিই দেবভাষা : আর পাত্রি কোথা।

সেবভাষার প্রিয় কবি, প্রিয়ের সেবভা।

সেবতার ক্ষমতা হ্রাসিত কবিতা তাই কেবল সেবতার ক্ষমতা নয়,
প্রিয়জনেরও ক্ষমতা।

এত ঈতি,

এত চক্ষু, এত ভাবে উজ্জ্বলিত আঁতি,

এত মনুষ্যতা ধারের সমুদ্র দিয়া—

বৈকুণ্ঠের গর্বে চলিয়া যাব—শুনিবীর তরুণ-তরুণীরা
কি কবিতা লোভ সংবরণ করে? তাহারা তাই গর্বে শূন্য
কবিতা নিষেধের প্রিয়জনগণের জন্ত আহরণ করিতেছে।”
কবি বলিতেছেন—হে বৈকুণ্ঠ কবি, কি কবিতা ছুঁনি ইহা
ঠেকাইবে?

অতএব ছুঁনি যদি শুধু বৈকুণ্ঠের জন্ত এই সম্পদের খনি
কবিতা খান, তাহা শুধু বৈকুণ্ঠের ভোগে লাগিতেছে না,
মানব-সংসারের ভোগেও লাগিয়া যাইতেছে।

বুদ্ধি-শৃঙ্খলার নড়তা যাহা হইয়া গিয়াছে—কবির অস্পষ্ট
বাচন-কৌশলে এ-কথা সত্য বটে, কিন্তু কবিতাটিতে
বুদ্ধিধারাই অস্বাভাবিক হইয়া আছে।

দ্বীভ্রমসাধের বহু কবিতাই আবেগাত্মক অম্লকম্বে
রচিত। এইসকল কবিতাই সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর। কবিমানের
একটি গভীর আবেগ আশনার স্বাভাবিক গতিবেগে সেই
কবিতাগুলিতে উজ্জ্বলিত হইয়াছে। অনেকস্থলে ঐ আবেগ
উজ্জ্বলিত হইয়া স্থান-কাল-পাত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া
নিরবধি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ‘বসে নাহি দিব’—এই
শ্রেণীর কবিতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অজ্ঞাত
উদাহরণ—বহুব্রহ্মা, কাষ্ঠাঙ্গিনী, এবার কিয়ৎ যোরে,
সত্যোত্তরসাধের প্রতি, ‘পলাতকা’র করেকটি কবিতা,
শা-জাহান, সেবতার গ্রাস, মাটির ডাক, লীলাসন্ধিনী,
ভৈরবী গান, শিবাক্ষি-উৎসব, নমস্কার, প্রেমের অভিবেক
ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট কবিতা ‘বধু’। ইহার বিশ্লেষণ
করিলে দেখা যায়, কবি বহুব্রহ্মের সন্মারিত একটি আবেগকে
এমন বাণীরূপ দিয়াছেন যে তাহার গম্ভীরপ্রকৃতির প্রতি
অম্লগানের আবেগও বধুর মনের আবেগের সঙ্গে মিলিত
হইয়া উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। যাহুবন্ধে লাগিতা
বন্ধকচ্যাবিশিষ্ট পল্লী-দ্রুপালী কলিকাতা নগরীর ধনীরা গৃহে
আসিয়াছে বহুব্রহ্মে। বেলা পড়িয়া আসিবামাত্র তাহার
মনে পড়িয়া গেল—এই কিম্বিকিমিকি বেলায় তাহার সখী
প্রতিদিন ডাক দিয়া বলিত—‘বেলা বে পড়ে এল, জলকে
চল’। বধুর মনে পড়িয়া গেল—পল্লীপ্রকৃতির চতুঃস্থকর
উদার মন্থর পরিবেশটি। তাহার সহিত বাম্বানীর
কারাগারের তুলনা করিয়া বধু বলিতেছে—

হার বে রাজধানী পাবান-কায়া;
বিরাট মূর্তিতেলে চাপিছে দৃঢ়বলে,
ব্যাচুল বাণিকারে নাহিক মায়া।

... ..

হেথায় বুধা কাদা, দেহেলে পেয়ে বাধা
কানন ফিরে আসে আশন-কাছে।

নগরের পরিবেশের মতো মাহুগলোও জুগুহুসী—

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন ক’রে বাটে সাঝটা বেলা!
ইটের ‘পরে ইট মাঝে মাহুগ-কীট—
নাইক ভালোবাসা, নাইক বেলা।

কবিকল্প বিহারীলালের নাগরিক জীবনের প্রতি বিষ্ময়কেই
কবি যেন বধুর মূখ দিয়া সরসতম রূপ দান করিয়াছেন।
বলা বাহুল্য, কবির নিষেধও নাগরিক জীবনের প্রতি
বিকৃত্যের ভাব ইহাতে লীনিত হইয়াছে।

বহুব্রহ্মের আবেগের উজ্জ্বল করুণতম রূপ ধরিয়াছে
নিম্নলিখিত দুইটি কবিতা—

কোথায় আছে ছুঁনি কোথায় না গো,
কেমনে ভুলে ছুঁনি আছিস ইংগো।
উঠিলে নব শশী, ছাদের ‘পরে বসি
আম কি রূপকথা বলিবি না গো।

জয়দেবনারায়ণ শূন্য বিছানায়
বুড়ি না, আঁখিজেলে রজনী আসো,
কুহুধ তুলি লয়ে এড়াতে শিবালয়ে
এবাসী তনয়ার কুশল মাগো।

দেবে না ভালবাসা, দেবে না আলো।
সদাই মনে হয় আঁখার ছায়াময়
বিধির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।

ডাক লো ডাক তোরা, বল লো বল—

“বেলা বে পড়ে এল, জলকে চল।”

কবে পড়িবে বেলা, ছুঁয়াবে সব বেলা,
নিবাবে সব আশা শীতল জল,
আনিস যদি কেহ আমার বল।

কবিকল্প আবেগাত্মক কবিতার কোন-কোনটিতে
জয়দেবগ এইরূপ উজ্জ্বলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ
ক্ষেত্রেই সংযত। ‘স্মরণ’ পর্বাণের কবিতাগুলিতে ইহার

আভিষেক অবাভাবিক হইত না, কিন্তু সেগুলি আশ্চর্যজনক নাহত। স্তম্ভাব্যেগমূলক অহুস্মে স্বভাবতই অলঙ্কারিত প্রাধান্য কবিতা আনিয়াছে।

কবিতার আলঙ্কারিক অহুস্মের কবিতার সংখ্যা কম নয়। Symbolical কবিতাগুলির কথা এখানে বলিতেছি না—Symbol ও Metaphor এক নয়। Symbolical কবিতার ব্যাকরণের সঙ্গে রচনার প্রত্যেক অঙ্গকে মিলানো যায় না—Metaphor-এ মিলানো চলে। Symbolical কবিতার অহুস্ম আলঙ্কারিক না-ও হইতে পারে। আলঙ্কারিক অহুস্মের রচনা সাধারণতঃ সাক্ষরূপকের রূপ গ্রহণ করে। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি এই অহুস্মের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

'বসন্ত' কবিতাটিকে অবলম্বন করিয়া কবির রচনার আলঙ্কারিক অহুস্মটি দেখানো হইতে পারে—

'ধবলীর ধ্যানভরা ধন বসন্ত' বৎসরের শেষে একবার নববয়সে আবির্ভূত হন।—

"তারি লাগি ভগ্নবিনী কী ভগ্নতা করে অহুস্ম,
আগনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, চাড়ো আভরণ,
ত্যাগের সর্ব্ব দিয়ে স্বপ্ন-অর্থা করে আহরণ,
তোমার উচ্ছেদে।

স্বর্ধ গ্রহণ করি কিরে সে পূজার নৃত্যভালে
ভক্ত উপাসিকা।
নয় ভালে ঝাকে তার প্রতিদিন উদয়াকালে
রক্তগ্নিটিকা।

সমুদ্রতরঙ্গে সদা মস্তকরে বহুশায়ী করে,
উচ্চায়ে নামের নৌক অরণ্যের উচ্চায়ে মর্যে,
বিশ্বেদের মরুপ্তে বহুস্বপ্নে দিকে দিগন্তরে
রক্ত মরীচিকা।

আবর্তিয়া গুরুমালা করে জপ, করে আঘাঘন
দিন গুনে গুনে
সার্বক হলো যে তার বিরহের বিচিত্র সাধন
মধুর কাহিনে।

তারপর বসন্তের আবির্ভাব—

হেহি উত্তরী তব, হে তরুণ, অরুণ আকাশে,
অনিম্ন চরণধরী দক্ষিণের বাতালে বাতালে,
বিশ্বনাথলা-হোম প্রস্থিত পলাশে পলাশে,
রক্তিম আগ্রনে।

তারপর বসন্তের রূপান্তর—

তাই আকি ধরিয়াই বসন্ত কর, বসন্ত প্রয়োজন
হল অবদান।
বৃক্ষাশা যুক্তভাব, ফলে তার নিরাসক্ত বন,
ক্ষেতে নাই ধান।
বহুলে বহুলে শুধু বহুকের উঠিছে গুঞ্জরি
অকারণ আকোশনে চকলিছে অশোকমল্লী,
কিশলয়ে কিশলয়ে নৃত্য উঠে দিবসপর্বা
বনে জাগে গান।

বসন্তের বিদায়—নিদ্রাঘের আবির্ভাব—

হে বসন্ত, হে মূল্য, হায় হায়, তোমার করুণা
কণকাল তরে।
মিলাইবে এ উৎসব, এই হাসি, এই দেখাশুনা
পুত্র নীণাঘরে।
নিরুজ্জের বর্ণিচা একদিন বিচ্ছেদবেলায়
ভেসে যাবে বৎসবাহতে হস্তসন্ধ্যাঘরের ডেলায়,
কনের মঞ্জীরখানি অবসর হবে নিদ্রাঘার
প্রাণিকান্তিরে।

আলঙ্কারিক রূপের আর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—'বৈশাখ'।
বৈশাখপ্রকৃতির রক্ততা, রক্ততা, গুহতা, উগ্রতা—
সমস্তই বৈশাখের তাপস রূপের মধ্য দিয়া কবি ব্যক্ত
করিয়াছেন।

আর একটি আলঙ্কারিক অহুস্মের চমৎকার দৃষ্টান্ত
'সাগরিকা'। এই কবিতার কবি নিজেকে ভারতীয় সংস্কৃতির
ভাবগতি। বৃহত্তর ভারতের বৈশিষ্ট্য উপনিবেশভূমিতে
ভারত যুগে যুগে তাহার কী মর্মবাণী (message)
পাঠাইয়াছে তাহারই কথা।

কবির আর একটি অহুস্ম 'স্মৃতিচিরের অহুস্ম'।
ভাবাবিষ্ট স্মৃতিতে তিনি যে চিত্র একদিন দেখিয়াছেন, ইহা
তাহারই বাণীময় প্রতিরূপ। বসন্তই না বসন্ত বসন্ত কবির
স্মৃতিপটে অহুস্মিত ও অহুস্মিত হইয়া অস্পৃষ্টতা লাভ
করিয়াছে। সাধারণতঃ এইগুলি বৃহত্তর কবিতার অঙ্গ
কিংবা কোন-না-কোন ভাবগন্ধনার পটভূমিকা। 'শিল্পের
চিহ্ন' কেবল স্মৃতিচিরে বসন্ত, ইহার সঙ্গে অল্প ভাবগন্ধনার
সম্বন্ধ নাই। কবির 'গন্ধার শোভা' চিত্রটি গড়ে রচিত
হইলেও অস্পৃষ্ট স্মৃতিচিহ্নের কবিতা।

পরশুষ্ঠান স্মৃতিচিরের দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল—

আজি যেমনকি দিন ; এসব আকাশ
হাসিছে বহুর মতো ; স্বপ্নের বাতাস
মুখে ঢেকে বকে আসি লাগিছে মধুর,—
অনুশ্রবণ বেন স্বপ্নে হিংস্র
উড়িয়া পড়িছে গায়ে ; ভেঁসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষে উপরি
তরল করেলে : অর্ধেক বসন্তের
দূরে আছে পড়ি, বেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে গুমে ; ভাঙা উচ্চতীর ;
ঘনহারা পূর্ণ তরু ; প্রবল কুটির ;
বহু শূণ্য পথবাণি দূর গ্রাম হ'তে
শব্দকেতু পার হ'য়ে মাঝিমাছে স্রোতে
তুহাও জিহবার মতো ; আমবধূণ
অকল জানায়ে জলে আতর্ক-মগন
করিছে পৌরুকালাপ ; উচ্চ বিটে হাসি
জলকলহের হিমি পশিতেছে আসি
কর্ণে বোর ; বসি এক বাঁধা নৌকা-পরি
ব্রহ্ম জেলে গাধে জাল নতশির করি
গোঁড়ে পিঁরি দিয়া ; উলস বালক তার
আনন্দে ঝাঁপিয়ে জলে পড়ে ব্যাঘ্রবার
কলহান্ত্রে ; বৈধব্যদী মাটার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহ-আলাতন ।

এই চিত্রের পর কবিতার একটা মন্তব্য আছে—তাহার
সার কথা—

এই তরু নীলময় স্থির শায় জল,
মনে হ'ল স্বপ্ন অস্তি সহস্র সরল ।

অতএব এই কবিতাটির রসমাধুর্য ঐ উপরিস্থিতি
চিত্রেই নিবদ্ধ । 'চৈতান্য'র 'মধ্যাহ্ন' কবিতার শেষ কথা—

আমি মিলে গেছি বেন সকলের মাঝে ;
কিহিন্দা এসেছি বেন আসি জন্মস্থলে
... ..

কোথার? যেখানে "মাতৃকনে শিশুর মতন—আমির
আনন্দের কবিতা গোষণ" আকড়িয়া ছিলাব সেখানে ।

এই কথাটি বলিবার ক্ষমতা কবি ১৯২৭ চরনের একটি
মধ্যাহ্নের স্মৃতিচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । অতএব ইহা
চিত্রাঙ্কন পরম্পরার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন ।

'ধাঁপি' কবিতার 'নিশ্চয় গরলার গলি'র চিত্র কেবল
পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা এবং 'সানাই' কবিতার স্মৃতিচিত্র

সানাইএর তানের সঙ্গে চিত্রের ছন্দভাঙা অসংগতি
সেখানোর ক্ষমতা অস্তিত্ব ।

'বোহাই' একটি চমৎকার স্মৃতিচিত্র ।

'শুনসেত' পুস্তক-ধারের স্মৃতিচিত্রটি সোতলাব কানাল
হইতে দেখা । এই চিত্রটি আধুনিকতার বেড়ার ঠাক দিয়া
২য় কালের আর একটি নারীর যে ছবি আনিয়া দিয়াছে,
সে ছবি বড় মর্যাদাপূর্ণ—

শূণ্য তার কল্প, স্মিত তার কণ্ঠ,
মুখ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি
তার সান্না মাড়ির সান্না চওড়া পাড়
হুটি পা মিলে ঢেকে পড়েছে ;
... ..

সে আবে-কটালের ছায়ায় ছায়ায় অল হুলে আনে,
তখন পোহেন ভাকে সম্মনের ডাল,
কিহে লোক হুসিবে বেড়ায় খেজুরের কোণে ।

আতঙ্ক বেঘের গোঁড়ে জীবনব্যতীয়ে প্রান্তে যে-সব ছবি
অনভিজগাচর ছিল, অকারণে কবির মনে জাগিয়া উঠিয়াছে
'আবেগের'—'ঘণ্টা বাজে দূরে' নামক কবিতার । একটি
ছবি—বাংলার নদীর খেয়াঘাটের কাছে বন্দর-জাহাজের
ছবি—যে ছবিতে—

হুড়ি কাঁধে জুটেছে বেছনি ;

মাথার উপরে ওড়ে চিল ।

মহাজনী নৌকোঙলো ঢালু তটে বাঁধা গাশাপাশি ;
মাল্লা বুনিতেছে জাল গোঁড়ে বসি চালের উপরে ;
আঁকড়ি বোঝের গলা পাতারিয়া চাবী ডেলে চলে
ওপারে ধানের ক্ষেতে—... ইত্যাদি ।

আর একটি পশ্চিম অঞ্চলের গঙ্গাভীরের শহরপ্রান্তের ছবি—
যে ছবিতে—

ডজিয়া আঁতার ডাঙে গব

শিতল-কাঁকন-পরা হাতে—

মধ্যাহ্ন আবিষ্ট করে একটানা স্বপ্ন ।

তরঙ্গের লতা হ'তে

ছাগল খেলায়ে রাখে কাঠি হাতে কুমাপালক ।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিই—ইহাকে স্মৃতিচিত্রও বলা যায়,
স্মরণচিত্রও বলা যায় । এই চিত্র ছন্দেই গভীর রঙ দিয়া
চিত্রিত । ইহাতে আছে বৌবনের দিনের স্মৃতি-মাধুরীর
আধার ।

মনে ছবি আসে—বিকিনিবিকি বেলা হলো,
বাগানের ঘাটে গা হুঁসেছ তাজাতাজি;
কচি দুখপানি, বরষ তপন বোলো;
তবু সেখানি ঘেরিয়াছে চুরে শাড়ি।
হুঁহুমনকোটা ভুরুশকমে কিবা,
বেতকরবীর গন্ধ কর্ণুলে;
শিছন হইতে দেখিলু কোমল গ্রীবা
লোভন হয়েছে বেশম চিকন চুলে।
তারুণ্যায় গোড়ে মালাখানি গঁথে
সিক্ত কন্ডালে বসে বেগেছ ঢাকি;
ছায়া-বেলা ছায়ে বাহুর বিরহে পেতে—
কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি?

... ...
মনে আসে, হুমি পুণ জানালার ধারে
পশমের গুটি কোলে নিয়ে আছ বসে—

উৎসব চোখে ব্রী আশা কর কারে,
আলগা আঁচল হাটিতে পড়েছে গলে;
অর্ধেক ছায়ে ব্রৌন নেমেছে বঁকে,
বাঁকি অর্ধেক ছায়াখানি দিয়ে ছাওয়া;
পাঁচিলের গায়ে চাঁদের গঁদের থেকে
চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে হাওয়া।

‘স্মৃতি দিয়ে ঘেরা’ চিত্রের কথা বলিলাম, এবার ‘বস্তু দিয়ে গড়া’ চিত্রগুলির কথা বলি। বস্তুচিত্রগুলি কবির প্রাচীন-সাহিত্যপাঠের ফল। কবির কল্পনা সাহিত্যের ইন্দ্রনা-চালিত পথে প্রাচীন ভারতের আবহেইনীর মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। এই প্রাচীন ভারত কবিগণের বস্তুমাধুরী দিয়া রচিত। যে পার্থকের কল্পনা কবির কল্পনার সহগামিনী হইতে পারে, এই চিত্রগুলি তাহারই উপভাষা।

বস্তুচিত্রের উৎকৃষ্ট নিদর্শন—সেকাল, প্রেমের অভিব্যেক, সেকাল ও একাল, বর্ষাযজ্ঞল, মেঘদূত ইত্যাদি। এখানে হুই—একটি চিত্র উৎকৃষ্ট করি—

দূরে বহুদূরে
বস্তুলোকে উচ্ছ্বসিনীপূরে
খুঁজিতে দেখিছ কবে শিঞানবীণারে
সোর পূর্বলিনমের প্রথম শ্রিয়ারে।
মুখে তার লোওরেণ্। নীলপদ্ম হাতে,
কর্ণুলে কুলকলি, কুলকলি মাখে,
তবু দেখে বক্তাবর নীলবন্ধে বাঁধা,
চরণে নুখবাণি থাকে আধা-আধা।

• •

শ্রিয়ার ভবন
বস্তুম সংকীর্ণ লগ্নে দুর্গম নির্জন।
ঘারে আঁকা শঙ্কর, তারি হুই ধারে
হুই শিত নীপতর পুত্রমেহে বাড়ে।
তোরেণের বেতকর-পরে
সিংহের গজীর মূর্তি বসি দস্তভরে।
শ্রিয়ার কণোতগুলি কিরে এলো ঘরে,
মহুঁ নিঃপ্রায় মর বর্ষক-পরে
হেনকালে হাতে দীপশিখা
দীপে দীপে নামি এল ঘোর মালখিকা।

‘প্রেমের অভিব্যেক’ কবিতার কবিকল্পনার অমরবতীতে কবি বস্তুচিত্র রচনা করিয়াছেন—সমরস্ট্রী, শঙ্করলা, মহাশেষতা, ব্রহ্মহা, পার্বতী ইত্যাদি কাব্যের নৃত্যিকাদের সইয়া।

‘প্রাচীন’ কবিতার পাই তপোবনের বস্তুচিত্র—
প্রভাতে—

তপোবনতরুণির প্রথম নবীন
জাগিল প্রভাত। বত তপসবালক—
শিখিরহুমিত বেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অঙ্ক-খোঁত বেন নব গুণ্যকটা,
প্রাতঃপ্রাত শিখকবি আত্মনিকটতা
অতিশোভা সৌম্যমূর্তি সঙ্কল্পলগ্নারে
বসেছে সেষ্টন করি কুলবট্টাঘারে
গুরু সৌতমেয়ে।

সন্ধ্যায়—

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অন্ত গেছে সন্ধ্যাপূর্ব; আশিরাহে ঘিরে
নিভন্ত আশ্রমমাগে শুনিপুত্রগণ
মহুকে সমিধু ভাষ করি আহরণ
বনান্তর হতে; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবনগোষ্ঠগৃহে শিখশান্ত-অগ্নি
প্রান্ত হোমধেনুগণে; করি সমাপন
সন্ধ্যাস্নান সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু সৌতমেয়ে মিরি কুটীরপ্রান্তে
হোমাদি-আলোকে।

‘সেকাল’ কাণিন্দাসের কাণিন্দ্য একটি চমৎকার চিত্র। সেকালের নাট্যিকার রূপচিত্র কবির বস্তু—
হুইমেহই পতলখায় বক রইত ঢাকা,
আঁচলখানির প্রান্তভিতে হাংসমিথুন আঁকা।

বিবাহেতে আখ্যাত থাকে। চেয়ে বইত বঁধুর আসে,
একটি করে পুষ্পার পুষ্পে দিন গণিত বসে।
বসে ছুটি বীণাবাদিনি গান গাহিতে তুলত বাণী,
রক্ত অলক অকচোখে লুপ্ত থাকে বসে।

....

শ্রীর নামটি নিখিরে দিত মাথের সাধিকারে
নাড়িয়ে দিত মৃদুস্বরে কল্পনাম্বরে।
কলোতজির লয়ে বুকে পোহাগ করত মুখে মুখে,
সারসীরে ঘাইরে দিত পল্লবকোরণ বহি।
অলক নেড়ে ছুটিয়ে বেষ্টি কইত কথা পৌরসেনী,
বলত স্বর্গীর গলা ধরে 'হলা পির সহি'।

'সাগরিকা' বৃহত্তর ভারতের একটি স্বপ্নচিত্র। ইহা পত্র-
চিত্রাঙ্কক পরম্পরাগত অলঙ্কারে চিত্র। আলম্ভাধিক
অনুকৃত্য ও চিত্রাঙ্কক অনুকৃত্য এই কবিতার উত্তমোত্তম ইহা
অনুপাতের সঙ্গী কবিরাছেন।

বদীভূতনাথের গাথা কবিতাগুলিতে স্বপ্নচিত্র অনেক সম্বর
পরিবেশের সঙ্গী কবিরাছেন; কোন কোন গাথার আশ্রয়
স্বপ্নচিত্র; যেমন—অভিসার, সামান্ত কতি, শর্শমনি, মঞ্চক-
বিক্রম, পুষ্করিণী।

'পুষ্করিণী'র স্বপ্নচিত্রের একটি নিম্নলিখন—

দেখা হুত কিরি দেল চলি বীরে বধু অমিতার ঘরে।
সমুখে বাধিয়া স্বর্গদ্বার
বঁধিতেছিল সে দীর্ঘ ভিত্তর,
আঁকিতেছিল সে ঘরে সিঁহুর সীমন্ত সীমা-পরে।

• • •

অম্বরবির রশ্মি-আভাসে বোলা জানালার ধারে
কুমারী শুভা বসি একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্যকাহিনী
চমকি উঠিল তনি কিছিন্নি—সাহিবা সেবিল ঘারে।

গদ্যাবলী সাহিত্যের প্রবর্তিত পথে কবির কল্পনা
কুমারবনের স্বপ্নলোকে বিহার করিয়া কতকগুলি স্বপ্নচিত্র
আঁকিয়াছেন। বর্গীর দিনে কবির—

পড়ে যনে বরিষার কুমার-অভিসার
একাকিনী বাহিকার চকিত চরণ।
স্বামল তমালতল নীল বদনার অল
আর হুটি ছলছল নগিননয়ন।
এ তরা বাসর দিনে কে বঁধিবে স্নান দিনে
কাননের পথ চিনে যন বেতে চায়।
বিভিন্ন বদনাবলি বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরাণ হুলে বিরহব্যথাবার।

'বর্গ-বাগন' কবিতার জানমালের অল্পসংখ্যে কবি
ঐরাধার স্বপ্ন-ভঙ্গতা রূপচিত্র অঙ্কন কবিরাছেন—

রজনী শান্তন ঘন ঘন দেবা গরজন—

মন-স্বপ্নে নিদ্রার মগন,—

সেই ছবি আগে যনে পুরাতন কুমারবনে

স্বপ্নিকার নির্জন ঘন।

হুই হুই বহে বাস, অধরে লাগিছে হাস

কেনে উঠে নুদিত পলক,—

বাহুতে মাখাটি বুঝে, একাকিনী আছে তরে,

পুষ্করণে তান দীপালোক।

সিরিশিরে মেঘ ডাকে, হুটি করে তরুনাথে

সাহুরী ডাকিছে সারসগতি,—

হেনকালে কী না ঘটে, এ সময়ে আসে ঘটে

একা ঘরে স্বপ্ননের সাধী।

এগুলি স্বপ্ন চিত্রের অঙ্গীভূত। কুমারবনী কবিতাগুলির
মধ্যে 'কুমারবনী' কবিতাটি আশাযোগ্য স্বপ্নচিত্র—কবি
কোনও অথৈ ভ্রমের বাথাল বাসল হইতে পাইলে কী
জীবনব্যাপন করিবেন, তাহারই, ভাবিক অলঙ্কারে রচিত
একটি চিত্র এই কবিতাটি। ইহার একটি স্বপ্নক এই—

ওরে, শান্তন-মেঘের ছায়া পড়ে কালো তমাল-মূলে,

ওরে, এগার-ওগার আঁধার হলো কামিনীরই কূলে।

ঘাটে গোপালনা ডরে

কানে ঘোরাবীরী 'পরে

মেঘে, কুমারবনে নাচে মধুর কলাপখানি কূলে।

ওরে, শান্তন-মেঘের ছায়া পড়ে কালো তমাল-মূলে।

আমি যে চিত্রাঙ্কক অনুকৃত্যের কথা বদিস্যাম, আরো
তাহা অনুকৃত্য কিনা তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে।
অনুকৃত্য বলিতে Sequence বা Succession-কে বুঝায়।
সঙ্গীত—Time-এর যথা নিঃস্রবিত, তাহারই অনুকৃত্য আছে—
চিত্র—Space-কে আশ্রয় করে—তাহার অনুকৃত্য থাকার
কথা নহে। চিত্রের বর্ণনায় পক্ষে তাহাই বটে, কিন্তু শিল্পীর
পক্ষে তাহা নহে। চিত্রশিল্পীর রচনায় চিত্রের একটি অঙ্গ
আর-একটি অঙ্গকে আকর্ষণ করিয়া আনে—Law of
Association-এর দ্বারা। চিত্র সোপানগত নহে যে,
একদিকে রূপলভ্য করিবে। চিত্রশিল্পীকে রচনায় একটি
অনুকৃত্যের অল্পসংখ্যে করিতেই হয়। বাণীচিত্রে কবিকে
একটির পর একটি অংশকে কল্পনা করিতে হয়—একটি অংশ
অন্য অংশকে রচনার আকর্ষণে টানিয়া আনে এবং তাহারই
মধ্যেও গ্রহণ-বর্জন করিতে হয়। অতএব চিত্রেরও অনুকৃত্য
আছে।

কুজেন

অন্তিম কবিতা

তোরা

চারদিকে সকলে ছুনিবিস্ত দেবতে লাগল।

হংস ফ্রৌক ময়র আর কুজেন করে না।
প্রাসাদতোরণে উড়ে এসে আর বসনা শুকসারি।
হিংস্র-অহিংস্র সব পশুই অধোমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
পশু আর ফুটছেন সারোবরে। গাছের পাতা
অকালে করে করে যাচ্ছে। বীণার তার ছিঁড়ে
পড়ছে অকস্মাৎ। মৃদঙ্গ বোল ফুটছেন। সকলেরই
বেন কর্তব্যজ্ঞানে বিভ্রম ঘটেছে। কার কটি নেই
আমোদে-বিনোদে, বিহারে-বিলাসে। সমস্ত পৃথিবী
কেমন মোহাচ্ছন্ন। রাজা অন্ধকার দেখলেন।

দুঃখ দেখল গোপা। গ্রাম নগর পর্বত, সমস্ত
পৃথিবী প্রকম্পিত হচ্ছে। মাটির গভীর আশ্রয় থেকে
ছিন্ন হচ্ছে বৃক্ষমূল। তারা খসে পড়ছে শূন্যে, চন্দ্র-
সূর্যও নিশ্চত। নিভেরও বা একি ভ্রপ! নিভের
হাতে চুল ছিঁড়ছে, ছিঁড়ছে গলার মুক্তাহার, ছিঁড়ছে
বেশবাস। যে খাটে শুয়েছে তার পা ভাঙা।
গড়িয়ে পড়ে ধুলোর লুটোচ্ছে। রাজার ছত্র-নণ্ড-
চামর খলিত-দলিত, সিংহাসনও টলমল করে
উঠেছে। স্বামীরও গাত্রাভরণ বিপর্যস্ত। এ কি
অকল্যাণ! নগরদ্বার দিয়ে এক জ্যোতিষিও
নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল, চারদিক থেকে অন্ধকার এসে
বিরে কেলল দিকদেশ।

বড়মড় করে উঠে বসল গোপা। পার্শ্বে শয়ান
স্বামীর ঘুম ভাঙল। পাণ্ডুযুগে বললে, 'নিদারুণ
ভয় পেয়েছি।'

সিদ্ধার্থ বললে, 'কিসের ভয়?'

'অন্তত স্বপ্ন দেখেছি। চারদিক খুঁত লাগছে।
প্রাণ ধুকধুক করছে।'

'কিসের স্বপ্ন?'

অলৌকিক স্বপ্নবৃত্তান্ত বললে তখন গোপা।

সিদ্ধার্থ বললে, 'তোমার এ স্বপ্ন ভয়হেতু নয়
পুণ্যহেতু। তুমি বিলীর্ণ হয়েনা, প্রমুদিত হও।
পুণ্যাদ্বারাই এরকম স্বপ্ন দেখে।'

ভাবাকুল চোখে গোপা। তাকিয়ে রইল।

'তোমার স্বপ্নের ফলাফল বর্ণনা করি, শোনো।'

বলতে লাগল সিদ্ধার্থ। 'হৃমিকম্পের অর্থ হৃমি
সমস্ত চর ও অচরের পূজ্য হবে। নদীকূহ উন্মূলন
ও মুক্তাহার বিখণ্ডনের অর্থ তুমি ভবক্লেশভাল ছিন্ন
করে দিব্যজ্ঞান লাভ করবে। রবিচন্দ্রের হানিমার
অর্থ তোমার অরজ্জালা অতৃপ্তি-অশান্তির মোচন
হবে। নিভের কেশবশ ছিন্ন করহ, তার অর্থ
আত্মধরুপের সাক্ষাৎ করবে। রাজার ছত্রদণ্ড
ভাঙার অর্থ কৃত্যে প্রতিষ্ঠিত হবে একচ্ছত্র বর্নরাজ্য।
আর আমারও যে গাত্রাভরণ চ্যুত-হ্রষ্ট দেখছ তার
অর্থ আমার প্রচারিত ধর্ম সমস্ত পাণ্ডিত্যশীকে উদ্ধার
করবে। তুমি ভয় পেয়েনা, প্রকৃষ্ট হও।'
সিদ্ধার্থের কণ্ঠস্বর করুণার্পী হল। 'গোপা, তুমি
অদানাত্মা, জ্ঞানে-গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ। জীবজগৎ অনিত্য-
মুখে যুদ্ধ, মাদ্রা-জালে আবৃত। দুঃখানলে পুড়ে
যাচ্ছে রাত্রিদিন। সেই দুঃখের অপনয়ন করতে
আমি এসেছি। তুমি আমার সহায় হও।'

‘আমি তোমার সহধর্মী।’ স্বামীর সান্নিধ্যবাক্যে আশ্বস্ত হল গোপা। সুখে নিশ্চিন্তা হল।

কিন্তু সিদ্ধার্থের হৃদয়ে সুখ নেই। শরবিদ্ধ সিংহের মত সে অস্থির।

মার্চে চাষ হচ্ছে দেখতে পেল সিদ্ধার্থ। কৃষ্যনাথ ভূমিখণ্ডের দিক তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। এ কি, হলের আশ্রিতে অসাধারণ কীটপতঙ্গ মরে রয়েছে! এত প্রাণীর জীবনের বিনিময়ে খাদ্যসংগ্রহ। এ তো কীটপতঙ্গ নয়, সিদ্ধার্থেরই স্বজন-স্বগণ। আত্মীয়-বর্ধের শোক লোক যেনন কাতর হয় তেমনি করেই প্রাণের ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। আর, এরা কান! ? বায়ুরৌহণ্ডলি দ্বারা বিকৃত হয়ে মাটি চব্বতে, আর বহনশ্রমবিবশ পশুগুলি চলতে পারছে না—এরাও কি আমার আত্মীয় নয়? ভূতপুংগ থেকে নেমে দলবল থেকে মরে নির্জনে গিয়ে পাড়াল সিদ্ধার্থ।

বৈদ্যমণির মত ঘনজ্ঞানল ভূগের আচ্ছাদন এই ভূমিতলে। সিদ্ধার্থ সেখানে বসে চিন্তাক করল। আত্মজ্ঞান ব্যাধি থেকে মুক্ত করল চিন্তাকে। আর অবজ্ঞাও নেই অহঙ্কারও নেই। হর্ষও নেই অনর্ঘও নেই। যেমন অস্ত্র তেমনি অসংশয়।

নানসমন্বয়ে এক পুরুষমূর্তি দেখতে পেল সিদ্ধার্থ। ভিগগেস করল, ‘হুনি কে?’

‘আমি চন্দ্রমুহুরীভৌত শ্রমণ।’ জরাব্যাধি আর বৃদ্ধার চিন্তায় পীড়িত হয়ে মুক্তির অন্বেষণে গৃহত্যাগ করেছি। যে মুখের ক্ষয় নেই সেই সুখই আমার প্রার্থনীয়। যে ধনের ব্যয় নেই সেই ধনই আমার আহরণীয়। যে জীবনের লয় নেই সেই জীবনই আমার আরাধা।’

‘কোথায় থাকো?’

‘কখনো বিজ্ঞান বৃক্ষমূলে কখনো পর্বতে কখনো গহনারণো। আমি নিরাকাজ্ঞ, সঙ্গীহীন। যথাগত ভিকাই আমার উপজীব্য।’

‘কিন্তু আমি কি করি?’ সিদ্ধার্থ সত্যতঃ

বললে, ‘যত্নাচার আগার এই সংসারে আমার শান্তি কই? শান্তি কি সম্ভব?’

‘যখন অশান্তি আছে, তখন শান্তিও আছে। চুঃখের যেখানে মূল সেখানেই সুখের বৃন্ত।’ বলতে লাগল শ্রমণ, ‘উত্তাপের অর্ধই কোথাও না কোথাও শৈত্য বিরাজ করছে। চরম ক্রোধ যদি আছে নিশ্চয়ই আছে তবে অনন্ত বিজ্ঞান। এখন সেই বিজ্ঞান সেই আনন্দ সেই শীতলতার সন্ধান করো। আয়াস না থাকলে অন্বেষণ হবে না। যে ভুজায় ভর্জর সে যদি জলাশয়ের সন্ধান না করে সেই দোষ জলাশয়ের নয়। পথ পড়ে আছে মানুষই চলছেন, মানুষও পড়ে আছে। পথ পথের নয় দোষ মানুষের। চিকিৎসক থাকে তবেও যদি ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ তার সাহায্য না নেয় তবে চিকিৎসক কি করবে। আয়াস করো, আয়াসেই পুরস্কার।’

‘কিন্তু সংসার আমার কাছে শুধু ভোগোপকরণের থালা সাজিয়ে আনছে। বাবা বলেন, পার্থিব সম্ভোগই আমার একমাত্র কর্তব্য, তাতেই আমার বংশের মর্যাদা। বলেন, আমি বয়সে তরুণ, আমার দেহ-মন এখনো উপযুক্ত হয়নি।’

‘দেহ-মন সব সময়েই উপযুক্ত।’ বললে শ্রমণ, ‘নিবাস গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন দেহ-মন উপযুক্ত নয়? ধর্মই নিবাস, সর্বমামুখের প্রাণবায়ু। আর বংশের মর্যাদা? যে পৃথিবীর মৃত্যুদাতা হবে তার কাছে কিসের কুলাকুল? যে ভোগ ক্ষণভঙ্গর তাতে কোন বুদ্ধিমান আকৃষ্ট হবে? কামনাই বিষ, কামনাই বন্ধন। তুমি এই বিষবন্ধন তুচ্ছ করে অগ্রসর হও। শিরে বস্ত্রাবৃত হলেও সত্যের পথ থেকে বিচলিত হয়না। অনন্তলক্ষ্য হয়ে সংগ্রাম করো, ঈগিল জয় তোমার করায়ত্ত।’

ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল।

সিদ্ধার্থ রাজার সামনে এসে উপস্থিত হল। বললে, ‘আমি মোক্ষের ক্ষেত্রে প্রত্যা নিতে চাই।’

ক্ষণকাল স্তম্ভিত হয়ে রইলেন শুদ্ধোদন। মর্মমূল পর্শস্ত হিম হয়ে গেলেন।

‘এমন নয় আমাদের বিচ্ছেদ কোনদিন হবে না।’
বিনয়বিশদ খরে বললে সিদ্ধার্থ, ‘আমাদের বিচ্ছেদ
মৃত্যুদ্বারা নির্দিষ্ট, স্থিরীকৃত। স্মৃতরাঃ প্রেমসমন্বিত
আমাকে বিদায় দিন। আপনাদের অগ্রমতি আশীর্বাদ-
স্বিষ্ট হোক, আমার সমস্ত হৃদয় পথ নিষ্কটক
করুক।’

রাজার ছুই চোখ জলে ভরে উঠল। কুমারকে
তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, ‘তুমি এ বুদ্ধি
কোদোনা। এই তোমার প্রথম বয়স, তোমার
চিন্তাভাবনা স্বাভাবিক। তাই প্রথম বয়সে ধর্মান্তরণ
দোষাবহ। ইন্দ্রিয় বার ভোগে উৎসুক সে ব্রতক্রম
সম্ব করবে কি করে? অরণ্যে প্রবেশ করলেও
অরণ্য থেকে সে প্রতিদিন বৃত্ত হবে।’

‘একবার পরীক্ষা করে দেখি না।’ দৃঢ়বিক্রমের
মত বললে সিদ্ধার্থ।

‘ধর্মান্তরণ করবার সময় এখন আমার, তোমার
নয়। আমার রাজস্বয়ীর তার তোমাকে অর্পণ করে
আমিই এখন অবশ্য হব। বিক্রমের দ্বারা রাজ্য-
পালন করাই তোমার ধর্ম হবে। পিতাকে ভাগ
করলেই অধর্ম। আমি যা বলি তাই শোনো।
সুন্দর গৃহস্থধর্মে রত হও। যৌবনে স্থখভোগের
পরেই তপোবনপ্রবেশ প্রশস্ত।’

আপনার কথা আমি শিরোধার্য করব যদি
চারটি বিষয়ে আপনি আমার প্রতিজ্ঞা হন।
সিদ্ধার্থের মধ্যে এতটুকু অস্পষ্টতা নেই। ‘আমি
বৃত্তি অবলম্বন করছি আপনিও তাই করুন।’

‘কি তোমার চার বিষয়?’

‘প্রথম, আমার জীবন মরণান্তক হবেনা।
দ্বিতীয়, রোগ আমার স্বাস্থ্য হরণ করবেনা। তৃতীয়,
জরা আমার যৌবনকে বিধ্বস্ত করবে না। আর
চতুর্থ, বিপত্তিতেও আমার সম্পত্তি অক্ষর থাকবে।’
‘এ প্রার্থনা ছাপুর।’ রাজা বিরক্ত হলেন। ‘যা
স্বভাবসিদ্ধ তার বিরুদ্ধ অভিলাষ পোষণ করা অর্থ
লোকের কাছে উপহাস্য হওয়া।’

‘যাতে তাই না হয় সেই কারণেই’ আমাকে

নিবৃত্ত করা উচিত হবে না।’ কুমার বললে শাস্ত্র-
মুখে। ‘মহানান গৃহ থেকে যে নিষ্কান্ত হতে চাচ্ছে
তাকে কেন বাধা দিতে যাচ্ছেন? মৃত্যুর বিধান
পৃথিবী থেকে বিচ্ছেদ যখন সুনিশ্চিত তখন স্বেচ্ছায়
ধর্মের জগ্রে বিচ্ছেদই কাম্যতর। আর যত দীর্ঘ
আয়ু পাই না কেন সংসারে মৃত্যু যখনই সম্মুখীন
হবে তখনই দেখব আমি অতৃপ্ত আমি অকৃতার্থ।
এই বার্থতার ভার নিয়ে আমি মরতে প্রস্তুত নই।
আপনি অগ্রমতি করুন।’

কোনো কিছুতেই নড়, বিরত হয়না সিদ্ধার্থ।

রাজা ক্রোধে লাগলেন। নশীরের বললেন
এমন ব্যবস্থা করো কুমার যেন আর বাইরে না যায়।
আর গৃহান্তান্তরে তার জন্তে সর্বোত্তম ভোগ্যবস্তু
স্তুপীকৃত করো।

পিতার অঙ্গপাতে নিবৃত্ত হল কুমার। বিষয়-
মুখে প্রবেশ করল অন্তঃপুরে।

অম্বঃ সুখঃ জলসবঃবিয় ভো তিগন্ধে

দুঃখস্ত সাগরজলঃ বিয়সবলোকে।

সুখ ভুগাশ্রের জলবিন্দুর মত অম্ব, দুঃখ সাগর-
জলের নতই অপরিস্রব। সর্বলোক একমাত্র দুঃখেই
পরিপূর্ণ। সুখ যাকে বলি তা কল্পনা, তা আভাস,
তা দুঃখেরই ছদ্মবেশ। অভ্যন্তরে বহিঃ, বাইরে শুধু
ভগ্নের প্রলেপ।

কিন্তু সুখ কি নেই? আছে। বিপুল সুখ।

মহা সুখপরিচয়ঃ পশুসে চ বিপুলঃ সুখঃ।

জগ্রে মহা সুখঃ ধীরোঃ সম্পদসঃ বিপুলঃ সুখঃ।

যদি স্বল্প সুখ ছেড়ে বিপুল সুখের অধিকারী
হওয়া যায়, বুদ্ধিমান নিশ্চয়ই সেই বিপুল সুখের
জগ্রে স্বল্প সুখ পরিত্যাগ করে।

কিন্তু সেই বিপুল সুখ কি? বিপুল সুখ নির্বাণ।
শুধু আনন্দের পরিধি দীর্ঘ করে এ সুখ পাওয়া যাবেনা,
আনন্দের হতে-হতে চলেছে, একদিন-না-একদিন
শত অনিচ্ছা সবেও তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ সুখ
পাওয়া যাবে স্পর্শের নিরোধেই হলে। ইন্দ্রিয়, বিষয়
ও বিজ্ঞান এই তিনের সংযোগেই স্পর্শ। স্পর্শ

থেকেই সংজ্ঞা, স্পর্শ থেকেই বেদনা। স্পর্শ নিরুদ্ধ হলে সংজ্ঞা ও বেদনাও নিরুদ্ধ। এই সংজ্ঞা-বেদনায় নিরোধই নির্বাণ। তাতেই পরমতম বিপুলতম স্থ।

অবিজ্ঞা ও ভবতৃষ্ণার অশেষ নিরোধে সমস্ত সংসারমুক্তি নিরুদ্ধ হলেই নির্বাণের সাক্ষাৎকার।

নির্বাণদ্বার অবারিত অমৃতের দ্বার। অবাণু-রোহঃ অনন্তসুস্বাদঃ। সর্গোপাদিবিক্তি সর্বসংসার-মুক্ত চিত্তের এক বিশেষ অবস্থা, বিশেষ আলম্বন নির্বাণ।

‘সমস্ত মতবাদের বন্ধন থেকে সমস্ত সত্ত্বদ্বয়ের সতীকর্তা থেকে মুক্ত করে আমি তোমাদের শূন্যবাদের উদ্ভূত আকাশতলে নিয়ে এলাম।’ বললেন তথাগত।

আকাশ কি শূন্য? আকাশ পূর্ণতার প্রতিমূর্তি। কে প্রাণধারণ করত যদি আকাশে না থাকত এই আনন্দের প্রাণনা!

১১৮

কান দুই রকম, বস্তুকান ও রেশকান। ভোগের হব্য পাবার যা ইচ্ছা তাই বস্তুকান। আর ভোগের হব্য পেয়েও যে অতৃপ্তি তাই রেশকান।

এই দুইরকম কানেই জীর্ণ হচ্ছেন বারাণসীরাজ।

সে জন্মে বোধিসত্ত্ব দেবলোকের অধিপতি হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বারাণসীরাজকে দ্বিবিধকানে আসক্ত দেখে স্থির করলেন তাকে নিগূহীত করবেন। লঙ্কার মত নিগ্রহ আর কিছু নেই।

ব্রাহ্মণকুমারের বেশ ধরে বোধিসত্ত্ব রাজার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

‘কি চাই?’

‘নহারাজ, একটা সুসংবাদ দিতে চাই।’

‘বলো।’ রাজা উৎসুক হয়ে উঠল।

‘তিনটি নগর আপনাকে দান করতে চাই, ইন্দ্রপ্রস্থ, কেকয় আর উত্তর-পঞ্চাল। তিনটি নগরই সমৃদ্ধ, শত্ৰুসম্পদে ভো বট্টেই, অর্থে গড়ে রথে, কাঞ্চনে কামিনীতে। প্রথমত সেনা নিয়ে

আক্রমণ করে এই তিনটি নগর আমি অধিকার করব, তার পরেই দান করব আপনাকে।’

‘সেনা নিয়ে? কত সেনা?’

‘অশ্বসংখ্যক সেনা হলেই চলবে। যেহেতু আমি সদ্ধান এনেছি আমারই অধিকার অগ্রগণ্য। যেহেতু সেনা আপনার, শেষপর্যন্ত নগর তিনটি আপনারই প্রাপ্য। আমি নিয়ে দিয়ে দেব আপনাকে।’

‘অত কথায় কাজ কি?’ রাজা চক্কল হয়ে উঠল। ‘সমীচেষ্টে কখন আনাদের যাত্রা করতে হবে তাই বলো।’

‘আগামী কাল।’

‘বেশ, তবে এখন যাও। কাল প্রত্যতে এসো।’

‘তাই আসব। আপনি সেনা সুসজ্জিত করুন।’ এই বলে বোধিসত্ত্ব চলে গেলেন দেবলোকে।

পরদিন প্রত্যতে রাজ্যে ভেরী বেজে উঠল। সৈন্যসামন্ত অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে দাঁড়াল জ্যেষ্ঠ বৈধে। কিন্তু সদ্ধানদাতা সেই ব্রাহ্মণকুমারের দেখা নেই।

মন্ত্রীদের ডেকে পাঠাল রাজা। কই সেই ব্রাহ্মণকুমার?

‘কার কথা বলছেন?’ মন্ত্রীরা মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

‘কাল যে বলে গেল নগরত্রয় জয় করে আনাকে দান করবে? উত্তর-পঞ্চাল, কেকয় আর ইন্দ্রপ্রস্থ। বলে গেল আজ সকালে আসবে, সেনাবাহিনী নিয়ে সদলে আক্রমণ করবে, তার ক্ষণে সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, সে কোথায়? যাও, তাকে নিয়ে এস নিগিরি।’

‘কোথেকে নিয়ে আসব? তার ঠিকানা কি?’ মন্ত্রীরা প্রশ্ন করল ভয়ে-ভয়ে।

‘ঠিকানা?’ রাজা বেন আকাশ থেকে পড়ল। শুকমুখে বললে, ‘কই, তা তো জেনে রাখিনি।’

‘যখন এমন সে একটা শুভসংবাদ দিল তখন

তার জন্তে একটা থাকবার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিলেই হত।’

‘আশ্চর্য, তা তো নহে হয়নি।’

‘তাছাড়া সে খাবে কি? তার খাবার খরচও তো কিছু দেননি বোধহয়।’

‘না, খেয়াল ছিল না।’

‘তবে এখন তাকে ধরব কোথায়?’

‘তা জানি না। বেখান থেকে পারো তাকে ধরে নিয়ে এস।’ রাজা পাগলের মত হয়ে উঠল।

‘নগরের পথে-পথে খুঁজে বেড়াও।’

সমস্ত নগর তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। কোথাও পাওয়া গেলনা ব্রাহ্মণজুমারকে।

রাজা লোকশয্যা আশ্রয় করল। অবিকল্পে বিলাপ করতে লাগল, নিজের বুদ্ধির দোষে বিপুল ঐর্ষ্য থেকে বঞ্চিত হলান। লোভই আমার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রইল! একবার জানতেও চাইলামনা তোমার চিকানা কি। কেনই বা তাকে চলে যেতে দিলাম, সামান্য একরাত্রির জন্তে কেন তাকে রাজ-অভিধির সম্মান দিলাম না? কেন তাকে অবহেলা করলাম?

রক্ত কুপিত হল, হৃৎপিণ্ড স্তিমিত। রোগের কবলে পড়ল রাজা। বৈজ্ঞান্য বহু চিকিৎসা করল কিন্তু রোগের নিবারণ নেই।

তখন বোধিসত্ত্ব স্থির করলেন, যাই, রাজাকে নিরাময় করে আসি।

বৈজ্ঞের বেশে দাঁড়ালেন রাজদ্বারে। সংবাদ পাঠালেন, আনি রাজার চিকিৎসা করব।

রাজা উপহাস করল। বললে, দেশবিদেশের কত বৈজ্ঞ এসে হার মেনে গেল, এর কি স্পর্ধা আমার উপশম করবে! প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন, কিছু পাথের দিয়ে বিসের করে দাও প্রার্থীকে।

দ্বারপ্রান্ত থেকে বোধিসত্ত্ব বললেন, ‘আমি পাথের চাই না, দক্ষিণারও আমি ভিক্ষুক নই। আমি চিকিৎসক। রোগ যখন ছেনেছি তখন চিকিৎসা

আমাকে করতেই হবে। দয়া করে রাজার সঙ্গে একবারটি আমার দেখা করিয়ে দিন।’

‘বেশ, আসতে বলো।’ রাজা হুকুম করল।

বহারাজের জয় হোক। উদার আশীর্বাদ করে একান্তে বসলেন বোধিসত্ত্ব।

রাজা তীক্ষ্ণচোখে নিরীক্ষণ করল বৈজ্ঞকে। অবিবাসের হাসি হেসে বললে, ‘তুমিই আমার চিকিৎসা করবে?’

‘করব।’

‘বেশ, করো।’ বাড়ী দেখাবার জন্তে হাত বাড়াল রাজা।

বোধিসত্ত্ব হাত স্পর্শও করলেন না। বললেন, ‘তার আগে আপনি আমাকে আপনার ব্যাধির লক্ষণ বলুন। তারও আগে জানতে চাই কি করে এই ব্যাধির উৎপত্তি হল। কেন, কি কারণে? কিছু খেয়ে, ছুঁয়ে, দেখে, না শুনে?’

‘আমার এই ব্যাধি, শুনে।’

‘শুনে?’

‘হ্যাঁ, আমার এই রোগ জ্বরণজাত।’

‘কি শুনেছিলেন?’

‘শুনেছিলাম আমার কথা, লোভের কথা। এক ব্রাহ্মণজুমার আমাকে এসে বললে, তিন-তিনটি নগর জয় করে আমার দান করবে। লোভে এত অন্ধ হলাম, তার বাসস্থান বা আহারের কোনো ব্যবস্থা করতেই ভুলে গেলাম। রুই হয়ে সে আমাকে ভ্যাগ করল, আর খুঁজে পাচ্ছি না তাকে। নিশ্চয়ই সে অন্ধ কোনো রাজাকে আশ্রয় করেছে। যে ধনবৈভব আমার হতে পারত তা এখন অস্তিত্ব নেই। নিজের ছদ্ম্বুদ্ধির জন্তে বিপুল ঐর্ষ্য থেকে বঞ্চিত হলান। সেই চিন্তায়ই আমার এই ব্যাধি। তুমি এর কী করতে পারো? হুরাকাজ্জালনিত ব্যাধির উপশম কি তোমার জানা আছে?’

‘আছে।’

‘আছে?’ উন্নতিত হল রাজা। বললে, ‘তাহলে ওষুধ দাও।’

বোধিসত্ত্ব বললেন, ‘আপনার এ নোগের ওষুধ বনজ উদ্ভিদ থেকে তৈরি করিনি, জ্ঞান দিয়ে মুক্তি দিয়ে তৈরি করেছি। কালসাপ যদি নংশন করে, মহাবীরে তার আরোগ্য সম্ভব। হৃতাযিকেরও কৌশলপ্রয়োগে শূন্য করা চলে। কিন্তু যে হুরাকাক্সার দাস তার উদ্ধার ভেবেছে নয়, তার উদ্ধার জানে।’

রাজা নির্মলদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

‘সুহৃদ, আপনাকে বুকিয়ে বলি।’ বলতে লাগলেন বোধিসত্ত্ব। ‘ননে করুন, আপনি সেই তিন নগর ভয় করেছেন। কিন্তু আপনি যখন আপনার নিজের নগর নিয়ে মোট চার নগরের গ্রহু হলেন তখন কি আপনি যুগপৎ চার বস্ত্র পরিধান করতে পারবেন? একসঙ্গে চার স্তূর্ণধালায় অন্ন ভোজন করতে পারবেন? একসঙ্গে চার রাজসযায়ে ভুতে পারবেন? মহারাজ, তুষ্কার পূরণ নেই, পূরণেও নিবৃত্তি নেই। স্তূত্রায় সংঘত হোন প্রশান্ত হোন, তুষ্কার আত্মনে পুড়ে অপারে প্রবেশ করবেন না।’

তুষ্কার উচ্ছেদ হল রাজার, ব্যাধিরও উপশম

হল। শীলাচারসম্পন্ন হয়ে পুণ্যাহুষ্ঠান করতে লাগল।

জাবস্তির স্রাক্ষণ রাজপুত্রোহিতের মেয়ে দস্তিক।। গৌতমী মহাপ্রজাপতির কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে সঙ্গে প্রবেশ করেছে।

কি খেয়াল হল, সেদিন গৃধ্রকূট পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে। কী দেখল সে পাহাড়ে উঠে?

দেখলাম এক বলোদ্ধত হাতি স্নান সেরে নদীতীর উত্তীর্ণ হচ্ছে। ক্ষুদ্র দুর্বল এক মানুষ তাকে চালনা করেছে। মানুষের হাতে যে ক্ষুদ্র অদৃশ, তাতেই সে মহাবারণ বশীভূত। দেখলাম সেই ক্ষুদ্র মানুষের আদেশে সেই বিশালদেহ হাতি তার সামনের পা প্রসারিত করে নিয়েছে। উত্তোলিত করেছে শুঁড়। মানুষকে স্নেহসমানর করে তুলে নিচ্ছে পিঠের উপর।

অদৃষ্টকে দমিত করেছে মানুষ। বশ্যকে বশ্য করেছে। তবে আর ভয় কি।

আনি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত ও বশীভূত করলান। এ একাত্তাই আনার সাধের মধ্যে।

[বন্ধন]



— রিকশার গান —

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৬৮

আজও সমস্তদিন ঘুরে ঘুরে কোন ফল হোল না। অপরিমীন ক্রান্তি আর অবসাদ। প্রাইভেট টুইশনি সংক্ষেপে খুব যে একটা মোহ আছে এমন নয়, বরং তার উপরই, কিন্তু উপায়ান্তরও তো নেই।

হিহু অনেকখানি দূর। কাল এইসময় যখন ফেরে, একজায়গায় একটা আশা নিয়ে ফিরেছিল তাই পথটা খেয়াল হয়নি। আজ গোড়াতে এসেই আশাভঙ্গ, গৃহধারী নিয়োগ করবার যা সঠক মিলেন তার শেষেরটা কানের মধ্যে যেন কায়েমী হয়ে বসে গেছে, এখনও গাটা সিরসির করে উঠছে। মানিয়ে সানিয়েই বলবার অবস্থা চেষ্টা করলেন— “আর কিছু নয়...বাজার—সেটা অবিশ্বিষ্ট চাকরটাই করে...তবে নেহাত যদি কোনদিন গরহাজির হোল...হয় না বড় একটা, তবে...সৈবাং যদি...”

“তাহলে এঁটো বাসন-কোসনও তো থাকবে পড়ে?”

ওঁর বক্তব্যটা পুরোপুরি বেরুবার আগে উত্তরটা যে দিয়ে ফেলতে পেরেছিল এই সান্দ্রনা নিয়ে বেঁচে আছে তড়িৎ। প্রথমই ঐ প্রবল ধাক্কা, তারপর অবসর মন নিয়ে আরও পাঁচটা জায়গায় টুইশনির সন্ধান নিয়ে বেড়ানো, পা যেন আর উঠতে চাইছে না।

সামনে একটা রিকশা আসছে। ঝাঁচির উচুনীচু রাস্তা দিয়ে রিকশার আরাম—চিন্তাতেই শরীরটা যেন আরও ভারী হয়ে আসে। রুখবে কি রুখবে না এই ভাবনার মাঝেই আপনি-আপনি যেন একটা ব্রফা হয়ে গেল, পকেটে হাত দিয়ে পরমা-রেজপি যা আছে গুণতে লাগল। দরকার ছিল না;

নিয়ে বেরিয়েছিল ছ’আনা, দশ করে নেবার জন্য দু’বার ছ’খিলি পান খেতে হয়েছে, বাকি পড়ে আছে পাঁচ আনা। জানাই। রিকশাটা যে গড়ানের মুখে, সা করে বেরিয়ে গেল হিসাব করতে না করতে, মিলে ডাকলে হোত।

এক এক সময় মনকেও ছেলে-ভোলাতে হয়; তাই বোধহয় করল তড়িৎ। চড়াই হৈলে উঠতে লাগল।

একটা বাড়ির রক, রাস্তার ধার থেকেই উঠেছে। মনে হয় বাঙালীর বাড়ি যেন। ঝাঁ, তাই; ছেলেনেদেরদেদ গলা শোনা যাচ্ছে। জাত-টিউটার, সে গলায় বয়স চিনে নেয়...রয়েছে যেন সম্ভাব্য ছাত্র-ছাত্রী, দেখবে নাকি একবার চেষ্টা করে? তাহলে কিন্তু আগে রকটায় একটু জিরিয়ে নিয়ে।

এগিয়ে যাচ্ছিল, মজর পড়ল চড়াই হৈলে একটা রিকশা উঠে আসছে। ঘুরে দাঁড়াল। প্রশ্ন করল— “হিহু যাবি?”

যাবে রিকশাওলা।

“কত নিবি?”

এখান থেকে হিহুর দশ আনা। পাছে অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা এসে পড়ে সেই ভয়েই যেন তড়িৎ চেপে বসল রিকশাটায়, বলল— “চল।”

তারপর অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করতে লাগল। না, পুঁজি-ভাঙা আর চলবে না। হাতে মাত্র সতেরোটি টাকা আছে, তার মধ্যে দশটি না থাকার মধ্যে। ধীর বাড়িতে ছেলে পড়িয়েছিল, মহীশ্রবাবু, খুব হিমাবী লোক তিনি। তঠাৎ বদলি হয়ে যেতে হোল। আটদিনের ভাড়া বাদ দিয়ে বাকিটা

বাড়িওয়ালাকে দিয়ে গেছেন, তড়িতের সঙ্গে মোকাবিলা করেই ; বাকিটা সে মাসের শেষে দিয়ে দেবে। তারপর পুরো ভাড়া দিয়ে থাকতে পারে না-পারে সে তার নিজের ভাবনা। সাতেরো থেকে দশ গেলে বাকি থাকে সাত। ওতে হাত দিলে আর রিকশা চড়ার আরাম একদিন উপবাসের তর্জণে স্বেচ্ছাসিদ্ধ হবে। পকেটে যে কটা পয়সা আছে, তাইহেই যা হয়।

তবু একবার চেষ্টা করল। বলল—“হ্যাঁ, হিমুর তো অত ভাড়া নয় ; তবে তুই অত চাইছিস কেন ?”

তবু একবার চেষ্টা করা, নৈলে রিকশা বাঁচিতে এসে চড়ল তবে যে ভাড়ার খবর রাখবে ? রিকশাওয়ালা জানাল—তবু ইউনিয়ান যে রাতে দূর শব্দে ‘ইন্সপিরাল’ গेट বেঁধে নিয়েছে সেটা চার্জ করেনি। আবার মনে মনে হিসাব চলতে লাগল। একটু পরে...কথটা মুখ দিয়ে বের করতে কেমন লজ্জা-দজ্জা করছে। তা এত লজ্জাই বা কিসের ? আধা-অন্ধকার নির্জন পথ ; আর রিকশাওয়ালা, সে এমন কিসের কুটন ?—তাও রয়েছে উল্টো দিকে দুখ ফিরিয়ে ; বলেই ফেলল তড়িৎ—“তুই বরং এক কাজ কর—ছ’আনায় যেখান পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবি সেইখানে গিয়ে আমার নামিয়ে দে। কতখানি হবে ?”

রিকশাওয়ালা জানাল—নদীর এপার পর্যন্ত যেতে পারে।

তাহলে তো হিমু আর বেশি দূর থাকে না। বেশ হেঁটে ওটুকু সেবে ফেলতে পারবে ; ততক্ষণ বেশ খানিকটা বিশ্রামও পাবে তো। বসে আবার পুঁজির হিসাব করতে লাগল—পকেটে যেটা রয়েছে। এবার লজ্জাটা আরও বেশি করে চেপে আসছে, তবু চোখকান বুজে বলেই ফেলল—“তুই বরং এক কাজ কর, চার আনা পর্যন্ত যতটুকু নিয়ে যেতে পারবি ততটুকুই নিয়ে চল।...তোকে রান্তির আর বেশি বোঝাতে চাই না।”

রিকশাওয়ালা এবার চুপ করে রইল। ওর নীরবতার জন্তেই আরও বেড়ে গেল লজ্জাটা। কী মনে করল লোকটা ? খুব শাসালো যাত্রী পেয়েছে তো, পয়সা বাঁচাবার জন্তে অর্ধেকেরও বেশি পথ হেঁটে দিতে চায় ! অপ্রতীত হয়ে অন্তরমনস্থ হয়ে গেছে, হাঁস হোল নদীর গড়ানের সামনে এসে ; বাস্তব হয়েই বলে উঠল—“একি, তুই তো নদীর ধারেই এনে ফেলচিস ! পাড়া—নামি।”

পাড়াল না রিকশাওয়ালা, গড়ানের মুখে রিকশা নামিয়ে দিয়ে বলল—“চল, তুরে হিমুতেই পৌছায়া দি’।”

আপত্তি করল আবার, কিন্তু তখন রিকশা গড়গড়িয়ে নেনে চলেছে, নাথাক মাঝে ব্রেকের চাপ দিয়ে সংযত করে রাখা। এক ধরনের স্বস্তিই অমূল্যব করছে তড়িৎ, সেই যে একটা হীন সৈন্তের ভাব এসে পড়েছিল, সেটা কাটিয়ে দেওয়ার একটা সুযোগ। একটু দরজা কঠেই অবহেলার ভাবে বলল—“তা চল নিয়ে। গরীব মানুষ লোকমানে পড়িস কেন ? পুরো ভাড়াই নিয়ে নিস।”

ছোট্ট পাঁকোটা পেরিয়ে রিকশা চড়াইয়ে মাথা তুলল। প্যাডেলে চাপ দিয়ে রিকশাওয়ালা বলল—“দশ আনা দিবি কেনে ? চার আনাই দিবি ; তুরে পৌছিয়ে দিছি।”

“তা কি হয় ? গরীব মানুষ আছিস...”

“হ, আছি। গরীব না হলে রিকশা টানব কেনে ? তা আর তো গরীবটি নয়। তুর বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে ভালো রোজগার করলাম—সাদে পাঁচ টাকা কামালাম,—চল, তুরে দিয়ে আসি। উ চার আনাও বাঁথে দিবি।”

“তা কি হয় ? তবে নেনে বাই আমি। তোর মেহনতের পয়সা...”

চড়াইয়ের মুখে পায়ের চাপে প্যাডেলের চেনটা খটখট করে পিছলে পিছলে যাচ্ছে। রিকশাওয়ালা চাপা নিশ্বাসের মধ্যেই বলল—“তুর জন্তে আর আলাদা মেহনত কুখায় হোল ?”

“তার নান্নে?”

“ইদিকেই তো আসছিলাম। রিসকা জমা দিতে হবে না?”

“জমা দেওয়া নান্নে? তোর নিজের নয়?”

“নিজের কুখা থেকে পাব রে, গরীব মানুষ। আটটা থেকে আটটা রাত। ছ’টাকা ভাড়া, হিহুন আগে অখিল ঘোষের দোকান, তুরে নামায়ে এসে জমা দিয়ে দেব—এই তুর রিসকা, এই তুর ভাড়া... কুবাই এখন খালাস।... তু পয়সা না দিবি। আজ আনি আর গরীব কুখায়?”

হঠাৎ একটু অন্তমনস্ক হয়ে গেছে তড়িং, সংশ্লিষ্টভাবে বলল—“আজ্ঞা চল, সে দেখা যাবে পৌছে।”

হঠাৎ একটা নতুন চিন্তার জোয়ার এসেছে। এই রিকশাওলা, নামটা বলল কুবাই, আজ আটটা থেকে আটটার মধ্যে মাড়ে পাঁচটা টাকা উপার্জন করল! তড়িং, ও-নশগণ্ডা পয়সা নেওয়াবেই, তাহলে ছ’টাকার ওপরেও আরও দু’গণ্ডা। স্বাধীন বৃত্তি, কাকর গোলাম নয়, কাকর খাতক নয়। কাকর মুখ-প্রত্যানী নয়; বরং উলটে বদান্ততা করবার অধিকার অর্জন করেছে; বলল—চার আনাতেই যাবে। অশক্ত দেখে করুণাবশে আরও উদার হয়ে উঠল—“উ চার আনাও রাখি দিবি”।

প্রার্থী না হয়েও প্রার্থীর লজ্জা, প্রার্থীর হীনতাটা অবশ্য অস্বস্তি করছে তড়িং, তার পাশেই কিন্তু রিকশাওলার বৃকের গোরবটাও নিজের বৃকে যেন করছে অস্বস্তি; অতবড় একটা কথা বলতে পারা অমন বরজ গলায়!

চড়াই-উতরাইয়ের ঢেউ ভেঙে এগিয়ে চলেছে। পিঠের ওপর একটা হেঁড়া পেজি; ভালোরকমই হেঁড়া, তার বড় বড় কাটলের মধ্যে দিয়ে ওর কালো কুচকুচে গায়ের খানিকটা খানিকটা বাচ্ছে দেখা। ঘামে ভেজা পিঠের পাঁজরের মাসলগুলো চিকচিক করে পাকিয়ে উঠছে। একটা অপূর্ব ছন্দ, সারা অঙ্গ জুড়ে স্বাধীন মুক্ত আনন্দের নৃত্যছন্দ।

তড়িংয়ের মনেও দোলা দিচ্ছে, চোখ কেবোতে পারছে না।

গল্প আরম্ভ করে দিল তড়িং, ভীষন-মুছে জয়ী এইরকম একজন পুরুষের অন্তরঙ্গতা লাভ করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

আদিবাসী, বাড়ি মানচুন জেলায়—পঞ্চকোট পাহাড় জানে তো তড়িং?—তারই নীচে নঙ্গলডি ব’লে একটা গ্রামে। কিছু ক্ষেত আছে, বেশিটুকুই মহাজনের কাছে বাধা পড়ে গিয়েছিল, তাই রোজগারের জন্য বেরিয়ে পড়ে; মাস-দুয়েক হোল। প্রায় সবটুকুই ছাড়িয়ে এনেছে, বড় তাই দেখানো করে, তার কাছে টাকা পাঠায়।

“তাহলে ফিরে যাবে নাকি এবার?”—তড়িং প্রশ্ন করে।

একটা ছোট চড়াইয়ের মুখে প্যাডেলের ওপর জোরে চাপ দিল কুবাই। পায়ের গুমোট। পায়ের পোস্টের আলোয় চকচক করে উঠল; বলল—“না, আর কে যাবে রে? রোজগার হইছে। অখিলবাবুর পারা দোকান করব। উ-ও তো এমনি রিসকা ঠেলেছে, আজ পনেরখানা রিসকার মালিক—ফি রিসকা তিনটাকা, হিসাব করে দেখ্ না। আর ফিরে যাব কেনে?”

অবশ্য রোজ যে পাঁচ-মাড়েপাঁচ ইচ্ছে এমন নয়—অখিলবাবুর পাঁচনার কমও হয়ে গেছে কখনও কখনও, তবে কর্ত্ত রাখে না—কর্ত্ত হারানী তো; বেক্ষার সময় ওছুটা টাকা কুঁয়াতে রেখে নেয়।... যেমন কম পড়েছে তেমনই আবার মাড়ে পাঁচটাকার ওপরেও উঠে গেছে। দূর শব্দের সবচেয়ে বেশি কানিয়েছে বারো টাকা!

উৎসাহে মাথা ঘুরিয়ে একটু ছলিয়েই দেয় কুবাই—“হী রে, তবে বলছি কি তুকে—বারো টাকা—একদিনের রোজগার—ই ছানা পায়ের জোরে, আর কিছু না! তু ভাবিস কি?”

অনেক কিছু ভাবছে তড়িং—মুখে একটা অন্তমনস্ক হাসি, তার অন্তরালে অনেক কথা, তার

সবটাই টাকার কথা নয়—টাকাটা স্বয়ং গোণ, অবিল যোগ হয়ে ওঠাটাও গোণ। মুখ্য কথা, যা সব-কিছুরই ওপরে—তা নব্বাশা, তা মুক্তি; পৌত্ত্ববকে স্বীকার করে নিয়ে, অভিনন্দিত করে নিয়ে, দেহের সঙ্গে বিতালি ক'রে নিয়ে আঘার বিজয় অভিযান। রুবাই যেন মানুষকে আজ নিভের সত্য চিনিতে দিল।

এর পাশে আজকের সেই অভিজ্ঞতাটা ধরা যাক-না।

হেলেনবেরেনের বিজ্ঞানদান করবে, কতবড় সম্মান, কতবড় মর্যাদার কাজ; লোকটার কিন্তু বলতে মুখে একটু আটকালো না যে চাকরের অবর্তমানে খুলি কাঁধে করে বাজার করে আনতে হবে!

রুবাই প্রশ্ন করল—এবার কোন্ দিকে যেতে হবে?

এতই অশ্রুমনস্ত ছিল তড়িং যে খানিকটা এগিয়ে প্রস্তুত আর একবার করতে হোল, তড়িং উত্তর করল—“কি বললি?...ও! ঠ্যা...তাকে অতদূর যেতে হবে না; আমার অবিলবাবুর ওখানেই নিয়ে চল।”

রুবাই প্যাডেল ধানিয়ে ঘুরে চাইল, বিম্বিত প্রশ্ন হোল—“অবিল ঘোষের উখানে? সিধায় তুই কি করবি?”

তড়িতির হ'শ হোল, এরকম একটা প্রশ্ন হতে পারে। প্রস্তুত ছিল না, তাড়াভাড়াভাবে যা একটা জুগিয়ে গেল তাই বলে দিল—“করা...মানে, একজন অবিল ঘোষকে জানতাম, দেখব সেই কিনা।”

“ছাড়িয়ে এসুন যে তার গলিটা।”

“কতটা এসেছি?...তা হোক গে, ফিরে চল।”

“কিরলে, রিসকা জনা দিয়ে দিতে হবে। টাইম হয়ে গেল কিনা।”

“তা দিয়ে দিবি; ভাড়া ভোকে পুরোই দোব।”

রুবাই আর কিছু বলল না। রিকশা ঘুরিয়ে নিয়ে অগ্রসর হোল। বোধহয় মনে মনে ভাবল,

এ-তুত ঘাড় খেকে তাড়াভাড়া কোনখানে কেড়ে ফেলাই ভালো।

২২

একটা আকারীকা গলির মধ্যে দিয়ে খানিকটা ভেতরে গিয়ে অবিল ঘোষের রিকশার আছা। সাননেটা এরকম হলেও ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। প্রায় বিধে দুয়েক জায়গার একদিকে একটা টানা খোলার চালের বারান্দা, তার একপাশে একটা ছোট্ট কারখানা, কিছু মেরামতের কাজ হচ্ছে, খানতিনেক রিকশা পাড়িয়েও রয়েছে, বোধ হয় সন্ধ্যা জমা দেওয়া। একজন একরঙা লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরা মাঝবয়সী লোক তদারক করে বেড়াচ্ছিল, রুবাই রিকশাটা রেখে তার দিকে এগিয়ে গেল, তড়িংকে বলল—“তু-ও আয়।” কাছে গিয়ে বটুয়া খেকে দুটো টাকা বের করে হাতে দিয়ে বলল—“বাবুটি তুর সাথে কথা বলবেক।” তড়িংকেও প্রশ্ন করল—“চেনা আছে তুর?”

ঘাড় নেড়ে তড়িং উত্তর করল—না, নেই। পাড়িয়েই রইল। রুবাই অবিল ঘোষকে একটা সেলাম করে চলে গেল।

“কোন দরকার আছে আমার সঙ্গে?”—অবিল ঘোষ প্রশ্ন করল।

তড়িতির উত্তরটা একটু অসংলগ্নই হোল; বলল—“না, তেমন কিছু নয়।...রিকশায় আসতে আসতে লোকটার সঙ্গে আপনার সঙ্ঘে অনেক কথা হোল...তাই মনে হোল, একবার দেখে আসি...”

কয়েক সেকেন্ড উভয় পক্ষে নীরবতার পর শেষ করল—“ইয়ে...আপনি রিকশা ভাড়াই খাটান?”

“ঠ্যা, খাটাই।”—কথাটা বলে একবার তড়িংকে আগাগোড়া ভালো করে দেখে নিল, তারপর আবার প্রশ্ন করল—“কেন?”

“তাহলে নিতুন।”

“আপনি নিজে চালাবেন?”

“ঠা।”

“লাইসেন্স আছে?”

তড়িং একটু থতমত খেয়ে গেল। রিকশা চালাবার ক্ষেত্রে যে লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় এটা জানা ছিল না। তবে অল্পতড়িই প্রকাশ না করে বলল—“সে তো আপনিই যোগাড় করে দেবেন।”

“শেখা আছে চালানো? অবোস আছে?”

আবার থতমতই খেয়ে গেল তড়িং, উত্তরও একরকম বা ভুপিয়ে গেল তাই দিয়ে দিল ক্যালক্যুল করে চেয়ে মুখের দিকে—“সাইকেল চালাতে জানা আছে...”

অখিল ঘোষ এবার হেসে ফেলল; বলল—“তবে আর কি? সে হুঁচাকা, এ তো একটা চাকা বেশি, খড়বার ভয় নেই, কি বলেন?...না, অত সহজ নয়। অবোস দরকার, গাড়ের জোরও দরকার, রীতিমতো...”

ওর শরীরের ওপর আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল—“তা নয় আছে আপনার খানিকটা, কিন্তু...”

হঠাৎ প্রশ্ন করে বলল—“রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে-টালিয়ে এসেছেন নাকি?”

তড়িং কথা ঘুরিয়ে একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে বলল—“পালিয়ে আসতে যাব কেন?”

“তবে? হঠাৎ রিকশা চালাবার ঝোঁক? পারবেন কেন? তত্ত্ববরের ছেলে মনে হচ্ছে...”

“আপনিও তো ভদ্রবরের ছেলেই...”

—মনটা অগোছাল হয়ে রয়েছে বলেই কথাটা ক্রমেন যেন জড়ভাবে বেরিয়ে পড়ল; তখন সামলে নিয়ে একটু অপ্রতিভভাবে হেসেই বলল—“ওর কাছে শুনলাম কিনা, আপনি নিজের চেষ্টায় এই করেই...মানে গোড়ায় এই করেই কারবারটা ধাড় করিয়েছেন, তাই...”

“আপনি করেন কি? বাড়ি কোথায়?”

প্রথমটা এড়িয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নটারই উত্তর দিল তড়িং—“বর্ধমান জেলায়...একটা গ্রামে।”

“কতদিন এসেছেন এখানে?”

“ছ’মাস।”

“কি করেন?”

এবার একটিনার প্রশ্ন, তাও পুনরুক্ত, আর এড়ানো গেল না। আর অবশ্যিকর প্রশ্ন বাড়ানোর দিকে গেল-ও না তড়িং, বলে গেল—“পড়ি। বি-এ পাস করে বর্ধমান থেকে চলে এসেছি, এখানে নাম লিখিয়েছি এম-এ’তে। বাড়ির অবস্থা ভালো নয়তো, টুইশন ধরেছিলাম একটা, ওদিকেও তাই করে পাস করি। তা ভদ্রলোক হঠাৎ বদলি হয়ে যাওয়ায় মুশকিলে পড়ে গেছি; তাই—”

“অচ্চ টিউশন ধরুন না। এ-কাজ আপনি পারবেন না।”

“পাচ্ছি না যে। এই তো তারই খোঁজে ঘুরে ঘুরে বাসায় কিরছি।”

অখিল ঘোষ একটু চুপ করে ওপর দিকে চোখ তুলে চেয়ে রইল, তারপর দৃষ্টি নানিয়ে বলল—

“আনার দরকার একজন টিউটার, করবেন?”

তড়িং মুখের দিকে ক্যালক্যুল করে চেয়ে রইল। অখিল ঘোষ বলল—“সুবিধে করেই যাব। কত পেটেন সেখানে?”

ক্যালক্যুল করে চেয়েই রইল তড়িং, যেন প্রশ্নে কোণঠাসা হয়ে আর উপায় দেখতে পাচ্ছে না। চেয়েই রইল একটু, তারপর মুখে কয়েকটা বিকারের রেখা ফুটে উঠল, তার সঙ্গে একটা কঠিনতাও; বলল—“খাচ্, যাই...না, টুইশন আমি আর করব না।”

অখিল ঘোষ বলল—“খামুন। ছ’ঘণ্টা করে রিকশা চালিয়ে পড়বেন কখন, কলেজ যাবেন কখন?”

আবার একটু হতভম্ব হয়ে পড়ল তড়িং, প্রশ্ন করলে—“ছ’ঘণ্টার কম পাওয়া যায় না?”

“তার কমে রোজগার হবে কোথা থেকে? সকাল ছটা থেকে বারোটা, বারোটা থেকে ছটা, আবার ছটা থেকে রাত বারোটা। বারো ঘণ্টা

করেও কেউ কেউ নেয়, যার গায়ে শক্তি আছে, যে বেশি রোজগার করতে চায়।”

“আমার তো সে-রকম রোজগারের দরকার নেই, পড়ার খরচটা চালিয়ে নেওয়া, কোনখানে একটু মাথা খাচ্ছে থেকে। যে রকম আন্দাজ করছি, যদি আপনার ভাড়া দিয়ে টাকা দেড়েক বাচে তাহলেই চলে যাবে আমার। এর ভাগে ধরুন ঘণ্টা দু'আড়াই—মানে আমি যা আন্দাজ করছি আর কি : তার ভগ্নে কত নেবেন আপনি ?”

“ঘণ্টা দু'একের ভাগে না হয় আনা-আঠেকই দিলেন, কিন্তু ঐ ছুটা টাকা কামাতে অসুস্থ ঘণ্টা-চারেক সময় তো লাগবেই, তাও রোজ যে পাবেনই এমন বলা যায় না।”

মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল—“তাই বলছি, ও মতলব আপনি ছাড়ুন। যা অব্যাস তাই করুন, টিউশন, আমার এগানে না হয় অল্প কোথাও, আমিও চেষ্টা দেখতে পারি।...আমার কথা শুনেছেন, আমার শুধু রোজগার করাই ছিল উদ্দেশ্য : আপনার যে পড়াও রয়েছে সঙ্গে, তাও আবার বলছেন এন-এ।”

তড়িং শুনে যাচ্ছিল, কিন্তু মন এদিকে ছিল না, আগের কথার ভের ধরেই বলল—“চার ঘণ্টার জুড়েই দিন তাহলে...”

একটু অপ্রতিভভাবে হেসে বলল—“ছ'টা থেকে নয় কিন্তু, ধরুন সাতটার পর, বেশ একটু গা-ঢাকা হয়ে গেলে...”

অখিল বোবও হাসল : বলল—“আমি কিন্তু দিনের বেলাই চালাতুম—সারা দিন, গা-ঢাকা দিয়ে নয়।”

তড়িং সেইরকম লজ্জিতভাবেই হেসে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল—“দিনের বেলা যে আমার কলেজ—”

উত্তর পক্ষেই একটু চূপচাপ গেল। তারপর অখিল বোব একটু চিন্তা করতে করতে টেনে-টেনে বলল—“ওরকম সময় মেওয়ার একটু অসুবিধে

আছে, বে-টাইম হো, আর চার ঘণ্টার ভাগে দেওয়া আরও অসুবিধে, তিনটে শিক্‌ট একরকম ভাগ করা আছে তো...কিন্তু তা হোক, দোষ আপনার।”

দৃষ্টিতে খানিকটা প্রাণশ্রম নিয়ে তড়িতের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তড়িতের দৃষ্টি লজ্জায় একটু আনত হয়ে পড়ল, তারপর কিন্তু মুখটা বেশ সোজা করেই তুলে ধরল সে, বলল—“আপনার দয়ার ভগ্ন ধন্যবাদ, আজ যেন বড় বেশি নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম, মনে হচ্ছিল রাঁচি বোধহয় ছাড়তেই হোল তাহলে।”

অখিল বোব বলল—“এতে আর দয়ার কি আছে ? পড়তে চাইছেন, এটুকু তো সাধি থাকলে করাই উচিত। বরং আরও যদি কিছু করতে পারি যাতে সুবিধা হয় আপনার...”

“লোভ বাড়ান্ছেন ?”

“সে ভয় নেই। ব্যবসায়ার মানুষ তো, লোভের বাড়াবাড়ি দেখি, পেছিয়ে যাব।”

—কথাটা বলে একটু হাসল। তড়িংও হেসেই বলল—“তাহলে সাহস করে বলতে পারি, যখন বলছেন বেশি কতি হবে দেখলে রাজী হবেন না। বলছিলাম, চার ঘণ্টার ভাগেই নোব, কিন্তু যদি কোন-দিন তার আগেই এই পরসটা পেয়ে যাই—ঐ ছুটা টাকা—তো আরো আগেই জমা দিয়ে যাব রিকশা।...পড়বার খানিকটা সময় পাওয়া যায় আর কি।”

অখিল বোবকে চিন্তিতভাবে চূপ করে থাকতে দেখে বলল—“অবশ্য, আপনার যা পাওনা...”

উত্তর হোল—“আমি সেই তয়ই করছিলাম। মস্তবড় দয়া দেখাচ্ছি বলছেন, আপনিও আবার উলটে দয়া না দেখান।”

তড়িং একটু ধাঁধা খেয়ে গিয়ে বলল—“বুঝলাম না তো।”

“পাওনার বেশিই দিতে চাইছেন তো—সে সব দিনে অত পাওনা যে হবেই না।”

হেসে উঠল তড়িং ; বলল—“তা বেশ, হিসেব-মতো পাওনার চেয়ে কমই নেবেন সেদিন।”

একটু খেমে বলল—“আমার মাথা কি এ-ভাবে দয়া নিয়ে আপনার দয়া শোধ করি? আপনি আজ যা...”

চাপা নিয়ে দিল অখিল ঘোষ; বলল—“আগে সেখান অত দয়ার ভার সহিবে কিনা, ঐ রিকশাখানা নিন, আশুন আমার সঙ্গে। চড়ে চালাতে পারবেন না, হ্যাণ্ডেল ধরেই নিয়ে আশুন—হুঁহাতে।”

কারখানার পাশে ফাঁকা জায়গাটা প্র্যাকটিস করবার জেতেই ছেড়ে রাখা, একটা বড় চক্রাকারে রিকশার চাকার দাগ পড়ে গেছে। উঠে চালাতে গিয়ে কিন্তু তড়িতের খুণ শুকিয়ে গেল, অখিল ঘোষের মুখের দিকে চেয়ে বিমূঢ়ভাবে বলল—“এ-বে দশমুদী বোকা একটা, অত জোরে চালায় কি করে—এর ওপর আবার লোক নিয়ে?”

উত্তর হোল—“এইজ্ঞাচ্ছই তো বলেছিলাম—অত দয়ার বোকা সহিবে পারলে হয়। টের পেলেন তো, নেমে আশুন এবার।”

হ্যাণ্ডেল বশে রাখাও প্রায় হুঁচাকার সাইকেলের মতোই ছুস্ত, মনে হয় তিনটে তিন দিকে বাওয়া করছে। তড়িং কিন্তু নামল না। বুঝল, জিনিসটা যখন এত চলেছে, আর, তার চেয়ে দুর্বল লোককেও যখন হনহনিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে দেখছে নিত্য—তখন ভেতরকার একমাত্র রহস্ত নিশ্চয় অভ্যাস। দেখল, তাই-ই। জ্যোৎস্না রাত্রি, প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে মেহনত করল, অবস্থা জিরিয়ে জিরিয়ে; আরও করত, একটা উৎসাহের জোয়ার এসে গেছে, অখিল ঘোষই বারণ করল, এইতেই হাতে পায়ে ব্যথা ধরবে।

ছোটো দিন দিতে হোল বাদ, তারপর ক্রমে ক্রমে সহজ হয়ে আসতে লাগল। প্রথমটা নিকুংসাহ করলেও অখিল ঘোষ যথাসাধ্য সাহায্যই করল। এখানে রপ্ত হয়ে বাওয়ার পর রাস্তায় বের করালো রিকশা, নিজে রইল রিকশা নিয়ে আগে-আগে। প্রথমে নির্জন রাস্তা, তার পর অপেক্ষাকৃত

জনবহুল, তারপর বাজার। চলার নিয়ম-কায়দা আয়ত্ত করিয়ে একেবারে পাকা হয়ে লাঠিসেল নেওয়াতে দিন পনেরো লাগল। তারপর নিজেই গাড়ি বের করল তড়িং। ওর প্রথম দিনের সওয়ারিও হোল অখিল ঘোষ।

বেশ খানিকটা হালকা-মন হুঁরকন ড্রাইভের মধ্যে দিয়ে ঘোরাশ, বাজারে নেমে কিছু কেনাকাটাও করল—কপের দোকানে, খাবারের দোকানে; তারপর ফিরে গিয়ে রিকশা থেকে নেমে বলল—“এবার যা করছি সেটা কিন্তু অসুভাবে নেবেন না, শোঁতাই।”

কিছু বুঝে ওঠবার আগেই পকেট থেকে হুঁচাকার একট নোট বের করে বাড়িয়ে ধরল; বলল—“নি।”

তড়িং হকচকিয়ে গেল একেবারে, মেহনতে মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছিলই, তার ওপরও একফলক রক্ত পড়ল ছড়িয়ে—নিশ্চয় অপমানই। অখিল ঘোষ ঝাঁহাতটা পিঠের ওপর রাখল; বলল—“না, বলেছিই তো অসুভাবে নিতে পারবেন না। এটা শুভ-বৈনি—ওকালতিতে আছে, ডাক্তারিতে আছে, গরীব ব্যবসা বলে আমাদেরই বা থাকবে না কেন? ...এও তো না-লক্ষ্মীই; তাঁর মর্যাদা এটা...”

প্রায় একমাসেই ছোটো বিরুদ্ধ অনুভূতির সংঘাতে—বিশেষ করে বোধহয় এই শেষের কথাটিতে তড়িতের হঠাৎ মনে হোল যেন চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসবে, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল—“নি।”

—মাথায় ঠেকাল নোটটা, তারপরে হঠাৎ মুখ তুলে তর্ক তুলল—“কিন্তু, এ তো আপনি আমাদেরই ঘুরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন, আমাদেরই স্বার্থে; তাড়া নোব কি বলে?”

অখিল ঘোষ বিস্ময়ের ভান করে বলল—“সে কি! বাজারে আমার দরকার ছিল না?—দেখলেন আবার, কল এদব কিনলাম এক গাদা।”

“দলিল পাক। করে রাখছেন, তা কে জানত
বলুন”—বলে হাসতে হাসতে তড়িৎ নোট। পকেটে
রাখছিল, অখিল ঘোষ আবার বিছায়ের অভিনয়
করে বলল—“তা বলে সবটা পকেটস্থ করেন যে!
বাঃ, আমার পাওনা আট আনা কে দেবে!”
একটা হাসি উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা।
অখিল ঘোষ নিমন্ত্রণ করে বলল—রাত্রে ওর

ওখানেই বেতে হবে আজ। আপত্তিই করল তড়িৎ,
কোন উপলক্ষ্য তো নেই, মিছামিছি...

বিশ্মিতই হোল অখিল; বলল—“উপলক্ষ্য নেই
কি মশাই! জ্বাতে তুললে তো পঙ্ক্তিতোজ দেয়
একটা, জ্বাতে নানিয়েই বা দেবে না কেন?
অতিপূরণ বলেও তো একটা কথা আছে।”

[ক্রমশঃ]

তবুও

শান্তবীল দাস

তবুও তোমার মুখ বারে বারে মনে পড়ে,
কেন যে জানি না।

হৃপ্তরে আগুন-রোদে রাতের জোছনা
মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় :

সাত-রঙা রামধনু আকাশের গায়
এখনো ওঠে যে দেখি ; তার সাথে ভেসে ওঠে
ফেলে-আস। জীবনের অনেক-স্মৃতিতে-ঘের।
সেই দিনগুলি আর সেই মুখখানি :
কেন যে জানি না আজো দেয় হাতছানি।

এখানে রুক পথ, ধূ ধূ মল্ল, বিস্তৃত প্রান্তর :
তৃষ্ণাতুর ঘাসীনল আকাশের পানে
বারে বারে চায় আর হতাশা-কাতর
দীর্ঘবাস লুকায় অন্তরে :
একটি ঘাসের কণা নেই কোনখানে।

আকাশে সজল মেঘ কোনদিন উঠবে কি,
জানি না, জানি না :
শ্রাবল শব্দের স্বপ্ন রূপ নেবে কিনা !
এখানে চরন্তু ঝড় আর পথ অসীম অশেষ—
মুমূর্ষু জলার গতি অকস্মাৎ কবে হবে শেষ।

তবুও তোমার মুখ মনে পড়ে যায় :
হৃপ্তরে আগুন-করা রোদে দেখি রামধনু
আকাশের গায়।



[দুঃস্বপ্নের পর]

এই সেই দিগ্বাণীকামিনী স্বন্দরী, যে মরিশ।
উইলিয়াম মরিশের শিরীষকু খানি জোল-এর পুথিবীখ্যাত
চিত্র "সুন্দরী সোপান"-এর কেন্দ্রীয় মূর্তি যে মরিশ। শ বলেছেন
"then in the flower of her youth, you can see
her in Burne-Jones's picture
coming down the Golden Stairs,
the central figure"। প্রথম দশনেই
প্রেম, এ আর বিচিত্র কি? কিন্তু
দিগ্বাণীকামিনী সম্পর্কে সচেতন হলেও
শ'র মনে হল—"এই দিগ্বাণীকামিনী
পরিহিতা অপর রমণীদের সঙ্গে আমার
সাধারণ সাংযোগে ছিন্ন হতে পারে না।
আমার সন্দেশ হইলো না যে স্বর্গলোকে
আমাদের বাগ্‌দানের কথা লিখিত
হ'য়ে গেল।"

নিম্নক শ-কাতীর উক্তি। এই
ধরনের উক্তির অল্প শ'র অত্যন্ত অসুস্থ
ডক্টরাও নায়ে মাঝে বিরক্ত হতেন।
কেবল নিজের কথা চিন্তা করতেই তাঁর
আগ্রহ। অপর কারও মনোভাব
গোচর চেষ্টা তিনি করতেন না।

যে মরিশের প্রতি নিজের প্রেমের কথা সবচেয়ে তিনি
সচেতন, কিন্তু যে মরিশের প্রেমের পরিমাণ তিনি
করেননি। একজন পবিত্র মন্তব্য এই ধরনের একটি
ঘটনার মুখোমুখি হলে কি করতে? তিসাধী-নিবাস না
করেই অনন্তের বৃক্ক কাঁপিয়ে পড়তো। প্রেমের গভীরতা
প্রদর্শনে আহুপ হলে শ্রিত্যমাকে নির্দিষ্ট আলিঙ্গনে জড়িয়ে
থরতো। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মাহুগতিব নাম অর্পণ বানীভ শ,
তাঁই তিনি নিজের দাবিরোধের কথা স্বার্থে চিন্তা করতেন,
যেন এই অভাবটাই স্বার্থেই পড়ে কথা, যে মরিশের যে
অর্থদামর্থ ছিল তাতে উভয়েইই ভালোভাবে কেটে যেতে
পারতো। তা ছাড়া সাংবাদিক-সমালোচক হিসাবে শ'র
বাংসরিক আর্থ তখন প্রায় চারশো পাউণ্ড। কিন্তু শ'র কথা
জানতেন, মরিশের পরিবারে প্রতিপালিত আর্থের লব্ধ
চারশো পাউণ্ড কুণ্ড।

সুতরাং শ' দিগ্বাণীকামিনীর পরিহিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ
হয়ে নিশ্চিত হইলেন, এধিক একদা যে মরিশ এক
অপকিৎসক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর এনগেজমেন্ট ঘোষণা
করলেন। লোকটা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়—যদি কেউ
প্রশ্ন করিতে থাকায় এই তার মনোগত অভিপ্রায়।
অতিদাখ্যক এই কবিতারই নাম এই, স্থানিভে ল্যাবিয়ে।
শ' বলেছেন—"Suddenly, to my utter stupefaction,
and, I suspect, that of Morris also the beautiful
daughter married one of the Comrades."

এতদিনে শ' বুঝলেন—এই তো স্বাভাবিক পরিণতি।

সুন্দরী
সোপান



ভাবনী মুখোপাধ্যায়



স্বর্গ নোপান

শিল্পী : হার্ব জোন্স

[কেরী নুটি যে বাস-এর আশ্রয় অতি]

দিবা-বাগদানকে কারেবী ঘর মনে করা তুল হয়েছে। কিন্তু রোমানদের ইতিহাসে এ এক নিপাক্তন বিশ্বাস-ভাঙের ব্যাপার বলে আমি আশ্ব মনে করি। আমার চাইতেও কমবেশ অনেক অযোগ্য, আর্থিক সক্তি তার ভালো ছিল না, আর (বসিচ তার পক্ষে তখন জানা সম্ভব ছিল না) ভণিত্ত উন্নতির আশা তার পক্ষে অতি ক্ষীণ।"

মিস মরিস হৃদয় শ'র উল্লাসীনতার বিরুদ্ধ হয়েছিলেন, আর তা ছাড়া দেখা যায় স্ক্রুটী ও দুষ্টিমতী বেডেরা অনেক সমস্ত প্রেমিকের কাছ থেকে সরে এসে এই ধরনের অযোগ্য ছদ্মছাড়া বাহুবের প্রতিই হুঁকে পড়ে।

সেই জন আভিনের যতে এই রোমানদের উপদেষ্টার প্রায় কথিক। নিজের নিবুদ্ধিতার জ্ঞাপনবিধি করতে গিয়ে শ বলেছেন, এই সব ঠার অতিশব্দ স্বঃস্ববিক ত্রুণ ঘটেছিল, অতিবিক খাইনি এবং অনিযমিত অভ্যাসাদি তার বেহু। বিভ্রাম ও বাহু-পরিবর্তনের একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বখারীতি বাহু-পরিবর্তনের ব্যয় বহন করা তাঁর পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল। শ বলেছেন—"এই নবহৃৎতি আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটানোর জ্ঞ, আমি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম, এবং পরমানকে কিছুকাল ওদের বাড়িতে বিজ্ঞানমুগ উপভোগ করলাম, এ বাড়িতে 'মরিসীরা মাফুরী' মেশানো ছিল। যে তার পিতার সৌন্দর্যবোধ এবং সাহিত্যিক জ্ঞানবলী উত্তরাধিকারস্বত্বে পেয়েছিল। ওদের সেই নতুন সংসারে চমৎকার কাটতে লাগলো। আমাকে অতিমি হিসাবে পেয়ে যে খুশী, আর শ্যারদিং খুশী হয়েছিল এই ভেবে যে, আমি তার গ্রীক মনোবহ বৈজ্ঞানিক রেখেছিলাম, কোনো বামীই গ্রীকে এমন আনন্দে রাখতে পারতো না। তরীরা মধ্যে আমিই হয়তো আনন্দময় পক্ষ।" কিন্তু এইভাবে বেশীদিন ছিল না, শ বে সময়টিকে মনে করছেন বহুরের বহনের কাল শেষ হল ঠিক সেই সময়েই এই আইনসম্মত বিবাহে বিচ্ছেদ ঘটলো। শ দেখলেন মহা বিপদ, ওদের স্বপতক হয়েছে এই দুহুর্তে : "I had to consummate it or vaniab."

অর্থগ শ'র পক্ষে বা স্বাভাবিক তাই ঘটলো, তিনি এই সংকটময় মুহূর্তে অদৃষ্ট হলেন। যে মরিসকে আর একবার বসিত করলেন বার্নাড শ। তিনি বলেছেন—"মের স্বামী আমার বন্ধুজন, আমার প্রতি তার ব্যবহার অতি মনোহর। তার আতিথ্য স্বীকার করে তারই গ্রীকে নিয়ে সরে পড়া আমার সম্মানে ব্যেধ, এক কৰ্ম সামাজিক দিক থেকে অনাড়রীয়। বসিচ যৌন এবং ধর্ম সম্পর্কিত ব্যাপারে আমি স্বাধীন মতবাদ পোষণ করতাম, কিন্তু সাহিত্যিক ও সামাজিক মহলে এই সম্পর্কে যে বাউণ্ডলে নৈনগজ্ঞানীতি প্রচলিত আমি তার সমর্থক নই। আমি জানতাম একটি কলর রটিত হলে আমাদের উভয়েরই ক্ষতি হবে। দতই মুক্তিভর্য দিয়ে বিচার করার চেষ্টা করলাম ততই ঘটনাটির অন্ধকার দিকটি আমার মনে এল, হুতরাং এই বিধরে

আমি কোনোক্রমে পিতৃকর্তৃক মনে আনলাম না। আমি অদৃষ্ট হলাম।”

গ্রন্থদল অমলো যখন স্মারাগিণীও অদৃষ্ট হল। কন্ঠিনেস্টে চলে গিয়ে ডিভোর্সের সুযোগ দিল থেকে। আরেক জনকে দিয়ে কবল, হুড সে তারে বোঝা সহচরী। আর, যে যদিও নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে লাগলো। ঘের বেয়ে স্বর্গীয় লাগনা ছুঁইট হইল।

স্বত্বীকর্মের একটি শিক্ষণীয় পরিচালনা করে যে যদিও দিন কাটে। এমনই অদৃষ্টের পরিহাস—ক্রোয়েল কার এই স্বত্বীকর্ম-প্রতিষ্ঠানের অন্ততমা ছাত্রী ছিলেন।

স্মারাগিণী পরবর্তীকালে অবশ্য বার্নার্ড শ সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর জন্মই তাঁদের বিবাহিত জীবন ক্ষেপের হৃদয়।

শ লিখেছেন :

“চল্লিশ বছর পর একদিন স্ট্রাটর অফলে মোটরে যাকিলাম, এমন সময় ক্রেমলস্টক যানর হাউসের কাছে পৌঁছালাম। উইলিয়াম আর জেন যদিও সন্ধ্যা আমি আগে ফেরি। এই ব্যগানবাক্তির প্রাচীন বরজার দিকে অগ্রসর হতে এক তরুণীকে দেখে আতঙ্কিত হলাম। প্রচণ্ড শক্তির অধিকারিণী তিনি, আমার দিকে কঠোর ভঙ্গীতে ডাকিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বসিনয়ে জবাব দিলাম। সেই দিব্য-বাগ্‌দান আজও বেন অগ্রান, তরুণীট সর্বজা উজ্জ্বল করে দিল, বেন এ বাড়ির অধিকারী আমি, তাহণর হৃদয়নিষ্ঠ কাল অদৃষ্ট হয়ে গেল। স্বপণরে এই বাড়ির সেই স্তম্ভী মেয়েটির সঙ্গে আবার আমার দেখা হল, এখন আমার উভয়েই প্রাচীন হয়েছি, বেন আমারদের জীবনে কিছুই কখনো ঘটেনি।”

এই নটকের এইখানেই বসিনিক। বার্নার্ড শ'র জীবনের স্বর্ণ-শোভন এইভাবেই দিব্যক্ষেপের মতো ছায়ায় লীন হয়ে গেছে।

১. প্রেরণ :

প্রথম আতিক

“The fame of having first offered Shaw to the public upon a platform worthy of him belongs, like many other public services, to Mr. William Archer.”—G. E. Chesleron

প্রথমতঃ আগে বলা হয়েছে কি ভাবে উইলিয়াম আর্চারের সঙ্গে বার্নার্ড শ'র প্রথম দেখা হয়। হৃদপর্ন এই স্বচ সুবক ব্রিটিশ দ্ব্যক্ষিয়মে *Tristan Und Isolde*-এর

বহনশি এবং *Das Kapital*-এর বঙ্গানুবাদ বার্নার্ড শ'কে একই সঙ্গে গুরুত্ব দেখে চমকিত হয়েছিলেন। চরিত্রে এবং স্বভাবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল অনেক, হৃদয়নে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ, তবু উভয়ের বহু অভেদ, গভীর এবং নিশ্চিত। অথচ মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়তেন এই বিচিত্র বহুর ব্যবহারে, শ'র অনেক কিছু সন্দর্ভযোগ্য নয়, এমন কি তাঁর পাঠ্যগ্রন্থসমূহে বার্নার্ড শ'র নাট্যকার হিসাবেও গ্রন্থ করেননি—তবু বহুর মন্তব্য ছিল।

চরিত্রে এবং মানসিকতায় উভয়ের এত পার্থক্য—বার্নার্ড শ' নীতিবাস্তব শিউরিটান, আর্চার দৃষ্টিভঙ্গি—অথচ উভয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রাস্কি সারটোরিয়ান চরিত্রে *Widower's House* নাটকে দেখে আর্চার বিম্বিত হয়েছিলেন। এমন একটি উগ্র নারী চরিত্র হুড পায়ে তিনি বিলাপ করেননি। উভয়ের মধ্যে রিক বে-সময় বন্ধু গড়ে উঠে সেই সময়ে বার্নার্ড শ'র সঙ্গে জেনী শারটারসনের প্রেমসীলা চলছে, আর্চার দৃষ্টেও পারেননি যে এই নিরীচ, শাস্ত, নার্সাল-প্রকৃতির মানুষটির গুণ দিয়ে এমন কড় বয়ে চলেছে। এই ডিম্বলিন বেশ এবং রাগা দাড়িওলা ব্যক্তিটির জীবনে যে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তা অবিস্মৃত।

১৮৬৩, ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে পার্শ্ব মহরে উইলিয়াম আর্চারের জন্ম। বয়সে তিনি বার্নার্ড শ'র চাইতে দু'মাসের ছোট। অত্যন্ত মনোহর চরিত্র এই স্বচ মানুষটির। অনেকের ধারণা তাঁর সমসাময়িক ছিল, কিংবা ইংলেন্ড-এর নীচে তিনি নামতে চাইতেন না। কিন্তু সে ধারণা ভুল। জর্জ বার্নার্ড শ'র জীবনে তিনটি ঘনিষ্ঠ এবং অস্বস্তক বন্ধু ছিল সিডনি গুয়েথ, ইদবার্ট কীথ চেম্বারলিন এবং উইলিয়াম আর্চার—একবার পাঠ্যশিক্ষিত ক্রীতির সম্পদ ছাড়া এদের কারও মধ্যে সমান বোধ্যস্ব ছিল না, উইলিয়াম আর্চারকে শ ভালবাসতেন সবচেয়ে বেশি।

ব্রিটিশ দ্ব্যক্ষিয়মের শাকাংকারের কলে তখনই বন্ধু গড়ে ওঠেনি। আর্চার বলেন—“কি ভাবে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল ভুলে গেছি, তবে জর্জ বার্নার্ড শ' যে একজন ব্যক্তিরসম্পন্ন ব্যক্তি সেইসু বোকার ভক্ত তাঁকে হুবার দেখার প্রয়োজন হয় না—বাই তো, আমার হৃদয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলাম।” সেই সময় আর্চার বসম্বন্ধ-সম্পর্কিত আলোচনার লেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন, *English Dramatists of To-day* নামক গ্রন্থ রচনার পর তিনি নাট্য-সমালোচকের কাজটি প্রথম পেয়েছিলেন। *The World* পত্রিকার সম্পাদক এডমন্ড ইয়েইস-কে তিনি

ইবসেন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখ, ইয়েইস সেই প্রবন্ধটি দেখত ছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যাবে তিন গিনি বাহিরা হিসাবে নাট্য-সমালোচকের পূর্ণ গ্রহণের আশ্রয় জানালেন—“My dear Sir, Ibsen won't do, but—if I am addressing the author of *English Dramatists of To-day*—You will.” আর্টার এই আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

The World পত্রিকার নাট্য সমালোচনা করা ছাড়াও *The Pall Mall Gazette*-এ তিনি গ্রন্থ-সমালোচনা করতেন, এবং অল্পাত বহু পত্রিকার প্রবন্ধাদি লিখতেন। সাংবাদিক হিসাবে তিনি প্রাচ্য স্রষ্ট্রিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু যোগ্যতা সম্পাদক হইলে কোনো বিষয় লিখতে বা তার গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তিনি সর্বদা ঠার অযোগ্যতা প্রকাশ করতেন, সেই বিষয়ে বীর অজ্ঞতার কথা বলতেন, কিংবা হাতে এখন অনেক কাজ রয়েছে যে এই কর্ম গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তবে—

এই ‘তবে’টাই মারাত্মক। “আমার এক বন্ধু আছে, মাল চুপ, মাল ডাউ, অল্পাত আইরিশ-ম্যান, কিন্তু আপনি যেমনট চান তার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, ভারী চতুর, প্রচুর রস এবং বিভিন্ন আইডিয়ার তার চরনাভঙ্গী অতি মূল্যবান। যে বিবেকে তার বত কণ্ঠ জান, সেই বিবরণটাই দল চাইতে ভালো দেখে।”

এই ভাবে *The Pall Mall Gazette*-এর সম্পাদকের বাধ্য করেছিলেন শ'কে পুস্তক-সমালোচনার কাজ দিতে, অল্পাতিনের মধ্যে ইয়েইসকেও এইভাবে বাধ্য করলেন। ইয়েইসের একজন আর্ট-ক্রিটিকের প্রয়োজন ছিল, আর্টার বললেন, আমি ছবির কিছুই জানি না, কি লিখব।

সম্পাদক কিন্তু বললেন—না-জানাটাই তো সমালোচকের সবচেয়ে বড় গুণ।

কবিতা শুনে আশ্চর্য হইল আর্টার যখন শ'কে ইয়েইসের উক্তি বললেন তখন বার্নার্ড শ সেই কথা সমর্থন করে বললেন—ঠিক তো। না-জানাটাই তো বড় গুণ। ছবি দেখলেই কী লিখতে হবে বুঝতে পারবে।

সুতরাং উজ্জ্বল চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে লাগলেন এবং সমালোচনা হুক্তভাবে লিখিত হতে লাগল। আর্টার এই বক্তব্য সম্মানসূচ্য অর্থে বার্নার্ড শ'কে পাঠিয়ে দিলেন, শ'কে রত দিলেন। শ'ও ডায়েরিতে লেখা আছে—“*The World*-এর সমালোচনার দরুন আর্টার আশ্রয় এক পাউণ্ড ছ’শিলিং আট পেন্সের এক চেক পাঠিয়েছিল, কেবল দিশাম।” আর্টার আবার পাঠালেন চেক—

এইবার বার্নার্ড শ আর্টারকে লিখলেন—“I re-return

the cheque, if you re-re-return it, I will re-re-re-return it again.”

আর্টারও কম নয়, যোজ্ঞা ইয়েইসের কাছে গিয়ে বললেন—“আমি যে আর্টার সম্পূর্ণ অস্থগুস্ত সে কাজ চালানো আর সম্ভব নয়।” এইভাবে ইচ্ছা দেখায় ইয়েইস শ'কে ডেকে পাঠালেন, প্রতি লাইন পাঁচ পেন্স হিসাবে বার্নার্ড শ *The World*-পত্রিকার আর্ট-ক্রিটিক বা কলা-সমালোচক নিযুক্ত হলেন। আর্টার হৃদয় জেবেছিনেন ছবি দেখে শ'র জ্ঞানও উড়ই মতো—কিন্তু শ' ডাবলিনের জ্ঞানশাল গ্যালারিতে ব্রুথাই সময় কাটাননি, তৎকালে লণ্ডনে বার্নার্ড শ'র মতো শিল্প-সম্পর্কে জ্ঞান অতি অল্প লোকেরই ছিল।

আর্টার কিন্তু এর চেয়ে বড় কাজ করলেন, বার্নার্ড শ'কে নাট্যরচনার তিনিই উৎসাহিত করলেন। আর্টার বললেন—আমি স্ট্রি দিতে পারি প্রচুর, কিন্তু সংলাপ-রচনার আমি একেবারে আনাড়ী।

শ' বললেন—আমি দিতে দিতে সংলাপ লিখে দিতে পারি, কিন্তু স্ট্রি-রচনা আমার সাধ্যাতীত।

সুতরাং ছির হল আর্টার যোগ্যদেন স্ট্রি আর বার্নার্ড শ তাকে রূপায়িত করবেন—সংলাপ দিয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন।

আর্টার-প্রদত্ত স্ট্রি তৎকালীন রীতি-মাকিক ছব্দধারা। আর্টার কলারী রীতি-মাকিক একটি নাটকের সবথুটিনটির পরিকল্পনা থির করলেন। শ' সেটি নিয়ে স্ট্রি অঙ্ক রচনা করলেন, কিন্তু সেই নাটক বাধাধরা রীতি-বিরোধী এবং আর্টারের কল্পনাভীত। আর্টার নাটক পাঠ করে আশাহত হয়ে চাঁৎকার করে উঠলেন। আর বার্নার্ড শ রচিত সেই স্ট্রি অঙ্ক ছ’-দাত বছর চাপা পড়ে ইইল। সেই সময় হেনরি আর্বার জোন্সের নাট্যকার হিসাবে খুব নাম। তাকে এই স্ট্রি অঙ্ক পড়ে পোনালেন বার্নার্ড শ।

জোন্স মজ্জা করলেন—“কই হে, খুন-অখম কই।”

ইঙ্ক-ওলম্বাজ ইবসেন-গ্রন্থিক বেকব টমাস গ্রোইন ছিলেন চা-বোপারী। তা ছাড়া কল্যাণ এবং লাইবেরিয়ার কন্সল্যাগ ছিলেন। স্ত্রলোকের কিন্তু ব্যবসা বা কূটনীতির চাইতে নাট্য-আলোকলেনে আশ্রয় অনেক বেশী। গ্যারিতে ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ঐতিহাসিক থিয়েটার লিবরে প্রতিষ্ঠা করেন, সেই ধরনের একটি নাট্যশালা বোলার স্ত্র গ্রোইন আগ্রহাব্যিত হলেন। গ্রোইন আজীবন লাভ-ক্ষতির লিখে লক্ষ্য না রেখে এই ধরনের নাট্যশালার উন্নতির লক্ষ্য অর্পণ ও সময়

ব্যব করছেন। সর্বপ্রথম যে প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করলেন তার নাম—The Independent Theatre। টাটেনহাম কোর্টে একটি সাধারণ হল ভাড়া নিয়ে তিনি *Genghis-khan* এর ইংরাজী অনুবাদ *Ghosts* অভিনয় করবেন বলে বিজ্ঞাপন দিলেন। কিন্তু এমনই টিকিটের চাহিদা হল যে, টাটেনহাম কোর্ট ছেড়ে গ্রেইন সোহো অফলে 'রয়্যালটি থিয়েটার' ভাড়া করলেন।

ভরলোক হুঃসাহসী এবং নির্ভীক মানুষ। কিন্তু *Ghosts* অভিনয় ব্যাপারে যে তাঁকে অপমান এবং অত্যাচার সহ করতে হবে তা তিনি কল্পনা করতে পারেননি।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ শুক্রবার তাঁর নাটকের অভিনয়-রজনী। নাটক দেখে কিন্তু সমগ্র সংবাদপত্র তাঁকে প্রচুর গালিবর্ষণ করল। ফ্রিমেট স্ট্রট লিখলেন—“ইংলেন্ডের এই ভয়ঙ্কর নাটক *Ghosts* একটি উদ্ভূত নর্দমা, আবেগপূর্ণ নৈশী কত, প্রকৃত হানে কুৎসিত কর্ণের মতো বীভৎস।” তিনি লিখলেন, পুদিন কি করছে, তাহা কি বুঝিয়েছে?

আর্চার, ওয়েকলি এবং বার্নাড শ ফ্রিমেট স্ট্রট জাতীয় প্রাণীদের অভিযানের মতো বাহিরজানহীন উত্তির প্রতিরোধে সচেষ্ট হলেন। ওয়েকলি *The Star* পত্রিকার অত্যন্ত সাহসিকতা সহকারে লিখলেন—“গতকাল একটি থিয়েটার দেখার আনন্দ পেয়েছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটি এত সাধারণ নয়, যা লেগেছিল তাতে মনে হয় ইংরাজী রক্তকে একটি নৃতন রূপ সৃষ্টি হল।” ওয়েকলির এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। *Ghosts* যক্ষ হওয়ার পর ইংরাজী থিয়েটারের অনেক পরিবর্তন এবং উন্নতি ঘটল। ব্রিটিশ সরকারের অনুমতিক্রমে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই ব্রিটিশ নৈশদের জন্য থে-নাটক থিয়েটারে *Ghosts* অভিনীত হয়েছিল।

Ghosts সংক্রান্ত হে-হলার অবসান ঘটবার পর গ্রেইন ঘোষণা করলেন—ইংলণ্ডে শত শত সহস্র নাটক লিখিত হয়ে পড়ে আছে, ব্যবসায়ের হুমকি-বালিকরা সেগুলি বন্ধ করতে সাহসী নয়।

একদিন মধ্যাহ্নে হামিরাগিথ রোড থেকে হাঁটতে শুরু করলেন বার্নাড শ আর গ্রেইন। প্রায় তোর পর্বত সেইভাবে শব্দ চলতে চলতে উত্তরের মধ্যে অনেক আলোচনা হল।

গ্রেইন অনুযোগ করলেন—“আমার আবেগনের দ্বাৰা একশানিও নাটক তো আমাকে কেউ পাঠান না।”

সেই দ্বিতীয়ের বার্নাড শ সহসা বলে বসলেন—“আপনি ঘোষণা করে দিন আপনার পরবর্তী নাটকের নাট্যকার জন্ম বার্নাড শ।”

অত্যন্ত খুশি হলেন গ্রেইন; বললেন—“বেশ, এই প্রজ্ঞা আমি গ্রহণ করলাম।”

আর্চারের সহযোগিতায় যে অসম্পূর্ণ নাটকের দুটি অঙ্ক লেখা হয়ে পড়েছিল তার সঙ্গে আর একটি অঙ্ক ছুড়ে দিলেন বার্নাড শ, ব্যবসায় করলেন—*The Widow's House*; তারপর পাতুনিগি গ্রেইনকে পাঠিয়ে দিলেন।

১৮৯২, ২৫ ডিসেম্বর রয়্যালটি থিয়েটারে এই নাটক অভিনীত হল। রাত্টি সারটোহিয়ারের ভূমিকার ফোরেল কার অভিনয় করলেন। তেজী প্যাটারসন এই অভিনয়-রজনীর অন্ততম দর্পক ছিলেন, হুতরাং ফোরেল বনের সুখে তাঁর অসুস্থতা করে অভিনয় করেছেন। লিঙ্কনের ভূমিকার অভিনয় করার যোগ্য নট অনুদমানে বয়ঃ গ্রেইন, প্রবোজক হারবার্ট শ লান্ডজ এবং বার্নাড শ বন গভীর উৎসে দিন কাটাচ্ছেন—কেডফোর্ড হোটেলে রিহার্সেল চলাচ্ছে—এমন সময় শ্রী হু, লাল হু, বামনাকৃতি জৈনিক বুৎ হু করে ঘরে ঢুক পড়েছিল। হু করে এগেও, ঘরে খাড়া ছিলেন তাঁরা দেখলেন এই তো লিঙ্কিন সবারীর উপস্থিত! সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লিঙ্কিনের পাঠ পড়তে বলা হল, লোকটি এমন রক্তক আকৃতি করল যে তৎক্ষণাৎ তাঁকেই সেই ভূমিকার বাহাল করা হল। লোকটির নাম জেম্‌স ওয়েল্‌স, তখন অশ্রাৎ হলেও, পরবর্তী কালে হামিরাগিথ অভিনেত্রী হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

এই নাটকটি বার হুঃসাহসী অভিনীত হয়েছিল, কিন্তু সংবাদপত্রের নজর এড়িয়ে বাঘনি, কেউ কেউ দীর্ঘ সমালোচনা এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লিখেছিলেন। এক সন্ধ্যা ধরে এই বিতর্ক চাঙ্গ ছিল। তবে এই আলোচনা *Ghosts* সংক্রান্ত আলোচনার মতো গালিগালাধপূর্ণ নয়। অনেক সমালোচক মন্তব্য করলেন, এই নাটক ইংলেন্ডের পদাধিগ্রহণের হস্তি। কিন্তু এই নাটকের প্রথম দুটি অঙ্ক বন্ধ হইতি হয় তখন বার্নাড শ ইংলেন্ডের নামও জানতেন না। তখনকার কালে মাকে বক্তৃতা-বনের কথা উল্লেখ করা অতি কর্তব্য কঠোর পরিচায়ক ছিল। এই অভিনয়কালে গ্যালাগিজে উপস্থিতি নোশানিকের প্রচুর হাততালি দিয়ে অভিনয়কর জানিয়েছেন, কিন্তু মূল্যবান আসনের তৎক্ষণীয় দর্শকরা বাজ-বিত্ত কর তামিলা প্রকাশ করলেন।

এই নাটকের তৃতীয় অঙ্ক অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ লিখিত, তা ছাড়া

প্রথম হুটি অন্ধের সাত বছর পরে রচিত হওয়ায় অসঙ্গতি-
হীন। উন্নতিশীল বছরের মন আর চরিত্রের মনে অনেক
প্রভেদ। নাটকটি তাই অসংলগ্ন। এই নাটক পড়লে
বোঝা যাবে কেন আর্চার নাট্যকার হিসাবে বার্নার্ড শ'কে
সমর্থন করতে পারেননি।

কিন্তু যতাত্ত্বক হলেও, বনাম্বব ঘটনি হুই বন্ধুত্ব মধ্যে।
১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম আর্চারের চেটায় বার্নার্ড শ
১১১ পাউণ্ড রোজগার করেছিলেন। নাটক-রচনায় মন
দিয়েছিলেন শুধু আর্চারের প্রেরণায়।

নাটক-রচনায় সহযোগি এ করতে গিয়ে উভয়ের মন

মতবিরোধে ঘটল, আর্চার সাথে গেলেন—এক বার্নার্ড শ
মনে মনে হুঃখিত হয়েছিলেন। উপজ্ঞান-রচনায় বিফলতার
জ্বালা তখনও কমেনি, নাটক-রচনাও অসফল, তাহলে কি
কোনোদিন তিনি কোনো কিছু করতে পারবেন না?
জীবনের এক সাক্ষটম্বর নুহুর্ভে আর্চার এসেছিলেন দেবদূত
রূপে—যে উৎসাহ নেই, বাইরে অসামর্থ্য—এক বিচিত্র
জীবন-সংগ্রামের দুর্গাবর্তে জড়িত যুবকের কাছে সামান্য
উৎসাহ, সামান্ততর প্রশংসার দৃশ্য সেদিন অনেক। তাই
সেদিন নাটকের হুটি অন্ধ একপাশে সরিয়ে রেখে বার্নার্ড শ
সাংবাদিকতার কর্মে মন দিয়েছিলেন। [রচয়:]

জয়চণ্ডী পাহাড়

প্রভাকর রাবি

জয়চণ্ডী পাহাড়ের পাশ দিয়ে ট্রেন চুটে যায়,
তিনটি আশ্চর্য চূড়া মেঘলোকে উঠেছে উদ্ভাস।
আরণ্যক কুমারীর প্রেম হেথা শিলা-রূপ পায়—
হৃদয়ের সবুজ বন, আশে-পাশে গাঁওতাল গ্রাম।

অশ্রু-ফেনা ও পাহাড় একদিন হয়েছিল লাল :
অন্ধকার স্তব্ধ রাত্রি। শব্দ হাতে দহন লুটেরার
দণ্ড করে জলে উঠে আচম্বিতে একশো মশাল।
শিউরে উঠতো ভয়ে নারীমাংস-লোভী জমিদার।

পাবাণ বন্ধ কি ওর ফেটে ফেটে হয়নি চৌচির ?
কত হিংস্র কাপালিক—তামসিক অহিষেন-সেবী—
ছিন্ন করেছিল কত শূলকণ কুমারের শির
কে জানে তা ? একমাত্র বন্দিদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

জয়চণ্ডী পাহাড়ের পাশ দিয়ে ট্রেন চলে চুটে,
অতীতের এক টুকরো ইতিহাস কথা করে উঠে।

ছোট-খোঁট

• * * চারুচন্দ্র ওট্টোচার্য * * •

‘যদি’

আজ, এই নভেম্বর, ‘অনন্দবাজার পত্রিকা’য় এই খবরটা দেখছি—

লন্ডন, ১ই নভেম্বর—ময় প্রত্যয়ে উত্তর-আমেরিকার উৎকর্ষ প্রচারিত হচ্ছে যেভাবেবের এক যোগ্যদ্য বলা হয় যে, শৃঙ্খলাকে যে “ভারতীয়” জীবন বাপন করিতে হইবে, সে সম্পর্কে বেলজিয়াম লোক নিজেদের উপর পরীক্ষা চালাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে যেমন গিনিপীপার উপর পরীক্ষা চালানো হয়, তেমনি মাধ্যাকর্ষণবৃত্ত ভাষ্যের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে উয়ালেস উপর পরীক্ষা চালানো হইয়াছে।

এর পর জানানো হচ্ছে—

আকাশ-পরিক্রমা-অবস্থায় বায়ুগণকে ৩০ থেকে ৪৫ সেকেন্ড পর্যন্ত ডারবুক অবস্থায় রাখা হইয়াছিল। এ ধরনের আকাশ-পরিক্রমণে নিচু ১৬ মনের মধ্যে ৮ জন সম্পূর্ণ আবেগে কাটাইয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। যে-সকল বিজ্ঞানী এই গবেষণা পরিচালনা করিয়াছিলেন তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, ৬ জন না থাকার অবস্থাটিই মানুষের পক্ষে বিপ্রায় উপভোগের প্রকৃষ্ট অবস্থা। উপরোক্ত পরিক্রমায় পাঁচ জন অল্প মোহাচ্ছন্ন ভাবে অশ্রুভব করিয়াছিলেন। বনে হইয়াছে যে, তাঁহারা অতলের দিকে মাথিয়া বাইতেছেন, অথবা শূন্য উন্মত্তভাবে ভাষিয়া বেড়াইতেছেন।

খবরের কাগজখানা পড়ে নাতি এসে জিজ্ঞাস করল—

আজ্ঞা, সাত, ৩০৪৫ সেকেন্ডের ক্ষেত্রে ১৬ জন লোক সখ্যে যা করল সমস্ত পৃথিবীবাসী সখ্যে সেটা যদি করে বসে, আর অনেক দিন ধরে যদি ভা করে, তবে আমাদের অবস্থাটা কি রকম পাঁড়াবে ভুনি একটু বল।

অর্থাৎ পৃথিবী যদি তার অভিকর্ষ-শক্তি হারায়

তবে কি হবে, এই তো তোমার জিজ্ঞাসা? তোমায় অভয় দিচ্ছি, কোনদিনই তা ঘটবে না।

যদি-র কথা বলছি, যদি তাই হয়।

যদি হয়, তবে বলি শোনো—

যে ৮ জন ভারমুক্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ আশ্রয় লাভ করেছিলেন আমি তাদের সঙ্গে পড়ব বা ৫ জনের মতো মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকব তা ঠিক জানি নে। তবে অভিকর্ষ চলে গেলে কয়েকটা ব্যাপারে আনার সুবিধে হয়ে যাবে। আমি তো তিনতলার ঘরে থাকি, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে ভীষণ হাঁপ ধরে, তখন এ বাংলাই আর থাকবে না, পরন্তু নামতে গিয়ে যদি পা হড়কায়ে তবে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতেও হবে না। অবশ্য এখন যত সহজে নামছি তখন তা হবে না। গলার নালী দিয়ে জল নেনবে না, তা হোক, জল কামড়ে-কামড়ে খাবে। স্নানের সময় মগে জল নিয়ে মাথায় ঢালা চলবে না; তা হোক গে, শীত পড়ে গেছে, স্নান বন্ধ করে দেবো। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। কয়েকটার উল্লেখ করছি।—

গঙ্গা হিমালয় থেকে নামতে নামতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, বানোদর-বাঁধের জলপ্রোতও তাই। বাড়িতে জলের কলের মুখ খুললেও তা দিয়ে জল পড়বে না।

পেটুলাম ছলবে না। ব্যারোমিটারের পায়রা উঠবে না।

চুনি গৌসাই লাফিয়ে উঠে বল্ হেড করল; চুনি গৌসাইও নামল না, বল্ও নয়।

চোঁকিতে পা দিয়ে চেপে ছেড়ে দিলে চোঁকি সেই অবস্থাতেই থেকে যাবে। ধানভানা চলবে না।

হাড়িপাল্লায় একটিকে ওজন চাপিয়ে অপর পাল্লায় যত কিছু দিতে থাক, সে পাল্লা উঠবেও না নামবেও না।

শিশু অনায়াসে হাতি ঘোরাতে পারবে, হাতের তো ওজন থাকবে না ; সে হাড়ির উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে হেঁটে যাবে, পড়বার ভয় নেই।

এসব ব্যাপার ছেড়ে নিশুম। আনাদের সাহিত্য যে বিপৰ্য্যস্ত হবে, সেইটে আসল কথা।

কালিদাস থেকে আরম্ভ করি।—

যক্ষ নেছকে দূত করে প্রিয়ার কাছে পাঠাচ্ছে।

উপদেশ দিচ্ছে—

বিঃ বিঃ শিবিরে পুণঃ পুণঃ গদ্যাদি যঃ

কীঃ কীঃ পরিলক্ষ্যঃ স্রোতঃসংকপৎভা।

নেদ, তুমি এখন হাস হাও তখন বর্ণন করে কিছুটা চল কমিয়ে কোলো।

কিন্তু কি করে তা হবে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা একত্র হয়ে যখন বড়ো হয় তখনই ভারি হয়ে ঝটিকরূপে মাটিতে পড়ে। এই হল সাধারণ অবস্থার কথা। কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণ যদি না থাকত, তবে তো ঝটিকা পড়বে না। ‘মেঘদূত’ এই রকমের অনেক স্লোক আছে যা নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাবে না।

সেকালের মহাকবি থেকে একালের মহাকবিতো আসা যাক।—

বাচস-দ্যোগ্য মনে পড়ে চোলেবেলায় গান—

ঝটিকা গড়ে টাপুর-টাপুর, নবের এল যান।

ঝটিকা টাপুর-টাপুর পড়বে না।

ঠাকুরবাড়ি ছোটেগি লোকের নাহি শেষ,

অবিভ্রান্ত ঝটিকাধার ভেসে যাব রে বেশ।

কোনো ভয় নেই, ঝটিকাধার বেশ ভাসবে না।

আদি বহিঃসংস্কৃত প্রাচীনরাষ্ট্র।

একবারে শুকনো শ্রাবণ মাস, এক কোঁটাও ঝটিকা নেই।

ঝটিকা তো পড়বে না, কিন্তু অভিকর্ষ চলে গেলে শিমিরও গোল বিন্দুর আকার ধারণ করবে না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সে লেখা এই অপূর্ব কবিতাটি বাতিল করতে হবে—

বহনিন ধরে বহু জেগে ধরে

বহু বায় করি বহু বেশ ধরে

দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা

দেখিতে গিয়েছি সিঁড়ি।

সেখা হয় নাই চক্ষু যেমিখা

যত হতে শুধু দুই-পা ফেলিখা

একটি ধানের দিঘের উপর

একটি শিমির-বিন্দু।

শুধু কি ঝটিকা, শিমির!

বসন্তে কি শুধু কেবল কোটা ফুলের মেলা রে।

দেখিল রে কি শুকনো-পাতা করা-ফুলের মেলা রে।

ফুল করবে না, ফরা-পাতাও খসবে না। আর গাছের আম গাছে থেকেই পচবে। সুতরাং

সহসা বাতাস কেলি গেল হাস শাখা ছলাইয়া গাছে ;

ছুটি শাকা কল লড়িল ছুতল আমার কোলের কাছে।

এ হবে না।

বহিঃসংস্কৃত লিখেছেন—

শৈবলিনী বলিল,—আমাকে মূলমন্ত্রেরো ভাত

বাগাইয়াছে—আমার ভাত খেল—মা গঙ্গা খরিও।

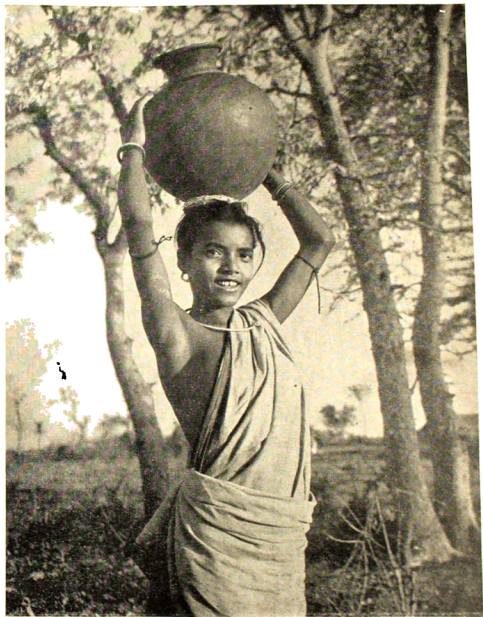
কিন্তু মা গঙ্গা অবধি পৌছতে হল না, শৈবলিনীর দেহ বাহুতে ভাসতে লাগল।

“কি হইল! কি হইল!” বলিয়া প্রতাপও ঝাঁপ দিল। প্রতাপেরও সেই দশা। সুতরাং, গঙ্গাবক্ষে

শৈবলিনী—ঐ

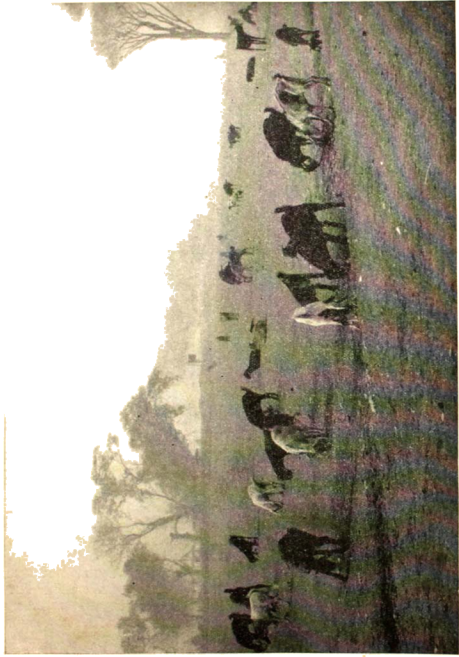
এ চমৎকার দৃশ্যটি মাঠে মারা গেল।

কিন্তু এতক্ষণ দিচ্ছে বকলুম। এসবের আগে জীব-সম্মত এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।



জলকে চল্

[কটো : রামকিঙ্কর সিংহ]



ভোরের বেলা

[কটো : অরুণভূমার মুখোপাধ্যায়]

বাংলার নবজাগরণের কথা

জীবোগেশচন্দ্র বাগল

২

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি কথা একাদিকথায় উল্লেখ করিয়াছি, এখানেও করি। তিনি বলিয়াছেন, ১৮২৬-১৮৪৫ এই বিশ বৎসরের মধ্যে বাংলার রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা হইয়াছে। এই উক্তিটির ভিত্তিতে যে কতখানি সত্য ও তথ্য নিহিত রহিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বর্তমান অবস্থে এই বিষয়টি বহুদূর আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

নব্যশিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত পন্থা খ্রীষ্টীয় দশকে বিকল্প স্রষ্টা আকারে ধারণ করিয়াছিল। তাহার আভাস ইতিপূর্বে দিয়াছি। রাজা রামমোহন রায়েব আংলো-হিন্দু স্কুল ইংরেজী শিক্ষার একটি কেন্দ্র হইল। ডেভিড হেরারের পটলডাঙ্গা স্কুল (যাহা পরে 'হেরার স্কুল' পরিণত হইয়াছে) এবং ডাবানীপুরের মধ্যমোহন বহুর বিদ্যালয়েও নব্যশিক্ষার প্রাথমিক পাঠ দেওয়া হয় এই সময় হইতে। ক্রমে গৌরমোহন আচ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারী এবং অন্ত্যস্ত ইংরেজী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

কিন্তু এ সকলেরই সীমাবদ্ধি ছিল হিন্দু কলেজ বা মহাবিদ্যালয়। এই কলেজও প্রথমে একটি স্কুল মাত্র ছিল। ডাঃ হোরেস হোমান উইলসন কর্তৃক হিন্দু কলেজের সংস্কার-সাধন ও নতুন নিয়মাবলী প্রবর্তনের স্বপ্ন এবং ডেভিড হেরারের প্রত্যক্ষ-সংযোগ ও ডিরোজিওকে শিক্ষক-নিয়োগের ফলন ইহা এতদকালে একটি উচ্চতম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। হিন্দু কলেজে ঐ সমস্কার সম্পন্ন হিন্দু ঘরের ছেলেরা পড়িতে আসিত। তবে কলিকাতা স্কুল দোদাটাই এমন একটি স্থান নির্মমের অবতারণা করেন, যে কারণে সে-স্থানের উৎকৃষ্ট অধ্যাপক নিঃস্বল বা অস্বল বিশেষ ছাত্রগণ এই বিদ্যালয়ের পাঠের বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিল। বড়ঘরের ছেলেরা বা স্বাধীনবেরা যে পাঠ্যে-কর্ষ একবারেই প্রবর্তন করিত না এরূপ নহে, কিন্তু এই সকল ছেলেই স্বীয় অধ্যবসায়ের বলে তৎকালের উচ্চতম বিদ্যা আদর করিয়া যদের কল্যাণবর্ধক প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন। আর ইহারা অনেকেই ছাত্রাবস্থা হইতে নানা বাধ্যবিশিষ্ট অতিক্রম এবং নির্বাচন সফল করিয়া নব নব শিক্ষা ও জ্ঞানবুদ্ধিতে প্রগতিশীল আন্দোলন

পরিচালনা করিয়াছিলেন। বাংলার নবজাগরণের সূচনায় ইহাদের কৃতিত্বই অতি প্রকারে সঙ্গত মনে করিতে হয়।

ডিরোজিও হিন্দু কলেজে পাঁচ বৎসর কাল (যে ১৮২৯-এপ্রিল ১৮৩১) শিক্ষকতা কর্তে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছেলেরের ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস পড়াইতেন। তিনি ছিলেন কবি এবং পাকডা হর্পনে ব্যাপার। শিক্ষাপ্রতীক যে প্রধান গুণ—ছেলেকের মনে জিজ্ঞাসার উদ্রেক—তাঁহা তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাঁহার শিক্ষার প্রধান দুই বৎসরের মধ্যেই ছাত্রেরা বিশেষ উৎসাহ হইল; ডিরোজিওর শিক্ষাদানের ব্যাপি ছাত্রগণের মধ্যে এতটা চড়াইয়া পড়ে যে, উপরের শ্রেণীর ছেলেরাও তাঁহার পরীক্ষা ক্রমে আসিয়া স্ক্রুতিত। কলেজে প্রথম তাঁহার অভিনব শিক্ষাদানেই ছেলেরা সবটুকুতে পাবিত না, তাঁহার কথা—উপদেশ শুনিবার জন্য উৎসাহ হইয়া অন্তরও তিক্ত জ্বাইত। কলেজের ভিতরে অবকাশ-সময়ে এবং ডিরোজিও-ভবনে তাহাদের নিহত বাতায়িত ছিল। ডিরোজিওর শিক্ষার অধঃপ্রাণিত হইয়া তপস্বী ছাত্র-শিষ্যেরা আ্যাকাডেমি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা করিল দুই বৎসরের মধ্যেই, ১৮২৮ সন নাগর। এই সভার বিধি অল্পত বিশদভাবে বলিয়াছি।^১ এখানে শুধু ইহার মুগ্ধাকারী ফলাফলের কথা কিছু বলি।

রাজা রামমোহন রায়েব ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের কথা আজ সুবিদিত। হিন্দু কলেজের ছেলেরা প্রগতিশীল ভাবধারায় এতখানি আশ্রুত হইয়াছিল যে, এতাদৃশ আন্দোলনসমূহের প্রবর্তক রামমোহন রায়ে তাহাদের নিকট আধুনিক পরিভাষায় 'মডার্নেট' বা ধীরশরী বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন। এই কারণেই হস্ত পরবর্তীকালের লেখকগণ ডিরোজিও-শিষ্যগণকে 'ব্রিট্রী' আখ্যা দিয়াছেন। কেহ কেহ তাহাদিগকে 'উচ্চাশ্রম' বলিতেও কণ্ঠ হন নাই। আবার ইহানীত্বন কোন কোন লেখক তাহাদের গুণগান করিতে গিয়া প্রাচীনপন্থীদের নস্ত্য করিয়া দিতেছেন। কিন্তু সত্য নির্ণয় করিতে হইলে উভয় মতবাদকেই বাচ্যই

১. স্রষ্টা: "অ্যাক্যডেমিক অ্যাসোসিয়েশন"—দাবানী মহাবিদ্যালয় পত্রিকা, ১৯০০

করিয়া লইতে হইবে। রামমোহন রায়ের সমাজ-সংস্কার এন্টোয়া সমর্থন করিতেন এই যুবকদল; বিলাতে উৎকৃষ্ট রাজনৈতিক কর্মের প্রণায়কও তাঁহারা ছিলেন পশ্চিম। বড়লাট বেকিট আইন দ্বারা সতীত্বকে নিষিদ্ধ করিয়া দিলে, ডিরোজিও 'সতী' শীর্ণক উক্ত আইনের গুণগান করিয়া একটি মর্মস্পর্শী কবিতা লিখিয়াছিলেন। কালেক্টর যুবকদল হ্রাসিকার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। ভারতবর্ষে ইংরেজের দ্বারা বন্দাবন বিধবক আকালনেও তাঁহারা তাঁহার সমর্থন ছিলেন। রামমোহন রায়ের কুহ্মার পর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যে জনসভা হয় তাহাতে কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে, পাত্রী) রাজ্যের এইসকল কাণ্ডের বিশেষ প্রকাশ করিলেন। কলিকাতা টাউনহাусে অঙ্কিত বিখ্যাত 'চার্টার অফ' সভায় বসিকক্ক মন্দির সনক আইনের নিষ্পত্তি করিয়া, ইহাতে দাপিত্ত্ব মন্দিরসর বিষয় পরিবেশিত হইয়াছিল সেগুলি একক রামমোহন রায়েরই কৃত্রিম বলিয়া নুতনকক্ক বীকার করিয়াছেন। তৎপরি এই নবাবলস রামমোহনকে 'মডারেট' বা ধীরপন্থী আখ্যা দিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরের ত্রিতরেই একদিকে যেমন হিন্দু কলেজের ছেলেরা কেন 'ব্রিগদী' এবং রামমোহন রায় কেন 'ধীরপন্থী' তাহা জানা যাইবে, তেমনি অল্পদিকে বাংলায় নবজাগৃতির গক্ষে যে হুইট দ্বারা এই কার্য চলিয়াছে তাহাও বুঝা যাইবে। নবাবলসের গুপ্ত ডিরোজিওকে অনেক 'নাটিক' বলিয়া হুবিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু কলেজের শিক্ষাকে নাটিক্যবুদ্ধির পরিশোধক বলিয়া সমালোচনাও করিয়াছেন। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ববন কিছুতেই নবাবলসকে বাগে আনাঠিতে পারিলেন না তখন তাঁহারা বড় নটের গোড়া ভাবিয়া ডিরোজিওকে নিষ্পত্তি কর্ম হইতে অপসৃত করিলেন। কিন্তু ডিরোজিওর দিকা যে নাটিক্যবোধ-প্রসৃত নহে তাহা তিনি কলেজ-ভ্যাগের প্রাচ্যালে ডাঃ উইলসনকে লিখিত পরে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল বুদ্ধি। বুদ্ধির মানসেও বিচার দ্বারা অসীক বিষয়গুলি পরিত্যাগ করিয়া সার বস আকড়াইয়া ধরিতে ছাত্র-শিক্ষকের উপদেশ দিতেন। কোন বিষয়ের সারবস্তুর সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে বুদ্ধির মানসেও ব্যাঙ্গোপাচ করিয়া পরিশোধনান্তর গ্রহণ করা তাঁহার শিক্ষার সর্বত্রই সীমিত ছিল।

ডিরোজিও-প্রসৃত এখনি শিক্ষার যুব-ছাত্রদল উৎসাহিত হইয়া এই বুদ্ধিনিষ্ঠ ভাবনা কার্যে প্রতিফলিত করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ-

সংস্কারমূলক এন্টোয়াতেই সমস্ত থাকিতে পারিলেন না। হিন্দুধর্মের অর্থাটান সীতিনীতি এবং হিন্দুসমাজের আচার-আচরণের মধ্যে এই ছাত্রদল জ্ঞানবুদ্ধি-বিরোধী অব্যবস্থাবিষয়েই প্রাচুর্য্য দেখিতে পাইলেন। আহা! করিলেন, কিন্তু তাহাতে পাড়াখান্ড বিচার করিতে হইবে কেন? কাহার নিকট হইতে ব্যক্ত প্রার্থ করিলেন তাহারই-বা ভাবিবার বুদ্ধিমুত্ততা কি? ধর্ম ও গুরু-পুত্রোহিতের আধিপত্য কেন? ব্রাহ্মণকে অন্ধকারে কেলিয়া রাখা হইয়াছে, ইহার কারণ কি? সমা যে শিক্ষার মূল, তাহা জাতি বা ভেদ-বৈষম্য বীকার করিবে কেন? কাঠ, গ্রন্থ বা বুদ্ধিকানিধিত সেবেবীকেই বা তাঁহারা ইশ্বরজ্ঞানে মাত্র করিলেন কেন? জনৈক কালেক্টর ছাত্র কতৃক কালীঘাটের কালীকে 'গড-মনি, ম্যাডাম' বলিয়া সম্বোধন করায় তাঁহার পিতার মনে কি আভয়েই না খট্ট করিয়াছিল। নবাবলসকারী যুবকদল তাই ধর্ম ও সমাজের নিয়মাদিকে মূল্য জ্ঞানে ভাঙিয়া-ছুরিয়া শেষ করিয়া দিতে উত্তত হইলেন। তাঁহারা যে গুরু-পুত্রোহিতের উপরই কণাখাত হানেন তাহা নহ, ঐ সময়ের খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টান পাত্রীদের আচার-আচরণও তাঁহাদের ব্যক্ত-বিত্তন হইতে রেহাই পার নাই। উমাস শেনের 'এক অক' রাজন' পুস্তকখানি ১৮৩১ সনে কলিকাতায় প্রোচ্ছিমাত্র কালেক্টর ছাত্রগণ লিখিয়া ফেলেন। পাত্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক বৎসর পরে লিখিত আত্মকাহিনীতে এ সময়কার নাটিক্য-বুদ্ধিপ্রসৃত তাঁহার ও তাঁহার সতীর্থদের কথা অল্পতত্ত্বভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সময়ে হিন্দুসমাজের ক্রিয়াকলাপ এবং গুরু-পুত্রোহিতের ধর্মের নামে অত্যাচার-অন্যচার ও অন্তর কার্যাদির কথা 'দি পারসিকিউটেড' নামক ইংরেজী নাটকে তীব্র ভাবার বিভিন্ন ব্যক্তি প্রমুখ্য প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রাচীন ব্রহ্মপন্থী হিন্দুসমাজ রাজা রামমোহন রায়ের বিশপ ছিলেন; তাঁহাদের বিরোধিতা একটি হইয়া গড়ে সতীত্ব নিবারণ কালে 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠার মধ্যে। ইহা ছাড়া তাঁহাদের বিরোধিতা কখনও সারস্বক আকার ধারণ করে নাই। কিন্তু কালেক্টর ছাত্রদের কার্যকলাপে প্রাচীন সমাজ একেবারে আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। নিজ নিজ সন্তানদের শারীরিক নিপীড়নে, এমনকি বিষতক্ষণ করানোর পর্যন্ত অভিভাবকেরা উত্তত হইয়াছিলেন। গোবর্ষ ভক্ষণবিধি দ্বারা তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও পোদন করাইয়া লইতেও তাঁহারা ছাড়েন নাই। কালেক্টর ছাত্রগণ কেন 'ব্রিগদী' আখ্যা পান—এখন হরত বুদ্ধিতে কষ্ট হইবে না।

এই আলোচনা হইতে কেহ যেন মনে না করেন, হিন্দু-কলেজের ছাত্রগণ তথা ডিবোজিও-নিষ্ঠ যুগু নেতিবাচক কার্যে যারা নিজে ভাবনা চরিতার্থ করিয়াছেন। ভাড়া-পড়া মুই ব্যাপারেই তাঁহারা সখান পিত্ত ছিলেন। 'পার্মেন' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা সাহিত্য-সেবা শুরু করেন। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে তাঁহারা ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, ইতিহাস, বর্ণন, বিশেষতঃ মানব বিম্বের বিতর্ক নিবৃত্ত হন। এই অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শে কলিকাতার ছাত্রসমাজে বহু বিতর্ক-সভা অল্পকালের মধ্যে স্থাপিত হয়। এমনকি বাংলাভাষা চর্চার ক্ষুদ্রও সভা-সমিতি গঠিত হইল। ছাত্রাবস্থায়ই যুগ্মগণ অষ্টেতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশেষ ছাত্রদের নবশিক্ষাদানে রত হইলেন। পাঠ্য পুস্তকসমূহ 'এনকোয়ারার' সাপ্তাহিক প্রকাশ করিলেন। 'দক্ষিণারজন মুখোপাধ্যায় ও বসিকক্ক মল্লিক ইংরেজী-বাংলা 'জ্ঞানামেঘ' সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালন ও সম্পাদনে অগ্রণী হন। ঐ সময়ে সাধারণের স্বার্থক্ষমকরে ফে-সব প্রচেষ্টা চলিতেছিল তাহাতেও তাঁহারা একান্তভাবে যোগ দিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতালাভার্থে যে সভা হয় তাহাতে বসিকক্ক মল্লিক ও দক্ষিণারজন মুখোপাধ্যায় ইহার নশকে বক্তৃতা করেন। জ্ঞানক ইংরেজ বক্তা বাংলা সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে দ্রাবিকর উক্তি করিলে দক্ষিণারজন ইহার প্রচার-বাহুল্যের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার উক্তির ত্রুটি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন বিভাগে তাঁহারা দায়িত্ব পূর্ণ পদে নিয়োজিত হন। শাসনের নানা জরে তখন দুর্নীতির চরম; কলেজে শিক্ষিত ছাত্রেরা দুর্নীতির ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠান। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সম্মুখে এই কথাটি বরাবর বলা হইত—তাঁহারা সভ্যবাসী, বিখ্যা করেনও বলেন না। সরকারী কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাত্ত, সাহিত্য ও সংবাদপত্র সেবা প্রকৃতিতে তাঁহারা কমে পিত্ত হইতেছিলেন। তাঁহাদের উক্ত্য বা উচ্চাখ্যতা কখনও ভ্রাস পাইল। কিন্তু তাঁহাদের চিন্তা এবং কর্মশক্তি সমাজ ও দেশসেবার প্রযুক্ত হইতে থাকে। ডিবোজিও-মুগের প্রিন্সী ভাবনা কাজির সর্বাঙ্গক উন্নতির হেতু হইয়া উঠিল।

বাংলায় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের কথা আলোচনা করিতে গিয়া কেহ কেহ রাজা রামমোহন রায়ের বিবর বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন এবং ডিবোজিও-মুগের মধ্যে তেমন কিছু স্বাভাবিক উদ্বোধন প্রকৃতি পান না। আবার কেহ কেহ ডিবোজিও-মুগের উপরে অতিরিক্ত গুরু আঘাণ

করিতে গিয়া অস্ত্রের প্রতি দ্রবিত্যর করিতে পারেন নাই। উভয়ই কিছু একটি কথা ভুলিয়া যান বলিয়া মনে হইতেছে। রেনেসাঁ বা নবজাগরণের দরুন একদিনে যেমন আমরা নৃতনকে গ্রহণ করিতে উদ্বু হই, অস্ত্রদিকে আবার আমাদিগের জিতরে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, স্বাভাবিক, শাস্ত্র অথচ চর্চার অভাবে বৃত বা জীবন্ত, তাহার পুনরুজ্জীবনেও আমরা উদ্বু হইয়া উঠি। এই মানসেই জিতর করিলেও শিবনাথ শাস্ত্রীর উক্তি অতীব সত্য বলিয়া আমাদিগের দিকট প্রতিভাত হইবে। নৃতনের আলোয় পুণ্যতনকে পরিবৃত্ত করিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে রাজা রামমোহন রায় আমাদের পথিকৃত। ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার-প্রচেষ্টার নিবিত এক সৈন্য হিন্দু-প্রধান তাঁহার প্রতিপক্ষ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ধর্মীয় আলোচনা, সামাজিক বিতর্ক প্রকৃতির মাধ্যমে জাতির যে কল্যাণ সাহিত হইয়াছে অল্পকালের তাহার ইঙ্গিতমাত্র দেখা চলে। পূর্বে ইহার কিছু আভাস দেখা হইয়াছে বটে, তবে এখানে এ বিবরটি আরও একটু বিশেষ করিয়া বলি। উক্ত প্রকার আলোচনা-বিতর্কের কলে আমাদের প্রথম ও প্রধান লাভ বাংলা ভাষার শাসনীয়তা লাভন এবং বাংলা সাহিত্যের বহুল প্রকাশ। বাংলা ভাষার মাধ্যমে যে দহুত-জীবনের স্বাভাবিক সমজা আলোচনা ও প্রকাশের উপযোগী তাহা এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল করিতে থাকি। রামমোহন রায় নিবিত ও প্রচারিত ধর্ম এবং সমাজ বিষয়ক পুস্তক-পুস্তিক-গুলির জ্বাবে, অমিকা সত্তেও, পণ্ডিত মুহুর্ত বিদ্যালয়র সৌভাগ্য ভাষার নিবিতে বাধা হইয়াছিল। সৈন্য-বিশেষদেবের যাহা বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া বিভিন্ন-বিষয়ক সংবাদ-পরিবেশনকরে 'স্বাধীনতা', স্বাধীনতা, সমাজনীতি, শিক্ষা-স্বাধীনতা-বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হইতে থাকে। পাঠ্য পুস্তকও সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ প্রকৃতি বিষয় লইয়া দেখা হইতে লাগিল। ভাষা-সাহিত্যের পরিমি ব্যাপক হইবার অবকাশ পাইল। 'সমাজার ধর্ম' হইতে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ পর্যন্ত এই সময় বঙ্গবরের মধ্যে বাংলা দক্ষ-সাহিত্যের গড়ন প্রায় ঠিক হইয়া গেল।

রাজা রামমোহন রায় বাংলা ব্যাখ্যানস্ব যে শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রকাশ শুরু করিয়া গিলেন, তাহা অস্ত্রের এমনকি তাঁহার প্রতিপক্ষগণ কবে গ্রহণ করিলেন। একটু পরে এ কথা বলিতেছি। এই সময়ে আর একটি বিষয়ের সূচনা দেখি। ইহা সম্পূর্ণ রামমোহন-নিবিশেষ এবং অত্যন্ত সুবলপ্রসূ হইয়াছিল। এটি হইল রাজা রাধাকান্ত দেবের 'শঙ্ক-

কল্পদ্রুম' নামক সংকলিত অভিধান লন্ডন-প্রকাশ। কলিকাতা মুদ্রক-দুর্গ মোহনচন্দ্র বিহারী বার্মিক রিপোর্টে (১৮১৮-১৯) এই অভিধানমণ্ডি লন্ডনের 'কীম' বা পরিচয়না ইংরেজীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সংকলিত সাহিত্য যে কত ব্যাপক—বর্ণন, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, অভিধান, আত্মপদ, দশাবল, গণিত, পুথ্য, কাব্য—কত বিষয়ে যে অপরূপ প্রভা হইয়াছে এই প্রস্তাবনা বা পরিচয়নার মধ্যে, তাহা আর কি বলিব? পূর্বেই ইহার সংকলন কার্য আরম্ভ হইয়াছিল। তৃতীয় দশকের প্রারম্ভভাগ পর্যন্ত এই বিখ্যাত অভিধানগ্রন্থের কয়েক খণ্ড বাংলায় মুদ্রিত করাইয়া সাধারণে প্রচার করিতে সক্ষম হইলেন। রামমোহন ছিলেন সম্পূর্ণ বঙ্গদেশপ্রেমিক। জীৱন যিন্মনী বা শাস্ত্রীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে রামমোহন দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইছিলেন। তাঁহার একাধি বঙ্গক-প্রতিপক্ষ সঙ্গ হিন্দুই যে ঐকান্তিক সমর্থন ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮২৪ সনে প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়ীয় সমাজ'-এর ভিতরে। একদলবাদের প্রচারে বা সত্যসাহ বিষয়ে রামমোহনের বাতাব্য বিরোধী ছিলেন আর ঐহারা তাঁহার একান্ত পরকণ্ঠী—উভয়েই আসিয়া দ্বিষ্টলেন 'গৌড়ীয় সমাজে'। 'গৌড়ীয় সমাজ'-এই ইংরেজী কথা হইয়াছে 'Literary Society' বা সাহিত্য-সভা। বাস্তবিক সাহিত্যক্ষেত্রে যে ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ের লক্ষ-বিশেষ সকলেই আসিয়া মিলিতে পারেন, এই সমাজের মধ্যে তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করি। সমাজ বাংলা সাহিত্যের অঙ্গুষ্ঠান, সংকলিত শব্দগ্রন্থ প্রকাশ প্রভৃতিতে মন দিতে লক্ষ্য করেন। হিন্দুধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে যিন্মনীদেব নির্দন আক্রমণ হিন্দুপ্রধানদের একজোট হইতে অনেকটা উৎসাহিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। গৌড়ীয় সমাজের আদর্শ ও প্রেরণা সংকলিত ভাষা-সাহিত্য-পুথ্য ও শব্দগ্রন্থ প্রকাশের মূলে কম সদর জোয়ার নাই। ১৮২৩-১৮৩৪, এই দশ বৎসরব্যাপী হিন্দু কলেজের শিক্ষা যেমন বাঙালী দুঃসম্প্রদায়কে নব নব বিদ্যা আহরণ দ্বারা পাশ্চাত্য ভাবধারার সমাজ-মধ্যে প্রচারে অঙ্গপ্রাণিত করিয়াছিল, তেমনি প্রাচীনরা, কি রামমোহন-দ্বারা কি বঙ্গপন্থী, সকলেই ভারতের নিজস্ব এবং চিরন্তন লক্ষ্য ভাষা-সাহিত্য-সংকলিত—যাহা আমরা ভুলিতে পরিয়াগোঁব, তাহার পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণে প্রয়াসী হইলেন। পশ্চিমের শাস্ত্র আবারের অঙ্গ জীবনকার্য হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই দুই বিভিন্ন দ্বারা পরস্পর-নিরসেপ হইয়া চলিলে তাহার কোষাধ ইতি হইবে, সমাজের ও দেশেরই

বা তাহা কতখানি লক্ষ্যপূর্ণ হইবে? তাই নিত্য ভাবাবিক্রমে, অল্প পরবর্ত্তের মনে অজ্ঞাতসারে, কিছুকাল পরে এই দুই বিভিন্ন আদর্শবিরোধী দ্বারা মিলন হইয়া গেল। এ বিষয়ে এখনে কিছু বলা দরকার। হিন্দু কলেজে শিক্ষিত নব্যদল—ঐহারা পরবর্ত্তী দশকে 'নব্যবঙ্গ' ('Young Bengal') নামে অভিহিত হইলেন, যে কম বাস্তবিক ছিলেন তাহা নহে। তাঁহারা নব্যশিক্ষা-মতাত্মক জ্ঞান-বুদ্ধি অল্পবয়সে বয়সের সেবার উদ্বোধন হইলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই ইংরেজীনিপুণ; ইংরেজীর অঙ্গুষ্ঠাননে রত। তথ্যনি বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রতিও তাঁহাদের দরদ কম ছিল না। ইংরেজী-বাংলা 'জ্ঞানার্থে'—এই লক্ষ্যতনা ও পরিচালনার কথা বলিয়াছি। ১৮৩৪ সনে শিক্ষার মাধ্যম লইয়া দুই দল ইংরেজের মধ্যে ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হইল। এক দল ছিলেন ইংরেজীর লগ্নে, আর এক দল সংকলিত ও আবির্ভাব লক্ষ্যতনা। নব্যদল ইংরেজীর অঙ্গুষ্ঠান মত প্রকাশ করিলেন; তবে এ কথাও লক্ষ্য লগ্নে বলিলেন যে—এমন একদিন আসিবে, আর সেদিন বেশী দূরেও নহ, যখন বাংলা ভাষাই বাঙালীদের শিক্ষার মাধ্যম বলিয়া ধার্য হইবে। শাসনতাত্ত্বিক আবেগের মধ্যে পড়িয়া তাঁহাদের এই ভাবনা কার্যকরী হইতে শতাব্দী কাল লাগিয়া যায়। ঠান্ডা কারমে অঙ্গুষ্ঠান সভ্যসমিতিতে তাঁহাদের যে-সব লক্ষ্যত বক্তৃতা দিতেন তাহাতে তাঁহাদের সোশালবাদের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাঁহারা তৃতীয় দশকে যেন-বাণীদের মধ্যে জ্ঞানালোক বিতরণের জন্যই বেশী করিয়া প্রয়াসী হন। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র নাম হইতেই প্রকাশ সাধারণলভা জ্ঞান অর্থন ও বিদ্যারই ইহা উদ্দেশ্য। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায়ই আলোচনার হ্রোগ দেখা হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বিবর্ষ এই সভার একটি অধিবৈশেষে সর্বপ্রথম একেশ্বরদের দ্বারা আলোচিত হইতে দেখি। হিন্দু কলেজে শিক্ষিত নব্যদলের এক অঙ্গ—ঐহারা সংগোষ্ঠিত হইলেন—নিচু বাংলা সাহিত্যের চর্চায় তৎপর হইয়াছিলেন। ইহারা হাক্স রামমোহন দ্বারের আদর্শে অঙ্গপ্রাণিত, তাঁহারা ইহা আলোচনা-হিন্দু ছুপে প্রথমে শিক্ষাপ্রাপ্ত, এবং পরে হিন্দু কলেজে আসিয়া ভর্তি হন। এই দলের মধ্যে প্রধান ছিলেন রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজেন্দ্রনাথ দ্বার এবং দ্বারবানান্থ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পরে, বহাবি)। 'দর্শনতত্ত্বাঙ্গিকা সভা' পুথ্যপুথি বাংলা প্রতিষ্ঠান। খির হইবে, ইহার কার্য-পরিচালনা হইবে বাংলা ভাষার এবং আলোচনাও চলিবে শুধু বাংলার

মধ্যে। 'আ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'সর্বভাষা-দীপিকা সভা'র যানিসভা উল্লেখ-সাম্য বেশি 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র মধ্যে। অবশ্য, এই তৃতীয় দশকে মাত্র বাংলা সাহিত্য-চর্চার বিমিষই একাধিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আর তাহাতে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং সুবিখ্যাত পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র তর্কভট্ট। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক রূপে তিনি পরে ব্যাতিশািত করিয়াছিলেন।

এখানে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাদির কথা কিছু বলি। ১৮৩৫ সনে বড়লাট বেণ্টিন কর্তৃক শিক্ষার মাধ্যম সংকুচিত ও আরবির পরিবর্তে ইংরেজীকে দাবী করার কথা অল্পই উল্লেখ করিয়াছি। শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী হওয়ার কলে শিক্ষা-লগ্ন্যতে এক দুলাস্তর উপস্থিত হয়। পরে, ইংরেজী-নিকিতদের সরকারী কর্মে নিগোগের হ্রসোগ দেওয়ার সমাজ-চিত্তে এক নব আলোড়ন আসে। কলিকাতার এবং মকঃমলে ইংরেজী বিভাগের প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। সরকারের কর্তৃত্বাধীনে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইল। দান্দীল ব্যক্তিত্ব পছন্দে ও মকঃমলে জনহিতার্থে ইংরেজী বিভাগের স্থাপন করিতে লাগিলেন। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবার হ্রসোগ ঘটিল। বাংলাদেশে বিজ্ঞান-চর্চার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এবং এনিময়িক সোদাইটির আত্মকূশো ইংরেজীতে এবং ব্যক্তিগত প্রসরে ইংরেজী-বাংলার বিজ্ঞান-বিষয়ক পরিকারি তৃতীয় দশকেই প্রকাশিত হয়। ক্রেতারিক করবিনের 'ইণ্ডিয়া ব্রিটিশ' যানিকপরে বিজ্ঞানের আলোচনা চিত্র-নহযোগে প্রকাশিত হইতে থাকে। এই পত্রিকাতেই কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের বসারদস্যের অধ্যাপক ডাঃ উইলিয়াম রাসি ওসাগ-নেসীম বিদ্যাব্যবহারে পদবরণ এবং সর্বসমকে পরীক্ষণের কথা আমরা জানিতে পারি। এই পরীক্ষণ বেশি বড়লাট অকল্যাও হইতে শুরু করিয়া বেশি-বিশেষ গণ্যমাত্র ব্যক্তিত্ব চবৎকৃত হন। এখানে প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখি, এই ওসাগ-নেসীম পরে ভারত-সরকারের টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রথম ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ১৮৩৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিবিধ বিজ্ঞান চর্চার একটি প্রকৃষ্ট কেন্দ্র হইয়া উঠিল। জু অধ্যাপক নছেন, প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরাও বিজ্ঞানের আলোচনার তৎপর হইলেন। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র প্রসারকুমার বিন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকৃতি পরীক্ষিতা সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। রাসা রামমোহন রায় গত দুগে যশেশবাসীয়া বিজ্ঞান-চর্চার আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে প্রবল বুদ্ধি উপাধন করিয়াছিলেন, এত দিনে তাহা কর্ম রূপায়িত হইতে চলিল। রাসারনাথ ঠাকুরের দানে মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষাদাত্য ছাত্রেরা বিশেষ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বাংলার বঙ্গোপদ্রি়ের মূলে বিজ্ঞানানুশীলন কতখানি কার্যকরী হইতুদে যন্ত্রকথার তাহা বলা সম্ভব নয়। এখানে জু ব্রটি ধরাইয়া দিতে প্রয়াস পাওয়ায়।

বেশিতে বেশিতে আমরা তৃতীয় দশকের শেষ বৎসরে আসিয়া উপনীত হইলাম। ১৮৩৯ সনের অক্টোবর মাসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববেদিনি সভা' স্থাপন করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনিও হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং 'নব্যবন্ধ'-কৃত্ত। কিন্তু তিনি এবং তাহার সতীর্থ বহুদূর ডিয়োকিতের সংস্পর্শে আসেন নাই। তাহারা রাসা রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দু মূলের কৃতপূর্ণ ছাত্র ও তাহারাও আদর্শে অল্পপ্রাপিত। রামমোহনের ধর্ম ও সমাজোন্নতি প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হিন্দুশ্রাব চর্চা, বাংলা সাহিত্যের অহুশীলন, রাজনীতিতে স্বাভাব্যবোধ এবং মানবিকতার মহত্তর ভাষায়গাণ্ডিও তাহারদের মনে স্পষ্ট ছাপ রাখিয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ ধর্মীয় হুলাস; বিলাসের আবের্থে নিপতিত হইয়া যন্ত্রকাল মধ্যেই আবার রুবিয়া পড়াইলেন। রামমোহনের উচ্চ ভাবানন্দিত্তিক অহুপ্রেরণা পুনরায় তাহাকে 'স্বধর্মে' প্রতিষ্ঠিত করিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের মত জন কুবক মাত্র লইয়া প্রথমে 'তত্ত্ববেদিনি সভা' গঠিত হয়; কিন্তু ইহার কর্মচেষ্টা বেশিরা তিন-চার বৎসরের মধ্যেই বাহিরের কুবক-সমাজ সভার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। সভার প্রথম কার্য—বাংলার মাধ্যমে ছেলেরের সর্ববিধের শিক্ষাদানের নিমিত্ত একটি বাংলা পাঠশালা স্থাপন। দ্বিতীয় কার্য হয়—রামমোহন-প্রচারিত একেশ্বরবাদমূলক পুস্তকসমূহ এবং হিন্দুশ্রাবাদি প্রকাশ। বেদবিদ্যা-চর্চা এই বিভাগের একটি প্রধান অঙ্গ, আর এই নিমিত্ত সভা পরে কাশীধামে চাচিহন পণ্ডিত-ছাত্র পাঠাইয়াছিলেন। তৃতীয় কার্য—সভার কর্তৃত্বাধীনে 'তত্ত্ববেদিনি পত্রিকা' প্রকাশ। এই সন্দর্ভ কার্য যে একই সময় বা একই বৎসরে সংগঠিত হইয়াছিল এমন নয়, প্রতিষ্ঠার পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যে, সভার সমস্ত-সাধ্যা বুদ্ধি হইলে এবং ইহার গুহ্য ও সাধারণের জ্ঞানকর হইতে থাকিলে এইসব সম্ভবপর হইয়াছিল। এই সভা আবার রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ পরিকল্পনাভারও গ্রহণ করিলেন। সভার সম্বন্ধে যিহন বরিয়া বলিতেছি এইমত

বে, চতুর্থ ও পঞ্চম এই দুই দশকেও ইহার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাঙালীর প্রাণে নবচেতন।—নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন দশকের সহায় হইয়াছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'বাঙালীর ইতিহাস—৩য় খণ্ড' এই সভ্যতার গুরু ও সংকুচিতসমূহের কথা অনবদ্য ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। নব্যবঙ্গ তথা ডিরোজিও-শিক্ষণও ধলে ধলে তত্ত্বাবোধিনী সভার সহিত হইয়া ইহার কাব্যিক-সম্পাদনে আন্তরিকভাবে সহায়তা করিতে লাগিলেন। রামমোহনের ভাবাদর্শ যে সভার মূল, তাহার মধ্যে 'বিশ্ববী' ডিরোজিও-শিক্ষণ লীন হইয়া ইহাকে এক অভিনব শক্তির আধার করিয়া তুলিল। বুদ্ধগণ্টল সমাজ—বাহাদুর রামমোহনের প্রতিপক্ষ ছিলেন, এবং 'ধর্মসভা' স্থাপন করেন, তাঁহারা তত্ত্বাবোধিনী সভার স্বকল্যাণ কামকালে আরুহ্য হইলেন। প্রতিপক্ষ-প্রধান রাজা বাহাদুর দেব তত্ত্বাবোধিনী সভার প্রতি সম্বন্ধে হইয়া নিজ 'শব্দকল্পদ্রুম' উহাকে বড়ই উপহার দিতে লাগিলেন। তাহার জামাতা জ্ঞানেশ্বর ঘোষ ও অন্ততলাল মিত্র এবং দৌহিত্র অননন্দকৃষ্ণ বসু সভার কর্মসম্পাদনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৪৪ সন নাগাদ এমন একটি ঘটনা ঘটে বাহ্যিক ধলে এই প্রাচীন হল আর ধীরে ধীরে পাকিতে পাকেন নাই, তত্ত্বাবোধিনী সভার কর্মসম্পাদনের সঙ্গে তাহারও কার্যে অঙ্গসং হইলেন। এই বিঘটি বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সংক্ষেপে হুঁচক কথায় বলিয়া বুঝানো যাইবে না।

কিন্তু ইতিমধ্যে 'নব্যবঙ্গ' কি করিতেছিলেন? নব্যবঙ্গ এখানে এক বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইলেও, ইহার মধ্যে হিন্দু কলেজের পরবর্তী সুবছাত্রগণকেও ধরিতে হয়। হিন্দু কলেজের ডিরোজিও-মুগ্ধ যেমন, তেমনি ডি. এল. রিচার্ডসনের অধ্যাক্ষতা-কালকে (১৮৩৮-৪৩) রিচার্ডসন-মুগ্ধ বলা যায়। এই দুইগণ প্রখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন—বালকসাহায্য বসু, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, জগদীশনাথ রায় প্রভৃতি। ইহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিভাগে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। 'নব্যবঙ্গের' কার্যকলাপের সঙ্গে

ইহাদের সাক্ষাৎ যোগস্থাপন এসবর হৃদয় লব্ধ ছিল না, কিন্তু তাহাদের জীবন ও কর্ম যে জাতীয় ভাবাদর্শে বহুলাংশে অঙ্গপ্রাণিত হইয়াছিল তাহার কারণে এমনি হইয়াছে। 'নব্যবঙ্গ' পান্ডারা ভাবাদর্শের উপাসক। কালেক্টর রাজনীতিক প্রসঙ্গিত যে তাহাদের কর্মসূচীতে একটি উচ্চ স্থান পাইবে তাহা আর বিচিتر কি? বঙ্গদেশে নিকর সম্পত্তি থাকেহাত্তকরণের প্রতিবাদে রাজনৈতিক সভা—বেমেন, জমিদার সভা—প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকল্পে একটি পুরাতন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এখানে স্থাপিত হয় নাই। এই ধরনের রাজনৈতিক সভা বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ—রামমোহন ঘোষ, তারারচরণ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচরণ মিত্র, চন্দ্রশেখর দেব, পান্ডী কলমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ভারত-হিতৈষী রামমোহন-বন্ধু উইলিয়াম অ্যাডাম বিলাতে কিরিয়া ১৮৩১ সনে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার অগ্রণী হন। এই সভার উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ-শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের তথ্যভিত্তিক আলোচনা এবং আন্দোলন পরিচালনা। মানব-হিতৈষী বান্দীপ্রবর জর্জ টমসন এই সভার সঙ্গে যুক্ত হইয়া ভারতবাসীর অহুকুলে বিলাতের প্রধান প্রধান সভায় বক্তৃতা দি করিয়াছিলেন। ভারতবাসী ঠাকুর প্রথম বার বিলাত-ভ্রমণকালে তাহার এবং তদীয় সহকর্মীর সহিত পরিচিত হন। বঙ্গদেশে কিরিবার সময় তাহাকে তিনি নিজ ঘরে ভারতবর্ষে লইয়া আসেন এবং নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ করাইয়া দেন। এই আলাপ-পরিচয়ের ফলে কলিকাতার উপরি-উক্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সম্ভব হইল—ইহার নাম 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'; প্রতিষ্ঠাকাল ২০শে এপ্রিল ১৮৪৩। সভার মুখপত্র হইল 'বেঙ্গল শেফটের' নামক বাংলা-ইংরেজী পত্রাঙ্গীক। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই সভাটিকে 'ভারতবর্ষীয় সভা'-রূপে অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার প্রতিষ্ঠার পর হইতে 'তত্ত্বাবোধিনী সভা'ও নূতন বল পাইল, এবং বাংলায় শিক্ষিত সাধারণের আদর্শবিশিষ্ট জ্ঞানসমৃদ্ধ উচ্চ প্রতিষ্ঠানই সবভাবে উজ্জ্বল হইল।



ভৌতিক

কানাই মানা বললেন, “গেল বৈঠকে কাণ্ডি যখন ভৌতিক প্রেম-কৃষ্টি-কাহিনী শোনাতে তখন আনারও একখানা ভৌতিক কাহিনী শোনাবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু শোনাই নি। যদি তোমরা শুনতে চাও তো আজ শোনাতে পারি।”

বলা বাহুল্য আমরা সবাই শুনতে চাইলাম। কানাই মানা কাহিনী শোনাতে শুরু করলেন।

বহুর কয়েক আগেকার কথা। কানাই মামার বয়স তখন এখনকার চাইতে কম। দিন কয়েকের ছুত্রে পরিবেশ বদলাতে গেছেন এমন এক মফস্বল শহরে, যে বেচারী তখনো পুরোপুরি শহরে হয়ে উঠতে পারেনি। অর্থাৎ সে শহর কিনা সে সবকিছু নিজে তখনো নিঃসংশয় হয়নি। তার অনেক রাস্তার দুধারে সারি সারি গাছের বাহুলা; এখানে সেখানে কোপ কাড়; বিকেলের পর থেকেই তাদের ছেতর অন্ধকার আঙা মারতে শুরু করে।

শহরে যদিকে সূর্য ডোবে সেদিকের সীমান্ত ঘেঁষে শহরের সমনামধারী ছোটখাট রেল-স্টেশন, তার প্রায় গা ঘেঁষে ছক্কোড়া রেল-লাইন। তাদের ওপর দিয়ে মাল আর যাত্রী নিয়ে রেলগাড়ি সময়মতো এবং অসময়মতো যাতায়াত করে। মিমেটে বাঁধানো প্রাটকর্মের বুক ভিড় জমে, ভিড় কমে, আবার জমে, আবার কমে; এইভাবে ঘুরে চলে জমা-কমার চাক।

এই স্টেশনেই সম্প্রতি-স্মৃতিপূর্ব স্টেশন-মাস্টার

বিরিকি হালদার তখন সম্প্রতি বিপত্নীক হয়েছেন। ‘রিটার্নার’ করে দাম্পত্য জীবন উপভোগ করা বিধাতাপুত্র তাঁর ললাটে লেখেননি। বিরিকি-বাবু অনেক স্টেশনে মাস্টারি করেছেন; তাঁকে বলা চলে ‘ভেটোর্যান’ স্টেশন-মাস্টার। তাঁর মাস্টারি-করা প্রত্যেকটি স্টেশন বিরিকি-পত্নীর সঙ্গে সপত্নীর মতো ব্যবহার করেছে। যে স্টেশনেই যখন মাস্টারি করেছেন বিরিকিবাবু, সে স্টেশনই তাঁকে এমন ভাবে প্রেম-মশগুল করে রেখেছে যে প্রেমের পত্নীর কথা ভাববার তিনি অবসর পাননি। নাওড়া-খাওড়া ইত্যাদি পরমাবশ্যিক কৃত্যাবি সেরে বাকী সময় প্রায় সবই তিনি উৎসর্গ করে দিতেন স্টেশনের বোনীতগো। সম্ভবতঃ সেই হুঁত্ব অনেক-দিন সয়ে-সয়েই শেষ পর্যন্ত আর সইতে না পেরে বিরিকি-পত্নী মারা গেলেন। আর তার মাত্র মাসখানেক পরেই বিরিকিবাবুর চাকুরি-জীবন শেষ হলো। তিনি পেনশন পেলেন। তার আগেই স্টেশনের কাছাকাছি একটা ছোটখাট বাড়ি সন্তায় কিনে রেখেছিলেন, স্টেশন-মাস্টারের কোয়ার্টার ছেড়ে সেই বাড়িতেই উঠে গেলেন বিরিকিবাবু; সেই বাড়িতেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবেন ঠিক করলেন।

স্টেশনের কাজে রাত জাগছেন বলে, জাগবার সুবিধার জন্য বিরিকিবাবু পান অভ্যাস করেছিলেন। অর্থাৎ পান-গুলি তাঁর রপ্ত হয়েছিল। পত্নী-বিয়োগের পর সেটি গবেষণায় পরিণত হলো।

বিভিন্ন জাতের পানীয় বিভিন্ন ভাবে মিশিয়ে পান করলে তার ফলাফল কি রকম বিভিন্ন হয় তাই নিয়ে নানা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করাই তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠলো। বিচিত্র, অদ্বুত তাঁর মিশ্রণ-প্রকরণ। ড্র্যাগির সঙ্গে মিষ্টি, জ্যাম্পানের সঙ্গে মৃতসজীবনী হুবা, বীয়াগের সঙ্গে দশমুলারিষ্ট, শেরীর সঙ্গে ভাড়ি—এমনি আরো নানা রকম। কখনো বা তিন, চার বা ততোধিক রকমের পানীয়কে তিনি এক পেহে মৌন করতেন, ভারত-ভূর্ধে যেমন করে অর্ধ, অনাৰ্ধ, শত মুন দল, পাঠান-মোগল, জাবিড় চীন ইত্যাদি এক হয়েছিল। পানের কলাফল, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের নেশা সবুড়ে খাওয়া নোট করে রাখতেন। এই ছিল বিপত্তীক বিরিকিবাবুর শেষ বয়সের শখ। ছপেয়ে শব্দ হয়তো একটু পেয়েছিলেন পত্তীশোকে, সেই শব্দে খানিকটা তাঁর এই শখের পেছনে থাকা অসম্ভব নয়।

কানাই আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হলো। আলাপের কলে গুচনই খুলী হলেন।

একদিন বিরিকিবাবুর বাড়িতে রাতের আহারের নেমন্তন্ন হলো কানাই আমার। বিরিকিবাবু বলে দিয়েছিলেন, “সন্ধ্যা হতেই এসে পড়বেন কানাই-বাবু, যেতে বসবার আগেও বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব করা যাবে।” কানাই নানা তাই সজ্জার বর: একটু আগেই গিয়ে হাজির হলেন বিরিকি-ভবনে। বিরিকিবাবুর রাজ্যবরে তখন রাজ্য করছে রামভৈরব, স্টেশনের ভূতপূর্ব কুলী-সদর। সে বিরিকিবাবুর বাড়িতেই থাকে, রাজ্য করে নিজে খায় এবং বিরিকিবাবুকে খাওয়ায়। থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে বিরিকিবাবুর বাড়িতে রাঁধুনির ডিউট করছে দারভাঙা ফেলার রামখেলন। তারই খেলনকে ভৈরব রূপ দিয়ে, রামখেলনকে রামভৈরব বানিয়ে নিয়েছেন বিরিকিবাবু। রামখেলন তাতে আপত্তি করেনি, কারণ রামভৈরব নামটাও তার অপছন্দ নয়।

বিরিকিবাবু বলেছেন, “ইন্সিডানে তুই রামখেলন। কিন্তু আমার বাড়িতে তুই রামভৈরব।”

রামভৈরব মাথা বেড়ে বলেছে, “বহুং আচ্ছা, হজুর।”

স্টেশনের নতুন হজুর যিনি এসেছেন, তাঁরও নেমন্তন্ন। অর্থাৎ বর্তমান স্টেশন-মাস্টারের নেমন্তন্ন ভূতপূর্ব স্টেশন-মাস্টারের বাড়িতে। নতুন হজুরের নাম পুরোনো ধরনের—উপেনবাবু। উপেন তরফদার। বিরিকিবাবু ভূতপূর্ব হবার আগে সস্ত্রীক যে কোয়াটারে থাকতেন, এখন উপেনবাবু সস্ত্রীক থাকেন সেই কোয়াটারে। উপেনবাবু জীবনে একবার বিপত্তীক হয়েছেন এবং ছাঁবার বিবাহ করেছেন। এখনো পিতা হননি বা হতে পারেননি। নিজে বাবা হবার মাছলি ধারণ করেছেন। স্ত্রীকে ধারণ করিয়েছেন মা হবার মাছলি। মাছলির অলৌকিক ক্ষমতার ফল এখনো প্রকাশ পায়নি। অপেক্ষায় আছেন হুজুরে।

নেমন্তন্ন খেতে এলেন উপেনবাবু। বিরিকি-বাবু আলাপ করিয়ে দিলেন কানাই আমার সঙ্গে। উপেনবাবু হাত জোড় করে বললেন, “নমস্কার।” কানাই মামাও তাই করে বললেন, “নমস্কার।”

বিরিকিবাবুকে ‘দাদা’ বলেন উপেনবাবু। বিরিকিবাবু উপেনবাবুকে ‘উপেন’ বলে ডাকেন উপেনবাবুবই বিশেষ অমুরোধে। কারণ বয়স তাঁর বেড়েছে এবং বাড়ছে, এই কথাটা হুলে থাকতে চান উপেনবাবু।

দাদার সঙ্গে ছোট ভাইটির সবচেয়ে বড় অমিল স্টেশন সবুড়ে। স্টেশন-মশগুল হয়ে স্ত্রীকে ভুলে থাকতেন বিরিকিবাবু, কিন্তু চামেলি-মশগুল হয়ে উপেনবাবু স্টেশন-মাস্টার হয়েও স্টেশন সম্পর্কে যথাসম্ভব উদাসীন; উপেনবাবুর হুঁসর স্ত্রীর ডাকনাম চামেলি।

সেই নেমন্তন্নের রাতে চাঁদ উঠেছে আকাশে, কুমড়োর পূর্ব কাগির মতো। ঐ চাঁদ দেখে বার বার চামেলির কথা মনে পড়ে যেতে লাগল বিরহী উপেনবাবুর। চামেলি থেকে যতক্ষণ দূরে থাকেন,

ততক্ষণ বিরহ-বাথা ভেতরে ভেতরে অমূর্তব করেন তিনি।

বাঙ্কেন তিনজন, পরিবেশন করছে রামভৈরব। হেঁসেলে সে আর কাউকে টুকে দেয় না। তা ছাড়া নিজে সে যেমন খাইয়ে, অল্পকে খাওয়াতেও সে ভেগ্নি ভালবাসে। শুধু ভোজনবিলাসী নয়, রন্ধন-বিলাসীও সে। পরের মুখে আপন রান্নার তারিফ শুনতে ভারি ভালবাসে। আর তারিফ করবার মতো রান্না রান্ধেও কটে।

বিরিকিবাণ্ড বললেন, “মুড়িঘটটা খাদ্য রেখেছিস, রামভৈরব।”

শুনে উপেনবাণ্ড বললেন, “চামেলিও চমৎকার মুড়িঘট রান্ধে, দাদা। খাওয়াবো একদিন আপনাকে।”

শুনে—কানাই মামা লক্ষ্য করলেন—রামভৈরবের মুখে একটু যেন ভৈরব ভাব ফুটে উঠলো। তাই কানাই মামা বললেন, “চামেলি দেবী তো ভালো রান্ধবেনই। রন্ধনে ভ্রোণদী হওয়া ভ্রোণদীর স্বজাতীয়াদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু রামভৈরব সর্দার মানুষ, ওর হাতে এমন রান্নার সম্ভাবনা অল্পও ভাব্য শক্ত। ওহে রামভৈরব, বলি, দেবে নাকি আর একটু? এমন মুড়িঘট অনেকদিন খাইনি।”

রামভৈরব খুশী হয়ে একটু নয়, অনেকখানি মুড়িঘট এনে দিল কানাই মামার থালায়।

শেষের দিকে চাটুনি দিয়ে গেল রামভৈরব। অতি বিচিত্র সূত্ৰাঙ্ক চাটুনি, বহু বিভিন্ন ধরনের চাটুনির উপকরণ বিচিত্র কায়দায় একসঙ্গে বেশানো। এ যেন চাটুনির ককটেল। কানাই মামার মনে হলো, এ ব্যাপারে রামভৈরবের ওপর তার মনিবের বিচিত্র প্রভাব কাজ করছে। দুজনেরই প্রকরণ একই প্রকারের, তকাত শুধু উপকরণের।

চাটুনি চেখে কানাই মামার মনে হলো এতে পরম সুকৌশলে জলপাই, কাঁচা আম, নেবু, কংবেল, আমলকি, কিসনিম, আপুবখরা, তেঁতুল, দিশী ও বিলিঠী আমড়া প্রকৃতি নানাবিধ মশলায় বেশানো

হয়েছে। এদের প্রত্যেকটির খণ্ড খণ্ড সুখাদ্য একসঙ্গে মিশে একটি বিশ্বয়কর অখণ্ড সুখাদের সৃষ্টি করেছে। চাটুনি খেতে খেতে বিম্মিত দৃষ্টিতে কানাই মামা তাকালেন রামভৈরবের দিকে। চামেলিও কিসের কিসের চাটুনি চমৎকার তৈরি করে তার একটা ফর্দ শোনাতে যাচ্ছিলেন উপেনবাণ্ড, কিন্তু সেদিকে এক ঝোঁটা কানও দিলেন না কানাই মামা। বললেন, “অ্যায়া চাটুনি হামারা পিতাভীকা উমরমে তি হান কতি নেহি ঝায়া। আরেকটু দাও তো হে, রামভৈরব।”

এলি করে রামভৈরবের হৃদয় জয় করে নিলেন কানাই মামা। কিন্তু তখনো শেষ নয়, এর পর চিনিপাতা দইও ছিল। তিনখানা পিরিচি দই দিয়ে গেল রামভৈরব। বিরিকিবাণ্ড হেসে বললেন, “শুনলে আপনারা অবাক হবেন, খেয়ে আরো অবাক হবেন, এ দই রামভৈরবের আপন হাতে পাতা। দোকান থেকে কেনা নয়।”

উপেনবাণ্ড বললেন, “চামেলিও কিন্তু—”
বিরিকিবাণ্ড বললেন, “দইটা আগে খেয়ে নাও, উপেন। মুখের প্রধান কর্তব্যটা আগে করো। হুঁনস্বরটা পরে কোরো। অবিস্ত্রি তোমার যদি পালাবার তাড়া না থাকে।”

উপেনবাণ্ড বললেন, “না দাদা, পালাবার তাড়া থাকবে কেন? ইন্টিশান দেখছে বটুকেশ্বর। বটুক আমার ভারি ওবিভিএট্—ডান হাত, দাদা।”

বটুকেশ্বর দাস-শর্মা স্টেশনের হুঁনস্বর, উপেনবাণ্ডর ঠিক পরেই। অবস্র অনেক পরে। তবু উপেনবাণ্ডর সে হুঁনস্বর ডান হাত। প্রাণোশনের জন্তে ভারি ব্যস্ত, তাই বুশি রাখে উপেনবাণ্ডকে। উপেনবাণ্ড ভরসা দিয়ে বলেন, “উন্নতি তোমার কেউ আটকাতে পারবে না, বটুক। আনি তোমায় রেকমেণ্ড করবো, ভয়ানক রেকমও করবো, যাকে বলে সুপারিশ; অবিস্ত্রি জানিনে আমার সুপারিশের দাম ক’পরদা।”

বহুধর বট্টকেশর বলে, “আপনার সুপারিশের দাম লাখ টাকা, স্যার।”

বিরিক্টিবাবু রসিকতা করে বললেন, “ইন্সটলমেন্টের কথা বলছি, উপেন—বলছি চামেলির কথা।”

উপেনবাবু সলাজ ভঙ্গিমায় বললেন, “দাদা, কী যে বলেন।”

আহারপর্ব সমাপ্ত হলে পর একখানা রেকাবির ওপর সাক্ষিয়ে একগাধা মিঠেপানের খিল নিয়ে এসে দিয়ে গেল রামভৈরব। চমৎকার বিভিন্ন মশলা সহযোগে সাজানো খিলিগুলো! অমন সুবাস পান অনেকদিন খাননি কানাই মামা। বললেন, “চমৎকার!”

বিরিক্টিবাবু বললেন, “রামভৈরবের আপন হাতে সাজা। দোকান থেকে কিনে আনা নয়। অতুত পান সাজে রামভৈরব।”

উপেনবাবু বললেন, “চামেলির হাতের পান একদিন আপনাকে খাওয়াবে, দাদা।”

বিরিক্টিবাবু কিছু বললেন না। পান খাওয়া শেষ করে যখন যাবার জন্য উসখুস করতে লাগলেন উপেনবাবু, তখন তাঁকে আর আটকে রাখতে চাইলেন না। সুযোগ দিলেন বিদায় নিয়ে চলে যাবার।

উপেনবাবু চলে গেলে পর বিরিক্টিবাবু বললেন, “উপেনের একটা ছেনিস আপনি বোধ করি লক্ষ্য করেছেন, কানাইবাবু?”

কানাই মামা বললেন, “সেটা আপনিও লক্ষ্য করেছেন মনে হচ্ছে। উপেনবাবুর মর্মান্বিতিক চামেলি-মগ্নতা।”

“ঠিক তাই।” বললেন বিরিক্টিবাবু। “চলতি কথায় বলতে গেলে বলা চলে উপেনকে চামেলির কুতে পেয়েছে।”

শেষ কথাটা বুঝি বা অজ্ঞাতসরোই কসু করে বেরিয়ে গিয়েছিল বিরিক্টিবাবুর মুখ থেকে। ‘ভূত’ শব্দটা উচ্চারণ করে কেসেই তিনি যেন একটু অবস্থি বোধ করতে লাগলেন। তারপর একটু

সামলেই বললেন, “চামেলি আর উপেনের কিন্তু প্রেম করে বিয়ে হয়নি, কানাইবাবু। নেহাতই ঘটক-ঘটিত বিবাহ। প্রথমপক্ষ বিগত হবার পর বছরখানেক বিরহ-ব্যথা মইলে উপেন তরুণদার। শুনেছি, ব্যথা হ্রাসবার জন্তে একটা তরপনার সেতার কিনে মাস্টার রেখে কিছুদিন পিড়ি-পিড়িও করেছিল। তরপনার সেতার কিন্তু বিরহ-আলার আগুন নেভাতে পারলে না। তখন পক্ষহীন হয়ে আর থাকতে চাইলে না উপেন। দ্বিতীয়পক্ষ সংগ্রহের জন্তে শরণ নিলে মৃত্যুঞ্জয় ঘটকের।”

“তার পর?”

“মৃত্যুঞ্জয়ের ঘটকালিতে উপেনের ঘরে এলো দ্বিতীয়পক্ষ। চামেলি। এমন কিছু ডাকমাউটে মুল্লুরী নয়,—কিন্তু একদিকে যৌবন, আরেকদিকে নিষ্ঠে নামের মোহনিয়া। যাহু। হাতে ঠাণ্ড পেয়ে ঘটককে প্রচুর খুশী করে দিলে উপেন। প্রথম-পক্ষকে বিশ্বস্তির অতলে তলিয়ে দিতে পারলে বেঁচে যায় বোজারা, কিন্তু যতই তাকে তলিয়ে দেবার চেষ্টা করলে উপেন, ততই সে বার বার ভেসে ভেসে উঠতে লাগল হাওয়া-ভর্তি রবারের বলের মতো।”

চামেলি তথাকথিত মধ্যবিত্ত গরীব পরিবারের মেয়ে। পণ দেবার একদম সাধ্য ছিল না বলে তার বাবা পণ করেছিলেন পণ দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

মৃত্যুঞ্জয় ঘটক এসে তাঁকে খবর দিলে বিনা পণে বিবাহ করবে বলে পণ করেছে একটি পরম সুপাত্র, তার নাম উপেন তরুণদার। চাকরি পাকা—স্টেশন-মাস্টারি। দোকানবর বাটে, কিন্তু চেহারা মেখে টের পাবার জো নেই। আর প্রথমপক্ষও ছিলেন লক্ষ্মীধরুপিণী, স্বামীকে একেবারে নির্ভরতা রেখে চলে গেছেন। ঝাঁকা সংসার, দ্বিতীয়পক্ষ এসে বসলেই হয় শূন্য আসন পূর্ণ করে।

বলা বাহুল্য, পাত্রী মেখে, অর্থাৎ চামেলিকে মেখে পছন্দ হলো উপেনের। মৃত্যুঞ্জয়কে আড়ালে

পেয়ে বললে, “মৃত্যুঞ্জয়, তাহলে পাঞ্জি দেখে এ মাসের ভেতরই—”

“পাত্রে মাথায় একটু টাকের আভাস দেখা দিয়েছে যেন।” মৃত্যুঞ্জয় ঘটককে আড়ালে বললেন চামেলির বাবা। বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনি; মেয়ে দেখবার সময় উপেনের ছুচাখ থেকেই তার আকুল প্রাণের ব্যাকুল হৃদে গুনে নিয়েছিলেন। স্তরঃ স্তরঃ শীতের মধ্যে না গিয়ে কোপ বৃক্ষে কোপ মারলেন। বিয়ের খরচা বাবদ পাত্রের পকেট থেকে কিছু টাকা নিজের পকেটে আগাম চালান করে নিয়ে চামেলিকে সম্প্রদান করলেন উপেনের হাতে।

মুখ হয়ে বিয়ে করেছিল উপেন, কিন্তু মুখ হয়ে বিয়ে করেনি চামেলি। চামেলির যে মুখ দেখে মোহিত হয়েছিল উপেন, সেই মুখ যে ভীষণ মুখর হয়ে উঠতে পারে, উপেন তা ভাবতে পারেনি। কিন্তু মুখরা হলো চামেলি।

প্রথমপক্ষে যে ভাষায় ভালবাসা জানিয়েছিল উপেন, দ্বিতীয়পক্ষে ভালবাসা জানাতে গিয়ে ভাষায় তার চাইতে আরো বেশী কবির মাথানো দরকার বলে মনে হলো উপেনের। প্রেম-নিবেদন-মনস্তত্ত্বের এই হয়তো স্বাভাবিক নিয়ম। প্রথম প্রেমের পরে আর কখনো প্রথম প্রেম হয় না, স্তরঃ প্রথমাকে যা বলা হয়েছিল দ্বিতীয়কে তা বলা চলে না। বিশেষ করে দ্বিতীয় যদি নিজেকে দ্বিতীয় বলে জানেন। প্রথমপক্ষের পর যে স্বামী দ্বিতীয়পক্ষের গম্বু ব্যস্ত হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, দ্বিতীয়পক্ষের পর তাঁর পক্ষে তৃতীয়পক্ষের সম্ভানে ধাবমান হওয়া অসম্ভব নয়, এই সোজা কথাটি দ্বিতীয়র খেয়াল না থাকার কথা নয়।

“তা যাই হোক”, বিরক্তিবাবু বলতে লাগলেন কানাই মামাকে, “চামেলিকে দোজবর উপেন যতই দেখি-পদপদ্মযুগ্মারূপ করুক না কেন, চামেলির মন তবু শুকিয়েই রইল। প্রেমের কোনো বুলি দিয়েই তাকে ভেজাতে পারলে না উপেন। চেষ্টা তবু ছাড়লে না। তাবলে—টাই, টাই এগেন। বছরের

পর বছর, বর্ষার পর বর্ষা, কিন্তু কিছুতেই বদলায় না চামেলি। বদলায় না উপেনও। টাকের মূহু আভাস ক্রমে মূহু টাকে পরিণত হলো উপেনের মাথায়। সে ইতিহাস অনেক লম্বা না হোক, একেবারে বেঁটেও নয়। চামেলির দত্ত জেব—দোজবর স্বানীকে সে হৃদয় দেবে না, উপেনেরও তত জেদ—চামেলির হৃদয় সে জয় করবেই। দুটি জেদ পালাপালি দুটি সমান্তরাল সরল রেখার মতই এগিয়ে চলল। সরল রেখা বললান বাটে, কিন্তু জটিল রেখা বললেই বরং ঠিক হতো। অপর কোনো স্বামী হলে বোধ হয় ছুস্তোর বলে ছেড়ে দিত; কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে না, দিতে পারলে না উপেন। কুমারী চামেলিকে বিয়ে করে সে তাকে দোজবর স্বামীর স্ত্রী বানিয়েছে এই অপরোধ-বোধটো প্রবল হয়েই দুর্বল করে দিয়েছিল উপেনকে। তারপর একাধিক স্টেশন ঘুরে আমার পেন্সনের পর আমার পোকে এসে আমার ছেড়ে-আসা কোয়টারে বাসা বেঁধেছে উপেন। আমি ওর চাইতে বয়সেও বড়, চাকরিতেও সিনিয়র, তাই প্রথম থেকেই আনায় দাখা বলতে শুরু করলে উপেন। আনায় জোর করে ‘তুমি’ বলালে, ‘বাবু’রীতি নান ধরে ডাকালে। এমন কি চামেলির দাদাও আমাকে হতে হলো। এ পর্যন্ত হলো ভূমিকা। আসল কাহিনী এইবারে শুরু।”

বিস্মিত কণ্ঠে কানাই মামা বললেন, “এতক্ষণে আসল কাহিনী শুরু?”

“শুরু।” বললেন বিরক্তি হালদার। “কাহিনী শুনে আপনি অবাক হয়ে যাবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না।”

কানাই মামা বললেন, “নিশ্চয় বিশ্বাস করব। আপনি বলুন।”

“তাহলে আরেকটু ভূমিকা করে নিতে হয় আমার নিজের কাহিনী খানিকটা বলে।” বললেন বিরক্তি হালদার। “ওনে অবাক হবেন আপনি, আমি ভালবেসে বিয়ে করেছিলুম, কিন্তু বিয়ে করে

ভালবাসতে পারিনি। তাই এক এক বার ভাবি—যাকগে, কি ভাবি তা জেনে আপনার আর লাভ কি বলুন? আপনারের প্রতিষ্ঠাকর নাকি একখানা উপস্থাপনা লিখেছেন—তাতে যে থাকে ভালবাসলে, সে তাকে বিয়ে করলে না, বিয়ের চাপে ভালবাসা পিষে মরবে বলে। বৃদ্ধির কাজ করেছিল নশাই।”

“কিন্তু খ্রীকে আপনি ভালবাসতে পারেননি কেন, বিরিকি বাবু?” শুধালেন কানাই নানা। “খ্রীকে ভালবাসাই তো আপনার কর্তব্য ছিল।”

বা হাতের তালুর ওপর ডান হাতে তালি দিয়ে বিরিকি বাবু বললেন, “এই তো ধরেছেন আপনি! ভালবাসাটা যেই ডিউটিতে দাঁড়িয়ে গেল, অগ্নি ভালবাসার বারোটাও বেজে গেল। বিয়ের অনুষ্ঠানে হৃদয়-বদলের মন্ত্র পড়া হয়েছিল: তোমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় তোমার হোক—এই সব। আশুনকে মামী রেখে শপথ করে খ্রীকে যেহি বললুম—‘তোমার জীবনের ভার আমি গ্রহণ করলুম’—অগ্নি সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার জীবনের ভার হয়ে উঠলেন।”

বিরিকি হালদারের মনে এ ধরনের ভাব এবং মুখে এ ধরনের কথা আশা করেননি কানাই নানা। স্টেশন-মাস্টারোচিত ভাব বা কথা এ নয়। বিশ্বয় দেখা দিল কানাই নানার মুখে।

বিরিকি বাবু বললেন, “সাগেই বলেছিলুম আপনি অবাক হবেন। হয়তো ভাবছেন আমি ব্যতিক্রম, মার্কীয় আমার ছিট ছিল। অমন ভাবলে যে ভুল ভাবছেন তাও জোর করে বলতে পারিনি। কিন্তু তাই বলে এমন ভাববেন না যে, খ্রীকে আমি অশ্রদ্ধা, হেলা, তুচ্ছ বা অব্যস্ত করেছি। মাইনে যা পেয়েছি তা হাতি-মার্কী না হলেও আমাদের দুজনের পক্ষে যথেষ্টর চাইতে বেশী। ভালোভাবেই খেতেছি, খ্রীকে ভালোভাবেই রেখেছি, জীবন-ব্যতায় কল্পসি করিনি কখনো। সামান্য মর্দি হলেও ডাক্তার দেখিয়েছি। অর্থাৎ

ভার বইবার যে দায়িদ অগ্নিসাক্ষী করে ঘাড় পেতে নিয়েছিলুম, সে ভার বিবাহের ডেফিনিশান অনুসারে বিশেষ ভাবেই বহন করেছি, কোনো ত্রুটি করিনি। কিন্তু যে ভালবাসায় ব্যক্তব্যস্ত নেচে ওঠে অনির্বচনীয় রোমাঞ্চময় আনন্দে, সে আর কিরে এলো না জীবনে। খ্রীকে ভালবাসতে না পেরেই স্টেশন-মশগুল হয়ে উঠলুম। খ্রীকে ভালবাসা যখন ডিউটি হয়ে উঠলো তখন স্টেশনের ডিউটিকে ভালবেসে ফেললুম। একেলে খ্রী হলে কি করতেন জানি না, কিন্তু আমার খ্রী একেলে নয়। তিনি নালিশও জানালেন না, কৌদলও করলেন না। খ্রীর কর্তব্য পাতিব্রতা, তাই শেষ পর্যন্ত করে গেলেন। ঈশ্বরের দ্বায়ে ডিউটিতে পাছে আমার ঠাণ্ডা লাগে, তিনি উল কিনিয়ে এনে আপন হাতে বুনে দিতেন সোয়েটার-মাক্‌লার। আমার স্নানের জন্য জল গরম করে দিতেন নিজে। শেষ রোগশয্যায় শুয়ে পড়বার আগের দিন পর্যন্ত আপন হাতে রেখে খাইয়েছেন আমাকে। আমার জন্তে দুই পাতেডেন নিজে, পান সাজতেন নিজে, নানারকমের চাটুনি, আচার, মোরক্সা আপন হাতে বানাতেন তিনি। দিনরাত তাঁর ভাবনা কিসে আমি ভালো থাকবো, কিসে আমার ভালো হবে। তাঁর দিকে তেমন একটা তাকাইনে বলে তাঁর দুঃখ নেই, অন্ততঃ দুঃখ-প্রকাশ নেই। স্টেশন-মাস্টার আমি যে স্টেশনের দিকেই তাকিয়ে আছি, স্টেশনের ডিউটির ভেতরেই খুঁজে পেয়েছি জীবনের সেবা রোমাল, তাইতেই তাঁর পরম আনন্দ।”

হঠাৎ একটা কথা খেয়াল করলেন কানাই নানা। রান্না, দুই পাতা, চাটুনি তৈরি, পান সাজা—এই চার ব্যাপারেই বিরিকি বাবুর ৬৯৪খনিষ্টার সঙ্গে আশ্চর্যরকমের মিল রানভৈরবের। তবে কি ৬৯৪র কাছেই এই চার ব্যাপারে পাকা তালিম পেয়েছিল রানভৈরব? কানাই নানা শুধালেন বিরিকি বাবুকে।

বিরিক্‌বাবু ঠাকলেন, “রামঠৈরব।” রামঠৈরব বললে, “হুজুর।”

“আলমারি খুলে নিয়ে আর লাল বোতল আর দুখানা গ্লাস।” বললেন বিরিক্‌বাবু। তাই নিয়ে এসে সান্নে রেখে গেল রামঠৈরব। বোতল থেকে তরল পানীয় ঢেলে ছুটি গ্লাসই আধাআধি পূর্ণ করলেন বিরিক্‌বাবু। সেই তরলে বহু রঙের মিশ্রণের কলে যে মিশ্র রঙ দাড়িয়েছে, কোনো চান্দু নামেই তাকে অভিহিত করা চলে না। আর সেই তরল থেকে সরল রেখায় যে গন্ধ এসে নাকে পৌঁছোচ্ছে সেও এক অতি বিচিত্র মিশ্র গন্ধ, তাতে বিষ্ময়কর ভাবে নিশে আছে কাঁজ, মাধুর্য, ব্রিঙ্কতা, মাধকতা।

“হুগুন।” বলে একটি গ্লাস ডান হাতে তুলে নিয়ে তার কানায় ঠোট ঠেকালেন বিরিক্‌বাবু।

“কি জিনিস?” শুধালেন কানাই মান্না।

“আর বাই হোক, হলহল নয়। নির্ভয়ে চুমুক খিঁতে পারেন।” বলে নিজে এক মুছ চুমুক দিয়ে তৃপ্তির আওগাছ করলেন—“আঃ!”

কানাই মামার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দেখে গ্লাস তুলে কানাই মামাকে এক চুমুক পান করিয়ে দিলেন বিরিক্‌বাবু। আশ্চর্য ঝাপ। টক নয়, মিষ্টি নয়, কাল নয়, তেতো। নয়—অথচ যেন সব-কিছু এমন শোভন মাত্রায় মিশ্রিত যে, রসনা বিরক্তি বোধ করে না। দেখে মনে একটা অপূর্ণ অল্পভূতি হুক হলো কানাই মামার। মনে হলো যেন আলাদা চোখে সব-কিছু দেখছেন, আলাদা কানে সব-কিছু শুনছেন, আলাদা মন দিয়ে ভাবছেন। গ্লাসের বাকী পানোট্টুও বিরিক্‌বাবুর দেখাও দেখি পান করে ফেললেন কানাই মান্না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অচুত চাঙ্গা বোধ করলেন তিনি, অঙ্গে অঙ্গে অনুভব করলেন নতুন জীবনের শিহরণ। ইহাং মনে হলো বিরিক্‌বাবু বলছেন, “রামঠৈরবের তালিমের কথা বলছিলেন না? না, তালিম তাকে দিয়ে বাননি কাদখিনী। বরং বলতে পারেন, গিয়ে তালিম দিয়েছিলেন।”

কানাই মান্নার মনে হলো তিনি বিম্বিত হয়ে বলছেন, “সে কি!”

বিরিক্‌বাবু বললেন, “শেষশয্যায় শুয়ে রামঠৈরবকে কাছে ডেকে তিনি বললেন, ‘আমি যদি আর না উঠি, বাবুকে তুই দেখিস, রামঠৈরব। তোর হাতেই রেখে গেলান বাবুকে।’ রামঠৈরব বললে না কিছু, চোখ মুছতে লাগল দাড়িয়ে-দাড়িয়ে। বয়স তার কাদখিনীর চাইতে বেশী, হয়তো বা আমার চাইতেও, যদিও আপন বয়সের হিসেব তার নেই। সেই লম্বা থেকে আর উঠলেন না কাদখিনী, পায়োহারা হলো বিরিক্‌ হালদার।”

“কল্প কি আপনার হাহাকার করে উঠলো না বিরিক্‌বাবু?”

“নইলে কল্প রয়েছে কি ভক্তে, কানাইবাবু? সে তো হাহাকার করবার ভজোই তৈরি।” বলে বিরিক্‌বাবু হুঁগ্লাসে আরো পানীয় ঢাললেন লাল বোতল থেকে। হুজনে আবার হুঁগ্লাসে চুমুক দিলেন। পৃথিবীটা এককণ মধুর ছিল, এবারে হারে উঠল মধুরতর।

বিরিক্‌বাবু বললেন, “কাদখিনী চলে যাবার পর ঠর কাছে ঋগ্বেদ তালিম পেয়েছে রামঠৈরব। তা নইলে রেমোর বাবার মাথি কি নিজের এলেনে অমন রান্না করে, অমন চাইনি বানায়, অমন দুই পাতে, আর অমন পান সাজে? হাজার হোক, হিন্দু সতী। ওপারে গিয়েও পতিভক্তি তুলতে পারেনি কাদখিনী।”

কানাই মামা বললেন, “আশ্চর্য!”

বিরিক্‌বাবু বললেন, “তার চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার এইবারে বলি। বিম্বিত হবার ভজো তৈরি হয়ে বাজুন। এখানে আসবার আগে চামেলির মন কখনো পায়নি উপেন, বলেছিলুম তো আপনাকে?”

কানাই মামা বললেন, “বলেছিলেন।”

“এখানে এসে পেয়েছে।” বললেন বিরিক্‌-বাবু। “চামেলি একেবারে বলে গেছে এখানে

এসে। এমন ভয়ানক বুলে গেছে যে প্রথমটা উপেন ভয় পেয়েছিল মাথা খারাপ হয়ে গেছে বুকি চামেলির। মুখে বা মেছাঙ্কে সে কাঁচ আর নেই, রক্ত উঠেছে মধুহাসিনী মধুহাসিনী। এতদিন নাইনে-কর; লোকের হাতের ছাই-পাশ রক্তা খেতে হয়েছে উপেনকে। এখন এসে উপেনকে রোজ নিভের হাতে পরম যত্নে রক্তা করে খাওয়াচ্ছে চামেলি। উপেনের জন্তেই পাতাছে নিভের হাতে, নিভের হাতে সাজছে নানারকম শৌখিন শৃঙ্খলি মসলা দিয়ে মিঠে পান। এমন কি, উপেনের জন্তে উপেন সোয়েটার আর কম্ফটারও বুনছে নিভের হাতে। দিনরাত ভাবছে কি করে আরো বেশী ছড় করা যাবে উপেনের। এ কথা চামেলি যেন একবারেই হুলে গেছে যে, উপেন মোজাবর আর সে তার বিতীর্ণপক্ষ।

কানাই মনো বললেন, “আশ্চর্য!”

“আরো আশ্চর্য আছে।” বললেন বিরিকি-বাবু। “এখন এসে হুঁচারদিনে চামেলির চরিত্র আমূল বদলে গেল বলেছি তো। আপনাকে? এম্মি পরিবর্তিত চামেলির মেজলা একবারে এলেন চামেলিকে দিনকয়েকের জন্তে নিয়ে যেতে। উপেনকে কেলে কিছুতে যেতে রাজী নয় চামেলি। অনেক বুকিয়ে-বুকিয়ে শেষটায় যেতে রাজী করানো গেল। যাবার দিনে হুঁচোখ ছলছল করে বিদায় নিয়ে গেল চামেলি। মাথার লিপি দিয়ে বলে গেল উপেন যেন সময়মতো নাওয়া-খাওয়া করে, বেশী রাত না জাগে, ঠাণ্ডা থেকে সাবধান থাকে, শরীর একটু খারাপ বোধ করলেই ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই চামেলিকে একটা টেলিগ্রাম করে দেয়, ওভারব্রীজ ছাড়া লাইন পার না হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বাপের বাড়ি গিয়েই চামেলি একেবারে পুনর্জন্মিক। উপেন প্রেমগদগদ ভাষায় একখানা তিনপাতা চিঠি লিখেছিল; চামেলি তার এমন কাঁজালো জবাব দিলে যে, উপেন বেচারার হার্টফেল করার অবস্থা

হয়ে উঠলো। সে কুন্তে পারলে না এখানে এসে হঠাৎ এমন ভালো হয়ে উঠে বাপের বাড়ি পৌঁছেই আবার সেই আগেকার ভয়ানক মাতৃষ্টি হয়ে উঠলো কেন চামেলি। চামেলির কক্ষ জবাবের একখানা অতি মোলায়েম জবাব লিখে পাঠালে উপেন। সে চিঠির যে জবাব এলো তার প্রতি ছুঁতে নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড আর জলবিদ্যুতির সম্মেলন। সে চিঠি পড়ে উপেন প্রথমে ভাবলে আত্মহত্যা করবে, তার পর—”

“তারপর ???”

“তারপর ভাবলে, করবে না। শেষ পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে এসে চামেলিকে ফেরত দিয়ে গেল চামেলির মেজলা। প্র্যাটিকমেই অত্যাধনা করলে উপেন, কোয়াটারে পৌঁছেই চামেলি আবার বুলে গেল। আশ্চর্যরকম বুলে গেল। আবার চাকহাসিনী। কে বলবে এই চামেলিই এমন নাইট্রিক-অ্যাসিড-মার্কি চিঠি লিখেছিল? আবার চামেলির যত্ন পেতে লাগলো উপেন। এখনো পাচ্ছে। যতদিন এই কোয়াটারে থাকবে ততদিন পাবেও। চামেলি-চরিত্রের এই পরিবর্তন উপেনের কাছে এক মহা রহস্য, কিন্তু আমার কাছে ছলের মতো সোজা।”

“কেন এ পরিবর্তন?” শুধালেন কানাই মামা।

“ঐ কোয়াটারে শেখনিবাস ত্যাগ করেছিল কাদম্বিনী।” দীর্ঘনিবাস ত্যাগ করে বললেন বিরিকিবাবু। “তার পতিব্রতা আত্মা এখনো প্রচ্ছন্নভাবে সারা কোয়াটারের আবহাওয়াটাকে আচ্ছন্ন করে আছে। তাই এ স্টেশনে যতদিন মাস্টারি করবে, ততদিন উপেনের ভাবনা নেই। চামেলির পুরো ভালোবাসা, নিখুঁত যত্ন সে পাবে। কিন্তু বদলির চাকরি উপেনের। এর পর এ স্টেশন থেকে বদলি হয়ে, এ কোয়াটার ছেড়ে অন্য কোয়াটারে চলে যেতে হবে উপেনকে। তখনকার কথা ভেবে উপেনের জন্তে বড় দুঃখ হয়।”

ব'লে উপেনবাবুর ভাবী দুঃখের কথা ভেবে
বিরিক্‌বিবাবুর ছুটি চোখ ছলছলিয়ে উঠল।

•

কানাই মানার মুখে কাহিনী এ পর্যন্ত শুনে ভরত
বললে, “আচ্ছা মামা, বিরিক্‌বিবাবুর কাহিনী কি
সত্যিই আপনি সত্যি বলে বিশ্বাস করেন?”

স্বাগো-গেঞ্জি গায়ে সুবিলম্ব বললে, “তোমার ঐ
এক বড় ব্যামো, ভরত, যখন-তখন ঘা-তা একটা

ফ্যাকড়া তুলে বসো। কাহিনী ‘কাহিনী’ হয়েছে
কিনা সেইটেই বড় কথা, সত্যি কিনা সেটা অবাস্তব।”

কানাই মানা বললেন, “বিরিক্‌বিবাবুরকে বেদবাক্য-
বাগীশ বলে মানিয়ে বটে, কিন্তু এর কাহিনীকে
গুল-গল্প বলে উড়িয়েও দিতে চাইনে। জানো ভো,
শেক্সপীয়ারের বলানো সেই বিশ্বাস্য কথা : স্বর্গে
আর মর্ত্যে এমন অনেক কিছু আছে, স্বপ্নেও আমরা
যা দর্শন করিনে।”





শহর-পরিকল্পনা

বিবর্তন শর্মা

বেশ বাদীন হওয়ার পর থেকেই সারা দেশে বেশ একটা হৈ-ঠে শুরু হয়েছে। নিছক কল্পনা নিয়ে মানুষ এখন ব্যস্ত নয়, পরিকল্পনার ব্যাকো প্রবেশ করে সে এখন উন্মত্ত। মানুষের নরন এখন কেবল উন্নয়নের দিকে। মহা গায়ে বেন বান এসেছে, এবার 'জব্বা' বলে তরী ডালালেই হয়। আড়াই শো বছর ধরে দেশের মানুষ কেবল খুশো-কাদার গড়াগড়ি দিয়েছে, প'ড়ে প'ড়ে মার খেয়েছে—এবার যদি সে বুক চিতিয়ে ঠাঁড়াতে চায়, খুশো-কাদা মুছে কেলে সভ্যতার লগে পাল্লা দিয়ে ছুটতে চায় তাহ'লে তাকে হোম বেবে কে? কর্বে নেশায় সে আজ শাগল হয়েছে। এটা একটা মূল কথা বৈকি।

এতোক মানুষই চায় হু' হ'য়ে বেঁচে থাকতে, শহর ও গ্রামের জীবন গ'ড়ে তুলতে। যে-মুহুর্তে তার আরণ্যক জীবনের নির্মোহ ব'সে পড়লো, সেই মুহুর্ত থেকেই তার এই এচেন্ট। যখন থেকে মানুষ সমাজ-জীবনের আওতা ব'সেছে তখন থেকেই তার মনে বেগেছে হু'র, সবল, স্বন্দর হ'য়ে বেঁচে থাকবার একটা প্রবল বাসনা। এপিভাম্, পিতামহের আমলে যে-সমাজ ছিল, এখনকার মানুষ চায় তার চেয়েও হু'র ও স্বন্দর সমাজ-জীবন গ'ড়ে তুলতে। বিশ শতকের মানুষ আর কোন মুক্তিতে লগ্ন শতকের পটভূমিকার কীরে বেতে চাইবে। আধুনিক কালে তাই তামাষ ছনিগ্রাধ সব দেশেই গ্রাম-পরিকল্পনা, শহর-পরিকল্পনার লজ্জা নিত্যা নতুন আয়োজন।

ইরোপো-আমেরিকার তুলনায় এদেশে শহরের সংখ্যা

নিতান্ত্রই নগণ্য। এদেশে গ্রামের সংখ্যাটি বেশি। এক পশ্চিমবংগপ্রদেশেই ৩৫ হাজারের ওপরে গ্রাম। আরও হাজার চারেক গ্রাম আছে, যেখানে মানুষের বসতি নেই। আর, শহরের সংখ্যা? মাত্র ১১৪টা। তার মধ্যে ৮২টি শহরে শৌর্যপ্রতিষ্ঠান আছে, ৩১টিতে নেই। আর, একটি হ'লো সেনানিবাস। এ থেকেই বোঝা যায়, বর্তমান সভ্যতার সম্বর-প্রতিবেদিতার আমন্ত্রণ কেবল পেছনে প'ড়ে নেই, হরবধং জলে ডুবে যদি বাশি। এদেশে সুশরিকল্পিত, সুশরিকল্প গ্রামটো বা কয়টা, আর শহরই বা কয়টা? মহানগরী বা সিটির কথা এখানে বাসই যেওনা থাক। এদেশের গাঁয়েঘরে যেমন লোক মরে, শহর-জীবনের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশও তেমনি তাকে হাস্যবোধ করে মারে। এদেশের গাঁয়ের লোকের মনে যেমন হু'র নেই, তেমনি এদেশের নাগরিকদের বেহে হাড-অস্থখ। এককালে মাদেবিতা যেমন এদেশের অসংখ্য গ্রামকে উদ্ধার করেছে, তেমনি বস্তু তার অষ্টোপানে শহরকে গ্রাস করতে উদ্ধত। হু'র ও স্বন্দর সমাজ-জীবন গ'ড়ে তুলতে চ'লে সব আগে তাই আধারের এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হু'র করা প্রয়োজন।

আতীত-সময়কার আজ দেশব্যাপী নানানরকমের উন্নয়ন-পরিকল্পনার মন দিয়েছেন। সমষ্টি-উন্নয়ন-পরিকল্পনা বা আতীত-সম্প্রসারণ-পরিকল্পনা সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত। দেশের জনসাধারণও আজ এদিয়ে এসেছেন

উন্নয়ন চিন্তা 'কল্যাণ' শহরে এক মনোহর পরিবেশ।



বর্তমান কালে জনিকল্পের জন্য আদর্শিক

সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে। তাই, কিছু কিছু প্রকল্পও অসম্পন্ন প্রত্যাক্ষ করছি। অসংখ্যকতার অভাব যদি না থাকে, কঠিন পরিশ্রমে দেশের মানুষ যদি না আর আগশায়া মতো ভয় পায়, তাহলে আমাদের দেশের চেহারাটাই যে বড় করবে বলে পাশ্চাত্যে খ্যাতি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বর্তমান কালে শহর-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে নানা কারণে। পশ্চিমবঙ্গের দায়তনের তুলনায় শোক অনেক বেশি। তার ওপরে আছে অগণিত উচ্চতর দেশ। শহরের আকর্ষণে গ্রামের মানুষ শহরে এসে ভিড় করেছে, কর্মের তাগিদেও এসেছে অনেকে। ফলে, পশ্চিম-বঙ্গের কয়েকটি শহর, বিশেষ করে কলিকাতা, হাওড়া, আসানসোল ও জলপাইগুড়ি লোকে লোকারণ্য। মহানগরী কলিকাতা তো দিনে দিনে সম্প্রসারিত হচ্ছে উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে। কলিকাতার পথে ভিড়, কোকানে ভিড় বাড়িয়েছে ভিড়। এই ভিড় কমাবার উদ্দেশ্যেই কল্যাণীতে নতুন শহর গড়ে উঠছে, সুসিড়িতে তৈরি হচ্ছে নতুন উপনিবেশ। যেমন করে গড়ে উঠেছে পান্ডুর নিগোথেরি ও ফরিদাবাদ। তা ছাড়া, জাতীয় সম্প্রসারণ-পরিকল্পনার কল্যাণেও দেশের বহু গ্রাম আজ উপনগরে পরিণত হতে চলেছে।

কলিকাতা শহর এখন গড়ে ওঠে, তখন তার পেছনে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। শুধু কলিকাতাই বা বলি কেন, ভারতের অসংখ্য প্রাচীন শহর সম্বন্ধেও এটাই একই কথা। ফলে, মহানগরী কলিকাতাকে আজ নতুন করে গড়ে তুলতে চলেছেন 'ইন্ড্রা-মেন্ট ট্রাস্ট'। বড় বড় রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে, বস্তি উচ্ছেদ করে তৈরি করা হচ্ছে নতুন নতুন ইমারত। শিল্পসমৃদ্ধ বড় বড় শহর নিয়েই বর্তমান সমাজ। মিল, কারখানা প্রকৃতি এলাকাগুলিকে যদি না বসতি-অঞ্চল বারিয়েডেনসিয়াল কোয়ার্টার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যায়, তাহলেই বিপর। চার্লস ডিকেন্স তার 'হার্ড টাইমস' গ্রন্থে শিল্প-শহরকে বিশেষিত করেছিলেন 'কোক টাউন' বলে। বেগিকে তাকান, শুধু বেগি আর বেগি। মিলের চিমনি থেকে

ধোঁয়া। গৃহস্থের রান্নার থেকে ধোঁয়া। শীত পড়তে-না-পড়তেই তাই শহরের বুকে 'কগ'-এর বদলে 'স্মক'-এর আচ্ছন্ন। এর ফলে স্বাস্থ্য নিয়ে সন্দেহ। কর্মব্যস্ত নাগরিকের জীবনে এ যেন এক বিঘ্ন। শোষণ-হাওয়ার ঘুরে বেড়ানো তো প্রেরণ, বাড়িতেই যে আলো-বাতাস চুকতে গণ পায় না। চিংপুর, বড়বাজার, গোয়া, বিহিরপুর প্রকৃতি এলাকার কথা ভাবুন একবার। ইন্ড্রা-মেন্ট ট্রাস্টের কল্যাণে তবু বা হোক এঁকালি, বাগবাজার, বেলেঘাটা প্রকৃতি এলাকার রূপ আজ বদলে যাচ্ছে। নতুন বাসিগঞ্জ, নতুন আলিপুর তাসেরই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ফল।

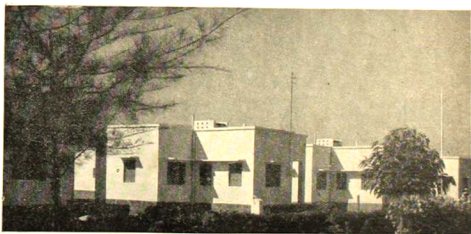
শহর-পরিকল্পনার প্রথম কথাই হ'লো বাড়িয়ে। কারণ, বাড়িয়ের পরিবেশই মানুষের মনকে স্থির, স্বস্তির ও সতেজ রাখে। তাই বাড়িয়ের অবস্থান, তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মরলা ও আবর্জনা দি নিকাশন ও অগ্ন্যগ্নে দহক দৃষ্টি রাখতে হয়। আলো আর হাওয়ার যেখানে অভাব নেই, সেমন জায়গাতেই ঘরবাড়ি তৈরি করা প্রয়োজন। শহরের আলো শুধু রোগ-বীজাই ধ্বংস করে না, তা থেকে যে আলুট্টা-ডায়োলেট রসি ছড়িয়ে পড়ে, মানুষের দেহ-গর্ভনে তা সাহায্য করে অনেকখানি। এই আলো আর হাওয়া যেখানে নেই, সেখানেই তো কেবল স্বপ্ন আর স্বপ্ন। বস্তি-অঞ্চলে যেখানে অসংখ্য শোকের বসতি, সেখানেই তো

এই হুঁশা। কম জায়গার বেশি স্যোকেস বাল; আলো নেই, হাওয়া নেই, তাইতো ঘত করে। কাজেই, শহর-পরিকল্পনার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাসোপযোগী স্বাস্থ্য-সম্মত পুষ্টিনির্মাণের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করতে হয় সবচেয়ে বেশি।

শহর-পরিকল্পনার বাড়িঘর নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে সড়ক-নির্মাণের গুরুত্বও উপলব্ধি করতে হয় বিশেষ করে। কারণ, এইসব সড়ক বা সড়কার হুঁশায়েই থাকবে ঘত বাড়ি। সড়কার গ্রন্থ অতুলসারেই বাড়ি নির্মাণের অসুবিধা বেন পৌঁছপ্রতিষ্ঠানগুলি। যেমন, ২০ ফুট চওড়া হ'লে কোতলা বাড়ি, ৩০ ফুট চওড়া হ'লে তিনতলা বাড়ি—এই রকম আর কি। আধুনিক শহর-পরিকল্পনার সড়কা ঘত বেশি চওড়া হয় ততই বহল। এমনভাবে প্রধান প্রধান সড়কাগুলি তৈরি করা দরকার যাতে করে সেই সড়কা ঘিরে গাড়িঘোড়া বেতে-আগতে সহজভাবে চলাচল করাতে পারে। একতর সড়কার মাঝ-বরাবর কয়েক হাত চওড়া সবুজ-ঘাসের আচ্ছন্ন গ্রন্থে সড়ককে হুঁশায়ে ভাগ করাও বেতে পারে। সড়কার দৌলধ্ব সৃষ্টি করতে সেই ঘাসের আচ্ছন্ন রকমারি ফুলের গাছ লাগিয়ে বিলে তৈরি কথাই নেই। চীনে নাকি এইরকমের অনেক সড়কা আছে। তারপর, সড়কার হুঁশায়ে পথচারীদের জন্য ফুটপাথ রাখাও প্রয়োজন। এতে করে অনেক রকম দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সেই ফুটপাথের পরেই থাকবে ঘত সব

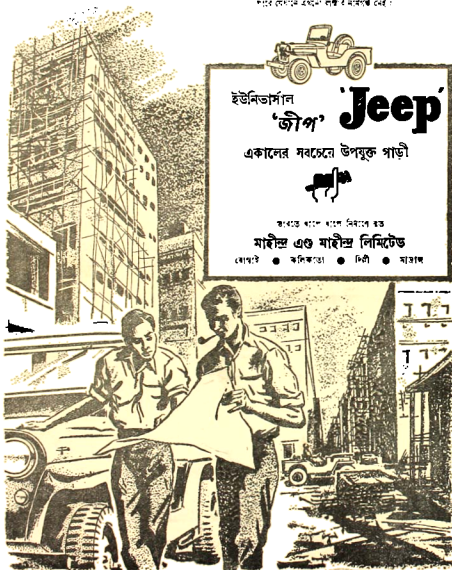
বাড়ি। বাড়িগুলিকে ঘতটা লতর ফুটপাথ থেকে পেছনে সরিয়ে নির্মাণ করাই উচিত। সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে, বাড়িগুলি বেন সমান দূরত্বে এবং সমান সারিতে থাকে। আর, দৌলধ্ব সৃষ্টির ব্যতিরেকে যদি প্রত্যেক বাড়ির সামনে একটা করে বাগান রাখা যায়, তাহ'লে শুধু বাড়ির পোতাঁই বাড়ি না, সামগ্রিক ভাবে শহরের পোতাঁই সৃষ্টি পারে। বেশিদূরে বেতে হবে না। কোচবিহার শহরের কথাই ধরা যাক। শহরটি বহন নতুন করে গড়ে তোলা হয়, তখন তার পেছনে চমৎকার একটা পরিকল্পনা ছিল। সড়কাগুলি বেশ চওড়া ও বাঁধানো। তা ছাড়া, প্রধান সড়কাগুলি কোথাও একেইকৈ দায়নি, চলে গিয়েছে লোকা। সড়কার হুঁশায়ে প্রত্যেকটি বাড়ির সামনেই বাগান। অনেকগুলি দীঘি সড়কার শহরের দৌলধ্ব আরও বেড়েছে। দীঘির চারদিক বাঁধানো, বসবার চমৎকার জায়গা, দান করবার স্বেচ্ছাসেবক—সবদিকেই শহর-নির্মাণাত্মক পদক্ষেপ দৃষ্টি ছিল।

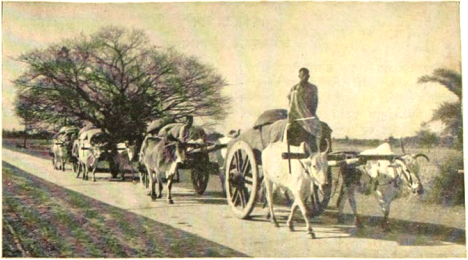
শহর-পরিকল্পনার বাড়িঘর তথা সমগ্র শহরের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখার ওপরই পরিকল্পনার সারস্বত্য নির্ভর করে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জলের সরবরাহ, ময়লা নিষ্কাশন ও আবর্জনা অপসারণের নিয়মিত ব্যবস্থা ঘটানি প্রয়োজন, ততখানি প্রয়োজন বাড়িঘর ও সড়কাঘাট পরিষ্কার রাখা। বাড়িঘর যেমন ধোয়াশুদ্ধ চুলি থাকলে ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখা যায়, তেমনি যদি



দৌলধ্ব লক্ষ্য রাখা করে গড়ে তোলা হয়েছে 'ক্যান্টন' সড়ক

କାହାଣୀର କାହାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନାବଳୀ ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ
ଏକଟି କବିତା—ବିଷ୍ଣୁ ନନ୍ଦୁନ ନନ୍ଦୁନ ନନ୍ଦୁନ
ହେବେ କହେ ହୁଏ ବିଚାରରେ ନାହିଁ ବିଚାରରେ
ହୁଏ ବିଚାରରେ—କାହା, କହ, କାହା, କାହା—କେହି
ହୁଏ ବିଚାରରେ କାହା କହେ କହିବ ।

[illegible]



আধুনিকভাবে নির্মিত মুন্সিগোবের 'জাতীয় সড়ক'

কল-কারখানাগুলিকে শহরের একপ্রান্তে প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহ'লে শহরও পরিষ্কার থাকে। বেথানে-সেখানে বোকানপাট খুলতে দেওয়া আসে উচিত নয়। এমন জায়গায় বোকানপাট ও বাজার বসাতে হবে, যাতে সব জিনিসই এক জায়গায় মেলে, শহরবাসীকে অন্যতরক ছুটোছুটি ক'রে হুঁরান হ'তে না হয়। বোকানপাট, বাজার-হাটের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহকজন অভ্যস্ত আবশ্যক বিষয়। যেমন—চাকঘর, ছুপ-কসেজ, হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি, থানা বা পুলিশ-কাড়ি, বানবাহন, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে বেড়াবার জায়গা চাই, খেলাধুলোর ঘাট চাই, ছোট ছোট ছেলেদেরদের জন্ত ভালো ভালো পার্ক চাই। আর চাই বাজার বাজার আলো ও জলের সুব্যবস্থা।

নতুন ক'রে বেসব শহর আজ গ'ড়ে উঠবে, গোড়াতাই যদি সেগুলির পরিকল্পনা নিশ্চিত হয়, তাহ'লে শহরবাসী

মারেই উপকৃত হবেন। একটা ভাত টিপলে যেমন ইঁড়ির ভাত শিখ হয়েছে কিনা দেখা যায়, তেমনি শহরের চেহারা দেখেই মানুষের স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অনেক-খানি পরিমাপ করা যায়। শহরই হোক আর গ্রামই হোক, তাকে সাজাতে হবে স্পষ্ট ক'রে, পরিষ্কার ক'রে, স্বাস্থ্য-সম্মতভাবে। কিন্তু, সেই সঙ্গে অত্যন্তকটি নাগরিককে হ'তে হবে আশ্বসিতেন। কারণ, শুধু নিজের বাড়িঘরের কথা ভাবলেই চলবে না, তাঁকে ভাবতে হবে শহরের কথাও। শহরকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে তুলে ও পরিষ্কার ক'রে রাখার দায়িত্ব তো। তাঁদের হাতেই। কোনো জিনিস গ'ড়ে তোলাবার সময় আমাদের যতখানি উৎসাহ, উত্তম ও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাকে ঝাঁচিয়ে রাখবার জন্তে যদি না ততখানি উৎসাহ, উত্তম ও আন্তরিকতা থাকে, তাহ'লে তার পরমাণু আর ক'সছর!

শিকারের টান

ব্রজেনচন্দ্রমার মুখোপাধ্যায়

শব্দ-পেদের আকাশ নির্ভল। বাতাসে শৈতবের টপ্পিত।
জোলের স্রোতে ঘাসে-পাতায় নিশিহরিতের আবির্ভাব।...
এই সমরটোতে শিকারীর মন উত্তলা হ'য়ে ওঠে। বৈদ্যনিন
স্বাক্ষরক বিকৃত আনতে থাকে। খোলা মার্টে, জলা,
গোপ-শাড়, বন-বঙ্গলে মন ছোটে। ধরগোদের একে-
থেকে ছোট্টাটুটি, উড়ন্ত হাঁসের কাঁপ, হরিণ-মল্লের স্রুত
ছুট, বনে নানা পতঙ্গ ডাক—হয়তো বা বাঘেরই সাড়া—
এইসবের আকর্ষণ অসংবরণীয় হয়ে ওঠে।

ভ্রামল পাহাড়প্রাণীর কোলে গভীর বন। ছোট ছোট
শব্দোভঙ্গি নদী হ'য়ে বেয়ে বাজে। তার ধারে ধারে
অতি স্তম্ভপূর্ণ বন্যাসাধ্য নিঃশব্দে হাঁট। হাতে গুলীডরা
উড়ন্ত রাইফেল। হঠাৎ সাবনে বহুদূর শব্দ—প্রকাণ্ড
সহায়ের সৌড়। গুলী-ভ্রামণের অবকাশই হ'ল না। কিন্তু,
ঐ বিকট স্বেধের কিপ্রভা, বড় বড় শিং হুটই পিঠে নামিয়ে
নাক উড় করে লাক আর চকিতে অন্তর্ধান—চিৎপটে
চিবিদনের মতো আঁকা হইল।

কখনও বা অতর্কিতে শিকার, রাইফেলের পাল্লায় মধ্যে
পাওয়া। দুকের শব্দন ঘটন, নিশার বহু, রাইফেলের নল
ও ঘর্ষণ লক্ষ্য স্থির রেখে বীরে ঝুঁগিয়ে চাপ। অন্তরে
গর্জন আর শিকারের ধ্বংসযাত্রা।

হাঁস শিকারের আশায়—অন্ধকার থাকতেই কনকনে
শৈতে জলাধ ধারে উপবিষ্ট। ক্রমে হাঁসের ডাক : হাঁসের
খাঁক ওড়ার শব্দ : শৈতবোধে অন্তর্ধান। হাঁস উড়ে
পাল্লার মধ্যে আসছে। বন্ধু উড়ন্ত—হৃৎপিণ্ডের শব্দন
প্রশমনের ব্যাকুল প্রয়াস। তার পর গুলী-ভ্রামণ : অন্তরে
গর্জন আর হাঁসের সশব্দে মলে পতন।

আবার—ত্রিতির শিকারে, অন্ধকার থাকতেই হাঠে
ঝোলের আঙ্গলে লুকিয়ে বস। এরিক-ওরিক থেকে
তিত্বিরে ডাঙ্গোডাঙ্গি। সাবনে একই দূর থেকে কোপ-
শাড় সঁজিরে লুকিয়ে-ধাক পানীকে ওড়াবার চেষ্টা চলছে।
হঠাৎ কোপ থেকে পানী-ওড়ার শব্দ। পানী বেধা সেল :
বন্ধুকের পাল্লায় মধ্যে আসতেই তার ওড়ার বিক আর
বেগ অস্থান করে গুলী-ভ্রামণ। পানীটির সশব্দে ভূমিতে
পতন। সৌচিক সংগ্রহ আর অস্ত্র পানীর ক্ষত প্রত্যতি।

মিষ্টীয় বাঘশারী-বিলাল-পালার কবিকে অস্থকরণ করে
চোঁচাতে ইচ্ছা হয়—“হানিনোভ—ওরা হানিনোভ—”।...

শিকারের অভ্যাস ব্যঙ্গনের মধ্যে গণ্য হ'য়ে থাকে।
বহিঃ কবি কানিশাসনের কণ্ঠে এ-প্রশ্নবিভাগের প্রতিবাদ
কর্মিত হ'য়েছে—“মিথ্যের ব্যঙ্গনও বদন্তি দুগদ্য—ঈদৃক
বিনোদন কৃতঃ”। সে ঘাই হোক, শিকারের অভ্যাসটা
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শব্দ দ্বারা। শিকারী শিকারের খোঁজে
যেয়ান নিজের শব্দ মেটাবার জন্যই, কারও কাছে বাহ্যিক
নেবার ক্ষত নয়। তাই ঐকান্ত শিকারী মল্লবান্। লক্ষ
আনন্দের স্মৃতিতে নিজেরই বিভোর। কদাচিৎ নিজেরই
মতো বদবেতার সঙ্গে একত-আলোচনায় ভুত। অভ্যাস
শব্দের মতোই শিকারের আনন্দ অবশিষ্টের প্রবোধ। কিন্তু
কখনও কখনও লক্ষ আনন্দের কিছুটা শুন্যবাহনের লোভে
শিকারীও লেখনী করেন। এটা নিছক আনন্দভ্রমের প্রয়াস।
শিকার-অবশিষ্টের চিতবিনোদনে এইরকম লেখার দৃশ্য
সাধ্যাচ্ছই। তবুও আবারের শিরঃখয়নীতে সেই শিকার-
জীবী আশিষ্টকরের বে রক্তস্রোত বইছে, সেটা শিকার
এসকে সাড়া না দিয়ে পারে না।

কুটনল, ক্রিষ্টেট প্রকৃতি বেলায় বেঘন বিধিনিবেধ
প্রতিষ্ঠিত, তেমনই শিকারক্ষেত্রেও কতকগুলি বিধিনিবেধে
মাননীয়। কোন্ পাখি বা জন্তু শিকার-উপযোগী তা
নির্দিষ্ট। অস্ত্র জীবজন্তু-হত্যা অধিকারীর লক্ষ্য। গ্রী-পত
ও অশুভ পত অবধ্য। জীব-জন্তুর সন্তানোৎপাদনকালে
শিকার বন্ধ : সংখ্যাল পতঙ্গের সংরক্ষণের ক্ষত নির্দিষ্ট বনে
শিকার পরিহার : শিকারের সংখ্যা পরিমিত রাখা : বনে-
ধাক পানীকে গুলী না করা—ইত্যাদি। নিছক হত্যার
লোভে বা মাংস আহরণের আশায় শিকারভ্রাতার উদ্বাহরণ
নিত্যন্ত বিরল নয়। কিন্তু এটা শিকারী পদব্যাচ নয় ;
এটা মন্থ বা কশাই-খরী বার।

ক্রীড়ার সময় অনেক বনেই জলাভাব ঘটে। এই সময়
বে-সব জলাশয় একবারে শুকিয়ে যায়নি, সে-সবের ধারে
সজ্জার সময় তুর্কাত বহু জীবজন্তুর সমাগম হয়। কখনও
কখনও এইরকম জলাশয়ের ধারে কোন বন্ধুধারী লুকিয়ে
থাকেন পতঙ্গভ্রাতার লোভে। কখনও বা স্নেকশিলে
জীবজন্তুর আনন্দোদানের পথে ঠাঁস পেতে যাবেন। পরে
অবসরমতো ফিরে, ঠাঁসে-পড়া জন্তুকে বধ করেন। এই
উপায়ে সাংগৃহীত পাখি ও জন্তুর মাংস বাজারেও বিক্রয়ার্থ
এলে থাকে। এইসব দ্রুতভিকারী কঠিন মণ্ডের বোধ্য।

শিকারের একটি অন্তর্ভুক্তির নিয়ম—আহত পতকে বধ না করা পর্যন্ত অনির্বৃত্তি। এই কর্তব্যে অবহেলায় কলে যে কত শিকারী-অশিকারীর অসহানি প্রাণহানি ঘটেছে, তা সাধারণতঃ। ‘নরনাশক বাঘের’ উক্ত এই শ্রেণীর কর্তব্য-পর্যাপ্ত কৃ-শিকারীর কার্যকলাপ থেকেই। আহত বাঘ বাভাবিকভাবে চকল, কতগামী, সাবধানী ভক্ত্য-পত-হত্যার অক্ষম হ’য়ে পড়ে। তখন ক্ষুধার তড়নায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অক্ষম, আত্মরক্ষার অসমর্থ মানবই ডক্কোর উপধুক্ত হয়ে পড়ায়। এইরকম বাঘের অভ্যাচারে বহু গ্রাম একেবারে পরিত্যক্ত হ’য়েছে।

অজ্ঞাত আহত জন্তুর বেলায় ক্ষতস্থান দৃষ্ট হ’য়ে জটিল কর্তব্যের ক্রম দেখ। জটিল ক্রমে বাঘ-আহরণে অসমর্থ হ’য়ে নিরহাযের দ্বারা বীরে অসম্ভব বরষায় প্রাণত্যাগ করে। এ দুট প্রকৃত শিকারীর মর্মান্তিক। বৃহত্তরপার অগ্ন্যবহায়ে পর্দাবসান সংঘটনই শিকারীর কাব্য।

গুলীর আঘাতে-হত না হ’য়ে আহত অবস্থায় জন্তুর পলায়নের দুইটি কারণ। প্রথম—মর্দন্থলে গুলীর আঘাত না ঘটা, আর দ্বিতীয়তঃ—ঘনতন্ত্রী অস্ত্র ব্যবহার। কোনও কোনও অভিজ্ঞ শিকারী অপেক্ষাকৃত অল্পতন্ত্রী রাইফেল অবলম্বনেই বহুবিধ বড় বড় জন্তু শিকার করেছেন। কিন্তু এঁদের ছিল স্থির লক্ষ্য। অবিকল মর্দন্থলে আঘাত করবার নক্তি ও দক্ষতা তাঁদের ছিল। সকলের পক্ষে এই দক্ষতা-অর্জন সম্ভব হয় না। এইজন্য সাধারণ শিকারীর উচিত বশাস্ত্রণ তীব্রতন্ত্রী অস্ত্র-ব্যবহার। তীব্রতন্ত্রী রাইফেল গুলুভার হ’য়েই থাকে। এই ভার-বহন থেকে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা শিকারীর পক্ষে অসম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে অগ্ন্যবহাণী অস্ত্রে আহত জন্তু শিকারীকে প্রত্যাখ্যাত, এমন কি তাঁর প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটতেছে।

এই কারণে শিকারীকে সাবধান অস্ত্র-নির্বাচন করতে হয়। পাখী থেকে বৃহত্তম জন্তু পর্যন্ত বধে সক্ষম অস্ত্র এখনও অনাবিষ্কৃত। ইতরায় এইজাতীয় অস্ত্রের সম্বন্ধে দরব অব্যাহার না ক’রে, ছোট শিকারের জন্য ১২-বোয়ের হুই-নলা বন্দুক, আর বড় শিকারের জন্য ১২-বোয়ের হুই-নলা হ’লে শিকারের কালে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন, উপরি-উপরি দুইটি গুলী ক্রমান্বয়েই ত্যাগ করা সম্ভব। কিন্তু এক-নলা ‘ম্যাগাজিন’ রাইফেলের একটি গুলী-ত্যাগের পর অপর একটি গুলী-ত্যাগে প্রস্তুত হ’তে যাকিষ্টা সময় লাগে। এই অবকাশে শিকার অসম্ভব হ’তে

পারে বা পাল্লায় বাইরে চলে যেতে পারে : এমন কি শিকারীকে আক্রমণও করতে পারে।

শিকার দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত হ’য়ে থাকে—‘ছোট’ শিকার আর ‘বড়’ শিকার। ছোট শিকারের মধ্যে গম্বা—নানারকম ছোট-বড় পাহা, খরগোশ, ইহুরে হরিণ (mouse deer)। বড় শিকার—নিরীহ হরিণ থেকে সাংঘাতিক হিংস্র বাঘ-ভালুক-তিয়া নিয়ে বিপুলসংখ্যে হাতী পর্যন্ত।

ছোট ও বড় শিকারের ক্ষেত্র, গ্রন্থা, অস্ত্র—সবই ভিন্ন। বন ও ভিন্ন। ছোট শিকারের অস্ত্র বন্দুক (shot gun)। বন্দুক এক বা দুই-নলা হয়। দুই-নলা বন্দুকই সম্বলিত প্রচলিত। বন্দুকের নলকে বশাস্ত্রানে টোটা (cartridge) পরিবেশ ক’রে বন্দুকের হুই (stick) ধারে ঢেপে লক্ষ্য স্থির রেখে টিগার চাপলেই টোটার ক্যাপ (cap) আঘাত ঘটে। ফলে টোটার মধ্যে অগ্নিস্ফোরক হয়। এই আগুন সামনে সাজানো বিস্ফোরক দ্রব্য (explosive powder) বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে টোটার অপরপ্রান্তে সাজানো ছুইয়া (shot)-দলল সতেজে সমুখের দিকে নিক্ষেপ হয়। এই ছুইয়ার দল সাক্ষি বেধে লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হয়ে শিকারকে আঘাত করে। বন্দুকটিও পিছু হটে শিকারীর কাছে থাকে।

বন্দুকের পাল্লা ও নক্তি নির্ধারিত হয়—নলের অন্তর্ব্যাস বা ‘বোর’ (bore) অনুসারে। সাধারণতঃ শিকারীরা যে বোরের বন্দুক ব্যবহার করে থাকেন, তা ‘১২’ বোর (12 bore) নামে পরিচিত। এই সংখ্যাটির অর্থ—অন্তর্ব্যাসের সমান ব্যাস-বিশিষ্ট সীসক-নির্মিত নিরেট গুলী ১২টির একত্র ভার ১ পাউণ্ড। কোনও কোনও পৌরীশ শিকারী ১৬-বোরের বন্দুক ব্যবহার করে থাকেন। এর প্রধান কারণ লম্বা আর পিছুধাকার দায়িত্ব। ১৬-বোরের উপকার সীমিত। এর পাল্লা, নক্তি ১২-বোরের চেয়ে অল্পতর। বিস্তারী, ভায়াগাম শিকারীর পক্ষেই একাধিক বন্দুক-ক্রম সম্ভব। সাধারণ অবস্থায় শিকারী ১২-বোর ক্রম করেন, তার তার সানকে বহন করেন ও শিকারে প্রস্তুত আনক পান।

আবার কোনও কোনও শিকারী দুইপাল্লায় বাজহাঁসের মতো বড় পাহা-শিকারে ৮-বোর, এমন কি ৪-বোর বন্দুক ব্যবহারেরও পক্ষপাতী। ১২-বোর টোটার যে ছুইয়া থাকে তাইদের মোট ওজন ১২ $\frac{1}{2}$ আউন্স। ৪-বোর টোটার ছুইয়া ৩ আউন্স। ইতরায় অনেকগুলি বোঁই ছুইয়া শিকারকে আঘাত করতে পারে। আবার, পাল্লা বোঁই হবার সাক্ষি ছুইয়াগুলি বোঁই বোঁই ছুড়িয়ে পড়ে। এইজন্য দুইপাল্লায়

শিকারের কাছে উপস্থিত হ'লেও হৃদয় একটিক ছুঁঁয়া যায় না। শিকারটিকে বেটন করে চলে গেল। ৪-বোরে বাবহারে এ সম্ভাবনা কমে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ১২-বোরের ভার ১ পাউণ্ড আর ৪-বোরের ভার অল্পতঃ ১২ পাউণ্ড। তার ওপর ৪-বোরের পিছুখাতাও স্তম্ভ নয়।

চোট শিকারের নীতি—বন্দা পাতীর ওপর ডলী নিক্ষেপ না করা। ওড় পাতীই শিকারোপযোগী। কোন পাতী শিকার-পষ্যভুক্ত তা নির্দিষ্ট। অল্প পাতী-হত্যাকে শিকার বলে না। পাতীরা বেশ বেগে ওড়ে। বর্টায় ৩০ মাইল—অর্থাৎ সেকেন্ডে ৬৪ ফুট বেগ অসাধারণ নয়। এইজন্য পাতী-শিকার কালে পাতীটির বেগ, ওড়ার দিক আর শাল্লা অনুমান করে, তৎক্ষণাতী ডলী-নিক্ষেপ প্রয়োজন। ৪০ গজ পরোয়, পাতীর সামনে ৪ ফুট দূরে লক্ষ্য করলে, তবে চটুবার ক'ক পাতীকে পাবে। বন্দুক থেকে নিক্ষিপ্ত ছুঁঁয়ার বেগ সেকেন্ডে ২০০-১,০০০ ফুট। ৪০ গজ অতিক্রম করতে ১ সেকেন্ড লাগে। এই সময়ের মধ্যে পাতীটি ৪ ফুট

অতিক্রম করে। এই কারণেই পাতীর সামনে ৪ ফুট অন্তরে লক্ষ্য করতে হয়। অবশ্য, সে পাতী ঠিক শিকারীর অভিমুখে বা তার বিপরীত দিকে উড়ছে, তার বেলায় তাকে লক্ষ্য করলেই চলবে।

শিকার-যন্ত্রার গোশাংক—পাতী রক্তের শাট, ব্রীচেস (breeches), মোটা বুট আর চামড়ার মোজা (legging) বা পট্ট। একেবারে ফ্যাশানের স্থান নাই। মোটা বদনধমে কাপড়ে গা ছ'ড়ে বাঙা, শক্ত চামড়ার পাইকাথ ঈচরণে কোম্বা-গড়া—এসব 'বাবু'দের পক্ষে শিকার চেটা বিড়ম্বনা মাত্র।

বড় শিকারের অস্ত্র রাইফেল (rifle)। নলের ভিতর-দিকে কুরে পৌঁছিয়ে ঘোরানো পথ থাকে বলে অস্ত্রটির এই নাম দেওয়া হ'য়েছে। এই পথে বুলেটটি নির্দিষ্ট সময়ের আগমন-গতি পায়। এইজন্য বায়ুর বাধা সহজেই অতিক্রম করে প্রায় অক্ষর তেজ শিকারকে আঘাত করে।

রাইফেলের টোটাৎ একটিমাত্র বুলেট (bullet) থাকে।



ইষ্ট ইণ্ডিয়া আর্মস্ কোং

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, ক্যাপ, বারুদ,
ছিটা প্রভৃতি আমদানীকারক

১নং ভৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ১৩

ফোন : ২৩-২৯৮২

গ্রাম : ভিকেন্ডার

বুলেট লম্বাকৃতি—সামনের দিকটা নরম। এই মাথাটি নরম সৌন্দর্য দিয়ে তৈরী হ'লে (soft nose) সেটা নরম-চামড়া-বিশিষ্ট শিকারের ওপর প্রয়োগ-যোগ্য। নরম চামড়ার জন্ত শিকারে বুলেটের অগ্রভাগ নরম নিকেশ খাছু দিয়ে মোড়া থাকে (hard nose)। এগুলি বাইসন, বহিষ, হকী, কুর্ভীহ ইত্যাদির প্রতি প্রযোজ্য।

বুলেটের তেজ ও তার রাইফেলের অন্তর্গত অস্থায়ী। শিকার-ক্ষেত্র, শিকারটির দৈহিক বিপুলতা—এইসব রাইফেল নির্বাচনের সময় স্মরণীয়। বড়-বোর রাইফেল-বুলেট ছোট হরিণকে আঘাত করলে তার দেহের ছাড়-মাংশ সব একাকার হয়ে যায়। ছোট-বোর বুলেট বাইসন বা হাতীকে আঘাত করলে তার চামড়ার নীচেই আটকে থাকে। আঘাতটা মাংসাতিক হয় না।

রাইফেলের বোর—ইকের দশমিক-সংখ্যার প্রকাশিত হয়। ইউরোপীয় অস্ত্রতন্ত্রে সেখানে বোরের পরিমাণ মিলি-মিটারে বিশদ্রু হয়ে থাকে (millimetre)। এফ ইফ ২৪৪ মিলিমিটারের সমান। রাইফেলের প্রচলিত বোর ০.২২ থেকে ০.৩০ পর্যন্ত। এইসব থেকে শিকারী নিজের প্রয়োজনমতো অস্ত্র নির্বাচন করেন।

রাইফেলের বোরের একটিমাত্র অস্ত্রে সব প্রেমীয় বড় শিকার পাওয়া স্বকঠিন। সাধারণ শিকারীর পক্ষে একটি মধ্যম বোর (medium bore)—যেমন ০.৩০৪" আর একটি বড় বোর—যেমন ০.৪০০" রাইফেল থাকলেই সর্বকর্ম শিকারের জন্ত এতত হতে পারবেন।

রাইফেল দুই প্রেমীয়—ম্যাগাজিন, এফ-নলা (magazine) ও দুই-নলা (double barrelled)। প্রেমীয় ভাগ শিকারী ছোট বোরের জন্ত ম্যাগাজিন, আর বড় বোরের জন্ত এফ-নলা অস্ত্র গছল করে থাকেন। ম্যাগাজিন রাইফেলে ৬টি টোটা একসঙ্গে ভরে রাখা যায়; কিন্তু ব্যবহারের সময় একটি টোড়ার পর আর-একটিকে নলের মধ্যে আনবার জন্ত যে বোল্ট (bolt)-টি চালনা করতে হয় তাতে বেশ কিছু সময় যায়। শিকার-ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। ই-নলা অস্ত্রে অব্যবহিত পর পর দুইটি গুলী-নিকেশ সম্ভব। বিশেষতঃ, হিংস্র জন্ত শিকারে এই সুবিধাহীকৃ অমূল্য।

বৃহৎশকার জন্তর প্রতি ছোট-বোর রাইফেল ব্যবহারের একটি মর্মস্পর্শ পরিণাম আশার প্রত্যক্ষ। শিকারী ছিলেন একজন নবাসত, আমেরিকান বৃত্তাবাসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। জলুক-শিকারে এসেছিলেন—০.৩০০ বোরের রাইফেল নিয়ে। আশা একই জলুকে শিকারে

এসেছিলেন। আমি তাঁকে অল্পটর অব্যোহাভা সম্বন্ধে সচেতন করে দিলাম। কিন্তু নিজের অস্ত্রতন্ত্র লক্ষ্যের উপর তাঁর শিরবিবাস উল্লসে অদম্য হই। জলুক তাঁর সামনে বেরতেই তিনি পর পর পাচটি গুলী করেন। অল্পটর এসব গুলী বহন করেছে তাঁকে আশ্চর্য করে আর টেনে জলুকে প্রবেশ করে। তাঁর অল্পটর কলকল সেড়ে এসে আমাকে এ সংবোধ দিতে আমি ঘটনাক্রমে অবিশেষে উপস্থিত হই। জলুকের গর্জন শুনেই পাঠ। নরম অস্থিসংগে জলুকে প্রবেশ করতেই জলুক গর্জন করে আমাকে আশ্চর্যগোষ্ঠিত হই। আমার ০.৪০০-বোরের একটি বুলেটেই মরণাতীত হয়। আহত উল্লসোৎসাহে জলুকের পাঠিরে এনে দূর সৈন্যে পাঠাবার বশ্যসঙ্গত ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু তাঁর প্রাণরক্ষা হ'ল না।

বড়-শিকার-পার্থক্যকৃত জন্তরমধ্যে আশ্চর্যকার সচেতন। তারা সব সময়ই সাবধান। তাঁর শ্রবণ ও ঞ্চাপাণ্ডিত্য তাদের বশ্যসময়ের বিশদ্রের সূচনা দেয়। তাদেরই চিত্রাভাস্ত্র পরিবেশে, তাদের বাতাবিক সতর্কতা ও কিশোরী অতিক্রম করে শিকারে সাক্ষ্যলাভ—বিশেষ বুদ্ধি প্রম আর অভ্যাস-ম্যাপেক। বহু বিকলতার পর শিকারে দক্ষতা অর্জিত হয়। এইজন্তই বোধ হয় প্রথম বড় শিকার পাবার বৃত্তান্ত কোন শিকারীই ভুলেন না।

বড় শিকারে আমার হাতেগড়ি ঘটেছিল পিতৃসেবের একজন ইউরোপীয় বন্ধুর কাছে। ইনি আসামে একটি চা-বাগানের সহকারী ব্যানেকার ছিলেন। আমার বয়স তখন বোধ হয় বারো। বন্ধুকের ওপর আমার অথবা আগ্রহ-লুপ্তি আর দিকের সংক্রান্ত বহোচিত নানা প্রস্তে বোধ হয় বিরত হ'য়েই পিতৃসেব তাঁর বন্ধুবরের হাতে আমাকে সমর্পণ করেছিলেন। হয়তো আশা ছিল যে, আমার প্রশ্রবণ ভাবাভ্রানের অভাবে প্রশ্রিত হ'বে। ইনি যে স্থানে থাকতেন সেখানে নানাবিধ বস্ত্রজন্তর লাক্ষ্য দৈনন্দিন ঘটনা ছিল। এই বস্ত্র-বাহিত্তি রাজ্যে আমাকে এই পিতৃসেব নিয়ে যাবেন, আর আমাকে শিকারের সুযোগ দিলেন—এ কথা শুনে আমার যে আনন্দ হ'য়েছিল, অজ্ঞ ও তাঁর আভাব মনে জাগছে।

আমরা গোঁহাটিতে থাকতাম। আসামের এই প্রশ্রান মহরটির প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোজ্ঞ। একদিকে বিশাল বরহোতা ব্রহ্মপুত্র নদী পূর্বের পাহাড় ভেদ করে নেমেছে—নদীর মধ্যে উদ্যানিক বস্ত্রেরে হুড়া দেখা যায়। ও-পাশে মাঠের পর মাঠ হ'ব বনে মিলেছে। আরও পূর্বে আকাশের

গারে নীল শর্টস্লিভেট। কোনও কোনও সময়ে একের মাথার শাল ধরতও দেখতে পাওয়া যায়। শহরটির অপর দিকে নুরুত মাছ-পালার ঢাকা পাহাড়ের পর পাহাড়। ব্রহ্মপুত্রের ধারেই একটি ছোট পাহাড়ের চূড়ার বিখ্যাত কামাখ্যা-দেবীর মন্দির। সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে বেড়াতে গেলে আরতির শব্দ-মন্দির নক ওনেত পাওয়া যায়।

কামাখ্যা পাহাড় থেকে আরম্ভ করে লৌহাটির আল-পাশে সব পাহাড় নিচেই আমার দৃষ্টিবিধি ছিল। স্থলের কোনো একটা বার্ষিক শরীফার বিশেষ কৃতির দেখিয়ে শিক্কেবেব কাছে পুরাতন-বরণ ছোট একটি হাইকেল (22 bore) দেবেছিল। এইট অবলম্বন করেই আমি নিজেকে শিকারীর পন্থাভুক্ত করি। বিশেষ চেষ্টায় লক্ষ্য স্থির করি। নিত্যসই ভাগ্যবলে কোনও বিপদ ঘটেনি।

শিক্কেবুটিকে আমি অঙ্কল (uncle) বলতাম। তাঁর নাম ছিল ক্রিকোর্ড। অঙ্কল ক্রিকোর্ডের সঙ্গে বন্যসময়ে তাঁর চা-বাগানে পৌঁছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। অন্টি (auntie) ক্রিকোর্ডের বেহু-পারিগাটো ভোজনটি বেশ কিছু কুই হ'য়েছিল। ডোরেই শিকারে বেরতে হবে—এই কথা জানিয়ে আমাকে ঘুমতে পাঠানো হ'ল।

আগামী কালের জলন-পলনই ঘুম আসেই না। তার পর কখন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ি—আর জেগে দেখি যোগ স্বপ্নময়। তাড়াতাড়ি উঠে কোনরকমে ঘুমে চোখে জল দিয়েই অঙ্কল-এর সন্ধানে নামি। অকস্মে বেশিরে গিয়েছেন তখন অস্তির ওপর খুব রাগ করলাম। কেন আমাকে আগে জাগিয়ে দেননি। ভেবেছিলাম কিছুই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু টেবিলে সন্ধানের নামা সেন্ডনীর ডোরা আমার প্রতিজ্ঞাকে শূন্যই কর্ব হ'য়েছিল।

আহারের পর অন্টি আমাকে একজন চাপরাশীর সঙ্গে অঙ্কল-এর অফিসে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তখন কাকে বাত ছিলেন। তবুও একজন কর্তব্যরূপে ছুটি ঘিরে আমাকে নিকটেই জ্বলে একই ঘুরিয়ে আনতে বললেন। এ লোকটি আসামী। নিজে একটি হাইকেল নিলেন, আর আমার হাতে একটি পো-নলা বন্ধু দিলেন। চৌচাঁর মালা পরে আমবা বেরোগাম।

চামল পাহাড়েরপশ্চিম কোলে জল। তারই ধারে এই চা-বাগান। বাগানটির চারিদিকে কাটা-তারের বেড়া ঘিরে মেঝা। প্রধানতঃ হরিণপালের উৎপাত থেকে চা-গাছ রক্ষার জন্যই এ ব্যবস্থা। এ ছাড়াও মাঝে পাহাড়ার ব্যবস্থা থাকে। কারণ, কখনও কখনও বন্য-হতী ঘূষ পাহাড় থেকে নেমে আসে—চা-গাছের রসাদান লোটে। তখন বিকট

চীৎকার, কটুকা ছোড়া, ঢাকা আঙঠা, টিন-পেটা ইত্যাদি অবলম্বনে ভীষ্মক অস্ত্রবিশেষ বিদায় দেওয়া হয়।

আমরা দু'জনে কবে চা-বাগানের দীবা অভিক্রম করে বন পেশাম। বহু লোকজনের আনন্দোন্মাদ বনের স্বাভাবিক শৌক্য অনেকাংশে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হরিণ, বরাহ প্রভৃতি জন্তর শব্দ-চলাচলের পন্থিক বহু স্থানেই লক্ষ্য হ'ছিল। আমার সঙ্গীট আমাকে এইসব চিহ্নের ব্যাখ্যা করতে করতে চললেন। হরিণ ও হরিণীর পন্থিকের তারতম্য, বাঘ-আহরণে যক্ষ্ম চলাচলের চিহ্ন আর ভীত হয়ে পৌড়ের চিহ্ন পার্থক্য, সামনের পা আর পিছনের পা'র বিশেষ—এইসব ঘূষ হ'য়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম। একটি পন্থিক নির্ধারণ করে, সেইট অবলম্বন করতে করতে তার দৃষ্টিবিধি ও আচরণ বেন চোখের সামনে হুটে উঠছিল।

হঠাৎ সামনেই একটি বড়বড় আঙঠা আর কোনও ভারী জন্তর ক্রত পলায়নের শব্দ। সঙ্গী বললেন—“পন্থ পলাল”—অর্থাৎ হরিণ পাগিয়েছে। সে বেগার মতো অভিযান স্থগিত রেখে বাগানে কেয়া হ'ল। অঙ্কলকে সব তথ্য জানাতে তিনি আমাকে মিলাসা করলেন—বৈকালে হরিণটির সন্ধানে যেতে রাজী কিনা। এ প্রশ্নই আমার বাহলা বনে হ'য়েছিল।

বাতলায় ঘিরে বন্যসময় শূন্য আহরণি দেইই আমবা তিনজন হাতীর পিঠে মাত্রা করলাম। জ্বলে বেশ কিছুদূর গিয়ে আমবা হাতী থেকে নামি। তার পর হেঁটে অগ্রসর হ'তে থাকি। কিন্তু স্বর-পাতা আমাদের পন্থকনি প্রচার করছিল। আসামী তরুলোকটি ইঙ্গিতে আমাদের ঘামিরে নিজে দূরে হেঁটে নিঃশব্দ অঙ্গ হ'লেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তরুলোকটি তেমনি নিঃশব্দে ফিরলেন। অঙ্কলকে জানালেন যে হরিণটির সন্ধান পাওয়া গেছে। আমবা অবির একত্রে মাত্রা করলাম। বেশ দ্রাবিক ঘূষ মাঝার পর আমাদের পন্থপ্রশ্নক ইঙ্গিতে জানালেন যে শিকার সামনেই আছে। অঙ্কল আমার হাতে হাইকেল দিয়ে এগিয়ে যেতে বললেন। আমাকেই এই শিকারে স্রোগ দিচ্ছেন জেলে আমার যে আনন্দ আর উৎসাহ জাগল, তার উল্লেখও বাহলা।

হামাতি ঘিরে বানিকটা পন্থ অভিক্রম করার পর পন্থপ্রশ্নকটি আত্ম দ্বিরে সামনে প'থালেন। দেখলাম—যনত-পন্থে বানিকটা খোলা জায়গায়। তার পিঠেই একটি ছোট পাহাড়। তার চূড়ার হরিণটি দাঁড়িয়ে। একাও ঘেঁষা, নিপুল শিং—আমাদের দিকে একদৃষ্টি। আমার সঙ্গী

ভ্রমশ্রোণটি কানে কানে জানানেন যে হরিণটি আমাদের এখনও ঝিক চিনতে পারেনি। তবে সন্দেহ হচ্ছে। অনতিবিলম্বে অন্বেষণ করবে। ঐশান থেকেই ওলী চাপাতে হবে।

এতটা শাস্তার ইতিপূর্বে কখনও লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করিনি। তবুও আসাদ ভর করে রাইফেল উদ্ধত করলাম। জয়টির গাড়ি আর বৃকের সন্ধিস্থলে সাবধানে লক্ষ্য রেখে ধীরে টিগারে চাল দিলাম। রাইফেলের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই হরিণটি লাফ দিয়ে অদৃশ্য হ'ল।

লক্ষ্যভেদ হ'য়েছে ভেবে আমি হতাশা আর সঙ্কার দৃশ্য নীচু করলাম। কিন্তু আমার সঙ্গীটি আমার হাত ধরে টানতে টানতে ঐ শাস্ত্রাটির দিকে ছুটতে আরম্ভ করলেন। সেখানে পৌঁছে উত্তেজনায হাঁকতে হাঁকতে দেখি যে হরিণটি শাস্ত্রাডের নীচে পড়ে রয়েছে।

হতাশার পর সাফল্য : প্রথম বিকার-প্রাপ্তির উত্তেজনা : দ্বিতীয় লক্ষ্যের ক্ষুদ্র আশ্বপ্রসাদ—এইসব একাত্মার হ'য়ে আমার মনে যে ডান জাগিরেছিল, তা এখনও নষ্ট। তার পর থেকে ততো কত বিকারই পেয়েছি, কিন্তু এমন খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্যের মনে পড়ে না। সেই শাস্ত্রাটির

চূড়ায় ঝাঁড়িয়ে, শরশর্পে অথচ শতর্পে শমনের পা ঝুঁকতে-ঝুঁকতে শিং-উঁচু-করে আমোদের দিকে চান্দ্যের দৃষ্টি আমার দৃষ্টিপট থেকে বোধ হয় কখনও মুছে যাবে না।

আর, তুলসি না কখনও, আমার অস্থূল আর অস্তির আদর। প্রশংসা আর উৎসাহ দিয়ে যেন আমাকে আকাশে তুললেন। ধীরে ধীরে আমার মুখে শিকারের আনন্দ বৃদ্ধান্ত পূর্বেও যেন ঐদের তৃপ্তি সম্পূর্ণ চঞ্চল না। সে ব্যস্তের গমগমাতা আর প্রকটোচ্চানের কপাও তুলবার নয়।

পরে, বড় হ'য়ে চান্দ্যগানের শতভয়ের কত সুন্দর, কত অভ্যাসের কতিনীই না গুনছি! কিন্তু আমার বাল্যের এই অস্থূল-অস্তির কথা মনে করে কখনও তৃপ্তি জাতির প্রতি চুপা জাগেনি। অনেক ঈশ্বরের কাছে জীবনে বক্তার অসম্ভবতার পেয়েছি : প্রতিবারে মারামারিও করেছি। ইংরাজ ব্যক্তি-বিশেষের নীচতা, ক্রুরতা আর অসন্তোষ জ্ঞাত প্রবৃত্তির পরিত্যক্ত অগণ্যতার পেয়েছি; তবুও জানি—দে-জাতির মধ্যে তিস্যোর্ত-বংশতির মতো অনাবিল মেঘের খ্রী-পূর্ণ জন্ম, দে-জাতির অন্তর্নিহিত মহৎ অনবীকার্য।

কানি!

তাকাতাড়ি আরাম
আর
বিরামের জোবো



বেঙ্গল ইন্ডিউস্ট্রি



বি আই. কফ সিরাপ

ডাঙারের জীবনচিহ্ন

• ডাঙার ডট •

২৫

শিক্ষিত: তবুও কবিতা আমি ছায়েব বলে একই বৈশিষ্ট্যের বস্তুতে ভাবেই বিশ্রাম। তাই তারা অল্প শিক্ষিতের মতো কেবল দুই থেকে আমাকে সমীহ করতো। না, বরং আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো, অবসরের সময়ে তাদের সঙ্গে মাছা দেওয়াও চলতো।

তারা তাদের কথিবা অসুবিধা ও অসুখের সব কথাই আমাকে বলতো, কোনোরকম কথাই বলতে বাধ্যতা না। এটা আমার সবচেয়ে অসহ্য শিক্ষকেরা খুব প্রশংসা চোখে দেখতেন না। তারা আমাকে আড়ালে তেঁকে স্পষ্টই বলতেন—“ওরে, ছেলেকের সঙ্গে এমন করে মিশোনা। জানেনা যে, কি মশকিল পড়বে, এর পর ওরা কীভাবে চোখে বলবে, এর বরদা অসহ্য অসহ্য করতে থাকবে যে শেষ পর্যন্ত তাল সামলাতে পাবে না।”

আমি সে কথাই কোনো জবাব দিতাম না। মনে মনে ভাবতাম, করলেই বা কিছু উপগ্রহ কিংবা অবসার, তাতেই বা ক্ষতি কি। ওদের সঙ্গে আমার খুব বেশী তলাত কি আছে। কিছুদিন আগে আমিও ওদেরই মতো ছিলাম। বলতে গেলে এখনও তাই আছি, ছাত্র হয়ে আমাকেও প্রভাচ্ পড়া দ্বন্দ্ব করতে হয়, তাকেই ওদের পড়াতে পারি। কিছুদিন পরে ওরাও মানারই মতো হবে। তখন কেবল কয়েকটা বছরের। তার ভক্ত আমাকে সর্বত্র রাপভাষি হয়ে থাকতে হবে, সেটা আমার পছন্দ হতোনা।

তবে ছাত্রের নানারকম আচরণই আমাকে ভ্রমতে হতো। কারো কারো বাড়িতে পছন্দ যেতে হতো, নষ্টলে তারা কিছুতে ছাড়তো না। অনেক সন্ধ্যার পরে আমার কাকারবাগানে বই নিয়ে আসতো, পড়ার যে-সকল কথা ভালো করে বুঝতে পারিনি সেগুলো বুঝিয়ে দিতে হতো। তেমনি অপর পক্ষে তারাও আমার ব্যেট সাহায্য করতো। নিজস্বের চেনাশোনার মধ্যে তারা মাঝে মাঝে রোগী ছুটিয়ে দিতো। তা ছাড়া আমার নানারকম ঘাই-করমাল খেটে দিতো, এখনও কিছু করতে বলতাম আশ্রয়ের সঙ্গে তা করে দিতো।

এইসব ছাত্রদের মধ্যে অন্যতমকে বিশেষ করেই আমার ডক ছিল। সত্যরচন তাদের মধ্যে একজন। ছেলেটি যেমন সপ্রতিভ তেমনি অসমসাহসিক। পড়াশোনার ঠিক দিয়ে একটু কম খারালো হলেও কোনো আড়ৎকাঠের খেলাতে সে সকল বিষয়েই অগ্রণী, কোনো কিছুতেই পিচপাও হতোনা। যেখানে কোনো বিশ্রাম-আপনের সন্ধাননা সেখানে সে নিঃস্বার্থে এগিয়ে বাবে। তা ছাড়া সে পরোপকারী, নিজের কষ্টকে ভুলে করেও পরের উপকার করবে, তাতেই সের তার স্বপ্ন। তবে তার চরিত্র লক্ষ্যে অল্প একটা বদলায় ছিল, কিন্তু সে কথা আমি জানতেও চাইতাম না, আমার ভাবতে কোনো কৌতুহলও ছিল না। গোপনে কে কি করছে তাই নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কি সরকার।

একদিন সন্ধ্যারদান আমাকে বললে—“স্বাঃ, একটা অসহ্য রোগীকে যদি একবার দেখেন—তখন নিউমোনিয়া, বোধ হয় বাঁচবে না—তবে আপনি চেষ্টা করলে হয়তো—”

আমি বললাম—“তোমার কেউ হয় নাকি?”

সে বললে—“না স্বাঃ, আমার আবার কে হবে, এমনি হঠাৎ চেনাশোনা—তবে খুব খারাপ পাড়াতে থাকে কিন্তু—বসিও আগে সে ভয়বের বোঝেই ছিল—”

আমি বললাম—“থাক থাক, অত পরিচয়ের কি সরকার? কোথার বেতে হবে তাই বলে।”

“না স্বাঃ, তাই আপনাকে বলছি—গত সাতকের ঘরের ডালো মেয়ে; বদ লোকের গল্পের পাড় ঐ জায়গাতে এসে পড়েছে,—খুঁপিও আপনাকে এমন জায়গাতে নিয়ে যাওয়া আমার উচিত নয়—”

“ডাক্তারি এখন করছি ওখন ডালো জায়গাতেও আমাকে ধেতে হবে আর মদ জায়গাতেও যেতে হবে। ঠিকানাটা বলে দাও, দেখে আসবো।”

“না স্বাঃ, সে আপনি চিনে যেতে পারবেন না, আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো।”

সেদিন তার সঙ্গে। জায়গাটা এক কুখ্যাত পাড়ায়, পলিচুটির মধ্যে। নীচেকার একটা ঘরে মাটিতে পাতে বিছানাতে রোগিণী একা আশ্রয়মতক হুঁচি দিয়ে গুণে আছে।

মাথার কাছে হস্তের কুঁচো-গেলা। ঘরে বিশেষ কিছু আঁশবাম্পত্র নেই।

সত্যরত্ন তার ঘরের নিকে কুঁচো গাটোয়ালি ক'রে ডাকতে লাগল—“মালা, এই মালা, চোখ চেয়ে দেখো, মাষ্টারেন্দ্রাই তোমাকে দেখতে এসেছেন, ধীরে কথা বলেছিলেন।”

মেয়েটি মুখ খুলে চোখ তুলে চাইলে। চোখ দুটো অব্যাহতের মতো লাগে। নাড়িতে হাত দিয়ে সেমলাম, খুব জর। বুকে শিঠ পত্রিকা ক'রে, কেবাম্বা, ভবন-নিউম্যানিয়া নয়, তবে একদিকের বুকে একটু গ্যাচ হয়েছে।

মেয়েটির বদন হবে উনিশ-দুই। গায়ের রঙ কবলা। মুখে চোখে প্রবর্তা আছে, নির্বিক্ত বসন্তে বসন্তা নেই। একদিকের একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে, যেন প্রত্যেক কথাই ব্যাপারটা সে বুকে নিচ্ছে এমনি একটা চাপা বকবার ভঙ্গী। ভবনকেই দেখে, সে সবচেয়ে কোনো সম্মত নেই। বহাভোগ্যদের মুখে যে একটা অত্যাচারের ছাপ পড়ে, সে ছাপ তার মুখে কোনোখানেই নেই। হঠাৎ বেঁধে তাকিয়ে আসে না, বরং প্রকাশই আসে।

নিউম্যানিয়া অতি মারাত্মক রোগ। এখনকার দিনে সেরিবিসিন প্রভৃতি নানা অস্ত্র থাকায় এ-রোগকে যেমন আশ্রয় আর ঝুটেই এড়িয়ে কুঁচি, না, ভবনকার দিনে তেমন ছিল না। ভবনকার দিনে এ-রোগের ক্রাইসিস ছিল, হঠাৎ হার্ট-স্ট্রোক বদন ভয় ছিল। তার উপর ওর টিউমিয়ার-কে, বিক্রিয়াকে আমাদের বড়া ভয় ছিল। আমি কেবলাম রোগিণীর ডিতরে বৃষ্টি থাকলেও আশ্রিত সব কথা ঠিক-ঠিক বলতে পারছি না, দু'একটা এসেমেলা কুল কথা বলছি।

সত্যরত্নকে বললাম—“তুমি যেমন বলেছিলেন তেমন ব্যাপার না বলেও, সীতামতো বর নেওয়া দরকার, নইলে রোগটা বিপদে যেতে পারে।”

রোগিণী নিজেই তাই শুনে বলে উঠল—“কে আর বর নেবে বলুন?”

আমি একটু থক দিয়ে বললাম—“সে কথা তোমাকে ডাকতে হবে না, সে ব্যবস্থা আমরা যা হয় করছি।” সত্যরত্নকে বললাম—“দু'বেলা দুটো ক'রে ইন্জেকশন দেওয়া দরকার, বুকে প্রলেপ লাগানো দরকার, যদি ঘরে স্ট্রুপ্যাট ওষুধ থাকতো দরকার, পদ্ম দেওয়া দরকার—এসব ব্যবস্থা এখনো হতে পারবে কি?”

সত্যরত্ন বলল—“পাশের ঘরে ওর এক বন্ধু আছে, তাকে দিয়ে সবই করিয়ে নিতে পারব। আর স্ট্রুপ্যাট তো

আমি দিচ্ছি, ত্রাস, আমাদের বাড়িতে খুব ভালো এক বোতল ত্রাসি ছিল, তাই একে ঘরে রাখতে এক আউল ক'রে বাইরে দিই, সারাতো পড়ে-পড়ে ঘুরে।”

আমি বললাম—“অতটা নয়, আপ আউলের বেশী দিওনা। কিন্তু তবুও হোম ইন্জেকশন দেওয়া দরকার। সে-সব ওষুধদের ব্যবস্থা যা দরকার তা আমি করছি, কিন্তু ওর ভালো পদ্ম চাই, সে ব্যবস্থা তোমায় করতে হবে। দুধ, হলিফল, সেবুর রস এইসব খেতে দিতে হবে।”

ওষুধ ইন্জেকশন প্রভৃতি সব-কিছু আমরাই ভক্তারখানা থেকে দিতে লাগলাম। নিজে প্রত্যাহ দু'বার ক'রে বেতাম ইন্জেকশন দিতো। হলিফল প্রভৃতি কেনবার মত করেওটা টাকাও দিয়ে বিলান-সত্যরত্নের হাতে, সে বেচারা বা কোথাও পাবে। সত্যরত্ন তো আমাকে লাগিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত, কিন্তু যখন তার নিয়তি তখন যা করা দরকার তা সবই করতে হবে।

মেয়েটির প্রতি আমার কেমন একটা মমতাও জন্মে গেল। আমি কেবলাম সে নিতাইই অসহায়। মুখ অব্যাহত, ঘাই পাক, কিন্তু এই রোগের অব্যাহতে তাকে সেববার-শোনবার কেউ নেই। একটি মন্ত মেয়ে এসে তার কিছু সেবা-টোকা করে বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আমি গেলেই বাড়ির বাড়িকল্লী দরকার চৌকাঠের কাছে ঠেপ দিয়ে পাড়ায়, আমার কর্কশলাপ দেখে, ভাগ্যের একটু থাকা হালি যেসে মুখ খুলিয়ে চলে যায়। তার ডাবভঙ্গী দেখে আমার মুখ ব্যাপা লাগে, কিন্তু আমি তার দিকে ন্যাকপমাত্র না ক'রে একেবারে বঙ্গগভীর হয়ে থাকি।

ঘীরে ঘীরে প্রায় এগারো দিনে মেয়েটি মৃত হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে সে আমার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলতে শুরু করল। খুব মন, খুব অমাবিক, তার কথাগুলি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার ভরা। প্রায়ই বলে—“আপনি এসে না পড়লে আমার কি হতো বলুন যেহি? এরা আমাকে রাখার টেনে কেলে লিভ। আপনি দু'বেলা আসছেন, এত কষ্ট করেছেন, বেহতেই তো পাচ্ছি নিজের শরৎ থেকে অনেক পরল। খরচও হয়ে থাকে। আমার বাপ-নাও আমার মতে এতটা করতো না। কিন্তু এই সব আমি কেমন ক'রে পোষ বেবো, ভক্তারবাবু?”

ঐ ধরনের কথা শুনেই আমি কোনো ভাব বা দিতে উঠে পাড়াডায়।

সে ব্যক্তি ছুরে বলতে—“না না, বহন একটু, এসব কথা বলে আর আপনাকে বিরত করবো না। দয়া করেছেন, এই

দেখি। একটা কথা বিজ্ঞান্য কহি, আমি উঠে একটু বলতে পারি ?”

তখন অল্প কথা এসে পড়ত। “আমি মনে-মনে ভাবতাম, ছুই অবস্থাতে ওর কেমন ক’রে চলতো? এও কি অল্পদের মতো বেহের ব্যবসা করতো? কিন্তু আমিও এ বিষয়ে শুকে কোনদিন স্পষ্ট ক’রে কিছু ভিজ্ঞান্য করিনি, সেও কিছু বলেনি।

ও এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠল তখন বললাম—“কাল থেকে আর আমার আসার বরকার হবে না। এবার তুমি সেয়ে উঠেছ।”

সে বেন এ কথা শুনে খুব বিব্রত হয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ ক’রে থেকে বললে—“তা ঠিক, এখানে আর আপনাকে আসতে বশ্যর কোনো মানে হয় না। শুধু মাঝে মাঝে এক-আধবার দেখে যাবেন তো, আপনার ছাত্তর রোগীটা কেঁচে ঝুল কিনা?”

আমি বললাম—“বরকার হল নিশ্চয় আমার আসাবো।”

তার পর দামখানেক আর মোটে সেখিকে বাইনি। সন্ধ্যারকন বরকারেক আমাকে বলেছিল যে সেই মালা বেহেটি আমাকে একবার ডেকেছে, একদিন বেন হাই। কিন্তু তখন পরীকার কাণ্ড চলছে। আমি তাকে বলেছিলাম—“দেখো তো, পরীকা নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি। এখন ধাবার সময় হবে না, পরে একদিন যাবো।” এই বলেই তখন কাটিয়ে ফিলাম।

কিন্তু সন্ধ্যারকন একদিন খুব জোর করতে লাগলো, বলল যে তার তলপেটে কি একটা ঠাটানি ব্যথা হয়েছে বলছে—সেটা বোঝা বরকার। একবার চলুন।

আমি বললাম, আচ্ছ, এবার যেদিন সময় হবে সেদিন নিশ্চয় যাবো।

তার দুই-তিনদিনের মধ্যে, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার বাড়ি ফেরবার দূর্যে দেখানে গিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি, সে একাই রয়েছেন।

আমি তার দূর্যে চুকেই বললাম—“কৈ, তলপেটে কোথায় তোমার ব্যথা পেঁচি?”

সে চমকে উঠে বললে—“সেখাছি, একটু বসবোন না?”

আমি বললাম—“না, আমার একটু ভাড়া আছে।” তার মানে বাড়ি ফিরে তখন কিছু ধাবার সময়, গিয়ে দেখেছিলাম। সে কথা কিছু বললাম না।

সে পরীকার ভগ্ন তখনই বিছানার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। পেটের উপর থেকে বখারীটি টিপে-টুপে পরীক্ষা ক’রে দেখে কলমাব—“কৈ, কিছুই তো হয়নি। কোথায় ব্যথা?”

“ব্যথা ডিতর দিকে, উপর থেকে কেমন ক’রে বুঝবেন?”

“আমরা ডিতরের খবর উপর থেকেই বুঝতে পারি। কিছুই হয়নি।”

“না ভাকারবাবু, ডিতরটা একবার পরীক্ষা করলে ভালো হতো, পাশের ঘরের মেয়েটিও তাই বলছিল যে ভাকারবাবুকে একবার দেখিয়ে নে-না।”

“আমার যা দেখবার ঠিকই দেখেছি। তোমার তলপেটের মধ্যে কোনো রোগ নেই, তবে অল্প যদি কোথাও কিছু হয়ে থাকে তো বলো।”

সে তখন উঠে বসে বললে—“আগনি আমাকে থুগা করেন, না ভাকারবাবু? তা খুবই সম্ভব। আমি নিজেই নিজেকে থুগা করি।”

“এটা তুমি ভুল বললে। তুমি তো বেহেমাফস, বুদ্ধি কম, না বুকে ছুতো ভুল কাম ক’রে সেলেছ। এটাই বেশ বুঝতে পারছি, তার বেসে কিছুই জানি না। কিন্তু তার অল্প থুগা করব কেন? বরং মমতা আর রেহাই করি। তুমি আমার চেষ্টা বহুস অনেক ছোটো, আমাকে ভাকারবাবু না বলে এবার থেকে কাকবাবু বলতে পারো। তাহলে আর হৃদ-নাকার প্রব্রই থাকবে না।”

আমার কথা শুনি শুনে মালা আমাকে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

যাযা এই কাহিনী পড়ছেন তাঁরা হয়তো মনে করছেন, দেখক বুদ্ধি বোঝাতে চাইছেন যে তিনি একজন রিয়েলিস্ট সাধুপুংখ। শ্রীলোকের দিকে কোনো লোভ নেই। কিন্তু সে-প্রব্রই এখানে আসতে পারে না। আমি জানাতে চাই যে, ভাকারবাবুর মনে এসব স্থলে সাধারণত কোনো আসক্তি বা লোভ জাগে না। সাধারণ ভুল্লোকের কারো কারো মনে ব্যাবিলানিদের সখকে একটা স্থানই হয়তো থাকে। আমাদের ভাকারবাবুর অনেক সময় তাও থাকে না। কিন্তু একটা ভিন্ন বিশেষ করেই থাকে, হঠাৎ কোনো একটা বিশ্রী রোগের ঘোঁষা লাগার ভয়। এক্ষেত্রে সেটাই সখকে প্রবল হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান-বিচারের দিক থেকে দেখতে গেলে বহিঃ এ ভয় অনেকটাই অহেতুক, কিন্তু নানারকম রোগী ও রোগের সংক্রমণ ও তার সারাস্বক ক্রিয়াগুলি দেখে দেখে আমাদের মনের মধ্যে আপনা থেকে ভুটিবাই-এক্সের মতো কেমন এক স্পর্শসংস্কার এসে যায়। ভাকারি জীবনের সোড়ার দিকে এটা খুব বেশী বাত্বাড়েই থাকে। তার পর অল্প বয়স বাত্বার সঙ্গে সঙ্গে অজিহতাও ওটা অনেক সময় যায়। মনে হয় যে, রোগীর মেহের সর্বাঙ্গে তো বটেই, এমন কি তার বিছানাপাশেও রোগের বিবাক জীবাত্ম

ওৎ পেতে আছে। হাকে বলে ওস্তাদের কুস্তর তব। অশরকে কুস্তর ধরলে ওস্তাদ তাকে তাড়াতে পারবে, কিন্তু তার নিজেকে ধরলে তখন কি উপায় হবে? এই ভয়ে আমার বোষ্টর ঘরে কোনো কিছু ছুঁলেই বাঘে বাঘে হাত ধুতে থাকি। বোষ্টর বাড়িতে কিছু বাঘার মিনিস খেতেই পারি না, এমন কি নিজের বাড়িতে দিয়েও আগে কাশড়-চোশড় ছেড়ে হাত-পা না ধুয়ে কোনো কিছু পাইনা। ভাকারের মনস্তত্ত্বটা অনেক স্থলেই এইরকম। নিজেকে গাঠিয়ে রাখতে তারা সব সময়ই সতর্ক থাকে।

মালা বললে—“আশনি যখন কাব্যাবধূ হলেন তখন আমার সব মিনিসটা আপনারকে স্তনতে হবে, আমার একটা ব্যবস্থা ক’রে নিতে হবে। এতদিন ভয়ে ভয়ে কিছু বলতে পারিনি, এখন আপনি নিজেই সে-জয় ভেঙে দিলেন।”

“বেশ তো, বলেই ফেলা বা তোমার বলবার কথা।”

“আমার নাম মালা নয়। এটা এধানকার কুটো নাম। আমি শাটনা থেকে এখানে গালিয়ে এনেছি। আমার বাবা সেধানকার একজন অফিসর। এই বাংলাদেশেই একজন ব্রাহ্মণপতিঃের ঘরে তিনি আমার বিয়ে সেন, তারা খুব ভালো কল্যাণ ব’লে। কিন্তু একবছর যেতে-না-যেতেই আমার স্বামী কল্যাণ হয়ে মারা যায়। তখন বাবা আমাকে তার নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান, সেখানেই আমার লেখাপড়া পেখাতে থাকেন। আমাদের বাড়িতে একজন আত্মীয় ছেলে থাকতো, সে ওখানে থেকে কলমে পড়তো। বাবা তার হাতেই আমাকে পড়াবার ভার বেন। তার ফলে শেখপণ্ড বা হয় তা বুঝতেই পারছেন।”

“সেই বুকি তোমাকে জুগিয়ে-ভালিয়ে এখানে টেনে আনলে?”

“তা ঠিক নয়, মিথ্যা কথা বলব কেন, বরং আমিই তাকে জুগিয়ে এনেছি। সে বললে, আমার ক্ষেত্রে সব-কিছু সে করতে রাজী, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। আমি বললাম, তা যদি হয় তাহ’লে তুমি আমাকে বিয়ে করে। সে বললে, তা হয় না, সম্পর্কে ভাই-বোন কখনো বিয়ে হতে পারে না। আমি বললাম, বিয়ে নাই-বা হলো, আমার কলকাতায় নিয়ে চলো, সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকবো চিরকাল। তুমি কলমে কিছু পাল করো, বা উপার্জন করবে তাতেই আমাদের চলে যাবে। তা ছাড়া আমার নিজের কিছু গয়নাও রয়েছে। এই শুনে সে তখনই রাজী হয়ে গেল, আমরা দুজন এখানে গালিয়ে চলে এলাম। এধানকার বাড়িওয়ালীর সঙ্গে তার সাথে স্নেহাশোনা ছিল।”

“সে লোকটি তাহ’লে কোথায়? তাকে কেনোমিনি দেখিনি তো।”

“শে কি এখনও আছে ভাবছেন? আমাকে ছেড়ে কবে সে ঘরে পড়েছে। মাদ-দুয়েক মাদ ছিল। প্রথমটায় আমাকে বেন মাখার ক’রে রাখতো, নিজেই সব-কিছু কাম করতো। কিন্তু কোনো বোঝগার তো নেই, খরচ চলাবে কিসে? প্রথমে আমার হাতের একগাছা বালা খুলে দিলাম। তাতেই চলল চ’মাল। কিন্তু ক্রমশ আমি দেবলাম তার বোঝগারের কোনো চেষ্টাই নেই, মনে করলে অনেক গয়না আছে, ওতেই বেশ চলে যাবে। ক্রমশ ওর ভাবভঙ্গী বললে যেতে লাগল, চাকরি খোঁজার কথা বললেই ভয়ে ওঠে। তখন হাতের বালাগাছি ছাড়া অন্য বা ছিল তা লুকিয়ে ফেললাম, পাশের ঘরের কবুর কাছে রেখে দিলাম। সে প্রাইই ভিজ্ঞানো করতো, বাকী গয়নাগুলো কোথায় রেখেছি, লুকিয়ে লুকিয়ে চারিদিকে খুঁজতো। আমি তুমিই দিয়েছিলাম যে হাতের বাকী বালাটি ছাড়া আর কোনো গয়না আমার আশিনি। শেষে সেটিও যেদিন খুলে ফিলাম, তাই নিয়ে সেই বে চলে গেল, আর কির এলো না।”

“তাহ’লে তুমি ক’রে পড়েছ বলো? খরচের টাকা

এখন বরকায় হচ্ছে তো।”

“না না, তা নয়, আমার তো সত্যিই আরো গয়না রয়েছে, তাতে অনেককাল বেশ চলে যেতে পারে। কিন্তু এখানে এখন ক’রে আর আমি থাকতে পারছি না। আমি বড়ই খারাপ মেয়ে হই, কিন্তু মনটা এখনও আমার মরেনি। আশনি আমাকে এই নরকস্থও থেকে গাঠিয়ে দিন, বাহ্যিক কিছু ব্যবস্থা ক’রে দিন। আমি এভাবে থাকতে চাই না, ভালোভাবে থাকতে চাই। একটা জল ক’রে ফেলছি বলে কি আমার জাহাঙ্গমে বেড়ে হবে?”

তার চোখ নিয়ে টুটল ক’রে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। দেখে আমার মাথা হলো। কিন্তু আমার দ্বারা কতটুকু বা মাধ্য!

বললাম—“আমি এর কী ব্যবস্থা করতে পারি?”

“আপনারই বাড়িতে আমাকে নিয়ে চলুন, কিংবা অন্য কোথাও রাহুন, আমি বি-গিরি ক’রে থাকো, যে কাম করতে বলবেন তাই করবো।”

“সেটা সম্ভব নয়। তার চেয়ে তোমার বাবার ঠিকানা দাও, আমি তাকে লিখে তোমার বিয়ে দবার ব্যবস্থা করি।”

“তা আরো কেষ্ট অসম্ভব। আশনি আমার বাবাকে চেনেন না। তিনি সেকলে গোঁড়া মাছ, সামাজিক

মধ্যাহ্নি তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো জিনিষ। প্রাণ দায় সেও স্বীকার, তবু জানাকে তিনি বাড়িতে আর ঢুকতে দেবেন না। আমি যে বাড়িচাঙ্গিই হইবে অল্প পুরুষের সঙ্গে বেঠিয়ে এসেছি, এ ধোঁয়ের কথা নাই।”

আমি চুপ করে বসে রইলাম। তাহলে কি করা যায়! নেমেই বসই হইবে ক’রে থাকুক, এখন সে শোধরাতে চাইছে, নিজের স্রোতকে সে এতদূর বস্তু নষ্ট হতে দিতে চায় না— তাই আমার সাহায্য চাইছে। আমার উপর নির্ভর করতে চাইছে। উহু বাঙালী ধরের মেয়ে বলই হোক, কিংবা বহুবিধ বংশই হোক, আমারও ওর উপর কেমন একটা মায়া পড়তে লাগে। ওকে খোঁসাবো সত্যি কথা উচিত।

কিছুক্ষণ ভেবেতিয়ে একটা মডলর ঠাওরানাম। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম—“তুমি ইংরেজী লেখাপড়া কিছু জানো কি?”

সে বললে—“হ্যাঁ, তা একটু-আটটু জানি। যদিও খুব বেশী নয়।”

আমি বললাম—“তাহলে এক কাজ করতে পারি। তোমাকে হাসপাতালে নার্সিং-সেবার জ্ঞানে ভর্তি করে দিতে পারি। সেখান থেকে পাল করতে পারলে তুমি নিজেই স্বাধীনভাবে উপার্জন করতে পারবে।”

“আমি তাতে খুব রাজী, কিন্তু এখানে আর একদিনও থাকতে চাই না। আশির্ ছায়েন না, আশনার ছাত্র ঐ সভ্যকে ছাড়া আমি আর কাউকে আমার ঘরে ঢুকতেই দিই না। বাড়িওয়ালী তাই রোজ আমাকে শাসাচ্ছে, এমন করলে এখানে থাকা চলবে না। আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠছি।”

“কিন্তু ব্যর্থ হলে চলবে না, কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে। এখন নার্সিং ভর্তি হবার সময় হবে তখন ছাড়া সেখানে বাঙালী থাকবে না। আমি এখন থেকে ব’লে-ক’রে গ্রিক ক’রে রাখবো, এখন সময় হবে তখন এখান থেকে নিয়ে গিয়ে নার্সিংয়ের হোস্টেলে তোমাকে রেখে দিতে পারবো। ততদিন পর্যন্ত এখানেই বৈধ ধরে থাকতে হবে।”

অতএব আরো কয়েক মাস তাকে ঐভাবেই কাটাতে হলো। কিছুকাল অল্পর আমি এক এক বার মেডার, ইংরেজী ধবনের কাগজগুলো দিয়ে তাকে পড়তে বলতাম, দু-এক কথার যানেও বলে বিস্তার, খাতা এনে দিয়ে হাতের লেখা দেখাতে বলতাম। ইংরেজী সে কিছু কিছু শিখতেও পারতো। নার্সিং-এর একখানা বাংলা বই এনে দিয়েছিলাম, তাও সে পড়তো।

ইডেন হাসপাতালে নার্সিং-কোর্সে ভর্তি ও হোস্টেলে থাকবার ব্যবস্থা সময় গ্রিকঠাক ক’রে নির্দিষ্ট দিনে সত্যরজনকে সঙ্গে ক’রে নিজের গাড়ি নিয়ে তাকে আনতে পেলাম। তখন আমার সাতকেলের বয়স ঘোড়ার গাড়ি হয়েছে। বলা বাহুল্য, বাহা বাহুই তা কিনে নিয়েছে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি, তাকে এখান থেকে বের ক’রে আনাও এক মহা বিস্তারের ব্যাপার। যে বাড়িওয়ালী ওকে ভাড়িয়ে দেবে বলে অন্তকাল পরাশ্রিত, সেই এখন থেকে গাড়িয়েছে। এ বাড়ি থেকে কিছুতেই ওকে চলে যেতে দেবে না। আগের থেকে আনতে গেলে কোথা থেকে দুজন লোক এনে ছুটিয়েছে, তাদের বলে বলীমান হয়ে মরতা আগলে গাড়িয়েছে, দু-খরাপ ক’রে বলছে—“কার এত বড়ো সাহস যে আমার ভাড়াটেকে আমার বাড়ি থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? এ কি আগের মূল্য পেতেছে? বেশী চান্সাকি করতে গেলে আমি এখনই পুলিশ ডাকবো।”

আমি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললাম—“আমি আগে থানায় খবর দিয়ে তবে এখানে এসেছি। সেখানে লিখিয়ে এনেছি যে আমার চেনা মেয়েকে তোমরা বল বললে এখানে এনে রেখেছ, আমি তাকে উদ্ধার ক’রে আনতে ছাড়ি। রাজ্যের মোড়ে পুলিশ গাড় করিয়ে রেখেছি। আমাকে বাধা দিলেই পুলিশ এসে তোমাদের হাতে হাতকড়া লাগাবে।”

এই বলে সত্যরজনকে ইমতি করলাম ওকে জোর ক’রে টেলে গরিয়ে দিতে। সত্যরজন আমার একটু বললে অনেকখানি করে, বাড়িওয়ালীকে সে হুঁহাতে মাথা ঘেরে কেলে দিলে। তার উগ্রমূর্তি দেখেই হোক, কিংবা পুলিশের নাম শুনেই হোক, লোক ভুটি কিছুই না ক’রে হতভম্বের মতো গাড়িয়ে রইলো। আমি নাগার হাত ধরে তাড়াভাড়ি বাইরে চলে এলাম, সত্যরজন তার হুঁকেনটা তুলে নিয়ে আমার পিছু পিছু এলো।

গাড়িতে উঠেই কোচোয়ানকে বললাম—“খুব জোরেই হাঁকিয়ে একেবারে ইডেন হাসপাতালে চলে যাও।”

কিন্তু গাড়ি চলতে-না-চলতে বড়ো বড়ো ঢিল এসে পড়তে লাগলো গাড়ির আশেপাশে, পিছনের ছানলার উপর। পিছনের গাটটা ভেঙে গেল, নতুন চক্কে গাড়িটাও কিছু কিছু অক্ষয় হলো। কিন্তু কোচোয়ান তখন খুব জোরে খোড়া ছুটিয়েছে, আঁস সময়ের মধ্যেই আমরা মোড় পেয়েই বড়ো রাস্তার উপর গিয়ে পড়লাম। ঢিলপড়াও বেয়ে গেল।

হোস্টেলে ওকে ছুঁকিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিত হলাম।

বসিও একটা বছর ওর হোস্টেলের খরচ আমাকেই চালাতে হবে, কিন্তু অসহায় যেটো তো জীবনের একটা রাত্তা পেতো। অসহায়কে একটি অবলা নারীকে আমি হীনবৃত্তি অসমর্থনের অনিবার্হতা থেকে রক্ষা করতে পেরেছি, এই ভেবে খুব আত্মমাতা বোধ করলাম।

দ্বাদশমাসে মালা নার্সি পত্রীকায়তে পাল করলো। তখনকার দিনে নার্সিং খুবই অভাব, পাল করলেই তৎকালীন কোনও হাসপাতালে চাকরি পেয়ে বায়। সেও কোনো কলেজেরই হাসপাতালে চাকরি পেয়ে গেল। দ্ব্যবসায়িত্ব মাথায় নার্সি: ক্যাপ লাগিয়ে এবা কোমরে বেটু, এঁটে সে নার্সের কাজে নিযুক্ত হলো। আমিও পরিতুষ্ট হলাম।

কিন্তু এখানেই এ কাহিনীর শেষ হলোনা। আরো কয়েক বছর ধরে মালায় জীবনের অনেক কাহিনীর সঙ্গে আমাকে জড়িত থাকতে হয়েছিল। সমস্তটাই এখানে বলতে হয়, নতুবা তার চরিত্রকথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পুরো একটি বছর সে চাকরি করলো। ভালো নার্স বলে হাসপাতালে তার সুনামও হচ্ছে শোনা গেল। সেখানে সে নার্সদের কোয়ার্টারে থাকে, দুটি পেলে থাকে থাকে আমার ডাক্তারখানায় আসে সেবা করতে, বেশ সপ্রতিভভাবে কথা বলে। দামী দামী জামাকাপড়ও কিছু কিনেছে দেখতে পাই। শুনলাম যে, বাইনের থেকে আলাসা ক'রে কিছু পছাডতেও পাচ্ছে। সবই ভালো, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটু কেন চটুসতা লক্ষ্য করেছিলাম। ভেবেছিলাম যে ওটুহু জো হবেই, বাধীন হতে যখন পেরেছে।

একদিন হঠাৎ শুনি, মালায় চাকরি গেছে। হাসপাতাল থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সেখানে দিয়ে খবর নিয়ে জানলাম, কোনো একটি ছাত্রের সঙ্গে কিছু অজ্ঞার প্রকমের গোপনীয় ব্যথিয়েছিল, রেসিডেন্ট-নার্সদের হাতে ধরা পড়ে। সেই ছাত্রটিও রাষ্ট্রিকেষ্ট হয়ে গেছে, আর ওরও চাকরি গেছে।

তারপর কোথায় গিয়ে উঠেছে কে জানে, বিরক্ত হয়ে আমি আর কোনো খোঁজ করলাম না। সত্যর কাছে শুনলাম, নার্সদের কোনো গ্রাইডেটে প্রতিষ্ঠানে গিয়ে চুকছে, নিজেই কামকর্ম যোগাড় ক'রে নিচ্ছে।

এর কিছুকাল পরে আমার নিজের হার্মিটা অপারেশন হয়। জান হবার পরে বেবি একজন নার্স আমার সেবা করছে। প্রথমটার চিনতে পারিনি, তারপরে চিনলাম—মালা। ও কেনন ক'রে এসে ছুটলো? পরে শুনলাম যে কোথা থেকে খবর পেয়ে ও নিজেই উপস্থান হয়ে এসেছে।

দিনে রাতে একাই থেকে সে খণ্ডে আমার সেবা করলে, অল্প কোনো নার্সকে আসতে দিলে না। বে-ক'টা দিন শয্যাগত ছিলাম, সে অসহায়ভাবেই পরিচর্য করলে, কোথাও কিছুমাত্র ক্রটি হতে দিলে না। তার কাম দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল, বললে যে—হী, এই একজন নার্স বাট!

তারপর আমি যখন সেের উঠে নিজের কাজ করতে শুরু করলাম, তখন সে আমার কাছে ঘন ঘন হাত-হাত করতে লাগল। আমার অত সেবা করেছে, আর তার প্রতি বিন্দু হয়ে থাকতে পারি না। তা ছাড়া সে নিজেই বললে—“আমাকে যে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে, তার মধ্যে অনেক কথা আছে, কাকাবাবু। আমার বিশেষ কিছু সোপ ছিল না, মালাগ-মালাগ তো এমনি কত লোকের সঙ্গে হলেই থাকে, তা তির অস্ত কিছু নয়। কিন্তু হ'একজন ডাক্তার আমাকে বিরক্ত করতে শুরু করেছিলেন, আমি তাঁদের কথায় কান দিইনি, তাঁদের খাবাই এটি হচ্ছে। বাবু, তা ভালোই হয়েছে, ওখানকার চেয়ে বাইরের কাজ ক'রে আমি বেশী পছন্দ পাচ্ছি। কোনোদিন আমাকে বসে থাকতে হয় না”—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু কিছুকাল পরে মালা সুর পাল্টাতে শুরু করলে। বললে—“না, এ বড়ো একঘেরে রকমের কাজ, আমার ভালো লাগছেনা। আমি ওর চেয়ে আরো কিছু বেকঁরকম শিখতে চাই। একটা হোমিওপ্যাথি কলেজে ভর্তি হয়েছি, সেখানে পড়াশোনা করছি, এগুলির সে কথা আপনাকে বলি।”

এর আর কি জবাব লেবো? আমি চুপ ক'রে বইলাম। তারপর একদিন বললে—“কাকাবাবু, আমাকে ডাক্তার রাতেও বাড়িতে ডুকিয়ে দিন না? পছন্দাকড়ি চাই না, তাঁর সিনিয়্যাল নার্স হয়ে থাকবে, তাতে অনেক কিছুই শেবা হয়ে যাবে।”

আমি বললাম—“আচ্ছা, তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।”

ডাক্তার রাতের চেঘরে কোনো সিনিয়্যাল নার্স ছিল না। অথচ অনেক স্ত্রীলোক বোগীও তাঁকে দিয়ে ট্রিকিংসা করাতে আসতো। একটি স্ত্রীলোক সহকারী না থাকায় থাকে থাকে খুব অসুবিধা হতো, বিশেষ ক'রে পর্দাশশন বোগীদের বেলোতে। তিনি এই প্রস্তাব শুনেই বললেন, মেয়েটিকে আগে আমি দেখতে চাই। তাঁকে একদিন নিজেই সেলাম। তার চটপটে ভাব দেখে ও নম্র কথাবার্তা শুনে তিনি রাগতে রাজী হয়ে গেলেন। বললেন—“এমনি আশুতে হবে না, টাইমভাড়া স্বত্ব কিছু নিতে হবে। তোমারও তো খরচ চলা চাই।”

সেই দিন থেকে মালা প্রত্যহ নিম্নবিত্ত সময়ে ভাতার বাসের চেম্বারে হাজিরা দিতে শুরু করলে। ভাতার বাইরেও কাজে খুব খুশি হলেন।

রোষ্ট্রি বোমার পালা শেষ হয়ে যাবার পরে প্রত্যহ বিকালে আমাদের সেখানে চায়ের আড্ডা বসতো। আমি ছাড়াও ভাতার রায়ে আরো দুই-তিনজন আদিস্টাণ্ট ছিল। ভাতার বাইরে বেরিয়ে যাবার পরে আমরা সকলে মিলে বসে জিবে-পত্কার সঙ্গে চা পানি করতাম। বাড়ির ভিতর থেকে আমাদের স্ত্রী পেটে-ডরা গরম জিবে-পত্কার সঙ্গে চা এসে হাজির হতো। সকলে মিলে তার সম্ব্যহার করতাম, মালাও আমাদের একপাশে বসতো।

আমরা ছাড়া বাইরের দুই-একজন ভাতারও সেই আড্ডার এসে কখনো কখনো ছুটে পড়তো। তারা প্রায় রোষ্ট্রি নিয়েই আসতো। রোষ্ট্রি চলে যাবার পরেও তারা কিছুক্ষণ থেকে যেতো, চা খাওয়া এবং আড্ডা আমাদের লোভে।

৩য় মাসে একজন ছিলেন ভাতার বোল। অব্যাহতাদের মহলে তার বেশ পস্যার প্রতিপত্তি ছিল, নিজের মোটরগাড়ি ছিল। তিনি শেইখ মাহুব, কিন্তু শুনেছিলাম বিপটীক। ভক্তলোক আমাদের চেয়ে বয়স খেঁচি বেড়ো, ঘাড়ের চুল কিছু কিছু শোক গেছে। কিন্তু তবুও তিনি আমাদের দলে মিশে আমাদের ঠাট্টা-তোমাদস্য যোগ দিতে আসতেন।

মালা ওখানে কেবল আমার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলা ছাড়া আর কারো সঙ্গে কোনো কথাই বলতেননা। একবারে শুধু চুপটি করে সে বসে থাকতো। ভাতার বোল প্রায়ই ৩য় দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতেন, কিন্তু সে থাকতো নির্বিকার হয়ে। এতে আমি মনে মনে খুশিই হতাম।

একদিন ভাতার বোল আমাকে ধরে "বলেন—"ঐ বেরিয়েছে তুমিই নাকি এখানে জুটিয়েছ?"

আমি বললাম—"হাঁ।"

"কোথা থেকে যোগাড় করলে হে?"

"মাগের থেকেই আমার চেনাশোনা।"

"ও, তাহলে তোমার হাতেরই লোক বলা। তা আমার সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দাওনা, আমিও তো শুকে দু-চারটে কেস-পত্কার দিতে পারি, তাতে ওরই লাভ হবে।"

আলাপ করিয়ে নিলাম। কিন্তু সে আলাপ মানে কিছুই নয়। সেবা হলো বালা হাত তুলে একটু নমস্কার করে, এই পর্যন্ত। ভক্তলোক অনেক বাজে কথা বলে যেতে আলাপ আমাদের চোঁরা করেন, কিন্তু সে দু-একবার 'হাঁ' কিংবা 'না' ছাড়া কোনো কথাই বলেনা।

ভাতার বোল তখন আমাকে ওর সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে অনেক ব্যাক-বিত্তন করতে শুরু করলেন, অবশ্য ওর অশাফাতে। আমি দু-একবার সুকিয়ে বললাম যে আমি ওর সম্পর্কে কান্দা হই, এ-সব কথা বলা ঠিক হচ্ছেনা। কিন্তু তিনি তাতে কর্পণাতও করেন না; বলেন—"অমন পাতানো কথা তের তের আমার বেলা আছে।" এখন বলতে ছাড়বেন না, তখন উনি যা-কিছু বলতেন আমি তাতে কান দিতাম না।

একদিন তাতে কিছুকাল কাটলো। তারপর একদিন আমার ওখানে থেকে বেরোতে একটু সেরি হলো। সবাই চলে যাবার পরেও আমি ল্যাগরেটরিতে ঢুকে কিছু কাগজ করছিলাম। এখন সেখানে থেকে বেরিয়ে আমি তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। বাড়িতে কেতে বেতে পথের দিকে মূখ বাড়িয়েছিলাম, বামিকটা গিরেই দেখি একটা গলির মোড়ে ছুটপাতের উপর গাড়িয়ে ভাতার বোল আর মালা দুজনে মিলে দাঁড়া কথা বলছে। মালাও তখন কিছুদূর সন্ধ্যাচ নেই, বহুঃ মনে হলো তার মুখচোখের ওপর খুশি সপ্রতিভ। কথার মধ্যে ওরা এতই তত্ত্ব যে সেখানে উজ্জল গ্যাসের আলো থাক। সঙ্গেও আমাকে ওরা নেবেতেই পেলেনা।

আরো কিছুকাল কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন ভাতার রায়ে বেরিয়ে যোগে মালাও বসে হয়ে গেল। সে যে কোথায় উঠাও হয়ে গেল, তার কোনো পাতাই আর ছিলো না। যে বাড়িতে সে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো সেখানে গিয়ে শুনেলাম, ঘর ছেড়ে দিয়ে সে কোথায় চলে গেছে, কাউকে কোনো ঠিকানাও বলে যায়নি।

কয়েক দিন পরেই কিন্তু রাভার আমি তাকে দেখতে পেলাম। সে চলছে ভাতার বোলার মোটে, ওরই পাশে বলে।

বৃকতে পারলাম সবই। সেই দিনই ভাতার বোলকে আমি টেলিফোন করলাম। একটু রক্তধাবেই বললাম—"মালাকে অমন চুপ করে সরিয়ে নিয়ে যাবার কোনো দরকার ছিল না। ব'লে-ক'রে নিয়ে গেলেই পরতেন, তাই সে ভাতার রায়ে কাছের আমার মাথা ঠেঁট হতোনা।"

ভাতার বোল তার দ্বাবাবে বললেন—"ওহে ভায়া, মালা কি ভিকাল তোমার গলাতেই দুলবে? এবার না হুঃ আমার গলাতেই কিছুদিন দুললো, ভাতের অমন পালা হও কেন? কি বলা, হ্যা হ্যা হ্যা—"

বিবর্তন হয়ে আমি টেলিফোনটা রেখে নিলাম।

বাঙ্ক, অতঃপর আমি ভাবলাম যে বাড়ি থেকে এ বোকা

নেমে গেল, আর আমার কাছে সে সুখ যেখানেই আসতে পারবে না। আর তার কোনো সহকারও হবে না।

কিন্তু মাস তিনেকের বেকি কাটলো না। একদিন সন্ধ্যার পরে সে আমার ভাস্করখানাতে এসে হাজির। বেশ ছব্ব অনেকখান খেতেই বাইরে ঈজিভি অংশকা করছিল, যেমনি দেখলে বে লোকজন সব চলে গেছে, আমি একা বসে আছি, অমনি বাইরে থেকে ছুট এসে আমার পা ভড়িয়ে ধরলো। কানতে কানতে বলল—“আগে আমার কথাগুলো সব শুনে নিন, তারপর আমাকে হাটা ঘেরে তড়িয়ে দেবেন। কমা করতে কনাতই পারি না, শুধু কথাগুলো আপনাকে জানিয়ে যেতে চাই।”

বললাম চেহারাটা খুবই বিশিষ্ট আর মসিন হয়ে গেছে। বেশকিছুবার সে পারিগাটা বেই, কাপড়চোপড় বদলা। মুখখানা শুকিয়ে গেছে, চোখের কোলে কালি পড়ছে।

আমি বললাম—“শুনে আর কি হবে? ভাস্কর বোস হুগিন বাসে তড়িয়ে দিলে তো?”

মালা বলল—“লোকটা মতান্তর ছোটলোক, বিখ্যাবাদী, জোচ্ছোর। তা কেমন করে জানবো বলুন? বোধহয় তো, আমি আগে শুধু সখে মিশতেই চাইনি। কিন্তু ও সখে সখে আমার সঙ্গে আসাপ করতে শুরু করল, তার বেঘোর ভুলটা করে আমার বাসাতে গিয়ে সেখানে কটার পর কটা বসে থাকতো। তারপর বলল, ওর ভাস্করখানাতে আমার ভক্তে আসাদ্য একটা হোমিওপ্যাথি বিভাগ খুলে দেবে, সেখানে বসে আমি প্র্যাক্টিস করতে পারবো। অনেক রকম সোত দেখালে, তাতেও আমি রাজী হইনি। শেষে বলল যে রেজিস্ট্রি করে আমাকে বিয়ে করবে। তখন আমি রাজী হয়ে গেলাম, একজন ভাস্করের স্ত্রী হয়ে দীর্ঘনির্ভর মানের সখে কাটিয়ে দিতে পারবো। তখন আমার সব কাম ছাড়িয়ে নিজের ভাস্করখানার উপকার একটা আসাদ্য ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখলে। প্রথমটায় আমাকে খুবই স্বা করতো, যেখানে যেতো আমাকে সখে নিয়ে যেতো। তারপর ক্রমশ আমাকে ত্রিক করতে দেখালে, নিষেধও ত্রিক করতো আর আমাকেও করতো। কিন্তু বিয়ের সখহে কোনো উদ্ভাঘটাই অরেনা, বললেই, হবে হবে বলে কাটিয়ে দেব। তাতে একদিন আমি ঠেক বসলাম। তখন থেকে আমার উপর রীতিমতো অত্যাচার করতে শুরু করলে। সেই ঘরটি থেকে কোথাও আমাকে বেরতে দেখনা, নিষেধ এখন আসে তখন ছাড়া খর সব সময় আমাকে ভালাবন্ধ করে রেখে দেয়। কিন্তু ছোব-দববধি করে আমার সখে পারবে কেন?

একদিন ত্রিক করে এখন একটু বেদামাল হয়ে পড়ছে, তখন একসময় ভাস্করটি ঘর থেকে বেরিয়ে বরজার শিকল টেনে বিয়ে আমি এক-কাপড় পালিয়ে এসেছি। আমার এক নার্স-বন্ধুর ঘরে এসে উঠেছি, কিন্তু সে আর কতদিন চালাবে? আমার পরসাক্ষি ত্রিকট নেই, এখন যেতে পারিনি। আমি পঠির ত্রিকিতি, ত্রিকিভাবে আপনি ছাড়া দুঃখ জানাতে আমার কেউ নেই, আপনায় কাছে গেল পর্যন্ত না এসে কি করি বলুন? সব কথাই আপনাকে বললাম, এখন আমাকে রাখতে হয় বাখুন, দারতে হয় নাকুন।”

খীকার করছি যে ওর সখহে আমার মনে একটু দুর্লভতাই ছিল। গোড়া থেকেই ছিল। মনে মনে ভাবতাম, আছা এমন একটি মেয়ে, অর্থক নই হয়ে ধরে! একটু চেষ্টা করলে যদি ওকে সেই নিঃশব্দ মিহতির হাত থেকে রক্ষা করা যায়, তো সেটা ভালো কথা নয় কি? যেহেতুটি পলম্বন একটু-আধটু হয়েই, সেইটুকু কমা না করলে চলনা। নির্দয় নির্দয় বিচারক হয়ে কোনো সাত নেই, তাতে কারও ভালো করা যাবনা। আমি চাই যে ও নিজের পায়ে পাড়াতে শিখুক, পৃথিবীকে চিনে নিলে সখহে হয়ে ভরতকমের বহুতীর্ন হাপন করতে শিখুক। কিন্তু তা কি একবারেরই হওয়া সখহ, এমনি ভাবে ঠেকতে ঠেকতে তবে শিখবে।

“কমার বেগা তো আমি নই, কাকাবাবু, আমার দিকটা ভেবে দেখবারও কেউ নেই। বরং কমা আমার করে নিতে জানে তাগের সকলেই কমা করে, কিন্তু দাটা জানেনা তারের উপায় কি হবে?”

চোখের জল ও পায়ের ধরা আর এইসব কথা পর স্বগত্যা আমাকে কমাই করতে হলো। আমার আগের মতো খুবই করতে হলো। আমার তাকে এক নার্সি-হোমে ঢুকিয়ে দিলাম। সে অস্ত্রান্ত নার্সের সখে ঘর ভাড়া করে ভরতভাবে কাজ করতে শুরু করলে। কিন্তু ভাস্কর রায়ের চেহারে আর তাকে কিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না। আমি তাকে বুকিয়ে দিলাম যে এতটাই খুশি হয়ে থাকো, এর চেয়ে বেশী কিছু উজাশা করে আর কাজ নেই। সেও কথটা এবার বুঝে নিলে।

বহুহয়ানেক পর্যন্ত আর কোনো গোলমাল হয়নি। আমার সে তেমনি খাট হয়ে উঠল, মন দিয়ে কাজ করতে থাকলো, ভাস্কর-মহলে তার স্থাব্যিতি শোনা গেল। নার্সের দরকার হলে অনেকেই ওর খোঁজ করে। দু-একটা বড়ো বড়ো বাড়িতে ওকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, তারাও

হরকার পড়লে আপে ওকেই চেয়ে পঠিয়ে। এলিক বেণ নিভুক, কানাই তাদের বাড়িতে বিদ্যি মালী প্রচলিত লক্ষ্যে পড়িয়ে পেলোছে। বাড়ির কাজকর্ম ওকে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করে পঠিয়ে। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ডাব করতেও বেণ পট্ট, কলকট্ট লকসেরই ও প্রিয়শাসী। আর মনেকরই বাড়িতে ও নিজের কাকাবাবুর গুণমাধা ক'রে বেড়ায়। বসে যে এমন ডাক্তার তোমরা দেখনি, সব ডাক্তারের দিকে এসে নিচ্ছে ডাক্তার উনি সারিয়ে তুলতে পারেন। বসে যে আমি নিজে তো একবার মরেই গিয়েছিলাম, উনি আমাকে কিসের ইন্সপেকশন দিয়ে খাট থেকে কিরিয়ে আনলেন। ওর মূখ এইসব বিজ্ঞান তুলে দুরারোগ্যে জমিক রেণী কেউ-কেউ আমাকে চিকিৎসারও ভার দেয়, তাতে আমার বেণ কিছু অর্থগনও হয়। ডাক্তার আমি যেমন কিছু কাজ পঠিয়ে দিই, সেও তেমনই যাকে যাকে আমাকে কিছু পঠিয়ে দেয়। এ বিষয়ে তার খুবই আগ্রহ দেখতে পাই। ওর যে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা বোধ আছে এটা অনেকবারই দেখছি। আমার দ্বারা চিকিৎসিত হওয়া মধ্যে কাউকে নত করতে পারলে ও নিজেই এসে আমাকে ছেকে নিয়ে যায়, আমার বা ভ্রাতৃর দী তার বসল তাদের কাছ থেকে আসার ক'রে দেয়। আমাকে চুপি চুপি বলে, "আমি এই দী ওদের বলছি; কম দী বসলে ওদের মনে বিশ্বাস আসতেনা। আপনি যেন এতে 'না' করবেন না।" কাজেই চুপ ক'রে বসে।

ইতিমধ্যে এক ডক্তরের হীর বেকসের হাতে খুব ধরলো, যাকে বলে 'বোন টিবি'। তাকে স্নাত্তার বেঁখে বহুদিনের ভ্রত বিছানার কেসে রাখতে হলো। ডক্তরের কোনো অকিসে চাকরি করেন; ডাক্তারি চাকরি। তিনি সফল সম্বন্ধিত থাকতে পারেননা। তার উপর আবার ভিন-চারটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। কেই বা তাদের দেখাশোনা করে, আর কেই বা পধ্যাত্ত রোগিণীর পরিচর্যা করে? কি-চাকরের দ্বারা যদিও সংসারের কাজ চলে যেতে পারে, কিন্তু এ-সব কাজ তাদের দ্বারা ত্রিকমতো ভাবে হতে পারেনা। তখন আমি সেই ডক্তরের কাছে বললাম, আপনি একজন নার্স রাখুন, যে যিনি অন্তত দুবার করে এসে এইসব কাজগুলো করে দির যেতে পারবে। তিনি বললেন, নার্স রাখার দ্বারা তার সামর্থ্য নেই। আমি বললাম, বেশী খরচ লাগবেনা, আমি অল্প পরাইই নার্সের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দাম্যকে সেখানে নিযুক্ত ক'রে দিরে বললাম, নার্সি-হোমে দ্বারার সম্বন্ধ আর সেখানে বেশী কিংবদন্তীর সম্বন্ধ দু'কটা

এখানে এসে রোগীর সব-কিছু কাজকর্ম ক'রে দিরে যাবে। যদিও সাময়িকই কিছু পাবে, কিন্তু এখানে পরমায় বিকটা দেখলে সন্ধাননা। সে খুব সন্তই মনেই এতে সাজী হলো।

সে ঐ ভাবেই ওখানে কাজ করছিল, কিন্তু রোগিণীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে লাগলো। তার নানারকম উপদ্রব দেখা দিতে লাগলো, চারিদিকে বেত-সোয় হতে লাগলো। দাম্য তখন নার্সি-হোম থেকে ছুটি নিয়ে দিনের পর্যন্তই ওখানে থাকতে লাগলো। দেখলাম যে ডক্তরেরাও ওর উপর নানা বিষয়ে নির্ভর করতে শুরু করেছেন, আর ছেলেমেয়েরাও ওর খুব বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু সেই রোগিণী হঠাৎ আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা ক'রে বললো—“ঐ নার্সটিকে আপনি এ বাড়িতে কেন আনলেন?”

আমি বললাম—“আপনারই দেখা করবার জন্তে। কেন, ও কি ভালো ক'রে আপনার দর নিচ্ছেনা?”

“সে বা করবার তা কহছে বৈকি। কিন্তু এদিকে যে আমার দাম্যকে আর ছেলেমেয়েদের আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?”

আমি হেসে উঠে বললাম—“একটু দূরে দূরে সরিয়ে রাখাই তো আমি চাই। ও ঠিক কাজই করছে। রোগটা কিছু ছোঁয়াতে ধরনের কিনা। ছেলেমেয়েরা আপনার সঙ্গে বেশী মাধামাধি করলে ওদের অনিষ্ট হতে পারে। আপনি আগে সেদে উঠুননা, তখন সবাই আপনার কাছে থাকবে। তখন কি আমরা বাধা দিতে আসবো?”

যদিও আমি জানতাম যে তার এ রোগ সারবার নয়, আর রোগিণীও সব কথা বুকেছিলেন, তবু আমার কথা শুনে তিনি চুপ ক'রে গেলেন।

কিন্তু কালের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটল।

এর পর অনেকদিন দাম্যর সঙ্গে আমার বৈশাখাশ্রম্য হয়নি। প্রয়োজন না হলে এখনিতে তখন আর তেমন দেখাই হলনা। সেও থাকে তার নিজের ক্লাব দিবে, আমি থাকি আমার নিজের ডালে। সে আমার কাছে না এসেও আমি তার বাসার গেলে অবশ্য দেখা হতে পারতো; কিন্তু আমার ডালে তখনেই আগতি ছিল, আমি মনে করতাম যে ওতে প্রার্থী বদার থাকবেনা। বিনা কারণে কেনই বা যাবো ওর বাসাতে।

কিন্তু একদিন দাম্যর বিশেষ প্রয়োজন হলো। একটি মার্কটীন পিত্তর কঠিন আঘাত রোগ লুপ্তে, আজই দাম্য সেখানে নার্স নিযুক্ত করা চাই। কোথায় নার্স খুঁজতে যাবে

এই ভেবে তারা ইতস্তত করছে, আমি বললাম যে আমিই একজন নার্সকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে খুব ভালো কাজ জানে, আপনাদের কোনো ভাবনা নেই।

সেই রাত্রে হঠাৎ গিরে হাজির হলুম মাল্যের বাসাবাড়িতে। হোতলায় উঠে দেখলাম, তার ঘরে আলো জ্বলছে, ঘরখাটা ভেঙেচোরা। হাতের চাপ বিতেই ঘরখাটা খসে গেল।

ভিতরে ঢুকেই দেখি, সেই বৃত্তময় ভবনলোকটি একপাশে চেঁচিয়ে বলে আছে। তার সাহসে এক ছোটো টেবিলের উপর ভিক্টোরিয়ার ও ঘরের বোতল। আরো দেখি যে, মাল্যার হাতে সিগারেট।

আমাকে দেখেই ভবনলোক বতবত খেয়ে দাঁড়িয়ে উঠল; “আমি তাহলে চমি” বলেই আমার পাশ কাটিয়ে বড়ের মতো বেরিয়ে গেল।

আমিও তখন চলে আসবার জন্য পা বাড়িয়েছি। মালা ছুটে এসে দরজা আগলে ধাঁড়ালে। বললে—“তুমি আগে কথা, আমার কোনো গোপন নেই, কাকাবাবু—”

হঠাৎ উজ্জল আলোতে আমার নজরে পড়ে গেল ওর ঘরের কোণে একটা ময় মাকড়সা। কে যেন সেটা আমাকে আঁচুল দিয়ে খেঁচিয়ে দিল।

আমি একটু হেসে ওকে বললাম—“বুকেছি বুকেছি। ঐমিকে চেরে সেল। তুমি ঠিক কথাই বলেছ, মাকড়সার কোনো দোষ থাকে না, ও কেবল ভাল পাততেই জানে। মাছিরেরই বত সেব, তারাই উড়ে উড়ে ওর ভালো দিয়ে পড়ে। বাই হোক, আমি চললাম। তুমি তো এখন ভালোই আছো। আমার কাছে আর কথাই নেইনা।”

সেই থেকে মাল্যার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধই আর রইলোনা। [সমাপ্ত]



সহকর্মিণী

অন্তাত দেবসরকার

উঠ-উঠি তিন মিন দেখা হ'লো। চলন্ত ট্রাম-বাসের গ্যাপগাড়ির মধ্যে। চতুর্থ দিনে বিমান নিজে থেকে চেনা দিয়ে বললে, মিস্ সোম, চিনতে পারচেন!

পাশের খালি সিটায় ইঞ্জিতে বসতে বলে মিস্ সোম অস্থূটে বললে, কবে এলেন?

ট্রামের রড্ ধরে বসতে উত্থত করে বিমান বললে, সপ্তাধানেক।

ছুটিতে?

না, বদলী হ'য়ে এসেছি।

বুঝি খুশী হ'লো মিস্ সোম। বললে, অনেক-দিন পরে এলেন!

তা! অনেকদিন, প্রায় এক হুগ! তাই কি আসা যায়—অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে—

এবার নিশ্চিন্ত! আর বাইরে যেতে হবে না আপনাকে।

হেসে বিমান বললে, বড়ি ছোয়ার কথা বলছেন? ও কিছু নয়, মুখশোকাভুঁকির ব্যাপার। আবার ফুলিয়ে দেবে কোন্‌দিন, কিছু ঠিক নেই রান-রাজবে!

মিস্ সোম চুপ করে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। কিছু বলবার নেই। বদলীর চাকরির কানোলা অনেক। হুজুতোগী ছাড়া কেউ বৃথতে পাতে না।

আরো ছোটো স্টপ্‌ স্বেথে রড্‌ ছেড়ে মিস্ সোমের পাশে বসে বিমান বললে, এত কাণ্ড করে' না এলেই হ'তো। একদম ভাল লাগছে না।

মুখ ফিরিয়ে চোখ তুলে মিস্ সোম জিজ্ঞেস করলে, কেন?

হঠাৎ থমকে বিমান বললে, তা জানি না। কেমন-কেমন ঘেন সব হ'য়ে গেছে!

হেসে মিস্ সোম বললে, কানপুর আর কলকাতায় তফাত আছে!

অন্তমনব্বের মতো বিমান বললে, যা ডেবেছিলুম তা নয়।

মিস্ সোম বুঝি কৌতুক করলে, কি ডেবে-ছিলেন? ইশ্রুপ্তীতে ফিরে আসচেন আবার!

অগ্রস্বত কঠে বিমান বললে, তা নয়। কল্পনা আমার অস্ত ছিল।

মিস্ সোম উত্তর দেবার আগেই বিমান উঠে দাঁড়াল, মহিলা আসনের প্রার্থী পাশে অপেক্ষা করছেন। আসন ছাড়তে হ'লো।

আর কোন আলোপ হ'লো না খানিকখণ। চিঁড়ে-চেপটা ভিড়টা হাঁসকাস করছে। হাজরা পার্ক পেছিয়ে এল ট্রামটা।

একদা পরিচিত হুঁজনেই হয়তো অস্ত কথা ভাবছে। কল্পনা-বাস্তবের সামঞ্জস্য কিছু!

একসময় বিমান জিজ্ঞেস করলে, মিস্ সোম, আপনি এখন কোথায় আছেন?

কোথায় আবার, সেইখানে! চাকরির কথাটা চেপে যেতে পারলে যেন বেঁচে যায় মিস্ সোম।

অনেকদিন হ'লো! উন্নতি-টুন্নতি কিছু? বিমানের খবর নেবার আগ্রহটা উৎকট।

মিস্ সোম হাসলে। উত্তর দিলে না। লোকটা তেমন সরল আছে, কোথায় কি জিজ্ঞেস করতে হয় জানে না। এতকাল পরে চাকরির খোঁজ!

আবার পাশে বসবার সুযোগ হ'লো। ডিপোয় এসে বেয়ে-পুরুষ অনেক খালি হ'লো। ট্রামটা খানিক ঠাড়িয়ে রইল লাইন-ব্রিগারের জন্তে।

বিমান বললে, এমন দেৱী হয় নাকি রোজ কিরতে?

মিস্ সোম মাথা নেড়ে সায় দিলে। খবরটা

এমন কিছু নহুন বা চমকপ্রদ নয়, গাড়ের বাঘের মতো পুরোনো।

বিমান বিষয় প্রকাশ করলে, এত দেবী! এত কাজ আজকাল কলকাতার অফিসে? বলেন কি!

মিস্ সোম না-কোভ, না-অভিযোগের স্বরে বললে, কানপুরে কাজ নেই?

জা বলে' এত নয়! মিস্ সোমের মুখের দিকে চেয়ে বিমান চূপ করে' গেল। খুবই আশ্চর্য মিস্ সোমের মতো বেয়ে কাজের লোক হ'য়ে উঠেছে! ক'বছরে কি পরিবর্তন হ'য়েছে কলকাতার, তথা পরিচিত জনের! এই মিস্ সোম যেন সেই মিস্ সোম নয়।

খুব মনে আছে বিমানের, চাকরি করার নামে সারাদিন ঘুর-ফুর করে' ঘুরে বেড়াত মিস্ সোম সান্সাই-অফিসের বাড়িময়। চঞ্চল প্রজাপতি যেন। একটা ছবি এখনই মনে হ'চ্ছে বিমানের তখন কোনদিন মনে হয়নি—সেই চঞ্চল, বিচিত্র প্রজাপতির একটা কোথাও স্থির হ'য়ে বসেছে আর পিছন থেকে পা-টিপে-টিপে ধরতে আসছে অবোধমতি কেউ। ধরতে পারছে না, উড়ে চোখের ওপর বসছে আবার প্রজাপতিটা কাছে কোথাও।

অফিস এক ছিল না, কিন্তু অফিস-বাড়ি এক ছিল। স্থান অভাবে একটা হলঘরে আলমারী আর শ্রীল-ব্রাকের বেড়ায় যেটুকু বিভিন্নতা—বুক-সরবরাহের ডখন নানা শাখা! যেন কোন রেল-স্টেশনের ওয়েটিং অটচালায় নানা জায়গার যাত্রী সব। তৃতীয় শ্রেণীর! ট্রেন আসার অপেক্ষা, কি বুদ্ধ ধামার উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা!

তখন অত বড় হলঘরে ঐ একমাত্র মেয়ে কেরানী মিস্ সোম। সব চোখ ঐ দিকে টানা। কাজ করার ধরকার ছিল না মিস্ সোমের; কি, কাজে কোন মন ছিল না মিস্ সোমের। সারাদিন আঁচল উড়িয়ে, বেগী ছুটিয়ে ঘুরে বেড়াত, ছুটি হবার আগেই কখন সরে পড়ত কেউ টের পেত না। পরের দিন একটা মুখরোচক গল্প তৈরী হ'য়ে

টেবিলে-টেবিলে ঘুরে বেড়াত বেলা দশটা থেকেই, মিস্ সোমের নান। চাকরি করতো না মিস্ সোম, গল্প তৈরী করতো। আর সে কি সব গল্প! শুনে যারা সত্যিকারের চাকরি করতে আসতো ত্রাসের চাকরিতে মন লাগতো না—সকাল থেকেই মনটা কেমন-কেমন করতো। রহস্যময়ী মিস্ সোম!

প্রত্যক্ষভাবে সে-রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা না করলেও মনে মনে বিমানও মিস্ সোম সম্বন্ধে সে-সময় বেশ কিছুটা উৎসুক হ'য়ে উঠেছিল। অনেক বকম উপমা মনে আসতো মিস্ সোমকে দেখে। 'মিউনিশন্ প্রোডাকশনের' মিস্ সোমকে কে না চিনতো তখন? অফিসের নানের চেয়ে মিস্ সোমের নাম ছিল বেশী সে-সময় কেরানী মহলে।

বরং ঘুরে বেড়ালেই যেন মিস্ সোমকে নানাত, দেখতে ভাল লাগত। ওর কাজে-বসাটাই দৃষ্টিকটু, কৃত্রিম শোভা অফিস-টেবিলের! ফুলনানিতে ফুল গাঁজো যেন হঠাৎ।

শখ-ই! শখ ছাড়া আর কি, চাকরি করে' কটা পরসাই বা পায় যার ক্ষেত্রে অমন গুরুতরভাবে কাজে বসতে হবে! পেটের ক্ষত্রে নিশ্চয়ই মিস্ সোম চাকরি করতে আসেনি, সূত্রং ওর ভয় কি! কে কি বলবে কাজ না করলে? বরং উণ্টো—

“হঠাৎ অত কাজে মন কেন? মিস্ সোম আজ একবারও এখানে এলনা! কি ব্যাপার?”

“বোধ হয় ভাড়া খেয়েচে। এটা অফিস, ফ্যানান শো নয়!”

• সত্যি, মিস্ সোম সিনে বসে নিবিষ্ট মনে কাজ করছে। দেখবার মতো। ভাববার মতোও।

কিন্তু কতক্ষণই বা। আঁচলের হাওয়া আবার বইতে থাকে হলঘরে, খুঁশির গুঞ্জে অফিস মুখরিত, অর্থাৎ এই চাই-ই, এই-ই স্বাভাবিক। মুখে না বললেও মনের কথা তাই বৃষ্টি সবার।

খানিক পরে বিমান বললে, কাজ খুব বেড়েচে

তা হ'লে আজকাল! আপনাদেরও বাটাকে, বাটতে হ'চ্ছে?

হান হেসে মিস্ সোম বললে, কেন, আনাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা আছে নাকি?

অপ্রস্তুতের মতো বিমান বললে, তা নয়। তাই বলছি—

আজকাল মিস্ সোম বড় গভীর হ'য়ে গেছে যেন। আবার কেমন চুপ করে' জানালার বাইরে চেয়ে আছে, কর্মক্রান্ত! বোধহয় এখন বাড়ি পৌঁছনের কথাই ভাবছে কেবল। কতক্ষণে পৌঁছন যায়! এ সেই মিস্ সোম নয়, রাত দশটা। সকাল দশটা বার দেখ-মনে এতটুকু ক্রান্তি বা অবসাদের আঁচ লাগতে পারতো না। সব সময় এক ভাব, প্যাকেট-মোড়া শব্দের সামগ্রীটি যেন। এতটুকু এদিক-ওদিক হবার ভো নেই, না চুলের না বেশবাসের। ফুটু!

অফিসের কাজেই মিস্ সোমকে কাবু করেছে তাহ'লে! চেয়ে দেখলে বিমান, মুখে কেমন ছায়া পড়েছে মিস্ সোমের। ঐ অনেকটা মুছে গেছে—তবাব ঘষে আবার লেখার মতো।

ট্রানটা মোড় ঘুরতে বিমান জিজ্ঞেস করলে, ন'নহরই আপনাদের অফিস তো?

মিস্ সোম মাথা নাড়লে।

একদিন যাব। সবার সঙ্গে দেখা করে' আসবো। আজকের কথা তো নয়—বিমান লক্ষ্য করলে, খুব যেন আগ্রহ নেই মিস্ সোমের বিমানের প্রস্তাবিত সাক্ষাৎকারে। গুরুত্বও কিছু নেই কথাটার। কথার কথা!

অফুটে মিস্ সোম বললে, আসবেন। আপনাদের অফিস তো এখন বিশন রো-এ?

কৌতুক করে' বিমান বললে, বদলী হ'য়ে এসে অফিস খুঁজতেই একবেলা কেটে গিয়েছিল! গোলক-বাঁধা, ওপর-নীচ করতে পায়ে-বুকে ব্যথা। ন'নহরই থাকলে পারতো! কি দোষ করলে?

বিমানের নতুন অভিজ্ঞতার কথা শুনে মিস্ সোম যেন হাসলে।

বিমান বললে, এইসব খরচগুলো ব্যবসার নজরে পড়ে না, গায়ে-গায়ে বসলে মহাভারত অন্তত হ'য়ে যেত! কেবল ভড়া!

মিস্ সোম বললে, ধরতো না!

তা হ'লে তড়িয়ে দিয়েচেন বলুন? বিমান কৌতুক করলে।

আপনারাই চলে গেলেন। একসঙ্গে থাকতে চাইলেন না। মাথা নিচু করে মিস্ সোম বললে।

বিমান বললে, তাই মনে হ'চ্ছে, যুগ-ই পাল্টে গেছে—মিলেমিশে আর কেউ থাকতে চায় না! যেমন সব হুয়েচে অফিস-মাস্টার!

তারপর হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ল, বিমান বললে, এখন তা হ'লে আপনারা একছত্র বসুন? একলা-একলা ভালই আছেন। বাড়িটা তো কম নয়! বেশ থাকা গিয়েছিল যুদ্ধের সময়, একসঙ্গে গুলতানি!

মিস্ সোম বললে, এখনো আছে! তবে আপনাদের মতো কোন স্থায়ী অফিস আর ন'কল্পে নেই। 'পরিকল্পনা'র অনেক অফিস টেবিল-ক্লেয়ার পেতে নিয়েচে। আরো আসবে।

বিমান বললে, তা হ'লে ভালই আছেন বলুন? নতুন নতুন মাহুস দেখছেন।

মিস্ সোম মাথা নাড়তে বিমান বললে, পুরোনো অফিস তা হ'লে একটাও নেই? চেনা-শোনা কারো সঙ্গে দেখা হবে না?

মুখ টিপে মিস্ সোম বললে, হ'তে পারে, আসবেন না!

যেন বিমানের নজরটা হঠাৎ পড়ল—মিস্ সোমের পোশাকের পরিপাটিও তেমন নেই। সাধারণ একখানা শাড়ি, তাও ক'দিনের-পর-যেন মনে হয়। দেখে, অনেক প্রশ্নের মধ্যে এ প্রশ্নটাও বোঁধী করে মনে হয়, মিস্ সোমের ছুরবছার কারণ কি? বিয়ে-থা তো করেননি, চাকরি করছেন—

খুব একটা কিছু না হ'লেও একলার পক্ষে যথেষ্ট।
পোশাক-পরিচ্ছদের সীনতা প্রকাশ পেলে
স্বাবলম্বীদের আর রইল কি! চাকরি করার
মানে? খুব একটা মেলাবেশা না থাকলেও মিস্
সোমের পারিবারিক জীবনের অনেক খবরই বিমান
রাখতো। বাবা না, ছুই তাই-বোন নিয়ে স্বপ্নের
সংসার। নিজেকেই একখানা বাড়িও ছিল। আরো
একটা কথা বললী হ'য়ে যাবার আগেই বিমান
শুনছিল মিস্ সোম সখুচ্ছে। মিস্ সোম প্রণয়ন্থয়ে
আবহু হয়েছেন বেশ কিছুদিন।

তা হ'লে—

অনেক স্বাধীন প্রেমের অবশ্রম্ভাবী ফল এই
কিনা কে জানে! মিস্ সোম ডিসাপয়েন্টেড?
কে জানে! কিন্তু সত্যি ভাষতে বিমানের কষ্ট হয়।
কি দরকার ছিল স্বখাত সলিলের!

তখন দু' থেকেই দেখেছে মিস্ সোমকে।
আজ এতদিন পরে আবার দেখা হ'য়ে পাশাপাশি
বসে' খুব কাছ থেকেই যেন সব-কিছু দেখতে পাচ্ছে
বিমান মিস্ সোমের। ক্লান্ত, অবসন্ন, মিস্ সোমের
যেন শেষ হয়ে গেছে। সে মিস্ সোম আর নেই।

মনে আছে। শুক থেকে অনেকেই হোক-হোক
করতো। এক ক'ক মাহির মধ্যে যেন এক কৌটা
মধু পড়েছে। কি ভেংছকা আর আগ্রহ মিস্
সোমকে নিয়ে! আদি-অন্ত-হীন আলোচনা মিস্
সোম সখুচ্ছে। অকিস আবহাওয়ার সে-এক
উল্লেখক উদ্ভাসনার স্মৃতি করেছিল মিস্ সোমের
আপয়েন্টেমেন্ট! টেবিলে টেবিলে ডিবেট, চায়ের
কাপে তুফান—মেয়েদের চাকরির ঐতিহ্য-অনৌচিত্য
নিয়ে।

সেদিন বন্ধুদের সঙ্গে তর্কের খাজিরে বৃষ্টি বিমান
বলেছিল, দ্রী-শিক্ষার দ্বিতীয় ধাপ এই চাকরি, এতে
আশ্চর্য হবার কিছু নেই—আরো অনেক কিছুই
শিক্ষিত মেয়েদের করতে হবে বা আজকের দিনে
তোমরা কল্পনা করতে পার না। অসাধারণ কিছু
নেই।

দু'এক বছরেই অবস্থাটা বদলে গেল।
'মিউনিশন প্রডাকশন' আরো অনেক মেয়ে চাকরি
করতে এল। হলঘরে অনেক শাড়ির খুশখমানি।
কাকে নিয়ে আর আলোচনা করবে বিশেষ করে!

ভাপার লক্ষ্য করলেই বোঝা যেত মিস্ সোমও
বৃষ্টি বিশেষতর হবার চেষ্টা করতো—বেশবাসের
অভিনববে। বেশ একটা রুচিসম্মত পরিবর্তন ছিল
প্রত্যহ।

সহকর্মীরা বলতো, মিস্ সোম দিন দিন চামি:
হ'য়ে উঠেচ। বাপার কি?

কেউ ফুট কেউ বলতো, সেইটেই তো জানি
না। চাকরি না অভিসার?

রক্ষে, মিস্ সোমের কানে কথাগুলো পৌঁছত
না। কেননা, অকিসের তাইকে বড় একটা আমল
দিত না মিস্ সোম। আড়ালে ছেলেটা অমন অনেক
কথাই বলে! বাজার মাকেও ডান বলে লোকে।

তা হ'লে মিস্ সোম এই ক'বছরেই বদলে
গেছে? সামান্য সহকর্মীদেরও আমল দেয়?
কাছে ডেকে বসায়? গায়ে পড়ে' আলো করে?

এইখানেই নামবেন বৃষ্টি?

হ্যাঁ, এইখানে। খানিকটা ঝেঁটে যেতে হয়
পার্কের পাশ দিয়ে।

সেই বাড়িতেই আছেন?

আর কোথায় যাব! নান হোসে ট্রান থেকে
মিস্ সোম নেমে গেল।

প্রশ্নটা করেই মনে মনে অপ্রস্তুত বোধ করলে
বিমান। মিস্ সোম নিঃশব্দ হোসে যেন বলে গেল
অত খোঁজের দরকার কি? এত কিছু অহুরঙ্গতা
ছিল কি কোনদিন?

কে জানে কি ভেবে প্রশ্নটা করেছিল বিমান।
নিজের বাড়ি থাকতে লোকে আবার কোথায়
থাকবে? অতুত প্রশ্ন বৈকি! মিস্ সোম অল্প
মানে করতে পারে স্বচ্ছন্দে। তা ছাড়া সেই বাড়ি
বলতে কোন্ বাড়ি বুঝেছে বিমান—চোখে তো

সেখেনি কোনদিন ? নিস্ সোম কোনদিন বাড়িতে নিমন্ত্ৰণ করেনি।

ট্রামটা আবার চলবার জাগেই নিস্ সোম পাশ দিয়ে ঘুরে এসে ট্রাম-লাইন পেরিয়ে গেল। পার্কের রেলিংগুলো দেখা যাচ্ছে—নিস্ সোম ঐ নিশানায় গন্তব্যে পৌঁছবে। রাস্তাটার নাম কিছুতে বিমান মনে করতে পারে না, অথচ এর আগে কতবার শুনেছে সে-নাম। বাড়ির নম্বরটাও মনে ছিল এককাল। ক'বছর বাইরে বদলী হ'য়ে সব যেন গোলমাল হ'য়ে গেল। মানুষও বললে গেল।

অমন করে বৃত্তি নিস্ সোম কখনো হাঁটতে না। এর তখনকার হাঁটার মধ্যে বিশেষ একটা কায়দা ছিল, অনেকের সমালোচনার উল্লেখ করতো। নিস্ সোমের হাঁটার স্টাইল অননুক্রমণীয় !

সেদিনের সমালোচকরা আজ দেখলে কি বলবে কে জানে—নিস্ সোম যেন হাঁটতে ভুলে গেছে, কি অনেক টেটে আর হাঁটতে পারছে না ! বড় দ্রুত, বড় অবসর নিস্ সোম। কতদিন নিস্ সোমের এমনি কষ্ট হচ্ছে কে জানে !

এখন ট্রামটা ভুলনার অনেক ঝঁকা। যারা ঠাড়িয়ে আছে তারা বৃষ্টি ঠাড়াতেই ভালবাসে। এধার-ওধার অনেক সিট তো খালি হয়ে গেছে। যুহুর্ডের চক্ষে চোখ ফিরিয়ে কেমন যেন মনে হয় ট্রামের ভেতরটা। একটা অদ্ভুত নিলিপ্ততা হঠাৎ যেন। সেই ভিড়ের ব্যস্ততা আর নেই।

ছুটা স্টপেজ পেরতে-না-পেরতে বিমান হস্ত-বস্ত হ'য়ে সিট ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো। নামবার জায়গাটা যেন বলা-কওয়া না করেই পেরিয়ে গেছে ! অচেনা পথ-ঘাটের ঐ একটি মাত্র চিহ্নই যেন স্মরণে ছিল, তাও পেরিয়ে গেছে অনবধানতায়—এরপর নামলে আর চেনা যাবে না।

অসুচিত হ'লেও একরকম ছুটন্ত ট্রাম থেকেই বিমান লাফিয়ে পড়ল। হুমড়ি খেতে-খেতে সামলে নিলে। তারপর চোখের উপর ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাবটা কাটতে উল্টো মুখে হাঁটতে লাগল। কিন্তু

কোন সে স্মরণ-চিহ্ন, কোথায় ? মোড়ে এসে খানিক থমক দাড়িয়ে রইল। আলোকিত রাস-পথে বকুল, শিরীষ, কৃষ্ণচূড়ার ছায়া চম্ভাতপের মতো ঘির।

হয়তো 'ভুল জায়গায় ভুল করে' নেমে পড়ছে ; কি ভুল চিহ্ন লক্ষ্য করেছে ! ভুলে-ভুলে এতটা হেঁটে এসেছে উল্টো দিকে। ন'মামার বাড়ি এদিকই নয়, বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছাকাছি। বহুকাল এদিকে আসেনি বলে আজ এমনি গোলমাল হচ্ছে। না হ'লে চেনা-শোনা-জানা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ির ঠিকানা ভুল হবার কথা নয়। ক'বছর আর বিমান বিশেষে ছিল পরিচিত গভীর বাইরে ?

পরিবেশে পরিচয়ের ছাপ থাকলেও অপরিচয়ের সন্ধ্যা অনেকখানি। কত যেন নতুন জায়গা এই রাসবিহারী-বালিগঞ্জ। কি ছিল, কি হ'য়েছে। দোকান-পসরায়, মানুষ-জনে, আলোয়-শব্দে গমগম করছে। শেয়াল-ডাকা অতীত স্মরণাতীত !

যদি সব মুহুরতা উবে গিয়ে কেবল নির্জনতা আর সীমা-চিহ্ন-হীন একটি-হুটি পথেরখা জেগে ওঠে, আর ধূ-ধিঃস্রবতা সে পথ-প্রান্তের, তখনো ঠিক এমনি ভাবে ঠাড়িয়ে কেবল আত্মীয়ের ঠিকানার কথাই কি ভাববে বিমান ? প্রত্যাশায় কি আর কিছু থাকবে না ? ঘবা কাচের আবরণে ঢাকা আলোর মতো সম্ভাবিত কিছু ?

কত যেন সব বললে গেছে ! সেই আগের মতো কিছু আর নেই। মানুষের খোলসটাই কেবল নজরে পড়ে। ভাল-মন্দর কথা নয়, কি-যেন অব্যাক্সন্সের তার। অশুষ্টিও।

দেখা হ'লে ন'মামা হয়তো বলবেন, এতদিন এসেচিন্স—মামা-মামীর সঙ্গে দেখা করতে নেই। এখন বড় হ'য়েচিন্স, মানুষ হ'য়েচিন্স, মামা-মামীর কথা মনে থাকবে কেন ? ভাল !

বিমান বলতে পারবে না, ঠিকানাটাই ভুলে গিয়েছিল সেদিন মামার বাড়ি যেতে-যেতে। বাড়িটা ঠিক করতে পারেননি।

ন'মামা আরো ক্ষুব্ধ হবেন। না, আজই বাড়ি খুঁজে আত্মীয়তা বজায় রেখে আসা উচিত। দেখতে দেখতে এক সপ্তাহের ওপর হ'য়ে গেল বিমান সেসে ফিরে এসেছে। আর দেবী ক'হলে আত্মীয়তার মুখ থাকবে না। মান থাকবে না কারো।

কোন মানে নেই পাগলের মতো এতখানি উত্তোষে হেঁটে আসার। এই অব্যবস্থিত চিন্তের কোন বৃত্তিসম্বত কারণও নেই। অক্লান্ত ধাঁধায় পাড়ছে যেন, অনেক দিন পরে কলকাতায় ফিরে এসে হকচকিয়ে গেছে বৃষ্টি!

আবার ট্রামে উঠতে গিয়ে মিস্ সোমের কথা মনে হ'লো বিমানের। মিস্ সোম কেমন যেন হ'য়ে গেছে—'মিউনিশন্ প্রডাকশনের' সে মিস্ সোম-ই নয়। নিজেকে যেন আড়াল করতে চায় মিস্ সোম।

কত পরিবর্তন হয় মানুষের! কালের। সে তুলনায় মিস্ সোম আর কি! অমনি কত মেয়ে কত কি হয়ে গেছে, তার ঠিক কি—কে বোঝ রাখছে?

তু মনে লাগে মিস্ সোম বলে'। পুরুষদের মধ্যে বৃষ্টি প্রথম চাকরি করতে এসেছিল। ন'নব্বর বাড়িতে ঐ একটি মাত্র মহিলা কেরানী ছিল সেদিন। কত কল্পনা-কল্পনা সেই মেয়েটিকে নিয়ে। কথিত, অকথিত কত সমালোচনা তার প্রতিটি পদক্ষেপের! অফিসের কাজ বলতে মিস্ সোম! কি মূল্য ছিল সেদিন মিস্ সোমের!

আজ হয়তো গল্পকথা মনে হবে। জৌলুহীন। সেদিন কি উত্তেজনাপূর্ণ সত্যি ছিল! ন'নব্বর বাড়ির ক'জন কেরানীর মজিক-বিকৃতি ঘটেছিল। কারণ ঐ মিস্ সোম। আজও তারা যদি মনোহুঃধ মনে রেখে চাকরি ক'রতো তাহ'লে মিস্ সোমকে দেখে নিশ্চয়ই সাশ্বনা পেতো, মিস্ সোমের দিন চলে গেছে! অত দেহাকের কিছু নেই!

নিত্যানন্দর কাণ্ডটাই মনে আছে। একটা 'মিন'। ডেলি-প্যাসেঞ্জার বেচারী। কোড়ো কাকের মতো সাত-সকালে অফিসে এসে গেতে

হাড়িরে থাকতো, আবার বেলা চারটের আগেই গেটে এসে পাহারা দিত। কোনদিনই বৃষ্টি মিস্ সোমের সাক্ষাৎ পেলে না! সবাই জানতো, সবাই বুঝতো, কেউ কিছু বলতো না! নিত্যানন্দ পাগল!

এখন প্রশ্নটা যেন মনে হয় বিমানের, সত্যি, সেদিন মিস্ সোম কিছু কি খেয়াল করেনি? না কি, তার কিছু খেয়াল করবার ছিল না। নিত্যানন্দরা যদি আকাশ-বুহম চায় কে কি করতে পারে!

মিস্ সোম সেদিন বৃষ্টি সমস্ত ঘোবনকেই অপমান করেছিল। প্রকারান্তরে সকল যুবক-আকাশকাকোকে। নিত্যানন্দ বলে নয়, রমেশ বলে নয়, সমরেশও নয়। সকলকে। অত কিসের অহঙ্কার? ঠিক হ'য়েছে!

হঠাৎ নিজের কথা ভাবতে গিয়ে কেমন চমকে যায় বিমান। না না, চোখেই দেখতো কেবল, যেন কিছু ভাবতো না মিস্ সোমকে নিয়ে সে। Desire of the moth for the sky! মিছি-মিছি, শুধু-শুধু, পাগলামী!

হুঁধারে গিটের মাকখানে সঙ্গ পথটায় সত্বর্গে এগতে এগতে নজরে পড়ল বিমানের। 'মিউনিশন্ প্রডাকশনের' মিস্ সোম যেন! ঠিক তেমনি, উজ্জল, উদ্ভাসিত। কে বলবে অফিস থেকে ফিরছে। আর কোথাও চলেছে অফিসের পর। অভিসারে। অভিসারিকা। কাল গল্প বেরবে ওর নামে অফিসে।

ডান হাতে রডটা চেপে ধরে ভাল করে লক্ষ্য করলে বিমান কাঁধের পাশ দিয়ে, মিস্ সোম নয়, মিস্ সোমের মতো—আজকের নয়, অনেক দিন আগের, যখন মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে বসে দশটা-পাঁচটা করা মানে হস্তরমতো অ্যাডভেঞ্চার। সং এবং হুঃসাহস উভরই। বাহাদুরী।

হ'তে পারে এ-মেয়েটিও কোনো অফিসে কাজ করে, হ'তে পারে অফিসের পর কোথাও গিয়ে এখন বাড়ি ফিরছে। সন্দের লোকটির সঙ্গে হয়তো কোন সম্বন্ধই নেই ওর—রাষ্ট্রায় কুড়িয়ে সঙ্গ দান করছে।

পাশের লোকটি কেমন ভিজে-ভিজে, নিয়োনো ঘেন। যুহু একটি হাতি আলাপে মাথা নেড়ে অপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে নেয়েটি। অদৃষ্ট একটা ঠেংহুকা যেন ধমকে আছে।

চাপুস কোনদিন মিস্ সোমকে অসুস্থরূপ অবস্থায় না দেখলেও, বিমানের মনে হয়, মিস্ সোমও এমনি কত করেছে—পুরুষ বন্ধুদের নিয়ে লোকটাকে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে কত! কেবল সমপর্যায় অফিসের লোকদেরই এড়িয়ে গেছে, অবহেলা করেছে। অনেক খেলা মিস্ সোম খেলেছে। লেখা-জোখা নেই।

মনটা কেমন করে ওঠে বিমানের। মিস্ সোম কি যেন কেমন যেন হ'য়ে গেছে! চাপে-চাপে চুপসে-বাওয়া ফলের মতো দেখতে লাগল মিস্ সোমকে যখন ট্রাম-স্টপ্ পেরিয়ে পার্কের রেলিং-এর মা-ঘেঁবে বাসায় ফিরছিল।

এখন মনে হচ্ছে বিমানের মিস্ সোমের আভ বাড়ি পৌছন পর্যন্ত একজন সঙ্গীর খুব সহকার ছিল। মিস্ সোম বুকি আরো খুঁধি হ'তো বিমানও যদি পার্কের পাশ দিয়ে রেলিং গুলে-গুলে তার সঙ্গে হাঁটতো। মিস্ সোম বড় একলা হয়ে পড়েছে আজ।

কেমন হয়, ঠিক যে জায়গাটায় মিস্ সোম নেবেছিল সেই জায়গাটা এখনি খুঁজে বার করে ক্রতপায়ে হেঁটে গিয়ে সমভিব্যাহারে মিস্ সোমকে পৌছে দেওয়া? মিস্ সোম এখনো বাস্তব হাঁটছে—কি, তেমন হাঁটতে পারছে না, খেমে-খেমে রগড়ে-রগড়ে হাঁটছে হয়তো! আশাহীন, নিরুত্তম পদক্ষেপ!

বুকি এরি নাম মানুষের দশ দশা! মিস্ সোমেরও তা হ'লে দিন ফুরিয়েছে!

নতুন মেয়েটির পাশের লোকটি এক জাটসায় নেবে গেল। বিমান ভাল করে লক্ষ্য করবার আগেই মেয়েটি মাথা নেড়ে পাশে বসতে ইঙ্গিত করলে। আড়ষ্ট হ'য়ে বিমান থপ্ করে' বসে

পড়ল। একটা কিছুতকিমাকার দৃশ্য যেন। অদৃষ্ট একটা কৌতুক মেয়েটির মুখে ফুটে উঠেছে বুকি। ছুঁচো-গেলা অবস্থা এখন বিমানের!

কলকাতা অফিসের চেহারাও বললে গেছে। পরিবেশটা আর তেমন লঘু নেই। যদিও নতুন মেয়ের অভাব নেই। এক-নজরে কম করে' হ'লেও তিনটি শিবিল কবরী নজরে পড়ে।

“যখন বদলী হই একটিও ছিল না, এর মধ্যে এতগুলি?”

“পলিসি চেঞ্জ করেছে!”

“হঠাৎ?”

সহকর্মীরা ভাবে লোকটি অজ্ঞ—পাশে যেয়ে দেখে মাথা ঘুরে গেছে। এখনও হালচাল বোঝেনি।

প্রথম ক'দিন বেশ অন্ববিধা বোধ হ'য়েছিল বিমানের। অস্বস্তিও। কাজের জন্তে ঐ মেয়েদেরই শরণাপন্ন হওয়া, ভিজ্ঞাসাবাদ করা। আশ্চর্য বেশ হ'য়ে গেছে শহর কলকাতা এই ক'বছরে! বিশেষ করে' অফিসগুলো, মেয়ে-পুরুষ এক জোড়ালে জুড়ে দিয়েছে। কেমন কাজ হ'চ্ছে অবলীলাক্রমে!

সে-সময় অফিসে মিস্ সোমকে নিয়ে যে জল্পনা-কল্পনা ছিল, আজ এতগুলো মেয়েকে নিয়ে তার সিকিও নেই। যেন মেয়েগুলো মেয়ে ছাড়া আর কিছু নয়, ঐ আকারে যেটুকু স্বাভাব্য মেয়ে বলে'। সমান তালেই কাজ করছে। কাকি নেই, কাক নেই, গল্প-জল্পন নেই। মুখ-বোঝা যন্ত্র যেন সব।

বিমানের মনে হয়, এ ভাল নয়—কেমন-কেমন যেন। বিপরীত। ঠিক তেমনটি নয় যেমনটি সেদিন মনে হ'য়েছিল মিস্ সোমকে হলঘরে একা বসে কাজ করতে দেখে। মিস্ সোম সাক্ষাৎসত্তে একটা কিছু চিন্তার উত্তেক না করিয়ে ছাড়তো না। নিত্য নতুন ছিল মিস্ সোমের সান্নিধ্য চিন্তা! সে তুলনায় 'মিশন রো'র এই অফিসটা এতগুলো মেয়ে নিয়ে কিছুমাত্র জমেনি, জাগেনি,—বলা যেতে পারে।

কাজ-কাজ গন্ধে ঘর-বার ভরপুর। দর বন্ধ হ'য়ে আসে যেন।

সিঁড়িতে, করিডরে ঘুরতে-ফিরতে প্রায়ই দেখা হয় গিঁটে অশ্রুত পকাশ বার, তবু যেন কোন কারণ নেই বলসেই আলাপ করে না বিমান সহকর্মীদের সঙ্গে। চোখ তুলে চেয়েই চোখ নামিয়ে নেয় যেন নিবিড় সে-চাওয়া! কাজের ক্ষণে এসে একদিন একটি মেয়ে বেচে পড়ে আলাপ করলে, আপনি বৃষ্টি বদলী হ'য়ে এসেছেন?

লাজুক চোখটা নামাতে গিয়ে আবার তুলে বিমান অশ্রুতে বললে, হাঁ।

মেয়েটি বললে, তাই আপনাকে নতুন দেখছি।

কি ভেবে বিমানও বললে, আপনাকেও নতুন দেখছি।

পাশে বসে কাগজ নাড়তে নাড়তে বেয়েটি বললে, নতুন আর কই, তিন বছর হ'য়ে গেল!

বিমান মাথা নাড়লে। নতুন কিছু নেই।

মনে পড়ে মিস্ সোমের সঙ্গে একদিন এমন প্রথম আলাপ হ'য়েছিল অফিসে। অতুত সন্ধ্যা যেন মাথায় ভেঙে পড়েছিল। কিছু না, মিস্ সোম কেবল ভিজ্জেস করেছিল, আপনি আমাদের অফিসের লোক নন? কি আশ্চর্য!

অপরোধটা যেন বিমানের। প্রায় পাশাপাশি, তবু এক নয়—একি বিশ্বাস।

বৃষ্টি কিছু খেদ ছিল মেয়েটির কণ্ঠস্বরে। তিন বছর হ'য়ে গেছে চাকরি-জীবনে। দাসঘে অনেক সময় অতিবাহিত।

যেন সাশ্বনা দিতে বিমান বললে, সিনিয়র হ'য়ে গেছেন অনেক! ভালই তো।

মেয়েটি কাগজ নিয়ে উঠে চলে গেল। নীরবে। আর কোন কথা হ'লো না।

তারপরও আর যে আলাপ, তা নেহাত-ই আটপৌরে—অফিসের কাজের কথা, কি বড়জোর বিখ্যাত কোন নেতার বক্তৃতার সারাস্বার্থের সমালোচনা। ট্রায়-বাসের ভিড়ের কথাও কিছু কিছু

কোনদিন। তেমন আর করেন না, গল্প কিছু হয় না। নিস্তরঙ্গ জলস্রোত যেন।

প্রায় একই সময়ের সহকর্মী অনন্ত। এইবার বৃষ্টি তার বদলী হবার সময় হ'য়েছে। ক'দিন ধরে খুব এদিক-ওদিক করে বেড়াচ্ছে। খবর নিচ্ছে বাইরের হাল-চাল সবধরনের। বিমানের কাছেও এল একদিন অফিসের পর।

বিমান বললে, চলে যাও, কোন ভাবনা নেই। আরামে থাকবে।

অনন্ত ভিজ্জেস করলে, কি অর্থে?

বিমান বললে, সব দিক থেকে, খাওয়া-পরা-থাকা। কিসে নয়!

অনন্ত কিস্ত-কিস্ত করলে, কিস্ত অফিস? তুনেচি—

বিমান বললে, চের ভাল। কাজের সঙ্গে সম্পর্ক, পাঁচটার পর এক মিনিটও থাকতে হয় না কারো মন জুগিয়ে।

ও তো কানপুরের কথা, আরো তো অনেক জায়গা আছে, সেখানে কি ব্যবস্থা কে জানে! অনন্তকে চিন্তিত মনে হয়। বিমান আশ্বাস দিলে, কোন ভাবনা নেই—সব এক।

তবুও চিন্তিতত্তর মুখে অনন্ত বললে, কলকাতার মতো নয়।

বিমান কৌতুকের স্বরে বললে, হাঁ, সেখানে এখনো মেয়ে আমদানী হয়নি।

অনন্ত মুখের দিকে চাইলে। মানে, বিমান এ কথা বলছে কেন। অনন্তকে তাই ভাবে নাকি। বেয়ে সহকর্মী না হ'লে কাজে হাত উঠবে না।

বিমানও মাথা নিচু করলে, কথাটা তার বলা উচিত হয়নি। সে যা ভাবে সে-ভাবনার কোন সমর্থন নেই আজকের দিনে। সহকর্মী-নিয়ে অত ভাববার কিছু নেই। মিছিমিছি!

অনন্ত বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠলো।

অপ্রস্তুতের মতো বিমানও হাসলে। পরস্পরের এ সন্দেহের কোন মানে নেই।

তারপর নিম্ন সোমের কথা যেন আর মনেই ছিল না। অনন্তকে ঠাঁটা করার পর হঠাৎ নিম্ন সোমের কথাটা মনে পড়ল বিমানের। একদিন অফিসে গিয়ে দেখা করবার কথা গিয়ে ছিল। নিশন যো থেকে নিম্ন সোমের অফিসটা খুব দূর নয়। ছুটির পর বিমান পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল। নিম্ন সোম বলেছিল, কাকের চাপে পাঁচটার পরেও সব দিন অফিসে থাকতে হয়। বড় কাকের চাপ 'মিউনিশন প্রোডাকশন' অফিসে। বাড়ি ফিরতে আটটা-বটা হয়ে যায় নাকি রোজ!

হাঁটা পথে শহরের নেশা ম-ম করে। গাড়ি আর মানুষের গাথাগামিতে পানপাত্রের গাঁজলা যেন উপছে উঠেছে। হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন কোনকিছুর আর তেমন আকর্ষণ থাকবে না। এই যে বিমান নিম্ন সোমের কথা ভেবে চলেছে, দেখা করার উদ্দেশ্যে মনের মধ্যে একটা আনন্দও বৃষ্টি বোধ করে, সেদিন তা আর থাকবে না! বিশেষভাবে কোনদিন নিম্ন সোমেরা মনেও আসবে না। কে জানে তা সুদিন, না দুদিন?

এইটুকু পথ আসতে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলে বিমান। পথের আলো জলে উঠলো। ভিড়ও ক্রমে ক্রমে কমলো।

কাঠানোটো ঠিক না থাকলে বৃষ্টি কলকাতাকে আর চেনাই যেত না!

এখন ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে অত বড় পাথরের বাড়িটা। ওপর-নিচে কোথায় কোথায় আলো জ্বলছে একটা ছটো। নিস্তরূপ বাড়িটার অন্ধকার প্রাকবে দাঁড়িয়ে হঠাৎ এ কথা মনে হওয়া বিচিত্র নয়, উপস্থিত বড়সাহেবরা অফিস করে' যাবার পর বিগত বড়সাহেবদের আত্মারা এসে অফিস করছেন আবার।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বিমানের গা-টা

ছমছম করে। অহেতুক কেমন একটা ভয়ও হয়। বোবা, নিলিপ্ত বাড়িটার আনাচে-কানাচে অনেক শব্দহীন অভিযোগ-অনুযোগ! ঐশ্বর্য কাকের সিঁড়ি কটা ভাঙতে বুকের খাস যেন বন্ধ হয়ে এল বিমানের।

সেই হলঘর! তাঁবু তুলে নিলে যুদ্ধক্ষেত্রের যেমন অবস্থা হয়—বাঁ বাঁ করছে। কোথায় নিম্ন সোম?

হলের আলো এখনো নেভেনি বটে, কিন্তু মনুষ্যবাসের কোন চিহ্ন নেই। নিম্ন সোম হয়তো আজ আগেই চলে গেছে। রোজই যে কাকের চাপ থাকবে তার মানে কি? আজ নিম্ন সোম ঠিক সময়ে ছুটি পেয়েছে।

চোখের ওপর আলোটা বৃষ্টি কোঁপে উঠলো। কে যেন কথা কইলে। নাম ধরে ডাকলে পাশ থেকে। বিমান স্পষ্ট করে চেয়ে দেখলে।

নিম্ন সোম হলঘরের এক কোণে টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে উঠে তাকে ডাকছে। শব্দটা বড় শ্রীণ, যেন অনেক দূর নদীপারের কাতর আত্মনা।

বিমান এগিয়ে এল। তখন কোনদিন মনে হয়নি, আজ মনে হচ্ছে হলঘরটা সত্যিই খুব বড় লম্বায় চওড়ায়। পা গুনলে অনেক পা।

বিমান বললে, এখনো একলা কাজ করতে আপনার ভয় করে না? জনমনিয়ি নেই!

নিম্ন সোম হাসলে, আমি তো আছি।

আশপাশে চেয়ে বিমান বললে, না, আপনার সাহস আছে!

ভেমনি হেসে নিম্ন সোম বললে, সাহসটা অভ্যাসের, অফিস করার মতো।

তারপর খানিক দ্বন্দ্বনে চূপ করে রইল। নিম্ন সোম ফাইল-পত্র গোছাতে লাগল।

আরো খানিক পরে ঘড়ির দিকে চেয়ে বিমান বললে, উঠবেন নাকি?

হঠাৎ খাতকে ওঠার মতো শোনাল নিম্ন সোমের উত্তরটা, আঃ, হাঁ।

বিমান অপ্রস্তুত হয়ে বললে, আপনার কাজে বাগড়া দিলাম। অহুবিধা হ'লো তো?

না না, আপনি আসবার আগে থেকেই উঠবো-উঠবো করছিলুম! নিম্ন সোন সাগ্রেহে বললে, চলুন—

বিমানের মনে হ'লো, জোর-কবে-আসা আলোর হঠাৎ জোর উল্কে দেওয়ার মতো নিম্ন সোম উজ্জল হ'য়ে উঠেছে।

কথাটা না জিজ্ঞাস করলেও হ'তো, তবু কেন যেন লোভ সামলাতে পারলে না বিমান। হল-ঘরের প্রান্তে এসে আলোর নিচে পাড়িয়ে জিজ্ঞাস করলে, আপনি লেট-আওয়ার্সে অফিসে থাকেন কেন? ভাল লাগে রোজ?

নিম্ন সোম উত্তর দিলে না। আগে-মাগে হলঘর থেকে বেরিয়ে এল।

দোতলার সিঁড়ির মাথায় এসে বিমান আবার জিজ্ঞাস করলে, কই, আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না তো নিম্ন সোম?

কাতর চোখ দুটো তুলে ধরে করুণ সুরে নিম্ন সোম বললে, কি উত্তর দেব বিমানবাবু, ভাল না লাগলেও ভাল লাগতে হয় যে!

কেন? চাকরি তো আরো সবাই করছে! প্রশ্নটা সময়োচিতও নয়, ভ্রমোচিতও নয়, কেমন

কাটকির মতো শোনায়। বলার সঙ্গে সঙ্গে বিমান তারি অপ্রস্তুত বোধ করে। হি-হি!

সিঁড়ির তলায় নেমে এসে অন্ধকারে পাড়িয়ে যেন মুখ পুকেয়েই নিম্ন সোম বললে, আর সবার কথা জানি না, এখন চাকরি ছাড়া আমার আর কিছু করবার নেই, বিমানবাবু! চাকরি গেলে কে দেখবে বস্তু?

অনেকদিনের কথাটা এমন সুযোগ পেয়েও বিমান বলতে পারলে না। অঙ্ককার যেন অট্টহাসি করলে।

পাশ ফিরে নিম্ন সোমের মুখের দিকে চাইবার আগে বিমানের মনে হ'লো, নিম্ন সোম হাত দিয়ে মুখ ঢেকেছে—হতাশায়, বেদনায় মুমুর্ষু পড়েছে 'মিউনিশন প্রোডাকশনের' নিম্ন সোম!

তাড়াতাড়ি হাত ধরে গেটের বাইরে আলোর সামনে এসে বিমান অবাক হয়ে গেল। নিম্ন সোম বুকি এতক্ষণ কৌসেছে, অনেক করেও চোখের কোলে অশ্রু সংবরণ করতে পারেনি।

আর প্রশ্ন করবার আগেই নিম্ন সোম মথেনে বললে, চাকরি করে-করে আমাদের 'চান' নষ্ট হ'য়ে গেছে। মারাজীবন এখন চাকরি-ই করতে হবে!

এর পর আর কোন প্রশ্নের কথা বিমান ভাবতে পারে না।





[শ্রীমদভগবদ্গীতা]

তখন পরের ভাবনা। একটা রাত্রি বটে, কিন্তু এটখানে পাড়িয়ে বসে রাত্রি কাটানোর বোধ হয় ব্যবস্থা নেই। অশ্রয় আবশ্যক। কিন্তু কোথায়? অকূল সমুদ্রের মধ্যে ঈতিহাসি তাকান—ভাসমান কোন গুহ কাণ্ড অসম্ভবপক্ষে। একটা লোক শুধু নাকি নিখরচার উপদেশ দান করে যান, অথ কিছু চাইনে।

টেলিকোন-ঘরে আনন্দ চুকে গেলেন। ঢেক সংস্কৃতি-দগুনের কেউবিটু এক ব্যক্তি—নাম ক্রাসা; তাঁর সঙ্গে চেনা আছে। ভারতে এসে ক্রাসা অনেকদিন ছিলেন, জলের মতো হিন্দি বলেন। তাঁকে ফোন করা হল: এসে পড়েছি মশায় আপনাদের দেশে। কি কাজে ক্রাসা বিঘন ব্যস্ত। ফোনের মুখেই, আনন্দ আনন্দ—করাছেন। পথের উপরে ঘনন, নিশ্চয় ট্রানজিট-হোটলে নিয়ে তুলবে। হোটলে গিয়ে মুখ-হাত ধুতে লাগুন, আমি আসছি।

আর এক বিপদ, উমা রাওয়ের পিপাসা পেয়ে গেল। ইয়োরোপের রেস্তোরাঁয় জল চেয়েছেন তো মনে মনে ভাববে, লোকটা অকৃত্রিম উজ্জ্বল। চাতকের মতো ফটিক-জল ফটিক-জল করে যতই গলা কাটান, কোন-কিছু কানে শুনে না। মদ চান, তবুণি এনে হাজির করবে। নিতান্ত পক্ষে নিম্নেরল ওয়টার। এরা কিন্তু সদাশয়, সাদামাঠা জল দিয়েই আতিথ্য করল। চা-কফি বা অল্প কিছু চেয়েছেন তো মূল্য নগণ চাই। ফেল কড়ি

মাখ তেল। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার কড়ি কোথায় পাচ্ছি আপাতত? ইয়োরোপ ঘুরতে এই বড় ক্যামাৎ। বিশ পা না যেতেই একটা করে দেশ শেষ হয়ে যাচ্ছে—তখন বের করে পাসপোর্ট-ভিসা, খোল বাস্ত-প্যাটার, বদলাও টাকা-পয়সা। পাউণ্ড বদলে ফ্রেন্সিন করব, তার লাঠা বিস্তর। তা ছাড়া সামান্য সফলের উপর হাত ঠেকাতেও চাইনে পাততপক্ষে।

নিমন্তক তরফের কেউ এসে পড়লে যে হত! তা হলে ভাবনা থাকত না। সাদা জল কেন, লাল হলধে তখন যত রকমের যে পরিমাণ খুশি। এবং পান করা বলে কি, হাত-পা মেলে সঁতার কাটবেন—টুপ করে ডুবেও মরতে পারবেন। চীন ও রাশিয়া ঘুরে এমনি ব্যাপার দেখে এসেছি। কিন্তু দোষ আনাদের—সঠিক তারিখ জানিয়ে খবর দেওয়া হয়নি। জর্নালিতে এসে পৌছবার কথা এপ্রিলের তৃতীয় সম্ভাষে, নে মাসের মাঝামাঝি এখন। ভক্তলোকেরা জানবেন কি করে যে ভাগ্যাকাশে এতকাল পরে আজ সম্ভাষ হঠাৎ সূর্যোদয় হয়েছে।

যাই হোক, জেনেছেন অবশেষে কেনন করে—বের্টে-বাটো এক জোয়ান পুরুষ উদর হলেন। জর্নন ভেমোক্রোটিক রিপাবলিক—সাদা কথায় যার নাম পূর্ব-জর্নন—সেই তরফেরই মানুষ বটে। কিন্তু আমরা ধাঁদের চাচ্ছি তাঁরা নন, আকাডেমির কেউ নন। প্রাগে ওদের কনসাল্টে আছে, সেখান থেকে পাঠিয়েছে ভিসার বন্দোবস্ত করে দেবার

জন্ত। দোরগোড়ায় এসে পড়েছি, এইবারে ভিসার হ'ল হল। পাচ-দশ বিন কিংবা পাচ-দশ ঘণ্টা আগে দিয়েও ভরসা করতে পারে না বৃষ্টি। তবু তো পেয়ারের অতিথি—নাওয়াত পাঠিয়ে এক কাঁড়ি টাকাপয়সা খরচ করে নিয়ে যাচ্ছে। কারগটা পরে বুকেছি। আপনারাও বুকেবেন। অবস্থা-গতিকে তখন আর দোষ ধরতে পারবেন না, করণা হবে। লোকটি এসে পাসপোর্টগুলো নিয়ে নিলেন : ভিসার সীলমোহর বসিয়ে সেই সেরে একুনি ফেরত এনে দিচ্ছি। হোটেল গিয়ে পৌঁছতেই হাতে-হাতে সমস্ত পেয়ে যাবেন।

শহর থেকে অনেকটা দূরে এরোডোম—সর্বত্র যেমন হয়ে থাকে। এই সম্রা থেকে পুরো একটা রাত্রি—আজ্ঞা শহরটা এক পাক ঘুরে দেখে এলে কেমন হয়? ট্যান্ডি করে যেতে হবে, কড়ির প্রয়োজন অতএব। বালিনের মাটিতে যতক্ষণ না পা পড়েছে, এয়ার-ইথিরা আমাদের মুক্খি। কিন্তু খানাপিনা দিচ্ছেন বলে ঘোরাঘুরির খরচাও বিতে যাবেন কেন তাঁরা? আনন্দ বললেন, চুলোয় থাকগে। এক পাউণ্ড করে বের করুন সকলে, ফোনিনে ভাঙিয়ে নিই।

টাকা ভাঙানোর ব্যাক আছে এরোডোম এলাকার ভিতরে—ভিনদেশী ঘাত্রীর যদি প্রয়োজনে লাগে। প্রবীণ এক ব্যক্তি কাউটার আগলানছেন। নোট ক'খানা নেড়েচড়ে দেখে প্রশ্ন করলেন, ভাঙাতে চান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সরকারি নয় উনিশ ফোনিন। আমরা কিন্তু ভাই দেবো।

এর উপরে কথা কি! নিশ্চিন্তে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। ভবলোক তবু ইতস্তত করেন। গলা নিচু করে হঠাৎ বলে উঠলেন, কেন খামোকা লোকমান দেবেন? বিদেশী লোক বদলেই বলছি। শহরে চলে যান, যে-কেউ বাট ফোনিন দেবে। যাচ্ছে কি জন্ত মরতে এসেছেন?

বাট আর উনিশ—কারাকটা বিস্তর। নোট সঙ্গে সঙ্গে পকেটে পুবেছি। মুশকিল হচ্ছে, শহরে গিয়ে পৌঁছলে তবে তো বাট। পৌঁছতেই তো ফোনিন লাগবে। এক ভরসা, ক্রাস! আসছেন। ধরে পড়ে তাঁর গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। শহরে পৌঁছলেই তো শাহান-সা—এক পাউণ্ডের ফোনিনে দু-পাকেট ভরতি।

এর পরে আবার যখন প্রাগে এসেছিলাম—সেই সময় টের পেলাম, ব্যাস্কের মামুষটি নিতান্ত বিনয়বশত বলেছিলেন বাট ফোনিন। আমি তো বটেই, চাপাচাপি করলে একশ' অবধি স্বাক্ষরে তোলা যায়। মোস্তাফিস্ট বেশে বিলাসবস্ত্র জোড়ানো যায়। মামুষ কিন্তু বারো মাস তিরিশ দিন শুধুমাত্র অত্যাবশ্যক ক'টি জিনিসে খুশি থাকে না; বে-দরকারি অপব্যয়ের ক্ষয়মন উসখুস করে। বিশেষ করে হাতে যখন বেদার ফোনিন—খরচ করে কুরানো যাচ্ছে না। অতএব বোজ নাও কালাবাজারের, জোগাড় করো স্টালি-পাউণ্ড যতই চড়া দাম হোক না।

বাইরে এসে চোখ জুড়িয়ে যায়। সর্ব্বত্র সমুদ্র। মরি মরি, কী কলস ফলেছে! একচোখো লক্ষীঠাকরুন এই তল্লাটে খ'পি উজাড় করে এনে জেলেছেন। এখানে জুটো ওখানে বা চারটে ঘর বসতি—সাগরের মাঝে মাঝে হীশের মতন। বাসে পুরে নিয়ে চলল ট্রানজিট-হোটলে। মার্চ ছাড়িয়ে এক বড় পাড়ার মধ্যে এসে পড়লাম। মামুষের একই হালচাল দেখি দুনিয়ার সর্বত্র—এক স্বভাব। আমার এই কলকাতার পাড়ায় কিংবা বারাসতে অথবা নববীপে যেমন দেখেন—প্রাগেও আলাদা কিছু নয়। রাস্তার ধারে খেলা করছে বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা, দরজা অল্প একটু ঝাঁক করে উকি দিয়ে দেখছে বাড়ির একটি মেয়ে।...আঁকা-বাঁকা গলিপথ বেয়ে এগুচ্ছে আমাদের বাস।

হোটলে এলাম। প্রোট এক ব্যক্তি—মহা

পণ্ডিত, পৃথিবীর তাবৎ ভাষায় দখলিকার। কথা-বার্তায় তাই তো মনে হল। ইংরেজি বলছে, ফরাসি বলছে, জার্মান বলছে। কণ্ঠটাও জানে—সেটা মুখে জানলে, বলে শোনাল না। বাহুতেও বিপুল শক্তি। আনাদের পাঁচজনের এই বড় বড় স্টুটকেন্স—গোটা তিনেক এ-হাতে, গোটা তিনেক ও-হাতে তুলে নিল—যেন তুলোর বাগিশ তুলে ধরেছে। ইয়োরোপ জায়গা—যার জিনিস সেই লোকেরই যথাসম্ভব হয়ে নেওয়ার নিয়ম। আমরা আহা-ওহো করে জিনিস শরতে যাই তো ভ্রুত এক ঘুরপাক দিয়ে হঠিয়ে দেয় সকলকে।

—মালপত্র ঘরে ঘরে রেখে আসি, কেনম?

সে-ই ভাল। লটবহর তালাবন্ধ থাকুক। হাত-মুখ ধুয়ে আমরা এমিকে চা-টা খেতে খেতে ক্রাস! এসে যাবেন—তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব।

—কাগজ দেখি।

কাগজ, কিসের কাগজ গো? এয়ার-ইন্ডিয়ার টাবে রয়েছি, যা-কিছু লিখবার তারাই লিখে দেবে। হোটেলের বাবতীর খরচা তাদের।

—কাগজ আনো নি, তবে আর কি করব!

হু-হাতের মালগুলো ডিবচাব কেলে দিল করিডরের উপর। যেতে যেতে আমরাও খনকে পাড়িয়ে গেছি।

—কি হল?

—আমি কি করব বলুন। দাম কে দিচ্ছে, আগে তার আধারা হওয়া চাই।

মুখের দিকে চেয়ে খানিকটা সময় ভাবে আবার কল, বিদেশের অতিথি—আজ্ঞা, এক কাপ করে চা খেয়ে নিল। শুধু চা। যায়, গজা যাবে। কিন্তু কাগজ না পেলে বর দিতে পারব না। সাক কথা। মালপত্রের এইখানে রইল।

চটনটে বলছি, দাম অল্প কেউ না দেয় আমরা রয়েছি। পাইও ভাড়া, উনিশ ফ্রেনিনই সই। ম্যানেজারকে ডাক, তাঁর সঙ্গে কথা বলি।

দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। ধপ করে একচেয়ারে

বসে পড়ে বলল, আমি—আমিই আপাতত ম্যানেজার। কি বলতে চান বলুন।

—একটা লোক দাও, এরোড্রোমে চলে যাক। কাগজ-টাগজ যা দরকার নিয়ে আনুক।

—ফালতু লোক কোথা? বলো তো আমিই যাই। তা হলে চা হবে না কিন্তু, চা দেবে কে তোমাদের?

আবার বলে, কোনে কথা বলো এরোড্রোমের সঙ্গে। তারাই লোক দিয়ে পাঠাক।

তাই হল। আনন্দ কোনে কথা বলছেন। কথা নয়, কলহ দস্তুরমতো। কাগজপত্রের দরকার—তা দিয়ে দাওনি কেন আনাদের সঙ্গে? কী রকম ব্যবস্থা তোমাদের?

কাজকর্মে ছুটাছুটির মধ্যে লোকটিও কান পেতে হু—এক কথা শুনেছে। কোন ছেড়ে দিতে কাছে এসে পাড়াল। সহানুভূতিতে গদগদ। বলে, ঠিকই তো! বিদেশী লোক—এত সব বায়না! কি করে জানবেন? আশুন আপনারা, চলে আশুন। ঘরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন। চায়ের টেবিল মাঝিয়ে বটী বাজিয়ে দেবো, তখন নিচে আসবেন।

—কাগজ?

তারা পাঠাবে, নয়তো আমিই আনিতে নেব। অতিথি মানুষ এত দূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন, আপনারা কেন ভোগান্তি হবে আমাদের দোষে?

সেই গম্ভাযন আবার বাড়ি তুলে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। পিছনে আমরা। পর পর ঘর দেখিয়ে দিচ্ছে।

আনন্দ বলে উঠলেন, এই প্রাণে আবার আসব দরকারি দাওয়াত নিয়ে। এক্ষণ এই পথে ফেলে রাখার শোধ তুলব সেইদিন।

মিরকে ও ক্রিসও দেখি উঠেছে এসে এখানে। ওদের কামেলা নেই, অনেক আগে তাই হোটেলে এসে গেছে। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম-স্বা নিয়ে বেরুচ্ছে এবারে। দেশের একেবারে গায়ে এসে পড়েছে, ছোটখাট আর একটি লক্ষের পথ, কাল সকালের

দ্রেনে বার্লিন পৌঁছতে এক ঘণ্টা মাত্র লাগবে।
ট্রেনেও যাওয়া চল—কিন্তু লাভ নেই, নিশিরায়ে
ট্রেনে চেপে সকালবেলা প্রায় একই সময় পৌঁছানো
যায়। কী পরকায়—নিশ্চিত উল্লাসে ওরা দুজনে
শহরের দিকে চলল। কেনাকাটা করবে কিছু,
সেখাওয়া করবে মাছুষজনের সঙ্গে।

আকাশ কখন মেঘে ঢেকে গেছে—শেঁ-শেঁ।
করে বাতাস ছাড়ল। তারপর বৃষ্টি। একটানা চলল
কতক্ষণ ধরে। খানাবার ডাক পড়েছে। একতলার
পরেও সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নিচে নামছি। যেন পাতাল-
রাজ্য। নামতে নামতে এই রকমই মনে হচ্ছে,
কিন্তু খানাবার গিয়ে জানলায় দেখছি—পৃথিবীর
উপরেই আছি বটে, এমন কি জমির লেবেলের বেশ
খানিকটা উপরেই। পাহাড়ের জায়গা—উঁচু টিলার
মাথায় হোটেল—টিলার একদিককার ঢালুর গায়ে
এই খানাবার। খাব কি—জানলা দিয়ে দূরবিস্তৃত
বাহেনিয়া-স্থির উঁচুনিচু সবুজ মৌলধর্ম দেখছি।
বৃষ্টিমাত্র শুষ্ক শুষ্ক চেহারা। ঘরবাড়িগুলো লাল
টালির টুপি পরে আছে মাথায়; বালা বর্ণপরিচয়ে
দীর্ঘ-উত্তে উল্লবাহুর ছবি দেখেছেন, বাড়িগুলো
তেননি এক এক চিমনির বাছ বাড়িয়ে দিয়েছে
আকাশমুখে।

সেই লোকটি হস্তদস্ত হয়ে খবর নিয়ে এলো :
ফ্রান্স কোন করলেন, এখন আসতে পারছেন না
তিনি। ভারি এক জরুরি কাজ নিয়ে পড়েছেন।
আসবেন ঠিকই—এসে পৌঁছতে বেশি রাত্রি হবে।

নিশ্চিত। শহরে যাওয়ার কোন আশা নেই।
ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে। বাঁচা গেল—
আরামের বিধানায় শুয়ে চোখ বুঁজে মনের আনন্দে
বৃষ্টির আগ্রাস্ত গুনিয়ে।

ভাল করে ভোর হয়নি—সাত-সকালে উঠে
পড়েছি। কাচের জানলায় ডবল-পরদা—পরদা
সরিয়ে দিয়ে লিখছি কাচের গায়ে বসে। লিখতে
লিখতে পাখির গানে মাথা তুলে ডাকাই। আবার

দেশের কোন চেনা পাখির কুজন নয়। কিন্তু ভারি
মিষ্টি শব্দ, কালোয়াতের মতন ইনিয়-বিনিয়
গাইছে। পাহাড় ধাপে ধাপে অনেকখানি উঁচু হয়ে
গেছে জানলার ঠিক বাইরে। বিস্তর ঘরবাড়ি—
পাকা দেওয়াল, টালির ছাউনি। একটা ঐ অদ্ভুত
ঘর—আগাগোড়া কাঠে বানানো, ছাদও কাঠের।
কী সবুজ চারিদিকে! আশেল ও কত বকন ফলের
গাছ। চেস্টনাট গাছগুলোর ডাল ভেঙে পড়ে
বুঁধি মাথা মাথা ফুলের ডারে। ইষৎ ভায়োলেট
বঙের ফুলে আঁকুর আর এক ধরনের গাছ
ঐ অজস্র। ঘাসের ভিতর পোকের আগ্রাস্ত।
ফসলের ক্ষেত দেখুন পাহাড়ের ঝাজে ঝাজে
চৌরস-করা কুমিত। মুরগী ডাকছে চারিদিক
থেকে। গাছের পাতা মড়ছে খুব—বাইরে অতএব
বাতাস উঠেছে, আটা-জানলার ঘরে বসে হাঁহর পাঙ্কি
না। মেঘলা আকাশ—গদাইলস্বর চাল মেঘপুঞ্জ
নড়াচড়া করছে, আজকেও বৃষ্টি হবে আবার।
কলকাতায় ঐষের আগুনে পুড়ে মরছিলান
—সেই ভগ্ন কড়াই থেকে একছুটে পাগিয়ে এসে
কাল রাতে হোটেলের খাটে লেপ নুড়ি দিয়ে
ঘুমিয়েছি।

মিথি করসা হয়েছে, মাছুষজন তবু তো এখনো
জাগল না। নিশ্চয় নির্জন। কত বেলায় এরা
ওঠে, কে জানে? খুব ঠাণ্ডা নিশ্চয় বাইরে।
আমার বোখবার উপায় নেই, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাপে
গরম-করা ঘর। যন্ত্রটা আমার টেবিলের পাশেই।
টেবিলের নিচটা অতিরিক্ত গরম—হুই পা তুলে
তাই উঁচু হয়ে বসছি মাঝে মাঝে চেয়ারের উপর।
এবাড়ি-ওবাড়ির চিমনির মুখে ক্রনশ ধোঁয়া দেখা
দিচ্ছে। অর্থাৎ জাগরণের লক্ষণ এককণ এইবার
—ঘরে ঘরে ঘরকরার শুরু।

বাস এসে হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়েছে।
এরোডোমে পৌঁছে দেবে আমাদের। একরাফি
বসবাসের ইতি। আবার আসব প্রাগে—এমন
রবানুত্তের মতো নয়। মালা নিয়ে সেদিন মারি

দিয়ে দাড়িয়ে থাকবে আমাদের খাতির করে ডাকবার জন্য।

নিচু হয়েছ প্লেন, বেগ কমেছে। কপালের সবুজ মাঠ—নদী-খালে ভরা। বালিনে নামলাম। এরোডোমের চেহারায় দেখছি আগাগোড়া নতুন করে বানানো। হবেই তো—বোমার ঘায়ে ছিল কি এখানে কিছু? বেড়ার ওধারে খানকয়েক হাত উঁচু হয়ে উঠল। অভ্যর্থনায় এসেছেন। সাক্ষ্যে চার-পাঁচজন হলেন। ছোট ব্যাপার—আমরাও এগিকে গোণাঙ্কণতি পাঁচজন। নেমস্তন্ন চারজন দেখকের—অতিরিক্ত একটি দেখকের স্ত্রী হিসাবে ফাউ হয়ে এসেছেন। মিরকে-ব্রিসও নামল আমাদের সঙ্গে। হাসিতে নিরঙ্কর কলমল করছে—উজ্জ্বল হয়ে বারখার শোনাচ্ছে, বাড়ি এলাম তাব সত্যি সত্যি? তাদেরই বেশখর আপন জাণা—অভিভাবক হয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলল।

বোমো উশে নানী ঔপছাদিক, একটা মাসিক কাগজও চালাল। জর্জন আকাসেমি অব আর্টসের সাহিত্য-বিভাগের সেক্রেটারি তিনি। ঐ সাহিত্য-বিভাগের নিমন্ত্রণে এসেছি আমরা। উশে মশায় এসেছেন খ্রীকে নিয়ে। আরও কে কে বেন। সেদিন কাজিকে চিনিমি, ঠিকঠাক তাই বলতে পারব না। হাজানা নিউতে চায় না—পাসপোর্ট-ভিসা কতজনে কতবার যে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখল! তবু তো নিজে থেকে আসিমি, ডেকেডুকে নিয়ে এসেছি। বীদের ডাকে এসেছি, ঔরাও সমরীরে স্রুধে হাজির। এতৎ সবেও এই ব্যাপার।

ছাড় পেয়ে একসময়ে অবশেষে বাইরে এলাম। ঘরবাড়ি করেকটা ছাড়িয়ে দিগ্‌ব্যাপ্ত মাঠ। প্রাণ জুড়াল, চোখ জুড়াল। কে বলবে, ঠিক এই উল্লাট জুড়ে প্রলয়ধর কাণ্ড চলেছে বারোটা বছর আগণেও। এবং ঘায়ের দাগ না মেলাতেই পায়তারা ভাঙা আবার শুরু হয়েছে। নিবাস নেওয়া কঠিন

হয়ে উঠছে ইয়োরোপের বাতাসে। ঠোঁটের ডগায় অহাস্তম নানা বুলি, কিন্তু নজর একটু খোলা রাখলে মনের কারসাজি ধরে ফেলবেন। পরম নিত্র বলে জানেন, গলা ধরাধরি করে ওঠা-বসা—মনে মনে ঔরাও গলা কটিবার ক্ষুর শানাজেন। কিন্তু মাঠের এই সবুজ ব্রিহত্তার মধ্যে মনের পাপের ছায়া পড়েনি। তাই বড় ভাল লাগল। এই জ্যৈষ্ঠমাসে বসন্ত পড়েছে মধ্য-ইয়োরোপে। রঙ-বেরঙের ফুল ফুটেছে, আরও ফুটি-ফুটি করছে। হলসে-হলসে ফুলে ভরে আছে নিক্প্রান্ত অবধি—আমার ভারতে পৌষমাসে খেমন সর্ষেফুল ফোটে। সর্ষেকেতই বটে—জিজ্ঞাসা করে জানলাম, রাইয়ের ফসল। এত সর্ষের ফলন, অথচ একটি কোঁটা। সর্ষের তেল পাবেন না সারা অঞ্চলে। এত রাই কি করে এরা বলুন দিকি?

এরোডোম থেকে বার্দিন শহর বিস্তর দূর। সর্ষত্র এনবি হয়ে থাকে; এখানে তো আরও হবে—রণশৈত্যের একনয়নের ঘাঁটি ছিল বালিন। দু-বানা নেটের ভাগ হয়ে যাচ্ছি—রাও, ব্রাও-জায়া ও আমি একটায়। ড্রাইভারের পাশের সিট আমার—সামনে বসে দেখাশোনা ও টুকে নেওয়ার সুবিধা। কাঁটা-তারে বেরা অনেকটা জায়গা নিয়ে এরোডোম—তার পাশ দিয়ে যাচ্ছি। বেড়ার কিনারা ধরে খাড়া খাড়া বিছাভের আলো—দিনমান হলও আলো জ্বলছে এখনো। আলোরা সারবলি দাড়িয়ে সীমানা পাহারা বিচ্ছে। এ দিকটা শেষ হল তো আলাদা এরোডোম আর একটা। নানান রকমের বিস্তর প্লেন; নড়াচড়া নেই—সকালের স্টীতে ত্রিপল যুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। এটা হল রুশীয় ঘাঁটি—এই যত প্লেন, সমস্ত সোবিয়েরের। লড়াই জিতে, দেখছেন, আলগে এখন চোখ পিটপিট করছে—আবার যদি এমন-তেনম কিছু বেধে যায়, চক্ষের পলকে ত্রিপলের ঢাকা বেড়ে ফেলে নিয়ে পাখা মেলে গজরাতে গজরাতে আকাশ ছেয়ে ফেলবে।

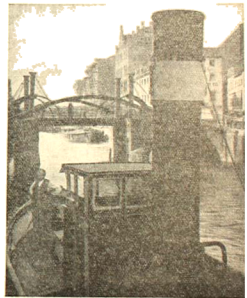
পটসডামের পথ ছেড়ে ডাইনে মুরলান বার্লিন-মুখে। তীর-চিহ্নে পথ দেখানো। পটসডাম মনে পড়ছে?—লড়াই জিতে রুশ-মার্কিন-ব্রিটিশ-ফ্রান্স যে জয়ধার্য বসে শলা-পরামর্শ করলেন, কি করা যায় ঠাণ্ডা হোড় এই জরনিকে নিয়ে। গোটা জরনি চার শক্তি বাটোয়ারা করে নিয়েছেন—এক করে নিয়ে এমনি ব্যবস্থা হোক, লড়াইয়ের ফলা কখনো আর তুলতে না পারে। কিন্তু লড়াইয়ের বিপদে এক হয়েছিলেন, লড়াই মিটেই যথার্থ আবার দুই বিরোধী দল। ফলে দুই জরনি হয়ে গেল। অমাদের এক দেশ ভারতবর্ষ যেমন দুই হয়ে গেছে। ব্যস্ত হবেন না—আসব ঐ পটসডামে। পটসডাম না ছুঁয়ে গেলে রক্ষে রাখবেন? আপাতত বার্লিন-মুখে—বার্লিন থেকেই নেমন্তন্ন আমাদের।

মাঠে হুঁড়ে চণ্ডা রাস্তা, হুঁধারে ছায়াময় গাছ। গাড়ি খেমে পড়ল এক জায়গায়। আরও কত গাড়ি জমেছে। পাসপোর্ট-ডিসা ও অফিস কাগজপত্র পরখ করছে পুলিশ। কতবার দেখবে রে বাপু, এখনি এই তো এরেজোনে হয়ে গেল। বেশির ভাগ মানুষই ডোক্তার-ফেরেকার, শরুপক্ষের চর—এই যেন মোটামুটি এরা ধরে নিয়েছে। গতিক বুকে দোষও দেওয়া যায় না। নিতান্তই ছেলেনাভূষ পুলিশ—ঝোঝা এঁটে কোনরকমে মানানসই হয়েছে। পাশপোর্ট মিলিয়ে দেখবার পর বিনয়ে জল হয়ে গিয়ে দীর্ঘ এক-এক সেলাম। ডাইভার স্থানীয় লোক—তা বলে তারও রেহাই নেই। পাসপোর্ট নয়, তার হল নিশানদিহি-কার্ড; কার্ডে কোটো সাঁটা। বার্লিন শহরে হুট করে ঢোকা-বেরুনা চলে না; আটেঘাটে কড়া পাহারা মোতায়েন। হরেক বায়নাকা। রথশাস্তির এই বারো বছর পরেও। উহঁ, কথাটা ঠিক হল না। শাস্তি আর হল কবে, লড়নেওয়ালারা এখনো তো পায়িতারা কহছে। এবং বিচিত্র নয়, সীমান্ত-বেঁধা এই বার্লিন থেকেই গওগোল আবার জমে উঠতে পারে। গা ছমছম করে। হু-দিকের মাঠে মাঠে

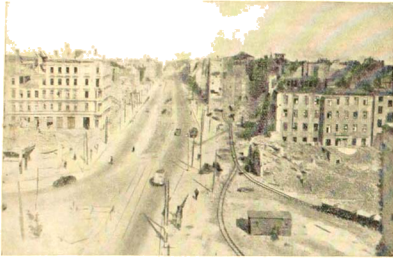
সবুজ ফসল মাথা তুলিয়ে আনলে লুটোপুটি খাচ্ছে—এর মধ্যে মানুষ তোমার এই আচরণ!

মাঠ ছাড়িয়ে পাড়ায় ঢুকলান। শহরতলির আরম্ভ বোধ হয়। কটা লোক জুটি নিয়ে ফিরছে। মনে হবে কাঠের নাভূষ। অথবা নাভূষ-পুতুল—খপখপ করে ঐ পা কেলছে লম্বাচণ্ডা পুতুল কটা। পাথরের পাশে পাথর বসিয়ে কতিন রাস্তা, নোটেরের চাকায় আর্ন্তনাদ উঠছে। অগণ্য নাভূষ নরে গিয়েছিল—বিদেশী নতুন সোবধের দেখে শহরের পুরনো শোক আবার যেন উথলে উঠেছে। লড়াইয়ের ভারী ভারী সরবরাহের জন্তই রাস্তা হয়তো এমন শক্ত করে বানিয়েছে।

এমনি কতক্ষণ ধরে চলা-আন, পথের আর শেষ নেই। তারপরে সস্তা শহরে এসে পড়েছি, হু-ধারে বাড়ি। বাড়ি ছাড়িয়ে আবার মাঠ। এমন কি জঙ্গল—যুদ্ধবন বা জরনি কোন জঙ্গলের ভিতর



শ্রী বী আন বার্লিন শহর পল্লবিন



যোষার বিলম্ব ক্রান্তকূটার-আলি (এখন স্টালিন-আলি) ।
 ছোট রেল ঘণ্টাঘের, রাস্তা ও বাড়ি নতুন করে বানানোর মানচিত্র আনবার দৃশ্য ।

বিয়ে পথ বানিয়ে দিয়েছে যেন । শহরের এলাকার মধ্যেই । এই এক বেওয়ার্জ দেখছি ইয়োরোপে । প্যারিস মতো শহরেও জঙ্গল জ্বিয়ে রেখেছে । ত্রাসেসলসেও ।

নদী পাওয়া গেল এবার—স্ত্রী । ছোট-বড় অগুপ্তি ফ্যাক্টরি নদীর ধারে ধারে । রাজধানীর এই পথের উপরেই শিল্প-রাষ্ট্র জন্মনির বানিকটা চেহারা পেয়ে যাচ্ছি । একে-কেক নদী ক্রমশ সফল হয়ে ঘন বসতির মধ্যে ঢুকে গেছে । নদীতে শহরে গলাগলি । কতবার পুল পার হলান, অবধি নেই । মাথার উপরে রেলগাড়ির পুল । বালিন শহরের মাথায় সোতলা-তেতলার সমান উচুতে রেল-লাইন, মাটির নিচে লাইন, ভূমিতলে প্রশস্ত পথে মোটর-গাড়ি ট্রাম ট্রলি-বাস তো আছেই । কত চড়বেন চতুর্ন-না ।

মাঝে মাঝে চমকে যাই । বীতংস ভয়াবহ দৃশ্য । রূপকথার রাকসে-খাওয়া এক এক পাড়া । তেরো বছর হতে চলল এখনো এই চেহারা ।

মাগুয়ের হিংস্রতা কি ভীষণ, বানিক বানিক তার নমুন । বাঘ-সিংহও নিশ্চয় মানুষের কাণ্ড দেখে লজ্জা পায় । নতুন বাড়ি বিস্তার গড়েছে—কিন্তু সে কত ? মনে করুন, গোটা কলকাতা শহর ধসে পড়েছে—কত কাল ধরে কত মানুষের পরিকল্পনায় কী অজস্র শ্রম ও অর্থব্যয়ে তৈরি, মাত্র তেরোটা বছরে কতটুকু ফের নতুন করে গড়ে তুলবেন ?

স্টালিন-আলি অর্থাৎ স্টালিনের নামের শড়ক । পূর্ব-বালিনের চৌরঙ্গি বলতে পারেন । আগের নাম ক্রান্তকূটার-আলি । রাস্তা ও রাস্তার ধারের ঘরবাড়ি ভেঙে তখনছ করেছিল, স্টালিনের নামে নতুন করে গড়েছে । যোজন-ব্যাপ্ত অট্টালিকা আকাশ হুঁড়ে হুঁড়ে লাইনবলি চলে গেছে । রাস্তা অতি চওড়া—ফুটপাথ যেন একটানা পার্ক । পাশ দিয়ে সাইকেল চলাচলের পথ । ইউ-লোহা-রাবিশ সরিয়ে গোটা পূর্ব-বালিন এমনি ভাবে গড়ে তোলাবার পরিকল্পনা । কত কাল লাগবে কে জানে ? আর যা গতিক দেখি ইয়োরোপের—বিপুল

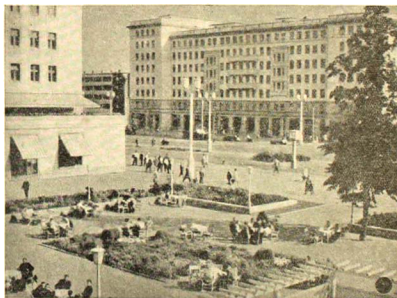
অধ্যবসারে যেমন এরা গড়ে তোলে, বিপুলতর বছর অত্বর এই তো হয়ে আসছে। সম্পদ নির্ভরতায় ভেঙে তেননি চুরনার করে। পনেরো-বিশ গড়ে তুলল কঠিন আয়াসে ; তারপরে আবার সমস্ত

ভেঙে চুরনার করে নররক্তের শ্রোত বউয়ে গোড়া থেকেই নতুন করে শুরু করে দেয়।

হিটলার কোন পায়ার থাকতেন ? চানসেরি কোথায়—হিটলারের রক্তক্ষয় আবাস ? পাতালের নিচে নিজের অভেদ ঘরবাড়ি বানিয়ে, নিঃশব্দে অস্ত্র দেশের ঘরবাড়ি ভেঙে বেড়াতেন। রাইফলটাগ ? রাইফ কি বলে, শব্দিত ভুবন এইতো সেদিন অবধি নিকঙ্ক-নিশ্বাসে কান পেতে থাকত। আমার বা-হাতের দিকে ডাইভার—ফণে ফণে সে হেসে ওঠে, আর দেবার ঘাড় নাড়ে। পিছন-সিটের বাও মুখ এগিয়ে কানের



যোশা বিল্ডিং স্ট্যান্ডার্ড-আগি স্ট্যান্ডার্ড-আগি নাম দিতে নতুন রূপে পড়ে উঠেছে।



স্ট্যান্ডার্ড-আগি এখানে। পার্কের এই ভাঙাঘর আরও অট্টালিকা ছিল ; যোশা বিল্ডিং স্ট্যান্ডার্ড-আগি নাম দিতে নতুন রূপে পড়ে উঠেছে।



হান্সের দশ বেলেনগেরের সঙ্গে মুক্তারাম হান্স ও লেখক

কাছে এনে বললেন, হিটলারের নাম মুখেও আনবেন না—বলুন, নাদির-সা। নাদির-সা কোন পাড়ায় থাকতেন, তাই জিজ্ঞাসা করুন।

ঘাড় কবিরিয়ে বোকার নতো তাকাই।

—কে জানে, কেমন মনের ভাব ওদের হিটলার সহ্যকে! ইংরেজি জানে না, কিন্তু নামটা শুনে কী আন্দাজ করে বসে ঠিক কি? কর্তাদের কাছে

গিয়ে লাগাবে হয়তো। যে রকম কড়াকড়ি, সামাল হয়ে চলাই ভাল।

রাওয়ের সন্দেহ আমারও ভিতর আরক্ত আন্তে চেপে বসে। এতক্ষণ দেখেছি ডাইভারকে—এখন ভিন্ন এক নজরে ডাকিয়ে দেখি। হাবাগবা ভাল-বাহুব, নিজ মনে গাড়ি চালায়—উঠেবা কিছু পেলে হেসে উঠছে হি-হি করে। বাতাসে আঙুল ঝুঁকে অবোধা একটা কথার পরে আর একটা কথা—হাতুড়ির এক ঘায়ের পরে আর এক ঘায়ের মতন—যেন পিটিয়ে পিটিয়ে আমাদের মস্তিকে বসাতে চায়। আমরা ইংরেজি এক কথা প্রশ্ন করলে প্রবল বেগে এবিক-ওদিক ঘাড় নাড়বে, হাত ঘোরাবে। অর্থাৎ কিছুই বুঝিনে বাপু। অথচ সে আমাদের বোকাবেই।

এখন ভাবনা হচ্ছে, ভানও হতে পারে ওটা। ডাইভার লোকটা জানে হয়তো ইংরেজি, আমাদের গুট কথাবার্তা শোনবার জন্য মতলব করে হাবা সেজেছে। দ্বিভ সামলাতে হবে অতএব; নাংসি কর্তাদের সম্পর্কে খুব একটা নিরাসক্ত ভাব দেখাতে হবে। সেদিনকার সেই সন্দেহ আজকে এখন ভাবতে গিয়ে হাসি পাচ্ছে। ডাইভারটির সঙ্গে তার পরে বিজ্ঞর জায়গায় ঘুরেছি—সত্যি, নিপাট ভালবাহুব। ভাল কে-ই বা নয়! হুনিয়ার ঘেনে বেশে সামান্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে কত মোলাকাত হল, ভাল বই মল বাহুব পেলান না একটি। বাহুব কী মন্দর, ভাবতে গিয়ে অবাধ হতে হয়। ভাবতেই থাকি, কলম আমার শুক হয়ে যায়। কী কাণ্ড, নন্দরা যেন গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়ে আমায় দেখতে পোয়।

প্রথম-মহাযুদ্ধের নেতা কাইজার উইলহেলমিনের নামে রাজপথ। তার পরে একটা পথ কার্ল মার্কসের নামে। কার্ল মার্কস জর্মনির বাহুব—তার নাম নিয়ে দেহাক দেখানো বিচিত্র নয়। তবু কিন্তু ক'বছর আগেও এই বিদ্রোহী কলকে পেতেন না। সাম্যবাদী পূর্ব-জর্মনি পথে পার্কে শহরে

বাজারে হালফিল এখন এঁদের নান বসিয়ে দিচ্ছে। মার্কস-এঙ্গেলস পার্ক—খোলামেলা। অনেকটা জায়গা, এক পাশে গ্যালারি। বোনার গুঁতোয় বিজ্ঞি-পাড়ার মধ্যে এমনি পার্ক সম্ভব হয়েছে। বিশ্বের ঐতিহাসিক বাড়ি গুঁড়ো-গুঁড়ো হল। লড়াই অস্ত্রে বিচার-বিবেচনা করে দেখা গেল, মেরামতের অবস্থা নেই। ইট-লোহা-রাবিশ সরিয়ে অস্ত্রএব বানাও শুধানে পার্ক। বার্ষিক উৎসব হয় এই পার্কে; মিছিলের পর মিছিল চলে। বার্ষিক উৎসবের মিছিল যেমনধারা স্বচক্ষে দেখে এসেছি পিকিনের স্থাননা পার্কে, মস্তোর রেড-স্কোয়ারে। নধ্য-এসিয়ার দেশে দেশে এমনি ব্যবস্থা; পূর্ব-ইয়োরোপেও দেখি ঠিক তাই। সকল সাম্যবাদী দেশেই উৎসবের চেহারা অবিকল এক—যেন ছকে কেলে বানানো।

সবচেয়ে বনেদি প্যাডায় পৌঁছে গেছি এতক্ষণে। হিঙেনবার্গ হিটলার গোয়েরিগ গোয়েবল্‌স—মনে পড়ছে তো নামগুলো!—গা শিউরে ওঠে কিনা

বলুন—ঘাবতীয় নাতকরের ঘরবাড়ি ছেলেপুলে অফিস-কাছারি ছিল এই দিকটায়। মেদিনের দায়িক সনোহো—আর দেখুন তাকিয়ে, খা-খা করছে শ্মশানহুনি চতুর্দিকে। পবিক কটিও যেন মরে গিয়ে হাঁটছে কুটপাথের উপর। ভয় করবে এই প্যাডায় অনেক জায়গায় আপনার একা একা ঘুরতে। রাইখস্টাগ—পার্লামেন্টের সেই বাড়িতে দেখছেন চামচিকের বাস। রাবিশ গাদা হয়ে আছে এদিকে-সেদিকে। চামড়া খুলে গিয়ে যেন কন্ডাল বেরিয়ে আছে বাড়ির সর্বান্তে। দেখুন, ছবিত্তে দেখুন। আর ভাবুন সেই পনেরো-ষোল বছর আগেকার দিনগুলো। এক একটা অধিবেশন বসে, আর বুক দুরু-দুরু করে বিশ্বহুবনের। কী না জানি গর্জন উঠবে ঐ জায়গা থেকে। ঐশান থেকেই সর্বময় ডিস্টেটর করে দিয়েছিল হিটলারকে—সবগুলো ভোট তাঁর দিকে, একটা শুধু বিরুদ্ধে। আজকে দিনহুপুরেও কেউ পা ফেলেনা, চোখ তুলে ওদিকে তাকাত্তেও ভয় হয়।



রাইখস্টাগ—পার্লামেন্টের সেই বাড়িতে প্যায় চামচিকের বাস। চামড়া খুলে গিয়ে যেন কন্ডাল বেরিয়ে আছে বাড়ির সর্বান্তে।

হোটেলের উঠানের উপর গাড়ি এসে উঠল।
মস্তবড় উঠান—এবারে-এবারে বড়বেরঙের নরমুখি
ফুল ও পাঁচ-দশ খাড়। চরাভীর্ণ বাড়ির উপরে
কিঞ্চিৎ রংঃ হয়েছে। আরও উৎকট চেহারা
সেইজগৎ। বলি-বিসীর্ণ মুখের উপর যেন গোলাপি
পাউডার ঘষেছে। নাম শুনবেন হোটেলের ?
হোটেল এডলন এবং রেস্টোরাঁ। হ্যাঁ, সেই—চনক
লাগবার কথাই। লড়াইয়ের আগে বাগিনের মধ্যে
সবচেয়ে বড় ও বনেদি হোটেল—সারা ইয়োরোপের
মধ্যেও পয়সা সারির একটি। সাংঘাতিক খরচা—
ঘনী-অভিজ্ঞাতদের ভারী ভারী ট্যাংক দশ-পাঁচদিনে
কাঁকা হয়ে যেত। এই হোটেল নিয়েই ভিকি বামের
বিখ্যাত উপজ্ঞাস—‘গ্রাও হোটেল’। লড়াই যখন
খতম হয়ে এল, বিজয়ী দল যত অত্যাচারের শোধ
তুলে নিচ্ছে বাগিনে—বিশেষ করে হিটলারের এই
পাড়াতার উপর। হোটেল-বাড়ির মাথায় সরাসরি
বোমা পড়েছিল। মূল বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। সেখানে
এক প্রশস্ত উঠান, কিছু সবুজ ঘাস ও রঙিন ফুল।
চার-পাঁচ তলা ভাঙাচোরা একটা অংশ খাড়া দাঁড়িয়ে
এখনো—ভাঙা কংক্রিট আর উলঙ্গ লোহালকড় ;
হাঁ করে আছে দরজা-জানলার অগণ্য কোকরগুলো।
পিছন দিককার একটা সারি টিকে আছে কোন
গতিকে—শ-চারেক মাত্র কানরা। এই নিয়ে বছর
দুই আগে হোটেল আবার নতুন করে চালু করেছে।

দোতলার একটা ঘরে আমি, আর এক ঘরে
আনন্দ। আর তিনজন ভেতলায়। ভয় করে,
হোটেল-মানেনজারের কাছে যত এই সব গল্প
শুনছি। হাজারখানেক মাহুষ মরেছিল শুধুমাত্র
এই হোটেলের চৌহদ্দির ভিতরে। এ-ভায়গায়
পাঁচ-শ মরেছে, ঐ ভায়গায় সাত-শ, ঐ রাস্তায়
দু-হাজার। খুব কম করে বলল তো এক-শ।
শয়ের নিচে হিসাব নেই। তাই দেখুন, মাহুষ
একবারে মশা-পিঁপড়ের সামিল লড়াইবাজ
ইয়োরোপে ; কাপুরুষ ব্যক্তি আমরা, আঙুল
কেটে দশ কৌটা রক্ত করলে আংকে উঠি—এই
বীরপুরুষদের দেশে আমাদের কী অবস্থা হয়,
আন্দাজ করুন। সন্ধ্যার পরে অফলটা একেবারে
ধমধমে হয়ে যায়। ধপধপ করে দু-পাঁচজন
চলে ফিরে বেড়ায় কুটপাথ ঘরে। মড়াগুলো ঘেন
ভাঙা অট্টালিকার লোহা-ইটের ভূপের নিচে থেকে
বেরিয়ে এসেছে। একদিন রাতে খুব বাতাস
উঠল। জানলা ভাল করে বন্ধ হয়নি। ঘুমের
মধ্যে শুনি ঠকঠক করে কপাটে বা দিচ্ছে কারা
যেন। ধড়মড়িয়ে উঠে বসি। আমার কি মনে
হল জানেন, বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-
সাদাপ করতে হোটেলের সেই একহাজার মরা
মাহুষ রাতছপুরে জানলার পথে পিলপিল করে
উঠে আসছে।

[বহনঃ]



কলহ

জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী ইংল্যান্ডে ক্যাল ইন্ডিনিয়ার। জার্মানির ডিগ্রী আছে। কনগ্রেসালিস স্ট্রীটে বোতামে আছে। পুস্তকস্রা হয়নি। সুকিয়া স্ট্রীটের কাছে দোতলায় কয়েকটি ঘর নিয়ে খানো-ড্রীতে থাকেন। স্ত্রী সুলতা সুন্দরী। বি.এ. পাস। ছাত্রদের সাহিত্য-আলোচনা ও সঙ্গীত-সাধনা করেই অবসর সময় কাটে। বীরেনের মুখে জার্মানী কবিতার আকর্ষণ তখনই সুলতার ভালোই লাগে।

অক্ষয় বোস কর্পোরেশনে চাকরি করে। প্রায়ই বীরেনের বাড়িতে যায়। পারিবারিক বন্ধু। সাহিত্য-রসিকও। তিনজনে সাহিত্যের নানা বিষয়ে আলোচনা করে বহু সম্ভা একত্র কাটায়।

অক্ষয় ও সুলতা এককালে পাশাপাশি বাড়িতে থাকত। স্বাভাবিকভাবে প্রণয়ও হয়েছিল। কিন্তু জাতের পার্থক্য থাকতে সুলতার পিতা রাজী হননি। অতএব বিবাহ হয়নি। বীরেন তখন সম্ভ জার্মানি-প্রত্যাগত ইন্ডিনিয়ার। সুলতার পিতা তার হাতে কন্যাকে দিয়ে নির্ভরকে ভাগ্যবান মনে করেছিলেন। পণও প্রচুর দিয়েছিলেন।

তারপর বিশ বৎসর কেটে গেছে। সুলতার পিতার মৃত্যু হয়েছে। সমাজের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সামাজিক বাধাগুলো আর তেমন ভয়ঙ্কর নয়। কিন্তু যা হবার তা হয়েই গেছে। এখন আর ভেরানো যায় না। সুলতাও আস্তে আস্তে বিবাহিত জীবনে খানার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কিন্তু সময় সময় যেন কৃত্রিমকণ্ঠ হয়ে যায়। তখন সারাজীবনের ব্যর্থতা ও আলা বেন একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায়। সুলতা কিছুতেই মাঝমাঝে পারেনা নির্ভরকে। তার সব শিক্ষা-বীক্ষা কোথায় যেন ডলিয়ে যায়।

গ্রীষ্ম অতীত জীবন বীরেনের অজান্তে ছিল না।

কিন্তু জার্মানি-প্রত্যাগত বীরেন সে নিয়ে রসিকতাই করত শুধু। নির্মল রসিকতা। এতটুকু আলা প্রকাশ পেত না কোথাও।

অক্ষয় একদিন বন্ধুর লেখা নাটক দেখতে গিয়েছিল। ভালো লেগেছিল তার। তার জীবনের ছায়া তাতে বোল খান। সুলতার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনাও করেছিল। বীরেনকেও বলেছিল। বীরেন বলেছিল—আচ্ছা, যাবো কাল।

পরের দিন—থিয়েটার ভেঙেছে। অক্ষয় নাট্য-কারের সামনে বীরেনকে এনে বললে—ওহে, ইনিই আমার বন্ধু। তোনার নাটক দেখতে এঁকেই এনেছিলেন আজ।

নাট্যকার চেয়ে বেশল—স্ত্রানবর্ণ, শীর্ণকায়, সাদা কুল-প্যান্ট, সাদা হাত-শাট পরিহিত একজন অকালক্রোড় তার নিকে তাকিয়ে আছেন। চুলে পাক ধরেছে। চোখ দুটো মিশ্রিত। থিয়েটার দেখতে আসার পোশাক নয়। প্রসাধনের পালিশও কোথাও নেই। মনে হল, অক্ষয় তাকে লোকান থেকে সম্ভ তুলে এনেছে যেন। অক্ষয় সুশুদ্ধ। তার সুসজ্জিত। তার উজ্জল ব্যক্তিত্বের কাছে তার বন্ধুকে বিশেষ গ্লান মনে হতে লাগল।

নাট্যকার নমস্কার করলেন; বীরেনও নমস্কার করলে। অক্ষয় বললে—ইনি একটু আলোচনা করতে চান তোনার নাটক সহৃদে। এখানে তো সুবিধে হবে না। ইনি আবার একটু সাহিত্যিকও। গোটে-শিল্প-এর পূর্ণন ভক্ত। এঁর মুখে জার্মান কবিতা শোনো যদি—

হঠাৎ অক্ষয় বাহুতে প্রবল চাপ খেল। সংযত হয়ে বললে—ঠ্যা, তোমার যদি অসুবিধে না হয়, ইনি তোমায় কাল সকালে চা খেতে বলতে চান। চা খাওয়াও হবে, আলোচনাও হবে। কি বল ?

বলা বাহুল্য, নাট্যকার আনন্দিতই হল। অক্ষয় বললে—তুমি সকালবেলা আমার ওখানে চলে এসো। আমি নিয়ে যাব সঙ্গে করে। আমার বাড়ি থেকে খুব কাছেরই।

পরদিন সকাল দশটা হয়ে একটা গলি ভাঙতেই কিছুদূর পর একটা বাড়ির সামনে এসে অক্ষয় বললে—এট যে। এই বাড়ি। দোতলায় যেতে হবে। দোতলাতেই ওঁরা থাকেন।

—ওঁরা? ওঁরাটি আবার কে হে?

—কেন, ওঁর স্ত্রী আর উনি।

—ওঁর স্ত্রীর সঙ্গেও ব্যাক্যলাপ করতে হবে নাকি?

—নিশ্চয়।

—এসব তো বলনি কিছু?

—এর আর বলাবলির কি আছে। ওঁর স্ত্রীও একজন সাহিত্যিক। চলো, আলোচনা করে যুখ পাবে। নাটকের বিষয় বলেছি। ওঁরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। নাও, ওঁরা। সিঁড়ি ভাঙে।

নাট্যকার প্রথমে, তারপর অক্ষয় সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। দোতলায় সিঁড়ির পাশে একটা ছোট বসবার ঘর ছিল। কিন্তু নাট্যকার তাতে না ঢুকে সোজা বারান্দাতেই উঠে পড়ল। লম্বা বারান্দা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মূল্যবান ফার্নিচার আছে। দূরে একটা টেবিলের পাশে একটা স্বাস্থ্যবতী মহিলা বসে। খুবই সুন্দরী। কিন্তু মাথায় কাপড় নেই। প্রসাধনও নেই। সজ্জিতও নন। আটপোরে খাড়িই একখানা পরনে। চোখছোটো বড়-বড়। কিন্তু জ্বলছে যেন। নাট্যকারকে দেখলেন, কিন্তু এতটুকু ভাব-পরিবর্তন হল না। নড়লেনও না। উঠলেনও না। কোন কথাও বললেন না। যেন সম্পূর্ণ আত্মবিস্তৃত তিনি। অক্ষয়ও তাঁর মুখ থেকে তিনবার, অতি সংক্লিপ্ত অথচ অতি ভীষণ ভিনটি কথা বেরিয়ে এল : সরে যা—সরে যা—সরে যা! তারপর ক্রোড়া স্বপ্নানীর মতো তিনি কোম-কোম করে নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। কে সরবে?

কাকে বলছেন? নাট্যকার অবাক হয়ে গেল। একি অজানতে স্বামী-স্ত্রীর স্বগভীর মধো তারা উপস্থিত হয়েছে নাকি? আর একি স্বগভীর! একি ভাব! এরা মজিত-কচি সংস্কারের বড়াই-করা পরিবার না? নাট্যকার পশ্চিমে থাকে। তার অবস্থা দেখবার মতো।

অক্ষয় একটু পেছনেই ছিল, সেও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। একি কাণ্ড! নাট্যকারকে তাড়াহাড়ি বা পাশের ছোট ঘরটিতে ঢুকিয়ে দিয়ে মহিলাটির দিকে অগ্রসর হল। নাট্যকার ঘরটিতে এসে বিমূঢ়ের মতো একটা সোফায় বসে পড়ল।

ছোট ঘরটিকে সুসজ্জিতই বলা যেতে পারে। দূরে একটা রেডিও। কোণে একটা টেলিফোন।

নেপথ্যে বারান্দার অক্ষয় আর ঐ মহিলাটির চাপা কথাবার্তা নাট্যকারের কানে আসতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের আর-একটা ঘর থেকে ইঁদুরন করে চায়ের কাপে চামচ নাড়ার শব্দও আসতে লাগল।

একটু পরে অক্ষয় কিরে এসে বললে—আর বলা কেন? এমন লোক যে, তোমার আসার কথা বলেনইনি কিছু বাড়িতে।

—কেন? বললে নাট্যকার আশ্চর্য হয়ে।

অক্ষয় রাগতন্তরে বললে—কি জানি কেন? কাল থিয়েটার থেকে ফেরবার পর থেকেই স্বগভীর চলছে। বলবার সময় কোথায়? ওঁর স্ত্রী জানতেনই না যে তুমি নাট্যকার। তোমাকে দোকানেরই কেউ ডেকেছিলেন। আমাকেও দেখেননি। আমি একটু পেছিয়ে পড়েছিলাম তো? সব শুনে লজ্জায় মরেন আর কি!

নাট্যকার চুপ করে রইল।

এই সময় হু-কাপ চা হাতে জার্নালির ডিএ-পাওরা ইঞ্জিনিয়ারটি আকর্ষণ-বিস্তৃত হাসি হেসে হাজির হলেন। খোপ-হরতাল সাধা পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরনে। দাড়ি-কামানো চকচকে মুখ। এই যে, আশুন— বলে এক কাপ চা এগিয়ে

হিলেন নাট্যকারের দিকে। নিজেই তত্বনি অলঙ্কার
হলেন। আর এক কাপ চা হাতে আবার এলেন।
একটা রেটে করে কেক-বিধুট নিয়ে এলেন।
আপন নমেন্ট বললেন—চাকরটা পাগিয়েছে।
তারপর বারান্দার দিকে চেয়ে বললেন—আমুন
অক্ষয়বাবু, এখানে। আপনাতঃ চা-ও এনেছি।

তিনজন নিঃশব্দে চা খেতে লাগল। চট্টাং
কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেছে। সকলে
একবারে চুপ। কালও মুখে কথা ফোটে না
আর। সকলেই অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করতে
লাগল। নিম্নকৃতি ক্রমশঃ এতটাই বেশমানসিক
হয়ে উঠল যে, অক্ষয় তা ভাওয়ার জন্মেই যেন
বলে উঠল—আমার একটা টেলিফোন করবার
দরকার ছিল। করব?

—নিশ্চয়। ওই যে। করুন না।— বলে
ধীরে টেলিফোনের টিবিলাটা দেখিয়ে দিল।

অক্ষয় টেলিফোন করতে লাগল। ধীরে

নাট্যকারের দৃষ্টি এড়বার জন্মেই যেন তার
টেলিফোন-করা। তেড়ে তেড়ে দেখতে লাগল।
—ওট-য়ে ওখানেই তাইবেইবি। ওট-য়ে পাশেই
হয়েছে।—ইত্যাদি অনাব্যাক্যীয় কথাও বলাতে
লাগল। অগ্রহায়ণের একশেষ হয়ে গেছে বেচারা!

টেলিফোন করা হয়ে গেল। চা খাওয়াও হয়ে
গেল। পুতুমামী বিনয় করে বললেন—আর একটু
চা দেব আপনাকে? নাট্যকারও বিনয় করে বললে
না, দরকার নেই। ধজবাল।

তারপর আবার কিছুকণ নীদবরণ। অতঃপর
নাট্যকার বললে—এবার তাড়ালে উঠি। পুতুমামী
চুপ করে রইলেন। নাট্যকার অক্ষয়ের দিকে
তাকাল। সে মাথা হেলিয়ে সাই দিল। নাট্যকার
উঠে পাড়াল। অক্ষয়ও উঠে পাড়াল। হুতনে
সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। নটক-আলোচনাও
হল না; জার্মান কবিতার আদর্শিতও শোনা
হল না।



PHONE • B.B.1717

GRAM • CALOPTICO

আমার চক্ষু আমার জীবিতোহন
একবার চকু পরীক্ষা করাব না কেন?



ক্যান্টকাটা অপটিক্যাল

কো: প্রাইভেট লিমিটেড

প্রতিষ্ঠান-জা: কার্তিক চন্দ্র বসু এম.বি.

৪৭, আমবাফ্ট স্ট্রীট • কলিকাতা-৯

রূপমাগর

দুর্যোধন যোদ্ধা

[পূর্বপ্রকাশিত নয়]

বিকালের আলো যখন রঙীন হয়ে এসেছে, কালিকাপুরের শালবনের উপরে উজ্জ্বল পাখিগুলিকে যখন রঙীন আলোর উজ্জ্বল ফুলের কাঁক বলে মনে হয়, তখন কালিকা নাইনস-এর ন্যানেজার নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের ফটকের কাছে কণ্টাক্টর চৌহানের গাড়িও হঠাৎ করে হঠাৎ এসে থামিয়ে পড়ে আর থেমে যায়।

গাড়ি থেকে নামেনা হুন্সন। গাড়ির ভিতরে চুপ করে বসে, নিজেরই হুট চোখের বিদ্যুতের আলো জোর করে চোখেরই উপর স্থগিত করে রেখে নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের বারান্দার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বারান্দায় কেউ নেই। বারান্দার গা-বেঁধা প্রধান ঘরের দরজায় যে পর্দাটা ক্রকুর করে উড়ছে, সেই পর্দার দিকে চোখ পড়তেই হুন্সনের হুঁচোখের আলানন্দ চাহনিতে একটা নতুন হাসির শিহর লাগে। হুন্সনের চোখের দৃষ্টিটাও যেন একটা হিংস্র কৌতুকের আবেগে ক্রকুর করে উড়তে থাকে। লাল ভেলভেটের চটি-পরা এক জোড়া পা, আর লালচে মেঝের মত রঙের একটা সিন্ধের শাড়ির আঁচল দেখা যায়। কালিকা নাইনস-এর ন্যানেজার নিশীথ রায়ের ছীবনের নীড়ে নব-বিহগীর আবির্ভাব; নতুন সুখের রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে সেই নীড়।

—আর একবার হর্ন বাজাও, ডাইভার! আনমনার মত অপলক চোখ নিয়ে নিশীথ রায়ের কোয়ার্টারের সেই ঘরের ভিতরের রঙীন আবির্ভাবের

ছায়ার দিকে তাকিয়ে ডাইভারের সঙ্গে কথা বলে হুন্সন। ডাইভার আবার হর্ন বাজায়।

কণ্টাক্টর চৌহানের এই গাড়ির হর্নের শব্দ চিনতে নিশীথ রায়ের পক্ষে একটুও অসম্ভব নয়; বৃষ্টিতে এক মুহূর্তও দেরি করবার কথা নয়। জানে হুন্সন, এবং হুন্সনের ব্লকের ভিতরের আক্রোশটাও আশায় ছটফট করছে, এই মুহূর্তে চমকে উঠবে আর ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দার উপর পাড়াবে নিশীথ রায়; আর, এক জোড়া ভীত ও কণ্ঠ চোখের দৃষ্টি তুলে অসহায়ের মত এই গাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকবে।

তারপর আর কতক্ষণই বা চুপ করে পাড়িয়ে থাকতে পারবে নিশীথ রায়? আস্ত আস্তে, ঐ ভীকতারই ভাবে অতিষ্ঠ হয়ে হুন্সনের এই দুই চোখের চাহনির কাছে এগিয়ে এসে পাড়াতে হবে। হুন্সন বলবে—চল, বেড়িয়ে আসি। এখনই চল। ওজর আপত্তি মনেতে চাই না। এখনই যেতে হবে। হুন্সনের সেই আহ্বান অস্বীকার করতে পারবে কি নিশীথ রায়? সাধ্য হবে কি?

হুন্সনের কল্পনার ভাষাগুলিই যেন নীরবে হেসে ওঠে। রুমাল তুলে দুই ঠোঁটের অদ্ভুত এক ধরনের হাসির কাঁপুনি চেপে রাখতে চেষ্টা করে হুন্সন।

নিশীথকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাওয়া যায়? রূপমাগর নামে সেই সেকেলের ইতিহাসের ছোট পুকুরটা বেশি দূর নয়। বড় বড় তালের ছায়ায় রূপমাগরের কিনারার সেই নির্জন নিভৃতের অনেক জায়গা এখনও নরন ঘাসে ছেয়ে রয়েছে। সেই নিভৃতের আবেশন ফুলে বাবার সাধিা হবে কি এই

নিশীথ রায়ের ? সেখানে গিয়ে আজও এই মুহূর্তে নিশীথ রায়ের হাত ধরে যদি সুনয়না, তবে নিশীথ রায়ের চোখ ছোটো সুনয়নার মুখের দিকে পাগলের মত না তাকিয়ে থাকতে পারবে কি ?

থাক রূপসাগরের ছায়াময় নির্জনতা আর নিভৃত। কালিকাপুরের শালবনের কিনারা ধরে এগিয়ে যেয়ে লালমাটির কাঁচা সড়ক যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে কালো চিপির মত ছোটো পাহাড়ের যে-কোন একটা পাথরের উপরে বসে, সূর্যাস্তের শেষ আভার দিকে তাকিয়ে নিশীথ রায়কে যদি প্রশ্ন করা যায়—কি ইচ্ছে করছে, নিশীথ ? আমার কাছ থেকে এখনই উঠে যেতে চাও ? এখনি ঘরে ফিরতে মন চাইছে ? আনি বলছি, না, বেও না।

চলে যেতে সাধ্যি হবে কি নিশীথ রায়ের ? আবার মুখের উপর রূমাল বুলিয়ে যেন একটা হাসির আলা মুহূর্তে থাকে সুনয়না। পৃথিবীর যে-কোন মানুষ বিয়ে করুক, কিন্তু তুমি বিয়ে করলে কেন নিশীথ রায় ? নিজেকেই চিনতে আর বুঝতে জুল করলে কেন ? বিশ্বাস করলে না কেন যে, তুমিও জুবে গিয়েছ ? সুনয়না বোস তোনার সেই ভুবন্ত্র জীবনের সঙ্গিনী।

না, রূপসাগর নামে পুকুরটার কিনারাতে নয় : শালবনের শেষের সেই ছোট পাহাড়ের পাথরের উপরেও নয় ; আজ নিশীথ রায়কে তার এই মিথ্যা বেলাঘরের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে একেবারে গালুড়িতে চলে গেলেই ভাল। গালুড়ির বাড়ির বারান্দার উপরে সেই বেতের চেয়ারের উপর বসে সুনয়নার হাতের যন্ত্র আর আগ্রহের ছোয়া দিয়ে তৈরী এক পেয়াল। চা খেয়ে নিক নিশীথ ; দেওয়ার ছায়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকুক। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকা পঙ্ক গালুড়ির রাস্তাঘাটের মাঠ। ঘরের আলো ঝলে উঠুক। সুনয়না বোসের মুখটা ভাল ক'রে নিশীথ রায়ের চোখে পড়ুক। তারপর দেখা যাক, আজকের রাত শেষ না হবার আগে কি ক'রে কালিকাপুরে ফিরে আসতে পারে নিশীথ রায় ?

সুনয়না বোসের কল্পনা এইবার একটা প্রতিজ্ঞার মত যেন নিরেট কঠোর আর নির্মম হয়ে ওঠে। তাই ভাল। নিশীথ রায় যেন আজ তার মন প্রাণ আর আত্মার হাড় হাড় বুকে ফেলতে পারে যে, ভুবন্ত্র জীবনের পাক পেয়ে মুক্ত হয়ে তাঁরে উঠবার মত শক্তিও তার নেই, সাহসও নেই ; ভালবেসে বিয়ে-করা জীবনের রঙীন নীড়টাই ভূয়ো ; বিশ্বাস করবার চরম সুযোগ পেয়ে যাক নিশীথ, সুনয়নাকে তুচ্ছ করবার ইচ্ছাটাও একটা কপট ইচ্ছা।

আর, সারারাত ধরে এই কোয়ার্টারের একটি ঘরের নিভৃত নিশীথ রায়ের অপেক্ষায় ভেগে বসে থেকে আজই বুকে ফেলুক নীরাজিতা, কেমন মানুষকে সে ভালবেসে বিয়ে করেছে।

কিন্তু ও কে ? গাড়ির হর্নের শব্দ শুনে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে বারান্দার উপর দাঁড়িয়েছে আর গাড়ির দিকে তাকিয়েছে যে, সে তো নিশীথ রায় নয়। নীরাজিতাও নয়। কিন্তু সুনয়নার চোখের অপরিচিত কোন মূর্তিও নয়। ও যে প্রতিভা !

সেই প্রতিভা ; চোখে সেই সোনার স্নেহের চশমা। সুনয়নার হুই চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা ভয়ানক বিশ্বয়ের আবেশ খনন করে। প্রতিভা এখানে, তবে মিহির নিত্র কোথায় ?

প্রতিভাদের কলকাতার বাড়িটাকে এখনও যেন স্পষ্ট করে চোখে দেখতে পাচ্ছে সুনয়না। প্রতিভার বাবা শিবধামবাবু সম্পর্কের দিক দিয়ে পরেশদাস'র খুড়শুভ্র হন। বৌদির সঙ্গে কয়েকবার প্রতিভাদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে প্রতিভার সঙ্গে চেনা-শোনার যে সূচনা হয়েছিল, সেটা তিন বছরের অন্তরঙ্গতার কী সুদূর বহুতের ইতিহাস হয়ে উঠেছিল ! সেই তিন বছরের স্মৃতি আজও সুনয়নার মনে একটুও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি। মনে আছে সবই ; প্রতিভার সঙ্গে শেষ দেখার ঘটনার সেই ছবিও মনে আছে।

সুনয়নার মাথার ভিতরে একটা ভয়ানক বিশ্বয়ের বিদ্রোহও বাজতে থাকে। যে প্রতিভার

মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন, সেই শেষ দেখার দিনে কৈদে ফেলেছিল হুনয়না—আজ যে সেই প্রতিভা! হুনয়নার এই মুখ এখানে দেখতে পেয়ে বিলবিল ক'রে হেসে উঠবে। —তুমি এখানে কেন, হুনয়না? প্রতিভার প্রচণ্ড বিশ্বাসের এই প্রশ্নের কি জবাব দেবে হুনয়না?

জানতো হুনয়না, এবং কে না জানতো যে, মিহির নিতের সঙ্গে প্রতিভার ভালবাসা হয়েছে; মিহির নিতের সঙ্গে প্রতিভার বিয়ে হবে। কে না দেখতে পেয়েছিল, মিহির নিতের সঙ্গে প্রতিভার মেলামেশার রীতিনীতির মধ্যে কোন কুঠার বালাই নেই? বারা সব খবর জানতো না, তারা মিহির আর প্রতিভাকে একসঙ্গে দেখে স্বামী-স্ত্রী বলেই মনে করে ফেলতো। কিন্তু হুনয়না কখনোও করতে পারেনি যে, বিয়ে না হতেই প্রতিভার মৃত্যু হয়েছে...

সত্যিই সে দৃষ্ট স্বাক্ষরে দেখে ভয় পেয়ে সেদিন কৈদে ফেলেছিল হুনয়না।

সিনেয়ার ছবি দেখবার জন্ত সন্ধ্যাবেলা প্রতিভাকে ডাকতে এসেছিল হুনয়না। এবং, হুনয়নার ঘরের ভেতরানো দরজা খোলে ঘরের ভিতরে ঢুকই শিউরে উঠেছিল হুনয়নার চোখ। আর, হুঁহাতে চোখ ঢেকে, ভয় লজ্জা দুঃখ আর ঘৃণারও একটা হুঃসহ অলোড়ন বৃকের ভিতরে চেপে রেখে ঘর ছেড়ে ছুটে বের হয়ে গিয়েছিল হুনয়না। মিহির বিরা প্রতিভার ভালবাসার মানুষ হলেনই বা, কিন্তু স্বামী তো নন। কিন্তু একি অদৃষ্ট দুঃসাহস প্রতিভার! প্রতিভার শরীরের রক্তে কি একটুও ভয় নেই, লজ্জা নেই?

প্রতিভাদের বাড়ির বারান্দায় মাত্র আর পাঁচ মিনিট চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল হুনয়না। প্রতিভাও সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। কি আশ্চর্য, হুনয়নাকে চোখ মুছতে দেখে, আর হুনয়নার মুখটাকে আতঙ্কিত হতে দেখে হেসে ফেলেছিল প্রতিভা।—লজ্জার ব্যাপার বলতে পার; কিন্তু এতে তোমার কান্দবার কি আছে, হুনয়না? ভয় পোলে কেন?

—‘ছিঃ’। শুধু এই একটি ঘৃণার কথা কোনমতে বলতে পেরেছিল আর চলে গিয়েছিল হুনয়না। দুই বাঁকবীর মধ্যে সেই শেষ দেখা আর শেষ কথা। তার পর এই আজ।

হুনয়নার মুখের সেই দিকারের প্রতিফলিতা যেন তিন বছর পরে ছুটে এসে হুনয়নারই জীবনের উপর এক প্রচণ্ড কৌতুকের ধ্বনি হয়ে এই মুহূর্তে বেজে উঠবে। মাথা হেঁট করে হুনয়না, আর অহুমান করতে পারে; এইবার আস্তে আস্তে হেঁটে এই গাড়ির কাছে এগিয়ে আসছে প্রতিভা; প্রতিভার মুখটা বোধহয় এক মিনিট ধরে হো হো ক'রে হেসে নিয়ে তারপরেই ঠেঁচিয়ে উঠবে—ছিঃ!

কোথায় গেল আর কেনন ক'রে কিসের অভিশাপে পুড়ে গেল তিন বছর আগের হুনয়নার সেই ভয় লজ্জা আর ঘৃণার অহঙ্কার। প্রথমে বৃকতে পারেনি হুনয়না, চোখ দুটো ভিজে গিয়েছে বলেই মাথাটা। আপনি হেঁট হয়ে গিয়েছে। ক্রমাল দিয়ে চোখ মুছতে গিয়ে চমকে ওঠে, এবং সন্দেহ করে; সত্যিই কি আজ তিন বছর আগের হুনয়নার সেই অহঙ্কারের জন্ত একটা মমতার কাহ্না এসে হুনয়নার অন্তরায়্যায় ছটকট করে উঠেছে? ঘৃণা করছে নিজেকে? লজ্জা পেল, ভয় পেল কি গাল্ভির হুনয়না?

—এস হুনয়না! হুনয়র ও স্বচ্ছন্দ পুশির স্বরের আশ্রয় শুনেই মুখ তোলে হুনয়না। ঠ্যা, প্রতিভা এসে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছে আর ডাকছে।

হুনয়না হাসে—আশ্চর্য!

প্রতিভা—কিসের আশ্চর্য?

হুনয়না—তোমাকে এখানে দেখতে পাব বলে যে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

প্রতিভা—আমিও যে ভাবতে পারিনি, তোমাকে এখানে দেখতে পাব।

গাড়ি থেকে নামে হুনয়না। —তুমিও খুব আশ্চর্য হয়েছ বল!

প্রতিভা—হ্যাঁ।

সুনয়না—কেন?

প্রতিভা—অঙ্ক কাউকে দেখতে গেলে আশ্চর্য হতান না। তুমি বলসেই—

সুনয়নার মুখের হাসি হঠাৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তিনবছর আগের সুনয়নার জীবনের গৌরব যেন বুকের ভিতরে আঁটনাদ করে উঠেছে। কি-ভয়ানক ধিকার প্রতিভার এই সম্রাজ্ঞ বিশ্বাসের মধ্যে বেজে উঠেছে।

সুনয়না আন্তে আন্তে বলে—নিশীথবাবু কোথায়?

প্রতিভা—বাইন্স অফিসে গিয়েছে। ডেকে পাঠাবো?

প্রতিভার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে সুনয়নার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। —না। আমি নিচ্ছেই ঘাব।

প্রতিভা হাসে—এখনি যাবে?

সুনয়না—হ্যাঁ। আর, এখনি নিশীথবাবুকে একবার গালুড়িতে নিয়ে যাবে।

প্রতিভা—দরকার থাকলে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে।

সুনয়না—তুমি অসুস্থ নাকি দিলেও চলবে।

প্রতিভা—ছিঃ, এ কি কথা বলছো, সুনয়না!

শিউরে ওঠে সুনয়নার চোখ। ছিঃ, সত্যিই যে তিনবছর আগের ধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিটা বেজে উঠেছে।

কিছুক্ষণ আনমনার মত কি-যেন ভাবে সুনয়না; তারপরেই হাসতে চেষ্টা করে। —তুমি বোধহয় আমাকে দেখে ভয় পেয়েছ, প্রতিভা।

প্রতিভা—বিশ্বাস কর সুনয়না, একটুও ভয় পাইনি।

সুনয়না—একটা ঠাট্টা করেছি শুধু। সত্যিই কি বিশ্বাস করলে যে তোমার নিশীথবাবুকে গালুড়িতে নিয়ে যাবার স্বপ্ন এসেছি?

প্রতিভা—নিয়ে গেলে আমার ক্ষতি কি?

সুনয়না হাসে—ক্ষতি নেই?

প্রতিভা—না।

সুনয়না—এমন বিশ্বাস কেনন করে হলো?

প্রতিভা—জানি না।

সুনয়না—বস্তু বড় বিশ্বাস পেয়েছো, প্রতিভা। সবচেয়ে ভাল হতো, যদি তোমার নিশীথবাবুও এই বিশ্বাস পেতেন।

প্রতিভা—আমার মনে হয়, নিশীথও তাই বিশ্বাস করে।

সুনয়না—কি?

প্রতিভা—তারও কোন ক্ষতি হবে না।

সুনয়না—তার মানে?

প্রতিভা—আমাকে জানে নিশীথ।

সুনয়না—কি জানে?

প্রতিভা—সবই জানে।

সুনয়না—কেনন করে জানতে পারলে?

প্রতিভা—আমিই জানিয়েছি।

সুনয়না—তবুও ভালবাসা হলো?

প্রতিভা হাসে—সেইজন্মেই ভালবাসা হলো।

সুনয়না—কিন্তু তুমি কি কিছু জেনেছিলে?

প্রতিভা—নিশীথের কথা বলছো?

সুনয়না—হ্যাঁ।

প্রতিভা—নিশীথই জানিয়েছে।

সুনয়না—বিয়ের পরে?

প্রতিভা—বিয়ের আগে। তা না হলে এ বিয়ে হতোই না।

সুনয়নার মনের ভিতরে এতক্ষণের প্রতিজ্ঞার উল্লাস যেন হঠাৎ আহত হয়ে মুখ খুবড় পড়ে যায়। প্রতিভার কাছে হার মানতে হচ্ছে যে! কী কঠিন প্রতিভার বিশ্বাস! কত উদার প্রতিভার সাহস! প্রতিভার জীবনকে ভয় পাইয়ে বিষণ্ণ করে দেবার শক্তি নেই সুনয়নার। অঙ্ক কোন বেয়ে নয়; নিখুঁত চরিত্রের নীরাক্ষিতা নয়। এ যে সেই প্রতিভা!

এবং, প্রতিভা বলেই যে অদ্ভুত একটা মায়াদ হোয়া লেগে সুনয়নার আকোশটাও দুর্বল হয়ে

যাচ্ছে। প্রতিভা আর নিশীথ, বেচারী এই দুটি মানুষ যে দুটি আহত জীবনের মানুষ। অনেক আশা করে দুজনে দুজনের ভালবাসা পেয়ে সুখী হতে চাইছে।

হেসে হেসে আর ঠাট্টা করতে পারেনা সুনয়না। সুনয়নার গলার স্বর হঠাৎ মূর্ছ হয়ে করুণ অভিনয়নের মত ফিসফিস করে। —তোমরা দুজনেই দেখছি মজা মজা... আশ্চর্য!... হ্যাঁ, কিন্তু আমি যে অন্তরকর্মের খবর পেয়েছিলাম, প্রতিভা।

প্রতিভা—কি ?

সুনয়না—জানিলাম, এমন কি নিবন্ধনের চিঠিও পেয়েছিলাম, নীরাজিতার সঙ্গে নিশীথের বিয়ে।

প্রতিভা—ঠিকই জানেছিলে। কিন্তু সে বিয়ে হলো না।

সুনয়না—কেন ?

প্রতিভা—নিশীথের চরিত্রে নাকি দাগ আছে ; কে যেন সে-খবর নীরাজিতার বাবা শীতলবাবুকে জানিয়েছে।

সুনয়না—তাইতেই বিয়ে ভেঙে গেল ?

প্রতিভা—হ্যাঁ। নীরাজিতা সরকারের পাবি-এরগের জ্ঞান রাজপোখরতে গিয়ে দেখতে পেলেন নিশীথ রায়, শীতল সরকারের বাড়ি অলঙ্কারের ফটক বন্ধ, বাড়িতে কেউ নেই।

সুনয়নার চোখ ছুটো। যেন ধপ করে জলে ওঠে।

—কি বলছো, প্রতিভা !

প্রতিভা—একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্যি কথা বলছি।

সুনয়না—মানুষকে এমন অপমানও করতে পারে মানুষ ? নীরাজিতারও কি মাথা খারাপ হয়েছিল ?

প্রতিভা—জানি না।

সুনয়না—চবৎকার দুর্ঘটনা !

প্রতিভা—হ্যাঁ, চবৎকার দুর্ঘটনাই বটে। তা না হলে, আমাকে আর এখানে আসতে হতো না।

সুনয়না যেন দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে রাস্তাভাবে বলে—খুব ভাল করেছ, প্রতিভা। তুমি একটা ভুলগোলের জীবনকে অপমান থেকে বাঁচিয়েছ। খুব ভাল হলো।

চুপ করে পাড়িয়ে আবার কি-যেন ভাবতে থাকে সুনয়না। তারপর মুখের চেহারাটা যন্ত্রণাক্ত হয়ে ওঠে। যেন প্রাণপণে মনের ভিতরের একটা কুণ্ডার সঙ্গে সংগ্রাম করে আরও কঠোর একটা কৌতূহলের চকলতা চেপে রাখতে চেষ্টা করেছে সুনয়না। কিন্তু পারছে না। প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন বলতে চায় ; বার বার কেঁপে ওঠে সুনয়নার ঠোঁট দুটো।

প্রতিভা বলে—তুমি কি যেন বলতে চাইছে, সুনয়না।

সুনয়না—সামান্য একটা কথা জানবার ছিল, না জানলেও চলে... অর্থাৎ...

প্রতিভা—আমি বলতে পারি, তুমি কার কথা জিজ্ঞেসা করতে চাইছো।

সুনয়না—তার মানে...

প্রতিভা—তার মানে, মিহির নিবন্ধের কথা জিজ্ঞেসা করতে চাইছো।

সুনয়না—হ্যাঁ।

প্রতিভা—সে আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। লগুন থেকেই একটি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, আমাকে ভাবতেই ভয় পায় মিহির নিজ।

সুনয়না আশ্চর্য হয়—কিসের ভয় ?

প্রতিভা—চরিত্রের ভয়।

সুনয়না—কার চরিত্র ?

প্রতিভা—আবার।

আবার আনমনার মত বিভ্রিবিড় করে সুনয়না—
মানুষ মানুষকে এমন অপমান করতে পারে।

প্রতিভা—কিন্তু সেজন্য আর হুঁখ করাবার দরকার কি সুনয়না ? মানুষ মানুষকে সম্মান করতে পারে, সেটাও তো দেখতে পাছ।

সুনয়না—কি ?

প্রতিভা—নিশীথ আমাকে নিয়ে করেছে। এর চেয়ে বেশি সম্মান কোন পুরুষ কি কোন মেয়েকে...

সুনয়না—নিশ্চয়, প্রতিভা। খুব সত্যি কথা। খুব ভাল হলো। নিশীথবাবু মানুষের মত মানুষ বলেই...

হঠাৎ কথা বন্ধ করে সুনয়না। আর, প্রতিভাই আশ্চর্য হয়ে যায়। কেনে ফেলছে সুনয়না।

—এ কি ব্যাপার, সুনয়না? প্রশ্ন করেই প্রতিভা অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে।

—খুব ভাল হলো, প্রতিভা। সুনয়নার চোখ দুটো অদ্বুত রকনের শাস্ত। সুনয়নার গলার ধরে যেন নিবিড় এক সাচ্ছন্দ্য আর বেগ টলমল করে। হঠাৎ যেন সুনয়নার জীবনটাই সুখী হয়ে গেল, পরম নিশ্চিন্ততার আবশে শাস্ত হয়ে গেল।

—চল প্রতিভা, তোমার ঘরের ভিতরে বসে একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে তারপর চলে যাব।...তুমি আজই এসেছ?

প্রতিভা—কাল এসেছি।

সুনয়না—সাক্ষিতে বউভাত হলো বোধহয়।

প্রতিভা—ঠা।

সুনয়না—তোমার জেঠাশুণ্ডর হরদয়ালবাবু চমৎকার মানুষ। ওঁরা সবাই নিশ্চয় খুব খুশি হয়েছেন?

প্রতিভা—সবাই বড় বেশি খুশি হয়েছে।

সুনয়না হাসে—হওয়াই উচিত। এবার নিজেরা ছুটিতে নিলেমিশে খুশি হয়ে আর সুখী হয়ে থাক।

ঘরের ভিতরে ঢুক প্রতিভার সঙ্গে গল্প করতে-করতে সুনয়না যেন নিজের সত্তার অস্তিত্বটাও ভুলেই গিয়েছে। —ঘরের চেহারাটা এবার বলে দিতে হবে, প্রতিভা। এ ঘরে এসব টেবিল-চেয়ার রাখবে না। এই ঘর শুধু তোমাদের ছদ্মনের গল্প করবার ঘর। বাইরের কেউ যেন এখানে এসে না বসে।

ঘরের এদিক-ওদিকে আর আলনার উপর

এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা কাপড়-চোপড়ের দিকে তাকিয়ে সুনয়না বলে—আমি গালুতি থেকে তোমার জন্ত একজন বি পাঠিয়ে দেব। খুব ভাল কাজ জানে, খুব পরিচ্ছন্ন বস্তাবের মানুষ। চমৎকার ঘর গোছাতে পারে বিটা। তোমার অনেক কাজের কথাটা বেঁচে যাবে, প্রতিভা।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে দূরের শালবনের আবছায়ার দিকে তাকিয়ে সুনয়নার মুখরতা যেন আরও উৎসাহিত হয়ে ওঠে।—এখানে বেড়াবার মত অল্প ভাল ভাল আর বড় সুন্দর জায়গা আছে, প্রতিভা। নিশীথবাবু হয়তো এবার দরকুনো হবার জন্ত চেষ্টা করবেন, কিন্তু তুমি বাধা দিও। হোজ সকালে একবার, আর সন্ধ্যায় একবার দুজনে মিলে বেড়িয়ে এস।...আজ্ঞা, আমি চলি এবার, প্রতিভা। নিশীথবাবুকে বলো, আমি নেনস্তর করতে এসেছিলাম। একদিন সময় করে দুজনে গালুতিতে আমার ওখানে যেও, কেনন?

প্রতিভা—একটু অপেক্ষা কর, সুনয়না। নিশীথের সঙ্গে একবার দেখা করে গেলেই ভাল হয়না কি?

সুনয়না ছটকট করে ওঠে—না, প্রতিভা। আমি চলি। নিশীথবাবুকে বলো, যেন আমার অভ্যস্ততার জন্ত কিছু না মনে করেন।

সুনয়নার সঙ্গে ফটক পর্যন্ত হেঁটে এসে প্রতিভাও গাড়ির কাছে দাঁড়ায়। সুনয়না হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর আবার অদ্বুত রকনের একটা শাস্ত হাসি হেসে প্রতিভার মুখের দিকে তাকায়। —একটা অমরোখ ছিল, প্রতিভা।

—বল।

—কালকেই কি যেতে পারবে?

—আমার পক্ষে না পারবার তো কথা নয়।

কিন্তু নিশীথের যদি কোন কাজ থাকে, তবে...

সুনয়না বলে—তবুও চেষ্টা করো, প্রতিভা। একটু তাড়াতাড়ি করো...কালই যদি যেতে পার তবে বড় ভাল হয়...নইলে...

কথা শেষ না করেই চুপ করে গেল সুনয়না।

আব, কটুটির চৌহানের গাড়িও শব্দ করে স্টাট নিয়ে কালিকাপুরের সড়কের লাল ধূলা উড়িয়ে উঠাও হয়ে গেল।

গালুড়ির বাংলা-বাড়ির গেটের দেওয়ারের ছায়া পার হয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়েই একটা শব্দ শুনে চমক এঠে সুনয়না। একটা কাচের গেলাস আছাড় খেয়ে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল। বাড়িটার কুকুর একটা ভয়ানক পিপাসার স্বপ্ন যেন আর্জানাস করে উঠেছে। বীরেন বোস তাহলে কলকাতা থেকে আজই ফিরে এসেছে!

অজুদিন হলে, এই একটা সামান্য গেলাসের আছাড় খাওয়া শব্দ শুনেই সুনয়নার মুখের উপর এক কলক ঘুরার আলা হুড়িয়ে পড়তে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সুনয়নার জীবনটা যেন সব অভিযোগের বেলা হারিয়ে একেবারে হালকা হয়ে ফিরে এসেছে। সুনয়নার লজ্জাহীন রক্তমাংসের আক্রোশগুলিও যেন ভষ্ম হয়ে বদরে গিয়েছে। পৃথিবীর কারও উপর এক বিন্দু রাগ নেই; বরং, মনে হয়, সুনয়নার প্রাণটাই যেন একটা পবিত্র হিংসার রসাতলে ডলিয়ে যাবার ঘ্রানি থেকে রক্ষা পেয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে। কালিকাপুরের হুটি মানুষ, সেই দুই শব্দর স্বামী-স্ত্রী বেচারার মৌভাগ্যকে অভিনন্দিত করে চলে আসতে পেরেছে সুনয়না।

বীরেন বোস নাম যে মানুষটার হাতের গেলাস খসে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল, সেই মানুষটার উপরেও যে একটুও রাগ হয় না। যেমন আছে থাকুক, হা নিয়ে থাকতে ভাল লাগে তাই নিয়ে ভাল থাকুক মানুষটা। একে ঘৃণা করবার কোন অধিকার নেই সুনয়নার। এতদিন যে ঘৃণা করেছে সুনয়না, সেটা তো সুনয়নারই জীবনের একটা নাতাল অভিমানের রাগ।

ঘরের ভিতরে ঢুকে একবার ধমকে দাঁড়ায় সুনয়না। একটা মোকাদ্দার উপরে কাত হয়ে পড়ে

আছে বীরেন বোস। ছইতির বোতল প্রায় খালি হয়ে এসেছে। সোফার কাছে ছোট একটা টেবিলের উপর অনেক কাগজপত্র পড়ে আছে। কলকাতায় গিয়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠে আর শেয়ার-মার্কেট ভাগ্যের যে কারবার করে এসেছে বীরেন বোস, তারই মতিপত্রের কতগুলি আবর্জনা।

অজুদিন হলে, বীরেন বোসের এই চেহারার দিকে, নেশায় বিগলিত এই অস্থিহীন ও অর্থগুস্তিত অবস্থার দিকে জরুজপও না করে নিজের ঘরের দিকে চলে যেত সুনয়না। কিন্তু আজ বোধহয় শুধু একবার জরুজপ করেই চলে যেতে চায়।

তাকাতো গিয়ে সুনয়নার চোখে যেন একটা নতুন বিশ্বাসের চমক লাগে। দরজার কাছে ধমকে দাঁড়ায়। বীরেন বোসের চেহারাটা যেন সোফার উপরে পড়ে আগুনে পোড়া সাপের মত কাতরাচ্ছে। নেশা করে শরীরটাকে এবং সেই সঙ্গে বোধহয় মন প্রাণ আর আত্মার সব সাড়াও অবশ করে পড়ে থাকাই বীরেন বোসের জীবনের নিয়ম। এরকম আলানয় অস্থিরতা নিভাত্যই ব্যতিক্রম। সন্দেহ হয় সুনয়নার, কলকাতা থেকে কি একটা অরের আলা কিংবা কঠিন কোন অনুশোধ অশ্বস্তি নিয়ে গালুড়ি ফিরে এসেছে মানুষটা?

সেখতে পেরেছে বীরেন বোস, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সুনয়না। সুনয়নার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই আস্তে আস্তে অশ্বস্তিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বীরেন বোস। এটাও বীরেন বোসের অভ্যাসের ব্যতিক্রম। এমন অবস্থায় সুনয়নাকে দেখলে একবার চোঁচিয়ে হেসে ওঠাই বীরেন বোসের জীবনের নিয়ম। এবং বীরেন বোসের সেই বিদগ্ধটে আনন্দের আওয়াছটাকে ঘৃণা করে তৎক্ষণাৎ অশ্ব ঘরে চলে যাওয়া সুনয়নারও জীবনের নিয়ম।

আজ কিন্তু চলে যায়না সুনয়না। বীরেন বোসের চোখের দৃষ্টি যেন একটা নীরব হাহাকার। যেন ভয়ানক একটা ছায়া মেখে ভয় পেয়ে বোবা হয়ে গিয়েছে বীরেন বোস।

ঘরের ভিতরে ঢুকে, আস্তে আস্তে হেঁটে
ধীরেনের কাছে এসে দাঁড়ায় শুনয়না—কখন
কলকাতা থেকে কিরলে ?

—এই তো, সন্ধ্যার একটু আগে।

—চা-খাবার খেয়েছ ?

—হ্যাঁ ? চমকে ওঠে ধীরেন বোস।

—চা-খাবার !

—কোথায় চা-খাবার ? কে দেবে ?

—কেন ? শুকসেব বাড়িতে ছিল না ?

—ছিল।

—তবে ?

—কিন্তু শুকসেব কেন মিছিমিছি আমাকে
চা-খাবার খাওয়ারে ?

—তুমি চেয়েছিলে ?

—না।

—কেন ?

ধীরেন হাসে—শুকসেবের কাছে চা-খাবার
কবেই বা চেয়েছিলাম ? তা হ্যাঁ...
শুনয়না—কি ?

ধীরেন—বেচারা শুকসেবকে বিরক্ত করে লাভ
কি ? ওর কাছ থেকে চেয়ে চা-খাবার খেয়েই বা
লাভ কি ?

শুনয়না—কিন্তু আজকাল আমার কাছ থেকেও
তো চা-খাবার কোনদিন তোমাকে চাইতে দেখি না।

ধীরেন—তা তো বটে। তোমাকেও বিরক্ত
করতে চাই না বলেই...

শুনয়না হাসে—ভাল কথা...আচ্ছা, একটু ভাল
হয়ে বসো : চা-খাবার আনছি।

শুনয়নার মুখের দিকে ক্যালক্যাল করে তাকায়
ধীরেন বোস। নেশাজ আর অবসর চোখ দুটো
যেন একটা মৃত্যুময় অন্ধকারের কবর থেকে হঠাৎ
উকি দিয়ে একটা অকল্যাণ আলোকের দিকে
তাকিয়েছে। বড় বেশি বিবশিত হয়েছ ধীরেনের
নেশাজ চোখ। কিন্তু ততক্ষণে ঘর ছেড়ে চলে যায়
শুনয়না।

পনরো মিনিটও সময় লাগে না। চা-খাবার
নিয়ে ধীরেন বোসের সেই অদ্ভুত এক নতুন
জাগরণের দুই চোখের বিহ্বল দৃষ্টির কাছে এসে
দাঁড়ায় শুনয়না। চা-খাবার খায় ধীরেন বোস ;
আর শুনয়না চুপ করে দাঁড়িয়ে ধীরেনের দিকে
তাকিয়ে থাকে।

জানেন না, এবং হিসাবও রাখে না শুনয়না,
চা-খাবার খেয়ে একটা হাত আলগাভাবে এগিয়ে
দিয়ে কতক্ষণ ধরে বসে আছে ধীরেন। বৃকতে
পেরেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে শুনয়না। এক গেলাস জল
নিয়ে এসে নিজেরই হাত দিয়ে ঘষে ঘষে ধীরেনের
শিথিল হাতটাকে ধুয়ে দেবার পর হোয়ালে ধোঁজে।
ধীরেনের হাতটাকে মুছে দেবার পর আবার চুপ
করে দাঁড়ায়। আস্তে একবার হাঁপ ছাড়ো শুনয়না ;
তার পরেই চলে যাবার ক্ষত দরজার দিকে পা
বাড়িয়ে দেয়।

ধীরেন বলে—একটা চিঠি ছিল।

মুখ ফেরায় শুনয়না।—চিঠি ?

ধীরেন—হ্যাঁ। রাজপোখরা থেকে শীতলকাকা
আমাকে লিখেছেন।

শুনয়নার হাতে দুটো চিঠি তুলে দিয়ে ধীরেন
বলে—সেই সঙ্গে আর একটা চিঠিও আছে।
খরসোয়ান-ম্যাক্সানিজের বিহৃতিবাবু শীতলকাকাকে
যে চিঠিটা লিখেছেন।

ধীরেন বোসের চোখের দানবে দাঁড়িয়ে, অবিলম্বে
ও নিকম্প মূর্তি নিয়ে চিঠি দুটো পড়তে থাকে
শুনয়না ; এবং পড়া শেষ হতেই চিঠি দুটো টেবিলের
উপর রেখে দেয়।

ধীরেন বোসের দ্বী শুনয়না বোসের এই শাস্ত ও
শুদ্ধ বক্তব্যের এক ভয়ঙ্কর অনাচারের তদন্ত
ক'রে যেন সংসারের কাছে রিপোর্ট দাখিল করেছে
এই দুই চিঠি। কিন্তু একটিও মিথ্যা কথা বলেছে
কি ? একটিও না। একটুও বাড়িয়ে লেখেনি
খরসোয়ান-ম্যাক্সানিজের বিহৃতিবাবু ; শুনয়না
বোসের চরিত্র একটা অভিশাপ মাত্র। নিশীথ

রায়ের জীবনকে রোমান্স করেছে সুনয়নার
নিঃশব্দের গোপন দুঃসাহস ।

কিন্তু কি আশ্চর্য, সুনয়নার শাস্ত ও গভীর
মুখের উপর একটা ক্ষীণ হাসির রেখা যেন দূর
প্রদীপের আলোর মত নিটনিত করে । তারপরেই
আন্তে আন্তে এগিয়ে এসে সোফার কাছে
ধাড়াই । আন্তে আন্তে ধীরেধীরে নাথায় হাত রাখা
সুনয়না ।

ধীরে বোসের নেশাজ্ঞ চোখের বিষ্ময়কে
আবার নতুন করে চমকে ওঠবারও সুযোগ দেয়না
সুনয়না । এক হাতে ধীরেধীরে মাথা শক্ত করে
চড়িয়ে ধরে । ধীরেধীরে মাথার উপর নিভেরও
নাখাটাকে কাঁচ করে পেতে দেয় : আর, ধীরেধীরে
কপালে হাত বোলাতে থাকে । তার পর...

তারপর বোধহয় একেবারে অঘোরে ঘুমিয়ে
পড়েছিল ধীরে বোসের অলস সন্ধ্যাই । যখন
ঠান্ধে চোখ মেলে তাকায় ধীরে, তখন বুকেতে পারে,
অনেকক্ষণ হলো চলে গিয়েছে সুনয়না । বেয়াল-
বড়ির কাঁটা রাত ন'টার ঘর পার হয়ে গিয়েছে ;
গুণ্ড টিক টিক করে বাজছে ঘরের শূন্যতা ।

সোকা থেকে নামে ধীরে । চটি পায়ে নিতে
ভুলে যায় । বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে ওঠে ধীরে ।
যেন সুনয়নাকে কি-একটা কথা বলবার ছিল ;
এবং সে-কথা না শুনেই চলে গিয়েছে সুনয়না ।

ঘুমিয়ে পড়েছে কি সুনয়না ? ঘর থেকে বের
হয়ে এবং বাতান্দা পার হয়ে সুনয়নার ঘরের ভিতর
চোকে ধীরে বোস । হাঁ, ঠিকই মনেই করেছিল
ধীরে । ঘুমিয়ে পড়েছে সুনয়না । কিন্তু বিছানার
উপরে নয় । একটা চেয়ারের উপর, একেবারে
নিশ্চয় হয়ে বসে আছে সুনয়না, মাথাটা যেন
দুর্ভর ক্রান্তির বোরে একদিকে কাঁচ হয়ে আছে ।
চোখ দুটো কুঁচকে আছে ; আর চোখের কোলের
সিন্ধু কাজল কাঁদা হয়ে রয়েছে ।

সুনয়নার হাতে ছোট একটা শিশি । কোলের
উপর ছোট হাত-ঝাপটা হাঁ করে পড়ে আছে ।

হাত বাড়িয়ে সুনয়নার হাতের শিশিটাকে
আন্তে আন্তে তুলে নেয় ধীরে ।

চমকে ওঠে, চোখ মেলে তাকায় সুনয়না, আর
শিশিহৃদ ধীরেধীরে হাতটাকে চেপে ধরে ।

হেসে ফেলে ধীরে । —এটা আমারই দরকার ;
তোমার দরকার নয় ।

—হিঃ ! শিশিটা কাড়বার চেষ্টা করে সুনয়না ।

ধীরে হাসে—তা হয় না, সুনয়না । আমাকে
যেতে দাও ।

সুনয়না—কিন্তু তাতে কি আমার যাওয়া তুমি
আটকাতে পারবে ?

ধীরে—তা জানি না । তোমার যাবার ইচ্ছে
থাকলে যেও ; কিন্তু আমাকে আগেই যেতে হবে ।

আরও শক্ত ক'রে, হুঁহাত দিয়ে ধীরেধীরে
হাতটাকে যেন বিমচে ধরে সুনয়না । —একটা
দয়া করবে ?

ধীরে—বল ।

সুনয়না—তোমার পায়ে পড়ি ; আমাকে
আগে যেতে দাও ।

সত্যিই, সুনয়না যেন একটা দুর্বীর আনন্দের
জ্বালায় ঠান্ধে কুঁচকে পড়ে ; আর ধীরে বোসের
চটিহীন পা হুটোর উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে, সেই হাত
মাথায় ছুঁইয়ে, আবার শক্ত হয়ে ধাড়াই সুনয়না ।

ধীরে তবু অবিকার ও অবিচল । —তা হয় না,
সুনয়না । বড় জোর...

সুনয়না—কি ?

ধীরে—বড় জোর এই বিষ দু'ভাগ ক'রে,
দুজনে এক সঙ্গেই...

চেষ্টা করে ওঠে সুনয়না । —ঠিক, ঠিক বলেছে ।

তবে আর দেরি করোনা, লক্ষ্মীটি ; দয়া করে
আমার পাশে বসো ।...এস...

আয়না-টেবিলের উপর থেকে ছোট একটা
খেলাস হাতে তুলে নিয়ে সুনয়নারই সঙ্গে এক
চেয়ারের উপর বসে ধীরে বোস । শিশির ভিতরে
যে শান্ত ও স্নদের কন্মার মধুরতা তরল হয়ে টলটল

করাছে, সে নখরতাকে গেলাসে ঢেলে ছাঁতগ করে ধীরেন।

সুনয়নার হাতে শিশিটা, আর ধীরেনের হাতে ছোট গেলানটা। সুনয়নার মুখের দিকে তাকায় ধীরেন।

शुनग्रन्—किं बलद्वहा ?

ସୌଭାଗ—ମନେ କେବଳ ଛାଞ୍ଚ ନେଇ ତୋ ସୁନାମ ?

अन्यथा—न। ।

बौद्ध—कोन बाण ।

शुभयुक्ता—एकदो ना । किन्तु छुनि ।

श्रीगुरुभ्यो नमः—किं ?

শুনয়না—আমার উপর কোন যেন্সা...

दीद्वन—हिः ।

ਸੁਵਸ਼ਨਾ—ਭਵ ?

সুনয়নার ঠোট ছোটো যেন বিপুল পিপাসার
 আবেগে থরথর করে কাঁপছে। যাবার আগে একটো
 চরম স্পার্কের স্বাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় সুনয়না।

এক হাঙে সুনমনার গলা জড়িয়ে ধরে বৃকের কাছে টেনে নেয় বীরেন, সুনমনার দুই ঠোঁটের সেই শিহরিত পিপাসার দিকে লোভীর মত তাকায়। নিশ্চিন্ত হতে চায় বীরেনও। এবং বৃক নিতে চায়, শেষ পর্যন্ত ভালবেসেই চলে যাওয়া গেল। এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে।

শেষ চুমোর তপ্ততা যেন শাশ্বত হতে চায় না।
বিষের ছোয়া বরণ করে ভিন্ন আর হিন্ন হবার
আগে তুটি জীবনের ক্ষত যেন মিলনের উৎসবে
বিলম্ব হয়ে উঠেছে।

বাইরের বরের দেয়ালবহিঃ সন্দের শব্দটা যেন
 আচেনক। কবীরের নত বেজে ওঠে। দীরেন বলে
 —আনার সব ভুল হয়ে থাকে, হুমায়ন।। বুকের
 ভেতরটা কেমন যেন হাঁসকীস করছে।

सुनयना—केन ?

দীরনের হুঁচোখ থেকে সরসর করে বড় বড় জলের ঝোঁটা করে পড়তে থাকে।—এভাবে গলাগলি হয়ে ওঠনের মরে না গিয়ে এভাবে বেঁচে থাকলে ক্ষতি কি হতো, সুনন্দা ?

—কি বললে! মুখ তুলে ধীরেধীরে মুখের
দিকে তাকাত গিয়ে কনকনার হাতের শিশিটা যেন
পিছলে পড়ে যেতে চায়।

ধীপেন—এভাবে হৃদয়ের বেঁচে থাকার মাধ্যমে
কি হবে না ?

मुनयूना—धर माधि इर ।

ধীরে ধীরে হাত থেকে গেলাসটা কেড়ে নিয়ে,
গেলান আর শিশি, ছুটি বস্তকেই একমুখে আঁকড়ে
ধরে জানলার বাইরে ছুঁড়ে দেয় সুনয়ন।

354



✱ ସଜାର ଢେକବାଟିରୁ ✱

• শ্রুত বিবাহ ও য যোগল উৎসাহক প্যাণ্ডুলি এবং গৃহমজুর।

७५-अ, डब्लु, प्रि, वाताऊजी घुँट • कलिकाता - ७ • स्थान - ५५ - २५४९



রাগাবান্না

‘জৌপদী’

মটরডালের পাভুড়ি

আমাদের যেট মটরডাল বিক্রিয়ে দিন। খট্টা-খট্টা ভেজানোর পর মিহি করে দিয়ে নিয়ে তাতে পরিমাল-মতো ছুন, কাঁচা লঙ্কা ও লবঙ্গ-বাটা ও ছায়া পলা তেল দিন ও মাংসারি মাংসের নরেকোলের আদ্যবান্না পুড়ো, ডালের সঙ্গে সব রকমের ডালো করে মেখে নিয়ে কলপাতায় আদ ইঞ্জি পুড় করে পাতিয়ে, তাতে নরম আচে কৈকে মিন—আর সব ডালো কলপা, তাড়ানো পেঁজা-পেঁজা হয়ে যাবে। এই পাভুড়ি খুবই সুস্বাদু।

ফুলকপির ফণ্ট

শীতকালে যখন বেশ ডালো দূলা পাওয়া যায়—মোট দূলা ছাড়া, ছোট ফুলকপি ছাড়া, আদা একপাতা (খুব মিহি করে দূলা কুটে, ফুলকপি ছোট করে কুটে ও আলু কুমা করে কুটে)—সবগুলি সমান পরিমাণে নিতে হবে মিন। পরিমাণ-মতো তেল কড়িয়ে দিয়ে তাতে পাঁচকোড়ন (কাঁচকোড়ন তরকারিতে যেমন দেওয়া হয় তার তুলন পরিমাণ) ফোড়ন

দিয়ে সব তরকারিগুলি একসঙ্গে দিতে হবে আর তখনই পরিমাণ-মতো ছুন, তুলস ও লঙ্কা-বাটা দিয়ে খামিরটা দেল করে ‘কাঁচো’ নিতে হবে; অল্প পরিমাণ জল দিয়ে ঢাকা দিলে শীঘ্রই সিদ্ধ হয়ে যাবে। সামান্য নরম থাকতে ও দূলা তেল দিয়ে ১ মিনিট ছুটবার পর কিছু ময়দা ছড়িয়ে দিতে হবে ও আদা, আঁখি-বাটা করে দিয়ে মেড়ে-মেড়ে নামাতে হবে। এই তরকারি এত সুস্বাদু হয় যে, মাছের তরকারি বেবে কোকে খেয়ে থাকে।

হুঁচা-চিংড়ির কোণ্ডা-কারী

চিংড়ি/চড়বির ডালো করে গোল ছাড়িয়ে নিতে হবে, তারপর শিলে পেটে নিয়ে তাতে পেঁজা-কাটা, লঙ্কা-বাটা, ছুন, সামান্য হলুদ দিয়ে ও পরিমাণ-মতো বেদম দিয়ে মেখে গোল-গোল নাকু পাকিয়ে তেলে ভেজে নিতে হবে। এই দড়ি খুব সুস্বাদু। এই দড়ার সঙ্গে আলু, আদা, লঙ্কা, পেঁজা, ছুন, মিঠি, গি, ময়দা দিয়ে কাঠী গা করলে উপপাচ হয়।



বিজ্ঞান

অগ্রহারণ সন্ধ্যার আকাশ

ঐকামিনীকুমার দে

আকাশ পরিচয়। নগরে ধোঁয়া ও কুয়াশা মিশিয়া আকাশকে ধোঁয়াটে দেখাইলেও নক্ষত্রমণ্ডলের পরিচয় লইতে অসম্ভব হইবে না।

এই মাসে সূর্য কৃত্তিকারশিত, সূর্যযোঃ কৃত্তিক-রশমিকে আর দেখা যাইবে না। ধ্রুবাশি সন্ধ্যার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অজোদ্ভব। মকর, কৃত্ত, মীন, মেঘ এই পরিচিত মণ্ডলসমূহ গতমাসে দৃষ্ট হ্রানের প্রায় ৩০ ডিগ্রী পশ্চিমে। ক্যাসিওপিয়া মধ্যরেখা অতিক্রম করিতেছে; সিকিহুল-মণ্ডল এখন পশ্চিমাকাশে। পেগাসাস-মণ্ডলের চতুর্ভুজ-আকৃতিও মধ্যরেখার পশ্চিমে আসিয়াছে। এণ্ড্রোমিডা ও পার্শ্বীয় মণ্ডলকে অন্যায়সেই চিনিতে পারা যাইবে। পেগাসাসের চতুর্ভুজকে ছুড়ি বনে করিলে, চতুর্ভুজের উত্তর-পূর্ব কোণের তারা এবং আর দুইটি তারা এণ্ড্রোমিডা-মণ্ডলে ছুড়ির লেক্সের উপর; ইহার পর পার্শ্বীয়-মণ্ডলের সর্বোচ্চল তারা। পার্শ্বীয়ের পৈতাত্যার কণা আমাদের মনে আছে। সিটাস রাক্ষসের কণা আমরা ভুলিতে পারি না। আকাশে যে মণ্ডলটির নাম সিটাস, তাহাও দেখিতে অসুত আকারের। কার্তিক মাসে ইহার বর্ণনা ও চিত্র দেওয়া হইয়াছে; এই মাসে ইহাকে দক্ষিণ আকাশের বহুব ব্যাপিয়া ভালোভাবে দেখা যাইতেছে। উত্তর-পশ্চিম দিকে বীণা-মণ্ডলের অভিজিৎ তার: আকাশকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব-পরিচিত দক্ষিণ-মীন-মণ্ডলের কোমলো তারাকেও একবার দেখিয়া লই। দক্ষিণ-মীন-মণ্ডলের দক্ষিণে যে তাত্যগুলি রহিয়াছে তাহারা এন্স বা বক-মণ্ডলে অবস্থিত।

কার্তিক মাস হইতে আমরা সপ্তর্ষি-মণ্ডলকে আর দেখিতেছি না। এখন উত্তর আকাশের প্রধান মণ্ডল ক্যাসিওপিয়া। ইহাকে চিনিয়া তারপর ঐকতারা টিক করিতে হয়। সপ্তর্ষি ও ক্যাসিওপিয়া ঐকতারা বিপরীত দিকে। সেইজন্য বহন সপ্তর্ষি বুড়মান থাকে, তখন বিপরীত দিকের ক্যাসিওপিয়া অদৃশ্য, এবং বহন ক্যাসিওপিয়াকে

দেখা যায় তখন সপ্তর্ষিকে দেখা যায় না। ঐক লক্ষ্য-সপ্তর্ষি-মণ্ডলের উজ্জ্বলতম তারা—আর ছয়টি তারাকে এখন পশ্চিম দিকে দেখা যাইবে। লক্ষ্য-সপ্তর্ষি কখনও অস্বাভাব্য না।

এখন আমরা সূর্য ও অগ্নিা মণ্ডলের সহিত পরিচিত হইব।

সূর্য। পার্শ্বীয়-মণ্ডলের দক্ষিণ দিকে গিয়া এক আয়গার ছয়-সাতটি তারার কটলা (সাদারপত: ছয়টি দেখিতে পাওয়া যায়) 'সাতভাই কৃত্তিকা' অনেকের নিকট পরিচিত। ক্রাইনোকেউলার কিংবা দ্বীপীন দিয়া এখানে আরও তারা দেখা যায়—সমংকার দৃশ্য। কৃত্তিকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইংলান্ডী অক্ষর V-এর আকারে যে তাত্যগুলি রহিয়াছে তাহারা 'হাই-এডিস'-পুঞ্জের অন্তর্গত। V-এর দক্ষিণ বাহুতে যে দ্বীপ রক্তের প্রথম প্রভার তারা দেখা যাইতেছে, তাহার নাম রোহিণী। দুই বাহু বর্ধিত করিলে তাহাদের প্রান্তে দুইটি উজ্জ্বল তারা দেখা যাইবে; ইহারও বুঝাশির অন্তর্গত। কৃত্তিকা-পুঞ্জ ও 'হাই-এডিস'-পুঞ্জের রোহিণী তারার সাহায্যে বুঝাশিকে অন্যায়সে চিনিতে পারা যায়।

অগ্নিা-মণ্ডল। সূর্য-মণ্ডলের উত্তর দিকে বুকের একটি তারা এবং অগ্নিা-মণ্ডলের চারটি তারা পঞ্চভূ-আকারে রহিয়াছে। এখন প্রভার হলে রক্তের তারটির নাম ব্রহ্মচন্দ্র (Capella)।

কালপুঙ্খ উদিত হইতেছে। দক্ষিণ-পূর্ব আকাশে এরিডানাস বা নদী-মণ্ডলের অনেক তারা দেখা যাইতেছে। এখানে প্রথম প্রভার একটি তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে; ইহার নাম অখের্নার (Achernar) বা নদীর শেষ। কাল-পুঙ্খের বৃন্দাশিা নক্ষত্রে এই মাসে পূর্ণিমার চন্দ্র থাকে; এই ক্ষণ মাসের নাম মার্গশীর্ষ। কালপুঙ্খ ও নদী মণ্ডলের পরিচয় সৌ্য মাসে দিব।

ঐকপূর্ব প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বে বাসন্ত্য বিন্দুবিন্দু বৃগশিা-নক্ষত্রে ছিল। বর্গীয় লোকমান্য তিলক এমন

নতুন সাহিত্য

পুস্তক-সমালোচনা

। প্রজ্ঞাপারমিতা ।

[শিখিতকৃষ্ণ বসু এইট। প্রকাশক : ইতিহাসে ক্যান্টোনিয়ন্ট পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭।

উপভাস : ১ হিমাঈ আকারের পুস্তক-সংখ্যা ৩০২। মূল্য ৪৪ টাকা]

অমিতকৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.) কবি ও রস-সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার 'পাগলা গায়ের কবিতা' এবং 'নে তে তেরি তোম' নামক কবিতাবলী এবং ধনপতি পাগলার ভাষেবির অসংখ্য কাহিনী বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' তাঁহার প্রথম উপভাস এবং একতৃপক্ষে ইহা ধনপতির দিনপঞ্জীর সময় ও সার্থক সংকলন। চিত্রাচারিত্র-রীতি অনুযায়ী এ উপভাসের কোনও নির্দিষ্ট নায়ক-নায়িকা নাই, নায়কবিকার বাহার অভিনয়ের কথা সেই প্রজ্ঞাপারমিতার বৃত্তান্ত পর কাহিনীর আরম্ভ, তাই সমগ্র উপভাসে কোথাও তাহাকে সন্দেহের পাইবার উপায় নাই। তবু এই বহুতর উপভাসের সমগ্র পরিবেশ ছড়িয়া আছে তাহার স্তব্ধতার স্রবতি, বিলীলবান মূলের গন্ধের মতো বাহা ঘাইয়াও যায় নাই। বহু বিচিত্র কাহিনীর মধ্যে বোগসত্ত্ব হিসাবে এই সূক্ষ্ম বর্ণিতত্ত্ব যেন অবলীলায় আপন মহিমার বর্তমান। প্রজ্ঞাপারমিতাকে না দেখিয়াও পাঠক তাহাকে পরিপূর্ণভাবে জানিতে পারেন এবং নিদ্রাস-প্রস্থানের মতো অনতিদ্রবীর-ভাবেই তাহার অদৃষ্ট অস্তির অনুভব করিতে পারেন। প্রজ্ঞার সিংহাসনার রক্তক্ষয় পরিচর রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' চরিত্রের কথাটি স্মরণ করাইয়া দের। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সার্থক উত্তরসাধনার পরিচয় ইহার সার্থক কবিতাগুলিতেও প্রাপ্ত। সে দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা রবীন্দ্রনাথের 'শেখের কবিতা'র সমধর্মী বলিয়া মনে হইবে—কিন্তু উপভাসখানি মূল্যত কাব্য নয় বরং বহুদাশে বহুকাব্যের গুণাবিত এবং সার্থক এলিক উপভাসের অনেক মতঃ গুণও ইহাতে বর্তমান।

ধনপতি তাহার ভাষেবির ভাষার ও ব্যঙ্গনার বে আশ্চর্য ভাবটুকু বজার রাখিয়াছে তাহাতে এতটুকু আদ্য-সাধ্য সাহিত্যরচনার প্রয়াস নাই, তবু 'ধনপতির জীবনে

অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, স্রব আদ্য বহুনা শীঘ্রই যেন চলে না" বলিয়া তাহার চোখে বদই একটু বাক্য কিতা ঠাণ্ডা বসন্ত অতি সরল প্রতিভাত হয়। সেইজন্য লগ্ন ব্যঙ্গ ও রসবসের ক্ষমতাই কোথাও প্রকাশ পাই। এখানেই গভীর ভাবজাতক উপভাস রচনা করিতে বসিয়াও 'অ. কৃ. ব.' তাহার নিজস্ব শিল্পীসত্তা বজায় রাখিয়াছেন। অথচ তাহার চরিত্রচিত্রণেও বিশ্বাস্যতা চমকতা, এমন কি ব্যঙ্গাত্মক পরিচয় নাই। প্রতিটি চরিত্র আপন মহিমায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অদ্রান ব্যাকুরীর মতো বীনার বাল্যল দেশে ক'জন আছে এবং নিখোলা বাণার মতো আশ্রয়বিহীন কর্মসাধনার নিম্নে সর্বভাষা সন্ন্যাসীই কত জন?

বে যুগে ব্যাভার্য্যতি মোটা উপভাস লিখিয়া ফেলাই রীতি হইয়া ঠাড়াইয়াছে সে যুগে 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র লেখক দীর্ঘদিন ধরিয়া অল্প অল্প করিয়া রচনা ও অংশে অংশে প্রকাশের পর পুনঃ পুনঃ সংশোধন, সম্মার্জন, পরিমর্জন ও পরিবর্ধনের বে নিষ্ঠা ও জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন তাহার জ্ঞানও তিনি ধরবারে পারত। তাঁহার এই সময় রচনার আশ্রয় এ যুগে বিয়ল।

'প্রজ্ঞাপারমিতা' ধনপতির দিনপঞ্জী ইটলেও একখানি মতঃ উপভাস, একাধারে বর্তমানের সমাজচিত্র ও মনুষ্য-চরিত্রের একখানি স্রষ্টব্যং 'অ্যালবাম'। কিন্তু তাহার মধ্যে এতটুকু স্বীনতা নাই, মালিঙ্গ নাই, ক্রম মানি ও পাণ্যভারের মহিমাকীর্তন নাই, বরং আছে একটি স্রষ্টব্য আশ্রয়বোধ এবং সকল অবস্থারই পরিপাতিতে এক সর্বব্যাপী গুচিবিদ্যতা। এই গুণটিও অধুনা বিয়ল হইয়া পড়িয়াছে। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' অভিজ্ঞ লেখকের সক্ষম লেখনীর সার্থক স্রষ্ট, বাংলা উপভাস-সাহিত্যে নিঃসন্দেহে সার্থক সাযোজন।

—সত্যজিৎ বসু

I রূপম্ ? I

[শ্রীমদবহুধার চরিত্রী প্রবর্ত। প্রকাশক : এ. ম্যাক্সিমি ভ্যাও বো : (আইফট) সি.,

২, কলম বোয়ার্ড, কলিকাতা ২২। দৃশ্য সান্ট ডিন ঢাকা]

‘হম্যাদি বীজা’ নামক সম্ভ্রুতি-প্রকাশিত উপাঙ্গের ভ্রমণকাহিনীর ব্যাতিমান লেখক শ্রীমদবহুধার চরিত্রবর্তী এটি প্রথম উপজ্ঞান। প্রথম উপজ্ঞানেই লেখক তাঁর অশাস্ত্য নিশিধনপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণতঃ বাচ্চায়ে যে ধরনের হাস্যকাহিনী সোমাস্তিক-ধর্মী উপজ্ঞান বেধতে পাওয়া যায়, আজকাল যে শ্রেণীর সজা গল্পোপজ্ঞানের বেনী করণ, এটা সোমাস্তিকের বই নয়। এর প্রকৃতি একেবারেই আলাদা। এতে প্রাচীন ইতিহাস ও আধুনিক-কালীন আখ্যাতিকা কোণে একত্র এখিত করা হয়েছে, অথচ ত্রুটি কাহিনীর রস এতটুকু ক্ষয় হয়নি। বইটি একটি প্রেমের গল্পকে কেন্দ্র করে বিস্তারিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই প্রেমের মধ্যে কোথাও কালীন লেখকগুণ চৌলভার আবেশ নেই, সেহেতাবে প্রবণতাকে অথবা স্বচ্ছন্দিত বোঝার বিস্তৃত চেষ্টা নেই; আগাগোড়াই কাহিনীটি শিল্পজ্ঞানোচিত সংঘর্ষের সৌন্দর্যের দ্বারা মণ্ডিত। দেহবস্ত্র ভাবটিও বেশ পরিষ্কার, কঠোর। ভাষার নৈপুণ্য আর ভাবের উৎকর্ষে বিশেষ উপজ্ঞানটি সত্যসত্যই একটি চমৎকার স্থপত্যার্চ। এতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বইটির ‘রূপম্?’ নামকরণের কিংবা তাৎপর্য আছে। সাক্ষাত নোকে আছে—“কজা বয়সে রূপম্”। কিন্তু সত্যই কি কজা তার ভাবী স্বামীর মধ্যে সব ছাড়িয়ে রূপকেই প্রানী করে? স্বামীর আর-কোন গুণনবা কি তাকে আকর্ষণ করে না? পুরুষের দৌর্য বীর্য সাহস বিজা প্রকৃতি কি নারী-চিত্রে রূপের চাইতেও বৃহত্তর আলোড়ন তোলে না? এই প্রশ্নটির একটি উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন লেখক তাঁর কাহিনীর মধ্য দিয়ে।

তবে উত্তরটি বোধ হয় সম্পূর্ণ প্রতীতিবোধ্য হয়নি। কাহিনীর দুই নৃপ পুরুষ-চরিত্র—স্বপ্ন ও নিরঞ্জন। স্বপ্নের আছে বিজা ও চরিত্রবল; আর নিরঞ্জনের আছে সামাজিক প্রতিষ্ঠার জোব, সে সরকারের বড় চাকুরে, প্রভুত উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সংসারে-সমাজে যে-কোন প্রকারে প্রতিপত্তিসাধাই তার কাম। উপজ্ঞানের নারিকা বরাবরী এই দুই পুরুষের আকর্ষণের অন্তর্ভুক্ত কর্তব্যবোধ হইবে গুণে সুনিশ্চিতভাবেই শঙ্করকে বরণ করে নিল। স্বপ্নের চেয়ে নিরঞ্জন অধিক রূপবান এ কথা বোধ হয়

বইয়ের কোথাও স্পষ্টাক্ষরে বলা হয়নি। তবে রূপের মূল্যবান স্বত্ব গুণনবার অধিক সমাদরের প্রায় এক্ষেত্রে উল্লিখ কোন্ স্বত্ব? লেখক যে উপাত্ত (promises) নিয়ে কাহিনীর স্বত্বপাত করেছেন তাতে কিংবা মূল আছে, হুতরাং সিদ্ধান্তও বধ্যবৎ হওয়ার কথা নয়।

কাহিনীর আর একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র হল দাক্ষ্য-মহাশয়। এক ব্যাতিপ্রতিষ্ঠা-সোভীন জ্ঞানভাগ্য সাধক। যৌবনে তিনি এক কল্যাণে ভালবেসেছিলেন, কিন্তু তার কাছ থেকে ভালবাসার প্রতিদান পাননি। তারই আঘাতের বেদনায় তিনি সামাজিক জীবন থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ভ্রুটিয়ে নিয়ে, এমনকি বিবাহ পর্যন্ত না করে, একান্তভাবেই অধ্যাস ও অধ্যাপনায় নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে অগাধ গুণভণ্ডনা তাঁর, এই জ্ঞানচর্চার স্বত্রেই শঙ্কর দাক্ষ্য-মহাশয়ের সাক্ষিপো আসে এবং তাঁর চরিত্রবস্তার দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। ব্যাবিকিই এক আদর্শ চরিত্র লেখকের রূপান্তরিত এই দাক্ষ্য-মহাশয় মানুষটি। তাঁকে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা দুই-ই নিবেদন করতে ইচ্ছা হয়। পার্থক্য এই চরিত্রটির অস্থাবরনের দ্বারা অস্থাপ্রাপিত ও উজ্জীত হবেন। অন্ত্যস্ত চরিত্রের মধ্যে সবিশেষ, হু-অর্জিত চরিত্র হল নিরঞ্জন, ব্রহ্মাবলীর মা, শটীন ও গদ্যধার।

উপজ্ঞানটির ইতিহাসভিত্তিকতার কথা আগেই বলা হয়েছে। ইতিহাস-সংযোজনায় স্বত্রে স্বাক্ষরবি কলিঙ্গদেব সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য এই বইয়ে সমৃদ্ধিত, স্বয়ং হয়েছে। সে-সব তথ্যাবলী পার্থক্যে আনক যেবে। উপজ্ঞান গুণার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসপার্শ্বের জ্ঞানিক উন্নতি অধিগত হবে। তবে ঐতিহাসিক তথ্যপরিবেশের সেরক্বে অন্তর্ভুক্ত জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আর্থিক দর্শন করতে পারবু না। সত্য জাতীয়তাবাদীতির চাইতে বড়।

বইয়ের প্রথম এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্বাধীনতার দিল্লী প্রিয়ানবী দ্বারা। চমৎকার প্রথমের পরিচিতি। বেদন পরিষ্কার তেমনি গুণিত। দাক্ষ্য-চলতি উপজ্ঞানের প্রথম লেখক যেবে স্বপ্ন, চোখ, কান, সেই সমস্ত উপজ্ঞানের বহিরাবরণে এইরকম একটি স্বপ্নের চিত্রের আবির্ভাবে সত্যিকার তত্ত্বি পুণ্যদা দেল।

—মামাল চৌধুরী



চিত্রলোক

পত্রপাঠ

শ্রবণীয় সত্য

আজ থেকে একশো বছর আগে, ১৮৫৭ সালে, তৎকালীন বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে ওসেই অসুখপুটে দেশী সিপাহীরা যে বিদ্রোহ-বলি প্রদর্শিত করেছিলো তার ক্ষেত্রে আজকের দিনে আবহা গর্বসোধ করি। সেই ক্ষেত্রেই সেই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে শ্রবণীয় করে রাখবার ক্ষেত্রে শতাব্দী কাল পরে ১৯৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহ ইতিহাসের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হোলো। আরেক শতাব্দী কাল পরে হুতো আন্দোলনের উত্তরাধিকারীরাও ভারতের বেতার ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র জনশক্তির মহাকাঙ্গারণের বিতীর্ণ শতবার্ষিকী পালন করবে। এই ভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সিপাহী-বিদ্রোহ শত-বার্ষিকী পালিত হতে থাকবে। সমকালীন সভ্যতা এমনি করেই চিরঞ্চাল ধরে শ্রবণ করে বিগত দিনের ইতিহাস। অতএব আশা করা যেতে পারে, আজ থেকে একশো বছর পরে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের বর্ণোচ্ছল ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে শ্রবণ করবে আজকের ১৯৫৭ সালকে।

‘১৯৫৭ সাল’ গৌরবময় অধ্যায় রচনা করবার ক্ষেত্রে চিত্রকাল, শ্রবণীয় হয়ে থাকবে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে। এই বছর ভেনিসের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ইতিহাস স্থলি করেছে সভ্যজিৎ রায়ের অমর শিল্প-স্থলি ‘অপরাজিত’; এর আগে পৃথিবীর আর কোনো দেশই ভেনিসের সর্বপুৰাতন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে একসঙ্গে তিনটি-পূরস্কার অর্জনের গৌরব লাভ করেনি। এ ছাড়া কাঁদলী ভাষার চলচ্চিত্র উৎসবে নবু মিত্র ও অমিত দৈব পরিচালিত ‘একদিন রাতে’ (অথবা ছবিটির প্রযোজক ও প্রধান চরিত্রাভিনেতা রাজ কাপুরের মতে ‘কাল তে রহে’) প্রথম পুরস্কার ‘প্র্যাত প্রিম’ লাভ করেছে। ইংলণ্ডের চলচ্চিত্র উৎসবে সভ্যজিৎ রায়ের আরেকটি অমর স্থলি ‘পথের পাঁচালী’ লাভ করেছে ‘সেপ্টেম্বর পথ’। ক্যানেনে সন্মান লাভ করেছে বিমল রায়ের ‘গোঁড়ম হুদ’। বার্লিনে

পুরস্কার পেয়েছে ‘কাবুলীওয়াল’। ভেনিসে সন্মান লাভ করেছে শিল্পিত ‘জলদীপ’ এবং ভারতে সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রেসিডেন্টের স্বর্ণপদক লাভ করেছে ‘কাবুলীওয়াল’।

প্রাদেশিকতা বোঝে অভিযুক্ত হবার সম্ভাবনা থাকলেও, একথা অনবদ্যই যে, ১৯৫৭ সাল ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় রচনা করলো তার সম্পূর্ণ কৃতির বাঙালীরাই। মাত্র একখানি ছবি ছাড়া আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সন্মানপ্রাপ্ত প্রতিটি ছবিই বাঙালী শিল্পীর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করেছে। এ কথা আরেকবার প্রমাণিত হোলো যে, অর্ধের সৈন্ত থাকলেও স্বজনী শক্তির অভাবে বাংলাদেশে কখনোই হবে না। চলচ্চিত্র ব্যবসারে গোছাই ও মাত্রাজ মোটা টাকা বরফ করে। কিন্তু তার শিঁদে থাকে চল্লিশ লাগিয়ে শোক জোলানের এবং অর্থ-উপার্জনের ব্যবসাদারী মনোবৃত্তি। ফলে সত্যিকারের শিল্পকর্ম হয় অবহেলিত। অথচ বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের বৈচিত্র্য সৃষ্টিও সার্থক শিল্প-প্রতিভার বিকাশ দেখা যায় এখনেই। বাংলাদেশে তোলা ছবি তাই বোম্বাই-মাত্রাজের অগুণ্টি ছবির চেয়েও অনেক উন্নত। কি কাহিনীর দিক দিয়ে, কি পরিচালনার দিক দিয়ে, সব দিক দিয়েই বাংলাদেশের ছবি চিত্রোৎসর্গের প্রকৃষ্ট পরিচয় বহন করে।

১৯৫৭ সালে ভারত-বিভাগের পর থেকে নানারকমের হুঁসেগের স্বল্প বয়ে চলছে বাংলাদেশের উপর দিয়ে। কিন্তু সব-কিছু বাধা-বিপত্তি, সব-কিছু প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। কারণ বাংলা কখনো মরতে পারে না। সারা ভারতকে প্রেরণা দেবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবদান আশ্চর্য আচ্ছে অস্বল্প। স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যখনই প্রত্যেকের ‘হয়েছে’ তখনই সারা ভারতবর্ষের পুরোভাগে এসে ঝাঁপিয়েছে বাংলাদেশ। অন্ধকারে দেখিয়েছে পথ। বর্তমান ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প যখন নিজেকেই স্থলি করা

গোলকর্থাধায় পথ দু'জোে কিরাছে—নতুন কট্ট, নতুন ভাবধারা এখন জন্ম হয়ে গিয়েছে—তখন আরেকবার বাংলা-দেশ এসে দাঁড়িয়ে পুরোধা হয়ে। বৈচিত্র্যময় ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের কল্যাণিতিকে সৃষ্টি দিয়ে বাংলাদেশ সূচনা করেছে নবযুগের। সারা বিশ্বে ভারতবর্ষকে অপরিসং

সন্ধানের অধিকারী করে বাংলাদেশ আরেকবার পরিচয় দিলো তার শিল্পচেতনায়, তার সহজমৌলিকতায়। আর সেই অবিশ্বদেয় কীর্তির স্মারক '১৯৭১ সাল'। এই শ্রেষ্ঠত্ব সত্যজি-নাগের শতবার্ষিকী আদ্যেবের ডবিত্ব উত্তরাধিকারী শালন করবেন কি?

মাধবীর জন্ম

একোজন : প্রতিউদাস ইটনিহনের পক্ষে পি.এ.স.র। পরিচালনা : নীতিন বহু। সঙ্গীত পরিচালনা : অরুণ বটক। কাহিনী : প্রতিজা বহু। রূপায়ণ : আশীষকুমার, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, সুদীপী লাহিড়ী, কালী সরকার, প্রীতি বহুমলার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, এণ্ডি ঘোষ, চন্দ্রাবতী, তপতী ঘোষ, পদ্মা দেবী এবং আরো অনেকে।

সম্রাটের বিশিষ্ট প্রভাবশালিনী মহিলা নিম্নোক্ত যোবারের একমাত্র কন্যা মাধবী। শিক্ষিতা, আধুনিক। বিলেত-কেন্দ্র ইটনিয়ার অশোক মাধবীর বহু। যখন যখন মাধবী কখন : করে অশোককে পত্রিকায় পাবার। অন্যথা বহুল ও তার বোন রাহুলকে কলকাতায় এসে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করবার বন্ধোবন্ধ করে দিয়েছিলেন নিম্নোক্ত যোবার। বহুলের বাবা ছিলেন তার বিশেষ পরিচিত। ঘটনাক্রমে বহুলের সঙ্গে পরিচয় হোলো অশোকের। এবং যখনই যখন হুজনে হুজনের প্রতি আকৃষ্ট হোলো। অশোকের বাবা মাধবী ছেলের বহু হিসেবে যেনোনীত করলেন বহুলকে। অশোককে পাবার সম্ভাবনা তিরোহিত হতে দেখে বিয়ের আগের দিন মাধবী বহুলকে গিরে জানালো যে, সে মা হতে চলছে এবং অশোকই তার জন্ম দারী। বহুল এই সংবাদে বিগলিত হয়ে ক্রিয়ে গিলো অশোককে। প্রত্যাহ্বান করলো পরিণীতা হবার স্বপ্ন-স্বপ্নাঙ্গ। অশোক ক্রিয়ে গিরে তার বাবাকে জানালো যে, বিয়ে ভেঙে দিয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতা স্পষ্ট করতে না পেরে তার বাবা শেখনিঃসার ত্যাগ করলেন। বাবার বৃদ্ধা-সংবাদে বিবুৎ হয়ে মোটব-মুগ্ধতার চলচ্চিত্র হারিয়ে কেলদো অশোক। বছর বশেক পরে মাধবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো বহুলের। তার কাছ থেকে সে কনলো ছেলে হওয়ার মিথ্যা ইতিহাস—যার জন্মে সৃষ্টি প্রাণ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। মাধবীর কাছ থেকে টিকানা গেরে বহুল গেল অশোকের কাছে। জীবন-সাক্ষ্যকে শিলন হোলো অশোক ও বহুলের। এই হোলো কাহিনীর সঙ্গীতরায়।

এখন অসম্ভব ছবি পরিণত পরিচালক নীতিন বহু যে কি করে বাংলা চিত্রজগৎকে উপহার দিতে পারলেন তা ভেবে কলকিনারা পানি না। চিত্রনাট্যের দুর্লভতার জন্মে ছবিটি কোনো জায়গার দানা ধাঁধতে পারেনি। কলো-পড়া মাধবীকে ছবিত্তে বেডাবে বেডানো হয়েছ তাত্তে শিক্ষিতা চলচ্চিত্রা তরুণী সশর্কে সম্যক জানের অভাবই প্রকাশ পেরেছে। আর, প্রাপ্তবয়স্ক প্রণতি ঘোষের কাছে নারক আশীষকুমারকে হুজপোত নাবালাক বলেই যনে হয়েছ চরিত্রচরণের গোষে। অশোকের প্রতি মাধবীর হুঁয়ার আকর্ষণ, যার জন্মে সে মা হতে যাওয়ার মিথ্যা সংবাদে বহুলের বিয়ে ভেঙে গিলো, কোন হুজমজিক-প্রস্থত কিনা সে বিষয়ে সল্কে আছে বলেই। হোস্টেলের মেয়েদের গিরে বেডাবে বোকাই ঢলে মাচগান করানো হয়েছ তা পরিণাক করতে যে-কোনো দর্শকেরই বাধ্যবে। বহুলের কাকার চরিত্রে জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় পরণ ক্রিয়ে দিয়েছে যে, তিনি এককালে বাতায়নে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। বিলেত-কেন্দ্র ইটনিয়ার রূপে আশীষকুমার এককথার অচল। অবশ্য তিনি চিত্র-শিল্পে নবাগত, এখনো অনেক সুযোগ পাবেন নিম্নোক্ত নাগেরের উপস্থূত করে গড়ে তুলতে। ছবি বিশ্বাস, একই আত্মপত্না থাকলেও, বেহেমহর পিতার চরিত্রটি ঠিক-মতো ছুটিয়ে তুলেছেন। বহুল চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ভালোই অভিনয় করেছেন। হোস্টেলের নিরম-কর্তার নিম্নোক্তাভির চরিত্রটিকে পরিচালক আরো একই সল্কে স্বাভাবিক করলে ভালো করতেন। অজ্ঞাত চরিত্রগুলি মোটামুটি অভিনীত হয়েছ। সঙ্গীতায়নের মধ্যে এশলো পাবার মতো কিছুই নেই। আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ ভালোই। সব মিলিয়ে 'মাধবীর জন্ম' ছবিটি এখন কিছু দিতে পারেনি যা অজ্ঞাত বাংলা ছবি থেকে ভিন্নতর। এবং বহুমলী খ্যাতিমান পরিচালক নীতিন বহু যদি এই ধরনের অসম্ভব ছবি দর্শকেরের উপহার দিতে পারেন তাহলে দৃষ্টতে হবে তার বানপ্রস্থ নেবার দিন এগিয়ে আসছে।

অন্তরীক্ষ

প্রবোক্ষনা: সিনে আর্ট প্রোডাকশন। পরিচালনা: রাজেন তরফদার। সঙ্গীত পরিচালনা: ভক্তান আলী আকবর খান। কাহিনী: তুলসী দাহিকী। রূপায়ণ: প্রবীরকুমার, চুবি বিদ্যাস, দুহ্লাবর বন্দোপাধ্যায়, কালী চক্রবর্তী, পদ্মা দেবী। রেবা বহু, হাসি বন্দোপাধ্যায়, নবাসতা কাকল চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

শাগবনী গ্রামের জমিদার রাক্ষা মহেন্দ্রপ্রতাপ তাঁর একমাত্র পুত্র নরেন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বে জহন নামে একটি ছেলেকে পাগল করেছিলেন। জমিদার ও তাঁর স্ত্রীকে জহন পিতামাতার মতোই জানে করে। জহনকে শুধু যে তাঁরো মামুষ করেছেন তাই নয়, সে যাতে মাথা তুলে পাড়তে পারে নিজের পায়ে, তার সুযোগও করে দিয়েছেন। গ্রামের পুণ্ডেহিত-ঠাকুরের পানিতা কস্তা বাণীর সঙ্গে জহনের বাগ্যপ্রণয় জমিদার। রাক্ষা মহেন্দ্রপ্রতাপ স্ত্রীর অসুযোগে জহন ও বাণীর বিবাহ দিয়ে তাদের আশালা গৃহস্থালী রচনা করে দেন। তবেই দিন কাটছিলো তাদের। কিন্তু অকস্মৎ বন্ধুত্ব হোলো নীল আকাশের বুক থেকে। নরেন্দ্রপ্রতাপের বিয়েতে বাঁজী আনবার জন্তে জহন গেল কাশীতে। সেখানে তার পকেট-নামা গেল। তার ব্যাগের মধ্যে বাণীর বাসাকায়ের কিছু অধ্যায়ের হাশি ছিলো। সেই ভুল সংবাদ গণেশ নামে এক হুস্তর হাতে গিয়ে পড়লো। ভয় দেখিয়ে জহনকে কাছ থেকে টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে গণেশ এসে হাতির হোলো শাগবনীতে। জহন জানতো বাণী বাল্যবিবাহিতা, কিন্তু সে পুণ্ডেহিত-ঠাকুরের কাছে পশখ করেছিলো যে, এই সংবাদ সে সকলের কাছ থেকে, এমনকি বাণীর কাছ থেকেও গোপন রাখবে। কিন্তু গণেশের জহনহীনতার কাছ থেকে পরিত্রাণ নেই। সে জহনকে সব কাঁদ করে দেবার ডর দেখিয়ে টাকা আদায় করবার ফিল্মের বোঝে। তার দাবি পটিন হাজার টাকা। তার হাত এড়াবার জন্তে জহন হুস্তের মর্পির জন্তে পটিন হাজার টাকা ক্রমা দেবার অসুহাতে সম্মানসত্তা। বাণীকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে রওনা হলো। সেই থবর জানতে শেষে গণেশ পথের মধ্যেই তাদের গতিহাথ করলো এবং উত্তম ছোঁরা নিয়ে জহনকে আক্রমণ করলো টাকার সোতে। ধর্মাক্ষতিতে গণেশ উড় দীর্ঘের পাড় থেকে পড়ে গ্রাম ছরালো। ঘটনার আকস্মিকতার বাস্তবজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল বাণীর। পুলিশ এসে তদবিল তদ্রূপ ও গণেশের মূনের অভিযোগে জহনকে

গ্রেপ্তার করলো। সব শুনে জহনকে দোষী মনে করে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন না। এদিকে বাণী একটি শিশুসন্তানের জন্ম দিয়ে পরলোকবাঁতা করলো। সেই সন্তোজাত শিশুকে দেখে মহেন্দ্রপ্রতাপের জ্বর-পরিবর্তন হোলো। তা ছাড়া, বাণীর পালক পিতার কাছ থেকে সব থবর তিনি জেনেছিলেন ইতোমধ্যে। কহনকে কাহানুত্ব করার জন্তে তিনি রওনা হলেন। এই হোলো সংক্ষেপে কাহিনীমৃত।

নব্যগত পরিচালক রাজেন তরফদার সত্তরত 'পথের পাঁচালী'র সাকল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বাস্তবধর্মী চিত্রনির্মাণে নিয়োজিত হয়েছিলেন, কিন্তু পথের বিধর সে প্রচেষ্টা তাঁর বার্ষ হয়ে গিয়েছে বাস্তবতা-বোধের অভাবে। গ্রাম্য জীবনের পরিচয় দেবার জন্তে তিনি অথবা সমর নটে করেছেন বনবাগাড় ক্যানেরা দুরিয়ে। চুবিটির প্রথমভাগের গতিহীনতার সঙ্গে দ্বিতীভাগের ভ্রতগতি ঠিকমতো জারসাম্য রাখতে পারেনি। তা ছাড়া, ঘটনাচক্রে গণেশের আবির্ভাবের পর থেকে এমন আকস্মিকভাবে 'বাসুদেব' বেড়ে গিয়েছে যে তার চাপে বৈধব্যতি মটরে ধর্ষকের। প্রথম থেকেই চুবিবানির মধ্যে সাদৃশ্যের বোঝা এমনভাবে চাপানো হয়েছে যে, তার ভার হুবহু হয়ে উঠেছে ধর্ষকের কাছে। চোকাচোকার ফীট কিংবদন্তি মধ্যে পরিচালক এতো বেশী জিনিস তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন যে, অধিকাংশ দৃষ্ট রসোপলব্ধিতে ব্যাঘাত হয়েছে। এবং সেইখানেই বসোজী হবার ভ্রমোগ হারিয়েছে চুবিট। পুহুরের ধারে চোকা-হাতে গণেশের সঙ্গে জহনের ক্ষতাক্ষির 'দুহুটি কোনো বোঝাই-ছবির অংশ বলে ধরে নেওয়া বেড়ে পারে। অভিনয়ে কাজল চট্টোপাধ্যায় সরদ দিয়ে ভূটিয়ে তুলেছেন সাদৃশ্য গ্রাম্য ঘরে ও বহু চরিত্র। প্রবীরকুমার ষোঁটানুটি ভালো। চুবি বিদ্যাস ও দুহ্লাবর বন্দোপাধ্যায় চরিত্রাঙ্গ অভিনয় করেছেন। হুস্ত গণেশের চরিত্রে কালী চক্রবর্তী এককথার অপরূপ। সঙ্গীতায় সাধারণ। আলোক-চিত্র ছাড়া কলাকৌশলের অস্ত্রাভ দিক তইবৎ। পরিণেশে একটি বক্তব্য আছে। সেটি হোলো এই যে, ভূমিকাসিপিুর মধ্যে ধাঁধের নাচ দেখিয়ে পরিচালক যে ঠিক কাকে নাচাতে চেয়েছেন—ধর্ষক, প্রবোজক, পরিবেশক, না থবর নিজেই, তা বোঝা গেল না। কারণ এই চুবি দেখতে দেখতে কেবলি যেন হয়েছে 'বাস্তবধর্মী' লেবেল দিয়ে অসম্ভব ঘটনা চিত্রায়িত করার একটা অপচেষ্টা যেন প্রচুর রয়েছে সারা চুবি ছুড়ে।

। আগামী আকর্ষণ ।

পথে হ'ল দেবী

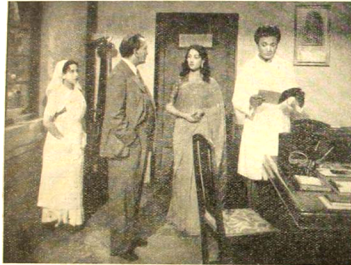
‘অগ্রদূত’ চিত্র এর আগে বাংলা চিত্রক্ষেপতে কয়েকটি অসীম অবস্থানের ক্ষেত্র নাম কিনিছে। আগামী বড় দিনের সময় এর নবতম প্রচেষ্টা গোড়াকলারে তোলা প্রথম বাংলা সমাজ-চিত্র ‘পথে হ'ল দেবী’ মুক্তি পাবে। আপোনা করা হচ্ছে ছবিটি চিত্রশিল্পীদের মনে লাড়া জড়িয়ে হ্রদন বৃদ্ধি করবে অগ্রদূত চিত্রের। ছবিটির অনেকখানি অংশে মুক্তি দেবে দেবীর বাইরে তোলা। তার ফলে প্রাকৃতিক

আপো করা বার, অগ্রদূত চিত্রের নবতম প্রচেষ্টা সামল্য-মুখিত হবে দর্শক ও সমালোচকের প্রশংসা অর্জন করে।

মানমণী গার্লস স্কুল

বর্ত্ত হবীজন্যে মৈত্রেয় বর্ষ রচনার মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক থেকে ‘মানমণী গার্লস স্কুল’-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শৌণীন ও শেখারী নাটকে হল কলকাতা ও শহরতলির রক্তমকে অনেক অনেক বার এট নাটকখানি উপস্থিত করেছেন পাঠপ্রদীপের সামনে। বর্ত্তমানে মেট্রো-

পলিটান শিকড়ার নাটক-খানিকে চিত্রে রূপান্তরিত করে বাংলা চিত্রশিল্পীদের কাছে উপস্থিত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছেন। একদা নিউ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত প্রবীণ পরিচালক (বহুসের দিক দিয়ে নর, অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে) হেমচন্দ্রের পরিচালনায় রক্ত সমান্ত্রির পথে ছবিখানি এগিয়ে চলেছে ইস্ট ইন্ডিয়া স্টুডিওতে। নায়ক-নায়িকার চরিত্র রূপান্তরিত করেছেন উত্তমকুমার ও অরুণ তী মুখোপাধ্যায়। অত্যন্ত চরিত্রে রূপদান করেছেন মলিনা, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরাক ভট্টাচার্য, জহর দাস এবং কমলা মুখোপাধ্যায়। সুরবোজনা করেছেন রাজেন



মুক্তি-প্রদীপিত অগ্রদূত-চিত্রে গোড়াকলারে মুক্তি পাবে ‘পথে হ'ল দেবী’ চলচ্চিত্রের শিল্পী-বোমের মুক্ত—
নারী (চিত্রিতা বসু), ডাঃ গোল (পারভী সত্যাল), শিশু (রক্তা ব্যাভাটী) (রক্তিতা দেব)
ও উত্তমকুমার (উত্তমকুমার)

পরিবেশের মোহনীয়তা বহুচিত্রবর্ষসমুদ্র গোড়াকলারে অপরূপ রূপ নিয়ে ফুটে উঠবে। সম্পূর্ণরূপে রোমান্স-ধর্মী এই ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্র রূপান্তরিত করেছেন বাংলা চিত্রক্ষেপতের বর্ত্তমান জনপ্রিয় রোমান্টিক ছুটি হুচিরা সেন ও উত্তমকুমার। অত্যন্ত চরিত্রে আছেন ছবি বিলাস, পারভী সত্যাল, জহর গাঙ্গুলী, অরুণকুমার, চত্রাবতী, ভারতী, মোহা সেন এবং নবগোষ্ঠা কমলা মুখোপাধ্যায়। ছবিটিতে সুরবোজনা করেছেন বরীন চট্টোপাধ্যায়। এই ছবি সম্পর্কে কোঁহলের অল্প নেই বাংলা চিত্রশিল্পীদের।

সরকার। অল্পকালের মধ্যেই ছবিখানি মুক্তি পাবে বলে আপো করা বার।

দম্পা রত্নাকর

বর্ত্তমানে বাংলা চিত্রক্ষেপতে নির্বায়মাণ ছবির মধ্যে সামাজিক চিত্রের প্রাধান্য থাকলেও, বর্ত্তমূলক পৌরাণিক ছবির সংখ্যাও অল্পলেখযোগ্য নয়। এর মধ্যে একখানি ছবি হোলো বি. এস. প্রোডাকশনের প্রথম অবস্থান ‘দম্পা রত্নাকর’। ছবিখানির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও গীত রচনা

করছেন কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ। তরুণ পরিচালক বঙ্গী আশের তত্ত্বাবধানে ছবিটি সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। নামভূমিকা রূপায়িত করছেন ব্যাতিমান চিত্র ও মঞ্চ শিল্পী কমল মিত্র। অস্ফুট চরিত্র-রূপায়ণে আছেন মলিনা, গুরুদাস, রেদুকা, জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, হরিধন মুখোপাধ্যায়, দীপ্তি রায়, শিখারামী বগল, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবাবগড় অবনীশ প্রকৃতি শিল্পী। স্ব-বোদ্ধনা করছেন রাজেন সরকার।

ডাক-হরকরা

ভাষানব্বয়ের বাস্তবধর্মী কাহিনী অবলম্বন করে অধ্যাপক-পরিচালক-শ্রীঃ 'ডাক-হরকরা' চিত্র রূপায়িত করছেন। নামভূমিকার কালী বন্দ্যোপাধ্যায় এয়া

চিত্রগ্রহণের কাজ সমাপ্ত করেন। সম্পূর্ণরূপে বাস্তবধর্মী এই ছবিখানিতে গ্রাম-বাংলার আসল রূপটি তুলে ধরবার প্রচেষ্টা করতেন। শাকল্যামণ্ডিত হই তা দেখবার ক্ষেত্রে চিত্র-রসিকেরা সাগ্রহে অগেণক করছেন। চবিখানি ক্ষুদ্র সমাপ্তিপথে, এবং আশা করা যায় ইংরেজী নববর্ষে শহর ও শহরতলির চিত্রগৃহসমূহে মুক্তি পাবে।

আন্দামান

'নীলাচলে মহাপ্রহর' তুলে শ্রীমোহন মজুমদার সার্থক প্রযোজকরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন চিত্ররসিকদের কাছে। এবার তিনি কুলাভ আকামান বীপকে ভিত্তি করে একগানি অভিনব কথাটির সর্বস্বত্বকণ্ঠে উপহার দিতে মনস্থ করছেন। বিদেশী শাসনে ভারতের মুক্তিকামী স্বাধীনতার



'অন্তর্যামী' অধ্যাক্রান্ত ও পরিচালিত বিবীকায় 'ডাক-হরকরা' গ্রন্থি একটি কৃত কলী অল্যোপাধ্যায় শোভা দেব ও অঃ বোদ্যায়। বহু তত্ত্বাবধানে রচিত্রে বাঃলার গাঠীকরণ নিরুত ওপট বসার ওয়া অঃ নেই পরিচালকঃ। বীঃকঃ এক ক্রমকপরিচালকঃ জিতঃই কৃতঃ বেজাঃ।

ডাক-হরকরার চরিত্রটি মুঠিয়ে ভোলার ক্ষেত্রে আশ্রয় চেষ্টা করছেন। তাঁর বিপরীত ভূমিকায় অভিনয় করছেন শোভা দেব। গ্রাম-বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশে মূলত বহিসৃষ্টে ছবিখানিকে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে পরিচালক ও রূপাংশীকৃত বীরভূমের আবাকলে সিয়েছিলেন। এরল বাহিন্য উল্লেখ করে তাঁরা বোলপুর ও অস্ফুট কারদার

সৈনিকদের নির্বাসনে পারানো হোতো 'শহতানের বীপ' এই আকাবানে। স্বাধীন ভারতের অধিবাসীদের কাছে তাই স্বাক্ষ আকামান হয়ে উঠেছে পুণ্যতীর্থ। এই আকামানের কাহিনী রূপায়িত করার ক্ষেত্রে প্রযোজক মোহন মজুমদার এককল কলাংশীকৃত সত্তে নিয়ে এ.এ. নিকোবর জাহাঙ্গ-বোসে সমাপ্তি হওনা হয়েছেন। এখানে তিনি আত্মবানিক

তিনি যান অবস্থান করে বহির্ভূত-প্রধান এই ছবির কাজ শেষ করবেন। ছবিটির মধ্যত অঙ্কিত হবে দু'খাত সেপ্টেম্বর জেলের অভ্যন্তরে, কয়েকীদের উপস্থিতিতে। সখিনী এবং চিত্রনাট্য রচনা করেছেন আন্তোভোব যুগোপাধ্যায়। মূল দ্রুতি চিত্রিত রূপ দেবেন অশীষকুমার

ও নবায়িতা মল্লা যুগোপাধ্যায়। ছবিখানি যাতে অবিচ্ছেদ্য হয় তার জন্তে এর প্রয়োজন সর্বশেষ প্রচেষ্টা করছেন বলে জানা গিয়েছে। বৌদ্ধভাবে কয়েকজন কলা-মুগ্ধী ছবিখানি পরিচালনা করবেন শ্রীভাষা চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে।

। খুচরো খবর ।

দুঃখ্যাতের চলচ্চিত্র শিল্পের রাজধানী হলিউড। সারা পৃথিবীতে সর্বাধিক-সংখ্যক ছবি তোলা হয় এইখানে। হলিউডের 'সোপান শিল্পকার অ্যাকাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স' বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি, পরিচালক, শিল্পী ও কলা-মুগ্ধীদের 'অস্কার' উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন প্রতি-বছর। সারা হলিউড সাম্রাজ্যে তারিখে থাকে এই 'অস্কার' পুরস্কারের দিকে। বাংলা বিজয়ী হন তাঁদের বরাত বার হাজারটি মূল। বাংলা বার্ষিক হন তাঁরা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেন আগামী বছরের জন্তে। গত বছর থেকে উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠান, বিশেষে তোলা ছবিও যাতে এই পুরস্কার প্রতিযোগিতার যোগ দিতে পারে, তার ব্যবস্থা করেছেন। সিন্ধু ভারতবর্ষ থেকে কোনো ছবি পাঠানো হয়নি গতবার। বিশ্বের দরবারে ভারতীয় ছবির প্রেরণ লক্ষ্য করে ('পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'র দৌলতে) 'অস্কার' কমিটি ভারতের প্রযোজকদের আহ্বান জানিয়েছেন ছবি পাঠাতে। সেখা হাফ, কোন্ ছবি ভারত থেকে পাঠানো হয় এই বহুজন-অভীলিখিত 'অস্কার' পুরস্কারের জন্তে।

চুয়ান বজের প্রবর্তক আচার্য বিনোবা ভাভের জীবন অবলম্বন করে একখানি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের প্রামাণ্য চিত্র তৈরী করার পরিকল্পনা করছেন ভারত সরকারের চলচ্চিত্র দপ্তর। অ.ভা.ব. ভাভের জীবন ও কর্মধারা যাতে সঠিকভাবে চিত্রায়িত হয় তার জন্তে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে বলে প্রকাশ। ভারতে বোধহয় এই প্রথম একজন জীবিত জননাথের পূর্ণাঙ্গ জীবনী-চিত্র তোলা হবে। জানা গিয়েছে—আচার্য ভাভে প্রবর্তিত চুয়ান, সম্পত্তিহীন, গ্রামহীন ও ভ্রমস্থান আলোকানওগির মূল আদর্শ সূত্রের তোলাই হবে ছবিখানির মূখ্য আদর্শ।

হলিউডের গ্যায়ামাউন্ট প্রতিষ্ঠান 'বেগুনাম' নামে একখানি ভারতীয় ছবির প্রদর্শনী বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে আদালতে বামলা হারের করেছেন। তাঁরা এই বলে অভিযোগ করেছেন যে, উল্লিখিত ছবিটি গ্যায়ামাউন্টের 'নক' অনু' (ভ্যানী কো অতিনীত) চিত্রের দ্বন্দ্ব নকল। বর্তমানে বিখ্যাত বোম্বাই আদালতে বিচারামীন।

জনস্বার্থমূলক ভাবধারার তোলা হয়েছে বলে বোম্বাই সরকার ছবিখানি হিন্দী ছবিকে প্রযোজকের হাত থেকে রেহাই দিয়েছেন। ছবি-মুখ্যখানি হোলো শাস্ত্রাম্বারের 'দো' অথবা বাংলা 'হাত' এবং বেহুদের 'মাসার ইতিহাস'। ভারতীয় চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবদের মতে, এই উদারতা দেখিয়ে জনস্বার্থমূলক ছবি তোলার প্রচেষ্টার প্রেরণা দিয়েছেন বোম্বাই রাজ্য সরকার।

বর্ধত কথাশিল্পী মানিক যুগোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' চিত্রে রূপায়িত করার জন্তে পাকিস্তানে তোড়জোড় চলছে বলে প্রকাশ। ছবিখানি তোলা হবে উম্ম' ডায়ার। খ্যাতনামা উম্ম' লেখক ও কবি বৈদ্যজ আনবর ছবিটির চিত্র-নাট্য রচনা করছেন। পদ্মানদীর বে পরিবেশে বৈখানি রচিত 'ওর সঙ্গে সন্ধ্যাভাবের পরিচিত হবার জন্তে জনাব আনবর সম্ভ্রতি লাহোর থেকে ঢাকা শহরে গিয়েছেন। লণ্ডনের কিরল ও লাইট প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আশু'তার কারবার এই ছবিটি প্রযোজনা করবেন।

ইউরোপের অধিকাংশ শহরে বাংলা ছবি দেখার জন্তে আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে চিত্ররসিকদের মধ্যে। সারা ইউরোপে বাংলা ছবি 'অপরাজিত'র সাম্প্রতিক সাক্ষ্যের ফলেই এই আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্ভ্রতি ইউরোপ-প্রভাগত প্রযোজক 'কাদুলীওয়াল'-খ্যাত তপন সিংহ উপরি-উক্ত তথ্য প্রকাশ করেছেন।

ওক্ত দত্ত কিশোর প্রথম বাংলা ছবি 'গৌরী' তোলা হচ্ছে সিনেমাফোণ পদ্ধতিতে। সেই সঙ্গে বিশেষে প্রদর্শনের জন্তে ছবিখানির থিয়েটারী সংস্করণও তোলা হচ্ছে বলে প্রকাশ। সিনেমাফোণে তোলা প্রথম ভারতীয় ছবি হিসেবে 'গৌরী' শব্দীয় হয়ে থাকবে।

বাংলা চিত্রজগতের বর্তমান জনপ্রিয় অভিনেত্রী হুজিরা সেন সম্ভ্রতি সপরিবারে লণ্ডন অভিমুখে পাড়ি দিয়েছেন। ওখানে অবস্থানকালে তিনি প্রায় দু'মাস ধরে ইউরোপ সফর করবেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র-নির্মাণ-কেন্দ্র পরিদর্শন করা তাঁর এই সফরের অন্ততম উদ্দেশ্য।

ଦୃଢ଼ିପାତ



—“କି ହୁଅଛି?... ଯାହା ହେଉ ଯାଉଅଛି ସବୁଦିନ ତେଣୁ ହୁଅଛି—”



স্থিতি

ফুটবল :

ভাৰতৰ অচুতম শ্ৰেষ্ঠ ফুটবল অভিযোগিতা আই.এফ.এ. ইন্ডিয়ান অসম্পন্ন সেনি-ফাইনাল খেলকে সমাপ্ত কৰোঁত গিছে যাঠে বে আবংগাংগাৰ দটি হুয়েত, তাৰ ফলে বনে হয়, অসমাপ্তই ছিল ভাণো। ঐ দিনেৰ প্ৰতিস্থিতি হুয়েছিল ইষ্টেংগন ও দীপ-বিজয়ী মহামেডান স্পোৰ্টিং দল। খেলাটি এৰ আগে একদিন খেলানো হুয়েছিল। প্ৰথম দিন প্ৰায় বিনা গুতখোলে অতিৰিক্ত সময় খেলানো দৰেও খেলাটি ১-১ গোলে অসমাপ্তিত ভাবে শেষ হয়। প্ৰথম দিনেৰ খেলাৰ পৰিচালক ছিলেন পি.চক্ৰবৰ্তী। কিন্তু দ্বিতীয় দিন খেলাৰ পৰিচালকেৰ দাখিৰ নিৰেছিলেন ডাঃ জ্যোতি দত্ত। কেন বে হুঠাং হেফাটী বদলানো হোলে তাৰ কাৰণে জানা যায় প্ৰচক্ৰবৰ্তী নাকি অস্থায়ী ছিলেন। কিন্তু খেলাৰ দিন যাঠে ঠাৱ সাক্ষাৎ পাক্কা গিৰেছিল কানো গেছে।

গত ৩০শে অক্টোবৰ আবংগাং খেলাটি হয়। এবল উত্তৰজনাৰ মধ্যে দ্বিতীয় দিনে প্ৰথমবাৰে পেনা পেন হলে আসল গুতখোলে শুরু হয় খিটীৰাংগেৰ কিছুকণেৰ মধ্যে। ইষ্টেংগন দলেৰ দুস ও মহামেডান দলেৰ দুজাক আমেদ প্ৰথম এৰ ফুৰপাত গটান ফাটীয়েৰ মধ্য দিহে, এংগ তাৰ মধ্যে দুদাৰ দাখিই ছিল দেনী নাভায়। পৰে দুজাক আমেদ এৰ প্ৰতিপোষ নেবাৰ চেটা কৰেন নাগাংগেৰ বাধানে। প্ৰথমে দুজাক আমেদ নাগাংগকে খুসি যাবেন মহামেডান স্পোৰ্টিংএৰ নিৰিষ্ট সীমানাৰ মধ্যে। তখন ডাঃ দত্ত দুজাক আমেদকে সতৰ্ক কৰে দেন। ফলে ব্যাপাৰ গুততৰ হৰে ওঠে। দৰ্শকবৃন্দ ক্ৰমশঃ চকল হতে শুরু কৰেন। তাৰপৰ আবংগাং তিনি সমস্তাৰ সমুদায় হন বখন দুজাক ও নাগাংগ পৰস্পৰে

মধ্যে পুনৰাব কথা কাটাকাটি শুরু কৰেন। অবশেষে দুজাক ও নাগাংগ দুজনকেই মাঠে থেকে বাৰ কৰে দিহে তিনি সন্তোষকেই সমস্তাৰ সমাপান কৰেন। এৰ ফলে চৰম গোলাবোণেৰ দটি হয়। ইষ্টেংগল জাবের কতৃপক্ষ একবৰণ জোৰ কঠেই নাগাংগকে মাঠেৰ মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। ফলে নাগাংগকে আবংগাং ডাঃ দত্তেৰ নিৰ্দেশ মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। ইষ্টেংগল দলেৰ কতৃপক্ষ ঠাপেৰ খেলোয়াড়গেৰ অভিযোগিতা বৰ্তন কৰবাৰ নিৰ্দেশ দেন। এংগ খেলোয়াড়গণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাঠে ত্যাগ কৰতে বাধ্য হন। হেফাটীৰ বাৰ বাৰ আক্কানেও ঠাৱ কৰপাত কৰেন না। কিছুকণ আপেকা ক'ৰে, হেফাটীৰ অস্থমতি নিয়ে মহামেডান দলেৰ খেলোয়াড়গণও মাঠে ছেড়ে চলে যান। বেলা এখানোই শেষ হৰে যায়। পৰে আই.এফ.এ.-ৰ সম্পাদকেৰ বিৰুদ্ধে ইষ্টেংগল জাব এক অভিযোগ পেশ কৰেন। সেইসঙ্গে হেফাটী ডাঃ জ্যোতি দত্তও এক বিবৰ্তী সম্পাদকেৰ কাছে দাখিল কৰেন। অবশেষে তিনি দিন সমস্তাৰ পৰ সৰ্বসম্মতিক্ৰমে আই.এফ.এ. ইষ্টেংগল জাবকে ১৯৮৮ সালেৰ কেতবাৰি পংখ ও ঐ দলেৰ খেলোয়াড় নাগাংগকে একবছৰেৰ জন্ত সাস্পেণ্ড কৰেন। মহামেডান দলেৰ দুজাক আমেদ কথা চাঙাৰ ঠাৱ প্ৰতি লখু দত্ত অৰ্থাৎ হু'পগ্ৰাহ সাস্পেণ্ড কৰাৰ সিদ্ধান্ত হয়। আই.এফ.এ. দলেৰ এ বিচাৰ ইষ্টেংগল দল যেনে নিতে পাবেননি। ঠাৱ হাইকোর্টেৰ সাহায্য নিৰেছেন এই ব্যাপাৰটিৰ মীমাংসাৰ জন্ত।

উল্লেখযোগ্য যে, দৰ্শকবৃন্দ এই গোলাবোণে অংগ প্ৰাপ্ত কৰেননি এংগ ভবিষ্যতে এই দুইটা প্ৰতিযোগিতাৰ সৰ্ব পৰিচালনাৰ স্বত্ব সাহায্য কৰবে বলেই আশা হয়।

রোডার্শ কাপ

পশ্চিম-ভারতের সর্বপ্রথম প্রেস্ট্র প্রতিযোগিতা রোডার্শ কাপ-এর বেলা প্বে হয়ছে। এই বৎসর হায়দ্রাবাদ পুলিশ দল বিজয়ী হইয়া অর্জন করেছেন। এই নিয়ে তারা মোট ছয়বার এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইলেন। ইতিপূর্বে ১৯৫০, '৫১, '৫২, '৫৩ ও '৫৪ নামে তারা পর পর পাঁচবার বিজয়ী হয়েছিলেন। পুনরায় এই বৎসর বিজয়ী হয়ে প্রমাণ করলেন যে, তারা এখনও ভারতের একটি প্রেস্ট্র স্ট্রীবল দল। আন্তঃপ্রদেশ দল-পরিবর্তনের ফলে কতিপয় হায়দ্রাবাদ পুলিশ দলের এই জয়লাভ সত্যিই কৃতিত্বের পরিচয়ক।

এই বৎসর কলিকাতা হতে প্রেস্ট্র চারটি দলের যোগদানের ফলে এই প্রতিযোগিতার উৎকর্ষ অনেক বর্ধিত হইবে, কিন্তু মহামেজান দল ব্যতীত কোনও দলই উল্লেখযোগ্য ক্রীড়াইনপুয়ার পরিচয় দিতে সক্ষম হননি। মোহনবাগান দল প্রথম বেলাতে জয়ী হইলেও, দ্বিতীয় বেলায় হায়দ্রাবাদ পুলিশ দলের নিকট পরাজিত হন। ইন্টেলেক্স দল সত্বে বলা যায় যে, তাঁদের পরাজয় সত্যিই হুজাগের পরিচায়ক। রাজস্থান দল সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছে তাঁদের বর্তমান বৎসরের সর্বপ্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী মহামেজান দলের নিকট পরাজিত হন। মহামেজান দল ফাইনালে হায়দ্রাবাদ পুলিশ দলের নিকট তিন গোলে পরাজিত হন।

[হায়দ্রাবাদ পুলিশ দল—ইণ্ডিয়ান ক্যাণ্ডার লীগকে ৪-০ গোলে, মোহনবাগান দলকে ২-১ গোলে এবং ক্যাণ্টনমেন্ট দলকে ৩-১, ২-১ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠেন।]

ক্রিকেট :

কলিকাতার ক্রিকেট মরত্ব যদিও এখনও সেদূর জমে ওঠেনি, তথাপি ইতিমধ্যে সি.এ.বি. লীগের বেলা শুরু হয়ে গেছে। সর্বপ্রথম বৎসরের ভুলনায় এই বৎসরের প্রতিযোগিতাওগি অধিক আকর্ষণীয় হবে বলে মনে হয়। এই বৎসরে বিভিন্ন নামকরা খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তনের ফলে কতকগুলি টিমের দলগত শক্তি অনেক পরিমাণে বর্ধিত হয়েছে। এই বৎসরে কলিকাতা ৫-০ জন্ম খেলোয়াড় দল পরিবর্তন করেছেন। প্রধান কয়েকজনের নাম—রাজস্থান দলের ডি. জি. ফাদকর, ডি. বোশী, এ. বেন শোটিং ইউনিয়নে এবং আর্থ. কে. ভিটলু কালীঘাট দলে যোগদান করেছেন। ইন্টেলেক্স দলের অবিল ভট্টাচার্য

ও কালীঘাটের সি. বি. দত্ত মোহনবাগান দলে যোগদান করেছেন। এমিগ্রেশের কল্যাণ বিশ্বাস ও পোর্ট কমিশনারের বি. গুপ্ত কালীঘাট দলে যোগদান করেছেন। ইহা ছাড়াও তাঁদের দলে ভারত-বিশ্বায় টেস্ট-খেলোয়াড় এস. সি. গুপ্ত রয়েছেন।

১৯৫২ সালের গ্রীষ্মকালে ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংলণ্ড সফর করবেন। এই উপলক্ষে এক ক্রীড়াসূচী তৈরি হয়েছে। এই সূচী অনুযায়ী ভারতীয় দল ইংলণ্ডে মোট পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ খেলবেন।

প্রথম টেস্ট ম্যাচ : ট্রেট ব্রীজ—৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯ই জুন।

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ : লর্ডস—১৮, ১৯, ২০, ২১ ও ২৩শে জুন।

তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ : সৌন্দ—২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ই জুলাই।

চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ : ওক টাকোর্ড—২৩, ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৮শে জুলাই।

পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ : ওভাল—২০, ২১, ২২, ২৪ ও ২৫শে আগস্ট।

ইহা ছাড়াও এই দল কয়েকটি প্রদর্শনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে।

হকি :

মাহাজ ইন্ডিয়ানিং গ্রুপ (বাঙ্গালোর) দল ভারতীয় খেলপথে দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে 'খ্যানচাঁদ হকি প্রতিযোগিতা'র বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরাই এই বৎসরের 'আগা খাঁ প্রতিযোগিতা'র বিজয়ী দল। একই বৎসরে হুইট সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা খুবই কৃতিত্বের কথা বলেই নাই।

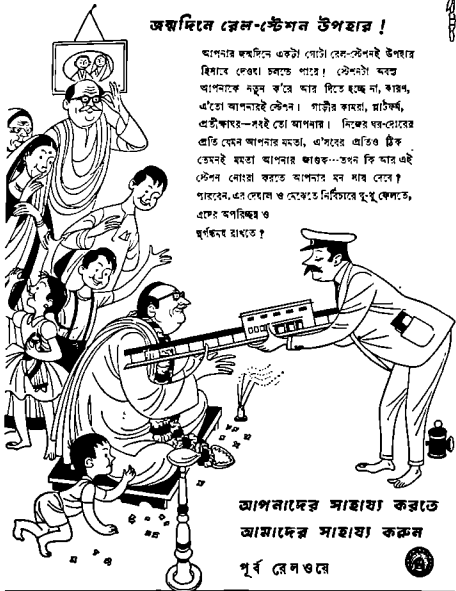
কলিকাতার হকি মরত্বও আসতে এখনও প্রায় দুইমাস বাকি। তথাপি হকি-ক্রীড়াবোশীদের মধ্যে এখন থেকেই বেশ সোহসোল গড়ে গেছে।

টেনিস :

বিশ্ববিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় জ্যাক ক্রেমারের অধিনায়কত্বে এবারে বিশ্বের চারজন সেরা খেলোয়াড় টেনিস খেলোয়াড় কলকাতার সাউথ ক্লাব টেনিস-লনে গত ১৬ই ও ১৭ই নভেম্বর ৬টি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে গিয়েছেন। এই বেলা দেখার সর্ব প্রচুর দর্শকের সমাবেশ হয়। কিন্তু বিশেষ দলের প্রথম দিনের বেলা দেখে দর্শকবৃন্দ তেমন পরিতুষ্ট হননি। কারণ প্রথমদিন বিশেষ দলের বেলা তেমন উৎসাহের হয়নি। দল

জন্মদিনে রেল-স্টেশন উপহার !

আপনার জন্মদিনে একটা গোটা রেল-স্টেশনই উপহার হিসাবে দেওয়া চলতে পারে ! স্টেশনটা যত আপনারকে দখল করে আর দিতে হচ্ছে না, কারণ, এঁতো আপনারই স্টেশন। গাড়ীর কামরা, মাস্টার্স, প্রতীক্ষায়র—সবই তো আপনার। নিজের ঘর-দোরের প্রতি যেমন আপনার মমতা, এঁসবের প্রতিও টিক তেমনই মমতা আপনার আগুক—তখন কি আর এই স্টেশন নোংরা করতে আপনার মন দাখ বেরে ? পারবেন, এর দেখান ও মেকতে নির্বিচারে দুখু কেলতে, এদের অপরিচ্ছন্ন ও স্বর্ণভদ্র রাখতে ?



আপনাদের সাহায্য করতে

আমাদের সাহায্য করুন

পূর্ব রেলওয়ে



বেলাভদিই এদিন 'স্টেট সেট' খেল হই। স্ততঃই কোনো খেলাতেই তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভব করা যায়নি। তবে তার প্রতিদানে বিদেশী দল বলিবার যে খেলা দেখিয়ে গিয়েছেন তা সত্যিই মনে রাখার মতো। রবিবার বিদেশী দলের খেলা দেখার পর সত্যিই মনে হয় যে, ভারতীয় খেলোয়াড়রা এখনো কত পেছনে। যা হোক, টেনিস-কোড়াখোঁরা বিদেশী খেলোয়াড়দের হাতের নিখুঁত কোর-হাও ও ব্যাক-হাও ড্রাইভ, পাসিং শট, ম্যান, ইত্যাদি মার দেখে প্রচুত আনন্দ লাভ করেছেন। আপা করা যায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা এর থেকে অনেক শিক্ষার খোরাক পাবেন। ভারতীয় টেনিসের অগ্রগতি বিদেশী খেলোয়াড়দের এই খেলার প্রদর্শনে যে আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার সাহায্য পেল তা বলাই বাহুল্য। চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে বিশ্বপ্রতি পেশাদার টেনিস-খেলোয়াড় রিচার্ড গান্ডালেনস বিজয়ী পাকো সেত্তা ও কেন্ন রোকগালেনের খেলা বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। বিশেষী দলের অধিনায়ক জ্যাক ক্রেমার কলিকাতার আতিথ্যে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং সাউথ ক্লাবের লনকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস-লন বলে মন্তব্য করেছেন। এই টেনিস-লনের মতো, আমাদের ভারতীয় খেলোয়াড়রাও অল্প জবিরত হাতে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ টেনিস-খেলোয়াড় হতে পারেন সেই আশাই কহি। নীচে হু'দিনের খেলার ফলাফল দেওয়া হলো :

রবিবারের খেলা :

সিঙ্গলস : কেন্ন রোকগাল (অস্ট্রেলিয়া)—৩৩, ৩৩ সেটে দুই হোডকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।
পাকো সেত্তা (ইকোয়েডর)—১৪, ১৫ সেটে জ্যাক ক্রেমারকে (হুজরাই) পরাজিত করেন।

ডাবলস : জ্যাক ক্রেমার ও সেত্তা—১৪, ৩৪ সেটে দুই হোড ও কেন্ন রোকগালকে পরাজিত করেন।

রবিবারের খেলা :

সিঙ্গলস : কেন্ন রোকগাল—১৫, ১৫ সেটে পাকো সেত্তারকে পরাজিত করেন। জ্যাক ক্রেমার—৩৩, ২৩, ৩৩ সেটে দুই হোডকে পরাজিত করেন।

ডাবলস : দুই হোড ও কেন্ন রোকগাল (অস্ট্রেলিয়া) ৩২, ১৬, ৩৩ সেটে পাকো সেত্তা ও জ্যাক ক্রেমার (হুজরাই)-কে পরাজিত করেন।

নীচে এই চারজন টেনিস খেলোয়াড়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো—

১। জ্যাক ক্রেমার—১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি

তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রেমার ১৯৪৪ এবং ১৯৪৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিঙ্গলস-চ্যাম্পিয়ন এবং ১৯৪৭ সালের উইম্বলডন-বিজয়ী। তিনি ১৯৪৮-৪৭ সালের বিজয়ী দ্বিট হোডকে কিছুদিন পূর্বে পরাজিত করেছিলেন। ইনিই এই পেশাদার দলের নেতা।

২। জাক্সি সেত্তা—১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২-শে জুন তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন। সেত্তা ১৯৪৩-৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩নং খেলোয়াড় রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে ওয়েসলিতে ১৪৫ মিনিটে রোকগালেনের নিকট পরাজিত হন, এবং পেশাদার প্রতিযোগিতায় চারবারের বিজয়ী রিচার্ড গান্ডালেনসকে সেমি-ফাইনালে পরাজিত করেন। সেত্তা সাধারণতঃ পাসিং-শট এবং ম্যান-রাইসেই অধিক দক্ষ।

৩। কেন্ন রোকগাল—১৯৩৪ সালের ২রা নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত সিডনিতে জন্মগ্রহণ করেন। রোকগাল অতি কিশোর বয়সেই টেনিস খেলার কৌশল-সমূহ আরম্ভ করে ফেলেন। তিনি মাত্র ১২ বৎসর বয়সে ১৯৫৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার গুকে ডেভিস কাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যান। রোকগাল ১৯৫৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার সিঙ্গলস-চ্যাম্পিয়ন এবং উইম্বলডনে রানার্স-আপ হয়েছিলেন। তিনি ১৯৫৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিঙ্গলস-চ্যাম্পিয়ন।

৪। দ্বিট হোড—১৯৩৪ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিস্‌ব্যান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বিশেষগত পেশাদার খেলোয়াড়দের মধ্যে ইনিই সর্বাধিক বয়স্কনিষ্ঠ। হোড ১৯৫৩, '৫৪, '৫৫ ও '৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়া দলের হয়ে ডেভিস কাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ১৯৫৬ সালে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৫৭ সালে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হবার পর তিনি ক্রেমারের পেশাদার দলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তির শর্তানুসারে তিনি পঁচিশ মাসের জন্য ৫০,০০০ পাউণ্ড বা প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা পাবেন ; এ ছাড়াও লাভের অংশ আছে।

ব্যাজমিটন :

হারত্রাবাবে এই বৎসর 'জাতীয় ব্যাজমিটন প্রতিযোগিতা'র যোগদানের জন্য বাংলার দলে নিয়মিত খেলোয়াড়গণ নির্বাচিত হয়েছেন—

প্রথম বহু (অধিনায়ক), জি. হোমতি, বিক্রম ভাট, রঞ্জিত খান্না, অম্বুকার খেব, গোরা ঘোষ ও মিস নীলিমা ভিক।

অ্যাথলেটিক্স :

সমগ্রি নবাবশিরাজে নিখিল ভারত অ্যাথ-রেলওয়ে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতে গেল। এই প্রতিযোগিতায় চারিটি ভারতীয় রেকর্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের আর. ডি. থেলো ২৭ ফুট ২৩ মি: ২'৪ সেকেন্ডে ম্যারামন জিতে—ভারতের ছোট সিং-এর এলিয়ার রেকর্ড ২ মি: ৪২ মি: ৩৮'৪ সে: ভঙ্গ করিয়াছেন। সাশান রেলওয়ের সি. এম. মুখিয়া ৪,৩৯২ পায়ে লাত করে ডেকাশনে নতুন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের রামচন্দ্রন ১২ ফুট ৪ ইঞ্চি লাফিয়ে পোল-জাম্পে রেকর্ড সৃষ্টি করেন। সাশান রেলওয়ের রিলে হল ৪২'৮ সেকেন্ডে ৪ x ১০০ মিটার বিলিতে ভারতীয় রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

ভার-উত্তোলন :

ত্রেহগানে যে 'বিশ ভারোত্তোলন-প্রতিযোগিতা' হয়, তাতে ভারতীয় দল যোগদান করিয়াছিলেন। মোট ত্রেহো তনকে নিয়ে ভারতীয় দল গঠিত হইয়াছিল। ভারতীয় দলের মধ্যে কেউই এই প্রতিযোগিতায় প্রথম চতুর্থের মধ্যে স্থানলাভ করতে পারেননি। এতে বোঝা যায় যে, ভারতের প্রতিযোগীদের মান কত নিম্নতর। এ দৃষ্টেও প্রচুর স্বপ্নাব করে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করার স্বপ্ন বোঝা যায় না। আমাদের ভার দরিদ্র দেশের দিকে একদল অশচর্য্য কাজই একান্ত কর্তব্য। বর্তমান পর্যন্ত আমরা এই বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দিকে প্রতিযোগিতা করার উপদ্রুত না হই, ততদিন দেশে থেকে অসুখীলন করা কর্তব্য—এবং তার পর বিশ্বের প্রতিযোগিতায় যোগদান করা উচিত।

সাঁতার :

কিছুদিন আগে আজাদ হিব বাগে 'পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতা' শেষ হয়ে গেছে। এবার ১৪টি বিভাগে পুরানো রাজ্য-রেকর্ড ভেঙে বাঙ্গাল কুতী সাঁতারুগা নতুন রাজ্য-রেকর্ড করেছেন। এ কুতির দড় কম কথা নয় এবং এ থেকেই বাঙ্গাল সাঁতারের মান যে বেশ উন্নতগতিতেই ক্রমোন্নতির পথে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এবারে বাঙ্গাল কুতী কিশোর-সাঁতারু শ্রীবেদীনাথ তাদুকদার সাধারণ বিভাগের বৃক্ষ-সাঁতারের ১০০ ও ২০০ মিটারে আবার ভারতীয় রেকর্ডকে ভাঙ করে দিচ্ছে। শ্রীমান বেদীর এই ক্ষমতা ক্রমোন্নতি যদি সত্যিই উপদ্রুত বিচার আওতাধীন পড়ে তবে ভবিষ্যতে বৃক্ষ-সাঁতারে সে

বিশ-রেকর্ড করলেও আশ্চর্য্য হবার কিছু থাকবে না। এবার মেঘেরের বিভাগে সন্ধ্যা চন্দ্রও বড় কম কুতিরের অধিকারিণী নয়। সে স্বাক্ষরে ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার ক্রী-সাঁতাইলে নতুন রেকর্ড করেছে। অবশ্য আগের রেকর্ডগুলিও সেই করেছিল।

এবারে ওখটার পোলো নক-আউট প্রতিযোগিতার ফাইনালে সেল্টাল হাইবিং ক্লাব ক্রাশানাল দলকে ৪-২ গোলে হারিয়ে বিজয়ী সন্মান লাভ করেছেন। এই জয়কে লীগের প্রতিশোধ বলা যেতে পারে।

নীচে যে সমস্ত বিষয়ে নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হলো :

সিনিয়র বিভাগ

১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক—বেদীনাথ তাদুকদার (ক্রাশানাল)—সময় ১ মিনিট ১৯'৮ সেকেন্ড (পূর্বের ভারতীয় রেকর্ড—১ মি: ২১'৬ সে:—হুসুলত সিং—সার্ভিসেস; আগের রাজ্য-রেকর্ড—১ মি: ২২'৪ সে:)।

২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক—বেদীনাথ তাদুকদার (ক্রাশানাল)—সময় ২ মি: ৪৩'১ সে: (পূর্বের ভারতীয় রেকর্ড—৩ মি: ৫'৪ সে:—সামনের ঝাঁ—সার্ভিসেস; পূর্বের রাজ্য-রেকর্ড—৩ মি: ৪'৩ সে:)।

১০০ মিটার বাটার-ফ্রাই স্ট্রোক—অরুণ সাহা (অগাধননী ক্লাব)—সময় ১ মি: ১৪ সে: (পূর্বের রাজ্য-রেকর্ড—১ মি: ১৭'২ সে:)।

৪ x ১০০ মিটার মিডলে রিলে—স্টেট ট্রান্সপোর্ট—সময় ৪ মি: ৮'৫ সে: (পূর্বের রাজ্য-রেকর্ড—৪ মি: ১৪'৪ সে:)।

ইন্টারমিডিয়েট বিভাগ

১০০ মিটার ক্রী-সাঁতাইল—কানাই চ্যাটার্জী (বৌবাজার বি. এস.)—সময় ১ মি: ২'২ সে: (পূর্বের রাজ্য-রেকর্ড—১ মি: ২'৪ সে:)।

১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক—হুলাল কুতু (চাতরা এস. সি.)—সময় ১ মি: ২১'৬ সে: (পূর্বের রাজ্য-রেকর্ড—১ মি: ৩০'২ সে:)।

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক—বি. মজুমদার (এস. এস. সি.)—সময় ১ মি: ২৪'৪ সে: (পূর্বের রাজ্য-রেকর্ড—১ মি: ২৪ সে:)।

১০০ মিটার বাটার-ফ্রাই স্ট্রোক—হুলাল কুতু (চাতরা এস. সি.)—সময় ১ মি: ২৩ সে: (পূর্বের রাজ্য-রেকর্ড—১ মি: ২১'৬ সে:)।

জুনিয়র বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রী-স্টাইল—সত্যেন দাস (জাশনাল)
—সময় ১ মি: ২৩'৩ সেক: (পূর্বের রাজ্য-রেকর্ড—১ মি:
২৩'৩ সেক:)।

১০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোক—তপন দত্ত (সেন্ট্রাল)
—সময় ১ মি: ২৪'১ সেক: (পূর্বের রাজ্য-রেকর্ড—১ মি:
২৪ সেক:)।

১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক—অমল চন্দ্র (সেন্ট্রাল —
সময় ১ মি: ২৮'৪ সেক: (পূর্বের রাজ্য-রেকর্ড—১ মি:
২৮'২ সেক:)।

৪ x ১০০ মিটার মিডলে রিলে—জাশনাল হুইমিং

অ্যাসোসিয়েশন—সময় ৪ মি: ৪৪'৮ সেক: (পূর্বের রাজ্য-
রেকর্ড—৪ মি: ৪৩'৮ সেক:)।

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রী-স্টাইল—সফা: চন্দ্র (সেন্ট্রাল)—সময়
১ মি: ২৩'৪ সেক: (পূর্বের রাজ্য-রেকর্ড—১ মি: ২৮'৪ সেক:)।

১০০ মিটার ফ্রী-স্টাইল—সফা: চন্দ্র (সেন্ট্রাল)—সময়
৩ মি: ১০'৭ সেক: (পূর্বের রাজ্য-রেকর্ড—৩ মি: ১৭ সেক:)।

৪০০ মিটার ফ্রী-স্টাইল—সফা: চন্দ্র (সেন্ট্রাল)—সময়
৩ মি: ৩৪'৩ সেক: (পূর্বের রাজ্য-রেকর্ড—১ মি: ৪৭'৭ সেক:)।

কিশোর-কীর্তক বৈদ্যনাথ ডাকবাজারে 'বহুযোগ্য কঠিন শ্রমে'তে
প্রকাশিত চিত্রটি প্রবর্তক শ্রমজগৎ কল্ল কল্লিত।

কোন : ২২-৪৬৮৭

এস, মুখার্জী এণ্ড কোং

[কাগজ ও মুদ্রণের কালি বিক্রেতা]

পি. ২২-৪, রাধাবাজার ট্রাট, কলিকাতা ১

পরিচালক :

টিটাগড় পেপার মিল্‌স কোম্পানী লিমিটেড

এবং

হগলি ইঙ্ক কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড



শেষ পাতা



জনৈক ডায়েরিটিন-পীড়িত দেশনেতাকে নতুন এক চিনির কারখানার ব্যারান্ডাটনের দৃষ্ট অমুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাতে অসম্মত হয়েছেন। স্বভাবতঃই আরেকটি চিনির কারখানা খোলার তার উৎসাহ হয় না।

সংকল্প হঠকে ভিনের মতই। কাজে না লাগালে আপনা থেকেই তা পড়ে যায়।

একজনের চিঠি :

‘ছেলে মানুষ করা কী কঠিন কাজ। কি করে ছেলেদের মানুষ করি বলতে পারেন?’



পরের ছেলে বলে ভাবুন। পরের ছেলে কি করে মানুষ করতে হয় সবাই জানে।

রানাঘাট পেরিয়ে পাকিস্তানে পা দেবার আগেই ভারতীয় কাস্টমের কর্মচারীরা তাঁকে প্রায় বিবস্ত্র করে ছেড়েছে বলে জনৈক পাকিস্তানী ঢাকায় গিয়ে অভিযোগ করেছেন। তাঁর পরনে মোটে চারখানি আনকোরা খুঁটি ছিল, তার তিনখানাই নাকি তার খুলে নিয়েছে।

যাক, একেবারে না-চার করেনি। ঢাকা যাবার মত কিছু রেখেছিল।

‘প্রবৃত্তির সঙ্গে কি করে লড়াই করা যায় দয়া করে যদি জানান...’ (পত্রাংশ)

প্রবৃত্তির সঙ্গে আমি কখনো লড়াই করিনে। আমার ভর করে, পাছে আমি জিতে যাই!

‘গান্ধিজী বানিয়া ছিলেন।’

নতুন ভারতবর্ষকে তিনিই বানিয়ে গেছেন, সত্যি!

‘হল্যান্ডের কমিউনিস্ট নেতাদের ধারণা ছিল যে ইন্দোনেশিয়ার জনগণ জাতীয়তাবাদী ডাঃ হাতাকে দূর করে শেষপর্যন্ত কমিউনিস্ট গবর্নেন্ট কায়েম করবে।’ (ইতিহাস-প্রসঙ্গ)

বদেশী হাতার চেয়ে বিদেশী বেড়ি বৃষ্টি ভালো?

‘রাখালের মাঠে গোকুল চরাতে গিয়ে পান ধরে। কী-সুরে গায় কে জানে!’ (উদ্ধৃতি)

Cow-গালি!

ভারত আর পাকিস্তানের ভেতরে তলে তলে কান্দীর ভাগাভাগির আয়োজন চলছে—বাগবাজারী গুজব।

‘কে নেবে আ-কাশ, কে হবে আ-মীর?’

ভালোবাসা বেলে মশাই, কিন্তু ভালো বাসা বেলাই যায়!

সংস্কৃতির প্রসারের জন্তে বাংলা সরকার সর্বত্র নতুন নতুন টোল খুলতে সাহায্য করবেন বলে জানিয়েছেন।

সংস্কৃতির না হয়ে স্বন্দরীদের গালের হলে অনেকই টোলে পড়তেন—নিঃসন্দেহই!

পাকিস্তান কাবুলের সঙ্গে অর্ধনৈতিক বিষয়ে আলোচনা চলতে রাজী হয়েছেন। জনৈক বিশেষজ্ঞের বিবেচনায়, কাবুলীদের ঠাণ্ডা করবার



কাবুল-পাকিস্তানী গোলাঘোগের আসল ওষুধ এতদিনে পাওয়া গেছে।

আসল ওষুধ—বগুন!

“অপরকে বই ধার দেয়া ঠিক কি?”—একজনের জিজ্ঞাসা।



Ask thy SHELF!

জনাত্তিক শোনা:

‘ভানো গিন্নি, মহিমের হাতটা তিন ডাঙগায় ভেঙেছে।’

‘বেশ হয়েছে। এবার ওর শিক্ষা হবে। আর সে ওসব জায়গায় যাবে না।’

একজনের চিঠি:

“ম’মাসের ভারানো কানের মাকড়ি ঠাঁচতে গিয়ে আমার তিন বছরের মেয়ে মীতুর নাকের ভেতর থেকে বেরিয়েছে। ‘বিধাস: নৈব কর্তব্য: জীহ্ব—’ যে বলে থাকে, সেটা নেহাত মিছে না...” না হাচালে বিধাস নেই!

“তারপরেই ল্যাংচার পতন হোলো।” (চীনের ইতিহাস)

পড়লো। কমিউনিস্টদের পাত্তেই। ল্যাংচাতে লাগলেন চ্যাংকেইসেক!

পণ্ডিত নেহরু তাঁর হিন্দীভাষণে ‘বানানা’ শব্দটি গঠনকর্মের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু বিদেশী সংবাদদাতারা ভুল করে তাঁর বক্তৃতায় কলার গুণগান আছে বলে মনে করেছিল। —জনৈক সংবাদদাতা।

আসলে তো একই। গঠন-কলাও আটগুণ ফলাও হলে অষ্টরত্তা!

হিন্দী ভাষ্যভের রাষ্ট্রভাষা তো হয়েচেই, এবার তাকে জোর কদনে চালু করার চেষ্টা করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

বাঙালীর ‘হায় হায়’ আরো শুধু বাড়ুলো নাত্র!

‘তুলে পাক ধরার অব্যর্থ কোনো দাবাই আপনার জ্ঞান আছে?’

আছে। তা হচ্ছে টাক ধরানো।

ধার বেয়ার চেয়ে একেবারে দিয়ে ফেলা ভালো। কেননা, ভেবে দেখলে খটা প্রায় একই।

বেয়েরা ত্বরকমের। মনের মত আর জীবনের মত।

প্রীতি দ্বিতীয় শ্রেণীর।

প্রত্যেক প্রেমেরই তিনটে দিক আছে। তোমার দিক, আমার দিক আর স্নায়ের দিক।

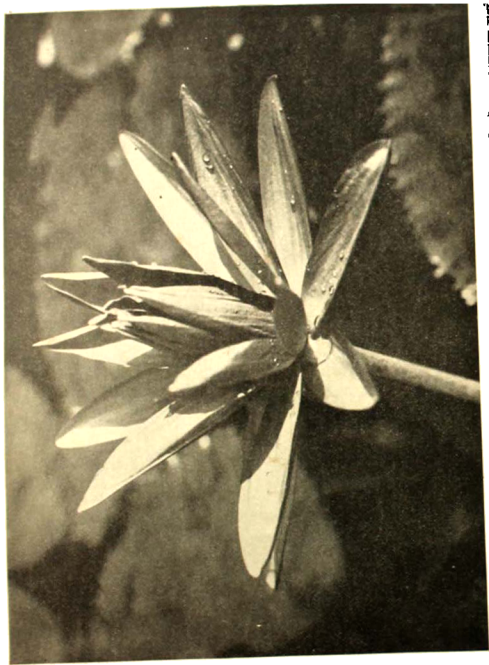
সম্পাদক—শ্রীচাক্রম ভট্টাচার্য

কে. পি. বহু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১, মহেন্দ্র গোস্বামী সেন, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীকেশবনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত
এবং প্রথম বর্ষ ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত



পসারিনী

[ফটো : বিশ্বজিৎ ঘোষ]



「 花 蓮 」 : 蓮 花 花 蕾 花 蕾

বসুধারা

প্রথম বর্ষ

পৌষ, ১৩৬৪

২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

সফ্রেটিসের মৃত্যুশয্যা

নিবন্ধাথ দাস্ত্রী

মেটো সফ্রেটিসের একজন অল্পবয়স্ক শিশু ছিলেন এবং এখিনীচরণ যখন হেমলক বিষ পান করাইয়া সফ্রেটিসকে হত্যা করেন, তখন মেটো সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সফ্রেটিসের মৃত্যুকালে বাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন তাহার নিয়মিত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন :

এই সকল বলার পর তিনি উঠিয়া চন্দ্রপদ ঘৌত করার জন্য আর একটি ঘরে গেলেন। ফ্রাইটন তাঁহার অঙ্গসংরূপ করিলেন, কিন্তু তিনি আনাদিগকে তাঁহার গুপ্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়া গেলেন, মৃতরাঃ আনরা অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। এবং তিনি যেসকল বিষয় বলিয়া গেলেন, সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলাম। আনরা ব্যক্তিবিক অশুভব করিতে লাগিলেন যে পিতৃ-বিয়োগে সন্তানের মৃত্যু আনাদিগকেও অবশিষ্ট কাল পিতৃহীন হইয়া কাটাতে হইবে। হস্তপদ ঘৌত হইলে তাঁহার পূরদিগকে তাঁহার নিকট আনা হইল। তাঁহার দুইটি অতি অল্পবয়স্ক পুত্র ও একটি অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক পুত্র ছিল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাগণও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি যখন তাঁহাদের সহিত কথা কহেন তখন ফ্রাইটনও সেখানে ছিলেন। তিনি বালকগণকে ও মহিলাগণকে ঘোষণাযুক্ত উপদেশ প্রদানান্তর ঘাটতে বলিলেন এবং নিজে আনাদের নিকট আসিলেন তখন নৃধ অস্ত্রাঙ্গগত-প্রায় : কারণ তাঁহার আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্থান করিয়া আসিবার পর আর অধিক কথা কহিবার অবসর পাটিলেন না, কারণ একাদশ কারাধ্যক্ষের ভৃত্য তখন আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহার সরিষানে প্ত্যতনান হইয়া বলিল, “সফ্রেটিস, অপরাধের ব্যক্তিহিত আনি বাতা দেখিয়াছি তাহা তোমাতে দেখিতেছি না। অর্থাৎ ম্যাট্রিষ্টেসিগের নিয়োগে আনি যখন তাহাদিগকে বিধপান করিবার কথা জানাইয়াছি, তখন তাহারা প্রায় সকলেই আনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে ও আনাকে পালাগালি নিদাছে। কিন্তু অপরাধকে এখানে অস্ত্রাবধি হত লোক আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে আনি তোমাকে সর্বাপেক্ষা উদার, বিনয় ও সন্তুণ্ণবাকী দেখিতেছি; সেই জন্যই আমার প্তবিবাস যে তুমি আনার প্রতি কুপিত হইতেছ না; তবে এক্ষণে বিদায়, তুমি দ্বিভিত্তেই পাতিতেছ আনি

কি ক্ষুদ্র আশিরাহিলাস। যথাসাধ্য প্রশান্তভাবে এই অপরিসীম কার্য সম্পাদন কর।” এই কথা বলিতে বলিতে সে ব্যক্তি কামিয়া ফেলিল এবং আনন্দের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সেখানে হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু সফ্রেটিস তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “তোমাকেও বিদায়, তোমার পরামর্শনত কার্য করিব।” অনন্তর আনন্দের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, “এ লোকটির ব্যবহার কি সৌভাগ্যপূর্ণ, এখানে আমার আসি। অবধি ও ব্যক্তি অনেকবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে ও সর্বশেষ নিজের সাধুতার পরিচয় দিয়াছে। এখনও কিরূপ সবাশয়, আমার ক্ষুদ্র কিরূপ কামিতেছে। ক্রাইটন, এখন উহার আদেশ অনুসারে কাজ করা উচিত; বিষ যদি প্রস্তুত হইয়া থাকে কাছাকেও আনিতে বল। যদি এখনও প্রস্তুত না হইয়া থাকে, যাহার প্রতি উহা প্রস্তুত করিবার ভার আছে, তাহাকে সহর প্রস্তুত করিতে বল।” ক্রাইটন বলিলেন, “সফ্রেটিস, এখনও সূর্য ক্রান্ত হইয়া নাই, গিরিশৃঙ্গের উপরে এখনও দেখা যাইতেছে। আমি অনেক লোকের কথা শুনিয়াছি, তাহানিগকে বিষ পান করিবার আদেশ করিবার পরেও তাহারা অনেককাল বিলম্ব করিয়াছে ও সেই সময়ের মধ্যে উত্তমরূপে পান-ভোজন করিয়াছে। অতএব তাড়াতাড়ি করিয়োনা, এখনও যথেষ্ট সময় আছে।” সফ্রেটিস উত্তর করিলেন, “ক্রাইটন, সে সকল লোকের পক্ষে সেইরূপ করাই ঠিক, কারণ তাহারা মনে করে এই প্রকার করিতে তাহাদের কিছু লাভ আছে, কিন্তু আমার পক্ষে এতদূর না করাই উচিত, কারণ আমি বিলম্ব করিয়া পান-ভোজন করিতে কোনও লাভ দেখি না, পরন্তু আপনার চক্ষে আপনি উপহাসাম্পন্ন হইব, কারণ তাহাতে এই দেখাইবে যে আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই এবং এ জীবন ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহি, যখন ইহা জানি যে এ জীবন শুধু একপ্রকার গিয়াছেই। অতএব যাও, আমার কথা শুন এবং আমার আদেশ অনুসারে কার্য কর।”

এই কথা শুনিয়া ক্রাইটন তাহার নিকট দণ্ডায়মান বালককে স্তম্ভিত করিলেন। সে চলিয়া গেল এবং কিয়ৎকাল পরে যে বিষ খাওয়াইবে সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া আসিল। সে ব্যক্তি একটা বাটীতে করিয়া গুঁড়া বিষ লইয়া আসিল। সফ্রেটিস তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আচ্ছা ভাই, তুমি শু শু সব জান, বল দেখি কি করিতে হইবে?” সে ব্যক্তি বলিল, “এখন বিশেষ কিছু করিতে হইবে না, আপনি এইটা পান করার পর বেড়াইতে থাকিবেন, যতক্ষণ না পা ছুটো ভারি হয়। পা ভারি হইলেই শয়ন করিবেন, আর কিছুই করিতে হইবে না।” এই বলিয়া সে বিষের বাটীটা সফ্রেটিসের হাতে দিল। ভাই ইবিক্রেটিস, কি বলিব, সফ্রেটিস আনন্দিত অন্তরে তাহার হস্ত হইতে বিষের পাত্রটি লইলেন। তাহার আকৃতিতে কোনও উবেগ বা পরিবর্তন লক্ষিত হইল না। তাহার প্রচলিত রীতি অনুসারে, সেই ব্যক্তির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি বল? দেবতাদিগকে নিবেদন করিবার ক্ষমতা কি এই পাত্র হইতে কিয়ৎকাল দিতে পারি?” সে ব্যক্তি বলিল, “যতদূর প্রয়োজন আমরা ততদূর বিষ প্রস্তুত করি, অধিক করি না।” সফ্রেটিস বলিলেন, “তোমার কথা শুনিলাম, কিন্তু দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদন করা ও তাহাদের নিকট প্রার্থনা করা কর্তব্য, যেন ইহকাল হইতে অবসৃত হইয়া আমার আশ্রয় কল্যাণ হয়।” এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল স্থিরভাবে থাকিলেন, তৎপরে প্রদম্বচিত্তে বিষের পাত্র মুখে তুলিয়া দিলেন। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্যবলম্বন করিয়া ছিলাম; কিন্তু যখন তাহাকে বিষের পাত্র মুখে তুলিতে দেখিলাম ও বিষ পান করিয়া ফেলিলেন জানিলাম তখন আর অশ্রু সহরণ করিতে পারিলাম না। আমার কথা এই বলিতে পারি, আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও অশ্রু থামাইয়া রাখিতে পারিলাম না। দুই এক বিন্দু নহে, জলস্রোতের দ্রায় আমার অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি

আমার গাত্রবস্ত্রে নিজের মুখ আব্বাধান করিয়া বালকের ছায় কাঁদিতে লাগিলাম। তাঁহার হৃর্ভাগ্যের কথা মনে হইল না, কিন্তু সঙ্গী ও গুরু হারাষ্টলান বলিয়া আপনার হৃর্ভাগ্যের কথাই মনে হইতে লাগিল। ফ্রাইটনও চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আমার অগ্রে উঠিতে হইল। এপোলোডার পূর্ব হইতেই কাঁদিতেছিলেন, এক্ষণে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া সফ্রেটিস ব্যতীত উপস্থিত সকলেই কাঁদিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সফ্রেটিস বলিয়া উঠিলেন, “বাঃ, তোমরা ত বেশ লোক ! তোমরা করছ কি ? বলিতে কি, পাছে এইপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয়, এই ভয়েই আমি জীলোকদিগকে থাকিতে দিই নাই, কারণ আমি শুনিয়াছি, মৃত্যুকালে ক্রন্দনের শব্দটা অমঙ্গল ; অতএব স্থির হও, ধৈর্যধারণ কর।” আনরা যখন এই কথা শুনিলাম তখন লজ্জিত হইয়া অশ্রুনিবারণ করিলাম। তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে যখন দেখিলেন যে পদদ্বয় ভারি হইতেছে, তখন তি হইয়া শয়ন করিলেন, এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে বিধ দিয়াছিল, সে মধ্য মধ্যে তাঁহার পদদ্বয় পরীক্ষা করিতে লাগিল, তৎপরে তাঁহার একখানা পায়ের পাতাতে ছোরে চাপ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তিনি তাহা জানিতে পারিলেন কি না ? সফ্রেটিস উত্তর করিলেন যে তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। তৎপরে সে ব্যক্তি তাঁহার উরুদ্বয় চাপিল, ক্রমে উপরে হাইতে লাগিল। আমাদিগকে দেখাইল, কেমন তাঁহার শরীর শীতল ও

স্পন্দহীন হইতেছে। সফ্রেটিসও নিজ শরীরের স্থানে স্থানে স্পর্শ করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—যখন বিধ তাঁহার শাসাধার পর্যন্ত পৌছিবে, তখন তাঁহার প্রাণবায়ু দেহকে পরিত্যাগ করিবে। ক্রমে তাঁহার শরীরের নিরুদ্ধ-সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল, তখন তিনি একবার মুখের আবরণ উন্মোচন করিয়া বলিলেন, “ফ্রাইটন, ইকুলিটিয়সের একটা মোরগের দাম দেওয়া হয় নাই। সেই দামটা দিতে তুলিয়োনা।” এই তাঁহার শেষ কথা। ফ্রাইটন বলিলেন, “তুলিব না। মনে করিয়া দেখুন আপনার আর কোন আদেশ আছে কি না।” তিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে একবার নড়িলেন। তখন সেই ব্যক্তি তাঁহার শরীরের আবরণ খুলিয়া দিল। তদনন্তর সফ্রেটিস উর্ধ্বনৈর হইয়া রহিলেন, তাহা দেখিয়া ফ্রাইটন তাঁহার চক্ষু ও মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। এই ক্রমেই হে ইটিফ্রেটিস, আমাদের গুরু ও উপদেষ্টার জীবন অবসান হইল। আমার জীবনশয্য যত মাদুঘ দেখিয়াছি তদ্বধ্যে তিনি ক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। বীরতা ও বিজ্ঞতাতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

মিঃটিমি, ২২শে নভেম্বর ১৮২৪

স্থখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত পেরিয়ার লিখিত ‘কীডন’ নামক গ্রন্থের ইংরাজী অনূবাদ হইতে ‘সফ্রেটিসের মৃত্যুশয্যা’ অনূদিত।

কঙ্কণ

অক্ষয়কুমার সেন

পন্থা।

কুমার বিষমুখে অস্থাপুরে প্রবেশ করল।

তার ভ্রাতৃ হীরকখচিত কাফন-আসন তৈরি।

চারদিকে যুগশাবকলোচনা বরজনাথের ভিড়।

বিচিত্র বাজনা বাজাচ্ছে তারা কিন্তু বাজ্ঞানি কানে

যেন হলাহল ঢেলে দিচ্ছে। রক্তাসনে বসল বাটে

সিদ্ধার্থ কিন্তু মনে স্পৃহা নেই শান্তি নেই। বন

অভিনিব্রমণেই সমুৎসুক। যে পুরুষোত্তম তার

সুধু পরমার্থগুণেই অভিকৃতি।

কিন্তু এদিকে, আনন্দের দিকে একটু দেখ।

লাবণ্যলাস্তর রাশিরাশি ঢেউ হয়ে উঠেছে

মেয়েরা। অবগে-লোচনে স্তনে-জ্বনে যৌবনকেন-

সমুজ্জল উত্তাল ঢেউ। কিন্তু সাধা নেই স্নেহক-

শিখরকে স্পর্শ করে।

জগে থেকে পারলনা, যদি ঘুমিয়ে পড়ে পারে—

তাই ভেবে রূপলোকের সেবতারা ঘুম নামালেন।

মুহুর্তে মেয়েগুলো নিভ্রাভিকূত হল।

কেউ অন্ধের বীণাকে টেলে ফেলে দিয়ে নিজের

হাতের উপর কপোল রেখে শুয়ে পড়েছে। কার

বেগুটি বা করলয়। বার্ষতায় কুপিত হয়েও ছুঁয়ে

রয়েছে প্রিয়জ্ঞানে। কার বকুটও থেকে অন্তর্ধ্বাস

অর্ধপ্রসূত। কেউ যেন বা সরোজশোভিতা শুভ্র-

হাসিনী ততীনী। হৃদয়কেই প্রিয়তমবোধে আলিঙ্গন

করে আছে কেউ। কেউ যেন বা গজভদ্রা কণিকার

শাখা। গবাকপার্শ্বেই কেউ বা গায়ত্রিগুণ ধনুকের

মত বন্ধন করেছে। কুণ্ডল ও কণ্ঠহার বিচ্ছিন্ন,

বন্ধনবিহীন কেশরাশি শিথিল-আকুল। যেমনি

বসে ছিল তেমনি কেউ কেউ ঢলে পড়েছে, কনক-

বলয়িত ভূজপাশে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে।

যেন শুধু কাষ্ঠপাকালী নয়, সিদ্ধার্থের মনে হল

কঙ্কালপাকালী।

ক্রমে অঙ্গবিক্ষেপপ্রচেষ্টা বিরূত হতে লাগল।

এমনিতে হয়তো বীরা স্থূললিতা মধুরভাষা, কিন্তু

এখন নির্গঞ্জ নাসিকাগর্জন শুরু করল। কেউ

কেউ বা শুরু করল চূষণ করতে। এমনিতে

চারুসর্বাঙ্গী, কিন্তু এখন মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে।

অক্লিষ্টগলের স্বোতাংশ উন্মীলিত করে পড়ে আছে

নিষ্পন্দ হয়ে। বিরূতবদনা প্রকটিতদশনা—সব

মূর্তিমতী বিকৃতি।

রাজপুত্রের ঘৃণা হল।

সব বসনভূষণের কারুকলা। শুধু রক্তভঙ্গির

ভরঙ্গ।

কৃত্রিম চাতুরীতেই বিভ্রান্ত হচ্ছে মানুষ।

যেখানে গুণ নেই সেখানেই গুণকল্পনা করছে।

আর কিছু নয়, যদি মেয়েদের শুধু নিজাভ্রমিত

বিকৃতিই বিবেচনা করত মানুষের প্রমাদবর্ধন হতনা।

আসন থেকে উঠে দাঁড়াল কুমার। তার

নিব্রমণের আকাজক্ষা প্রবল হয়ে উঠল। এখুনিই

প্রশ্নে গম্ভীর্যভিত্তিতেই সে গৃহ ছাড়বে।

পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়াল সিদ্ধার্থ। শরীরস্থ

রক্তাভরণ খুলে ফেলল একে একে। যুক্তকরপুটে

পূর্ববৃদ্ধদের স্মরণ ও নমস্কার করল। নমঃ

সর্ববৃদ্ধভ্যঃ। বাইরে তাকাল একবার নিনিমেষে।

অমলধবল শশাঙ্ক মধ্যাকাশে দীপ্তমান।

যশোধারাকে একবার দেখে গেলে হয়।
একটু বা রাহুলকে।

সিদ্ধার্থ বৃন্দব্রতধর কিন্তু নিঃশেষ নয়।

নিমিত্তা পতীর কক্ষে প্রবেশ করল কুমার।
যশোধারার বাহুল্য হয়ে রাহুল ঘুমিয়ে আছে
শান্তিতে। মুখখানি সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছেনা।
মায়ের বাহুতে কিয়দংশ আবৃত। সিদ্ধার্থের ইচ্ছা
হল বাহুখানি সরিয়ে একটিবার দেখে চোখ ভরে।
কিন্তু কি দরকার! হয়তো যশোধারা ভ্রমণে
উঠবে। যখন এই দণ্ডেই বেরিয়ে যাচ্ছে তখনবে,
নিশ্চিত বাধা দেবে। যাত্রার ক্ষণটি স্তব্ধশাস্ত
থাকবেনা।

যাত্রার ক্ষণটি স্তব্ধশাস্ত থাকে এই সিদ্ধার্থের
ইচ্ছা।

স্তব্ধতা আর শান্তি। তাইতো যাত্রার লগ্ন
গভীরনিবৃত্ত মধ্যরাত।

তা হাড়া পিড়কে দেখবার জন্য চকল হয়ে লাভ
কি। আমি তো আবার কিংই আসব! মনকে
প্রবোধ দিল সিদ্ধার্থ। বৃদ্ধব লাভ করে যখন
কিরে আসব তখনই দেখব রাহুলকে।

আর যশোধারা! সে তো জানেই তার
সংকল্পের কথা। কে না জানে! কার কাছে
থেকেই মনের এ গভীর বাসনা অন্তরাল করেনি
সিদ্ধার্থ। শুদ্ধোদন উৎসাহ না দিক যশোধারা
দিয়েছে। তার বীপশিখায় সলতেটিই তো
যশোধারা।

তাই সিদ্ধার্থের এ পলায়ন নয় এ জয়যাত্রা।
এ লুকায়ন নয় উদ্বেগ। এ নিকৃতি নয়
উপহিতি।

রাহুল! যদি হাত বাড়ায় সিদ্ধার্থের দিকে
কি সে দিতে পারবে ছেলেকে। কি বিস্ত তার এখন
আছে বা তাকে দেওয়া যায়।

সম্বোধিলাভের পর কপিলাবস্তুর পথে ভিকার
বেরিয়েছেন বৃদ্ধ। পিতৃগৃহের নিবৃত্তবে বসেছেন
আহারে। কক্ষান্তরে রাহুলকে রাজপুত্রোচিত

বসন-ভূষণে সাজাতে বসল যশোধারা। সাতবছরের
বালক, রাহুল পুলকিত বিষয়ে চকল হয়ে উঠল।
জিগগেস করল, 'না, আমাকে সাজাচ্ছে কেন?'

'বৎস, আজ তোমার সম্পত্তিলাভের দিন।'

'কোথায় মা সম্পত্তি? এই বাড়ির মধ্যে?
রাতালয়ে?'

'না।'

'সন্নিহিত কোনো গুপ্তধনের তবে সন্ধান পাওয়া
গেছে?'

'তাও না।'

'তবে কে দেবে আমাকে সেই ধন?'

'ঐ যে গব্যাক্ষপথে দেখতে পাচ্ছ ভ্রমণকে,
রূপগৌরবে ত্রক্ষর মত প্রতীকমান, তাঁরই কাছে
আছে সেই ভাণ্ডার। তিনিই দেবেন তোমাকে
বৃহৎ বিত্ত।'

জানলা দিয়ে তাকাল রাহুল। ভূমিতে আসন
পেতে এক সাদু আহারে বসেছেন। বালক
কৌতুহলী হয়ে জিগগেস করল, 'তিনি কে না?'

'তিনিই তোমার পিতা।'

'পিতা? বিধ্যা কথা।' বালক মুখ কিরিয়ে
নিল: 'আমার পিতা নেই।'

'না, আছেন। তোমার পিতা তো আছেনই,
তাঁর কাছে তোমার পিতৃধনও প্রাপ্য আছে। বাও,
তাঁর কাছে থেকে চেয়ে নাও তোমার উত্তরাধিকার।'

সাতবছরের ছেলেকে যশোধারা পাঠিয়ে দিল
পিতার কাছে, বৃদ্ধের কাছে। পরমধনের
অধিকারের দাবিতে। অমৃতফলাভের আশ্বাস-
সিদ্ধিতে।

কাছে গিয়ে নির্ভয়ে বৃদ্ধের মুখের দিকে
তাকিয়ে রাহুল ডাকল: পিতা!

পরমকল্পণায় তাকালেন বৃদ্ধ।

'ভ্রমণ, তুমি কি স্থলর দেখতে! আগুনের মত
জ্বলছ কিন্তু কি শীতল! তোমার ছায়াটিও কি
শান্তিময়! এতদিন কোথায় ছিলে? আমোনি
কেন এতদিন?'

আহার্য্যে বৃদ্ধ রাহুলকে আশীর্বাদ করলেন।

প্রাসাদ ভাগ করে চলে যাচ্ছেন, রাহুল তাঁর সঙ্গে ধরল। আশ্চর্য্য, কেউ বালককে নিষেধ করলেনা, বৃদ্ধও নীরব থাকলেন।

যেতে-যেতে রাহুল বলতে লাগল বার-বার, ‘আমাকে আনার পিতৃধন দিন। দিন আনার উত্তরাধিকার।’

শারিপুত্রের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। বললেন, ‘আমার পুত্র কি আমার কাছে ঐহিক ধন চাইছে? স্বর্ণ রৌপ্য নদী-র আমার কোথায়? আর যে ধন অচিরে নষ্ট হয়ে যাবে, যে ধনে কেবল উদ্বেগ ও উত্তাপ সে ধন নিয়ে কি হবে?’

‘না বলে দিয়েছেন আপনি বৃদ্ধ চতুর্বিধ ধনহরের অধীশ্বর।’ বললে রাহুল, ‘বলে দিয়েছেন ঐ ভাঙার প্রার্থনা করে। কেননা পুত্রই পিতার উত্তরাধিকারী।’

সর্বাস্বত্বকরণে আত্মান করলেন পুত্রকে। বললেন, ‘পবিত্র জীবনের উত্তরাধিকার দিতে পারি তোমাকে। সেই ভাঙারই অলয়-অক্ষয়। তুমি যদি সেই ভাঙারের প্রার্থী হও আর যদি তা বন্ধ করতে ও বহন করতে সমর্থ হও সেব তোমাকে। কিন্তু তুমি কি তা নিতে পারবে?’

‘পারব। মা আমাকে তাই নিতে বলেছেন।’ বালক দৃঢ়তর বললে, ‘পিতৃধন থেকে কিছুতেই বঞ্চিত করবনা নিজেকে।’

‘সেই চতুর্বিধ ভাঙারের নামই হচ্ছে চতুরঙ্গ সত্য।’ বললেন বৃদ্ধ, ‘সেই ভাঙারের আট চাবি, তারই নাম অষ্টাঙ্গ ধর্ম্মার্ণব। সেই পথে নেবে তুমি সত্যকে?’

‘নেব।’

‘যারা মনের উন্নতিসাধন করে সর্বোত্তম অবস্থা লাভের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন তুমি তাঁদের সম্মুখ হও?’

‘হব।’

পিতৃধন আদায় করে নিল রাহুল। আর

মায়ের কাছে ফিরলেন। শারিপুত্রের কাছে লীলা নিল। ভিক্ষুসম্মুখ হতে গেল।

“চন্ডারি আরয়সজ্জানি।” চার আর্ঘ্যসত্য। এই সেই চতুর্বিধ ভাঙার।

হে আনন্ড, এই চার আর্ঘ্যসত্যকে না জেনে না বৃদ্ধ আমরা অসুস্থহীন সংসারাবর্তে দীর্ঘকাল বিচরণ করেছি। আর করবনা। এবার জেনেছি চার সত্য আর তার অষ্টপথ। এবার সমস্ত জন্মমুহূর্তা শোক-পরিণেবন সমস্ত দুঃখরাশি পিছনে ফেলে উপনীত হব নির্বাণে।

দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধ-উপায়—এই চার সত্য। আর অষ্টপথ কি কি? অষ্টপথের নাম : সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম, সম্যকজীবিকা, সম্যকপ্রচেষ্টা, সম্যকস্মৃতি ও সম্যকসমাধি।

জাতিপি দুঃখ। জন্মই দুঃখ। গর্ত্বাসই দুঃখ। জরাপি দুঃখ। সবস্ত বৃদ্ধির মাঝেই জীর্ণতার বীজ। জরাও দুঃখ।

ব্যাধিপি দুঃখ। কার সাধ্য আছে ব্যাধিকে পরিহার করে। ব্যাধিই দুঃখ।

মরণপি দুঃখ। কে এমন আছে যে শেষ উদ্‌গলনের যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবে। এমন মহাজ্ঞানী যে অনাথপিণ্ডিক মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শারিপুত্রকে বললে, মৃত্যুযন্ত্রণা ছবিবহ। কে এক বলিষ্ঠ পুরুষ লৌহদণ্ড নিয়ে আনাকে ঐচণ্ড আঘাত করছে এমন অমুণ্ডব করছি। মৃত্যুও দুঃখ।

অগ্নিবানঃ সম্প্রযোগে দুঃখ। অগ্নিরসংযোগে দুঃখ। শত্রুর সান্নিধ্য যন্ত্রণাদায়ক। যা স্পৃহণীয় নয় ঋতিকর নয় তার সঙ্গে মিলন মর্শূল।

পিবানঃ বিধ্বযোগে দুঃখ। ভেদনি প্রিয়-বিপ্রয়োগও দুঃখাবহ। শোক তো নয় দাবদাহ। শুধু জীবন্ত নয় নির্জীব প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদও অসহনীয়।

যম্পিচ্ছঃ ন লভতি তম্পি দুঃখ। মনোরথ সকল না হলেই দুঃখ। ইচ্ছার অপূরণই যন্ত্রণা।

যেমনটি চেয়েছিলেন পেয়ে দেখলাম তেমনটি হয়নি এ অতৃপ্তি ক্রমকর। অতৃপ্তির থেকে জ্ঞান কই?

সম্মিষ্টেন পঙ্কপাদানঞ্চক। তুখং। সূত্রানুসূত্র অসংখ্যের তুঃখ। উঠতে বসতে চলতে কিরতে শুতে জাগতে সর্বত্র তুঃখ। বসে আছে তো কখন উঠে পীড়াবে, উঠে ধাক্কিয়েছে তো কখন বসতে পাবে। শুয়েও সুখ নেই, প্রানিকর এ ছড়তা; জেগেও সুখ নেই ক্রান্তিকর এ অনিশ্রা। অনাহারে কই আবার আহারান্তিক আলস্যও অস্বস্তিকর। প্রতিমুহূর্তেই এই তুঃখের কটকবেধ। সংক্ষেপে, যতক্ষণ স্পন্দন ততক্ষণ ক্রন্দন। পঞ্চ উপাদানই তুঃখের স্বভাব। রূপ, বেদন, সংজ্ঞা, সংস্কার আর বিজ্ঞান এই পঞ্চ উপাদান। এই পঞ্চ উপাদানেই ভৌতিক দেহ। আর এই দেহই তুঃখের আশ্রয়-আশ্রয়। এই পঞ্চস্বত্বকে ছিন্ন করার আগে মুক্তি নেই তুঃখ থেকে। এই প্রথম আর্বসত্য বা তুঃখ-সত্য।

কেন, কিসের জন্তে এই পঞ্চস্বত্বকে ছিন্ন করা যাচ্ছেনা? কে বারে বারে পঞ্চস্বত্বকে প্রবর্তিত করছে? কে উপাদান করছে পৌনর্ভব? কে সে গৃহকারক? তারই নাম তুকা। সেই ভব থেকে ভবান্তরে নিয়ে যাচ্ছে জীবকে, সেই তার পুনর্জন্মের রচয়িতা।

তুকা আবার নন্দিতাগ-সহগতা। তুকার হুই সহচর, আনন্দ আর লোভ। দর্শনে শ্রবণে আয়োগ স্পর্শনে প্রথমে আনন্দ, পরে তাই লোভে লেলিহজ্বিল।

ভয় ভয়ানিন্দিনী। যে-যেখানে তুকা পুঞ্জিত সে-সেখানেই জীবসমাজ গড়ে উঠেছে। শুধু ভোগ্যবস্তুকে লক্ষ্য করেই গোষ্ঠীনির্মাণ। প্রাণি-জগতের আবাস ও সমাজসৃষ্টি তুকারই অনিবার্য পরিণতি।

কামভগ্নহা, ভবতগ্নহা, বিভবতগ্নহা। কামতুকা, ভবতুকা, বিভবতুকা। কামলোকের স্বপরস শব্দ গন্ধ বা স্পর্শের প্রতি যে অহুরাগ তাই কামতুকা।

আবার স্বপ্নপরিগ্রহের বাসনা, এ ক্ষম্মে হলনা পরজন্মে হবে, এই ভোগেচ্ছা তাই ভবতুকা। আর ভবিষ্যতে কে জানে কি হবে, স্বপ্ন করে যি খেয়ে যাই, লৌকিক ভোগ্যবস্তুকে নিরবশেষ ভোগ করে যাই এ আসক্তিই বিভবতুকা। এই ত্রিবিধতুকাই যে সমস্ত তুঃখের উৎপত্তি এই উপলব্ধিই দ্বিতীয় আর্বসত্য বা তুঃখ-সমুদয়-সত্য।

তারপরেই তুঃখের নিরোধ বা ধ্বংসের তত্ত্ব। দেহকে কৃষ্ণব্রশে কৃশ করলেই তুকাকে উচ্ছিন্ন করা যায়না। বিবাক্ত শরীর থেকে জ্ঞান পোতে হলে ঐ শরকারকেই বধ করতে হবে। এমন একটি অবস্থা আছে যেখানে মূলও নেই বৃক্ষও নেই, তীরও নেই তীরন্দাজও নেই, সেখানেই অনির্বাচ্য নির্বাণ। সেখানেই শাশ্বত শান্তি, শাশ্বত স্বকতা। এই জানেই তৃতীয় আর্বসত্য বা তুঃখ-নিরোধ-সত্য।

আর চতুর্থ আর্বসত্যই নির্বাণে পৌছবার পথোপলব্ধি। তুঃখনিরোধের বা নির্বাণপ্রাপ্তির উপায়ই অষ্টমার্গ।

মোক্ষো

হর্মাণ্ড থেকে অবতরণ করল সিদ্ধার্থ। নিঃশব্দ-চিস্তে চলে এল বহির্গৃহে।

আনি সত্যের সন্ধান পেয়েছি, স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে আমি বহুপরিচর। আমি বৃদ্ধ হব।

বৃদ্ধবাক্য বার্থ হবার নয়। বাসুপাথে প্রেরিত প্রব্রবণেও পতন যেমন নিশ্চিত, যেমন নিশ্চিত বিবরভাগকালে সিংহের গর্জন কিংবা নম্বর প্রাণীর মৃত্যু কিংবা প্রভাতে সূর্যোদয় বা গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রসব, তেমনি বৃদ্ধবাক্যও নিঃসন্দিগ্ধ। আমি নিশ্চয়ই বৃদ্ধ হব।

বখার্থ পুরুষের মত সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করল।

ঘরের বাইরে এসে তাঁড়াতাড়ি সারথি ছন্দকে জাগাল। বললে, 'শিগগির কন্ধকে নিয়ে এস। অনুভূতপ্রাপ্তির পথে আমি এই মুহূর্তে যাত্রা করব।'

'সে কোথায়?'

‘বহু কল্প ধরে আমি যে বোধিলাভের স্পৃহা করে আসছি অথচ আয়ত্ত করতে পারিনি আজ সেই অসীম বস্তু আমার সমুখীন হয়েছে।’ বললে সিদ্ধার্থ, ‘চিহ্নে এতখানি সন্তোষ ও সংকল্পে এতটা দৃঢ়তা এর আগে অমূল্য করিনি। নির্জনেও নিজেকে প্রকৃত সহায়সম্পন্ন বলে মনে হচ্ছে। অতএব হর্য করে। আমার নিজস্বপনের সুসমন্বয় সমাগত।’

‘আপনি যে যাবেন তা জানি। সৈবজ্ঞরা তো আপনার জন্মকালেই বলেছিল গৃহে থাকলে আপনি রাজচক্রবর্তী, গৃহত্যাগ করলে আপনি সমুদ্রতী বৃদ্ধ হবেন। কিন্তু প্রভু, ছন্দক কাতরভাবে বললে, ‘এই কি আপনার বানপ্রস্থের ব্যঙ্গ? কত ক্রীড়া-কৌতুক ও কানভোগ আপনার অসমাপ্ত আছে। মেঘমুক্ত সৌদামিনীর মত লাবণ্যলতিকা আপনার পত্নী, পতিতরা পতিতরা, তাকে কেন আপনি উপেক্ষা করবেন? চারদিকে কত গীত কত শোভা কত সুখন বস্তুর সমারোহ, আপনি কেন তাতে বিমুখ থাকবেন? আপনার কোমল শরীর, ত্রৈলোক্য আপনি সইবেন কি করে? ভোগপর্ব শেষ করে নিষ্কটকে পুরী ত্যাগ করবেন কেউ কিছু বলতে আসবেন।’

‘ছন্দক, তুমিও আবার সেই ভোগের কথা বলছ?’ সিদ্ধার্থ দৃঢ়ভাবে বললে, ‘ভোগ অনিত্য অশ্রবণ বিপরিশ্রমজনক। গিরিনদীর মত চপল। শিশিরবিন্দুর মত ক্ষণজীবী। রিক্ত মৃষ্টির মত অসার। বালকের অঙ্কিত চিত্রের মত অর্থহীন। কদলীশঙ্কর স্বচ্ছের মত দুর্বল। জ্ঞানচক্র বিপর্যয়ের জগ্নয়ে লোকে এর অনুসরণ করে থাকে। আসলে এ লবণাদুর মত তুচ্ছাবর্ধক, সর্পশিরের মতই দুঃস্পর্শ। সর্বশাস্তির বিনাশক এ কামবিবয়ের কথা আর বোলোনা।’

শরবিচ্ছেদ মত আহত দেহাল ছন্দককে। বললে, ‘ব্যক্তে পারছি আপনি আপনার ব্রতসাধনে কৃতসংকল্প। ভবু, মার্জনা করবেন, না বলে থাকতে

পারছি না। কত তীব্র ব্রতনিয়ম উপস্থাপন করে লোকে পায়না, আপনি বিনা আয়াসে রাজব-দেবব অর্জন করেছেন। সমস্ত আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু ভোগ করে বিহার করলেন দেবরাজের মত।’

সিদ্ধার্থ হাসল, ‘ছন্দক, পূর্ব-পূর্ব জন্মে আমি অসংখ্য ধ্বংস ভোগ করেছি, কাম্য-কামনায় অমূল্য থেকে ভ্রমাব্যবিসৃভ্যতে নিগূহীত হয়েছি—তুমি কি জানো তার পূর্বাপর ইতিহাস? ইন্দ্রিয় করেছি দেবব করেছি যমবও করেছি—তবু শতলক্ষ কাম্যে বা ভোগেও আমার ভূপ্তি হয়নি, খুঁজে পাইনি তুষ্কার অবসান। এত সুখে মত্ত থেকেও যখন পাইনি নিশ্চিৎ তখন কি আর তুমি আশা করো? ভোগ্য-ভ্রবা আমাকে কি সেই পরমপরিহৃতি সেই অক্ষয় অমৃত দিতে পারবে? সুতরাং আদেশ পালন করো। ঘোড়া নিয়ে এস।’

বল, তেজ, বেগ ও ক্ষিপ্ততার সমন্বিত প্রতিমূর্তি কষ্টক। ছন্দক তাকে সুসজ্জিত করে নিয়ে এল সিদ্ধার্থের কাছে।

বিশালবক কুমার তাকে আলিঙ্গন করল। অন্তরঙ্গের মত বললে তার কানে-কানে : ‘ভোমাতে আরোহণ করে রাজা বহবার যুদ্ধে শত্রুদের নিরস্ত করেছেন। তুমিও আমার যুদ্ধক্ষেত্রে, কামজয়ে সহায় হও। আমাকে অমৃতপদের পথে নিয়ে চলো। সংগ্রামে বা ভোগসুখে সহায় অত্যন্ত শুলভ কিন্তু আপংকালে বা ধর্মসংগ্রামে সহায় দুস্তাধ্য।’

সিদ্ধার্থ অবশে আরোহণ করল।

বলল, ‘আমার এই নিজস্ব ধর্মপ্রেরিত, অগতির কল্যাণের জগ্গে। সুতরাং, হে ছুরদম, তুমি সর্বলোকের মঙ্গলের জগ্গে বেগে ও বিক্রমে প্রধাবিত হও।’

রাত্রিকালীন প্রচণ্ড শব্দ পরিহার করল কষ্টক, পাছে সেই ঘোর নিনাদে রাজপরিজনদের ঘুম ভাঙে। প্রশান্ত পক্ষপে প্রায় নিঃশব্দে পুরী পার হল।

কিন্তু পুরীদ্বার রুদ্ধ। সাধা নেই পরাক্রান্ত

হাতি তা অব্যাহত করে। আশ্চর্য, সে দুট অর্গল-বন্ধ লৌহকপাটে ঘুরে গেল সহজেই।

উজ্জ্বলিত হল অশ্বখুর। পিতৃনগর হতে বহির্গত হল কুমার। বহির্গত হল শ্রেষ্ঠপুরুষ পিতা, বালক-পুত্র, অমৃতনা লক্ষ্য আর অমৃতরক্ত প্রজাবর্গকে পরিভ্যাগ করে। অমেষ ঐশ্বর্যসম্ভারের প্রতি বিন্দুনার আকাঙ্ক্ষা না রেখে।

নগরের দিকে শেষবারের মত অবলোকন করল সিদ্ধার্থ। গম্ভীর সিংহনাদ করে উঠল, ‘অমৃতত্বার পরপার না দেখে আর আমি ফিরবনা।’

এক জম্বাক বললে, ‘আমি বিশ্বাস করিনা যে আলোকিত জগৎ আছে।’

‘হা, আমরা যে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, সূর্য চন্দ্র তারা।’ তার বজ্রা প্রতিবাদ করল।

‘মিথো কথা। কোথাও কিছু নেই। শুধু নীরক্ত অন্ধকার।’

‘সে কি? এত এখানে বর্ণের আয়োজন, শ্রামল আর রক্তিম, কোমল আর উজ্জ্বল—’

‘মিথো কথা। যদি বর্ণ বলে কিছু থাকত আমি নিশ্চয়ই তবে তা স্পর্শ করতে পারতাম। তোমরা যা বলছ তা শুধু অলীক বক্তব্য। যার স্থূল সত্তা নেই যা স্পর্শের অধীন নয় তার অস্তিত্ব অসম্ভব। যদি কিছু থেকে থাকে তা হচ্ছে অন্ধকার—নীরক্ত অন্ধকার।’

অভিন্ন বৈভ ছিল নিকটে, তাকে ভাকা হল। এই অন্ধের চিকিৎসা করুন।

চারটি সহজ ব্রব্য মিশিয়ে ওষুধ প্রস্তুত করলেন বৈভ। জম্বাকের চক্ষে তা প্রয়োগ করলেন।

জম্বাক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল।

বুড়ই বৈভ। আর চারটি ওষুধ চারটি মহান আর্ঘ্যসভ্য।

উখান করো, উপবেশন করো, নিত্রিত থেকে লাভ কি? হারা ব্যাধিগ্রস্ত, শলাবিদ্ধ, যন্ত্রণাপীড়িত তাদের কি নিত্রা সম্ভব?

উখান করো, উপবেশন করো, শান্তির ভোগে দ্বিঃসংকল্পে জ্ঞানাবেশন করো, বেধতা ও মানুষ্য ঘাতে আবদ্ধ সেই কৃষ্ণকে অতিক্রম করো, যেন সময় না চলে যায়। যে সময়কে চলে যেতে দেখে সে সর্বব্যকে চলে যেতে দেয়।

প্রমাদ অশুদ্ধি, অবিচ্ছিন্ন প্রমাদ অশুদ্ধি, অপ্রমাদ ও বিজ্ঞা দ্বারা অন্ধকার উৎপাটিত করো।

শিষ্যবৃন্দকে স্থানান্তরে পাঠিয়ে নিয়ে বুদ্ধ ভ্রমণ করতে-করতে উল্লবিশে এসে উপস্থিত হলেন। পথে এক কুণ্ডবনে বসলেন বিশ্রাম করতে। সেই কুণ্ডে ত্রিশজন বদ্ধ তাদের নিঃশেষের পতীর সঙ্গে প্রমোদে মত্ত ছিল। এত মত্ত ছিল যে কখন যে তাদের জিনিসপত্র ছুঁবি হয়ে গেল তা তারা লক্ষ্য করতে পারেনি। প্রমোদে কোথায় একটু ছেদ পড়তেই খেয়াল হল বুদ্ধের, চোর জিনিস সরিয়েছে। তখন তারা দলবদ্ধ হয়ে চোরের সন্ধানে ধাবিত হল। ক্রুদ্ধতলে দেখতে পেল তথাগতকে। ব্যস্ত হয়ে জিগগেস করল, ‘প্রভু, আপনি কি আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে যেতে দেখেছেন কোনো চোরকে?’

‘গেলে তো। এই পথ দিয়েই গেছে।’ জিগগেস করল আরেকজন : ‘দেখেছেন?’

‘এই পথে না গিয়ে ঐ পথেও তো যেতে পারে।’ আরেকজন অস্ত পথের ইঙ্গিত করল।

ত্রিশজন নানা পথে ছুটোছুটি করতে লাগল, সম্ভাবণ করতে লাগল জনে-জনে।

তথাগত তাদের ডাকলেন। বললেন, ‘তোমরা কি চোরের সন্ধানই করবে আত্মহুসন্ধান করবো? আমি তোমাদের কাছ থেকে উত্তর শুনে চাই। কোনটি তোমাদের কাছে প্রাধান্যীয়? চোরসন্ধান, না, আত্মহুসন্ধান?’

‘আত্মহুসন্ধান।’ সমস্তের বললে বজ্রা।

‘তা হলে বোমো আমার সামনে। শোনো।’

যুবকদল বসল বুদ্ধের পদপ্রান্তে। সাগ্রহে শুনে লাগল বুদ্ধবাক্য।

[বঙ্গ:]

ছিট-ফাঁটা

• * * চারচন্দ্র ওটোচার্য * * •

চিটশিল্পী করল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

দুই ভাই ভেটিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের এক ছোট ভাই বিদেশ থেকে ফিরছে। সে ছিল চিটশিল্পী, চিটবিজ্ঞ। অমূল্যলীল করতে বিদেশে গিয়েছিল। জাহাজ কাছে এসে পড়েছে; ওই যে তাদের ভাই, হাতে একখানা খাতা; খাতাটা নাড়ছে। নিশ্চয় খাতাখানা ছবিতে ভরা; তিন বছর বাইরে থেকে অনেক কিছু শিখে এসেছে; এবার সে আমেরিকায় একজন নামকরা চিটশিল্পী হবে।

কিন্তু নেমেই ছুটেছে ছুটেছে দাদাদের কাছে এল; হাতে সেই খাতাখানা।

দাদারা বলল,—তাহলে তুমি আমেরিকায় ছবি আঁকার হুণাহার আনছ?

না না, মোটেই তা নয়, একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, খুব বড়; আবিষ্কার, তারই খুঁটিনাটি এই খাতায় আঁকা।

দাদারা পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে হাসতে লাগল। তারা বলল, ওসব রাখ, তুমি সেখানে কেমন ছিলে, তোমার চিটবিজ্ঞা শেখা কেমন হল, সে দেশের লোকেরা কেমন, এসব বল।

কিন্তু বলল,—পড়াশুনা ভালই হয়েছে, অনেক কিছু শিখেছি, সেখানকার লোকেরাও চমৎকার; কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক। আমি এখন তোমাদের একটা আবিষ্কারের কথা বলছি শোন।

কি সম্বন্ধে আবিষ্কার?

তড়িৎশ্রোত, তড়িৎশ্রোত নিয়ে আবিষ্কার।

দাদারা তো হতভম্ব! ভাই আমাদের ওসবের

কি ধার ধারে! মুখে বলল,—আজ্ঞা, বল, কি তোমার আবিষ্কার।

কিন্তু মস' বলতে আরম্ভ করল।—

একটা তড়িৎ-চুম্বক ধর। আকারে ঘোড়ার খুরের মতো, সবুজটা তার দিয়ে জড়ানো, তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎশ্রোত গেলে ওটা চুম্বকের মতো কাজ করে, আর তড়িৎশ্রোত কোথাও ছিন্ন হলে, একমুহূর্তও দেহি হবে না, এই তড়িৎ-চুম্বক তার চুম্বক হারাতে।

এসব তো আমরা জানি—দাদারা বলল।

আনি গোড়া থেকে আরম্ভ করছি। আজ্ঞা, তড়িৎশ্রোত যেই চালানুম অননি এই তড়িৎ-চুম্বক একটা লোহার পেরেককে টেনে তুলবে; তড়িৎ-শ্রোত বন্ধ করলে পেরেকটা পড়ে যাবে।

এও জানি।

বেশ, আর নিশ্চয় এ-কথাও জান যে, তার খুব লম্বা হ'লে তড়িৎশ্রোত হতদূর ইচ্ছে যেতে পারে।

জানি।

বস। আর কিছু নয়। শোন তবে। জাহাজে জনসন বলে এক ভ্রমলোক যাত্রীদের এইসব কথা বলছিল। আমিও শুনছিলুম। আমার তখন মাথায় এল, তবে তো এ দিয়ে দূরে সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, সংবাদ যেতে এক সেকেন্ডও সময় লাগবে না। রাত্রে এর একটা নমুনা এঁকে ফেললুম, তারপর এই দেড়মাস দিনরাত কেবল ওই কথাই ভেবেছি, খাতা-ভরা ওইসবেরই নমুনা। আমি একটা কোডও তৈরি করে ফেলেছি, যাতে করে

— রিকমার গান —

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৩৮

অসুস্থভাবেও সাহায্য করতে লাগল অখিল।

তড়িৎ যে তারে এই নূতন কাজটা প্রকটতা দিয়ে
দ্বিগুণে বাবতে চায় সেটা আগেই টের পেয়েছিল—
যখন সে বলে, সাতটার পর গাঢ়াটা হয়ে এলে
গাড়ি বের করতে চায়। অখিল একটু দম্প বা
বালুভাবে নিজের কথা বলেছিল,—সে যে কোন
কুঁটার বালাই না বেধে দিনের বেলাতেই সহরের
বুকের ওপর নিজে চলিয়ে নিয়ে গেছে গাড়ি।
তড়িৎ লজ্জিত হয়ে কথটা ঘুরিয়েও নেয়।

অখিল কিন্তু পরে তেঁবে দেখল ওর পক্ষে নিতান্তই
স্বাভাবিক এই কুঁটা। বয়স কম, নূতন বাড়ি ছেড়ে
বেগিয়েছে, তিনটে পাস দিয়েছে এবং লক্ষ্যটাও সেই
পথেই এগিয়ে যাওয়া। এর ওপর নিজের নিজের
প্রকৃতিও এসব বিষয়ে কাজ করে বড় বেশি, ছেলটি
লজ্জুক : এমন অবস্থায় ও যে অনেক এতখানি
পর্যন্ত মর্যাদা দিতে পেরেছে আপাতত এই যথেষ্ট
ওর পক্ষে। যেভাবেই হোক, টুইশনের লোভ
ছেড়েই তো রোজগারের এই পথটা নিলে বেছে।
অখিল অসুস্থভাবেও সুবিধা করে দিল ওর।

কুঁটাটা নিশ্চয় বাঙালী সম্বন্ধেই বেশি। অখিল
ওকিটোর সম্ভাবনাটা কনিয়ে নিয়ে এল। অল্প
সময়ের মধ্যে নিয়মিত রোজগারটুকুও হয়ে গেল
ভালো, ও মাসিক ব্যবস্থায় একজন স্বদের জোগাড়
করে দিল সাড়ে সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত নিয়ে
যাবে প্রত্যহ, আশ বটা আন্দাজ থেকে আবার নিয়ে
আসা, মাসকাবারে চল্লিশ টাকা ভাতা। বলল—
চৌঠায় আছে, এরপর ঐ পথে যেতেই যদি সুবিধা-
মতো আর একটা জোগাড় করে ফেলতে পারে তো

বাঁধা সময়ের মধ্যে ঐ প্রয়োজনীয় ভাড়ার কিছু
বেশিই হয়তো এসে যেতে পারে।

ব্যবস্থাটুকু অমনিই হোল না, কিছু গল্প লাগল
অখিলের। স্বদেরটি অল্প এক রিকশাওলার হাতে
ছিল, তার কাছ থেকে নিতে দৈনিক পাওনার
থেকে বেশ খানিকটা ছাড়তে হোল অখিলকে।
লোকটা বোধহয় গড়পড়তা বেশিই কামিয়ে নেবে ঐ
সময়টায়, তবু একটা নিশ্চিত আয়ের বাঁধা স্বদের
ছেড়ে দিতে হোল তো। তড়িৎর একটা বাড়তি
সুবিধা এই হোল যে, সহরের বাইরের নিকে বাওয়ায়
বাঙালী বা পরিচিত অল্প কারুর সঙ্গে দেখা হওয়ার
সম্ভাবনাটা আরও এল কমে। একটানা দূরের সফর,
প্রথমটা বেশ কষ্টই হোত, তারপর ক্রমে ক্রমে
সেটাও এল সারে। স্বদেরটি বিহারী; বেশ
অবস্থাপন্ন এবং ভদ্র; সাধারণত একলাই যান,
কোনদিন যদি কাউকে সঙ্গে নিলেন বা বেশি সময়
রয়ে গেলেন তো তার ভ্রাতৃ নিজে হতেই ভালো করে
দেন পুথিয়ে। মানকাবারী ব্যবস্থা হ'লেও একবার
বলাতেই দিনের দিন ভাড়টা চুকিয়ে দিতে
লাগলেন। বেশ চলেতে লাগল। বাঁধা সময়টার
ওপর আর খানিকটা বাটলে আট আনা, দশ আনা,
কোনদিন বা এক টাকা পর্যন্ত এসে যায়।

বেশ চলা মানে অদৃষ্টের অধিকূলতা। কিন্তু
অদৃষ্টকে তো দেখা যায় না; তা না থাক, কিন্তু এটা
তো স্পষ্ট যে অদৃষ্ট মানে তার এককোণে অখিলই।
মনটি কৃতজ্ঞতায় ছলছল করতে থাকে, কিন্তু
প্রকাশের তো উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না।
একদিন মৈষযোগে আয়টা বেশ ভালোরকম হওয়ায়
আবেগের বেশিই পাওনার চেয়ে কিছু বেশি দিতে

গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যুক্তি ঠিক করে রেখেছিল—যেমন অবিলম্বেই ঠিক করে দেওয়া যত্নের; ভ্রমলোক সেদিন হুজনে নিলে যাওয়ার এবং বেশিজন থাকায় টাকা তিনেক দেন—কিন্তু, বেশি দেওয়ার কথাটা তুলতেই অবিলম্বে এমন একটা বিমিত গভীর ভাব মেঝাল যে একটা যুক্তির কথাও মূৰ দিয়ে বের করতে পারল না তড়িৎ। অপ্রতিভ হয়ে পড়ল, যেন একটা অথবা অলুগ্রহ সেখানে গিয়ে অচ্ছায়ই করে বসেছে। কিন্তু কৃতজ্ঞতা জিনিষটা মনের একটা উদ্ভাপ, তাকে চেপে রাখা যায় না, চাপা থাকলে অশান্তিরই করে সৃষ্টি। সেই ভাবেই চলছিল, এমন সময় একদিন একটা ব্যাপার হোল।

বেহারী ভ্রমলোকটির ওখানে উপস্থিত হওয়ার সময়টাই তড়িৎ ঘড়ির কাঁটার কাঁটা ঠিক রেখে যায়, তিনিও একেবারে প্রস্তুত থাকেন, এ পৌছুলেই গিয়ে রিকশায় ওঠেন। সেদিন গিয়ে দেখে—বৈঠক-খানায় কয়েকজনের সঙ্গে গল্প করছেন, গায়ে গেজি, পায়ে চটি। ওকে দেখেই ভেতরে চলে গেলেন এবং একটু পরে দেই ভাবেই বেরিয়ে এসে ওর কাঁধে হাতটা দিয়ে বললেন—“একটু এমিকে আনুন।”

বারান্দা থেকে নেমে একফালি সবুজ বাসের লন। তড়িৎের কাঁধে সেইরকম ভাবেই হাত দিয়ে বৈঠকখানার দরজা থেকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন—“আজ আমার বাড়ি থেকে হুজনে আশীর্বাদ এসেছেন, তাঁদের নিয়ে দুপুরবেলাই আমি হয়ে এসেছি।...আপনি আপনার প্রাণ্য ভাড়াটা নিন এই।”

তড়িৎ বিমিত হয়ে বলল—“আপনি যাবেন না, অথচ আমি ভাড়া নোব।”

“আপনার তো ক্ষতি হোল।”

“ক্ষতি কিসের? সময়টা তো হাতেই রইল, কামিয়ে নোব আমি।”

“নাও পেতে পারেন ভাড়া...”

“তেননি বেশিও পেয়ে যেতে পারি। সেটা চাপের কথা, কিন্তু না গিয়েও ভাড়াটা নেওয়ার তো কোন যুক্তি পাচ্ছি না খুঁজে।”

ভ্রমলোক যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন; সেইজন্মেই হালকাতাবে একটু হেসে বললেন—“যুক্তি যথেষ্ট আছে, আপনি যদি এখন খুঁজে না পান। আগেও এরকম হয়েছে হুঁ একবার, দিয়ে দিয়েছি ভাড়া, আর্পত্তি করেনি।”

তড়িৎ হেসে ফেসল অদৃষ্ট যুক্তিটায়; বলল—“তাদের উদারতার প্রশংসা করছি, কিন্তু অমৃকরণ করতে পারব না, মাফ করবেন। তবে আপনার এই উদারতার জন্মে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ; কিন্তু নিই কি করে বলুন?”

ভ্রমলোক আবার বিব্রতভাবে মাথা ঘুরিয়ে চারিদিক চেয়ে নিলেন, তারপর হঠাৎ যেন একটা ভালো যুক্তি পেয়ে গেছেন এইভাবে বললেন—“কেন, এই দেখুন, আপনি এতটা পথ তো নিছিনিহিই এলেন, যিরে যাবেন খালি গাড়ি নিয়ে...”

“আমি আসবার সময় পেলে দেওয়ারী তুলে নিই, আজ পাইনি; যাওয়ার সময় চেষ্টা করব, পেয়েও যেতে পারি।...তবু বেশ, আপনি যখন দ্বিধা করছেন, এই ভাড়াটা আমি নিতে পারি; চার আনা আর চার আনা—আট আনা।”

ভ্রমলোক একটু চুপ করে রইলেন, ভাড়াটা দেওয়ার জন্মে ডান হাতটা সরিয়ে নিয়েছিলেন, আবার কাঁধের ওপর রেখে বললেন—“আপনি নিন সমস্তটা, আমার অমুরোধ। আমি বুঝি কেন নিতে চাইছেন না, মনে করছেন অমৃকম্পা দেখাকি, অমৃকম্পার পরস্যা কেন নেবেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, অমৃকম্পা মোটেই নয়। আমার আশীর্বাদ এটা কঠিন পীড়া, এ সময়ে কষ্টের মনে এটাইকু নিরাশার ছাড়া পর্যন্ত পড়ে এটা আমি চাই না, মনে হয় তাতে ওর অমঙ্গল হবে...”

“কিন্তু আমার তো কোন নিরাশাই নেই এতে...”

“বুকেছি।...কিন্তু আমার নেনেও এই ভেবে যদি একটা খুঁতখুঁতুনি...”

শিটে হাতটা একটু চেপে দিলেন, গলাটাও হঠাৎ ভারী হয়ে উঠল। তড়িং তাড়াতাড়ি হাতটা বাড়িয়ে দিল; বলল—“দিন। আমি উরে কল্যাণের ছাত্র ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব।...হয়েই যাবেন ভালো তিনি, ভাববেন না।”

কে কার মাঝে কথা জোর করে বলতে পারে? তবু মনের পূর্ণতায় কথাটা মুখ দিয়ে গেল বেরিয়ে। বেগুনও যেন একটা বিশ্বাসের মধ্যে থেকেই। রিকশা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল। জ্যোৎস্নারাত্রি, পিচ-ঢালা প্রায় নির্জন রাস্তার ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে চালিয়ে নিয়ে চলল রিকশাটা, কতকটা যেন আপনি বয়ে যাওয়া, মনটা যে কোথায় উঠে গেছে, কত উজুতে,—সেইর প্রয়াসে আবার যেন নিচে নেমে না আসে।...

“ভাড়া যাবে?...?”

পাশেই একজন পথিকের প্রশ্ন। সামনে পথটা ঢালু; উত্তর-প্রত্যাহার পাছে এই দুর্গত ভাবাবেশটুকু যায় নিলিয়ে, সেইজন্য কিছু না বলে প্যাডেলে একটা চাপ দিয়ে সজোরে নেমে গেল তড়িং।

কিছু একটা করতে ইচ্ছা করছে, সামান্যও হয় তো, ক্ষতি নেই—নাহুয়ের কঠুটুকুই বা সাধ্য, কিন্তু এইরকম যেন মহৎ হয়।...সে যে শেষ পর্যন্ত বিবেকের জিদ ধরে রইল না, নিল ভাড়াটা, এতে চনৎকার একটি আশ্বপ্রসাদ অমুভব করছে। এটা ঠিক নেওয়া হোল না তো, জ্যাগই।...বহুটুকু ত্যাগ পারল করতে।

কিছু একটা করতে ইচ্ছা করছে, সত্ত সত্ত হলেই ভালো; মনের একটা বোঝা নেনে যায় যেন তাহলে।

কিছু করার ইচ্ছা থেকেই মনে পড়ল—ঘেটুকু করার সোঁকুও যে করা হয়নি। অবিলম্বদার (এ-সম্বন্ধটা অনেকদিনই পাতিয়ে নিয়েছে) এত দূরার কী প্রতিদান দিতে পেরেছে সে?

কী ভাবেই বা পারবে?...এই চিন্তাটা নিয়েই আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল, পায়ের জোর দিতে গিয়ে চিন্তার স্বভাট না যায় ছিঁড়ে।...তারপর এক-সময় মনে হোল উপায় যেন একটা থাকতেও পারে। সহরের এদিকে এসে পড়েছে, হীহুর পথে। প্যাডেলে চাপ দিল তড়িং। সময়টা মূল্যহীন থেকে একেবারে অতিরিক্ত মূল্যবান হয়ে উঠেছে, আর একমুহূর্তও অপচয় করা চলে না। মাঝে মাঝে পথিকদের প্রশ্ন খালি গাড়ি মেখে—“ভাড়া যাবে?” কাউকে দিল উত্তর, কাউকে বা দিল না; উঁচু নীচু রাস্তার দোল খেতে খেতে একেবারে অবিল ঘোষের রিকশার আড্ডায় গিয়ে গাড়ি ধামাল। একটা হাতঘড়ি রাখে, পথেই, শেষের দিকে একবার হাতটা উলটে দেখল, সবসুদ্ধ রাত চল্লিশ মিনিট নষ্ট হয়েছে; অবিলের বাড়িটা রিকশার আড্ডার সংলাইই, ঠীকা যে ভ্রমিটা রয়েছে তার ঝপের দিকে। দু’মাসের ওপর হয়ে গেল ঢালাচ্ছে রিকশা কিন্তু বার তিনেকের বেশি যায়নি। যাওয়ার দরকারও হয় না, লাভুক প্রকৃতির বলে চায়ও না অযথা বাখামাখি করতে। বার তিনেক গিয়েছিল তা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, একবার সেই রিকশা ঢালাতো গুলু করবার দিন, তারপর দু’টো কি পূজা উপলক্ষ্যে। গিয়ে বাড়ি নীচু করে বেয়ে চলে এসেছে। অবিলের বাড়িতে ওর বিধবা মা, একটি বোন, ব্রী, দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। বড় ছেলেটি সামনের বছর ম্যাট্রিকুলেশন দেবে, ছোট দুটি নীচু ক্লাসে পড়ে। এদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, খেতে গিয়ে ঠাইয়ে বসবার আগে, তারপর রিকশার আড্ডাতেও দেখা হয় মাঝে মাঝে।

আজ ওদের বাড়ি যাবে। তার পর...বা ভেবে ঠিক করেছে, বার কত তাড়াতাড়ি এসেছে ছুটে। আশ্র তার সুবিধা না পায়, অশ্রদিন হবে, কিন্তু যাবে আশ্র, আসা-বাওয়াটা আরম্ভ করে দেবে। জড়তাটাকে সরাবে, অমুভব করছে এই দু’মাসেই যেন আস্তে আস্তে অনেকটা কমে এসেছে।

ও জিনিসটা যেন বইয়ে-মুখ-গোঁজা ছাত্রদের সম্পত্তি, পাচজনের সঙ্গে মেলামেশা করে যাদের চালাতে হয় তাদের কাছে জন্মে পায় না।

একটা সুরিধাও হয়ে গেল আজ। অখিল কারখানায় নেই, কোথায় বেড়িয়েছে। তাকে রিকশা কিরিয়ে দিয়ে ভাড়াটা দিতে হবে। তার ব্যবস্থা অবশ্য হতে পারে, অল্প কয়েকবার হয়েছেও, কিন্তু আজ এই অল্পপুষ্টিতির সুযোগটা কাজে লাগল। রিকশাটা কারখানার মিস্ত্রীর কাছে জমা দিয়ে তড়িৎ সোজা অখিলের বাড়িতে গিয়ে উঠল। বারান্দায় উঠে ডাকল—“অখিলদা বাড়ি আছেন?”

ছেলে-মেয়ে তিনটিই বেরিয়ে এল। বড়টি বলল—“বাবা তো বাড়িতে নেই, বেরিয়েছেন।”

“কোথায় গেছেন?...কিরবেন কখন বলে গেছেন?”

“রিকশার পার্টস্ কিনতে গেছেন।”

“তবেই তো!...একটা কাজ ছিল।”—চিন্তিত-ভাবে একবার মাথাটা ঘুরিয়ে নিল চারিদিকে।

ছেলেটি বলল—“বসুন না, গেছেন অনেকক্ষণ বাবা। শিগগিরই ফিরতে পারেন।”

মেয়েটির সঙ্গে একটু বেশি মেলামেশা আছে, কারখানায় বেশি যায়। এগিয়ে এসে ডান হাতটা ধরে একটা টান দিয়ে বলল—“হ্যাঁ, আশুন। গল্প বলবেন। কখনও তো আসেন না।”

“তোমরা তো পড়ছ এখন।”

“বা—রে! যারা পড়ে তাদের বাড়ি কেউ আসে না?”

তড়িৎ হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে বাইরের ঘরে বসল। ঠিক গল্প নয়, যে ধরনের কথাবার্তা আরম্ভ হয়েছিল সেই ধরনেরই চলল কিছুক্ষণ। আসেনা কেন তড়িৎ কাকা? ওর কথা প্রায়ই হয়... ঠাকুরমা বলেন, ছেলেটি বড় লাজুক...একলা থাকে, ইচ্ছে তো করে নেমস্তন্ত্র করি মাঝে মাঝে, কিন্তু যা পাতের সঙ্গে মিশে থাকে—বেন শান্তি একটা!...

মেয়েটি মেজো, যদিও বড়র চেয়ে বেশ খানিকটা ছোট: ওই বাক বেশি, একটু বেশি অন্তরঙ্গও তো। বড় ভাই একটা অঙ্ক নিয়ে পড়ছে, মাঝে মাঝে বাড়ি বৈকিয়ে চোখ তুলে থামতে ইসারা করতে বোনকে, তারই মধ্যে ছোটটি আর যেন থাকতে না পেরে অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলে উঠল—“আর রত্ন-পিনিনা, মিনি...চকোরে তড়িৎকাকার সেই রিকশা-চালানো দেখে, হেসে...”

বড় ভাইকে এবার বেশ সোজা হয়ে বাড়ি তুলেই চোখের ইসারা করতে হোল। এই সময় ভেতর থেকে ডাকও পড়ল ওদের হৃৎকনের—“অলক, কবি—ভেতরে এসো তোমরা, না ডাকছেন তোমাদের।”

ওরা চলে যেতে তড়িৎ বড় ছেলেটির দিকে ঘুরে চাইল; প্রশ্ন করল—“অঙ্কটা শক্ত নাকি বিমল? অনেকক্ষণ থেকে বলে রয়েছ যে?”

বিমল বাড়ি তুলে একটু হাসল; বলল—“শক্তই। সকালবেলা মাস্টারনশাই অনেকক্ষণ চেষ্টা করলেন।...দেখছি একটু আবার।”

“সেবি।” বলে খাতাটা টেনে নিল তড়িৎ।

এইজন্মেই এসেছে আজ। টিউটারটি আট-এস্ সির ছাত্র, বেশ যে ধরনের মতো নয়, সোজাসজি না ভিগ্যাস করেও ক্রমে টের পেয়েছিল তড়িৎ: কতকটা ঐ কারণেই গ্র্যাঞ্জারেট ফ্রেনে অখিল সেদিন তড়িৎকে টুইশনি নেওয়ার কথা বলেছিল। তড়িৎ ঠিক করেছে মাঝে মাঝে এইরকম একটা ছুতানাতা করে এসে ব'সে ওদিকে যে জটিলকুঁ হক্ষে সেটা মুদরে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এই করেই ও অখিলের শ্রীতির স্বপ্ন সাধ্যমতো পরিশোধ করে করে যাবে; বড়টা পারে। এইজন্মেই আজ সৈবক্রমে যে সময়টুকু বেঁচে গেল সেটা তো রোজগারে লাগালই না, বাকী সময়টুকুও নিল এই দিকেই টেনে।

বেশ একটি নূতন ধরনের আনন্দ পাচ্ছে। এইবার থেকে এইরকম করবে মাঝে মাঝে।

ও অঙ্কটা শেষ করে আরও গোটা দুই করিয়ে

মিল। তার পর আর কোন কোন পাঠ্য বিষয়ে অতিক্রম্য জিগোস করে নিয়ে টা হাডের পড়তি দেখিল, এমন সময় একটা বড় প্যাকেট খুলে করে অধিল এসে পৌঁছল।

একটু বিস্মিত হুইটে প্রশ্ন করল—“হুইটের আছে এত সকাল সকাল যে? শরীর খারাপ নাকি?”

হুইটে কারবটা বলল; অবজ্ঞা হাসল কারবটা নয়।—“খবরের কথাটাও নয়।—টাকাটা আজ অল্প সময়ের মধ্যেই এল উঠে, তাবল বাড়ি ফিরে যাওয়া দোকানগুলো—বই নিয়ে বস। যাবে বরং। এর ভাড়টা দিতে যাবার জন্যে বসে আছে।

“কতক?”—জিগোস করল অধিল।

“এটো অনেকটুকু...”

বিলল বলল—“তার চেয়েও বেশি, তিনটে অল্প কবলুন; প্রায় হুইটখানেক...”

“অল্প হবে?”—একরকম কথাটা চাপা দেওয়ার চেষ্টাই পকেট থেকে একটা টাকা বের করে বলল—“এটো মিল।”

নাথ থেকে আট আনা পয়সা বের করতে-করতে অধিল বলল—“দেখো তো, আর অজুই মেরি করে ফেললাম আমি। তা তুমি তো ওটা কাটকে নিয়ে চলে যেতে পারতে।”

বিললকে বলল—“একটু জা দিচ্ছেলি কাকাকে?—মনে তো হচ্ছে না, সে হুইটে আছে?—তিনটে অল্প কথিয়ে নিলুম!—একটু বসবে হুইটে তুমি”—বলে ভেতরে চলে গেল।

কবিতা

কোল্ড ক্রীম অভ বোজেজ

গোলাপগন্ধ প্রসারিত প্রলেপ

বেঙ্গল
কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই
কানপুর

আঙ্গুরগন্ধ ক্ষেদ্রমুক্ত রাখিতে

গ্লিসারিন

স্বচ্ছ সাদা

শ্রীত

অসিতকুমার

পাতা পোড়ার গন্ধ আসে
হলুদ ছোয়া। সবুজ ঘাসে
ঘনায়, আর—
কুয়াশ। জন্মে মাঠের কোণে
তোমার মনে আমার মনে
অঙ্ককার ;
সজীব হয়, পৃথিবীময়
ছায়াবা শুধু কি কথা কয়
দীর্ঘদিন—
রূপ রোদে লুপ্তবাদ—
কী অবসাদ ! কী অবসাদ !
অন্তহীন ।

কিছু যে করি, দ্রুমে ভরি
সবলে কিছু, নিকটে ধরি
সাদা কোথায় ?
মটিতে নেই ধানের ত্রাণ—
শয়িত দেহ লুপ্ত ত্রাণ—
বাতাস শুধু শরীরী ;—
ধর শূন্যতায়...

•

সন্ধ্যা : শ্রীত

এখন দিনের শেষ : পায়ে পায়ে ঘরে ফিরে আসা,
এখন রাতের শুরু : মনে মনে দুরাকাশে ফেরা,—
এখন কথার শেষ : থাকে যদি কোনো ভাষাবাসা
তাই দিয়ে ছায়ানীড় গড়ে তোলে ভীষণ পথিকেরা ।

বেতান্ত কুয়াশা ক্রমে জন্মে ওঠে পৃথিবীর কোণে
ছায়া গাঢ়তর হয়, পাতাকরা গাছের শাখায়—
অজান্তে খোঁজে মন আরো কোনো মাহুঘের মনে
প্রদীপের মতো কারো ছুই চোখে, এ চোখ তাকার ॥

ডাক্তারের জীবনচিহ্ন

• ডাক্তার ডট •

৯৮

ঐ সময়কার আরো একটি কল্প স্মৃতি এখনও আমার মনে জলজল করছে। তার কথা আজও আমি ভুলে যাইনি।

যে কথা বলতে হাকি পে-মোটেইর নামে নির্বলা। মালার শূন্য পরিচয়বাহী এই কল্প আমার পরিচয় হয়ে যায়। যে ব্যক্তিত্ব মালার থাকতো সেই ব্যক্তিত্ব সেও সৈদহরুর এসে উঠছিল।

একদিন মালার অনায়েক ছেলে পরীক্ষা। বলে পাঠালে যে মত একটি ঘোঁষী আছে, তাকে একবার দেখতে আসতে হবে।

আমি যেতেই মালার প্রাণ আমার কাছে এনে হাকির করলে। বললে—“প্রথম কতো, ঠিনি আমার কাকদানু, তোমারও তাই হন।” যেহেতু হুমিই হয়ে আমারকে প্রণাম করল।

মেয়েটি খুব রোগা, মুখখানি অতি ককণ, মোহাত বোকাগোকা জাদামাহুরের মতো। বয়স বেশি নয়, এতশের উপর হবে বলে মনে হয় না। গায়ের রঙ ক্যাকাশে, বহুহীন। দেখলেই বোঝা যায় মেয়েটি গর্ভবতী, প্রায় পূর্ণগর্ভ। যে বেশিকণ পাড়িয়ে থাকতে পারলেনা, বসু করে মাটির উপর বসে পড়ল।

মালার কাছে ওর পরিচয় শেলান। মালার যা বললে তা শুনে ভর্তি হয়ে গেলাম। সে বললে—“এ হুতভাটীর অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। অল্পবয়সে বিধবা হয়ে শূন্যব্যক্তিত্বই ছিল, ওর বাপ-মা কেউ নেই। গল্পাঘানের লোক, কিন্তু তাদের অবস্থা ভালো। দেখানে ওর এক ভাইর আছে, সে বহুচরিত্র আর বেশাধার। বাপ-মাদের তোখে ধুলো দিয়ে সে একরকম কোর করেই ওকে নষ্ট করেছে। ওকে ভয় দেখিয়ে শাসিয়ে রেখেছিল যে ধরনার কাউকে যদি বলিস তাহলে তোকে খুন করে ফেলব। প্রাণের ভয়ে ও কাউকে কিছু বলেনি। কিন্তু যখন পেট বড়ো হয়ে উঠতে থাকল তখন তো আর লুকিয়ে রাখা যায় না। যখন জানাকানি হলো তখন সবাই ওইই নামে ঘোব দিলে, বললে যে ওকে বাড়ি থেকে দূর করে দাও।

তখন ডাক্তার বললে যে, তোমরা কিছু চেয়েনা, আমি ওর ব্যবস্থা করছি। সেই ডাক্তার ওকে এখানে এনে ফেলে দিয়ে গেছে। ব্যক্তিগতালীর হাতে মোটা কিছু টাকা দিয়ে গেছে, বলে গেছে যে, প্রথম হয়ে দাখার পরে বাচ্চাটার একটা কিছু হাতি করে ওকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু ফিরিয়ে যে কতই নিয়ে যাবে সে তো বেশ বুকতেই পারছি। ব্যক্তিগতালী আর ওকে এখানে রাখতে চাহনা, কেবলই বগছে ওকে হাসপাতালে নিয়ে আসব। আর ওর অবস্থা দেখেচেন তো, প্রথম হতে হতে হয়তো মরেই যাবে। এখন আপনি যদি ওর একটা কিছু উপায় করে দিতে পারেন। ওর পোষ তো নিশ্চয়ই আছে, ও এমন স্নাতক কেন? কিন্তু তবুও যাতে এখন ও প্রাণে নাচে দে-চেটা করতে হয়।”

মেয়েটি ভেটমুখে বসে হাঁপাতে লাগল, তার হুচোখ দিয়ে জল বরষতে লাগল। আমি যত দিয়ে হাট্টা একবার দেখলাম, হাট্টের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। এ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে রাখা খুবই দরকার।

আমি তখন বললাম—“কেবি, হাসপাতালে একটা বেড ঠিক করে আসি। তার পর ওকে নিয়ে যাওয়া ব্যবস্থা হবে।”

নির্বলা আবার হেঁট হয়ে আমার পায়ের ধুলো নিতে এগিয়ে এল, এদিকে তখনও হাঁপাচ্ছে। আমি বললাম—“থাক থাক, ওসব পরে হবে।”

হাসপাতালে একটা বেড জোগাড় করতে আমার কোনো বেগ পোতে হয়নি। হুদিনের মধ্যেই তার ব্যবস্থা হয়ে গেল। সত্যকে বললাম গাড়ি ভাড়া করে ওকে এনে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে।

সে ওয়ার্ডে ওকে ভর্তি করা হলো দেখানকার ডাক্তার ও নার্স প্রভৃতি সকলকেই আমি বলে রেখেছিলাম যে মেয়েটি আমার বিশেষ পরিচিত। স্ততরাও ওর চিকিৎসার ও ক্ষয়র কোনোই জটী হলোনা।

পরীক্ষা একই সোয়ে আসছিল, কিন্তু এসবের সম্বন্ধ নানারকম গণগোল লাগল। দেখা গেল যে এসবের কোনো বেগ নেই, আর ভিতরকার সম্ভানটীও জীবিত

নেই। বাধ্য হয়ে নানারকম কৃত্রিম উপায়ে তাকে এসব করাত হেলা।

তার পরে ওর প্রচুর রক্তস্রাব হতে থাকল, কিছুতেই তা থামানো যায় না। এর ক্ষতও অনেক কৃত্রিম উপায়ে রক্তস্রাব বন্ধ করতে হলো। এইসকল কারণে সে নিত্যমাত্র নির্ভীক হয়ে পড়ল।

এই উপরে তার প্রবল অর হতে লাগল। এখনকার দিনে এসবের পরের এই অরকে কোনোই ভয় নেই, এর খুব ভালো ভালো ওষুধ রয়েছে যাতে হই-তিনদিনেই তা আরোগ্য হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তখনকার দিনে এও ছিল এক মারাত্মক রোগ, অনেকেই মশুতিই এ-রোগে মারা যেতো। তখনকার নিহম অসুস্থারী যথাযথ চিকিৎসা হতে থাকল, কিন্তু সে অর সহজে কমতে চাননা।

আমি এতাহ তাকে একবার ক'রে দেখতে যেতাম। অরের ঘোরে আমার দিকে চেয়ে সে প্রাণলভ হয়ে উঠতো। বলতো—“কাকাবাবু, আমার মস্তে আপনি অনেক কিছুই করলেন, কিন্তু এবার আমাকে যেতে দিন। আমার মতো হতভাগিককে বাঁচিয়ে কি লাভ আছে বলুন? আমি তো হুং পাগোই, আর আপনিও হুং পাগেন।”

ব্যস্তকি সাধনা সেবার তো কিছুই ছিল না, তাই তাকে ধমক দিয়ে ছুপ করিয়ে রাখতাম। একই ধমক খেলেই সে শুৎক্ষাৎ ক্ষান্ত হতো।

কিন্তু ক্রমশ ধীরে ধীরে সে আরোগ্য হয়ে উঠল। জীবন মৃদু হতে সে আশঙ্কিত হলো, তার মূখে একই হাসিও দেখা গেল। তখন সে বলতো—“কতকাল পরে আমার ভয় মূচল তার ঠিকানা নেই। মায়-জীবনটা আমার ভয়ে-ভয়েই কেটেছে। কিন্তু ভয় গেলেও ভাবনা তো যায় না, কাকাবাবু! এর পরে আমার কি কথা হবে, কোথায় গিয়ে উঠবো, কি কাজ করবো?”

আমি আমার ধমক দিয়ে বলতাম—“এসব তোমার ভাবতে হবে না, যেন ভাবনা থাকলে সারতে আরো সেবি হবে। আগে ভালো ক'রে সেরে ওঠো, তারপর তখন দেখা যাবে। এখন এসব ভাবনা আসতেই শিঙনা।”

সে বলতো—“আপনি বধন বলাচ্ছেন তখন আর ও-কথা ভাববোই না। আপনি আর-কয়ে আমার বাবা ছিলেন।”

মুখে ঐ কথা বললাম বটে, কিন্তু এ ঘেরটিকে নিয়ে বে কি করি, কোথায় ওকে রাখি, তাই নিয়ে মহা ভাবনায় পড়লাম। ও যেন আমারই ব্যাঙের বোঝা হয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে হাসপাতালে এনে রেখেছি, সেখানে আর একে কিহিরে পাঠানো যাবনা। এখনত ক'র কাজেই বা

পাঠাবো, আর ষিঠীত থাকবার মতো পরচরজ না দিলে কেই বা ওকে রাখনা দেবে। শতমদাঙ্কিত ফিরে যাবার কথা একবার উপাশন ক'রে দেখেছিলাম, কিন্তু সেখানে সেই ডাক্তার রয়েছে; ও বলে যে—মাছতনার পড়ে থাকি সেও ভালো, তবু সেখানে যাব নয়। অস্ত্র আতীর-বলনও কেউ এখন নেই সেখানে ওর স্থান হতে পারে। হুনিয়ার কোনোখানে ওর স্থান নেই। কিন্তু আমিই বা ওর কোন উপায় করতে পারি, কতটুকু আমার ক্ষমতা।

হাসপাতালে বেশিসি ওকে রাখবে না, একই হুং হয়ে উঠলেই ডিসচার্জ ক'রে দেবে। একজন রোগী অনেকদিন পর্যন্ত বেহু অধিকার ক'রে থাকবে, হাসপাতালের এ নিয়মই নয়। এর মধ্যেই ওরা বলতে শুরু করেছে যে এবার বাড়ি নিয়ে গিয়ে পুষ্টিকর পথাদি দিয়ে ওকে সারিয়ে তুলুন। হতশুদ্ধ তার অসুস্থ হতে আরো কিছুদিন রাখতে অসুতোখ করেছি, নিতান্ত আমার বাড়িরে আরো কিছুদিন ওরা রাখতে বীকার হয়েছে। ইতিমধ্যে বাহ্যিক একটা কিছু ব্যবস্থা ক'রে ফেলতেই হবে।

অনেক ভেবেচিন্তে আমি এগ নারী-আশ্রম বৃক্কে বেধ করলাম। তারা এমনি পক্ষ-পরিভাস্ত অসহায় মেয়েদের স্থান দিয়ে রাখে। অনেকগুলি দ্বী শোকের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত উন্নত ধরনের এক নারী-আশ্রম, সেখানকার সবকিছু ব্যবস্থা বেশ ভালো। মেয়েদের ঘরায় সেটি পরিচালিত হয়, পুরুষের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। মেয়েদের সেখানে মতো কাটতে, ঠিক চালানো, পশম প্রভৃতি দ্রুত, আর জামা-কাপড় সেলাই করতে সেখানেই হয়। কিন্তু সেখানে ভর্তি করার হাফা বা আছে, কেউ একজন অভিভাবক-বরূপ দাঁড়িয়ে রাখি এহং না করলে দাকে-তাকে সেখানে স্থান দেওয়া হয়না। ঐ নারী-আশ্রমের একজন কতৃপক্ষক আমি নিনতাম, তাকেই গিয়ে ধরলাম। তিনি বললেন, আমি যদি গার্ভেন-বরূপ হয়ে দাঁড়াই, তাহ'লে তিনি চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন। তাতেই আমি বীকার হলাম, মস্পর্কে আমি কাকা হই বলে বরখাস্তের উপর দ্বাক্ষর ক'রে দিলাম। নাম দাব ঠিকানা সমস্তই দিতে হলো। কয়েকদিন পরে ঐ আশ্রম থেকে চিঠি সেলাম যে মেয়েটিকে ওরা নিতে রাজী আছে।

সংকেচ কাটিয়ে ওকে গিয়ে তখন বললাম যে আপাতত এই ব্যবস্থাই আমি করছি। এ ছাড়া অস্ত্র কোনো উপায় নেই।

ভেবেছিলাম যে, নারী-আশ্রমে এইভাবে চালান ক'রে সেবার কথা শুনে ও হসতো হুংখিত হবে, মতো আপত্তি

করবে। কিন্তু তা কিছুই হলো না। বহু সে খুশি হয়ে বললে—“আগনি সেখানে যেতে বললেন দেখানোই আমি ধাবো। যেমন ভাবে রাখলেন তেমন ভাবেই থাকবো।”

সেই নারী-আশ্রমে গুপ্ত পৌঁছে গিয়ে আমি নিশ্চিত হলাম। কিন্তু তখনও ও বেশ হুঁ হুঁ ছাশনি। সেহ রক্তপূর্ণ, শরীর হুঁহু। আমি তাই আশ্রমে বলে দিলাম যে গুপ্ত আপাতত একই স্থানেই রাখতে হবে, সম্ভ্রান্তি হানপাতাল থেকে আসেছে। ওর জ্বর আগাশা দুধের বাবুবা ক’রে দিলাম। নিয়মিতভাবে বাঙালিদের জ্বর বলাকারক গুপ্ত প্রতিক্রিয়া দিয়ে এলাম। তারা বললে, এখন গুপ্ত কোনো কাজ করতে যে ওয়া হবে না, যা করাই থাকবে।

তার পর হুই-একবার মাত্র দেখানো গুপ্ত দেখতে গিয়ে-ছিলাম। দেখা করাও কম হাজারো নয়, অনেকটা সময় নষ্ট হয়। প্রথমে আবেশন জামিয়ে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করতে হয়, আশ্রমকর্ত্রী কাছে থবর বাথ, তিনি হুঁহু দিলে তবে উন্মিত মেয়েটিকে বাইরের ঘরে ডেকে আনা হয়। এখন বেথলায় যে শরীর হুঁহু হলেও ভোক্তাটু সে ভালোই আছে এবং গুপ্তপথ গ্রিকভাবেই থাকে, তখন আর সেখানে দাবার প্রয়োজন বোধ করলাম না।

প্রায় একমাস-দুইমাস এইভাবে কেটে গেল।

একদিন সন্ধ্যার পরে আমার ডাক্তারখানার বসে আছি, মাঝায় হুঁহু পাগড়ি বাঁধা এক লম্বা-চওড়া পাঞ্জাবী ছোক এসে আমার সামনে পড়িয়ে বতহতকে আমারকে অভিবাধন করলে। খুব সন্ত্রাসের সঙ্গে পরিষ্কার হীরেকীতে বললে—“আপনার সঙ্গে আমার একটি ঐতিহ্যেট কথা আছে, কখন সময় হতে পারে?”

আমি বললাম—“এখনই।” তখন কেউই সেখানে ছিল না।

সে বললে—“আমি আপনার অহুমতি চাইতে এসেছি। যদি অহুমতি কেন তাহ’লে আপনার কল্যাণকে বিবেচনা করে পৌঁজা আমার হতে পারে।”

আমি গ্লো অবাক। আমার কল্যাণ! বললাম—“আপনি বোধ হয় কিছু ভুল করেছেন। কোথা থেকে এ ধরনের সন্দেহ বসে তো?”

সে বললে—“নারী-আশ্রম থেকে। সেখানে একটি মেয়েকে আমি দেখে এসেছি, আপনি তার পার্শ্বন, সে আপনার পাগিতা করা। তাহেই আমি বিবেচনা করব বলে মন্ব করছি, কিন্তু আপনার অহুমতি ভিন্ন তা হতে পারে না।”

তখন সব ব্যাপারটা শুনলাম তার কাছে। নারী-

আশ্রমের এক নিয়ম আছে যে, কেউ যদি ইচ্ছা করে তাহ’লে গুপ্ত থেকে বড়ো বেছে নিয়ে বিবাহ ক’রে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাহ’লে জ্বর সেখানে কিছু চান্দা দিতে হয়, আর গুপ্তপথের ও অভিভাবকের অহুমতি নিতে হয়। টারার টাকা ক’মা বিবেচনা করে বড়ো বেছে নিতে চাইলে, বিবাহযোগ্য সকল মেয়েকে সামনে এনে টাঁড় করানো হয়, তার মধ্যে থেকেই খুশি বেছে নিতে পাওয়া যায়। ঐ খুবকটি বেশ থেকেই এই নারী-আশ্রমের সন্ধান পেয়ে এখানে এসেছে, অস্ত্রার মেয়েদের মধ্যে নির্মলাকেই তার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে।

খুবকর পরিচয় তখনাম। পাঞ্জাব প্রদেশে গুপ্তবাস-পুত্রের কাছে তার বাড়ি, বিয়াস নদীর ধারে। সেখানে গুপ্তের কিছু কলের বাগান আছে, তেঁতার পশনের খাবসা আছে। ওর বাপ আছে, মা নেই। বাপ গুপ্ত অমেরকরিন থেকেই বলছে একটি বৌ ঘরে আনতে। কিন্তু গুপ্তের বেশে মেয়ের বড়ো অভাব। অনেক টাকা দিয়ে গুপ্তানে মেয়ে কিনতে হয়, কিন্তু তারা প্রায়ই হয় অভিশ্যর গোঁয়ার ও মোহরা। ও দেশের ভক্তসমাজের লোকেরা তাই অস্ত্রার প্রদেশ থেকে মেয়ে সংগ্রহ ক’রে এনে বিবাহ করে, এটা গুপ্তের বেশে চল হয়ে গেছে। বাঙালী মেয়ের উপরেই গুপ্ত সবচেয়ে বেশী পোঁতা, কারণ বাঙালী মেয়েরা যেমন নম্র ও ভদ্র, তেমনি অতি পরিষ্কার। গুপ্তের বেশের অনেকটাই তাই নিজেরের জ্বর এই নারী-আশ্রম থেকে মেয়ে বেছে নিয়ে গেছে। এখান থেকে বিবেচনা ক’রে নিয়ে গিয়ে তারা সকলেই খুব হুঁহু হয়েছে। বাঙালী মেয়েদের মতো বিশ্ব ও সেবাপরাণ মেয়ে আর কোনো দেশে নেই, এই হলো গুপ্তবাসের লোকের অহুমতি। সাম্প্রতিক হুঁহু-পাঞ্জির জ্বর যদি বিবেচনা করতে হয় তাহ’লে বাঙালী মেয়েকেই বিবেচনা উচিত।

সব কথা শুনে আমি বললাম—“আমার অহুমতি দিতে কোনোই আপত্তি নেই, কিন্তু প্রথমে তার নিজের অহুমতি নেওয়া হরকার। যে যদি গুপ্তে রাবী না হয় তাহ’লে কেবল আমার অহুমতিনিই কোনো লাভ নেই।”

খুবক বললে—“আমি আসে তার অহুমতি কেনেই তবে আপনার কাছে এসেছি। সে নষ্ট বলে দিচ্ছে, আপনার আপত্তি না থাকলে তার কোনোই আপত্তি থাকবে না। আপনি যেমন হুঁহু করছেন তাই সে শুনে। সব-কিছু আপনারই হাতে।”

আমি বললাম—“তাহ’লে আমারও কোনো আপত্তি নেই। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে, তোমার কাছে মেয়ে-

সে খুব হুবেই থাকবে। কিন্তু একটা কথা, ও সম্ভবিত খুব একটা কঠিন যোগ থেকে উঠেছে, এখনও ওর পরীক্ষা খুবই হৃৎপ। এই সময়ে বিবাহাদির হাজাখা, তার পরে ট্রেনে অত দূর-দেগে নিয়ে যাওয়া, এতে ও হুতো বেশি অস্থির হয়ে পড়তে পারে।”

সে বললে—“আমি তা মেয়েই বুঝতে পেরেছি, আর ওখানকার লোকেরাও সে-কথা আমাকে বলেছে। যদি সময় থাকতো তাহ’লে কিছুকাল এখানে অপেক্ষা করে যেতাম। কিন্তু বেশে বুড়া বাগকে একলা কেলে এবেছি। আর বুঝতে পারছেন তো, অত দূর থেকে আবার আসা আমার গকে সম্ভব হবে না। আমি এখনই এককাক শেখ করে কেলতে চাই। কোনো হাজাখা হবে না, এখানে রেক্সিষ্ট্রী বিবাহ করে ওকে রিকার্ড-বার্ষে খুব হুতের সঙ্গে নিয়ে যাবো। ওখানে একবার গিয়ে পড়তে পারলে ওকে আত্ম-বিসদানা আর বাঁটা টেঁকা-হুখ খাইয়ে একমাসের মধ্যেই জাগড়া করে তুলবো। আমি হু-বছর পরে আপনার কাছে এনে ওকে দেখিয়ে নিয়ে যাবো, ওর চেহারা দেখে তখন আপনি চিনতেই পারবেন না। এখান থেকে বত মেয়ে ওখানে গেছে সকলেই খুব আশ্চর্যবতী হয়েছে। ওখানকার জলখাবার খুব চমৎকার।”

পাঞ্জাবের ঐ অঞ্চলের জলখাবার খুব ভালো সে-কথা আমিও ভনেছি। তা ছাড়া এ তো আনকেরই কথা, মেয়েটারও জীবনের একটা কিনারা হয়ে যাবে, আর খাড় থেকে দাড়িয়ের বোধ্য নেমে গেলে আমিও নিশ্চিত হতে পারবো। কাজেই আমিও তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলাম।

হুসিন বাবাই রেক্সিষ্ট্রী বিবাহ সমাধা হলো। আমাকেও রেক্সিষ্ট্রী অফিসে বেতে হয়েছিল। অনেক পরমাণর করে সেই পাঞ্জাবী খুবক বেনারসী জামা ও কাপড় কিনে দিয়েছিল; গলায় হার, কানে হুল, হাতে হুড়ি প্রভৃতি কিছু কিছু গহনাও দিয়েছিল। প্রায় থেকে তারা নির্মলাকে বেশ হুসুর করে নাড়িয়ে দিয়েছিল। গলার হুলের মালা, কপালে চন্দনচর্চা, সিঁঝিতে সিঁহুর। সেই অভাগিনী নির্মলাকে তখন বেনে সতাই আর নোনা হাঙ্গিল না। তার হুখের দিকে চেয়ে দেখলাম বেশ হুশিতে ভরা। বিবাহের পরে ওরা একসঙ্গে আমাকে প্রণাম করলে। পাঞ্জাবী খুবকটি এক গরমের কোড় ও দশটি টাকা আবার পারের কাছে রেখে বিদে। এ আবার কি। সে বললে, শুওকে বিয়ের দিনে প্রণামী বিতে হু, এটা ওদের দেশের রহস্য।

পরের দিনে ট্রেনে ওদের তুলে দিয়ে এলাম। সেকেও জামে হুট রিকার্ড-বার্ষ নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে বিশ্ব

জিনিদশত, নির্মলার অস্ত্র নতুন হুটকেন, কল ও খাবারের হুসুরি। ওরা হুসুরে আমাকে প্রণাম করে গাড়িতে উঠল। গাড়ি ছেড়ে খাবার পরেও নির্মলা জানলা দিয়ে খুব খাড়িয়ে চলছিল চোখে আবার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সাতা দিন ধরে সেই দৃষ্টীটা বারে বারে মনে পড়তে লাগল।

দিন চারেক পরে আমার কাছে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। সেখানে পড়ে আমি চমকে উঠলাম। তাতে লিখেছে, নির্মলা হুয়াং যাত্রা গেছে, পরে চিঠিতে সব কথা জানা যাবে। একথা বেনে আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না।

কয়েকদিন পরে এক চিঠি পেলাম। সে এমন বিচিত্র চিঠি যা পড়ে খুব করুণ হুনে হতে পারে আর কৌতুহলও হুনে হতে পারে। পাঞ্জাবী খুবক লিখেছে—

“মাই ডিয়ার কাপার-ইন-ল,

টেলিগ্রামে জানতে পেরেছেন যে নির্মলা আর নেই। ওকদাসপুর স্টেশনে নেমেই হুয়াং সে অস্থির হয়ে পড়ল, সেই স্টেশনের প্রাটকর্বেই সে প্রাণত্যাগ করল, তাকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারিনি। অথচ চারদিন ট্রেনযাত্রার মধ্যে সে খুবই স্বস্থ ছিল, আর বরাবর আমার সঙ্গে আদর্শ স্ত্রীর মতোই ব্যবহার করেছিল। ওইই মধ্যে আমাদের ডাচা একই-আই-শিখে নিয়েছিল। খাবার সময় হা করে আগে আমাকে খাইয়ে তবে সে খেতো, হুয়ের সময় আবার তুলে হাত হুগিয়ে দিত। কখনো হুখ তার করে থাকেনি, আলাপ করবার জন্ত খুবই আগ্রহ, কোনটাকে কি বলে বারে বারে জিজ্ঞাসা করত। এমন শান্ত সরল মেয়ে আমি কখনো দেখিনি, নিজেকে সৌভাগ্যবান বলেই মনে করছিলাম। মাত চারটি দিনেই মনে হুঙ্গিল বেনে কতকালের পরিচর। কিন্তু স্টেশনে নেমেই সে বুকে হাত দিয়ে প্রাটকর্বে ওয়ে পড়ে ছুটখুট করতে লাগল। কতকগুলি কথা বললে তা আমি কিছু বুঝতেই পারলাম না, কেবল বুঝলাম যে কাশাবাবু নাম করে আশনাকে হুতো জাকছে। ঐ কথা বলতে বলতেই সে শেখনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। ওখানকার ডাক্তারকে তাড়াহাড়ি ডাকা হয়েছিল, সে বললে হুয়াং হার্ট-কেল করেছে।

—হুতভাগ্য আপনার জামাতা”

এইজাতীর বিড়ম্বনা, এও আমার ডাক্তারী অভিজ্ঞতার মধ্যে। অস্ত্র কোনো ডাক্তারকে এমন ভোগ করতে হুয় কিনা জানিনি, কিন্তু আমাকে অস্ত্র তুলতে হয়েছে।

৮৮

এই দমরে একজন সাধুকে আশ্চর্যভাবে আরোগ্য ব'রে আমি খুব উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম, যনে করেছিলাম যে বড়ো বড়ো নগর ডাক্তারের উপর টোকা দিয়েছি।

তিনি একজন খ্যাতনামা সাধু ব্রহ্মচারী। অধিকাংশ লোকেরই তাঁকে চেনে। সকলেরই তাঁকে উৎসবের মাত্রায় বলে প্রভাভক্তি করে। প্রকৃত নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষী বলে তিনি সর্বদা, সকলের সঙ্গে অন্যায়ের দ্বন্দ্বিতায় পড়েন বলে রাজা-মহারাজা থেকে শুরু করে সবাই তাঁকে বাতির করে, কেউ তাঁর কথা সহজে মেনে নেয় না। সকলের কাছেই তাঁর প্রতিপত্তি আর সকলের মহত্বের কাজ নিয়েই সর্বদা লেগে আছে। যেখানে অসুখভাব ও হুতিক সেখানে তিনি তা সাধনাতো দূর করবার চেষ্টা করছেন, যেখানে বজা গিঝে মহামারী দেখা দিয়েছে সেখানে তিনি ছুটে যাচ্ছেন, যেখানে শিকার অভাব সেখানে শিকা-বিতরণের ব্যবস্থা করছেন, যেখানে লোকের উৎপীড়িত সেখানে গিয়ে নানা ভাবে চেষ্টা করছেন যাতে তাঁর কিছু দীর্ঘাঙ্গ হয়। কাজেই দেশের লোকের তাঁর একজন কর্মবোম্বী সমাদরী বলেই জানে। তাঁর শিষ্যদিগে অনেক আছে, ভক্তের সংখ্যা কম নয়। তাঁর উপদেশ-বাণী শুনেই সভ্য-সমিতিতে অনেক লোকের ভিড় হয়।

এই সাধু আমাদের পাড়াতেই থাকতেন। ইতিপূর্বে তাঁর নামও যথেষ্ট শুনেছি, আর তাঁর সঙ্গে আমার কিছু মৌখিক পরিচয়ও ছিল। পাঁচ ঘণ্টা মাকে মাঝে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যেতো। কিন্তু ইদানিং আর তাঁকে দেখা হাঙ্গিল না, শুনেছিলাম তিনি অসুখ।

তাঁর এক শিষ্য ছিল আমার বোম্বী। তাকে আমি পুরোনো ডিসপেন্সারি রোগ থেকে আরোগ্য করেছিলাম। সেই অবধি আমার উপর তাঁর খুব বিশ্বাস ছিল। সে প্রায়ই এসে বলতো যে সাধু হার্টের রোগে কষ্ট পাচ্ছেন, অনেক বড়ো বড়ো ডাক্তারকে দিয়ে তাঁর চিকিৎসা করানো হচ্ছে, কিন্তু কোনো চিকিৎসাতেই কিছু উপকার হচ্ছে না। আমি তখনাম, কিন্তু কিছু মন্তব্য করতাম না। হার্টের রোগ নতাই দুঃখাগো।

কিছুকাল পরে সেই লোকটি একদিন এসে বললে—
“আপনি একবার চলুন, সাধুকে দেখবেন।”

আমি বললাম—“তা হয় না। আপনি বললেই আমি যেতে পারি না। আর, যেখানে অল্প ডাক্তারে চিকিৎসা করছে সেখানে আমার বাতায়ই উচিত নয়, ডাক্তারী নীতিতে এটা নিষিদ্ধ।”

সে উত্তেজিত হয়ে বললে—“আরে মশাই, ও কথা কি আমি জানি না? আপনাকে অসম্মানিত হতে সেখানে নিয়ে যাবো? অনেকদিন পৃথক আলোচনায় চিকিৎসা করিয়ে কোনো উপকার না পেয়ে তিনি এখন সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথি করচ্ছেন।” কিন্তু তাকেও কিছু হচ্ছে না। ডাক্তারের খুঁজে কষ্ট পাচ্ছেন, অনেকের বলছে এমনি ভুগতে ভুগতে হঠাৎ একদিন হার্ট-কেল ব'রে মারা যাবেন। সে কষ্ট চোখে দেখা যায় না। কিছু খেতে পারেন না, উঠে পাড়তে পারেন না, শাশ্বত একটা নড়চড়াতেই খুঁবের কষ্ট হয়, ছটফট করতে থাকেন, দ্বারে পৃথক ঘুম নেই। আমি তাই বললাম যে বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা তো সবাই কেল করলে, এখন আমাদের পাড়ার ছোটো ডাক্তারকেই একবার দেখান না। কিছুতেই কিছু। বর্ষন হচ্ছে না, তখন এতটুকু ক্ষতি কি আছে। আমার এমন রোগটা বর্ষন মারিয়ে দিতে পেরেছে, ভগবানের ইচ্ছা হলে আপনাকেটাও হয়তো মারিয়ে দিতে পারে। তিনি হুদিন পৃথক আমার কথার কোনো জবাব দেননি, হুদিন পরে আজ বলছেন যে তাঁর ডেকে নিয়ে এসো। তবেই আপনাকে ডাকতে এগেছি।”

অগত্যা সাধুকে দেখতে যেতে হলো। তিনি থাকেন তাঁর এক আশ্রম-বাড়িতে, ভক্তদের দ্বারা পরিহৃত হয়ে। ভক্তেরা যথেষ্ট তাঁর সেবা করছে।

আমাকে দেখে তিনি একই হেসে বললেন—“সব ডাক্তারকেই দেখানো হলো, কেউই কিছু করতে পারলে না। শেষ পৃথক এখন তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম, দেখি যদি তুমি কিছু করতে পারো। মরে গেলে কোনো দুঃখ নেই, তাঁর জন্য আমি প্রস্তুতই আছি। কিন্তু এই যন্ত্রণার হাতে থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দাও, অন্তত কিছুটা এর কঠিনে দাও, তাঁর বেশি আর কিছু চাই না।”

আমি বহারীতি তাঁকে পরীক্ষা করলাম। তাঁর পরে বললাম আজ পৃথক কি কি চিকিৎসা করা হয়েছে আর কি কি ল্যাবরেটরী পরীক্ষা হয়েছে তা আমার জানা দরকার। ইতিপূর্বাতেই একজন ভক্ত একাও এক বাঙালি এনে হাজির করলে। অফিসের কাইলজলা যেমন হয়, তেমনি তাকে এক স্রুহুং স্রুহুং বলা চলতে পারে। আমি নিষিষ্ট-মনে প্রত্যেকটি কাগজ উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলাম।

হার্টের গুণ্ড, বাবা নিবারণের গুণ্ড, যুনের গুণ্ড প্রভৃতি নতুন ও পুরোনো বত বকমের আছে সমস্তই ব্যবহার করা হয়েছে। বলতে গেলে ডাক্তারী শাস্ত্রের কোনো ওষুধই বাদ যায়নি। আবেহিকা, ইংলও, কার্বানি, ব্রাইকারপ্যাও, এমন কি জাপানের পৃথক নতুন নতুন কোম্পানির

নহন নহন গুপ্ত সবগুলিরই নাম এই বাড়ির লোকের মাথা পাওয়া যায়। আর এদিকে রক্ত, মূত্র, পুত্র, মল প্রভৃতি সব-কিছুই লায়বেরটাই পরীক্ষা করানো হয়েছে, তার রিপোর্টগুলি রয়েছে। কার্ডিওগ্রাফও করা হয়েছে, হার্টের এক্সরে ছবিও নেওয়া হয়েছে। কোথাও কোনো ক্রটি বা ছিঁচ নেই।

সব কিছু দেখতে দেখতে হঠাৎ আবার মনে হলো, 'ডব্লু.আর.' পরীক্ষার কোনো রিপোর্ট দেখিনি তো। সমস্ত কাগজগুলি খুঁজে দেখলাম, কোথাও তার উল্লেখ পেলাম না।

তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম—“রক্তের ডব্লু.আর. পরীক্ষা কি কখনো করানো হয়নি?”

একজন ডাক্তার এসে বললেন—“বে-সব বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা ঠকে চিকিৎসা করার ভার নিয়েছিলেন তাঁরা কেউই হয়তো তার প্রয়োজন বোধ করেননি। আপনি কি তার প্রয়োজন বোধ করছেন? আপনার মতে কি ওটা নিতান্তই প্রয়োজন?”

আমি একটু বিরত হয়ে বললাম—“তা নয়, এখানে ঠিক প্রয়োজনের কথা নয়, তবে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে পুথ্যাপুথ্যভাবে বে-সব পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া চাই বলে নিয়ম আছে, তার কোনোটিকেই বাত দেওয়া উচিত নয়। যোষ্টর শরীরে কোন্‌ ঘোষ আছে আর কোন্‌ ঘোষ নেই সে সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিকার কিছু থেকে না বায়, সকল বিষয়েই প্রমাণ পেয়ে হিরনিস্‌ফর হয়ে চিকিৎসার নামা হরকার।”

আর একজন ডাক্তার বললেন—“সাধারণ মানুষদের বেলাতে সেই কথাই ঠিক বাটে, কিন্তু এই সাধু মহাপুরুষের সবচেয়ে গুপ্তপরীক্ষার কোনো প্রস্তাব ওঠেনা। এর রক্তে বে-রোষ কিছু নেই বসেই আপনি ধরে নিতে পারেন। এসব বৈজ্ঞানিক তর্ক ছেড়ে আপনি এর কষ্ট নিবারণের উপস্থিত কিছু ব্যবস্থা করুন।”

আমি বললাম—“আমাকে আপনারা অঙ্কের মতো কাজ করতে বলছেন। অস্ত্র চেয়ে হলে তাই হয়তো আমি করতে পারি। কিন্তু এখানে যখন এই একটা ক্রটি আমার চোখে ধরা পড়ে গেছে, তখন এইচুর সমাধান না করে আমি চিকিৎসার দিকে হাত দিতেই পারবোনা।”

সাধু তখন নিজেই বিরক্ত হয়ে ডাক্তারের দিকে চেয়ে বললেন—“গার হাতে চিকিৎসার ভার দিতে চাইছি ভার সবে পোনারকমের তর্ক করতে বাওরাই আমাদের হুঁত। তার যখন একবার দিবে দিলাম, তখন থেকে আমার অস্ত্র কোনো কথা বলবার অধিকারই মইল না। উনি যখন সে ভার এতখ বয়েছেন, তখন ঠিক বা বুনি

তাই করলেন। তোমাদের কথা উনি তখনই কেন? —ভুনি যদি ঐ পরীক্ষা করতে চাও তাহলে এখনই তার ব্যবস্থা করতে পারো।” এই কথা বলে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

আমার সঙ্গে ব্যাধ ছিল, তার মধ্যে গানি টেস্ট-টিউবও ছিল। আমি তাঁর হাতের শিরা থেকে গানিক রক্ত টেনে নিলাম। রক্ত নেবার সময় আমার হাত কিছু খুব কাঁপছিল, মনে হচ্ছিল এর মস্ত আনাকে হয়তো হাতাশাশ হতে হবে।

লায়বেরটিতে সেই রক্ত পারিবে দিলাম। চাপদিন বলে রিপোর্ট এলো—ডব্লু.আর., ‘শ্রুং পরিত্রিত’। অর্থাৎ যে রোগের আশঙ্কা করে এই বিশেষ রক্তের পরীক্ষাটি করা হলো সেই রোগের বিপরীত এই প্রেরিত রক্তের মধ্যে পুথ্যাত্মকতাই বিদ্যমান।

রিপোর্টটি পেয়ে আমার মনে আনন্দের সীমা নেই। ঘোষ যখন খুঁজে পেয়েছি তখন সেই ঘোষ ধরে চিকিৎসা করলে রোগও নিশ্চয় মারবে। এক্ষেত্রে আমাকে আশ্বাসে হাতড়ে বেড়াতে হলেনা। রোগও এখন নির্দিষ্ট, চিকিৎসার লক্ষ্যও নির্দিষ্ট, লক্ষ্যভেদী বাণও নির্দিষ্ট করা আছে, কেবল তার প্রয়োগের অপেক্ষা। এখানে চিকিৎসাতে সক্ষম আমি হবোই।

কিন্তু রিপোর্টটি নিয়ে আমাকে হুপসিলে পড়তে হলো। কেমন করে একথা জানানো বাত যে, ঐ সাধু ব্রহ্মচারীর রক্তের মধ্যে প্রায়শ যোগের বিশ রয়েছে? এক্ষেত্রে একথা বলাই আমার উচিত নয়। যোষ্টর সবচেয়ে বা গুপ্ত কথা তা সকলের কাছ থেকেই গোপন রাখতে হবে, এই হলো ডাক্তারের নীতি। এ নীতি আমি কিছুতে লঙ্ঘন করতে পারি না। আমাকে এখনও গোপন রাখতেই হবে।

সেদিন অনেক হাতে আমি ছুপি ছুপি সাধু কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। একজন মাত্র সোক তাঁর কাছে তখন ছিল, আমি তাকে বললাম—“আমি ঠকে একটু প্রাইভেট পরীক্ষা করতে চাই।” সে দোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমি ঘরের বরফা বন্ধ করে দিলাম।

তার পর রিপোর্টটি শকেট থেকে বের করে তাঁকে দেখালাম।

তিনি রিপোর্ট দেখে প্রথমে কিছু দ্বন্দ্বতে পারলেন না। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—“এর অর্থ কি হলো?”

আমি বললাম—“আপনার রক্তে প্রায়শ যোগের বিশ পুথ্যাত্মক রয়েছে, রিপোর্ট সেই কথা বলেছে।”

“কেনন ক’রে এ বিধ রক্তের মধ্যে এবেশ করলো?”

“সে কথা আমি কেনন ক’রে বলবো? বরং আপনিই হয়তো বলতে পারবেন, কোনোমতই যদি—”

তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত চোখ বুজে বসে রইলেন। তার পর চোখ তুলে বললেন—“আমার এখন যৌবনের কথা মনে হচ্ছে। সে সময়ে আমি নিতলক ছিলাম না, চব্বিশের কিছু হুঁসলতা ছিল। কিন্তু সে অবস্থাটা ছিল সাময়িক। আর সে হলো প্রায় বিপদের আগেকার কথা। তা হ’লে আমি জানতাম: এটাই বলাতে পারি যে কোনো যাত্রার সংস্পর্শে ঘাইনি। আর যাত্রার যোগ শরীরের মধ্যে ঢুকলে তখনই তার তো কিছু চিহ্ন বাইরে প্রকাশ পাবে? কিন্তু শরীরের কোথাও তেমন কোনো লক্ষণই কোনোদিন প্রকাশ পেতে দেখিনি। এতেই আমার বুঝে আস্তর্য্য মনে হচ্ছে।”

আমি বললাম—“আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কারণটা বখনই ঘটেছে তার কসও যে তখনই বলবে এর কোনো মানে নেই। অনেক সময় এমন হয় যে এটি রোগের জীবন্ততা শরীরের মধ্যে ঢুক তখনই কিছু চিহ্ন প্রকাশ করলে না, কিন্তু কয়েকবছর পরে একবারেই কোনো ভিতরের দরক্কে আক্রমণ করলে। যেমন এখন আপনার হাঁটকে ঘটেছে।”

“তাই হয়তো হবে। কিন্তু আমি তা ভাবছি না, আমি ভাবছি আমার নিজের কথা। বখনই কেন কোষ ক’রে থাকি, ঠাকি দিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। তার কল আমাকে ভূগতেই হবে। অনেকদিন আগের কথা তিন, আমি সে-কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন সব মনে পড়ছে। নিজের উপর খুব অশ্রদ্ধা হচ্ছে, নিজেকে এখন ক’রে আবার জিনতে পেরে। দুনিও নিজের মনে মনে আমাকে ঝুগা করছে।”

“নিশ্চয়ই না। সকল রোগকে আমরা রোগাক্রান্ত রোগী বলেই দেখি, তার ব্যক্তিগত বোধভঙ্গের কথা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আর আপনিই বা তা ভাববেন কেন? এখনকার মানুষটি আলাদা, আর তখনকার মানুষটি ছিল আলাদা। গোড়া থেকে সকলেই স্বাধীন-বিবেকানন্দ হ’লে জন্মাবেন। মানুষ গোড়ার থাকে দুর্বল, তার পরে হয় সবল; গোড়ার থাকে অন্ধ, তার পরে হয় দৃষ্টিবান। এধনি ক’রেই তার বহুভয়ের বিকাশ। আপনাকে আমি চিনি, জ্ঞাতের কত কাজ করছেন তা আমি সবই জানি। আগেকার জীবনের কথা নিয়ে এখনকার আপনার বিচার চলবে কেন?

আপনারাই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন বিশ্বমঙ্গলের কথা, কত নীচের থেকে কত উচুতে মন্থর উঠতে পারে। মনে করুন, আমরা যদি শুনি যে বিশ্বমঙ্গলের পূর্বসূরী জীবনে তাঁর রক্তের মধ্যে এইরকম কোষ পাওয়া গিয়েছিল, তাহ’লে কি তাঁকে অশ্রদ্ধা করতে শুরু করবো?”

অশ্রদ্ধার আঘাত কথা শুনে হেসে ফেললেন। হাসতে-হাসতে চললেন—“এটি খুব চমৎকার কথা বলেছে। আজ তোমার কাছ থেকে একটি নতুন কথা শুনলাম। কিন্তু এ খবর তুমি-আমি ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তির জানানো উচিত নয়, কি বলো? একজন জানলেই পাঁচজন জানবে। তাতে আমার কাজের ক্ষতি হবে। কেউই আমার কথা তখন মানবেনা; বলবে—এটা ভণ্ড, দুশ্চরিত্র। তাতে সাধারণের যে কাজে আমি নেমেছি সে-কাজ একেবারেই পণ্ড হয়ে যাবে। তখন ছিলাম অসাধু আর এখন হয়েছি সাধু, এ কথা বললে কেউই মানবে না।”

আমি বললাম—“কটিকট জানাবার দরকার নেই। আমি আজ রাতে এখনই আপনারকে একটা ইন্জেকশন দিয়ে দাখি। তাতে আপনার খুব আর হবে। কাল সকালে সবাই জানবে যে আমি কিছু ইন্জেকশন দিয়েছি, তার জরুরি আর হয়েছে। এর এক সপ্তাহ পরে আবার একটা ইন্জেকশন দেব। কি দিখি আর কি করছি সে কথা জ্ঞানরের কাণ্ড জানাবার দরকার কি?”

“কিন্তু এতে রোগ সারবে কি?”

“আশা তো করি। ধরা বসন পড়েছে তখন এবার সারতেই হবে।”

“একটা ইন্জেকশনেই কি উপকার বুঝতে পারবো?”

“আশা তো করি তাই। দেখুন-না কি হয়।”

“একটু যদি হুহু হতে পারি তাহ’লে এর পরে তোমার ওখানে গিয়েই ইন্জেকশন নিয়ে আসতে পারবো। এখানে তোমাকে আর আসতে হবে না।”

সেই রাতেই তাঁর শিরায় মধ্যে আর্দেবিশেষ ইন্জেকশন দিলাম।

ভয়লোক আশ্চর্য্যরূপে হুহু হয়ে উঠতে লাগলেন। এক সপ্তাহ পরে তিনি গাড়ি ক’রে নিজেই এসেন আমার ডাক্তারখানায়। ডাক্তারখানার পাশে একটি আলাদা ঘর ভাড়া নেওয়া আছে, স্রীলোক সোপান এসে সেখানেই তাবের দেখি, আর হাতিকালে কম্পাউটার দেখানোই করে থাকে। আমি তাঁকে সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে ইন্জেকশন দিলাম, তার পর গাড়ি ক’রে বাড়ি পারিয়ে দিলাম।

ঘোড়ের উপর বারোটি ইন্জেকশন তাঁকে দিয়েছিলাম,

কিন্তু তার আগেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। অনেকেরই উৎসাহক হয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করতো যে একে কিভাবে ইন্জেকশন দিয়েছি, কেন্দ্র চিহ্নসমূহ একে আবার কয়েছি। আমি এটা-ওটা বলে কাটিয়ে দিতাম। যে লোকটি আমাকে ঢেকে নিয়ে গিয়েছিল তাকেও কোনো কথা বলিনি। তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকেই বলিনি।

এই সাফল্যের আনন্দে আমি খুব কৃত্তি লাভ করেছিলাম, আর মনে মনে যে আমার গর্ভ হ্রস্ব এই-কথা বললে মিছেকথা বলা হবে। বারে বারেই আমার মনে এই ভাবের উদ্ভব হতো যে, অস্ত্র ডাক্তারের বা প্যায়েনি আমি তা পেয়েছি, আমি না চিকিৎসা করলে এই লোকসিঁইতরী সাফল্যে নিশ্চয় মাথা বেতেন।

কিন্তু সভ্যই কি তাই? আমার কৃত্তির ওখানে কতটুকু, আমার নিজের হাত ওর মধ্যে কতটুকু ছিল? দেবতা আমার মাথায ঢুকে গেল যে রক্তের ঐ বিশেষ রক্তবর্ণের পরীক্ষাটি করা দরকার, তাইই আমি সাফল্যের সঙ্গে বাকী সব-কিছু করতে পারলাম। যদি ঐ কথটি আমার মনে উঠত না হতো তাহলে আমিও অস্ত্রদের মতো সফল চেঁচিয়ে বিফল হতাম। আর এ না-হয় বোলা গেল যে বোগের মূল কারণটি হরতে পারা যায়নি বলেই তার চিকিৎসায় এ-নর্থ কোনো ফল হয়নি। কিন্তু যেখানে কোনো কিছুই জটিলতা নেই, যোগ্য শশ্টভাবে জানা আছে, তার ওখুণ্ড জানা আছে, সেই ওখুণ্ড স্বাধীনতা এরোগ্যও ক'রে ব্যক্তি—তবু কেমন ক'রে দুহা এসে রোগীকে হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, সেখানে কোথায় থাকে আমার কৃত্তি? এ অভিজ্ঞতা পেতে আমার বেশিদিন বিলম্ব হয়নি। কিছুকালের মধ্যেই উপটো হুই স্বকর্মের দ্রুত অভিজ্ঞতা আমার মিলে গেল।

প্রথমে আমার এক বন্ধুর কথা বলছি। ডাক্তারি পাস করার আগের থেকেই সে ছিল আমার পাড়ার বন্ধু। বেশ বিদ্বান ছেলে, কিন্তু তার ছিল হাঁপানি রোগ। ডাক্তারখানা খোলার পর থেকেই সে আমার কাছে এসে বসতো। হাঁপানির আক্রমণ হলেই আমার কাছে একটা ইন্জেকশন নিতো, তাতেই সে আরোগ্য হয়ে যেতো। কয়েকমাস অন্তর মাঝে মাঝে তার এঘনি হাঁপানির আক্রমণ হতো, কিন্তু তার জন্য সেও কোনোদিন চিন্তিত হয়নি, আমিও হইনি। যোগ্য জানা আছে, ওখুণ্ড জানা আছে, ডাবনার কিছু নেই। এমন হাঁপানির দাঁত অনেকেরই থাকে, কোনো কিছু জটিল গতগোল কিংবা বাতের গতগোল হলেই তা দেখা দেয়। এই দাঁত নিয়েই তারা সারা জীবন কাটিয়ে দেয়, এবং দেখা যায় যে তারা দাঁতেও অনেককাল পর্যন্ত।

কিন্তু এঘনিব নষ্টার পরে সেই বন্ধুটির হাঁপানির

হঠাৎ কিছু জোরালো রকমের আক্রমণ হলো। সে নিজের ডাক্তারখানায় আসতে পারলে না, আমাকে ডেকে পাঠালো। গিয়ে তাকে ইন্জেকশনটি দিয়ে এলাম। একটু মধিক রাতে বাড়ি বাবো মনে ক'রে ডাক্তারখানা বন্ধ করতে বাম্বি, আবার সেখান থেকে ঢাকা এলো, হাঁপানি এমনও কমেনি। আবার সেখানে সেলাম এবং এখার ডবল যাত্রার ইন্জেকশন দিলাম। কিন্তু রাতে হুই দাঁটা পরে আবার ঢাকা এলো, তখনও হাঁপানি কিছুমাত্র কমেনি। এবার গিয়ে অন্তরকম একটি ইন্জেকশন দিলাম। এবার নিশ্চয় কবাবে বলে আমি চলে এলাম। কিন্তু এক দাঁটা পরে আবার আমাকে বেতে হলো। সেখানে গিয়ে সেপি বন্ধুটি হীতিমতো হাস টানছে, বসে থেকেও দম নিতে পারছেন। আমি দাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার একজন ডাক্তার এসে হাজির হলেন, ওরা তাঁকেও ডেকে এনেছে।

তখন দুজনে মিলে আশ্রয় পরামর্শ করলাম এ-অবস্থাতে কি করা যায়। ডাক্তারটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কি ইন্জেকশন বা ওখুণ্ডের সেওয়া হয়েছে। সবই আমি বললাম। তিনি বললেন—“হা বা সেওয়া উচিত ছিল সবই সেওয়া হয়েছে, তাতে দমন কিছু কল হলোনা, তাহলে আর কি করা যেতে পারে?” আমি বললাম, একমাত্র বাকি আছে মর্ফিন ইন্জেকশন। তাই দিলে নিশ্চয় এই কট কমে যাবে, আর রোগী সুস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। তিনি বললেন—“গ্রিক কথা, মর্ফিন চাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই, এখনই গিরে পাও।” তিনি ছিলেন আমার চেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি। দুজনের একই মত হওয়াতে আমি একটি মর্ফিন ইন্জেকশন দিয়ে দিলাম। অল্পকণের মধ্যেই তার কল হতে দেখা গেল, রোগীর কট কমে গেল, সে নিজেই বলল—“এখন এসবুই আমার পাচ্ছি।” তার পর সে বাগিশে মাথা তেবে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু ডোয়ের বোলা ওয়া আবার আমাকে ডাকতে এলো, বললে যে রোগী একেবারে নিশ্চল হয়ে পড়েছে। গিয়ে দেখি সেই অস্ত্র ডাক্তারটিও এসে হাজির হয়েছেন। দুজনেই আমরা রোগীকে বেরতে সেলাম। কিন্তু দূত সীতথোত্রাপ বসাবার এরোজন হলো না, বেথেন্ট দৃঢ়তে পারলাম যে রোগীর চুৎগিতের ক্রিয়া একেবারে থেমে গেছে।

বন্দনায় হলো আমারই। আমিই মর্ফিন ইন্জেকশন দিয়ে তাকে ঘেরে কেলেছি। অথচ সে-সময়ে তাই সেওয়া চাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না, অস্ত্র কোনো-কিছুর খাবাই তার কঠোর লাঘব করতে পারতাম না। এ-সময়ের মর্ফিন ইন্জেকশন দিতেই হয়, বইতেও পড়েছি, এবং হাসপাতালেও বহুবার তাই কয়েছি। সাফল্য আর এমন মর্ফিনাতে কখনো কারও অন্তি হতে দেখিনি। অস্ত্র

অভিন্ন ডাক্তারদের আদি এ-সময়ে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখলাম। তাঁরা সকলেই বললেন যে চিকিৎসার দিক থেকে ঠিকই করা হয়েছিল, কিন্তু বোধ হয় অতিরিক্ত ঝাঁপনির কঠোর হাট খসি খুব ক'রে পড়েছিল, তাই যক্ষ্মার প্রকলন যে কিন প্রতিক্রিয়া ঘটল তা আর হাট নষ্ট করতে পারলেনা। একে একটা অ্যান্টিভেট বা আকস্মিক ব্যাপার বলা যেতে পারে। এমন ব্যাপারের উপর কারোই কোনো হাত নেই।

কিন্তু একেইহাট সাধারণের কাছে বাটে না, স্ত্রীরাং আদি কাউকে কিছু বললাম না। বহনাম আমার চুড়ান্তে থাকলো। পরে বহনাম ক'রে বেড়ানো, বিশেষত একজন ডাক্তারের বহনাম করতে পারা অনেকের কাছেই বেশ উপভোগ্য মিলিস। অল্প ডাক্তার অল্প ইন্সপেকশন বেননি গিলে, আর সিগিফর টুচ টেনে বের করতে-ন-করতে জ্যান্ত মানুষটা চুইখটের হয়ে গেল, অনেক শব্দ-প্রশংসা ছুড়ে দিয়ে এই ধরনের বিচারিত আলোচনা অনেকের কাছেই সুখোচক। তারা বেন উভেজিত হয়ে বাগ-বিতণ্ডা করবার মতো একটা খোদাক পেয়ে যায়। কিছুকাল সময় এই নিয়ে বেশ কাটাতে পারা যায়। এবং তাইই আমার আমার কাছে এসে ইমিনে-বিনিয় পোনাতো থাকে যে অল্প লোকটা আপনায় বিজ্ঞে এইসব বহনাম ব্রতীছিল, আমি তাঁকে আশ্বা ক'রে তনিয়ে দিয়েছি, কোনো কথারই আমি কিছু জবাব দিতাম না। বহনামকে বড়ই চাপা দিতে চেষ্টা করা যাবে ততই তার প্রসার আরো বেড়ে যেতে থাকবে, বড়ের আগুন হ'লগতি জল ঢেলে নিবেনোর চেষ্টা করতে গেলে বেনন হয়। পাড়ায় আমার প্রসার-প্রতিপত্তি অবশ্য কিছু কমল, কিন্তু তার আর কি করা যায়।

কিন্তু এর কিছুকাল পরেই রায়ে আমার অল্পী ডাক পড়ল, ঐ স্ত্রী বহুই অল্প এক আত্মীরে বাড়িতে। সেখানেও রোগপীড়া হলে আমাকেই ডাকা হতো, আমার প্রতি তাদের খুব বিশ্বাস ছিল।

সেখানে গিয়ে দেখি, এও প্রায় একই রকমের ব্যাপার। বহা তার চেয়ে আরো বিপজ্জনক অবস্থা। এক বহিগী বহিগা—আগের থেকেই তার হাটের অবস্থা খারাপ ছিল, তার উপরে এখন ঝাঁপনির কঠোর পড় হয়েছে। সম্ভবত হাটের প্রকলন এই অবস্থা। বুকে দারুণ কষ্ট হচ্ছে, তার উপরে তিনি ঘোটে ক'রে নিতে পারছেন না। বলে বলে ঝাঁপাচ্ছেন, গলার ঠাঁই-ঠাঁই শেষের লগে একরকম ঘড়-ঘড় শব্দ হচ্ছে। এখানে খুবই দ্রুতহবে কাজ করতে হবে, যাতে হঠাৎ হাট-বেল না করে।

কি করা যায়! হাঁপের কঠোর কমানোর শুধুওড়ি দিয়ে আর কিছুকণের লজ্ঞ অল্পিয়ে দিয়ে দেখলাম, তাতে কিছুই হল হলোনা। এদিকে এমন অবস্থাতে যোগ্যকে বেশিগণ কেনে বাধা দান না, তাতেও হাট-বেল হবে যেতে পারে। এ-কঠোর নিবারণ করার একমাত্র উপায় হলো বহিগা। এমন নিষাকণ কঠোর অবস্থা দেখেও তা যদি না দেখা যায় তাহলে রোগীর প্রতি নৃশংসতা করা হয়। একজনকে বহিগা দিয়ে সে দারো গোছে বলে সেই সূত্রেই আমি অপারের প্রতি নৃশংসতা করতে পারি না। আমি তখন ব্যাধ হয়ে বললাম—“এখন বহিগা ইন্সপেকশন দিতে হবে, তা ছাড়া আর অল্প কোনো উপায় নেই।”

যোগ্যী ঝাঁপাতে ঝাঁপাতে বললেন—“তাহ'লে দিগ গির তাই দিয়ে দাও, বাবা, আমি আর নষ্ট করতে পারছি না।”

তার আত্মীয়েরাও সকলে ব্যস্ত হয়ে বললে—“বা ডাশো বোয়েন তাই দিয়ে দিন, অনর্থক ঘেরি করছেন কেন?”

আমি বহিগা ইন্সপেকশনটি প্রয়োগ করলাম, অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে। সেবারারই কিছুকণের মধ্যে তার সকল কঠোর লায়ে হয়ে গেল, তিনি হুহু হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। বাড়ির সকলে নিশ্চিন্ত হলো।

কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি কই? এই দুই বহি হুহুয় ঘুমে পড়িল হই। তার বেলাতে যে সেইসকলই হয়েছিল। আমি ধরেই তাই পাঠই বললাম—“তারো আমাকে ঠর কাছেই থাকতে হবে, কারণ এখন হুহু হলও পরে হাট-বেল করার আশঙ্কা আছে।”

অতএব সেই ব্যবস্থাই করা হলো।

সারা রাতি আমি যোগ্যীর পাশেই রইলাম। তিনি সারা রাত ঘুমিয়ে কাটালেন, কিন্তু আমি সারা রাত জেগেই বসে কাটলাম। হায়ে হায়ে তার নাড়ি টিপে দেখি, নাড়ি টিক চলছে কিনা; বুকে হাত দিয়ে দেখি, হাট চলছে কিনা। সকালে যখন তার খুব ভাল তখন কোনো কঠোর আর নেই। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ।

এরা সকলে আমার সুখ্যাতি করলেন, রোগীগণকে আশ্বর্যকণে বাঁচিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সে সুখ্যাতি বাইরের কেউ বেন তেমন কানেই নিলেনা। এও আমার জানা ছিল। সুখ্যাতি মিনিসটা বেনন সুখোচক, সুখ্যাতি মিনিসটা তা কখনই নয়। একজন লোককে অসাধু প্রতিপন্ন করা খুব সহজ, কিন্তু সাধু প্রতিপন্ন করতে পারা খুবই কঠিন। যোনের বেলা দায়বের স্বাস্থ্যটি ভালো, গুণের বেলা সে অল্প হয়ে যায়।

[বন্দন]



যেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা

নীলদত্ত রায়

প্রথম পর্বন।

রূপ-দৌর্যে মুগ্ধ হয়ে পাড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ। আমার চোখের সমুখে যেন বসন্তের বনরিকা উজ্জ্বলিত হল। দৃষ্টিকে ঘেঁষে আঁকড়ে ধরলো সুদৃষ্টিত এক তবী নর্তকীর অপরূপ লীলাবিত বেহুচ্ছ। অপরূপ রূপসী মনে হল কুমায়ূনের পর্বত-শিখরে নৈনিতালকে। মুখনয়নে তারিয়ে ছিলাম সরোবরের এবং তার পারিপার্শ্বিক রূপ দেখে। তখন চোখের পলকও বোধকরি আমার দৃষ্টিকে ব্যাখ্যাত খটাত সাহস করেনি।

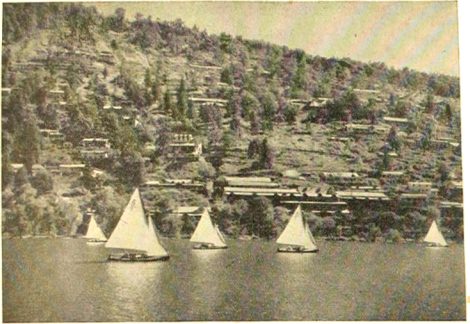
এই মুহূর্তে আমি ভুলে গিয়েছিলাম অতীতের শোন। কুমায়ূনের ছোট ছোট কাহিনীগুলো। দে-সখ কাহিনীতে ছিল শুধু কুমায়ূনের ভ্যাল রূপ-বর্ণনা। ছোটবেলা থেকে কত কাহিনীই তো শুনে এসেছি কুমায়ূনের হিংস্র নরখাদক বাঘ সম্বন্ধে! তখন গ্রামে শুধু ভীতির সন্ধার করেছি, শিহরণ দিয়েছে সারা দেহে। তার পর মুন্ডের দিনে যখন দুর্ধর্ষ কুমায়ূন-রেজিমেন্টের লড়াইয়ের প্রশংসা শুনেছি, তখন সেই-সব কৌজনের মনে মনে তুলনা করেছি ও-দেশেরই বাঘের

সাথে। এ ভাবেই কুমায়ূনের বাঘ এবং ফৌজ ডামার মনের ভেতর একই ছাপ মেরে দিতেছিল—ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ভয়াল।

সেই ছাপ সহসা মনে থেকে মুছে গেল কুমায়ূনের গভীর অরণ্যের এক রূপসী। বনদেবী যেন আবির্ভূত হয়েছেন চোখের সমুখে। মুগ্ধ হয়ে বেরছিলাম, কৃত্রিম ছোঁয়াচ লাগা লঙ্ঘন, প্রকৃতির রূপ-বৈশিষ্ট্য। এমন রূপের সমাবেশ আর কোনো পর্বত-দেশে দেখেছি বলে মনে হল না। ভারতবর্ষের আর যে-সব শৈলাবাসে এ-জাতীয় সরোবর তৈরি করা হয়েছে, সে-সব প্রচেষ্টায় এমন সার্থক রূপ ফুটে উঠেনি। কোটেনি শুধু প্রকৃতির সহযোগিতা না পেয়ে। প্রকৃতি যেন নৈনিতালের সরোবর সাজাতে চকুপিকে হাত মেলে দিয়েছে। সাজিয়েছে রানীর সাজে। কুমায়ূনের রানী।

ওপরের দীল আকাশ বেবে নুদর পাহাড় নেমে এসেছে ঘরে ঘরে। হাতে হাত মিশিয়ে গোল বুজাকারে

উপরের ছিটটি বৈশিকালের 'চামন-পীঠ' থেকে লুই হিলসের পূর্বদিকের দৃশ্য। ব্যালেকটরিট সিস্টেমাল পেন্ট কল্লিক পুঠি।



বৈদ্যাসের স্নেহ-এর কুণ্ড পাল-জোলা নৌকা

[কটা : মনঃ বহু]

পাহাড়গুলো যেন তৈরি করেছে এই সরোবর। তারপর তাকে পরিপূর্ণ করেছে সবুজ-জল উজাড় করে ঢেলে দিয়ে।
জন—ব্রহ্মর জন! সেই জনে প্রাণ ফোটাতো ছেড়ে দিয়েছে
উটুকতক খেত-হাক্কাস।

দূর থেকে তাই মনে হচ্ছিল। পাল-জোলা নৌকাজলো
হাক্কাসের মতোই ভেসে বেড়াচ্ছিল সরোবরের বুকে।
সত্যিই কেন মনে বেন বন্ধে ঈড়িয়ে পড়েছিলাম লেকের পাড়ে
গাড়ি থেকে নেমেই। বহুদিনের অতীতের নৈনিতালের
লেক। প্রথম দর্পনেই তুড়ি এলো চোখে; ঘুচে গেল
পরিভ্রমণ লেহাবন্দ। সেইখানে তুলেই গিরেছিলাম—ভ্রমণ
শেষ হলো, শেষ হয়নি আসল কাজ—ভালো একটি হোটেল
খুঁজে নেওয়া।

সেইখানে তারিখ তখনো পেলাম। বৌদি ডাকছেন—
চলো, চলো, পরে ওদয় প্রাণ ভরে দেখো। এখন চলো তো
হোটেলের বাই আগো—

তাকিয়ে দেখি, কুলীদের দিঠে লইবহরের পাহাড়
চাপিয়ে দামা-বৌদি আর হুই বহু হোটেল অভিযানে
অগ্রসর হচ্ছেন। আমি দলের পঁচাত্তর অগ্রসর হলাম

নীরবে। যে-দলে দামা-বৌদি আছেন, সে-দলে আমি
লক্ষণ ছাড়া আর কী হতে পারি? আমার করণীয় বা
বলনীয় কিছুই নেই।

বাস্-স্ট্যাণ্ড থেকে লেকের ডানদিকের পথ ধরে এগিয়ে
চললাম। পর পর কয়েকটা হোটেল পার হয়ে গেছি,
তখনো চলছি পেছনে পেছনে। দলের অগ্রভাগে হোটেল-
গাইড কি বেন বলতে বলতে যাচ্ছে দামা-বৌদিকে। কিছু
পরেই এক হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে দোতলার উঠতে শুরু
করলো মাগবহনকারী কুলীর দল। বুঝলাম এই আমাদের
হোটেল। একদমই দেখে বেশ ভালো লাগলো হোটেলের
বাড়িটা এবং তার পরিবেশ।

সিঁড়ি বেয়ে আমরা দোতলার প্রশস্ত বাহাদ্যার এসে
দেখলাম, ম্যানেজার আমাদের কামরা দেখিয়ে দিচ্ছেন।
পর পর তিনটে কামরা—আট, নয় এবং দশ নম্বর। দামা-
পত্র তদারক এবং অজ্ঞাত ব্যবহার ব্যত রয়েছে হোটেলের
আর দুজন—বোধকরি অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট
ম্যানেজার। তাদেরই তদারকিতে দার দার কামরার
অবস্থা সামান্যই সব চলে গেল।

আমরাও একবারই অকরে গিরে আবার কিরে এলাম ব্যাকসাধ। আগ্রাস-কোষাঘাৎ পরিচাল্য বেহটাকে চেড়ে দিয়ে একই বিজ্ঞান বেদার চেষ্টা করলাম। আত্মানার ব্যবস্থায় নিশ্চিত হয়ে সবাই বেন চূপ মেয়ে বসে কি ভাবতে লাগলাম। মনে মনে হয়েতো যে জিনিষটায় অস্বাভাবিক সবাই অস্বস্তি করছিল, তাই এসে হাজির হল।

চা এলো।

জু চা নয়, পুরোপুরি ব্রেকফাস্ট এনে হাজির করলো হোটেলের বর। টেবিলে সাজাতে লাগলো ডিন্-কাটা-চামুচে। বুধা বিলম্ব না করে টেবিলে আসন গ্রহণ করা গেল। বেশী কথা না বলে নীরবে কান্নে বেগে গেল সবাই। টেবিলে তখন কাটা-চামুচের একটা ঐকতান-বাদন শুরু হয়েছে। এই ঐকতান-বাদনের পরিচালনায় ছিল হোটেলের বর। নতুন বোর্ডারদের সেবার স্বাভাবিক ভাবেই একই বেশী তৎপর হয়ে ব্য আমাদের মনোরঞ্জনের প্রাপণ চেষ্টা করছিল। টোন্ট-ওন্টেট টেবিলে রেখে পরীক্ষের স্ট্রেটগুলো নিয়ে গেল। ছুটে চলে গেল নীচে, আবার ছুটে এলো ওপরে। টেবিলে নম্বর রেখে একটা ডিন্ এগিয়ে দিলে, চা-এর পট্ট সজিয়ে নিচ্ছে—এভাবেই সবাইকে সন্তুষ্ট করে দিতে লাগলো সে।

—তোবারা নাম কোরো ছায়? এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করলো বরকে।

—ওলাব সিং।

—ওলাব? মিষ্টার ওলাব? অপর বন্ধু প্রশ্ন করলো। একগাল হেসে মাথা নাড়লো বর। আমরাও তখন সবাই একই হেসে কেলেছি। হাসকা হাসি।

ওলাব বোধ হয় একই লক্ষ্যে গেল আমাদের হাসিকতার। তাই সে চটপট কয়েকটা ডিন্ ট্রে-তে ছুলে নিয়ে তাকাতাড়ি চলে গেল নীচে। আমাদের তখন আনন্দের কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে।

•

বেশ লাগছিল, খুব ভালো লাগছিল আমাদের ঐ নতুন আসর। নতুন সেপে পরিচিতির এমন একটা হল মূহুর এক পরিবেশের সৃষ্টি করে তুললো। মনে হচ্ছিল আমরা দু'টি চিরকালই একই বলের, একই গোজির। কান্নে আর মনে কোণাও যেন অবিল হবার এতটুকু প্রবেশ ছিল না। এই পরিবেশ-সৃষ্টির মূল অবদান ছিলো আমি। কারণ একমিকে আমার হুই অন্তরঙ্গ বন্ধু আর অন্যমিকে আমার দাদা-বৌদি,—এই দুই-এর মাঝখানে আমি ছিলাম হাইকেন-এর মতো। দুই বন্ধুকে ছাড়াই স্টেশনে বসন

দাদা-বৌদির সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিই, তখন থেকেই ওরাও দাদা-বৌদি গেল। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা লক্ষ্য-ভরত-শুরু হয়ে দাঁড়ানাম। তারপর হওকারমা না হলেও, কুমায়ন ব্যক্তার পূর্ণ শুরু করলাম কান্ন ভাগ্যভাগি ক'রে। কেউ যিকার্ডেশন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে, কেউ শেখ-ঘাটে বানানিমার বিল-ওলো যোগ ক'রে, পাঁচ দিয়ে ভাগ ক'রে হিসেব করতে চাক-আনা-পাই, আবার কেউ কুশীদেব হিসাবপত্র চুকিয়ে দিতে চেষ্টাযেচি করতেই জংশনে জংশনে।

গাড়ি বহল করতে হয়েছিল লক্ঠে জংশনে। গুপুদবেশা বড়-লাইন ছেড়ে ছোট-লাইন ধরতে হবে। সে রাত লাড়ে আটটা। এই দীর্ঘ সময় কাটাতে হবে লক্ঠে জংশনে।

দাদা-বৌদি আর আমার অবশ্য জংশনে পড়ে থাকতে হুনি, কারণ কোলকাতা থেকে দাদা লক্ঠের ততীপত্রকে ভিনপদমা ধরচা করে যে বার্তা গারিয়েছিলেন, তার পুরোপুরি মর্দাদা দিতে, অর্থাৎ বিশেষ দশপত্রের আতীতদের অভ্যর্থনা জানাতে তিনি নিজেই স্টেশনে হাজির ছিলেন। তখন এপ্রিল মাস। তীর গরমের প্রদর গৌর উলেক্ষা করে আমাদের অতি-নাইডিয়ার ততীপত্রি স্টেশনে এসেছেন। আমাদের সেবে আনন্দে অতি যত্ন হয়ে উঠলেন তিনি।

দুই বন্ধুকে অগত্যা স্টেশনে ছেড়ে, এবং ওদেরই জিম্মার মালপত্র রেখে আমরা চলে গেলাম ততীপত্রির মর্দাদা রাখতে। ততীপত্রির অমর্দাদা ততীর কাছে। ততী তখন হুতো আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছিল তাইদের আর বৌদিকে দেখবে বলে। কতদিন পর দেখা হবে! কত দুই হবে।

কাঠগোদায় পৌঁছলাম সকালবেলা।

লক্ঠে থেকে ছোট-লাইনের শেষগ্রামে এই স্টেশনটি একস্বাত্রির প্রথম। বিজ্ঞানপত্র ওছিরে আমরা তৈরি ছিলাম সবাই। ঘটনানেক আগেই স্নিত-স্নিত-ভোবের মুহ-ভাতা আমেরক ভেঙেছিল লালকুশী-স্টেশনে বেহ-টি শেষে। তখন থেকেই সকলের ভাবটা ছিল যেন বৈমিত্তাল এসেই গোছি।

গাড়ি থামতেই কুশীদেব আরম্ভ শুরু হল। আমরা চারজন ওদিকে মাথা না ঘামিয়ে নিশ্চিন্তে গাড়ি ছেড়ে চললাম ওলো-কমের দিকে। মালপত্রের ঝামেলা নিয়ে তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এক বন্ধু—কান্নের ভাগ্যভাগিতে যার ওপর ও-সারির বর্তেছিল। বন্ধু তখন কুশীদেব

বোকাঝিল—দামান্ হি'হাসে হ'চা লে' বাবেগা, বাসুমে উঠা দেগা...

বাসু কার্গোশাম চাড়াগো।

আজ্ঞে আজ্ঞে সমতল পথে এগিয়ে চললো উই-পাহাড়টা চাইনে বেবে ধারিকের নীচু-পাহাড় খেঁবে। গাড়ির বেগ জট হয়ে এলো। অন্যদিকে অনেকটা পথ অতিক্রম করলো হু'ধারে শালবন আর বুনো জঙ্গল বেধে। পাহাড়-বেগের পথ। অন্ধর পরিবেশে অন্ধর পথ বেগে অন্যদিকে বাসু চলছে একটানা। সমুদ্র সঞ্চিত এই পথের জল কৃতির উত্তরপ্রদেশ-সরকারের। শুষ্ক নৈনিতালেই নচ, একেশের সর্বস্বই পথখাট লংঘে রাখার জল হ্রদান আছে।

মায় বাইশ মাইল পথ। তার পরই নৈনিতাল।

উত্তরপ্রদেশের দুটি শৈল্যবাস—মুন্ডারী ও নৈনিতাল। এ দুই পর্বত-শহরের অঙ্গদিকে পার্বত্য থাকলেও, পথ-নির্মাণের দিক থেকে মিল আছে। রেল-স্টেশন থেকে শহরকেন্দ্র পথের পথের দূর এক। বাইশ মাইল। শুষ্ক তাই নয়, দুই স্থানের পথের নির্মাণ-পদ্ধতিও এক—যেন একই ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে হিসেব করে ছকে তৈরি-করা দুটি পথ। অল্প পাহাড়-বেগের পথ দেখতে পাওয়া যায়, ঘুরে ঘুরে পথের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে গেছে ঝাড়াই কম বেধে চলবার জন্ত। কিন্তু এদেশের পাহাড়-পথ এত বেশী ঝাড়া বে, অল্পপথে অনেকটা উঁচুতে চলে আসে গাড়িগুলো। গাড়ির মেশিনে বয়েষ্টে চাপ পড়ে তা বুকতে পারা যায় ইয়ারের গোঁ-গোঁ গকে। প্রথম আর দ্বিতীয় স্ট্রয়ার ছাড়া গাড়ি ওভাবে পাহাড়ের গাড়াই উঠতে পারে না।

মাথপথে হু'একবার গাড়ি বাসে। চীর-গাছের পরিবেশে হু'চার মিনিট মায়। গাড়ির বেতিয়েটোরে জল বেবে; আর হাড়ীরাও এ ঠাঁকে একটু একঘেয়েমি কাট্টিরে নেবে মাটিতে পা দিয়ে। এইটুকু সুযোগেই পাহাড়ীরা হাতে করে নিয়ে আসে হু'একটি গাছের কল। জুলে ঘরে হাড়ীঘের কাছে। পথের ধারে নতুন কল, তার অক্ষরভাবে সবুজ শালপাতার শাকানো। বতাবতই লোভ হয় হাড়ীদের, কিনতে ইচ্ছে করে। ইতিমধ্যে হাড়ীদের অনেকই নেমে ঘাঘ পথের পাতের ছোট চাষের লোকানের আকর্ষণে। একই সময়ে হু'চুমুক চা, বিশেষ করে ঐ পরিবেশে, প্রচুর আনন্দ দেয় হাড়ীদের। চায়েব লিকার-ফোটার মাছাই করবার অবসর থাকেনা আনন্দের সেই মুহুর্তে।

•

আমরা সবাই হোটেলের ব্যাঙ্কার রেলিন-এ কুঁকে দেখছিলাম সমুদ্রের লোক। তখন সূর্য চলে গেছে বিপরীত দিকের পাহাড়ের চূড়ায়। রোপ ছড়িয়ে পড়েছে সারা লোক-টার জলে। টুকরো-টুকরো বোনগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে ঝিকিঝিকি করে। তারই ওপর হুটে চলছে রাজহাঁসের মতো পাল-তালা নৌকা—ইয়ট। প্রেজার-বোট চলছে এদিক থেকে ওদিকে তক্তপ-তক্তপকে রঙিন আগুন বদিয়ে। সুনিব হাঙ্গিতে বেন সারা লোক-টা মেতে উঠেছে এই ডর-হুপুং বেলাই। আমাদের মনও তখন মাতবো-মাতবো করছিল। ডাশছিলাম মল্ গোড ধরে এগিয়ে যাই।

গলাব এসো ওপরে।

—মিস্টার গলাব! ডাকসো বন্ধ।

লঙ্কার হাসি হেসে গলাব এগিয়ে আমাদের পাশেই ঝাড়ালো এসে।

আমরা সবাই নতুন স্থান দেখছি বুকতে শেষে, নিজে থেকেই গলাব বদতে শুরু করলো,

—লোক-কা উদার হার তলিতাল, আউর উদার মে মলিতাল।

—তব্, বীচমে জল্লর নৈনিতাল? বগার ভেতর আবি জিজ্ঞাসা করলাম।

সবাই হেসে উঠলো। গলাবও একগাল হেসে মাথা নেড়ে বললো—জী, হাঁ। উও যো মন্দির দেখাই দিতি না, লোক-কা উন্ পারমে—উও ছায় নৈনী-বেবীকা মন্দির। উও মন্দির কা নার পন্ নৈনিতাল ছয়া।

—আউর কোরা ফেরা ছায় ছায়, মিস্টার গলাব? জিজ্ঞাসা করলাম।

—আউর ছায়—তব ইদার নেহি। আশ্লোক বেবেঙ্গে বহং আচ্ছা ছায়—তীমতাল, শালতাল, মওলাতাল, নকুতিতাল—

—হুতোর নিকুতিতাল। টেচিয়ে উঠলো এক বন্ধু। তোমরা তাল নিয়ে এখানে তাল পাকাবে, না, বাতায় বের হবে?

হাসির ভেতর সবাই এবার তৈরি হতে চলে গেলো কামরাই। গলাবও বেগতিক বুঝে নীচে নেমে গেল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি মন্-এর কাছে। এ পথে শু'রিজা চলে, তলিতাল-মলিতাল হুটোহুটি করে। প্যাসেজার বড় বেশী পার না। অল্পকারীরা নেহাত অচল বা বেয়সিক না হলে এমন অন্ধর পরিবেশে রিজার চাপতে বাবেন না। অল্প করতে এসে এই অসুখ লোক-এর পারে পারে বেঁটে না চললে যে অল্পের মানুষই

গানের না। তের পাওয়া যায় না—লোক-এর সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কখন গরুই হু শব্দ হয়ে যায়।

পথটা এ পর্যন্ত সহজ। এখানে বাগান সাজানো আছে হুন্দর হুন্দর ফুলের। খিউনিদিগ্গালিটির সমস্ত রক্তিত বাগানের পাশে বিস্তার করবার জন্য বেঁকি পাতা আছে। যার ইচ্ছে কিছুক্ষণ বিস্তার করে এই মল-এ বসে, না-হয় তো ইচ্ছে করলে চলে বেতে পারে কিছুদূরের নকশাবন্দীর মন্দিরে। এই মন্দিরের অতীতের ইতিহাস আছে। বিদ্যালয়ের চূড়া নকশাবন্দীর নামেই এই মন্দির নাকি প্রথম আলমোড়ার এক রাজা তাঁর রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে স্থানীয় লোক দ্বারা নৈনিতালের লোক-এর পারে এই মন্দির নির্মিত হয়।

অতীতের ইতিহাস যাই বশু, বর্তমানে এই মন্দিরের চতুর্দিকে যে মেলা বসে প্রতিবছর, তাতেই যাত্রির সাথে স্থানীয় এবং আগম্পানের গ্রামের হাজার হাজার লোককে। মন্দির উপলক্ষ্য করে বড় লোক আনন্দ পাব, শান্তি পাব—সেটাই হচ্ছে গুণের ফল।

দার্জিলিং-মুন্সীর মতো নৈনিতালেরও আগম্পন হচ্ছে মল। এ চতুর্দিকেই লোকদের ভাঁড়, বাহু-পরিবর্তন-কারীদের চলা-কোলা, বাজারের কেনা-কাটা সব সমরই লগেগে আছে। এখানে থেকে শহরের উঁচু প্রান্তে বেড়ে হলে অনেকটা গাড়াই উঠতে হবে। দালা আর বৌদি সেই গাড়া পথ বেয়ে এগিয়ে চললেন। হরতো নিজেদের কিছু কেনা-কাটার প্রয়োজন ছিল। আশ্বাসের তিনজনের কিছু প্রয়োজন ছিলনা বলে বসেই রইলার একটা বেঁকিতে।

কিছুক্ষণের জন্য, দালা-বৌদি ফিরে না আসা পর্যন্ত, আমি একই বাধীনতার আবেশে অহুতব করলাম। গুরুজনের সমুখে ধূপান এবং সংঘর বেয়ে কথাবার্তা বলা—এসব বাধা থেকে স্বপ্নিকের মুক্তিতে অনেকখানি আনন্দ এসে গেল গ্রামে। তখন চলে সেলাম, এ-বাসে কনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাওয়াটা কতখানি মধুর।

তিন বছর মনেই একটা অস্ত্র ধরনের আনন্দ এসেছিল তখন। তিনজনেবই এক মত—এক উদ্বেগ, একাধ শেলো। একই চা খাওয়া যাক। চলো যাই ঐ লোডলা রেক্টরেটে। বেশ রেক্টরেটে দেখতে, ওখানে বসেই আমরা দেখতে পাবো শহরের সৌন্দর্য।

চা-এর টেবিলে বসেই দেখছিলাম শহরের এই চমকটা। জানালার পাশে দৃষ্টি যেখানেই দেখা যাক্সিল শেরগ্রান্ডের উঁচু পাহাড়টা, আরও দূরের পাহাড়গুলো।



বৈচিত্র্যের আগম্পন 'মল'-বাগান

[কটা: বীজ গার]

এক বহু দেখালো—ঐ তো দেখা যাচ্ছে 'টিফিন-উপ'। চলো-না একদিন পাওয়া যাক ঐ উঠতে—

তাকিয়ে দেখলাম ওপানের পর্বতচূড়ার স্টে দেখা যাচ্ছে টিফিন-উপ। খুব ছোট আকারে দেখা যাক্সিল হু'একজন লোক মড়াচড়া করছে। দূরবীন থাকলে তখন দেখতে পাবতাম—ওরা টিফিন বাসে, না, উঁচু থেকে অহুতব করছে নীচুকে।

আমি মুখে বললাম, নিশ্চয়ই যাবে। মনে মনে ভাবলাম, জানু নিকলে যাবে ঐ উঠতে উঠতে।

অপর যে বহু এতক্ষণ কথা না বলে বাটীরে লিগে একদৃষ্টে তাকিয়ে কি ভাবছিল, সে বেনে হঠাৎ একটা/সম্মান পেয়ে বললো—এই, তোমরা মার্ক করোছো—কোলকাতার একটা দিকের দিকে ঐ-দিকটার সাদৃশ্য আছে?

সে আবার কী! আমরা জবাব না দিয়ে গুনতে চাইলাম বন্ধুর বক্তব্য।

বহু বোঝাতে লাগলো—ঐ টিফিন-উপটা হচ্ছে গড়ের মাঠের সমুদ্রে, আর লোক-টা হচ্ছে বেস-কোর্স। লোক-এর চারপাশের হু'বাইল রাজ্যটার ঘোড়ার বশে মানুষ ঘুরে বেড়ায়। কে ক'কার্য ঘুরে এগো তার অবস্থা হিসেব করতে হয় না। হিসেব রাখবার প্রয়োজন হয় না, অর্ধ-প্রান্তির বোমা থাকেনা ব'লে। এখানে তো সবাই আসে অর্ধাধ্য করছেই।

হোটেলের দিকে ফিরছি। এক বিদ্রোহালা হেঁকে যাচ্ছে অনবরত—এক সীট, এক সীট—

এখানে ব্যাপারটা বুঝিনি। কাছে এসে দৃষ্টিতে পারালাম, ওর গিল্লার একটি আসন ঘালি আছে। যদি কেউ খেতে চায় দেখারে, যেতে পারবে। তিনি একটি আসন দখল করে অপর অমনো এক অংশীদারের অপেক্ষার আছেন, তাঁর দিকে লক্ষ্য করে মনে হল, তিনি বেশ নীচায়ে উঠেছেন। তাই একান্তে যিজ্ঞাওয়ালা হাঁকে ফাঙ্কে : এক সীট—এক সীট—

ব্যাপারটা দৃষ্টিতে পেরে বৌদি বললেন—ও হরি ! এই হচ্ছে এক সীট ?

যিজ্ঞাওয়ালা আমাদের দিকে তাকিয়েও হাঁক দিল। আমরা কোন সাড়া দিলাম না। কারণ আমাদের পাঁচ সীট দরকার। তা ছাড়া আমরা তো ঘাবো গানিকরূর মার।

•

সকালবেলা ডেকাক্সের টেবিলে বসেই দিনের এখন আলোচনা শুরু হ'ত আমাদের। দৃষ্টিগোচক খাবারের সঙ্গে দৃষ্টিগোচক কথাও বেশ অব্যবহিত আমাদের আসত। কথার প্রসঙ্গ নিজেদের ভেতর সীমাবদ্ধ না রেখে, স্থানীয় লোকদের কথা আর ওদেশের কথাও উঠতো।

এই হুকুর লোক-টা কি করে হল তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল। সত্যিকারের ইতিহাস বুঝে বের করতে বিভিন্ন মহাবলদীনা বিভিন্ন দিকে চলে যায়। ভূতরবিদ্রাও একমুঠ হতে পারেনি এই লোক-এর উৎপত্তি সম্বন্ধে। এদের ভেতর একদল বলে, দারুণাম থেকে মাটি গলে গেছে ধল বেয়ে; আবার আর একদল বলে, আগ্নেয়গিরি থেকেই নাকি এর উৎপত্তি। শেষের অভিমত অনেকেরই মনেতে রাজী হয়; মাঝে মাঝে অলের ভেতর গন্ধক-জাতীয় পদার্থের গন্ধ পাব বলে। হাকে মাঝে মাঝের নড়ক নাকি লাগে। জলটা বিবাক্ত হয়েই বোধহয় হাকারে হাকারে মাছ ওভাবে ম'রে ভেসে ওঠে।

অনেকে বিশেষ ধরনের ধূমপান ক'রে গ্রাণ ধুলে বলে যায়—সেবতারা একবার পশ্চিমদিকের উচ্চ পাহাড়ের শীর্ষে জলতেই। অহতব করেছিলেন, তখন এই জলাশয় তৈরি করে তারপর মিটিয়েছিলেন তেটা।

'নৈনিতান' নাম বিবেক অল্পরূপ কথা শোনা যায়। দক্ষিণে সতী দেহভাগ্য করার পর শিব বন জানহারা হয়ে সতীর দেহ ভঙ্গে নিয়ে হিমালয়ের, কৈলাস-পর্বত অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন নাকি সতীর নরম এই স্বাবে পড়েছিল। সতীর নরম থেকেই 'নৈনী', আর সেই থেকে 'নৈনিতান'। লোকের দৃষ্টিতে পর্বত আজ বেখানে নৈনী-দেবীর মন্দির, সে স্থানটাই পবিত্র বলে গণ্য করা হয়।

এই হুকুর স্থানটি সম্বন্ধে বাইরে ১৮৪১ খ্রিঃ পর্যন্ত অজানা ছিল। সেই সালে প্রথম জেনেছিলেন শাহজাহানপুরের জনৈক দিল্লীর বাসিন্দা, এগারো মাইল দূরে ভীমতালে দিকার-সন্ধান এসে। তিনিই এ স্থানটির উদ্ভূতি প্রমাণ ক'রে পটিকাচর লেখা প্রকাশ করেন। দলে, তার পরের বছরই বাইরের লোক এখানে আসতে শুরু করে। এই লোক-এ প্রথম বেশির নৌকা জালিয়ে এক সাহেব আনক উপভোগ করছিলেন—সেদিন সেটাকে অনাচার, গাণ মনে করেছিল শুধানকার ধর্মভীরু জনসাধারণ। পবিত্র জল অপবিত্র হয়েছিল এক স্নেহের নৌকা চালাবার জন্য!

নৌকার কথা উঠতেই বৌদি বললেন—আজ আমরা নৌকা চড়বোই।

—তাছলে ওঠো, চলো এখন বাই তন্নিভাল থেকে মল্লিতাল। আমি উঠে পাঁড়ালাম।

শাসা বললেন—আমি এখন যাবো না।

এক বন্ধু চেয়ার ছেড়ে বললো—পাঁড়াও, আমিও আসছি। আর এক বন্ধু এসব কথার গা মাথালোই না, নির্বিকার হয়ে চেয়ারে বসে রইল। শুধু একটা হাঁক দিল জোরে—ওলাব ! দিল্লীর ওলাব !

•

আমরা তিনজন একটা নৌকার গুচ্চের। কিন্তু আমাদের হাঁকে ধরলো দল-বায়েজন নৌকাওয়ালা। মরহুমে নৌকাওয়ালা রঙে ক'রে নানা সেপের লোকজন নিয়ে এরা লোক-এর দূকে ঘুরে বেড়ায়। অতি সহজ সরল লোক বলে মন্থন লোকদের ওপর ধাঁও মারতে জানে না। মিউনিসিপ্যালিটির সেই ধাঁও ভাঙার এরা পরিশ্রম করে যায় হাসিমুখে।

আমাদের ভাড়া লাগবে মাত্র ছ'আনা। এগার থেকে ওপায়। এচ্ছেতে নৌকা বাছাই করে লাভ কি? সোচ্চারে চলে বসলাম একটার।

চাপলাব, কিন্তু সমস্তা হল বসা নিয়ে। স্থাটি তো মাত্র সীট। বৌদিকে বসতে দিয়ে আমরা কাঠের ওপর বসবো বলে স্থির করবার আগেই বৌদি বললেন—ডোবরা দিল্লী, আমি নৌকা চালাই। আর কথা না-বলে বৌদি দিল্লী চলে গেলেন নৌকাওয়ালার পাশে। একটি পাড় হাতে ধরে বললেন—এই, হাম্ চালাবে গা—

নৌকাওয়ালা বুঝলো বেগতিক। মুখে শুধু একটা হাসি দিয়ে হুলে দিল পাড়টা বৌদির হাতে।

বৌদির হাতে পাড় দিয়ে যে কী বিশদ করেছিল, তা নৌকাওয়ালা না বুঝলেও, বুঝেছিলাম আমি। উঠো,

বাঁকা—বেদিকে আগ চাপ সেকিবেই বৌদির ঝাঁড় পড়তে লাগলো। তাবতে লাগলাম, শেষকালে না এই নক্সে-ফীট গভীর লেকের অন্তরে চলে যায় বহুদেশের এক নারী। এদিকে বহুটি তো হেসেই অধির এই দৃশ্য দেখে। সঙ্গে সঙ্গে নৌকাওয়ালাও বেশি হাসছে। শেষপর্যন্ত হাসিখেই আমরা অবশ্য ওপারে নামতে পেরেছিলাম।

আমরা মল-এ এসে ঘেরি বাসা আর বহু বেজিতে বসে আছেন। বহু জিজ্ঞাসা করলো—কেন না লাগলো?

আমি বললাম—আজ একটা মত কাড়া গেছে।

বহু আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—কি সে কেন?

তারপর নৌকা-প্রমত্ত-কাহিনী শুনে সবাই একটোটা হেসে নেওয়া গেল।

সহরের কোন্সিকটায় আজ পরদলে ভ্রমণ করে বাহ্যের উন্নতি করবো তাই নিয়ে একটু সমস্তা হয়েছিল। তারপর সবাই দ্বিগ্ন করলাম গভীরনৈঋত হাউসের দিকে বাবো। অর্ধশতাব্দী পূর্বে বোধ হুটিন রাজ্যের বহুতমে সাক্ষ্য-সাক্ষ্য মূহুরা যায় করে যে রাজকীয়, আবাস তৈরি হয়েছিল, তা বর্তমানে বদলী রাজত্ববানে পরিণত হয়ে চেহারা রূপ সহজে আমাদের সঙ্গেই জানিয়েছিল যখন। গিয়ে হঠাৎ দেখবো আমাদের পরিচীর নাম হয়েছে 'পদী'। তাই তো ঘটছে স্বাধীনতার রূপ গালটাতে, বিদেশীকৃত অধিকার ক'রে বেশী সজা বজায় রাখতে গিয়ে। আজ তাই লাক-পার্টিতে 'দহি-মড়া'র নাম থাকে 'বেহু'তে, তেমনি চপ-কাটলেটের স্থলে পাকোড়া-ফুদ্রি অন্যভাবে সর্বজনযোগ্য আইটেম।

এমনিতর একটা ডেকিটেবল-মন নিয়ে সবাই মল-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের পথটা ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম। আর একটা পথ আছে লেকের পূর্বদিক থেকে। সেটা পট-কাই। কিন্তু ওটা এমনই মারাত্মক পথ যে, সে-পথে তেমনি-স্বাভাবিক লোক ছাড়া আমাদের হতো লোক উঠতে গেলে হার্ট আর লালং একসঙ্গে বিশেষ বাধা হয়ে কখন হঠাৎ উড়েই বাবে। তার চেয়ে এবিধকার রাজাটার হ্রদ বেশী হলেও প্রাণটা বাঁচবে।

রাজত্ববনের পারিপার্শ্বিক রূপ দৃশ্যের সঙ্গেই নেই। তার ভেতর ভালো লাগে মল-বন্দার হার্টে দেখতে, আর ভালো লাগে বেয়েদের একটি কলেক্ট এই মনোরম পরিবেশে। বেয়েদের আবাসিক এই ডায়গনোস্তিক কলেক্টটি দেখে দৃষ্ট হয়েছিলাম জু পরিবেশের রূপ দেখে।

ভেমনি পরিবেশ দেখে দৃষ্ট হয়েছিলাম বেয়ারদের 'হিন্দু বিশ্ববিজ্ঞান' দেখতে গিয়ে।

বেলা দুপুর পর্বত এভাবে হাঁটাইটি করে আমরা যখন হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম, তখন জ্ঞানির কবলে পেরে ছেড়ে দিয়েছে সবাই। কেউ আর কামরাং সেল না, বাইরের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসেই হাঁক-ডাক শুরু হল।

—গলাব, ও গলাব।

—মিস্টার গলাব, পানি পে-আও—

সিঁড়ি বেয়ে ছুটে আসার আওয়াজ পাওয়া গেল। সবাই আশ্বস্ত হল। কিন্তু এসে হাজির হল আর-এক ছোকরা। মল-বাগে বছরের ছোট্ট স্টুটে এক ছেলে, হোটেলের পোশাকে বেশ খাট্ট দেখাচ্ছিল। আমাদের সম্মুখে এসে হাসিমুখে এক সেলাম তুলে দাঁড়ালো।

—তুমি কে রে? বৌদি কোঁহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—হানু বিজয় সিং।

—তা, গলাব কোয়ার?

—ও আড্ডি আ বাহা হায়।

বৌদি বেন ভারী হুই ঐ দৃশ্যের চেলেটাকে দেখে। আমাদের বললেন—বাং, ভারী দৃশ্যের লাগছে ওকে। ওর নাখটাও বেশ।

তারপর বিজয় সিংকে কাছে ডেকে বললেন—এই শোন, গলাব তো আসছে? তুমি আমার একটা কাজ করে দিবি? আমার মস্ত হুটো পান কিনে এনে দিতে পারবি?

সঙ্গে সঙ্গে বিজয় সিং যেভাবে সমস্ত জানালো, তাতে মনে হল, ও একাজের ক্ষতই এসেছে ওপরে। বৌদির হাত থেকে পয়সা নিয়ে ছুটে গুণ্ডানো হল। বৌদি পেছনে ডেকে বলে দিলেন, মিঠে-পান বেন না আনে। সালা পান।

একটু পরেই বৌদির আবার কি মনে হল। টেচিয়ে ডাকলেন—বিজয় সিং—এই বিজয় সিং?

বিজয় সিং তখন নীচে নেমে বাতায় ছুটে চলেছে। বৌদি-এ হুঁকে বৌদি তবুও টেচিয়ে আবার ডেকে বলে দিলেন—এই বিজয় সিং—জরী হাতে করে নিয়ে আসি—

নৈমিত্তিক লোক-ই হচ্ছে সহরের প্রাণকেন্দ্র। পর্বত-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত সহরের প্রাণ চলাচল করে এই লোক-কে প্রদক্ষিণ করেই। ঘর-বাড়ি ছড়িয়ে পড়তে পারেনি হয়ে হ্রদ, বেনন পেরেছে দুহুরা আর শিলা-এ। তাই পথের ধার থেকেই পাহাড়ের বুক বেয়ে ঘর-বাড়ি



‘চল-ব-চল’ এর উপর ঘরোয়া

[কটা : যোগেশ ঘোষ]

উঠতে উঠতে হুড়ায় পৌঁছেছে। অধঃ থেকে উঠল। শাহাড়ের বুধ-জোড়া এটসব আবাসের দিকে ডাকিয়ে থাকে বলে ভাবতে পারিনি ঐ উঁচু স্থানের লোকজন কিভাবে হাতাহাত করে নিভা। কী অংশে, কিসেব মোহে বাবা বেঁচেছে ঐ উঁচু স্থানে!

ওদের হুধ-হুবিধা জানতে পারিনি, তবে ঐসব বাড়ি বেঁধে আনক পেয়েছি রাত্রির অন্ধকার পরিবেশে। সন্ধ্যার পর বর্ধন ঘরে ঘরে আলো জ্বলে ওঠে, তখন লোক-এর দক্ষিণ পায়ে পথ চলতে চলতে হুঁ হয়ে বেতে হয় পর্বতের আলোক-সন্ধ্যার অর্ধ রূপ দেখে। পর্বতবুকের আলো-মালা

লোক-এর জলে ভুবে আলো-জলের মিশ্রিত এক নতুন রূপ তৈরি হয়। তারই ভেতর নবনারীরা উজ্জ্বল নৌকা-বিকারে যেতে থাকে। জলের ওপর কিরী-কর্ট ভেসে বেড়ায় আর শোনা যায় জল-কাটা ধাঁড়ের শব্দ—‘চল-ব-চল-ব’। দক্ষিণ বহুকের জনহীন নীচে ঐ পরিবেশে একা চলতে চলতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চয়।

দিনের বেলা শহর কোলাহলমুখর হয়ে ওঠে। পাল ভুলে ইচ্ছা-নৌকা হুটতে শুরু করে লোক-এর বুকে। পোশাক-বিলাসী স্রমণকারীরা গাধে বিচরণ করে বেড়ায় বলে বলে। অসমর্থ বা অসুস্থরা ডাক্তার ঘোষে কোথায় যাবে শহর দেখে, আর সমর্থরা ঘোড়ার চড়ে হুট বেড়ায়—চলে যায় ‘চাদমা-পীক’-এ। পর্বত-দিগন্তে উঠে তারা হিমালয়ের দৃশ্য দেখতে পায়। দিনের শেষে পরিভ্রান্ত হয়ে সবাই ফিরে যায় নিজ নিজ আত্মনায়। নৈমিত্তিক ও তখন পরিভ্রান্ত বোধ করে।

কবে শহরের বুকে নেমে আসে নিরুপ নিম্নরতা। এ সময় আমাদের হোটেলের বারান্দায় বসে অসুস্থ করা যেতো চতুর্বিকের শান্ত নিম্ন পতিবেশ। রায়ে রায়ে কানে ভেসে আসতো দূরের নকশাচরিত মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি।

ওলাব বলেছিল ওর দেশটা ভালো। আমরাও যখন-প্রাণে অসুস্থব করেছিলাম তাই। ওখানকার লোকজন সহজ সরল, ওদের আন্তরিকতা পরদেশীর মনে ছাপ কেসে যায়। যনে থাকে অনেকদিন। ওলাব এবং তার সহকর্মীরা হোটেলের বোর্ডারদের অতিথির সাহিল গণ্য করেছে।

ও-দেশটার মানুষ আচ্ছ, সৌন্দর্যও আছে। বহু সৌন্দর্যের ভেতর শ্রেষ্ঠ কুমায়ূনের নৈমিত্তিক। রূপসম্পদে কুমায়ূনের হানী। পর্বত-পরিবেশকে এমনিভাবে উজ্জল করে রাখতে আর কেউ পারেনি। বেধে যনে হবে, পর্বত আর সত্যবতের সম্মিলিত রূপের পটচিত্র—কুমায়ূনের ছ’হাজার হুট উঁচু একস্থানে টাঁজানো হয়েছে আকাশের বুকে।

কপদ্মাগর

দুর্বোধ ঘোষ

[পূর্বপ্রকাশিত নয়]

সুনয়নাকে নিয়ে গাড়িটা সড়কের লাল ধূলা উড়িয়ে উধাও হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে ফটকের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল প্রতিভা। প্রতিভার মনের ভাবনাগুলিকে যেন একটা হুহু হু হুয়ালির মধ্যে ফেলে রেখে, আর নিজের জীবনটাকে সব হুয়ালির গ্রাস থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, একেবারে হালকা হয়ে চলে গেল সুনয়না।

ভয় পেয়েছে কি সুনয়না? কিন্তু কই, সুনয়নার চোখে তো ভয়ের কোন ছায়া দেখা গেল না? ভয় পেল কি মানুষের মুখ এমন শাস্ত ও সুলভ হাসিতে ছেয়ে যেতে পারে?

তবে কি তার মনে, হতাশ হয়ে আর দ্রাস্ত হয়ে নিজের জীবনের একটা বিশ্রুপের জালায় জ্বলতে জ্বলতে ছটকটিয়ে পালিয়ে গেল সুনয়না?

তাও যে মনে হয় না। যার বৃকের ভিতরে আক্রোশের জালা থাকে, বিফল স্বপ্নের অভিমান থাকে, কিংবা বার্থ অহংকারের বেদনা থাকে, সে কি এমন করে খুশি হয়ে, শুভ ইচ্ছার উপহার দিয়ে আর অবাধ প্রীতি জানিয়ে চলে যেতে পারে?

তবে কি একটা জয়ের আনন্দে আকুল হয়ে চলে গেল সুনয়না?

ফটকের কাছে থেকে সরে আসে; আস্তে আস্তে হেঁটে আবার ঘরের দিকে কিসের যায় প্রতিভা। এবং বারান্দার উপরে উঠে চেয়ারের উপর বসে পড়তেই আশ্চর্য হয়ে নিচ্ছেনই চোখের উপর হাত বোলায় প্রতিভা। ভিজে গিয়েছে চোখ-দুটো। কিন্তু বৃষ্টিতে পারেনা, কার জন্তু এবং কিসের দ্বারা চোখ-দুটো সজল হয়ে উঠলো?

কার জন্তু মুখ হয়? সুনয়নার জন্তুই বোধ হয়। কিন্তু নিশীথের মুখটাও মনে পড়ছে কেন? সে বেচারার বৃকের ভিতরে কোন বেদনা চিরকালের আক্ষেপ হয়ে স্কিয়ে রইলনা তো?

বৃষ্টিতে কি আর কিছু থাকি আছে? কেন এসেছিল সুনয়না, এই প্রশ্ন প্রতিভার কাছে এখন আর না-বোঝবার মত কোন রহস্য নয়। কিন্তু সুনয়না যে সেই রহস্যকে ছিন্নভিন্ন করে, একেবারে ধূলা করে উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। সুনয়নার চোখের সেই হাসির ছায়াটা যেন প্রতিভার মুখের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই ধূ, করে হেসে উঠলো আর নিভে গেল। তবে কি প্রতিভারই জীবনের উপর কল্পনা করেছে সুনয়না?

হয়তো তাই। কিন্তু শুধু তাই নয়। কালিকা-মাইনসের ন্যামেজার নিশীথ রায়ের জীবনেরও উপর সুনয়নার মায়া হঠাৎ খুশি হয়ে হেসে ওঠেনি কি? এবং এই মায়া কি নিতান্তই মায়া? কিংবা...

প্রতিভার ভাবনাটা ভুল করেনি বোধহয়। নিশীথ রায়কে সত্যিই ভালবেসেছে সুনয়না। তা না হলে, নিশীথ রায়ের জীবনের ঘরে প্রতিভাকে দেখতে পেয়ে এত খুশি হয়ে উঠবে কেন সুনয়না? যেখানে আঘাত হানবার সুযোগ ছিল, আঘাত হানা উচিত ছিল, সেখানে মাখনা দিয়ে আর সাহস দিয়ে, এবং যেন নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল সুনয়না। সুনয়নার মুখটা মনে পড়লে প্রতিভার মাথাটা যে আস্তে আস্তে হেঁটে হয়ে যায়।

কালিকাপুরের শালবনের ছায়াময় কালো চেহারা আর দূরের পাহাড়ের চেহারা হঠাৎ বললে

গিয়েছে মনে হয়। দেখতেও পায় হুনয়না, যেন হেসে চলল করছে চারদিকের মাঠ, পাহাড় আর শালবন। সন্ধ্যা হতেই পূর্বের আকাশে মত্ত বড় চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার চাঁদ নিশ্চয়।

বারান্দার আলো নপ্প করে জ্বল ওঠে। বেয়ারাটা এসে সুইচ টিপেছে। প্রতিভার হাতের কাছে একটা চিঠি দিয়ে চলে যায় বেয়ারা।

রাজশেখরের চিঠি; শিবদাসবাবু লিখেছেন। চিঠির লেখা পড়তে পড়তে প্রতিভার চোখ ছুটো আবার জ্বলে ভরে যায়। চিঠির কথাগুলি যেন একটা ছোট ছেলের কাগাহাসির মত কল্প-মধুর বস্তু কথা। বোকা যায়, চিঠি লিখতে লিখতে শিবদাস দত্তের চোখ ছুটো বার বার কেসেছে আর হেসেছে : ভাল আছিস তো, মা? আমার যে এখন ছুটে গিয়ে তোকে একবার কোলে নিতে ইচ্ছে করছে।... নিশীথ ভাল আছে তো? ...কোন ভাবনা করিস না, প্রতিভা!...মামুষের নিথাকথা শেষ পর্যন্ত কারও কন্ঠ করতে পারে না।...

চিঠির শেষ লাইনে একটি কথা লিখেছেন শিবদাস দত্ত, একটা আক্ষেপের কথা। কিন্তু শিবদাস দত্তের এই আক্ষেপের ভাষা যেন একটা প্রাণখোলা হাসির প্রতিধ্বনি : শীতলবাবু একটা অদ্ভুত কথা বললেন; বেচারি নিশীথের চরিত্রের নানারকম অপব্যাস করে একটা ভয়ানক ব্যক্তি চিঠি বিকৃতই লিখেছে। আমি সে চিঠি পড়েছি আর বার বার হেসেছি।

প্রতিভার চোখে-মুখে যেন একটা হঠাৎ প্রসন্নতার দীপ্তি বিলিক দিয়ে চমকে ওঠে। বিহুতি, খরসোয়ান ব্যাঙ্গানিষ্ঠের সেই বিহুতি, লোহার মত কঠিন যার চরিত্রের শুদ্ধতা, সেই ফসলোকই তাহলে শীতল সরকারের মেয়ে নীরাজিতার জীবনকে কলুষের ধোঁয়া থেকে বাঁচিয়েছে!

হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে পাড়ায় প্রতিভা। সুইচ টিপে বারান্দার আলো নিভিয়ে

যেয়, আর চাঁদের আলোতে চলল করছে কালিকা-পূর্বের মাঠ পাহাড় আর শালবনের যে শোভা, ভারিই দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিহুতিকে যে খস্তবাদ দিতে ইচ্ছে করছে। জানে না বিহুতি, এখন কল্পনাও করতে পারছেন। বিহুতি, প্রতিভার জীবনের কত বড় উপকার সে করে ফেলেছে। বিহুতির চিঠি অলঙ্কারের উৎসবের আলপনা মুছে দিয়েছিল বলেই না প্রতিভা আজ নিশীথ রায়ের ভালবাসার এই ঘরে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে।

যেন প্রতিভার মুখের ভিতর থেকে হাসিটা বার বার উথলে উঠেছে। ভাগ্য ভাল প্রতিভার, প্রতিভাকে ঘৃণা করেছিল বিহুতি। আরও ভাগ্য, নিশীথকেও ঘৃণা করে বিহুতি। তা না হলে, আজ যে শীতল সরকারের মেয়ে নীরাজিতা এই বাড়ির এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কালিকাপূর্বের পূর্ণিমা-চাঁদের আলোতে চলল ঐ শালবন আর পাহাড়ের শোভা হুঁচোখ ভরে দেখতো।

ফটকের কাছে গাড়ির শব্দ। দেখতে পায় প্রতিভা, হ্যাঁ, নিশীথেরই গাড়ি। গাড়ির হেড-লাইট জ্বলছে না। নিশীথের গাড়িটাও যেন এই জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা গায়ে মেখে আস্তে আস্তে হেসে গড়িয়ে বাড়ি ফিরছে।

বারান্দার উপর উঠে আশ্চর্য হয় নিশীথ। —হুমি কি আমার আসতে ঘেরি দেখে...

প্রতিভা হাসে। —না, তোমার আসতে ঘেরি দেখে ভাবনা করবো, আমি সে মেয়ে নই।

নিশীথও হাসে। —এতটা ভুচ্ছ কোরো না, প্রতিভা।

নিশীথের কাছে এগিয়ে বেচে, নিশীথের গলা হুঁহাতে জড়িয়ে হেসে ওঠে প্রতিভা। —বাবার চিঠি এসেছে।

নিশীথ—তাই বল। সেজন্য এক খুনি।

প্রতিভা—শুধু সেজন্য নয়।

নিশীথ—তবে?

প্রতিভা—মনে পড়লো, তোমার বন্ধু বিহুতিবাবু বড় উপকারী মানুষ।

নিশীথ হাসে। —হ্যাঁ, বিহুতি বেচারা আমার একটা উপকার করেছে, স্বীকার করতেই হবে।

প্রতিভা—তার নামে ?

নিশীথ—বিহুতি তোমাকে ঘেন্না করতে পেরেছিল বলেই না আমি আজ...

প্রতিভার মাথার হাত বুলিয়ে নিশীথ মুগ্ধ হয়ে বলে—আজ তোমাকে এখানে চোখের এত কাছে দেখতে পাচ্ছি।

প্রতিভা—বিহুতিবাবু কি তোমাকে ভ্রষ্টা করে ?

নিশীথ—তা জানি না। তবে অশ্রদ্ধাই বা করবে কেন ?

মুইচ টিপে আলো জ্বলেই নিশীথের হাতের কাছে শিবদাস দত্তের চিঠিটা এগিয়ে দেয় প্রতিভা।

চিঠি পড়েই হো-হো করে হেসে ওঠে নিশীথ। —বিহুতিটার মাথা খারাপ। --যাই হোক... বিহুতির কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

প্রতিভা—কেন ?

নিশীথ—বেচারা চেষ্টা করে, শীতলবাবু আর তাঁর মেয়ের উপকার করবার জন্য এভাবে অলঙ্কার উৎসবটা ভেঙে দিতে পেরেছে বলেই তো তোমাকে...

প্রতিভাকে বৃকের কাছে টেনে নেয় নিশীথ। আস্তে আস্তে ফিসফিস করে প্রতিভার কানের কাছে যেন জীবনের একটা সৌভাগ্যের আর তৃপ্তির গুঞ্জন শোনাতে থাকে : —ভালই করেছে বিহুতি।

প্রতিভা—একটা কথা...

নিশীথ—কি ?

প্রতিভা—শীতলবাবুর কাছে তোমার নামে এরকম একটা অপবাদের চিঠি দিয়েও বিহুতিবাবু ফুল উপহার পাঠিয়েছিল কেন ?

নিশীথ—ফুল ? ও, হ্যাঁ... মনে পড়েছে, এককুড়ি ফুল পাঠিয়েছিল বিহুতি।

প্রতিভা—কেন ?

নিশীথ—এটাও বিহুতির একটা অভ্যাস, একটা স্টাইলও বলতে পার। চিরকাল বিহুতিকে তো এইরকম নানা কাণ্ড করতে দেখছি।

প্রতিভা—তার নামে ?

নিশীথ—তার নামে, বেচারা মিছিমিছি নানারকম কাণ্ড করে ফেলে। যা না করলেও চলে, তাও করে।

প্রতিভা—কিছুই বুঝতে পারছি না।

নিশীথ—যেমন ধর ; বি-এসসি পরীক্ষাতে যে কাণ্ডটা করেছিল বিহুতি। পরীক্ষার হলে বসে অমন বেপরোয়া হয়ে, এত বড় একটা বই আলোয়ানের আড়ালে রেখে, গার্ডের চোখে ধুলো দিয়ে...ওভাবে দশ-বারটা নম্বর বেশি পাওয়ার জন্য... না, কোন দরকার ছিল না। তবু...

প্রতিভা—এইবার বৃকলান।

নিশীথ—এর চাকরিটার কথাই ধর-না কেন। ধরসোয়ান ম্যাক্সানিজের সাহেব মালিক বিহুতির সেই চমৎকার চালাকিটা ধরতেই পারেনি। নইলে আমাদের ত্রিপুরারি সেনের নত এত যোগ্য ক্যান্ডিডেটকে বান দিয়ে বিহুতিকে চাকি সুপারভাইজার করবে কেন ?

প্রতিভা—সেটা আবার কি ব্যাপার ?

নিশীথ—ত্রিপুরারি সেনাকেই চাকি সুপারভাইজার করা হবে, ধরসোয়ান ম্যাক্সানিজের বিলিতি মালিকের। এরকম সিদ্ধান্ত করেই ফেলেছিলেন ; বিহুতিও ঐ কাজের জন্য দরখাস্ত করেছিল ; কিন্তু বিহুতির চেয়ে ত্রিপুরারি দক্ষতা বেশি কোয়ালি-ফায়ের। ঐ কাজ পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই বিহুতির পক্ষে ছিল না, কিন্তু বিহুতি দরবার পাত্র নয়। বিহুতি এক পুলিশ অফিসারকে বেশ কিছু টাকা খাইয়ে ত্রিপুরারি নামে একটা খারাপ রিপোর্ট করিয়েছিল যে, ত্রিপুরারি আগে রিভলুশনারী বলে ছিল ; এবং এখনও হাড়ে-হাড়ে অ্যান্টি-ব্রিটিশ। ধরসোয়ান ম্যাক্সানিজের ডিরেক্টর-বোর্ড এই রিপোর্ট

পেয়েই ত্রিপুরারির সম্পর্কে সাবধান হয়ে গেল।
কাজটা পেয়ে গেল বিহুতি।

প্রতিভা—চমৎকার ব্যাপার।

নিশীথ—টাকা-পয়সার ব্যাপারেও বিহুতির
এরকন খেয়াল আছে; যা না করলেও চলে, তাই
করবে।

প্রতিভা—কি রকম ?

নিশীথ—বিহুতি বেশ বড়লোকের ছেলে।
চাকরি-বাকরি না করলেও ওর চলে যাবে, কোন
অভাবেই পড়তে হবে না। কিন্তু টাকার ওপর
বিহুতির বড় মায়। কোন চ্যারিটিতে কোনদিন
একপয়সা চান্দা গিয়েছে বলে মনে পড়ে না। আরও
অদ্বুত ব্যাপার, কারও কাছে ধার খীকার করেনা
বিহুতি।

প্রতিভা—তার নামে ?

চৌচিয়ে হেসে ওঠে নিশীথ—কারও কাছ থেকে
টাকা বা কোন ভিনিস ধার নিলে সেটা মনেই
রাখতে পারেনা বিহুতি; এমনই ভুলো মন।
গান্ধির চৌহানবাবুর সঙ্গে বিহুতির একবার
কমকাতার রাত্তায় দেখা হয়েছিল। আলিপুরে
একটা বাড়ি কেনবার চক্রে সেদিনই পাঁচহাজার টাকা
বাড়না করবে বলে ব্যাংক টাকা ভুলতে গিয়েছিল
বিহুতি। কিন্তু ব্যাংক বন্ধ ছিল। অগত্যা
চৌহানবাবুর কাছ থেকে মগদ পাঁচহাজার টাকা
নিয়ে কাজ চালিয়ে নিয়েছিল। চৌহানবাবু কোন
রসিদ চাননি, আর নিশীথও দেয়নি। বাস...তারপর
এই তো পুরো তিনটি বছর পার হয়ে গিয়েছে,
বিহুতি এখনও মনে করতে পারছেননা যে,
চৌহানবাবুর কাছ থেকে পাঁচহাজার টাকা ধার
নিয়েছিল। চৌহানবাবু বেশ আশ্চর্য হয়ে
গিয়েছেন।

প্রতিভা—আরও চমৎকার ব্যাপার।

নিশীথ—বিহুতির এসব কাণ্ড দেখতে ভাল
লাগেনা ঠিকই, এরকম কাণ্ড করা উচিতও নয়, কিন্তু
একটি বিষয়ে বিহুতির প্রশংসা না ক'রে পারি না।

প্রতিভা—কি ?

নিশীথ—সেটা ভুলিও শুনেছ। বিহুতির চরিত্র
নিখুঁত; বিহুতি আমার বিশবছরের চেনা বন্ধু;
কিন্তু শতযুখে খীকার করবে, জীবনে মেরকম কোন
ভুল করেনি বিহুতি, যে-ভুল...

প্রতিভা—কি ?

নিশীথ গম্ভীর হয়, এবং গম্ভীর মুখটা ধীরে ধীরে
করুণ হয়ে উঠতে থাকে। —যে-ভুল আমি করেছি।

প্রতিভার সোনার স্ক্রেনের চমৎকার আড়ালে
চোখের তারা দুটো যেন বিহ্যাতের মত বিলিক দিয়ে
झলে ওঠে। —ভুলি কোন ভুল করিনি, নিশীথ !

নিশীথ—কি বললে ?

প্রতিভা—আমিও কোন ভুল করিনি। আমি
চৌচিয়ে গর্হ করে বলছি, নিশীথ—তোমার আমার
ঐ ভুলকেও আমি নমস্কার করতে পারি, কিন্তু
তোমার বন্ধু বিহুতির চরিত্রকে ঘেঁষা করতেও
ঘেঁষা হয়।

নিশীথ—বিহুতির উপর খুব রাগ করছে। বলে
মনে হচ্ছে।

নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে এইবার
প্রতিভার চোখ দুটো সত্যিই রাগ ক'রে ছটফট করতে
থাকে। —বড় ভুল কথা বললে, নিশীথ।

নিশীথ—ক্যা ?

হেসে ফেলে প্রতিভা; আর তেমনি ছটফট
ক'রে হুটু টেপে আলো নিভিয়ে দিয়ে নিশীথের
বুকের সঙ্গে আরও নিবিড় হয়ে এলিয়ে পড়ে।
—বিহুতিকে সত্যিই ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে,
নিশীথ। বিহুতি আমার যে উপকার করেছে, তার
চেয়ে বড় উপকার হয় না।

—কি ?

—আমাকে বিয়ে করেনি বিহুতি, এর চেয়ে বড়
উপকার আমার জীবনে আর কি হতে পারে ?
বিহুতি কোতা আমার সুখিধাভা।

সত্যিই বেন মুক্তির আনন্দে উজ্জল একটা
নিঃশব্দ ছাড়ে প্রতিভা।

নিশীথের নিঃশ্বাস হঠাৎ যেন কেঁপে ওঠে—
আমাকেও মৃত্তি পেতে হবে—

হেসে ওঠে প্রতিভা; এবং নিশীথও প্রতিভার
চমকে-ওঠা বুকের শিহরটুকু অহুত্ব করতে পারে।
নিশীথ বলে—কিন্তু তুমি সেক্ষণ কিছু ভেবে না,
প্রতিভা। আমি কাউকে ভয় করি না; কেউ
আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

প্রতিভা বলে—আজ সন্ধ্যার একটু আগে
স্বনয়না এসেছিল।

চমকে ওঠে নিশীথ; এবং বৃক্ষত পারে নিশীথ—
তার বুকের এই ঢিপঢিপ শব্দ, ভীকৃতার এই
আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছে প্রতিভা।

নিশীথের হাত ধরে প্রতিভা। —চল, ঘরের
ভেতরে গিয়ে বসি।

ঘরের ভিতরে না গিয়ে, ছু'পা এগিয়ে যেয়ে
বাগান্দার চোয়ারের উপর ক্রান্তভাবে বসে পড়ে
নিশীথ। চোয়ারের গা ধেঁবে পাড়িয়ে থাকে
প্রতিভা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর, যেন বুকের
ভিতরের ভীক নিঃশ্বাসগুলির সঙ্গে মনে মনে সংগ্রাম
ক'রে আরও ক্রান্ত হয়ে যাবার পর, আস্তে একটা
হাত তুলে প্রতিভার হাত ধরে নিশীথ। —তোমাকে
অপমান করেনি তো স্বনয়না?

প্রতিভা—না।

নিশীথ—আমাকে অপমান ক'রে গিয়েছে
বোধ হয়?

প্রতিভা—না।

নিশীথ—কেন? আমাকে অপমান করা ছাড়া
স্বনয়নার তো এখানে আসবার কোন দরকার হতে
পারে না।

প্রতিভা—তা জানি না।...কিন্তু স্বনয়না তোমাকে
গালুড়িতে গিয়ে চা খেয়ে আসবার নেমন্তন্ন করে
গিয়েছে।

নিশীথ—হুঃসাহস।

প্রতিভা হাসে—কা'র হুঃসাহস?

নিশীথ—স্বনয়নার; আমাকে গালুড়িতে গিয়ে
চা খেতে নেমন্তন্ন করা যে তোমাকে অপমান করা।

প্রতিভা—আমাকেও নেমন্তন্ন করেছে স্বনয়না।

—সেকি! আশ্চর্য হয়ে চোয়ার ছেড়ে উঠে
পাড়ায় নিশীথ। —তোমাকে নেমন্তন্ন করে কেন?
তোমাকে চেনে নাকি স্বনয়না?

প্রতিভা—ঠা। স্বনয়না যে আমার অনেকদিন
আগের চেনা বন্ধু।

নিশীথ—তাই বল, বন্ধু বলেই চক্ষুশঙ্কর
খাতির নেমন্তন্ন ক'রে ফেলেছে। নইলে...

প্রতিভা—কি?

নিশীথ—নইলে আমার সামনে তোমাকে, আর
তোমার সামনে আমাকে অপমান না করে খুশি
হতেনা স্বনয়না।

প্রতিভা—স্বনয়নাকে এরকম ভয়ানক মাহুষ
বলে মনে করছে? কেন?

নিশীথ—জানি বলেই মনে করছি। তুমি
কিছুই জান না।

প্রতিভা—কিন্তু আমাকে বন্ধু বলে নেমন্তন্ন
করেনি স্বনয়না।

নিশীথ—তবে?

প্রতিভা—তোমার দ্বী বলে।

নিশীথ—অসম্ভব।

প্রতিভা—বিবাস কর, নিশীথ! স্বনয়না খুব
খুশি হয়েছে।

নিশীথ—কিসে খুশি হলো?

প্রতিভা—আমাকে এখানে দেখতে পেয়েছে
বলে।

নিশীথ—বুকলান না, প্রতিভা।

প্রতিভা—বৃক্ষতে পারনা কেন নিশীথ?
আমাকে যে চেনে জানে, আমার ভুল নিষ্ঠের চোখে
দেখেছে স্বনয়না; আমার ভুলে একদিন কেঁদে
ফেলেছিল স্বনয়না।

বলতে বলতে মাথা হেঁট করে প্রতিভা। এবং
প্রতিভার সেই হেঁটমাথা মূর্তির দিকে চুপ করে

কিছুকণ তাকিয়ে থাকে নিশীথ। তার পর আন্তে আন্তে কাছে এগিয়ে এসে প্রতিভার চোখে হাত দিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে নিশীথ—ছিঃ, প্রতিভা! সেজন্য সুনয়নাকে ভয় করবার কোন দরকার হয় না।

প্রতিভা—সুনয়নাকে ভয় করছি না, নিশীথ। ভয় করছি নিজেকে।

নিশীথ—কেন ?

প্রতিভা—সহ্য করতে পারবো কিনা বুঝতে পারছি না।

যেন প্রতিভার জীবনের পথে একটা অতি নির্মূল পত্নীকার আশঙ্কতার ছায়া দেখতে পেয়েছে প্রতিভা। সেট পত্নীকার কাছে পরাক্রম যেন মানতে না হয় ; তারই চক্রে প্রাণের ভিতরে একটা প্রতিজ্ঞার স্তোর ভরে দেখার ক্ষমতা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে প্রতিভা।

নিশীথ—কি সহ্য করতে হবে বলে ভাবছো, প্রতিভা ?

প্রতিভা—তোমার গুনে কোন লাভ নেই, ক্ষতিও নেই, নিশীথ। জিজ্ঞাসা কোরো না।

নিশীথ—আমি বলতে পারি।

প্রতিভা হাসে। —তবে বল।

নিশীথ—ভাবছো, সুনয়না যদি অন্যাকে আবার ... অসন্তুষ্ট, প্রতিভা ; আমি আত্মহত্যা করতে পারবো, তবু সুনয়নার ছায়ার কাছেও আর দাঁড়াতে পারবো না।

প্রতিভা—কিন্তু যদি তুমি বুঝতে পার যে, সুনয়না তোমাকে ভালবাসে ? তবে ?

হেসে কেলে নিশীথ। —যদি পশ্চিমে সূর্য ওঠে, তবু ! ... তোমার প্রশ্নটাই কোন অর্থ হয় না, প্রতিভা। সুনয়নার মত মানুষ ওসবের ধার ধারে না। সুনয়না একটা বেপরোয়া উৎপাত মাত্র। মানুষকে নিজের ওপর যেটা ধরিয়ে দেওয়াই ওর প্রাণের একটা আনন্দ।

প্রতিভা হাসে। —কিন্তু যদি সত্যিই সুনয়না তোমাকে ভালবেসেছে বলে তুমি বুঝতে পার, তবে...

নিশীথ—যদি একটা কাল্পনিক স্ত্রী বলে সেটা বেনেই নিউ, তবু উচিত কি, আসে যায় না। নিশীথ রায় সুনয়নাকে কোমলিন ভালবাসেনি, ভালবাসতেও যাবে না। তুমি নিশীথমিহি...

প্রতিভা—না, আমিও সেজন্য ভাবি না। সুনয়না যদি তোমাকে ভালবাসে, তবে আটকাবে কে ? আর, সেটা তোমার দেখাই বা হবে কেন ? কিন্তু...

নিশীথ—আর কিন্তু কেন ? কোন কিন্তু নেই।

প্রতিভা—যাই হোক ; তাহলে গালুড়িতে দিয়ে সুনয়নার বাড়িতে চা খেয়ে আদি চল।

নিশীথ—আমি যাব না।

প্রতিভা—আমি যাব কি ?

নিশীথ—সেটা তোমার ইচ্ছে। আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমার ইচ্ছে নয় যে, তুমি যাও।

প্রতিভা—কিন্তু তুমি না গেলে, শুধু আমি একা গেলে সুনয়নাকে অপমান করা হয় না কি ?

নিশীথ—আমার জীবনের মানের উপর কোন দরদ আছে সুনয়নার, যে অন্যাকে ওর মান-অপমানের কথা ভাবতে হবে ?

প্রতিভা—আছে।

—কি ? অকুটি করে তাকায় নিশীথ।

—সুনয়না বলতে গেলে আমাদেরই দু'জনের কথা তবে অনেক কথা বলেছে।

—কি কথা ?

—তোমার সঙ্গে রোজ বেড়াবার কথা।

—তার মানে ?

—হ্যাঁ, সুনয়না একটা কি পাঠিয়ে দেবে বলে গিয়েছে ; খুব ভাল কাজ জানে ঝি-টা ; আমাদের কোন কথাটাই সইতে হবে না।

বারান্দার আলো আলিয়ে প্রতিভার মুখের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে নিশীথ। যেন দেখতে চায় নিশীথ, প্রতিভার চোখ ছোটো হঠাৎ একটা ঠাট্টার আবেগে হাসছে না তো ? নইলে এসব আবোল-তাবোল কথা বলে কি লাভ হচ্ছে প্রতিভার ?

প্রতিভা বলে—সুনয়নার ইচ্ছে, এই ঘরের ভেতরে কোন চেয়ার-টেবিল থাকবে না। এই ঘরটা শুধু তোমার আমার জন্য একটা নিরিবিলা ঘর হবে।

নিশীথ—সুনয়নার এসব কথা বলে লাভ কি ?

প্রতিভা—সুনয়না তোমার ভাল চায়।

নিশীথ—আমার ভাল চেয়েই বা সুনয়নার লাভ কি ?

প্রতিভা—সুনয়না তোমাকে ভালবাসে।

হঠাৎ নীরব হয়ে যায় নিশীথ। এবং অনেকক্ষণ পার হয়ে যাবার পরেও যখন কথা বলেনা নিশীথ, তখন প্রতিভাই কথা বলে। —তাহলে চল।

নিশীথ—আজ এত রাতে কেমন করে যাব ? আজ নয়।

প্রতিভা—কবে যাবে ?

নিশীথ—একদিন বাওয়া যাবে।

প্রতিভা—কিন্তু সুনয়না যাবার সময় বিশেষ একটি অমরোদধ করে গিয়েছে।

নিশীথ—কি ?

প্রতিভা—যেন কালই আমরা যাই। যেন ঘেরি না করি।

—কি ? নিশীথের চোখ দুটো যেন একটা বিজীবিচার ছায়া দেখে চমকে উঠেছে।

প্রতিভা—হ্যাঁ, কালই একবার গালুডি যাবার জন্য চেষ্টা করতে বলে গিয়েছে সুনয়না, নইলে...

—নইলে কি ?

প্রতিভা—সে-কথা বলেনি সুনয়না।

হাত বাড়িয়ে প্রতিভার একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে নিশীথ। —প্রতিভা।

—বল।

নিশীথ—সুনয়না বোধহয়...আমার ভয়ানক সম্বন্ধ হচ্ছে, প্রতিভা ; সুনয়না যেন ভয়ানক কিছু করবে বলে মনে হচ্ছে—

প্রতিভা—কেমন ক'রে বুকে ?

নিশীথ—সে-মামুষ এরকম ভাষায় কথা বলে

না। কেনদিন বলেনি। এ ভাষা সুনয়নার মুখে একেবারে নতুন ভাষা। সুনয়না বোধহয় চিত্রকালের মত সরে যাবার মতলব করেছে।

প্রতিভা—কোথায় সরে যাবে ?

ছটকট করে উঠে পাড়ায় নিশীথ। —তুমি বড় ভুল করছ, প্রতিভা।

প্রতিভার মুখ কণ্ঠ হয়ে যায়। —কি ভুল করলাম ?

নিশীথ—তুমি সুনয়নার কথার অর্থ বুকে পারনি। হি হি, আমাকে শুধনি যদি একবার খবর পাঠাতে !

প্রতিভা—তবে কি হতো ?

নিশীথ—তবে সুনয়নাকে আটকে রাখতাম।

প্রতিভা—আটকে রেখে কি লাভ হতো ?

নিশীথ—আঃ, একটা মামুষ নিজেকে সঙ্গ করতে না পেরে প্রাণটারই ইতি ক'রে দিতে চায়, তাকে আটকে রেখে দুটো ভাল কথা বলে, মানুষনা দিয়ে, তাকে তো বুকে দিতে পারা যেত যে—না, এরকম হতান হতে নেই। সুখী হয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার তোমারও আছে।

প্রতিভা—আমি এতটা ভাবতে পারিনি, নিশীথ ; সুনয়নার কথা শুনে একটা খটকা লেগেছিল, এই মাত্র।

চুপ করে বাইরের পৃথিবীর জ্যোৎস্নাসিক্ত বিহ্বল শোভার দিকে তাকিয়ে নিশীথের চোখ দুটো যেন ধীরে ধীরে সম্মল হয়ে উঠতে থাকে। আনন্দের মত, যেন ভাঙা-ভাঙা নিঃবাসের বেদনার শব্দ দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে অক্ষুণ্ণের এক-একটা কথা বলে নিশীথ। —রাত হয়ে গিয়েছে...কিন্তু এখনই একবার...এমন কিছু দূর নয় গালুডি—গেলে ভাল হতো।

হঠাৎ প্রতিভার দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠে নিশীথ। —ওকি ! তুমি আবার এ কি কাণ্ড করছো, প্রতিভা ?

দেখেছে নিশীথ, এক হাতে কপাল টিপে চুপ

ক'রে চেয়ারের উপর বসে আছে সুনয়ন। আর, ছুঁচোখের ছুঁই কোণে বড় বড় দুটো জলের ফোঁটা টললন করছে।

প্রতিভা হাসে। —ঠিক আছে। তুমি যা বলছো, সবই সত্য; সব সহ্য করতে পারছি : তুমি নয় করে আমাকে ভুল বুঝবে না !

নিশীথ—তুমি কি আমার কথায় হুঃ পেলে ?

প্রতিভা—না। মানুষের জন্ত মানুষের মনে নানা থাকবে, এতে আশ্চর্য হব কেন, সহ্য করতেই বা পারবো না কেন ?

নিশীথ—আমার সত্যিই যে বড় কষ্ট হচ্ছে, প্রতিভা !

প্রতিভা—সুনয়নার জন্ত নিশ্চয়।

নিশীথ—হ্যাঁ।

প্রতিভা—আমারও কষ্ট হচ্ছে, নিশীথ, বিশ্বাস কর।

নিশীথ—তুমি আমাকে ভুল বুঝলেনা তো ?

প্রতিভা—একটুও না। তোমাকে ভাল করে চিনতে পারলান।

নিশীথ—তাই কি কষ্ট পাচ্ছ ?

প্রতিভা—হ্যাঁ।

নিশীথ—আমাকে সম্বোধ হয়।

প্রতিভা—না, সম্বোধ নয়। তোমাকে বিশ্বাস করি।

নিশীথ—কি ?

প্রতিভা—সুনয়নাকে আজ ভাবতে তোমার ভাল লাগছে।

নিশীথ—সত্যি কথা। মনে হচ্ছে, সুনয়নার কাছে যেন ছোট হয়ে গেলান। মনে হচ্ছে, সুনয়নাকে ভুল বুঝেছিলাম। বৃকতে পারছি, সুনয়নার অনেক ক্ষতি করেছে। সুনয়না সুখী না হলে আমি...আমরা সুখী হতে পারবো কিনা, বুঝতে পারছি না, প্রতিভা।

নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিভার চোখ দুটো কীদে দীপের-নিখার মত করুণ হতে হতে

শেষ পর্যন্ত হেসে ফেলে। জীবনের সবচেয়ে কঠোর পরীক্ষটাকে সহ্য করার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করছে প্রতিভা।

এসিয়ে এসে প্রতিভার কাঁধের উপর মাথার ভার এলিয়ে দিয়ে ছটফট ক'রে ওঠে নিশীথ। —তোমার কাছেই পরামর্শ চাইছি, প্রতিভা। একটা উপায় বলে দাও।

প্রতিভা—এই রাতটা কেটে যাক, তারপর চল, গালুড়ি ঘাই।

নিশীথ—কিন্তু গালুড়ি গিয়ে যদি দেখতে পাই যে...না, সেরকম কিছু ঘটে যাবে না—কি বল, প্রতিভা ? সুনয়না নিজেই যখন কালকে বেতে বলেছে, তখন সুনয়নাকে বিশ্বাস করা যায়, নিশ্চয় আমাদের অপেক্ষায় থাকবে সুনয়না।

প্রতিভা—আমার তো তাই মনে হয়।

নিশীথের মাথায় হাত বোলায় প্রতিভা। নিশীথকে এভাবে আশ্বস্ত করার অর্থ কি, বোধহয় নিজেও বুঝতে পারেনা প্রতিভা। শুধু বুঝতে পারে যে, নিশীথকে আশ্বস্ত করার মত জোর আছে প্রতিভার প্রাণে, এবং হাতদুটোও অভিমানের বেদনায় দুর্বল হয়ে যায়নি।

অনেকক্ষণ পরে নিশীথের মুখের দিকে একবার তাকায়, এবং তাকাতে গিয়ে অনেকক্ষণ চোখ স্কোতে পারেনা প্রতিভা। একেবারে আনমনা হয়ে গিয়েছে নিশীথ, যেন অনেক দূরের কোন মায়ায় জগতের দিকে তাকিয়ে আছে।

এবার আর বুঝতে কোন অনুবিধা নেই প্রতিভার, যাকে ভয় করতো নিশীথ তাকেই আজ মায়া করতে চায় নিশীথের মন। যাকে এককাল ঘৃণা করে এসেছে, তাকেই ভাল লাগতে শুরু করেছে।

কিন্তু ভুল করছে কি নিশীথ ? ভুল নয়, একটুও ভুল নয়। যদি এটা ভুল হয়ে থাকে, তবে এটা মানুষেরই মনের ভুল। এরকম ভুল না করলেই বোধহয় মানুষে অমানুষ হয়ে যায়।

ঠিকই তো; প্রতিভার মনটা যে নীরবে গ্রাস করে করে নিজের মনের কাছে থেকেই উত্তর আদায় করতে থাকে। আজ সুনয়নার কথা স্মরণে গিয়ে যদি হো-হা করে হেসে উঠতো নিশীথ, তবে নিশীথকে একটা নির্ভর হাসির স্তব্ধহীন অভিনেতার মত মনে হতো নাকি? এবং, নিশীথের সেই হাসির লগ্ন শুনে প্রতিভারই বুকের ভিতরটা ভয় পেয়ে চমকে উঠতো নাকি?

তাই, এইটুকু বৃত্তে পারছে বলেই নিশীথের নাথায় হাত বুলিয়ে দিতে প্রতিভার হাতটা একটুও ব্যথিত না হয়ে বরং খুশিই হয়ে ওঠে। এটা কোন পরীক্ষা নয়।

কাল সকালে সুনয়নার চোখের কাছে গিয়ে যখন ঠাড়াবে নিশীথ, তখন, এবং তার পর যা হবে, তারই ছবি যেন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে প্রতিভা; এবং বৃত্তে পারছে, সেটাই তো পরীক্ষা। সম্ব করতে পারা যাবে কি?

পারা যাবেনা বোধহয়, এবং সেসব হুঃ নেই।

জানবে সুনয়না, নিশীথের মন সুনয়নাকে আজ জ্বালা করে; সুনয়নাকে ভাল লেগেছে নিশীথের;

সুনয়নাকে মহৎ বলে মনে হয়েছে নিশীথের। সুনয়নাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে নিশীথের ব্যথিত মুখটা আবরণময় হয়ে উঠবে: তুমি কোন্ হুঃশে আর কেন নিজেকে বেয়া করবে, সুনয়না? তোমারও বেঁচে থাকবার সব অধিকার আছে।

সুনয়নাও আবস্থ হয়ে বেঁচে থাকতে চাইবে। এবং তার পর? নিশীথ ও সুনয়নার এই ক্রমান্বয় নতুন সম্পর্কের পাশে একটা অবাস্তব ছায়ায় মত প্রতিভা যদি পড়ে থাকে, তবে এই দুই বেচারার জীবনের আনন্দে বিভ্রম্বনা ঘটানো হয় নাকি?

মনে মনে হেসে ফেলে প্রতিভা। আর, যেন মনেরই একটা দুরন্ত ব্যাকুলতায় হঠাৎ ছুটফট করে উঠেই মুখ কিরিয়ে নেয়; চোখ ভিজে গিয়েছে, কিন্তু মুখের উপর যেন অদৃষ্ট একটা প্রতিজ্ঞার হাসি চমকল করতে থাকে; চাকের আলোতে ঢলঢল শাল-বনের শোভার চেয়েও মধুর ও নায়ন্য সেই হাসি।

নিশীথের জন্ত চা তৈরি করতে হবে; বাস্তব হয়ে ওঠবার আগে প্রতিভা শুধু মনে মনে একটা প্রার্থনা সেরে নেয়; যেন মনের এই হাসির জোহরটা কাল পর্যন্ত অটুট থাকে।

[সমাপ্ত:]



কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র

অসিতকুমার

এক উজ্জ্বল আত্মর চাকল্যে কবিকিশোর চোখ মেলে
তাকানো।

জলের মতো ঘন অন্ধকার হাওয়ার মতো হালকা হয়ে
এসেছে বলে নয়, আকাশের সমুদ্রতল ভেদ করে ফুটে ওঠা
লাল, নীল, আগো নীল, নীলসোহিত বিশ্বের অসিদ্ধিম
আলোকিত করল তাকে। সেই প্রকাশের স্নেহ, প্রকাশের
সেই বিজল আনন্দের স্নেহ সে আপন জগতের এক অস্বপুর্ন
দাখুদা অগ্রভব করল, —অগ্রভব করে আবার বিজল হ'ল।

কির সে বিজলতা কি থাকে? এই অসিদ্ধিতকে
কোথায় অতান করে রাখবে কবিকিশোর? সে তো
মেঘলোকের ঠাঁড়ির নেই, অমরতার স্তম্ভী তার হাত ধরে
কেনো অনজাত স্বর্গজন্মের অধঃপাতিতায় নিয়ে যাবার
কর্তৃ উপস্থিত নেই তার পক্ষে।



কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র

তার স্বর স্নেহ আকাশ ছুড়ে ছড়ানো ধাক্কা—সে তো
ঠাঁড়ির আছে নহর-সীমান্তের এক সর্কোণ গলির
উপান্তে।

স্বর্গসেবতার হোলিখেলা চলুক বেগলোকের প্রান্তরে—
তার চোখ পড়ে বাব পৃথিবীতে, এ কোন্ বাতাবরণ রচিত
হয়েছে তার চাৰিপাশে? ফুটে সেওয়ার দখলী বহু নিয়ে
ই টখনা পাঁচিলের ধারে ঠাঁড়িরে হুই খুণধরা হুতি তারবরে
চিবকার করে চলছে জোর হওয়ার আগে থেকেই, চায়ের
লোকানের ছোঁকরা ছেলোটা কাঁচা কলসার খোঁষার হুই চোখ
লাল করঙে গালাগাল ঘেরে চলছে মনিবের, শুটিংবয়ে
শ্রোঁড়া হুটো ছুব দিয়ে উঠে চলছে অগতি পৃথিবীর হোঁদাচ
বাঁচিয়ে। পরিবেশ, সমস্ত পরিবেশ, তার প্রত্যেক বহুধর,
বিকৃত রেখা আর কদুবিভ স্বর্গজিবা নিয়ে আঘাত করে
তার মনে,—এক অবাক বহুধর হুই হাতে চোখ ঢাকে সে।
হুই হাতের খোলা মুঠোর সে বহন স্বর্গকে স্পর্শ করেছিল,
তখন এ কোন্ পৃথিবী আঘাত করল তাকে! নিজের হুই
বিজলতাকে বিচার করতে চাইল সে, আঘাতপ্রায়ে
উত্তেজিত হ'ল। তার স্বর্গ-পিঙ্গাঙ্গুর তীব্রতাই নরক-
সচেতন করে তুলল তাকে; এক অপরিস্রব মিশ্র
অগ্রহুতির স্বপ্নে জর্জর হয়ে আত্মপ্রকাশের বায়ু হুঁজল সে।
সে অবেগন আজও শেখ হবনি।

“অক্টোপাসের মত নহর তার শুলো বাড়িয়েছে চাৰিধারে
—গাফল হুতিকা থেকে তবু নেব—সমস্ত শাপ ও শত্রু—
তাজা বাগুনের রক্ত ও প্রাণ—আম্বাও।

কিছু শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদের আলোয় এমিকটা বেন
অন্তরকম দেখায়। মনে হয় ও বেন রাজা নয়; ও বেন
অন্ত শ্রান্ত স্মৃতির কোনো অবলম্ব প্রাণের ব্যাকুল সব বাহ
অনিচ্ছিত স্বপ্নের দিকে প্রসারিত হয়ে আছে। হরত এও
তার আর একটা রূপ! যে জানে।

দিনের বেলায় ইজিনিয়ারের গজ কিতে বোলার,
কষ্ট-জিহের হিসেব আর ফ্লির পাঁচটি, আর রাতে
চতুর্দশীর চাঁদের আলোর তার গল্প আদ্যার এই কাহুতি।

হয়ত হুই-ই সত্য।”

—আশাশুভ

বাঁশা সাহিত্যে। যে পাশাবনলের সুগে তারই পুরোধ।
রূপে প্রেমেন্দ্র মিত্র সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন যে এই উজ্জ্বল
আত্মপ্রকাশের সুগ। কেবল সৌন্দর্যবোধের কোঠের নিজের
দৃষ্টিকে বন্ধী করে রাখার প্রচেষ্টা নির্দেশকে অস্বীকার
করে, স্বল্পনশীল বিবেকের নির্দেশে কল্যাণসুখের কবি তখন
অণু প্রকৃতি নয়, সংসারের আত্মনাথ এসে পাঁড়িয়েছেন।
সেখানে স্বন্দর-অস্বন্দরের মধ্যে, শুভ-অশুভের সংঘাতে—অণু
নিজের স্বয়ং নয়, বিশ্বাসকেও নতুন করে গঠিয়ে নিতে
হয়েছে তাঁকে। যদি এই বেধে এসে পাঁড়ানোর মধ্যে
প্রাক্তনকে অস্বীকারের আবেগটা উদ্ভূত না হতোয় তবে
আত্মপ্রকাশ করে থাকে, যদি মনে হয়ে থাকে যে, এটো নতুন
বোধের মধ্যে সৌন্দর্যবোধকে অস্বীকার করার প্রেরণাটাই
প্রবল—তবে অণু শিল্পীর প্রতি নয়, শিল্পকীর অস্তিত্ববিহীন
নীতির প্রতিই অবিচার করা হয়। নবজাতকের মতো
প্রত্যেক নতুন জীবের আনির্ভাবও স্বয়ং তীক্ষ্ণতার স্বতন্ত্র :
আর সৌন্দর্যবোধের অভাব নয়, সমগ্র জীবনের
পরিপ্রেক্ষিতে স্বন্দরকে সত্য করে তোমার তাগিদে-ই
নবযুগের কবি অস্বন্দরের মুখোমুখি হয়েছেন। জীবনকে
হাজার কাহাবাব করে, আলাদা চিসেকোয়ার ঠাঁকুঘরের
মতো স্বন্দরকে একপাশে আলাদা করে রাখার প্রচেষ্টা বোঝ
কিতে পারেননি তিনি। প্রত্যেক মুহূর্তের মধ্যে সন্দরবাণ
মানবজীবনের দ্বারা স্বন্দরের অস্তিত্বকে অধঃপতন করে
প্রতিষ্ঠা করার সংকল্পেই, বার বার অণুটি আর অস্বন্দরের
শাফাৎ সংশ্লিষ্ট করে নিয়ে হয়েছিল, আর তাই অন্তর্ভুক্ত
স্বন্দরকে বহন তিনি সেরেছেন, চকল সন্ত-উদ্ধাসের অস্ত্র
লবণাক্ত পরিচয় বহন করে কোনো-এক স্থির বিন্দুতে বহন
তিনি কিংবে এসেছেন, কিংবে আসতে চেয়েছেন, তখন
তা প্রত্যাবর্তন হয়নি—তা হয়েছিল পরিণতি। তাঁর স্বন্দর,
অনন্তস্বর স্বন্দরকে থেকে, লোকালয়ের বিস্তৃতির মধ্যে সমগ্র
জীবন রূপ নিতে চলেছে।

এমনি আমার ভগবান
বার বার জন্ম লন মার হৃদে
মুগধির ধরণীর কোলে।
তারপরে চেয়ে দেখি—
কোথা মোর ভগবান ?

কীর্ষ গৃহ, আত্মর্জনা চারিদিকে
তার মাঝে আলোহীন বায়ুহীন কক্ষে,
ছিন্নশব্দ-গণের গুহে
দোহরকক্ষ কুমাখীর্ষি বহু লয়ে

শেষটা আমার
কেনে দীর্ঘবাস !

—বৈষ্ণব মন হৃদ : প্রথম

‘প্রথম’র জন্ম এটো হৃদীর বৈষ্ণববোধ থেকে। যে
‘দ্ব্যাকাল আলোক’ তত্ত্ব মন প্রাণ-এর জন্তে স্বদীক্ষনার
সকল স্বরস্বতী সবেও জীবনসেবতাকে অন্তরের নতি
জানিয়েছিলেন, সেটো বৃহৎ জীবনবোধের পরিচয় ‘প্রথম’র
অঙ্গুপরিচয় নয়। উপলব্ধির সেটো তত্ত্বস্বতাকে ভক্তির
পরিচিতি ছাশে উপলব্ধিত করেননি কবি, অণু শুভ
আবেগের আনির্ভাবতার উচ্চারণ করেছিলেন

সেধের বীণাতে ওঠে বংকারিষ। স্বরের প্রগতি
নমো নমো নমো।
নয় বাণী, নয় কতি, নহে প্রার্থনা,
গান নয়, নয় আরাধনা,
অণু সেহবীণ হতে ওঠে শিখার
নমো নমো নমো !

...

ক্ৰমা গুণে নাহি মিলে বিশ্বের মধ্যে না’ক সীমা
আনন্দের বটিকার কাশ প্রাণ শূন্যমান তারকার মত
বিরাটের তীরে তীরে জীবন কল্যাণি ওঠে—
নমো নমো নমো !

—নমো নমো : প্রথম

কিন্তু উপলব্ধির এটো গাঢ়তা সবেও অণু তার মধ্যে
নিজেকে বন্ধী করে রাখেননি বলেই কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্র
মিত্র এবং কাব্য হিসেবে ‘প্রথম’ কাব্যসার্কের অকৃত
সামুদ্র অর্জন করেছিল। জীবন-মহাশব্দের নৃত্যে, হাজার
ভাঙাভাঙার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন তিনি : নামতে
পারেননি, বাবেননি। কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট আত্মহারা হয়ে মনে
হয়েছিল ‘আকাশের আলো বত কবি জয়, মিটিবে না কত
ডাট—আদি পয়ের ক’—তবু সেটো প্রানিবোধও স্বাধী
হয়নি, অধি-আপরে আকাশে বাতা নাম লিখে গেল,
পৃথিবীকে বাতা বিগল বলে জেনেছিল, অরণ্যপথ বাসের
অন্তরে গভীর গহন ও সমুদ্র অতল হয়েছিল, তাদের-ই
আমার সামুদ্রিক অধিবাসও উত্তীর্ণ হয়েছিল অবশেষে।
মহাশব্দের নামহীন হৃদে আহত আত্মর থেকে অনেক
ডাঙাটে বাড়ি আর পুরোনো কাশাকের ডীড়ে ছোটো ছোটো
জীবনসত্যের পরিচয় নিতে নিতে অবশেষে একটি দ্বার
উপলব্ধি সত্য হয়ে উঠল তাঁর কাব্যে :

স্বাপ্নেরা যে পথ দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ
 তৈরী করেছে বন ঘাট্টিয়ে ঘাট্টিয়ে
 শিকারের চেটার আর জলের অংকনে
 —নৃত্য তৃণের পথ !
 সে পথ হিংসার, সে পথ ক্ষুধার, সে পথ কামের ।
 মাহুত প্রথম তুত লতা-ওদ-তৃণের
 একটি অবিশ্রিত রেখা ছুটি করেছিল ।—কবে ?—কেন ?
 আমি বলি ক্রীতিতে ।

—দাসা : অমরা

সোনালী রোষের সুধা
 পান করে ধরতীর
 প্রসারিত নব্বু বগনা,
 —কোন দূত কবে : সম্রাট

তাই তিনি আদি মানবের কর্তব্য সম্বন্ধে মায়াবী
 জননে পেরেছেন :

হে-ইতি, হাইতি, হাই
 অরণ্য ডাকে ওই-বাই

কাপুক্ষ্য সিংহ ত মারতেই জানে শুধু
 আমরা যে মরতেও চাই ।

—শীলকর্ত : সম্রাট

'প্রবন্ধ'র নানা ভাবম্বন্ধনের পর এই ক্রীতির পথ
 প্রেমের বিরুদ্ধে 'সম্রাট'-এর নতুন জীবন-অন্তরঙ্গতার দিকে
 পরিচালিত করেছে—শেষপর্যন্ত হারানো পথ তাকে টেনেছে

কোরম্বানের নোনা মল্লর ওপর দিয়ে
 খোঁজানো থেকে বাদকশান
 পামিরের স্তম্ভাবপুষ্টি ডিঙিয়ে, ইয়ারকক থেকে খোটান—
 জাঙ্গ উঠের শায়ে শায়ে বেগানে উড়েছে মল্লর বালি
 ১৮শতীর পুরে লেগেছে বরফগলা কাদা ।

—পথ : সম্রাট

বাংলার কপিল-চোখে তাকিয়ে আরেক অরণ্যের কথা
 মনে হারেছে তাঁর, 'স্রোতোহীন চেতনার গাঢ় গুঁড় অতল
 সপিন্দে,—অনেক প্রাচীরে ঘেরা—অনেক মুখেরে কোঁড়া'
 আর-এক ইটের অরণ্য, 'যে অরণ্যে নবনৃত্য ঘোরা
 স্ক্রিয়াজি' বলে স্রোতের অস্ত্র নেই তাঁর। এই বিক্ষোভ
 করনে 'আমরা বুড়ে বাটনি' বলে হুশিয়ার হয়ে উঠেছে,
 করনে দুম্ব আত্মবিকারের আবেগে প্রিয়ার প্রতি অনুরোধের
 রূপ নিয়েছে :

চাঁদে বেঙ নাকো সেখানে আকাশ অনেক বড়
 শীতানাহীন !
 তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা—অশন সব
 হবে বিগীন ।

—রাস বেঙ নাকো : সম্রাট

তবু সেই বিক্ষোভের মূলে রয়েছে এক গভীর মানবতা-
 বোধ, যে বোধের সঙ্গে জীবন সামরিকতাবাদ বশেই কবি
 বিমুগ্ধ । সমস্ত অশান্ত উৎসবের অভ্যাসে তাই তাঁর

মনে পড়ে, মনে পড়ে
 কোথায় অরণ্য ছিল
 সুনিশান গহন গভীর

আবার এই সম্রাট মধ্যপ্রাচ্যে বঙ্গগর্ভ মেঘের আবির্ভাব
 লক্ষ্য করেছিল আর তার পর জীবনের প্রেরণার হয়েছিল
 কোয়ারী কোঁড়া । বঙ্গোপসাগর থেকে টেঁহাই পর্যন্ত জল-
 অঞ্চল, নীচুমাটির জমিতে ঘুরে ঘুরে সন্ধান করেছিল বোধের
 নিকোকেই । কিন্তু তবু যে আশ্রিত কবিত্ববোধ 'প্রবন্ধ'র
 প্রথম পর্যায়েই বিস্তৃত জীবনবোধে বার বার আশ্র-উত্তরণ
 করে গিয়েছিল জনগণের বৈচিত্র্যে—সে বৈশিষ্ট্য কোয়ারী
 দ্বাকটে চাইল না, ফিরে এল 'আপন গহন সত্য' ধোঁকবার
 প্রেরণায় । তাই নেকা গেল 'সাগর থেকে কোরা' কবি হিসেবে
 প্রেমের মিথের সিরন্তন পরিমিতবোধ আরো স্বচ্ছ ও
 সজাগ হয়েছে, অথচ আত্মশক্তির একান্তও ধৌনবের মতো
 সূর্য্যহীন বাতায়ো অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে । 'কোনাকী মন'-এর
 যন্ত্রণারির তাঁর স্বচ্ছ চেতনার অসোচের নেই,—'এত ভিড়
 কিংবদন্তি স্মৃতি ভর অন্ধতা তাড়িত' তার অর্থ বহুবার
 সাধাতীত ব্রতে আত্মনিয়োগ করেননি তিনি, শুধু মনের
 সমস্ত জানালা বুলে, আকাশ-পৃথিবী-সমুদ্রের সমস্ত অস্তিত্ব
 ও আনন্দকে নিজের মনের গভীরে গ্রহণ করেছেন । আর
 সেই গভীর সাহুজ্যের আনন্দে খোঁজা করেছেন :

যিথোই
 মিল-বোঝা মন চায় উপমা ।
 নেই, নেই ।

জলর হুতোষ হয়ে, শুধু গেয়ে ওঠে,
 সেই ! সেই !

—দায়র থেকে কোরা : দা. বে. কে.

আর এই নতুন আত্ম-আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীরও
 নতুন সিংহাসন বুলে দিয়েছে তাঁর মনোদোষে । 'কোনাকী'
 নগরের পথে পথে বসে লেগে ও চতুর্থ সপ্তক' ফেলে 'সাগর-
 পাদিনের একান্ত আপন', 'এখনো নির্জন' কোনো ঝীশের

অনুভবের ক্ষয়কে সহ্যও করেছেন। পৌঁছতে চেয়েছেন সেই দিগ্ভ্রমে, যা পেলোই আমবা হারাই :—

এ এক পাহাড়-বেয়া বহু ভ্রম, সরল নিশাপাণ,
মেঘ আর বাবরের হাঁসেলের ছায়া শুধু জানে ;
খান তায় নজোনীল। চেয়ে চেয়ে সারা নিশিদিন
স্বপ্নের বুজায় থেকে পাখ তার আগনার বানে।

—ভ্রম : মায়র থেকে ফেরা

সাগর থেকে ফেরার শেষ সারে ঐতিহ্যের নব মূল্যায়নের একটা ইচ্ছিত প্রেমেন্দ্র মিত্র দিয়েছেন ('সমানন' ও 'ঈশান')। এই ধারা যদি তাঁর রচনার অঙ্গুর হই তবে আমাদের কাছে প্রাচীন বোধ ও নবীন ভাবের সংগমে আর এক দিক উদ্ঘাটিত হতে পারে বলে মনে করি। বস্তুতঃ যে পরিণতির আশ্বস তাঁর বর্তমান রচনা বহন করে, সেই পরিণতিই, ভাব ও বোধের এই বৃহত্তর সমন্বয়ের পথ-নির্দেশক।

'ছেলেটির চোখ মীল, কিন্তু আকাশের মধ্যে হইত নব।
ইটের ছাদের তলার বাস করে সে হইত আকাশের কথা
ভুলে গেছে। ভুলে গেছে অকূল সাগর আছে কোথাও
নসর থেকে বহু দূরে। শহরের পথঘাট সে জেনেছে,
জেনেছে সীমা, বন্ধন, পাসন। আর সব সে ভুলে গেছে।'

—মাসটিকাল

কবি যেখানে নিজের ভাবনা-বেদনাকে অতিক্রম করে পৃথিবীর মানুষের ভাবনা-বেদনাকে স্পর্শ করতে চান তখনই বোধের ঈতি-কবিতার সীমান্ত অতিক্রম করে ছোটগল্পের জগতে চলে আসেন। মানুষের যে-সব সুবহ্নন থেকে কবিতা জন্ম নেয়, তারাই গড়ে তোলে—গড়ে ভুলতে পারে

এক একটি ছোট গল্প, যারা আকাশে ছোট হইবেও অনুভূতির মধ্যে অপরিণীত হয়ে ওঠে।

তাই বর্তমান প্রবন্ধের বহুপদিসারে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র সাহিত্যিক সত্তার বিচার করা যদিও সম্ভব নয়, সংগতও নয়—তবু ছোটগল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের সার্থক পরিচয় না পেলে কবিও অপরিচয়ের অন্তরালে থেকে যান। 'পুতুল ও প্রতিমা'র সেই সুন্দর, গভীর, আশ্চর্য সূক্ষ্ম রচনা-গুলির মধ্যে অক্ষমতোপ জীবনের রেখায় রেখায় তির্যক কাহিনীগুলিতে মানবমনের কী অনবগুণ প্রকাশ-ই না; খটতে পেরেছে! 'পোনাঘাট পেহিছে' শিল্পীর 'তেলমাশোতা আধিকার' পর্যন্ত এবং তার পথেও এই অস্বদৃশি ঈশ্বরের নিষে পেড়ে মানব-মনের দুর্জয়ের সূত্রশালাকে। ছোট একই বোধের ক্ষমার মধ্যে উদ্ঘাটিত করেছে অপর্যায়াল জীবনের প্রান্ত। বস্তুতঃ তাঁর কবিসত্তা ছোটগল্পের মাধ্যমেও নিজের অস্বদৃশি আশ্বপ্রকাশ খুঁজেছে—যে প্রকাশ সাহিত্যের অস্ত্র কোনো ক্ষণের মধ্যে হইত সম্ভব হইত না।

যে-কোনো কবিকে তাঁর জীবিতকালে সম্মানিত করলে, সে-সম্মান শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সম্মান হই না, তার দ্বারা সমগ্র জাতির মানব-ই আপন প্রাপ্যধর্মকে অভিনন্দিত করে। জাতি যে জীবিত, তার রসচেতনা যে সজীব—কবিকে সম্মানের মাধ্যমে সেই সত্যই স্বপ্রকাশ হয়। এবং জাতীর রাষ্ট্রকেই বহু উত্তোষি হয়ে এই সম্মান গ্রহণ করতেন, তখন তাঁরা শুধু রসবিচারের দক্ষতা ছাড়াও আর-এক বৃহত্তর গুণের পরিচয় দিয়ে থাকেন—তাঁহা জাতীর মানবের সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবহার বাতাবিক আত্মীয়তা-বোধের পরিচয়। ভারত সরকার তাই প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সম্মানিত করে শুধু আমাদের ধর্মবাহিতাঙ্গন নয়, প্রীতিভাঙ্গন হয়েছেন বলে মনে করি।



বৃত্ত

ঐঅপূর্বমণি মন্ত

আটত্রিশশানা বিল-বইয়ের চৌটাল দিয়ে ফেললেন মহানন্দবাবু। তেঁকে হাজার শাতান টাকা আট আনা। মুখখানি বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠলো তাঁর। টাকা সংগ্রহ বেশ ভালোই হয়েছে বলতে হবে। মাত্র তিন সপ্তাহের চেষ্টায় এতখানি তিনি আশাই করতে পারেননি। এখনও বারোখানা বিল-বই দুইহুে খাইয়ে, গড়পড়তা এইরকম আদায়ের হিসাব করলে আরও প্রায় চার হাজার আসতে পারে। যেটে মতোয়া হাজার টাকা। মন্দ নয়। তবে পুরোপুরি বিল হাজার হলেই মহানন্দবাবু খুশি হতেন।

এইবার টাকাগুলো গুনে ফেলবার পালা। বিল-বইয়ের চৌটালের সঙ্গে আসল টাকার চৌটাল মিলিয়ে সেগুলো ব্যাঙ্ক পার্সোনেই নিশ্চিত হতে পারা যায়। দশটাকা, পাঁচটাকা, দুটাকা এবং একটাকার কুশাবার নোট। চুচু: টাকা এবং ডেজকিও কম নয়। চেকও রয়েছে কয়েকখানা। প্রত্যেক আদায়কারী তাঁর বিল-বইয়ের সঙ্গে একখান: লগা খামে আদায়-করা টাকা জমা দিয়েছেন। খানের উপরে দেখা বিল-বইয়ের নম্বর এবং টাকার পরিমাণ—তার তলার স্বাক্ষর এবং তারিখ। এসব ব্যাপারে নিরবের ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। এ টাকা মহানন্দবাবুর নিজের টাকা নয়। জনসাধারণের টাকা—হুতরাং এই অর্থের পাই-পরদায় হিসাব রাখতে হবে, নড়চড় হলে চলবে না। মহানন্দবাবু সে বিষয়ে নির্ভর।

'দুঃখবিজয় সমিতি'র খ্যাতি এ অঞ্চলে অনেকদিন থেকেই। সাতা ভারতবর্ষে এঁদের কর্মক্ষেত্র। দুছতম একটা হুর্ধটনা হলেও এঁদের সাহায্য-ভাগ্যের খাতা নিয়ে বেড়িয়ে পড়বে আদায়কারীরা চারিদিকে। মাদ্রাজে বেলে-হুর্ধটনা হলো, দুঃখবিজয় সমিতির সেবকরা হুটমেন সেখানে কয়েক বোকা বসল নিয়ে। সিদ্ধেশ্বর এখন ভারতবর্ষের হাইরে, কিন্তু সেখানেও সেবার বহন পরপালে গম খেয়ে সেল, এঁরা হিল্লিতে সাহায্য-ভাগ্যের তুলে তিনটে চারিটি-শো করে বাড়াই হাজার টাকা তুলে ফেললেন।

এবারে হয়েছে উজ্জিয়ার দ্রাবন। কাল্কেই দুঃখবিজয় সমিতি মিণ্টেট হয়ে বসে থাকতে পারেন না। তাঁদের তিন সপ্তাহের চেষ্টার ফলাফল এভাবেই কলা হয়েছে।

এই সমিতি স্থাপিত হওয়ার স্তর থেকেই মহানন্দবাবু প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি অ্যাণ্ড ট্রেনারার। বার্ষিক বিবরণী

আগে ছাপা হতো ইংরাজীতে, গত কয়েকবৎসর থেকে ছাপা হচ্ছে বাংলায়। আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী ভাষে মহানন্দবাবুর নামের তলার ইংরাজী সংজ্ঞা-হুটোর পরিবর্তে লেখা হয়েছে কর্মসচিব এবং কোষপাল। সেখানে জনসাধারণের অর্থ নিয়ে কাজ করতে হয় সেখানে পরদায় অশ্বব্যবহার করা চলে না। কাল্কেই বার্ষিক বিবরণী ছাপা হলেও, সেটা মূল্যবান। এক টাকা লাড়ে তিন আনা তার দাম। স্ট্যাম্প পাঠিয়ে মহানন্দবাবুর কাছে আবেদন করলেই পাওয়া যায়।

টাকা গুণতে গিয়ে মহানন্দবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বিল-বইয়ের চৌটালের সঙ্গে আনা টাকা টাকার চৌটাল মিললো না। পনেরো টাকা সাত আনা কম হয়ে গেল। কাল্কেই অনেকখানি পরিশ্রম ও সময় নষ্ট করে আবার বিল-বইয়ের চৌটাল দিতে হলো, টাকাগুলিও আবার ভালো করে গুণতে হলো। না, তুল হুনি তাঁর। পনেরো টাকা সাত আনা কমই বটে। এ কি ব্যাপার। বাগে এবং বিরক্তিতে তাঁর মনটা তিক্ত হয়ে উঠলো। অনেকখানি মূল্যবান সময়ের অশ্বব্যব হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সাধারণের অর্থের এরকম গরমিল হলে চলবে না। আবার গুণতে বসলেন মহানন্দবাবু। এবার প্রত্যেক বিল-বই এবং খামের চৌটাল আলাদা করে মিলিয়ে দেখতে লাগলেন।

হিসাবের অর্থ নাকি ব্যত্যেবও অতন্কা—হুতরাং অবশেষে ব্যাপারটার হিলস পাওয়া গেল আঠারো-নম্বর বিল-বই থেকে।

এই বিল-বইখানির কাউটার-কারেলের লিখিত টাকার বোগক্ষল হলো দুশো তিরসার টাকা বায়ো আনা, কিন্তু আঠারো-নম্বরের খামের টাকা গুনে দেখা গেল ভাড়ে রয়েছে দুশো আটত্রিশ টাকা পাঁচ আনা। গরমিল-হওয়া পনেরো টাকা সাত আনা-ই এই খামের ভিতর কম পাওয়া যাচ্ছে। হিসাব এবং তহবিলের অসামঞ্জস্য এইখানেই থা পাড়ে গেল।

কিন্তু কি আশ্চর্য। কি হলো এই টাকা? দেখা গেল আঠারো-নম্বরের খাতা সেওয়া হয়েছিল অনাদি সহবলকে। আদায় লব্ধে তার কৃত্তিহ যথেষ্ট। কিন্তু... তবে কি এই টাকার কোনও চেক অনাদি তুলে তার পকেটে রেখে দিয়েছে? কিন্তু চেক বলি লতাই কেউ দিয়ে থাকে

তাহলে পনেরো টাকা তার ঢেক বেগুয়া আসবাব নব, কিন্তু তবুও খুচরা সাত আনার মোলদালাটা প্রদোখাই থেকে থাকে।

মনের খটকা গেল না। চকল হয়ে উঠলেন মহানন্দাবাবু। হিসাব না ধিললে তার খতি নেই। যাহে, গুল হওয়ার সম্ভাবনাও কম। অথচ এগুন রাগি প্রার সাত্বে দশটার সময় বাগবাজারের কোন এক গলির মধ্যে অনাদি সরবেলকে খুঁজে বেব করাও তো সম্ভব নয়।

সকালে এলো অনাদি সরবেল। প্রুঃসমিষ্ণব সমিতির প্রতিষ্ঠার দিন থেকে এই সোকাটি এর সঙ্গে জড়িত। মাইনে হিসাবে কিছু পায়, তা ছাড়া আদারী টাকাবু উপর কিছু কমিশন। আদার করবার বখন কোনও উপলক্ষ থাকে না, তখন তাকে সমিতির আফিসে কেহানীর কাজ করতে হয়। কেবল মাইনের টাকাটাই তখন ডরসা।

মুখখানা খুব গম্ভীর করে মহানন্দাবাবু বললেন, “পনেরো টাকা সাত আনা কব হয়েছে ডোমার হিসাবে। এই গমমিল কব হলো? পার নিক-মনি তা জানো?”

কিন্তু অনাদিকে উত্তর দেখা গেল না। সে বললে, “আজ্ঞে, কাল জমা দেবার সময় তাকাতাড়িত্তে আপনাকে বলতে ভুল হবে গেছে। ও টাকার সব্বছে একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছে।”

কপালটা হুত্বে উঠলো মহানন্দাবাবু। ব্যাপার? বোল আনা আদার করলে বোল আনা গুনে জমা দেবে, এর মধ্যে আবার ব্যাপারের কি থাকতে পারে? ডিসিমিল সব্বছে তিনি সর্বদা মচেনতন এবং এসব ব্যাপারে আফিসের বড়কর্তা হিসাবে তিনি ইংরাজীতেই ডব্দনা এবং কথাবার্তা বলেন।

—“সোকাট ডু ইট মীন?”

ব্যাপারটা বলতে আরম্ভ করলে অনাদি সরবেল।

বেল-আফিসের বড়বাবু রায়সাহেব কীতিধরজ নজ্জবদারের দকে একদিন টেলিফোনে কথা হয়েছিল মহানন্দাবাবু। রায়সাহেব বলেছিলেন, “বেল তো, পাঠিয়ে দেবেন আপনার সোকাতে। এসব জমহিতকর কাজে যদি দ্রুতী পরসাদে দিতে পারি তাহলেও শূণ্যসকর।”

সুতরাং মহানন্দাবাবুর নির্দেশে বেলে হয়েছিল অনাদিকে। আফিসে গিয়ে শোনা গেল হঠাৎ-সর্মিষ্ণবের মতো হওয়ার রায়সাহেব অস্থগম্ভিত। তিন দিনের ক্যাকুয়েল টুটি চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। তার বাড়ি বাল পার হয়ে নারকেলডাঙার ওঠরিকে। অতএব সেই রিকেই অতিথান করতে হলো অনাদি সরবেলকে।

কেবল বেল-আফিস নয়, আরও কয়েক জায়গায় খুবে ক্রান্ত হয়ে পড়েছিল অনাদি। বাল থেকে নেমে মাঝনে একটা সোকানে ‘অত্মাৎমট গম্ভ চা’ মাইনখোর্ড দেখে চুকলো দেখানে।

ব্যাপারটার তরু স্টেখানে।

স্রাও-গেগি গারে লুদি-পরা দ্রুতি লোক সোকানের ডাটা বেকিটার বলে আলোচনা কবছিল। আলোচ্য বিবট্টা যদিও তখনও পথিকার হয়নি, তবে এটু বোকা গেল যে বাকে নিয়ে আলোচনা হক্কে, এদের হুজনের মধ্যে একজন তার সপকে আর একজন তার বিপকে।

—“ছি ছি, চোখের চামড়াও তো থাকে মাহুকের! নিরীহ ভহ্লোকসকট নেহাত বিপকে পড়েছে লেই তো!” বললে ওই চুকনের মধ্যে একজন।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি প্রতিবাদ করে উঠলো, “বাম ভুট, বাম। হানছতর তো আর খুলে বসেনি কেট মিসির—”

“ওই অবস্থার হুই বসি পড়তিস তাহলে দেখা যেতো কত ধানে কত চাল—” বললে প্রথম ব্যক্তি।

এইভাবেই তরু বেড়ে উঠতো, কিন্তু সোকানের ছোকরাটি তিন কাপ চা এনে তিনজনের মাঝনে ধরতেই আবহাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা হলো।

কিন্তু বেশিক্ষণের জন্ত নয়। খুব নিকটেই কতকগুলি উচ্চকর্তের চীংকার এবং সেই সঙ্গে কয়েকটা ছেসেমেয়ের কান্নার একটা মিশ্র আওয়াজে সবাই একটু সচকিত হয়ে উঠলো।

“মিলে বোম হয় গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে এইবার—” বললে সেই দ্বিতীয় বক্তা।

“কান্ধাবাঝা নিয়ে দাঁড়ায় কোবার ভহ্লোক এইবার!”

—উক্তর দিলে প্রথম।

“গাছতলার দাঁড়াক্কে। কিন্তু তাই বলে কেট মিসিরকে দোষ দিতে পারবোনা আমি। চল না, দেখি গিয়ে—” বলে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি উঠলো।

এক-নম্বর বললে, “ভুই-ই বা, আমায় চোখের চামড়া আছে—”

অনাদি সরবেল আর কৌতুহল চেপে রাখতে পারলে না। জিজ্ঞাসা করলে, “কি ব্যাপার, মশাই?”

ঘটনাটা শোনা গেল। রাজীব লাহিড়ী এনেছিলেন গতবৎসর টাকটাইলের কাছাকাছি কি একটা গ্রাম থেকে। সঙ্গে ছিল স্ত্রী, আঠারো বছরের মেয়ে শাকল, তার পর তিনটি ছেলে—বায়ো, নব এবং পাঁচ তাদের বৎস। হুঃদগ্ধা শেরালদহ স্টেশনের স্রাটকরমে কাটিয়ে, তদপর

কোথাকার উন্নয়ন শিবির, সেখানে থেকে উড়িষ্যার কি একটা গ্রাম, তারপরে সেখান থেকেও ফিরতিদূর আবার স্টেশনের ট্রাউন্সম—এবারে পেচালহাট নদ, হাওড়া। চ্যুটি প্রান্তির মধ্যে সেইখান থেকেই একটা বেন কমে। কোথাকারে এক মহিলা-শিল্পকাজে পাকলবে ত্রি কত বেগুনা হবে, থাক-পাওনা ছাড়াও হাতখরচ কেওনা হবে যাদে পচিন টাকা—এট কাহিনী একটি ব্যাক-পরা মহিলার কাছে শুনে রাজীর লাহিড়ী অকুল কুল শোলে। মহিলাটির সঙ্গে শিল্পকাজে ত্রি হওয়ার রক্ত পাকলবে পাঠিয়ে গিলেন। সে আজও ফেরেনি। শিল্পকাজের টিকানায় গিয়ে দেখা গিয়েছে সেখানে কয়েকটি দোকান ছাড়া আর কিছুই নেই।

এককম ঘটনা নুতনও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। এর চেয়েও অবস্থার কাহিনী এখনি সরথেরের জানা আছে। সাতভাই চম্পা আর বোন পাকলের মধ্যে অনেক পাকলের হলি আজ পর্বন্ত মেলেনি। কাজেই রাজীর লাহিড়ীর মেয়ের অন্তর্ধান-কাহিনী এখন আর চাকলোর দৃষ্টি করে না, বাস্তবী ঘটনার পর্ষায় এসে গিয়েছে।

ত্রিটু ছেলে এখা রক্তা রীথে নিয়ে আরও কত জাংগা ঘুরে অবশেষে রাজীর লাহিড়ী নারকেলজাতার এই অযাতি গলির বহির্ভে এসে কি উপায়ে আশ্রয় পেলেন, তার বিবরণ অবাস্তব।

শিখ উপজাতিগণা তো চাই। বেঁচে থাকতে গেলে পদসার প্রয়োজন এবং পদসার রক্তই উপাধন প্রয়োজন। কিন্তু পথ কোথায়?

পথের নির্দেশ গিলেন একজন। মুড়ি, চিড়ে, আদুর কুচি, চিনাবাশাম এইসব মিশিয়ে ভেজে নিয়ে সজ রোক্তার অবাণ-রুলপান-জাতীর বস্ত্র তৈরি করে যদি পাড়ার শিনেবা-হাউসের দোরের কাছে ঈড়ানো যায় তাহলে ইন্টারভালের সময় বেশ কিছু বিক্রি হওয়া অসম্ভব নয়।

গ্রীর হাতে একটা ঘেটী সোনার আংটি ছিল, সেটা বিক্রি করে কয়েকটা টাকা মূলধন সংগ্রহ করে রাজীর লাহিড়ী অসম্প্রদেব রোক্তা নিয়ে বেরলেন। বড় ছেলেরি বস্ত্র বারো, সেও একটা বলির ভেতর কয়েকটা রোক্তা নিয়ে ঈড়ানো বাস-স্ট্যাণ্ডের সামনে।

কিন্তু সেখানেও প্রতিযোগিতা। দেখা গেল আরও চার-পাঁচটি ছেলে ওইজাতীর রোক্তা নিয়ে অনেক আসে থেকেই বাস-স্ট্যাণ্ডের সামনে ঈড়িয়ে মোহনগার নিজের পণ্যের জ্বলান গায়। রাজীরেই ছেলেরি একদিন লাভ হলো এদের হাতে প্রহার, রোক্তাগুলো লুট হয়ে গেল। ছেলেরি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো।

এখনি কয়েই বিন চম্পিল। তাকে চলা বলে কিনা তা নিয়ে হুজুতে তর্ক উপস্থিত হতে পারে। এমন সময়ে কুক মিত্রের আবির্ভাব ঘটলো। টনি বাড়িওরালো। খোলার বস্তির ঘোলখানা ঘরের প্রত্যেকখানির পাঁচ টাকা হিসেবে তাক্তা আদার প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহেই হয়ে যায়, তার ব্যতিক্রম সজ করা তাঁর অভ্যাস নয়।

কিন্তু তিনমাসেরও বেশী বাকী হয়ে গিয়েছে রাজীর লাহিড়ীর। একসঙ্গে এতগুলি টাকা বেওয়া তাঁর পক্ষে কল্পনার অতীত, অথচ এতগুলি টাকা ছেড়ে বেওয়াও কুক মিত্রের কল্পনার বাইরে।

সুতরাং বেটা স্বাভাবিক সেইটাই হলো। প্রথমে তার দেখানো, তারপর গালাগালি, চোর জোক্তোর ধামাঝড় ইত্যাদি সন্ধান, শেষটা উঠিয়ে বেওয়ার ডর এবং সবশেষে বেটা কোকে পরিণত করা। সামান্ত কারণে আইন-আদালতের সাহায্য নেওয়া কুক মিত্রের অভ্যাস নয়। অশ্রমশ্রমের যদি বুকের পাটা থাকে তারা কুক মিত্রের নামে খানা-পুলিশ কলক, তবে তার পরিণাম সবচেয়ে বেন সতেজন থাকে।

পাড়ার হুমকি ওগাকে নিয়োজিত করেছেন কুক মিত্র, আজ এদের কিনিদপত কেলে দিবে ঘর থেকে বের করে বেওয়া হলে।

বেশ ভিড় জমেছে। খোলার বস্তির বাকী পনেছো-খানা ঘরের গ্রী-পুষ্ক, ছেলেরেই মিলে প্রায় শ'খানেক লোক জমায়েত হয়ে বেবেছে ঘটনাটা। খুব বে বুনী হয়েছে কেউ তা তাদের সুখের ভাব লেখে মনে হয় না। তারাও অল্পবিস্তের লোক, অভাবের সংসার তাদের এবং তারাও কুক মিত্রের ভাড়ার। তাদেরও একদিন এককম হওয়া বিচির নয়।

কিন্তু দানছত্র হুলে বসেননি কেউ মিত্রি। চায়ের দোকানের সেই লোকটার কথা খাটি সত্য।

গোটা কতক ঈড়ি, চোঁড়া বাঁধানা এবং আখডাঙা বিকর একটা টাক, ডোদা উজ্জ্বল, সোহার কড়া, এমুনিমিঘরের কয়েকটা তৈজস—সজ উঠানটায় গড়াগড়ি বাচ্ছে। বিজ্ঞানের মতো ঈড়িয়ে আছেন বে প্রৌঢ় ব্যক্তিত্ব, তিনিই রাজীর লাহিড়ী। একখানা চোঁড়া কাপড়ে বাবার ঘোষটা ঘোবার ঘূর্ণ উজ্জবে একশাশে কয়েকটি শিশুর হাত ধরে ঈড়িয়ে বে নারীমতি, তিনিই রাজীরেই গ্রী।

সমস্ত দুশটা বেখে কেমন বেন খবকে ঈড়ানো অনাথি সরথেল। তার নিজের অবস্থাও বে ভালো তা নয়। বাগবাঝারের বে গলির মধ্যে তার বাসা সেটা ঠিক

খোলায় বসি না হলেও রাজপ্রাসাদ নয়। একথানা তেতলা বাড়িতে আর নচিৎসর চাড়াটে। নিচের তলায় একথানা ঘর এবং তারই পাশে গোয়ালের একাংশে ঘোড়া—তারই কল্ল তারে প্রতিরাসে ভাড়া দিতে হয় আঠারো টাকা। হুঃখবিজয় সমিতির আদায়ের উপর কমিশন—পেটা নেহাত খারাপ নয়, কিন্তু মাসের পর মাস আদায় হওয়া সম্ভব নয়। তখন মহানন্দবাবুর আকিসের কেরানীর কাজ—বংশামাত্র খাটেন। রাজীব লাহিড়ীর সঙ্গে ওকাত বতই? চিনেবামাম আর চিড়েভাঙা ও মুচি মিশিয়ে যে বরটা গ্রহণ কর—তা থেকে খরচ বাব দিয়ে কি লাভ থাকে তা অবশ্য অনাধির জানা নেই, তবে সে অকটা যে বেই নয় সেটা বোঝা যায়। সংসারের সব-কিছুর মধ্যেই তাঁর লাহিড়ির ছাপ। পাঁচটাকা ঘরভাড়া বাকী রেখে কেউ মিসিরের গুণ্ডার হাতে এবং এতগুলি লোকের সামনে লালিত হওয়া—নিতান্ত নিরুপায় না হলে কেউ স্বপ্ন করে না।

চলক হয়ে উঠলো অনাধি সরবেলের অন্তর। হুঃখবিজয় সমিতির হুপা ডিম্বার টাকা ব্যায়ে আনা আত্ম তারই হাত দিয়ে আদায় হয়েছে। আঠারো-নব্বয়ের বিল-বইখানা এবং টাকাকল্যাণ সবই হয়েছে তার কামার পকেটে। উড়িয়ার প্রাবল হয়েছে, সেখানে পাঠানো হয়ে এই টাকা। সেখানকার যে-সব নরনারী শিশু বুড় হয়েছে সর্বনাশের সন্ধানী, তাদেরই হিতকামনায় হুঃখবিজয় সমিতি সংগ্রহ করেছে এই টাকা।

দুই সাধু উদ্বেগত সঙ্কেহ নাট। কিন্তু হুঃখবিজয় সমিতির সঙ্গে স্বচ্ছ সাম্প্রতিক নয়। সে জানে, এসব টাকার ব্যবহার কোথায় এবং কিভাবে হয়। অর্ধেক অসব্যব্যবহার সম্বন্ধে বহু আবেদন এসেছে সমিতিতে, কেরানীর কাজ করবার সময় তার প্রত্যেকটি ডান্ডো করে পড়ে দেখেছে অনাধি। একবার অফিসেও সারা একটা গ্রাম গুড়ে ছাই হয়ে গেল। পাঁচশো কোড়া নূতন মুতি পাঠানো হয়েছিল সেখানে হুঃখবিজয় সমিতি থেকে, কিন্তু দুই লোকেরা হঠাৎ দিলে একথানা মুতিও নাকি বিতরণ করা হয়নি, খানকরের পুরানো ডোঁড়া কাপড় দিয়েছিলেন গ্রামের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। এবং এই গুহুটনার কিছুদিন পরেই যে ‘স্বলন্ত বস্ত্র-ভাণ্ডার’ স্থাপিত হয়েছিল সেই গ্রামে, তার দোড়াপতন নাকি হয় হুঃখবিজয় সমিতির পাঠানো পাঁচশো কোড়া মুতি নিয়েই।

এখন কত কাহিনীই তো শোনা যায়। গরীবের কল যে কল বিতরণ করা হয়েছিল, সেই কলগুলিই যে কি যাদুযন্ত্রসে সেখানকার লোকদের আলমবারিতে এসে

উঠলো, এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। অনাধির তা অজানা নয়।

কিন্তু চোপের সামনে এই যে একটা অসহায় পরিবার পুতুছারা হতে গেলছে, ঐ ও কয়েকটি ছোট ছেলে নিয়ে থাকে বাবার ঠাড়াতে হংস পরমুহর্তে, তাকে যদি আগাততঃ এই টাকা থেকে সাহায্য করা যায়—তাহলে অশচয় হবেনা সেটা নিশ্চয়। উড়িয়ার প্রাবলে মিশর একজন অজানা লোকের পরিবর্তে যদি প্রত্যেকভাবে আর একজন অভাবগ্রস্তের হুঃখের সাধন হয়—তাতে কতি কি?

কেউ মিসির হিসাব করে বললেন যে, পনেরো টাকা সাত আনা তাঁর পাওনা। পকেট থেকে একটা ছোট বলি বের করে কনে দিলে সে-টাকা অনাধি সরবেল।

আলপাবের সংস্কার প্রবলমান দৃষ্টিতে তার চিত্ত ঢেবে গেলো। রাজীব লাহিড়ী তো হতভম্ব। কিন্তু পরমুহর্তেই আর অনাধিকে দেখানো দেখা গেল না। সে তখন গদি পেগিয়ে বড় বাজার এসে পড়েছে।

কিন্তু এসব আলমবারি গল্পে মহানন্দবাবুকে ভোলানো যায় না। ধামাঝাকাকে তিনি চেমন, এবং ক্ষমা করেন না। সাধারণের অর্থ নিয়ে এরকম বেহিসাদী কাজকে গ্রন্থর বেওয়া তাঁর নিজম্বর বাইরে। উড়িয়ার কল যে টাকা আদায় হয়েছে সে-টাকা নারসেখাডাচার গলির বহির্বাসীর কল বয়চ করা যেতে পারে না। পাবলিকের কাছে ওকে কৈকিয়ত দিতে হবে। কি বলবেন তিনি?

তিনদিন সময় দিলেন অনাধি সরবেলকে। এই তিনদিনের মধ্যে পনেরো টাকা সাত আনা এনে ব্যাপ মিলিয়ে দিতে পাঠা—ভাশোটে, নইলে এম্বেলমেন্টে চাক দিয়ে পুলিশে ধবংস দিতে তিনি বাধ্য হবেন।

কিন্তু ততদূর করবার দরকার হলো না। আদায়-করা টাকার সমিতির প্রচলিত হিসাবে কমিসন পেতো অনাধি সরবেল। অল্প কয়েক মহানন্দবাবু দেখলেন কমিসনটা বাদ দিলে ব্যার কয়েক আনা পাওনা হং অনাধির কাছে।

অকটা তাকে বৃথিরে দিয়ে, তরুনীটা জুঁ করে বললেন, “সেট আউট—”

অনাধি সরবেলের চাকরি গেল।

হুঃখের মধ্যেও তার হাসি এলো। আত্ম সে এবং রাজীব লাহিড়ী একই পর্যায়ের। রাজীবের তবু অস্বাক-জলপানের পথটা খোলা আছে, কিন্তু অনাধির তাও নেই।

রাজার কল থেকে অনাধি চকক করে জল পান করতে দেখে গেল।—

ভারতীয় পুতুল ঐক্যিত মুখোপাধ্যায়

সেই প্রাচীনকাল থেকে ভারতের গ্রামের ঘেরেরা যে-সব পুতুল তৈরি করে আসছে তার আবেগন বর্তমান যুগও কিছুমাত্র কমে যায়নি। এগুলির মধ্যে শাস্ত্রতত্ত্বের এমন একটা ছাপ আছে, যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে যার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। এইসব পুতুল দরবারের চাঁচের বদলে হাতেই গড়া হয়ে থাকে। অন্যদিকাল থেকে যার ব্যবহার চলে আসছে সেই মাটি দিয়ে হাতের সাহায্যে ছোটো ছোটো কাণের মতো টিপি তৈরি করা হয়। তারপর চাঁচের চাপে সেগুলি থেকে রূপ নেয় বিভিন্ন মূর্তি। এই মূর্তিগুলি শুধু কাঠের মতো, কোনোরকম নিখুঁত রূপ প্রাপ্ত থাকে না। মূখ, হাত, পা প্রকৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আভাস মাত্র দেওয়া এই মূর্তিগুলির মধ্যে যুগ-যুগান্তরের ঐতিহ্য যেন রূপ পরিগ্রহ করে।



শোভামাটির পুতুল

মাটির তৈরী এইসব পুতুলের মধ্যে যা ও ছেলে এবং কুমারীকল্পের প্রাধান্যই দেখতে পাওয়া যায়। এগুলির মাথার চোখেরা হয় অনেকটা বলসারী মতো এবং কখনো কখনো কণিক বা পাখার মতো ছোটো চুড়া থাকে মাথার উপরে। চোখ, হয় লাগানো থাকে, না হয় হুঁপে অথবা একে বেঙেরা হয়। মুখের কোনো চিহ্নই থাকেনা কতক-গুলিতে, আবার কতকগুলিতে মুখের আদল মাত্র থাকে। পুতুলগুলি যাতে তারামাঝ বজার রাখতে পারে তার অভ্যন্তর থেকে নীচে পর্যন্ত সাধারণত ঢট্টার আকার হয়। আরেক ধরনের পুতুলের পেটের কাছে নাভির মতো গর্ত থাকে এবং সামনের তিকের অংশ শোশাক-পরিচ্ছদের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলির শিউনের দিক হয় কাটা আর তার ফলে পা দেখতে পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে, শোভামাটির তৈরী এই পুতুলগুলি আগে ছিল নর। পরবর্তী কালে ক্রমে ক্রমে শিশুদের খেলার পুতুলে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে যৌনভাবোৎসাহ কোনোরকম ডিক এগুলির মধ্যে নেই।

শাস্ত্রতত্ত্বের এই মাটির পুতুলগুলি, মাছুর কিংবা অঙ্কনোপায়ের মূর্তি, ঠিক কি উদ্দেশ্যে তৈরি তা আগে থেকে ঠিক করা থাকে না। এগুলির ব্যবহার ও বিভিন্ন অমুঠানের সঙ্গে যোগাযোগের মধ্যে দিয়েই তা স্থির হয়। কোনো ঘটনাছের নীচে যদি ঘোড়া বা কুংারের মূর্তি দেখা যায় তাহলে সেগুলি বিশেষ কারণে উৎসর্গ বলে ধরে নিতে হবে, কিন্তু কোনো শিশুর কাছে সেগুলি খেলার সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়। সামাজিক আচার-অমুঠানে বয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুরা নিজের নিজের পুষ্টিভঙ্গী নিয়ে যোগ দেয় এবং তার মধ্যে দিয়েই ধারাবাহিক ঐতিহ্যের সামগ্রিক রূপটি কুটে ওঠে। সামাজিক আচার-অমুঠান ও খেলাধুলা, এর মধ্যে যে সম্পর্ক তা অতি ঘনিষ্ঠ। গ্রামের কোনো মহিলা পারিবারিক দেবতা মষ্টি-ঐক্যমানীর মূর্তি গড়তে গড়তে আশপাশে জড়ো হওয়া ছেলেমেয়েদের বহির ব্রতবধা গল্পব্বলে বলতে থাকেন। ফলে ছেলেমেয়েরা ঐ মূর্তিটি যখন খেলার সামগ্রী হিসেবে পায় তখন ঐ ব্রত-কাহিনী তাদের মনের মধ্যে পাক্যপাকিভাবে বাসা বাঁধে। ঐ পুতুলটি তখন তাদের কাছে বিশেষ একটি ঘটনা, যা তারা ভালো করেই জানে, তারই প্রতীক হয়ে

ওঠে এবং তাদের মনের গোপন আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। এইভাবে মাটির তৈরী পুতুলের মধ্যে অক-জানোবারের মূর্তিগুলি মেলো-লো, হরহা প্রকৃতি মূলের ঐতিহ্য এবং বর্তমান যুগের সাম্প্র এই দুইয়ের সম্মিলন ঘটায়।

পোড়া মাটির পুতুলগুলি যোগে তৈরী কিংবা আগুনে পুড়িয়ে তৈরী করা হয়। আগুনে পোড়ানোর সময় মাটির মধ্যে সাধারণিক প্রতিক্রিয়া ঘটায় ফলে মূর্তিগুলিতে কখনও ও লাল রঙের বিভিন্ন বর্ণান্তর ঘটে। সাধারণত ৮০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপই পোড়া মাটির পুতুল-তৈরির পক্ষে প্রশস্ত। এই উত্তাপের তারতম্য ঘটলে মাটির রঙ পাটকিলে বা কালো হয়ে যায়। সম্পূর্ণ কালো রঙে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে মাটির পুতুলগুলিকে একটি মাটির পাত্রে কুণ ঢাকা দিয়ে তাতে কার্যকরতার আগুনে পোড়ানো হয় কিংবা ঘোঁরা সাহায্যে বর্ণান্তর ঘটানো হয়। পোড়া মাটির মূর্তিকাররা যখন প্রাকৃতিক বর্ণ ছাড়া অন্য কোনো বর্ণবৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটতে চায় তখন মাটি থেকে তৈরী অল্প কোনো রঙের মোটা টান দিয়ে কুটির তৈরী করে অপরূপ হয়। পুতুল-তৈরির কাজ এককভাবে হয় না। বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে থেকে মাটি সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে জল মেশানো, কাঁকর বাসি পরিষ্কার করা, নমন মাটির তাল বানানো, যোগে কিংবা আগুনে পোড়ানো এবং রঙ চড়াও—এই সব কাজই হয় সমবেত প্রচেষ্টায়। এই সমবায়মূলক প্রচেষ্টায় যা ও মেয়েরা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে। কুমোরদের বাড়িতে একটি ছোটো চাকি আলাদা করে রাখা হয় মেয়েদের জন্যে। তারা ঐ চাকিতে তৈরী করে পুতুল আর খেলনা।

হাতে তৈরী আর ঝাচে তৈরী পোড়া মাটির কারুকার্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্যীয়। হাতে তৈরী একই ধরনের খেলনার মধ্যে মিল থাকলেও, প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র। অপর-দিকে ঝাচে তৈরী পুতুলের মধ্যে আকিকের ত্রফাত থাকলেও, যে-কোনো একরকমের খেলনা একাধিক সংখ্যার যখন মূলি বানানো সম্ভব। অনেক সময় পোড়া মাটির মূর্তির সাধারণ অংশ ঝাচে এবং বাকী অংশ হাতের সাহায্যে চাকিতে তৈরী করা হয়। মূল ঝাচটি হাতে তৈরী হয় এবং কুমোরদের বাড়িতে পুতুলসমূহকে সংরক্ষিত থাকে। ঝাচে তৈরী পোড়া মাটির প্রত্যেক বস্তু বিভিন্ন রকমের হয়। তা ছাড়া এদের ব্যবহারও হয় বয়স্কদের কাছে। এগুলির মধ্যে কোনো বিশেষ এলাকার এবং সাময়িক পরিবর্তনের ছাপ পাতলা যায়। আধুনিক চিত্রের মধ্য



পোড়া মাটির পুতুল

দিয়ে পুরনো পদ্ধতির বিবর্তনের ফলে এগুলির বিশিষ্টতা যায় বেড়ে।

ঝাচে কোলা থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত পোড়া-মাটির প্রত্যেকটি বিশেষ শিল্পকর্মের ঐতিহ্য লক্ষ্যীয় আছে। এর সম্পূর্ণ রূপটি শিল্পীর মনে সব সময়ই জাগরক এবং সেই রূপটি জুড়ায় নিরন্তরতার নব, বয়ঃ সমাজ-ব্যবস্থার জীবন্ত রূপের প্রতিফলন। বিভিন্ন রঙের ব্যবহারিক জ্ঞান ও মূর্তিভঙ্গীর বিচিত্রতার মধ্যে দিয়ে প্রতিটি শিল্পী এই ধারাবাহিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে। বর্ণ-রূপময় মূর্তিগুলিকে লক্ষ্য করে তোলে। রঙের ব্যবহারের মধ্যেই ঝাচে তৈরী ও ঝাচে তৈরী পোড়া মাটির প্রত্যেক পার্থক্য ফুটে ওঠে। এই বহুবিচিত্র বর্ণ-রূপময় শিল্পকর্মের সামনে এক অপরূপ রূপকথার রাজ্য সৃষ্টি করে—যেখানে হাতের রঙ হয় সবুজ, ঘোড়া হয় নীল রঙের এবং গোষ্ঠের রঙে দেখা যায় লাল, নীল, হলুদ, সবুজের সমাবেশ। বহুদিনের অভ্যাসের ফলে কোনো শিল্পীর জুলির টানে গভীরমস্তিষ্কতার চেয়েও



কোথার পুতুল

সংস্কৃত, পুতুলগুলি গ্রামের পল্লীস্থলার স্বতন্ত্রতা ধারণে না।

বেশনা বা পুতুল তৈরির কাজে মাটি চাড়া অল্পাধিক বেশব্রহ্মিণি ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে কাঠি ছোলা প্রভৃতি। এ ছাড়া সোণা, কাগজের মণ্ড, গোবর, রোজ,

সাদু লক্ষ্য করা যায়।

বাংলার কারুশিল্প

বাংলার কারুশিল্প চারুকলায় অগুরুত্ব বিদ্যমান। ব্যারসকত দর ব'লে তার তদন্ত ও হঠা উচিত ঘর ঘর। এসব জীবন শুধু যে সংগ্রহশালায় পৌঁছবে যদি করে তা বর, বৃহৎ (মৌজ্ব ও সকলের আবক্ষ বর্ণাব ও এর কুলবা বেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

সাদু লক্ষ্য করা যায়। গ্রামের পল্লীস্থলার স্বতন্ত্রতা ধারণে না।

হুগ-পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্য যে তার গতি হারিয়ে কেনে, তার কারণ হলো গ্রামীণ সংস্কৃতিতে ভিত্তি করেই সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং শিল্পী ও কর্মীরা তাদের মনে এই ঐতিহ্যকে পড়েছে সত্য। গ্রামের কৃষকের বসবাসের জন্মে ভূমি দেওয়ার বেতন ছিল এবং গ্রামবাসীরা তার উপর-প্রভাবের জন্মে নিতো ফল। এর বিনিময়ে কৃষকের কাছ থেকে গ্রামবাসীরা তৈজসপত্র আর পুতুল ও বেশনা পাওয়া যেতো। এইভাবে মালিকের ও গ্রাম-জীবনের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে পরিগণিত হতো। এই পদ্ধতির মধ্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল, যা না থাকলে কারুশিল্পীদের পক্ষে তাদের শিল্প-কর্মের মধ্যে দিয়ে ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হতো না। এবং এই সঙ্কট ব্যবস্থা থাকার ফলে কারুশিল্পীরা নিশ্চিন্তমনে তাদের চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে দৃষ্টি করতে পেরেছিলেন শিল্পকর্মের। এমন কি, নিজস্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নতুন আদিকের দৃষ্টি করতে পারতো। কারুশিল্পীরা নতুন আদিকের দৃষ্টি করলে কিংবা পুরনো

পদ্ধতির নতুন রূপায়ণ ঘটালেও, মূল গঠনবীতি কিছু অক্ষর থাকতো। কামন যৌথ পরিবার থেকে শুরু করে গ্রামা পক্ষান্তে পর্যন্ত এমন সোচ্ছলিত সমাজ-ব্যবস্থা ছিল, যার মধ্যে বৈচিত্র্য কিছু করা সম্ভব ছিল না।

ধারাবাহিক ঐতিহ্য বজায় রাখার পক্ষে শৌখানিক কাহিনী বা উপকথা প্রয়োজনীয়তা অনুবীকার্য, কারণ এগুলি থেকে গ্রামা কলেশিতরা নতুন নতুন গল্পের উপাধান লাভ করতো। কেন্দ্রীয় উপজাতি অনুবিগম্য জায়গার এখনো বাস করে, তাদের তৈরী পুতুল বা বেলনা এইসব কাহিনী বা উপকথারই বাস্তবিক রূপান্তর। এগুলির মধ্যে শিল্পকর্ম ও বাস্তবিক্যের পারস্পরিক সম্পর্ক অবিলম্বে। গ্রামের কুমার উপকথা বা কাহিনীর সাহায্য না নিয়েই বাস্তব সৃষ্টি গুরুত্ব পাবে, কিন্তু উপজাতির গড়া বাস্তব সঙ্গে কোনো-না-কোনো পূর্বাকাহিনী বা স্বতন্ত্রের যোগাযোগ থাকবেই। ফলে, জ্ঞানের গড়া বাস্তব সৃষ্টি প্রায় উপকথার বন্ধন মতোই রক্তবদর।

বিভিন্ন এলাকার ছড়িয়ে থাকা আদিবাসী মোকিদা কেন্দ্র শিল্পকর্ম তৈরি করে তার গঠনবীতি ও আঙ্গিকের মধ্যে কথ-বৈধি মিল দেখতে পাওয়া যায়। তাদের গুপ্ত আচার-অনুষ্ঠানের পুরোপুরি অর্থ এখনো জানা যায়নি, যদিও এইসব

আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাত্ত্বিক বীজবস্ত্রের সচেতন পাওয়া যায় এবং তাদের তৈরী বাস্তব সৃষ্টিগুলি এইসব গুপ্ত বীতি-নীতির প্রতীক-চিহ্ন। এগুলির প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করতে পারলে ভারতীয় সৃষ্টিশিল্প সংস্কৃতি গবেষণার পথ অনেক প্রশস্ত হবে।

শিল্পোৎপত্তি এবং অর্থনৈতিক রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, ফলে গ্রামা কলেশিতরা সামাজিক শোকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সামাজিক নিষাদরা ও শূন্যতা পদ্ধতির কিছু কিছু বীতি-নীতিও তাদের হারচাড়া হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও আঙ্গকের মিলে তাদের শিল্পকর্মের আবেশন কিছুমাত্র কমেনি।

ভারতে তৈরী পুতুল এবং বেলনার ধারাবাহিক ঐতিহ্যস পর্যালোচনা করলে আমাদের সাংস্কৃতিক বীতি ও উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক রূপবিবর্তনের রূপ পরিষ্কৃত হবে। প্রকৃতপক্ষে এইসব পুতুল একদিক দিগে ভারতীয় জন-সাধারণের জীবনেন্টিহাস। *

* উল্লিখিত মূল্যায়নটি শিবির ইংগোরা একদমঃ চায়াবল



শ্রী বঙ্গবন্ধু ডেকরেটর

২২০-চিপুরঞ্জন এন্টিনিউ • কলিকাতা - ৬

নতুন ইয়ারোপ: নতুন মানুষ

মনোজ বসু

[দ্বিতীয় অংশ]

ভিক্টোর উপর আনন্দের খবরসারির ভার। আকাশের দাচিৎ-বিভাগের অক্সিস-সেক্রেটারি অথবা ঐ গোচর কিছু। কলেজ ছেড়ে সন্ত বেরিয়েছে। বয়সে ছেলেমানুষ—ইংরেজিটাও দৃষ্টিতে খুঁজিয়ে বলে। কিন্তু বড় ভাল ছেলে—



আলান-হু গোদা উপ ও লেখক

নিম্পাণ সরল হাসি দেখে মন ভরে যায়। আর একজন, লীবার্গ, সরকারের সংস্কৃতি-বস্তুর লোক —বেটেখাটো চেহারা, মাথায় চকচকে টাক। চমৎকার ইংরেজি জানে, বিস্তর দেশ ঘুরেছে, বিশ্ব-জোড়া বন্ধুবান্ধব। এবারের ক্ষেপে আমরাও তার পরম বন্ধু হয়ে এলাম। অস্টেলিয়ায় ছিল অনেক দিন, অসা-বাওয়ার পথে ভারতের মাটির উপর বয়ে শহরের হোটেল লীবার্গ একদিন থেকে গিয়েছে—

—বলো কি হে, পুরোপুরি চকিশ ঘটা? তবে তো ভারত সংক্ষেপে বিশেষজ্ঞ তুমি—বই লিখে ফেল নি? আমি লোকটা, এই দেখছ, যা দেখি শুনি টুকে নিই। ক'টা দিন মাত্র তোমাদের সঙ্গে রয়েছি—তাই নিয়ে কী ভীষণ বই লিখব দেখে নিও। আস্ত এক থান-ইট—কি ওজনে কিবা আয়তনে।

এক প্রাণো গল্প মনে এলো। কম দেখে এসে বেশি লেখার ব্যাপার—এই আমরাই মতন। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মাসিক কাগজে ভ্রমণকাহিনী ঠাণলেন—'ইউরোপে তিনমাস'। বছর ধরে বেক্ষেপে, লেখা শেষ হবার লক্ষণ নেই। সমাজপতি 'সাহিত্য' কাগজে রসিকতা করলেন : সর্বাধিকারী মহাশয় কি গল্পের গাড়িতে ইউরোপ প রি ত্র ম গ করিয়াছিলেন? আমাদেরও সেই গতিক—গেনে লহমার

মধ্যে বেশ-দেখাভয় পাড়ি দিই, লেখা চলে গরুর গাড়ির চালে।

বায়ে কথা থাক। বোমো উশে, ঐমতী উশে, লীবার্গ, ডিক্টে ওরা এই চার জন—এবং আমরা পাঁচটি, একুনে নবরত বসলান এক টেবিল ঘিরে।—ডেকডুকে খরচা করে নিয়ে এলে মাত সমুহ ও মস্তর পাহাড়ের ওপার থেকে—কিরিস্তি দিয়ে দাঁও, কি খাটনি খাটাবে এবারে? ক'ল বক্ততা শোনাবে, এবং আমাদেরই বা ক'লগায় বলাবে?

জবাব একেবারে গলজল। ঘান দিয়ে অর ছাড়ল মশায়। ছক-বাহা প্রোগ্রাম কিছু নেই—খাও দাঁও বেড়াও—চেনাছানা হোক আমাদের সঙ্গে, সেইটেই আসল। ছোটখাট ছ-চারটে বৈঠক করা যাবে, অবরে-সবরে বলবে ছ-এক কথা। তার ক্ষেত্রে ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

জপুরের খানাপিনা হোটেলের নয়। আমরা পাঁচ আর ওরা তিন (লীবার্গ সরে পড়েছে) ছোটো গাড়ি বোঝাই হয়ে চলেছি। চলেছি, চলেছি। কালোবরণ প্রাচীন গির্জার সারি—ভাঙাচুরো প্রকাণ্ড গোলটুপি মাথায়, সর্বাত্মক ক্ষতমুখে লোহালকড়ের কঙ্কাল বেরুনো—গাড়িরে রয়েছে পথের ধারে ধারে। দিনজপুরেও শিউরে উঠি। দেখতে পাচ্ছি যেন ক'কে ক'কে আকাশের আগুন আর কানে শুনেছি ধরিত্রীর আর্তনাদ। সর্বদেশে মাহুখ—হিংস্র মাহুখে. এমন বালিন শহর খুবলে খুবলে বেয়েছে। এই ভেরো-চোন্দ বহর পরেও দেখে আনুন একবার গিয়ে।

অ্যাক্টরস ক্লাবে নামলাম। অভিনয়-শিল্পীরা বানিয়েছেন, কিন্তু আড্ডাটা সর্বশ্রেণীর গুণী-জ্ঞানীদের। আড্ডা দেয়, খানাপিনা করে। উপরে নিচে গুটিছয়েক ঘর, স্বকম্বক শুকতক করছে। দেয়ালে দেয়ালে গুণীদের স্কেচ-ছবি—উচুদরের শিল্প-কর্ম। মিড়ি দিয়ে উঠছি—হুই ধারে ছবি টাঙানো, বডেক নামকরা অভিনয়-শিল্পীর নানা চরিত্র কোটো-গ্রাফ। একটি মেয়ে পোভাশ্বিনী হয়ে আমাদের

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে—সে এসে খাওয়ার টেবিলে সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করল। সোমবার থেকে কাজে লাগবে, মাসে ছুটা দিন—আর কোন দল এদেশে, তাদের সঙ্গে ঘুরছে এখন। মেয়েটির



বালিন শহরের কেন্দ্রে আলকলোভার হোটার

নাম—Jisl Fleischhacker—ইংরেজিতে মিচ্ছি, উচ্চারণ কতক দিকি কেমন! ক্লাউ দ্বিসছ্যাকার—বলতে গিয়ে আমারই তো পাঁচ বসে পড়ল একটা। নড়া-দাঁত ছিল অবশ্য। কিন্তু কাঁচা-দাঁতের উপরেও এমন উচ্চারণের ভর সয় কি না। সয়, সেই মনেয়ে নামের শেষাংশ বাতিল করে লিঙ্গেল বলে ডাকতাম তাকে। ক্লাউ নয়, ঐমতী নয়, শুধুমাত্র লিঙ্গেল।

নিচে নেমে ওভারকোটে আবার দেহ ঢোকান্ছি, আনন্দ একটা করে নেটি গুঁজে দিলেন সকলের পকেটে। ভোজন-সঙ্গীণা—পকাশ মার্ক। রাস্তায় বেরিয়ে এটা-সেটা খরচ আছে—কোথায় এখন পাউণ্ড ভাঙানোর ধান্দায় ঘুরবেন?—আকাদেমি থেকে বংসামাস্ত্র এই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চোখ ঢুলুঢুলু হয়তো আমার—বোমো উশে বললেন, ক্লাউ আপনি, হোটেলের পৌছে দিয়ে আসি। পড়ে পড়ে ঘুম দিন গে।

আপনারা ?

আমরা ঘুরব এদিক-সেদিক। এবার একটু দোকানেও যেতে চাচ্ছন ঠিক। সন্ধ্যার মুখে আপনাকে তুলে আনব। একটা ডকুমেন্টারি ছবি দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে শুধু আপনাদের ক'জনের জন্য।

আনি কি তাই শুনি ? পকেটে মার্ক—লোকানে ঠিক যেতে পারেন, আমারই বা আটকায় কিসে ? সরকারি দোকান। সমস্ত বেলে—টাই থেকে টেলিভিসন। কোন্টা চাই ? রাশিয়ায় যেমন গুম, গভনের বিবিধ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। একতলা দোতলা তেতলায় ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হয়ে যায়। একমাত্র উমা রাও সওয়া করে ফেলেছেন গুঁর প্রসাধনের বিবিধ বস্তু। আমার পুরুষরা দর দেখে দেখে মিচাই হয়রান হই।

স্ট্যালিন-আলির মত আর এক রাজ্য নিশেছে—মোড়ের উপর বানিকটা ঝাঁক জায়গা। চারিদিকে ঘরবাড়ি—এমন চমকমট পাড়ায় মোড়ের জায়গা ঝাঁক থাকার কথা নয়। অট্টালিকা ছিল, বোমার গুঁহায় নিপাত গেছে। রাবিশ সরিয়ে সাদা, হলুদ, বেগুনী, নীল, ধন কালো নানান রকমের ফুল ফুটিয়ে আলো করছে দেখুন কেমন। প্যানসি ফুল—কতকটা আমাদের তুঁইচাঁপা ধরনের। আর একরকমের ফুল—বাংলায় মানে করলে ঠাড়াবে সং-না। কেন এই আদ্রব নান, কে বলবে ? ফুলবাগানে কবিখানা। বাগানের এদিকে সেদিকে চেয়ার-টেবিল পাতা। হালকা টেবিল, হালকা চেয়ার—রুটিবাদামার বা রাস্ত্রিবেলা যাতে সরিয়ে নেওয়া চলে। নক্সা-ঝাঁক কাপড়ের বড় বড় ছাতা প্রতি টেবিলের ধারে—কালীর গঙ্গার ঘাটে যে আয়তনের ছাতা দেখতে পান। এখন বন্ধ আছে, চড়া রৌদ্র কিংবা রুটির সময় খুলে দেয়। একপ্রান্তে মিউ থর ভিন-চারটে—অফিস এবং রান্নাঘর। মিটি বাজনা আসে গুদিক থেকে। আমার বাজিনা অফিস-ঘরের দিকে, একজন এসে করমাস জেনে

নিল। খাওয়ার শেষে দামও মিটিয়ে নিয়ে গেল এই মাঠ থেকে।

বইয়ের দোকানে তারপর। এটা সরকারি প্রকাশনালয়। এ ছাড়া ব্যক্তিগত বইয়ের ব্যবসাও আছে অনেক—তারি তারি মানভানা প্রকাশকেরা আছেন। প্রকাণ্ড বাড়ি—একতলা-দোতলায় হল-বারান্দায় নিলে দশ-বারেটা। কত ছবি, থাকে থাকে কত রকমের বই সাজানো ! বানিকটা আবার মিউজিয়ামের মতো, পুরানো পাণ্ডুলিপি একটা ঘরে। চেয়ার রয়েছে, আরামের সোফা রয়েছে ঘরে ঘরে—বই কিনতেই হবে, এমন কথা নেই—বসে যান কোন একখানে, এ-বই সে-বইয়ের পাতা উল্টান। পড়ুন বসে একঘণ্টা দু-ঘণ্টা—কেউ কিছু বলতে যাবে না।

ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখাতে নিয়ে গেল এক বাড়ি। সরকারি ভারতীয় ফিল্ম রাখে এখানে—সিগারেট খাওয়া কড়া ভাবে মানা করে দিয়েছে। ঘরে ঘরে নোটিশ টাঙানো। মাঝারি সাইজের একটি ঘর, গুটিনশেক চেয়ার, দেয়ালে ছোট পাথরের সাদা পর্দা—কলকাতা লাইট-হাউসে মিনিয়চার ফিল্ম দেখানোর ঘর আছে, এ ঘরের আয়তন তারও চেয়ে ছোট। যিনি ছবি দেখাচ্ছেন, উশেক বলে গেলেন মাঝের সিটে বোতানের কাছে বসতে। ঐ বস্তুটা একটু-আধটু ঘুরিয়ে আওয়ালের কম-বেশি করতে হয়।

যা যা ঘটেছে, হুবহু সেই ছবি—ঘটনার সমস্ত তুলে নেওয়া। কল্পনা মেশানো নেই কোথাও, ছবির একটুকরো করমাস-মাসিক বানানো নয়। গোড়ার দিকটা অতি-পুরানো আমলের—মুখর ছবি তো নয়ই, এমন কি সিনেমা-ছবিরও চলন হয়নি তখন। কোটোগ্রাফ ছিল, সেই সমস্ত জুড়ে গাঁথে দিয়েছে। জায়গা কম, কলোনি চাই, বিশ্ববিজয় করতে হবে—জিগির তুলেছে জর্মনরা। মতলব হাসিলের অতি-পুরানো মানচিত্র। মানচিত্রে ভারতবর্ষ দেখছি ; ভারত ছাড়িয়ে উদ্দাম জিপ্সিখা

চলে গেছে আরও পূর্ব অঞ্চলে। শূণ্যপনে তারই সর্বগ্রাসী করাল আত্মোজ্জ্বল।

প্রথম-মহামুন্ডের দুমিকায় কাইজার উইলহেল্ম-মিনের দাপ্তিক ভাবণ। রেকর্ডে তোলা ছিল, সেপুল্‌য়েডে বসিয়ে নিয়েছে। প্রথম-মহামুন্ডের বিস্তার ফোটো—তখনকার কামান বন্দুক বোমা সাবমেরিন জেপলিন—জীবন নিয়ে ছিনিবিনির নানা দৃশ্য। হেরে গিয়ে নাকে-খত দিল জর্মনি। দেশের চৌহদ্দি বাড়াবার জন্য লড়াই; হেরে গিয়ে ছোট দেশ সর্বাধিকার হল। মরল যত মানুষ, তাদের একরকর বাঁচোয়া; বেঁচে থেকে কঙ্কালসার হয়ে তিলে তিলে বরছে সেই ছবিগুলো বড় বেশি ভয়ানক।

কাইজার বাতিল হয়ে গণতন্ত্র গড়ে উঠল। হিগেনবার্গ প্রেসিডেন্ট। সাধারণ মানুষের ভরসা হয়েছে—সড়াই আর কখনো নয়, শান্তির দিন এবার থেকে। দ্বি-চিহ্ন থেকে চলন্ত সিনেমা-ছবিতে এসে গেছে ইতিমধ্যে; নিঃশব্দ ছবি থেকে মুখর ছবিতে ফ্রান্স।

হিটলারের জন্মস্থান—রাইখ ভোট দিয়ে হিটলারকে সর্বময় প্রভু বানাল, শুধুনাও একটা ভোট বিরুদ্ধে। জর্মনি ক্ষেপে গিয়েছে আবার, শক্তিমদে মাতাল। জার্মা চাই, কলোনি গড়ব দুনিয়ায়। হিগেনবার্গকে সরিয়ে হিটলার তারপরে একাই চ্যান্সেলার ও প্রেসিডেন্ট। শিল্পপতিরা একজোট হয়েছে হিটলারের পিছনে, ফ্যাক্টরির যাবতীয় কাজ-কর্ম বামিয়ে ভারে ভারে শূন্য বানাচ্ছে। ইতালি ও জাপানের সঙ্গে মিতালি। নর-রাকসেরা হানা দিয়ে পড়েছে সকল অঞ্চলে। পোল্যান্ড পুড়ল, ফ্রান্স-ইতালিও পুড়ল, রাশিয়া হারবার হল পুড়ে গিয়ে। কনসেন্ট্রেশন-ক্যাম্প—একটা-দুটো নয়, গুণজিতে তিন-শ। যাকে শত্রু ভাবে, তাকে এনে পুরছে ক্যাম্পের ভিতরে—বাঘ-সিংহ তো রীতিমতো দয়ালু মানুষের তুলনায়। শেষ মুখে আগুন ঘুরে এসে পড়ল নিজেদের উপর। যত অভ্যাচারের

শোধ নিচ্ছে জরী পক্ষ। বোমা মেরে মেরে বাল্লিনের রক্তা-ব্যবস্থা বানচাল করে দিয়েছে। শহর চুরমার হয়ে মাড়ি-মাড়ি করে অসছে। গোটা জর্মনি জ্বলছে। মরা মানুষের হিসাব লাখে আর কুলায় না। জ্বাত ঘরেই নিরস্ত, পথের ককির। বিধ্বস্ত নগরীর পথে গর্জন তুলে দলে দলে রাশিয়ার ট্যাঙ্ক এসে পড়ল। ভিন্ন দিক দিয়ে অস্ত্রেরাও এলো এর পরে। গোটা জর্মনিশে লুটের মাল এখন—তাত্তাত্তি যে যতদূর দখল করে নিতে পারে।

ছবিতে দেখাচ্ছে রাশিয়ার সদয় ব্যবহার। জরী হলো অনেক ক্ষতি হয়েছে—তা সত্ত্বেও রাশিয়া ভারে ভারে খাদ্য-বস্ত্র পাঠাচ্ছে জর্মনিতে। হয়তো বা বলবেন, পূর্ব-জর্মনি ছবিতে খোশামুদ্রি করেছে রাশিয়াকে। যেমন বোকেন হলু গে—ডুক্সেমটারি ছবিতে যেমন যেমন দেখেছি, আমি লিখে গেলাম।

রাত হয়েছে। হেঁটেই যাইনা কেন গল্প করতে করতে। মেটরে ঘুরলে দেখা হয় না, হেঁটে হেঁটে শহর দেখতে দেখতে যাই। কচিং-কদাচিং দুটো-চারটে মেয়ে-পুরুষ চলাচল করছে। একজনের কোটের হাতা অবশ্য দুটোই, একটা হাতা চলল করছে চলার সঙ্গে—একটা হাত লোকটার। এক খোড়া যাচ্ছে ওদিকে কাঠের পা ঠকঠকিয়ে। বাল্লিনের পথে হাটতে হাটতে নজরটা ছড়িয়ে রাখলে এমন অনেক দেখবেন। লড়াইয়ে খুবলে খেয়েছে। চলার ধরনটাও নেবুন। জ্যাঙ্গ মানুষ নয় যেন—রাত্রিবেলা ভাঙাচোরা গলিঘুঁজি থেকে মড়ারা বেরিয়ে এসেছে।

গা ছমছম করে। পা চালিয়ে চলুন। দুটে গিয়ে হোটেলের ঘরে উঠে তো বাঁচি! সভ্যতায় না বাথলে দৌড়ানোও যেত।

কিন্তু হোটেলের এসেই বা রেহাই কোথা? এখানে রাজকস্তা। বাইরের চেয়ে বেশি আতঙ্ক তাকে নিয়ে। সেই সেড় প্রহর বেলায় উপরে এসেই নজরে পড়েছে। হাজার লোকের ভিড়েও নজর

পড়ত, আর তখন তো একলা সে করিডর দিয়ে যাচ্ছে। আসল রাজকক্সা চোখে দেখিনি—তবে চেহারা লাভ্যা ও বয়সের দিক দিয়ে রাজকক্সার যে ছবি মনে রয়েছে, মেয়েটা অবিকল তাই। হীরা-মুকতার অলঙ্কার কি, নিতান্তই স্ফাড়া হাত, স্ফাড়া গলা। অতএব ধরে নিয়েছি—কোনো এক অতি-আধুনিক রাজকক্সা এই বনেদি প্রাচীন হোটেলে এসে উঠেছেন।

কলপরে দেখি, সেই মেয়েটা বৃকের উপর থেকে পা অবধি সাদা কাপড় কুণিয়ে লম্বা বৃকশ দিয়ে করিডরের ধূলা সাক করছে। হাওয়ার হাওয়া, হোটেলের মেইড। রাজপ্রাসাদে থাকে নানায়, চাকরানী সেই রূপদী মেয়ে। হঠাৎ একসঙ্গে আমার ঘরে ঢুকল। খোপছুরন্ত চাদর পেতে বিদ্রোহিত করছে, কথল পাট করছে। ইংরেজি একবর্ষ বোধে না। একটা-কিছু বললে ঘাড় খঁকাবে, বুড়ো আঙুল নাড়বে। পনেরো মিনিট ধরে বলছি, গোসলখানা কোথায় দেখিয়ে দাও, আকারে ইঙ্গিতে হরেক চেষ্টা করছি—হা করে চেয়ে থাকে। নিজেই তখন খুঁজে-পেতে বের করি। অবস্থা এই, অথচ যখন তখন সেই মেয়ে অলাপ ভ্রমতে ঘরে আসবে। ফড়ফড় করে ভরনে বলে যায় একগাল কথা। কি করে জানিনে, একটা কথা ধরে ফেসলাম : কতদূর থেকে এসেছে? ভাবব : ইণ্ডিয়া। আর রক্ষে নেই, কথায় তুফান বয়ে চলল এর পরে। আনি কি করব—হাসি-হাসি মুখ করে বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকি। কহ-বা নো-নো ইয়েস-ইয়েস—ডাইনে-বায় উপরে-নিচে ঘাড় নাড়ি আন্দাজমতো। যেন বাংলা কাগজের সম্পাদকীয়—হাঁ-না, লোকে বেটা ইচ্ছে বুকে নিতে পারে। কিন্তু জর্মনির ফুলস্ট্রী মেইড সদাশয় বাঙালী পাঠকের মতো যা-হোক বুকে চুপ করে বাবার পাত্র নয়। কথায় হলো না তো, মুখে মুখে উৎকট শব্দ করছে—কু-বু-বু-বু-বু। এবং হু-হাত জুড়ে হু-হাতের আঙুল পাখির পাখনার মতো মেলে ধরে যেন চেটে দিয়ে সামনে ঠেলে

দিচ্ছে। ভাগ্যবশে আর-এক মেইড এসে পড়ায় রক্ষে পেলার। সে কিছু ইংরেজি জানে। জানতে চাইছে, কিসে আমরা এসেছি—এরোপেনে? হাতের ইসারায় মুখের আঙুলে এরোপেনে ওড়া দেখাচ্ছে।

মুখ জান করে মাথার উপরে একটা আঙুল ঠুকে বলছে, মাথা খারাপ বুঝতে পারছেন না? নয় তো, এমন করবে কেন?

মন খারাপ হয়ে যায়, এমন মেয়ের এই দশা! আরও গল্প শুনলাম তার পরে। ভালোষবের মেয়ে—প্রায় রাজকক্সাই। দশ-বারো বছর বয়স তার, সেই সময়টা হঠাৎ একদিন ঘর-বাড়ি ভেঙে-চুরে খোয়া-রাবিশের গাদা, সেই গাদার নিচে বাপ-মা ভাই-বোনের জীবন্ত কবর, এবং কেমন করে পাশে ছিটকে পড়েছিল কাটা-মাথা চেতনাহীন মেয়েটা। তাকেও মড়া ভেবেছিল, কিন্তু তাহর করে ধুকপুকানি একই পাওয়া গেল পাচরের নিচে। প্রাণে বাঁচল বটে শেষ অবধি, কাটা-মাথার নাগও ঘন চুলে লেকে গেল—কিন্তু মাথা আর ভালো হল না। কি-গিরি ছাড়া ছনিয়ার আর কোন কাচে আসবেনা এমন ফুলস্ট্রী মেয়ে।

জর্মনি দুই বৎসর হয়েছে—পূর্ব আর পশ্চিম। যেমন পূর্ব-বাংলা আর পশ্চিম-বাংলা। পুরানো রাজধানী বার্লিনও দুটো—পূর্ব-বার্লিন, পশ্চিম-বার্লিন। আমাদের কলকতা শহরটা কিন্তু খুব বেঁচে গিয়েছে—কি বলেন?

শনিবার। পুরো দিন এবং পুরো রাত্রি কাটল বার্লিনে। অতএব বার্লিন সম্পর্কে লাত্যেক হয়ে গেছি বলা যায়। তত্পরি কালকের পকাশ মার্ক পকেটে—বলতেই হবে বড়লোক। কারও তোয়াকা রাখিনে অতএব—সকালবেলা নিম্নেরাই বেরিয়ে পড়ছি এ-বার্লিনে ও-বার্লিনে। সকাল মানে এগারোটো—ব্রেকফাস্ট মেরে গড়িমসি করছি, হাবিব তানবির দেবি করে আসছে।

দিল্লীর ছোলে হাবিব—এঁদের কেউ নয়—নাট্টকে মাগুথ, অল্পকাল উদ্‌ কবিজা লেখারও অভ্যাস আছে। ভারত সরকারের রুচি নিয়ে ইংলণ্ডে গিয়েছিল নাটক-থিয়েটার-অপেরা সম্পর্কে শিক্ষা-নবিলি করবার জন্য। সেখানে পনেরো বাস কাটিয়েছে। এখানে খবরের কাগজে লিখে কিছু কিছু পায়, তাইতে চলে একরকম। ইয়োরোপের নানান ভ্রমারে ঘুরে থিয়েটারের যাবতীয় ঘাঁতখোঁত দেখেবুঝে নিচ্ছে। কাগজে আমাদের আসার খবর জেনে কাল রাতে হোটেল এসেছিল এক তরুণী অভিনেত্রীকে সজ্জিনী করে। খানাপিনা সেরে অনেক রাতে চলে গেল। পুরো ছয়মাস বালিনে আছে, পথঘাট সমস্ত জানা। হাবিবকে মুকুতি ধরে পশ্চিম-বালিনের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। বাসাও তার ঐ দিকে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া ও যাবতীয় কাজকর্ম পূর্ব এলাকায়। আধলা পয়সা খরচ করবে না পশ্চিম-বালিনে। পেরে উঠলে সবাই এমনি ব্যবস্থা করত। কী বিদ্যুটে ব্যাপার শুধুমাত্র তবে—কতবড় সর্বনাশের মুখে পড়ে পশ্চিম-বালিনে সামাল হয়ে চলতে হয়।

কলকাতা শহরটা ধরুন দু-ভাগ করে দিয়েছে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট-কলেজ স্ট্রীট-ওয়েলিংটন স্ট্রীট-ওয়েলসলি স্ট্রীট বরাবর। রাস্তার পূর্বের এলাকা অর্থাৎ পূর্ব-কলকাতা পশ্চিমবঙ্গে; এবং পশ্চিম-এলাকা অর্থাৎ পশ্চিম-কলকাতা ঢুকিয়ে দিয়েছে বিহারপ্রদেশের ভিতর। অবিকল এমনিধারা ঘটেছে বালিন শহর নিয়ে। হয়তো ভেবে বসে আছেন, পশ্চিম-বালিন থেকেই একনাগাড় পশ্চিম-জার্মানি চলল। (বিচ্ছিন্ন আমার পাঠকেরা, তাঁরা এমন-ধারা ভাবতে যাবেন কেন? কিন্তু লক্ষ্য করলে বলতে, আমার নিজের কিন্তু ঐ গোছের একটা ধারণা ছিল।) পশ্চিম-বালিন পশ্চিম-জার্মানির রাষ্ট্রভুক্ত বটে, কিন্তু শহরটুকু ছাড়িয়েই আবার পূর্ব-জার্মানির এলাকা। (ঠিক যেমন, পশ্চিম-কলকাতা বিহারে ঢুকিয়ে দিলেও হাওড়া থেকে

অনেকদূর অবধি পুনশ্চ পশ্চিমবঙ্গ।) চতুর্দিকেই পূর্ব-জার্মানি, মাঝখানে শুধুমাত্র পশ্চিম-বালিন জায়গাটুকু পশ্চিম-বালিনের অধিকারে। যেমন বৃটিশ-ভারতের মধ্যে চন্দননগর জায়গাটুকুতে ছিল ফরাসীর অধিকার। একটানা আসল পশ্চিম-জার্মানি—অনেক, অনেক পশ্চিমে—শান্তিনেত্র নাইল অন্তত। আন্তর্জাতিক রাস্তা আছে, এবং রেল-লাইন। পশ্চিম-জার্মানি যেতে ভারতের লোকের ভিসা লাগে না। অতএব ঢুকে পড়লেন আপনি পশ্চিম-জার্মানিতে। তারপর মেনে হোক, ট্রেনে হোক, মোটর গাড়িতে হোক—ঐ আন্তর্জাতিক পথ ধরে পূর্ব-জার্মানির এলাকা হুঁড়ে এসে পৌছলেন বালিনে। পূর্ব-বালিন থেকে পশ্চিম-বালিনে যাতায়াতের বাধা নেই, পাসপোর্ট-ভিসা লাগে না। যেমন চন্দননগর—মোট ফরাসী এলাকা হলেও আমরা অবধি যেতে পারতাম। যাতায়াতে বাধা দেওয়া সম্ভবও নয়। বালিনের কেউ কোনদিন কি যন্ত্রে ভেবেছে, এক শহর দু-টুকরো হয়ে দুটো আলাদা রাষ্ট্রে চলে যাবে? তাই দেখবেন, কোন রাস্তার এ-দুটপাত হয়তো পূর্ব-বালিন, ঐ দুটপাত পশ্চিম। আপনার বাড়িটা পূর্ব-বালিনে; বাড়ির কানোতে পশ্চিম-বালিন। এমন কি, একই বাড়ির দুটো ঘর পূর্ব-বালিনে, পাঁচটি হয়তো পশ্চিমে। ঠেকাবেন তবে কেমন করে? তবে দেখুন, অতিবড় শত্রু হলেও ড্যাং-ড্যাং করে আমি পূর্ব-বালিনে ঢুকে তাদের বৃকের উপর চেপে বসব, কতৃপক্ষ ঠেকাতে পারবে না। জেনে-বুঝেও কিছু করবার চো নেই, শুধুমাত্র সতর্ক নজর রাখা ছাড়া। কিন্তু যদি আন্তর্জাতিক রাস্তা থেকে এক পা নানি, কিংবা যদি বালিন শহর থেকে বেরিয়ে পড়তে চাই, ক্যাক করে দুটি টিপে ধরবে : ভিসা বের করো এবার যাহুন্ননি, কোটোগ্রাফ মিলিয়ে দেখি। শতেক বায়নাকাতা তখন।

জার্মানির টাকা হল মার্ক। তা-ও নিয়ে গোলনাল। সেটাই বিষম মারাত্মক। এখন হয়ে পাড়িয়েছে দু-রকমের মার্ক—পূর্ব-মার্ক ও পশ্চিম-মার্ক।

আইনের চোখে হ'মার্কেরই সমান দাম। যেমন আমাদের ভারতের টাকা আর পাকিস্তানের টাকা। আপনি বিদেশি মানুষ, একটা পাউণ্ড ধরুন মার্ক ভাঙাবেন। পূর্ব-জর্মনিতে ভাঙলে বারো মার্ক দেবে, পশ্চিমেও বারো। কিন্তু পশ্চিম-জর্মনিতে (পশ্চিম-বালিনেও এর ভিতর) ভাঙানো পশ্চিম-মার্ক ফের যদি পূর্ব-মার্ক করে নিতে চান, প্রতি পশ্চিম-মার্কের বরলে অন্তত চার পূর্ব-মার্ক দেবে। আইন যেমনই হোক, লেনদেন প্রায় প্রকাশ্য ভাবেই চলে। অতএব পূর্ব-বালিনে পাউণ্ড না ভাঙিয়ে পশ্চিম-বালিনে ভাঙানোই সুবিধা—বারোয় চারগুণ আরট্রিশ পূর্ব-মার্ক পেয়ে যাবেন। ওদের যারা শত্রু, তারাই এই লাভের পথ খুঁজবে; পূর্ব-জর্মনির বাসিন্দা কেউ করবে না। শত্রুরা ওদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটাবার জন্য গাঁটের টাকা গচ্ছা দিয়ে এই কাণ্ড হটাচ্ছে—বলতে বলতে আগুন হয়ে ওঠে তারা। কতবড় সর্বনেশে ব্যাপার, ভাবুন। পশ্চিম-জর্মনির লোক যদি পূর্ব-বালিনে এসে (অবাধেই তারা আসতে পারে) কেনাকাটা করে, তাদের প্রতিযোগিতায় এরা হাঁড়াবে কেমন করে? চারগুণ মার্ক তাদের হাতে—হুড়হুড় করে সমস্ত জিনিসপত্র কিনে ফেলবে। একবার হয়েছিল তাই—সেই থেকে অতি সতর্ক। কোটো-অঁটা নিশানোর কার্ড পূর্ব-জর্মনির প্রতি মানুষকে রাখতে হয়। ঐ কার্ড যাদের আছে, দোকানদার শুধুমাত্র তাদেরই মাল বেচবে। পশ্চিম-জর্মনিতে যাতে মাল পাচার হয়ে না যায়। তাই কি কোটো-অঁটা যায় বলে আনা? ভিড়ের মধ্যে দোকানদারের কার্ড দেখতে হয়তো মনে থাকল না। বিবন অপরাধ সেটা—প্রায় স্বদেশপ্রোহিতা। ইচ্ছে করে করবার লোকও যে নেই এমন নয়—বনে রাখবেন, এটা সভ্যবৃণ নয়—এ-জর্মনির ভাই-বান্ধার ও-জর্মনিতে—ভাবা-সাহিত্য, জ্ঞাত-জ্ঞাত, আত্মীয়তা-কুঁথিতে কোন দিক দিয়ে ভিলেক ফারাক নেই—মালপত্র যদি কিছু দিই পাচার করে অপর-জর্মনির আত্মীয়ের কাছে।

ধরতে পারলে খোলমাল—কিন্তু ঐ তো গুনলেন, হুই বালিনের কত জারগায় শুধু হয়তো একটুকু পাঁচিলের ব্যবধান। শিলান ছুঁড়ে পাঁচিল পার করে—কী করতে পারেন, করুন।

তালো তালো স্কেন্ড-খামার পড়েছে পূর্ব-জর্মনির তাগে; পশ্চিম-জর্মনিতে রুড় ইত্যাদি উৎকৃষ্ট খনিজ অকল। পশ্চিম তর্রাটে অতএব ভারী ভারী শিল গড়ে তোলবার সুবিধা, পূর্বের তর্রাটে চাষবাস। পূর্ব-বালিনে অস্ত্র সব বস্ত্র নিয়ে কড়াকড়ি—কিন্তু পশ্চিম-বালিনের কেউ এসে উত্তম উত্তম মালে সস্তার জঠর ভর্তি করে যায়, তাতে এদের আপত্তি নেই। আসলে একই গোস্তির মানুষ তো! পাটোয়ারি ব্যক্তি অনেকেরই তাই পূর্ব-বালিনে খানাপিনা। হাবিবও মহাজন-পন্থা ধরেছে।

হোটেল থেকে কয়েক পা গিয়েই রেলিং-ঘেরা একটু গর্তমতো জারগা—পাতালের সিঁড়ি নেমে গেছে। নেমে যান পাতালপুরী। টিউব-স্টেশন। বিজলী-ট্রেন পাতাল তোলপাড় করে মিনিটে মিনিটে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। উপর থেকে কিছু ট্রেস পাবেন না। চেপে বস। গেল একটায়। বসবারও ক্রসং হল না, নেমে পড়তে হল লহমার মধ্যে ছুটে। স্টেশন পার হয়ে গিয়ে। স্টেশন কত কাছাকাছি বে বাপু! অথবা বিষম জোরে চলে বলেই এমনিধারা ঠেকে। এস্কালাটর অর্থাৎ চলতি-সিঁড়িতে উঠে আবার উপরে। এবং এক ছুটে দিয়ে রোসে-কলমল ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে পড়লাম।

পাতাল থেকে বেরিয়ে এবারে স্বর্ণমুখো ধাওয়া। সিঁড়ি ভেঙে উঠছি উচুতে—আরও উচুতে। একতলা সমান উঠে উচুর ট্রেন ধরলাম। এরও উপরে আছে—আমাদের মাথার উপর দিয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে ট্রেন। সড়াক-সড়াক করে স্ত্রী এবং ঝাল পার হয়ে যাক্কা। হাবিব বললে, পশ্চিম-বালিনে এখন আমরা। নেমে পড়লাম।

স্টেশন থেকে কতলে নেমে হাঁটছি। খুব স্বকমকানি এদিকটার। দেদার মোটর। স্বকমকে

সোকানপাট। ঐশ্বর্য উপরে পড়ছে, একমজরে মালুম হয়। বোনা পড়েছে এনিকে সামান্যই। হিটলারের হাবতীয় দপ্তরখানা ছিল পূব অফলে। পূব দিক দিয়ে কক্ষরা কাঁপিয়ে পড়ল। পূবের তলাটি দলে-শিবে গুঁড়ো-গুঁড়ো। হবার মুখেই বালিনের পতন—পশ্চিম আরও ঢুকে লড়াই করবার আর তখন গরজ হইল না।

হাটছি তো হাটছি-ই। রোদ বেশ চড়া। রাত্তার ওপার থেকে এক ভয়লোক হস্তদ্বয় হয়ে এলেন। চেহারায় ও সাজপোশাকে বোল-আনা জর্মন। কাছে এসে সমস্ত গোলমাল করে দিলেন। ইংরাজিতে কথাবার্তা : আপনারা ভারতীয় নিশ্চয় ? আনিও ভারতীয়। সেখান কতদূর থেকে চিনতে পেরেই ছুটেছি।

কার্ড বদলাবদলি হল। বি. এল. শাহ—বাড়ি গুজরাট। জর্মন বউ নিয়ে তিরিশ বছর এই শহর-বাড়ির মেখে আছেন। আগুবাচ্চা অনেকগুলো। ক্যামেরা এবং ঐচ্ছাতীয় ভিনিসপত্র বাইরে দরবরাহ করেন। হরেক শৌখিন মাল আমদানি করেন ভারত ও পূর্বাঞ্চল থেকে। লক্ষ্যীঠাকুরনের কুপা আছে, হাবেভাবে মালুম। কথাটা উঠতে মোলায়েম হেসে ঘাড় নাড়লেন : উহঁ, এমন আর কি ! অর্থাৎ বিলক্ষণ দু-পয়সা আসছে ঘরে, পরন আনন্দে আছেন।

আমার কার্ড পড়ে শাহ মহাশয় বললেন, বহু দেখছি। বহু এলফিনস্টোন কলেক্শে পড়তাম—একজন বহুর লেখা অ্যালক্সেড্রার পড়েছি ওখন। তাঁদেরই কেউ আপনি ?

ঘাড় নাড়ি : হাক্কার-লক্ষ বহু আছেন বাংলাদেশে। কোনও সময় হয়তো এক ছিলাম। অনেক আগের কথা। যিনি অ্যালক্সেড্রার লেখক, চেনা-জানা আছে তাঁর ছেলের সঙ্গে। বহু লোক।

রাত্তার ধারে ধারে ত্রিপল খাটিয়ে রেস্তোরাঁ—ফুলে ফুলে নন্দনকানন বানিয়েছে। স্বয়ং জ্ঞাত।

ত্রিপল খাটানোর মানে ইচ্ছা হলেই খুলে ফেলে খোলা আকাশ করা যায়। বসে গেল পছন্দসই একটা জায়গায়। অধনের জন্ম আপেল-রস ; এবং মালদার ব্যক্তির উৎকৃষ্টতর মাল উদরস্থ করছেন।

শাহ মশাঘের গল্প শুনছি—বালিনে বোনা পড়ছে, তখন এখানেই তিনি। আটচল্লিশ রাত্রি, মশায়, পর পর বোনা পড়ল। সন্ধ্যা হলেই হুড়ুগড় লেগে যায়। আলো-নেভানো শহর—বোমার আগুন ক্ষণে ক্ষণে উপরের আকাশ উজ্জল করে তুলছে। বাড়ির পর বাড়ি ভেঙে পড়ছে, আহতের আত্মনাগ উঠছে এনিকে-সেনিকে। অন্ধকারে শহরের উপর দশ-বিশ হাক্কার প্রলয়ধ্বংস মৈত্রী ছেড়ে দিয়েছে যেন। সারা রাত্রি চলত এইরকম, সকালবেলা চারিদিক করসা হয়ে গেলে তবে ঠাড়া। এরা তাড়িয়ে দিচ্ছে কখনো আকাশে উঠে। তাড়া বেয়ে এরাই বা নেমে এসে ভূতলে মুখ লুকাই। অথবা ধীরে মুখে নামবাড়ই ফুরসত দিল না, বৌটা-হেঁড়া আনের মতন গড়িয়ে পড়তে হয়। রোজ আমি একটা জায়গায় আশ্রয় নিতাম, সন্ধ্যা হলেই চলে যেতাম সেখানে। সে-রাত্রে ভাগিাস যাইনি। ভগবানের ইচ্ছা, বোঁচে থাকব—নয়তো কেন ঘাবার ইচ্ছে হলনা বলুন ? এগারো-শ মাহুচ কবরস্থ হল সেই একটি জায়গায় সে-রাত্রে। দশজন মাত্র কি গতিকে ফিরে এলো, তাদের কাছে সব শুনলান।

—আপনি মশায় সে সময়ে বালিনে কেন পড়ে ছিলেন ?

—বউ-ছেলেপুলে মাইল ত্রিশেক দূরে এক গায়ে গিয়েছিল। আনিও যেতাম সেখানে। কিন্তু ভাতভিত্তি সমস্ত বালিনে—শহরের পাট চুকিয়ে একেবারে হাত-পা গুটিয়ে বসি কি করে ? বৃটিশ তখন জর্মনির শত্রু—আমি হলাম বৃটিশ-প্রজা। গোড়ার দিকটা আমেরিকার উপর আমাদের শ্বরণদারিভার ভার। তারপর আমেরিকা নেমে পড়ল তো নিরপেক্ষ সুইসেরা অতিভাবক হল। লড়াই অন্তে

সুইল আত্মশাসি-মুহুরে নিয়ে গেল রাশিয়ার—
একেবারে ন-পিতা ন-মাতা ন-বন্ধু ন-ভ্রাতা অবস্থা
আমাদের। উঃ, কী অবস্থায় যে দিন কেটেছে!

—হু-হুটো লড়াইয়ে আত্মা রক্ত শিক! হল
এরপর, কি বলেন?

একটু ইতস্তত করে শাহ বললেন, কোথায়!
আবার তো নাভান্নাতি দেখছি। লড়াইয়ের আগে
যেমন দেখতাম, ধানিকটা সেইরকম। পশ্চিম-
জার্মানির আঠারো জন বাঘা-বাঘা বৈজ্ঞানিক আটম-
বোমার বিকশে কড়া মনুষ্য কেড়েছেন, এই যা।
ইউদারা আবার সব ফিরে এসেছে। হিটলার
কেড়ে-কুড়ে নিয়েছিল—আমেরিকা যুদ্ধবি হয়ে
তারের সমস্ত সম্পত্তি কেবল দিয়েছে। জার্মানদের

মনোভাব জানতে তো বাকি বেই—শুধু তারা হলে
এক আধলাও দিত না। যার হত সম্পত্তি নেই
হয়েছে, লড়াই নিটে গেলে সরকার তার দান করে
অর্থেক দিয়ে দিলেন। টাকা অবশ্য আমেরিকার।
নগদ টাকা পেয়ে সুবিধা হল সামলে
ওঠার। বড় বড় শিল্পপতি স্পষ্টাঙ্গপতি অনেকেই
বলে, লড়াই হয়ে ভালই হয়েছে। সেকলে
যন্ত্রপাতি ছিল—ফ্যাক্টরিগুলো বজায় থাকলে তো
ওরই উপর কিছু তালিহুসি দিয়ে কাজ চালাতাম।
বিলকুল নিপাত পেল, বাস্তব জিনিসের বদলে
করকরে একগাদা টাকা পেয়ে গেলাম। আধুনিক
কলকলার ফ্যাক্টরি জেলে সাজা হয়েছে
একেবারে।

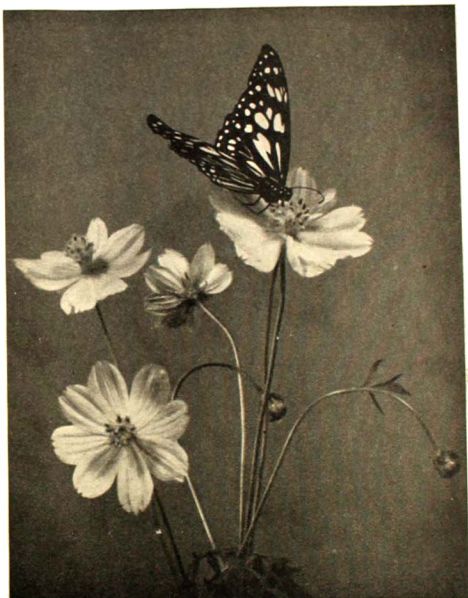
[বন্ধু]



সত্যকীর প্রতিভা
হুৎলাস

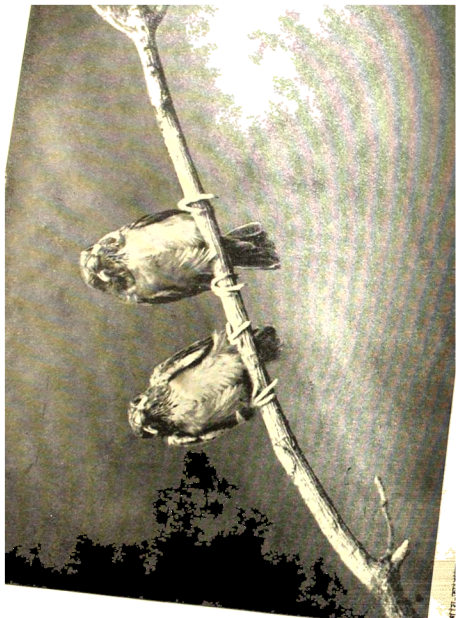
টি.জি.ভ্যাড্ডি
এও দল

৪২ নং কর্তওয়ালিস ট্রাট
কলিকাতা ৬



মরুভূমী

[কটে : অসিত মুখোপাধ্যায়]



গণনা ক্রিয়োত্তির ঘোষ

১

বহিঃস্থ পদ্য প্রকাশ ক্রিয়োত্তির। তাহার গণনা অতি নিম্ন। ক্রমের তারিখ ও সময় জানিতে পারিলে, তিনি যে-কোন ব্যক্তির কৃত, উপস্থিত ও বর্তমান সকল কথাই বলিয়া দিতে পারেন। যদি কেহ ক্রমের সময় ঠিক না বলিতে পারে, তাহা হইলে, শুধু তারিখ হইলেই চলে। যদি কাহারও তাহাও জানা না থাকে, তাহা হইলে কি করে তাহার ক্রম, তাহা জানিতে পারিলেও তিনি স্বয়ংক্রিয় গণনা করিয়া দিতে পারেন। যদি তাহাও জানা না থাকে, তাহা হইলে যে-কোন একটি কল বা সূলের নাম করিলেও তাহার গণনা যে কোন বাধা থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে হাতের বেগেও তিনি বিচার করেন এবং তাহা বোঝিয়া বহু নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকেন।

স্বামল কাজ করে দশ বাস এও কোম্পানিতে। ঘাটিনা ভাঙই পার। কোন বদশেয়াল নাই। তবে একটি যাত অভ্যাস আছে, সেটা হইতেছে, লটারিতে টিকিট কেনা। অবশ্য বেশী টাকার টিকিট নয়, অল্পমূল্যই প্রচলিত। টিকিট কিনিয়া কলকালের আশার দিনাতিপাত করা এবং অবশেষে হতাশ হওয়া, ইহাই যেন তাহার একটি মনোমগ্ন অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবাহ করিয়াছে প্রায় তিন বৎসর। স্ত্রীটি বেশ মনের মতোই হইয়াছে। চোখ-কলপানো সৌন্দর্য না থাকিলেও তাহাকে বেশ সুন্দরী-ই বলা চলে। দেহের স্বন্দর পঠন ও নিটোল মাথা তাহার রূপকে কমবীর করিয়া তুলিয়াছে। বাস্তবিক হুঁমিতার সঙ্গে স্ত্রীমন্দের গুণ হয়। হুঁমিতা বলে, কেন শুধু অমন করে পয়সা নষ্ট কর। তা ছাড়া, কলকাল না জানা পর্যন্ত মনের একটা অশান্তি, তার পর হতাশার কষ্ট। নিজের উপার্জনই ভাল। তাতেই হয়। হঠাৎ পড়ে-পাওয়া টাকার কি হয় হয়?

স্বামল বলে, কি জানি কেন, আমার কেমন একটা অভ্যাস হইতে গেছে। এমনি এমনি হঠাৎ অনেকগুলো টাকা পাওয়া যায়, এটা ভাবতে বেশ লাগে।

—কিন্তু কেন হুঁমি অমন টাকার পরে লোভ করবে? আর এতদিন দেখতে তো পাচ্ছি, শুধু উষ্ম আর হতাশা ছাড়া কিছুই হচ্ছে না। যদিও কোনদিন হঠাৎ কিছু পাওয়া যায়, তাতে আমার একইও আনন্দ হয় না। অমন দোষ কখনো নেই।

স্বামল বলে, আচ্ছা গো আচ্ছা, আর মাটির করত হব না। মাংসের ভাগাই সব। ভাগ্যে যদি থাকে, তাহলে চড়ে একখানা একটাকার টিকিটেই ভাগ্য ফিরে যাবে। তখন আর লটারিতে তোমার আশা থাকবে না।

—নিশ্চয়ই থাকবে। ও কাজটাকেই আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। কেন যে হুঁমি এটা বোঝে না, আমি ধারণা করতে পারি না। এমনি করেই লোকে রে-সে-সে আরম্ভ করে, আবার আরো কতরকম চুরাখোর কোঁক এসে পড়ে। শেষের ফলে কখনো একখানা টিকিট কিনলে, সেটা আলাদা কথা। তার কথা মনেও থাকে না, কোন উৎসাহও হয় না, টাকা এল কি না-এল, তা নিয়ে অশান্তি হয় না। কিন্তু অনবরত খালি শুই নিয়ে থাকি, ওটা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। সত্যি, হুঁমি ক্রমে ক্রমে ওটা ছেড়ে দাও।

—আচ্ছা, দেখা যাবে।

স্বামল হুঁমিতার অহরহে ও শাসনে লটারির টিকিট কেনা অনেক কমািয়া দিয়াছে। কিন্তু অভ্যাসটা একেবারে ছাড়িতে পারে নাই।

একদিন তাহার অফিসের আর একজন কর্মচারী একখনি লটারির টিকিটের বই আনিয়া তাহার সম্মুখে ধরিতেই স্বামল বলিল, না ভাই, আমি আর এটার টিকিট কিনব না।

—সে কি হয়? তোমার ভরসাতেই আমি বইখানা নিয়ে এলাম। তুমিই বউনি করবে।

স্বামল আপত্তি করিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একখানা টিকিট কিনিয়া ফেলিল।

যিনি টিকিট বিক্রয় করিলেন, তিনি বিশেষ জোরে করিয়াই বলিয়া গেলেন, স্বামল অত্যন্ত 'লাকী', এবার নির্ভাত হয়।

বাড়ি আসিয়া ভয়ে ভয়ে হুঁমিতার নিকট টিকিটের কথা বলিতেই হুঁমিতা বলিয়া উঠিল, আমার টিকিট কিনেছ?

—অনেকদিন পরে। অফিসের এক বন্ধু গতিয়ে দিল। এড়াতে পারলাম না।

—লোক বুকেই গভীর।

—বোধ হয় এই আমার শেষ টিকিট।

—দেখা যাবে।

স্বামল একই বিশ্বাস করিল। তারপর জামা-কাপড়

শনির বাহিরে হাইবার জন্ত উদ্ভত হইল। স্মৃতিতা বলিল,
এই অক্ষিপথের এনে, আবার কোথায় বেরুই ?

একটু গলাধরু শব্দীর শুধানে বাব।

—আবার জ্যোতিষী ? বত সব—

—কি যে বল ? গলাধরু পড়িত হু বড় জ্যোতিষী,
সবার সব কথা ঠিক-ঠিক বলে দিতে পারেন।

—কি জিজ্ঞাস করতে যাবে তুমি ?

—এই—মানে—এই টিকিটের ফলাফল।

—প্রশ্নমকে নিয়ে আর আমি পারিনি ! অবসর সময়ে
একটু পড়াশোনা কর, না-ওর কোন ভাল সভা-সমিতিতে
যাও। তবু ভাল না লাগে, অগত্যা না-হর আমার
সঙ্গেই একটু ফটিনট্রি কর। তা তো না, বত সব বুঝলি,
তাই নিয়ে সময় নষ্ট। জ্যোতিষী যা হয় কি একটা বলে
দেখে, আর তাই নিয়ে বসে বসে ভাববে। কি যে এক
বড়ির ছুটিয়ে, বসতে পারিনি বাবু !

—এই আমি এসব বলে। বেশ তো, যনিবাগে টাকা
আছে নাকি ? যদি না থাকে, হু-তিনটে টাকা দিয়ে লাও।
পণ্ডিতমহাশয়ে কিছু কলিণা বা প্রশনী দিতে হবে।

—এ দিছি। কিন্তু আমি বলছি, তোমার এসব
ট্রিক ছাড়তে চাবে।

—আম্মা আম্মা, কমে কমে হবে। তোমার হাতে
খরচ পড়েছি—

—আচ্ছা! আমার হাতে উনি পড়েছেন ? কত
আবশ্য বাধ্য তা আমার আর জানতে থাকি নেই।

—কেন, কখন গিয়ে তোমার অবস্থা হলো ? তোমার
অসুখটি চাড়া আমি কিছু করে থাকি ?

—বাও ! আর আধিযোতা করতে হবে না।

জ্যোতিষী গলাধরু পড়িতের নিকট গিয়া স্ত্রামল তাহার
হাত দেখাইল এবং লটারির টিকিটের কথা বলিয়া উহার
ফলাফলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। পণ্ডিতমহাশয়
যানিকল্প চিন্তা করিলেন, কাগজ-পেন্সিল লইয়া একটু
লেখাপড়াও করিলেন। পরে সমীচরণে বলিলেন,
লটারির টিকিটের ফলাফল ঠিক বোঝা সেস না, তবে
হুইমস পরে ধনপ্রাপ্তি যোগ আছে। স্ত্রামল হিসাব করিয়া
বেধিল, লটারির ফল প্রকাশিত হইতে ঠিক হুইমসই থাকি
আছে। হুতরাং ওটা যে লটারির-ই ফল, সে বিষয়ে তাহার
মনে আর সন্দেহ রহিল না। কিন্তু ধনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে
আর যে একটি কলের কথা পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, তাহা

ওনিয়া স্ত্রামলের মূখ পুসাইয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয়
বলিলেন, আপনার স্ত্রীও একটা বড়রকম কাড়া আছে
একমাস পরে। বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। আর, শনির
কোণ নিশাচরণ আশাফেও একটা পনিতোষ বজ্র করতে
হবে, তার জন্ত সাতচল্লিশ টাকা সাড়ে এগারো আনা অর্থাৎ
সাতচল্লিশ টাকা ব্যতান্তর নগদ পয়সা লাগবে। এটা অবশ্য
আপনার মজুতই। অল্প লোক হলে ঠিক এর খিঙদ
লাগত।

—টাকা এখন আমার কাছে নেই যে ?

—তা, দিয়ে যাবেন কাল সকালে।

স্ত্রামল ভীত ও উদ্ভিষ্টিত বলিল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।
অধিক বাবার পথে আপনার টাকাটা নিশ্চয়ই দিয়ে যাব।
বজ্রের সব ব্যবস্থা আপনিই করবেন।

—নিশ্চয়ই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। তবে
সব বিষয়ে একটু সাবধানে থাকতে বলবেন আপনার
স্ত্রীকে। শনির কোণ, কোন্ দিক দিয়ে কি হয় বলা তো
যায় না। তবে হ্যাঁ, বজ্রবল ঠিকই ফলবে।

পরদিন ধানসবরে স্ত্রামল জ্যোতিষীমহাশয়ের টাকা
দিয়া অফিসে গেল। এতগুলি টাকা অপব্যয় হইল দেখিয়া
স্মৃতিতা অত্যন্ত চট্টয়া গেল। কিন্তু কি আর করিবে ?
স্ত্রামলের এ বাত্বিক বতদিন আছে, ততদিন এইকম
অভ্যাচার সহিতেই হইবে। তবে পূর্বের চেয়ে বাত্বিকটা
একটু কমিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যদি কমল বাত্বিকটা
ছাড়িয়া যার, এই আশাই স্মৃতিতা করিতেছে।

স্ত্রামল তাহার লটারি ঘাড়া ধনপ্রাপ্তির সম্বন্ধে জ্যোতিষী-
মহাশয় যে ভবিষ্যবাণী করিয়াছেন, তাহা স্মৃতিতাকে
বলিয়াছে। কিন্তু তাহার কাড়া সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন,
সে কথা স্মৃতিতাকে বসে নাই। একথা শুনিতে হয়তো
স্মৃতিতা উত্তির হইবে। মানসিক অবলাদ হইতে আবার
কোন অসুখ-বিদ্রুহ করিয়া স্মৃতিতে পারে, এই সকল কথা
মনে করিয়া স্ত্রামল স্মৃতিতাকে কাড়ার কথাটা একেবারে
চাপিয়া গেল। স্মৃতিতাকে কিছু না বলিলেও স্ত্রামল
নিজের মনের উত্তেজনা কেমন করিয়া রোধ করিবে ? সে
ডাবিতে লাগিল, তাই তো, হুইমসের সম্বন্ধে কি এমন
কাড়া আছে ? এমন বাধ্য, হঠাৎ কি হইতে পারে ?
কিন্তু, কি না হইতে পারে ? বলেরা, দগল, টাইকয়েড
সবই হইতে পারে। শেষে মোটরগাড়ির তলায় পড়িয়া
হাইতে পারে। নির্দিষ্ট কিয়া নাবিবার সময়ে হঠাৎ পড়িয়া
হাইতে পারে। কি না হইতে পারে ? দৈব যদি প্রতিফল
হয়, তাহা হইলে সবই সম্ভব। বাহা হউক, এ...

হুমিতাকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিতে হইবে। তাহার আহারাদি, তাহার চলা-ফেরা, তাহার বাড়ির বাহিরে কোথাও যাওয়া-আসা প্রভৃতি সঙ্গল বিষয়েই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হুঁটা মাস! সোচ্চা কথা নয়। বাট বিন! এই বাট লিনের মধ্যে কি না হইতে পারে? স্নানগ শুষ্ক ডাবিতে লাগিল। এ! হুঁটামাস নিয়োগের কাটিবে তো? শনিরাজের কি কোন কল হইবে না? উঃ, এই হুঁটামাসের মধ্যেই কি তাহার এই চারবৎসরের স্নানের নীচ ভগ্নাংশ হইয়া যাইবে? আর হুমিতা! আহা, এই দরপা অবলা, দুঃখান্বিতা হুমিতা, আবার এই হুমিতা, এই হুমিতার জীবনে এমন কি একটা খাঙ্কা আসিবে? সে খাঙ্কা সে সহিতে পারিবে কি? যদি না পারে? তাহা হইলে কি হইবে? আবার হুমিতা কি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে? বাটতে পারিবে কি সে? যদি তাই হয়, আমি যাবি কেন করিয়া? হুমিতাবিহীন স্নান—সে যে একেবারেই অসম্ভব! অসম্ভব! অসম্ভব! ওঃ। স্নানগ ডাবিয়া ডাবিয়া কোন কলকিনারা পায় না। হুঁটামাসের মধ্যে তাহার সাধের জীবনভর্য্য কি বজ্রাঘাতে চুবিয়া যাইবে? কোন্‌ভিত্তীর কথা কি একেবারেই ভুল হইতে পারে? কখনই না। তবে, হ্যাঁ, শনিরাজের কল হয়তো শুভ। কিন্তু তাহারই বা স্থিরতা কি?

ভাবিতে ভাবিতে স্নানগ ভীষণ গভীর হইয়া গেল। ঘুমে হাপি নাই। কখনও কোন কাজে কথা নাই। কোনরূপে নিবন্ধিত কালগুলি করিয়া যায় আর হুমিতার বিকে প্রথর দৃষ্টি রাখে। কখনও কোন দূর্ভটনার খেঁদ না পড়ে, কোনপ্রকার অশান্তি কেন না থাক, শরীরের প্রতি কোন অসুচ্যের না করে। এমনি করিয়া নিরাসার উচ্চ-চিন্তে স্নানগ হুমিতাকে তাহার সতর্ক দৃষ্টি ও কঠোর উপদেশ দিয়া থিরিয়া রাখে।

হুমিতা বলে, তোমার মনে কি? দিনরাত আমার শিচ্ছে লেগেছে কেন বল তো? বাড়ির দোককে দেখেও কেন কি ঘনে করছে? অত বাড়ানাড়ি কি ভাল?

স্নানগ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলে, কই, কি আর করছি? তোমার মত একই ভাবনা, তবে কার মত ভাবব?

—আজ্ঞা আজ্ঞা, হয়েছে! তাই বলে অমন করে শিচ্ছে লাগলে আমি সবার কাছে ঘূষ বেঁধাব কেনন করে?

—আজ্ঞা, লাগব না শিচ্ছে। তবে, সব বিষয়েই একটু সাবধানে থাকই ভাল নয় কি?

—নিশ্চয়ই। 'তা বলে সব সময়ে অমন ট্যাংক-ট্যাংক কোয়েনা।

স্নানগ একাও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। আর মনে মনে বলে, আমার যে কী ভাবনা, সে ছুঁমি কেনন করে বুঝবে? অহরহ আমার বুকের মধ্যে যে চিন্তা, কী উৎসেগে চোখে বসে রয়েছে, তা ছুঁমি কেনন করে জানেনে, হুমিতা!

স্নানগের এই উত্তির মনে হুমিতাকেও উত্তির করিয়া তোলে। সেও মনে মনে ভাবে, 'পি হ'ল গর? হুঁটাৎ কেন এত গভীর হয়ে গেলেন। লটারির ভাবনা? কিন্তু সেমত উনি আমার মত কেন বিব্রত বোধ করেন? লটারির সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

স্নানগ কেবলই চিন্তা করে, হুঁটা মাস কি আর কাটবে না? কত দিন, কত সন্তান, কত মাস, কত বছর কলকল করে বেড়িয়ে গেল, অথচ এট হুঁটা মাস যেন কাটছেই না।

একদিন অভিযানভরে ছলছল চোখে হুমিতা স্নানগকে বলিল, তোমার এ দীর্ঘশ্বাস আমি আর সহ্যে পারছি নে। কি হয়েছে, আমাকে বলতেই হবে। অভিযানের কোন টাইপিস্ট বা মত কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ-টাপালা হয়েছে হুমি? কিবা ব্যাপারটা আরও এগিয়ে কোন বিশিষ্ট পরিচিতি ঠাঁড়িয়েছে? আমাকে আর ভাল লাগছে না? না, পোটনার পড়ে ছটকট করছে? কি হয়েছে, বল-না?

স্নানগ অসহিষ্ণু হইয়া বলে, কী বা-তা বলছ তুমি? ওসব কল্পনা মনেও এনে না। তুমি আমার চমিতা, আমি তোমার স্নানগ, এর মধ্যে কোথাও কোন ফাঁক নেই। অবাস্তব চিন্তা মনে এনে না। নাও, এমন খাঙ, রেডিওটা খুঁজে একটু গান-টান শোন গে। মনে বা-তা উৎসেগ করে শরীর খাওয়া কোরো না। শরীরের সঙ্গে মনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বুঝবে? মন খাবার তলে শরীরও খাবার হবে। শরীর আর মনের বিবরে খুব সাবধানে থাকবে, বুঝবে?

—তা থাকব। কিন্তু তুমি আমার শরীর মন নিয়ে কেন হুঁটাৎ অস্থির হয়েছে, তা কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে। তুমি বোধ হয় ডেবেছ—, সে সব কিছু নয়। আমি বেশ ভালই আছি। আর যদি হয়, সে তো আজ্ঞামের কথা। এত হুঁচুতা কিদের?

—না না, সে সব আমি ভাবিনি। 'তবু দিনকাল ভাল নয়। তাই বলি, খুব সাবধানে যেকো।

—আবার সেই কথা! বাব, আমি বলছি, সাবধানে থাকব। 'হ'ল তো?

একদিন সন্ধ্যার সময়ে শ্রামল অফিস হইতে ফিরিয়া বিদ্রাম করিতেছে, হুমিতা পাশে বসিয়া একটি চায়ের শেষোশার চুম্ব দিতেছে। শ্রামল বলিল, হুমি!

—কি, বল।

—আবার ব্যাগের মধ্যে একটা প্যাকেট আছে, নিয়ে এস।

হুমিতা প্যাকেটটি আনিয়া শ্রামলের হাতে দিল। শ্রামল অঙ্গে অঙ্গে প্যাকেটটি হুলিয়া একটি চেষ্টা ভেদভেদে বাক্স হইতে একটি জড়োয়া হার বাহির করিয়া হুমিতার গলার পরাইয়া দিয়া বলিল, যাও, আরনার সামনে তাঁড়িয়ে দেব তো, পাটারিটা কেনন হারছে?

হুমিতা সেখানে বসিয়াই বুকের দিকে একটু চাহিয়া বলিল, চমৎকার হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি? এত টাকা কোথার পেনে?

—খার করলুম।

হুমিতা কপালে চোখ হুলিয়া প্রায় আর্দ্রাভ করিয়া উঠিল, খার করলে? কি সর্বনাশ! আজকালকার দিনে কেন তুমি এ কাজ করতে গেলে?

—লটারির টাকা পেলেই শোধ করে দেব।

—বলি না পাও?

—নিশ্চয়ই পাও। জ্যোতিষীর গণনা মিছুল। ধনপ্রাপ্তি দানে লটারির টাকা পাওয়া ছাড়া আর কি হবে? কি হতে পারে?

—তাই, টাকা পাওয়া পবিত্র আর তব সইল না। আমি পূর্বব না এ-হার। তুমি কালই এ হার ফিরিয়ে দিয়ে এস।

—একটা বেলে কেনা, এ হার কেবল নেবে না। তা ছাড়া, কেনই বা কেবল দেব? আর মাস-দেড়েক বই তো নয়। লটারির টাকাটা পেলেই এর দাব শোধ হবে, তার উপরেও কিছু হাতে থাকবে।

হুমিতা বলে, উঃ, কী ব্যতিক্রম যে পেয়েছে তোমার! এ একটা বোম-বিশেষ। কবে তুমি এ জ্যোতিষ-চর্চা ছাড়বে আমাকে বল। নইলে—

হুমিতা প্রায় কাদিয়া কেদিল।

শ্রামল হুমিতার খাধার হাত বুলাইতে লাগিল এবং বলিল, আচ্ছ, এই আমার শেষ লটারির টিকিট। আর কখনো কিনব না।

—এ কথা তুমি আগেও আমাকে বলেছ। তা ছাড়া তুমি লটারির টিকিট নয়, তার পরে আবার জ্যোতিষের প্রলেপ।

একে মনশা, তার আবার খুঁচো গছ! এমন করতে করতে কৌনদিন তুমি প্যাগল হয়ে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমিও—

হুমিতা প্রায় কাদিয়া কেদিল।

শ্রামল তাহাকে সাবনা দিয়া বলিল, সত্যি বলছি, আমি আর টিকিট-কিকিট কিনব না।

—কিন্তু হারেব কি হবে?

—বেখানে আছে, ওখানেই থাকবে।

—হারের টাকাও কি হবে?

—লটারির টাকা থেকে শোধ হবে।

—আবার সেই লটারির টাকা আর সেই জ্যোতিষ!

শ্রামল বলিল, আবার ভাবতে বসল? বলেছি না, ভাবনাও শরীর খারাপ হয়। যাও, রেডিওর চাবিটা মূল একটু গান-টান শোন গে।

করেকদিন পরে।

হুমিতা লাজিয়া-জিয়া শ্রামলকে বলিল, দিদির সঙ্গে একটু দিনেখাব বাড়ি। কতদিন যাইনি।

—না গেলেই ভাল হ'ত না?

—কেন?

—দেখছ-না কাগজে, প্রায়ই নানারকম আকৃষিভেট হচ্ছে। কিছুদিন না-হয় একটু সাবধানেই থাকলে।

—সাবধানেই তো রয়েছি। তাই বলে বাড়ি থেকে একটু বেরুনা না?

—তা কেন বেরুবে না। কোন দিন যাবন করেছি?

হানে, দিনকাল ভাল নয় কিনা। বাসে, টায়ে, মোটরে, রিকশায়, এমন কি গুপু ফুটপাথেও হরময় কত আকৃষিভেট হচ্ছে। তাই বলছিলাম, কিছুদিন একটু সাবধানে থাকলেই ভাল হ'ত।

হুমিতা বলিল, আমাদের টিকিট কেনা হয়ে গেছে। এখন আর বাগড়া দিওনা। দিনেখা থেকে কিরে এসে আবার সাবধানে থাকতে আরম্ভ করব।

দিদির সহিত ট্রাবে বাইতে বাইতে হুমিতা বলিয়া কেদিল, কি যে হয়েছে কিছুদিন থেকে, কেবল আমাকে সাবধান করে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর সর্বদাই কি কেন ভাবেন, আমাকে দেখলেই ঐর ভাবনা কেন বেড়ে ওঠে।

দিদি হাসিয়া বলিলেন, ওরকম হয়ে থাকে। যাক-না আর হু-একটা বছর। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আরো কিছুদিন পরে। হুমিতার দ্বাধার ছেলের

অগ্রদূত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ আনিয়াছে। হুমিতা স্নানলব্ধে বসিয়া একটা বড় তুণু কিনিয়াছে। সন্ধ্যার সময় যখন তাহার বাজা করিবে, তখন স্নানল হঠাৎ গভীর হইয়া বলিল, আচ্ছা, তোমরা কি না-গেলেই নহ?

—সে আবার কি! দাশর চুলের ভাত, অথচ আমি যাব না, এর মানে কি?

—না, মানে, সময়টা ভাল না কিনা। নেমস্তন্ন খেয়ে-টেয়ে হঠাৎ অস্থির-বিস্ময় না করে।

—কি আশ্চর্য! কী ঘ-তা ভাবছ। হুমি কি জান না, ষাণ্ডহার বেদ্যর আমি স্বত সাধনাম? এত লোক যাবে, তারের কারও কিছু হবে না, শুধু আমারই অস্থির হবে?

স্নানল ঢোক গিলিয়া বলিল, মানে, সময়টা ভাল না কিনা। চারদিকে কত অস্থির-বিস্ময় হচ্ছে, তাই একটু ভাবনা হয় না?

—তোমাকে আর ভাবতে হবে না। এল, ক্রমশ হাত হবে বাচ্ছে।

স্নানল অসত্যা চলিল হুমিতার সঙ্গে। পথে কেবলই ভাবিতে লাগিল, যে ভগবান, যে পবিত্রস্থান, এই নিমন্ত্রণের ঠিকানা কাটিয়ে দিয়ে!

কাঁড়া নির্বিঘ্নে কাটায়া গেল। কিন্তু স্নানলের হুমিতা কান্না কই? বাজ লেঙ্কন হইয়াছে। আগো পনেরো দিন বাকি। এই পনেরো দিন কাটে তবে তো! চিত্রাঘ, ভাবনার, উৎসেগে স্নানলের শরীর ও মন ক্রমশই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। আহা! কঠি নাই। হুমিতাকে সামনে দেখিলেই ধাবার মন তাহার গলার বাহিয়া যায়। হুমিতাও ক্রমশ ভীত হইয়া পড়িল। স্নানলের কোন কঠির অস্থিরের পূর্ণলক্ষ্য নয় তো? অথচ সে-কথা বলতে পারে না। বলিতে গেলে অস্থিরের উপসর্গ আবার বাড়িয়াও বাইতে পারে।

একদিন স্নানল লক্ষ্য করিল, হুমিতার কপালের ডানদিকে ছোট একটা ফুসফুঁ হইয়াছে। প্রায় একটা ঘামাটির মতো, তবে ঘামাটি নয়। সেবিষাই স্নানল অত্যন্ত উত্তির হইয়া হুমিতাকে বলিল, বেশ, খুব সাধনাম! ফুসফুঁটার হাত দিয়োনা বেন। আমি আজই ডাক্তারকে খবর দিছি।

—কি যে বল! একটা ফুসফুঁ হয়েছে, হু! দিন-তিনদিন পরেই সেবে যাবে। আমার ইচ্ছে করছে এখনই গেলে দিই।

—ধরদার! এমন কাজও করো না। সময়টা মোটেই ভাল নয়। বেশছ একটা সামান্য ফুসফুঁ। ওথেকে কি না হ'তে পারে? কোড়া হ'তে পারে, কারবাফল হ'তে

পারে, গ্যাংগ্রীন হ'তে পারে, সেপ্টেমিয়া হ'তে পারে, ইরিসিপেলাস হ'তে পারে, কিস্টুলা হ'তে পারে, ক্যানসার হ'তে পারে। আমি ডাক্তারকে খবর দিছি। হুমি খুব সাধনাম! হাত-চাত দিয়োনা। দু-চারদিন তেলমাখা, স্থানকরা বন্ধ কর।

হুমিতা কি বলিবে ভাবিয়া পার না। তবু বলে, ই্যা, আমি খুব সাধনামে থাকবো, হুমি ডেবো না।

স্নানল কিন্তু রীতিমতো ভাবিতেছে। এমনি করিয়াই কি গণকের কথা ফগিয়া যাইবে? সে ডাক্তার বড়ানন চাইলোকে বল দিল। ডাঃ চ্যাটার্জী আসিলেন। দোষ্ট্র এবং রোগ বেগিলেন। অভিকর্মে চাপি চাপিয়া একটা প্রেসক্রিপশন করিয়া দিলেন এবং কী-সইয়া বলিয়া গেলেন, বেশ! ভাববেন না আপনাবা। তিন-চারদিন পরে আমাকে খবর দেবেন।

খবর অবশ্য দিতে হইল না। দুইদিনেই ফুসফুঁটা অদৃশ হইয়া গেল। হুমিতা বলিল, তুণু তুণু স্বতগুদো টাকা ডাক্তারকে দিলে!

—তুণু তুণু নয়, হুমিতা! সময়টা ভাল নয় কিনা? সাধনামের মার নেই।

এমনি করিয়া দিন কাটিতেছে। হুমিতা স্নানলকে বলে, তুণু ডেবে ডেবে নিজের শরীর মন এমন করে কেন মট করছ? ষাণ্ডা নেই, দুই নেই, ধানি আমার কল্প ঘ-তা ভাবনা। হুমি তো এমন ছিলে না! ধানি নেই, আনন্দ নেই, কেবল সাধনাম আর সাধনাম!

স্নানল বলে, হুমি ঠিক বুঝে না। মানে, বেশছ না, চারদিকে নানারকম অস্থির-বিস্ময়, কখন কার কি হয় বলা যায় কি? সময়টা মোটেই ভাল নয়।

যাহা হউক, গণকের নির্দিষ্ট দুইমাস শেষ হইতে চলিয়াছে। আজ ঠিক দুইমাস পূর্ণ হইবে। যদি আজকার দিনটা ভাল-ভালর কাটে, তাহা হইলে কাল হইতে স্নানলের আর হুমিতা থাকিবে না। কিন্তু আজকার দিনটা কাটিবে কি?

স্নানল আজ কাদুঘর লীড লইয়াছে। তাহার ভাবনা মতাই আজ চরমে উঠিয়াছে। আরো চম্পিশটা ঘটা সে ব্রহ্মমন্ডিকে থাকিতে পারিবে কি?

হুমিতা যানের ঘর হইতে আসিয়া বলিল, এট বেশ, তোমার গণকের কথা কিন্তু সত্য হবে সেজে।

স্নানল চমকিয়া উঠিল। কি ব্যাখ্যা?

—আজ তোমার ধনবান্ধি হয়েছে।

—সত্যাবির বদর এসেছে বুঝি? কই, চিঠি দেখি।

—চিঠি নয়। তোমার ধন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।

স্বামল বাহু ত্রস্ত হইয়া বলিল, বৈয়ালি ভাঙ্গ। বল, কি হয়েছে?

—এই দেখ, বলিয়া হুমিতা হাত খুলিয়া দেখাইল।

স্বামল স্তম্ভিত হইয়া দেখিল, একটি নয়া পয়সা।

হুমিতা বলিল, বাৎসরিক ভ্রমের পাণ্ডে পড়ে গেল। যাই হোক, তোমার জ্যোতিষীর গণনা সার্বিক হয়েছে, কি বল?

স্বামল কেন উত্তর দিল না। বনে করিল, ধনপ্রাপ্তি যাহা এই বৎসরপ্রাপ্তি, তা না হইতে পারে। একটি নয়া পয়সা কি ধন নয়? জ্যোতিষগণনা ব্যর্থ হইবার নয়।

দ্বিতীয়া সন্ধানভে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর স্বামল একই বাড়ির হইয়া গিয়া অরক্ষণ পরেই কিরিয়া আসিল। সে আজ হুমিতাকে চোখের আড়াল করিতে পারে না। তাহার ছোট বোনটিও ইহা লক্ষ্য করিয়াছে। সেও একই একই হাসিতেছে আর ভাবিতেছে, দাদার হ'ল কি?

রায়ে আহারাদির পর স্বামল ও হুমিতা শয়ন করিয়াছে। একই পরেই হুমিতা ঘুমাইয়া পড়িল। স্বামলের চোখে ঘুম নাই। সে ভাবিতেছে আরও পুত্রা আট ঘণ্টা বাকি। এই রাত্রিটা নির্বিঘ্নে কাটিবে হয়। এক এক বার হুমিতার দিকে চাহিতেছে, আর হৃদয়স্থ তাহার মূখ্য বেন দিব্য হইয়া উঠিতেছে।—ছোট বেড়রুদ-ল্যাম্পটা আগাই ছিল। বেড়রুদটা ধরিয়া নিভাইতে দিয়াও নিভাইল না। না, থাক আজ আসোটা আগা। চোটে আগা, জলুক-না একটা রাত।

দেওতারের গায়ে ঘড়ি টিকটিক করিতেছে, অশ্রুট আগার দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলি বেধা বাইতেছে। বাহিরে মাঝে মাঝে রাস্তার গাড়ি বাওয়ার শব্দ শোনা যাউতেছে। মাঝে মাঝে জানালা দিয়া এক একতলক বাতাস লুকাইয়া মণিরিতাক হেলা হিতেছে—আর, স্বামল বিনিত্র চোখে হুমিতার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। কাঁড়াটা কাটিবে তো! উঃ, যদি কিছু অঘটন ঘটনা বায়!

ঘড়িতে টং-টং করিয়া দুটো বাজিল। স্বামল অতি দক্ষপণে বাণিশের পাণ হইতে একটী সাদা কার্ডবোর্ডের ছোট একটা বাহু হাতে লইয়া ধীরে হুমিতার গা বেঁধিয়া বসিয়া হুমিতার গা একই টেনিয়া তাহাকে জাগাইল। হুমিতা থকথক করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, এ কি! তুমি এখনও সুযোভনি?

স্বামল সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া প্রায় ধরা গলায় গাফথরে বলিল, হুমিতা!

হুমিতা দুঃখ-বিজড়িত চোখেও একটু না হাসিয়া পারিল না। বলিল, কোন নতুন কথা আছে বাকি?

—শোন হুমিতা, তুমি কড়াপাকের সন্দেশ যেতে এত ভালবাস। অনেকদিন হুমি কড়াপাকের সন্দেশ খাওনি। তাই—

এই কথা বলিয়াই স্বামল কাগজের বাহু খুলিয়া হুমিতার সামনে ধরিয়া বলিল, নাও লক্ষ্যটি—

হুমিতা হাসিবে না কাণিবে, বৃত্তিতে না পারিয়া স্থির হইয়া রহিল। পরক্ষণে বলিল, তুমি কখনোই ছেলেমানুষ হচ্ছ বুঝি? রাত দুটোর সময় মণারির মধ্যে বলে কড়াপাকের সন্দেশ খাবার মানে কি?

—মানে তুমি বুঝবে না। তুমি যেতে থাক, আমি এমনি জলের মাস নিয়ে আসছি। এক কামড় সন্দেশ খাবে আর এক হুমুজ লগ খাবে। নচেৎ শুকনো সন্দেশ গলায় বেধে একটা অনর্থ না হয়।

এই রাতে বিজানার বসিয়া তর্কাতর্কি করা শোভন নয়। হুমিতা একটি সন্দেশ খাইয়া, বানিকটা লগ খাইয়া শুইয়া পড়িল। বলিল, আমার তয়ানক ঘুম পাচ্ছে। ডেকো-টেকো না কি—

হুমিতা একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু স্বামলের চোখে ঘুম আসে না। সে ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনিতেছে আর ভাবিতেছে, আর তিনটে ঘণ্টা কাটিবে হয়। সে নিশ্চিন্দ চোখে হুমিতার দিকে চাহিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে তাহার হাতের আঙুল নাকের সোড়ার লইয়া দিয়া দেখিতেছে, নিঃশব্দ বসিতেছে কিনা।

এমনি করিয়া রাত কাটিল। জানালা দিয়া প্রভাতের আলো আসিয়া পড়িল। হুমিতার ঘুম ভাঙিল। বলিল, কি আশ্চর্য! তুমি এখনও বসে আছ?

—হ্যাঁ, হুমিতা! এম, একটু কাছে এস।

—যাও! আল্লা, এর মানে কি?

—আজ আর তোমাকে মানে বলতে বাধা নেই।

জ্যোতিষী বলেছিল, সু-মাসের মধ্যে তোমার একটা সাংঘাতিক কাঁড়া আছে। আজ সকালে সু-মাস শেষ হ'ল।

—ও! তাইতো বলি, কেন তুমি আমাকে দিনরাত সাধন করে নিয়ে বেড়াচ্ছিলে। তাহলে কাঁড়াটা সুসংস্কৃত ভিতর দিয়েই কেটে গেল। কি বল?



। জে।

সাহাবাদিক্স গ্রন্থ সমালোচক

"He was an art critic, a dramatic critic, and a musical critic; and in all three, it need hardly be said, he fought for the newest style and the most revolutionary school." —(J. K. Chesterton)

অধ্যাপক হেনরী সিজউইক-এর বর্ণন-সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থ বার্নার্ড শ'কে সমালোচনার্থে সম্পাদক থিয়েট্রিয়ান। একবছর শেষ হয়ে গেল, তবু সমালোচনা প্রকাশিত হয় না, প্রকাশকরা সম্পাদকের কাছে নানিশ জ্ঞানলেন। পর-মল গেজেটের সম্পাদক বিরক্ত হয়ে বার্নার্ড শ'কে বই পাঠানো বন্ধ করলেন।

এই বিলম্বের হেতু কিছ অপরূপ। শ' বইটি নিয়ে লেখলেন, যোগ্য সমালোচনার মতো পাণ্ডিত্য তাঁর নেই, তাই একবছর ধরে তিনি সেই সম্পর্কে অনাথ্যে এম পার্শ্ব করলেন। দাখ্য পত্রিকার ছোট একটি সমালোচনা লেখার জন্য এতখানি সততা এবং নিষ্ঠা।

যেন অবিশ্বাসযোগ্য। সাংবাদিক মহলে বার্নার্ড শ' জাতীয় মানস তাই অসল।

বার্নার্ড শ'র সাংবাদিক আদর্শ তখন মাত্র দু-পাউণ্ড। হতভাগ্য এই ব্যক্তিত্ব চলে ব্যক্তিগত তাঁর অস্তিত্ব হল অনেক, তখনও ফেরিয়ান সোসাইটির অনেক অষ্টবর্তনিক কর্ম করতেন চয়। এই ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দেই শ'র দিত্তবিভাগ হল।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, তখন একদিন বছর বয়স বার্নার্ড শ'র—দীর্ঘে দীর্ঘে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি হচ্চে, অল্পবয়সের সাংবাদ্য বাড়ে। এক শিল্পি মুরো Cashel Byron's Profession গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশিত হল। বদাতি গুটি জিভেনশনকে উইলিয়াম আর্চারের সাংবাদ্যর বয়স অষ্টবর্তনের জন্য গ্রন্থটি পাহিয়েছিলেন তখন তিনি লিখেছিলেন—"I say, Archer,—my God, what women!" কিছ জিভেনশনের প্রশংসা লেলেও বইটি বিক্রি হয়নি।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একজন প্রকাশক An Unsocial Socialist উপন্যাসটি প্রকাশ করলেন, কিন্তু এই উপন্যাসের জন্য প্রকাশক লাভবান হলেন না। ১৮৮৮-৮৯ হিসেবের মধ্যে এই প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান থেকেই জনৈক কবি বার্নার্ড শ'কে চিঠি লিখে জানলেন—"আমাদের প্রকাশিত উপন্যাসটি চমকপ্রদ, কিন্তু আমরা মতে আপনি যদি দুটক লেখেন সেই আপনার কলমেই উপজুক্ত কর্ম হবে।" বার্নার্ড শ'র

দেখ
বার্নার্ড



জবানী মুখোপাধ্যায়

কাজে তখন এই উৎসাহ-বাক্যের প্রয়োজন ছিল, তা ছাড়া এই ভক্তশোক নাটক-রচনার যে প্রভাবটি জানিয়ে-
ছিলেন, সেই প্রভাব বার্নাড শ'র জীবনে নিঃসন্দেহে নতুন
প্রেরণা দকার করেছিল।

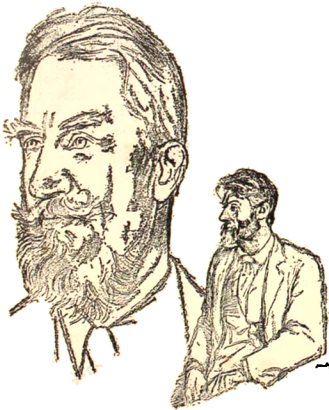
১৮৮৮-র ঘোড়ার দিকে বার্নাড শ আবার একটি
নিবেদিত কাজ পেলেন। আইরিশ সাংবাদিক এবং
পারলামেন্টের সদস্য টি. পি. ও'কনর একটি সাতা সৈনিক-
পত্র প্রকাশের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করে *The Star*
প্রকাশ করলেন। পত্রিকার মতবাদ উদারনীতিক,

তা ছাড়া আয়ারল্যান্ডের স্বাভাব্যত্বের তার অজ্ঞাতম দাবি।
এই হোমরুল বা স্বাভাব্যত্বের দাবিটুকু ছাড়া টি. পি.-র
দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ প্রাচীন। তাঁর সহযোগী সম্পাদক এইচ.
ডব্লু. ম্যাসিংহাম ছিলেন বরসে তরুণ, কর্ণে অসুস্থ এবং
মতবাদে কেবিরান। অনেক পরে তিনি ইংলণ্ডের বিখ্যাত
সাপ্তাহিক পত্র *The Nation* পত্রিকার সম্পাদক
হয়েছিলেন। ম্যাসিংহাম ও'কনরকে বললেন—অসুস্থের
অর্ধ বার্নাড শ'কে সম্পাদকীয় বিভাগে নেওয়া হোক।

ও'কনর কখনও বার্নাড শ'র নামও শোনেননি; প্রশ্ন
করলেন—সে আবার কে? ম্যাসিংহাম বার্নাড শ সম্পর্কে
টি. পি.-কে অবহিত করলেন। *The Star* পত্রিকার দ্বিতীয় দিন
থেকে সাপ্তাহিক হু-পাউও দল
মিলিও বেতনে অর্ধ বার্নাড শ
যোগদান করলেন।

The Star পত্রিকার শুধর
ম্যাসিংহাম, বার্নাড শ, ওয়েকলি
এবং বোশেপ পেনেল—কোনো
সংবাদপত্রে তখনকার কালে
এতগুলি অদ্বন্দ্ব লেখকের সম্মিলন
সম্ভব হয়নি। ওয়েকলি ছিলেন
নাট্য-সমালোচক আর বোশেপ
পেনেল কলা-সমালোচক।

বিশ্ব সোম বাৎসর্যে বার্নাড
শ'কে নিয়ে। তিনি এই উদার-
নীতিক সংবাদপত্রে এমন প্রকারে
সম্পাদকীয় সিংহলেন যা
কেবিরান সংবাদপত্রের উপ-
যোগী। সাম্যবাদী প্রচারে তাঁর
সম্পাদকীয় বক্তব্য পরিপূর্ণ।
উদারনীতিক নেতা জন বরদি
সংবাদপত্র পাঠ করে তো
হতবাক। তাঁর আশা ছিল যে,
তিনি দেখবেন তাঁদের প্রশংসার
পত্রিকাটি মূহুর হয়ে উঠবে। কিন্তু
তাঁর পরিবারে সিংহিত হয়েছে যে
আর্যাই দেশের সর্বনাশের অজ্ঞাতম
কারক। টি. পি.-কে ধরে তিনি
বললেন—“এদর কী কাণ্ড।”



অর্ধ বার্নাড শ (১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে)

[পিতা : ডার উইলিয়াম মসকটাইন]

জন মরলির কথায় টি. পি. ওর্য়েন-বসেন। তিনি সেখানে এইজাতীয় সম্পাদকীয় আগামী পক্ষণ বহুতেও ছাপা যায় না।

ম্যাসিংহাম আর মরলির মাঝে বার্নাড শ। ফলে, তিন সত্তাহের মধ্যেই বার্নাড শ পদত্যাগ করলেন। টি. পি.-কে বার্নাড শ এক দীর্ঘ পত্র লিখে বললেন—“অষ্টাদশ শতকের নিম্নাধারের কাটিয়ে উঠুন।”

পরদিন সকালে হাতের বাকী কাজকর্ম সেয়ে নেবার জন্য বার্নাড শ অফিসে এলেন।

টি. পি. অতি ভালোমাহুষ। বার্নাড শ চেড়ে বাবেন এ তাঁর ভালো লাগছে না। বার্নাড শ-ই তাঁকে তাঁর এই ষিঃ থেকে মুক্তি লিয়ে বললেন—“আমি বহু সত্তাহে সঙ্গীত সম্পর্কে দুঃক্লম লিখব—এ অ-রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় নিয়ে কোনো হাস্যম হবে না।”

টি. পি. তৎক্ষণাৎ বললেন—“চমৎকার! সেই ভালো। আপনার যা খুসী লিখবেন, তবে অসম্মন কিছু লিখবেন না।”

১৮৮৮ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত সত্তাহে-ডু-গিনির মিনিমরে বার্নাড শ বহু বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করলেন *The Star* পত্রিকায়। সেদিন বিদ্যাবলীর মধ্যে অবস্থা সঙ্গীত ক্ষয়তম। বার্নাড শ এই সময় *Corno di Bassetto* এই চম্বনাৎ গ্রন্থ করেছিলেন। জাতীয় ইংলিশ পিডা-জাতীয় বাজবস্ত্রের নাম *Bassetto*। শব্দভান্ডার সময় বিবাদের মূহ এই করে জনিত হত। বার্নাড শ এই নামটাই তার উপযুক্ত হিসাবে গ্রহণ করলেন।

বার্নাড শ যখন লিখেছেন, এই *Corno di Bassetto* নামাঙ্কিত কলমটি সাক্ষাৎলাভ করলো।

The World পত্রিকায় উইলিয়াম আর্চারের সহযোগী ছিলেন লুই এঙ্গেল, সঙ্গীত-সমালোচক হিসাবে এর বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে তাঁকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ত্যাগ করতে হয়, আর্চার তখনই সম্পাদক এডমণ্ড ইয়েটসকে দিয়ে জানালেন, এঙ্গেলের যোগ্য উত্তরাধিকারী *Corno di Bassetto*। ফলে বার্নাড শ *The Star* পত্রিকা ত্যাগ করে *The World* পত্রিকায় যোগদান করলেন। প্রতি সত্তাহে জি.বি.এস. এই নামে একপৃষ্ঠা করে লিখতেন। ১৮৯৪-এ এডমণ্ড ইয়েটসের বৃদ্ধা হই, বার্নাড শ ততদিন পর্যন্ত এই পত্রিকায় নিযুক্ত লিখতেন।

বার্নাড শ ইয়েটসকে অতিশয় পছন্দ করতেন। তিনি

বলেছেন—“আমার মনে হল, ইয়েটসের মতো সঙ্গীতসম্পন্ন একজন সম্পাদক পেলে তবে আমার লেখা বাবে। ইয়েটস ছিলেন নিষ্ঠুর, অসাধারণ—কিছুতে ভয় পেতেন না, কতই পত্র খাওয়া উলে তা তিনি বুঝতেন।



শ

[শিখী: যোগ্যত ছিলেন]

তার ফলে, সমালোচনা পার্থক্যে হত। হুতরাং আমি পদত্যাগ করে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে *The Saturday Review*-এর সম্পাদক ফ্রাঙ্ক হারিসের ন্যাট-সমালোচক হিসাবে যোগ দিলাম।”

এখন প্রকাশের স্লিগ বছর পরে যখন এই বার্নাড শ লিখিত এইসব (*The Star* এবং *The World* পত্রিকায় প্রকাশিত) সঙ্গীত-সমালোচনা চাপ পড়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল, তখন সঙ্গীতবিদ এবং সমালোচকরা সেই গ্রন্থ পাঠ করে বিস্মিত হলেন। শুধু যে হুদ এবং বসে সেই রচনাগুলি ভরপুর তা নয়, সঙ্গীত-সম্পর্কে লেখকের গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।

ফ্রাঙ্ক হারিসের একই মূলধর্ম পরিচয় প্রয়োজন। তিনি বার্নাড শ-র যে জীবনী লিখেছিলেন, স্বয়ং বার্নাড শ-কে তা সম্পাদনা করতে হয়েছে। হারিসের জীবনকথায় সে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

হারিসের সব-কিছুই বিচিত্র। তাঁর আকৃতি অদ্ভুত। শেঁকবল অল্প বাহু প্রভা ও স্তন্য উত্তক করে, কিন্তু দৈর্ঘ্য মাত্র পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। ছুতার গোড়ালি দু'ব উঁচু, আর গলা-বক কলারের জন্য তাঁকে দীর্ঘ

দেখাতো। কালো ঘনচুল কপাল পৃষ্ঠে নেমে এসেছে, প্রকাণ্ড কাইক্লোপোয়ক আর স্থলীর্থ কানের অস্ত্র দেখলে মনে হবে কর্মান সজাটের আত্মীয়। জন্মকালো শোশাক, হাতে আত্মী, গায়ে চার-কেটি, মাথাঘ হামবুর্গ-টুপী,



চোখ-দুটি যেন ইলেকট্রিক বাণের মতো জ্বলছে। অপর সমোহনী দৃষ্টি; গলায় স্বর গভীর, চড়া পরায় বাধা।

যে ইংরাজী ছুপে তাঁকে পার্শ্বানো হুৎ সেটি মনোমতো না হওয়ায়, চৌকবছর বয়সে তিনি আমেরিকায় গালিরে বান। ছা-ইয়েক তিনি ছুতা গালিশ করেছেন। কিছুকাল ক্রক সিন থ্রি জে র কাল্পারও ছিলেন।

১৮৭৮-এ লণ্ডনে ফিরে এসে

বার্নড শ একেবারে *Speculator* পত্রিকার মিলি: এলেক্সান্দারিয়ান যোগ দিলেন। কয়েকমাস পরেই *The Evening News*-এর সম্পাদক হলেন। রসালো দ্যলগর এবং চুল ক্যান'র-হেডলাইন দিয়ে তিনি বেশ কর্মিয়েছিলেন। পত্রিকার অন্তরত্ব অংশীদারের কিন্তু এইসব ভালো লাগছিল না। একমাস তৌরী নেতার বিলছে জৈনক অভিনেত্রী বিখানত্রয়ের মাঝলা এনেছিল। ক্রাক স্বয়ং এট মাঝলার বিবরণ লিখতেন। এমনসব হেডলাইন যে, গালিক তাঁকে বরখাস্ত করলেন।

অতঃপর ক্রাক *Fortnightly Review* নামক এক অভিজাত পত্রিকার সম্পাদক হলেন। সেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে পদচ্যুত করলেন।

প্রথম দিকে মনে গেলেও, ক্রাক আবার উঠে দাঁড়ালেন। সেই বছর (১৮৮৪) সেপ্টেম্বর মাসেই *Saturday Review*-এর মালিকানা স্বা কিলে নিলেন।

শ বললেন—“আমি বুকেছিলাম এই ব্যক্তি আমার যোগ্য সম্পাদক এবং আমিও তাঁর যোগ্য লেখক। ভেবে দেখলাম, একই বুদ্ধিমত্তা চলে না রাখলে পোকটি আমাকে দাবিরে রাখবে, তাই ইয়েইসকে বেভাবে দেখতাম সেই ভক্তিতে কথা বললাম।”

এই সময় শ'র বয়স উন্নতচিহ্ন। পাতলা, দীর্ঘ চেহারা; দাঁত দাড়ি। ইয়েডের পোশাকে অসতর্কভাবে সজ্জিত। লোকটির মুখ-চোখের আকৃতি দেখে তার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না।

ক্রাক বললেন—“আমি চাই অন্তত: জন-দ্বয়ের সুদক্ষ লেখক আমার পত্রিকার নিয়মিত লিখবেন। তাহলে প্রতি সপ্তাহে তিনটি প্রবন্ধ পাব। প্রতিটির মধ্যে মৌলিকর থাকবে।”

শ প্রশ্ন করলেন—“এই ছ'জন প্রতিভাধর ব্যক্তির নাম কি?”

ক্রাক জবাব দিলেন—“এইচ. জি. ওয়েলস—নভেল সমালোচনা করবেন। ডি. এল. ম্যাক্সল (পরে লণ্ডনের 'টেট-গ্যাসারি'র প্রধান হয়েছিলেন), বর্তমানে লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ কলা-সমালোচক, আমার পত্রিকার যোগ দেবেন। চামার্স মিচেল (পরে 'রয়্যাল জুগলজিক্যাল সোসাইটি'র প্রধান) বিজ্ঞান-সম্পর্কিত আলোচনা লিখবেন। আমার মনে হয়—কানিংহাম প্রেহাম, আর্থার লিনল্স, ওয়াসটার পেটার, অদকার ওয়াইল্ড প্রভৃতি লেখক, ঠাঠা মাঝে মাঝে আমার পত্রিকার লিখবেন, তাঁদের সম্পর্ক আপনায় ভালো লাগবে।”

শ বললেন—“বেশ, কিন্তু দুটি শর্তে।”

—“কী সেই শর্ত?”

—“প্রথমত: প্রাচীন রীতিতে সম্পাদকীয় 'আমরা' বর্জন করতে হবে। 'আবরা' হলে 'আমি' চালাতে হবে। আর দ্বিতীয়ত: আমার বেতন হবে সপ্তাহে ছ-শাব্দ।”

—“তখাখ।” সহস্রে বললেন ক্রাক।

নতুন উৎসাহে ক্রাক হুত হল।

ক্রাক লিখেছেন—“চমৎকার কাজ করেছিলেন বার্নড শ। সাংবাদিক হিসাবে বোধকরি এই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য, এবং বৃত্তি হিসাবে নিয়মিত সাংবাদিক জীবনের এট শেষ।”

ক্রাক হারিস সেই সময়কার কথা আরো লিখেছেন। সাংবাদিক বার্নড শ'র পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে হারিসের কথায়:

“শ ছিলেন লেখক হিসাবে চমৎকার। সর্বদা ঠিক সময়ে লেখা দিতেন, নেহাত কোনো কারণ না থাকলে ঘেরি হত না। সর্বদা বিচারশীল, নিজের গুরু মনোদান করতেন, সর্বদা ভালো কাজই করতেন। আমি বুকেছিলাম, সমসাময়িক নাটক এমন তীক্ষ্ণভাবে আর কেউ সমালোচনা করেননি। লেনিং-রচিত *Dramaturge*-এর সঙ্গে শ'র প্রবন্ধগুলির জুগলমূলক সমালোচনা করে দেখেছি, শ জিতেছেন। শ'র সমালোচনামূলক প্রবন্ধ যেন তাঁর সঙ্গে বসে দুখোমুখী কথা কওয়া, পরবর্তীকালে নাটক-রচনার এই

ডকী তিনি এগুণ করেছিলেন।—“যাকে মাঝে বার্নাড শ’কে অনুরোধ করতাম প্রবন্ধের নির্মাণ কমাতে। কয়েকমাস ধরে আমি মনে মনে গভীর আধ্যাত্মিক লাভ করেছি শ’র মতো লোককে আমার পরিকার পেয়েছি বলে।”

Saturday Review অভ্যন্তর জনপ্রিয় হয়ে উঠল। একজন লেখক লিখেছিলেন—“প্রতি সপ্তাহে আমরা এই পত্রিকা ডিস্কাস করে, ত্রুটি করে, ধার করেও সংগ্রহ করতাম।”

শ মনে করতেন, সমালোচকের কর্তব্য বাস্তবের চেতনাকে বিচলিত করা,—তারের মনে ভিত্তি, ভাবনা এবং বেষ্টনা সৃষ্টি করা, এবং তাঁর সব সমালোচনার মূলে একটি বিশিষ্ট ধারণা বা বিশ্বাস ছিল। মধ্যযুগে চার্চের যে ভূমিকা ছিল, সমসাময়িক কালে নিরেটোরও সেই ভূমিকা।

Saturday Review-এর সঙ্গে বার্নাড শ’র সংযোগের শেষের দিকে তিনি কয়েকটি নাটকের সাক্ষ্যের কলস জোগ করতে শুরু করেছেন,—দীর্ঘকালি টেবিলে জার্মান ভাষায় তাঁর নাটক অনুবাদ করে জার্মান ও অস্ট্রিয়ান থিয়েটারে মঞ্চস্থ করছিলেন: এদিকে রিচার্ড ম্যানস্ফীল্ড *The Devil’s Disciple* নাটক আমেরিকার মঞ্চস্থ করে সাক্ষ্যলাভ করেছিলেন। তবে দীর্ঘকালি ছিলেন শ’র ডক্টর, ম্যানস্ফীল্ড কিন্তু তা নয়।

ম্যানস্ফীল্ড বলেছেন—“প্রতি রাতে আমি আমার শয্যাভাঙে উপরবে আর্থন: কানাই নাটকের সাক্ষ্যের জন্ত, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলি, এনাটক বার্নাড শ’র লেখা কেন হল?”

ম্যানস্ফীল্ড কিন্তু বার্নাড শ’র ঘরাই ব্রডওয়েতে প্রতিষ্ঠিত হলেন, কিন্তু শ’র আর কোনো নাটক তিনি মঞ্চস্থ করেননি। শ কিন্তু এক চোখ ম্যানস্ফীল্ডের দিকে আর এক চোখ এলেন টেরীর দিকে যেহে *The Man of Destiny* লিখেছিলেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বার্নাড শ ক্রান্তকে বললেন—“সাংবাদিকতা করে আমি আর্থিক দিক থেকে ঠিকছি; যে সময় সাংবাদিকতার ব্যয় করি, সেই সময় কমেতি রচনা করলে তার দশগুণ আর হয়।”

ক্রান্ত বললেন—“তাহলে আপনি আমার কাগজে লেখা বন্ধ করুন। আমিও এই কাগজ বিক্রি করে দেব মনে করছি, যদি আর মাস দুই চালাতে পায়ের, অন্ততঃ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, তাহলে আমি সুখি হই।”

বার্নাড শ জবাবে বললেন—“আর কিছু বলতে হবে না, আপনার রাজত্বের অবসান না ঘটা পর্যন্ত আমি আছি।”

—“ভালো কথা, কিন্তু আমার জন্ত আপনার এই ভাগ-বীকর কিরকম লাগছে—”

—“ভাগ-বীকর নয়, এট-ই স্ত্রাবসকৃত ব্যবস্থা। *Saturday Review*-তে আপনি আমাকে নাট্য-সমালোচনা লিখতে বলার আমার অনেক দিক থেকে ভবিধা হয়েছে, থিয়েটার এবং তার সমস্তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, আমার সাক্ষ্যের সহায়ক আপনার পত্রিকা। আজ এই সাক্ষ্যের মূলে আপনি থাকেছেন, আমি অন্ততঃ তার আর্থিক গুণ পরিশোধ করি।”

—“আপনি যদি এই কথা বলেন, আমার কিছু বলার নেই। নাটকে তাহলে অনেক আর হচ্ছে।”

—“হ্যাঁ, ইংলণ্ডে নয়, আমেরিকা প্রচুর টাকা দিচ্ছে। এত টাকা যে, খরচ করতে পারি না। ব্যাংকে একটা হিসাব মূলেছি, আমার ব্যাকার এখন আমাকে দেবে হার্সেন—লেখক শুধু টাকা চোজগার করেছেন, আমার জবাবে—এ যে দারুণ বিশ্বাস।”

এইভাবে বার্নাড শ’র জীবনের সাংবাদিক ও সমালোচক পর্ব শেষ হয়ে এল।

ক্রান্ত হারিস ১২৩১-এ বার্নাড শ’র জীবনী-রচনার কালে মারা যান। সেই প্রথম শেষ করেন বার্নাড শ স্বয়ং। ক্রান্তের বিধবাকে সাহায্য করার জন্যই তিনি তা



শ-এর ভাস্কর

[এই. বি. গ্রেসল লিখিত]

করেছিলেন। ক্রান্ত হারিস সম্পর্কে শ বলেছেন—“He is neither first rate, nor second rate, nor tenth rate. He is just his horrible unique self.”



রাষ্ট্রাবান্ধ

‘ব্রৌপনী’

বেসমের বড়ার ডালনা

বৌকি বাগে হলে অনেকসময় অল্পবিধায় পড়তে হয়, বিশেষতঃ যদি ভাড়াভাড়া থাকে। বেসমের বড়ার ডালনা কোনো অংশে বৌকার চেয়ে খারাপ হয় না, যদি স্বয়ং করে রাখা হয়। চোপার ডালের বেসম পরিমাণমতো জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়, তাতে হুন ও একটু মিষ্টি দিয়ে। বেশ ভিজলে, তাতে একটু বাবার সোডা ও অল্প লবণ-বাটা মিশিয়ে ক্ষেঁটিয়ে নিয়ে ছোট ছোট করে বড়া ভেজে নিতে হয়। বড় আলু বড় করে কেটে, আগে তেলে ভেজে, তার পরে পেঁয়াজ, অল্প পরিমাণে রসুন হালুদ লবঙ্গ আদা, তেজপাতা লবঙ্গ এতলে ফোড়ন দিয়ে কষে নিয়ে জল ঢেলে দিতে হয়। ফুটে উঠলে, আলু দিতে হবে। আলু সিদ্ধ হলে বড়াগুলি কড়াতে দিয়ে ঘি দিতে হয়। নামাখার সময় গরম-মশলা দিয়ে বেশ কোল-কোল থাকতে নামাতে হবে। পেঁয়াজ না দিয়ে, হিা দিতে পারা যায়।

কাঁচকলার খোসার বড়া

দীতকালে যখন পুষ্টি কীটকলা পাওয়া যায় তখন এর খোসাগুলি ফেলে না দিয়ে বেশ দুধবেচক ধোবার করা যায়। ভালো করে মুখে নিয়ে, খোসাগুলি শিক করে ফেলতে হয়। তারপর জল করিখে, শিলে মিষ্টি করে বেটে নিতে হয়। ঐ বাটা খোসার সঙ্গে পরিমাণমতো বেসম ছান মিষ্টি কাঁচ-লবঙ্গ আর পেঁয়াজ-কুঁচি দিয়ে বেশ করে মেখে ফেলতে হবে। পেঁয়াজ-কুঁচি না দিলেও চলে। মিশ্রমিশ্রীকৃত তাহলে খেতে পারেন। তারপর ছোট ছোট বড়ার আকারে নরম গাচে তেলে ভেজে চায়ের সঙ্গে পরিবেশন করলে, তেজিটেবল চপের চেয়ে কোনো অংশে খারাপ হবে না।

এইভাবে ডালো মৈনিতালে-আলুর খোসাও বড়া করা চলে।



বিজ্ঞান

পৌষ সন্ধ্যায় আকাশ

ঐকামিনীকুমার দে

শীতের নির্মল আকাশ। নবরমণস চিনিবার সর্বাঙ্গকা উপযোগী সময় এখন। এই মাসে কালপুষ্প-মণ্ডল এবং কতকগুলি প্রথম প্রভাব তারা পূর্বাংশে সন্মিলন করিয়া অপরূপো দিগ্ভাষ করে। এখানে পূর্ণপরিচিতি মণ্ডলের বিষয়েই আলোচনা করি।

স্বয়ং এই মাসে মঙ্গলশিঙে, হস্তাঃ মঙ্গলশিঙে স্বর্গাশ্বের সন্ধ্যাই অপরূপো হইতেছে। মঙ্গলশিঙে কিছু পরে অস্ত হইবে—মঙ্গলকেও এখন ভালো করিয়া চেনা যাইবে না। পরিত্রিঙে মঙ্গলকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দেখা যাইতেছে। পেগাসাসের চতুর্ভুজ পশ্চিমাকাশে আবিষ্কৃত। গ্রাভার দক্ষিণ দিকে মীনরাশির পাটটি কৌণোজ্ঞান তারা মিলিয়া যে ছোট পক্ষপাতাকৃতি করিয়াছে তাহাকে দেখিতে পাঠিতেছি। এখন হইতে মীন-মণ্ডলের অস্ত তারাগুলির অস্তরণ করিতে হইবে। শেষের দিকের তারাগুলির পূর্ণদিকে হাইড্রালান্দ-মণ্ডল এবং মেঘরাশি। আরও পূর্ণ দিকে কৃষ্ণপাক্ষ সহ মঙ্গলশিঙে তাহার V-এর আকৃতি ও প্রথম প্রভাব লালরঙের বোধহী তারাগুলি সাহায্যে চিনিতে পারা যাইতেছে। সূর্যের উত্তর-পূর্বে অরিগান-মণ্ডল ও তাহার প্রথম প্রভাব তারা ব্রহ্মরথকে দেখা যাইতেছে। পেগাসাস-চতুর্ভুজের উত্তর-পূর্ণ কোণের তারা হইতে এণ্ড্রোমিডা-মণ্ডল এবং তাহার পর পার্সিফ-মণ্ডলকে অস্তরণ করি—উত্তর দিকে ক্যাসিওপিয়া মণ্ডলকে অস্তরণ করিয়া আবিষ্কৃত—ক্যাসিওপিয়ার পশ্চিমে সিফিফ-মণ্ডলকে দেখিতে পাঠিতেছি। দক্ষিণ আকাশে সিটাস-মণ্ডল মধ্যরাত্রে অস্তরণ করিয়াছে।

মিথুন—রমণ-মণ্ডলের পূর্ণ দিকে মিথুন। এই মণ্ডলের অপেক্ষাকৃত উজ্জল তারাগুলি একটি আয়তক্ষেত্র রচনা করিয়া রহিয়াছে। মনে হয় যেন হস্তের মস্তক মুখোমুখি চাহিয়া আছে। আয়তক্ষেত্রের পূর্ণপ্রান্তের দুইটি নক্ষত্র বেল উজ্জল—হলুদ-বস্ত্রের প্রথম প্রভাব তারাটি 'প্রথম পুনর্বহ' (Pollux), আর সমান উজ্জল নীল তারাটি 'দ্বিতীয়

পুনর্বহ' (Castor)—আকাশের উত্তর-পূর্ণ দিকে ইহারদিককে দেখা যাইতেছে। (Pollux ও Castor-এর মিলিত নাম বিবচনপূতক 'পুনর্বহ')।

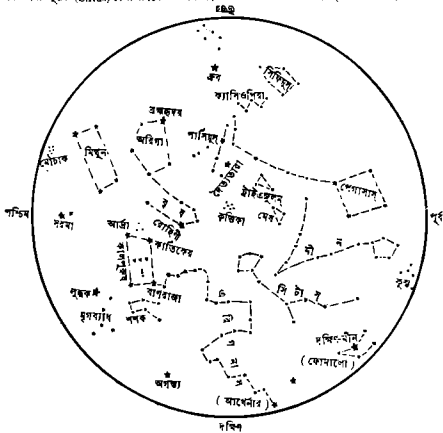
কালপুষ্প (Orion)—মঙ্গল আকাশে ইহার ভাষ সূর্য ও উজ্জল মণ্ডল আর নাই। সূর্যের পর ইহাই সন্ধ্যায় পরিচিত। শীতের আকাশকে এই মণ্ডল অতুল পোভার রূপায়িত করিয়া রাখে। ইহাকে ঠিক পূর্ণ দিকে দেখা যাইতেছে, কাশনের শেষে সন্ধ্যায় ইহাকে প্রাণ মাখার উপর দিগা যাইতে দেখা যাইবে। জ্যেষ্ঠ সন্ধ্যায় ইহাকে আমরা পশ্চিমাংশে অজাচলগামী দেখিয়াছিলাম। কালপুষ্প-মণ্ডলে চারটি উজ্জল তারার একটি আয়তক্ষেত্রের প্রাণ মাফানে আড়াআড়ি ভাবে তিনটি তারা আছে। ইহার নক্ষত্রের লইয়া একটি মাধুর্যের মূর্তি বহন করা যায়। উত্তর দিকে কাছাকাছি তিনটি কৌণোজ্ঞোতিঃ তারা এই পুরুষের মস্তক—নাম 'মুগদিরা নক্ষত্র'। পূর্ণোক্ত আড়াআড়ি তিনটি তারা তাহার কটিদেশ। আবার ঋগ্নালা আলোর ভিতর করটি তারা কটিদেশ হইতে বিলম্বিত তরবারির মতো দেখায়। কতকগুলি তারার সমাবেশে হাতের ধনু রচিত হইয়াছে। আয়তের উত্তর-পূর্ণ কোণে লাল উজ্জল তারার নাম আট্রা (Betelgeuse); কেন্দ্রাকূনী বিপরীত দিকের নীল তারাটি বাগ্নাকা (Rigel)—উভয়েই এখন প্রভাব তারা। কালপুষ্পের বক্ষদেশে আয়তের দ্বিতীয় তারারটি নাম কাটকের। ঋগ্নালা আলোর মতো বাহা দেখা যাইতেছে তাহা কালপুষ্প-মণ্ডলে অবস্থিত নীহারিকা। আকাশে কোনো কোনো স্থান পাতলা উজ্জল বেঘের মতো দেখায়। ইহাদের সাধারণ নাম নীহারিকা। ইহারা প্রথমতঃ ব্রহ্মী বস্ত্রের। ইতিপূর্বে একরকম নীহারিকার কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি। তাহারা আমাদের নক্ষত্রজগতের মতো বহু কোটি নক্ষত্র সমন্বিত পুণ্ড্র নক্ষত্রজগৎ। সূর্যের কোটি কোটি নক্ষত্রের সম্মিলিত আলোকে এইরকম কৌণোজ্ঞান বেঘের মতো দেখায়। দ্বিতীয়প্রকার নীহারিকা

মহাপুৰুষ বিস্তৃত প্যাল ও বসুন্ধৰা দুইয়া গঠিত। কালপুৰুষৰ
নীচাৰিকা এই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত।

মুগব্যাধ বা বড়কুকুৰ মণ্ডল (Canis Major)—কাল-
পুৰুষৰে সন্নিবেশৰে তিনটি তারা বে বেগাৰ আছে, সেই
বেগা ধৰিয়া দক্ষিণ দিকে বাইতে থাকিলে আকাশৰে
মণ্ডল তारा পুৰুষ (Sirius) দেখা যাইবে—উজ্জলতাই

নাম সৰম (Procyon)। ইহা ছোটকুকুৰ (Canis Minor)
মণ্ডলৰ তারা।

পুৰুষ, সৰম এৰা আৰু এই তিনটি প্ৰথম প্ৰভাৱ তারা
এক বড় সৰম বাহু জিহ্বাৰে তিন কোণে আছে। ইহা লক্ষ্য
কৰা যায় যে, উত্তৰে ব্ৰহ্মপুৰুষ হইতে আৰম্ভ কৰিচা গোহিনী
এৰা পৰ পৰ বাণবাজ, পুৰুষ, সৰম, পুনৰ্ভৱ এই পাঁচটি



ইহাৰ পৰিচয়। এই তাৰাটি মুগব্যাধ-মণ্ডল: মণ্ডলটি
বড়কুকুৰ (Canis Major) নামেও পৰিচিত। এই মণ্ডলৰ
তাৰাগণিকে একটি শিকারী কুকুৰ ৰূপে কল্পনা কৰা হয়।
মুগব্যাধ ও কালপুৰুষ বা চুগ সৰমৰে আমাদেৰে বেলে
প্ৰচলিত আখ্যায়িকা অম্ৰহাৰণ মানে দেখা হইয়াছে।

মিথুনৰ পুনৰ্ভৱ দক্ষিণে এৰা কালপুৰুষৰ উত্তৰ-
পূৰ্ব কোনাৰ একটি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ তারা দেখা যায়—ইহাৰ

প্ৰথম প্ৰভাৱ তারা দীৰ্ঘৰে আকাশকে সন্ধানিত কৰিচা
একটি বৃদ্ধাভাৱে উপৰ বহিমাছে। আকাশৰে এই অংশৰ
ভিতৰে বৃষ, অৰিগা, মিথুন ও কালপুৰুষ মণ্ডল। দক্ষিণে
অধিক হইলে ইহাৰেৰে বেলে ভালো কৰিচা দেখা যাইবে।

দক্ষিণ-পূৰ্ব দিকে একটি প্ৰথম প্ৰভাৱ তারা দেখা
যাইতেছে, তাহাৰ নাম অগস্ত্য।

লক্ষ ও নীচী মণ্ডল—কালপুৰুষৰ ঠিক দক্ষিণেৰে

ভারতবর্ষে শব্দ-মণ্ডলের অন্তর্গত। নদী-মণ্ডলের তালিকাগুলি
কিঞ্চিৎ। ইহা এক স্থলীয় মণ্ডল। কালপুত্রের বাণ-
প্রাকারে উত্তর-পশ্চিম হইতে আঘাত করিয়া কতকগুলি তাহা
অকিঞ্চিৎ-বাকিরা বাকীদ্বীপে পড়ি করিয়াছে। শেষ ভারতটি
এখন এডার আধার্নার (Achernar)। চির-সাহায্যে এই
মণ্ডলটি চিনিতে হইবে।

শব্দকালের নির্বল আকাশে ছায়াপথও এক অপরূপ দৃশ্য।

এই মাসে পূর্ণিমার চন্দ্র পুজা নামক নক্ষত্রে থাকে। পুজা
কর্কটরশ্মির তাগা; বলা বাহুল্য, কর্কট নক্ষত্র উদিত
হইতেছে। ইহার পরিচয় মাথ মাখে দিব।

তরুকে নক্ষাতারা রূপে দেখা যাইবে। পূর্ণ মাসের
প্রথমদিকে সূর্য্যোক্তের কিছু পরে এবং মাসের শেষদিকে
সূর্যের আগে অস্ত্র যাইবে, অস্ত্র কোনো গ্রহ নক্ষত্র দেখা
যাইবে না।

পৃথিবী ছাড়িয়ে

অধ্যাপক ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ প্রসাদ গুহ

চিন্তার পথে দূর অস্ত্র গেলে যখন চারদিক অধার হয়ে
আসে, তখন কালো আকাশের গায়ে যেন হাজার হাজার শীপ
ভ্রমণ করে। এসব কতকগুলি দূর উজ্জল—যেন দলপল্ল ক'রে
ভ্রমণে, অধার কতকগুলি দূরই রান—যেন মিটমিট করছে।
এসব কালেও নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। কোনটি লাল,
কোনটি নীল, অধার কোনটি বড়-বড় লাল।

আকাশের গায়ে এই যে হাজার হাজার শীপ ভ্রমণে,
এসব মতো আটটি গ্রহ এবং গ্রহাণুগুণ বারে বারী নক্ষত্রলোই
নক্ষত্র। নক্ষত্রের থেকে গ্রহদের চেমবার উপায় কি?
নক্ষত্র যেন সকলদিকে কিংকিন্ করছে বলে যেন হয়, কিন্তু গ্রহ
শিরডায়ে উজ্জল আলো দেখে, কিংকিন্ করে না। এর
কারণ, নক্ষত্রের আলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসে
কিন্তু বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর স্বর্ণনও স্থির থাকে না, উত্তাপের
ভাৱতমা অতসারে সবলমহায়ে তাদের কিছু-না-কিছু পরিবর্তন
হয়। কাজেই নক্ষত্রটি থেকে যে আলো আসছে তার
গতিপথও প্রতিমূহুর্তে বদলে থাকে। নক্ষত্র এতদূরে রয়েছে
যে, তার আলো যেন একটি বিন্দু থেকে আসছে। কাজেই
তার আলোর গতিপথ সাধারণ পরিবর্তন হ'লেই তা আমাদের
চোখে ধরা পড়ে। এর কপে প্রতিমূহুর্তেই যেন হয় নক্ষত্রটি
যেন একটু সরে গেছে। তাই আমাদের চোখে একটা
বিকিরণের অহুভূতি জাগে। নক্ষত্রের তুলনায় গ্রহ
অনেক কাছে আছে বলে তাকে একটা ছোট চাকতির মতো
কেন্দ্রে। আর এই চাকতির অনেকগুলি বিন্দু থেকে আলো
এসে আমাদের চোখে পৌছায়। বায়ুমণ্ডলের ক্রিয়ায় এই
আলোক-রশ্মিগুলোর স্বাভাবিক কিছু-না-কিছু বিক-পরিবর্তন
হয়। কিন্তু এই বিক-পরিবর্তনের কল পরস্পরের সঙ্গে

কাটাকাটি ঘায়, কাজেই এসব সমবেত কপে বিশেষ কোনো
পার্থক্য আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। এইজন্য গ্রহের
আলো উজ্জল এবং স্থির বলে যেন হয়। গ্রহদের চেমবার
আর একটা উপায়—কিছুদিন ধরে একটা গ্রহের অবস্থান
নক্ষত্র কয়েকটি বেঝা যায় যে, নক্ষত্রমণ্ডলের তুলনায় গ্রহটি
ক্রমাগত স্থানচ্যুত হয়ে যায়।

নক্ষত্রের নিজের আলো আছে। একজন বিজ্ঞানীদের
কাছে সূর্যও একটা নক্ষত্র বলে গণ্য হয়। গ্রহদের নিজের
আলো নেই। সূর্যের আলো এসব গায়ে পড়ে চারদিকে
ছড়িয়ে যায়। সেই ছড়ানো আলোর কিছু অংশ পৃথিবীতে
এসে পৌছায়। অধার ঘরে একটা আয়না রাখা হ'ল, কিছুই
দেখা যাবে না, কারণ এ থেকে আলো বেরোয় না। এখন
একটা প্রতীপ আললে দেখা যাবে, তা থেকে আলো বেরোচ্ছে।
এবারে প্রতীপের সামনে আয়নাটা রাখা হ'ল। প্রতীপের
আলো তার গায়ে পড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তাই এবারে
আয়নাটাও দেখা যাবে। সূর্যও একটা বিশাল প্রতীপের মতো
ভ্রমণে ঘায় গ্রহগুলো তাইই আলো যেন আমাদের মতো
ছড়িয়ে দিচ্ছে, তাই আমরা গ্রহদের উজ্জল রূপ দেখতে পাই।

আসে মাগনের বিদ্যায় ছিল যে পৃথিবী মাঝখানে স্থির
রয়েছে আর তাকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ,
নক্ষত্র সব ঘুরছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী টলেমী ১৪০ খ্রীষ্টাব্দে
বেমতবাদ প্রকাশ করেন তাই প্রায় চতুর্দশ শতাব্দী ধরে সত্য
বলে গৃহীত হয়েছিল। বোড়ল শতাব্দীতে গোল্যান্ড-সেনের
বিজ্ঞানী কোপারনিকাস সর্বপ্রথম বললেন যে, পৃথিবী
গোলাকার এবং সে নিজের বেসল-এর উপর নাড়ির মতো
ঘুরছে, তাই আমরা গ্রহ-নক্ষত্র সৈনিক গতি দেখতে পাই।

আরও গবেষণার ফলে তিনি নিশ্চিত হুবহুই যে, সূর্যের চারদিকেই পৃথিবী এবং অসংখ্য গ্রহগুলি ঘুরছে। এখন মনে করলে গ্রহদের গতিবিধি নির্ণয় করা অনেক সহজ হয়। কিন্তু তাঁর এইসব আবিষ্কার জননকার অল্প ধর্মবিশ্বাসের এতই বিরোধী ছিল যে, লোণ তেজ বছর ধরে তিনি কাউকে একথা বলতেই সাহস পেলেন না। তাঁর আবিষ্কারের কথা শুনে অসংখ্য জ্যোতিষদ্বারা ভাবতে পারলেন, কিন্তু কেউই এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন না। এর পর ইটালির বিজ্ঞানী গ্যালিলিও নিজহাতে একটি দূরবীন তৈরি করলেন। এর সাহায্যে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের কথা জানা আরও সহজ হ'ল। কোপারনিকাসের মতো তাঁরও দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, সূর্যের চারদিকেই পৃথিবী ও অসংখ্য গ্রহগুলি সব ঘুরছে। তাঁর এই বিশ্বাসের কথা তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে লাগলেন। কিন্তু এমনকি তাঁকে খুবই বিশপস পড়তে হ'ল। ধর্মবিরোধীরা শিক্ষা দিচ্ছেন বলে তাঁর বিচার হ'ল। প্রাণরক্ষার অস্ত্র দেখে তিনি তাঁর এই মতবাদ অব্যাকার করতে বাধ্য হলেন। এ থেকেই বোকা বাবে, আগেকার মাথাব কত আচ্ছন্ন ছিল, আর তাদের কাছে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রকাশ করা ছিল কত কঠিন। কিন্তু এইসব বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করেই মাহুয় জায় সাধনার পথে এগিয়ে চলেছে।

গ্যালিলিওর দূরবীন ছিল খুবই ছোট, আর তার শক্তিও ছিল খুবই পরিমিত। দূরবীনের সেই দুর্দিন আর নেই। এখন যেন-বিচ্ছেপ অনেক পশ্চিমালী দূরবীন নির্মিত হয়েছ। আর এইসব যন্ত্রের সাহায্যে অসংখ্য স্থগলী বিজ্ঞানী তাঁদের সম্বন্ধী দৃষ্টি নিয়ে অসংখ্য আকাশের বিভিন্ন বস্তু উন্মোচনে ব্যস্ত রয়েছেন। তাঁদের অসংখ্য অধ্যবসায়ের ফলে আজ অধি নক্ষত্রলোকের যে-সকল বিভিন্ন তথ্যের সম্বন্ধ পাওয়া গেছে তা ভাবলে বিস্ময় অতিক্রম হ'তে হয়।

আধুনিক গবেষণার ফলে জানা গেছে, নক্ষত্রদের মধ্যে কোনটি আকারে সূর্যের মতো বা তার চেয়ে অনেক ছোট, আবার কোনটি সূর্যের চেয়ে অনেক বড় এবং জেজোদর। পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে রয়েছে, তাই তাদের এত ছোট দেখায়। রাতের বেলা খালি চোখেই প্রায় তিন হাজার নক্ষত্র একদিকে দেখা যায়। কাজেই খালি চোখে মোট প্রায় হাজারাব নক্ষত্র দেখা সম্ভব হয়। বিজ্ঞানীরা দূরবীন ও ক্যামেরার সাহায্যে প্রায় ৪০ কোটি নক্ষত্রের পরিচয় পেয়েছেন।

প্রাচ্যের রাতে উত্তর থেকে দক্ষিণ আকাশে ছুড়ে একটা উজ্জল পদার্থ মতো দেখা যায়, এর নাম ছায়াপথ (Milky-

way)। পশ্চিমালী দূরবীন দিয়ে দেখলে বোকা যায় যে, অসংখ্য নক্ষত্র মিলে এই ছায়াপথের সৃষ্টি করছে। বিজ্ঞানীদের মতে ছায়াপথই আমাদের নক্ষত্র-সমূহের লীমা নির্দেশ করছে।

অসংখ্য নক্ষত্রের মাঝে আর-একপ্রকার অতিশুদ্ধর জ্যোতিষ্কের সম্বন্ধ পাওয়া যায়, তাদের নীহারিকা (Nebula) বলা হয়। দূরবীন দিয়ে দেখলে নীহারিকার শাভালা মেঘের মতো রূপ আমাদের চোখে পড়ে। নীহারিকা প্রধানতঃ তিন রকম—(১) উজ্জল কিন্তু হালকা মেঘের মতো, (২) উজ্জল কিন্তু চরকির মতো এবং (৩) নিশ্চুত। উজ্জল মেঘের মতো যে নীহারিকা, সেই সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অতিমত এই যে, এগুলি অতি বৃহৎ আকারের সমষ্টি। আমাদের অস্থান, এরা নিঃসঙ্গ জ্যোতির্মান নয়, অসংখ্য নক্ষত্রের আলোকেই এরা আলোকিত, তাই এদের উজ্জল মেঘের মতো রূপ আমরা দেখতে পাই। অতি পশ্চিমালী দূরবীন দিয়ে দেখলেও, এর মধ্যে পৃথক্‌ তারকার অস্তিত্ব বোকা যায় না। চরকির মতো যে নীহারিকা, সেই সম্পর্কেই বিজ্ঞানীদের কৌতূহল সবচেয়ে বেশি। কারণ, পশ্চিমালী দূরবীন দিয়ে দেখলে মনে হয়, বহুবিস্তৃত জ্বলন্ত বাষ্প-পি মেনে একটা চরকির মতোই বসবসু ক'রে দুরছে। এর মাঝে কয়েকটি আলোর চাকুতিও বেশ স্পষ্ট বোকা যায়। সবত এইসব চাকুতির আকার এক-একটি নক্ষত্রের চেয়েও বহুগুণ বড়, কারণ অতি পশ্চিমালী দূরবীন দিয়েও একটি নক্ষত্রকে আলোর চাকুতির মতো দেখা যায় না। নিশ্চুত নীহারিকার নিজস্ব কোনো আলো নেই, তাই অদূর নক্ষত্রসমূহের শাভনে একে অন্ধকার কালো মেঘের মতো দেখায়।

নক্ষত্রদের মধ্যে খুবই আমাদের সবচেয়ে কাছে রয়েছে, কিন্তু তার দূরত্বও পৃথিবী থেকে প্রায় ম'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। এরপরই যে নক্ষত্রটি আছে, তার নাম 'প্রক্সিমা সেন্টারি' (Proxima Centauri)। এর দূরত্ব হ'ল পড়িশ লক্ষ কোটি মাইল। অসংখ্য নক্ষত্র রয়েছে কোটি কোটি মাইল দূরে। দূরত্বের এই হিসেব দেখলে মাথা ঘুরে যায়! বিজ্ঞানীরা তাই নক্ষত্রের দূরত্ব মাপার জন্য একটা যন্ত্রের বাশনী ত্রিক করেছেন। এই বাশনী কিরকম তাই বুঝিয়ে বলছি।

ফুলের একটা বই কতটুকু লম্বা হয়? একটা বেল মিলে মেরে বলব, মাত ইকি। বসবার ঘরটা কতখানি লম্বা? এখানে বেল দিয়ে মাপা মূল্যবান, তাই হুটের মাপ দরকার। কিতে মিলে মেরে বলব, ঘরটা বোম হুট লম্বা। ধরা থাক,

দূরব আরা অনেক বেশি হ'ল, যেমন—মলকাতা থেকে দিল্লী কতদূর তাই যোগে বলতে হবে। এবারে হিসাব করতে হবে মাইলে। কিন্তু নক্ষত্রের দূরব মাশতে দিয়ে আমরা মাইলের হিসেবেও হিসেবদারী হয়ে পাই। প্রক্সিমা সেন্টরাই নক্ষত্রের দূরব অর্থাৎ দূরত্ব দিয়ে প্রকাশ করলে তেমন গাড়ার দেখা থাকে—

২৫,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল, অথবা ২৫×১০^{১০} মাইল। দূরত্বের নিকটবর্তী নক্ষত্রের কোনোই এই অর্থশা! এ থেকেই অর্থমান করা যায়, দূরবর্তী নক্ষত্রের দূরত্বকাশে আরও কত বহুগুণতর বৃদ্ধি হবে।

আমরা জানি, আলো প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে যায়। অতীতের একটা শীশ আলোকে, নাকি এক সেকেন্ড সময় আলো চলে যাবে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল দূরে। এনে যদি বলি, একটা মিনিট এক 'আলো-সেকেন্ড' দূর আন্তে, তাহলে দূরত্বে হবে যে সেই তিনিশটা আলোকে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল দূর রয়েছে। এইভাবে কত দূরত্ব দূরত্বটা বোঝানো গেল!

১ম পৃথিবী থেকে চ'লক উলটানি হাজার মাইল দূরে আছে। চাঁদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে লাগে প্রায় দেড় সেকেন্ড। কাজেই এখন আমরা বলব, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব দেড় 'আলো-সেকেন্ড'। সূর্য পৃথিবী থেকে প্রায় ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে। সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসতে লাগে ৪৮ সেকেন্ড বা আট মিনিট, কাজেই পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরব আট 'আলো-মিনিট'। এই হিসেবে প্রক্সিমা সেন্টরাই নক্ষত্রের দূরব সাড়ে চার 'আলো-বছর' (Light-years)। এই দূরত্বের কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। এই নক্ষত্রটি থেকে আজকাল যে আলো বেরিয়েছে তা পৃথিবীতে পৌঁছাবে সাড়ে চার বছর পরে, যদিও এই আলো চলে আসছে প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে।

আর একটা নম্বর কথা এই যে, যে আলো আজ দেখলাম তাতে দুশতাব্দ, সাড়ে চার বছর আগে নক্ষত্রটি ওখানে ছিল। আজ যদি হঠাৎ নক্ষত্রটি নিভে যায়, তবে তা আমরা জানতে পারব সাড়ে চার বছর পরে। আকাশে এমন অনেক নক্ষত্র দেখা গেছে যাদের আলো পৃথিবীতে আসতে কোটি কোটি বছর কেটে যায়।

দূরত্বের মাশকাটি দ্বিগুণ হ'ল, এইবার কল্পনা করব যে আলো-বহু ধাক্কা। এক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে ক্ষতিকারী আলোক-বহু ব্যবহার করতে হবে, এই রকম পতিবেগ

প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এই রকম করে রওনা হলে আমরা একমুহুর্তেই চলে যাব পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে। আমরা চাঁদে পৌঁছাব মাত্র দেড় সেকেন্ডে, সূর্যে কেতে লাগবে আট মিনিট, আর, কয়েক খণ্ডের মধ্যেই সৌরজগতের শেষ গ্রহ প্লুটোকেও আমরা অতিক্রম করে যাব। কিন্তু এরপর আমাদের সুদীর্ঘকাল ধরে অনন্ত শূন্যের ভেতর দিয়ে চলাতে হবে। এইভাবে একটানা প্রায় সাড়ে চার বছর চলাবার পর আমরা সৌরজগতের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টরাই-এ পৌঁছাব। আরও চার বছর চলাবার পর আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র শূন্যকে পৌঁছান যাবে। এইভাবে কৃত্তিকা-নক্ষত্রপুঞ্জে (Pleiades) যেতে লাগবে প্রায় ১৩৫ বছর। এই নক্ষত্রপুঞ্জে অতিক্রম করতেই কিন্তু আমাদের প্রায় দশ বছর সেগে যাবে। এইভাবে চলতে চলতে প্রায় সত্তর হুই লক্ষ বছর পরে আমরা ছায়াপথের শেষ সীমায় উপস্থিত হ'তে পারব। আমরা যদি একই সঙ্গে সমগ্র আকাশটা দেখতে পেতাম, তাহলে বুঝতাম, ছায়াপথ যেন একটা বিরাট বলয়ের মতো সমগ্র পৃথিবীকে বেতন করে রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে অসংখ্য নক্ষত্রবহিত আমাদের এই নক্ষত্র-জগতের আকার অনেকটা লেন্সের মতো, আর ছায়াপথ তার পরিধির সীমা নির্দেশ করেছে। তাই ছায়াপথকে এমন চক্রাকার দেখায়, আর ছায়াপথের সীমানা দিয়েই নক্ষত্রের ভিড় এত বেশি। বাস্তবিক এই চক্রাকার ছায়াপথের সীমানা দিয়ে সংখ্যাতীত নক্ষত্র দেখা গেলেও, দুই শাশি নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক কম। নক্ষত্র-জগতের আকার লেন্সের মতো না হ'লে এখন দেখা সম্ভব হ'ত না। মহাশূন্যে ভাসমান চরকির আকারের নীহারিকাগুলি দেখে এই অর্থমান সত্য কলই মনে হয়। বিজ্ঞানীদের হিসেব অর্থযায়ী এই নক্ষত্র-জগতের ব্যাস প্রায় ২,৫০,০০০ আলো-বছর। সেই ভুলনাথ এর বেশ খুঁই কম, প্রায় ২৫,০০০ আলো-বছর।

ছায়াপথের দূরব অতিক্রম করার পর আবার আমাদের কয়েক লক্ষ বছর ধরে মহাশূন্যে এদিয়ে চলাতে হবে। প্রায় ২০ লক্ষ বছর পরে আবার আমরা আর-একটি নক্ষত্র-জগতে প্রবেশ করব, এর নাম 'এণ্ড্রোমিডা নীহারিকা'। এই নীহারিকাটির আকারও সেহাৎ কম নয়, প্রায় ৪৫,০০০ আলো-বছর। বিজ্ঞানীদের অর্থমান, এর মধ্যে আছে প্রায় দশ লক্ষ কোটি নক্ষত্র।

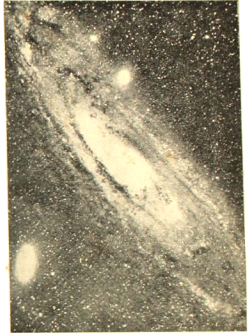
আদি-অর্থহীন মহাশূন্যের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শীপপুঞ্জের মতো অনন্ত শূন্যে যেন অসংখ্য নক্ষত্র-জগৎ ভেসে রয়েছে, আর তাদের মাঝে রয়েছে বহুনাভীত ব্যবধান।

বর্তমান দিলাব অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অনন্ত ব্যাপ্তিতে এইরূপ গ্রাহ্য বিশ লক্ষ নক্ষত্র-সমূহের সম্মান পাওয়া যাবে।

স্বদীর্ঘকালের সাধনার ফলে নক্ষত্রলোকের দিকে মানুষের দৃষ্টি এখন বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। 'মাইলিট প্যালোমার মান-মন্ডিরের' অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দিবে শত-কোটি 'আলো-বছর' দূরে অবস্থিত জ্যোতিষ্কও এখন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানী তাকেও সন্দেহ করেনি। তাঁর প্রসারিত দৃষ্টি-সীমার বাইরে অজ্ঞাত আরও কোনো জ্যোতিষ্ক আছে কিনা, তারই অঙ্গসন্ধানকল্পে আবিষ্কার করেছেন 'রেডিও টেলিস্কোপ'। তাঁর আশা, এর সাহায্যে নক্ষত্রলোকের আরও অনেক বিচিত্র রহস্য হৃদয়তো প্রকাশিত হবে পড়বে তাঁর চোখের সামনে।

বিভিন্ন নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার ফলে আমাদের এই নক্ষত্র-সমূহের যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে তা কল্পনা করে সজ্জিত হ'তে হয়। জানা গেছে, লেন্সের আকারের এই নক্ষত্র-সমূহটি ত্রুণাকারে ঘুরছে। সম্পূর্ণরূপে একবার ঘুরে আসতে এর লাগে প্রায় ২৫ কোটি বছর। এই গতি অত্যন্ত দ্রুত বলে মনে হওয়া বাস্তবিক, কিন্তু এই দ্রুত গতির ফলেই বহির্ভাগের নক্ষত্রগুলিকে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৫০ মাইল বেগে ছুটতে হচ্ছে। এই গতিবেগ নিশ্চয়ই তুচ্ছ করার মতো নয়।

মহাপ্রান্তে ইতস্ততঃ ছড়ানো নীহারিকাগুলির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে আরও বিস্ময়কর সংবাদ পাওয়া গেল। বোঝা গেল, একমাত্র এণ্ড্রোমিডা নীহারিকা ছাড়া অন্যান্য সব নীহারিকা বা নক্ষত্র-সমূহই আমাদের কাছ থেকে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২৫,০০০ মাইল বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। মনে হয়, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটি বিশাল বৃহৎসের মতো দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। যে হারে বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে তা থেকে হিসেব করলে দেখা যাবে যে, মাত্র একশো কোটি বছর আগেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এখনকার তুলনায় অনেক ছোট একটি কেন্দ্রে ঘনীভূত অবস্থায় থাকা উচিত ছিল। কিন্তু নক্ষত্রের আত্মকালের তুলনায় এই সমগ্র অত্যন্ত সাক্ষিগত বলেই মনে হয়। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হৃদয়তো



মহাপ্রান্তের অনন্তর আশ্রয় গ্রহণ 'আণ্ড্রোমিডা নীহারিকা'। ইহার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে পৌঁছাইতে আলোক-গতিতে ২৫,০০০ বছর লাগে।

পর্যায়ক্রমে প্রসারিত ও সংকুচিত হচ্ছে। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন-উদ্ভাবিত 'আপেক্ষিক তত্ত্ব' অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয় সঞ্চিত হতে থাকবে, নয় প্রসারিত হয়ে যাবে চিরকালের মতো, আর নয়তো একটি বৃহৎ আকার থেকে সংকুচিত হবে গ্রন্থে ন্যূনতম আয়তন লাভ করবে এবং তারপর আবার প্রসারিত হয়ে যাবে। এর কোনটো যে সত্য তার কোনও প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। তবে আগন্তুক এইটুকুই শুধু নিশ্চয় করে বলা যায় যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভয়ংকর বেগে প্রসারিত হয়ে চলেছে। এর শেষ কোথায়, তা কে জানে!

কৃষি প্রদর্শ

আলু

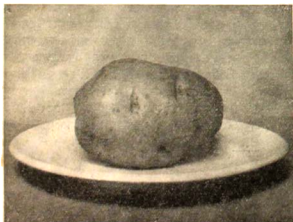
শ্রীতারশ রায়

আজকাল শহরে বাবুদের আলু না হলে একবেলাও চলা পায়। বাড়ির গিল্লীয়াও পিক, ভাজা, ফোলে আলু কোনমতে হু-চাওটে আলু দিয়েই পড়াই লাগেন। অফিস আর খুনের ভাত, তরকারি হোগানোর মনুষ্যন আলু-ই। অথচ কিছুদিন আগেও কিন্তু আলু পশ্চিমবঙ্গের কেন, সাতা ভারতের তিসীমানায় কেউ চোখে দেখেনি। মুচু অর করে সেমোপানা দুইই অনেকটাই হয়ে এনেছেন, কিন্তু সে সম্পদ হুদিনেই অধঃপাত হয়ে গিয়েছে। শেক বিজয় করে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে যেদিন লুটেরা সোনার পথে আলু পানা ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিল, সেদিন তারা ১০০০ টাকার জন্য যে সেমো-জরুরতের চাইতে ঐ সামান্য আলুই এনে দেবে তাগের দাবী সম্পন্ন। এখন সেমো এবং সেখন থেকে আলু এলো ইতালির জমিতে। কমে গোটা পৃথিবীতেই আলুর চাষ ছড়িয়ে পড়ল। অবশ্য এর পেছনে রয়েছে কৃষীবিদ্যার অগ্রগতি। আলুর উৎপন্ন বাইবেল

মাই বা'লে, লোকের ধর্মাত্মতা ও গোড়ামি অর করার ক্ষমতা বহু বৈজ্ঞানিককে এর চণাণ্ডণ সত্বেও প্রচার করতে হয়েছে। কমতানাদী মতপন্থীদের চাহীকে আলু চাষ করার ক্ষমতা দেখাতে হয়েছে, এমনকি ক্রান্তের বানী মেহী আয়োজনেও আলুর আলুর দেখানোর ক্ষমতা খোঁপার এর মূল্যও বুঝতে হয়েছে। এইসব উদ্যোগগুলোর মধ্যেই উত্তর ইউরোপের গরীব চাহীদের কাছে আলুচাষ সহজ হয়ে উঠলো। কারণ তারা দেখলো যে, অল্প জমি থেকে এত বেশী খাবার তোলা আর কোনো ফসলেই সম্ভব নয়। তাই জান প্রাণ বাঁচানোর প্রচেষ্টায় তারা সহজেই আলুর চাষে লিপ্সিলো। সেবে আলুচাষ বেড়ে এমনও হয়েছে যে, যোগ-মধ্যমারীতে আলুর ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার কবচবাব ইউরোপে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।

অনেকে বলেন যে, ১৬১৪ সালে আকবীর শহরে আসক ৫০০ সার টমাস বো-কে যে ভোজ দেন তাতেই নাকি আলু প্রথম এদেশে দেখা যায়। ১৬৭৫ সালে ক্রায়ার সাহেব নাকি হুবাটে ও কর্ণাটে প্রথম আলুর চাষ দেখেছিলেন। হাই হোক, এ পিছিয়ে কোনো তুল নেই যে ইংল্যান্ডের মাধ্যমেই এদেশে প্রথম আলুর চাষ প্রবর্তিত হয়। ভূমি সাহেব লিখেছেন যে ডব্লিউ এইন্সের সাহেবের মতে উত্তরাংশ অস্বর্গীয় থেকে জাহতে প্রথমে আলু আনা হয়। সোড়ার বেকর ইংল সাহেব মুসৌরীতে আলুর চাষ করেন। ক্যান্টন টাউনসেও আলু চাষ উত্তরীত ক্ষমতা বৃদ্ধি কক্ষ করেন এবং প্রায় ১৮৩৩ সালের কাছাকাছি পাহাড়ী ও সমতল ভূমির অনেক কারখানতেই আলুর চাষ ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৪২ সালে কলকাতার বে ফল ও সবজি প্রদর্শনী হয় তাতে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী জনসন সাহেব নাকি এমন আলু দেখেছিলেন



উত্তর ভারতের আলু পোক-মালু : 'হুজু-১-নব্ব'

যা সাহেবদের বেশের আদুকেও হার মানায়। ঐ আলু নাকি শহরের আশপাশেই হয়েছিল, তবে তিনি বলেছেন যে, অবশ্য চোপুড়ীর পাহাড়ের এরা চাইতেও ভালো আলু হয়।

তখনকার দিনে সাটশাহেবকেও এক-আধ বুড়ি আলুর ভেট দেওয়া চলত।

একশো বছর আগেও বে-কসল আমাদের বেশে প্রায় অজানা ছিল বলা চলে, আজ খণ্ডিত ভারতেরই বছরে তার উৎপাদন হচ্ছে প্রায় ৫ কোটি ৩০ লক্ষ মণ। মণ প্রতি মটাকী দরেও তার মূল্য ঠাঁড়ার ৫৩ কোটি টাকা।

ভারতের সব আলুই গাছ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শিল্পে এর এখন পর্যন্ত এদেশে বিশেষ কোনো ব্যবহার নেই। অস্ত্রের বেশে সো-পাতের জন্ত আলুর চাব করা হয়ে থাকে এবং এইসব গল্প আবার মাংস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে একে অস্ত্রের করে বহু দেশে মাংস-শিল্পও চলছে। তা ছাড়া কাচিনা (কাপড় ও সুড়োর মাজের জন্ত), অ্যালকোহল, গ্লুকোজ, ডেক্সট্রিন প্রভৃতি শিল্পেও আলু ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে ফলন ৩৫ ও চাবের বরচা বেশী বলেই, শিল্পের কাচা মাংস হিসাবে আলুর তেমন চাহিদা নেই।

গাছ হিসাবে আলুতে শতকরা ৮০ ভাগ আবহ জল, ২ ভাগ প্রোটিন ও ১৮ ভাগ খেতসার আছে। আলুর খাটমান গাছ ও চালের চাইতে কম হলেও, সস্তা খেতসার-জাতীয় গাছ হিসাবে অগ্রগণ্য। প্রতি আধচটাক আলুতে '৩৬ ক্যালরি' পাওয়া যায়। কিন্তু সমশ্রমিমাণ গমে পাওয়া যায় ১-২ ও চালে পাওয়া যায় ১১৪ ক্যালরি।

আমাদের গরীব দেশে যেখানে সবলের ভাত জোড়ানো মুশকিল, সেখানে গাছ হিসাবে আলুর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বর্তমানে ভারতবর্ষে মোট প্রায় ৬ লক্ষ একরের কিছু বেশী জমিতে আলুচাষ হয়। ভারতের যে সমস্ত জায়গায় বেশী করে আলুচাষ হয় সেগুলি হলো—উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও আন্দাম। ভারতের মোট আলুর জমির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ আলুর জমি এইকয়টি রাজ্যে অবস্থিত। বোম্বাই প্রদেশের পুন্যর বেশ কিছু আলুচাষ হয় এবং তা ছাড়া দক্ষিণ-ভারতের নীলগিরি পাহাড় ও মহানুর এবং বাঙ্গালোরে কিছু আলুচাষ হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গলায় মোট ১ লক্ষ একরের কিছু বেশী জমিতে প্রতিবছর আলুচাষ হয়। এর মধ্যে প্রায় ৪,৩০০ একরের মতো চাষ হয় দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অঞ্চলে। পাহাড়ী অঞ্চলে বছরে দুইবার—গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে আলুর ফলন পাওয়া যায়। পাহাড়ী অঞ্চলে গ্রীষ্মের চাইই প্রধান।

সেই সময় যে আলু উৎপন্ন হয় তার প্রায় সবটাই সমস্তজুড়িমির বীজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম-বাংলার প্রধানতঃ ঘসলি, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলাতে শীতকালে আলুর ব্যাপক চাষ হয়ে থাকে। অবশ্য অস্ত্রান্ত জেলাতেও কিছু কিছু আলুচাষ হয়।

আলু শীতের ফসল। যেখানে বেশ ঠাণ্ডা গড়ে এবং যে মাটিতে বর্ষভেট হয় থাকে, সেখানেই আলু ভালো হয়। জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত হালকা বেলে দোআঁশ মাটি আলু-চাষের জন্য ভালো। আলু-জমির মাটি একটু অম্ল হওয়া ভালো, কিন্তু বেশী অম্ল হলে সেই মাটিতে আলুগাছ ভালো বাড়ে না; আবার জমি বেশী ক্ষার হলে উঠলে, তাতেও আলুর 'দেগে' রোগে হবার সম্ভাবনা থাকে।

সাধারণতঃ আউন ধান বা পাটের পরই ঐ জমিতে আলুচাষ করা হয়ে থাকে। অবশ্য যেখানে জলদী আলুর ফলন করে চাবীরা বেশী দানে বিক্রি করতে চান সেখানে আলুর জমিতে অল্প ফসল করা হয় না। জমি পতিত কেসে সেখাে প্রত্যেক মাসে একবার করে চাষ ও সায়া দিবে ঐ জমিতেই জলদী ফসল দেওয়া হয়।

আলুর ফলন আমাশের দেশে এখনও খুব কম। গড়ে সাধারণতঃ ১ শত ১০ মণের মতো আলু প্রতি একরে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাশের দেশের আবহাওয়াতেও, একটু ঘর করে আলু চাষ করলে, একরে ৩০-৪০ মণ আলু পাওয়া মোটেই সঠিক নয়। সর্বভারতীয় শস্ত-প্রতিযোগিতায় কিছুদিন আগেও একজন আলু-চাবী একরে ১৪৫ মণ ফলিয়ে 'কৃষিপণ্ডিত' উপাধি পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় শস্ত-প্রতি-যোগিতার অনেকেই একর-প্রতি ৪০০ থেকে ১০০ মণ আলু ফলিয়েছেন। এই থেকেই বোঝা যায় যে, ভালোভাবে চাষ করে আলুর ফলনে অনেকেই লাভবান হতে পারেন।

আলুর ভালো ফলন পেতে হলে দরকার :

- ১। ভালো নীচোং বীজ নির্বাচন করা ;
- ২। ভালোভাবে জমি তৈরি করা ;
- ৩। জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সার দেওয়া ;
- ৪। ফসলের পরিচর্যা করা ;
- ৫। সেচ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা করা ;
- ৬। রোগ ও কীট-শত্রু দমন করা।

পশ্চিমবঙ্গে আলু লাগানোর জন্য প্রায় ১০ লক্ষ মণ বীজ আলু বছরে দরকার হয়। এর মধ্যে দার্জিলিং ও অস্ত্রান্ত সংশ্লিষ্ট রাজ্য থেকে বছরে ৪ লক্ষ মণের মতো বীজ-আলু আমদানি করা হয়। বাকী বীজ-আলু চাবীরা হয় নিজেরাই দানেন, নতুবা বিভিন্ন বাজার থেকে চাবের সময় কিনে নেন। অপরাধিত বাজ্রে বীজ বসানোর জন্য অনেক

চাবীকেই পরে দখাতে হয়। সেইজন্য বসানোর জন্ত ভালো জাতের বীজ-আলু সংগ্রহ করা বিশেষ দরকার।

মাটির আকারের ১ থেকে ১½ ইঞ্চি ব্যাসের গোটা আলুই বীজ মার্যে বসানো সবচাইতে ভালো। বীজ-আলু খুব বড় হলে সেগুলি অবশ্য কেটে বসানো যেতে পারে। কাটাবার সময় হলো দরকার যেন প্রত্যেক খণ্ডে দুই থেকে তিনটি চোখ থাকে। কেটে নেবার আগে নীচের বীজ-আলু বেছে নেওয়া ভালো এবং কাটাবার সময় চুবি বা কাটারি মেথিলেটেড শিটিট দিয়ে বায়ে বায়ে মুছে নেওয়া ভালো। এতে কাটা আলুর মধ্যে কোনো জীবাণু সংক্রামিত হতে পারে না। বীজ-আলু একটা ভিনে চটের টুকরো দিয়ে স্বয়ং ২৪ ঘণ্টা কাল ঢেকে রেখে, তারপর জমিতে বসাতে হয়।

জমি তৈরি করবার সময় মাটি খুব গভীরভাবে খুঁদিয়ে বা লাঠি দিয়ে বায়ে বায়ে চাষ করে তুলতুলে করে নেওয়া দরকার। ১০০ মণ পাতা ঘোবর বা আবর্জনা দাব দিয়ে জমিতে আরও ২১০টা চাষ ও মই দিয়ে, জমি আলু বসানোর জন্ত তৈরি করতে হবে। আলু-জমিতে দুই ফুট দুই দুই ৪½ ইঞ্চি গভীর করে নালি কেটে নেওয়ার দরকার। নালির মধ্যে একর-প্রতি দুই মণ হুশার-কসকেট দুই লাইনে দিতে হবে। তার পর দুই মণ ভঁকো বেড়ির খটল, দুই মণ নিউকোটে অব পটাস, এক থেকে দেড় মণ অ্যামোনিয়াম সাপলফেট, দুই মণ তপানি সারের সঙ্গে মিশিয়ে নালির ওলার বিছিয়ে দিতে হবে। এর ওপর পাতলা করে দুই মাটি দিয়ে ঢেকে ৮-৯ ইঞ্চি দুই দুই বীজ বসাতে হবে। বীজ বসানোর সময় লক্ষ্য যেন থাকে—বীজ-আলু সরাসরি সারের সংস্পর্শে না আসে। বীজ-আলু মাটির ২১০ ইঞ্চি নীচে বসিয়ে, এর উপর তিন মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়; জমিতে উপযুক্ত বস না থাকলে, একটা জলের কান্টা দিতে হয়।

বীজ বসানোর ৩৪ সপ্তাহের মধ্যেই আলুগাছ বের হয়। আলুগাছ ৪½ ইঞ্চি বড় হলে, জমি ভালো করে নিড়েন দিয়ে প্রথমবার গাছের গোড়ার মাটি ধরিয়ে দিতে হয়। এই সময় একর-প্রতি দেড় মণ অ্যামোনিয়াম সাপলফেট মাটির সঙ্গে আলুগাছের গোড়ার দেওয়া ভালো। প্রথমবার 'ডেলি' বাঁধবার ৩ সপ্তাহ পরে আবার নিড়েন দিয়ে ডেলি বাঁধতে হবে।

আলু বসাবার পর থেকে আলু তুলবার আগে পর্যন্ত মাশে বাসে জলসেচ করে আলুর জমি সরস রাখা দরকার। সাধারণতঃ আলুর ফসলে ৮ থেকে ১০ বার জলসেচ করা হয়। জলসেচের সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার যে,

আলুর ডেলির মাথা যেন ২½ ইঞ্চি জলের ওপরে জেগে থাকে এবং জলে ডুবে না যায়। জমিতে যেন অবধা জল দাঁড়িয়ে না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ দরকার। প্রত্যেকবার সেচের পরেই জমিতে 'আর্চট হেডে' বা পাতলা করে নিড়েন দিয়ে জমির আর্চট হেডে দেওয়া উচিত। উত্তরবাংলার হুচবিহার, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও উত্তরি জাংগার জমি বতাবতঃই যথেষ্ট সরস। কাজেই এসব জাংগার জলসেচের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

আলুগাছ ৪½ ইঞ্চি বড় হলেই প্রথমবার পেরেনন ও ডি.ডি.টি-গোলা জল আলুগাছের পাতায় ও ডেলির উপর ভালো করে 'স্প্রে' করা উচিত। সেফ্লোর পেরেনন ও একসের ডি.ডি.টি, মাড়ে বাবো মণ জলে গুলে সর পিচকারি দিয়ে এই ঔষধ দেওয়া দরকার। আলুগাছের ২ থেকে ২½ মাস বয়স হলে আর-একবার এইভাবে পেরেনন-গোলা জল আলুগাছে স্প্রে করে দিতে হয়। এর ফলে আলু অনেক মারাত্মক রোগের ও পোক-মাকড়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। তা ছাড়া আলুর কলনও অনেক বাড়ে।

আলুগাছে নানারকম রোগ ও পোকা দেখা যায়। এর মধ্যে জলদি ধসা ও ডাইরাস রোগ-ই সমস্ত লক্ষ্মির আলুর পক্ষে মারাত্মক। অবশ্য জীবাণু-খণ্ডিত 'ঢলা' রোগও আলুর বেশ কিছু ক্ষতি হয়। পোকায় মধ্যে আলুর কাটুই পোকাই আলুর সবচাইতে বেশী ক্ষতি করে। পেরেনন-গোলা জল স্প্রে করে আলুর জলদি ধসা রোগ ভালোভাবে দমন করা যায়। ঐ জলের সঙ্গে ডি.ডি.টি, মেশানো থাকলে, কাটুই পোকায় উপদ্রবও বিশেষ হয় না। ডাইরাস রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে, নির্বাচিত ও পরীক্ষিত নীরোগ বীজ-আলু ব্যবহার করাই একমাত্র উচিত। রোগ দেখা গেলে, ঐর গাছ তুলে ফেলা ভালো। জীবাণু-খণ্ডিত ঢলা রোগ দেখা দেওয়ারাত্র, বীজ-আলু-সম্বন্ধে চাচুটি তুলে ফেলা উচিত। আলুর বীজ যদি ভালো হয়, তাহলে এই জীবাণু-খণ্ডিত রোগ বতাবতঃই কম দেখা দেয়। জলদি জাতের আলুর মধ্যে 'দার্লিঙ্গি হালগোল' ও কুচি-বিভাসের উদ্ভাবিত 'মংবুল-১নং' আলু-ই বোনার পক্ষে ভালো। ২য়ম জাতের মধ্যে 'সাবা গোল', 'হেট বট' ও 'অ্যাদি' প্রধান। নাবী জাতের আলুর মধ্যে 'ম্যাগনাম বোনা', 'আপ-ই-ডেট' ও 'রয়্যাল কিংস' ভালো। নাবী জাতের আলু—নৈনিতাল ও বেঙ্গল আলু নাথেকেই বাজারে পরিচিত।

এইভাবে আলুচাষ করলে আমাদের দেশের কৃষকগণ সহজেই বিধা-প্রতি জমি থেকে ১০০ মণ কলন পেতে পারেন।

ভট্টাচার্য্য গ্রামে কলিদাস চট্টোপাধ্যায় ওয়েক কালী মির্জার জন্ম হয় এবং সম্ভবতঃ ১৮২১-২৪ খ্রীষ্টাব্দের (১২২৭-৩১ সাল) মধ্যে কালীতে তার জন্ম হয়। তার জীবনীকার লিখেছেন—

“মির্জা মহাশয় পেন্সন সময়ে জগদগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কখন বা ইহসংসার পরিত্যাগ করেন, তাহার প্রকৃত নিদর্শন কিছুই পাওয়া যায় না। তবে তিনি কলিকাতায় বিখ্যাত হাঁহুদেবশায়ী বৃত্ত মহাশয় গোপীমোহনে হাঁহুদের সমসাময়িক ছিলেন এবং পলাশীর যুদ্ধের সাত-আট বৎসর পূর্বে জগদগ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বিংশতি বৎসরের মধ্যে ধর্মাদান পরিত্যাগ করেন, এই পর্যন্ত মূলতঃ অবগত হওয়া গিয়াছে।”*

কালী মির্জার পিতার নাম ছিল বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায়। বিজয়রাম অসিন্দুর-অন্নীত কণ্ঠপ-গোরক্ষ দশকের বাংলায় লোক। তার ছুটি পুত্র—কোঠা কলিদাস ও কনিষ্ঠ হনুমাণ। কালী মির্জার জন্মস্থান ভট্টাচার্য্য গ্রাম বা গুপ্তধরপুর নামে পল্লী—হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। সে সময়ে এই গ্রামের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। W. H. Hunter লিখিত *Statistical Account of Bengal* গ্রন্থে এই স্থান সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে তা এই—“Guptipara is situated on the bank of the Hugli, in the extreme N. E. of the district • • • It is noted as a seat of Hindu learning and has produced some celebrated Sanskrit scholars.”

এই গ্রামের উত্তরে ও পূর্বে ডাঙ্গীরাবাঁ এবং দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে বেঙ্গারবাঁহী নদী প্রবাহিত। পশ্চিমে দেবকোল নামে একটি ক্ষুদ্র ভূম আছে। প্রকৃতির এই স্রমসা হানটি বহু কবির আশ্রয়ভূমি। প্রসঙ্গতঃ কবিকেশরী বাণেশ্বর ও মধুসূদনের নাম উল্লেখযোগ্য।

কালী মির্জাও নিধুবাবুর মতো বাংলাকালেই বেধা ও ধীশক্তির পরিচয় দেন। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী প্রথম ক্রামের পার্শ্বালার তার শিক্ষা শুরু হয়। তারপর খ্যাতনামা পণ্ডিত রামনিধি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চোলে পাঠ করেন। কালী মির্জা ১৮১২ বছরের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। চোলের পাঠ সমাপ্ত করে একখানি বাহীর-দৌকার কাশী যাত্রা করেন। সেখানে তিনি কিছুদিন বেসান্তবর্ণন ও সঙ্গীতবিজ্ঞা শিক্ষা করেন। তারপর সন্তো ও দিল্লীতে কয়েক বছর থেকে সঙ্গীত অমূলীন করেন এবং সঙ্গীতবিজ্ঞার যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই তিনি কাশী ও

উহা ভাষাও শিখেছিলেন। এদিক থেকেও তাকে নিধুবাবুর সঙ্গে তুলনা করা চলে। হুজুনেই যেখানে চার; হুজুনেই হিন্দুস্থানী বাগদসঙ্গীতে সীতামতো শিক্ষালাভ করেন; হুজুনেই বাংলা সঙ্গীতের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। এরা কেহই স্বভাবকবি বা লোকসঙ্গীত-গায়কের স্বাভাবিক নন। সঙ্গীত তথা সাহিত্য সম্বন্ধে উভয়েরই যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তবে নিধুবাবু যেখানে ইংরেজী সংগীতের ব্যাখ্যা অধিকতর প্রদর্শিত ছিলেন, কালী মির্জা সেখানে অধিকতর প্রদর্শিত ছিলেন মুসলমানী সংগীত ব্যাখ্যা। এক কথায়, ইংরেজ-নবীরের সঙ্গে কাশী-নবীরের যে পার্থক্য, নিধুবাবুর সঙ্গে কালী মির্জার ব্যক্তিরের তাই পার্থক্য ছিল। এ পার্থক্য উভয় কবির জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতেও প্রতিফলিত। নিধুবাবু যেখানে ইংরেজ কালেজেরে কুটির কেবানীর পদ গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং সঙ্গীতকে গ্রহণ করেছিলেন শৌরীন বা-আমোচাদের নেশা হিসাবে, কালী মির্জা সেখানে গোপীমোহনে হাঁহুদের সভাগায়ক হিসেবে জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন এবং সঙ্গীতকে গ্রহণ করেছেন শৌরী হিসেবে। গানের প্রচারের জন্য নিধুবাবু কোনও পুঠ-শোষককে অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেননি। তিনি তার শোভাবাজারে বটদলার আশ্রয় পাটাতন—সেখানেই প্রসিদ্ধ লোকদের আগমন হোত। কিন্তু কালী মির্জার কাছে—হর প্রতাপচাঁদ নর গোপীমোহনে হাঁহু, একজন না একজন পুঠশোষক অবশ্যপ্রয়োজনীয় ছিল। বরষে সম্ভবতঃ কনিষ্ঠ হলেও, একহিসেবে কালী মির্জা পুরোনো যেজাজের পের গায়ক, ঐর প্রধান পুঠশোষক গোপীমোহনের মতো হুরসিক ধনী; আর রামনিধি গুপ্ত ওয়েক নিধুবাবু নতুন যেজাজের প্রধান গায়ক, ঐর প্রধান পুঠশোষক অনুসাধারণ। সে যুগের বাহুরের সেওয়া নামও এই ইঙ্গিত বহন করছে—একজন সাধারণের নিধুবাবু আর একজন অভিজাতের কালী মির্জা।

আমুখানিক ৩০-৩২ বছর বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত করে কলিদাস নিজের গ্রামে ফিরে আসেন এবং বিবাহ করেন। প্রবাহ আছে, তার স্ত্রী অতি সুন্দরী ও ধার্মিকা ছিলেন। সেকালের প্রথা অনুযায়ী তিনি নিজ হাতে হাফা করে ব্রাহ্মণ বাড়ীতে বড় ভালবাসতেন। কলিদাসের পিতা বিজয়রামের জীবিতকালেই এ বিবাহ হয়। বোধহয় এই বিবাহের পরেই কলিদাস স্বর্ধমানের সুবজাজ প্রতাপচাঁদের সভাসদ হন। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, সেখানে আমুখানিক অর্থ না পাওজার স্বর্ধমান ত্যাগ করে কোলকাতার আসেন ও গোপীমোহনে হাঁহুদের আশ্রয় লাভ করেন। গোপীমোহনে

ঠাহুর ছিলেন উদ্যোগী পুরুষসিংহ। বহিঃ তিনি বর্ণ-মর্যাদার ঠাহরের পুত্র হিসাবে শৈতব্য স্বরে বহু সম্পত্তি পেয়েছিলেন, তথাপি নিজের পিতার মতো চন্দ্রনদীর ঘরানী গভর্নমেন্টের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে বহু উপার্জন করে শৈতব্য সম্পত্তির বৃদ্ধি সাধন করেন। রাজসাহী, দিনাজপুর, বগৈর প্রকৃতি প্রায় ১০১১৪টি জেলায় তাঁর কলিগারি ছিল। কোলকাতার উত্তরে মুলাকোড় গ্রামে তাম্রধ্বজীয়ার গোপীমোহন ১২১৯ সালে তাম্রধ্বজী নামে কালীমূর্তি ও স্বাধন নিবাসিত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। কালী মূর্তির বহু স্মারাবিষয়ক সঙ্গীত-রচনার এটি হয়তো অন্ততম উৎস। গোপীমোহন 'হিন্দু কলেজ' স্থাপনেও বহু অর্থ দান করেছিলেন। এছাড়া তিনি ও বৎসানের মহারাজা 'হিন্দু কলেজ' ও পরবর্তী প্রেসিডেন্সি কলেজের বংশোদ্ভূত শিক্ষণসমকর্তা হয়েছিলেন। এখানে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথমকলাক উপাধ্যায়ের উক্তের নাম খোদিত আছে।

এই বিভাগসাহী, গুণগ্রাহী, সম্মান ব্যক্তির আশ্রয়-লাভের পর কালী মূর্তির দায়িত্বস্বত্ব আর ভোগ করতে হননি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গোপীমোহন কালী মূর্তিকে আশ্রয় ও উৎসাহ, অর্থ ও সম্মান দান করে কবি-প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করে গেছেন। উক্তের বৃত্তার বহুদিন পরেও দেখি গোপীমোহনেরই বংশধর-গৌড় স্তায় বতীভ্রমোহন ঠাহুর কালী মূর্তির গুণ সঙ্গীতগুলি শুনুগ্রহণের বারম্বার গ্রহণ করে বাংলা সংস্কৃতির এই স্বরঙ্গনপরিচিত দিকটি উন্মোচিত করে দিয়ে গেছেন।

কালী মূর্তির কৃতি ছিল মাক্তিত এবং গুণগ্রাহিতা শক্তি ছিল তীক্ষ্ণ—তাঁর গৃহশোষক গোপীমোহন ঠাহুরের সঙ্গে এ বিষয়ে মিল বেশা যায়। সে যুগের শব্দে তিনি বেশ 'কাইলিশ' ব্যক্তি ছিলেন বলা যেতে পারে। হিন্দুস্থানী গোলাক পরনে, ঘনকৃষ্ণিত চুল ব্যবহরি করে গেছেন ওড়ানো, গৌরাক্ষ, দীর্ঘকায়, বর্ণিত অঞ্চল একহায়ে, কোড়া-ভুজ, আরত ও ইতংরক্টিম চোখ, চওড়া দলটি,—নির্গাচন-কবিতার, রেখের শক্তিভে, স্বরশিকতায় সব মিলিয়ে কালী মূর্তি ছিলেন একটি প্রতিভাবহ ব্যক্তি। নব্বো অকলেগে আশ্বকায়রা ও গোলাক-প্ররক্ত ছিলেন বলেই সম্ভবতঃ তাঁর 'মূর্তি' নামকরণ হয়। নিধুবাবুর মতোই কালী মূর্তিও সমালোচী, বিনয়ী এবং অনাধিক বলে খ্যাত ছিলেন।

সঙ্গীতশাস্ত্র তাঁর খ্যাতি এতদূর প্রসারিত হয়েছিল যে, কোলকাতার কে-কোনো প্রসিদ্ধ বক্তৃতিসঙ্গেই তাঁকে আমন্ত্রণ করা হতো। তাঁর একটি বোড়া ছিল। তিনি তাতেই বাতায়ত করতেন। পূর্বেই বলেছি, গোপীমোহনের

আত্মকল্যাণ তাঁর অভাব ছিল না। সারা বছর তিনি তাঁর কাছ থেকে যে অর্থ পেতেন, তাই দিয়ে নিজ গ্রামের বাড়িতে বাৎসরিক হিন্দু-কৃষ্ণাকর্ষণের পরচাতি নির্বাহ করতেন এবং বহু পরিবার প্রতিপালন করে লুপ্ত বহুজন্ম জীবন কাটিয়ে গেছেন।

ধর্মের তিনি ছিলেন উসারপন্থী, বহিঃ আচারে ব্যবহারে নির্ভাবান ব্রাহ্মণের মতোই চলতেন। কিন্তু যাকে ধর্মের গোড়ামি বলা হয়, সে সঙ্গীতের তাঁর ছিল না। তাঁর গান শুনেই তা গোলা যায়। যেমন—

যদি ভবনসী পার হতে থাকে বাসনা,

দক্ষিণে কালীকে কুকে ভের কোরো না।

তাম্রধ্বজী, বাগদাক্ষ-বিবরক সঙ্গীত, গঙ্গাভোজ, আগমনী সকলপ্রকার ধর্মসঙ্গীতই তিনি রচনা করেছিলেন। আবার নিধুবাবুর মতো বিতক্ত প্রেমের গানও তিনি রচনা করেছেন। এই ধর্মনিরপেক্ষ ভাবটি নিধুবাবুর মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। রাজা রামমোহন বারও হয়তো এইমতই কালী মূর্তির শিষ্ট হয়েছিলেন। তা ছাড়া একটি integrity বা সঙ্গীতের ভাব লক্ষ্য করা যায়, যা উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁশের প্রথম অবলান, বার পূর্ণরূপের প্রতিচ্ছবি ছিলেন রামমোহন। কালী মূর্তি ও নিধুবাবুর মধ্যে সেই সৌম্যবোধ ছিল যা বঙ্গ যানবজীবনের বিভিন্ন রস-আম্বাদনে তাঁরা পরাশ্রয় হননি, অঞ্চল তাতে তাঁদের জীবন বিরতিভুক্ত হয়েও যাননি। সাংসারিক জীবনে শোক ও আশ্রয় দুই কবিই পেয়েছিলেন—নিধুবাবুর জীবিতকালেই দুই স্ত্রী, প্রথম পুত্র এবং তৃতীয়-পক্ষের স্ত্রীর দুই পুত্র ও এক কস্তার দুহা হয়। কালী মূর্তিরও জীবিতকালেই স্ত্রী এবং সব-করটি সম্মানের দুহা ঘটে। কিন্তু এমন নিরাক্ষণ শোকও তাঁদের পরাক্রান্ত করতে পারেনি।

কালী মূর্তির কালীমোহনের পূর্বেই এই শোকবহু ঘটনা-গুলি ঘটে যায়। তবু কালী-বাতায় আয়োজন করবার সময় তিনি অস্ত্রান্ত পরিভ্রমের কথা বিস্তৃত হননি। তাঁর তাই বহুনাথের স্ত্রী, পুত্র ও অনেকগুলি কস্তা ছিল। এসবেরই জীবন-বাহারের স্বভাব তিনি গোপীমোহনের কাছে নিম্নলিখিত গানটি বেঁচে মোনান বলে প্রবাদ আছে—

হুনিয়াসারী কি স্বকমারী বানালে বেহাল।

মনে করি বাব কালী, বলতে মুখে বেরোয় হাসি,

পরিবার গলাব কালি হয়েছে একশাল।

হায় কি কবিরি দল, না রাখে কারো তোয়াক

উড়ারে ব্যোনের লক্ষা দুই হানে হাল।

শোনা যায়, এই গান শুনে গোপীমোহন অভ্যস্ত ভুট হন

এবং নির্ভাক তাঁর পরিজনের সুব্যবস্থার জন্য এককালীন সম্বলস্বত্ব চালা দেন। সম্ভবতঃ এর অল্পদিন পরে গোপী-মোহনের মৃত্যু হয় ১২২৬ সালে। তাঁর পরেই কালী মির্জা জাতি ও গ্রামবাসী ঠাকুরদামকে সঙ্গে নিয়ে কান্দি-দাঙ্গা করেন। তাঁর এই আত্মীয় মৃত্যু পর্যন্ত সঙ্গে ছিল। মির্জার মৃত্যুর পর অনৈক কান্দিবাসী মাদোচাটীর কাছে গুপ্তিত ছাড়াবার চাকা তাঁর জ্ঞাতবধূ পান এবং এই অর্থে তিনি বহু পুণ্যকাজ করে গেছেন।

‘ঐতলহরী’কে কালী মির্জার সঙ্গীতের অবশ্য সম্পূর্ণ সংগ্রহ বলা চলে না। কারণ গ্রন্থটি মুদ্রণের পর আরও দুই-তিনটি গান সম্পাদকের হস্তগত হয়। তিনি যখন করেছিলেন, বিত্তীয় সংকরণে এই গানগুলি সংযুক্ত করে বেবেন। কিন্তু হস্তান্তর জানা যায়, ‘ঐতলহরী’র আর কোনো সংকরণ হয়নি। এই গ্রন্থের প্রথম সংকরণ ১৯-৪ খ্রীষ্টাব্দে বিহারপ্রদেশ প্রেস থেকে অন্ততলাল বসোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি দুভাষা। শ্রীমুক্ত সনৎকুমার ভট্টের সংগ্রহে গ্রন্থটি আছে। তিনি আবারও গ্রন্থটি লেখক ও পড়বার সুযোগ দিয়ে রুচক করেছেন। গ্রন্থটির মধ্যেই পূর্ণাঙ্গোচিত কালী মির্জার জীবনী তথা গোপীমোহন ঠাকুরের জীবনীও আছে।

‘ঐতলহরী’তে ৬৪টি স্তোত্রাবিধকে সঙ্গীত, ৪২টি রাধাকৃষ্ণ-বিবরণ সঙ্গীত, ১৪টি বিবিধ ধর্মবিবরণ—যেমন গোবিন্দ-বিবরণ, গঙ্গাঈশ্বর, আগমনী ইত্যাদি, ১৮টি প্রণয়-বিবরণ সঙ্গীত স্থান পেয়েছে। পূর্বেই বলেছি, নিম্নোক্তর মতো কালী মির্জাও ছিলেন মার্কসঙ্গীতের সাধক, একজন আধুনিক সঙ্গীতের বড়ো তাঁদের সঙ্গীত সহকর্মী ছিল না। তাঁর উপরে যুগলচির প্রভাবে তাঁদের সঙ্গীতে অমুগ্ধাঙ্গ, বহু প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রাচুর্য থাকার কথাগুলি কিছু দৃষ্ট ছিল। এর উপরে আবার কালী মির্জার সঙ্গীতে আধ্যাত্মিকতার গভীরতা থাকার তাঁর কোনও কোনও সঙ্গীত আধুনিক গায়কের কাছে রীতিমতো দ্ব্যর্থোৎসাহ বলে মনে হতে পারে।

কালী মির্জার ভাবধারার আর একটি বৈশিষ্ট্য—ঐশ্বর্যময়

রূপে আরাধ্যকে দেখা। শক্তি-উপাসনার অবশ্য এটিই কাহা, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-সাধনার মাধুর্যময় রূপে উপাস্তাকে দেখাই বিধেয়। কিন্তু কালী মির্জা সেখানেও ঐশ্বর্যময়-রূপেই তাঁর ধোয়কে দেখেছেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনাপূচক রূপে বলেছেন,—

আপনি হইছে বর্ষ মানিলে বলিত গর্ষ
বামন রূপে, উদ্ধারিলে অহল্যা গাধার।

—৪-সংখ্যক স্তোত্র

অথবা শ্রীমাদার বর্ণনাপ্রসঙ্গে—

রসসিঁহোপানে বসতি লুপ্তাবনে
রাজরাজেশ্বরী রাধাধারী।

—১-সংখ্যক স্তোত্র

রাধাকে বোয়ালী, বিরামিনী, উদ্ভাসিনী সব রূপেই বৈকুণ্ঠ কবিতা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ‘রাজরাজেশ্বরী’ শব্দটি রাধার বর্ণনার একবারেই অমূল্যমুক্ত। তাই বৈকুণ্ঠ পদ্যবলীতে যে আত্মহারা ভাবের সমুদ্র সদাই টলমল, কালী মির্জাতে তা অমূল্যমুক্ত। ভাবের গভীরতা অপেক্ষা রচনা-চাতুর্যের উপরে কবি জোর দিয়েছেন রাধাকৃষ্ণ-বিবরণ পদ্যগুলিতে, ফলে পদগুলি আবারও কানকে তৃপ্ত করলেও মনকে করে না।

কালী মির্জার পদগুলিতে বহু, অমুগ্ধাঙ্গ, স্নেহ প্রভৃতি অলঙ্কারের ব্যবহার থাকলেও, সৌন্দর্য ও সংযুক্ত হয়েছে। এইখানেই কালী মির্জার বৈশিষ্ট্য—তাঁর সঙ্গীতে চাতুর্য ও সৌন্দর্য, আধ্যাত্মিকতা ও ঐশ্বর্য পাশাপাশি বিরাজ করছে। তাঁর রচনা পাঠ করলেই দেখা যাবে একরকম ও সঙ্গীতশাস্ত্রের উপর কবির যথেষ্ট অধিকার আছে। স্বভাবকবির বা লোকসঙ্গীতের যে ভাবাবেগের প্রাবল্য থাকে, সেই বহনহীন উদ্ভাস এই প্রণয়ী শিল্পীবাসনের বিরোধী। আবার কবিওয়ালাদের অমুগ্ধাঙ্গ-বসকের চক্ৰকৃতিতে শিল্পপ্রতিভার যে সৈন্ত ঘোষণা করে, কালী মির্জার জীবিতান মন তাকেও গ্রহণ করতে পারে না। বহির্নিম্বানু অপেক্ষা কালী মির্জার বিহ্বলের পটভূমিকা বৃহত্তর, তবু উভয় শিল্পীর মানসেই এই সংঘর্ষোৎসাহ দক্ষ্য করা যায়।

সঙ্গীতপ্রেমীর স্মৃতি-কাহিনী

‘গৌতম’

অনেকদিন আগে বেঙ্গাল গান শিখবার খেয়াল চেপেছিল একবার।

হলে, অতি ক্লেশ বলে তার খ্যাতি সে হঠাৎ দরজাঘট দিলদরিয়া হয়ে উঠেনে পাড়ার লোক বেবন চমকে ওঠে, আশাকে খাড়া চিনতেন তাঁরা তেরি চমকে উঠলেন। কারণ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বরদাশ করতেন পারি এমন দুর্দার আশা ছিল না। গান ভালো লাগত বটে, কিন্তু ওজাস্বী গান নয়। সেই আদিষ্ট কিনা কোমর বেঁধে তালিম নিতে শুরু করলেন খাঁ-সাহেবের কাছে, আর তাঁর বাতুলে বেওয়া কাছকার নিরাশা ঘরে সা-রে-গা-না সাধতে লাগলেন! সবাই বলাবলি করতে লাগলেন—ব্যাপার কি?

তখন অল্পদিন হলো আবদুল করিম খাঁ সাহেবের গান বাঁকার হাত পরেছে অভিনয় রেকর্ডে। তাঁর দুখানা অতুলনীয় গান ‘বুনাকে ভীষ’ আর ‘শিরা বিন নহি’ কানে কানে যুগু করছে। গুল মহম্মদ খাঁ সাহেব দে-গান শুনে আবেশে নিব্বীলিত নেবে বলছেন—“বুনাকে করিম ভাইরাকে গম্বো ক্যামা দরদ দিরা!” আবদুল করিমের গানের রেকর্ড শুনে যেন হলো এই যদি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হয় তাহলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তেমন ভয়ের কিছু নেই; করিম খাঁ না হতে পারি, কিন্তু তাঁর কাছাকাছি পৌঁছবার চেষ্টা করতেই হবে।

বে মহরের কথা বলছি সে মহরে তখন ওজাদ গুল মহম্মদ খাঁ-ই একমাত্র খাঁ-সাহেব। লম্বা পাসোয়ানী চেহারা; এককালে সুকী-ইতি লড়তেন বোধ হয়। খাঁ-সাহেবের বেকাজ শরৎ বহু বিচিত্র কাহিনী শোনা ছিল, বাস্তব অভিজ্ঞতা কিছু ছিল না। একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল খাঁ-সাহেবেরা চাই করে কাউকে লাগবে বানাতো রাজী হন না; তাঁদের লাগবেই বনতে হলে অনেক সাধ-সাধনা, অনেক সুশাসিত দরকার হয়।

গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের একজন প্রবীণ সাগরেদের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। তিনি সঙ্গীতের শিক্ষকতা করতেন একমাত্র পেশা হিসেবে, হুতরাং ওজাস্বী গান ছাড়া অল্প গানও তাঁর জানা ছিল। এই অল্প গানের ভাণ্ডার থেকেই হু-একখানা গান আমার তিনি নিবিধেও ছিলেন। উল্লসও দিয়েছিলেন হুইর আছে

আমার গলায়, হুতরাং গান শিখলে আমার ‘হবে’। তিনি আমার সঙ্গীতার কথা শুনে খুশী হয়েই একদিন খাঁ-সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। এখানেই বলে, নিজেকে যে মাতাল সে অপরকে মাতাল বানাতো ভালোবাসে।

তালিম দিতে রাজী হয়ে গেলেন খাঁ-সাহেব। বললেন, প্রথমে সাহেগাখা সাধতে হবে কিছুদিন, তারপর খেয়াল। কিছুদিন খেয়াল বিশেষ তারপর হুঁরি; খেয়ালের ভিত পালা করে না নিলে হুঁরি পাওনা; যার না। খৈরী ধরে হুথারীতি অগ্রসর হতে হবে, চটকট বা ডাড়াডাড়া করলে কখনো গান শোনা হবে না। সঙ্গীত হচ্ছে সাধনার জিনিস—মাতারাসি আর বাই হুওয়া যাক, গাইবে হুওয়া যার না।

এই প্রসঙ্গে মহরের বিখ্যাত খনী এক ব্যবসায়ীর ডব্লোকের কথা বললেন খাঁ-সাহেব। ‘ডব্লোকের গান শুনবার সব প্রচণ্ড, নিজেকে ওজাস্বী গানের ‘কদরখান’ সমজদার বলে জাহির করতেও তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই। যেখানেই গানের আসর হয় সেখানেই যান, চোখ বুজে তম্বর হয়ে শোনেন ব্যার মাঝে মাঝে ‘কেজাবাং কেজাবাং’ বলে ওঠেন। নিজের বাড়ির বাড়লঠান-ওজালা বৈঠকখানায়ও যন যন বৈঠকী গানের বৈঠক বসান। তাতে খরচাও করেন দরজা হাতে; অল্প সব ব্যাপারে পরম কল্লি থাকলেও গানের মজলিস সম্পর্কে তাঁর চরম হুঁলতা আছে, এতটুকু কার্পণ্য নেই।

ডব্লোক হুবার বিশদীক হয়ে তৃতীয় শরী পরিগ্রহ করেছেন। কলশ দিয়ে কানো রাখছেন পাকদরী চুপ-ডলোকে। ডব্লী শরীর কাছে নিজেকে তরুণ প্রতিপন্ন করবার চেষ্টার কোনো কট না রাখবার প্রাণপন চেষ্টা করছেন।

একবার শনিম থেকে এক মাঝকরা বাই এ মহরে এসে করেকটি আগরে গান শুনিবে গেলেন। সে গান শুনে মুগ্ধ হলেন উক্ত ডব্লোক।

তারপর এক সন্ধ্যার বগোবা আসর বসল ডব্লোকের বৈঠকখানায়। সে আসরের প্রধান গায়ক ওজাদ গুল মহম্মদ খাঁ।

আগরের শেষে খাঁ-সাহেবকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ডব্লোক বললেন, “একটা জাহি শেন করতে চাই

খাঁ-সাহেব!" তাঁর বলবার ভঙ্গীটা বেশ—'ভায়ে বলব, না, নির্ভয়ে বলব, বহাদুর?'

খাঁ-সাহেব অতঃপর ভঙ্গীতে হেসে বললেন, "পেপ করুন।"

ভ্রমলোক বললেন "খাঁ-সাহেব, সঙ্গীতের পাছা গুলু কাগনি। মেহেরবানি হলে, কে-কোনো সাগরবন্দে আপনি চটপট ওজার বানিয়ে তুলতে পারেন।"

অনেকটা 'মুকং গংগাতি বাচাল' গোছের ভণিতা। তখন কৌতুক বোধ করলেন খাঁ-সাহেব।

খেয়াল গানের আগে তোহা-তানান-২২ যতো কিছুকণ কোণের চাতধারে কোণ ঘেরে তাহপের অতি শব্দপণে আসল কথাটা গুলুগুন ভ্রমলোক : তাঁর তৃতীয়শব্দকে ছ'হাসের ভেতর পাশা গাইরে বানিয়ে দিতে হবে, খাঁ-সাহেব কাল থেকেই মেহেরবানি করে তাগিষ দিতে মুক করুন।

খাঁ-সাহেব বললেন, "এ কি তাক্ষব বাত বলছেন আপনি? ছ'হাসে আপনার বিধিকে গাইরে বানিয়ে দেবো, আমি কি বাহু জানি, না, আলাদিনের চেহারা আছে আমার কাছে?"

তৃতীয়শব্দের দ্বারা ভাবলেন খাঁ-সাহেব যে কোনো কাহিনেই হোক এড়িয়ে যেতে চাইছেন। ভাবলেন : হাজার হোক, পেপাটার দানব তো? টাকার লালচ না বেহালে কাজ হবে কেন? বললেন, "বাহু আপনি জানেন বৈকি খাঁ-সাহেব? সুবের কাল বুনবার বাহু জানেন, আর হু পেপাটার বাহু জানেন না? সেলাখির জন্তে যাবড়াবেন না আপনি, ছ'হাজার টাকা বেহো আপনাকে।"

খাঁ-সাহেব তখন একই ভেবে বললেন, "ছ'হাসে ছ'হাজার আপনি কেন খরচা করত যাবেন? সু-চার মোজ যদি সবু করেন তাহলে অনেক কম খরচেই জ্বাভো জলদি আপনার বিবিগাহেরা পাছা গাওঁইরা হতে পারবেন।"

বিস্মিত হয়ে ভ্রমলোক গুথালেন, "কি করে, খাঁ-সাহেব?"

খাঁ-সাহেব বললেন, "আমি কতকগুলো পিল বানাছি। গুর এক-একটা পিল খেলেই সঙ্গে সঙ্গে এক-একটা রাস-দাগিণী বগ্ন হতে বাবে, তাগিন আর রেহাজের বিলকুল কোনো দরকার হবে না।

বাগেঈ পিল খেলে বাগেঈ, দরবারী কানারু পিল খেলে দরবারী কানারু, মালকোব পিল খেলে মালকোব—... যে বাগ বগ্ন করত হবে, ইক করে তার একটা পিল খেয়ে কেলেসেই চলবে।"—

কাহিনীর পরবর্তী ইতিহাসটুকু খাঁ-সাহেব বলেননি, কিন্তু আমি জানি।

উক্ত ভ্রমলোকের তৃতীয়শব্দকে তাগিষ দিয়েছিলেন খাঁ-সাহেব নয়, আরেক ভ্রমলোক। আর বহুধরনের। জনৈকি, এই অল্পসময়ের ভেতরেই ভ্রমবহিলা হাজারবানিগামে বয়ে সা-বে-গ্যা-না বাজানো প্রায় শিখে ফেলেছিলেন। কঠে অবশ্য সা-বে-গ্যা পর্যন্তও বগ্ন হননি।

এই প্রসঙ্গে খাঁ-সাহেবেরই মুখে শোনা একটি কাহিনীর কথা মনে পড়ে গেল। সংক্ষেপে বলি। মিহা তানসেন মনে মনে ভাবছেন তামার হিন্দুতানের তিনি অধিতীর গায়ক, একনিমানে তাঁর নামের সঙ্গে বার নাম বেগুটা চলে এমন গায়ক শোটা ভারতবর্ষে নেই। এমন সময় তিনি তনলেন গায়ক বৈজু বাগ্গার অসাধারণ গানের উক্সিত প্রশংসা। 'বাগুয়া' মানে পাগল। বৈজু বেশ একই পগলাটে ধরনের মাহুয বলে তাকে লোকে ডাকে পাগল বৈজু নামে। এ নামের পেছনে তাক্সিলা নেই, আছে ব্রহ্মা, ভালোবাসা, বিশ্বাস।

কোথার থাকে বৈজু? লোকালয়ে নয়, লোকালয় ছাড়িয়ে এক জঙ্গলের ভেতর। আপন মনে বধন-তখন গান গায়, কোনো আলরে বা মজলিসে গিয়ে গান শুনিবে বাহবা নেবার একেটাটা আশ্রয় নেই।

তানসেনের মনে-এবং বাসনা জাগল দেখতে হবে এই বৈজুকে, কথা কইতে হবে তার সঙ্গে, শুনেতে হবে তার গান। তানসেন বেঁচে থাকতেও কিনা বৈজুর গানেরও প্রশংসা করে লোকে? ইর্ষাও জাগল তানসেনের মনে।

সেই জঙ্গলে চলে গেলেন তানসেন। জঙ্গলের বাইরে যে জুনগল, সেখানকার লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন বৈজুর সঙ্গে কোথায় মোলাকাৎ হতে পারে। তারা বললে, এই জঙ্গলের ভেতরেই; কিন্তু জঙ্গলের ঠিক কোন্ অংশে এখন আছে বৈজু, সে কথা বলা অসম্ভব।

তানসেন জঙ্গলের ভেতর ঢুকে এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে খুঁজতে লাগলেন বৈজুকে। অনেক পৌজার পর শুনেতে গেলেন একটা কোণের আড়ালে মল্লভকর্ষের একটানা জলদগড়ীর আওয়াজ। আওয়াজ লক্ষ্য করে গিয়ে দেখেন, একটি লোক একটা স্টেট-হাঁড়ির মুখের সামনে মুখ রেখে ঈর্ষকষ একটানা আওয়াজ করে চলেছে। অসামান্য দম সোকটার, নইলে একনিমানে অতঃপর হবে আওয়াজ চাপু বাধা সামান্য কুলকুলের কর্ণ নয়।

লোকটির সামনে গিয়ে ধাঁড়ালেন তানসেন। তারপর

আওয়ারক ধামতে তাকে বললেন, “ভাই, আমি এসেছি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টে দেখা করতে। বলতে পারো—”

গোষ্ঠী বললে, “আমিই বৈজ্ঞ। তুমি কে ভাই?”

বিতা তানসেন বললেন, “আমি তানসেন।”

এ কথা শুনে মন্ডের মতো বল হলো। বৈজ্ঞ আনন্বে অতিথি। হয়ে বললেন, “তুমিই তানসেন। ভারতের অধিনীতি গায়ক, হরের বাহুর তানসেন? জৈন্যের বেশে আজ আমার দ্বীপন ধর হলো, নয় না সার্বক হলো। এ কলপ পবিত্র হলো তোমার পদস্পর্শে। বিরাট গুপ্তি তুমি, তোমার উপযুক্ত অভ্যর্থনা আমি কি করে করব, তানসেন? এত কষ্ট করে এ কলপে কেনই বা এসেছ তুমি?”

তানসেন বললেন, “তোমার গান শুনে। তবু তোমার গান শুনে। যে গানের এত প্রখ্যাতি শুনেছি, যে গান একবার শ্রবণে করলে শুধু মনোভাষা অর্জন করবো বলে এসেছি। সংস্কৃতিতে তুমি না কি পিতৃপুত্র।”

বৈজ্ঞ বললেন, “ছি ছি, সে কি কথা। সিদ্ধি বহুদর, এ দ্বীপনে হবে না। মোটে তো সাধনার স্বরূপ, তাও ভালো করে এগোতে পারছি না।”

হাঁড়ির মুখে মুখ দিয়ে ঐ একটানা আওয়ারকের তাৎপর্য বুঝে নিলেন তানসেন। তাৎসলেন—গলা সাধার অধুত পদ্ধতি বটে; সাথে কি আর সোকে গায়ক বলে?

তানসেন, “এতকল গলা সাধছিলে তুমি?”

বৈজ্ঞ সাধে বললেন, “ঈশা ভাই, গাছার সাধছিলুম। ছত্রিশ বছর ধরে ক্রমাগত গাছার সাধছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত গাছার রস্তু হলো না।”

আশ্চর্য, ছত্রিশ বছর সাধনা করেও স্বরশ্রাবের সাতটি ধরের তৃতীয় স্বরটি আবৃত করতে পারেনি যে, তাকে আবার লোকে গাইয়ে বলে!

গান একখানা শোনাতোই হবে, বৈজ্ঞকে ধরলেন তানসেন।

বৈজ্ঞ নিজেকে গাইয়ে বলেই বীকার করতে রাজী নন। বললেন, “বলেছি তো আজ পর্যন্ত গাছার রস্তু করে উঠতে পারিনি, যাক-সংস্কৃতি গাইব কি করে? তবু, তুমি যখন ধরেছো, তখন আপন যেখান-পুণিতে যে-সব গান গাই, তারি একটি-শোনাই তোমাকে। যেভাবে গান শোনানো, সে যে ভাষা ভাষার কথা।”

বলে হর লাগলেন বৈজ্ঞ। শুনে চমকে উঠলেন তানসেন। কী আশ্চর্য কর্তৃ, নিরুত্তর হর লাগাবার পদ্ধতি! তাবশর স্রবের আলাপ-বিতার ধীরে ধীরে কবে উঠতে লাগল, তব্বর হয়ে শুনে লাগলেন তানসেন। এমন

অপূর্ব সংস্কৃত কখনো শোনেননি তিনি। বৈজ্ঞর গান শুনে শেষ হলো তখন অজ্ঞতে ছলছল হয়ে উঠেছে তানসেনের হৃদয় চোখ।

—“সার্বক তোমার সাধনা, বৈজ্ঞ!” বললেন তানসেন।

“তোমার গান শুনে আমি নিজেকে ধর মনে করছি।”

বৈজ্ঞর গান শুনে তানসেনের মন থেকে অসংখ্য ধর হয়ে গেল। তিনি এতদিন ভেবে এসেছেন যে সংস্কৃত-মহাসমূহকে তিনি গিলে হজম করে রেখেছেন; আর এই বৈজ্ঞ, তার অপূর্ব গান শুনে গল্পস্বামী গাছ-পাখার পর্যন্ত মুগ্ধ না হয়ে পারবে না, সে কিনা বলেছে ছত্রিশ বছর গা সেখেও এখনো সে গা-পিচ্ছ হতে পারেনি!

কাহিনীটি আবার কলমের ডগায় কুল হয়ে হুটে উঠতে পারল না। কিন্তু ঝাঁপাহেবের মুখে তার বিচিরি পার্থক্যী ব্যাঙ্গ্যর এ কাহিনী যে অনবদ্য রস সঞ্চিত করত তার তুলনা নেই।

কাহিনীটি কোলকাতা ইঙ্গিতপূর্ণ। এবং ঝাঁপাহেব জোর দিতেন বৈজ্ঞ বাওয়ার ছত্রিশ বছর গাছার সাধার ওপর। হ-চারজন পুরোনো শ্রবণে মনে গভীর বেদ ছিল ঝাঁপাহেব মহা কলপের মতো টিপে-টিপে টিপে তেতালার তালির দিচ্ছেন, আসল কিনিগলো ছাড়তে চাইছেন না। শ্রবণের অপ্রতি ইচ্ছা করেই অবধা বিলম্বিত করছেন। তাদের অন্তরের এই নাগিন সোকাহুজি ভাষার প্রকাশ না শেলেও প্রকারান্তরে প্রকাশ পেতো। বলা বোধ হয় ব্যবহৃত, এসের লক্ষ্য করেই ঝাঁপাহেব বৈজ্ঞ বাওয়ার ছত্রিশ বছর গাছার সাধার কাহিনী শোনাতেন। শুনিতে প্রকারান্তরে বোঝাতে চাইতেন—“বাণু যে, বৈজ্ঞর মতো গুপ্তি ছত্রিশ বছর গাছার সেখেও তৃত্ব হননি। আর, তোমরা এই অল্প-দিনের ভেতরেই ওজাস হয়ে বাবার আশা করো? ওজাসের ওপর বিশ্বাস রেখে রেজাজ করে বাও, সত্যে নিশ্চয় বেঙরা কলবে।”

কিন্তু বেঙরা কলবার সময়-সংকুল প্রতীক্ষার অনিদিষ্ট কাল সত্ত্ব করতে গররাজী হয়ে ঝাঁপাহেবের তালিম গগন থেকে হ-চারজন সাগরের নক্ষত্র ধীরে ধীরে বাস পড়ল। ঝাঁপাহেব ব্যথিত হলেন। আমাকে বললেন, “আসল আসল ঠিক সাগরের ধরেই সঙ্কে ব্যতলাইনি বলে আমাহের (যানে ওজাসের) একটা বদনাম আছে শুনেছ বোধ হয়?”

বললুম, “শুনেছি, ওজাট।”

ঝাঁপাহেব বললেন, “কথাটা সত্য। কিন্তু তার আসল ব্যাঙ্গ্য আমাহের কিস্টেটি বা শোকাহুজি নয়, সাগরের ধরে

যেইমনি বা অযোগ্যতা। অগতঃ দান আমরা ত্রৈধন পছন্দ করিনে। আদ্য নিজেবা অনেক কামেলা সহ্যে, অনেক কদম্ব মেহনৎ করে যে-সব জিনিস বস্তু করছি, কই করে সেয়েছি বলসেই আমবা তা সঠি করে সেয়েছি, জেয়েছি তার কথাঃ দুখ। যে জিনিষ অতি সহজে পাওয়া যায়, অতি সহজে পাওয়া গেল বলেই মাথায় তার মাঝা কদম্ব দুখের পারঃ না। সেইজন্মেই দাতা তালিন বেখার আগঃ সংগেহলেন আমরা কিছুদিন ব্যক্তিঃ মিঃ। পরঃ করে নিই তারা সঠিঃ এ সাধনার টিকে থাকবে, না, এ তাদের হুসিনের ঈনকোঃ দখ। পরঃের গোপে যে সাগরের টিকে হয়ে সেই ওজারের কাছ থেকে পার মাঝা তালিন। আর বাগা টেলেনা তারা জেঃ ভেয়েসেই যায়।”

বাঃসাংহেব ওক কঠর শিহের ধৈর্য এবং নিষ্ঠা পরীকার যে ওখা বললেন ত্রাতঃ সত্যঃ অজাব নেই বটে, কিন্তু এমন একটরিক সংইত-ওকর কথাও শুনেছি—এবং বিশেষ বিবস্ত্রঃ—বাঃ সংইত-বিকাঃ সহজে ‘বতই করিয়ে দান তঃ যাবে বেড়ে’ নীতিই মানতেন না। সেখানেই সহজে টালসে যেমন একটা অইহুকী কৃপণতাঃ বজাগত ছিল, টালসে সংইত-ভাত্যের ভালে ভালে জিনিসগুলি ঠায়া নিঃসেঃ দিতেন না। কোনঃ ওখাঃ ঠায়া ঘরানার সেয়া জিনিসগুলো অল্প কোনঃ সাগরেহকঃ না দিয়ে শুঃ আপন খুঃবে বাঃ অপর কোনঃ নিষ্ঠাঃ আত্মীয়কঃ দিয়ে দান তার একটা মনঃ বোকাঃ যায়। কিন্তু এমন ওখীর কথা শুনেছি, ঠায়া পুর বা নিষ্ঠাঃ আত্মীয় এমন কেউ ছিল না যাকে ঠায়া সংইতঃহাঃ উত্তঃখিকাঃ কইঃ হেঃ যেতে পারেন, তন্ম ঠায়া জিনিস অপর কঠরিকঃ তিনি সেখানে রাখীঃ হননি। সহঃবঃ এঃ এক ধরনের পাগলামি।

উকঃ বাঃসাংহেবের খুঃই মিঃ তানসেন সহজে আরেকটি কাহিনী শুনেছি। বাঃসাংহেব বলেছিলেন অননুঃকরণীয় ভাষায়, আমি আমার অনুঃকরণীয় ভাষায় বলি। কাহিনীটি যেসে টেকসই কিনা সে প্রশ্ন এখানে অব্যক্তঃ; কাহিনীটি মজাদার, সেটাই বড় কথা।

আগে বলা কাহিনীতে তানসেন বৈদুঃ ব্যঃগার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, এ কাহিনীতে সেলেন বিখ্যাত নায়ক নায়ক গোপালকে দেখতে। নায়ক গোপালের বিশুলঃ খ্যাতির কথা শুনেছিলেন তানসেন।

নায়ক গোপালের বাড়ির খৌঃ করতে করতে এক ইদারার দ্বারে এসে তানসেন দেখলেন—ইদারা থেকে অঃ হুলে-হুলে দাসীরা বেটে-ঘড়ায় ভরাঃ, আর তাদের কাঃ তঃরকঃ করছেন এক সন্ন্যাসঃবঃীয়া তরুণী। তরুণীটি জলপূঃ ঘড়াগুলোতে চৌকাঃ মেঃ-মেঃ কি বেন পরঃ করছেন, এবং যে ঘড়া ঠায়া পছন্দ হচ্ছে না সে-ঘড়া ব্যক্তিঃ করেঃফলে দেওয়া হচ্ছে। এভাবে একাধিক ঘড়া ব্যক্তিঃ হকেঃহয়ে শেষ

পৰ্বঃ সাতটি ঘড়া তরুণীটির পছন্দের ছাড়পত্র গেল। দাসীরা জলপূঃ সাতটি ঘড়া নিয়ে গেল গেল ইদারার অনতিঃহঃ একটি ব্যক্তিঃ ভেতর। কাঃ দেখে তানসেন বেশ কৌতুক অঃতঃ করলেন। দাসীরা চলে যেতে তরুণীকে তিনি জ্বালেন নায়ক গোপালের বাড়িটি কোন্‌দিকে।

তরুণী বললেন, “আপনি ঠায়া বাড়ির মনুঃখেই ঠাড়িয়ে আছেন। এবং আমি ঠায়াই কতা। আপনি কে জানতে পারি কি?”

তানসেনের পরিচয় শেঃে নায়ক গোপালের কথা একই সঙ্গে আনন্দিত এবং ব্যক্তিঃ হয়ে বললেন, “কি সৌভাগ্য, আপনি এঃছেন! পিতার খুঃে আপনার অসাঃরঃ প্রতিভার কত প্রশংসা শুনেছি। কিন্তু কি হুঃাগো, পিতা আজ জীঃিত নেই। আজ ঠায়া প্রাঃ-অঃস্থান।”

নায়ক গোপালের হুঃাঃ-সংবাদ শুনে মঃদঃহঃ হলেন তানসেন।

নায়ক-গোপাল-হুঃিতা বললেন, “পিতা আপনার সঃীঃতের মঃা তরু ছিলেন। আপনি আজ এসে পঃ্কেছেন, এ বোগাযোগঃ হুঃিকাঃ বিধাতারই বিধান। সাতঃবাসঃে আপনার গান শুনে পিতার আঃাঃ তঃ্রঃ হঃে।”

অতিঃি তানসেনকে নিয়ে পুঃাঃজিঃ্মেঃ চললেন তিনি। যেতে যেতে কৌতুকী তানসেন প্রশ্ন করলেন, “আঃ্হা, আপনি চৌকাঃ মেঃ-মেঃে কয়েকটা ঘড়াকে ফেলে দেওয়াঃলেন কেন?”

তরুণী বিস্মিতা হয়ে তাকালেন তানসেনের খুঃের দানে। হুরের পুঃারী তানসেন এমন প্রশ্ন করছেন, এ হুঃি তিনি কখনও করতে পারেননি।

বললেন, “সাতটা ঘড়া সঃ্রঃহুরে নিঃুঃ করে বিলিয়ে নিলাম। চৌকাঃ মেঃে দেখেঃদেখেঃ বেঃহঃাঃ ঘড়াগুলো ব্যক্তিঃ করে দিলাম। পিতা ছিলেন হুরের উপাসক। বেঃহঃাঃ ঘড়ার জলে তো ঠায়া আঃাঃ তঃ্রিঃ পাঃে না।”

যেঃেটিঃ জঃাব শুনে বিস্মিত এবং সন্দিঃ্ত হলেন তানসেন। তঃবলেন যেঃেটিঃ পিতার উপঃুকঃ সন্ধান হটে।

নায়ক গোপালের খুঃে অসাঃরঃ আগঃ এবং সন্ধান সেলেন তানসেন। মনে মনে ভাবলেন, এ সন্ধান তো ঠায়া পাওয়াই। ঠায়া সমঃকঃ গায়ক হুঃ-ভারতে আর কোঃার আছে?

প্রাঃভঃাসঃে নায়ক গোপালের কথা নায়ক গোপালের তঃ্রঃাঃ হুলে গিলেন তানসেনের হাতে। বললেন, “পিতার এ তঃ্রঃার দান একমঃাঃ আপনিই রাখতে পারবেন। এঃ তঃ্রীঃতে বাংকঃ হুলে আপনি বাঃ-সঃীঃতের আলাপ করুন! পিতঃেঃবের পতিঃ আঃাঃ আপনার সঃীঃতঃ-প্রঃণে পরম পতিঃুঃ হবেন।”

প্রাঃভঃাসঃে সঃাঃীঃ উৎকঃ। নায়ক গোপালকে গান

শোনানেন জানসেন। সঙ্গীতের এক মহাসমুদ্র গান শোনানেন আরেক মহাসমুদ্রকে।

তবুও তবীতে স্বকার তুলে আলাপ হুহ করলেন জানসেন। আচ্ছ তিনি আসর হাত করবেন, যেন সারা আসরে ধুহ-ধুহ শুনিয়ে শোতে বহায়েন।

কিন্তু একি! হুহসা আর্জন্য করে উঠলেন নায়ক-গোপাল-নক্ষিত্রী: গেল, গেল, সব আরোজন শও হয়ে গেল। অন্যক গোপালের তবুওর বর্ষাধা রাখতে পারেননি জানসেন। যেভাবে তিনি আলাপ ধরেছেন সেটা হুহ লাগাবার নির্ভুল নির্ণুত পদ্ধতি নহ।

জানসেনের হাতো গ্যাটিমান তবীর স্বর-প্রয়োগের তবীতে যে অনন আনন্দের ব্যাকতে পারে, এ যেন ভারতেও পারেননি অন্যক গোপালের কন্ঠ।

সবিনয়ে ছোড়ছোড় নায়ক-নক্ষিত্রী জানসেনকে বললেন, “লগা করে আপনি গান বহু করুন! আপনায় এ গান অনে পিতার কর্তব্য এবং জগত পীড়িত হয়েছে। শ্রান্তনারের আবহাওয়া বেরতো করে গিয়েছেন আপনি। শ্রান্তের সমস্ত উপকরণ তার শরীরে দ্বিত হয়ে গেছে। সমস্ত বাতিল করে দিয়ে আমাকে আবার নতুন করে আরোজন করতে হবে।”

লক্ষ্যের হুঃপ আছহারা হলেন জানসেন। প্রতিবাদ করবার কোন বা প্রবৃত্তিও রইল না। তিনি অল্পভব করলেন যেন কোথায় সত্যিই তাঁর স্বর-প্রয়োগে হুহ কটি হয়ে সেজে যা হুঃপ হয়ে বেজেছে নায়ক-নক্ষিত্রীর কানে।

শ্রান্তবারের ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন পথে। যেতে লাগলেন বেদিকে হু-চোষ যায়—নায়ক গোপালের গৃহ থেকে দূরে বহুদূরে শাণিয়ে যেতে পারলে যেন তিনি বাঁচেন। ও গৃহে তিনি জীবনে বৃষ্টি আর কখনও হুহ দেওয়াতে পারবেন না। অল্পলম্বী অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক বলে স্বর্ণ ছিল জানসেনের মনে, সে স্বর্ণ কি এমন নিষ্ঠুরভাবেই ভাঙলেন জগদান?

যেত যেত এক নিরালা পথের ধারে এক গাছতলার বিশ্রাম নিতে নিতে হুধিয়ে পড়লেন শ্রান্তদেহ ব্যথিতজ্বরর জানসেন। হুধের গোরে বহু খেলেম তাঁর মাখন এসে পাড়িয়েছেন এক সোম্য স্বপ্নবর্ণকাকি পুরুষ, মুখে তাঁর করুণার হাসি। তিনি যেন বলছেন—“বৎস জানসেন, আমি নায়ক গোপাল। পিতৃমোকেই আমার কন্ঠর অনন বৈশিষ্ট্যটি ঘটেছিল। তাতে হুঃপ কোরো না। তোমার সবকয় গায়ক পৃথিবীতে কই আছে? তু তোমার স্বর-প্রয়োগের পদ্ধতিতে সামান্য একটু কটি আছে, এইটুকু ওপরে নিয়েই ছুধি নির্ণুত গায়ক হতে পারবে।”

বলে তিনি শব্দের চেতরই স্বর-প্রয়োগের আদর্শ পদ্ধতি শিখিয়ে গিলেন জানসেনকে। শব্দের তালিম শেষ হবার

সঙ্গে সঙ্গেই হুহ ডেকে গেল, জোপ ঘেলে তাকালেন জানসেন। তখন মাখন আর পাড়িয়ে নেই অন্যক গোপাল, কিন্তু তাঁর দেওয়া তালিমের বাহু-মাথানো স্বকার তবীতে বাজছে জানসেনের কানের পাশে।

আচ্ছ!!!

এখানে ওখানে একটু ওজন, একটু মোড়, একটু পোঁচের তবীত মাত্র, অথচ ঐ সামান্য তবীতের কী অসামান্য বাহু! আচ্ছ প্রতিভা নায়ক গোপালের! স্বকার মাথা নত হয়ে এশো স্তম্ভগর্ভ জানসেনের। আকিমিডিস যেমন ‘ইউরেকা! ইউরেকা!’ বলে চোঁচাতে চোঁচাতে ছুটেছিলেন, জানসেনও তেমনি ‘পেয়েছি! পেয়েছি!’ বলে ছুটে চললেন অন্যক গোপালের গৃহ-অস্তিত্বের। যখন পৌঁছলেন তখন শ্রান্ত-বাসর আবার নতুন করে লাকানো হয়েছে নতুন উপকরণে নতুন সরকামে।

এবার জানসেন বিবাহীন, নিঃসংসার, দুঃপ্রতিভ। গান শোনানেন তিনি অন্যক গোপালকে। গল্পাভ্যাসেই করবেন গল্পাভ্যাসেই শুরু। জানসেনের ঐকান্তিক অমুরোগে জানসেনের হাতে অন্যক গোপালের তবুও আবার হুহে গিলেন নায়ক-নক্ষিত্রী।

এবার আর কুল হলোনা জানসেনের। সামান্য খেটুই কটি ছিল, সেইখু বর্ণে তালিম দিয়ে ওপরে গিয়েছেন নায়ক গোপাল। সত্যিকারের নির্ণুত তবীতে হুহ লাগালেন জানসেন, সারা আশের অনিঃশব্দীর আনন্দের শিঃপ-প্রোত বয়ে গেল। গানের শেষে নায়ক গোপালের কন্ঠা উজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেন জানসেনের প্রশংসায়। স্বভাব বদাই স্বস্ত-স্বস্ত করতে লাগলেন। তাতে আনন্ডিত হলেন জানসেন, কিন্তু গবিত আর হলেন না।...

এ কাহিনী ঋগ-সাংঘের বলেছিলেন একজন সঙ্গীতামোদী ধর্মীর ভাবনে একটি ঘরোয়া বৈঠকে, ছুটি গানের মধ্যবর্তী বিরাম-কালে। গল্প বলতে ভালোবাসতেন এবং ভালো পারতেন ঋগ-সাংঘের। ঘরোয়া বৈঠকে যখন গাইতেন তখন মাঝে মাঝে পিয়াদেটের হোঁরা উপভোগ করতে করতে হু-চাগটি গল্প তনিয়ে নিয়ে তারপর আবার গান ধরতেন তিনি।

আগেই বলেছি ছাপার হরফ নেই সে সমীচীন উচ্চতা যা ছিল কাহিনীমুখর ঋগ-সাংঘেরের মুখে, বিশেষ করে সেই নৈশ সমীচীন-বৈঠকের পরিবেশে। কাহিনীর আবেগন (ইংরেজিতে থাকে বলে ‘একই’) নিঃকর কাহিনীর ওপরই নির্ভর করে না, তার প্রকার এবং মাষ্টাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে পরিবেশ এবং পরিবেশন। বইখোঁজোলে কলমল লিঃপুঃগের ডিঃকাক্স স্টেশন-স্ট্যাটস্বর্ষ বা পেরো-ম্যাক্টে গাঃচঃমঃমঃমঃ চুতের গল্প পড়ন্তর যা শুনবার উপাত্ত পরিবেশ নহ, সে কথা বোধ হয় বদাই বাহুল্য।

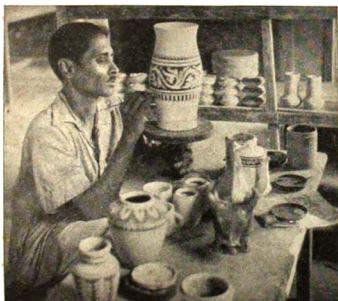
পশ্চিমবঙ্গ-পরিচরমা

বীরভূম মনোজিং বসু

[পুঁত্রিকাভিত্তিক পত্র, ১৯৭১: ১৯৭১]

আগেই বসুজি, বীরভূম-জেলায় জলদায়ক মোটামুটি স্বাধীন। ১৮৭০ সালে এটা তার পরে বেশ কয়েকজনের দ্বারা এখানে কাস্টেমাইজিং হাওর চালানো, জমদারতা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। এখান থেকে মালদহের দিকে বসে। তবে, বীরভূম-জেলায় মতো এ জেলাতেও কৃষকের প্রাধান্য রয়েছে। এই জেলার চিত্রিত-সংস্কৃতিও মনোজিং বসুজি

কেজ (হালদাভাঙ্গা, বাঁকুড়াজি, বিষ্ণু ও মাতৃমঙ্গল কেজ, লাতন) ঐক্যবদ্ধ, কৃষ্ণাঙ্গের দ্বারা। জেলায় অত্রাণ্ড তাৎপার্য। জামায়াত চিত্রিত-সংস্কৃতিও রয়েছে কয়েকটি। দিকের দিক থেকে এ-জেলার অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। ১৮৭১-৭০ সালে বীরভূম-জেলায় যেখানে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল ১৫১টি—আজ সেখানে তার সংখ্যা এক হাজার একশ পাঁচ, কি তাইও কিছু বেশি। ১৯৪০ সালে এ-জেলায়



চিত্রিত-সংস্কৃতি

বিভিন্নশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্বারাও সরকারী হালদাভাঙ্গা রয়েছে চারটি, কৃষ্ণ-চিত্রিত-সংস্কৃতি একটি, মাতৃমঙ্গল-কেজ একটি, আর লাতন ঐক্যবদ্ধ দুটি। তাছাড়া, আরও ৭৮টি চিত্রিত-সং

স্কুলে ছিল ৪টি; হাইস্কুল ৩৭টি—তার মধ্যে ৩৪টি ছেলের, ৩ মেয়েদের এটি; মিতল স্কুল ৮১টি—ছেলের ৭০টি, মেয়েদের ২টি; প্রাইমারী স্কুল ১০২টি—১০২টি ছেলের, ২০টি

মেরেপু; আর, অল্পাংশ দিকা-প্রতিষ্ঠান ২৪১টি। চারটি কলেজের নাম—কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতুসপু; বিভাগাগর কলেজ, সিউড়ী; ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, বোলপুর; ইন্টার-মিডিয়েট কলেজ, রামপুরহাট। তাছাড়া, এই জেলাতেই রয়েছে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়; অর্থাৎ, শাস্তি-নিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। এই জেলার চারিদিকের বেশি ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাছাড়া, অগ্রদত্ত সন্তানদের ছেলেদেরদের দত্তও শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে এই জেলায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণ-বিভাগ পরামর্শী করে জেলার দত্ত সিউড়ীতে রয়েছে একটি 'প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুল', আর একটি 'ছ'নিয়র বেসিক ট্রেনিং স্কুল' স্থাপিত হয়েছে স্ট্রিনিকতনে। এই জেলার বিভিন্ন ঘাটপাড়া করেকটি বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে। সিউড়ীতে একটি 'স্ক-বখির বিদ্যালয়'ও রয়েছে অনেকদিন থেকে।

ইংরেজ রাজত্বের শাসন-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি ছিল শহর-কেন্দ্রিক। ফলে, এদেশের বড় কিছু উন্নতি বা অগ্রগতি হয়েছে তা কেবল শহরকে কেন্দ্র করেই। গ্রামীণ জীবন তাই এতদিন ছিল উপশ্লিষ্ট। স্বাধীনতা-লাভের পর সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। গ্রামের কেন্দ্র করেই ডক হয়েছ উন্নতির কাজ। শহর থেকে গ্রামে যেতে আর রাজস্বাচারের ভয়ন অস্বীকার নেই। বেগাযোগে-ব্যবহার দ্রুত উন্নতি দেখা হচ্ছে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে। তাই বলে, সকল অস্বীকারই যে দূর হচ্ছে এমন নয়। কিন্তু, যাতে তা দূর হয় সে-বিষয়ে সন্দেহই আর দ্রুততন। বীরভূম-জেলায় বিভিন্ন প্রেক্ষীর রাজ্য রয়েছে সেহুয়াবার মাইলের ওপর। তার মধ্যে গাফা রাজ্য ছা'প আশী মাইল। বাকিটা পাঁচো। এ-বিধাব অল্প বহুর কয়েক আগেকার। ইতিমধ্যে আরও অনেক রাজ্যখাট তৈরি হয়েছে। কিন্তু, তার-পুরো হিসেব না পাওয়ায় এখানে তা উল্লেক করা সেল না। সর্ব মহুয়াবার শাকা রাজ্য গিয়েছে সিউড়ী থেকে গাইবান্ধা, দুবরাপপুরে, দুবরাপপুর হ'য়ে বোলপুর, আর মহন-বাড়ারে। তাছাড়া, গাইবান্ধা-হলাননপুর, বোলপুর-ইলাম-বাড়ার, বোলপুর-স্কল, আর স্কল-শাস্তিনিকেতনের রাজ্যও পাকা। রামপুরহাট মহুয়াবার শাকা রাজ্য আছে দু'টি—একটি রামপুরহাট থেকে নারায়ণপুর, অত্রটি মহীশা থেকে গাইবান্ধা। এ-জেলার পল্লী-অঞ্চলে ঘোরাঘুরা করতে বেশির ভাগ লোকই নেন মোটর-বাসের সাহায্য। শহর

মহুয়াবার বাস-কট আছে নয়টি—(১) সিউড়ী-আহমদপুর; (২) দুবরাপপুর-শাস্তিনিকেতন; (৩) সিউড়ী-আনন্দোড়া ঘাট; (৪) সিউড়ী-দুবরাপপুর-মহন-বাড়ার কেন্দ্র; (৫) সিউড়ী-দুবরাপপুর-শরারশোল; (৬) সিউড়ী-রামনগর; (৭) সিউড়ী-তীতীশাড়া; (৮) সিউড়ী-মহন-বাড়ার-সেউড়া; (৯) লাতপুর-গাফিয়া; আর (১০) সিউড়ী-হলাননপুর। এর মধ্যে সিউড়ী-দুবরাপপুর-শাস্তিনিকেতনের বাস-কটটিই সবচেয়ে দীর্ঘ—চুয়ামিল মাইল। রামপুরহাট মহুয়াবার বাস-কট আছে দু'টি—(১) রামপুরহাট থেকে নারায়ণপুর; আর, (২) রামপুরহাট থেকে বিষ্ণুপুর। এ ছাড়া, সিউড়ী থেকে বিহারের গাঁওভাল-পরগণার অন্তর্গত মশাহোর ও দুবকা বেতেও বাস পাওয়া যায়। সিউড়ী থেকে ভাগলপুর আর রামপুরহাট থেকে দুবকা পর্যন্তও বাস চলাচল করে। বীরভূম-জেলায় যে-কয়েকটি রেলপথ বিদ্যুত হয়েছে তার মধ্যে ইস্টার্ন রেলওয়ের সাহেবগর-সূদ লাইন-ই প্রধান। এই পথে পড়েছে বোলপুর, কোপাই, আহমদপুর-অংশ, বাতালপুর, গাইবান্ধা-অংশ, নারায়ণপুর, মনায়পুর, রামপুরহাট, স্বাধীনপুর, নলগাতি-অংশ, চাতরা, দুয়ারই, বাণেশ্বরী ত্রিম ও রাজগাঁ টেশন। ইস্টার্ন রেলওয়ের আর তিনটি শাখা গিয়েছে এই জেলার দ্বা দিক—(১) অগল-গাইবান্ধা কর্ড; আর, (২) আহমদপুর-কাটোয়ার শাখা। টাকীপুর ও মোহাপুর পড়েছে অগ্নিবর্গ শাখার। ভীমগড়, পাঁচরা, দুবরাপপুর, ত্রিমগাই, সিউড়ী ও কোলুর টেশন পড়েছে মগাল-গাইবান্ধা কর্ড লাইনে। আর লাতপুর, মহনপুর, স্বাধীনপুর ও লললগ্রাম বেতে হ'লে আহমদপুর-অংশ থেকে কাটোয়ার গাড়ি ধরতে হবে। এই জেলার সাব-পোস্টঅফিস রয়েছে পনেরোট আর ব্রাক-পোস্টঅফিস আশির ওপর। সাব-পোস্টঅফিসগুলি রয়েছে সিউড়ী, গাইবান্ধা, দুবরাপপুর, বোলপুর, লাতপুর, রামপুরহাট, মোড়েশ্বর, নলগাতি ও দুয়ারই থানায়। আর, প্রত্যেক থানাতেই আছে ব্রাক-পোস্টঅফিস।

বীরভূম-জেলায় উল্লেকযোগ্য গ্রামগার আছে কমপক্ষে চারশটি। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও আধুনিক গ্রামগার হ'লো শাস্তিনিকেতনের 'বিশ্বভারতী গ্রন্থভবন'। যে গ্রন্থভবনের গ্রন্থাগারিক ছিলেন রবীন্দ্র-জীবনীর প্রভাতহুয়ার সুযোগ্যগায়ে। গ্রন্থানত এর অল্পাংশ চেঁতেই 'বিশ্বভারতী গ্রন্থভবন' বিরাট একটি জানভাওরে পরিণত হয়েছে। নৈশ ও বিশেষী ভাষার বহু দুশ্যাপ গ্রন্থ আছে এখানে। এই জেলা থেকে যে-সব সাম্প্রতিক সংসারণ প্রকাশিত হয়, তার

মধ্য সিউড়ী থেকে প্রকাশিত 'বীরভূম বার্তা' ও 'বীরভূম বাবী', বোলপুর থেকে প্রকাশিত 'বার্তাবহ' আর রামপুরহাট থেকে প্রকাশিত 'রাষ্ট্রাঙ্গিকা' ও 'বীরভূমের ডাক' উল্লেখযোগ্য। পল্লীগানের সমাজ-জীবনে এইসব সংবাদপত্রের যে বিশেষ একটা স্থান আছে, সে-কথা বলাই বাহুল্য। আনেক-প্রমোদের দিক থেকে লগ্নের ধাতা ও অভিনয়-ব্যবস্থা বান দিয়ে থাকে সিনেমা। তবে, সিনেমা-হাউসের সংখ্যা যার তিনটি। তার ছুটি আছে লগ্ন মহেশ্বার সিউড়ী আর বোলপুর, অষ্টটি রয়েছে রামপুরহাটে। হাটবাড়ারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কীর্ণহার, লাডপুর, বাহিহী, পাইকিলা, আনন্দপুর, মহেশ্বার, লেউটা, দুর্বারপুর, লোকপুত্র, হেমনপুর, বড়বা, রামনগর, উত্তীর্ণাড়া, ইলামবাড়ার, ছন্দাতিহি, করিয়া, পূর্ববরপুর, সিউড়ী, রামপুরহাট, মাচগ্রাম, পাইকর, দুর্বারই, নন্দীগ্রাম, কথমা, নলহাটি, মোড়েশ্বর, মহারপুর, নারায়ণপুর ও বিষ্ণুপুরের হাট।

বীরভূম জেলার লোকসংখ্যি সত্যি বৈচিত্র্যপূর্ণ। আউল-বাউল-সরবেশের স্পে হলো বীরভূম। তারিক মতবান ও বৈকর মতবান দুইয়েরই প্রাধান্য এই জেলায়। বীরভূমের পল্লী-সকলের পুরাতন দিনের বহু মন্দির যেমন বিজ্ঞান, তেমনি পীরের সরগার সূচ্যও বড় কম নয়। ধর্মাস্ত্রের ধান বা ঠাই-ও দেখতে পাওয়া যায় প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই। তারিকদের ছুটি বড় কেন্দ্র হলো বক্রুর ও তারাপুর। তেমনি, জয়নব-কৈলুসি ও লগ্নের হ'লো বৈকরদের ছুটি তীর্থস্থান। জয়নব-কৈলুসি আউল-বাউল-সরবেশের একটি প্রধান কেন্দ্র। মাঘ-সংক্রান্তির দিন এঁরা জড়ো হন জয়নব-কৈলুসিতে। রাত্রির চলে নাচে, গান ও উৎসব। শুধু জয়নব-কৈলুসি নয়, বীরভূম-জেলার প্রায় সবখানেই দেখতে পাওয়া যায় আউল-বাউল-সরবেশের। এদের গানে বীরভূমের পল্লীপ্রান্তর কেন লগ্নের হ'য়ে ওঠে, এদের নাচে উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে বীরভূমের শৈবিক পথ। এট বাউলের হয় কেন পল্লীবাংলার প্রাণের স্বর, বাউল-নাচ কেন পল্লীবাংলার নিম্নর ছন্দ। বাউল-গানের স্বর স্ববীজনাথকও যে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তা সর্বজনবিদিত।

প্রাচ্যদেশতা হিসেবে ধর্মাস্ত্রের প্রভাব এ-জেলার সবসঙ্গে বেশি। আদেই বসেটি, প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই 'ধর্মাস্ত্রের ধান' দেখতে পাওয়া যায়। বিগ্রহ খুব সামান্যে। সূর্য্যাত একটা হুচি-পাখর। সিঁদুর-রাঙা এই ধরনের পাখুরে বিগ্রহ লগ্নেই লোকের নজরে পড়ে গাছের নিচে বা

ছোটখাট মন্দিরে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে, কোথাও আবার ভাস-সংক্রান্তিতেও ধর্মাস্ত্রের পূজা হয়। অনেক কোয় হাঁস-মুগিও বলি দেওয়া হয় ধর্মাস্ত্রের পূজার।

বীরভূম-জেলার লোক-সংখ্যির ক্ষেত্রে মনসাপুত্রা ও মনসামিশল-গানেরও বিশেষ একটা স্থান আছে। গম্ববদিক সম্রাটের মধ্যেই মনসাপুত্রা বিশেষভাবে প্রচলিত। পূজা হয় শ্রাবণ-সংক্রান্তি বা ভাস-সংক্রান্তিতে। বিবাহ-উপলক্ষে অনেক মনসামিশল-গানেরও ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। এতে করে কেন চাঁদলদাগরের ঐতিহ্যই বজায় রেখে চলছেন এঁরা।

লগ্ন চিত্রবিনোদনের উপায় হিসেবে বীরভূম-জেলার এখনও ধাতা, কথকতা ও বৈকী-সকীতের চল আছে। বেজাবে একদিন 'মৈমনসিংহ গীতিকার' সংগৃহীত হয়েছিল, সেইভাবে যদি কেউ বীরভূম-জেলার পল্লীতে পল্লীতে খুঁজে দেখানকার পল্লীপীতি সংগ্রহ করতে পারেন, তাহ'লে নিঃসন্দেহে তা স্বর্ণমণ্ডলে সমর্পিত হবে। এইসব পল্লীপীতির ভাব ও স্বরের মধ্যে যে মাধুর্য লুকিয়ে রয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে বাংলার নিম্নর সম্পদ এবং তার মধ্য দিয়েই ছুটে উঠছে ভাট-অকলের লোকসংখ্যির একটা বিশিষ্ট রূপ। সৌরমোহন মিত্র মহাপ্রবরের 'বীরভূমের ইতিহাস' বই থেকে এখানে বীরভূমের কয়েকটি প্রাচীন গ্রাম্যপীতিকার নমুনা উদ্ধৃত করছি—

মা-দুর্গার শব্দ পরা :

"দুর্গা বলে—আমার বাইরে শব্দ নাই, তোমার নাই লাগ।
ঠাহুর ছুটি বাই শব্দ নাওহে মাঝী বেবরার।
কোথা না দেখিলি শব্দ ; কোথা খুঁজে এলি।
কি কুস্তির শব্দরান, আমারে মাগিলি।
কণা, সোনা পর, যে অকালে বেটি বাবি।
হাঙা কলি শব্দ পঠি' কোন্ কর্তা বাবি।"

শিবের চাষ :

"ঠাহুর বলে—

কোথা গাব লাগল জোয়াল, কোথা গাব বীজের ধান।
কোথা গেলে গাব দুর্গা মেস্তর কুলাণ।
হাতের ত্রিশূল ভেঙ্গে পড়, কোয়াল আর ফাল।
রাখাল কবি করবে করে, নন্দী মহাকাল।
আমার বাসে, তোমার কৃষে, মর্ডো কোড় হাল।"

বানভাসীর পান :

“নদী সে ধানোশরে, বরাকরে, করছে আনানোনা।

দু'শার মিশারে ভাসে শেরগড় পরগণা।

এলো বান শকটোটে,

এলো বান শকটোটে, নিলেগ লুটে, ডালগো বাজার পড়।

দু' দু' শব্দে ভাসে পবিত্র পাথর।

...

এবারে বান বাহির হ'লো—

এবারে বান বাহির হ'লো, রাত গোহালো,

চললো ঘাটে ঘাটে।

গলায় মিশার বান অবিকার ঘাটে।

বারশ' মিশ সালে—

বারশ' মিশ সালে, বরবাকালে, ডালগো নক্ষরবাস।

কেউ হ'লো পাকুড়ে রাজা,—ভারো স্বর্নশা।”

“বীরভূম-জেলায় এখনও বহু প্রাচীন মেলা অঙ্গীকৃত হ'য়ে থাকে। সেইসব মেলায় যথোপযোজ্য উপলক্ষ্যযোগ্য হ'লো—মহানব-কৈবল্লির জয়দেবের মেলা আর স্বকেশবরের বিব-চতুর্দশীর মেলা। সরকাৰী হিসেব থেকে জানা যায় যে, গ্রামে একশ' গাঁওত্রিগুণি মেলা অঙ্গীকৃত হয় এই জেলায়। তার মধ্যে দুবরাকপুত্রে ও বোলপুর থানায় হয় একশটি ক'রে, মহানব-বাজার থানায় কুড়িটি, খরবাসোল থানায় বোলটি, নলহাটি ও বৌড়েশ্বর থানায় এগারটি ক'রে। শিউড়ী, নাহুর, ইলাব-বাজার, লাভপুর, ঘুঘাই ও বানপূর্বহাট থানাতেও বিভিন্ন উপনব-মহাঠান উপলক্ষে বিভিন্ন আকারের মেলা বসে। এইসব মেলায় বাড়িল-নাচ ও গীতগানী নাচও অঙ্গীকৃত হয় অনেকক্ষেত্রে।

বহু প্রাচীন মন্দির, গীতগান, সরগা প্রভৃতি ছড়িয়ে আছে বীরভূমের এখানে-সেখানে। হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের বহু ইতিহাস এখনও বর্তমান। দুবরাকপুত্র থেকে পাচ মাইল উত্তর-পূর্বে হিন্দুতীর্থ স্বকেশব অবস্থিত। লোকের বলে এটি একটি গীতগান। কারণ এখানে নাকি বিকৃতকর্ত বসতি সতীসেবের স্র পড়েছিল। এখানকার মহানবগানের ওপর যে-মহাপীঠ ছড়িয়ে আছে, তাতে আছেন সেরী মন্দিরমন্দিরী, আর ভৈরব বক্রনাথ। মন্দির-প্রাঙ্গণ আছে একটি উচ্চ প্রস্তম্ব। সেখানে রান ক'রে একটি গজদেব যথোপযোজ্য করত হ'র বক্রনাথকে। আরও কয়েকটি গরম জলের কোথারা আছে বক্রেশ্বরে। এইসব কোথারায় জলে রান করলে নাকি নানারকমের রোগ, বিশেষ ক'রে চর্মরোগ সেবে

যায়। দুবরাকপুত্রে গেলে, অনেকগুলি প্রাচীন শিবমন্দির দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার কোলশাখার ব্যাতি সারা বাগ্যোপদেশেই। দুবরাকপুত্রের জমিদার যে বড় বড় শাখর দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রথম এই যে, শ্রীমন্তক হিমালির থেকে রথ ক'রে লম্বা দ্বারার সমর এইসব শাখর সঙ্গে নিয়ে চলেছিলেন। কিন্তু তাতে ক'রে রথ টানবার অসুবিধা হওয়ায় তিনি নাকি কিছু কিছু শাখর এখানেই কোল গান। এখানকার গাছাভেদর শিবের পূর্ব দিকে একটি বড় ঠাণ্ডা শাখরের মধ্যে নাকি সারা বছরই জল দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম এই, গীতগানী বনগমনের পাথে এই জলে মাথা দুয়েছিলেন। দুবরাকপুত্রের দু'মাইল পশ্চিমে সন্নীমগীতি নামে একটি বড় পুষ্করের ধারে স্নেহবীর্য মন্দির আছে। মন্দিরটি বহু প্রাচীন দে-বিশেষ কোনো দশেই নেই। লোকের বলে, এখানে নাকি বিকৃতকর্ত বসতি সতী পড়েছিল। শিউড়ী পথের সোনাভোর-মহাভার রাসমকটিও একটি সেখবার মন্দির। এর কাছাকাছ বড় জলর। অনেক সেখদুতি খোদিত আছে এই রাসমক। শিউড়ী পথের ছাড়িয়ে দু'মাইল পশ্চিমে গেলেই নক্ষর পড়বে একটি মন্দির। নাম—ভাগীরথন। সেখানে প্রতিষ্ঠিত আছেন অনাবিলিখ শিব, দিঘাখ ব'লেই ধার ব্যাতি। এরই কাছ রয়েছে রাজা বীরসিংহের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। লাভপুর-ও গীতগানের ব্যাতি অর্জন করেছে। কারণ এখানে নাকি সতীরা রোঁট পড়েছিল। এখানকার 'দুহরার মন্দির' অত্যন্ত শ্রীয বস্তু। লাভপুরের দু'মাইল পশ্চিম-পশ্চিমে গোপালপুর গ্রামের কাছে দুর্গাঙ্গণটির আশ্রয় ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। সেইজন্যই নাকি গোপালপুরের অস্ত্র নাম 'দুর্গাঙ্গণ গোপালপুর'। বোলপুরের কাছে জুপুরে, স্বকেশব-বাজার পুষ্কিত বলে কথিত স্বকেশবের শিব এখনও বর্তমান। মন্দিরটি রয়েছে বোলপুর-ইলামবাজার রাস্তার একশাশে। বোলপুর থেকে চার মাইল পূর্ব-উত্তরে গেলে পাওয়া যাবে একটি গ্রাম। শিবান গ্রাম। লোকের বলে, সেখানে নাকি পুরাকালে গুপ্তপুত্র মূর্তির আশ্রয় ছিল।

বীরভূম-জেলায় গিয়ে গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের প্রতি-বিম্বিত কৈবল্লি বা কৈবল্লি না সেখানে, একটা বড় শ্রীযামানই যার প'ড়ে যাবে। এই কৈবল্লি-গ্রামেই জয়দেবের জন্ম। আর তাই আর শুধু কৈবল্লি নয়, জয়দেব-কৈবল্লি। কবি একদিন যে রামায়ণবন্দীউ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ক'রে সিদ্ধিহিঁকেন, আরও তাঁর নিত্যপূজা হয়। হাতের মূল বিগ্রহ আর সেই, কিন্তু ভক্তরা তা বিশ্বাস করতে চান না।

ভাড়া বসেন, ঐ বিচারই বৈকুণ্ঠচামরি অঙ্গনবের প্রতিষ্ঠিত। প্রতিবছর নন্দর-সত্যাবির দিন কেঁদুসিতে বসে বিরাট এক মেলা। 'জয়দেব-মেলা' নামেই তার খ্যাতি। এই মেলায় প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো 'শ্রীজগদ্বিখ্য'-নাম। তাছাড়া, আউল-বাউল-করবেশের সমাবেশ। এখানে বেতে হ'লো, বোলপুর কিংবা অণ্ডাল-অংশনের নিকটবর্তী দুর্গাপুর, অথবা দুর্গাচরণপুর রেল-স্টেশন থেকে বাস পাওয়া যায়। কেঁদুসির কাছেই আরেকটি সেখবার ভাড়াপা আছে। সেটি হ'লো অঙ্গনবের দক্ষিণে প্রাচীন ত্রিগুণীপুত্র বা ইচাই ঘোষের অঙ্গ-সেত্বের ধ্বংসাবশেষ। ইচাই ঘোষের বিকৃত বর্ণনা আছে 'ধর্মযশ-কাহ্না'। রাশপুরহাট মহকুমার অন্ততম থানা মদারপুরেও প্রাচীন দেবের কিছু কিছু সেখবার মিলিন আছে। যেমন—মদারপুর শিব। মদারপুর গ্রামের পূর্বদিকে আছে একটি পাহাড়। নাম শিবপাহাড়ী। তাছাড়া, ঐই গ্রাম থেকে মাইল-সাতেক পূর্বদিকে সেসেই বীরভদ্রপুর ও পর্দাবাস নামে দুটি জায়গা দেখতে পাওয়া যাবে। বৈকুণ্ঠের কাছে তা জীর্ণস্থানরূপেই পরিগণিত। পর্দাবাসের প্রাচীন নাম—একচক্রপুর বা একচাকা। এই গ্রামের সঙ্গেই ভক্তির আছে লক্ষপাত্রের এক স্থিতি। তাছাড়া, চৈতন্য-লছর প্রকৃ নিত্যানন্দের জন্মস্থান হ'লো এই গ্রামের খ্যাতি আছে। এখানে থেকে চার মাইল পশ্চিমে রয়েছে কাঁচড়া-গ্রাম, যেখানে বঙ্গপ্রহর করচিঙ্গেন প্রসিদ্ধ বৈকুণ্ঠকবি জানবাস।

রাশপুরহাট থেকে মাইল-তিনেক দূরে আরেকটি গ্রাম। নাম—ভারাপুর। সেখানে রয়েছে ভারাসেবীর প্রাচীন মন্দির ও প্রসিদ্ধ যোগাঙ্গম 'ভারাপীঠ'। জনশ্রুতি অনুসারে এটিও একটি পীঠস্থান। বিষ্ণুচক্র বর্ণিত সতীর চোখের একটি ভাড়া নাকি পড়েছিল এইখানেই। সেখিক থেকে না-হোক, আরও একটি কারণে ভারাপীঠের খ্যাতি। এ-দুপের অঙ্গনব শিবপুত্র বায়াক্যাণ। ধর্মযশেন এই ভারাপীঠেই। প্রতিবছর আশ্বিন মাসে এখানে একটি মেলা বসে। জনশ্রুতি অনুসারে নন্দাটীও একটি পীঠস্থান। কারণ, সতীর ললাট নাকি এখানেই পড়েছিল। ললাটের নন্দিত এখানেকার অঙ্গনব ঠায়ে হান। নন্দাটী স্টেশনের কাছে নন্দাভার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও চোখে পড়ে সবার। 'কিছু, এই নন্দাভার কেনো প্রাণবান ইতিহাস' আনন্ডা হুঁসে পাই ন। রাশপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত দুয়ারই থানার কনকপুর গ্রামে ধ্বংস আজ-একটি প্রাচীন দেবীমূর্তি দেখতে পাওয়া যাবে। দেবীর নাম অপরাজিতা। বীরকীর্তিপুত্র নামে একটি বড়ও দেখতে পাওয়া যাবে দুয়ারই থেকে না-মাইল

পশ্চিমে সেলো। উহু একটি টিলার ওপরে এই দড়টি অবস্থিত। বীরভূম-জেলায় আর দু'টি ঠায়ে হান হ'লো রাজবাড়ী আর ভদ্রপুর। রাজবাড়ী খুব কাছেই রয়েছে রাজা বীরসেনের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। ভারাই কাছে মীতা-পাহাড়ী নামে ছোট একটি পাহাড়। ঐতিহাসিক কারণে রাশপুরহাট-মহকুমার ভদ্রপুর গ্রাম আজও বিখ্যাত হ'য়ে রয়েছে। আশ্বিনমঙ্গল-পাখার লোহাপুর স্টেশন থেকে এই জায়গার দূরত্ব খুব বেশি নয়। মাইল-চারেক হবে। অন্যদিকে মহারাজা নন্দকুমার জন্মগ্রহণ করেন এই ভদ্রপুর-গ্রামেই। ত্রাশাণী নদীর তীরে তাঁর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও কিছু কিছু নষ্টের পড়ে। গুরুপাণর ও রাশীপাণর নামে বড় বড় দু'টি মৌখি আছে এই গ্রামে। সম্ভবতো মহারাজা নন্দকুমারেরই অক্ষর কীর্তি। বৈকুণ্ঠকবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান হিসেবেই নাগুর-এর খ্যাতি। অনেকের মতে চণ্ডীদাস ১৪-শ শতাব্দীতে এখানেই আবির্ভূত হন। কিন্তু, কোন্ চণ্ডীদাস? সেই নাম-সমস্তর যে আজও সমাধান হয়নি! তাছাড়া, বাঁহুড়ার ছাত্ৰনা-গ্রামও চণ্ডীদাসের জন্মভূমি হিসেবে পরিচিত। খুব সম্ভবতো কবি চণ্ডীদাস, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠদাসকর্তৃক পরিচিত কবি চণ্ডীদাস, বীরভূমের নাগুরে কিংবা বাঁহুড়ার ছাত্ৰনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং নাগুরে জন্মগ্রহণ করলে তিনি ছাত্ৰনায গিয়ে বসবাস করেছেন; অথবা, ছাত্ৰনায জন্মগ্রহণ করলে নাগুরে গিয়ে বাসা বেঁধেছেন। নাগুর ও ছাত্ৰনা—দু'আলগাওতেই চণ্ডীদাসের বহু স্থিতিচিহ্ন বর্তমান।

ইতিহাসের পূর্বা থেকে জানা যায়, হিন্দু-রাজবংশে বহু সামন্ত ভূপতি বীরভূম-জেলায় বিভিন্নভাবে রাজত্ব করে গিয়েছেন। এ-সম্পর্কে বহু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রদাস শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত 'রামজয়িত' কাব্যগ্রন্থে। যেসব রাজার নাম পাওয়া যায়, তাঁর মধ্যে আছেন—বীরমণি সিংহ, কিকিন, মৈ বা সোহিত, যেভবদত্ত, সুবহ, শিবমিত্রা, কচচরণ, ধগমিত্রা, শেত, ত্রাশপদ্যজ, বীরসিংহ, সামঙ্গসেন, হেমঙ্গসেন, বিজয়সেন, বীরসেন, নন্দাভা, মানপতি, অমসিংহ, চক্রহুড়, মুহুটবাহ, দুর্ধ্বসেন, যদু, রামজীবন প্রভৃতি। রাজা বীরমণি সিংহ ছিলেন সামান্যবাসের শেষ রাজা (১৪-শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে)। এই সামান্যবাস থাকলে লাভপুর-অঞ্চল। কীর্তীধারের রাজত্ব করতেন রাজা কিকিন। কিকিনের ধী নামে এক পাঠানের হাতে এই রাজা নিহত হন। নাগুরের কাছে 'গোপতিহি' নামে এক গ্রাম ছিল সেকালে। রাজা মৈ বা সোহিত

হিসেন সেখানকার সামন্ত স্রুপতি। প্রায় এক বর্গমাইল গোলাকার ভূখণ্ড ছিল তাঁর রাজ্যপ্রাঙ্গণ। লুপ্তগ্রাম সেই প্রাঙ্গণের কিছু কিছু এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। লোকেরা বলে—সোহিত-রাজার পুত্র। বেতবংশ নামে আরেকজন সামন্ত রাজা রাজত্ব করে গিয়েছেন পিরান-এ। বোলপুর থেকে মাইল-তিনেক উত্তর-পূর্বে ছিল সেই পিরান। রাজা যখন যে বোলপুরের নিকটবর্তী লুপ্ত-গ্রামে আশ্রিত্য করে গিয়েছেন, সে-কথা তো আরোই বলেছি। রাজা শিবসিংহার রাজত্ব ছিল ঠাইখিরা বানার নিউর বা শিবপুর-গ্রামে। ইনি ছিলেন একজন কথিত রাজা। এঁর রাজ্যপ্রাঙ্গণের ক্ষেত্রাবলি এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে থাকে বীরকুমারের মাটি থেকে। রাজা কচুরণ দাসের পত্নীস্বরূপ এক সামন্ত রাজা। নিউজী-ছবরাঙ্গপুর গণ্ডে কচুরাঙ্গ গ্রাম ছিল তাঁর রাজত্ব। শোনা যায়, বাহুবল তিনি দিল্লির রাজাসীমা অনেকখানি বাড়িয়েছিলেন। ছবরাঙ্গপুরের বেড় মাইল পশ্চিম-উত্তরে খন্দ্র-গ্রামে ছিলেন রাজা বগদিত্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খন্দ্রের শিব এখনও বর্তমান। বরেন্দ্র-অঞ্চল ছিল রাজা খেতের অধিকারে। লোক বলে, এই রাজাই বরেন্দ্রের খেতগঙ্গা ছুঁতে প্রতিষ্ঠাতা। নিউজী নদীর পাঁচ মাইল পশ্চিমে খটকা-গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ রাজা রাজত্ব করতেন বলেও শোনা যায়। তবে, ঐতিহাসিক প্রমাণ বড় একটা মেলে না। রাজা মানপতি মাজগ্রামে, রাজা অশ্বিনীহ ও প্রহ্লাদ তারাপুরে, রাজা মুহুট রায় ঘোড়পুর্বে, রাজা দুর্জয় সেন কোটাপুরে, রাজা বর মজারপুরে এবং রাজা বামজীবন ঘোড়পুর্বে বানার ঢেঁক-গ্রামে রাজত্ব করে গিয়েছেন বলে জনশ্রুতি আছে। এইসব রাজা-রাজড়া আসলে ছিলেন অমির। তবে সেকালের অমিরের হিসেবে রাজা-রাজড়ার মতোই ছিল তাঁদের বৈশাখ ও প্রহ্লাদ। রাজা বীরসিংহ ও রাজা বীরসেনের যে-ঐতিহ্য পাওয়া যায় তাতে ক'রে তাঁরা যে প্রহ্লাদই বীর ছিলেন, সে-বিষয়ে অস্বস্তি সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বীরকুমার-জেলার হিন্দু-রাজত্বের ইতিহাসে এঁরা তাই সর্বশ্রেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য। রাজা বীরসিংহ ১৩-শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বীরকুমার রাজা ছিলেন। এই সময় তাঁর রাজধানী ছিল রাজনগরে (তখনকার লগপোরে)। হুলতান বীরসিংহই উক্ত ঠাঁকে হুৎ পরাজিত করে লগপোর অধিকার করে নেন। কিন্তু বীরসিংহকে পরাজিত করতে তাঁর পুত্রই বেগ পেতে ব্যর্থ ছিল। রাজনী শেখরের কাছে বীরনগর বলে যে-গ্রাম আছে, শোনা যায় রাজা বীরসেনের রাজধানী ছিল সেখানে। ইনি সেনবংশেরই কোনো এক রাজা হবেন। তাঁর বিরূপ

রাজপ্রাঙ্গণের ক্ষেত্রাবলি এখনও দেখতে পাওয়া যায় বীরনগরে।

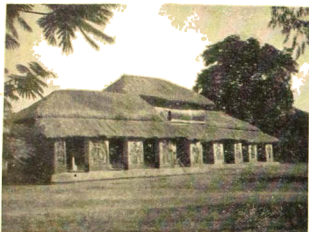
মুসলমান-আমলে যে-সব সরকারী কর্মচারী ও কৌশলার বীরকুমারের বিজ্ঞাংশে আশ্রিত্য বিচার করে গিয়েছেন, এখানে তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। পটান কৌশলারের বীরকুমার-অঞ্চলে পাতি ও পৃথলী বক্ষর ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে কর আদায় এবং বিলাস-বাসনে শিন কাটতে সেগড়াটাই যোগ্যতর বেশি পছন্দ করতেন। অস্বস্তি, ইতিহাসে তো সেই ইন্দিবই পাওয়া যায়। ১৩-শ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে যে-সব মুসলমান-পাদুক বীরকুমার ছিলেন, তাঁদের অনেকের অনেক পুত্রই মেলে রাজনগর-অঞ্চলে। সম্ভবতঃ, রাজনগরই ছিল তাঁদের রাজধানী বা সদর। যে-সব মুসলমান-পাদুক রাজনগরে বা বীরকুমার অঞ্চলত আসে রাজত্ব করে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেওয়ান বাহাদুর খাঁ (বা প্রধান খাঁ বাহাদুর), দেওয়ান দাওয়া কামাল খাঁ বাহাদুর, দেওয়ান আমদ-উল-খাঁ, দেওয়ান বাবীউল-জমা-খাঁ, মহম্মদ আমদ-উল-জমা-খাঁ বাহাদুর, বাহাদুরউল-জমা-খাঁ, মহম্মদউল-জমা-খাঁ, মহম্মদ হাও-বউল-জমা-খাঁ, মহম্মদ জহর-উল-জমা-খাঁ প্রভৃতি। রাজনগরে এখনও এঁদের অনেকের বাড়ির, তোরণ ও ইমামবাড়ার ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ে। কিন্তু, সারকলের তেমন কোনো বসাবস্তু না থাকায়, এ-সব হযতো একদিন নিশ্চয় হয়ে যাবে।

বীরকুমার-জেলার ইতিহাসে কতগুলি হুৎ-বিগ্রহ উল্লেখযোগ্য হ'য়ে আছে নানা কারণে। ভগ্নাবশেষ-কৌশলির কাছে অমর নদের তীরে ছিল রিপটীন্দ বা ঢেঁকুর। এখানেই ইছাই ঘোষের হুৎ হয় শৌচাশ্রমিত্যের প্রতিমিতি কর্ণসনের সঙ্গে। ইছাই ঘোষ সামান্য এক গোণ-সন্তান হ'য়েও যে-রক্তম লাসের সঙ্গে হুৎ করেন, তার তুলনা বড় একটা মেলে না। ঢেঁকুরে এখনও ইছাই ঘোষের সেউল দেখতে পাওয়া যায়। অস্বস্তি হুৎবিগ্রহের মধ্যে নাম করা যেতে পারে—কাটিগ্রামের হুৎ, ডামরার হুৎ, হেতমপুরের হুৎ, সঃগ্রামপুর ও জগদাঙ্গপুরের হুৎ। বলা বাহুল্য, এ-সব হুৎের প্রধান কারণ ছিল রাজত্ব আদায় নিয়ে সরকারী কর্মচারী বা শাসকবর্গের সঙ্গে স্থানীয় লোকের অসন্তোষ।

কালের পরিবর্তনে বীরকুমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু চারামিহ পত্নী-অঞ্চলের প্রগতি এখনও একেবারে লুপ্ত হ'য়ে থাকে। এখনও তাই বীরকুমার গৈরিক গণ্ডে আউল-বউল-দরবেশের পবিত্র অশ্রিত হয়, বৈষ্ণবের আশ্রয় চলে

অষ্টপ্রহর নাম-সাকীর্জন, কবরতঃ-বাহারি আগর এখনও বসে
কোথাও কোথাও। অমল্যব, চণ্ডীদাস, নিত্যানন্দ, জ্ঞানদাসের

ধোদিত হলেছে সেই অমর বাণী—“তিনি আমার প্রাণের
আরাধ, মনের আনন্দ, আশ্বাস পাতি”। ১২০১ সালে



কলাভবন হাটবাস, শাহিনিকতন

[ছবি : অমিত বিশ্বাসী]

সেই এই বীরত্ব। সমাজ-জীবনে এখনও তাই বৈকল্য-
রূপটি বহরা আছে। তেমনি আছে তাত্ত্বিকতার রূপ।
শক্তি পুত্রের প্রচলনও দেখতে পাওয়া যায় বীরত্বের বহু
রূপে। উপজাতীয় সাঙতালার মধ্যে এখনও সেই
বীরত্বের অঙ্গ আছে। তারা যেমন সহস্র, সরল জীবন
যাপন করে, নাচ-গানের মধ্য দিয়ে নিরন্তর মনের আত্মিক
মাধুর্য ও উজ্জলতাকে প্রকাশ করে, তেমনি আবার সাহস ও
বীরত্বের পরিচয়ও দিতে আসে।

আধুনিক কালে এক শাহিনিকতন-ই বীরত্ব-ক্ষেত্রে
পরিচিত করে রেখেছে সারা ভারতে, এমন কি সারা বিশ্বের
শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। হাওড়া স্টেশন থেকে একশো
মাইলের দূরত্ব, বোলপুর স্টেশন থেকে যাত্রা এক মাইল।
এই অরণ্যের নির্জনতা, এর শাসনিত্ত পরিবেশ ও প্রাকৃতিক
সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'য়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬০ সালের মার্চ মাসে
এখানে একটি উপাসনা-মন্দির ও অতিথিবালা স্থাপন করেন।
তারপর ১৮৮৭ সালে তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়
শাহিনিকতন আশ্রম। যে-রুটি ছাতিমাগাড়েই নিজে বসে
মহর্ষি একদম উপাসনার বিষয় থাকতে ভালোবাসতেন,
আজও তা অক্ষয় হ'য়ে রয়েছে সেখানে—একটি প্রস্তরফলকে

রবীন্দ্রনাথ শাহিনিকতন-আশ্রমকে নতুন করে গড়ে তুললেন।
প্রতিষ্ঠিত হ'লো ব্রহ্মচর্যাশ্রম—প্রাচীন ভারতের আদর্শ।
প্রকৃতির শাস্ত্র পরিবেষ্টনীর মধ্যে স্থাপিত হ'লো মৃত্যু-প্রাণ
বিভাগ। সেখ-বিরেখের ছেলেনেত্রের আসতে লাগলো
কবিগুরু আকর্ষণে। নতুন পরিবেশে, নতুন শিক্ষা-পদ্ধতিতে
জন্ম হ'লো তাদের জ্ঞানচর্চা। সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম,
বিজ্ঞান এ-সবের সঙ্গে সঙ্গে চললো সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রকলা
অধ্যয়ন। কবিগুরু অস্বাস্থ্য পরিপ্রবেশে কলম হুড়ু হ'লো
শাহিনিকতনের ভিত্তি। পৃথিবীর মনোবী ও বিবেক সমাজের
ধূই আকর্ষিত হলো দেহিক। ১২২২ সালের ১৬ই মে কবি
শাহিনিকতন-বিভাগের কর্ণকল্প সম্ভারিত ও পুনর্গঠিত
ক'রে প্রতিষ্ঠা করলেন এক আনুষ্ঠানিক বিশ্ববিদ্যালয়। নাম
দিলেন 'বিশ্বভারতী'। যে-বিশ্বভারতী'র পরিচালক আজ
ভারতের জাতীয়-সরকার। শিল্পশ্রেণী থেকে উচ্চতম শিক্ষা
ও গবেষণার নানা ব্যবস্থা আছে এখানে। পাঠ্যভবন (বা
বিদ্যালয়), শিক্ষাভবন (বা কলেজ), চৌকালভবন, বিশ্বভবন,
কলাভবন, সঙ্গীতভবন, গ্রন্থভবন (বা গ্রন্থাগার), বিনয়ভবন
(বা শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ), বিভাগভবন (বা গবেষণা-
মন্দির) প্রভৃতি 'বিশ্বভারতী'-রই বিভিন্ন বিভাগ। আর

হয়েছে শ্রীনিবেশতন—আদর্শ পটীগঠন, ভূমি ও দৃষ্টান্তিগ্ন জিত্ত কোথায় যেন তলে কেটে গেছে—শাখিনিবেশতনের প্রকৃতির আদর্শ দিকাক্ষেত্র। দইট আছে, চহতো বা আরও পুরনো, সবটি গেছে চাহিয়ে। তবু বলন—শাখিনিবেশতন



টপানবা-গৃহ, পশ্চিমবঙ্গতন

[কটা : অতিথি ইহাবী

উন্নতি হয়েছে আগের চেয়ে। কিন্তু আগেকার সেই শাস্ত্রমণ্ডুর বীরভূমের ননেনতি, যে-মদি আরও উচ্চল; শাখিনিবেশতন
পরিবেশটি আর আর নেই, শোকেব চাপে আর বাড়িখতের পশ্চিমবঙ্গের গৌরব-ভিলক—যে-ভিলক আরও অচ্চল।

কোন : ২২-৪৬৮৭

এস, মুখাজী এণ্ড কোং

[কাগজ ও মুদ্রণের কালি বিক্রেতা]

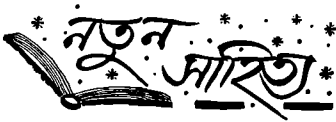
পি. ২২-৪, রাণাবাজার ট্রাট, কলিকাতা ১

পশ্চিমবঙ্গ-পরিচয় :

টটোগড় (পপার মিল্‌স কোম্পানী লিমিটেড

,এবং

হগলি ইক কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড



দুই বন্ধু—রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র

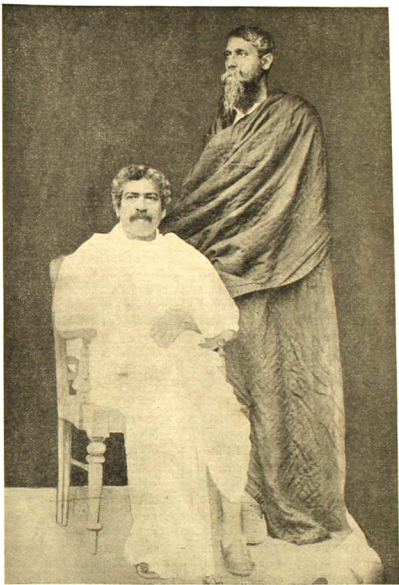
বিনয় ঘোষ

একজন কবি, আর একজন বৈজ্ঞানিক। সাধারণত কোন বন্ধু হবার কথা নয়। কিন্তু একেতে এমনভাবে হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের বন্ধু সম্পর্কে এসেছে অনেক লোক-কাহিনীরও উদ্ভব হয়েছে। এই বন্ধু এমনই ঐতিহাসিক যে কেবল ছাত্রের অভিভাবতা দিয়ে তার রহস্য ও ভাবগর্ভ বোঝা যায় না। ছাত্র ছাড়াও আরও অল্প কয়েক এমন গভীরতর এক অভিভাবতা ও ঐক্য ছিল যা ছুটি 'ব্যক্তিকে' অবিশেষ বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে পেরেছিল। তাকে 'প্রতিভার ঐক্য' বলা যায়। জীবনের নিষ্ঠুর যাত-প্রতিঘাতে অনেক 'অভিভূত' বন্ধুও বন্ধুর বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু ছাত্রের রসে পুঁটে হয়েও যে-বন্ধু 'প্রতিভা' ও 'ব্যক্তির' মধ্যে ঐক্যের যোগসূত্র খুঁজে পায়, তার বন্ধন শত আগাতেও ছিন্ন হয় না। আচার্য জগদীশচন্দ্র বহুকে সিংহিত রবীন্দ্রনাথের পরাবলীর মধ্যে* হুই যুগপ্রতিভার এই কৌলিক ও ঐতিহাসিক ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বোঝা যায়, আমাদের জাতীয় প্রতিভার নবোদ্বোধকালে হুই যুগপ্রতিভার যে মিলন হয়েছিল, মনোরাজ্যে ছন্দে তাকেই ছাত্রী আগুন দিয়েছিলেন এবং এই পরাবলীর মধ্যে সেই মিলনের সুরই আগাগোড়া ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। কবিতার সঙ্গে বিজ্ঞানের বাস্তব মিলন নয়। হুই উদ্যাবলী প্রতিভার দুইয় অতিথানগালী আশ্রয় মিলনের অম্লরগন রবীন্দ্রনাথের এই পরাবলীর ছুরে-ছুরে শোনা যায়।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সাহিত্যসাধারের মধ্যে তাঁর পত্র-

সাহিত্যের একটা বিশেষ আছে। কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিক তাঁদের শিল্পকলায়, কাব্যে ও সাহিত্যে তাঁদের মানসিক ভাবাচ্ছন্ন প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যে তাঁদের অন্তরাস্তর নিরাভরণ পরিচর পাওয়া যায় না। গভীর ব্যক্তনা ও ইচ্ছিতের ভিতর দিয়ে, নানাবিধ আভরণের অধ্যাস রচনা করে, তাঁরা তাঁদের স্তূট সাহিত্যে ও শিল্পে আত্মপ্রকাশ করেন। মনের কথা মন মূলে বলবার সুযোগ সেখানে নেই। পার্থকের সঙ্গে তাঁদের যে সংযোগ তা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। অসংগিত অপরিস্ফুট পার্থকের মনের সঙ্গে তাঁরা যে যোগসূত্র স্থাপন করেন, তা বড় আশ্চর্যকরই হোক, মূলত রহস্যবৃত্ত। সেই রহস্যের পরা উদ্ভাচন করে ধারা শিল্পীর মানসলোকের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন, তাঁরাও শেষ পর্যন্ত সেই গর্ভগুহের অতলস্পর্শ অঙ্কুরে হতান হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হন। সব প্রতিভাকেই তাই দময় অস্থলস্থান ও অভিমানের শেষে রহস্যময় বলে মনে হয়। বিশ্বের বড় বড় প্রতিভার মতন, রবীন্দ্রপ্রতিভার ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। মাথা খুঁড়েও সেই মনের জাহ্নবী কোঁটার সোনার চাবির সন্ধান পাওয়া যায় না। যা কাব্যে পাওয়া যায় না, চিত্রে পাওয়া যায় না, সুরের ও ছন্দের মধ্যে বা ধরা-চোঁরা যায় না, একমাত্র ব্যক্তিগত পরাবলীর মধ্যে তাকে অনেকটা মনে ধরা-চোঁরা যায়। কারণ ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেই শিল্পী, কবি বা যে-কোন প্রতিভা নিরাভরণরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, বন্ধুর কাছে—প্রীতির পাত্রের কাছে। চিঠিপত্রের মধ্যেই তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে পাওয়া যায় এবং আত্মপ্রকাশকাতর শিল্পীরাও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যে নিঃসঙ্কেতে নিজের মনপ্রাণ, চিন্তাভাবনা, অস্থল-বিভাগ উজাড় করে দিতে সূচিত হন না। সাধারণভাবে তাই

* চিঠিপত্র, খণ্ড ৪০ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঐশ্বরিকবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত। বিলাসারটী, ২, বর্ধমান রাস্তা-পাথার স্ট্রীট, কলিকতা। চার টাকা (কাগজের বাঁধাই), পাঁচ টাকা (খোঁট বাঁধাই)।



অগবীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

[‘বিখ্যাত’র সৌহার্দে]

সাহিত্যের ইতিহাসে শিল্পী-সাহিত্যিকের পত্রসাহিত্যের একটা বিশেষ স্থান আছে।

পত্রসাহিত্যের এই বিশেষত্বের কথা উদ্ভিদ শতকের বিখ্যাত ইংরেজ গল্পলেখক কার্ভিডাল নিউম্যান ১৮৩৩ সালে তাঁর ভাগিনীকে লেখা একখানি চিঠিতে উল্লেখ করে দিয়েছিলেন। আরও অনেকে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কার্ভিডাল নিউম্যানের উক্তি অস্বীকৃত :

"It has been a hobby of mine...that the true life of a man is in his letters. Not only for the interest of a biography, but for arriving at the inside of things, the publication of letters is the true method. Biographers varnish, they conjecture feelings, they interpret...but contemporary letters are facts."

নিউম্যান খণ্ডে চান যে মানুষের আসল জীবন তার চিঠিপত্রের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং তার মধ্যেই সত্যকার মানুষটিকে চেনা যায়। কেবল জীবনচরিত্রের জন্ত নয়, জীবনের ও বিধিধর্মের বর্ণনায় প্রবেশ করার জন্ত চিঠিপত্র পাঠ করা প্রয়োজন এবং সেইজন্য চিঠিপত্র প্রকাশ করাও বাঞ্ছনীয়। চরিত্রকাররা অনেক ঘটনামালা করেন, পালিশ করেন, অস্ত্রের ভাবোচ্ছিন্ন অহুত্ব ইত্যাদি তারা অহুত্বান করে দেন, জীবনকে ব্যাখ্যা করেন, সমালোচনা করেন। কিন্তু সমসাময়িক চিঠিপত্র হল ইতিহাসের মালমশলা এবং খাটো তথ্য।

কেন ইতিহাসের? সাহিত্যের ইতিহাসের এবং সমাজের ইতিহাসেরও।

ডব্লিউ জনসন আরও স্বাক্ষরভাবে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে চিঠিপত্রের এই বিশেষত্বের কথা Mrs. Thrale-কে লিখিত একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন : "In a man's letters his soul lies naked, his letters are the mirrors of his heart." প্রাত্যহিক জীবনের সীমাবদ্ধ চৌহদ্দির মধ্যে থেকেও সাধারণ মানুষ আত্মীক-সত্যের কাছে যে-সব চিঠিপত্র লেখেন, সংগ্রহ করতে পারলে (সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীগত জর থেকে বাছাই করে), সেগুলি থেকে সামাজিক ইতিহাসের এমন মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যেতে পারে যা কোন মহাকাব্যকারের দলিলপত্রেরও দুর্লভ। জীবনের দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগ, ব্যর্থতা-দ্রাবি—স্বপ্নের ভাষায় বা বলা যায় না, চিঠিপত্রের মধ্যে তা অবলীলাক্রমে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রসাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যের কথাই জনসন ও নিউম্যান বলেছেন।

বিশ্বসাহিত্যের ভাষায় পত্রসাহিত্যের বিশুল সম্ভারের কথা সকলেই জানেন। সংগ্রহ করলে কেবল পত্রসাহিত্যেরই একটি বিরাট পর্যায়গার তৈরি করা যায়। ব্যাভানামা মনীষী শিল্পী সাহিত্যিক, সকলেরই পত্রসংকলন ইংরেজী ভাষায় সংকলিত অনুদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভ্রুতি যুব বেশি পরিমাণে হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে পত্রসম্ভার তেমন সঙ্কট না হলেও, সামান্য নয়। এদিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথ বড় একটি অভাব পূরণ করে দিয়েছেন। বেদন তাঁর পত্রাবলীর পাতের বৈচিত্র্য, তেমনি তার বিশুলতা। মনোবোগ দিয়ে অহুত্বলন করলে এই পত্রাবলীর ভিতর দিয়েই রবীন্দ্র-প্রতিভার ও রবীন্দ্রচরিত্রের এমন অনেক আপাততঃসম্মত দিকের সম্ভান পাওয়া যায়, যা ঠীকাকারের বিচারিত ব্যাখ্যানের মধ্যে পাওয়া যায় না। 'বিশ্বভারতী' রবীন্দ্রনাথের এই পত্রাবলী যত্নে যত্নে প্রকাশ করে এই অহুত্বলনের হুত্ব কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্রের এই পত্রাবলী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজে যা বলেছেন তা প্রবিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্র বহুধর পত্রাবলী যখন 'এবালী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৯০৯ সনের জ্যৈষ্ঠ থেকে শৌব সংখ্যা-পর্বত) তখন প্রথম কিত্তির আগতে রবীন্দ্রনাথ 'পত্র-পরিচয়' প্রসঙ্গে লেখেন :

"ছেলেবেলা থেকে আমি নিঃসঙ্গ, সমাজের বাইরে পারিবারিক অপরোধের কোণে কোণে আমার দিন কেটেছে। আমার জীবনে প্রথম বহুধর জগদীশের সঙ্গে। আমার চিত্তাভ্যন্ত কোণ থেকে তিনি আমাকে টেনে বের করেছিলেন যেমন ক'রে শরতের শিশিরবিন্দু সূর্য্যোদয়ের মহিমা চিরদিন আমাকে শোবার ঘর থেকে ভুট্টির বাইরে এনেছে। তাঁর মধ্যে সহজেই একটি ঐশ্বর্য দেখেছিলুম। অধিকাংশ মানুষেরই বতাইকু সোচের তার বেশি আর ব্যক্তনা নেই, অর্থাৎ বাড়ির প্রাণী বোঝা যায়, আলো বোঝা যায় না। আমার বহুধর মধ্যে আলো দেখেছিলুম। আমি গর্ভ কবি এই যে, প্রমাণের পূর্বেই আমার অহুত্বান সত্য হয়েছিল। প্রত্যেক হিসাব গণনা ক'রে যে প্রভা, তাঁর সত্যকে আমার প্রভা সে জাতের ছিল না। আমার অহুত্ব ছিল তার চেয়ে প্রত্যক্ষতর; বর্ধমানের শাক্যাইহুয় মধ্যেই আবদ্ধ ক'রে ভবিষ্যৎকে সে বর্ধ ক'রে দেখেনি। এই চিঠিগুলির মধ্যে তারই ইতিহাস পাওয়া যাবে, আর যদি কোনো দিন এই

উভয়ে প্রত্যাহার আমার চিঠিগুলিও পাওয়া যায়।

তাহা'শে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারবে।"

এতদিন পরে সেই ইতিহাস সম্পূর্ণ হল, জগদীশচন্দ্রকে লিখিত বীজ্ঞানার্থে এই পত্রাবলী প্রকাশের পর।

জনগণের মূগে হোরেল ওয়ালপোল (Horace Walpole) ছিলেন 'prince of letter-writers'। প্রে, কৃপার, ল্যাব বা চেষ্টারহিষ্ণের সঙ্গে তাঁর মূল্য না করেও বলা যায়, কেবল চিঠিপত্রের ভাষে ও বাহ্যে তিনি পত্রপ্রসারের সম্রাট বলে গণ্য হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, ওয়ালপোলের পত্রাবলী সংক্ষেপে স্বল্প আশ্বাসন বলেছেন :

"They have almost every good quality but one—and that is charm. The very sincerity of his letters...reveals the fundamental lack of character which prevented his undoubted talents and unrivalled opportunities from having any creative effect on the world".

বাংলা সাহিত্যেও অজ্ঞাত ক্ষেত্রের মতন পত্রসাহিত্যেরও সম্রাট ছিলেন বীজ্ঞানাথ। ভাষে, বাহ্যে ও বৈচিত্র্যে তাঁর পত্রাবলী অঙ্গুলনীয়। কিন্তু ওয়ালপোলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আশ্বাসন করেছেন, বীজ্ঞানাথের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ কোনবতেই করা চলে না। বীজ্ঞানাথের পত্রাবলীর অন্ততম আকর্ষণ হল তাঁর 'charm' এবং যে-কোন বিখ্যাত পাশ্চাত্য পত্রলেখকের 'sincerity' তাঁর পত্রের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও, তাঁর অধিকাংশ পত্রের মধ্যে 'character'-এর পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিত্বের ও প্রতিভার 'চরিত্র' তাঁর মধ্যে যেন অজ্ঞাতসারেই ছুটে ওঠে। জগদীশচন্দ্রকে লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে আরও বেশি ক'রে ছুটে উঠেছে, কারণ বীজ্ঞানাথের ভাষায়—"এবল স্বধঃস্বরে বোঝায় যিলে অনুরের স্তম্ভ বধন জগদীশের তরুণ স্তম্ভকে বধন করছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি।" বীজ্ঞানাথের বয়স বধন অল্প, সামনের জীবন বধন "ভোর বেলাকার বেবেষে মত", আরেকটা তার "অশ্লষ্ট কিন্তু নানা রয়ে বতীন", যন বধন তাঁর "হচনায় আনন্দে পূর্ণ", এবং বধন "আত্মপ্রকাশের স্রোত নানা ঝাঁকে ঝাঁকে আপনাতে আপনি বিক্ষিত হয়ে চলেছিল", তখন থেকে তাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের প্রথম বন্ধুর, এবং এই পত্রাবলীর আদানপ্রদান চলছে জীবনের স্রোতঃকাল থেকে অপরায়তাল পর্যন্ত ক্রমবিকাশের একটি ধারা এই পত্রাবলীর মধ্যে লক্ষ্য করলে নজরে পড়ে। এই

ধারাটি বীজ্ঞানপ্রতিভার ও চরিত্রের চাবিকাঠির মতন। সেই বিশ্বরূপ প্রতিভার অনেক পাপতির উন্নীতনের সোপান রহন্ত বীজ্ঞানাথ নিজেই যেন তাঁর 'প্রথম বন্ধুর' কাছে সেগা এই পত্রাবলীর মধ্যে উন্মোচন করে দিয়েছেন। কেবল বসিকজনের কাছে নয়, ধারা নিষ্ঠার সঙ্গে বীজ্ঞানপ্রতিভার অহুশীল করতে চান, তাঁদের কাছেও এই পত্রাবলী বহু অজ্ঞাতপূর্ব উপাদানের উৎস বলে মনে হবে।

উপাদানের বৈচিত্র্য সংক্ষেপে পত্রাবলী থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

১৩০৬ সনের ১৩ জ্যৈষ্ঠ, বীজ্ঞানাথ জগদীশচন্দ্রকে লেখেন : "কতগুণি পৌরাণিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে—সেমন করিয়া হৌক তাহাদের একটা গতি করিতে হইবে—তাহারা আমার কল্পনাস্রবের মত—পাত্রিকের সহিত তাহাদের পতিবদ সাধন করিতে না পারিলে তাহারা অরক্ষিত্ব হইয়া উঠিবে—কিস হইহাদের সংক্ষেপে বাল্য-বিবাহটা ভাল নয়—উপযুক্ত বয়স পর্যন্ত টহাদের করলব ও ও উপগ্রহ আশ্রয়ে সঞ্চারিতেই হইবে।" (১নং চিঠি)

এই প্রসঙ্গে বীজ্ঞানাথের 'কথা' ও 'কাহিনী'র কথা মনে পড়ে। ১৩০৬ সনের মাঘ মাসে 'কথা' এবং কাছন মাসে 'কাহিনী' প্রকাশিত হয়। 'কথা' কাব্য জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত। জগদীশচন্দ্র কণ-চরিত্রের বিশেষ অমুগাহী ছিলেন। এ-সময়ে বীজ্ঞানাথকে তিনি পিণিমাছিলেন : "একবার কণ সংক্ষেপে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাঁদের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কণের সৌন্দ-গুণবিশিষ্ট অপরিশূর্ষ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়।" ১৩০৬ সনেই বীজ্ঞানাথ 'কণ-কুন্তী-সংবাদ' রচনা করেন।

১৩০৭ সনে একখানি চিঠিতে বীজ্ঞানাথ লেখেন (৩নং চিঠি) : "ওনে আশ্চর্য্য হইবে, একখানা Sketch book নিয়ে ব'সে ব'সে ছবি আঁকি। বলা বাহুল্য, সে-ছবি আমি প্যারিস সেলোজ-এর জন্তে তৈরী কর্তৃক নে. এবং কোন দেশের জ্ঞানজ্ঞান দ্যালাদী যে এগুলি যদেশের ট্যাক বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এবংকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। কিন্তু ছেলের প্রতি যার যেমন অশূর্ণ রেহ জন্মে তেমনই যে বিজ্ঞাটা ভাল আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা করনু, এবারে বোল আনা ইচ্ছেমতে যন দেবে তখন ডেবে ডেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এই সময়ে উন্নতি লাভ করবার একটা মত বাধা হয়েছে এই যে,

যত শেলিঙ্গ চাপাঙ্কি তার চেয়ে বেশী রবার চাপাতে হচ্ছে, হুতরাং এই রবার চাপানটাই অধিক অভ্যাগন হ'বে বাচ্ছে—অতঃপর হুত র্যাকেন্স তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হ'বে য'বে থাকতে পারেন—আমার দ্বারা তাঁর কবরের কোন লাভ হবে না।" সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ ত্রিভুজাচরণ মনোনিবেশ করেন প্রাচীন বয়সে (১৯০৫)। কিন্তু এই পর থেকে বোভা দ্বারা, প্রথম জীবন থেকেই তিনি ত্রিভুজাচরণ অহুলাই ছিলেন এবং একান্তে মধ্যে মধ্যে এবিধে চর্চাও করতেন।

১৩০১ সনেই আর-একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছেন 'নৈবেদ্য' সম্বন্ধে : "আমি আশুতোষ নানা গোলমালের মধ্যে 'নৈবেদ্য' বলে এক একটি কবিতা প্রত্যহ আমার কোন এক অবস্থার নিষেধে লেগে আমার অধ্যয়নটিকে নিবেদন করে দিই। আমার জীবনের সমস্ত কৃত কণ্ঠের সমস্ত চিত্রিত সংকল্পের সমস্ত সংকল্পের কেন্দ্রস্থলে যিনি প্রব বিতরণভাবে বিব্রাজ করছেন এবং সেই সঙ্গে সমস্ত অঙ্গপরিমাণ সমস্ত বিরাট জগৎবস্তুর যিনি একটানা একাত্ম—তাঁর কাছে নিঃশব্দে গোপনে প্রত্যহ জীবনের একটি একটি বিন সমর্পণ করে দিচ্ছি। সে দিনগুলিকে যদি পর্যবেক্ষণ দ্বারা পরিপূর্ণ করে বিতে পারতুম তাহলেই ভাগ হত কিন্তু অস্বস্ত তাকে পরশুটে ফুগের মত একটি করে গান সক্রিয় আমার জীবনের নদীর ঘাটে সেই সমুদ্রের উদ্দেশে ডাণিয়ে দিয়েও দ্রব আছে। শ্রীহই এগুলো চাপাতে দেখো—বোধ হয় তুমি ঝিলেও থাকতে থাকতেই পাবে।"

এককম আরো অনেক রহস্যের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় এবং অনেক উপাদানের। কেবল রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোক সহজে নয়, তখনকার সমাজ রাজনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনেক চিন্তার ও ধ্যানধারণারও পরিচয় পাওয়া যায় পরগল্পটির দ্বারা।

এই ধরনের পত্রাবলীর সকলম একাধ সঙ্গার দায়িত্বও অনেক। কেবল পরগল্পি একরে জড়ো করে মূদ্রিত করলেই সেই দায়িত্ব শেষ হয় না। পরগল্পিকে যে-অর্থে রবীন্দ্র-

জীবনের ও রবীন্দ্রসাহিত্যের চাবিকাঠি এবং বহু অজ্ঞাত উপাদানের উৎস ও আকর বলেছি, সম্পাদক ও সংকলকের উপর সেই অর্ধের দায়িত্ব প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব থাকে। তা না হলে সংকলনের কাজ অনেকটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। আলোচ্য পত্রাবলীর প্রযোগ সম্পাদক ও সংকলক শ্রীপুলিন-বিহারী সেন এই দায়িত্বের গুরুভার বেরকম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন, তা আমাদের দেশে অস্বস্ত: তাঁর সমোদ্বোধের মধ্যে স্পষ্ট। সেজন্য পূর্ণাঙ্গ পত্রাবলীর শেষে তিনি প্রায় আরও একশত পৃষ্ঠার যে বিস্তারিত 'এছপরিচয়' সরিবেশ করেছেন, তাতে নিম্নুতভাবে পত্রাঙ্গত প্রত্যেকটি বিষয়ের উৎসের ও আকরের সন্ধান তো দিচ্ছেনই, ঠিক-এভাবে অস্বস্ত প্রমাণ ও উপকরণও সংগ্রহ করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের অস্বাস্থ্য ও অস্বস্থানীদের অনেক পরিচয় থেকে তিনি সূত্র করেছেন। শ্রীযুক্ত সেনের পক্ষেই এই সূত্রকাজ এতখানি নিম্নুতভাবে করা সম্ভব। বাবুইপাখি যেমন একটি-একটি করে গড়ুটো সংগ্রহ করে নীচ ঘটনা করে, পুলিনবাবু তেমনই সাহাজীবন ধরে রবীন্দ্রজীবনের ও রবীন্দ্রসাহিত্যের সমস্ত খুঁটিনাটি উপাদান, বৈধ ও নিষ্ঠার সঙ্গে, সংগ্রহ করেছেন। কেবল বিদ্রিওকাইলের বৈশাখ ঘোরে বিভোর হয়ে তিনি এই উপাদান সংগ্রহ করেননি। ধীরস্থিরভাবে, অবিরাম অহুলাস করে, বৈজ্ঞানিকের মতন সেতগি আহরণ করেছেন। দিগন্তবিস্তৃত রবীন্দ্রপ্রতিভা কেবল পর্যবেক্ষণ করাই যে কত কঠিন তা তাঁর এই বিশেষকর বিশুল 'সংগ্রহ' দেখলেই বোঝা যায়। এত উপাদানের প্রায় একতরফ মালিক যিনি, এককথার রবীন্দ্রজীবন ধীর নথ্যপূর্ণে বলা যায়, পত্রাবলীর সম্পাদনকার্য নিম্নুতভাবে তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর নিজস্ব আকর্ষণ তো আছেই, কিন্তু তার সঙ্গে সম্পাদকের 'এছ-পরিচয়' উপযোগিতার জন্য বইখানি প্রত্যেক সংগ্রাহকের কাছে অবশ্যসঙ্গত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের চিত্রাবলী এবং চিঠিপত্রের পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলি সংকলনটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

। কলকাতার কাছেই ।

[পদ্মসুন্দর দ্বিতীয় প্রবন্ধ : উপদান। একাধক : ইতিহাস আন্দোলনটিকে পর্যবেক্ষণ কোং প্রাইভেট লিট্রিউট। মুদ্র : পাঁচ টাকা আট আনা]

ঐকান্তিক নিষ্ঠার চাকচর্চাই ধাঁসের জীবনব্রত তাঁদের জীবনে অকস্মাৎ এমন একটি সুর আসে যখন তাঁদের রচনা অসামান্যতর সম্পন্ন করে। প্রেরণাই বলি, আর প্রতিভার স্ফূরণই বলি, সেই বিশেষ লায়টেই না পৌঁছতে পারলে

শিল্পীর সাধনার চরম সার্থকতা আসে না। ধাঁসের প্রথম আবির্ভাবের লায়টেই সেই প্রথম লয় হয়ে দেখা দেয়, একদিক দিয়ে তাঁদের জীবন বিভূষিত। যে প্রত্যাশা ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে তাঁরা আবির্ভূত হন, নিজেদের অতিক্রম করে যাওয়া

ঐশ্বর্য পক্ষে হুঃশাখা হয় বলে, সেই প্রত্যাশা তাঁরা আর পূর্ণ করতে পারেন না, সেই প্রতিজ্ঞাটি পালন করা তাঁদের পক্ষে হুঃশব্দের হয়ে ওঠে। সন্তান-সমাজে তাঁরা সারাজীবন এককাতীয়া আশাভঞ্জেই দাখিল বহন করে চলেণ। বিচ্ছিন্নত্ববোধ মত দুর্গত শিল্পী তাঁর ‘পথের পাচালী’কে কোনোদিনই অতিক্রম করে যেতে পারলেন না, তাঁর অহুঃখিস্থত্বের কাছে এর চেয়ে কোন্‌দের বিধর আর কি হতে পারে।

তাই মনে হয়, ঐশ্বরের পরম লম্ফটী জীবনে বিলম্বিত হয়ে আসে তাঁরা যেন একদিক দিয়ে সৌভাগ্যবান। গজেন্দ্র-কুমার বিশ্ব আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের একজন শিখাবান শিল্পী। গল্প ও উপন্যাসে তাঁর রচনাতীর্থ ঘটনার অভাব নেই। কিন্তু তাঁর নবতন স্বপ্নটী ‘সলসলতার কাছেই’ উপন্যাসে তিনি তাঁর অতীতের সমস্ত উৎকর্ষকে অতিক্রম করে পেছেন। স্রষ্টার পরম লম্ফটীতে তিনি উপনীত হয়েছেন, তাই তাঁর লেখনী অসামান্যতর স্পর্শ করেছে।

ঐশ্বর্য উনিশ শতকে বাংলার নবজন্ম বা রেনেসাঁস মূলত নাগরিক জীবনেই সম্ভব হয়েছিল। নবজীবনের সেই প্রাণবন্তা বহানগরীর হুঃশ ছাপিয়ে পল্লীগ্রামে পৌঁছালেও তাঁর মর্যলো প্রাণে প্রবর্তে পারেনি। বাংলার গ্রাম-জীবনের চিরমহান প্রাণপ্রবাহিত্রী আকো শান্ত ও নিঃশব্দ বাসায় ঐতিহ্যের খাতেই প্রবাহিত হচ্ছে। কলরবমুখিত বহানগরীর অনতিদূরে—কলকাতার কাছেই—সেই জীবনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। গজেন্দ্রকুমার আদোচ উপন্যাসে সেই জীবনরহস্তেরই একটি অনাবিষ্কৃত দিক উন্মোচিত করেছেন। এ উপন্যাসের নারিকা নারী, নাথক নেই; কিন্তু এর প্রতিনায়ক হল পুরুষ। আমাদের মাতৃকাতাত্ত্বিক সমাজব্যবস্থা বহুদিন বিস্মৃত হয়েছে। কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজে নানাভাবে বিচ্ছিন্ন ও ভাগ্যবঞ্চিত নারীর আত্মবরণ ও আত্মবিবরণের সংগ্রাম যে আকো কত সত্য ও বাস্তব, গজেন্দ্রকুমারের উপন্যাসে তা বেন নতুন করে আমাদের চোখে পড়ল।

বহানগরীর উপকণ্ঠেই বলা যাবে, হাওড়া থেকে আটন-বাইলের মধ্যেই উপন্যাসের পটভূমি রচিত হয়েছে। কয়েকটি অতিশুভ ব্রাহ্মণকন্যা এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্র। গ্রিক কৌলীভ্যপ্রাধার পরিণাম বলা চলবে না, অথচ তাঁরই যোগ্য, অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনে স্বামী কর্তৃক প্রবঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন নারীসমতাই রয়েছে কাহিনীর জাবকস্রে। উপন্যাসের প্রধানা নারিকা স্যামা ঠাকুরনের বর্তমান বয়স উনআশি বৎসর। দশ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়,

সেখানেই উপন্যাসের শুরু। কালের বিচারে মোটামুটি ভাবে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম, কাহিনীর আরম্ভ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে আর প্রথম বড় শৈশু হয়েছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অর্থাৎ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের অব্যবহিত পরে। গল্পের প্রথম দ্বয়ে রয়েছে তিনটি ব্রাহ্মণবিধবা—গ্রামস্বামী, কন্যাস্বামী আর দয়াময়ী। রাসদেবির তিন কন্যা—সুনন্দা, স্যামা আর উমা। স্যামার বিবাহ হয়েছে কন্যাস্বামীর ছোট ছেলে নরেনের সঙ্গে, আর দয়াময়ী-তনয় শরতের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে উমার। যদিও উপন্যাসখানি মূলত স্যামার জীবনকে অবলম্বন করেই প্রতিষ্ঠিত, তবু স্যামা আর উমার যুগ্মবর্ণীতেই উপন্যাসের অলৌকিক উৎসাহিত হয়েছে।

হুঃশ, দারিদ্র্য আর দুর্ভাগ্য যে কত নির্ভয় হতে পারে স্যামা আর উমার জীবন বেন তার শেষ কথা। আর নারী-জীবনের পরম লয়ে—কুলশয্যার রায়েই—ওঁঠাধরে হুঃশপাত তুলে পরতে গিয়ে দুজনেই জানতে পারলে যে, সে-পায়ে সারাজীবনের জন্তে যে পানীর সঞ্চিত হয়ে আছে তা অন্ত নথ, বিধ। তবু স্রষ্টা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে শুরু হল দুজনের জীবন-যাত্রা। স্যামা দাম্পত্যজীবনের ইলাহল আশ্রয় পান করেই হল সর্গসংহা, আর উমা দাম্পত্যশ্রমালনের চির-অন্তর্ভুক্ত তুচ্ছা নিয়ে বহিঃজাগতপ্রাণ স্বামীর জীবনশাতেই দাম্পত্যপ্রাণে নারীর মত হল চিরবহিত। এই স্রষ্টা বনজ বোনের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী জীবনেই উপন্যাসের প্রধান উপকীর্তি। গ্রহকার নারী-জীবনের এই গদ্যবন্দনাধারার বৈদাম্পত্য-যচনার সর্বাধিক দক্ষতা লাভ করেছেন। বাস্তবপরিভাষ্য উমার জীবনরহস্তের উন্মীলনশীলাই এ উপন্যাসের অপূর্ণ সম্পদ। উমার ভাগ্যে তার স্বামী থেকেও নেই। তাই সে স্বামী কর্তৃক সর্বভাবে নিগূহীতা স্যামার ভাগ্যকেই উপকীর্তি করে। তার মনে হয় : “আখ্যাত পাণ্ডাও পাণ্ডা।” তার স্বামীর মত ত উদ্দেশ্যী নহ স্যামার বর! কোর ক’রে দখল প্রমাণ করে। সন্তোষ করে সে পণ্ডর মত বল প্রয়োগ ক’রে—তবু, তবু তা থেকে আসক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। আর ওর স্বামী? রূপবান, মিষ্টভাষী—যে কোন ঘেরেরই কাবনা করার মত—তার কাছে ওর পরিপূর্ণ কৈশোরের সমস্ত কামনা ও অহুঃখের জালি নিয়ে গিয়ে দিয়ে এল, সে কঠোর ঐশ্বরীভাষ্য ও অনাসক্তির কথাটী এতটাই উল্লংঘ্যে পারলে না।” তাই “যেটা শেষে স্যামার হুঃশ, সেটা না শেষেই উমার এত দীর্ঘবাস।” নারীর এই মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে গ্রহকার হৃদয় শিল্পীর কল্যাণেশল প্রদর্শন করেছেন। উমা-প্রসঙ্গেই এসেছে প্রেমের মালিক ফটিল,

কাঁচের মে নিশু ও উপাশীন, অথচ অস্থিরে এট গোপন-চাটিকের আকর্ষণ করার জন্যে তার সম্মোহন-ভাগ-বিজ্ঞানের চেষ্টার অন্ত নাই। উমা-প্রসঙ্গেই এসেছেন গুরুদেব, উপভোগ্যে ধীর আবির্ভাব অব্যাহত বলেই যোগে হৃৎ গ্রন্থকার কতৃক অনাদৃত। শেষ পর্যন্ত উমা—ফটিক, বিকটোর আর গুরুদেবের প্রণেতিন থেকে মুক্ত হয়ে নিজের পথ বেছে নিয়েছে সারথতমারে, গৃহে গৃহে শিক্ষালানত্রেতে। সেই তার জীবিকা। সেই তার আত্মরক্ষার একমাত্র পথ। উপভোগ্যের প্রথম খণ্ডে উমা পাঠকের কৌতুহলেই জাগ্রত করেছে, তার অস্থির পরিণামের জ্বলে পরবর্তী কাহিনীর জ্বলন্ত প্রতীক অপরিস্রাব।

কাহিনীর প্রথম স্তরেই তখনই মনো রাসমণির চরিত্রই সমাজে দলিত ও উচ্ছন্ন। নারীচরিত্রসমূহ আমাদের কখনো-না-হিঁসেব ভাঙাবে গল্পের কুমারের রাসমণিও চিরদিনের বড়ই আসন পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। রাসমণির মুহূর্তেই উপভোগ্যের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হয়েছে। নারিকো নামার বয়স তখন পর্য্যাপ্ত। এর মধ্যেই তারও দুই বেয়ে মহাবেতা আর ইঞ্জিনার বিয়ে হয়েছে। তাদের নিয়ে কাহিনীর নতুন নতুন স্তর রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু প্রথম খণ্ডের যেখানে সমাপ্তি হয়েছে সেখানে, মনে হল, উপভোগ্যে পথ-প্রশাখার প্রশান্তিই হয়ে চলেছে। পরবর্তী স্তরে লেখক তাঁর কল্পনার জালকে দি ভাবে গুটিয়ে

আনবেন তা দেখবার জ্বলে পাঠকমনে ঝংহুকা আর কৌতুহলেই শেষ নেই। অস্তিত উমার দ্বারা পরবর্তে অনস্বস্ত কাহিনীর শেষ কোথায় পরবর্তী খণ্ডে নিশুই তার সন্ধান পাওয়া যাবে।

লেখক বলেছেন এই পাঠ-পাঠীদের নিবেই আবেহুখানি উপভোগ্য তিনি লিখবেন। বলাই বাহুল্য, তাহলেই ক্রমাধ উনখানি বংশের জীবনকথার পূর্ণাঙ্গ হতে। তিন খণ্ডে যে উপভোগ্য সমাপ্ত হবে তার প্রথম খণ্ডের উপসংহারে এসেই তার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ দত্ত হই না, তবু এ কথা যীকার করতেই হয় যে, প্রথম খণ্ডে এট গ্রন্থখানি প্রচুর সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছে।

তবু 'কলকাতার কাছে' পড়ে একটি কথা বারবারই মনে হয়। জীবন কি সত্যসত্যই এত নির্ভর? হৃৎ ও দারিদ্র্যের কথা বলতে গিয়ে গ্রন্থকার কি হৃৎবাদের মোহে জীবনের অল্পপিককে একেবারেই ভুলে গেলেন? হৃৎখের কাহিনী-বন্যার তাঁর নির্ভর-বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা নিশুই করণ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলব, জীবনবিশ্বাস সাচে হসিক-সমাজের দাবি আরো বেশি, আরো বড়। আরেকটি কথা না বললেই নয়, রাণীবন্দন-এসঙ্গে আরো রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু কল্পনা-প্রসূত কাহিনীর মধ্যে এভাবে ইতিহাসের আবির্ভাবে রসাতাল ঘটে।

মদনীন্দ্র বসু

১ রবীন্দ্র-কাব্যালোক ।

[অধিকাংশ নিম্ন এইঃ। প্রকাশক : এ. দ্বাধি আও কোং (এইঃই) বিঃ, ২, কলকাতা, কলিকাতা ১২। মূল পাঁচ টাকা]

অধ্যাপিকা ঐদত্তী অমিতা বিদ্য প্রণীত 'রবীন্দ্র-কাব্যালোক' গ্রন্থখানি রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যে অগ্রদূতন ও উপস্থিত পক্ষে একটি চরিত্রের সহায়ক গ্রন্থ। এর ভিতর রবীন্দ্র-কাব্যের স্থিতিস্থাপন আলোচনা করা হয়েছে, অন্য দিক থেকে রবীন্দ্র-কাব্যমনসকে বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে। লেখিকার রচনাক্রমে পথ ধরে অগ্রসর হলে তবু যে রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যে প্রবেশের একটি নির্ভরযোগ্য চাবিকাঠিই দান পাওয়া যায় তাই নয়, রবীন্দ্র-কাব্যের অঙ্গভূতিও তাঁরই হয়। বিশেষণের চেমার আলোকে বিশ্লেষিতকে চেনা সহজ হয়। প্রধানতঃ ছাত্রসমাজের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে বইখানি লেখা হলেও সাধারণ পাঠক-সমাজও এর দ্বারা উপকৃত হবেন। বিশেষতঃ রবীন্দ্রাবোধী পাঠকসমাজকে আকর্ষণ করার মত বিচিত্র উপাঙ্গান এতে

সম্মিলিত হয়েছে। খণ্ডটির বিশ্লেষণ যেমন নিশুণ তেমনি এর তথ্যের দিকও বেশ ভারী।

গ্রন্থটি অনেকগুলি প্রবন্ধের সংকলন, তবে প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটা নিহিত যোগসূত্র আছে। বিষয়বস্তুর সম্মর্মমতা এই যোগসূত্রের সঙ্গী করেছে। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আছে—রবীন্দ্রনাথের মানবগাথনা, রবীন্দ্র-নাথের আধ্যাত্মিকতার বহন, রবীন্দ্র-কাব্যে শৌণ্ডিকভূতি ও হৃৎবাহুভূতি, রবীন্দ্র-কাব্যে বর্ণার ভাবগাথনা, রবীন্দ্র-কাব্যে নারী ও প্রেম, অভিসার, মিলন ও বিরহ, রবীন্দ্র-কাব্যে 'লীলা-সঙ্গিনী' ও 'উৎকর্ষিতা', রবীন্দ্র-কাব্যে বৈকল্য প্রভাব, বিহায়ালাল ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-কাব্যে বৃত্তান্ত স্বরূপ, ইত্যাদি। রবীন্দ্র-কাব্যের প্রতি অস্তরের মনখানি দরব চলে লেখিকা এই সকল বিষয়ের আলোচনা করেছেন,

ফলে আলোচনার মধ্যে একটি গভীর আন্তরিকতার স্বর লেগেছে। যা পেশাদারী বীজ্ঞ-আলোচনার হ্রস্ব। ৯মত আলোচনার ধারা-ধরনের মধ্যে ভাবাবেগের সিকিৎসা আভিযাত্রা আছে। তবে সে আভিযাত্রাকে যেমন নিয়ন্ত্রণ বসেটিকে বীজ্ঞ-কাণের মনোদখ্যটনকারী একটি নিপুণ আলোচনা-গত রূপে স্বীকার করতে বাধ্য ন। 'বিহারীলাল ও বীজ্ঞানা' গ্রন্থকে লেখিকা বিহারীলালের সঙ্গে বীজ্ঞানাধের কবিত্বভাবের সাধুতা ও সাংস্কারের প্রসঙ্গ বিচিত্র প্রমাণ-প্রমাণের সাহায্যে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লেখকের, বিহারীলালের প্রভাবের ধারা বীজ্ঞানাধের সোচ্চার কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠিত চলেছে, পরে বিচিত্রবর্গী অমূল্যলনের ধারা বীজ্ঞানাধের সেই প্রভাবকে কেন্দ্র অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। বিহারীলালের কাব্যের একটি মাত্র স্বর—ইতিমিত্তা: পক্ষান্তরে, নিত কবি বীজ্ঞানাধ তাঁর অমিত প্রতিভার বলে বহু বিচিত্র অমূল্যলনের ধারা কাব্যে স্পর্শ করেছিলেন, ফলে তাঁর কবিতা ভাবে ও ভাষায় বহুভাবে নতুন হয়ে উঠেছিল। বীজ্ঞানাধের বৈষ্ণব প্রভাবের আলোচনার লেখিকা বৈষ্ণব কবিতার ভাবধারার সঙ্গে বীজ্ঞ-কবিত্বলনের অনেক দিক

থেকে একা দৃষ্টি পেয়েছেন, তবে শুধু শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যে কিছু কম নয়। লেখিকার পক্ষা—বৈষ্ণব সাধকের তত্ত্বি মহামিলনে, কবির তত্ত্বি মিলনের অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষার। বিজ্ঞান-বেদনার মধ্য দিয়ে বীজ্ঞানাধের মিলনের স্নাতকি বার বার পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ মিলন বৈষ্ণবের মহামিলন নয় বা প্রমাণস্বাক্ষরিত নয়। এ কবিরই নিজস্ব ভাব-স্বাধীনতা।

এইরকম প্রত্যেকটি আলোচনার মধ্যেই ভাবাবেগ ও অগ্রভব বরবার মত অনেক সামান্য কথা আছে। ভাট-ভাটীলদের স্রবিকার জন্ত বীজ্ঞানাধ থেকে প্রচুর উক্তি সংকলন করা হয়েছে। বৈষ্ণব কাব্য থেকেও বহুখোলা উক্তি আছে। পরমানে সমালোচকের খোঁজনাও, বীজ্ঞ-কাব্যের উক্তিও পরিমাণ কবির সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ কাব্যের প্রতিফলনার ধারা ভরিয়ে তুললে আলোচনার দৃষ্টান্ত-প্রমাণের দিকটি আরও জোরালো হত।

মাত্র তোক, 'বীজ্ঞ-কাব্যালোক' গ্রন্থখানি পাঠে বরং আমরা বাস্তবিকই দুই আনন্দিত হয়েছি। একদলনি স্থাপিত বীজ্ঞ-সাহিত্য-প্রবেশক এই বিশালা বইটির ব্যাপক সমালার কথা।

—নাগেন জৌহরী

—যে করে রাখিবার মত বই—

অবশ্য বিরচিত

উদ্ধার গুরুর ঘাট

লেখকের সেই সময়ের প্রতিকৃতি সহ পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

উদ্ধারণের খাট সাক্ষ্যকরনের এক অদূর যোগ্য। বিচিত্র অভিজ্ঞতার সহিত আধ্যাতিক জীবনভরে অনুভূত সত্যের। নিতাই বৈষ্ণবী আশ্রম নিয়মানুগ পদ্ধতিই প্রকাশের মাত্র, প্রকৃত শ্রুতি সাধনার অঙ্গানো যিনি আশ্রম সাক্ষ্যকে ইষ্ট মনোনে লিখেছেন। আশ্রমবাসীণ জ্ঞান সাক্ষ্যই আর এক রূপ। যে বীজ্ঞারী সাক্ষ্য সাধনার প্রথম স্তরেই বুদ্ধ হোলেবস্তুও অসন্তোষিতা ন্যাক হোলেবস্তু—আশ্রমবাসীণ জ্ঞানই রূপক মূর্তি। এই আধ্যাতিক বিবরণে আশ্রম করিতে চাহে নাই—সাক্ষ্যকে সত্যক করিতে চাহিয়াছে মাত্র। এ সত্যের সাক্ষ্য সাধাইই পদ্ধতি নূতন হইল—যিনি জ্ঞান নন, তিনিও বিচিত্র কাহিনীর রোমাঞ্চকি করিয়া রোমাঞ্চকি করেন। এই রচনার মত বিলম্বিতো 'ন কৃতো ন ভবিষতি'।

মরুতীর্থ হিংলাজ ৫

বশীকরণ ৪॥০

বহুত্রীহি ৪॥০

দিক্‌মাহিত্যের

অজ্ঞাত সৈনিকের লেখা

আজ্ঞাজ্ঞান যুগোপাধায়ে

বাকী রাখে

মৃত্যু উপলক্ষ

মর্যাদাপী উপলক্ষ

নবন্যায়িকা ৩৥০

নৃতন গ্রন্থ

দিল্লীর ডাকে ৩৥০

চেনা অচেনা ২৥০

নবোদ্ভাব মিরের

বর্ষা বিজয় ৩

বিভূতিভূষণ যুগোপাধায়ে

গল্প-পঞ্চাশৎ ৮

মিত্র ও ঘোষ : ১০, কামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২



চিত্রলোক

পত্রনাভ

কল্পাতিথি

প্রযোজনা : অরুণ বি. ফিল্মস। কাহিনী : প্রশান্ত ও জয়ন্ত সৌমুদ্রী। পরিচালনা : দিলীপ মুখোপাধ্যায়। হর-কষ্ট : কালিদাস সেন। রূপায়ণ : ঐমান বিহু, ঐমান বাবু, বিপিন ভট্ট, পাচাড়ী শান্তাল, অরুণ বাবু, অম্বপত্নী, মলিনা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, তেজুকা দাস, বাবী বাবু, নিত্যানন্দী, রাজলক্ষী, অরুণ দাস, কুশলিতা চট্টোপাধ্যায়, কুলদী চক্রবর্তী, স্যাম দালা এবং আরো অনেক।

অনাথ-অগ্রজের জীবন কাটাতে পলুই আর ভাবলো। ঐতিহ্যের যে পরিমাণে তীর্থ, তার থেকেও বেশী তীর্থ প্রত্যাশা। অগ্রজের হৃদয়বিহীনতার প্রত্যাহারের প্রতিবাদে, তারা একদিন মারা কাটালো তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থলে। বিবেক-ভ্রমণের কল্পনা তাদের সামনে নিয়ে এসে দেয়িয়ে পড়লো। চলার পথে নানান ঘটনার মধ্যে দিয়ে তারা এগে পৌঁছলো একটি ছোটো স্টেশনের মাস্টারমশার হরিপদবাবুর কাছে। হরিপদবাবু নিঃসন্তান। তাঁর স্ত্রী পুত্রের মতো বেছে বেছে হলে নিলেন পলুই আর ভাবলোকে। কিন্তু তাঁর ঘেঁষের আশ্রয় ওদের পইলো না। দাবার পথে নামলো ওরা। এক ব্যতীর ঘরের মধ্যে ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়ে স্বপ্নকাতা এলো দুজনে। ক্রিকেট-পাগল বৃন্দ শোমনাথ ওদের বাড়িতে নিয়ে গেল বাহুধ করবে বলে। শোমনাথের ভারী পত্নী অনীতার কন্ঠস্বরে ওদেরও নিমন্ত্রণ হলো। পলুইর বৃন্দে জড়নের চিন্তা দেখে অনীতার মা জানতে পারলেন যে-ই তাঁর ছোটোবেলার হারিয়ে যাওয়া ছেলে। পলুই মা পেলো। আর ভাবলো? সে তার মাসীমা হরিপদবাবুর স্ত্রীর উদ্দেশে হঠকা দিলো। তাকে খুঁজতে পলুইও এগে হামির হোলো তাদের মাসীমার

কাছে। হরিপদবাবুর বাড়িতে বিলন-মধুর দুপুরের অবতারণা হোলো। সংক্ষেপে এট হোলো চিত্র-কাহিনী।

ছোটো ছোটো দুটি ছেলের পৃথিবী-ভ্রমণের পরিচালনার মধ্যে দিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি ও অশ্রু তার চমৎকার জাল বোনা এট ছবিটি বর্তমানে সপরিবারে দেখবার মতো একমাত্র বাংলা ছবি। ঐমান বিহু ও ঐমান বাবুর নিঃসত্তাচ অভিনয় ছবিখানিকে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরিয়ে তুলেছে। কয়েকটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে রমণী হস্তরসের সৃষ্টি করা হয়েছে। ঘেঁষের পরণ গেলে ছোটোরা যে কি ভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে তার অনন্ত উদাহরণ ছবিখানিকে অশ্রুপূর্ণ করে তুলেছে। ছোটোছোটো ঘটনার মধ্যে দিয়ে দর্শকমনকে তর করে পরিচালক যথেষ্ট মূল্যমানার পরিচয় দিয়েছেন। সারা ছবি ছুড়ে পরিচয় কচির পরিচয় পাওয়া যায়। ঐমান বিহু ও ঐমান বাবু দ্বন্দ্ব দর্শকগণকে টেনে রেখেছে তাদের সচল সরল অভিনয়ে। পুত্রহীনা স্ত্রীর মনের আকৃতি প্রকাশ করেছেন মলিনা তাঁর আবেগপূর্ণ অভিনয়ে। শোমনাথের ভূমিকায় অম্বপত্নীমারও মারমূল অভিনয় করেছেন।

ছবিখানির মধ্যে উদ্ভবের কল্যাণকালের বিশেষকম ছাপ না থাকলেও, স্বাভাবিকতার প্রকাশগুণে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। সনীতাংগ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যবন্দীর মধ্যে অনাড়ম্বর রূপটি ফুটে উঠেছে। ছবির পেশিকতা শোভা-তালি দিয়ে বিল করা হলেও, সব মিলিয়ে একটা পরিভ্রমণ যেন নিয়ে বর্ণক ছবিঘর থেকে ফিরে আসতে পারবেন। সপরিবারে দেখার মতো এই ধরনের আরো ছবি বাংলাদেশে হওয়া উচিত। তা না হলে, একঘেঁষে প্রেমের কচকচি ও বাবুচাচুর লম্বা করে বাংলা-ছবি ঠাঁড়াতে পারবে না।

তমসা

একোজন : বহুমিত্রের গন্ধে গৌর্যজ্ঞানার বহু ও শিশির মিহ। কাহিনী : পীত্ব বেনী। পরিচালনা : বনী আর্গ। অংশটি : সম্ভাষণাধ্যায়, মলিনা দেবী। পাতাভী সত্যায়, শীতাক ভট্টাচার্য, শিশির মিত্র, শীতক মুখোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, ভরদ্বাজ মুখোপাধ্যায় অজগুণকণ, তুলসী চক্রবর্তী, অমর রায়, চন্দ্রাবতী, ভারতী, পদ্মা দেবী, রাজেশ্বরী, শরদ্বালা এবং আরো অনেকে।

রীতিমতো কালো বেয়ে মলিনার বিয়ের আশা তার মা-বাবা ছেড়েই দিয়েছিলেন। সৈবের কপার বিরাট কমিটারের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর সে জানলো তার স্বামী অন্ধ এবং সেই দৃষ্টিহীনতার সুযোগ নিয়ে বৈবাহিক জীবন এই বিয়ে ঘটিয়েছে নাথাকে অন্ধ করবে বলে। বৈবাহিক জীবনের আর সংশোধনী মলিনার জীবনকে বিবাহ করে তুললো তাদের শহরতলী বৃদ্ধি দেখিয়ে। স্বামীর পরিচিত এক ডাক্তার বন্ধু কলকাতায় গিয়ে চোখের চিকিৎসা করিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনবার আশা দিলেন। স্বামীকে নিয়ে কলকাতায় এলো মলিনা এবং চিকিৎসার গুণে দৃষ্টিশক্তি ফিরে গেলো তার স্বামী। কিন্তু মলিনাকে দেখে তার স্বামী ভীষণ বিব্রত হোলো। অপমানিতা মলিনা সেখান থেকে বেরিয়ে গঙ্গার আশ্রয়তা করতে গেল। কিন্তু বলে ডেসে অপর ভীমে এসে উঠলো সে। এক পুরোহিত তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। তাঁর চেষ্টায়

দৃষ্টিহীনদের শিক্ষণভার কাজ গেলো মলিনা। এদিকে তাকে হারিয়ে অশোচনীয় মন ভরে গিয়েছিল স্বামীর। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মলিনার সন্ধান না পেয়ে সে আশা হারিয়েছিল। পরিশেষে অন্ধ-বিজ্ঞানকে মিলন হোলো স্বামী-স্ত্রীর। এই কালো সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

এখন অচল ছবি বহুদিন দেখিনি। এক এক কাহিন্যের এখন বেতালো দেগেছে যে, ছবির থেকে উঠে চলে আসার কথাই মনে হয়েছে। মলিনার বিয়ের টিক হোলো বিশটীক প্রৌঢ় হরিহরের সঙ্গে, কিন্তু হঠাৎ কি করে সে তার কমিটার-পুত্রের সঙ্গে বিয়ে হোলো তা দৃষ্টি অগোচরেই থেকে গেল। কালো বেয়ে বোকানোর অন্ধ সত্যতার মুখে বর্ণলিপন করা হয়েছে, কিন্তু গলা ও হাতের দিকে দৃষ্টি না দেওয়ার কলে রঙের অসামঞ্জস্য দৃষ্টিকটু হয়েছে। অভিনয়ের দিকেও কোনোদিকম বিশিষ্টতা মনে লাগে না। সত্যতার অভিনয় চলনশই। আড়ট কার্টের-পুতুল নাটক প্রাণেশ্বরীর চেহারা-সর্বভার পরিচয় দিয়েছেন। শীতক মুখোপাধ্যায় ভিলেন-চরিত্রে রূপ দিতে গিয়ে বাড় বেঁকিয়ে গাড়িয়ে, হুঁ বেঁকিয়ে কথা বলেছেন সর্বজন। কলে, চমু-গাড়াদায়ক হয়ে উঠেছে তাঁর অভিনয়। আশ্চর্য্যতঃ পুরোহিতের ভূমিকায় ভরদ্বাজের অমর্ত্য করে গান গাওয়া রীতিমতো দৃষ্টিকটু হয়েছে। কুটুম্বের শীতাক ভট্টাচার্য স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন।

কয়েকখানি হস্তি গান ছাড়া ছবিখানির মধ্যে প্রশংসা করার মতো কিছুই নেই।

। আ গা নী আ ক র্ণ ব ।

পরশপাথর

বাংলা সাহিত্যের প্রবিশ্যাত বাস্তব-শিল্পী পরশপাথর বিরচিত 'পরশপাথর' অবলম্বন করে আন্তর্জাতিক-ব্যাপ্তি-সম্পন্ন পরিচালক সত্যজিৎ রায় যে ছবিখানি তুলেছেন তা খুব শ্রদ্ধেই মুক্তি পাবে শহরের স্রিগুণে। ছবিটির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন প্রবীণ শিল্পী তুলসী চক্রবর্তী। তাঁর অনবদ্য অভিনয় এই স্নেহাঙ্ক ছবিটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। বিভিন্ন পার্শ্বচরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন—স্বাধীনতা, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাশঙ্ক বহু, হরিদ্রন

মুখোপাধ্যায়, অমর রায়, বীরেশ্বর সেন প্রভৃতি শিল্পী। ছবিটিতে স্রবের মায়াকাল বিদ্বিরেছেন রবিশঙ্কর।

বিদ্রাষ্ট

বর্তমানে বাংলা-চলিত বিভিন্ন ধরনের কাহিনী ও আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললেও, অপেক্ষাকৃত ভরদ্বাজ কাহিনীকারদের পূর্ব বেনী প্রয়োগ বেগুনা হয় না। অথচ নাম না থাকলেও, ভরদ্বাজ সাহিত্যিকদের অনেকের মধ্যেই প্রতিভার স্রবণ দেখা যায়। নবগঠিত নবোদয় ফিল্ম

ভ্রাতৃদের প্রথম ছবি 'বিজ্ঞান' তুলছেন পশ্চিমাদী তরুণ কথাসাহিত্যী অজিত দেবের কাহিনী অবলম্বনে। রোমাঞ্চ, রোমাঞ্চ এবং দলীয়তার স্বরসূচীভার ছবিখানি প্রশংসার্জনী হতে পারে আশা করা যায়। বিভিন্ন চরিত্র রূপায়িত করবেন—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, অসিতবরণ, অশ্বিনকুমার, পাহাড়ী সাক্ষাৎ, কাহ্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল ঘিট ও পদ্মা দেবী প্রভৃতি নামকরা শিল্পী। ছবিটির পরিচালনা ও সহকর্ষীর দায়িত্ব নিয়েছেন বঙ্গভ্রমণে চিত্র মুখোপাধ্যায় ও প্রকৃতিনাথ। আগামী বছরের প্রথমদিকেই ছবিখানি মুক্তি পাবে বলে প্রকাশ।

অর্ধ-মর্ত্য

প্রথম মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বন করে বিকাশ প্রায় প্রোডাকশন 'অর্ধ-মর্ত্য' নামে একখানি ছাত্রসমাজের ছবি তুলছেন। এর প্রধান পুষ্টি ছবিবার দেখা যাবে তাহ্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবন বহুকে। অজ্ঞাত চরিত্রে কমল বেবন—মধু দে, সুপতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, দাম সান্না এবং নবাগতা শীলা পাল। সহকর্ষীর দায়িত্ব নিয়েছেন কপিলদেব দেব। পরিচালনা করবেন বিকাশ দাস।

যমালয়ে জীবন্ত মানুষ

বাংলা-চলিত নতুন কিছু করার বে বেওয়াজ সম্মতি এসেছে তার অন্ততম উদাহরণ হাজরুমারী চিত্র-দলটির নির্মায়ণ ছবি 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'। ছবিটি নামের দিক নিয়েও নতুন আনবে। ইস্ট ইন্ডিয়া স্টুডিওতে প্রথম চক্রবর্তী পরিচালনার ছবিখানি দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন চরিত্র রূপায়িত করেছেন—ছবি

বিকাশ, কমল নির, পাহাড়ী সাক্ষাৎ, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, তাহ্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরী দেবী এবং নবাগতা বাসবী মল্লী ও শীলা পাল।

দীপা-কল্প

প্রবীণ পরিচালক সত্যীন্দ্র দাসগুপ্ত সামগ্রিক বার্ষিকির পক্ষে 'দীপা-কল্প' নামে একখানি পৌরাণিক ছবি তুলছেন ক্যালকাটা স্টুডিওর স্টুডিওতে। সত্যীন্দ্র পরিচালনা করছেন সৈলেন দাসগুপ্ত ও সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। প্রধান হুটি ছবিবার দেখা যাবে নবাগতা তামসী রায় এবং নবকুমারকে। অজ্ঞাত চরিত্রে রূপ দেবেন—সুনন্দা দেবী, চন্দ্রাবতী, রেণুকা দাস, নিতানন্দী, তপতী ঘোষ, পাহাড়ী সাক্ষাৎ, দীপা সত্যীন্দ্র, তাহ্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনকুমার, শ্রীমান বিদ্যুৎ প্রভৃতি শিল্পী। ছবিখানির কাজ আর শেষ হয়ে এসেছে বলে জানা গিয়েছে।

মর্যবান্দী

এস. আর. প্রোডাকশন সম্মতি ক্যালকাটা স্টুডিওর স্টুডিওতে তাঁদের প্রথম চিত্রার্থ 'মর্যবান্দী'র শুভ-মহরত অহুষ্ঠান সমাপ্ত করেছেন। মনোজ ভট্টাচার্যের কাহিনী অবলম্বন করে এই ছবিখানির পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অশ্বিনী মল্লিকদ্বারের উপর। সন্ধান রচনা করেছেন প্রশান্ত চৌধুরী। সহকর্ষীর দায়িত্ব নিয়েছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। বিভিন্ন চরিত্রের রূপায়ণে দেখা যাবে—কাহ্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিকাশ, মধু দে, চন্দ্রাবতী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অশ্বিনকুমার, অশ্বিনকুমার, ঘিটির ভট্টাচার্য প্রভৃতি শিল্পীদের। নতুন প্রতিষ্ঠানের নতুন ছবির সর্বাঙ্গীণ সাক্ষ্য কামনা করি।

। খুচরো খবর ।

আগামী বছরের ৩-শে নভেম্বর হুবিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কথ-শব্দসাহিত্যী পালন করা হবে দাদা দেশে। এই অহুষ্ঠানকে শ্রদ্ধা করে রাধাবতী জ্যেষ্ঠ ভারত-সরকারের চলচ্চিত্র দপ্তর আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনী-অবলম্বনে একখানি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করার অভিপ্রায় ঘোষণা করেছেন। এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় অবলম্বনে একটি কাহিনী রচনা করেছেন জগদীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'বহু বিজ্ঞান-বন্দিন'।

ভারত-সরকারের চলচ্চিত্র দপ্তর প্রস্তাবিত জীবনী-চিত্র এই কাহিনীকে ভিত্তি করেই তোলা হবে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান পরিচালক বিবল দাস ভারতের চিত্রায়িত বহুকাল্য দাদাশন ও মহাভারত অবলম্বন করে তাঁর পরবর্তী ছবি তুলবেন বলে ঘির করেছেন। ছবিখানি তোলা হবে ইস্টম্যান-কল্যার পল্লিতে, এবং বিভিন্ন চরিত্র-রূপায়ণে বত্ধ্ব সর্বদা নতুন ছব দেখা যাবে। কাব্যের

মাধ্যমে কথকতার ভরিতে চিত্রকাহিনীর বর্ণনা এষ্ট ছবির বৈশিষ্ট্য বাড়াবে বলে প্রকাশ। বিষম রায়ের প্রবোজনা ও পরিচালনার আগুণেই বছরের মাস্তামারি সনহ পেরে ছবিখানির কাজ প্রকৃৎ হবে।

দিংহলের ছবিগরগুণিতে সারা বছর বেশ-কিছু-সংখ্যক বিশেষী ছবি দেখানো হয়। এর মধ্যে ভারতীয় ছবির সংখ্যাই বেশী। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে, ১৯৭৭ সালের প্রথম ছ'মাসে সিংহল বোর্ড ৪৩,৪২,৭৩-ফুট বিশেষী ছবি আমদানি করেছে। তার মধ্যে ভারতীয় ছবি ৩০,৭৭,০৩৭ ফুট, মার্কিন ছবি ১১,০৪,১৮৬ ফুট এবং ব্রিটিশ ছবি ৪,৩২,১৮৪ ফুট।

ফাইলোফিলিস্ রোগ সংক্রান্ত একটি প্রামাণ্য ছবি তোলায় করে রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্গত 'বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থা' একদল কলাকূশলীকে ভারতে পাঠিয়েছেন। কোচিন এবং ত্রিবান্দ্রনে এই রোগ সংক্রান্ত গবেষণা-কেন্দ্রে প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবিখানির কিয়দংশ তোলা হবে। বাকী অংশ তোলা হবে হাঙ্গি এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার গৌকট দেশে। ছবিটি পরিচালনা করবেন খ্যাতিমান প্রামাণ্য-চিত্র-পরিচালক মাইকেল ব্রাফ।

বোম্বাই-এর ছবিঘরে সাধারণ প্রদর্শনীতে বাংলা-ছবি 'কানুদীওয়াল' অসামান্য সমাদর পেয়েছে দর্শক ও সমালোচকের কাছে থেকে। তার কলে দেখানকার ছবিঘরের দক্ষিণা বাছা বাছা বাংলা-ছবির সাধারণ

প্রদর্শনী করার ব্যাপারে আগ্রহাবিত হয়েছেন বলে প্রকাশ।

বিশ্ববৃত্তের জানা গিয়েছে, আমেরিকার 'অস্কার প্রতিযোগিতা'র ক্ষেত্রে নির্বাচিত ভারতীয় ছবির মধ্যে বাংলাদেশে তোলা 'পকতপা' ও 'কানুদীওয়াল' স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের চিত্র-রসিকদের কাছে সবটকি যে দুইই আনকের, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চিৎসেধর মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় 'কিন্দ্র ক্ষেত্রবেশন অণু ইতিহাস' কার্যকরী সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন বসবে। এই অধিবেশনে দক্ষিণ আমেরিকা, ইরান, থানা এবং অন্যান্য দেশে ভারতীয় ছবির প্রদর্শনীর বিষয়ে আলোচনা-আলোচনা হবে। এ ছাড়া ভারত-শাক চলচ্চিত্র ব্যবসায় অচলাবস্থা এবং চলচ্চিত্রকে মামোদ-কর-নুৎ করা সম্পর্কেও আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে।

একটি খবরে প্রকাশ যে, 'ভারতীয় সঙ্গীত-নাটক অ্যাকাডেমি' বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় নৃত্যের উপর কয়েকটি ছবি তুলবেন বলে স্থির করেছেন। এষ্ট প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার আহ্বান দিয়েছেন সোভিয়েৎ সরকার। কাচা ভিন্ন শব্দবহা এবং রূপ বেশ থেকে ইন্ডিন-ইন্ডি-পরিবৃষ্টন ও মুদ্রণ করা ছাড়াও ক্যামেরা, কলাকূশলী ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাঁরা সাহায্য করবেন। কয়েকদিনের মধ্যেই বোম্বাইতে সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের চলচ্চিত্র-সংস্থার প্রতিনিধিত্ব ও 'সঙ্গীত-নাটক অ্যাকাডেমি'র কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনা-আলোচনার পর চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।





যুগিষ্টিৰ

ফুটবল :

এংগেৰে 'দিল্লী ক্লব মিল ফুটবল প্রতিযোগিতা'ৰ বিজয়ী হবার সম্মান লাভ করেছেন কলিকাতার খ্যাতনামা ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব; বিজিত হবার সম্মান লাভ করেছেন কলিকাতাৰেই আৰু একটা ক্লাব—বেলগুৰে স্পোর্টস ক্লাব। ইষ্টবেঙ্গল দলের এটী এই বৎসরের প্রথম দাফল্যা। অতিনকন জানাই এংগেৰে থাকিলে।

কলিকাতার ফুটবলের ইতিহাসে বেলগুৰে স্পোর্টস। ক্লবৰ ই. জাট. আৰ.। মাথটা নতুন। কিন্তু এই দলের খেলা বেশ মনে হয়, অধুৰ ভবিষ্যতে এংগেৰে পক্ষে কোনও প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওখাও অসম্ভব নহা। তরুণ বাঙালী খেলোয়াড় নিয়ে গড়া এই দলটির সদস্য যেনোবল সত্যই প্রশংসনীয়। বিশেষ করে, এই দলের কয়েকটি খেলোয়াড়ের, যেনন—গ্রীষ্ম বক্যোপাধ্যায়, নিখিল নন্দী, ডি. সোম প্রভৃতির মধ্যে যে সত্যিকারের প্রতিভা এবং উচ্চাঙ্গ ভবিষ্যৎ আছে, এ কথা অনস্বীকার্য।

বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এংগেৰে নিয়ে মোট তিনবার (১৯৫৭, ১৯৫২ ও ১৯৫৭) 'ডি.সি.এম.' বিজয়ীৰ সম্মান লাভ করলেন। আগে সর্বাধিকারী সব প্রতিযোগিতাগুলিতেই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এংগেৰেৰে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

কলিকাতার অপর একটি খ্যাতনামা দল দাক্ষিণ্যন ক্লাবও প্রথম এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে অতিলম্বী হলেও, পরে যে কোনো কারণেই হোক খেলতে দেখা যায়নি।

প্রথম খেলার দিল্লী ইংগেৰে বেন্স দলের কাছে ওচাক-গুজার শেষে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব কোয়ার্টার-ফাইনালে পৌঁছান। পরে কোয়ার্টার-ফাইনালে বাছানোয়ের আটলাইনী সেক্টর দলকে ৫-০ গোলে ও সেমি-ফাইনালে ইণ্ডিয়ান নেভি-কে

১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন। অপরদিকে রেল-ওয়ে স্পোর্টস প্রথম খেলার দিল্লীর প্রেসিডেন্টস এস্টেট-কে ৫-১ গোলে, কোয়ার্টার-ফাইনালে গাত হু-বছরের চ্যাম্পিয়ন ইণ্ডিয়ান এয়ার-কোর্পকে ১-০ গোলে ও সেমি-ফাইনালে জলকরের খালসা স্পোর্টসকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন। ফাইনালে খেলার প্রথম দিনে মীমাংসা না হওয়ায়, আবার দল দুটিকে দ্বিতীয় দিন খেলতে হয়। এই খেলার দ্ব্যাক্রমে মুশা ও এস. যোগে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে দুটি গোল করে খেলটির মীমাংসা করে গেলেন।

মীচে 'দিল্লী ক্লব মিল প্রতিযোগিতা'র বিজয়ী ও বিজিতদের নাম দেওয়া হল :

দল	বিজয়ী	বিজিত
১৯৫৭	নিউ দিল্লী মীমাংসা	কে. ও. ওয়াই. এস. আই.
১৯৫০	জাইলিয়া স্পোর্টস (দিল্লী)	নিউ ক্লাব (লেক্স)
১৯৫০	ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব (কলিকাতা)	৫০ জর্বা ক্লাব
১৯৫১	বাক্সন ক্লাব (কলিকাতা)	৫০ জর্বা ক্লাব
১৯৫২	ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব	৫০ জর্বা ক্লাব
১৯৫০	এলিগাব জিৰখানা	ই. আই. আর. অ্যাকাউন্টস
১৯৫৪	জিওগ্রাফিক্যাল সার্ভে (কলিকাতা)	হায়ড্রাবাদ এফ. এ.
১৯৫৫	ইণ্ডিয়ান এয়ার-কোর্প	ডি. এস. এ. (এলাহাবাদ)
১৯৫৬	ইণ্ডিয়ান এয়ার-কোর্প	ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব
১৯৫৭	ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব	কেলগেৰে স্পোর্টস (কলিকাতা)

ক্রিকেট :

কলিকাতা ক্রিকেট লীগ বেশ দ্রুত তাগলেই এগিয়ে চলছে। কিন্তু খেলার মধ্যে সভ্যতার প্রতিশ্রুতিভার বিশেষ অভাব দেখা যাচ্ছে। কালীঘাট, মোহনবাগান ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের তুর্ধ্ব দলের বিরুদ্ধে কোনো দলই বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না। কারণ এই কয়েকটি দলে

এত বেশী ভালো খেলোয়াড় হয়েছেন, বাঁশের বিরুদ্ধে উপযুক্ত খেলোয়াড় একদম নেই বলিলেই হয়। ওস্ত-জাতীয় ও ক্রীড়াবীরের বিশেষ সম্ভ্রান্ত খেলোয়াড়রা যেন বিশ্রাসের হায়ে পড়েন। এইসব কারণে ভালো খেলোয়াড়দের খেলাতেও বিশেষ অবনতি দেখা দিয়েছে। এইভাবে ভাড়া-করা খেলোয়াড় এনে যদি করেপটি দল বিশেষ শক্তিশালী হয়, তবে ক্রুটবলের মধ্যে ভাড়াটে খেলোয়াড় আনিতে দলকে শক্তিশালী করার প্রয়াস পাবে সম্ভব দল। ইহাতে স্থানীয় ক্রিকেট খেলার খানের অবনতি আবার ক্ষতগতিতেই হবে। এই কারণে সমস্ত ক্রীড়ার কর্তৃপক্ষ যেন স্থানীয় খেলোয়াড়দের উন্নতির জন্য সজাগ দৃষ্টি নেন। অথবা খবর, এ বৎসর ক্রিকেটকে দিয়ে মূল ও কলেজের ছাত্রদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে। এতে কিছু ফল ফলবে বলে মনে হয়। কিন্তু কিছুকাল আগে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন তা খুবই নৈরাস্তজনক। তাঁর মতে, একজনও ভালো খেলার বা উইকেট-কীপার তাঁর মতে পড়েনি, যদিও কয়েকজন ভালো ব্যাটসম্যান তাঁর চোখে পড়েছে। আশা করা যায়, ফলস্বরের শিক্ষার জগৎ বাংলার নবীন খেলোয়াড়েরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

‘রঞ্জিট ইক্স’র জন্য বাংলার দলে খেলোয়াড়েরা হলেন:—পঙ্কজ বার (অধিনায়ক), নিমাই ঘোষ, এ. সেন, ফারুক, কে. মিত্র, এম. সেন (স্পোর্টিং ইউনিয়ন); পি. চ্যাটার্জী, এ. ভট্টাচার্য, জি. চক্রবর্তী, এস. বসু (মোহন-বাগান); বাবু ভদ্রে, কে. কৃষ্ণজ্যোতি, বি. চক্, কে. বিশ্বাস (কলীঘাট); আর, সত্যেন্দ্র (পোর্ট কমিশনার)।

টেনিস :

দ্বিতীয় রান্ধা লন টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারতের ১১নম্বর খেলোয়াড় রমানাথ কুকান ইংলণ্ডের ৪নম্বর খেলোয়াড় বিলি নাইটকে পরাজিত করেছেন। ফাইনালে কুকানের খেলা খুবই উন্নত পর্যায়ে হয়। কুকান ও নাইটের মধ্যে খেলাটি ১০০ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু ডাবলস খেলায় প্রতিযোগিতার কোনোই আভাস পাওয়া যায়নি। খেলায় ইংলণ্ডের নাইট ও শিকার্ডের বিরুদ্ধে কুকান ও উমরুখার ভারতের দলকে খেলেছিলেন। নাইট ফলাফল দেখেই হোলো :

সিসলস ফাইনাল

আর কুকান (ভারত) — ৬৩, ১-২, ৬-১, ১-১ সেটে বিলি নাইট-কে (গ্রেট ব্রিটেন) পরাজিত করেন।

ডাবলস ফাইনাল

বিলি নাইট ও টনি পিয়ার্ড (গ্রেট ব্রিটেন) — ১-৪, ৬-৪, ১-২ সেটে আর. কুকান ও উমরুখারকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ব্যাডমিন্টন :

কিছুদিন আগে হাওড়াবাদের রাজস্বান স্টেডিয়ামে জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার অর্ন্তর্গত হয়ে গেল। জাতীয় ব্যাডমিন্টনে বাংলা বিশেষ কোনো সুবিধা না করতে পারলেও, আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিন্টন ফাইনালে অবশ্য বাংলা দল বিজিত এবার স্বত্বান লাভ করেছেন। আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায় বাংলা:—মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, গোয়াইকে হারিয়ে ফাইনালে গুঁটে। অবশ্য গোয়াই দল এ-দলের খুবই দুর্বল। কেননা ভারতের প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন, টমাস কাদের খেলোয়াড় নানু নাটেকার এবার গোয়াই দলের দলকে হারিয়েছেন। প্রত্যয় গোয়াইয়ের শাকল্যের পুরোভাগে থাকেন নানু নাটেকার, সত্যতঃ তাঁর অসুস্থবিস্থিতিতে গোয়াই দল যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে, এ আর আশ্চর্য কি? এবার সংপ্রকার শাকল্যের মুখেই দেখা গিয়েছে উত্তরপ্রদেশকে। বর্তমান জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ত্রিলোকনাথ শেরের অনবদ্য ক্রীড়া-নৈপুণ্যের দান তার মধ্যে প্রায় সবটাই। আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিন্টন ফাইনালে বাংলা দল উত্তরপ্রদেশের কাছে ৩-০ খাটে হেরে গিয়েছে। আর জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিলোকনাথ শেরে ফাইনালে দিল্লীর ব্যাডনাবা ও ২য়ী খেলোয়াড় অরুণ দেওয়ানকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ত্রিলোকনাথ এবার জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতার কোনো খেলাতেই একটিও গেম হারাননি। তবে এ ধরনের নৈপুণ্য যদি দেশসমূহ ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে ভারতীয় প্রতিযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তবে আমরা খোটেই সন্তুষ্ট হব না। টমাস কাদের ভারতীয় দলের নিদারুণ ব্যর্থতায় যদি কিছুমাত্র প্রেরণা তাঁরা অস্বত্ব করে থাকেন, তবে এ নৈপুণ্য তাঁরা বিশ্বজনের কাছে ছড়াবার চেষ্টা করেন এই আশাটি করি।

বাংলা দলের দলকে এবার প্রথম বসু (অধিনায়ক), বিরূম ডাউ, রঞ্জিৎ ব্যানার্জী, গজানন হেমাজি, পঙ্কজ গুহ, গোয়া ঘোষ, হুম্মার দেব, নীলিমা ডিক্সন যোগদান করেছিলেন। এর মধ্যে বিরূম ডাউই অসুস্থকায় ভালে। খেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারপরই বলা যেতে পারে

এরূপ বস্তুর নাম। এবার সবচেয়ে হতাশ করেছেন গোরা ঘোষ, হুকুমার লেব ও নীলিমা ডিক্সন। বাকীরা সব চলনশই।

জাতীয় ব্যাডমিন্টনে এবার গার্লস সিন্সলসের খেলা এখন শুরু হোলো। এখন বছরের বিক্রিণী হয়েছেন মিল্লার কুমারী বান্দ্রী। (গার্লস বিভাগের প্রতিযোগিতার কাশটি দিয়েছেন পাট্রিয়ালার মহারানী।) বহুক্ষে সিন্সলসে বিক্রি হইয়েছেন উত্তরগ্রন্থের সুরেশ গোবেল। মহিলা বিভাগে চালিশরন হয়েছেন বোম্বের মিসেস গ্রেম পরাশর— বোম্বের মিসেস হুশীলা কাশাদিয়ারকে পরাজিত করে। জাতীয় ব্যাডমিন্টনে বাংলার অধিনায়ক এখন বহু তৃতীয় টাইও দিল্লীর আর, এন, বহুধারার কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। বিরূপ ভাট কোয়ার্টার-কাইনালে ভারতের ২-নম্বর খেলোয়াড়, দিল্লীর অমৃত বেওয়ারের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। একমাত্র ডাবলসের খেলোয়াড়ই হোয়াইট ও ভাট সেনি-কাইনালে ওঁরবার যোগ্যতা অর্জন করেন, কিন্তু উঁরাও বেওয়ার ও চাওলা জুটির কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হন। জুনিয়ারদের খেলার গোরা ঘোষ ও হুকুমার লেবকেও বহুক্ষে এস. গোবেল ও এম. ম্যাপুলের কাছে হার স্বীকার করতে হয়।

ডিসেম্বর অবধা জাহ্নগারি মাসে দিল্লীর শিকারক্ষেত্র একমাত্র শিকারগ্রন্থের জন্য ১১ জন খেলোয়াড়কে নির্বাচিত করা হয়েছে। বাইল্যাণ্ডের কাছে পরাজয়ের জন্যই এত হোড়হোড় কিনা জানি না। আর তাই যদি হয় তবে কিংবা করি বেন আবার ভারতের গর্বের পুরোনো দিন ফিরে আসে। এর প্রয়োজন আরও অনেক আগেই ছিল, কারণ বিশ্বের ব্যাডমিন্টন তালিকা ভারতের এক বিশিষ্ট গৌরবের স্থান ছিল। হুস্তায় এখন থেকেই যদি ভারী খেলোয়াড়দের উপযুক্ত কোচিং-এ রাখা হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের পক্ষে ভারতের পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা আছে। (তালিকার মধ্যে বাংলার গোরা ঘোষ ও হুকুমার লেবও রয়েছেন।)

নীচে আন্তঃরাষ্ট্র ও জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফুটার ক্লাসস ও ক্রমপর্ষায়-তালিকা দেওয়া হোলো—

■ আন্তঃরাষ্ট্র কাইনাল ■

টি. এন. শের্ট (উত্তরগ্রন্থ)—১৫-৫, ১৫-৬ পরেটে প্রথম বহুক্ষে (বাংলা) পরাজিত করেন।

পি. এম. চাওলা (উত্তরগ্রন্থ)—১৫-৫, ১৫-৬ পরেটে বিরূপ ভাটকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

কুমারী বীনা শাহ (উত্তরগ্রন্থ)—১১-১, ১১-৪ পরেটে মিসেস নীলিমা ডিক্সনকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

■ জাতীয় কাইনাল ■

পুরুষ (সিন্সলস)

মিলোক শের্ট (উত্তরগ্রন্থ)—১৫-৭, ১৫-৬ পরেটে অমৃত বেওয়ারকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

মহিলা (সিন্সলস)

মিসেস গ্রেম পরাশর (বোম্বাই)—১১-৬, ১১-৭ পরেটে মিসেস হুশীলা কাশাদিয়ারকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

পুরুষ (ডাবলস)

আর ডি. ডিম্বাওলা (বোম্বাই) ও ডি. এন. ডোভাড় (বোম্বাই)—১১-১৫, ১৫-১৩, ১৫-১১ পরেটে পি. এম. চাওলা (উত্তরগ্রন্থ) ও অমৃত বেওয়ারকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

মহিলা (ডাবলস)

মিসেস গ্রেম পরাশর ও মিসেস কাশাদিয়ার (বোম্বাই)—কুমারী বীনা শাহ ও কুমারী ভৌসলকে পরাজিত করেন।

মিল্লড (ডাবলস)

মিসেস হুশীলা কাশাদিয়ার ও সি. ডি. বেওয়ার ১৫-৭ ও ১৫-১১ পরেটে মিসেস গ্রেম পরাশর ও ডি. এন. ডোভাড়কে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

জুনিয়ার (সিন্সলস)

সুরেশ গোবেল (উত্তরগ্রন্থ) ১৫-১১, ১৫-১৫, ১৫-১১ পরেটে ডি. কে. বাম্বাকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করেন।

গার্লস (সিন্সলস)

কুমারী বান্দ্রী (দিল্লী) ১১-১, ১১-৬ পরেটে কুমারী হুশীলা আগ্রেকে (মহাগ্রন্থ) পরাজিত করেন।

পুরুষ খেলোয়াড়দের ক্রমপর্ষায় তালিকা :

- ১। মিলোকনাথ শের্ট (উত্তরগ্রন্থ),
- ২। অমৃত বেওয়ার (দিল্লী),
- ৩। সি. ডি. বেওয়ার (বোম্বাই),
- ৪। প্রথম বহু (বাংলা),
- ৫। টি. ডি. এস. সিঙ্গে (মহাটাই),
- ৬। পি. এম. চাওলা (উত্তরগ্রন্থ),
- ৭। পি. কে. বহুধার (উত্তরগ্রন্থ)।

মহিলা খেলোয়াড়দের ক্রমপরিচয় তালিকা :

- ১। কুমারী শীনা শাহ (উত্তরপ্রদেশ),
- ২। কুমারী করিমা বেগ (অন্ধ)।

এঁরা ছাড়া গীরা হটলেন, তাঁদের মধ্যে নাকু নাটকার, মিসেস মমতাক সোটাওহালা, মিসেস পরাশর ও মিসেস কাশ্যাপিয়া। অস্বাভাবিক-সংখ্যক প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ না করায়, এঁদের যোগ্যতা বিচার করা সম্ভব হয়নি।

মুষ্টিযুদ্ধ :

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

এবার চতুর্থ 'স্ট্রানাল বকিং চ্যাম্পিয়ানশিপ' কলিকাতার আয়োজিত হইলো। ১০টি প্রতিযোগিতার মধ্যে সার্ভিসেস দল ৭টিতে ও রেল দল বাকী তিনটিতে জয়লাভ করেন। আর সব কাইনালেই রেল ও সার্ভিসেসের প্রতিযোগিতা করেন। অস্ত্রান্ত রাজ্যগুলির মুষ্টিযোদ্ধাগণ প্রতিযোগিতার আশাহরুপ কীড়া প্রদর্শন করতে পারেননি। একদমদেই বাংলা ও বোম্বাইএর মুষ্টিযোদ্ধারাই ভারতের শীর্ষস্থানে ছিলেন। এ থেকে বেশ বোকা বার বে, উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুশীলনের অভাবে এই হু'রাবোয় যান নিম্নাভিষ্টি। অপরগণকে অস্ত্র সব খেলার মতোই সার্ভিসেস ও রেলওয়ে দল সুবক্তার মধ্য থেকে নতুন নতুন প্রতিভা খুঁজে বার করেছেন। অচিরে ভারতের সর্ববিধের কীড়াক্ষেত্রে সার্ভিসেস ও রেলওয়ে দল ছাড়া আর কারও নাম দেখা নাও যেতে পারে, যদি-না এই বিবরে অস্ত্র সব রাজ্যগুলি সচেতন হন। নিরে বিভিন্ন বিভাগের চ্যাম্পিয়ানদের নাম কেওয়া হোলো :

ফ্রাই ওয়েট	— দেবদানব (সার্ভিসেস)
ব্যাক্সম ওয়েট	— এস. খাটাই (রেলওয়ে)
কোয়ার ওয়েট	— সারওয়ান সিং (সার্ভিসেস)
লাইট ওয়েট	— হুম্বর হাও (")
লাইট ওয়েটার ওয়েট	— স্যাম্বরাজ (")
লাইট মিডল ওয়েট	— বি. ডি'ব্রজা (রেলওয়ে)
মিডল ওয়েট	— হরি সিং (সার্ভিসেস)
ওয়াটার ওয়েট	— রঘুনাথন (")

লাইট হেভী ওয়েট — এস. বহু (রেলওয়ে)
হেভী ওয়েট — ম্যাক্সেয়াস (সার্ভিসেস)

মুগের অগ্রতিতে তাল মিলিয়ে ভারতও আজ আর খুব একটা পেছনে নেই। বরং সামনের দিকেই জয়লাভ এগিয়ে চলেছে। একদিন হয়তো দেখা যাবে—ভারত বা সস্তি করতে, অস্ত্র দেশ হয়তো হুজ-মাথানো বিশ্ব নিয়ে তার পানে তাকিয়ে আছে। হরি আর শোদার মতো, বক্ষিপূর্ণ এশিয়া মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় ১টি লড়াইয়ের মধ্যে অচিরে জিতে—ব্রজেন্দ্র, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, জাপান, সিংহল মোট ৫টি দেশের বিরুদ্ধে ভারত ৫টি বর্ষসক লাভ করেছে। ফাইনালে খায়া এই বর্ষসক জেতার বর্ষসক ছিলেন তাঁরা তিনজনে হলেন : লাইট ওয়েটে—হুম্বর হাও, মিডল ওয়েটে—হরি সিং, হেভী ওয়েটে—ম্যাক্সেয়াস। হুম্বর হাও—জাপানের মূগি মোরাকে পরেতে, চরি সিং—ব্রজেন্দ্র টি: ওকে নক-আউটে (প্রথম রাউন্ডে) এবং ম্যাক্সেয়াস—ব্রজেন্দ্র এস. এস. মূগকে পরেতে পরাজিত করেছেন। ফাইনালে অপর হুই মুষ্টিযোদ্ধা দেবদানব ও বি. ডি'ব্রজা বন্ধাক্ষে ফিলিপাইনের জোব বোনাস ও অস্ট্রেলিয়ার কেভিন হোগার্নের কাছে হেরে গেছেন। ভারতের স্রেই কুশলী মুষ্টিযোদ্ধা স্যামী খাটাই (রেলওয়ে) ফিলিপাইনের বোনাসের কাছে পরেতে পরাজিত হয়েছেন। অস্ত্রান্ত যোদ্ধাদের মধ্যে সারওয়ান সিং ভালো গড়েন।

সাঁতার

আগাবী বৎসরের (১৯৬৮) জুন মাসে ভারতীয় ব্যারিস্টার মিহির সেন পুনরায় ইংলিশ চ্যাম্পিয়ন অতিক্রমের আশা প্রকাশ করেছেন। এটা তাঁর তৃতীয় প্রচেষ্টা। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহের আর্থিক সাহায্যের আশা দিয়েছেন। গত প্রচেষ্টার তাঁর প্রায় ১৭ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল। এই ব্যয়ের মধ্যে ভারত সরকার মাত্র ৫ হাজার টাকা সাহায্য করেছিলেন। শ্রী সেন আশা করেন যে, ভারত সরকার এইবার হয়তো তাঁর এই সাঁতারের জন্য সম্পূর্ণ ব্যয়ের দায়িত্ব-গ্রহণে সক্ষম হবেন।



শেষ পাতা



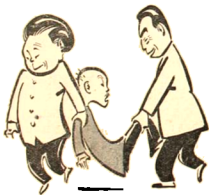
জনৈক সমালোচকের মতে বিশ্বমারিত্যে বর্নিত
ন-র কোনো সংগোহ নেই। তার জুড়ি কোথাও
নেলো না।

তিনি একাই এক ন!

নেতিবাদ বলে একটা কথা আছে। কিন্তু তাই
বলে নেতিবাদের বাদ দেবার কোনো কথা নেই।

ভাষ্যাবাসার দুটি ধারা : অগ্রিতে চূড়ান্ত
আর তৎক্ষণাৎ চালা।

চ্যা:কাইশেক যদি চীন পরিদর্শন করতে আসেন
তবে তাঁকে সম্মানে আহ্বান করা হবে বলে চীনের
প্রধানমন্ত্রী চুন-এ-লয় জানিয়েছেন।



যদি ঠাণ্ডে দোলায় করে আনা হয় সে হবে
সিঁরে চ্যাংদোলা!

“কলম্বাস নয়, চীনেরাই সর্বপ্রথম আমেরিকা
আবিষ্কার করেছিল—৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে।” (উদ্ধৃতি)
কিন্তু চিনেছে এতদিনে!

এদিকে মাঠের ধানটান সব শুকিয়ে গেল, এখন
শোনা যাচ্ছে বোম্বের বিধাত আবহাওয়াবিদ
ডাঃ সবুর (Dr. Savur) অল্প খরচায় কৃত্রিম বারি-
পাতের অল্প এক প্রণালী আবিষ্কার করেছেন।
সবুর আরও বলছেন, ক্রমেই মেওয়া কলবে!

পণ্ডিত নেহরু লাক্টোর দুব-উৎসবে যুবকদের
দেশের হাল ধরবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

—সংবাদ

দেশের হাল যদি বদলায় এবার!

আসন্ন দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধকল্পে ভারতীয় চায়ের
বদলে বিদেশীয় গম আমদানি করা হবে বলে একটি
সংবাদে প্রকাশ।

‘চা! চা! আপন বাঁচা’?

‘মেয়েরা নিশ্চিৎ হেসেই নিজেদের কাজ গুছায়।’
‘SELF HELP by SMILES’?

পাণ্ডাব বিধানসভার সর্বস্ত্রী জীবন সিং ফুক
সরকারের কাছে উচ্চহাস্তের ওপর কর ধার্য করার
প্রস্তাব করেছেন।

করকর টাকাগুলো তাহলে হেসে ফুকে দিন
এবার!

‘পৃথিবীর শান্তি বজায় রাখার সহক্ষেত্রে সব দেশের সঙ্গেই আমাদের সৌম্য-সংসর্গ।’

—পণ্ডিত নেহরু

সবাই Peace-ভূত ভাই ?

জাপানী ডায়েটের (Diet) সমস্তর তারপর পরম্পরকে যুগ্মেয় পাঁচ ফেলে কানু করতে লাগলো।

—খবর

ভালো Diet বলে যা হয়।

ভারতে ফেরার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন—‘এখন আমি কিছুই বলব না। শুধু এটাই বলতে পারি যে বিনেশ ভ্রমণ করে আমি খুব শিক্ষালাভ করেছি।’

মুখ খুললেই অনর্থ আর অনর্থক মুখ খোলা—
এই শিক্ষাটি তো ?

এক বোম্বাই-পত্রিকার বিবেচনায়, কোড়-পতিদের কাছে লাখটাকা কিছুই নয়, অতি সহজেই তাঁরা কিছু ক্ষতি মনে না করে এই টাকার মায়া ভাগ করতে পারেন।

বলতে পারেন কোড়পতীরাই ! কারণ, বাড়িতেই চ্যারিটির স্ক্রু তো ?

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু একবার বিলতেঘাটায় জর্জ বর্নড শ-র জন্তু দিল্লির থেকে এক ঝুড়ি গোলাপখাস আম সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।
দেওয়ানি আম, না, দেওয়ানি খাস ?

“এম্বা অম্বের অধ্যাপক মনীষবাবু বাড়ি যেত।
লক্ষ্মীমোয়ের মতো চুপটি করে অল্প কবিতা বসে বসে।
অবশেষে একদিন দেখা গেল অধ্যাপকের সঙ্গে
তার বিয়ে হয়ে গেছে।” (গল্পাংশ)

অঙ্কলক্ষী—বুঝি একেই বলে ?

কয়েকটি সমস্ত যুবক এক বাছ লুঠে গিয়ে
ভুল করে পাঁচ লাখ টাকার বসলে হিসেবের
খাতাপত্র-বোকাই একটি বাছ নিয়ে উধাও হয়েছে
বলে জানা গেল।

এবার থেকে তারা হিসেবনকতা কাজ করবে
আশা করা যায়।

“সে-যুগের ডিপুটি-মিগির। নথ নাড়ুজেন।”

(পুস্তক-প্রসঙ্গ)

এ-যুগের ডিপুটি-কর্তাদের এখনো নথি নাড়তে
হয়।

অস্ট্রেলিয়ার এক অনাবিকৃত এলাকার স্বৈতানরা
পকাশটি আদিবাসী পরিবারের দেখা পেয়েছে।
ভারতও জীবনে এই প্রথম সাদা রঙের মানুষ দেখল।
এবং এই শেষ। এর পর আর দেখতে
হবে না !

একটি ছেলে সংস্কৃত-উত্তরের খাতার প্রত্যেক
পাতায় গোক একে দিয়ে এসেছে—যাতে পণ্ডিত-
মশাই কিছুতেই কাটতে না পারেন।



গোকর জলকল্প ?

লাহোরের এক আদালতে একটি উটকে সাক্ষ্য দেবার চুক্তি তলব করা হয়েছে, সে নাকি হুকোয় তামাক খেয়ে তার সাক্ষ্য দেবে।



আশ্চর্য, হুকো কিন্তু সবাই উটমুখো হয়েই যায় !

একজনের জিজ্ঞাসা : 'মেয়েরা বিয়ের আগে কামে কেন ? কই মশাই, ছেলেদের তো কখনো কাদতে দেখি না।'

তাদের কাদতে হয়—বিয়ের পরে।

মেয়েরা মস্তিষ্কের চেয়ে মুখশ্রীর-ই বেশী চোকা করে থাকে, কারণ ছেলেরা মুখ দেখেই ভোলে, মেয়েটার মাথা আছে কিনা তা আর দেখতে যায় না।

'বিলেত আর আমেরিকার বিস্তার গাইয়ে-বাড়িয়ে কেবল বেতার থেকেই প্রচুর অর্থোপার্জন করে থাকেন, কিন্তু এখানে যে-কেউ বেতারের দৌলতে গাড়ি-বাড়ি করে ষড়লোক হয়েছেন এমন কোনো দৃষ্টান্ত আপনি দেখেছেন ?'

—একজনের অভিযোগ

Building castle on A.I.R. ?

সম্পাদক—শ্রীচাক্রা ভট্টাচার্য

কে. পি. বহু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১, মহেন্দ্র গোস্বামী সেন, কলিকাতা ৬ হাইওয়ে শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় বর্ডক মুদ্রিত
এবং তৎকর্তৃক ৪২, কনওয়ার্লিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হাইওয়ে প্রকাশিত



নোহাগ

[ফটো : রামকিষ্কর সিংহ]



মহাশূন্য

[কটো : গৌর দত্ত]

বন্ধুধারা

প্রথম বর্ষ

মাঘ, ১৩৬৪

২য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা

স্বাধীনতার স্বরূপ

রাজশেখর বসু

স্বাধীন আর পরাধীন দেশের প্রভেদ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই বলবেন, দেশের লোকেই যেখানে শাসন করে সে দেশ স্বাধীন, বিদেশী যেখানে শাসন করে তা পরাধীন। কিন্তু এত সহজে প্রশ্নটির মীমাংসা হয় না। দেশের কত জন স্বাধীন, কতটা স্বাধীন, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে স্বাধীন, ইত্যাদি নানা বিষয় বিচার করা দরকার।

স্বাধীনতার বাৎসরিক অর্থ—নিচের ইচ্ছায় চলবার অর্থ। যা ইচ্ছা তাই করবার ক্ষমতা। এ রকম নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কোনও দেশের কোনও লোকের নেই, সর্বশক্তিমান ডিক্টেটোরসও নেই। সকল রাষ্ট্রেই নাবালক, পাগল, জেলখানার কয়েদী ইত্যাদির স্বাধীনতা অল্প। প্রাচীন স্বাধীন ভারতে জ্ঞী আর শূত্রের অনেক অধিকার ছিল না, ব্রাহ্মণ গুরু পাণে লবু দও পেত, কিন্তু অত্রাঙ্গন নিকৃতি পেত না। কমিউনিস্ট দেশের প্রচার স্বাধীনতা অতি সীমাবদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যাগুরু অশ্বৈজাতির অনেক অধিকার নেই। বিলাতে ১৮২০ সালের আগে রোমান ক্যাথলিক প্রচার পূর্ণ অধিকার ছিল না, ১৯১৮ সালের আগে মেয়েদের ভোট ছিল না। ব্রিটিশ আমলে ভারতের প্রজা

বিনা বাধ্য প্রচুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে পারত। কিন্তু সমাজতন্ত্রী স্বাধীন ভারতে সেই অধিকার সংকুচিত হয়েছে। বর্তমান ব্রিটিশ এবং আরও অনেক ইউরোপীয় রাষ্ট্রের অবস্থাও এই রকম। মোট কথা, প্রচার পক্ষে স্বাধীন আর পরাধীন দুই বশাই আপেক্ষিক বা relative।

আমরা বলে থাকি, তুর্ক জাতি অর্থাৎ পাঠান-মোগল কর্তৃক ভারত বিজয়ের পর থেকে ১৯৫৭ সালের অগস্ট পর্যন্ত মোটামুটি ৭০০ বৎসর ভারত পরাধীন ছিল। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, মুসলমান বিজেতারা ভারতে স্থায়ী ভাবে বসতি করেছিল এবং এদেশের বিস্তর লোক মুসলমান হয়ে বিজেতাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, এই কারণে বাদশা-নবাবদের বিদেশী বলা ঠিক নয়, তাঁদের রাজত্বকালে ভারত পরাধীন ছিল এ কথাও বলা চলে না। এঁদের যুক্তি অগ্রসারে কেবল ব্রিটিশ অধিকারই ভারত পরাধীন ছিল। এ দেশের মুসলমানরাও মনে করে, বাদশাহী আর নবাবী আমলে তাদের স্বাধীনতার হানি হয় নি।

আলোচ্য বিষয়টি কি রকম জটিল তা আরও কয়েকটি দেশের ইতিহাস থেকে জানা যাবে।

১৭৬৬ ইষ্টাব্দে নরমাণ্ডির ডিউক উইলিয়ম যখন ইংল্যান্ড আক্রমণ করে জয়ী হন তখন ইংরেজ জাতি নিশ্চয় পরাধীন হয়েছিল। তার পর শতাব্দিক বংসর নরমান অভিজাতবর্গের সর্বনয় কড়'হের সমগ্র দেশের অধিবাসী আ্যলোক্তাকমনরা অধীনতার চুঃখ ভাল করেই ভোগ করেছিল। কিন্তু সেই পরাধীন দশা ক্রমে ক্রমে আপনিই বিলীন হয়ে গেল। বিভক্তা আর বিজিতদের মধ্যে ভাষাগত ভেদ ছিল, কিন্তু বর্ণগত ধর্মগত আর আচারগত ভেদ ছিল না, সেজন্য নরমান আর আ্যলোক্তাকমন শীঘ্রই সম্পূর্ণভাবে মিশে গেল। সুতরাং এ কথা বলা চলে যে নরমান বিজয়ের পর ইংল্যান্ড ছ-এক শ বংসর মাত্র পরাধীন ছিল।

সমগ্র শতাব্দে ইসলামানের উৎপত্তির সময় মিসর পারস্য তাতার প্রভৃতি স্বাধীন ছিল, কিন্তু কয়েক শ বংসরের মধ্যেই মুসলমান খলিফা এবং আরব যোদ্ধারা এই সব দেশ জয় করে নিজের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। দেশের লোক বিজিত হলে, কিন্তু ধর্মাস্বতন্ত্রি হয়ে বিজেতাদের সঙ্গে বিশেষ দ্বিগে সামুজা লাভ করল, তাদের পরাধীনতার কলঙ্ক আর রইল না।

মুসলমান বিজয়ের এইপ্রকার পরিণাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটলেও কয়েকটি দেশে ব্যতিক্রম দেখা গেছে। স্পেন, সিসিলি, বলকান প্রদেশের কতক অংশ আর ভারতবর্ষ বিজিত হয়েও পুরোপুরি ধর্মাস্বতন্ত্রি হয় নি। স্পেন সিসিলি ইত্যাদি কয়েক শ বংসরের মধ্যেই বিজেতার কবল থেকে মুক্ত হয়েছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ তা পারে নি। কুবলাই খাঁ আর তাঁর উত্তরাধিকারীরা অনেক বংসর চীন দেশে রাজত্ব করেছিলেন এবং নিজেরাই বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

এ কালে ভারতে যে বেশাধ্বাব্য আর সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে, সেখানে তা ছিল না। ভারতবাসী বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, আপং-কালেও তাদের একা ঘটে নি, আক্রমণ জাতিদের

মতন তারা ঘৃণনিপুণ ছিল না, তাদের নীতি যত্নবিহীন তদৃষ্টবিহীন। এটি সব কারণে ভারত পরাধীন হয়েছিল। ভারতী প্রজা চিরকাল কষ্টাট পরিহার করেছে, ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে থেকে চিরগত ধর্ম আর সমাজবিধি পালন করতে পারলেই কৃতার্থ হয়েছে, রাজা যেই হক তাতে তার বিশেষ আপত্তি ছিল না।

নরমান বিজয়ের পর ইংল্যান্ডের এবং মুসলমান বিজয়ের পর মিসর পারস্য প্রভৃতির সর্বাঙ্গীণ পরাধীনতা ঘটেছিল এবং মিশ্রণের কলে কয়েক শ বংসরের মধ্যেই তা তিরোহিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতের পরাধীনতা আনন্দিক, অর্থাৎ শুধু রাজনীতিক, অত্যাচারিত হয়েও দেশের অধিকাংশ লোক তাদের ধর্মগত আর সমাজগত স্বাভাব্য রক্ষা করেছিল। বহুবর্ষব্যাপী নিশ্চেষ্টতার মধ্যেও ভারতবাসীর একটি বিষয়ে দৃঢ়তা ছিল, সে তার 'সহজঃ কর্ম (বা ধর্ম) সদোষমপি' ভ্যাগ করে নি। সমগ্র ভারত যদি পরধর্ম গ্রহণ করত তবে আমাদের পরাধীন দশার স্থিতি সাত শ বংসর না হয়ে দু শ বংসর গণ্য হত, অর্থাৎ শুধু ব্রিটিশ অধিকার কাল। সে ক্ষেত্রে সমস্ত মুসলমানের সঙ্গে সামাজ্য অসুভব করে কবি ইকবালের মতন আমরাও দ্রুত রাজ্যের জন্ত বিলাপ করতাম—চীন হমায়, স্পেন হমায়।

অন্ত বিষয়ে উজ্জবহীন হয়েও ভারতবাসী তার দৃঢ় স্বধর্মনিষ্ঠা কোথা থেকে পেয়েছে? কেউ কেউ বলবেন, এর মূলে আছে বর্ণাশ্রম ধর্ম। কিন্তু বর্ণাধর্ম বর্ণাশ্রম আর চাতুর্বর্ণ্য বহুকাল আগেই লোপ পেয়েছে, তার স্থানে বা এসেছে তা জাতিভেদ বা casteism। এই শতমুখী তেজবুদ্ধির এমন শক্তি থাকতে পারে না যার দ্বারা বিজেতার ধর্মকে বাধা দেওয়া যায়। ভারতবাসীর প্রকৃতিতে এক প্রকার প্রবল জাড বা inertia আছে, সে অজ্ঞাতসারে অনেক পরিবর্তন ঘেনে নেয় কিন্তু সজ্ঞানে তার নিষ্ঠা ভ্যাগ করতে চায় না। হয়তো এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই বহিরাপত আঘাত প্রতিহত হয়েছিল। পেগান গ্রীস আর রোমের সংস্কৃতি প্রচুর ছিল, তথাপি

সেখানকার লোক নিজে ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছিল। ভারতের অসাংখ্য ধর্মব্রত আর লোকোচ্চারের মধ্যে এমন কিছু বলিষ্ঠ অবলম্বন আছে যার কাছে বিদেশীর প্রভাব হার মেনেছিল। ইতিহাসজ্ঞ সমাজবিজ্ঞানীরা হয়তো তার সম্ভাবন পেয়েছেন।

আর একটি বিষয় লক্ষ্যীয়। পাঁচ শ বৎসরের মুসলমান শাসনের কালে ভারতবাসীর সংস্কৃতি

অবশ্যই কিছু বদলেছে। কিন্তু তার চাইতে বহু গুণ বদলেছে দু'শ বৎসরের ব্রিটিশ শাসনে। মুসলমান সংস্কৃতি থেকে গ্রহণযোগ্য বেশী কিছু আমরা পাই নি, কিন্তু ব্রিটিশ বা ইংরেজীয় সংস্কৃতি থেকে প্রচুর পেয়েছি। আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম নেবার প্রয়োজন বোধ করি নি, কিন্তু ইংরেজীয় আচার কিছু কিছু আকর্ষণ করেছি এবং সাগ্রহে পাশ্চাত্য বিজ্ঞা বৃদ্ধি ও ভাবধারা অল্প পরিমাণে গ্রহণ করে নিয়েছি।

আমর সফট ঐক্যানীচরণ ঘোষ

হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, ঐশ্যের গল্প প্রভৃতি পুথক বঙ্গবাস ধরিয়া প্রচলিত থাকায়, সাধারণ লোকের নিকট ইহার কথ্য কিছু কমিলেও ঐক্যিক ও জাতিক ভাবের আঁকর হিসাবে ইহাদের মূল্য যে ভ্রাস পার নাই, তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে কষ্ট হয় না। 'একচন্দ্র হরিণ' আক্ষণে বহুত-সমাজে বিচরণ করিতেছে। যে শিক্ষা ঐশ্য এই সন্দের মাধ্যমে দিয়াছিলেন, তাহা উপেক্ষিত হইতেছে; কর্মক্ষেত্রে ইহার যতটা প্রযুক্ত হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় না; ইহাই সমস্যা।

বহু ঘটনা করিয়া দেশ-বিদেশে নামানো গিটাইয়া রাজধানী হইতে রাজধানীতে সফর করিয়া পক্ষ-বাদিক পরিগল্পনার গুণকীর্তন করিয়া আমাদের প্রতিদিনেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। দ্বিতীয় পরিগল্পনার শিল্পপ্রচেষ্টার উপর গুরু আয়োপিত হইল। অমৃত্যবের সভাবনা নাই মনে করিয়া আমাদের অন্ধ-চক্ষুটি নিশ্চিন্ততার দিকে রাখিয়া আমরা মানসিকভাবে বুদ্ধ-নিরোধ, অশবিক-বোমা বজন, জাতিগত অধিকার—মহুত, সমাজ ও রাষ্ট্রকৌশলের ধন প্রচার করিতে লাগিয়া গেলাম।

এবার-বজনে আছে—“নাই বলিলে সাপের বিষও থাকে না”। হতত অভাবের ঘরে দারিদ্র্য-কষ্ট লাগবে করিবার পক্ষে ইহা কোক মাত্র, যেমন ‘নাই’ বলিলে কেউটে, সোচ্ছুরা প্রভৃতি বিষধ সাপের বিষ অস্তিত্বিত হয় না। আরের কল কোনও তিনা নাই—প্রতিনিয়ত নানা ক্ষেত্রে হইতে প্রচার করা হইয়াছে, বৎসর হই পূর্বে ঘনের আনন্দ

কিছু বাস্তবত্বের বর্ণনা করিয়াও দেখা হইয়াছে। লোকে বুঝিল যে, আর চিন্তার কারণ নাই, কারণ বাহার ঘরে অভাব সে কি কাচের লোভে কাকল ছাড়িয়া দিতে পারিবে? দেশের অমৃত্যব দুই হইয়াছে অন্যত্র করিয়া বিবেচী স্বপ্ন পাইবার সুবিধার জন্য এইরূপ করা হইয়া থাকিবে।

অবস্থার গুরু সম্বন্ধে সরকারী মহল যেন একটু রাসের বাধী বর্ণন করিতেছে। কোনো কোনো গদ্য ব্যক্তি চাইল-ব্যবহার ভ্রাস বা বচন করিতেছেন এবং লোককে কল্যা, আশেল, অস্ত্র, দুখ, বাস্তব প্রভৃতি বস্তুর পরিবর্তে বাস্তব হিসাবে গ্রহণ করিবার সুপারামণ নিতেছেন। ইহাদের নিকট-আত্মীয় কেহ দরিদ্র নাই এবং ধান হইতে নিশ্চয়ই পেজা, বাগাম, আতর, বাহু ইত্যাদি ইহাদের নিজ সম্পত্তিতে উৎপাদিত হইয়া থাকে; তাহা না হইলে, তাহাদের অন্য উপদেশ নিত্যন্ত পরিহাসের মতো বলি করিতে হয়। বাজারে এসকল প্রযাদির যে মূল্য তাহার ক্রয়ের আর ইহাঙ্গিগবে পরিবর্ত আহারে বলিয়া মনে করা যায় না। গাহারা বলেন, অবশ্যই তাহাদের পক্ষ সাধারণ লোক অশেষা অনেক বেশী এবং ইহা রুদ্র করিতে তাহাদের কোনো অসুবিধা হয় না।

‘গোলা-লোক’ অর্থাৎ আপায়নসাধারণ—মহাপুরুষ ব্যতিরেকে—হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছিল যে অবস্থা বড়ই গুরুতর। ১০, ১১, ১২, টাকার প্রতি-মণ চাইল যখন ২০, ২২, হইল, তখনই লোকে প্রমাণ গণিল। তাহার পর বহু চেটায় ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৪, ৫৯৫, ৫৯৬, ৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০০, ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১০, ৬১১, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৬, ৬১৭, ৬১৮, ৬১৯, ৬২০, ৬২১, ৬২২, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৭, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৭৯, ৬৮০, ৬৮১, ৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১১, ৭১২, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৭, ৭১৮, ৭১৯, ৭২০, ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬১, ৭৬২, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩, ৭৭৪, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯, ৭৮০, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০, ৮০১, ৮০২, ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮০৮, ৮০৯, ৮১০, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ৮৯২, ৮৯৩, ৮৯৪, ৮৯৫, ৮৯৬, ৮৯৭, ৮৯৮, ৮৯৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪, ৯০৫, ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯০৯, ৯১০, ৯১১, ৯১২, ৯১৩, ৯১৪, ৯১৫, ৯১৬, ৯১৭, ৯১৮, ৯১৯, ৯২০, ৯২১, ৯২২, ৯২৩, ৯২৪, ৯২৫, ৯২৬, ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০, ৯৩১, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৭, ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১, ৯৪২, ৯৪৩, ৯৪৪, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৬০, ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৭৬, ৯৭৭, ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮২, ৯৮৩, ৯৮৪, ৯৮৫, ৯৮৬, ৯৮৭, ৯৮৮, ৯৮৯, ৯৯০, ৯৯১, ৯৯২, ৯৯৩, ৯৯৪, ৯৯৫, ৯৯৬, ৯৯৭, ৯৯৮, ৯৯৯, ১০০০, ১০০১, ১০০২, ১০০৩, ১০০৪, ১০০৫, ১০০৬, ১০০৭, ১০০৮, ১০০৯, ১০১০, ১০১১, ১০১২, ১০১৩, ১০১৪, ১০১৫, ১০১৬, ১০১৭, ১০১৮, ১০১৯, ১০২০, ১০২১, ১০২২, ১০২৩, ১০২৪, ১০২৫, ১০২৬, ১০২৭, ১০২৮, ১০২৯, ১০৩০, ১০৩১, ১০৩২, ১০৩৩, ১০৩৪, ১০৩৫, ১০৩৬, ১০৩৭, ১০৩৮, ১০৩৯, ১০৪০, ১০৪১, ১০৪২, ১০৪৩, ১০৪৪, ১০৪৫, ১০৪৬, ১০৪৭, ১০৪৮, ১০৪৯, ১০৫০, ১০৫১, ১০৫২, ১০৫৩, ১০৫৪, ১০৫৫, ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৫৮, ১০৫৯, ১০৬০, ১০৬১, ১০৬২, ১০৬৩, ১০৬৪, ১০৬৫, ১০৬৬, ১০৬৭, ১০৬৮, ১০৬৯, ১০৭০, ১০৭১, ১০৭২, ১০৭৩, ১০৭৪, ১০৭৫, ১০৭৬, ১০৭৭, ১০৭৮, ১০৭৯, ১০৮০, ১০৮১, ১০৮২, ১০৮৩, ১০৮৪, ১০৮৫, ১০৮৬, ১০৮৭, ১০৮৮, ১০৮৯, ১০৯০, ১০৯১, ১০৯২, ১০৯৩, ১০৯৪, ১০৯৫, ১০৯৬, ১০৯৭, ১০৯৮, ১০৯৯, ১১০০, ১১০১, ১১০২, ১১০৩, ১১০৪, ১১০৫, ১১০৬, ১১০৭, ১১০৮, ১১০৯, ১১১০, ১১১১, ১১১২, ১১১৩, ১১১৪, ১১১৫, ১১১৬, ১১১৭, ১১১৮, ১১১৯, ১১২০, ১১২১, ১১২২, ১১২৩, ১১২৪, ১১২৫, ১১২৬, ১১২৭, ১১২৮, ১১২৯, ১১৩০, ১১৩১, ১১৩২, ১১৩৩, ১১৩৪, ১১৩৫, ১১৩৬, ১১৩৭, ১১৩৮, ১১৩৯, ১১৪০, ১১৪১, ১১৪২, ১১৪৩, ১১৪৪, ১১৪৫, ১১৪৬, ১১৪৭, ১১৪৮, ১১৪৯, ১১৫০, ১১৫১, ১১৫২, ১১৫৩, ১১৫৪, ১১৫৫, ১১৫৬, ১১৫৭, ১১৫৮, ১১৫৯, ১১৬০, ১১৬১, ১১৬২, ১১৬৩, ১১৬৪, ১১৬৫, ১১৬৬, ১১৬৭, ১১৬৮, ১১৬৯, ১১৭০, ১১৭১, ১১৭২, ১১৭৩, ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬, ১১৭৭, ১১৭৮, ১১৭৯, ১১৮০, ১১৮১, ১১৮২, ১১৮৩, ১১৮৪, ১১৮৫, ১১৮৬, ১১৮৭, ১১৮৮, ১১৮৯, ১১৯০, ১১৯১, ১১৯২, ১১৯৩, ১১৯৪, ১১৯৫, ১১৯৬, ১১৯৭, ১১৯৮, ১১৯৯, ১২০০, ১২০১, ১২০২, ১২০৩, ১২০৪, ১২০৫, ১২০৬, ১২০৭, ১২০৮, ১২০৯, ১২১০, ১২১১, ১২১২, ১২১৩, ১২১৪, ১২১৫, ১২১৬, ১২১৭, ১২১৮, ১২১৯, ১২২০, ১২২১, ১২২২, ১২২৩, ১২২৪, ১২২৫, ১২২৬, ১২২৭, ১২২৮, ১২২৯, ১২৩০, ১২৩১, ১২৩২, ১২৩৩, ১২৩৪, ১২৩৫, ১২৩৬, ১২৩৭, ১২৩৮, ১২৩৯, ১২৪০, ১২৪১, ১২৪২, ১২৪৩, ১২৪৪, ১২৪৫, ১২৪৬, ১২৪৭, ১২৪৮, ১২৪৯, ১২৫০, ১২৫১, ১২৫২, ১২৫৩, ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৫৬, ১২৫৭, ১২৫৮, ১২৫৯, ১২৬০, ১২৬১, ১২৬২, ১২৬৩, ১২৬৪, ১২৬৫, ১২৬৬, ১২৬৭, ১২৬৮, ১২৬৯, ১২৭০, ১২৭১, ১২৭২, ১২৭৩, ১২৭৪, ১২৭৫, ১২৭৬, ১২৭৭, ১২৭৮, ১২৭৯, ১২৮০, ১২৮১, ১২৮২, ১২৮৩, ১২৮৪, ১২৮৫, ১২৮৬,

সরকারী প্রচেষ্টায় 'বস্ত্র-ধ্বংস' পড়িয়া গেল। এখন মোটামুটি ২৭,১২০ বা ততোধিক প্রতি-মণ চাইনের দাম চলিতেছে। এখানেও কর্তৃপক্ষ খন্তাবাদের পাত্র, কারণ নুতন চাইল উঠিবার ন্যূন কোনওরূপ দর পড়িবার পরিবর্তে এখনও ৩০০ মণ হয় নাই।

কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রকৃত রূপ আজও প্রকট হয় নাই। সমুদ্রে মেঘরা চলিতে পারে। 'পলাশ সাল'-এর মতো আবার হয়ত ফল কবিদা পথে ঘাটে পড়িয়া থাকিবে, জুড়াইবার লোক চাপিতে হইরান হইতে হইবে। ভারত তথা রাজ্য-সরকার অগ্রাভাব সম্বন্ধে অতি সচেতন। কারণ প্রতিদিনই এ সম্বন্ধে কোনো-না-কোনো বিবৃতি পত্রিকার প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু, এই অবস্থা যে কেবল অগ্রকই নহে, রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে ইহার প্রতিফলিত যে কত গভীর, সে সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় হয়ত বা উজীর হইয়া গিয়াছে।

মনের আনকে ঐক্যদাচারী বংসরে কম-বেশী একপত কোটি টাকার নূতন ট্যাঙ্ক বংসাইয়া গিলেন। দ্বিতীয় পঞ্চাধিক পরিকল্পনাকে সফল করিতে না পারিলে, 'গেল রাফা, গেল মান' ভাঙ ছাড়িলেন। একজন সাধারণ লোক বাহা বুঝিতে পারে, তাহার মতো বিচক্ষণ লোকের দৃষ্টি কি ভাবে তাহা এড়াইয়া গেল, ইহা চিন্তা করিবার বিষয়।

এক দেশে কলন কম হইয়াছে, তাহার উপর নুতন ট্যাঙ্ক তৈল, কাপড়, চিনি, কাগজ, দিগ্‌লশাই প্রকৃতি সফল নিত্যব্যবহার্য বস্তুর দর বাড়াইয়া দিল; সর্বপ্রকার ভাড়া বৃদ্ধি পাইল। সাধারণ লোকের কি অবস্থা হইবে, তাহাদের কল্যাণের নিমিত্ত মন্ত্রীমহোদয়ের তাহার কথা না-হয় নাই ভাবিলেন, কিন্তু তাঁহার সাধের মানসদলান 'দ্বিতীয় পরিকল্পনা'র কি হইবে, তাহা ভাবিলেন না। তাহার দান চাল উৎপন্ন করেন, তাহাদের তো ঐ পণ্যসাহায্যে অপব্যয় প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করিতে হয়, সুতরাং 'ধড়ে গ্রাণ' রাধিবার জন্য তাহারা দান-চালের দর বৃদ্ধি করিয়া গিলেন।

এখন আঘাত আসিল,—কৃষক জনসাধারণের কথা ছুটিয়া আর লাভ নাই,—হ্রস্ব লাভার জন্য অধিক বেতন ও ভাতার দাবি। বাধা হইয়া সে-দাবি পূরণ করিতে হইল; কতকগুলির জন্য মাসিক দু-টাকা বৃদ্ধিতে পাঁচ কোটি এবং কতকগুলি জন্য মাসিক পাঁচ টাকা বৃদ্ধিতে পনেরো কোটি টাকা ব্যয় বাড়িয়া গেল।

এই অবস্থায় বিদেশ হইতে অধিকমাত্রার বাণিজ্যতুল্যের আদ্যদানি অবশ্য-প্রয়োজন হইয়া পড়িল। দাম তো আছে,

সঙ্গে আছে দানবাহন চলাচলের যান্ত্রিক। এই দুই কারণে অস্বস্তি পলাশ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। খাতের বটন, নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতি ব্যয়ের কথা না-হয় ছাড়িয়া দেওয়া গেল। সেখানে কম-বেশী মণ কোটি টাকা ব্যয়বৃদ্ধি হইবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাহারা বেশে ডাভ-কাপড়ের ব্যবস্থা না করিয়া বড় বড় পরিকল্পনার যান্ত্রিগাছের, তাহার আর বাহাই বকন, প্রকৃত অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া শূন্যে আশ্রয় গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কোনও চেষ্টা হয় নাই, তাহা বলা ঠিক নহে। এখন পরিকল্পনার কৃষির উৎপাদন-বৃদ্ধির চেষ্টা হইয়াছিল সম্ভবিক। কিন্তু যে পদ্ধতিতে হইল, তাহার ফল যে আশাস্বরূপ হইল না, তাহা দেখিবার লোক বা দৃষ্টি ছিল না। অধিক বাণ-উৎপাদন প্রচেষ্টার শত কোটি টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে; তাহাতে প্রচার-পত্রিকা বত প্রস্তুত হইল, শস্ত-উৎপাদন সে অল্পপাতে হইল না। কাপড়, গতিত জমি লাভ করিয়া কল-বৃদ্ধির চেষ্টা প্রসংসদীষ, সন্দেহ নাই। কাজের মধ্যে, বহু বিদেশী ট্রাক্টর (tractor) বা বনন-বহর আসিল। চালাইবার উপযুক্ত লোক নাই, মানমশলা (মোটো তৈল) প্রকৃতির সরবরাহ নাই, যোরাবতের ব্যবস্থা নাই। ভারতের জমি স্থানে স্থানে গভীর কাশামাটি হওয়ায়, ট্রাক্টর চালাইবার অসুবিধা হইয়াছে। রাষ্ট্রকৃত ট্রাক্টর অপর্যাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। ইহাতে কয়েক কোটি টাকার অপব্যয় হইয়া থাকিবে।

জল পাইলে চাষ হইবার কথা। বড় বড় সেচ-পরিকল্পনা হইল; জল বাধিয়া ভূদেব পতি হইল,—এক-একটি সাগর বলিলেও চলে। ইংরেজের বনে, "Water, water, everywhere, not a drop to drink." জল থৈ থৈ বাধে, পানের ক্ষেত কাটিয়া চৌচির। বাঘের জল ছাড়িয়া বিশপ, না ছাড়িয়া আরও বিশপ। জলের দাম স্থির করিতে করিতে চাষের 'কো' চলিয়া গেল। যিঠেন জলাশয়ের পাশে কল শুক হইয়া মরিল। বড় পরিকল্পনার দ্বারা প্রয়োজন আছে, কিন্তু ছোটকে উপেক্ষা করিয়া বড় ভুল করা হইয়াছে। সোনারশুধ-আড়াপাঁচে, ভিহিরির দান-ভিহির প্রকৃতি স্থানে বৎসক্রমে জননিগণ ও গভীর নলকূপের সাহায্যে সেচ প্রকৃতি ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ পরিকল্পনার বৈশি বনোযোগ মেঘরা উচিত ছিল। এক-একটি সেচ-পরিকল্পনার সমস্ত অংশগুলি শেষ করিবার পর জল ছাড়িয়া চাষের উন্নতির ব্যবস্থা অপেক্ষা কাজ চলিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক অংশ হইতে জল ছাড়িয়া বাহাতে

কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহ করা যায়, তাহার মতো পরিকল্পনা হইলে শোভন হইত।

জাপানী প্রথা চাষের গুণগান প্রচুর হইয়াছে, কিন্তু কে-পরিমাণ জমিতে চাষ হইতেছে তাহার আরতন কতটুকু? আবার এদিকে, তাহার লোকসংখ্যা নানাবিধ প্রকাশ পাইতেছে। সোকে একবার আতরগ্রস্ত হইলে আর গণনা যাইবে না। এত সূচকের 'জাপানী ধানচাষ' চাষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কষ্টকর হইয়া পড়িতেছে।

চাষের জল সরকারী বীজ কাহারও মনে উৎসাহের সৃষ্টি করে না। নিত্যমুহুর্তে অজানপক্ষে চাষী উল্লাসিয়া থাকে। সকল সময়ই বে কণ ব্যয়ণ হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু যদি অল্প স্থানে সংগ্রহ করিতে পারে, তবে সরকারী বীজ-পিকার কেন্দ্রে চাষী বাইতে চাহেনা।

অবস্থার গুরু দুষ্টি, কত শীঘ্র ফসল উৎপাদন করা যায় তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত এ-বিষয় কিছু শক্তি নিয়োগ করিবার সুযোগ আছে। যদি হিসাবে তাহার দাম কম, সমষ্টি দীর্ঘা বিচার করিলে ইহার ফল সবচেয়ে সহজেই একটি ধারণা করা যায়। এবং তাহা যে নিত্যমুহুর্তে উপেক্ষীয় হইবে না, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

যাহা একক হিসাবে করা যাইতে পারে, তাহার ক্ষেত্র দূর বিস্তৃত নহে; কিন্তু আজ কাহারো 'চোটা' বিঘা মনে করা যায় না। এ সম্পর্কে প্রথমেই অপচর-অপব্যয়ের কথা উল্লেখ করিতে হয়। অবশ্য ধান গম প্রভৃতি তুলসের অত্যধিক চড়া দামের জন্ত অপচরের পরিচালনা উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু তৎসঙ্গেও এ বিষয় একবার অনুসন্ধানরূপে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার কতি নাই।

আবার মনে হয়, অপব্যয়ের ক্ষেত্র নাই একথা বলা ভুল। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে ভোক্তাশ্রবণের যে আয়োজন হয়, তাহা সাধারণতঃ প্রয়োজনের অধিক হইয়া থাকে। তাহাতে উৎসৃত ভ্রমের একটা অপচর আছে। হ্রত তাহা বাদী হইলেও, বাড়িতে পরদিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে; অথবা দ্রব্যসমূহ প্রত্যাশীদের মধ্যে বিতরণিত হয়। প্রথমটিতে অল্পবয়স্ক সন্তান; দ্বিতীয় ব্যবস্থা সবচেয়ে অনেক সামাজিক বিচারের কথা আনিয়া পড়ে, ইহা এখানে আলোচ্য নহে। এক কথাই বলা যায়, যাহা উৎসৃত হইয়াছে তাহা পাক না করিলে অনেকের পক্ষে এবং সমরভ্রমের ব্যবহার করা বাইত। আজ যাহা বাচাইয়া রাখা যায়, কাল তাহা একজননের জীবন রক্ষা করিতে পারে।

কিন্তু বুল কথা, বাঁহায়া নিমন্ত্রণ করিয়া বহু লোককে

চুবিভোজনে পরিতৃপ্ত করিতে চান তাহার বিতরণী; বিতরণী না হইলেও ধনবানের চলে নিকটে পরিতৃপ্ত করিতে ইচ্ছুক। অবশ্য সকল আয়োজন সমান গুরু নয়, ইহার মধ্যে স্ফুটনের অনুশাসিত কম-বেশী হইয়া থাকে। বাঁহাদের এইসকল আসরে উৎসবে নিমন্ত্রণ করা হয়, তাহাদের অবস্থা, সামাজিক ব্যবসায়িক ব্যক্তিগণের, নিত্যমুহুর্তে অনুশ্রম নয়। একদিনের নিমন্ত্রণে তাহাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; কিন্তু একটা আয়োজনে যে ভোক্তাশ্রবণের পাক হয়, তাহা বংশোদ্ভবের জীবনরক্ষার সমর্থ। বর্তমান অবস্থায় এইসকল আশ্রয় সর্বপ্রকারে পরিচালনা করাই বাহনীয়। বিদ্যাতী ধর্মের ভোক্তাসভার কেক (cake) প্রতিভার প্রচলন আছে; সাধারণতঃ হোটেলের ভোক্তাসভা বসে, আর না হয় প্রান্তর প্রত্যাগি বাড়িতে খানার ব্যবস্থা করিয়া নিমন্ত্রিতের তৃপ্তিবিধান করা হয়। ব্যবস্থা দুই নতুন নয়। এই সেইদিনও ব্যস্ত-নিমন্ত্রণের সময় লক্ষ্য জনের অধিক লোককে নিমন্ত্রণ করা ও আত্মবিশ্বাস ব্যাপারে বিধিনিষেধ ছিল। অবস্থা আরম্ভের বাহিরে হাইবার পূর্বে এই সাধনাত্মক অবলম্বন করা বিধেয়।

পরিচালনা বহু অল্পই হউক, যাহা প্রত্যেকেই কিছু কিছু উৎপাদন করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। বাঁহাদের জমি নাই বা বোটেই সময় নাই, তাহাদের কথা বহুতঃ ইচ্ছা থাকিলে, সময় কিছু বাহির করিয়া লওয়া বাইতে পারে। কিন্তু বহুতঃবাহিরে লক্ষ্য জমি অনেকেরই আছে, বিশেষতঃ পল্লীর দিকে প্রায় সকলেরই কিছু কিছু জমি আছে। পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিলেই এই জমির অব্যবহার বা অপব্যবহার সকলেইই নজরে পড়ে। হ্রত সকলের আর্থিক সঙ্গতি নাই, কিন্তু কাছিকি জমে বাহা সম্ভবতাহাও যে হয় না, ইহাই ক্ষোভের বিষয়।

পল্লীগ্রামের পতিত জমি হইতে আয় করার এইরূপ প্রয়োজন ইহার পূর্বে হ্রত আর কখনও হয় নাই। প্রতিটি কাঠা জমি বাহা উৎপাদন করিতে পারে, তাহার প্রকৃতি চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। যেখানে মালিকের সঙ্গতি নাই, সেখানে সমর্থ প্রতিবেশী বা অপর ইচ্ছুক চাষীকে চাষ করিতে দিলে ফসল উৎপাদনের চেষ্টা অব্যাহত থাকে। অবশ্য বাহাতে মালিকের স্বত্ব নষ্ট না হয়, প্রয়োজন হইলে তাহার জন্ত আইন বা অভিনাশ প্রণয়ন করা দরকার।

এই এমত বসিতে হয়, যেখানে বহু ভালো জমি বেড়া ও রেলিগ সাহায্যে বিশেষভাবে সুরক্ষিত, বহু বহু ফুলের বাগান, বাড়ির সঙ্গত টেনিস প্রভৃতি খেলায় জমি আর বিলাস-ক্ষেত্র করিয়া রাখা অশ্রুতি। ভালো ফুলের চাষা বা বীজ সাময়িকভাবে সমর্থ একাধারে রাখিয়া যাহা কিছু হউক

উৎপাদন করা চাই-ই। ধর্মীর ধন, আশ্রয়কা করিবে না; এসকল চাষে যদি অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াও বাহ্যে কিছু ফল পাওয়া যায়, তাহা উপেক্ষা করা ভালো নয়। এসকল স্থানে গম, ভুট্টা প্রভৃতি খাজতরুল এবং শাকসবজি, কলা, মৃগা বহুলকৈ জন্মিতে পারিবে। পল্লী, এমন কি সহস্রোচ্চ ছাগল-গরুর উৎপাদ হইতে গাছ রক্ষা করা এক সমস্যা। এসকল 'বার্থে' বা উঠানে গাছ সহজেই রক্ষা পাইবে। অনেক ক্ষেত্রেই বাহিনী-করা দালী আছে, তাহারা বর্ষস্থানে শাকসবজি চাষ করিয়া সাহায্য করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে পাক বা সরকারী বাগানগুলি বাগ দেওয়া ভালো। অনেক পোকে যেখানে স্বাস্থ্যগাভের অপায় বায়, সেখানে চাষ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখার লাভ অনেক। মোট কতি বেশী হইবে। তাহা ছাড়া, কীটামোচী ছেলেদের অভ্যাচার হইতে ফল রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

বাগান-জমিতে ধান জন্মিবে না সত্য, কিন্তু অপর দান্য চাষ হইতে পারে। বাঁহাকে বাকারে গিয়া ডিঙ করিতে হইবে না, পরিবারস্থ লোকের সাহায্যে নিষের সবজির অত্র মিটারিতে পারিবে, তিনি ভাববাসীর বন্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। এইজাতীয় চাষে সরকারী সাহায্য বড় উপকার করিতে পারে, অল্পক্ষেত্রে হয়ত ততোই হয় না। জমির প্রকৃতি, চাষের কাল, উপযুক্ত বীজ ও ফলের নির্বাচন সংক্রান্ত কৃষিবিবরণ জ্ঞান থায়ে বসিয়া পাইলে, লোকে যতাবতঃই উৎসাহ পাইবে। বহু ক্ষেপে এবং ব্যয়ে এইসকল 'ঘরোয়া চাষ' হইতে বিকলতা লাভ করা বার বলিয়া গৃহস্থ জমি কেলিয়া রাখা লাভজনক মনে করে। গরু-বাড়ুর, চোর প্রভৃতির উপদ্রব আছে, তাহার উপর আছে অল্পা গাছ। কৃষি-বিভাগীয় কর্মচারীর জ্ঞান ও শক্তির পরিচর নিবারণ, 'নিমকের' সম্মান রাখার একতরফ হযোগ আর হয় নাই। কিন্তু, ইহাদের ডাকিয়া পাওয়া এক সুসাম্য ব্যাপার। তাহার উপর আছে যেতাদী বিজা; কলিত বিজা যে কতক আছে, তাহা লক্ষ্যেই বিবরণ।

যিনি যে চাষ করেন—তাহা বাহাতে সার্থক হয়, সর্বোচ্চ ফলন বাহাতে পাওয়া যায়, তাহার ক্ষমত দর্শনের চেষ্টা করা বাহিনী। সরকারী কর্মচারীর দ্বারা এককাল সম্ভব কিনা, সে প্রশ্ন এখন আর করিয়া লাভ নাই। বাঁহারা 'কৃষিপতিত' উপাধিতে ভূমিত হইতেছেন এবং তাহার স্বকিঞ্চ লাভ করিতেছেন, তাহাদের বিজা চাষের ক্ষেত্রে চারীকে শিকা দিলে বৃদ্ধিতে পারা যাইবে, সত্যই 'পতিত' অথবা জমির গুণের কৃতিত্ব; জমির ক্ষতি থাকে

তো, ঐ সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্যে তাহার উন্নতি সাধিত হইবে এবং বহাবর ডালো। ফল পাওয়া যাইবে। কৃষি-বিভাগের চাষ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ অথচ উচ্চ-ভিত্তিধারী কৃষকজনের যুগে এক এক জেলার 'কৃষিপতিত'কে পরামর্শদাতা হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারিলে, ফল হয়ত ভালো হইতে পারে।

সরকারী আদর্শ কৃষি-উদ্যানে নাকি অসম্ভব ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্বে, অতিরিক্ত ব্যয়ে সাধারণ অপেক্ষা কিছু উন্নত ফলের অল্পহাতে 'উদ্যানে' অল্পকত বিধি-ব্যবস্থা শাসিত হওয়ায় আগতি হইতে; অর্থাৎ 'বাগানের' জ্ঞান বাগানেই থাকিয়া যাইত। এখন ফলের ধর্ম অত্যধিক বাড়িয়াছে এবং যে অথবা আদিয়া বাড়িয়াছে তাহাতে ফল এত প্রয়োজন যে, উৎপাদনের ব্যয় একবারে অসম্ভব চড়া না হইলে, অর্থ সম্বন্ধে কিছু উপেক্ষা করা যাইতে পারে। এখন প্রতি বড় বড় চাষের বার্থে বা 'বাধা'র দু-এক বিঘা জমি লইয়া 'আদর্শ কৃষিক্ষেত্র' স্থাপনের সম্বন্ধ বাড়িয়াছে। কৃষি সম্বন্ধে এমন বিরাট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি আছেই বাঁহাদের বৃত্ত-ভূতার বার্থের কালা লোপে নাই; আজ তাহাদের পরীক্ষার সম্বন্ধ আসিয়াছে, কৃতিত্ব-পরিচয়ের সুবর্ণ-স্রোতঃ ব্যয়সেপে আদিয়া সমুপস্থিত।

প্রায় ফল না হইলে চাষ হওয়া সম্ভব নয়। একথা প্রতি পোকে জানে এবং তাহা বৃষ্টিতে বড় বড় বর্ষের সাহায্যে অসাধারণ সঠি করিয়া সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। কার্ণক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ নাই, বাহা আছে তাহা বন্ধ জলের বিরাট পরিমাণ এবং তৎসংক্রান্ত কলনাতীত ব্যয়ের পরিমাণের তুলনার কিছুই নাই। বহু কৃতিত্বের গবেষণার পরিচর এই বাঁহা। বার্থে বার্থে ফল সম্বন্ধেই বাঁহা বিশ্বযোগ্যব্যবস্থা, সম্বন্ধ নাই। সেচের সুদীর্ঘ কাল কাটার কাজ কোথাও অসম্পাদিত হইয়াছে; অধিক স্থানেই হয় নাই। আহার বক্তব্য, এইসকল বিজ্ঞানী এখন আবিষ্কার করিয়া বসুন বাঁহাদের গায়ে কত ক্ষয় হইয়া সাহায্যে এবং প্রয়োজন হইলে নল (পাইপ) সাহায্যে সেই ফল দুই-দুইবারের একবার, দুইবার, পাঁচবার মাইল দূরের বার্থে জলে তিকায়া দিতে পারিবে। কাল কাটার পরিকল্পনা চলিতে থাকুক,—অনেকের অঙ্গ-সাহায্য হইবে, এবং আর্থনৈতিক ব্যয়ে পরিকল্পনার সাহায্যে প্রমাণ করা যাইবে; কিন্তু কত ক্ষয় বার্থে বার্থে ফল চালিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা অনতিদিলেই প্রয়োজন।

'গোলা-লোক' হইলেও, একটা কথা সহজেই মনে পড়িতে পারে। একবার পশ্চিম-পশ্চিম কর্মাইল আশ্রমের

এবং ছদ্ম-শাস্ত-আটপত দুই গভীর জ্ঞানশর ভূত হইয়াছে ; কিন্তু সৰ্ব্বত্র উপায়ে জল বিহার ব্যবস্থা হয় নাই কেন, তাহাষ্ট বিরাট প্রশ্নের বিষয়। বিহারের মার্গে হইয়া এত ইচ্ছা কি ভাবে উৎপাদিত হইল এবং বিহার চিনি-উৎপাদনে ভারতে বিত্তীয় স্থান অধিকার করিল, তাহা মাটি ও আবহাওয়ার গুণ ছাড়া আরও এক সাধারণ কারণে সম্ভব হইয়াছে। মার্গের মধ্যে বড় কৃণ করিয়া 'পানিবাহন হটল' বা 'রেহট' সাহায্যে মার্গে প্রচুর জলসেচন হইয়া থাকে। এ চাষের অভিজ্ঞতা কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইল না। তাহা ছাড়া এখন নলকৃণ প্রচলিত হইয়া তাহার কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। জাহাজের কাছ বা খোটা হইর মতো ধাতুর তার বিশ্লেষণিক বহন করিয়া মার্গের উপর দিয়া চলিয়াছে, তাহায়া বাঁধের দশের জলবিশ্লেষণ-কেন্দ্র হইতে 'পঙ্কি' বহন করিয়া চলিয়াছে। এইসকল তার ধরিয়া রাণিবায় জল ধাতুমিহিত বড় বড় খুঁটি বা বায় বসাইতে জমি দখল করা হইয়াছে। (ইহার সাহায্যে বহুধন গরম বিশ্লেষণিক পাণ্ডা যার।) কৃষার জল জমি দখল করিবার পক্ষে কোনও অসুবিধা নাই, কারণ তার তুল্যইতে জমি-দখলের পদ্ধতি বিশেষভাবে আদৃত করা হইয়াছে। ঐসকল কৃষা সরকারী বা সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে; জমি ছাড়িয়া দিতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিবে না। বিশ্লেষণ-চালিত পাশ বসাইয়া জল ভুলিয়া দিলে অতি সহজে তুফান মাটি শস্ত ফলাইয়া তাহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞান করিবে। বলস সাহায্যে 'রেহট' চালাইয়া জল উঠাইয়া যদি বিরাট চাষ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বিশ্লেষণিক যে তাহা সহজে হস-পায় করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের মাটির নীচে জল খুঁজিতে লক্ষ লক্ষ টাকা অর্থব্যয়ে 'পানিবাহন' পুথিতে হয় না। কৃষার জল পকাশ হইতে পঁচাত্তর ফুট গর্ত করিলে অসুস্থ জল পাওয়া যাইবে। ঐদ্য ব্যতিরেকে জিন-পরিষ্কৃত ফুট নীচেও প্রচুর জল পাওয়া যায়।

দেশে চাউল নাই; গম, ধব বাহা আমদানি করিয়া পাওয়া যাইতে পারে তাহা ডোমানে অভ্যস্ত না হইয়া উপায় নাই। এইক্ষেত্রে ভুট্টার কথা মনে আসে। ভুট্টার আমদানি নাই, প্রয়োজন হয় না। ভুট্টা পুষ্টিকর বাছ এবং উপযুক্ত সার পাইলে প্রচুর পরিমাণে ফলন হয়। ভারতে গৃহস্থের বাড়ির কানোচে ছোট ছোট ক্ষেত্রে যে চাষ হয়, তাহার সম্মিলিত পরিমাণ খুবই বড়। এতি গৃহস্থ কিছু কিছু ভুট্টা চাষ করিলে দ্রবল হইবে। একটা বা দুইটা

পেকা ভুট্টা খাইলে একদিনের অল্প ক্ষুধিবৃত্তি হইয়া থাকে। কলা, কচু প্রভৃতি ফল পাইতে বৎসরাধিক লাগে; দিম, বদপটি, ধূল, খেঁদাতি, ছোলা প্রভৃতি কচু-অস্থায়ী কয়েক মাসের ফল। ভুট্টা এই ভিত্তির স্তম্ভের ফল; সর্বত্রই কম-বেশী কপিবে, সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় সাগানে ভুট্টা চাষ খুবই উপযোগী ফল, এবং ইহা ভাল-কড়াই অপেক্ষা পরিমাণে অনেক বেশী ফলে এবং লাভ, কৃষক, বেতন, সবকি অপেক্ষা বহুগুণে পুষ্টিকর।

বাক্যের পুথিলেই বাস্তবত্বের ভবিষ্যৎ দরবারেই দ্রবণ প্রতীক্ষান হয়। যে হরে যে চাউল ক্রয় করিতে হয়, তাহা নিত্য প্রাণধারণের প্রয়োজনে বাধ্যতামূলক অবস্থা। তাহা না হইলে, ঐ উচ্চ দর দিয়া ঐরূপ অশান্ত অর কেহই ক্রয় করিত না। অল্পের ব্যবস্থা সরকার করিতে বাধ্য। টেন-দ্রুগটনা প্রভৃতি হইলে সরকারের তথ্য উচ্চ কর্মচারীদের সারির থাকে না; সেইরূপ অনাহারে মরিলে, অরকটে শ্রম পাইলে লোকের 'পশাল' বা ভাগ্যের বিঘ্নন। ছাড়া আর কিছুই প্রমাণিত হয় না। সেই হিসাবে অর, বর, উচ্চিষ্ক তৈল, চিনি, দিগন্তলাই প্রভৃতি বাগ্যে কেবল দ্রুগ্য নয়, দ্রুগ্যাপা ও অদ্রুগ্য করিতে সহায়তা করিয়াছেন, কর্মসাতার প্রতি তাঁহাদের কোনও দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। লোক 'পরিবলন' চর্চা করিয়া বঁচিবে না। পরিকল্পনা, নান ব্যয়ে, বিশাল-জবনের সুযোগ হয়, ভিকার নামে দরিদ্রের দেশ-বিদেশ জবনের সুবিধা হয়, কোটি কোটি টাকা ব্যয়পাতি ও মাল-মলার ক্রয়ে বহু লোকের বিপদ সুবিধা হইয়া থাকে। এরূপে তালিকা আরও বড় করা যাইতে পারে। ইহাতে পরিকার পাতা ভাঙি করা ছাড়া লাভ কিছুই নাই। লাভ হয়, যদি ট্যাঙ্কের লোড পরিচালনা করিয়া বাস্তবত্ব ও বিবিধ বাস্তব-ক্রয়ের মূল্যায়নের চেষ্টা করা যায়। হস্তক্ষেপ ছাড়া দখল সমুদ্রে থাকিলে, লোকে নক্তি অহুগারে কিছু চাল গম সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডারে ভুলিয়া রাখিবে। অত্যধিক দর থাকিলে, ব্যবসায়ী মাল ধরিয়া রাখিরা কাল, পরশ বা আগামী সন্তোষে বিক্রয় হারা অভিলান্তের আশায় বলিয়া থাকিবে। উচ্চমূল্য শস্ত-উৎপাদনে উৎসাহ দেয়। অপর দিকে, বেশী কলিলে ব্যাকর-দর পড়িবে; অধিক পরিমাণে কম লাভ হইবে। ইহা মনে করিয়া বড় চারীর হত্যা চাল আছে তাহা সইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বলিয়া থাকা অসম্ভব নহে।

বহন সরকার দরদহীন, তখন ব্যক্তিগত চেষ্টার বড়টা হয়, তাহার উপর নির্ভর করিলে আদুর কাল দুইদিন, দশদিন, দুইমাস বা চারমাস বৃদ্ধি করা অসম্ভব নয়—তাহার

মনে হইবে কিছু খট্টে পারে : সত্কাহের মতিগতির পরিবর্তন ওহা মিথ্য অসম্ভব নয়। আমলানি না করিয়া উপায় নাই : পরিকল্পনা সফল করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য আমলানি করিতে সমর্থ লাগিয়া থাকিবে। এত যে সাত উৎপাদিত হইতেছে, সেতব্যের স্বল্প স্বত উপকার বাধ্য দেখা, খাল-কাটা প্রভৃতি দৃষ্ট্য যে অল্প স্বত হইতেছে—একবার হিসাব করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইত যে, প্রতি সের অতিরিক্ত লক্ষ-উৎপাদনে কতকটা টাকা ব্যয় হইয়াছে। যদি দেখা যাইত যে, উপকার অতি অতিরিক্ত ফলনের হিসাব করিতে কষ্ট হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, যেখানে ফল হইতেছে তাহার পরিবর্তন সাধন করিয়া নূতন পন্থা

আবিষ্কার করা হউক। আর বাতারা দুখটি অর্থাৎ করিয়াছে, আমলানি করিয়া দেশকে তুল দৃষ্ট্যইহাছে, তাহার কৃষিক্ষেত্রে গিয়া নিজের অর্থের স্বল্প মাটি চাষিয়া কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করুক। চাষের ফল না হইলে যখন জীবন ধারণ করা সম্ভব নহে, তখন কৃষি-বিভাগীয় মহী হইতে কর্মচারীরা যদি নিজেরা কিছু লক্ষ-উৎপাদন বা উৎপাদনের চেষ্টা করিয়া পরকে ‘অধিক ব্যয় ফলাভ’, ‘বাড়ির উঠানে চাষ করা’ প্রভৃতি আগ্রহাকা প্রাণের অধিকার লাভ করেন, তাহা হইলে তাহাদের আগ্রহ ক্ষুদ্র-বৃহৎ নূতন চাষী দেখা যাবে : অগ্রভাবের ওহা সকলের সম্মুখে প্রকৃত রূপে দেখা দিয়া স্বার্থ উদ্ভূত করিবে।

বাণী দিন, বাণী দিন।

অমরেন্দ্র ঘোষ

এমন কন্‌বিশেষণ বড় একটা দেখা যায় না। যেমনি ভ্রমকালো লাড়ি, তেমনি গাঁও। মনে হয় যেন পলাশভাঙার মাঠের কাঁটা-আলা কোপগুলো কতকাল ধরে যেন ঝুঁকড়ে খোঁচা-খোঁচা হয়ে রয়েছে।

সুসেন সেন একজন সাহিত্যিক। যশ খ্যাতি প্রচুর হয়েছে, বাংলাও পেয়েছেন গাঁদাগুল থেকে রজনীগন্ধার। শুধু একটা জিনিস বাকী—সে হচ্ছে পয়সা।

আশাবাদীরা বলে, আপনি ঘাবড়াবেন না, লিখে যান—বিচারের দিন এলো বলে। একদিন আমরাই অধ্যাপক, চেয়ার-হোল্ডার হব।

সুসেন সেন জবাব দেন, তাতে আমার কি ভাই? কেউ তো পাবলিশার হতে পারছে না। মলাট রঙ-চঙে না হলে যে মলাট খুলছে না!

মধ্যপন্থী বন্ধুরা বলেন, অল্পদিনে যে পয়সা পেয়েছ, মন্দ কি! কত লোক তো আজীবন সাধনারও কিছু পায় না। এমন প্লান করে হিসেব করে চলো।

কিন্তু কোনো প্লানেই কাজ হয়নি। এক এক দিন মালা গলায় দিয়ে চোরের মতো ঢুকতে হয়েছে বাড়ি। গিন্নীর চাইতেও বড় বিপদ মেয়েটা। সেদিনও তার লুকটা কেনা হয়নি।

রক্ষণশীলরা সুসেন সেনকে পেলে একনিষ্ঠাসে শেখ ক'রে নিসেসুকে ডেকে বলেন, এঁর বই প'ড়ে না কিন্তু, ভীষণ অলীল। এখনো স্টাইল কর্ম করেনি।

হয়ত কোনো নিসেসু এক গাল লোজা সুখে পুরে উত্তর দেন, তবে যে সেদিন ঠেকে সম্বর্ধনা জানালে প্রায় হাজারখানেক সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-রসিক? আমি তো আর চোখ-কানকে অবিশ্বাস করতে পারিনি!

—ও-সব ব্যঞ্জে হুজুপ, তোমার যাওয়া উচিত নয়—ওদের মারপ্যাচ বুঝতে এখনো ঢের দেবী।

নিসেসু শুধু পান-মোস্তায়াই রস পান না; বলেন, তুমিও কি সুসেন সেনকে আদ্য নিয়ে বুঝে? এ কোটে রায় লেখা নয়, সাহিত্যের জাজমেন্ট। আমি এবং হুমিতা সুসেন সেনের প্রায় সব বই-ই

পড়েছি। তিনি অলীল নন মোটেই। বরং বলব, এই ভ্যাপসা ছোলো যুগে একমাত্র রিয়েলিস্ট। তবে একটু ছুঁকুহ। পাথুরে ভাষাই তাঁর স্টাইল, এক সেন্সে তিনি ইউনিক।

চোখ ছানাবড়া হয়ে থাকে রক্তশীলের। মিসেসের বয়স হয়েছে—চুলোয় যাক, আপত্তি নেই। মেয়েটা যে কাঁচাবয়সী।

কিন্তু সুসেন সেনের আত্মকার সমস্তা এখানে নয়। সে আরো তীব্র। তবু কিছু ভণিতা না করে উপায় নেই। কারণ ছানাবেল দাড়ি-গোঁফ দিয়েই এ গল্পের পত্তন।

অনেকের হয়ত জানা নেই, কেউ কেউ দাড়ি-গোঁফ রাখেন স্নেহের ভয়ে। অতগুলো নরম গরম জঙ্কালে বুকটা ঢাকা থাকলে হয়ত চাপটা একটু কম থাকবে। তবল হয়ে উঠে বাবে পুঙ্খ পুঙ্খ স্নেহা-রাশি। এ গেল কবিরাজী মত।

দুর্ধর্ষ চোর-ডাকাতের মতে—দাড়ি-গোঁফ রাখা মান অস্বস্তিক। অনেক ক্ষেত্রেই যেন যমকে বুড়ো আঙুল দেখানো। হ্যাঁ, পুলিশ আর বম তাদের চোখে সমান বইকি।

সুসেন সেন কিন্তু কবিরাজী এবং ডাক্তারী মতে বিশ্বাসী নন। তিনি দাড়ি-গোঁফ রেখেছেন মনের হুগে। এতগুলো ভালো বই লিখেও যখন পরসা হল না, তখন আর আসলখানা দেখিয়ে লাভ কি?

আজ হস্তে হয়ে কলেজ-স্ট্রিট অকলে ঘুরছেন সুসেন সেন।

কোথায় ঢুকবেন? তাঁর বইয়ের প্রকাশক একজন নন, প্রায় দশ-পনেরো জন। কুই-কাতলা থেকে চুনো-পুঁটি। বঁড়িশি দিয়ে গাঁথতে পারেনি, বরক উলটে গাঁথা পড়েছেন সাহিত্যিক। ভারত-পুরাণে এর উদাহরণ নেই, বাংলাদেশের কেতাব-পট্টি এক আত্মক উলট-পুরাণের দেশ। তাই মাহের শিকার মানুষ।

আজ ক্রক্ কিংবা অয়েল-ক্রকের সমস্তা নয়।

কাল রাতে বাড়ি ঢোকানায় গিন্নী বলেছিলেন, আমি তো ভেবে আকুল।

সুসেন বেশ খানিকটা বিস্ত্রিত হয়ে বলেন, কেন, আমি কি ট্রান-চাপা পড়েছি?

—বালাই, তা ভাবব কেন? কেউ কোনো অসম্মান তো করেনি? —খানীর জামা-কাপড়ের দিকে তাকান সাবিত্রী। —আমার তো শুনে অবধি তালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে।

পরিশ্রান্ত সাহিত্যিক বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করেন, কেন, জল খেতে পারনি? কুঁজো, টিউবওয়েল, মায় রাস্তার কলটাও কি শুকিয়ে ছিল? — তিনি রঙ-চটা, স্ট্রাপ-হেঁড়া স্মাগল-জোড়া খুলে রাখেন।

সাবিত্রী অবনি অমুরোধে গলে পড়ে,—তুনি স্মাগল জোড়া খুলানো, লস্কীটি! রাতারাতি দিয়েই সেলুন থেকে দাড়ি-গোঁফটা কানিয়ে এসো। পরসা না থাকলে, দারোগার বটএর কাছ থেকে চেয়ে এনে দিচ্ছি।

মহৎ বেদনায়ই দাড়ি-গোঁফ রাখা। তার চেয়ে কী বৃহৎ বেদনায় এ সর্নির্ভক অমুনর? সেদিনও যৌবন ছিল, তখন কোনো প্রয়োজন হয়নি। তবে এখন কি সাবিত্রীর বন্ধাতি? না, কোনো বোম্বের্টের পাল্লার পড়েছেন গৃহিণী?

—তোমার ছুটি পায় পড়ি, আর দেবী করোনা—যাও! অন্তত, ও-ছুটো না থাকলে সনাক্ত করা যাবে না।

—কে বলছিল? দারোগা-গিন্নী বুরি?

—হ্যাঁ, এই তো বুকেছ। এবার লস্কী হেলোটের মতো রঙনা দাও। ঠাকুর! ঠাকুর!

—হঠাৎ এত ভক্তি যে? বিবয়টা খুলেই বল না?

সাবিত্রী এগিয়ে গিয়ে বলেন, পুলিশ এসেছিল। এমন ভাবে বলেন, যেন পুলিশ-ব্যারাকে দাড়িয়ে স্বামীর কানে বে-আইনী কিছু চোলাই করছেন।

সাহিত্যিক স্তম্ভিত হয়ে ঘান। তিনি তো চোর-ডাকু নন। জীবন-ভোর ঠেকে এসেছেন ছাড়া

ঠিকাত পাবেননি। তবে আবার এ ফাদাদ কেন? মুখের চালা কোপগুলো ঘেঁষে ওঠে। কিছুই গির করতে পারেননা সাহিত্যিক। অনেক কণ্ঠন করে একটা কথা নেন আসে। এ আর কিছু নয়, আনন্ডি-করাপশনের আর একটি কিশলয়-ত্যাগ—অশ্লীলতা পাকড়াওয়ার অভিধান।

সুসেন সেনের ইচ্ছা করে—কাগজ-কলম রোস্ট করে ফেলতে। সেইসঙ্গে ডান হাতখানাও দখল থাকে। কি হবে রেখে এ আত্মসম্মতি কলঙ্ক? কিন্তু যখন সত্যিসত্যি জ্বলনি শুরু হবে, তখন আত্মসম্মতি ভাঙার কথা, কোনো ইমারতসম্মতি পৌঁছবার যে ট্রামভাড়াও নেই!

আপাতত তাই স্থগিত থাকে রোস্টিং।

হবে কি দাড়ি-গোঁফ নিহুল করে আসবেন? কত হুংসের গালভরা ফসল, একমুঠেই পরমাণু? না না, এ তিনি কিছুতেই করবেন না। জেল হলে আর ক'বছর হবে? দাড়ি-গোঁফ গজাতে লেগেছে যে চোন্দবছর। বলতে গেলে, এক রানায়ণের যুগ!

জী বলেন, হাঁ করে রইলে যে?

তুমি তো তোমার স্বামীটির কথাই শুধু ভাবছ। আমি ভাবছি সাহিত্যিকের কথা। তাঁর মান-মর্যাদা অনেক কিছুই। আমার জীবনী তো একদিন সবাই পড়বে।

—এখন আর সময় নষ্ট কোরো না। শেষকালে সেলুন বন্ধ হয়ে যাবে।

—বাক, তবু আমি দাড়ি-গোঁফ কামাব না। অতিপরিচিত পাঠক-পাঠিকারা সেলুন থেকে বেরিয়ে আসামাত্র সব স্তনে বলবে 'এসকেপিষ্ট'। তা আমি প্রাণ থাকতে সইতে পারব না।

একটু বাধে জানা যায়, পুলিশ আসেনি। বেক্সা ভাড়ার ডিগ্রীর কিস্তির জন্য বাড়িওয়ালার নাকি মালফ্রান্ডী পরওয়ানা আনবে—অন্যদারে 'বডি-ওয়ারেন্ট'। দারোখা-বউএর ব্যাখ্যা সাহিত্যিকের বউ গুলিয়ে ফেলেছেন।

তবু আজ হস্তে হয়ে খুবছেন সাহিত্যিক। অন্তত একটা: কিস্তি না দিতে পারলে উদ্ধাস্ত!

কোথায় ঢোকা যায়? এ পাড়ায় অলিতে-গলিতে পাবলিশার। ক্যানি: স্ট্রিট, মুগিহাটা, খ্যাংরা-পট্টির যেন মাথা যায়। সব দরজাই খোলা। কম-বেশী খন্দের আছে সর্বত্র। সুসেন সেন পকাননের কাউটারে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁর প্রতিভা এবং সত্য-দৃষ্টির কটিপাখরে যেন দাগ পড়ে: নো অ্যাডমিটেন্স, বাবাজীবন!

তবু দাঁড়িয়ে থাকেন সুসেন সেন। পকানন একখানা সমালোচনার বইএর দাম কত হুস্তে পারে, সেই আলোচনার ময়। পকাননের পাশেই লেখক বসে। এক বিশিষ্ট অধ্যাপক। সুসেন সেনকে দেখা-মাত্র আপায়ন করেন, আশ্বন আশ্বন! নমস্কার।

পকানন কিন্তু ফিরেও তাকায় না। অধ্যাপক একটু বিব্রত বোধ করেন।

পকানন বলে, দাম হবে দশটাকা।

অধ্যাপক লাফিয়ে ওঠেন, এই ক'কর্মী? এক কপিও বিক্রি হবে না।

পকানন জবাব দেয়, তা আমি জানি। তাই আপনার পাওনা-গড়া নিয়ে প্রায় কাবার করেছেন?

—কি আর পেয়েছি বলুন। ষাট্টিনিটা তো দেখেছেন?

পকানন দাঁতশূন্য মাড়ি যা বার করে, তা দেখলে গিলে চম্কে যায়। বলে, দশখানা দেখে একখানা টোকা। ষাট্টিনি বইকি! আর আমাদের এই যে টাকা-পয়সা—প্রেস-বাইওয়ারের বজাট, এ যেন কিছু নয়। দেখছি, শিক্ষিত ব্যক্তিরাই চরম স্বার্থপর।

সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক বলেন, এডিশন হলেও কিছু সাচ্ছন্দা ছিল।

পকানন বলে, তা যে হবে না, আপনিও জানেন, আমিও জানি। ভরসার মধ্যে শ'টুই যদি আপনার ছাত্রমহলে চালিয়ে আসলটা তুলে নেওয়া যায়।

—বাকিটা সব লাভ!— অধ্যাপকের গলা শুকিয়ে যায়।

পকানন বলে, আমার নয়—উইপোকোর।

অধ্যাপক উঠতে চান। পকানন বলে, একটু বৃকে-বৃকে প্রসন্ন করবেন। আপনাতর অধ্যবসায় থাকলে একদিন এডিশন হবেই।

অধ্যাপক বেরিয়ে এলে, ঠাডিকারে গলা দেওয়ার ক্ষেত্রে যেন ছটকট করেন যশবী হুসেন সেন। মনে মনে আওড়ান এমন সব মৌলিক কথা, যা এখনও পৰ্ব্বন্ত তিনি কোনো সাহিত্যে ব্যবহার করেননি। তাঁর প্রতিটি লোমের ডগায় যেন কমথ-কেশর জেগে ওঠে। কিস্তির চাপে প্রতিভার কী অদ্ভুত স্তূর্ণ! সাহিত্যিক অবাক হয়ে থাকেন।

কিন্তু পকাননের মনে কোনো ‘রিসিতার’ নেই। সে পর পর স্বন্ধের বিদায় নিয়ে চলে।

বেলা শেষ। বাইরে ট্রাম-বাসের নক, মানুষের ভিড়। ভিতরে ঘড়ির টিকটিক আর খরিকারের চাপ। চার-পাঁচজন কর্মচারী বই নামাতে ওঠাতে বদলাতে হিনসিম খেয়ে যায়। মাকে মাকে তো রয়েছে বকুনির খাস্তা কচুরি।

ছপাশে কোলাপসিবেল গেট। মাঝখানে বইএর স্ন্যাক-ঠাসা দেয়াল। দেয়ালের সামন্তরাল লম্বা কাউন্টার। বাণীবী রং। যেন ঘি-পিছল। কেউ হাত দিলে তাঁর গা মিরমির করে—বিশেষ করে সে যদি হয় প্রার্থী কিংবা পাওনাদার। মনে হয়, শিডিমাছ আল্ মারছে। কাব্যিক সূহৃৎে এ-কথা কেউ সরলভাবে জানালে পকানন শুধু ছিনালী হাসি হাসে।

হুসেন সেন স্বন্ধের চাপে একবার নর্থ-পোল আবার সাউথ-পোল করেন। পকানন দেখেও যেন দেখে না। সাহিত্যিকের চকচকে কথার বুব্বুগুগে অকারণে মনের কোনায় মিলিয়ে যায়। তবু এ কাউন্টার ছাড়ার উপায় নেই। এমন রেডি-মনি এ পাড়ায় আর নেই। অনেক বোমামদির পর হয়ত চেক। প্রায়ই ক্রস। কঠিন দায়-নিদানে ডিসঅনার্ড।

বাইরে অন্ধকার না হলেও, ভিতরে অন্ধকার জমে ওঠে। নিয়ন-লাইট অলে গোটাকয়েক। ভিড় একটু পাতলা হয়। সাহিত্যিক ভাবেন, এবার কথা বলবে পকানন। বাস্তবিকই সে মুখ খোলে। এখন নয়, একটু বাবে।

অপমানে পুড়ে ওঠে দাড়ি-চাকা কল্‌জেক্ট। ভাবেন—আর নয়, বেরিয়ে যাবেন। কিন্তু কোত্থলে খানিতে হয়।

—হুসেন সেনের ‘কাকদ্বীপ’ উপন্যাসখানা আছে?

হুটি কুড়ি-বাইশ বছরের নেয়ে এসে প্রশ্ন করে।—থাকলে, দিন তো?

পকানন বলে, ওখানা কেন? ও তো বিয়ের উপহারের বই নয়।

প্রথমটি বৌী হুলিয়ে বলে, তা জানি। উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে চাইছিলেন। রেকার্ডের জন্ম দরকার। অমন উপমা এবং নসীপধের বর্ণনা নাকি আর নেই। আমাদের অধ্যাপক সংগ্রহ করে পড়তে বললেন। পাবলিশার কে? খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি। এমন একখানা বই, অথচ বিজ্ঞাপন নেই!

—একটু সরবত খাবেন? ভিতরে এসে বসুন না? আরো ক’খানা বই দেখাচ্ছি। আরো ভালো। লিও তো হে ‘প্রেম কানে কানে’, ‘বমুন নীরবে চলে’, ‘কুমুম-কল্যা’...

—না না, আমার ‘কাকদ্বীপ’ চাই।

পকানন একটু বিরক্ত হয়ে বলে, তবে তাই দাও। আগেই বলে দিচ্ছি, ও বই কোনো উপহারে লাগবে না।

বই আসে। মেয়ে হুটির হাতে ধুলো লাগে। পকানন মাড়ি খিঁচিয়ে ওঠে।—এই মুছে দে! মুছে দে!

দ্বিতীয় মেয়েটি বলে, দেখছি আপনিই প্রকাশক, তা বিজ্ঞাপন যেন না কেন?

—কত বই, কোন্‌খানা রেখে কোন্‌খানার

বিজ্ঞাপন নিই বলুন? তা ছাড়া, অথর চুবে-নিড়ে লাস্ট-ফাঙ্গিটি পর্যন্ত নিয়ে যান। তাই আজকাল আমরা একটু রস-কব-ওগালে মকেলের বই ছাড়া সরঞ্জ ছাপিনে। ঈ্যা, তাঁদের সঙ্গে কাজ করে সুখ আছে।

নেয়ে ছুটি বিখ্যিত হয়। —তবে তো আর ভালো বই ছাপা হবে না। ছুখ-বেদনার ভিতর নিয়ে না এলে কি সত্যিকার সাহিত্যিক হয়?

—হবেনা কোন ছুখে? পড়ে দেখুন 'যমুনা নীরবে চলে'। একজন বাচ্চা চাকুরের নেয়ের লেখা। ছাত্র ছাত্র প্রেমের বচা। একবার পড়লে, ইচ্ছা করবে মুগ্ধ করতে; আর 'কাকদ্বীপে' শুধু বাই-বাই, নাই-নাই! আমার তো নেটেই ভালো লাগে না—

আর পড়ানো চলে না। সুসেন পিছিয়ে যান। কিন্তু কেন জানি, একেবারেও বাইরে বেরুতে পারেন না।

পকানন বলে চলে, সুসেনবাবু বিজ্ঞাপনের কঠোর কোনো ধার খরতে চান না। আজকাল কি-যে সর্বনাশ। বরজা বেড়েছে পাবলিসিটির! — তারপর টোটে একটু রস ভনিয়ে ফের বলতে শুরু করে, বাচ্চা চাকুরের নেয়ের বই বেরুবান্যত্ন নানা লাইব্রেরি থেকে জুড়ে সব অর্ডার। মাস বেড়েকের মধ্যে এডিশন। সাহিত্যে শাস্ত হতে গেলে, শুধু মজুরের মতো খাটলে হয় না, চাই একনমিক প্ল্যানিং।

নেয়ে ছুটি আর কি বলবে? বলে, তা বটে—

—তবে একখানা 'যমুনা নীরবে চলে' দেব কি? লেখিকার নিতান্তই কাঁচা বয়েস। হাতের সই এবং ফটো আছে চোখে লাগার মতো। আপনারা পড়াশুনা করেন, দেখলে ইনসপিরেশন পাবেন। দাও তো পাঁচু, লাল সিকের কিতে দিয়ে সুন্দর করে একখানা বেঁধে—

সুসেন সেন সিঁড়ির শেষ ধাপে নাবেন। পাঁচু মুখ মচকে হাসে। সে এই সাহিত্যের যুদীখানার অনেকদিনের কর্মচারী। আর একটু খোঁজতাই

ক'রে বললে, সাহিত্যের এই কসাইখানার পুরানো জঞ্জাল। খন্ডের এবং পাইকাররা তা ভালো করেই জানে। শুধু নবাগতদের হয় মুশকিল।

নেয়ে ছুটি ছুখানা 'কাকদ্বীপ' হাতে নিয়ে বলে, নমস্কার। 'যমুনা নীরবে চলে' উপহারের জন্য ভালো থাক্।

মেয়েরা বেরুতে পারে না। সুসেন সেনও ফুটপাথে পা দিতে পারেন না। একদল যুবক মার-মার ক'রে কাউটারে ঢোকে।

আজকাল দিনে-তুপুরে কলকাতার যুকে রাহাজানি খুন হচ্ছে। পকাননের চোখ কপালে ওঠে! সে ক্যাপ না কাছা-কোঁচা সামলাবে, বৃষ্টিতে পারে না। —ওরে পাঁচু, রামলোচন-বাবায়া...!

কর্মচারীরা হতভম্ব। মেয়ে ছুটি দেখেগুনে কাঠ।

পকানন এবার বিনা জিজ্ঞাসায় কথা বলে, আমি নই বাবা, ওরিকে যাও। হাতে কি রিভলবর?

না। এক-একটি পেন এবং খাতা এক-একখানা সবাইর হাতে। ছেলেরা জিজ্ঞাসা করে, জেছের সুসেন সেন কোথায়?

ইতিমধ্যে পাঁচু একটু সামলে নিয়েছে। এঁরা আর যাই হোক, ডাকাত নন। সে প্রশ্ন করে, কেন তাঁকে খুঁজছেন বলুন তো? এই তো দাঁড়িয়ে ছিলেন।— পাঁচু মুখে হাসি টেনে বাইরের দিকে উকি মারে।

একটি হাওয়াই-শার্ট-পর্য ছেলে বলে, ও-সব কথা শুনছিনে। সাহিত্যিকরা বড়ই লাজুক, এড়িয়ে থাকতে চান। আজ আমরা কি-যে লাজুনা পেয়েছি!

কে যেন বলে, এক এক জন যেন নবাব!

—চুপ চুপ, আজ ও-কথা বলতে নেই।

প্রথম ছেলেটাই সন্ধিরে বলে, আমরা 'সিংহ সবুজ সম্ভের' সব মেস্কার। এ বছর ভোটের পিছে ছুটে ছুটে সাহিত্য-শাখার তেমন কোনো অমুঠান

করতে পারিনি। কিন্তু বার্ষিক উৎসব এসে পড়েছে। মেজন্তু ভাবছি, সুসাহিত্যিকদের বাণী সংগ্রহ করে পাঠ—প্রয়োজনে আবৃত্তি করব, তাই শ্রুতেনবাবুকে বঁচছি।

পাঁচ বলে, তাঁকে চেনেন ?

—না। তাঁকে দেখার কখনো দৌড়াগা হয়নি।

—এঁ যে, এগিয়ে যান—নাড়িওয়ালা। ফুটপাথে।

বেশ লম্বা-চওড়া যোয়ান।

আবার মার-মার কাট-কাট রব। ছেলেরা ফুটপাথে নেমে আসে।

—বাণী দিন, বাণী দিন—সাহিত্যিক !

পলকে পরিস্থিতিটা বুকে নেন শ্রুতেন সেন।

ট্রাম-বাস ধরতেও দু-পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগবে।

তিনি দাড়িয়ে তা দিয়ে বলেন, শ্রুতেন সেন ভিতরে,

আমি এঁদের মন্তব্য—গোলান কাসের—

ছেলেরা ক্ষিরে চলে। —তোবা ! তোবা !

শ্রুতেন সেন চলন্ত ট্রামে কুলে পড়েন।

একটু জুত করে বসে ভাবেন, এ-ও তো একতরফ এসুকেপিছন। কিন্তু আজ তাঁকে মার্ক্স নিশ্চয় কবর থেকে কমা করাবেন।

আর্ট ও আধুনিকতা

জিহ্মেশ্বরকুমার রায়

“আর্ট কি ? আর্ট কি ?”—চাকরলার জগতে হুগে হুগে শোনা গেছে এই সাংগ্ৰহ প্রশ্ন।

প্রশ্নটি বেশ চিন্তন বশলেও অত্যাড়ি হবে না। কিন্তু অত্যাড়ি কোন নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি। টলস্টয় এ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করে এবং আর্টকে নানা দিক থেকে দেখিয়েও কোন সর্বব্যাপিসম্মত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ’তে পারেননি।

তা পারা বোধ হয় সম্ভবপরও নয়। হুগে হুগে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিভা আর্টকে ভেঙে গ’ড়েছে এবং গ’ড়ে ভেঙেছে। নতুন নতুন শিল্পীর সৃষ্টিভঙ্গী আর্টকে দিয়েছে নব নব রূপ, ভঙ্গী, ছক।

তবু একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায়। অতীতে ঐ সব ভাঙা-গড়া হয়েছিল কতকটা আঙ্গিকভাবেই, কারণ শিল্পীদের সামনে জাগ্রত থাকত শটে (কিংবা অশটে) ভাবে আর্টের একটা সাধারণ আদর্শ এবং তার দিকেই চোখ রেখে চলত বাবতীয় ভাঙা-গড়ার কাজ। বাহ্যের সৃষ্টিকে অস্বাভাবিক ক’রে তোলাবার বা ভিত্তি ভেঙে আদর্শ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কেউ করত না।

কিন্তু বর্তমান সভ্যতায় এখন পায় থেকেই আর্টের রাস্তা চলছে সেই দ্বন্দ্বটাই। সেকলে বর্ষ জাতিরা যখন পৃথিবীর সভ্যতায় পর সভ্যতাকে ধ্বংসরূপে পরিণত করেছিল, সেইভাবেই একদল শিল্পী আকস্মিক মূলে উৎখাত করতে চাইছেন চাকরলার সাম্রাজ্যকে। এবং শ্রেষ্ঠতর রপিকের ছুটিকার অভিনয় করবার জন্যে এখন

একদল লোক তাঁদের গ্রন্থসমগ্র পঞ্চদ্ব হারে উঠছেন, হাঁদের উদ্বারগামী ব’লে বর্ণনা করলে বাসোবরা ছাে ঠাঁড়ালে ভেড়ার সোবাসে আঙন সেঁড়ার মতো।

এই দলের একজন প্রধান শিল্পী (হাইপার-রিয়ালিস্ট দলের নায়ক জোয়ান মিলো) জোর দলদ্য শটে ভাংয়ের প্রচার করেছিলেন—“আমি চিত্রকলাকে ধ্বংস করতে চাই !” এবং সেই কমেজুপের উপরে তিনি বো-ভে-বীর ‘আর্ট’কে সংস্থাপন করতে চেষ্টাছিলেন তার মন্দ ! হাঃ চমকগ্রন্থ, কারণ তাঁকে ছবি ব’লে চেনাই যায় না। এমন কি, সে ছবির নামকরণও সম্ভবপর নয় !

গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আর্টের জগতে যত নতুন নতুন পদ্ধতির জন্ম হয়েছে, দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস খুঁজলেও তার তুলনা পাওয়া যাবে না। এই নব নব শিল্পীর দকলে ও পদ্ধতির জকলে চুকে পড়লে সহজ বুদ্ধির খেঁই হাথিয়ে ফেলতে হয়। কোন মলে যান, তার পানে তাকান, কোন দলের আদর্শ গ্রহণ করব—কিছুই আকাজক করা যায় না।

নতুন নতুন দল গড়া ও বহুদীন বাগাড়ম্বর করা হয়ে উঠেছে আধুনিক শিল্পীদের ব্যক্তিকের মতো। এটা আমাদের ব্যক্তিগত মত নয়। ‘কিউবিসম্’-এর ভক্তে বিখ্যাত প্যাবলো পিকাচোর-নাথ শব্দার সঙ্গে উচ্চারিত হয় অতি-আধুনিক শিল্পীদের হয়ে। এখানে সেই পিকাচোর-ই একটু গল্প বলি।

অনেক গভুক্তক পিকাচো একদা প্রশ্ন করেছিলেন, “আকস্মিক না জানলে লোক কি কহবে ?”

ডক্টররা বিলেন, “আর্ট-স্কুলে ভর্তি হবে, ওহা-হা।”
পিকারো বললেন, “উঁহ, ঠিক জবাব হ'ল না। নতুন
একটা বল গড়ুন।”

পিকারোর উক্তির মধ্যে যে ব্যঙ্গ বা স্নেহের ভাব
লুকানো ছিল, ডক্টর তা ধরতে পেরেছিলেন কিনা
জানি না। নিরুপকার আগেরই এখন স্বান পেয়েছে নতুন
বল গড়ার ক্ষেত্রে। বল হয়ে উঠিয়েছে আর্টের চেয়ে বড়।
বানররা অশুকরণপ্রিয়, মাছবদের বেধাতেরি অনেক
কাজই করতে পারে। কিন্তু শুকশাখীরা যেমন তখন মাছবের
তুলি মাছভেঙে তার অর্ধ বৃত্তে পারবে না, বানররাও
তেমনি হাতে-কলমে মাছবের কাজ করেও বৃত্তে পারেনা
যে, তার সেই অশুকরণের ভিতরে কোন্ উদ্দেশ্য নিহিত
আছে।

বানরদের মধ্যে শিম্পাঞ্জীরা আবার অশুকরণে অধিকতর
অগ্রগত। তারা টেবিলের সামনে চেয়ারে ব'লে চারের
পেগোলায় চুক দিতে, সাম-কাপড়-টুপি পরতে, সিগারেটের
খোঁচো টানতে ও ছাড়তে, ঘর খাঁট দিতে এবং আরো
কিছু কিছু বাস্তবিক কাজ করতে পারে। বলা বাহুল্য, এ-সব
কাজের সঙ্গে তাদের স্বাধীন মস্তিষ্কের যোগ থাকে না।

সম্প্রতি একখানি ইংরেজী পত্রিকায় হাং-তুলি নিয়ে
চিহ্নায়নে নিবৃত্ত কক্কে-নাথদারী এক শিম্পাঞ্জীর ছবি
প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সব ছবি আধুনিক আর্টের নমুনা
ব'লে প্রদর্শনীতে স্থান লাভ করবে এবং নিশ্চিতভাবেই
আশা করা যাচ্ছে—আধুনিক আর্টের উক্ত ক্ষেত্রও অন্বেষ
হবে না।

তখন অনেকে বিস্মিত হতে পারেন, কিন্তু আধুনিক
আর্টের বাক্য ঘেরে দিলে চালু হ'তে পারে সব কিছুই।
কিছুকাল আগে কলকাতা দেশে এরও সেরে উঠে ঘটনা
ঘটেছিল।

গঙ্গীর ধাঁড় ব'লে বহি কিছু থাকে, ব্যাণাঘট। হচ্ছে
তাই। জনৈক বদিক লোক একটা মাথাকে খ'রে তার
ল্যাকে বেঁধে দিলেন ঝ-মাথানো তুলি। বলা বাহুল্য,
আধুনিক উপদর্শটাকে তাড়াতাড়ি কেড়ে কেনবার কত্তে
গাফটা ঘন ঘন ল্যাক নাড়তে লাগল। সেই সময়ে তার
এদিকে ওদিকে বিকিভ লাঙ্গলের সঙ্গে সলস তুলিকায়
তলার ধরা হ'ল একখানা গট এবং অবিলম্বে তা হয়ে উঠল
বর্ষে বর্ষে বর্ষায়। কলে বা গাড়ালো, সেই কিছুতকিমাকার
বর্ষের প্রকাশের গালভরা নাম কেওয়া হ'ল—‘আভিহাভিক
লাগরে স্বর্ষা’। আপনারা তখন বিশ্বাস করতেন কি,
সেই ছবি পরে প্রদর্শনীতে প্রবেশাধিকার পাবে এবং
ক্রি-সমালোচকদের কাছ থেকে প্রশংসিতও হবে?

অনু ষ্টর হচ্ছেন একজন শক্তিশালী আমেরিকান ভাস্কর।
তার চলতি বীতিতে গড়া ভাস্কর্য-কার প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন

করেছে। একবার থেরোলের বংশ ‘কিউবিস্ট’-এর পদ্ধতি
অবলম্বন করে করেইক বড় সোহা দিয়ে তিনি বা গড়লেন
তা দেখতে হ'ল ক্ষুদ্র সংকরণের ‘সাইক্লোপাস’-এর মতো।
কাল থেকে সেই ‘কিউবিস্ট’ ভাস্করের কয়েক বড়ো বিজ্ঞান
নন্দা তিনি আমেরিকার পাঠ্যাবার কত্তে শুষ্ক-ভবনে গিয়ে
উপস্থিত হলেন। পরের কথা তার নিম্নের মুখেই শুধু:

“শুষ্ক-ভবনের কর্তৃত্বাধীরা আমার ভিন্নিস পাঠ্যে
নাযাক হ'ল। তাদের বিশ্বাস, সেটা কোন বিশুদ্ধক
অগ্রত হয়। তারা যথাক্রমে নামা ‘ক্যাটালাগ’ ও বাস্তবিত্ব-
সম্পর্কীয় সমস্ত পাঠ্যপুস্তক পাঠি করে দেখলে। বিশেষজ্ঞ-
দের ডেকে আনলে। কিন্তু তবু ধাঁধা মুচল না। সবাই
হতভয়।

“আমি এখন বলব, এ হচ্ছে আর্টের নিদর্শন, তখন
তারা হেসে উঠল সকৌতুক। অবশেষে মিউজিয়ামের
অধ্যক্ষকে আন্তান করা হ'ল। তিনি সন্দিগ্ধ গোখে তার
দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং অবশেষে সাব্যস্ত করলেন
আমি ‘আন্যকির্কি’ নই ও সত্যকথাই বলছি। তারপর
তারা সেই বর্ণিত ভাস্কর্য যথায়ানে পাঠ্যেই রাখা হ'ল।”

কালে এখন তা কিরিয়ে আনা হ'ল তখনও আবার সেই
একই কাগাস। মাতুল-সংগ্রাহক তা কোন বাহুর বিভিন্ন
অংশে ব'লে খ'রে নিলে, কিন্তু বলা নিরূপণ করতে
পারলেন না।

ষ্টর বললেন, “এ হচ্ছে নিছা।”

মাতুল-সংগ্রাহক সহজেই সে-কথা মেনে নিয়ে বললে,
“তাহ'লে এর কত্তে খুব চড়া শুষ্ক দিতে হবে।”

অত্যন্ত চ'টে গিয়ে ষ্টর চেঁচিয়ে উঠলেন, “তাহ'লে
এগুলো আমি ত্যাগ করব। ছবিই এগুলো নাও, ছবিই
এগুলো রাখে—আমি তোমাকে উপহার দিলুম।”

ষ্টর চ'লে যাকিলেন, মাতুল-সংগ্রাহক ভয়চকিত মুখে
তার পিছনে ধাওয়া করে বললে, “মশাই, এই দিন
আপনার ভাস্কর্য! এর কোন দ্বন্দ্ব নেই, আপনার ভিন্নিস
আপনারই বাস্ক।”

ভাস্কিলোর ভাব বেধিয়ে তবু ষ্টর চ'লে যাকিলেন,
কিন্তু লোকটাও নাছোড়বান্দা, জোর করে সেগুলো তার
হাতে গছিয়ে দিলে। যত একটা বিপদের বোকা নাযাতে
পেরে বেন সে বীতিমতো আনন্দিত হ'ল।

আর্ট কি? এই অতি-আধুনিকতার মরগনে কে দিতে
পারে তার সঠিক উত্তর?

আরো একটু ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কিছুকাল আগে
বিলাতের একটা বিখ্যাত ক্রি-প্রদর্শনীতে জনৈক ‘মায়রিয়া-
লিস্ট’ শিল্পীর ছবি ভুল করে উকোটা টাঙানো হয়েছিল।
আসলে বে চাঠিয়েছিল, সে ছবির কৌনদিক উকোটা
আর কৌনদিক সোকা তেবেতিস্তেও তা আশাক করতে

পারেনি, কিন্তু এতে শিল্পীর মেজাজ গরম হওয়াই স্বাভাবিক। জুজ শিল্পী প্রদর্শনীর কণ্ঠশব্দের কাছে প্রবল প্রতিবাদ করতে গিয়ে সন্নিহরে ওললেন, তাঁর সেই উটো-টাঙানো ছবিখানিই একেলে চিত্রকলায় ভক্তদের বাছ থেকে লাভ করছে উদ্ধৃতিত প্রমাণ!

আধুনিক আর্টকে সমগ্রভাবে খতিয়ান করে দেওয়া চলে না, তার মধ্যেও চিত্রার খোরাক ও দৌলতের ঈর্ষ্য আছে সত্যসত্যই। কিন্তু তার বহুলাংশ আশ্বয় করে আছে বিকৃত-বস্ত্রের মুক্তিহীন ও জীবনী কষ্টকল্পনা এবং বাজে ঠাণ্ডতা দিয়ে সত্যায় সমস্তকার সাজবার জন্তে তা দেশে প্রশংসার হুটসোল জুগছে এমন সব নিবুড়ি জাবক, যারা গর্ভভের দাঙ্গাসাঙ্গোপানে স্টে হিজিবিং ও উটো-টাঙানো চিত্রপটের ভিতর থেকেও আবিষ্কার করতে পারে চিত্রদ্বারী রূপ ও রসের বিষ।

পিকাচো ঠাট্টা করে বলেছিলেন দল গড়ার কথা। কিন্তু দল যারা গড়ে তারা বোধ করি ঠাট্টা-তামাশার দায় ধরে না, গভীরভাবে দল গড়ে এবং এক-একটা চটকদার নাবও বেছে নেয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই আর্টের অগতে এই নতুন নতুন নামে পরিচিত হবার বেগমজা বেড়ে চলেছে। এক-একটা দল এক-একটা 'ইজম্' বা বিশেষ মতবাদের জন্তে ব্যাখ্যা কি ব্যাখ্যা হয়ে ওঠে। ওদের মধ্যে কতিপয় 'ইজম্'-এর মুন্ডা হয়েছে শৈশবকৈ।

যে-সব 'ইজম্' অতিরিক্ত গণগোল ডোলবার চেষ্টা করেছে তাদের দ্বয়েকটির নাম এই: কন্সটিজন্স, জাচাবালিজন্স, ফিউচারিজন্স, ইম্পেস্টিজন্স, আইডিয়া-লিজন্স, পিউরিজন্স, দালাইজন্স, হাইপার-রিয়ালিজন্স ও সাব্রিয়ালিজন্স।

এগুলির সঙ্গে 'কিউবিজন্স'-এর নাম উল্লেখ করদুষ্ম না। একসময়ে 'কিউবিজন্স' নিয়ে আর্টের রাজবে সড়ো পড়ে গিয়েছিল। 'কিউবিজন্স'-এর সঙ্গে লেগেই পিকাচোর নাম উচ্চারিত হয় বটে, কিন্তু 'কিউবিজন্স'-এর বাক পাওয়া যায় তাঁর পূর্ববর্তী শিল্পী গল গিলেন-এর (১৮৬৯-১৯০৬ খ্রী:) চিত্রেও। প্রথমক্রমে এখানে কীর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কথা স্বয়ং হচ্ছে। তাঁর মুখে শুনেছি: "কিউবিজন্স বলে আমার দায় নাম দিয়েছি, সেটা নতুন কিছু নয়। অজন্মার গুহা-ঢিরেও 'কিউবিজন্স'-এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।"

চিত্রশিল্পীরা জানেন, গগনেন্দ্রনাথ তাঁর অনেক ছবিতে অতি সাফল্য ও সফলভাবে 'কিউবিষ্ট' পদ্ধতির বখাযোগ্য ব্যবহার করেছিলেন এবং তাই সেখান থেকে বিখ্যাত শিল্প-দলোচ্চক উইথ এইচ. কন্সল বলেছিলেন: "হুয়োপীর

'কিউবিষ্ট'রাও তাঁর মতো চমৎকার ছবি আঁকতে পারেন না।"

আমাদের 'কিউবিজন্স'-এর তেমন প্রতিপত্তি না থাকলেও, তা একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি। তার মধ্যে অল্প-বিস্তর সত্যের ইঙ্গিত ছিল বলে বিভিন্ন শিল্পী আনন্দিত হয়ে এখানে তাকে ব্যবহার করেন। এইরকম আরো কোন কোন 'ইজম্' পুরোপুরি বার্থ হয়নি, তাদের কিছু কিছু বিশেষ আধুনিক চাককলায় বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে রয়েছে।

'কিউবিজন্স'-এর সঙ্গে পিকাচোর সম্পর্ক এখন খুব খনিষ্ট নয়, জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন প্রভাবের দ্বারা চালিত হয়েছেন এবং নানা পদ্ধতিতে একেছেন নানা ভাবের চিহ্ন। তিনি যে উচ্চশ্রেণীর শিল্পী, সে সন্দেহে সন্দেহ নেই—কিন্তু প্রীতিমতো ধামধামানো, বা বলেন এবং যা করেন তার হৃদয় পাওয়া যায় হয়ে ওঠে।

জাঙ্কের সিন্দ নদীর তীরে কতকগুলো নানা আকারের প্যাণ্ডি-কেস পিকাচোর নজরে পড়ে গেল এবং কোন্ বেঘোলে তিনি একে ফেললেন সেভালোর ছবি। তারপর ছবির একটা নাম দিতে হবে তো? অতএব তৎক্ষণাত ছবির নাম হল—'আমার বাবার প্রতিচ্ছবি'! বলা বাহুল্য, সে 'প্রতিচ্ছবির' সঙ্গে পিকাচোর পিতা-বেচারার কোন সাদৃশ্য ছিল না, কারণ প্যাণ্ডি-কেসের ঢাকিকে মাছের মত্টিচির বলে চালানোর চেষ্টাটাই হচ্ছে অশেষ। কিন্তু পিকাচো সেট বে খুশো হুললেন, শিল্পের পক্ষে তা স্বাভাবিক হ'ল না—উইট ও অদভব সব প্রতিচ্ছবির হিজিক সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ল কচি ও কাচা শিল্পীদের মধ্যে। আজও চলেছে তার জের। নতুন সব ধোখার হুজুগে যেতে অদখো আধুনিক শিল্পী এমন সব বেকার ব্যাশাহকেও কলাবিশ্বের কর্তব্য বলে খ'য়ে নেন।

একজন প্রখ্যাত লেখক (Husley Eddleston) আধুনিক শিল্পীদের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করে বলেছেন: "আধুনিক চিত্রকররা সাদিক হয়ে উঠেছে। নিজস্বের মনে মনে তাদের বিশ্বাস হচ্ছে যে, তারা হচ্ছে পূর্ববর্তী শিল্পীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। নইলে তো তাদের ছবি আকার দরকারই ছিল না! এই ভাবটিই প্রাথমিক বিচার করেছে আধুনিক আর্টের উপরে। যেম্বাওর নিজের ক্ষেত্রে তাকে যদি হারানো না যায়, তবে ডির ক্ষেত্রে বেছে নিতে হবে। যেম্বাও তাঁর নিজের ক্ষেত্রেই ভালো, কিন্তু সেখানে সেখান থেকে চোখ আমাদের শ্রান্ত হয়ে পড়ছে। আমরা নতুন কিছু আবিষ্কার করব। 'জািসিজন্স'-এর মধ্যে দাগ করা চরে 'কিউবিজন্স'-এর মধ্যে শ্রুত করা প্রেমর?"

— রিকমার গান —

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

চার

উদ্ভটটা বোধহয় সন্দেশ করে থাকবে অখিল, তবে কিছু বলল না, কেমন যেন মনে হোল, ভেলেনাম্‌হু, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, হয়তো পারিবারিক স্পর্শ চায় একটু, টুকে দিলে না-আসতে পারে; তাতে একটু থেকে বকিতই কর; হবে।... এ অধমেন যদি নাও হয় সত্য তো, বাঙালীর ছেলে, সং, আসে যায়, মেলাবেশা করে এটা চায়ই অখিল। কিছু বলল না ওকে প্রথমটা। শুধু বাড়িতে বলে দিল। তারপর যখন নামে তিন-চার দিন থেকে সমুদ্রে প্রায় নিম্নমিতভাবে ছুঁগিনে এসে পড়াল হাচরি-সেওয়াটা, তখন একদিন তুলল কথটা। বলল—“এ তো তুমি সময় বাঁচিয়ে খুব কাজে লাগবার পথ; এক বের করেছ, তড়িং, ছুঁগিনেই লোকসান।”

তড়িং আনত-আনত করে বলল—“লোকসান নয়, অখিলদা, পুরনোটা ঝালানো হচ্ছে তো, তাতে বর; লাভই হচ্ছে দেখছি।”

মনে মনে একটু নিশ্চয় হেসে থাকবে অখিল; বলল—“লাভ হয় ভালোই; আমার কথা—পুরনো ঝালিয়ে গিয়ে, এদিকে নতুন না খলসে যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে যেও। এত বেহমৎ করে পড়া...”

আর কিছু বলল না। তবে বাড়িতে বলে দিল—যেদিন এইভাবে সকাল সকাল এসে বসবে সেদিন যেন ওকে ভালো করে চা-জলখাবার খাইয়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়—নাকে, বদকে বলে দিল যেন বাড়িতে ডেকেই খাইয়ে দেন ওরা, টিউটারের মতো বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে নয়। তবে, একদিনেই নয়; সইয়ে সইয়ে, আস্তে আস্তে বাড়ির লোক

করে নেওয়ার মতো করে। খাতির হচ্ছে দেখে কুঠায় যাতে আসা বন্ধ করে না দেয়।

তাঁই হোল; মা পূজাচাঁদা নিয়েই থাকেন বেশি, কিন্তু স্ত্রী সরোজিনী বেশ বুদ্ধিমতী; কবে থেকে চায়ের সঙ্গে জলযোগের আমদানি হোল, কবে থেকে তাতে একটু আড়তর এসে গেছে, কবে থেকে বাইরের-ভেতরের ব্যবধানটা গেছে ঘুচে, তারপর কবে থেকে নিমন্ত্রণের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে নিমন্ত্রণের ব্যবধানটুকুও গেছে মিটে—কিছুই যেন বুঝতেই পারল না তড়িং।

তারপর যখন একদিন রবিবারে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর পর সরোজিনী জানাল, এবার থেকে ফি রবিবারে এখানেই থাকে, তড়িং হেসে বলল—“কেন, অজ্ঞ বারগুলোই বা কি অপরাধ করেছে, বৌদি?”

হাসিটা এমন, সরোজিনীর মনে হোল ওর স্ত্রীতির রীতি যেন ধরা পড়ে গেছে। একটু থমকে গিয়ে হেসে বলল—“আমার বেমতুর নয়, ভাই, তোমার দাদা বলেছিলেন।...মানে, রবিবারটা কারখানার ছুটি দেন তো, একটু গল্পসল্প করতে পারেন—হয়তো সেইজন্তে।”

স্ত্রীতির, আত্মীয়তার একটা রেবারেবি চলল, রবিবার তড়িং বিমলের পড়াভূনা নিয়ে আরও বেশি করে লাগল। ওরই মধ্যে অলক আর কচির সঙ্গে গল্প, খেলা; রান্নাঘরের রুকে বসে সরোজিনীর সঙ্গেও গল্প হয়, হয়তো রত্নিও রইল। অখিলের মার কাছেও গিয়ে বসে তাঁর পূজা থেকে অবকাশ হলে। পূর্ববঙ্গের পরিবার, ঠিক বাস্তবহার নয়, গোলমালের আগেই এদিকে চলে এসেছে, তারপর

এখন সব সখক ছিন্ন, বাস্তবতারই সাদিন। ঐ
চুপে ক'ষাই উনি বেশি ক'ন। পুকুর বাগান,
ক্ষেতখানার, লোকজন—কিছুই সঙ্গেই, কান্নার
সঙ্গেই আর সখক রইল না; আত্মীয়-বন্ধন কে
কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, আর কি দেখা হবে কান্নার
সঙ্গে এ-কালে? শোনাবার নতুন লোক পেয়ে আর
বলে কুলিয়ে উঠতে পারেন না। সবার সঙ্গে সবার
মতোটি হয়ে দিনদিনই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে
পরিবারটির সঙ্গে তড়িৎ।

সরোজিনী বোধহয় আরও চায়। একদিন
রাত্রাঘরের বারান্দায় আলাপ-প্রসঙ্গে বলল—
“বিমল—কবি—অলক, এদের তো একরকম হচ্ছে,
মাষ্টারও রয়েছে, তুমিও নিজের মতন করেই দেখছ,
ঠাকুরকির বোধহয় হচ্ছে একটু পড়াশোনা করে...”

রতিও ছিল, রুটি বেলছিল, মুখটা তুলে বলল
—“তোমার কানে ধরে বলতে গিয়েছিলুম...”

“সব কথা কানে ধরে বলতে হয়, ঠাকুরপো?...
বেশ, বলোনি, পড়েই না, এমন সুবিধে রয়েছে...”

একটু চুপ করে থাকে রতি, তারপর লেটিতে
ছোটো টান দিয়ে বলল—“পরের অসুবিধে করে
নিজের সুবিধে করে নেওয়া—সে ঠাকুরকির কুটিতে
লেখেনি। আর তড়িৎ। তো নিজেই ছাত্র এখন,
নিজের চরখায় তেল দিন।”

মাথাটা আরো নীচু করে নিয়ে মিটে-মিটে
হাসতে লাগল। তড়িৎ সরোজিনীকেই বলল—
“অসুবিধের মধ্যেও না হয় করলাম চেষ্টা, কিন্তু
হবে কিছু আশা করেন, বৌদি?...দেখছেন তো
গুরুভক্তি?”

রতি রুটিটা খালায় ছুঁড়ে দিয়ে আর একটা
লেটি চাকির ওপর টিপে ধরল, অল্প জ্বালা দিয়ে
বলল—“হা গুরু, পড়ার চেয়ে ভক্তি দেখানো আরও
শক্ত। মুখুই থাকি তার চেয়ে।”

আর সবার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, তার পাশে ওর সঙ্গে
এই আড়াআড়িও চলছে সমানে। মাস চারেক
গেল কেটে।

বেহারী ভ্রমলোকটিকে মেড়-ঘন্টা সময় দিতে
হয় তড়িৎকে। গুটা একরকম বাঁধা-ধরা, যদি না
সেখানে আটকে গেলেন কোনদিন। এর পর
ঘন্টাখানেক আরও খাটে, চেষ্টা করে শেষের ভাড়টা
যাতে বাসার দিকেই হয়; রিকশা জমা দিয়ে ঘন্টা-
তিনেকের নাথায় করে বাড়ি।

সেদিন ওদিক থেকে ফিরে আবার বাইরেরই
একটা মেওয়ারী পেয়ে গেল। সবেমাত্র ঘুর থেকে
এসেছে, ইচ্ছা ছিল না বাইরে যাওয়ার, তড়িৎ একটা
মোটো ভাড়া চেয়ে বসল, প্রায় ডবল। জায়গাটা
কতকটা নির্জন, একটা খালের মতো বেরিয়ে গেছে,
তার দুদিকে নতুন বাড়িঘর ঘূঁঁ একখানা করে উঠতে
আরম্ভ হয়েছে, তারই একটিতে বোধহয় তদারক
এসেছিলেন, ফিরবেন। কি ভেবে একবার ওপরের
দিকে চেয়ে নিয়ে রাক্তী হয়ে গেলেন ভ্রমলোক, উঠে
পড়ে বললেন—“বেশ চলা...একটু ভাড়াভাড়ি।”

এদেশীয়ই; বাঙালীদের সাধামতো এড়িয়েই
যায় তড়িৎ। মেওয়ারী নামিয়ে কেরবার সময়
ভ্রমলোকের ডবল ভাড়া স্বীকার করে ভাড়াভাড়ি
বেরিয়ে পড়ার কারণটা বুলল তড়িৎ। দিনের
বেলায় একটা খুব পাতলা মেঘের আন্তরঙ্গ আকাশে
দেখেছিল, লক্ষ্য করবার মতো নয়, এখন একটা
গুরুগম্ভীর ডাকে চোখ তুলে দেখল—একটি মন্ডরও
নেই। তুল হয়ে গেছে, উঠেই জোরে চাপ দিয়ে
রিকশা হাঁকিয়ে নিল। ঘুরে, বোধহয় সোকেটার
ওপর আক্রোশভরেই একবার বাড়িটার দিকে চেয়ে
নিল।...ডবল ভাড়ার লোভ দেখিয়ে বিপদে টেনে
এনেছিল।

বোধহয় মাইল দেড়েক কি দুইয়েক একভাবে
চালিয়ে সহরের প্রায় কাছে এসে পৌঁছেছে,—
আকাশ নাটোঁস দিয়েই যাচ্ছিল—কয়েক কেঁটা জল
হাতের খোলা আঁশটায় পড়ল। ক্রান্ত হয়ে পড়েছে,
তবু আরও চাপ দিল প্যাডেলে তড়িৎ, তারপর
খানিকটা এসে আশ্রয় দেখতে হোল—রিকশা রেখে
কোথায় একটু উঠে দাঁড়াতে পারে। একদিকটা

একেবারেই খালি, একটিকে—ডানদিকটায় খোলার বাড়ি—বারান্দা নেই, মন্দির দোকান, পানের দোকান, খানিকটা পড়তি ভনি—গোত্র-ছাগল বাঁধা। ...মাঃ, ভিজতেই হোল, খানিকটা পেছেই ভিজে, মরিয়া হয়ে বেরিয়ে যাওয়াই ঠিক করেছে, আরও গোটা-কতক এই ধরনের বাড়ি-ঘর—খাটালের পর একটা কোঠা বাড়ির বারান্দা। তড়িং নেমে পড়ল। পাশে রিকশা রেখে উঠে যাক্সিল, আবার ফিরল। ছুড়টা ফেলে দিয়েছিল, হুসে দিয়ে সীটের নীচে থেকে কাড়নটা বের করে মুছে দিয়েছিল সীটটা, তারপর সেটা তারই ওপর বিছিয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠল।

আকাশটা বন্ধুর মতোই ব্যবহার করেছে বলতে হবে। গোটা দিন-চার ছোট ছোট পললায় ত্যাগ নিয়ে এগিয়ে নিয়ে এসেছে, খুব তেজস্বিনি। এই রাত, ও একটু ঠাই পেতে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ধারণাতনে নামল।

একটা নতুন সমস্কার সম্মুখীন হয়ে বেশ একটু চিন্তিত হয়ে উঠল তড়িং। বর্ধা বলে একটা কত আছে আবার, প্রায় চারমাস, কম-বেশি করে। এখনও বৈশাখই চলছে, বোধহয় মাকানাকি, কিন্তু মনে করিয়ে দিল কথাটা। কি করবে এবার? রাত্তির বর্ধা আবার শুনেছে অনেক এগিয়েই আরম্ভ হয়। ...বাইরের দিকে চেয়ে এই কথাই ভাবছিল, গুটি চেপে আসতে মনটা অস্বস্তি বোধ হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। চিন্তাটা ভবিষ্যতের হলেও, একেবারেই সাননের; সেটাকে ছেড়ে কিন্তু একেবারে অতীতে গিয়ে উপস্থিত হোল তড়িং। ...দেশ—বর্ধানানের একটি ক্ষুদ্র পাড়া-গাঁ, কোনও সময় কোন বজায় দামোদরের জল খানিকটা ঘুরে গিয়ে একটা হুঁতী বানিয়ে দিয়েছে, তারই ধারে। জল থাকে না বারোমাস। ...এখন কি করছেন? বৌদিদির গোয়ালে সাঁকাল দেওয়া, প্রদীপ জালা, শাঁখ বাজানো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। দাদা প্রায় এদিক-ওদিক ঘুরে এই সময় সামনে একটা মাহুর পেতে রমাকে নিয়ে পড়াতে বসে। ...দাদার বদনাম,

বৌদিদির অচলধরা একটু। দাদা তো বলে, রমাকে পড়াতে হবে ভালো করে, ওকে তড়িতের ভাইকি হয়ে উঠতে হবে, বাপ না-হয় চাষাই হয়ে উঠল। ...দাদাই নয়, দাম্পত্য বন্ধনটা ওদের বাংলাই বেশ নিবিড়; বাবা-মাকেও মনে পড়লেই একসঙ্গে মনে পড়ে, একটি শান্ত প্রশ্নের ভাব ছুঁতে মুখে। ...রতিটা বড় ঢোল। ...

মাকথানে হঠাৎ রতির কথা কোথা থেকে এসে গেল! একটা কৌতূহলের হাসি ফুটতে যাক্সিল তড়িতের মুখে, হঠাৎ মিলিয়ে গেল। এতদূরের রণ উঠল না? ...

হ্যাঁ, এই বাড়িতেই; ওদিককার একটা ঘরে। আর গানও যে! 'দেশ' রাগিণীর ধরনটা মনে হচ্ছে যেন। মেয়ের গলাই। তড়িং উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াল।

গান গাইতে জানে না; সময় পেল কোথায় জীবনে এ-পর্যন্ত? তবে বড় সুরগুলো মোটামুটি চেনে, অর্থাৎ শুনলেই বলে দিতে পারে। ওটা হয়েছে বর্ধামানে শেষ ছুটো বছর যে-বাড়িতে ছিল সেখান থেকে। বড় বাড়ি, মাস্টার এসে মেয়েদের গান শেখাত, গানের জলসাও হোত মাঝে মাঝে, বিশেষ করে কোন বড় গাইয়ে কি বাড়িয়ে যদি এল বাইরে থেকে। ...'দেশ' রাগিণীটা বড় ভালো লাগে, ওর তো মনে হয় এমনি বর্ধার সঙ্গে যেন মন্ত্রারের চেয়েও মেলে বেশি করে। ...এই রকম বর্ধা রাত, বিপন্ন, নিরুপায় হয়ে অস্বস্তিকার গৃহকোণ আশ্রয় করা, সেখানে হঠাৎ এই সঙ্গীত, তাও সব কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে 'দেশ',—বড় অদ্ভুত লাগছে তড়িতের। ...আরও অদ্ভুত লাগছে—সেটা মাঝে মাঝে—একজন রিকশাওলা তলিয়ে গেছে সুরের লহরিতে! মনে হচ্ছে কী যেন একটা হয়ে গেছে জীবনে, যার জন্তে এই জগৎ থেকে আস্তে আস্তে সরে গেছে তড়িং, কবে, কি করে। মনে হচ্ছে আশ্রয় যেন আবার ঘুরে এসে এ তার একটা অনধিকার প্রবেশ। কেনন একটু লজ্জা-লজ্জা করছে যেন।

আকাশ করে পড়েছে, কখনও গাঢ়, কখনও
স্বিমিত; এশ্রাজের ছড়ের টানের মতো...

‘দেশ’-এর স্বর গিড়ে পৌছেছে গ্রামের
বাড়িতে; দাদা, বৌদিদি, মা, রমা, খোকা। দাদা
বলে—তড়িং পড়ুক, যত পারে। ওকে ছেড়ে
দিছি। ছেড়ে দিয়েছে তড়িং দাদাকেও। অর্থাৎ
প্রতিজ্ঞা করেছে ওর ওপর কোন চাপ দেবে না।
সেই যেদিন ওনল বৌদিদির বালা বাঁধা দিয়ে ওর
বই কেনার খরচ জুগিয়েছেন—আই. এ.—তে ভক্তি
হবার সময়—সেইদিনই করেছিল প্রতিজ্ঞাটা, অবশ্য
প্রতিজ্ঞার কথা জানতে দেয়নি দাদাকে, বাবার
কথা যে টের পেয়েছিল, সে-কথাও নয়।...চালিয়ে
যাবেই। বেশ তো চলছে রিকশাতে। খেয়ে-দেয়ে,
কলেজের খরচ চালিয়ে, আংশিক বাড়ির ভাড়া
দিয়ে এই চারমাসে চৌষটিটা টাকা জমিয়েও
কেনেছে।...দাদা যদি কখনও টের পায়? পাবে
কোথা থেকে?...বাঙালী ভাড়াটে যে পরিহার করে
চলে এমন করে তার একটা হেঁচু তো এ,—পাছে
কোনও সূত্রে, কোন রকমে কথাটা কানে উঠে যায়
তার। অবশ্য তার সম্ভবনা কই?...কোথার মানপূর
আর কোথায় রঁচি; তার ওপর দাদাও তো বাড়ি
ছেড়ে বেকনো কাক বলে জানেই না।

দাদার কথা মনে হলে রুবাটায়ের বড় ভাইয়ের
কথাও মনে পড়ে যায়। বড় ভাই ওদিকে সামলাচ্ছে,
ছোট ভাই বেরিয়েছে দুনিয়া দেখতে, মানুষ হয়ে
দাঁড় করায়ে নিজের নিজের পরিবারকে।

‘দেশ’-এর মূর্ত্তনা, বর্ধার রিমঝিমের ওপর মূর্ত্তিত
হয়ে পড়ছে। গানটা বোকা গেলে বেশ হোত।
হিন্দী গান, মানে ধরতে পারে না। একরকম মন্দ
নয়, ধরতে পারেনা বলেই মনে হয় তার মনে যা সব
কথা উঠছে-নামছে যেন সেই সব দিয়েই ভরা।
‘দেশ’ গান হলোই—যদি না বাংলা হয়ে ম্পষ্ট হোল
মানোটা—তো ওর মনে হয় যেন অনন্ত বিচ্ছেদ,
অনন্ত হতাশা; যেন বহু দূর, সেই দীর্ঘপথে শুধু বৃকের
দীর্ঘশ্বাসকে পাঠানো ভিন্ন কোন উপায় নেই আর।

একদমর গানবাজনা গেল খেমে, আজকাল
যেমন হয়েছে—সবে এসে আস্তে আস্তে নিলিয়ে
যাওয়া। বাড়িটা স্বরূপ হয়ে রইল ঋনিকশণ।
বৃষ্টিটা খেমে গেছে, তবে সংলাপ ঋনিকটা ভেসে
আসছে, একজন পুরুষের গলা, ভরাট আর ভারী;
আর মনে হোল ছুটি বেয়ের গলা। ঠিক বোকা
যাচ্ছে না, তবে মনে হোল, আর গাওয়া না-গাওয়া—
এই নিয়েই হচ্ছে কথা, একজন বলছে—বৃষ্টি ধরে
এসেছে, এই সময় সরে পড়াই ভালো। কথার
মধ্যেই উঠে পড়ে তিনজনে এগিয়ে আসছে বাইরের
দিকে।...পুঙ্খ কণ্ঠে শোনা যায়—“চাঁটা ছাড়া
না, সুপা...এই তো হয়েছে দুঃখ, বিয়ে হোল তো
আনাদের নেয়েদের গান-বাজনা সব গেল ঘুচে,
একটু যে চেষ্টা করে...”

“খস্তি-হাতার তালের মধ্যে কতদিন থাকবে
টেঁকে, মাস্টারমশাই?”—একটা হাসি উঠল।
তারই মধ্যে বারান্দার বিজলি-বাতিটা জলে উঠল,
দোর খুলে তিনজনে বেহিয়ে এল।

মাস্টারমশাই অর্থাৎ গান-বাজনার মাস্টার
নিশ্চয়। তেতরে তবলার বোল, সেতরের ইঁ-টাং
চলছে তখনও, তাইতে এই রকমই মনে হয়।
মাক-বয়দী লোকটি কাঁচাপাকা চুল, একটু ভারী
শরীর, আগেই বেরিয়েছেন, বললেন—“বাং, এই
তো রিকশাও হাজির, আর দেরি করতে হবে না,
বৃষ্টিটাও খেমেছে।...যায়-গা রে?”

ওদিকটা ঠিক রেখে গেছে তড়িং, চুলের ছাঁটে,
ঝানিকটা মাজ-গোজেও, হঠাৎ বাঙালী বলে যে চিনে
ফেলবেই এমন নয়; রিকশাওলা, সূত্রবাং এদেশী—
এই বিশ্বাসটাই তো কাজ করে গোড়ায়।

একটা কুঠী ঠেলে আসছে;—কিন্তু না যাওয়ারও
তো কারণ নেই। একটা টোক গিলে তড়িং
বলল—“যায়গা, বাবু। কঁহা?”

জায়গাটা বলল একজন মেয়েই। একটু যেন
কিভাবে মুখের দিকে চাইল, তবে বৃষ্টিটা সরিয়ে নিল
তখন।

“বাদ্যগা।”

ভাড়াটা বাড়িয়েই বলল তড়িং, আগের সওয়ারীর মতো, যাওয়া না-বাওয়া—যা হয়।

ঐ মেয়েটিই আপত্তি করল—“ছ’না ভাড়া, একবারে বারো আনা হাঁকবে কেন? বৃষ্টি তো ধরে গেছে।

জামবর্ণ, ছিপছিপে গড়ন, একটু তীক্ষ্ণ গৃষ্টি। অপর মেয়েটি বলল—“তা চলুক, আবার যদি বৃষ্টি এসে পড়ে, তখন...”

কপালে সিঁদুর, গৃষ্টিটা আপনিই গিয়ে পড়ল তড়িংয়ের।

মাস্টারমশাইও সমর্থন করলেন—“হ্যাঁ, যখন বসতে পারবেনা আর, তখন বেরিয়ে পড়াই ভালো।...বারো আনা নেই, দশ আনা লেগা, যাও।”

আলো আলছে তড়িং, উঠে বসতে বসতে জামবর্ণ মেয়েটি অপরটির নিকটে চেয়ে একটু চোখ পাকিয়ে বলল—“সব ভাড়াটা। আজ তুই দিবি, সুপা...আমার ভাজে তো কেউ হাঁ করে বসে নেই, ডবল ভাড়া দেওয়ার কিছু ভাড়া ছিল না...”

—একটু নীচু গলাতেই, ওবে এমন কিছু লুকিয়ে-চুরিয়ে বলা নয়; আর বাংলাই তো।

বরাবরই বন-বসন্তী সহরের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। এদিক সামলে, ওদিকেও কান দেওয়ার বিশেষ কোন চেষ্টা না করেই তড়িং যা জানতে পারল তা এই যে ওরা দুজনেই এখানকার নিয়মিত ছাত্রী—সুপা বলে মেয়েটির নৃতন বিবাহ হয়েছে—এবার বাবে শশুরবাড়ি, মাস্টারমশাইয়ের কাছে বিদায় নিতে এসেছিল—দুখানি গানও গায়—(জামবর্ণটি আর একটু যেন ঘোঁষে গলা নামিয়ে বলল—“তোর গলা আরও মিষ্টি হয়ে গেছে...কি করে রে?)—শেষের গানটা, যেটা গেয়ে ওরা উঠে এল, গেয়েছিল এই মেয়েটি, যেটি জামা, ছিপছিপে; এজ্ঞাও নিজেই বাজিয়েছিল—মেয়েদের কলেজে পড়ে আই-এ ক্লাসে, নাম মল্লী—কোন নভেই বিয়ে করবে না—(বিয়ে আবার মাহুবে করে, সব খুঁয়ে-খাইয়ে?)

—গান নিয়ে কাটিয়ে বেবে জীবনটা—মানে, গানের সঙ্গেই বিয়ে আর কি!...এইবার হবে মুশকিল, সুপা চলল—কার সঙ্গে যে আসবে এবার থেকে, ভাড়াটাও পড়ে যাবে বৈকি প্রায় ডবল, একলার বাড়িয়ে—বরাবর সহরের মধ্যে দিয়ে রাস্তা, না-হয় সঙ্গী কেউ না-ই হইল—(তোর বর এসে এইখানে থাকুক, সুপা, সব দিক বেশ সামলে যায়; ইস, যুগ যুগ ধরে আমরাই গিয়ে শশুরঘর করব; মাহুবে নয় তো!)...

কথাবার্তার মধ্যেই আরও আন্দাজ পেল তড়িং যে, মল্লী মেয়েটির বাড়ি এখানে নয়, পরের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করছে।

বাজার পেরিয়ে একটা পাড়ার মধ্যে খানিকটা প্রবেশ করে তড়িংকে রিকশা থামাতে হোল, সুপা নেমে পড়ল।

কমালের গেরো খুলে পরমা বের করে দিতে যাচ্ছিল, মল্লী বলল—“পারছিস দিতে? তোর আন্দাজ! হো কম নয়!”

“বেশ, বেঁচে গেল আমার”—বলে সুপা ভাড়াভাড়া আবার গেরোটা বেঁধে নিল। হাতটা একটু একটু কাঁপছে।

“কাল ঐ সময় আসবি, মল্লী, বেরবার খানিকটা আগেই...ও বিশেষ করে বলে দিয়েছে তোর কথা...”

—মুহূর্ত কটা যেন বড় চড়া হুঁরে হঠাৎ বেঁধে দিয়েছে কে। উত্তর হোল—“বয়ে গেছে আসতে... বড় উপকার করেছেন জোড় ভাঙিয়ে টেনে নিয়ে বে...”

মুখটা ঘুরিয়ে চোখ-দুটো কমালে চেপে ধরল। “আসবি...নিশ্চয় আসবি...নেলে...”

হঠাৎ হুঁরে গিয়ে একরকম ছুটে-ছুটেই গेट ঠেলে ঢুক গেল সুপা। ও-ও নিশ্চয় নিজেই সামলাতে পারছে না। আরও খানিকটা গিয়ে একটা গेटওলা মাঝারি গোছের বাড়ির সামনে রিকশা থামিয়ে নেমে পড়ল মল্লী। [কথন:]

ডাক্তারের জীবনচিহ্ন

• ডাক্তার ডট্ট •

এখানে

অতি-নববয়স্ক একজায়ে শিক্ষকতার কাজ করবার পরে আমার চাকরিতে বদলি হবার সময় এলো। সরকারী চাকরির নিয়মই এই, কাউকে তারা স্থায়ীভাবে এক স্থানে রাখেনা, কিছুকাল কর্তিলেই এক স্থান থেকে অল্প স্থানে বদলি করে দেয়। আমার কাছে গবর এলো, এখান এখানে ছেড়ে অল্পস্থানে অল্প কাজে যেতে হবে।

কোথায় যেতে হবে? শুনলাম যে কলকাতা ছেড়ে কাড়গ্রামে, শিক্ষকের কাজের বদলে মহকুমা-ডাক্তারের কাজ। তাপে বেশিরিবের জঙ্গ নয়, মাত্র একমাসের জঙ্গ। সেখানে যিনি ডাক্তার আছেন তিনি একমাসের জঙ্গ ছুটি নিচ্ছেন, তাই একমাস তাঁর জায়গাতে আমাকে কাজ করতে হবে।

কিন্তু আমার কলকাতার প্রাকৃতিদের কি হবে? সে দিকের উপাভ্রম আপাতত আমাকে ছাড়তেই চলে। চাকরি বন্ধ হবার পরেই গেলে সবদিকেরই সুবিধা ভোগ করবো এমন বরাবর চলে পাবেনা। অগত্যা আপাতত আমার কলকাতার প্রাকৃতিস বন্ধ রাখতেই হলো। ডাক্তারখানাতে আমার জায়গাতে অল্প একটি বন্ধকে বসিয়ে রেখে আমি তন্নিতজ্ঞা বেঁধে কাড়গ্রাম দ্বার: করলাম।

কাড়গ্রাম তখন খুব জঙ্গল ভাঙাম। সবমাত্র একটি নতুন মহকুমা পরিগত হয়েছে। চারিদিকে বিরাট বিরাট শালবন, একপ্রান্ত থেকে অল্প দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। স্টেশনের কাঁজাঝি কতকটা দুই পর্যন্ত স্থান পরিষ্কৃত করা হয়েছে, তার মধ্যেই আছে আলোত, পোস্ট-অফিস, হাকিম মুন্সেফ ও ডাক্তারের বাংলো, খানিক দূর চোয়াটা একটি হালপাতাল, এবং ওরই মধ্যে বা কিছু লোকালং ও লোকালপাট। হালপাতালের পর থেকে শুরু হয়েছে জেবল শালবন। তার মধ্যে বহু দুই-দ্রাক্ষর চোয়াটা ছোটো এক-একটি গ্রাম। কাড়গ্রামে শেখানকার এক রাজার বাড়ি আছে, কিন্তু সে হলো স্টেশন থেকে অনেক দূর। রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ি খাতাঘাত করে, সাইকেলও চলে, কিন্তু তা ছাড়া সেখানে আর কোনো যানবাহন তখন হয়নি।

আমি হাবার সময় ভেবেছিলাম যে, না-জানি সেখানে আমাকে কতই পরিচয় করতে হবে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম,

যা মনে করেছিলাম তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজ বলতে কিছুই নেই। দাঁড়াবা ডাক্তারখানা একটি আছে। একজন কম্পাউন্ডারও আছে, কিন্তু তাৎক্ষণিক বিশেষ কোনো কাজ নেই। দুই দুই গ্রাম থেকে দুই-চারজন রোগী আসে, সামান্য সামান্য রোগের ওষুধ নিয়ে যায়। জায়গাটা বেশ স্বাস্থ্যকর, এমন কি ম্যালেরিয়া পর্যন্ত দেখানো নেই। যে ডাক্তারবাসুটি সেখানে ছিলেন তিনি আমাকে সব-কিছুর চাকি বুঝিয়ে দিয়ে বললেন—“কাজ কিছুই নেই, আসার জাগিয়ে চুপচাপ বসে থাক। আর অফিসারদের বাড়িও কারও অস্থর চলে দেখানো একটু সেখানেই করা। একটা মাস এখানে এইভাবেই থেকে যান, মনে করুন চোখে বেড়াতে এলোছেন। এখানে দুই-খি খুব শক্ত। আর অল্প দূর একটু দুর্গি বিলবে, যদি আগমনর তাতে কোনো আপত্তি না থাকে। আর আমি একটু ব্যয়নে করেছি, সেইসু দেখাবেন, যেন জলের অভাবে মত হয়ে না যায়। অফিসারদের সঙ্গে একটু ভাবসংসার করে নেবেন, সন্ধ্যার পরে তাঁদের এখানে গিয়ে আচ্ছা করবেন। আমিও তাই করতাম।”

কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম। একমাস এই ভাবে এই জমলের মধ্যে বাঁকলে শেষ পর্যন্ত ডাক্তারি-ই চলে বাবে। কিন্তু কোনো উপায় নেই, সরকারী চাকরি যখন নিষেধিত তখন সবকমই সহ্য হতে হবে।

দিন আর কোনামতে কাটতে চ্যাম। গাড়ির ডাক শুনে, আর জানলা দিয়ে আসার সূচকদের প্রথম অংশে এসে খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে যায়। বাংলা থেকে কেহিয়ে স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে বাই। কলকাতা-মাসী বোম্বে বেশ ঐ সময় শুধানে কয়েক মিনিটের জঙ্গ পাড়াতে। কলকাতার কোনো চিঠি বেবার থাকলে গাড়ির ডাকবাগলে ফেলে দিয়ে আসি। তার পর চোরে চোরে দেখি সন্ধ্যা-ভাঙা ঘরীরা জানলা দিয়ে ঘুম বাড়িয়ে আছে। ঘুমে তাদের আসার মিলনানকের ঝংসুতা। কেউ কেউ ওঘাটা আশেছে বিপাত থেকে, কেউ বা বোম্বেই থেকে, কেউ বা মাংসপুষ্-অল্প থেকে। সবলেই মাংসে কলকাতার। সেখানে রয়েছে ওদের শ্রিয়জনবদা, মতী হুয়েকের মধ্যেই ওরা তাদের কাছে পৌঁছে বাবে, তখন তাদের সঙ্গে আশাপ-অলোচন

ক'রে আনকের অস্ত্র থাকবেন। কিন্তু আমার ও-ট্রেনে ও-ট্রেনের কোনো উপায় নেই, কলকাতার আমার বাবার কোনো বাতাই নেই, এমনকার ঘাঁটি আগলে আমাকে এতদূর কাগ এখানেই বসিয়ে দেবে। একটি ধর্মনিষ্ঠাশ্রমণে গাড়ির ভেতরের কাছ থেকে একখানা পাউরুটি কিনে নিয়ে আমি বাসায় ফিরি।

বাসার আছে একজন চাকর আর ঠাঁহুনি। তারা তখনও ঘুমোচ্ছে। তাদের না জাগিয়ে আমি নিজেরি চৌকি জেলে চা টেবিলে ক'রে খাই।

বেশী হলে ঝড়াতুড়া হঠাৎ একবার ডাকারখানায় বাই। ঝড়াতুড়ার ঘনিষ্ঠ এখানে কোনোই দরকার নেই, আসকার ডাক্তারেরা দুটি-পাশাপাশি পরেই যেতেন। কিন্তু অভ্যাগাষ্টা আমি বজায় রাখতে চাই, সকালে প্যাট-কোট চড়িয়ে প্রতাহ বেয়েনোর সেই বহুদিনের অভ্যাগাষ্টা। সেখানে গিয়ে প্রতাহের বলে কাগজ পড়ি। দুটি-একটি রোষ্ট্রি যারা আছে, তাদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে ওখুঁষ লিখে দিই। আবার কাগজ পড়ি। বেলা এগারোটায় মধ্যে কাগজের বিজ্ঞাপনগুলো পর্বত সমতলই আগাগোড়া পড়া হয়ে যায়, কিছুই আর বাকি থাকেনা। তখন অগত্যা উঠে পড়ি, দীর্ঘ-স্বপ্নে বাসায় ফিরে আসি।

অগ্রণের নাওরা বাওয়া এবং ঘুম। কিন্তু কতই-না ঘুমোনা যাবে। কিছুক্ষণ বইটাই নিয়ে নাড়াচাড়া করি। বিকেল হলে চা খেয়ে আর-একবার বাই ডাকারখানায়। কিন্তু বিকেলের দিকে-অনগ্রাণীও সেখানে আসেনা। কিছুক্ষণ সেখানে ঘোরাঘুরি ক'রে আবার বাসায় ফিরে আসি। আবার এক কাপ চা খাই। এও একটা কাজ।

কিন্তু তার পরে কি বা করা যায়! সময় যে কিছুতেই কাটতে চাননা। বারে বারে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, কখন সাতটা বাজবে। সাতটা বাজলে অকস্মিক বায়রা নিজের আঙ্গা জমাবার মতো অবসর পাবেন, তখন তাঁদের এখানে গিয়ে হাজির হবো।

একদিন সেলাব হাকিম-সাহেবের বাংলাঘোটে। নিত্যন্ত অল্পবয়সী একজন আই.সি.এস., বোধ করি এই প্রথম একটি বহুতরার তারপ্রাণ হয়েছেন। বাতাসীয়েই ছোলে, কিন্তু বাতাসী বসেন খুবই কম, যেইখুঁষ বসেন সেইখুঁষ বাকা-বাঁকা। মুখে সর্বদাই গাইল লাগেনা থাকে, তারই পাশ থেকে ঠাঁত ঠাঁক ক'রে ট্রেট বেকিয়ে তিনি সামান্ত কিছু বসেন, কি বলছেন তারও অনেকখানি বোকা যায়না। হাকিমী চালুই বসায় রাখতে সব সবাইই সন্তুষ্ট, পাছে কিছু বেচাল হয়ে বায় সেদিকে সর্বদা নব্বত থাকে। তাঁর স্ত্রী আছেন

সঙ্গে। তিনি মুক্কা নন কিন্তু অভিজাতগণিতা, কৌচানো বতীন শাড়ি আর হিন্দু-তোলা জুতো প'রে এবং ঘষেই ঘষেবেজে সর্বজনই কিছুকটি হয়ে থাকেন। স্বামী চাড়া দ্বিতীয় কাগও সঙ্গে তিনি যেমননা বা কথা বসেননা। বিকেলে রোজ বাতায় সঙ্গে সাতাভ্রমণে যেমন, শালবনের ধার দিয়ে, ডাক্তারখানার আগপাশ দিয়ে। রোজই যেখতে পাই নিঃশব্দে তাঁরা বেড়াতে চলেছেন। মনে মনে ভাবি, নিচর এসেব মনের খুব দিল আছে, কথা বলার স্বকায়ই হয়না।

সাহেবের বাংলাঘোটে উপস্থিত হয়ে ২২ থেকেই তখনতে সেলাব, ডিতয়ে শিন্নানো বাজছে। হাকিম-গৃহিণী একা একা শিন্নানো বাতায় চলেছেন, বেহুতো বেতাল। বোধ করি নিজের টুং-টাং যথেষ্ট স্ত্রণবিত্তাস তনে নিজেই তিনি পরিতৃপ্ত হচ্ছেন। এদিকে সাহেব বসে আছেন বাইরের বাতায়কার, মস্ত দু-সেওয়া ডবল-বাতি আলো জেলে আছে তিনি কি একটা বই পড়ছেন। মুখে রয়েছে সেট পাইপ।

আমাকে সেখানে উপস্থিত হতে দেখেই তিনি বইখানি মুড়ে রাখলেন। তাঁর স্বকীর বাংলায় বললেন—“আহুন ডক্টর, কোনো জরুরী কেল?”

আমি বললাম—“তা কিছু নহ, আমি এমনিই আগন্ডায় সঙ্গে একটু আগাণ-পাগাণ করতে এসেছিলাম।”

“বহন বহন! আককের স্টেটসম্যান পড়বেন?” বলে তিনি কাগজখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

অগত্যা সেখানে বসে কাগজ পড়তে থাকলাম। তিনিও তাঁর বইখানি খুলে আবার পড়তে শুরু করলেন। বানিক বায়ে মুখ তুলে বললেন—“এক কাপ চা আনতে বলি?”

আমি বললাম—“নাপ করবেন, এইমাত্র বাসা থেকে খেয়ে আসছি।”

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। আবার তিনি একটি কথা বললেন—“আগন্ডায় বৃষ্টি কলকাতাতেই থাকা হয়?”

আমি বললাম—“হাঁ।” আবার তার পর চুপচাপ।

শেষ পর্বন্ত দেখলাম, তিনিও কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেননা, আর আমিও কি আগাণ করবো বুঝতে পারছিনা। কাজেই কিছুক্ষণ পরে আমি বললাম—“আজ তাহলে আসি।”

“আজ্ঞা, আহুন আহুন।”

এর পরে আর সেখানে বাওয়া চলেনা।

আর একদিন সেলাব প্রথম মুলোলের বাসায়। সেখানে গিয়ে দেখি খুব স্বাভাৱী দাবার আঙ্গা বসেছে। ইজন বাহন বলেছে, আর চারজন তাই খুঁবে বসে পরম আক্কেবর সঙ্গে

দেখছে। আমি যেতেই সবাই সচকিত হয়ে উঠলো। অভ্যর্থনা করে মূলেকবাবু বললেন—“এই যে ভাঙ্কার-সাহেব, আইন আইন! বাবা বেগা একটু-আটু আসে তো?”

আমি বললাম—“না, ভট্টা এখনও শিখতে পারিনি।”

“তা হোক, বসে বান এইখানে। দু-চারদিন দেখতে-দেখতেই পেগা হয়ে যাবে, তখন আবারই আপনায় কাছে হার মানবো। কিছুই না, একটু মনোযোগ দিলেই বুকেতে পারবে। ওরে, আরো এক কাপ চা নিয়ে আর—”

সেদিন হুই থকী বাবৎ বসে বসে খেলাই দেগলাম। কিন্তু ওতে আমার মন লাগলনা। পরের দিন আর গেলামনা।

একদিন গেলাম ভিত্তীয় মূলেকের বাসা। তাঁর এক বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। সে এতাহ সন্ধ্যার পরে হার্মোনিয়ম বাক্সের স্বরীজ-সঙ্গীতের কলরব করে, সত্তবত দর বাড়তে। মেয়েটির গলা কর্প, তার উপর গানের হয়েও অনেক তুল থাকে। কিন্তু তার সঙ্গীতপ্রিয় পিতা তাই শোনেন নুহ হয়ে, চোখ বুজে বসে। গানটি শেষ হলে তিনি চোখ খোলেন; বলেন, “আজ খুব ভালো গেয়েছিল, আর একখানা গা।” আবার তিনি-চোখ বুজে বসেন।

আমি যেতেই তল্লোক খুব অভ্যর্থনা করে বসালেন। বললেন—“এগেছেন—ভালোই হয়েছে, আমার বেয়ের দুখানা গান শুুন। গা তো সেই গানটা?”

গান শুনেত বসলাম। হার্মোনিয়মের উপর স্বরগিপির বইখানি খোলা হয়েছে, সেই বিকে চোখ রেখে মূলেক-কন্ঠা গচিংকারে পাড়া মাং করে গানের কথাগুলিকে নির্মমভাবে উচ্চারণ করে চলেছে—“কোন নব চকল ছন্দে মোর বীণা—”। তার মধ্যে দরদের কোনো নামগন্ধ নেই। গাইতে গাইতে মাঝে মাঝে আটকে বাজে, তখন সে স্বরগিপিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। আর হার্মোনিয়মে যদি-বা কখনো ঠিক হুটী বাজছে, কিন্তু গলার বা বনিত হচ্ছে সে তার থেকে অস্তরকম। গান কিন্তু তাতে বাধচেনা, সপ্রতিভ ভাবেই গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে চলেছে।

গানটি শেষ হলে মূলেকবাবু চোখ বুজে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—“কেমন শুনেলেন বসুন?”

আমি বললাম—“স্বংকার।”

“কেলি তো, গলা ডোর আছ ঠিকরে সেছে। আর একখানা গা।”

মেয়েটি তার স্বাংকালো কর্ত্ত আরো কলার দিয়ে বিভল উৎসাহে শুরু করলে—“আজি মদিন দুয়ার খোলা, এগবে

আবার বলন্ত এস।” এগা আমার পরিচিতি করতে লাগল, ভাঙ্কারদের পরিচিত অস্ত্র এগরকমের দর্শন-হুদারের কথা আর অস্ত্র একরকম বসন্তের কথা অস্ত্র হতে লাগল। তার পরে যখন “শিখল দুলের রেণু—” লাইনটা এলো, তখন একেবারে দম বন্ধ হবার উপক্রম, কেউ যেন আমারই টুটি টিপে ধরছে। তবাবি আশ্চর্য এই যে, নিত্যন্ত ভালোমাহুদের মতো নুহ করে আমি নিবিকার হয়ে বসে রইলাম। মাছুব কী না পারে!

আবার যখন শুরু করতে বাজছে তখন কিন্তু উঠে পড়লাম। আমি যখন উঠে আসি তখন মূলেকবাবু বিশেষ করে বলে দিলেন—“কাল আবার আসা চাই। ও-দর পাবার আচ্ছায় খবরদার যাবেননা, ওতে হাফুয়ের রসকম গুণিয়ে বাত, ফুটবুড়ি এসে বাত। একা একা বানাব থেকেই বা কি করবেন, এখানে এসে বরং হুটী ভালো ভালো গান শুনেত পাবেন। আর মেয়েটাও স্মৃতি করে গাইবে, প্রোতা। দু-একজন থাকলে গান জিনিসটা জমে ভালো।”

মূলেকবাবু এতাহই এমনি অল্পস্বপ্ন করতেন, স্ততমাং বাধ্য হয়ে এতাহই আমাকে ঐ গান শুনেত বেতে হতো। যেমন করে হোক, সম্ভটী তবু তো কেটে ধার।

এমনি ভাবেই হতো সেখানকার মেয়াদ আমার কেটে যেতো। কিন্তু কিছুদিন পরে এক চমৎকার দরবের কাজ হাতে পেরে গেলাম। ঠিক আমার মনের মতো কাজ।

একদিন সকালে অনেক দূরে প্রাথ থেকে গল্প গাড়িতে এক বীভৎস রকমের রোগী এসে হাজির হলো। তার একখানা ঠ্যাং একেবারে ক্ষত-বিক্ষত। বস্ত্র জাদুকে তার গোটা ঠ্যাং-খানাকেই চিড়িয়ে খেঁতলে দিয়েছে। চুলদিকের ক্ষতগুলি ঝাঁ করে ঝাঁক হয়ে আছে, সেগুলি রীতিমতো সেপটিক হয়েছে। উপরন্তু জাদুকে তার গাশেও দিয়েছে একটা আড়, গালের মাংগটা তুলছে। এই অবস্থার সনে রয়েছে প্রবল অস্ত, রোগী আরে ও বিহস্ত্রিগতে বেহুঁশ হয়ে আছে। তিন-চারদিন পূর্বে এই ঘটনা ঘটেছে, অবস্থা সাংঘাতিক হওয়াতে তখন তাকে এখানে এনেছে।

অবস্থা খুবই কঠিন। কিন্তু সত্য বলছি, এমন একটা রোগী পেরে মন আমার আনকে লাফিয়ে উঠল। যবে বসে বসে বই পড়ে আর মূলেক-কন্ঠার গান শুনে শুনে আমি স্মিট হয়ে উঠেছিলাম, এই শক্ত রোগীটিকে পেরে মনে হলো এবার আমি বেঁচে গেলাম। মনে বেজার স্মৃতি এসে গেল।

এমন সাংঘাতিক রোগীকে জু শুধু দিয়ে ব্যাওজ বেঁচে

কিভাবে দেওয়া যাবেন। হাসপাতালেই তাকে রাখতে হয়। কাছে গেলে চিকিৎসা করতে হয়। অথচ রোগীকে রাখবার হাত্রে কোনো বেড, পর্যন্ত সেখানে নেই। নতুন হাসপাতাল খোলা হয়েছে, তখনও পর্যন্ত তেমন কোনো ব্যবস্থাই করা হয়নি। তাই লেগে কি করা যায়! কম্পাউণ্ডারকে বললাম, কোথায় থেকে একটা খাটটা ক্রোয়াড় করে আনো, ওকে আমি এখানেই রাখবো। ওর এখনই অপারেশন করা দরকার, নইলে ও বাঁচবেনা। আর অপারেশনের পরেও ওকে আমাদের নক্ষত্র রাখতে হবে। এখানে ওকে না রাখলে তো চলবে না। তার ব্যবস্থা করতেই হবে।

কম্পাউণ্ডারও ছিল উৎসাহী। সে তখনই কোথা থেকে এক খাটটা এনে হাজির করলে। সেও করার মতো কিছু কাজ পেরে গেল।

আমি বললাম—“আগে ওকে অপারেশন-টেবিলে নিয়ে চলো। যন্ত্রপাতি বা কিছু আছে সবস্তু ঠোঁড় জেলে কেরিগারীজ করতে লাগে। তার পর দেখা যাক কতদূর কি করা যেতে পারে। ক্রোয়াডার্শ আছে তো?”

সে চার আউন্সের একটি বোতল বের করলে। তার থেকে আখ্যানা জিনিস উঠে গেছে, আখ্যানা যার ভরা আছে। আমি বললাম—“ওতেই হবে।”

তার পর যন্ত্রপাতির খোঁজ নিলাম। তা বোতামুটি সব বহুমের হয়ে রয়েছে, আর সবই মজুন, কোয়ামিন তার ব্যবহার হয়নি। আমি সেগুলিকে ভালো করে কোঠাতে দিলাম।

তোড়কোড় করতেই আর দু'ঘণ্টা কেটে গেল।

সমস্ত প্রস্তুত করে নিয়ে কম্পাউণ্ডারকে বললাম—“এবার তুমি ক্রোয়াডার্শ দিতে শুরু করো।” কিন্তু ক্রোয়াডার্শ দেবার কোনো বস্তু সেখানে নেই, আর কেমন করে ক্রোয়াডার্শ দিতে হয় তাও সে জানেনা। তখন আমি বোটা ধার ছিঁড়ে কাগজের এক টোকা বানালাম, তার মধ্যে খানিকটা তুলো ভরে দিলাম, তাইই মধ্যে একটু একটু ক্রোয়াডার্শ ঢেলে তুলো ভিজিয়ে সেই টোকা সমস্ত নাকের উপর ধরে রাখতে বললাম। তাকে বলে দিলাম যে, তুলোয় ক্রোয়াডার্শ গুটিয়ে এসেই আবার তা ভিজিয়ে নিতে হবে, যাতে গ্যাসটা বখাবরই নাকে চুকতে থাকে। তাই সেই রোগী অজান হয়ে থাকবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগী অজান হয়ে পড়ল। তখন আমি একে একে কতখানগুলি চিরতে শুরু করলাম। বনে করেছিলাম যে, খানিকটা করে চিরে গিলেই ক্ষতের ভিতর থেকে পুঙ্খনস্তুগুলো ছেঁন হয়ে বেরিয়ে যাবে, তার

পরে গজ ভ'রে ব্যাগেজ বেঁধে গিলেই চলবে। কিন্তু বা দেখলাম তাতে আবার চক্ষুরি হয়ে গেল।

সেখানেই চিরি, তারও উপর দিক থেকে গুলুগু করে পুঙ্খনস্তু গড়িয়ে আসতে থাকে। আবার যদি তার উপরে চিরি, তবে তারও উপর দিক থেকে ঐভাবে গড়তে থাকে। টেবিলের নীচের বালতি সেই পুঙ্খ নস্তু প্রায় ভরে উঠল, কিন্তু তবু তা জুগেবার কোনো লক্ষণ নেই। যেন কোথায় একটা ভর উৎস সৃষ্টিয়ে রয়েছে, সেখান থেকেই অবিরল স্রোত বরছে। সেই উৎস পর্যন্ত না পৌঁছতে পারলে কিছুই লাভ হবেনা। আমি লম্বা এক দৌলপলাকা ডিতরে চালিয়ে দিয়ে সেই উৎসের প্রান্তসীমা অহুলস্থান করতে লাগলাম।

লম্বাটা হাঁটুর উপর দিক পর্যন্ত চলে গেল। অগত্যা সেখানেও আমি খানিকটা চিরে ফেললাম। তখন তার ভিতর থেকে ইকরো-ইকরো হাড় বেরিয়ে আসতে লাগল। বুজলাম যে, ভালুকই হাঁটুর হাড়গুলোকেও চিবিচ্ছে, সেখান থেকেই ইকরো-ইকরো আসছে।

এ অবস্থায় ঠ্যাং-টাকে বজায় রাখা চলবেনা, কোট বাদ দিতে হবে। হাঁটুর উপরে অ্যাম্পুটেশন করতে হবে। তা ছাড়া উপার নেই।

এতবার আবার মনে ভব হতে লাগল। অ্যাম্পুটেশন করতে দিয়ে যদি কোনো শিরা কেটে ফেলি এবং তা পুঁজ না পাই! মনে পড়ে গেল কনল চ্যাটার্জীর কথা। হুব মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে হবে, কারণ এখানে এমন কেউই নেই যে আমাকে সাহায্য করতে ছুটে আসবে।

আমি মনে করলাম, হাঁটুর উপর বখাব-টুনি কেটে দিয়ে বেঁধে বাসগুলো আগে একটু একটু করে সেটে বির প্রস্তুতি বুঁজ বের করে, সেগুলোকে একে একে বেঁধে ফেলি। অতঃপর ভাই করতে শুরু করলাম। তাতে অনেকটাই সরল সেলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে দেখি রোগী হাত-পা নাড়তে শুরু করেছে, মুখ পৌ-পৌ শব্দ করছে।

কম্পাউণ্ডারের দিকে চেয়ে বললাম—“একি হচ্ছে, ওর যে জ্ঞান কিরে আসছে, ক্রোয়াডার্শ আর ঢালোনি বুকি?”

“ক্রোয়াডার্শ আর কিছু নেই, সব তো গুলিয়ে গেল।”

কি সর্বনাশ! ও বস্তু শেরেছে কমাগত জেলেই সেছে, মনে ভেবেছে বস্তু কোঁ ক্রোয়াডার্শ ঢালা যাবে তত বেশী অজান হবে। একটু একটু করে ঢালালে অনেকখান পর্যন্ত চলেতে পারতো, কিন্তু তা ওকে বলে দেওয়া হয়নি।

এখন কি করা যায়। এখনও আসল কাজ-ই বাকি।

হাঙ্গুনা কথাত দিয়ে কাটতে হবে। কিন্তু এ অবস্থায় তা করতে গেলে ওর গুরোপুত্রি জান দিয়ে আসবে, হয়তো টেবিল ছেড়ে লাক দিয়ে পড়বে। অথচ ইতিমধ্যে বাসগলো কেটে কাঁক ক'রে দেওয়া হয়েছে, চিড়-খাওয়া হাঙ্গুনা বেহিমে পড়েছে—এখন তাগে কেটে কেলেহেই হবে, যেমন ক'রে হোক।

অতঃপাশ্চাত্যে এক উপায় আবিষ্কার করলাম। তাড়াতাড়ি ডবল মাত্রার একটা মফিয়া ইনজেকশন দিয়ে দিলাম। ক্রোয়েকর্ষের নেবার উপরে নক্ষিয়ার নেপাতে নিচ্চর খানিকটা ঘুমের ডাব এসে পড়বে। তার পর হাসপাতালের চাকর ও বেধরকে হুদিক থেকে রোগীকে চেপে ধরতে বলে আমি হাঙের উপর বেগরোয়া করাত চালাতে শুরু ক'রে দিলাম।

তখন দেখলাম চেপে ধরার কোনো দরকার ছিলনা। রোগী বিশেষ কিছু গওপোল করলেনা। সে চূপচাপ করে রইল, আর মাতে মাতে চোপ বেলে এলিক ওলিক চাইতে লাগল। হাঙে কোনো অস্বস্তি-ব-কি ছিলনা বলেই হোক, কিংবা স্থানীয় নার্সগুলো খেঁতলে মাড়ে হয়েছিল বলেই হোক, কিংবা নেবার গ্যারেই হোক—সে যেন বুকেই পারলেনা যে তার পায়ের হাড় কেটে ফেলা হচ্ছে।

বিনা বাধায় অ্যাসুটেশন শেষ ক'রে আমি হাঙের কাটা প্রান্তটা বাঁধ দিয়ে ঢেকে দিলাম, আর স্বতঃস্ফূর্তি আধাআধি ডাবে সেলাই ক'রে দিলাম। ভিতর থেকে হস রক্ত প্রকৃতি বেরিয়ে বাবার জন্ত যথেষ্ট কাঁক রেখে দিলাম। শেরকালে তার উপর ফুলে-গাওয়াও করিয়ে দিলাম।

এতক্ষণ পর্যন্ত রোগী কোনোই আপত্তি প্রকাশ করেনি। কিন্তু যেমনি পায়ের ঝিক ছেড়ে তার ফুলে-গাওয়া গালের মাংসটা সেলাই করতে গেলাম, অমনি সে প্রবলভাবে আপত্তি করতে লাগল, সঙ্গেসঙ্গে মাথা ঝঁকাতো থাকল। অগত্যা জোর করে চেপে ধরে আমাকে কোনোরকমে সে কাজ সাহজে হলো। তা ছাড়া কোনো উপায় ছিলনা।

কিন্তু এতখানি ধকলের পরে রোগী একবারে নিজীবের মতো হয়ে পড়ল। নক্ষিয়ার প্রভাবে সে অচেতনের মতো পড়ে রইল চলে, কিন্তু নাড়ির গতি কীণ হয়ে এলো। আসে অর ছিল, নাড়ির গতি ক্রান্ত ছিল, কিন্তু এখন আর অর নেই, সর্গিক খেমে উঠেছে। এক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে স্কোজ ইনজেকশন দেওয়া দরকার, কিন্তু কোথায় পাবো স্কোজ! আমি এক বোতল সেলাইন প্রস্তুত করলাম, এবং তার সঙ্গে কিছু উত্তেজক ওষুধ মিশিয়ে শিয়ার মধ্যে খুব ধীরে ধীরে প্রয়োগ করতে থাকলাম। একঘণ্টা বাবং

সেলাইন দিতে থাকার পরে রোগীর নাড়ি বেশ বলল হয়ে উঠল।

যখন সেলাইন দেওয়া শেষ ক'রে উঠে ঈড়িয়েছি তখন দিনের আলো জান হয়ে এসেছে, অপরাহ্ন পার হয়ে গেছে। তখন হতে পড়ল সারা দিন কিছু খাওয়া হয়নি, আবারও না, কম্পাউটারেও না। কিন্তু তবুও এমন অবস্থায় রোগীকে কেলে সবাই চলে যাওয়া দায়ন। যাত্রেই বা কে ওকে দেখবে?

রোগী একজন জোয়ান বাহুব, ওর দুটো বাপ এসেছিল সঙ্গে। সে এতক্ষণ পর্যন্ত হাসপাতালের সাহনে গাড়েতলায় বসে ছিল। তাকে এমন কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে থাকতে রাজী আছে কিনা। সে বললে, হাত্রে দে রোগীর কাছেই থাকবে। আমার কম্পাউটারও বললে যে সেও ওখানে থাকবে, দরকার হলে আমাকে ধরবে দেবে।

সেদিন সারা দিন খাওয়াও হয়নি, আর ঈড়িয়ে ঈড়িয়ে পরিশ্রমও হয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু তাতেও আমি কিছুমাত্র ক্লান্ত হইনি। মনের মধ্যে খুব একটা ক্ষুধার ভাব নিয়ে শিব দিতে দিতে আমি বাসার ফিরলাম। এতদিনে কিছু কাজের মতো কাজ শেষে গেছি এনা তা সার্থকভাবে সম্পন্নও করছি। কিন্তু মনের মধ্যে কোনো অহংকার বোধে, শুধুই সাক্ষ্যের সার্থকতা। এমন সাক্ষ্যের বললে আরো অনেক কিছুই হতে পারতো। রোগী যেমন মারাত্মক অবস্থায় এসেছিল, অপারেশনের সময় টেবিলের উপরেই সে মারা যেতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। কোনে: শিরা কেটে প্রচুর রক্তপাত হতে পারতো, কিন্তু তাও হয়নি। ক্রোয়েকর্ষ ক্ষুধির বাবার পরে বাকী কাজটুকু শেষ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারতো, কিন্তু তাও হয়নি। বা কিছু আমার করণীয় ছিল তা সৌভাগ্যবশত গুরোপুত্রি করতে পারা গেছে। অপারেশন সাক্ষেস্ফুল। এতেই মন আমার আনন্দে ডরে উঠল। সাধের অতিরিক্ত একটা কাজ আমার দ্বারা আজ হতে পোহেছে, এতেই আনন্দ। এখনও বেশ মনে আছে, বাসার বেয়ারা পথের পাশে ছিল ক্ষুধির বন—আমর সন্ধ্যার দক্ষিণ-বাতাসে সেখান থেকে ভেসে আসছিল কুম্ভিক-কুম্ভের ভারি মিষ্টিবুকের একটা উতলা। হুবাস—আমার মনের আনন্দ তাতে যেন আরো বেশে ভরপুর হয়ে উঠল। অস্তরীক থেকে কেউ বেন আমাকে একটা অপূর্ণ সার্থকতার জন্ত আশীর্বাদ পাঠাচ্ছে! যেন জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমার দ্বারাও জগতের কিছু ভালো কাজ হতে পারে। সে অস্বস্তি আনক কেবল নিজে-নিজে টের পাওয়া যায়, অপর কাউকে বোকানো যায়না।

পরের দিন সকালে বিজ্ঞানীরা তার জ্বর এসে গেছে, জ্বরের ঘোরে সে আনন্দ নিরস্ত। তা হতো হবেই। একে অশ্রুপাশে ঘেরে প্রতিদিন, তার উপর হস্তের মধ্যে বিরাট জীবাত্মের সৌন্দর্য্য প্রতিভা। এখন ওর হাত থেকেই রোগীকে রক্ষা করতে হবে। সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি।

তখনকার দিনে সেপ্টিক জীবাণুদের বিরুদ্ধে সালফা গ্রন্থ ওষুধটির আবিষ্কারই ঘটনি। আমাদের দল ছিল কেবল অ্যান্টি-সিরাবের দ্বারা চিকিৎসা করা, আর জীবাণু-নাশক হিসাবে কতকগুলি অ্যান্টিসেপ্টিক ওষুধ প্রয়োগ করা। ডাণ্ডারাম ওধানকার স্টকে কয়েকপ্রকার অ্যান্টি-সিরাব সঞ্চয় করা ছিল। আমি সেগুলি পুরা মাত্রাতেই প্রয়োগ করতে থাকলাম, আর সেই সঙ্গে শিরার মধ্যে প্রত্যহ জ্বরের ক'রে অল্পমাত্রাতে আইওডিন ইন্জেকশন দিতে থাকলাম। এ ছাড়া ড্রেস-করা প্রভৃতি সমস্ত নিজের হাতেই করতাম। আমি দেখলাম ওখানে মাছির খুব উপদ্রব। কতখান ব্যাগেজ করা থাকলেও, তার উপর মাছি বসলে নতুন কিছু বিশৃঙ্খলক সাক্ষ্য ঘটতে পারে। আমি তাই নিজের বিছানা থেকে মত একখানা চামর এনে তার আশপাশের চাকা দিয়ে রাখলাম, আর তার বাপকে বলে দিলাম তালের পাখা দিয়ে যেন সর্বদাই মাছি তাড়াতে থাকে।

পাখির ব্যবস্থাও আমাকেই করতে হলো। ওরা আর ওখানে কোথায় কি পারে? নিজের বাসা থেকে ছুই বেলা ছুদ-বাগি প্রস্তুত করে পাঠাতাম। মুহুরির শুকনো তৈরি করে পাঠাতাম। স্টেশন থেকে সর্বশক্তি লেবু সংগ্রহ করে তার রস প্রস্তুত করে পাঠাতাম। তখনও ওর কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা শার্কীয় ছিলনা।

এই একটিমাত্র রোগীকে নিয়ে আমাদের সত্যাকন্দই ব্যস্ত থাকতে হতো। কেবল ওরই কথা চিন্তা করছি—কিনে ওকে চাকা করে তোলা যায়, কিনে শীত আরাম করা যায়, ক্ষতের মধ্যে কোন কোন ওষুধ প্রয়োগ করলে তাড়াতাড়ি ঘ। শুকিয়ে আসতে পারে, কিনে ওর জীবনীশক্তি ফিরে আসে।

কিছু আশ্বর্ষ্য ঐ স্থানীয় আদিবাসী লোকের নিম্নেই বাতাবিক জীবনীশক্তি। সে যেন আপনাকে থেকেই সেরে উঠতে লাগল। আমি যেহুঁহু সাহায্য তাকে দিতে পারছিলাম তাতেই তার পক্ষে যথেষ্ট হলো। দিনে দিনে সে হুহু হয়ে উঠতে লাগল। তিন-চারদিনেই জ্বর ছেড়ে গেল। কত-গুলিও ক্রমশ লাল হয়ে শুকিয়ে আসতে লাগল। কলকাতার হাসপাতালে কখনই এত শীত যা শুকোতে দেখিনি।

কয়েকদিন পরে তাকে ভাত খেতে দিলাম। ভাত খাবার সত্ত্বে সে খুব জোর ত্যাগা লাগিয়েছিল। তার বুড়ো বাপটাও বসছিল যে—ভাতই ওদের সকল ব্যায়ামের পথ, ভাত না খেলে ওদের কোনো রোগই সাধে না। ভাত দেখে তার কী আনন্দ! অরে-ওরে নর, উঠে বসেই সমস্ত ভাত খেয়ে ফেললে, একটি দানাও ফেলে রাখেনা।

যা শুকিয়েছে সেখান অল্পদিনের মধ্যেই কতখানার সেলাই কেটে দিলাম। আরো কিছুদিন ওখানে রেখে তাকে সৌহৃদ্যটিক টনিক ওষুধ খাওয়াতে লাগলাম।

কিছু ইতিমধ্যে আমার চাকরির মেয়াদ জুঝে। সেদিন আগেকার ডাক্তারবাবু ফিরে এসে আমার কাছ থেকে চার্লস লোক, সেদিন তাকে টুটি দিয়ে দিলাম।

তার দেহের কয়েকটি মাপ নিয়ে রেখেছিলাম। কলকাতায় ফিরে এসে তার জন্যে একটি কার্টের পা আর একটি কাছ তৈরি করিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। [ক্রমশ]



ছিট-ফোর্ট

• ** চারুচন্দ্র ওড়াকার ** •

উডট জ্যাক

সমস্তাপূরণ

মহারাজ বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে এই সমস্তাটি পূরণ করতে দিলেন।—

অইম্যা: পরতত্তিবির্ম নবমী সা পৌর্ণমাসী তিল ।

অষ্টমীর পর নবমী হল না, একেবারে পূর্ণিমা হল ।

মহাকবি কালিদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন।—

সাম্বৎসচ্ছিমহোৎসবে বসিষট্যারক্ৰোৎসবটাবারনামং
সৌহিত্যেন ধরাধরাকবুবি সোচ্চারঃ স্মিগন্ত্যাং শিবঃ ।

চুড়াক্ষরনভঃপলেনুশিলনে নীরন্তু 'হা সখ্যেটাধু—

'অইম্যা: পরতত্তিবির্ম নবমী সা পৌর্ণমাসী তিল' ।

সন্ধ্যাবেলায় সন্ধিপূজায় মহারাজা অনেক বলিরক্ত পান করলেন ; বমনের উল্লেখ হওয়াতে যেই তিনি মাথা নাড়লেন অমনি তাঁর কপালের অর্ধচন্দ্রে ঠিকরে গিয়ে আকাশের অর্ধচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হল, উভয় মিলে পূর্ণচন্দ্র হয়ে গেল ; সুতরাং অষ্টমীর পর পূর্ণিমা দেখা দিল ।

বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে পূরণ করতে বললেন।—

তদা মধ্বমন্তকে ভগবৎ পরমঃ ধর্মঃ ।

মহুরের মন্তকে থেকে সাপ গর্জন করতে থাকল । কিন্তু এ কি ক'রে সম্ভব ? মহুর তো সাপের চিরশত্রু ও ভক্ষক ।

কালিদাস এই ভাবে পূরণ করলেন।—

যদা তু ভানবীপতে ভূচ্ছন বতিতং ধন-
স্বদা নগাঃ প্রদম্পিতাঃ স্তম্বেকমলতালয়ঃ ।
ভয়াং ভবাত্তোভবৎ ভগবত্ভ্যক্ পবতম-
'অদা মধ্বমন্তকে ভগবৎ পরমঃ ধর্মঃ' ॥

ঐরামচন্দ্র যখন হরধম্ম ভাঙলেন তখন শ্রমেত মন্মর সব বেঁপে উঠল । কাতিক ভয়ে মহুর নিয়ে শিবের কোলে লুকালেন । শিবের মাথার সাপ মহুর দেখে ভয়ে গর্জন করতে থাকল ।

বিক্রমাদিত্য এই চরণ পূরণ করতে দিলেন।—

চৌরেণাপহৃতং সর্গং বিনা নাসাম্যমৌক্তিকম্ ।

নাকের মুকুটা ছাড়া চোর আর-সব চুরি করে নিয়ে গেল ।

ভববৃতি এই ভাবে পূরণ করলেন।—

নিভ্রায়াশ্চলয়েণী ধসং ভগিমগিজম্বাঃ ।
'চৌরেণাপহৃতং সর্গং বিনা নাসাম্যমৌক্তিকম্' ॥

রমণী নিজা বাজে, বেকীটা নাকের ডগায় এসে শেব হয়েছে, কোন্ কোন্ ক'রে বাস পড়ছে ; নাকের মুকুটকে সাপের মাথার মণি মনে ক'রে চোর ভয়ে সেটাকে নিল না ।

কালিদাস বললেন, ও হল না । সাপের মাথাটা মোটা, লেজটা সূত্র । নাকে যে অংশ

শেষ হয়েছে ওটা লেজ, মাথা হতে পারে না। তিনি এই ভাবে পূরণ করলেন।—

অপরাজিতায়াঃ মুক্তাভরতঃ ।

‘অপরাজিতাঃ সখা বিনা নাস্যায়মৌক্তিকম্’ ॥

অথের লাল রঙের প্রতিফলনে মুক্তার তলটা লাল দেখাচ্ছে, চোখের কাজলের প্রতিফলনে উপরটা দেখাচ্ছে কালো। মুক্তাটা একটা কুঁচের মতো দেখাচ্ছে। কুঁচ আর কি নেব ব’লে, চোর ওটা ছাড়া আর-সব নিয়ে গেল।

৪

রবে: কবে: কি: সমস্ত সারঃ

কবেত্বঃ কি: কিমন্তি ক্কা:

সদা ভয়ঃ চাপাভয়ক বেধাঃ

ভীতবীতীঃসমাজিতানাম্ ॥

ম্লোকটির প্রধান তিন চরণে সাতটি প্রস্ন আছে ;

আর এই সাতটি প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাবে শেষ চরণটিতে। শেষ চরণটি বিশ্লেষণ করলে এই রকম পাড়ায়,—

ভা: + সী: + রথী + ঐতি: + রসম্ + আজিতানাম্

রবে: সারঃ কিং—ভা: (কিরণ)

কবে: সারঃ কি—সী: (বাণী)

সমস্ত সারঃ কিং—রথী (যোদ্ধা)

কবেত্বঃ কিং—ঐতি

[ঐতি—ছয়টি শব্দবিয়, তার। হল—

অভিগৃহীতবাহুঃ পলভামুখিকা: ধগা: ।

প্রত্যাপদ্যে রাজান: বক্তো ঐত্বঃ বৃত্তা: ॥]

ক্কা: কিং অস্তি—রসম্

সদা ভয়ঃ চ কেধাঃ—আজিতানাম্

সদা ভয়ঃ চ কেধাঃ—(সমস্তটা একত্র করে)

—ভাগীরথীতীরসমাজিতানাম্ ।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে সরস্বতী

ঐনরেস্তনাথ বাগল

বৈদিক যুগে সরস্বতী যজ্ঞাদি শত-বলি অছড়ানোর ভিতরে সর্বপ্রথম পূজা লাভ করিলেন। তারপর তাত্ত্বিক সাধনার, অহিংস বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মে বিভিন্ন নামে পূজিতা হইতে লাগিলেন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পর ভারতবাসক করুণা, প্রেম ও মৈত্রী সাধনার বিস্তার দেখা দিল, সেই বিস্তারে ভারতমাতার বাক্যের সম্পদ করুণা, প্রীতি ও মৈত্রী গদিত্য, করিত হইয়া প্রোতাবহা হইল। ‘ভারতীর করুণা-সংপূর্ণ জ্ঞান ও প্রীতি তিস্ত, ব্রহ্মবেশ, চীন, জাপান, সিংহল, মালয় ও ব্যবসীয়ে ছড়াইয়া গড়িল। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের অগণ্য সন্তান ভারতীর জ্ঞান-পীুষ্প-পানে ধস্ত হইল। ভারতের দেবী সরস্বতী সমগ্র এনিয়ার বৌদ্ধধর্মে পূজিতা হইতে লাগিলেন।

বেদাম্লোকে সরস্বতী

বৈদিক ঋষিগণ বিশ্বব্রহ্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিতে করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন যে—“প্রজাপতি ঐ ইদম্ আসীৎ

—তস্ত বাক্ বিতীর আসীৎ”। অর্থাৎ প্রলয়কালে বিশ্ব বধন বয় ছিল, তখন একবারে প্রজাপতি ছিলেন। তিনি ভীষ্মারষ্ট শকিতে বাক্রপণে বিতীর হইলেন। তারপর প্রজাপতি কামনা করিলেন—“একোঃ বহুশ্রাম্” ; এক হইতে আমি বহু হইব। এই কামনায়ই বিশ্বশষ্টি হইল। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ইহাকে অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—“ন তদা বাচা তেন আত্মনা ইদং সর্বম্ অদ্বকত যদিৎ”। তদ্বৎসি স্যামানি ছন্দাশি যজ্ঞান প্রজা: পশুন:—এই জগৎ-সৃষ্টির কারণে প্রজাপতি এবং ঐহার শক্তি ‘বাক্’ই প্রথম বেদজ্ঞানে বাইব-সরস্বতী বা শব্দব্রহ্ম হইলেন। ঋগ্বেদের ঋষিগণ বলিলেন—ইজাদি শব্দান্ত্রিধা: বহির্মুখ্যস্তি: ॥ অর্থাৎ ইজা, ভারতী ও সরস্বতী যজ্ঞাদির তিন মূর্তি। ইজা বিশ্ব-সম্পর্কিত দেবী। ভারতী—আদিভা (জগৎই আদিভা বা দূর্ব)-সম্পর্কিত

সেবী। সপ্তমতী—আতিথ্যের উল্লেখ—কালোকেব সেবী।

অগ্নিগণ পুনরায় বাইথ-সপ্তমতীকে অধিকার প্রাপ্য করিয়া 'গুহ্যকপিণ্ডি' শক্তি বলিলেন। এই গুহ্যকপিণ্ডি বাস্ক শক্তি চণ্ডিপ্রকার। ইহার ভিতরে তিন বাস্ক মানব-জগৎয়ের নিরালা স্থানে অব্যক্ত; চতুর্থ বাস্ক যথা মানব কথ্যাব্যক্তি বলে। বৈদিক ঋষি উচ্য-পুত্র ত্রিষ্টুপ-ভাস্ক বলিলেন—“চতুর্থি বাস্ক পরিমিতা পরমি তামি বিহুত-জ্ঞাপ্য বে মনোবিগ্ণ। গুহ্য জীপি নিহিতা নেত্রযন্তি তুরীয়া বাচো মহত্যা বহুজি”। এই চতুর্থি বাইথ-সপ্তমতী মানবের অমর-জগৎয়ের অবস্থিত; যথা—জাগ্রত, স্বপ্ন, অস্থি ও তুরীয়া (৪র্থ)। এই চতুর্থবাস্কশক্তি সাহায্যে মানব ঈশ্বরভোগ করে। ইহার সাধনাই বাইথ-সপ্তমতীর সাধনা।

চতুর্থি বাইথ-সপ্তমতী বা শব্দরাজ যথাক্রমে—বৈদ্য, মধ্যমা, পত্রি, পরাবাস্ক।

১। বৈদ্য বাস্ক—ইহার সাহায্যে মানব কথোপকথন করে। বৈদ্য বাস্ক জিহবার শক্তিদান করে। শক্তির উৎস জ্বর; এই জ্বরই ব্রহ্ম। জ্বর হইতে এই বাস্ক জাত বলিয়া, অগ্নিগণ বৈদ্য বাস্ককে ব্রহ্মসত্তা বলেন। তারপর এই বাস্ক জ্বর হইতে জন্মিয়া মনঃসত্ত্বিনী ইহা আহার সাহায্যী হয় বলিয়া, অগ্নিগণ বৈদ্য বাস্ককে ব্রহ্মসত্তাও বলিয়া থাকেন।

২। মধ্যমা বাস্ক—অপ্রাণবায়ু যে শক্তিসত্তা ঈশ্বর চালিত হয়, সেই বাস্ক 'মধ্যমা'। প্রাণমধ্য হইতে জন্ম বলিয়া 'মধ্যমা' নাম। প্রাণই বিজ্ঞান বা শক্তি। অতএব মধ্যমা বাস্ক 'বিজ্ঞান'।

৩। পত্রি বাস্ক—চেতনার ঘনীভূত মানবায়ার শাস্ত্র অমৃত আত্মকে অগ্নিগণ 'পত্রি বাস্ক' বলেন। চেতনাময় মানবায়ার কল্পতাপে তপ্ত থাকিয়া মানবকে সচেতন রাখে। সেইজন্য 'পত্রি বাস্ক' কল্পশক্তি।

৪। পরাবাস্ক—চেতনাময় মানবায়ার মল-মুক্ত আত্মকে অগ্নিগণ পরাবাস্ক শক্তি বলেন। এই পরাবাস্ক জ্ঞানচেতনার বহু থাকে। এই বহু তামসময়ী আহার মানব তুরীয়া বা চতুর্গুণন ব্রহ্ম রক্ষণ করে। ইহা মানব-সেবকের হৃদাধার (গুহ্যকপিণ্ডির অন্তর্গতী হৃদ-অঙ্গুরির মধ্যে) হইতে বিকাশ পায়। পরাবাস্ক হৃদাধার হইতে বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া জ্বরদের নির্গত অমৃতভূতির শব্দজ্ঞানের সাড়া জাগায়। অতএব 'পরাবাস্ক শক্তি' শব্দময় বা নাগাধিক।

পরাবাস্ক শক্তিই মানবের মল-মুক্ত, বহু জ্ঞানের গুহ্য-প্রাতিমতী সাধিক গুণের বাইথ-সপ্তমতী। অগ্নিগণ সাধনাময় বিভিন্ন স্তরধর্মিত ব্রহ্মসত্তা লাভের জন্য 'বাইথ-সপ্তমতী'র সাধনা করিয়া জীবজন্তি লাভ করেন। পরাবাস্ক শক্তির বলে মানবায়ার অনাহৃত বস্তু গ্রহণ হুংবে, বড়কে, নিম্নে, রাগে, অহরাসে, কড়িতে, কোমলে আশ্রয় নিমিত্ত উঠে। এই বাইথ-সপ্তমতী চতুর্থি কল্পার অধিগতী। উপরি-উল্লিখিত চতুর্থি বাইথ-সপ্তমতীই বেদাঙ্গোকে প্রজ্ঞাপায়িনী। ঐ চিত্তরী নিম্নাকার শক্তির সাধনা কামমূল্য মানব সূক্ষ্ম কড়িতে পড়ে না; তাই চিত্তময় ভাবসাধনার গুণধর্মের প্রতীক যথা প্রতিমা গড়িয়া দেবী সপ্তমতীর রচনা মানব করিয়া থাকে। যাকিওম পুরাণে দেবী-নাগাচো এই শক্তিকে পুনরায় মানব-চরিত্রের তমঃ, ব্রহ্ম ও স্বয়ং এই ত্রিভুগুণের তিন দেবতা বলিয়া করিয়া অর্চিত হইল। তমঃ—আলস্য, তড়তা ও তমসাত পূর্ণ; অতএব তমঃ শক্তির দেবী ব্রহ্মবর্ণা মহাকালী।

৫। অনাহৃত বস্তু—অর্কতাপের (প্রাণবায়ু) কোষিত চেতনার স্বল্প কল্পনে জ্বর যে শব্দতরঙ্গের স্রষ্টা হয়, তাহাষ্ট 'অনাহৃত বস্তু'। প্রাণবায়ু বা অর্কতাপের তাড়নে চেতনার উদ্বোধন হয়। তারপর চেতনাই মানবশক্তিকে 'বাস্ক' শান করে। অতঃপর অর্কতাপ এবং জৈব চেতনার মিশ্রনে অনাহৃত বস্তু বা আদিভা-জ্বর আহৃত হইয়া 'বাস্ক' রূপে ব্যক্ত হয়। অনাহৃত বস্তুকে সাধকগণ শব্দরাজ, আদিভা-জ্বর, এবং তাহারই আহৃত বাস্ক-শক্তিকে বাইথ-সপ্তমতী বলেন। মানবের প্রাণের দ্বিতিকাল পর্যন্ত অনাহৃত বস্তু গ্রহণ হুংবে, কড়িতে কোমলে, রাগে অহরাসে ব্যক্তিমা চণ্ডিতেছে। এই স্বল্প কল্পন বা অনাহৃত সঙ্গীত, মানব বহির্চেতনা রক্ষা করিলে, শাস্ত্র তত্ত্বতে সনাতনময় ভাবগুণভিত্তার ভিতরে চেতন-সূত্রের কোষিত তরঙ্গের গর্জনধর্মি অনিতে পায়। অস্বাভ্য প্রাণবায়ুতে নষ্টরাজ বেন উদ্ভবের সূত্র করেন। মানবের স্বল্পতাপের পূর্ণ অমৃতভূতির কেন্দ্র হইল অনাহৃত বস্তু। এই আহৃত এবং অনাহৃত শব্দতরঙ্গের ধ্যানবোধ ভাবসাধনাই পরাবাস্ক বা তুরীয়া সাধনা। ইহার বহিঃপ্রকাশই সূর্যসঙ্গীত। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে—“নামরূপা পরাশক্তিবিদ্যারূপো মহেশ্বরঃ। যদুপ ব্রহ্মা; স্থানং ব্রহ্মগ্রন্থিতং যঃ স্তম্ভতঃ। তদ্বাচো সন্বিতঃ প্রাণঃ প্রাণাংকং বজ্রিসমুৎপন্নঃ। বজ্রি (অর্ক—স্বয়ং) যাক্ত সান্বোগায়ঃ সন্মুখায়তে, নাদাহ্র্যংসম্বতে বিকৃত্যতঃ সঙ্গীত চ বাচ্যঃ।”

রক্ত:—স্বপ্ন, ঐশ্বর্য ও ভোগবন্দী; তাই প্রজাসৌভাগ্য সৌরবর্ণী মহাসম্রাট। পরাবাহু পঙ্কি—বহু, নির্বল, ক্রমবৃদ্ধ, গুণ-প্রতিষেধী। শান্তিক ভূগণের মহাসরস্বতী। এই ত্রিগুণস্বরূপ বিশ্ব শক্তি ও আলোকিত হইয়া নিয়মের বন্ধনে চলিতেছে।

তাত্ত্বিক সাধকগণ ঐ শক্তিবন্ধ নীলসরস্বতী, মহামায়, তত্ত্বকালী বসিমা অর্চনা করিলেন। এই তত্ত্বকালী 'তারা' নামে খ্যাত। বর্তমান সরস্বতীপূজার অতলিহানে তত্ত্বকালীকে প্রণাম করা হয়।

বৌদ্ধধর্মে সরস্বতী

বৌদ্ধধর্মের প্রধান বোধিসত্ত্ব হইলেন অবলোকিতেশ্বর। তাঁহার পরবর্তী বোধিসত্ত্ব—মহাশ্চী। এই মহাশ্চীর অত্যন্ত নাম—মহাশ্যে, মহাশ্যে ও বাঈশ্বর। এই মহাশ্চী বা বাঈশ্বর বৌদ্ধধর্মে বিচার্য দেবতা। ইহা ব্যতীত একবক্তা, বিহঙ্গা সরস্বতী বৌদ্ধধর্মে পূজিতা হন। আদি বৌদ্ধধর্মের সংস্কৃত গ্রন্থ—সদিবসিদ্ধ, হিপিটক প্রভৃতিতে মহাশ্চীর পরিচয় পাওয়া যায় না। পরবর্তী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী-রত্নকারতন্ত্র, লক্ষ্যব্রহ্ম-সূত্র, সংস্কৃতগীতা, স্ত্রীমতীসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে মহাশ্চী প্রথম বোধিসত্ত্ব এবং জ্ঞানবিচার্য দেবতা বলিয়া বর্ণিত আছে। মহাশ্চীবিদ্যুতগ্রন্থ গ্রন্থীনাভাব্য ন্যানজিও (Nanjio) নামে ৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে অমূল্য হইল। এই গ্রন্থে মহাশ্চী—সম্মতি ও সরস্বতীর শক্তিতে শক্তিমান। মহাশ্চী—বৌদ্ধধর্মের দেশসমূহে জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতির দেবতা বলিয়া পূজিতা হন।

বৌদ্ধ 'সাধনমালা' গ্রন্থে, একবক্তা, বিহঙ্গা সরস্বতী চারিপ্রকার:—মহাসরস্বতী, বহুবীণাসরস্বতী, বহুসারমা সরস্বতী, আরা সরস্বতী। ইহার ভিতরে (১) মহাসরস্বতী হিন্দুর বার্কটের পুরাণের দেবী-মাহাত্ম্যে অষ্টভুজা হুগাশক্তি-রূপে পূজিতা হন। মহাত্ম্যেতে ভীষণকর্মের ৮০০-৮০৪ স্তোকে অষ্টভুজের হুগাভাবে মহাসরস্বতীর নাম উল্লিখিত আছে। বর্ণা—“কুম্ভধাতুর্গণবতি হুগে কান্তারবাসিনি। বাহ্যাকার: স্বধা চৈব কলাকাটা সরস্বতী, সারিত্রী বেদমাতা চ তথা বেগাত উচ্যতে।” হিন্দুযুগে মহাসরস্বতীর বীজমন্ত্র—ভীমজ্ঞানময়ী। বৌদ্ধযুগে—মহাসরস্বতীর বীজমন্ত্র শেত-পত্রের চতুর্বিধে ক্রী:। তিনি স্বাশ্রমবর্ণব্রহ্ম, বেতপদ্মাননা, চন্দ্রমণ্ডলবাসিনী; দেবীর মূখ বক্তা-মধুর। বাক্য নৃত্যাবার, দক্ষিণ হস্তে বহুবক্তা, বাম হস্তে বৃণালবৃদ্ধ পত্র। চন্দ্রকিরণে তিনি গুণাবিতা। তাঁহার চারিজন নারিক—সম্মুখে প্রজা, পশ্চাতে যতি, দক্ষিণে মেধা, বামে স্মৃতি সন্তত বাস

করেন। (২) বহুবীণাসরস্বতী—বিহঙ্গা, গুণবর্ণী—ইহা হস্তে বীণা। (৩) বহুসারমা সরস্বতী—জিনদনা, অর্ধচন্দ্র-শোভিতা, মুহুটাদিগী, গুণা। (৪) আরা সরস্বতী—যোড়সরস্বতী, মনোজ্ঞা, গুণা, দক্ষিণে বক্তা, বামে প্রজাপারমিতা পুতক। সাধনমালা ১৬৮ সংখ্যার দেবীর রূপবর্ণনা:—“সিতবর্ণা মনোরমা দক্ষিণে রক্তাঙ্গুলাদিগী: বামে প্রজাপারমিতাপুতক-দারিগী”।

আর্যবজ্জা সরস্বতী—বৌদ্ধ সরস্বতী। দেবী বজ্রম-অভাঙ্গুলা ত্রিভদ্রা, বজ্রহস্তা, প্রত্যালীচপদা। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত তিনখানিতে বজ্রাক্ষেপ পত্র, অগ্নি, কলী; বাম হস্ত তিনখানিতে—ব্রহ্মকপাল, বজ্র ও চক্র। মূখের দক্ষিণ-ভাগ নীলবর্ণ, বামভাগ গুণবর্ণ।

বৌদ্ধধর্মের সরস্বতী সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা হইল।

জৈনধর্মে সরস্বতী

জৈন তীর্থঙ্করগণের মধ্যে ভগবানের বাঈর নাম—লত। ভগবানের বাঈ বাঘর; ক্ষতএব লত এবং সরস্বতী অতির বাকার, জৈনগণ সরস্বতীকে ‘লতদেবী’ বলিয়া পূজা করেন। জৈন ধর্মগ্রন্থ—‘জাতার্থকবাহুজ’ ১ম ক্রতি, ৪র্থ বর্ষ, ১ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—“নম: শ্রীবর্ধমান্য শ্রীপার্বপ্রভবে নম:। নম: শ্রীমৎসরস্বতৌ সহায়ৈস্তো নমো নম:”। জৈন ধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর শ্রীবর্ধমান মহাবীর স্বামী জীবনগণের মুক্তিপথের ক্ষত শ্রাবণ মাসের প্রতিপদ তিথিতে সুর্যোদয়কালে সৌভাগ্যমুহুর্তে, অভিজিৎ নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থানকালে উপবেশ প্রদান করেন। ঐ উপবেশ, সৌভাগ্য গণধর ঐ দিন সন্ধ্যাকালে, ভগবান মহাবীরের বাগীকে ১১ম অঙ্ক, ১৪শ ‘পূর্ব’তে বিভক্ত করেন। তারপর তিনি তাঁহার সহযোগী সুর্য্য স্বামীকে উপবেশ দান করেন। সুর্য্য স্বামী ঐ উপবেশ জঙ্ঘবায়ীকে দান করেন। জঙ্ঘবায়ী বহু স্বধীজনকে ঐ ১১ম অঙ্ক, ১৪শ ‘পূর্ব’ উপবেশ দান করিয়াছিলেন। ঐ ১১ম অঙ্ক, ১৪শ পূর্ব, ২ম প্রকীর্তক এবং ১৪শ অঙ্কবাহু বাগীর বন্দনা-সমূহকে একত্রে ‘লতসমুদয়’ বলে। এই লতসমুদয়ই সরস্বতীমন্ত্র। জৈনগণ ঐ সরস্বতীমন্ত্রের অঙ্ক, পূর্ব, প্রকীর্তক, অঙ্কবাহু বাগীসমূহ অষ্টধাতুর দ্বারা ভারতবর্ষের মানচিত্র নির্মাণ করিয়া, ঐ মানচিত্রে কান্দীর হইতে গিহেল পর্যন্ত লম্বাভাবে এক রেখা অঙ্কিত করিয়া, তারপর এড়াভাবে বাহুজঙ্ঘ অঙ্কবাহু বাগীসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাচীন-যুগ হইতে জৈনগণ সরস্বতীকে ‘ঈদামি’ বাগদেবতাক্রমে অর্চনা করিয়া আসিতেছেন। লিগম্বর এবং বেতাঘর উভয়

জৈন-সম্প্রদায়ের ভিতরে ২৪ জন তীর্থঙ্কর শাসন-সেনীকুলে পূজিতা হইতেছেন। এই ২৪ জন তীর্থঙ্কর শাসন-সেনীর ভিতরে ১১ জন শাসন-সেনী মহাবিক্কাৰূপে জৈন ধর্মে পূজিতা হন। জৈনমতে বোড়ল মহাবিক্কার নাম 'অভিধানচিত্তাধি' (হেমচন্দ্রাচার্য-বর্ণিত) ২৪ পর্থাৎ হইতে প্রস্তুত হইল। এই 'বোড়ল মহাবিক্কা' শাসন-সেনীগণের জৈনমতে সরস্বতী।

জৈন বোড়ল-মহাবিক্কা

মহাবিক্কা	নাথকর	ধ্বন	বয়স
রোহিণী	অজিতবলা	চৌকি	চারি হস্ত
প্রজ্ঞাতী	হরিহারী	হংস	ছয় হস্ত
বহুশ্রুতা		"	চারি হস্ত
তুপিপাশুলা	মনোবেগা		
	মনোভগ্নী, স্ত্রায়া	অব	চারি হস্ত
চক্রেধরী		গরুড়	বোড়ল হস্ত
পুরুষত্যা		হতী	চারি হস্ত
কালী	শাক্তা	চাৰি হস্ত	তুব
মহাকালী	অজিতা	চারি হস্ত	
সৌরী	মানবী	তুব	চারি হস্ত
গাছারী	চণ্ডা	জরি হস্ত	
সর্গদ্বয়মাহালা	আলাবাগিনী	তুব	আট হস্ত
মানবী	অশোকা	চারি হস্ত	
বৈরাট্যা	বৈরাটি	সর্প	চারি হস্ত
অম্বুত্যা	অনন্তবতী	হংস	চারি হস্ত
মানসী	কল্পা	সিংহ	চারি হস্ত
মহামানসী	নির্ভাণী	ময়ূর	চারি হস্ত

জৈনধর্মে ২৪ তীর্থঙ্করগণের ভিতরে উপরিলিখিত বোড়ল মহাবিক্কা সরস্বতী রূপে পূজিতা হন। বেড়াবর জৈন-সম্প্রদায়ের নিত্যকর্মপদ্ধতির নাম 'ব্রহ্মশাসন'। ঐ গ্রন্থের হিন্দু সরস্বতী-ত্বেরে অল্পমাত্র একটি ভব এষ্টমলে প্রস্তুত হইল : ঐশ্বর্যবতী নাম : ঐশ্বর্যমায়ী নাম : সরস্বতী মহাভাগে বরদে কাষরুপিনি, বিব্রুপিনি বিপালাকি যে বিচ্ছে পরমেশ্বর। সরস্বতী বহা হুই। বীণাপুস্তকধারিণী, হংসবাহনসংযুক্তা বিজ্ঞানব্রহ্মণী।

জৈনগণের সরস্বতী-পূজা সাধারণভাবে বর্ণিত হইল।

সরস্বতীর বিভিন্ন বাহন :

হংস, পদ্ম, মেঘ, ময়ূর ও সিংহ

হংসবাহনা সরস্বতী—বাই-সরস্বতী সম্পর্কে পূর্বে বলা হইয়াছে। বাই-সরস্বতী ব্রহ্মের শক্তি। মানব-

দ্বয়ই ব্রহ্মশক্তি। জগৎ হইতে বাত্ দ্বিতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। জগৎকে 'হংস' বলে। স্তূত্যাং বাই-সরস্বতীর বাহন মানবজগৎ বা হংস। এই হংস ব্রহ্মার মনঃসত্ত্বাবের বিচরণ করে। অর্থাৎ আত্মাই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই হংস—আত্মা মনঃসত্ত্বাবের বিচরণ করিয়া বাত্ রূপে ব্যক্ত হয়। অতএব বাই-সরস্বতীর বাহন হংস, ঐ হংস মনঃসত্ত্বাবের বিচরণ করিয়া মানবকে বাত্, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করিয়া থাকে। সেইজন্য হিন্দুগণ, বাই-সরস্বতীর বাহন হংস—ঐ হংসের মানস সত্ত্বাবের বিচরণ করিয়া করিয়া, আত্মার অর্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পদ্মাসনা সরস্বতী—তৈত্তিরীর ব্রাহ্মণে (১১।৩।৪) আছে—প্রজাপতি ব্রহ্মা জগৎ-সৃষ্টির ইচ্ছা করিলে, তিনি দেখিতে পাইলেন যে একটি পুস্তকস্বরূপ সরলভাবে জলের উপরে ঝাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থা হইতে সরস্বতী পদ্মাসনা হইলেন। কারণ প্রজাপতি ব্রহ্মার মূখে সরস্বতী থাকায় ঐ সরল স্থান পাইরাছিল। পদ্মাসনা সরস্বতী তিস্রোত, দক্ষিণ ভারতের নলৈকোণচোড়াপুন্ড্র, বগলি, গবদ-এ পূজিতা হন। মেঘবাহনা সরস্বতী—বাকীর সাহিত্য-পরিষদ চিত্রশালায় চতুর্ভুজা, মেঘবাহনা সরস্বতী-মূর্তি রহিয়াছে। দক্ষিণ হস্তে অক্ষমাল, বাম হস্তে পুস্তক এবং নিম্ন হস্তে বীণা রহিয়াছে। ময়ূরবাহনা সরস্বতী—মালপুত্রনা, বোম্বাই এবং তিস্রোত ময়ূরবাহনা সরস্বতী পূজিতা হন। সিংহবাহনা সরস্বতী—বৌদ্ধধর্মে পূজিতা হন। ময়ূরী বাহন সিংহ।

তিনকত, যবদীপ ও জাপানে সরস্বতী-পূজা।

কল-চিত্রশালায় সরস্বতী-মূর্তি

তিস্রোত অধিকাংশই বিহুজা খ্রিস্টপূর্বসালীন বীণা-ধারিণী সরস্বতীর পূজা হয়। দেবী ওত্তরলী—এক হস্তে বীণা, অস্ত্র হস্তে বহু। তিস্রোতের ভাষায় সরস্বতীকে 'লত্-চন-ব' বা 'লত্-গি-ল-ব' বলে। বববীণে সস্ততরীঃ বীণাধারিণী পদ্মাসনা সরস্বতীর পূজা হয়। ইহা ব্যতীত বববীণে খিলপদ্মাসনা, মল্লোপদীতধারিণী, বীণাবাদিনী সরস্বতীর পূজা হয়।

* Archaeological Survey Reports, Vol. 4, p. 70—কানিংহাম

ও সস্ততরী বীণা—বহুবি নারদের 'নারদবীণিকা' গ্রন্থে সস্ততরী বীণার নাম—চিত্রাবীণা। "সস্ততরী ডবেজিতা ... চিত্রা চানুগীবাহনা"।

অম্মা বিলাতব্রহ্ম মহাশয় তাঁহার রচিত 'সরস্বতী' পুস্তকে 'Young East পরিবার' গ্রন্থের পত্র, ৪ম সংখ্যার (১৯২৪ খ্রি:) 'What Japan Owes to India' নামক প্রবন্ধ হইতে জাপানে সরস্বতী-পূজার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ঐ বিবরণের সাহায্যে জাপানে সরস্বতী-পূজা সম্পর্কে পরিচয় প্রাপ্ত হইল।

জাপানে সাতজন সৌভাগ্য-সেবতার পূজা হয়। সপ্ত সৌভাগ্য-সেবতা—বেনজেন, কুহুরোকুহু, বিয়মন, জিরোজিন, তোট, এবিসু, সাইকোকু। ইহাও ভিতরে তিন্দুর সেবতা মহাকাল—নটকোকুতেন, সরস্বতী—নটকোকুজিতেন, সুবের—বিয়মন: এই তিন সেবতা পুজিত হন। জাপানে সরস্বতী-মন্দির পুষ্করিণী বা মনৌতটে নির্মিত হয়। টোকিওর নিকটে উয়েনো (Uyeno) নামক স্থানে শিনোবাকু নামক পুষ্করিণীতে সরস্বতী-মন্দির আছে। ইহা ব্যতীত কানাকুহোর নিকটে এনোশিমা, তিন্দুসিমা ও মিমিজিমা এই তিন বোপে সরস্বতী-পূজা হয়। জাপানের সরস্বতী—জাপান ও 'হকুজা' বা শ্বেতসর্পবাহিনী। জাপানের দুই নরকটি এবং পুষ্করুক; চক্ষুহর চরমণিত, গায়েব হানে তানে বহু বৃহৎ হয়।

জাপানের পাণ্ডা 'হকুজা' বা শ্বেতসর্প; সমুদ্রে সূতানীল উপাধার প্রদান করে। ইহা ব্যতীত অষ্টভুজা সরস্বতী জাপানে পুজিত হন। সৌর অষ্টভুজ বহাধমে উমা, বহু, অসি, চক্র, শাশ, পরশু, ধনু ও শর বহিয়াছে। জাপানী ভাষায় এই সরস্বতীর নাম—হজি-বেন-তেন এবং কোকো-সিও-বেন-জিতেন।

হাশিমার পেলিনগ্রাড-চিত্রপাণ্ডা উপত্যামণ্ডির (Ukhoniski) সংগ্রহের ভিতরে শিবলপগ্রাসীনা বীণা-ধারিণী সরস্বতী-মূর্তি বহিয়াছে। মূর্তিটি মেনাপী পদ্ধতিতে নির্মিত।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে শেণ-বিদ্যেপের সরস্বতী-পূজা সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচিত হইল। অরণ্যভীত বৈদিক যুগে চিত্রশীলক বাস-সরস্বতীর পূজার উন্নয়ন হইয়াছিল, সেই চিত্রশীলকির গুণধর্মের প্রভাব ক্রমান্বয়ে সহস্র সাধনার প্রতিধার পণ্ডিত হয়। তদনন্তর কালচক্রের বিভিন্ন প্রবাহে হিন্দুধর্ম হইতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে ছড়াইয়া সরস্বতী-পূজা এনিবার বিস্তারলাভ করে।

মহাবি কাত্যায়ন স্বকুমহিতার অমুকুমণিকার নবি এবং সেবতা সম্পর্কে বর্ণিতছেন—“যত ব্যাক্যে স কবি: বা তেনোচ্যতে সা দেবতা তেন ব্যাক্যেন প্রতিপাত্য বহুত সা দেবতা”। অর্থাৎ সাধারণ ব্যাক্য তিনিই নবি; তিনি ব্যাক্য বলেন তাহাই দেবতা। ব্যাক্য যে বিবরণের প্রতিপাত

হয়, তাহাই দেবতা। এইসকল সাধনামাধ্যম চতুর্ধীক বা বাটম-সরস্বতীর সাধনার ইঙ্গিত লাভ করা যায়। অর্থাৎ ব্যাক-সাধনাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা এবং তাহার গুণ-প্রকাশই 'সেবতা'। দৈবশক্তি মানবজন্মে গুণবিশিষ্টে অব্যক্ত থাকে। চতুর্ধীক সাধনা: দ্বারা গুণবিশিষ্ট বাটম-সরস্বতীর সাধনা করিতে হয়। এই সাধনার বহু হিন্দুগণ নিরাকার অন্তর্ধানী শক্তিকে রূপময় করিয়া: চূর্ণশক্তি, নিরাকার শাস্ত্রের চেতনা স্থান করিয়া কথা বলার ভাব ফটি করিয়াছেন। জনমের চতুর্ধীক সাধনার বশেষ, কল্পনা-প্রেম-মৈত্রী সাধনার হিন্দুধর্ম হইতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদ্ভব হইয়া সমগ্র বৌদ্ধ ভূগোলে সরস্বতীর অর্চনা হইয়া থাকে।

প্রত্যেক ধর্মের প্রবাহশরে মানব-ভগবানের সঙ্গে নিজের স্বরূপ বিশেষণের চেষ্টা করিয়া থাকে। এই স্বরূপ-বিশেষণে দেখা যায় যে, জ্ঞানই মানবের চরম পরিণতি, সাধনাই জীবনের নাজিকেন্দ্র। এই জ্ঞান-সাধনার উৎস মানবজন্ম। এই সাধনাই সরস্বতীর সাধনা।

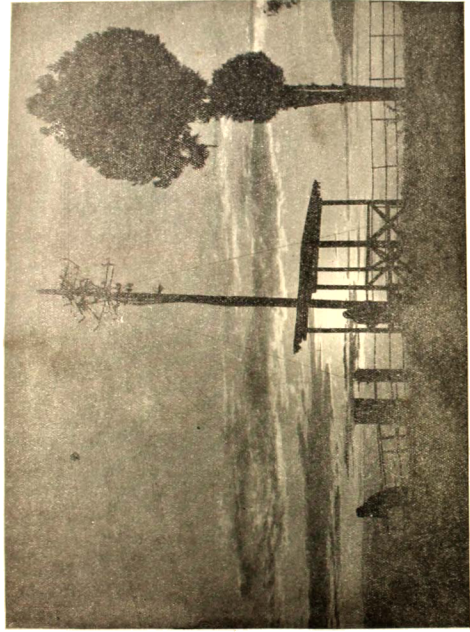
প্রত্যেক সভ্যজাতির ধর্ম মানবকে কৃষ্টিচিন্তায় ব্যতিত করে। কিন্তু হিন্দুধর্ম—বিশেষণ করিতে করিতে কৃষ্টিতে কৃষ্টিতে নবজন্মে কী-কায়স্থকণে সনিকো গ্রহণ করিয়াছে। কৃষ্টির বিক্রীতিকায়ে হিন্দুগণ ভীত নহে। কারণ হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে যে, মানবের ইচ্ছাশক্তি এবং পরজন্ম আছে। কৃষ্টিই হউল পরজন্মের নবোদয়। আশাশ্রাব্যবিনী মানবের জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। হিন্দুগণ ইচ্ছাশক্তি যে কর্ম করে, তাহা ইচ্ছাশক্তি এবং পরজন্মের সুখের আশার।

সুতরাং হিন্দু ইচ্ছাশক্তির কর্মমধ্যেই সাধারণ সাধন করিয়া পরজন্মের মুক্তির পথ ফটি করিতে চায়। আশা-মায়াবিনী পরজন্মের সুখের জন্ত ইচ্ছাশক্তিরে বুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্রহ্মকণ, হিংসা-ধেব ও ব্যাপ্তিত: হইতে হিন্দুকে বিরত রাখে। কারণ হিন্দুগণ ইচ্ছাশক্তিরে প্রুথাক, পরজন্মের সুখের জন্ত সকল কর্ম অন্তর্ধানীর নিকটে সমর্পণ করিয়া সুখে থাকে। আশ্রয়গ্রহ দ্বারা সে অন্তর্দেহবৃত্তাকে জাগ্রত রাখে। হিন্দুর আগ্রহের সাধনার বহন বৈশ্বশক্তির প্রভাব অন্তর্ভুক্ত হয় না, তখনও সে দেবতাকে ত্যাগ করে না, বাহিরে বহুরূপে মূর্তি স্বজন করিয়া পূজা করে; পূজায়ে বিসর্জন করে। হিন্দুর লক্ষ্য থাকে—ইচ্ছাশক্তির কর্মের ভিতরে পারমৌলিক পথ ফটি করা। মানবের ইচ্ছাশক্তি ও পরজন্ম সাধনার দ্বারা হিন্দুধর্ম বসিষ্ট হইয়াছে। সেইজন্য পরমাতীত যুগ হইতে যুগযাতায় ভাঙ্গাগড়ার যুগিযাতায় ভিতরেও হিন্দু বিচলিত হয় নাই; তাহার সৌর অর্চনা—জ্ঞানের সাধনা ভারতবর্ষ হইতে সমগ্র এশিয়ায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তেজস্বী জ্ঞানই হিন্দুর সরস্বতীর সাধনা।



পাতা-বাহার

[কটো : স্বতন দাশগুপ্ত]



ব্রজকলি

সুশীল রায়

হার, বৃদ্ধ অগ্রসার !

অনেক দীর্ঘাচিই হয়তো অস্থি দিয়েছে, কিন্তু ছুনিয়ার দানব-সৈন্তের নিপাত তবু হয়নি। বৃদ্ধ অগ্রসার কেন-বে আত্মহত্যা করতে গেলেন, কিছুতেই কেউ তা বৃদ্ধকে পারবেনা। তাঁর এই আত্মহত্যার পর দলন কারও মস্তির পরিবর্তন যে হবেই, এ-কথা কে বলল।

সারা নাকতলা ঘনঘন করছে। ঘটনাটির পর কতদিন কেটে গেছে, আরও কতদিন কেটে যাবে, কিন্তু অগ্রসারকে এ-ভাবে হারাবার ভ্রানি ভুলতে পারবেনা এই কলোনি।

শেকালিকুন্ডের বধূটিকে নিয়েই এই দুর্ঘটনা। কিন্তু কথটা শুনেই কেন কেমন। বৃদ্ধ অগ্রসারের সঙ্গে ঐ বধূটির সম্পর্ক কী।

সম্পর্ক কিছু থাক বা না-থাক, সে-কথা নিয়ে ভাবনা করা ঠিক না। কোনো ঘটনার মধ্যে মুখরোচক আলোচনার রস থাকলে তার পুরোপুরি সম্ভাবহার করাই সংগত।

এ-নিয়ম মেনেই নাকতলা-কলোনি। তাই, এখানকার আবহাওয়া বতাই ঘনঘন হোক-না কেন, তার নেপথ্যে চাপা গুঞ্জন চলেছে নিয়মিত।

সার পাঁচজন ন্যায় বলতে পারে অনেক কিছু। কিন্তু অগ্রসারের অন্তরঙ্গ সহচর বলে বার। এখানে চিহ্নিত, অগ্রসারের ছাত্রের মতো বার। চলাচল করত এখানে, যারা ঐ বৃদ্ধ মানুষটিকে সমীহ করত সম্মান করত শ্রদ্ধা করত—আশ্চর্য, তারাও যোগ দিতে আরম্ভ করেছে ঐ আলোচনার। ঐ বিপিন হালদার, দিগন্ত বটব্যাল, আর মিহির মৈত্রও নিজেদের তকাত্তে রাখতে পারেনি। তকাত্তে রাখা দূরের কথা, তারাও বেন এসে কঁপিয়ে পড়েছে এই আলোচনার মধ্যে।

সবর বছর বয়স হয়েছিল যে-মানুষটার, তার এমন মতিভ্রম হতে পারে, কে বিশ্বাস করবে এ কথা? কেউ বিশ্বাস করুক বা না-করুক, তবু আলোচনা চলতে কতি কি। হয়তো এই ধরনের মনোভাব নিয়ে বসে আছে সকলে।

সেইজন্তে, একদিন যাকে সকলে মনে করেছিল এই সকলের প্রাণবিন্দু বলে, এখন তাকেই এখানকার একটা অর্ধাচীন বলে মনে করতে কারও বৃদ্ধি বাধে না।

রাস্তার ধারের কালে বাগতি তাতে নিয়ে ছোড়া হয়েছে পল্লীর মেয়েরা। কলের ভলে ছোড় নেই, তিরতির করে ছল পড়ছে। একটা বাগতি ভরতি হতে সময় নিচ্ছে অনেকটা। এতে অস্থিধে নেই কারো। সময় এখানে অস্বল্প। কোনো ছোড়া নেই, তাগাদা নেই।

ঐ-বেলাই আর কুনড়ার লতা ধীরে ধীরে মন্ডর গতিতে লতিয়ে উঠছে মলিকানের ঘরের বেড়া বেয়ে-বেয়ে, অবিকল অননি গতিতে ভীষন হয়ে চলেছে এখানে। কলের ভলে ছোড় নেই বলে তাই কোনো অভিযোগও নেই কারো।

কিন্তু কলে ছোড় না থাকলে কী হবে। ছোড় আছে কথায়। অনর্গল বলে চলেছে তারা নানা বাড়ির হাঁড়িহেঁশেলের কথা, কার বাড়ির কোন মেয়ে নতুন ছোড়া পরতে শিখে পায়ে কোন্ ভুলে কেমন ভঙ্গিতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে টাটে—দেখলে হাসি পায়, কোন বাড়ির বউ কুঁড়ের মতো বসে বসে গতির না নাড়িয়ে ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে কেমন চালকুমড়োর মতন—

মলিকা খিলখিল করে হেসে বলল, “না রে, মালতী, চালকুমড়া বলিস কেন? এসেছিল যখন তখন ছিল পানবাগিচা, এখন হয়েছে তাকিয়া।”

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে খুন হতে লাগল মল্লিকা। তার এই কথার মধ্যে একটা মজার মানে যে আছে, তা সকলে ধরতে পেরেছে কিনা, সকলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সে তাই লক্ষ্য করতে লাগল।

বা-হাতে বালতি কুলিয়ে ডান হাতে নিজের ডাল চিবছিল শেফালিকা। তার দিকে চেয়ে মল্লিকা বলল, “কেনন রে, শেফালি?”

মুখ থেকে দাঁতন বাঁর করে খুঁ ফেল শেফালি বলল, “ইশ, তেতো বিব!”

কথটা শুনে চমক উঠল বুকি মল্লিকা আর মালতী। কি কথা? কি উত্তর দিল এই হাদা মেয়েটা। তাকে ভিজ্ঞাসা করা হল তাকিয়ার কথা, আর সে উত্তর দিল তার দাঁতনের খাদ সহজে। এমন না হলে, নাম কি হয় ওর এমন—

মল্লিকা এগিয়ে এসে ওর ডান হাতটা চেপে ধরে বলল, “ওল, তোকে নিয়ে যাই ওই কুঞ্জে। তুই হবি খেদানকার নহুন কুঞ্জখরী।”

অর্থাৎ কিনা, ওই শেফালিকুঞ্জে প্রসঙ্গে এসে গেল ওরা। যে-গৃহের গৃহবধু এই কলোনির মুখে কলর লেপন করে এ-অঞ্চলের বাঁর হয়েছে, সেই গৃহে নিয়ে গিয়ে ওরা বসাতে চায় বুকি এই শেফালিকাকে।

শিউলিফুলের পাপড়ির মতো ধবধবে সাদা দাঁত বের করে হাসতে লাগল শেফালিকা। বলল, “তা, ঘেতে রাজী আছি। কিন্তু কোথায় পাব তাই তাকে?”

“কাকে? কাকে?”

খুঁ ফেল শেফালিকা; বলল, “অগ্রদ্বান্ত-নবিতি?”

হাসিতে তার চোখের তারা-হুটি কিলিক দিয়ে উঠল। শেফালি আবার বলল, “হাদা বামীর ঘর করতে লারব, তাই।”

শেফালিও ব্যঙ্গ করল ঐ বধুটিরই। মেদিনীপুরের শালবনীর উপকণ্ঠের মল্লিকপুর গ্রাম থেকে খুঁজে

আনা হয়েছিল ঐ বধুটিকে। বৃদ্ধ অগ্রদ্বান্ত এজ্ঞে অনেক মেহনত আর অনেক ডকলিব করেছেন। আন্তনাথবাবুর ছোলে বৈজ্ঞান্যথের জন্মে ভালো একটা বউ চাই। সব কাজে কাঁপিয়ে পড়াই অভ্যাস ছিল অগ্রদ্বান্তের। ধরকুনো মানুষ আন্তনাথ, সেইজ্ঞে তাঁর সহায় হয়ে এগিয়ে এলেন অগ্রদ্বান্ত। অনেক দেখে, অনেক বেড়ে, অনেক যাচাই করে আন্তনাথের পুত্রবধু নিয়ে এলেন অগ্রদ্বান্ত শালবনী থেকে।

বনের হরিণী নিয়ে আসা হল কুঞ্জে। শালবনীর নিভৃত পল্লী থেকে সে এল শহরতলির শেফালিকুঞ্জে। কিন্তু বেশিদিন সে টিকলনা এখানে। বনের হরিণী গেল যেন কোথায় চলে!

মালতীর বালতিতে জল পড়ছে করবর শব্দে। এদের কথাও তোড় শুনে কলেও বুকি তোড় এসে গেছে।

“কোথায় আছে রে সে এখন?”

“বনের হরিণ নিশ্চয় গেছে মনের মানুষের কাছে। শেফালিকুঞ্জে ঢোকার পথ তার বন্ধ হয়েছে, হয়তো এখন সে নিজেই একটা নিকুঞ্জ তৈরি করে নিয়েছে কোথাও।”

এরা কথা বলে চলেছে, এমন সময় বাজার করে ফিরছে বিপিন। ধমকে খেমে সে জিজ্ঞাসা করল, “কি এত হাসাহাসি রে তোদের?”

শেফালি বলল, “কিছু না।”

বিপিন বলল, “কিছু-না-ভেই এত হাসি, কিছু হলে তো তোদের নাড়ি ছিঁড়ে বাবে।”

মল্লিকা এগিয়ে এসে বলল, “আমাদের নাড়ির জ্ঞান টনটনে, অত সহজেই ছিঁড়ে যায় না।”

“বটে? খুব তো কথা মিথখিদি?”

“শিখব না কেন? কোন্ পল্লীতে বাস করছি তা তো দেখবে?”

“কেন। পল্লীর হল কি?”

মল্লিকা সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে একই হাসল; বলল, “কিছুই বুকি জান না, বিপিননা।”

ধমকে দাঁড়াল বিপিন হালধার। কিছু সে

জ্ঞানে, কিংবা কিছু সে জ্ঞানে না—কোনো মন্তব্যই করতে পারল না সে। এই কচি কচি মেয়েরা কোনো পাকা পাকা কথা নিয়ে কোনো আলোচনা এই পথে দাঁড়িয়ে করতে পারে কিনা, সম্ভব হল তার। কিন্তু এদের চোখমুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন, এরা কোনো মুখরোচক কথা নিয়েই মত্ত আছে। কিন্তু জেরা করার সাধ হলনা বিপিন হালদারের।

বলল, “বুকেছি। এবার বাড়ি পালা সব। কল ছাড়। এবার নাইতে আসব।”

“এত সকালেই এত তাড়াছড়ো যে? কাজের মানুষ ঘারা, তাদের নাওয়া-খাওয়া ইতিমধ্যে হয়ে গেছে দেখ গিয়ে।”

বিপিন হাঁটা দিয়েছিল, ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, “কার কথা বলছিস?”

“তোমাদের বৈজ্ঞানিকের কথা। আবার কার কথা?”

ওঃ। বুঝতে পারল বিপিন, এই কলতলার কলকাকলি তবে চলছিল কাকে নিয়ে। আর দাঁড়াল না সে। হনহন করে হাঁটা দিল।

এই কলতলার ভিড় জমে রোজ, রোজ নানা কথাও জমে ওঠে সেইসঙ্গে। কেবল এখানে না, ওই-বেে ঐ পাড়ে ওই বুড়ো সিন্থ-গাছটি তার জীর্ণ-ডালের মরা ছায়া তার পারের কাছে কেলে দাঁড়িয়ে আছে, ওইই সেই জিমিত ছায়ার নীচেও জমে আলোচনা। সেখানকার আলোচনা কচিকাঁচা মেয়েদের নয়, বড় বড় ছোয়ানদের। আর, দূরে ওই-বেে করোপেটের টিনের ছাওয়া লুবা ইটুলঘর, ওর দাঁওয়ার দাঁড়িয়েও নানা কথা বলেন মাস্টার-মশায়েরা। সব জায়গার নানান কথার মধ্যে একটি কথা উঠে পড়েই—সে হচ্ছে বৃদ্ধ অরুণাকান্তের কথা।

এই ইটুলবাড়ি তৈরি হয়ে উঠেছে ধীর চেষ্টায় আর ধীর পরিভ্রমণে, তাঁকে বৃষ্টি সকলে শ্রবণ করে

এখানে দাঁড়িয়ে, এই কলোনির ছোট-বড়-মাকারি বাড়িস্থলো ঐ-যে দাঁড়িয়ে আছে সার সার—ধীর উত্তোষে ও উৎসাহে এই বাড়িগুলির প্রতিষ্ঠা, তাঁকে শ্রবণ করতেও কারও কুঁঠা নেই।

মল্লিকানদের বরের বাতা বেয়ে বেয়ে যেমন ধীর ধীর কুন্ডলার ডাল উঠেছে লতিয়ে, অবিকল অমনি ধীরে এখানে গড়ে উঠেছে এই কলোনি। পাঁচজনের কথা ভেবে, পাঁচজনকে একত্র ক’রে, পাঁচজনের শ্রুত-শ্রুবিধার দিকে নজর রেখে যে-নাথুটি নিজের উদ্ভামেই একটা পোড়ো প্রান্তরকে এভাবে ভরাট করে তুলেছে, তাঁকে শ্রবণ করতে কারও কৃপণতা নেই কোনো।

বুড়ো হাড়ে অসাধারণ শক্তি নিয়ে এসেছিল ঐ লোকটা। সকলে তারিফ করেছে, তোয়াজ করেছে, অর্ছা করেছে, সম্মান করেছে। এইজগত পরিভ্রমণের কোনো নাম না পেলেও, কোনো লোকসান বলে মনে হয়নি তাঁর।

কিন্তু তিনি গভ হবার পরও তাঁকে যে এখানকার লোকে শ্রবণ করবে, এ কথা তিনি কল্পনাও করেননি হয়তো কখনো। কিন্তু সারা কলোনি আঙণ, তাঁর পরলোকগমনের পাঁচ-সাত মাস বাবেও, মনেপ্রাণে শ্রবণ করে চলেছে তাঁকে।

মিহিরদের দাওয়ায় তাদের আসর বসেছে। মাহুর বিছিয়ে বসেছে সকলে। বিপিন আছে, দিগিশ্র আছে, মল্লিকার বাবা আছে।

হে-হে ক’রে, চৈতিয়ে, চীংকার ক’রে সোলাসে চলেছে খেলা।

হঠাৎ দিগিশ্র পদ্মীর হয়ে ভারত বঙ্গল, কী তাস ফেলবে যেন ভেবে পাচ্ছে না।

বিপিন বলল, “অত চিন্তার আছে কী। দাও-না রঙের টেকাটি।”

কিন্তু রং কখন শেষ হয়ে গিয়েছে, সে-হিসাব রাখেনি বিপিন। দিগিশ্র নুচকে হাসল; বলল, “রং আর নেই। এই নাও ক্রপের টেকা।”

লাল পানের টেকাটি ছুঁড়ে দিল দিগন্ত।
অমনি উঠল হাসির তুফান।

রূপের টেকা! কথাটা তো মন্দ বলেনি
দিগন্ত। ঐ টেকাতে হাত দিতে গিয়েই প্রাণ
নিতে হল একটা মানুষকে। আবার কিনা—

অদৃষ্টাচ্যুতের অরণ করতে আরম্ভ করল সকলে।
তাস খেলতে বসে তাদের কথাই বৃষ্টি ভুলে গেল
সকলে। কত দেশ তরঙ্গ করে রূপের একটা টেকা
বেছে নিতে এসেছিলেন ঐ বৃদ্ধ, সেই টেকার থাকায়
তার যে প্রাণান্ত হবে, কে ভেবেছিল। আবার
কিনা দিগন্ত পড়েছে ঐ পান্নায়।

লাল পান। অবিকল অমনি টুকটুকে রাঙা
ছিল তার ঠোট-দুখানি। সেই ঐক্য-ছটি নিয়ে
কোথায় লুকালো সেই ক্লবধৃতি? এ-ভিজ্ঞাসা
তাদের মনে ভাগছে, কিন্তু সে-ভিজ্ঞাসার কোনো
জবাব পাবার লালসা তাদের মনে নেই।

মল্লিকার বাবা ভিজ্ঞাসা করলেন, “ইংরেজিতে
কি-বেন বলে হে? কি যেন কথাটা? ও, হ্যাঁ।
স্বাভাৱ। অদৃষ্টাচ্যুত ঐ স্বাভাৱে পড়বেন কে
ভেবেছিল।”

বিপিন বলল, “ওই-যে সংস্কৃতে বলে, জীবনের
চরিত্র দেখা ন জানন্তি। ওর সঙ্গে যোগ করে দেওয়া
দরকার ‘পুরুষ’ও। পুরুষদের চরিত্রও কি কম
হেয়ালিতে ভরা? অনন একটা বৃদ্ধা মানুষ তার
কিনা এই নতিভ্রম? কি বল, মিহির?”

কিন্তু মিহির কিছু বলে না। কদিন থেকেই
মিহির যেন একটু মীচিয়ে গেছে। এ-সব
আলোচনায় তার যেন তেমন উৎসাহ নেই।
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, “ভাবছি অল্প
কথা।”

“কি কথা।”

“ওই হতভাগটার কথা।”

“কার কথা বলছ হে?”

মিহির বলল, “বৈজ্ঞানিকের কথা। বেচারাকে
একবারে পথে বসিয়ে গেল! ওর মুখ দেখানোই

এখন তার হয়েছে। দেখ-না, কেমন মাথা ঠেট
করে চলে যায়। কারও মুখের দিকে চায় না।”

অট্টহাস্য করে উঠল বিপিন হালদার; বলল,
“অদৃষ্টাচ্যুত মরে বোঁচেছেন। ঠেকে গেলে বৈজ্ঞানিকটা
বুঝি ঠেকে চিবিয়ে খেত। ওর জী তো গেছেই, ওই
বৃদ্ধা হাড় চিবতে গিয়ে ওর ঠাত-কটিও যেত।”

মিহির বলল, “কি জানি, কিসে কি হত, কে
বলতে পারে বল।”

মিহিরের একবার বৃষ্টি বলতে ইচ্ছা হয়, একটা
অসম্ভব কাহিনী এমন ভাবে ফেনিয়ে কাঁপিয়ে তুলে
দরকার কি। কিন্তু সে কিছু বলে না। চারদিকে
যে আলোচনা বে-ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে পড়ুক, ওতে
কারই বা কি ক্ষতি। কিন্তু তার আক্ষেপ এই—
যাকে নিয়ে এত আলোচনার ও জল্পনা-কল্পনার
সূত্রপাত, তার কথা কেউ কখনো তুলছে না।
সে মানুষটা আজ কোথায় এবং কার হেফাজতে,
এ-সংবাদ জানার ক্ষেত্রে, ব্যগ্রতা না হোক, একটু
কৌতূহল জোগে ওঠে মিহিরের মনে। রূপের টেকা
বলে যার এত নাম, এত খ্যাতি, এত কদর, এত
কুংসা—সে এখন কোথায়?

বৈজ্ঞানিক তার বই থেকে চোব তুলল না; মাথা
নীচু করে বলল, “বলতে পারলাম না আমি, মিহির-
বাবু। ও-কথা আপনারাও জানতে চাইবেন না।”

মিহির বলে উঠল, “না না, তুল করবেন না।
সে বোঁঝ নেবার ক্ষেত্রে আপনাদের কাছে আসিনি।”

বৈজ্ঞানিক বলল, “মর্যাদিত হয়ে আছি।
অপমানিত হয়ে আছি। একটা সংসারের এ-রকম
ঘটনায় কোনো দৌরব নেই।”

“না, নেই। কিন্তু সংসার বড় বিচিত্র জায়গা—
এই খবরটা দিতে এসেছিলাম।”

“কি রকম?” চোখ তুলে তাকাল বৈজ্ঞানিক।

মিহির বলল, “আজ আসি।”

কিন্তু শোনা হলনা তো সংসারের সেই বিচিত্র
কাহিনীটা?

মিহির বলল, “আবার আসব।”

“ঠিক আসবেন তো? কেউ আর আসে না। আমাদের ভাগ করেছে এট কলোনি। কিন্তু তার ক্ষেত্রে কি আমরা দায়ী?”

নানা কাহিনী নানা জল্পনা-কল্পনা নিয়ে সারা কলোনি ব্যস্ত হয়ে আছে। কিন্তু যে-ব্যক্তিটি এই একটা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আহত, তার প্রতিও সহানুভূতি নেই কারও। বৈজ্ঞানিক যখন মোটা মোটা তারিখ বই নিয়ে ঘর পায়ে মাথা ঠেট করে বাস-স্টপের দিকে রওনা হয়, তখন জানলার-জানলায় উঁকি দেয় অনেক মুখ। এর আগেও বৈজ্ঞানিককে দেখে এইভাবেই উঁকি দিয়েছে এরা, কিন্তু সেদিন তাদের চোখে ছিল বিষয়—মামুলটার জ্ঞানের আর গুণের খ্যাতিতে তাকে দেখার কৌতূহল ছিল তখন এদের মনে। কিন্তু এখন যে ওরা উঁকি দেয়, সেটা কোনো মামুলকে দেখার ক্ষেত্রে যেন নয়, যেন একটা মহা দেখার ক্ষেত্রে।

সংসার একটা বিচিত্র জায়গা—কে জানে, মিহির এশানকার মামুলবসের এই আচরণের ক্ষেত্রেই এই সম্ভাব্য সেদিন করে এসেছে কিনা বৈজ্ঞানিকের কাছে। সম্ভবাই সে করেছে, সম্ভবতার কোনো ব্যাখ্যা করতে সে পারেনি। ব্যাখ্যা আর করে কী করে। কিছুদিন হল মাত্র তার নিজের মতির পরিবর্তন ঘটেছে, সে নিজেও তো সারা কলোনির আচরণের সঙ্গে নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছিল। কিন্তু একটা আঙ্গুণি কাহিনী যতই অকারণে পানা বেঁধে উঠতে লাগল, ততই মিহির তাদের কাছ থেকে নিজেকে একটু সরিয়েই নিল। অদৃষ্টান্তের মতো মামুলবের নামে একটা অপবাদ দিয়ে এরা মহা খুশি হয়ে আছে। মামুলটা আশ্চর্য্য করে তুললই করেছে বুকি।

মামুলটা নিশ্চয়ই খুব বেকুব ছিল। নইলে মামুলবের পরজার কড়া নেড়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তার উপকার করে আসক্ত কেন। এ-তল্লাটে তার নিস্ক ন। খেয়েছে এমন একটা লোক খুঁজে পাওয়া

দায়। ঐ-যে বৈজ্ঞানিকের বাপ আজনাথ, যে লোকটা দুনিয়ার কারও কাছে মাথা ঠেট করেনি ব'লে গর্বিত, সে মামুলবও অদৃষ্টান্তের কাছে ঋণী। ধনিকে প্রতিধনি সর্বদাই নাকি ব্যস্ত করে, ধনির কাছে সে যে ঋণী—হয়তো সে-কথা চাপা দেবার ক্ষেত্রেই। আহামুকিই করেছে অদৃষ্টান্ত। আহ-নাথের একটা পুত্রবধু জোগাড় করে দেবার ক্ষেত্রে কী উৎসাহ আর কী উদ্বল। যেমন-তেমন মেয়ে হলে হবে না—রুডের জলুচ চাই, ছিমছাম কিগার চাই, ধারালো কিচর চাই। নাও, চাও। তোমার মুখে কলঙ্কের কালি ঢেলে দিয়ে সে মেয়ে তো এখন পগার পার।

“বহু দূরে চলে গেছে সে, বহু দূরে। অনেক নেনে গেছে সে, মিহিরবাবু। যতটা আমার ভাবতে পারি, তারও নীচে নেনে গেছে।”

স্বপ্নের মধ্যে কথা বলার মতো করে বলতে লাগল বৈজ্ঞানিক। বলল, “দোষ আমারও আছে। আমি বিশ্বাস করেছিলাম তাকে বড়ই বেশি। অত বিশ্বাস বুকি করতে নেই কাউকে।”

মিহির বলল, “বিশ্বাসে কোনো দোষ নেই। দোষ হচ্ছে কড়ি।”

“অভিনয় করতে পারত। অভিনয় করতে দিলাম। শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গেই অভিনয় আরম্ভ করে দিল। ভেবেছিলাম, আমি ওর জীবনের হীরা, কিন্তু আমাকে সে বানিয়ে দিল ভিলেন। মুখ দেখাতে পারিনে কারও কাছে।”

গালে হাত দিয়ে বসে বসে মিহির বেন বৈজ্ঞানিকের কথাগুলো শুনছিল না, গিলছিল; কি যেন বলার ক্ষেত্রে সে তৈরি হল, গলা পরিষ্কার করে নিয়ে এবার বলল মিহির, “বড় বিচিত্র জায়গা এই সংসারটা। দোষ করে একজন, তার গ্লানি সইতে হয় অজ্ঞকে।”

মিহিরের গলায় সহানুভূতির নুর যেন শুনতে পেল বৈজ্ঞানিক, তার মনে হল—মিহির যেন বৈজ্ঞানিকের উপরই সমবেদনা জানাচ্ছে। মাথা নীচু করে তে

চোখের মতো ঘাতপ্রাপ্ত করে স্বাস্থ্য, পথের দুপাশের লোক তার দিকে ব্যস্তের দৃষ্টিতে তাকায়, তাদের মুখের দিকে সোজা মুখি না তাকিয়েও বুকেতে পারে বৈজ্ঞানিক; আশপাশের দরজা-জানলার আড়াল থেকে কিসকিন্দ লক্ষণ আসে তার কানে, কারণ সবই সে বোকে। অসহ্য বোধ হয় তার, নিভেছে অসহ্য বলে মনে হয়। কিন্তু সনাত্ত রানি সে মাথা পেতে গ্রহণ করে। এ ধরনের আচরণের প্রতিবাদ হয় না, এর কোনো প্রতিকারও নেই।

মিহিরের কথা শুনে বৈজ্ঞানিকের তাই বড় ভালো লাগল। তার মনে হল, অন্তত একজন মানুষ সে পেয়েছে, যে বুকেতে পেয়েছে বৈজ্ঞানিকের অবস্থাটি। বৈজ্ঞানিকের চোখ তাই সহসা সজল হয়ে উঠল।

এ চোখের দিকে তাকাল মিহির। এই লোকসমূহের প্রতিটি লোকের উপর মন তার অগ্রসর হয়ে উঠল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের চোখ সজল হল কেন, তা সে বুকেতে পারল না।

মিহির বলল, “আশ্চর্য মানুষের মন। একজন খেজাচারিণী হয়েছে, কিন্তু সেই ঘটনা নিয়ে চারদিকে যে ভটল ও যে গালগল্প, সে-সবও কি খেজাচারের নমুনা না? তারও কি তবে সকলে খেজাচারী আর খেজাচারিণী নয়? নিভেদের মন-গড়া গল্প বানিয়েছে তারা।”

“কি বলে সকলে? আনাকে বুঝি—”

“হ্যাঁ। আপনাকে তো যা খুশি তা বলেই। এমন কি অস্বাস্থ্যবাহকও ছেড়ে কথা বলে না।”

বৈজ্ঞানিক চিন্তার তল থেকে যেন বলল, “কিন্তু তাঁর কী দোষ। তিনি কি ইচ্ছে করে একে বেছে এনেছিলেন?”

“বেছে আনার জন্তে না। তিনি নাকি ওর জন্তেই আস্বস্ত্য করেছেন।”

“হ্যাঁ। তা তো করেছেনই। লক্ষ্যায় কৃপায় অপমানে নিম্নের উপর তাঁর বিতৃষ্ণা এসেছিল।”

মিহির বলল, “আমরা তা বুকেছি। কিন্তু ওরা বলে অন্য কথা। বলে—”

“কি বলে?” বুকে বসল বৈজ্ঞানিক।

“ওকে জড়িয়ে ঘেরার কথা বলে। বলে, বুড়োর নাকি মতিভ্রম ঘটেছিল।”

অপমানিত বৈজ্ঞানিক স্তব্ধ হয়ে ছিল, হঠাৎ সে অলে উঠল যেন ফুলিসের মতো; বলল, “আহাশ্বক। কারা বলে, চলুন এখন তাদের মুখোমুখি দাঁড়াব আমি। চলুন—আমুন।”

হঠাৎ এমন উত্তেজিত ও উত্তপ্ত হয়ে উঠবে এই নিরীহ নর ও পরাস্ত মানুষটি, এ কথা কল্পনাও করতে পারেনি মিহির। সে ধতমত খেয়ে গেল। বৈজ্ঞানিকের বাধা দেবার জন্তে বুঝি একই ব্যাকুলই হল।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃঢ়সংকল্প। উঠে দাঁড়াল সে, আলনা থেকে চাদর টেনে নিয়ে কাঁধে ফেলতে-ফেলতে বলল, “আমুন।”

“কোথায়?” মিহির যেন মনে করেছে একটা অনর্থ এবার বাধিয়ে তুলবে এই মানুষটি। যে কখনো রাগে না, হঠাৎ সে রেগে উঠলে অগ্রিকাণ্ডই বেধে ওঠে যে।

মিহির ভয়ানক চোখে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল, “কোথায়?”

স্বিমিত হাসল বৈজ্ঞানিক; বলল, “ভয় নেই। চলুন, চাঁদা চাইব সকলের কাছে গিয়ে। অস্বাস্থ্যবাহার স্বতন্ত্রকার জন্তে কিছু দিতে হবে সকলকে। তাদের কাউকে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্তে দাবি জানাব না।”

মিহির উঠে দাঁড়াল। বৈজ্ঞানিকের মধ্যে হঠাৎ এই তেজ আর উত্তম দেখে অনেকদিন বাদে সেই মানুষটির স্বত্তি জেগে উঠল তার চোখের সামনে। বলল, “চলুন।”

অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক আশ থেকে নতুন ব্রত নিল কিনা ঠিক যেন বুকেতে পারছেন মিহির। সে তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কমানিয়ার সাংস্কৃতিক-দল

শ্রীমতী বাণী দেবী

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে বিদেশের বহু সাংস্কৃতিক-দল ভারতে এসেছেন এবং এখনও আসছেন। রাশিয়া, চীন, চেকোস্লোভাকিয়া ও উল্লেখকৃত্যনের সঙ্গীত ও নৃত্যের সঙ্গে এইভাবেই আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছে। আমাদের সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের বিভিন্ন অঙ্কণে বোগ দিয়ে তাঁরাও পেয়েছেন আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়। এদেশের সাংস্কৃতিক-দলও বিদেশে গিয়ে বিপুলভাবে অভিনবিত হইয়েছেন। এই আসা-যাওয়ার মধ্যেই পৃথিবীর অল্পাত দেশের সঙ্গে ভারতের আঞ্চিক বোগত্বর যেমন স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে, সাংস্কৃতিক-ক্ষেত্রেও তেমনি গ'ড়ে উঠছে একটা পারস্পরিক প্রজ্ঞা ও শ্রীতির ডাব।



কমানিয়ার সাংস্কৃতিক-দলের মহিলা-নৃত্যশিল্পীদের একটি সমন্বত লোক-নৃত্য

ভারত-সরকারের আয়ত্বগে গত ডিসেম্বর মাসে এসেছিলেন কমানিয়ার এক সাংস্কৃতিক-দল। কলিকাতাতেও তাঁরা প্রত্যত তাঁদের দেশের অপর লোক-সঙ্গীত ও

লোক-নৃত্যের অঙ্কণ ক'রে নিইয়েছেন। ভারতের আরও কয়েকটি জাংগায় অঙ্কণ অঙ্কণের মাধ্যমে তাঁরা এদেশের লোকচিত্র জ্ঞত ক'রে নিইয়েছেন।



কমানিয়ার সাংস্কৃতিক-দলের পুরুষ-নৃত্যশিল্পীদের একটি সমন্বত লোক-নৃত্য

কমানিয়ার-সরকারের বৈদেশিক সাংস্কৃতিক-দপ্তরের উপ-সভাপতি মিঃ আলেকজান্ডর কুইকানের নেতৃত্বে কমানিয়ার এই সাংস্কৃতিক-দলটি নৃত্য-শিল্পীতে এসে উপস্থিত হন ৩ঠা ডিসেম্বর (১৯৭৭)। তিনি ছাড়া, এই দলে ছিলেন উনচলিশ জন শিল্পী। কেউ নাচিয়ে, কেউ গাইয়ে, কেউ ব্যক্তিবে; আবার কেউ কেউ পরিচালক গোষ্ঠীর সদস্য।

কলিকাতায় একাণির সাংস্কৃতিক-মণ্ডণে কমানিয়ার এই শিল্পীরা তাঁদের লোক-সঙ্গীত ও লোক-নৃত্য পরিবেশন করেন শীতের ত্রুটি সঙ্গায়—১৯ঠা ও ১৯ঠা ডিসেম্বর। কলিকাতাবাসীদের

মধ্যে ধারণের পক্ষে এই অনুষ্ঠান-হুটি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইবে, তাইয়ের মনে বহুদিন সজীব হইবে থাকবে সেই স্মৃতি—যে-স্মৃতি শুধু আনন্দপূর্ণই নয়, শিষ্টদশাময়। কমানিয়ার নৃত্যশিল্পীরা যে কয়টি লোক-নৃত্য পরিবেশন করেছেন, তার মধ্যে যুক্ত কোনো ইতিহাস বা শিল্পীতি না থাকলেও, তাঁদের প্রতিটি নাচই প্রাণবন্ত ও রসোচ্ছল। তাইয়ের লক্ষ্যবস্তুর বসিষ্টতা, রস-প্রকাশের একতা, জীবনবাহিনীর স্বকীয়তা এবং সাঙ্গরক্ষার বৈচিত্র্য দর্শকমনে বেন একটা ভগতীর মারকতা এনে দিইছিল।

এদের অহুর্দান শুরু হয় দক্ষিণ-কমানিয়ার অতিনিরা-গ্রামের একটি গ্রাম-নাচ দেখিতে। যেহেতু পরনে লালবস্ত্রের ডাট, হাত-চীন দস্তা কোট, আর মাথায় রেপহী ওড়না। নাচতে নাচতে তারা বেন গ্রামের যুবকদের গ্রামে নাড়: জাগিয়ে তুললো। যুবকরা এলো ঘোঁবনের আমন্ত্রণে, হাতে হাত মিলিয়ে গ্রামা-তরুণীদের নিয়ে তারা বেতে গেল অগম্য এক প্রাণোচ্ছল নাচে। পরবর্তী নাচের নাম দেওয়া হইছিল—‘মল্লাভিড্যান’। একটি আত্মনিবেশনের কহিনীই নৃত্য হইতে উঠেছিল এই নাচের মধ্য গিয়ে। এঁদের আর একটি উল্লেখযোগ্য নাচ হলো বংশোদ্ভাবনের নাচ। বংশবিস্তার লোকসকল সজ্জিত হয়ে ছোলাবহ অঙ্গর নাচের মধ্য দিয়ে কমানিয়ার গ্রামে ছোলামেয়েরা নাকি এভাবেই কতকাল বসন্তের বন্ধনায় উচ্ছল হয়ে ওঠে। শেষের দিকে এরা বেড়াবে ‘আলবাম’ থেকে দেবিরে এসে গুটিকতক ছোট ছোট নাচ দেখালেন—আঙ্গিক ও বিহব-বৈচিত্র্যে সজ্জাই তা অভিনব। কোনো নাচে প্রানের অভিব্যক্তি, কোনোটার বা মিলনের, আবার কোনোটার বিরহের। একটি নাচে আবার, এক বৃত্তকে বেগা গেল ঘোঁবনের অভিলক্ষ্যকণে। এঁদের ‘ওলাস’ ও ‘বানাত’ নাচ-হুটি দর্শকযুবককে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। আঙ্গিক নৃত্যর চেয়ে হাত-লাস ও ভাবের অভিব্যক্তিতেই এইসব নৃত্যশিল্পীরা অধিকতর পটু। এঁদের কোনো কোনো লোক-নৃত্যের সঙ্গে এসেণের শাস্ত্রীরা গ্রামা-নৃত্যেরও কিছু কিছু মিল বোধ করি বুঝে পাওয়া যায়।

কমানিয়ার এইসব লোক-নৃত্যগুলি তাই উঠেছিল প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথমত, এইসব শিল্পীদের অপরূপ দৃশ্য, বিশেষত বহিরা-শিল্পীদের রূপলাবণ্য। দ্বিতীয়ত, নৃত্যশিল্পীর আনন্দময় চক-হৃদয় ও সাক্ষরক্ষার ওচ্ছলতা। আর তৃতীয়ত, অর্কেস্ট্রা-বাদন। নাচের সঙ্গে বিভিন্ন বাতবস্ত্রের সুর-মুচনা নাচের সত্যিই উপভোগ্য করে তুলতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন—(যেহেতু মতো): মারিয়া বাতিয়ু, মোরিকা ড্যু, ইউজেনিয়া বালোই, কোরিকা ইগেভো, কোরিকা আদু, ভ্যালেন্টিনা বাসেয়া, কোরিনা কোভাকি, আনা হুদি লোইয়ু, এলিজাবেথা গাথোর ও তামারা মুকুনয়া। নৃত্য-পরিচালনা করেন—শেতে বোলেশুং। শেতে বোলেশুং ‘কমানিয়ার ইন্সটিটিউট অব কালচারাল রিসেশন্স’ উঠে করেন কাস্ট্রিক্স-এর ডিরেক্টর।

এই দলে একক সঙ্গীত-শিল্পী হিসেবে এসেছিলেন জ্যাসাইল ওগুয়েয়া। অপরূপ কণ-শাসিত্যের অধিকারী তিনি।

কমানিয়ার এইসব লোক-নৃত্য ও লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে সে বাতবস্ত্রগুলি বেতেছিল তা হচ্ছে—ক্র্যরিওনেট, হারমনিয়ন, সাক্সোফোন, অ্যাকর্ডিয়ন, পিউলিনা, ডাডনা, সিথালো, বেহালা, চেলা, কণ্ট্রাবাস, প্যান-পাইপ প্রভৃতি। প্যান-পাইপের বাজনা বোধ করি আজও প্রত্যেক দর্শকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে আছে। কারণ, এত সুন্দর ও অভিনব পাইপের বাজনা এসেণের লোক আসে শোনেনি। এটি বাজিয়েছিলেন আইয়ন ওগুয়েয়া। আর একটি উল্লেখযোগ্য বাজনা হলো সিথালো। সুরতের বাধ্যত্ব হিসেবেই তার ব্যবহার। যেহেতু অনেকটা ট্রাঙ্গীজের মতো। কুড়ি-পঁচিশ সোচ্চা ছোট তার এবং পঁয়ত্রিশ সোচ্চা বড় তার লাগানো থাকে ঐ যন্ত্রে। হুটি কাঠি দিয়ে তারের ওপর আঘাত করে সুর সৃষ্টি করা হয়। সেই কাঠির ডগার আবার তুলো জড়ানো থাকে, সুরের মধ্যে মিউতা বা বাধুও আনবার ক্ষমতা। সিথালো বাজিয়েছিলেন—হুমিক মারিনেজু কিউকিউ। বেহালা ও ক্র্যরিওনেট বাজনাও উপভোগ্য। বেহালায় অংশগ্রহণ করেছিলেন—আওনেল ফ্রিস্টেরা, আওনেল দিনিহু, আওনেল ভ্রাগোমিবেজু, যেওরনে টিওভোবেজু। ক্র্যরিওনেট বাজান—টাইআন লায়ুং কাগারাসাহ। ডাডনা, চেলা, কণ্ট্রাবাস ও অ্যাকর্ডিয়ন বাজিয়েছিলেন—এলেমার কোকো, ভ্যালেরিয়ান ওনেজু, অ্যাডমক ওটি, ইউজিন টেগের। অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করেন—আওনেল বুদ্ধিবোহা। ইনি কমানিয়ার একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা সরকারী-পুস্তকালয়প্রাপ্ত বয়-সঙ্গীত-বিশারদ।

বহু জাতির সংমিশ্রণের ইতিহাসই কমানিয়ার ইতিহাস। আর, বিভিন্ন সামাজিক প্রভাবেই কমানিয়ার লোক-সঙ্গীতে এসেছে বৈচিত্র্য। সাধারণ কৃষক ও বেংগালকের গানই কমানিয়ার লোক-সঙ্গীতের প্রধান উপজীব্য। কমানিয়ার

জনসাধারণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লোক-সঙ্গীতের রূপও বদলাচ্ছে আজকাল। কমানিয়ার লোক-সংস্কৃতিকে নবমর্যাদা দানের জন্তে ১৯৪১ সালে বিভিন্ন ট্রেড-ইউনিয়ন সংস্থা কর্তৃক এসেছে একটি নৃত্যসঙ্গীত-সংলগ্ন স্থাপিত হয়। সংসদটি তিনটি শাখায় বিভক্ত। প্রথম শাখায় নক্স ইজন সঙ্গীত-শিল্পী, দ্বিতীয় শাখায় সঙ্গীতজ্ঞ শিল্পীরা একটি ব্যাল ওর তৃতীয় শাখায় অঙ্গীজন নৃত্যশিল্পী। সংসদের ভ্রাম্যমাণ রক্ষক বছরে একবার করে কমানিয়ার বিভিন্ন এলাকায় অস্থানীয়ের আয়োজন করে। তা ছাড়া, কৃত্তি থেকে ত্রিশজন বাছাই-করা শিল্পী নিয়ে সংসদের ছোট ছোট দল বছরের প্রায় সবসময় গ্রামে গ্রামে ও কারখানার কারখানায় ঘুরে নাচ দেখিয়ে আসে, আর গুনিয়ে আসে তাদের গান-বাজনা। কমানিয়ার এই নৃত্যসঙ্গীত-সংসদকে দেশের লোকসংসদ-সংস্থাটি বলা চলে। সাধারণ মানুষের চিত্ত-পিনোদনের এটি একটি প্রধান মাধ্যম। শোনা গেল, গত দশবছরে এই সংসদ কম করে প্রায় হু'হা'কার লোক-সঙ্গীত ও লোক-নৃত্যের অস্থান করেছেন। দেশের বাইরে এরা গিয়েছেন—সোভিয়েট রাশিয়ায়, হাংকংয়ে, পূর্ব-জার্মানিতে আর ফিনল্যান্ড, জাপান, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, মিশর, সিরিয়া ও লেবাননে। এবার এরা ভারতেও তাদের অস্থান প্রচার করে গেলেন।

কমানিয়ার রাজধানী বুধারেস্টে এই সংসদ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেন এবং বার্লিনে পান দ্বিতীয় পুরস্কার। এই সাংস্কৃতিক-সংসদ কমানিয়া-সরকারের কাছে থেকেও দুটি মূল্যবান খেতাব পেয়েছেন। তা হলো— (১) স্টেট ব্রাইজ লাইসেন্স ও (২) অর্ডার অব লেগার (কাল্টুর-ক্লাস)। এই সংসদের সাক্ষ্যের শিল্পে কমানিয়ার কয়েকজন সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ, সঙ্গীত-ব্যবস্থা ও সাহিত্যিকের

এছোঁও বড় কম নয়। সংসদের প্রত্যেক শিল্পীই দেশের প্রাচীন ও আধুনিক লোকসংস্কৃতি, সাহিত্য ও অস্তিত্ব চাক্ষুসের তথ্যাদি সংগ্ৰহে ও অস্থানীয়ের বরণন।

দেশের নেতা ও শিল্পীরা ছাড়া, কমানিয়ার এই সাংস্কৃতিক-দলের সঙ্গে এসেছিলেন—দারিন ব্রাগোই (কমানিয়ান পিপলস রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি; বুধারেস্ট ফোক-লোর ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক, সরকারী-পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন প্রতিভাধর শিল্পী); হেরিয়া পানাই-তম্বু (কমানিয়ান ইনস্টিটিউট ফর কালচারাল রিসেশন্স উইল করেন কাল্পনিক-এর পরিচালক); আওন বুধুর (সংসদের অল্পতম পরিচালক) এবং এরিকা সাক্সের (প্রতিনিধি-দলের সেক্রেটারি)।

কমানিয়ার এই সাংস্কৃতিক-দলটি নতুন-সিগা থেকে কলিকাতার এসে পৌঁছান ১৯ই ডিসেম্বর (১৯৭১) সন্ধ্যায় এবং কলিকাতা থেকে বেয়েই দাড়া করেন ১৯ই ডিসেম্বর রাতে। হাওড়া স্টেশনে এদের আগমন ও বিদায়কালে কলিকাতার কয়েকটি সাংস্কৃতিক-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও নাট্যকার এবং অভিনয়কারীদের পক্ষ থেকে কর্মসূচীও উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়কারীদের উদ্যোগেই কলিকাতায় এদের অস্থান আয়োজিত হয়েছিল। কলিকাতার অবস্থানকালে প্রতিনিধিদল 'কলিকাতা সাংস্কৃতিক-সংলগ্ন'-এর একটি অধিবেশনে এবং 'জাননাগ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন'-এর একটি সংবর্ধন-সভায় উপস্থিত হয়ে এসে দেশের সঙ্গীত ও নৃত্য বিশেষভাবে উপভোগ করেন। বরীন্দ্রনাথের প্রতি প্রতিনিধিদলের সকলই বিশেষ প্রশংসিত। কমানিয়া-ভাষার অন্বিত কবির বহু কবিতা ও গান তাদের শুধু জানাই নেই, কেউ কেউ মুখ ক'রেও রেখেছেন।



বাঁচোয়া

কালীদাস চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যক্ষ না হলেও, ঘটনাটা অর্ধপ্রত্যক্ষ। কেননা, আমার অর্ধাঙ্গী একেবারে চোখের ওপর ঘটেছে এটা। সেদিন রাতে কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরেই তিনি এর বিবরণ দিয়েছেন।

বয়স হয়েছে, কাজেই এখন আর কলকাতা-হেন কাছেপिঠে যেতে হ'লে সঙ্গীসার্থী নেন না। সেদিন বিকেলে মহানগরীতে যেতে হয়েছিল তাঁকে। রাতে ফিরেই বললেন ঘটনাটা।

তার মুখে যেমন শুনেছি, তেমনি বলবার চেষ্টা করি :

শেখারদায় এসে, বৃক্কে, পেলাম শান্তিপুত্রের গাড়ি। কী ভিড়—কী ভিড়! যেন মুগি-বাঁচা গেলেছে। পরের গাড়ি তো কেমনগরের। ভিড় ওর চেয়ে কম হবে না। নিছিনিছি দেরি ক'রে লাভ কী?

উঠে পড়লাম মেয়ে-কানরায়। আমি একা গেলে, মেয়ে-কানরায় ছাড়া কখনও উঠিনে। জান তো।

বসবার জায়গা পাব ভাবিনি। একটি বউ—তারি লক্ষ্মী মেয়েটি—অনেক ক'রে এপাশের লোককে ঠেলে ওপাশের লোককে সরিয়ে, জায়গা ক'রে দিলে বসতে। একেবারে জানলার ধারে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম যেন।

গাড়ি তো ছাড়ল। গাড়ি চলছে। একটা লোক টপ ক'রে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বাইরে পানির ওপর। ব্যাটাছেলে। বয়েস, ধর, পঁচিশ-তিরিশ-ফিরিশের বেশি হবে না। ভয়লোকের ছেলে। গায়ে করদাভোরাকাটা শাট। চেহারাটাও খারাপ নয়।

লোকটা যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখানটাতে বসেছে এক মোটা গিন্নি। সে তো একেবারে

খাকখ্যাক ক'রে উঠল, “মেয়েছেলের গাড়িতে ব্যাটাছেলে উঠেছে কেন? নেমে যাও—এছুনি নেমে যাও!”

ছেলেটা বিনয় ক'রে বলল, “গাড়ির ভেতরে তো উঠিনি, মা, বাইরে বুলছি। কী করব বলুন—”

গিন্নিটা বলল, “মেয়ে-কানরার বাইরেই বা দাঁড়াবে কেন তুমি? শিগগির নেমে যাও, তা নইলে কেলে দেবো ঠেলে।”

তখন ভীষণ রাগ হল আমাদের। ‘মা’ বলছে ছেলেটা। কুলে যাচ্ছে বাইরে, কোথায় কুই ভেতরে তুলে নিবি, তা নয়, বলছিস—‘ঠেলে কেলে দেবো!’

লোকটা বলল, “তাই দিন, মা। আপনি মা, আমি আপনার ছেলে—আপনার যদি ইচ্ছে হয়, ঠেলেই ছেলে দিন।”

গিন্নিটা তবু মুখ করছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল কিছু বলি। কিন্তু বউটাই বললে। আঁহা, বেশ বউটি গো। তারি লক্ষ্মী মেয়ে, বৃক্কে? কী চমৎকার দেখতে। বেশ লেখাপড়া-জানা মেয়ে মনে হল। সেই মোটা গিন্নির পাশেই বসেছে বউটা, আর তার পাশেই আমি। মানে, গিন্নির আর আমার মাঝখানে আরকি মেয়েটা। সে বললে, “স্ট্রা দিদি, অত যে বলাছেন, আমরা মেয়েরা যখন ছেলেদের কানরায় উঠি, তখন তো কই তারা নামিয়ে নেয় না আমাদের। বরং বসবার জায়গা না পেলে ওরা উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের জায়গা ছেড়ে দেয় বসতে। আর, ভয়লোক চলন্ত ট্রেনে উঠতে বাঁধ্য হয়েছেন। দাঁয়ে না পড়লে অমন কুঁকি নিয়ে কেউ ওঠে না। কানরার ভেতরেও আসতে চাইছেন না। আপনাকে মা বলছেন—আচ্ছা, নিজের ছেলে হলে আপনি পারতেন বলতে নেমে যেতে?”

সামনের বেকির একটা মেয়েছেলে বলল, “ওঁর

নিজের ছেলে আছে কিনা তাই জিজ্ঞাস করুন আগে। ছেলের মা কখনও অবন হয়?”

গিরি তো একেবারে হুসার ছেড়ে উঠল, “আমার ছেলে নেই—তোমার আছে? আট-আটটা—হু-উ গণ্ডা ছেলে ধরেছি এই পেটে, জানিস আটকুড়ী!”

আর বাবে কোথায়! আটকুড়ী বলা! তুল-তুল মগড়া বেধে গেল। লোকটা বাইরে থেকে চ্যাচাতে লাগল, “আপনারা থামুন, মা—থামুন, দিদি—আমি পরের স্টেশনেই নেমে গিয়ে অল্প কামরায় উঠছি—নেহাত চলতি গাড়িতে বসেই—”

বউটা হুজনের, বলতে গেল, হাতে-পায়ে ধরতে লাগল, “থামুন না, দিদি,—ছিছি, কী করছেন আপনারা! ব্যাটাছেলে-ব্যাটাছেলে করছেন, ব্যাটাছেলের সামনে মান রইল কোথায় আপনারদের—”

কে কার কথা শোনে!

পরের স্টেশন এল—উন্টোডাঙা। লোকটা বলল, “সুখ বাড়িয়ে একবার চেয়ে দেখুন, মা, সব কামরার সামনে সার ধরে লোক কুলছে। নেমে গিয়ে এর মধ্যে আমি উঠব কোথায়? এখানে তবু পাদানিতে পাড়াতে পেয়েছি, আর কোথাও যে তাও পাব না।”

গিরিটা তেড়ে উঠল, “কী-ই! বদমাশি পেয়েছ তুমি? এই বললে, পরের স্টেশনে নেমে যাব, অগ্নি এখন বলছ—”

লোকটা বলল, “আচ্ছা—আচ্ছা, মা, আমি নেমে যাবছি, আপনি শান্ত হোন। কিন্তু নামাই সার হবে, ওটা আর হবে না আমার। অথচ এ গাড়িতে আমার না গেলেই নয়—”

সত্যি নেমে পাড়াল লোকটা। কিন্তু তক্ষুনি গাড়ি দিল ছেড়ে। উন্টোডাঙা স্টেশন তো? কটা সেকেন্ড যে খেবেছে গাড়ি, সেই বেন ঢের। বউটা চোঁচিয়ে উঠল, “না-না, আপনি উঠে পাড়ান—উঠে পাড়ান—নামবেন না!”

লোকটা কেব উঠে পাড়াল। গিরিটা ফের তেড়ে উঠতেই, বউটাও এবার তেড়ে উঠল, “আপনি পেয়েছেন কী! এ কামরায় কি একা আপনি যাচ্ছেন? আর কেউ বাড়ি না আনরা? আমার সবাই মিলে বলছি ভত্সলোককে ভেতরে উঠে আসতে।”

লোকটা বলল, “না, দিদি, ভেতরে আমি যাব না। আপনারা বললেও যাব না। আমার নিজের একটা কবন-সঙ্গ আছে তো? এর পরের স্টেশনে—দমনদ জংশনে গাড়ি ধামবে বেশিক্ষণ, লোকও নেমে যাবে অনেক। সেখানে আমি ঠিক বেনে গিয়ে একটা কামরায় উঠব। এ কটা মিনিট আনায় পাড়াতে দিন, না।”

এটা বলল গিরিকে আরকি। গিরিও তখন দেখল যে, সারা কামরার তার মধ্যে তার পক্ষে আর কেউই বলছে না। সবাই বিপক্ষে। গিরি বলে উঠল, “পাড়াবে তো, গা ঘেঁষে পাড়ানো কেন? স’রে পাড়াতে পার না? যারা দমন দেখাচ্ছে, তাদের গায়ের ওপর গিয়ে পাড়াও না।”

সবাই হেসে উঠল। আমি বললাম, “আসল কথা হচ্ছে তাই। দিদি একটু গায়ে-ভারী মানুষ, ঠর গায়ের ওপরকার হাওয়া কখনো ঠর দমন বন্ধ হয়ে আসে না?”

“আসেই তো। আসেই তো দমনবন্ধ হয়ে। পরপুরুষের গায়ের গন্ধে দমন বন্ধ হয়ে আসে—সেইটেই আমাদের স্বভাব—”

বা একধানা গলা ছাড়ল মুটকী—আমার মুখে আর রা নেই!

বউটা হেসে হেসে বলল লোকটাকে, “আপনি না-হয় একটু এদিকেই স’রে পাড়ান। হাওয়া বন্ধ হলে সত্যি ঠর অনুবিধে!”

কিন্তু, স’রে পাড়াবে কোথায় লোকটা। এদিকে তো কাঠ নেই ধ’রে পাড়াবার। বউটাকে ছাড়িয়ে, আমার পেছনে রয়েছে আর-একটা কাঠ। লোকটা হাত বাড়িয়ে সেই কাঠটা ধ’রে পাড়াল।

মা গো! ভাবতে এখনও আমার গা শিরশির করছে!...না-না, প'ড়ে যায়নি। তা হ'লে তো আর কথাই ছিল না। আমি, ভাগ্যিস, জানলায় কসুই রেখে বসেছিলাম, তাই আমার পেছনের কাঠ ধরলেও, লোকটা পাড়াল বউটার আর আমার মাঝখানে। কতকটা বউটার-ই গায়ের ওপর আঁকি।

আহা, ভারি লক্ষী বউটি। কী চমৎকার দেখতে! ভারি ভালোমানুষ। একেবারে সরল ছেলেনামুখ গো!

হ্যাঁ, বলছি। তারপর আর বিশেষ কথাবার্তা নেই। আজকাল বড় লোক খেড়ে গেছে, কী দুর্দশা হয়েছে লোকের, তাই নিয়ে দু-একটা কথা বলছিল লোকটা। আমরাও হঁ-হাঁ করে যাচ্ছিলাম আঁকি।

দমদম জ্বন্দন এসে পড়ল। গিগিটা বলল, “এবার কিন্তু নেনে যাবে তুনি। তা নইলে কিন্তু শেকল টেনে গাড়ি থামিয়ে দেবো আনি ব'লে রাখছি।”

দমদম স্টেশনে ঢুকছে গাড়িটা। তখনও বেশ স্পীড। প্লাটফর্মটা ভীষণ লম্বা তো? তার শেষ মাথায় এসে তবে তো গাড়ি থামবে। লোকটা পারানি থেকে লাফ দিয়ে পড়ল প্লাটফর্মের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে বউটা চিংকার করে উঠল। কী হল!...আমরাও ভেবেছিলাম, লোকটা বুকি উল্লার-কলায় প'ড়ে গেছে। পড়ে যাবে কী! লোকটা। তখন ছুটে পালাচ্ছে। আশ্চর্য! স্টেশন-ভরতি লোক গিসগিস করছে...তা কে-ই বা লোকটাকে ধরবার জন্তে তৈরি হয়ে আছে, বল। কেউ নামতে বাস্তু—কেউ উঠতে বাস্তু...

কী আবার! সেই বউটার গলার হার ছিঁড়ে নিয়ে লাফ মেরেছে লোকটা।

ধব্—ধব্—ধব্—। কে কাকে ধরে! আশ্চর্য, চোখের সামনে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল লোকটা।

আহা! ভারি ভালো মেয়েটা গো! কী সুন্দর মুখখানা। গা-ভরতি গয়না। গয়না প'রে কেন যে লোক পথে-ঘাটে বেরোয়!...আমার, বাপু, গয়না-কয়না নেই—ঝামেলাও নেই—বঁচেছি!

পরিপাটী মুদ্রণ

কম্বার

নিখুঁত ব্রহ্ম-তৈয়ারির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

॥ কলার স্টুডিও ॥

৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী সেন, কলিকাতা ৬

খেজুর-মহল তুলসীদাস সিংহ

'রস, চাই র—স'—...। সকালটা হলেই গলার বাবুঁলড়ি-বাঁধা স্পেশাল কোচগুলির একটা হাঁড়ি কাঁখে চালিয়ে, মাঝারি সাইজের একটা রাস হাতে নিয়ে লাড়িহুড়িওয়াদা যে সাহেববা অনিতে-গলিতে উপরের হাঁকটি হেঁকে ঘুরে বেড়ায়, তারা শহরের লোক নয়—গাঁয়ের লোক। আর যেখানের অনিতে-গলিতে ঐ হাঁকটি পেড়ে তাক্সা ঘোরে, সেগনটা গা নয়—শহর। খেজুরগাছের রস—ও আবার কেউ পরদা দিয়ে কেনে নাকি ! তুমি শহরে বাসু, বেদার পরদা আছে তোমার, রস পরদা দিয়ে কিনে খেতে পার—তুমি কিন্তু মনে রাখবে আমবা গাঁয়ে বাস করি, আর মনে রাখবে পরদাটা খোলানকুটি নয়। পাড়ারগাঁয়ের অনিতে-গলিতে বহি কোনো মহলদার ঐ হাঁকটি হেঁকে ঘুরে বেড়াতে বায়, তাহলে দশ বছরের ছোঁড়াই হোক আর বাট বছরের বুড়োই হোক, এক হাত নিয়ে পর ছাড়বে—এটা সাঙতাল-পাড়া নয় গো, যে লগম বিক্রী করবে। সকালে উঠে বিনা পরদায় যে খেজুরের ডাল ভেঙে ঠাতন করি, যে খেজুর পাকলে তরোর-ছাগলে খেয়ে এলে বায়, যে গাছের গোড়া কেটে মাখার ময়দাটা পর্বস্ত ঘেবে কেলসেও কারও কিছু বলবার এক্টিয়ার থাকে না, সেই খেজুরের রস তুমি কিনা হাঁড়িতে ফুড়িয়ে পরদা গুটতে চাইছো, কই দেখি ঠাণ তোমার বদনটা !

অতঃপাং পুঁথিকের জানালাটা খুলে দিয়ে সকালের রোদটি গায়ে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে বলি আপনি 'রস, চাই র—স' ডাকটি শুনতে চান, তাহলে শহরে যেতে হবে আপনাকে। পাড়ারগাঁয়ে রস-ই মিলে, 'রস, চাই র—স' ডাকটি মিলে না।

কিন্তু সে হাই হোক, এ রস থাথা সংগ্রহ করে তাষিকে বনিহারি হাই ! কার্পোটা ঐ খেজুরগাছ—গোটা গা তার শক্ত শক্ত খাজে ডতি, কে বলবে ভিতরটা ওর রসে টটুঁতুর। সাধারণের তোষে খেজুরগাছের গা-টা তো কাঠের নয়—পাথরের। ঐ পাথরের গা থেকেও আবার রস নাযে নাকি !

অন্য মহারসিক—দীর্ঘদা পাখান থেকেও সে রস সংগ্রহ করতে পারে, কিন্তু আমি মহলদারকে অবশেষে চাইতেও বড় রসিক বলে মনে করি। অন্য রস গ্রহণ করে নিজের জন্তে, কিন্তু মহলদার

রস গ্রহণ করে পরের জন্তে। দ্বিতীয়তঃ, অন্তর রসিক হলেও, বন-রসিক—বারো-মান চম্পিন-বটী ধরেই সে 'রস রস' করে, কিন্তু মহলদাররা সময় বুকে, কোন্ সময়টার রস বেশ জ্বাট বাঁখে, কোন্ সময়টার 'রস রস' করে পাগল হতে হয় তা তারা ভালো করেই জানে।

দ্বীঘ বর্ষা শরৎ বলন্ত আহুক, চলে যাক—একই কথা। শিরশিরে শীতের হাওয়া না বইলে রস জমবে কোথা থেকে ? আর জ্বাটা রস ছাড়া অন্ত রস রস-ই নয়। সুরসিক মহলদাররা এ কথাটি বেশ ভালোভাবেই বুকে, এবং বুকে বসেই শীত ছাড়া অন্ত সবর 'রস রস' করে না। শীতের হাওয়াটি যেই গায়ে লাগতে আরম্ভ করে তেমননি তারা এসে মগ ধায়ের কর্তালদে সামনে ফুটী-হেসে ঠোঁড় : বাবুদশ—আলার—

বাবুদশাইগা দুখডগো বেজার করে প্রাণ এক কথাই



বায় হাঁড়ি-দেওয়া



খেজুর-বাগ

বলেন—তা এনি, বেশ করণি। গতবছর ধান-আগারে যে ব্যস্ত হইলাম—আর সেই থাকে ছুটুও করে উড়ে গিলি, তিন-তিন সের গুড় আনার জলে গেল! বতনা ঢালাক নাহব—লক্ষণ বুকে ভেগ-হেতের বা হোক আটিকে নিলে—ঐকতে হল কেবল আমাকেই। এ বছরও যদি সেরকম হয় তাহলে আগেরভাগেই বলে দিছি, মহল তোদিকে করতে হবেনা এ পাঁয়ে—তোদের মতো অমন ডের মহলদার আছে—

মহলদার স্যাহেব তখন ঘাড়ের চুলে আঙুল চুকিয়ে বলে, মাথ করে পাগোইনি, বাবু—বাধা হয়ে পালাতে হয়েছিল। বড় জানাইটা এসে পবর দিলে যেহেটা আমার গাড়াগাড়ি-রকম পড়ে আছে—সব কেলে ছুটতে হল হঠাৎ। যদি ঠাকি দেবার মতলব থাকতো, তাহলে কি আর আসতাম এ বছর, বাবুদশর? তিন সের আপনি হুদ সহ বেশে দেন-না এবার—

ঘনের মতো কথা। হুতরাং বাবুদশাই এবার উৎকৃষ্ট হয়েই বলেন—আনিও নাহব চিনি, ফলেশান—আনিও নাহব চিনি। তখনই আমি ধরেছিলাম একটা কিছু ঘটেছে, নইলে ফলেশান কখনো তোষে থুলা দেওয়ার পাত্র নয়। তা, ঘরের ছেলেপিলে সব ভালো তো? চাখ-আবাখ-কেমন হল?

হয়-আতিথ দরকার নেই, বাসী রাখতে হয় না—খেজুরগাছ আপনা থেকেই হয়। খেজুরগাছ মারকত বা নিলে তা ঐ 'হুড়িয়ে পাওয়া চোক আনা'ই। গাছের মালিকরা এবং মহলদাররা উভয়েই সে-কথা বুকে।

মালিকরা বুকে—আর বাই হোক—আখন-পিঠে, শৌখ-পিঠের জন্তে তো ট'গাকে হাত দিতে হচ্ছে না; মহলদাররা বুকে—এ বছর তোষে থুলা দিয়ে কেটে গড়লেও, আসছে বছরের জন্তে ডাবনা করবার কিছু নেই।

শীতভোর গাছ থেকে রস নামাবে মহলদাররা, সেজন্তে গাছের মালিকরা পাবে গাছ-পিছু তিন সের গুড়, কোথাও বা আড়াই সের, কোথাও বা আবার চার সের। মহলদারদের ডাবার এর নাম হল 'বাখনা দেওয়ার'। বাখনা—বাধা থাকনা, বার বার বরদস্তর করতে হয় না—তবে গাছে হাত লাগানোর আগে কী-বছরই মালিকদের কাছে ছুটুও নিতে হবে। মালিকদের কাছ থেকে ছুটুও নিলে যাওয়ার পর মহলদারদের কাজ হল 'কামান দেওয়া'। পালাপাত

বুড়ে কামান দেওয়ার পর গাছগুলো যাদুক, তারপর ভায়ের দশার তখি চুকো, তারপর ঘরের দিকে ডাকাও। পালাপাত বুড়ে কামান দেওয়ার কাজটাই হল সবাইতে শক্ত কাজ। পাতাপাতক মহলদার ছাড়া আনান্ডী ঘটায়ামরা যদি এ কাজে হাত লাগায়, তাহলে ধরে নিতে হবে গাছের ব্যোরাটা বেঁকে গেল। কামান দেওয়ার সময় কোশটা একই কৌশলকম হয়ে পড়লেই, বত জোয়ান গাছেই হোক, দেখতে দেখতে শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করবে। পক্ষাশটা কামানো গাছের মধ্যে বিপটা শুকিয়ে গেল—এমন কত জারগার দেখা যাবে। জানাশোনা মহলদার ছাড়া নজুন-আসা মহলদারদের হাতে গাছ ছেড়ে দিতে মালিকেরা তাই সহজে রাজী হয় না। ফলেশান-ই বলেছিল—এ কথ করতে চুল শাকলো, বাবু, কিন্তু হেতের ধরলে এখনও বুকাটা কাপে—পাছে বেতালে হাত পড়ে, পাছে কোশটা একই বেশী হয়ে যায়। গাছ মরলে, মালিকরা আসতে দিবেনিকি—চুকতে দিবেনিকি গায়ে।

গাছ হুড়বার সময় যে পাতাগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো দিয়ে মহলদাররা এক বিশেষ রকমের হুড়ে তৈরি করে। এদের ডাবার এর নাম হল 'মহল'। এ-মহলে থেকেই ঘরের 'সিঙ্কিনটা' ভায়ের কেটে যায়। খেজুরের রস বততিন গড়াবে, হুড়ের আখও তততিন গড়াবে। রসও মরবে, হুড়ও বতম হবে। এ মহলগুলো বারা তৈরি করে, তাগাই হল 'মহলদার'। আর এ মহলগুলো বারা তৈরি করে, তাগাই হল 'মহলদার'।

গাছের গলা দিয়ে বখন রস নামতে আরম্ভ করলো,

মহলদারদের আসল কাজ শুরু হয়ে গেল তখন থেকেই। হুবহু বোমার কোমরে হেভেনলাডিওথান বসেটাকে বেঁধে, হাতে বোটা বেটে-বসেট একটা হুড়ি নিয়ে গাছে গাছে ঘুরতে আরম্ভ করে মহলদাররা। তাদের গাছে-ভাঁটা সেখবার বসেট জিনিষ—টিক বেন লাক দিয়ে দিয়ে উঠছে। গাছের বেধানটা দিয়ে বস নামছে, তার হাত-হুহে নীচে একটা কাঠ বাঁধা থাকে—সেটার উপরে হু-পারে তর দিয়ে ঠাঁড়িয়ে, কোমরটাকে গাছের সঙ্গে হুড়ি দিয়ে বেঁধে, হু-হাত দিয়ে কাজ সারে তারা। কাজ সারা হলে, কোম আবার লাকতে লাকতে নেমে আসে নীচে। এক-একটা গাছে ঠাঁড়ি দিতে মহলদারদের লাগে এক থেকে দু-মিনিট। হুবহু বোমার ঠাঁড়ি হুলতে আরম্ভ করে, সন্ধ্যার আসেই কাজ শেষ করতে হয় যে তারিখে।

সারা রাত ধরে এবার বস পড়ক টলটল করে, ঠাঁড়ি ডতি হয়ে উঠুক, তোমের শাক-কোকিল ডাকলে কোম আবার নাখিয়ে নিয়ে যাবে ঠাঁড়িগুলো। খুব জোর থাকতে থাকতে মহলদাররা গাছ থেকে ঠাঁড়ি নাখায়। যারা বস-পালসা তারা গর্তে মহলদারদের চাইতেও ডোরে। মহলদাররা গাছ থেকে ঠাঁড়ি পেড়ে তলার পা দিতে-না-দেতেই বলে তারা—কি সাহেব, আজ জিরান-কাঠি, না? হুড়টাকে বেজার করে সাহেব তখন বলে—আর লাগম, যাবু—আপনারিখে। হুড়টা থাকবে, চেয়ে খান। চাইতে এলে বন বন—সিবনিকা, তখন না-হয় গাছ থেকে ঠাঁড়ি পেড়ে খানগা। হুড়টা গাছের ঠাঁড়ি নাখানো তবু ঠাঁড়ি আর ভুলনি। এমন করলে গা ছেড়ে পালাতে হবে, যাবু।

কইকে কি কচকে তখন জবাব দেয়, মাইরি বলছি সলমান, ঠাঁড়ি তোমার ছুইনি আজ—হো পাড়ার কেউ এসে বেয়ে গেছে তাহলে।

কেয়ট ভাইদের বালাই যেমন বগ আর ঝুঁপী, মহলদারদের বালাই তেমনি কচকে আর কইকে। গাছ একটা নর, একশোটি। পাঁচজন মহলদার একশোটি হয়ে তো আর একশোটি গাছের তলার ঠাঁড়িবে থাকতে পারে না? সায়েব প্রাণী জলে উঠবার আসে-আগেই বস গাছে ঠাঁড়ি স্থানিয়ে মহলদাররা চলে এল যহলে। পরবর্তক রাত হলে সেখ এল—কোমটার হু-গোলাস, কোমটার জিন গোলাস বস লসে আছে। হাতে একটা চর্চ, লসে বার পেটে কচা থাকে এখন একজন পেছারের লোক দিয়ে, পাটিনে টিপে গাছতলার এসে ঠাঁড়ি দিয়ে পড়। সন্দের কইকে কান চোখ বুলে বাড়ি থাকুক, আর ছুটি তড়তড় করে উঠে পড় গাছটার। উপরে

উঠে কোমরের হুড়টা বুলে ঠাঁড়ির গলার বাঁধে, তারপর হুহাতে বালস্তি নানানোর বসেট নাখিয়ে লাগ সেটা হুহুড় করে। মারিতে হেঁকবার আগে কইকে ধরে নিখু ঠাঁড়িটা। ধরে, হাতের মটটারে ঢেলে নিখু হুড়টা। মহলদাররা যদি ভালোমানুষ হয়, বস চুপি করে খেলও পানিগোলাস তেমন না দেয়, তাহলে তুমি কোম ঠাঁড়িটাকে হুলে টাঙিয়ে রাখ; আর মহলদাররা যদি পানী-প-পাড়া হয়, তাহলে তলার ঠাঁড়ি আর উপরে উঠিয়ে কাজ নেই। বোটা ঠাঁড়ি গুড়গুড়ি খেতে খেতে হু-কটাল হয়ে পড়ে খান গাছতলাতেই।

মহলদাররা গালমল দিয়েও বন পারবে না, তখন ব্রাহ্ম প্রয়োগ করে। রসের ঠাঁড়িতে পুতরো-বীজ কেলে দেয়। রসের সঙ্গে পুতরো-বীজ বিশেষ রসকৃত বিবকৃত হয়ে থাকে একেবারে। এ বস বিনি মুখে হুসবেন, তাঁকে আর ঘুরে ঘাস খেতে হবে না! শিখ মহলদাররা যদি ভালো ভালো যার—কইকে-কচকে তাহলে পাড়ার-পাড়ার যার! সকেহ থাকলে, রসকে বড়িতে এনে একটু ছুটিয়ে নিশেই তো চুকে গেল। আগুনের কাছে পুতরো টিকবে কতক্ষণ?

একে তো বেজুর-বস, তার আবার যদি দে-বস জিরানকাঠ হয়—তাহলে পুতরো কেন, কানীশাপের বিকই বা বিশিয়ে গিলে—পেড়ে খেতে কেউ দিচ্ছিলে যাবে না। জিরানকাঠ অর্থাৎ পরন্ত বে-গাছটার রস টাঙানো হয়েছিল—কাল বস টাঙানো বন্ধ ছিল, কোম আজ টাঙানো হয়েছে—সে গাছটার রসই হচ্ছে জিরানকাঠ বস। মেয়েই বাঙদা হোক আর ছুপি করেই বাঙদা হোক, এ বস বিনি খেয়েছেন তিনি বলবেন, রেখে লাগ হে নাগর—তোমার রসপোলা।

রসের চাইতে ভাতরসি আবার আরো এক কাঁটা। রসের। বেজুর-বসটি কেন রস—মানে, কি রকমের রস, সে কথা বাক্য দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার সাধ্য নেই আমার। রস—তা সে বেজুর-বসই হোক, আখ-বসই হোক, রসপোলায় রসই হোক আর সাহিত্য-বসই হোক—গাঁত সেখে বলবার উপায় নেই—এটি গ্রিক যোগে বহুরে, এটি আর্গারো বহুরে, এটি বিশ বহুরে, এটি বুড়ো, এটি সোয়ান; “মাইরি বস, ঘুরে বস—গাঁত দেবি তোর, বহস কত” মানেই—রসের গাঁত নেই যে সেসে বহস মানুষ হবে। তবে হ্যাঁ, এইটুকু আমি বলতে পারি—রসকে যদি আগুনে ভাতানো যায় তবে তার দাম বেড়ে যায় অনেক অনেক বেশী। তা সে বস প্রের-বসই হোক আর বেজুর-বসই হোক—এখ সে আগুন বিরহ-আগুনই হোক আর কারিকলার আগুনই হোক। বেজুর-বসকে ভাতানোর



রস-বিরাট

সময়ে যখন সেটি লাল-মতো হয়ে ওঠে, তখন তার নাম হল 'তাতরসি'। তত্পরস থেকে হয়েছে তাতরসি। এ তাতরসি যিনি খেয়েছেন তিনিই মরেছেন। খুব পেয়ারের লোক ছাড়া মহলদাররা কাটকে তাতরসি খেয় না। রস ফুটে 'তাতরসি' হয়ে ওঠার সময় মহলদারদের ডেগের পাশে ঘটা হাতে অনেক খট্টারমই এসে গাঁড়ায়। কিন্তু মহলদাররা পেয়ারের লোক চেনে। যে 'জলুমানবের শোলায়া' রস চুবি করে খায় না, সময়ে অসময়ে চালটা-ডালটা দিয়ে সাহায্য করে 'তারা' এসে বোজট গাঁড়াক-না কেন এ-সময়টায়—হুসেমানের দুখটা গুম হয়ে যাবে না। ফুটন্ত তাতরসির দিকে চোখ রেখে ডেগের মধ্যে খোজটা বোরাতে বোরাতে খেপনহাসি দুখট করেই সে বসবে পেয়ারের লোকদিকে—চামচা তিনক গুঁড়িচা আর চামচা কতক বোঝের হ্রদ ফেলে দিলেই যেতে লাগবেক বা!

'না বলিয়া লটলে চুবি করা হু' কিন্তু 'বলিয়া লটলে' মহলদাররা নভরমতো ঐ-পাস দেয় সকলকেই। বাড়িতে কুইম-বন্ধু এলে তো কথাই আসালা। এই ধোবা, তোবার বাড়িতে আজ কুইম এসেছে, আর সে-কুইমটি হল বড়-কুইম, তাহলে তাকে রস খাওয়াতে হবেই তোমাঝে। সত্যের সময় চুবি মহলদারকে দিয়ে বললে—সাহেব, কুইম এসেছে আজ—রস খাইয়ে দিতে হবে। শোলেমান তৎক্ষণাৎ বলবে—পথরটাক হলে আসবেন একটা পাত নিয়ে—জয়ে সিদ।

এই ভয়ে বেগুদার কথাটা উঠে যাবে দুটি ক্ষেত্রে। একটি কুইম-বন্ধুর ক্ষেত্রে আর একটি বাড়ীর মেয়ে-বৌদের ক্ষেত্রে। আমরা যেটাচ্ছে—মহলে দিয়ে রস মেয়ে আসতে পারি

আমরা। মেয়ে-বৌরা তো আর তা পারে না? সুতরাং তাদের জন্তে রস পাতে ভবে বাড়িতে নিয়ে আসতে হয়। আর বাড়িতে রস আনলে, রস-বিজ্ঞাত ঘটবেই। ঐ-বে ঐ পুঁচকে ছেলে-মেয়েরা, ওরা রস দেখলে সব চীনে জোকের মতো ধরে বলে—একতু রস দাও, একতু রস দাও। ঘূষে বলে 'একতু' কিন্তু একটুতে পেট ভরেনা তাদের; একটু দিলে, বলে—'আর একতু দাও'। খেই হিলেও বিশদ—সদ্বিতে বড়োড় করবে সব। সুতরাং পুঁচকে ছেলে-মেয়েরা একদিকে চ্যাচানি তক করলো—'আর একতু দাও—আর একতু দাও', দাও কি দাও বাহ তুলে স্ববরদাহি করতে লাগলেন—'মারবো চড়ু—মারবো চড়ু', আর সেই কাকে না কি দিদিয়া

রসের দ্বার কাঁকা করে কেললেন।

রসের কথা হল—এবার গুড় আর লবাত। মহলের মধ্যে বাসির একটা বেদির উপরে গোল গোল গর্ত করে রাখা আছে—জিয়েন ঠিক করে নিয়ে, ঐ বেদিটা কাপড় দিয়ে ঢেকে গর্তগুলো গুড় দিয়ে ভর্তি করে দিলেই বখাসবয়ে গুড় জমে লবাত হয়ে যায়। এ হল সাধারণ লবাত। একটু বিশেষ রকমের লবাতের প্রয়োজন থাকলে, মহলদারদিকে একদিন আগে এসে বলতে হবে। তারা জিয়েন করবার সময় গুড়ের সঙ্গে ছোট এলাচ, কপূর ইত্যাদি পাচরকম মিশিয়ে বেশ মজাদার লবাত তৈরি করে দেবে। এর নাম হল বাহনা-বেগুদা লবাত। দাঁহ সেই একই, কিন্তু ঐ-বে সাতপাঁচ মিশাতে হচ্ছে, ওগুলো জোমাকো কইনে দিতে হবে মহলদারকে। গুড়ের চাহিয়া বধন বেশী থাকে, মহলদারেরা তখন লবাত করে না; আর, গুড়ের চাহিয়া বধন কম থাকে তখন লবাত তৈরি করে বাজারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

না—ওজন করে নয়, পণ হিসাবেই চলেছে এখনও পাড়াগায়ে। তবে এ-চলা আর বেশীদিন চলবেনা বলেই মনে হয়। হুসেমানকে যদি বলি—লবাতের দর কি আছে, হুসেমান? হুসেমান বলবে—এক পণ। মানে, টাকার এক পণ—আশীট। এক আনার নিলে, পাঁচটি। গুড়ও বিক্রি হয় পাইএ বেলে। গাছের পল্লব খাওয়া বা লেগামি হিসাবে যে গুড় খেওয়া হয়, তাও ঐ-বে বেশই—বোয়ানে বেঘন পাই। কিন্তু শহরে মাগামাপির রেওয়াজ উঠে গেছে আমেই। গুড়ই হোক, লবাতই হোক—ওজন-হরে বিক্রি

হয় সেখানে। মহাজনরা—বারা মহলে এসে গুড় বরিন করে, তারাও ঐ গুড়-নরই করে।

পেঙ্গুর-গুড় সপনেরই দরকার। তার মধ্যে ঐ পৌন-শিয়ার সম্বন্ধটাই চাহিল। মাঝখক বকম বেড়ে যায়। বারা গাছের মালিক তারা অজান্তে সময়ে একপোরা-আমণেরা এনে চাণিয়ে নেয়, বোটা পাওনাটা রেখে দেয় পৌন-শিয়ার ক্ষেত্র। বাঘের গায়ে মছল হয়নি, তারাও সব ছুটে আসে এই সময়ে মহলে। তবে সবচাইতে বেশী দরকার হয় মাঘের, তারা হল মাঘসারী—মহলসাররা মালিকে বলে 'মহাজন'। মহলসার গুড় রস খুঁটিয়ে গুড় তৈরি করেই খালাস পেতে পারে; পেঙ্গুর-গুড়ের বারা ব্যবসারী, বাইরে বারা গাঙ্গা গাঙ্গা গুড় চাপান দেয়, তার ঠিক দরকার মাফিক মহলে এসে গুড় তুলে নিয়ে যাবে। তা সে টাকে করেই হোক আর গাড়িতে করেই হোক। গাছে কামান দিতে-দিতেই তো আর রস নাও? কামান পেওয়ার পর প্রায় মাসমানেক হাত-পা গুটিয়ে হাওয়া বেতে হয় মহলসারদিগে। বারা মহাজন তারা জাল পাতে ঠিক এই ভাকুটতেই। গাঁয়ের দোকানদাররা বিবাল ক'রে চাল-ডাল ধার দিচ্ছেন। হলেমানকে, গোপাল-বাবু কি মাখালবাবুও দুখ তুলে তাকাচ্ছেন না—তখন মহাজন এসে হাসি ফোটায় হলেমানের মুখে। বিশ্বভারতী-ব্যাগটা বুকপকেট থেকে বার করে মহাজনবাবু বলেন—অসময়ে দিয়ে গেলুম, হলেমান—মনে বেন থাকে। আরি যেমন তোমাকে তোমার অসময়ে বলতে-বলতে গুনে নিদুম, তুমিও তেমনি বেন আমার অসময়ে মুখ তুলে তাকিয়ে—

হলেমান হাত কচলাতে কচলাতে হেঁ-হেঁ করে বলে—সে কথা কি আর বলতে হয়, বাবু—সেখবন-নিকু তখন।

কামান পেওয়ার পর থেকে আরম্ভ করে রস নামা পর্যন্ত সময়টা হচ্ছে মঙ্গলবারের কাছে অসময়। আর মকর-

সংক্রান্তির দু-হুন্ডা আগে থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত যে-সময়টার গুড়ের বাজার করণে—'সেগে দা গুন্ডা, সেগে দা গুন্ডা'—সে-সময়টা হল মহাজনের অসময়। বাজার চাইছে দু-টাক—তুমি মহল থেকে এনে নামোজো আধ টাক। হলেমান না-হয় বলেছিল—'সেখবন-নিকু তখন', কিন্তু হলেমানকেই এখন কে দেখে! গাছের মালিক বারা, তারা ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে—এক পোরা কম হলে, ডেগ তোমার থাকবে না, হলেমান। ভিনগাঁয়ের বাহুরেরা এসে চিলাচ্ছে—আট আনার জারগার দশ আনাই না-হয় নাও, গুড় কিন্তু তোমাকে দিতেই হবে, হলেমান। আর ওমিকে মহাজন-বাবু মঙ্গলবার মতো একটানা বলে চলেছে—সেমিসের কখাটা ডেবে কাপো, হলেমান, হাত পাডতে-পাডতে বাইরে রেখেছি, আঠাবোর জারগার বিপ-ই দিচ্ছি—দু-একটাকা দরের হেরকের দরহি না এখন—একটা টাক অম্মত: দিতেই হবে আজ—

টাক-খাইরে-মাগা মহাজন দর দিলে মণ-পিছ হুড়ি টাকা—বারা উপরি মহাজন তারা চুপি চুপি এসে দর দিয়ে গেছে বাইশ। মণ-করা দু-টাকা মানেই, পঁচিশ মণ হলে পঞ্চাশ টাকা—চাড় ভিবা দি কথা নাকি!

অতঃপর মহলসার বারই এই সময়টার চাণ্ডড় হয়—তারা করে কি, ওই মধ্যে এক ঠাকে উপযুক্ত পারে গুড় সম্ভরণ করে ফকা দেয়। পরদিন সকালে গাছের মালিকরা কি মহাজনরা মহলে এসে দেখে, মহলের ছাদনটা ঠিক আছে বটে, কিন্তু তার ভিতরে মন্তুই নেই—ডেগ-ছাড়া কোলটা রান্ধসের মতো হাঁ করে আছে—এবারে-সেখানে ছিটে-কোটা গুড়কে ঘিরে ভেঁমো পিঁপড়ের দল ফুলফুলি মারছে, ডোমসের দেশো লবাত-করা ঠাঁওগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বতইতু পাচ্ছে গুড় তুলে মুখ পুচ্ছে।

ভ্রমার্টার কটা-চিরওগি লেখক করুণ নুইত

ভালো ক'রে হুমোও

[২য় পর্বে]

লেখক : মাইকেল জসচেচেকো • অণুবাদক : সুধান্তকুমার গুপ্ত

[আধুনিক কণ সাহিত্যে চরিত্রদের গল্প নিয়ে যারা খ্যাতিলাভ করেছেন, মাইকেল জসচেচেকো (Michael Jostchenko) তাদের অন্তর্গত। এর প্রকাশকরাই যেন গল্প ও স্বাভাবিক ভাষাও যেমন সরল ও অনাড়ম্বর। পৃথিবীতে সাধারণ লোক যেভাবে আলাপ-আলোচনা করে, সেই আটপোরে ভাষাতেই ইনি গল্প নিয়ে থাকেন। বস্তুতঃ গল্পটি তার প্রকৃতি অনুযায়ী।]

সত্যি কথা বলতে কি, ভ্রমণের উৎসাহ আমার মোটেই নেই। পথে বেরিয়ে, আর কোনো অশ্রুবিধা হোক আর নাই হোক, রাতের বেলা আশ্রয় বেলা ভার। দিনের বেলাটা একরকম কাটিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু রাত্রে একটা আস্তানা না হলে চলে না।

কতবার কত কাজে বাইরে যেতে হয়েছে অনায়ে, কিন্তু যাত্রা দুটি বার স্থান সংগ্রহ করতে পেরেছি হোটেলে। তাও আবার শেষবারটা হোটেলের স্থান পাই কতকটা বরাত-জোরে। হোটেলের ন্যানেজার তুল করেছিলেন আমার সহকর্মে—আরেকজনদের আসবার কথা ছিল, তিনি ডাবলেন আমিই বৃষ্টি সেই লোকটি। অবশ্য পরের দিনই তুলটা তাঁর ভাঙে, আমার যেতে বললেন তিনি, তবে আমি তখন দাবার জন্তাই পা বাড়িয়ে আছি।

কিন্তু প্রথমটা ওদের আসার-আপায়নে কী আশ্চর্যই না হয়েছিলাম আমি! একটা গোলাপের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে হোটেলের দারোয়ান বললে, “দেখুন, আপনার ঘরটার সামান্য একটা গলদ আছে। গোড়ায় সাবধান করে দেওয়া ভালো। ওর একটা জানলা ভাঙা। রাতে যদি একটা বেড়াল ঐ ভাঙা জানলা দিয়ে ভেতরে লাফিয়ে পড়ে, আপনি ঘাবড়াবেন না যেন।”

“কিন্তু বেড়ালটা ভেতরে লাফ দিতে চাইবে কেন?” জিজ্ঞাসা করলাম আমি, “একটা কিছু উদ্বেগ থাকে চাই। বাস্তবিক, তোমার কথায় আশ্চর্য না হয়ে পারছি না।”

দারোয়ান আমতা আমতা করে বললে, “জানলার ওধারে জঞ্জাল জড়ো করা আছে বিস্তর। জানোয়ারের বুদ্ধি তো? জঞ্জালের ওপরে ঘুরতে-ঘুরতে ইট-একসময় লাফিয়ে পড়ে ঘরের মধ্যে—বৃকতে পারেনা ঘর ও বাইরের পার্থক্য, ভাবে সবই বৃষ্টি এক।”

অবশ্য ঘরের ভেতর যখন ঢুকলাম তখন বেড়ালের মনস্তত্ত্বটা অনুধাবন করতে দেয়ি হল না আমার। সত্যি, বেড়ালের পক্ষে তুল করাটা খুবই স্বাভাবিক। জঞ্জালের তুল এসে ঠেকেছে একেবারে জানলার কানিশ পর্যন্ত—কোথায় যে একের শেষ ও অপরের আরম্ভ তা বোঝা ঐ অবোধ জীবের পক্ষে সম্ভব নয়।

ধনী আমি নই আর ধনীর মতো বিলাসও কামনা করি না আমি, তবু এ-কথা না বলে পারছি না যে, হোটেলের অনায়ে জন্তে যে ঘরটি নির্দিষ্ট হয়েছিল তা দেখে ভারী দমে গেল মনটা।

সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম এই দেখে যে, ঘরের মাঝখানটায় বেশ খানিকটা জল জমে রয়েছে। জলটা মুছে নেবার জন্তে চাকর-বাকরদের ডাকাডাকি শুরু করলাম, কিন্তু কেউই এল না। অগত্যা গেলাম দারোয়ানের কাছে।

দারোয়ান বললে, “আপনার ঘরে যদি জল জমে থাকে তাহলে বৃকতে হবে কেউ ওখানে জল ফেলেছে নিশ্চয়ই। আজ বাড়তি লোক কেউ নেই, কিন্তু কাল আমি হকুম দেবো ঘরের জলটা মুছে ফেলবার

জ্ঞান—তবে কাল সকালের মধ্যেই সম্ভবতঃ জলটা শুকিয়ে যাবে। এখনকার আবহাওয়া বেশ গরম।”

“ভী যাই বল”, অসন্তোষের স্বরে বললাম আমি, “ঘরটা মোটেই স্বাক্ষ্মাকর নয়। আলো-বাতাস কম, তা ছাড়া আসবাবপত্রও বিশেষ কিছু নেই—একটা চেয়ার, বিছানা আর একটা বায়। অবশ্য সব হোটেলই সমান নয়—এক এক জায়গায় এক এক রকম ব্যবস্থা।...কিছুদিন আগে এক হোটেলের ছিলান এক রাত্রি, কখনের বদলে তারা দিয়েছিল টেবল-ক্রশ...”

“অতদূর আমরা এগেইনি এখনো”, বাধা দিয়ে দারোয়ান বললে, “তবে বিছানার চাদরের বদলে ছোট ছোট টুকরো ব্যবহার করে থাকি। আর ঐ অঙ্ককারের কথা বা বললেন, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আপনি তো আর ঐ ঘরের মধ্যে গহনার নক্সা করবেন না—কী এসে যায় অঙ্ককারে? ...এসব বাজে অত্যাধোগ ক'রে কর্তৃপক্ষকে বিরক্ত করার বদলে ভালো ক'রে ঘুমোবার চেষ্টা দেখুন গে—ঘুমিয়ে পড়লে আর কোনো অবাচ্ছন্দ্যই আপনাকে পীড়া দেবে না।”

ওর সঙ্গে তর্ক করে মেজাজ গরম করতে ইচ্ছা হল না আমার; কিরে এলাম ঘরে। তারপর পোশাক ছেড়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

কী যে ঘটছে প্রথমটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। যখন হল আমি যেন গড়িয়ে পড়ছি বিছানা থেকে।

বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়ছি কেন, ইচ্ছা হল জানবার। উঠে পাড়বার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পা ছুটো জড়িয়ে গেল বিছানার চাদরে। বৃকতে দেরি হল না, চাদরের যে-সব বড় বড় ছিঁড় রয়েছে তারই ভিতর পা গেছে আটকে। কোনরকমে পা ছুটো ছাড়িয়ে নিয়ে বিছানা থেকে নেমে ঝেলে দিলাম আলো। বিছানাটা পরীক্ষা করতে লাগলাম ভালো ক'রে।

লক্ষ্য করলাম, শ্রিং-এর গদিটা কুলে পড়েছে

নীচের দিকে, কাজেই ওর ওপর সোজা হয়ে শুয়ে থাকি অসম্ভব। বালিশটা তুলে এনে রাখলাম পায়ের দিকে, তার নীচে ঢুকিয়ে দিলাম হ্যাটকেসটা, তারপর শোবার মানসে বিছানার ঢুকলান উল্টো দিক থেকে।

কিন্তু এখন দেখলাম আমি ঠিক শুয়ে নেই, বসে আছি বিছানায়—বিছানার মাঝখানটা মেবে গেছে ব'লে, পা ছুটো ছড়ানো সম্ভব হয়নি। কাজেই ওভার-কেট আর হাত-ব্যাগটা তুলে এনে বিছানার মাঝখানে দিলাম বসিয়ে। তারপর লগ্না হয়ে শুয়ে পড়লাম খানিকটা ঘুমিয়ে নেবার জন্যে।

সবে যখন তন্দ্রাকর্ষণ হয়েছে, ঠিক সেই সময় হারপোক। কামড়াতে শুরু করল। দু-তিনটে হারপোকের কামড়া আমার অবশ্য ভয় পাবার কিছু ছিল না, কিন্তু মেখলাম, হারপোকের একটা প্রকাণ্ড দল এসেছে আক্রমণ করতে।

প্রথমটা আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম, কিন্তু মিনিট দুই-তিনের মধ্যে ভয়টা কাটিয়ে উঠে লড়াই শুরু করলাম। সাদ্রি দিয়ে শরপক্ষ আসে আক্রমণ করতে, আমি ক'পিয়ে পড়ি তাদের ওপর। এমন করে লড়াইটা যখন খুব তীব্র হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময় আলোটা হঠাৎ গেল নিবে।

অঙ্ককারে অততায়ীর সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভব নয় ব'লে, আমি ঘরের মধ্যে পায়েচাচি শুরু করলাম চিত্তাশ্রিত ভাবে। হঠাৎ কাঠের পাট্টাখানো সন্জারে থাকা দিলে কে এবং সঙ্গে-সঙ্গে রুক বেয়েলী গলায় তীব্র একটা কন্ডায় শোনা গেল—“তোমার মতলবটা কী? হাতস্থপূরে পাগলের মতো ঘরের ভেতর ছোটাছুটি করছ কেন?”

প্রথমটা ভয়ে আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম, কিন্তু পরক্ষণেই নিচেতে মাঝে নিয়ে বাগহুচ্ছ শুরু করে দিলাম প্রতিবেশিনীর সঙ্গে।

আমাদের মধ্যে তখন যে বাক্যালাপ হল সেটা আর বর্ণনা করতে চাই না, কেননা আমরা দুজনেই তখন এত উত্তেজিত যে, পরস্পরকে

যে ভাষায় আপ্যায়িত করলাম তা ভ্রমসমাজে বলা চলে না।

“একবার যদি সুবিধা পাই আমি”, প্রতিবেশিনী অবশেষে বললে, “তোমার ভালোরকম শিক্ষা নিয়ে দেখো!”

এর একটা কড়া জবাব দেবার ইচ্ছা হল আমার, কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো সামলে নিলাম নিজেকে; আমি শুধু বাস্তবতা তুলে দেওয়ার লগ্নে গিয়ে দিলাম ছুঁড়ে—যাতে ও ভাবে আমি গুলী ছুঁড়ছি ওর দিকে। এর পরই চুপ করে গেল প্রতিবেশিনী।

দেওয়ালের কাছ থেকে শয্যাটা নিলান সরিয়ে। তারপর ছলের বোতলটা নিয়ে শয্যার চারদিকে বৃত্তাকারে ছল ছড়িয়ে দিলাম মাটিতে, যাতে ঐ দুইমন ছারপোকাকুলো আমাকে আর আক্রমণ করতে না পারে। তারপর শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

সবে একটু ঘুনের আমেজ এসেছে, এমন সময় পাঠিশালের ওধার থেকে কানে এল নারীকণ্ঠের এক তদ্যর্থা চীৎকার।

প্রতিবেশিনীকে উদ্দেশ্য করে গলাটা বেশ চড়িয়েই বললাম, “তুমি যদি আমার ঘুম ভাঙাবার জন্তে ইচ্ছে করে চীৎকার করে থাকো, তাহলে এ বেঘাদবির শাস্তি কালই তোমায় পেতে হবে।”

তারপর আবার গুরু হল বাগ্‌বুছ। কথা-কাটাকাটির সময় জানতে পারলাম, বেড়ালটা তার ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছিল বাইরে থেকে, আর সেইজন্তেই সে চৈতন্যে উঠেছিল ভয় পেয়ে।

বুঝতে পারলাম, সেই নির্বোধ দারোগ্যানটা যা বলেছিল তা ভুল। সে বলেছিল, বেড়ালটা লাফিয়ে পড়তে পারে আমার ঘরের মধ্যে, কিন্তু আমার জানলা আঁতুই ছিল আর ভাঙা ছিল প্রতিবেশিনীর ঘরের জানলাটা।

সুতরাং বগড়াটা মূলতঃই রেখে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মনের মধ্যে উদ্বেগ থাকায়, কেবলই এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম, ফলে যখনই পাখি ফিরি—স্মিথ—এর গদিটা এমন একটা

বিক্রী আওয়াজ করে যে, ঘুমটা আসতে-না-আসতেই উপে যায়।

ভোর হতে আর দেরি নেই—অন্ধকারটা ফিকে হয়ে আসছে। গদিটা শয্যা থেকে তুলে এনে মেঝেয় রাখলাম। তারপর ক্লান্ত অবসর দেহে তার ওপর শুয়ে পড়লাম হাত-পা ছড়িয়ে। এতক্ষণে যেন আরাম পাওয়া গেল—মনে হল, এইবার হয়তো চোখের পাতা বুজোতে পারা যাবে।

“ঘুমোও ভালো ক’রে... আরেকজন অপেক্ষা করছে তোমার বালিশের চক্ষে”, মনে মনে বললাম আমি, গতবছরে দেখা দেওয়ার লগ্নে গিয়ে ঐ ধরনের একটি বিজ্ঞাপিত শ্রম ক’রে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই করাতের একটা বিক্রী ঘস্‌ঘস্‌ আওয়াজ আসতে লাগল জানলার বাইরে থেকে!

সুতরাং পরের দিন যখন আমি হোটেল ত্যাগ করলাম তখন আমার শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। মনে মনে সঙ্কল্প করলাম, আর কখনও ঐ হোটেলে বা ঐ শহরে পদার্পণ করবো না। কিন্তু আমার সঙ্কল্পে কি আসে যায়, ভাগ্যদেবীর বিধান অম্লকরম।

ট্রেনে বাট মাইল ভ্রমণের পর আবিষ্কার করলাম, হোটেলের দারোগ্যান আমার যে পাসপোর্ট নিয়েছে, সেটা আমার নয়। আর যেহেতু পাসপোর্টটা ম্রনেকা মহিলার, আমার পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

পরদিন হোটেলে ফিরলাম। অবশ্য প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দেখা করতে প্রথমটা একটু সঙ্কোচ বোধ করছিলাম, কিন্তু সে সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে সময় লাগলনা বেশী। আমারই মতো সেও হোটেল থেকে বিদায় নিয়ে আবার ফিরে এসেছে—আমার পাসপোর্টটা নিয়ে।

প্রতিবেশিনী পরমা রূপসী, গীতারূপের শিকড়িতী। অন্ধকণের মধ্যে আমাদের আলোপ বেশ ভ্রমে উঠল, রাত্রের বগড়াঝাঁকি গেলান তুলে।

অতএব হোটেলে থাকা একেবারে বেকায়দা নয়, মাকে মাঝে কেউ কেউ লাভবানও হয়।

বিশ্বকর্মার উদ্যোগ

হরপ্রসাদ দত্ত

কূলে কূলে ভরে বাতাবিগাহটা, কোথায় লুকিয়ে কোকিল ডাকে—
দূরে সবুজের কাপলা পাড়তে আকাশেরে। রঙ-ধূসর লাগে।

সামনে ঘড়িটা—বেলা বেড়ে যায়

সকাল ফুরোলো শাস্ত্র হাওয়ায়,

অতুর বদল বোধের আদল কেবলই ভাঙছে,—

কেবলই গড়ে।

বহুরে-বহুরে বাতাবিগাহটা নিজেকে করিয়ে নিজেকে ভরে।

আমিও এখানে এই-যে বিন্দু—

চেয়েছি, পেয়েছি, হেরেছি, আর—

মাকে-মাকে থাকি জয়ের-হাওয়াতে, মাকে-মাকে কোত ছনিবার।

কোথায় লুকিয়ে ডাকে-যে কোকিল—

সামনে টেবতে পাতাবাহার!

কালের পালেতে নেই হাওয়া নেই, মাঝি-মাঝারা ছেড়েছে দাঁড়।

ব্যাবসা মন্দা, হ'হাত শূন্য, বৃকে পড়ছেই ঢেঁকির-পাড়।

তবু কেউ-কেউ দেখছে এখনো দূরে বন্দর, সিদ্ধিস্থ—

অনেকে যদিও জানে তা আশি

—কারণ, তটিনী তটবিশুখ।

—অর্থাৎ এই মানুষে জগতে মেলনা, মেলনা, মেলনা আর।

বাতাবি, কোকিল, আকাশ কিংবা মাটির টেবতে পাতাবাহার—

মৃত উপমান, আশ্র কবিতা, দরতী রমণী, শূন্য স্মৃতি।

মেঘদূত আর লকুন্তলারা প্রত্নশালায় গলিত চিঠি।

আমরা রাস্তা উজিয়ে এসেছি অতুর থেকে বীজের সিক।

বিকাশ মানেই বিনাশ বহু,—সোনারতরী-তে কে থাকে টিংকে?

মনে কিম্-বরা বিশাল শূন্য, আদিম প্রৌঢ় অঙ্ককার—

মোনই একা মুক্তসব, কোনোদিকে নেই বহু দ্বার।

তবু বিশ্বাস করিনা তাকেও।

—কোথায় লুকিয়ে কোকিল ডাকে!

বহুরে-বহুরে কূলে, সৌরভে, স্বপ্নে, আশায় বাতাবি জাগে!

অতুর বদল বোধের আদল কেবলই ভাঙছে,—

কেবলই গড়ে—

নমো বহু, নমো বহু, নমো বহু—কী তার পরে?

নিখিল-বঙ্গ ভাষা-সম্মেলন

মানবেন্দ্র বাল্যোপাধ্যায়

নিখিল-ভারত লেখক-সম্মেলনের ভূমিকালো: অধিবেশনের পূর্বেই, ১৯৪৭ সালের ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর মাতৃভাষা-সংরক্ষণ-সংঘ এবং 'পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃত পুত্রিবধ'-এর উভোগে মহাজাতি-সম্মেলন যে নিখিল-বঙ্গ ভাষা-সম্মেলন অন্তর্ভুক্ত হ'লো, অল্প সময় হ'লে, আমরা হঠাৎ একে বলচুম নীতের বঙ্গভাষার উচ্চাঙ্গসংগীত সম্মেলনগুলির মধ্যেই কোনো মর্যাদা দিইনা; কিন্তু, স্রবের কথা, এই ভাষা-সম্মেলন ব্যাপারটি ঘোটেই সেরকম কোনো মজলিশ ছিলো না, বরং সরকারি ভাষা-কমিশনের প্রকল্পিত, ঠিকত এবং একগোষা অহুযোজন-গুলির মূল অভিপ্রায়ের বিক্ষেপে প্রতিবাদ জানানো এর উদ্দেশ ছিলো বলে, যে ওকতর সূত্রে বাংলাদেশের বুদ্ধি-জীবী সম্ভার এবং জনসাধারণ সেখানে মিলেছিলেন, তার মধ্য থেকে কেবলমাত্র একটি জিনিষই প্রতিভাত হইবে, তা হ'লো মাতৃভাষার প্রতি একটি অকুছিন্ন অহুবাগ, যা মন্ত্ররূপেই সম্পূর্ণ করে। এইরকম একটি সূত্রেই কিছুকাল আগে বাংলা পক্ষিত গলায় এক সরকারি প্রত্যয়ের বিক্ষেপে প্রতিবাদ জানিয়েছিলো: আমি বঙ্গ-বিহার-সংস্কৃতি প্রত্যয়ের কথা বলছি। প্রসঙ্গত হুজাতা বলা যেতে পারতো প্রবন্ধের ভাষা-আন্দোলনের কথা: কিন্তু সে-কথা এখানে এই কারণেই অন্যাগোপ উচ্চ বাহা চলে যে, ভাষা-সাজাওদের এই সমস্তর নমুন: বভাবতই সকলের মরণে আছে।

নিখিল-বঙ্গ ভাষা-সম্মেলনের তিনটি অধিবেশনের মধ্য থেকেই একটি জিনিষ প্রথমেই সূত্রে উঠেছে, তা হ'লো সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের নিরপেক্ষ ও সঙ্গর পটীকায়। ভারতবর্ষে চিরকাল বিভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ক'রে এসেছে, ভারতীয় সংস্কৃতির সেই মূল তথ্য মরণে ছিলো বলেই এই সম্মেলন এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'তে গিয়েছেন যে, ভারতের জাতীয় ঐক্য কেবলমাত্র পহিছুতা এবং পারস্পরিক সৌহার্ষ্যের ভিত্তিতে রচিত এবং রক্ষিত হ'তে পারে, এবং এই সোনালি বৈচিত্র্যকে সঙ্গরভাবে উপগক্তি করতে চাইলেই ভারতবর্ষের সম্পূর্ণতা প্রতিভাত হ'তে পারে; সেই কারণেই এই সম্মেলন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে আবেদন জানিয়েছেন যে, এই পটীকায় থেকেই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ও নীতি অবলম্বন করতে হবে—বিশেষ

ক'রে ভাষার মতো কোনো সম্পর্কাতর বিষয়ে তো বটেই। মর্যোগ এবং মানের সমতার মধ্যেই ভারতবর্ষের সকল ভাষার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ হোক—সম্মেলনের মূল কামনা ছিলো এই, এবং সেইজন্যেই সে সকল ভাষাকেই জানিয়েছে তার ভেতর, আর আশা করেছে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ত্রিভিত্তি ভিত্তিতেই ভারতের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক মূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে।

এই সম্মেলন হিন্দিভাষা বা হিন্দিভাষী জনগণ সম্পর্কে কোনো বিচ্ছিন্ন মনোভাব পোষণ করেনি, কিংবা তাদের সঙ্গে তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিলো না; বরং সে সর্বাঙ্গ-করণে সকল জীবিত ও প্রধান ভারতীয় ভাষাকেই ভারতের জাতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করেছে, সকল ভাষাকেই সমান মর্যাদা দিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে যে, একইসঙ্গে সকল ভাষার সমান বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটাই সে স্থাবী হবে; কোনো ভাষার প্রতিই সে পক্ষপাতী মনোভাব পোষণ করেনি, কিংবা কোনো ভাষার চুড়ুপামনাও সে করেনি। এই পটীকায় থেকে বিচার ক'রেই সম্মেলন দৃঢ়ভাবে তার বিশ্বাস ঘোষণা করেছে, কোনো ভারতীয় ভাষাকেই এমন দান ও মর্যাদা দেয়া উচিত হবে না, যা অল্প ভাষাসমূহের পক্ষে কতিকর হবে।

এই অবিকার ও স্থায় পটীকায়কে এইভাবে একটি সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জাহির করার প্রকার পড়লো। এই কারণে যে, সরকারি ভাষা-কমিশন যে অহুযোজনগুলো করেছেন, তা কাজে পঠানো হ'লো: (১) ভারতীয় প্রজাতন্ত্র-তীক্ষণ ও প্রতিদ্বন্দ্বী পটীকায় বিভক্ত হয়ে যাবেন; একদলে থাকবেন হিন্দি ভাষার মাতৃভাষা সেইসব প্রথম শ্রেণীর প্রজাতন্ত্র, যারা নেহাৎই দৈববৃত্তে হিন্দিভাষী অকলে জরগ্রহণ করার কলে অসংখ্য বিশেষ সুবিধে ভোগ করবেন, এবং অল্পদলে থাকবেন ঠাঁরা, যারা হিন্দি বলেন না, অর্থাৎ ভারতবর্ষের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী, যাদের একাংশ 'বাংলালি', এবং ঠাঁরা কেবলমাত্র হিন্দি ভাষার মাতৃভাষা নয় ব'লে বহু স্থায়ী অক্ষমতার ভুক্তভোগী হবেন। অর্থাৎ আশাধের বহু কষ্টে অজ্ঞিত স্বাধীনতা এবং ঐক্য নতুন ক'রে বিপর্যয় হবে, কেবলমাত্র অল্প কয়েকজনকে বিশেষ সুবিধে নিতে পারে। (২) তা ছাড়া চাহুবি, বাগিচা, বাজনীতি

ও সর্বপ্রকার স্বাধিকার ও কর্মের ক্ষেত্রে সমতার মূলনীতি পক্ষে-পক্ষে বাহ্যতঃ হইবে; ভারতীয় সংবিধানে প্রত্যেক ভারতীয় প্রজ্ঞাকে যে-সব মৌলিক অধিকার দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির কোনোটিরই অর্থ আর থাকবে না। (৩) তুমি তাই নয়, ইংরেজির দলকে হিন্দির চর্চা করলে আশংকা আধুনিক জগৎ, বিজ্ঞান ও বিশ্ব-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হইবে যথাসম্ভব গোড়ামি ও সংকীর্ণতার দ্বারা। (৪) উচ্চতর স্বাধিকার ক্ষেত্রে—তুমি উচ্চতরই বা কেন, যে-ভাবে একের পর এক শতাব্দিক শাসন গ্রহণ করা হইছে, তখন অল্প ভবিষ্যতে এমন কর্ম অতি অল্পই থাকবে, যা রাষ্ট্রচালিত হইবে না—সর্বোচ্চ প্রয়োজনীয় ভাষা হবে হিন্দি, অতএব আমরা অনিশ্চয় নব্বো অবিচার্য ভাবে ইংরেজি ও আপন-আপন মাতৃভাষার চর্চা তুলে ধারাবো। (৫) ইংরেজি তুলে নিয়ে আমরা বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র হারাবো; এবং মাতৃ-ভাষার চর্চা তুলে নিয়ে আমরা কেবল আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকেই হারাবো না, হারাবো আমাদের সমগ্র—আমাদের সবচেয়ে পবিত্র জন্মগত অধিকার।

সরকারি ভাষা-কমিশনের অধ্যক্ষমণ্ডলি পছন্দসই মনে না হওয়ায় ভারতের অজ্ঞাত অঞ্চলের মতো বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্ভ্রমকে গোড়া থেকেই প্রতিহত জানাশিল্পেন; অসংখ্য মাসে বাংলাদেশের প্রবীণ সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দলমত নির্বিশেষে একযোগে দৈনিকপক্ষে এক পর প্রকাশিত করছিলেন। পরে তাঁরাই মাতৃভাষা-সংরক্ষণ-সংঘ নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলে বিভিন্ন সভা-সমিতি পরিচালনা করছিলেন। কিছুকাল আগে মহাবোধি সোসাইটি হলে তাঁদেরই উদ্যোগে অসংখ্য এক সভার সাহায্যে উল্লিখিত চোদ্দটি ভারতীয় ভাষার প্রত্যেকটিকে এবং ইংরেজিকে ভারতের জাতীয় ভাষা স্বীকার করবার দাবি জানিয়ে সেইসঙ্গে এইসব প্রজ্ঞা পাশ করিয়েছিলেন যে, প্রত্যেক রাজ্যের মধ্যে সর্বত্রই শিক্ষা ও শাসন, আইন ও বিচার-সংক্রান্ত সকল কর্ম সেই-সেই জাতীয়-ভাষার বা ভাষা-সমূহে যথাসম্ভব পরিচালিত হোক, এবং বাংলাদেশে ১৯৩১ সালে অর্থাৎ স্বাধীন-পতাবাদিকার আগেই তা শুরু হোক; শিক্ষাতন্ত্রের পাঠ্যপুস্তিতে সর্বত্রই ইংরেজি ও অল্প কোনো ভাষার স্থান বী হইবে তা বিভিন্ন রাজ্য-সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেরাই স্থির করবেন সে-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো নির্দেশ বা গণপাঠী ব্যবস্থা থাকবে না; অল্পব্যয়, প্রশাসন, সম্ভার, শিক্ষার, সাংবাদিকতা প্রভৃতি উপারে জাতীয়-ভাষা ও সাহিত্যের

উন্নতি ও প্রচার বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে সব প্রচেষ্টা করছেন বা করবেন তাতে সামান্যতঃ সম্পূর্ণভাবে প্রতিকূল হওয়া সরকার, কোনো একটি ভাষার প্রতি পক্ষপাতী ব্যবস্থা চলবেনা; নিবিল ভারতীয় চাকুরি-সংক্রান্ত সকল পরীক্ষা ইংরেজিতে, এবং তুমি ইংরেজিতে পরিচালিত হবে; যথাসম্ভব শ্রম এবং যতদূর পর্যন্ত সম্ভব, রাজ্যসমূহের চাকুরি-সংক্রান্ত পরীক্ষা সেই-সেই রাজ্যের জাতীয়-ভাষায় এবং তুমি সেই ভাষাতেই পরিচালিত হবে; বহুভাষী রাজ্যসমূহ সরকারি ব্যবহারের জন্য ও শিক্ষার বাহনরূপে হই তাঁদের প্রধান ভাষাগুলিকে, নতুন ইংরেজিকে নির্ধারন করিতে পারবেন; সর্বভারতীয় আইন ও বিচার-সংক্রান্ত ব্যবহারের জন্য তুমি ইংরেজি স্বীকৃত হোক, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবহারের জন্য হয় ইংরেজি, মততো ইংরেজি ও প্রয়োজনমতো বিভিন্ন রাজ্যের মাতৃভাষা স্বীকৃত হোক।

এই রাষ্ট্রগণিত সন্তুষ্ক ও জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে 'প্রথম নিবিল-বন্ধ ভাষা-সম্মেলন' আহ্বত হইয়াছিলো; সম্মেলন আহ্বান এবং প্রতিভার কাজে পরে 'শচিন্দ্রবর সাংস্কৃত পরিষদ' যোগদানের সম্মেলন হইতে সন্তুষ্কভাবে অসংখ্য হইতে পেরেছে। বিশেষ করে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা তাঁদের বিরোধী মতবাদের বুদ্ধিজীবীদের বক্তৃতা দিতে আহ্বান করে যে মহাশুদ্ধতা, সঙ্গমদত্তা এবং সঙ্কটভার পরিচয় দিয়েছেন, তা তুমি প্রশংসারই নয়, বীতিমতো স্মরণীয় ঘটনা। এমন ঘটনা এই ধরনের সম্মেলনে এই বোধ হয় প্রথম ঘটনো, এবং তা সম্মেলনের সম্ভবজাতীয় সাফল্যকে সামগ্রিক করে তুলতেও যথেষ্ট সাহায্য করলো। দীর্ঘ আলোচনার পর সেই অধিবেশনে ১১ দফা প্রজ্ঞা প্রণীত হয়, নিচে তার দায়-সংকলন করে দেয়া হইলো।

ভারতীয় সংবিধানের যে-অধ্যায়ে হিন্দিকে ভারতের সরকারি ভাষা বলে স্বীকার করা হয়েছে, 'ভারতীয় মুনিবদের সরকারি ভাষা' স্বীকৃত সংবিধানের সেই অধ্যাদেশ খণ্ডের গণতান্ত্রিক চরিত্র বিষয়ে এই সম্মেলন দৃষ্টিমতো সন্দেহ পোষণ করেন, কেননা একাধিকবার বিবেচিত হবার পর তা ক্ষুদ্রতম ভৌতাদিকো স্বীকৃত হইয়াছিলো। সরকারি ভাষা-কমিশনের সদস্যদের অধিকাংশের স্বাক্ষরস্বত্ব অধ্যক্ষমণ্ডলো—বা ভারতের ভাষা-সমস্যার সমাধান করবার শর্তা যথেষ্ট—তা সম্পূর্ণ অব্যবহ, হিন্দি ব্যতীত অজ্ঞাত ভারতীয় ভাষার উন্নতির একান্ত প্রতিবন্ধক, এবং ভারতের রাজনৈতিক উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকর বলে এই সম্মেলন সেগুলো সম্পূর্ণ বাতিল করছে।

এই সম্মেলন, সেই সময়গেই, লাবি করছে যে

(১) ইংরেজি এবং প্রত্যেক প্রধান ভারতীয় ভাষাকে ভারতের জাতীয় ভাষা ব'লে স্বীকার করতে হবে ;

(২) প্রত্যেক রাজ্যের শিক্ষা-ব্যবস্থা সর্বস্বরে রাজ্যের প্রধান ভাষায় বঙ্গাধায়া পুঁর পরিচালিত করতে হবে, এবং রাজ্য-সরকার ও সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে সেই রাজ্যের শিক্ষা-ব্যবহার ইংরেজি ও অন্ত্য ভাষার স্থান কী হবে স্থির করবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, এ বিষয়ে কেবল থেকে কোনো নির্দেশ স্থান কিংবা পক্ষপাতী ব্যবস্থা অবলম্বন করলে চলবে না ;

(৩) প্রত্যেক রাজ্যে বঙ্গাধার পুঁর সেই রাজ্যের মূল্য ভাষাকে—ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় ব্যবস্থা ক'রে—সর্বপ্রকার শাসন, আইন ও বিচার-সংক্রান্ত কাক্স-কর্মে ব্যবহার করতে হবে ;

(৪) সর্বভারতীয় চাক্রি-সংক্রান্ত সমস্ত পরীক্ষা, আশ্রিত, ইংরেজিতে এবং শুধু ইংরেজিতে, পরিচালিত হবে ;

(৫) আন্তঃরাজ্যিক যোগাযোগের সময় ইংরেজি কিংবা সম্পূর্ণ রাজ্য-সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোনো বিশেষ ভাষা কিংবা ভাষাসমূহ ব্যবহার করতে হবে ;

(৬) তর্জমা, মুদ্রণ, প্রচার, সাংবাদিকতা প্রভৃতি উপায়ে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও প্রচারপুষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে-সব প্রচেষ্টা করছেন বা করবেন, তাতে কোনো-একটি ভাষার প্রতি কোনোরকম পক্ষপাতী ব্যবস্থা চলবে না—তাতে সম্পূর্ণভাবে সামান্যতম রক্ষা করতে হবে ;

(৭) ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের জন্য অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে রাজ্য-সরকারের চাক্রি-সংক্রান্ত সমস্ত পরীক্ষা সেই রাজ্যের মূল্য ভাষায় পরিচালিত করতে হবে ;

(৮) বহুভাষী রাজ্যসমূহ তাদের শিক্ষা এবং সরকারি কাক্সকর্মে হয় রাজ্যের মূল্য ভাষাগুলি, নরতো ইংরেজিকে গ্রহণ করতে পারবে, এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোনো নির্দেশ দিতে পারবেন না, কিংবা তাদের এই স্বাধীনতায় কোনোরকম হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না ;

(৯) সর্বভারতীয় আইন, বিচার এবং শাসন-সংক্রান্ত কাক্সকর্মে অন্য আপাতত ইংরেজিকে, এবং প্রয়োজনযতো সম্পূর্ণ রাজ্যের ভাষাকে, কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের সময় ব্যবহার করতে হবে—সে-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোনো পক্ষপাতী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন না ; কেন্দ্রীয় সরকারি যোগাযোগ এবং সমস্ত নির্দেশ ইত্যাদিতে সম্পূর্ণ রাজ্যের ভাষা এবং ইংরেজিকে ব্যবহার করতে হবে ;

(১০) বহি আইনসভা-সমূহের সভাস্থলে দুই-তৃতীয়াংশের মতৈক্য ঘটে, এবং সমস্ত রাজ্য-সরকার তা একবাক্যে স্বীকার ক'রে নেন, তবে এক কিংবা একাধিক ভারতীয় ভাষাকে কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারি ভাষার মর্যাদা দেয়া চলবে ; কিন্তু তার আগে, অন্তত পঁচিশ বছরের জন্য, সকল ভারতীয় ভাষাকে একই মূল্য ও মর্যাদা দিতে হবে, এবং অন্তর্গতী কালে কেন্দ্রীয় সরকার কোনো বিশেষ ভাষার পৃষ্ঠপোষণ করতে পারবেন না, বা কোনো পক্ষপাতী ব্যৱস্থা অবলম্বন করতে পারবেন না ;

(১১) ভারতীয় সংবিধানের সপ্তদশ খণ্ডকে এই সমস্ত সিদ্ধান্তের আলোকে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করতে হবে, এবং সরকার হ'লে এই মূর্তিকোণ থেকে বিচার ক'রে অন্ত্য সম্পূর্ণ বিবরণ ও সংবিধানকে পরিমার্জিত করতে হবে ।

এই সম্মেলনের সাফল্য ওকতর ভাষা-সমস্তা সম্পর্কে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান আবেগই পরিচয় দেয়, এবং ভারতবর্ষে আপাতত ইংরেজির স্থান কী হবে, এই বিষয়ে একটি স্নহ, স্নহির ও মুক্তিদায়ক সিদ্ধান্ত এই সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়েছে ব'লে, সম্মেলনের উত্তোক্তাদের এবং বাংলা-দেশের শিক্ষিত সাধারণকে অশেষ ধন্যবাদ জানানো উচিত । নানা জনের নানা মত সবেও সকলে যে একই যুক্তি এইভাবে একত্রিত হ'তে পেরেছেন, একেবারে সেই বাস্তবায়ন আবহাওয়া নির্মাণের জন্য উত্তোক্তারা আমাদের অভিনন্দন পাবেন । একই 'হবে' লেখক-সম্মেলন হ'লে বাঙালি, জনসাধারণের দ্বারা বেখে এটা সম্মেলন বোঝা গেছে যে, এই ভাষা-সম্মেলন যে চরম স্তরিনকে যোগ করবার সংকল্পের প্রকাশ, সেই সংকল্পকে সার্থক করবার জন্য শিক্ষিত বাঙালিদেরই আর্থিক সমর্থন ও পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া বাবে ।

[१५ वरी, २८ अक्ष, ५४ अक्ष]

১৭. যেমন লক্ষী দেবীকে অশ্রুতে ধরে রেখে—
 একটি মণি পুষ্পের কলসে পুতি দিও।
 গন্ধে হৃদয় বিস্ময় হুগু—সেখানে যেই অমৃত
 পান করি মাঝে মাঝে ও মণির মতপন্থে—
 মাঝে মাঝে হৃদয়ে পুতি দিও লক্ষণে।
 মিলিয়ে শিশু মণির মিলে পুতি দিও হৃদয়ে।
 হৃদয়স্থিতের কলসে, মাঝে মাঝে পুতি দিও।
 হৃদয়ে যেই অমৃত পান করি, সেই মাঝে মাঝে।

বিলেতে বাঙালী পিয়ন

ডক্টর নিনাইসানন বহু..

কলকাতায় বিনিতি মাহেব, রাইট স্ট্রীটে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থাকলে, ডক্কন ডক্কন ধোণা গোণেও—সওনে বাঙালী পিয়ন একটি দুর্ভাগ্যবৃত্ত। পিয়নটি আর কেউ নয়—আমি নিজে।

গিরেছিলান বহু দেখতে অর্থাৎ লগন বিবিসিখানয়ে ইতিহাসের দিচ্ছেটা আরও চক্চকে ও মজবুত করে নিতে। মজবুত থেকে কলা বেচার অর্থাৎ বিনিতি পোস্ট-অফিসে বাঙালী পিয়নের কাজ করার সুযোগটা হঠাৎ এসে গেল।

ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি। খ্রীষ্টাব্দের আর মাস বোঝুক দেখি। সোমবারটাগুলো নতুন নতুন জামা-কাপড়, বেগুন, ছোট-বড় উপহারের সামগ্রীতে ভরে গেছে। চারদিকেই এই উৎসবের হাওয়া বইতে শুক করেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা কলক থেকে ফিরে লম্বা বসে আছি আজনের ধারে। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা। হঠাৎ কনিংহামটা বেজে উঠলো। উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দেখি ডানকান—আমার কলেক্টর বন্ধু। “আরে, কী ব্যাপার, এস এস।” ডানকান বললো, “কী দীর্ঘ পড়েছে বেছে? হাত-পা জমে গেল।” বললাম, “চল চল, লম্বা গিয়ে বস। বাবু।” দুজনে গিয়ে আরাম করে আজনের ধারে সোফার বসলাম। কথাবার্তা শুরু হোল। একটু পরেই দেখি ল্যাণ্ড-লেডি নিলস পেনসন হুঁকাপ চা ও হুইকোয়া ক্রুট-কেক নিয়ে হাজির। ঠাণ্ডার দিনে চাষের চেয়ে আরামদায়ক অত কিছু বোধহয় নেই। নিলস পেনসনকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, “এই না হলে বাড়ির খানী? দাঁড়িয়ে লম্বা আছে।” নিলস পেনসন একপাশ হেসে চলে গেলেন। এই প্রশংসাটা তাঁর বিচ্ছেদ ঝিরা। একপা-ওকবার পর হঠাৎ ডানকান বললো, “হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে।” কিছু টাকা রোজগার করতে চাও?” বিস্মিত হয়ে বললাম, “টাকা আর কে চায় না, কিন্তু ব্যাপারটা কি?” “ব্যাপারটা সহজ। খ্রীষ্টাব্দের সময় পোস্ট-অফিসের অতিরিক্ত কাকের চাপ বাড়ায়, খ্রীষ্টাব্দের ক’দিনের জন্য অনেক অতিরিক্ত মোকাবেলা। বহু ছাত্র এই কাজ নেয়। ছুটি মেবে নাকি?” উত্তর দিলাম, “নিশ্চয়ই নেবে। কিন্তু কী কাজ করতে হবে হে?” “ভর নেই। তোমার অ্যাভিশনাল পোস্ট-মাস্টার বা ক্যান্সিয়ার করবে না। সন্ধ্যা ডেলিভারি ইত্যাদির কাজ।

অর্থাৎ চিঠি, পার্সেল ইত্যাদি বাছা, বাড়িতে তোলা ও বিলি করা।” বললাম, “বেশী খাটতে হয়তো তো?” ডানকান বললো, “না হে, না। তোমার দশ-বাগার খরতে হবে না। চিঠি বা পার্সেল বিলি করতেও পারবে না? তবে বাড়িতে বসে কবিতা লেখ, নহতো ব্রিটিশ নিউজিয়ারে পুরানো পুঁদী পড়ে বস হও। আমি এখন চলি। বয়সখানটা বহি করতে চাও তো, ইন্ড্রি লোরো।”

অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত সহমত করে বসলাম। দরমাস করতে হোল স্প্যানাল স্ট্রিটের ইউনিয়নের মারকত। চার-ইউনিয়নের মারকত আবেদন করলে চাকরি পাওয়া সহজ।

ফর্ম লেখা আছে দেখলাম: ‘ব্রিটিশ মার্ভেই ছাড়া পোস্ট-অফিসে অত্র কেউ কাজ পাবে না।’ বিলি ফর্ম নিখিলেন তাঁকে বললাম, “আমি তো ব্রিটিশ মার্ভেই নই, আমি ভারতীয়।” তিনি বললেন, “ঐ একটু হোল।” উত্তর দিলাম, “তা হে নাকি? আমরা ভারতীয়। আপনারা ইংল্যান্ড।” “বেশ তর্ক জুড়সেন বেশি”, বললেন তিনি। “আরে বশাই, সিংহ-না ব্রিটিশ, দেখায় কি আসে যায়?” বললাম, “হা নই তা লিখি কি করে?” শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, “ইতিহাস কমনওয়েলথে তো? কমনওয়েলথ-এর সভ্য হলেই হোল।” এবারে সহজ হলো। খুজিটা ঘন নয়। সই করে ফর্ম দিয়ে দিলাম।

দিন-দুইয়ের পর এক ইন্টারভিউ-পর লোমার। ২১শে নভেম্বর বিকাল তিনটার সময় ইন্টারভিউ পোস্ট-অফিসে দেখা করতে হবে। নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় দিয়ে হাজির হলাম। একটা বড় ঘরে ইন্টারভিউ হচ্ছে। বাইরে হুটো বেকে আরও কাছেরজন অপেক্ষা করছেন। তার মধ্যে দুজন ভারতীয়ও রয়েছেন। সব-ক’জনই বিব-বিভাগের ছাত্র। গলার স্মার্ক দেখেই চেনা যায়। অপেক্ষা করতে করতে ভাবলাম—কি প্রশ্ন করবে, কে জানে! পোস্ট-অফিসের কাকের অভিজ্ঞতা চাইবে না তো? ঘোষ-না বিনকরেরের টেমোরাডী চাকরি। চাকরি তো? কাজেই সাতপাঁচ চিন্তা না হয়ে যায়। লেখা। খানিক পরেই ডাক পড়লো ভিতরে। এক বুড়ো সাহেব ইন্টারভিউ নিখিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, “এর আগে পোস্ট-অফিসে কাজ করেছেন?” বললাম,

“না।” “কি ধরনের কাজ চান?” বললাম, “চাণ্ডাল-কাজ।”
 হিসেব রাখা ছাড়া অন্য কে-কোনো কাজ।” এর পরেই,
 “পার্সেল বিলির কাজ নেবেন?” জিজ্ঞাসা করলাম,
 “কাজটা সঠিক কি?” “জান না লম্বা করে বাড়িতে
 বাড়িতে পার্সেল দিয়ে আসা। সঙ্গে অভিজ্ঞ পিয়ন
 থাকবে। সে সব দেখিয়ে দেবে।” বললাম, “জানেন করে
 পার্সেল-বিলি অবশ্যই করতে পারবেন।” সাহেব বললেন,
 “তাহলে তিন আছে। মাস্টারেল-হিল পোস্ট-অফিসে
 ১৫ই ডিসেম্বর সকাল ৮টার রিপোর্ট করবেন।” অফিসিয়াল
 নিয়োগের অবশ্যই ইতিবাচক।

বহুভাষা জানিয়ে চলে এলাম।

বাড়ি এসে ল্যাণ্ড-লর্ড ও ল্যাণ্ড-লেডী মি: ও মিসেস
 পেনসনের বললাম, “চাকরি হয়ে গেল পোস্ট-অফিসে
 পানতো তারিখ থেকে।” বলার ভঙ্গী দেখে অবশ্য কে-কেনেই
 দৃষ্টি করতো যে, “অসম্ভবতঃ পোস্ট-মাস্টার-জেনারেল”
 বা একজনকে কোনো কাজে নিযুক্ত হয়েছি। মিসেস
 পেনসন বললেন, “পারবে তো?” “কি যে বলেন! না
 পারলে, কাজ নিলাম কি করতে?” বললাম বিভ্রান্ত মতো।
 “হু-ব তাকো করা, মাইনে পেতে করবে কি?” জিজ্ঞাসা
 করলেন মিসেস পেনসন। “পতিনেটে বাব ডাবছি।”
 “কেনে বেশ?” “আপনার বেশ দাব।” যেসে উত্তর
 দিলাম। মিসেস পেনসন আশ্বিন মহিলা।

হু-চারদিনের মধ্যেই আমার জানাশোনা সবাইকে
 শোনালাম, পোস্ট-অফিসে চাকরি পেরেছি। তাও আবার
 কে-সে কাজ নয়—পার্সেল-বিলি-করা। জানলো সবাই, শুধু
 কলকাতার বাড়ির শোক ও বন্ধুবান্ধবরা ছাড়া। তাকখনও
 জানানো ব্যাপার? শুনেল ডাববে কি? বিলিতে গিয়ে
 পিয়নের কাজ, আরে ছি ছি। কোথায় ডেবে আছে
 সাহেব বনে গেছি, আর তার বংশে পোস্ট-অফিসে কাজ
 —কিনী সাহেবরা বলবে—“প্রেসটিজ লস্ট!”

পনেরোই ডিসেম্বর সকাল আটটার মধ্যে হাজির হলাম
 মাস্টারেল-হিল পোস্ট-অফিসে। আটটা থেকে পাঁচটা
 পর্যন্ত ডিউটি। মাকবানে বারোটা থেকে একটা—ল্যাক্স
 চুটি। আমি ছাড়া আরও তেরো-চৌদ্দজন দেখলাম হাজির
 হয়েছে। তার মধ্যে দুজন ছাড়া স্ত্রী সবাই ছাত্র।
 আটটা থেকে নটা চূচাপ বসে রইলার। কারোর কথা
 নেই। পোস্ট-অফিসের অজ্ঞাত সব কর্মচারী ও পিয়নরা
 যে ব্যাব নিজেদের কাজ করে থাকে। আমাদের কোনো কাজ
 দেবার তালির কারোর দেখেলাম না। ঘটনাতমক গুরে
 একটি কর্মচারী আমাদের সবাইয়ের নাম লিখে নিলেন ও

জানালেন, আজ আমাদের বিশেষ কিছু করার নেই।
 পরের দিন সকালে বাউস-গ্রীন পার্সেল-অফিসে যেতে
 হবে। পার্সেল-বিলি ঐখানে থেকে হবে। সেইদিন বেলা
 চারটে পর্যন্ত পোস্ট-অফিসে থাকতে হোল বটে, কিন্তু
 কাজের মধ্যে একবার কাছাকাছি হু-চারটে লোকানে
 পার্সেল-বিলি ও মাথো মাথো হু-চার বস্তা চিঠি বাছা ছাড়া
 কিছুই করতে হোল না। কাজের চেয়ে পোস্ট-অফিসের
 ক্যান্টিনে চা খেয়ে, ডাট বেলে ও অজ্ঞাত কর্মচারীদের সঙ্গে
 গল্প করে সময় কাটলো বেশী। এবারে লীগ-চ্যান্সিন
 ওয়েস্ট ব্রমউইচ না উল্ভুস হয়ে, লিওওয়ার্ড ও মীলার
 ইংল্যান্ডের ব্যাটলম্যানদের কান্না করতে পারবে কিনা,
 ভায়তবর্ষে শ্রীতকালে কিংকর ঠাটো পড়ে, চীন ফরবোসা
 আক্রমণ করবে কিনা, ‘স্লাই সলার’ গ্রানিয়ার বিশেষ কোনো
 অর্থ কিনা—ইত্যাদি—এক কথা, ‘হুতো সেলাই থেকে
 চণীশাই’ পর্যন্ত কোনো আলোচনাই বাব গেল না। প্রথম
 দিনে কে-কিনিসটা বিশেষ করে লক্ষ্য করলাম, সেটা হচ্ছে
 পিয়নদের বা অজ্ঞাত কর্মচারীদের বহুবর্ণ ব্যবহার।
 শ্রুতি: লক্ষ্য করা যায় যে, সবাই চোঁটা করছে আমাদের
 বেন বেশী কাজ করতে না হয়। তারা ছাড়া আমরা
 সবাই ছাত্র। এই ধরনের কাজে একবারে অনডাঙ।
 তাই আমাদের বাতে অস্থবিধার না পড়তে হয়, সে দিকে
 প্রায় সবাই দৃষ্টি রেখেছে। পোস্ট-অফিসের সবাইয়ের এই
 ব্যবহারে প্রথম দিনেই সব সন্ধ্যা বা লক্ষ্য হু হোল।
 সন্ধ্যাবেলা বখন বাড়ি ফিরলাম তখন সারাদিনের পরিশ্রমের
 ক্লান্তির বদলে অস্থব করলাম এই নতুন পরিবেশ ও
 পরিচয়ের এক বিচিত্র আনন্দ।

পরের দিন সকাল আটটার মধ্যে গেলাম বাউস-গ্রীন
 পার্সেল-অফিসে। অফিসার-ইন-চার্জ আমাদের ডানের
 হেড-পিয়নের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। চারজনকে
 নিয়ে এক-একটি ডানের স্ত্রী এসে ব্যাব ব্যবস্থা হয়েছে।
 ডাইভার, হেড-পিয়ন ও দুজন ছাত্র। আমাদের এসে
 হেড-পিয়নের বরস হবে প্রায় পঞ্চাশ-বাহার। নাম—বিল্।
 ড্যান-ব্রাইডার দেখলাম খুব আমদে দোক। বরস প্রায়
 চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। নাম—বাস্টিন্। অস্ত ছাত্রী হল
 অব ইকনবিক্সে পড়ে। নাম—ট্রান্। বাস্টিন্ আমার
 বললো, “ছালা স্রাব, হাট ছু ইট ছু?” বিল্ বললো,
 “এর নাম মিথাই।” বাস্টিনের জাতে কিছু ব্যাব আসে
 বলে মনে হোলনা। “আমরা তোমার স্রাব বাব ডাববে,
 কি বল?” উত্তর দিলাম, “আমার কোনো আগতি নেই।
 একটা নাম হলোই হোল।” মনে মনে বললাম—এই

কৃৎস্নকে যে ‘সাম’ বলেছে তাই যথেষ্ট। বাড়ির লোকেরা অবশ্য বলে ‘ডাইট কান’ অর্থাৎ ‘উচ্ছল কৃৎ’। প্রথম পরিচয়ই বাস্তব ও মিলসকে খুব ভালো লাগলো। মৌখিক শিষ্টাচারের বেড়াঙ্কান কাঠির সহজভাবে মেলামেমা করার আশ্রয়টা সহজেই নব্বয়ে পড়ে।

পার্সেল-অফিসে হাজার হাজার পার্সেল আসছে। আমাদের কাজ হোল পার্সেলগুলো খাড়াই ক’রে, সকালে একবার ও বিকেলে একবার বিলি করে আদা। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে পার্সেলগুলো বিভিন্ন স্বাক্ষর নামাফ্রায়ে বখা-বন্ধী করে ভ্যানে ছুঁলে বেরলাম বিলি করতে। প্রথম দিনের সেই পার্সেল-বিলির অভিজ্ঞতা দটাই বিচিত্র ও অশূর্য। এক-একটা বাড়ির সামনে ড্যান নামছে আর আমরা ড্যান থেকে নেমে পার্সেল হাতে নিয়ে বাড়ির কলিং-বেল টিপছি। একটু পরেই দরজা খুলে কোনো গুজলোক বা ডব্রমহিলা বেরলেন। আমাদের দেখে একটু অবাক হলেন, কেননা পোস্ট-অফিসের সাক্ষাশালাক আমাদের পরা নেই। হাতে শুধু পোস্ট-অফিসের ব্যাগ আছে। পূর্বাবনী হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, “সুইডেট?” বললাম, “ইয়েস।” পার্সেলটা হাতে নিয়ে হেসে বললেন, “খ্যাক ইউ, খ্যাক ইউ।” “খ্যাক ইউ।” আবার ভ্যানে উঠে বসলাম। বাস্তবী সহাত্রে জিজ্ঞাসা করলো, “অল রাইট, সাম? অল রাইট, ডাণ?” “ইয়েস।” আবার উত্তর দিলাম। মিল্ন্ আমাদের প্রথম এটোফোকে অভিনন্দন জানিয়ে বললো, “ওয়েল-ডান, বয়েজ।”

এইরকম ভাবে পার্সেল-বিলি চললো ঘণ্টা-দেড়েক। পার্সেল-অফিসে আসবার আগে ডর ছিল, কি জানি কিরকম কাজ হবে। বেস্ট বাটতে হবে কিনা। কয়েক-জনের মুখে শুনেছিলাম ভীষণ পরিশ্রম করতে হই। তা ছাড়া পোস্ট-অফিসের সাধারণ শিশুর বা কর্মচারীদের সঙ্গে নিজস্বের খাপ খাওয়াতে পারবো কিনা যে-চিন্তাও বে ছিল না, তা নব। কিন্তু এই ঘণ্টা-জিনেশের মধ্যেই সব আপত্তা দূর হোল। দেখলাম পোস্ট-অফিসের বাস্তবী, মিল্ন্ বা প্রথম হাতো লোকেরের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে যে সহজ সরল স্বাক্ষর আছে তা ‘এককিউজ য়ী’, ‘ব্রীজ’, ‘ইক্ ইউ ডোট রাইড’, ‘পারডন্ য়ী’—সেরা ইংরাজদের মধ্যে নেই।

চুপুহবেলা লাকের পর আবার শুক হোল পার্সেল-বাছাই। বাছাইএর পর ড্যান বোঝাই করে বেরলাম পার্সেল বিলি করতে। এবেলা পার্সেলের মধ্যে বেস্ট না থাকার, চায়টের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে, সেল। বাস্তবী

ড্যান বাবালা একটা রেস্টুরেন্টের সামনে। ড্যান বন্ধ করে সবাই চুকলাম রেস্টুরেন্টে। চুকলে দেখি আমাদের মতো অল্প কয়েকটা দলও চুকছে চাখেতে। মিল্ন্ চাও কেকের অর্ডার দিল। একজন শিশুর জিজ্ঞাসা করলো মিল্ন্কে, “কি হে, তোমরা কেমন কাজ করলে?” “খুব ভালো। আমরা সব পার্সেল বিলি করে বিবেছি।” উত্তর দিল মিল্ন্। “এরই মধ্যে?” অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো শিশুরটি। “হ্যাঁ, এরা খুব কাজের ছেলে।” মিল্ন্-এর প্রশ্নের খুব দৃষ্টী হলাম। এ বেন প্রশ্ন মিল্ন্ হুঁলে হেডমাষ্টার-মহারের শির্ষ-চাপড়ানি-খাওয়া। চাপাওয়া শেষ করে কাউন্টারে দাম দেবার জন্ত ব্যাগ বার করতে বাস্তবী দেখে মিল্ন্ বললো, “ডোন্ট বি দিলি। আই উইল পে।” বাস্তবী বললো, “ছেলেমানুষ কিনা? পকেটে টাকা কুইকুই করছে। বাথ হয়োনা। তোমার টার্ম আসবে।”

পাঁচটা নাগাধ পোস্ট-অফিসে ফিরলাম। মিল্ন্ বললো, “কাল সকাল আটটার মধ্যে এস।” রেকিটারের সেই করে বাড়ির গথ বরলাম। পোস্ট-অফিস কর্মজীবনের ষিটার দিন শেষ হোল।

বারে ডিনার খাবার সময় বিসেস পেনসন জিজ্ঞাসা করলেন, “কাজ ভালো লাগছে?” “খুব ভালো লাগছে। লওনের কত কি দেখছি, জানছি ও শিখছি।” বিসেস পেনসন বললেন, “ডাড়াটাড়ি শুয়ে পড়। কাল আবার জোরে উঠতে হবে।”

পোস্ট-অফিসে কাজ করেছিলাম মাত্র এগারো দিন। পানয়েই থেকে পঁচিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত। পেনসনির কাজ ছিল একই রকম। পার্সেল-বাছা আর বিলি-করা। কিন্তু কোন-দিনই কাজের মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব খটনি। প্রতিদিনই একটা-না-একটা ঘটনা আমাদের হৃদির মোহরাক জোগাত।

একদিন সকালে বাউস-ব্রীন্ পার্সেল-অফিসে গিয়ে দেখি, পার্সেলগুলোর মধ্যে দুটো বড় বড় দুইট। ঐটমানের উপহার রূপে চলছে কোনও ভাগ্যবানের বাড়ি। মিল্ন্ বললো, “দেখেছ তুমি, দেখেছ—অজ্ঞাত নহ? কোন্ বোটা খাবে দুইট, আর আমরা কিনা বাড়ি ব’য়ে নিয়ে আসবো?” বাস্তবী বললো, “একটা সখির ফেল-না, দাবা।” রোস্ট বা জমবে ফার্স্ট-ব্রাদ।—বোঁজ যদি করে, পোস্ট-অফিস থেকে লিখে দেবে ‘লস্ট অন ট্রানজিট’। তবে ঐ গোলমামুখো ইনচার্জটাকে একই ভাগ দিতে হবে।” মিল্ন্ বললো, “পরকার নেই, সম্মুখি পোষাবে না। ঐ বোল-স্টোনী চেহাওয়ার সোটা মুঠুটোর সানাবে না, তো বব্বা!” মিল্ন্-এর কথাই সবাই হেসে উঠলো। বাস্তবী পরে

দুইটি-তিনটি ভায়ে ভুলে বেবশাম বধাধানে পৌঁছে দিচ্ছে।
বাগ্গিন্ বগলো, "দুইটি বধন থাকুইই হোল্ না, এস
আমরা এদের আহার শান্তি করবো কি?" ট্রাণ্ বলে
উঠলো, "ওগবান, তুমি এদের শান্তি দিবে। আর, পুনরায়
যদি এবং দুইটি হয়ে অগ্রগ্রহণ করে তে, আমাদের কিচেনে
এখানে মজ্জি গায়ে।" আমরা বললাম, "আমেন।"

আর এগরিন পোস্ট-অফিসে চুকেই দেখি, চারদিক
ঘরের গছে ভরপুর। এদিক এদিক তাকিয়ে দেখি, বাগ্গিন্
একটা পার্সেল তুলে আর আগুন মনে বলছে, "আম-
আহা, এমন জিনিসটা নই হোল্।" পার্সেলটা দেখেই
দুশশন বহুর বোতল : জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাগার কি
হে?" "আরে ডাশার, হইতি-হইতি। কোন গাধা
হইতির বোতল পোস্টে পারিয়েছে অবচ ভালোভাবে প্যাক
করেনি।" বাক্যে পারিয়েছে, সে শু ভাড়া কাচ পাবে।"

মিল্ বগলো, "তার সঙ্গে গিগাক্স। দিতে হবে ১০ পিলি।"
ওর ওপর টাঙ্গ বসেছে। "মিলসের ওপর তার ছিল
টাকাপকি আদ্য করত, তাই ঐ পার্সেলটা বিলি
করতে সেল সে নিজে। আমি সেলাম সঙ্গে মজ্জাটা
দেখতে। বেশ টিপতে, একটি বুড়ী বেম দরজা খুললো।

মিল্ বগলো, "পার্সেল, ম্যাডাম—ট্যাঙ্গ দিতে হবে দশ
পিলি।" পোস্ট-অফিসের নিয়ম—আগে টাকা আদ্য,
তারপর ডেলিভারি। টাকাটা পকেটে পুঁতে, মিল্ বিল
পার্সেলটা বুড়ীর হাতে। বুড়ী তাকাতাড়ি পার্সেলটা
খুলতেই করে পড়লো চোঁট-বড় কান্ধে ইকরো। "বুড়ীর
মুখ তখন হজ্জিকাচার ধারণ করেছে, "হোয়াট ইজ বিল্?"

মিল্ বগলো, "পাচের বোতল ভালো করে প্যাক করিনি,
তাই এই অবস্থা।" বুড়ী তখন আঙুন : "তা করবে কেন?
করবার কি অবস্থা ছিল? নিজে দু-বোতল বেয়ে বোতল
ভুড়ীর বোতলটা সেই বেঁকে পারিয়েছে। মনে করেছে
কি—ঐইবাস, না পরমা এগ্রিন—ইভিট, মাগ, ল্যেল !!!"
মিল্ বগলো, "ওড বার, ম্যাডাম।" "ওড বার—
তারপরই সমস্ত বহর-বহর আওচাক !!!

এবারো দিন কেটে গেল বেন নিজের অজান্তে।

কিন্তু এই কদিনে ওপেনের কর্মজীবনের, বিশেষ করে
সাধারণ ইংরাজ প্রমিকের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয়ের
বে সুযোগ পেয়েছিলাম, তা অমূল্য। বিশেষী ছাত্রেরা বারা
ইলায়েও বার উল্লসিকার ক্ষত, তারা সাধারণতঃ বেলানেশ।
করে শিখিত বা বুঝিভীরা সম্ভ্রমারের সঙ্গে। ওপেনের
সাধারণ পোস্ট-না প্রমজীবনের সঙ্গে পরিচয়ের বা তাদের
কথা জন্মদায়ী-সুযোগ হয়না বেশী। এই কদিনের পরিচয়

বুঝেছিলাম যে, আমাদের ওপেন সহজে কতটা অজানা
থেকে বার এইরকম সুযোগের অভাবে। ডাইভার বাগ্গিন্
বা পিরন, মিল্-এর সঙ্গে কোনো অধ্যাপক, উচ্চশিক্ষা
কর্মচারী বা ব্যাবসায়ী ইংরাজের মনিকা ও রীতিনীতির
পার্থক্য রয়েছে প্রচুর। এই পার্থক্যের জলদানুলক আলোচন
নিশ্চয়োদয়ন। কিন্তু মায়র হিসেবে এই প্রমজীবীরা যে
বুঝিভীরাইদের চেয়ে এতটুকু নীচে নহ, তা বুঝতে বেশি
হয়নি। বাগ্গিন্, মিল্ বা পোস্ট-অফিসের যে-কোনো
কর্মচারীর কাছে যে ব্যাবহার পেয়েছিলাম, তাতে তারা যে
সাধারণ কর্মচারী আর আমরা বিবিদিশালয়ের উল্লসিকিত
ছাত্র তা চিন্তার অবকাশ পাইনি। আমাদের মনেও
একদিনের ক্ষণও যে-চিন্তা আসেনি। আমাদের মধ্যে
যে ছাত্রতা, সহানুভূতি ও সহযোগের আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে
উঠেছিল তা হৃদয়ী প্রবাস-জীবনে সত্যি ছিল বিরল।

এক দিনের কথা। বেলা তিনটে নাগাম একটা কাজ-
খান্য় মিল্কে বললাম, "তাকাতাড়ি বাড়ি কিভাবে
পারলে ভালো হয়।" মিল্ বগলো, "বন-ইইই চলে
যেঁয়ো, আমরা তোমার 'হয়ে কাজ' করে দেবো।"
তিনটের সময় বাড়ি চলে এলাম। অবশ্য পোস্ট-অফিসে
এ কথা কেউ জানলো না। পরের দিন সকালে ইঞ্জি-
কিজায়া করলাম, "গতকাল কখন কাজ দেব হোল্?"
ট্রাণ্ বগলো, "প্রায় ছ'টা। একমুঠা ওডার-টাইম করতে
হয়েছে। আর, তোমার নামেও মিল্ শিখেছে—ছ'টা
পর্বত কাজ করছে।" অবশ্য হয়ে মিল্কে জিজ্ঞাসা
করায়, সে লহাতে উত্তর বিল, "তুমি তো বেশ চেলে।
কাজ ছিল, চলে গেছে—তাকে হয়েছে কি? আমরা কাজটা
করেছি তোমার হয়ে—কাজেই।"

আর-একটা ঘটনা। পর পর আট-ন'দিন ভ্যান থেকে
নাম-ওঠা ক'রে ঐটমানের আসের দিন পায়ে ব্যাধা
হয়েছিল। সেদিন মাজ কয়েকটা বাড়িতে পার্সেল দেওয়া
ছাড়া ভায়ে বসে সময় কাটাচ্ছিলাম। আমরা হয়ে পার্সেল
বিলি করছিল বাগ্গিন্। আইনতঃ বাগ্গিনের এ-কাজ
করবার কথা নহ। তার কাজ শু ভ্যান চালানো।
কিন্তু আমার পারের ব্যাধা-সেবেই বাগ্গিন্ নিজে পার্সেল
বিলি করছিল। আমি বাধা দেওয়ার বললো, "পা-টা
একবারে খোঁড়া না করলে চলেছে না? আর কথা
বাড়িজনো, বলে থাকো।" এর পর বলে থাকা ছাড়া সত্যি
কোনো কাজ ছিল না।

পরের দিন ঐটমান। সকালবেলা পোস্ট-অফিসে
সেলাম বাটে, দ্বিভ চলায় আর অবশ্য দেই-দেদিন মাজ

একবেলায় কাছ ছিল। সবসময়ই ভাবেন বলে কাটালাম।
মিল্প ও বাস্তবিক শব্দে কুটি রেখেছিল বাগে ভান্নি থেকে
একবারও না নামি। এককম ভাবে নিজের মতো ভাবেন
যেই হ'ল যেতে নিজেই খুব খাপস লাগছিল। বাস্তবিক
আর মিল্পকে বললাম, "তোমাদের কত কাজ বাড়িয়েছি।"
মিল্প বললে, "কী খাতা বগছে? খটখটকে তোমার
পায়ে পেগেছে তাই আমায় তোমার কাজ করে দিচ্ছি।
আমার যদি লাগতো, তোমায় করতে না?" এত মিষ্টভাষী
বাস্তবিক নয়। সে বললে, "আমি তো ঠিকই বলছি। বোড়া
পায়ে ঠাট্টে না, এ কি কন ছাথের কথা? তা আজকের
মাইনেটা নয় আমাদের দিয়ে দিয়ে।" তোমার জল হুটো
নকল পা কিনে লেবে।" এর পর আর কোনো কথা বলিনি।
এটিনই ছিল আনালের পিয়নগিরির শেষদিন।
ঐটমাসে উপলক্ষ্যে কয়েকটি বাড়ি থেকে আমায় কয়েক
শিপি উপহার পেয়েছিলাম। কাজের শেষে মিল্প বললে,
"বা পেয়েছি তা আনালের সমান করে ভাগ করে নিতে
হবে।" আমায় বললাম, "না মিল্প, কল তুমি নেবে।"
"আ হু না, তোমাদেরও নিতে হবে", উত্তর দিল মিল্প।
আমায় বললাম, "আমাদের অংশ তোমার চেলেমেদের
ঐটমাসের উপহার রূপে দিচ্ছি।" এর পর আর সে 'না'
বলতে পারেনি।

পোস্ট-অফিস প্রেসিডেন্টের লেখাবারের মধ্যে আমি-মই করে
বাটের এসে মিল্প ও বাস্তবিকের কাছে বিদায় নিলাম।
ছাত্র-শিক্ষক করে বাস্তবিক বললে, "কি আম, আমাদের চলে
যাবেনা তো?" মিল্প বললে, "আমি মাস্কুলেট-হিল
পোস্ট-অফিসে কাজ করি।" মাগে মাগে আসবে তো?"—
আমাদের পরিচয় মাত্র দশ-বারো দিনের—মিল্প সিয়ন,
বাস্তবিক ছাইভার, আর আমি চাব। পোস্ট-অফিসের কাজ
কালের জীবনধারণের উপায়, আর, আমায় কাজে তা কাজে-
সিয়নের বিলাস ছাড়া কিছুই নয়। ওদের বদলও আমার চেয়ে
অনেক বেশী। কিন্তু এত পার্থক্য, এত ভিত্তির মাঝেও
যেন এই ক'দিনের জল আমায় পবনর বন্ধ ও পৃথকমী হয়ে
উঠেছিল। মিল্প, বাস্তবিক বা বাস্তব-গীন, মাস্কুলেট-হিল
পোস্ট-অফিসের অফিস কর্মচারীদের জীবনে প্রত্যেক
ঐটমাসে কত নতুন নতুন ছাত্র আসে কুটির কাজ বা
'ডেস্কশন ওয়াক' নিয়ে, জানিনা নতুন নতুন পরিচয়ের
মাসে তাদের আমার কথা মনে থাকবে কিনা। চমকো
থাকবে না। কিন্তু আমার জীবন সাংসারের জীবনে এটি
ক'দিনের জল যে নতুন পরিচয় হয়েছিল, যে অল্প
বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল, এবং দূরব উপর
ইংরেজ দেশ ও দেশবাসীর যে নতুন দিক দেখতে
পেয়েছিলাম—তা নান থাকবে চিরকাল।



১৯৩৭

বঙ্গল ডেকার্টার

২২৬-চিওরজন এডিনিউ • কলিকাতা - ৬

ঘর

ভালাতোয়ালি মুখোশাখ্যার

কথায় কথায় মুখাংগ বললে, “আমি তো কোনে সনজা দেখি না। আজই তো এক বাড়িওয়ালা দস্তুরনতো সাধাসাধি করছিল। তবুও তুমি, নেবত। নেলে তো বাড়ি নেলে না।”

বহু অভিজ্ঞতায় প্রোট ভোলানাথদা টিঙ্কনী কটিলেন। আজই না-হয় একটু যন্ত্রিতে বসতে পেয়েছেন এ-বাসটিয়। তার আগের ছুঃখপ, সে তি সচজে ভোলবার? বললেন, “নতুন কথা শোনালে বাহোক। বলে, যে ছানা ঘরের নালিক সে ছাদে ঠাড়িয়ে কথা বলে, সে কোনে ছাখে হোমায় খোমামোদ করবে হে? সে হারছিল চল্লিশ-বিয়াল্লিশ সাপে। বোমার হিড়িকে সবাই পালান শরত ছেড়ে। আদেক কেন, তখন সিকি ভাড়ায় বাড়ি পাওয়া গেছে। গতিক বুকে, বিনা ভাড়াতেও রাখতে জেলাজেদি করেছে বাড়িওয়ালা। এই দেখে-দেখে বলে কিনা চুলে পাক ধরল! বাচ্চ কথা বলার আর জারগা পেল না, হোকরা?”

মুখাংগও দমবার পাত্র নয়। নজির নেলে ধরলে সামনে। বললে, “বিশ্বাস না হয়, এই ঠিকানার বোঁদ নিয়ে দেখুন—বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে দিন-ছয়েক।”

এর পর আর তর্ক চলে না। চাবিকাঠি বখন এগিয়ে লিচ্ছে তখন বাইরে ঠাড়িয়ে আফালন শুধু লোক হাসানো। অতএব তখনকার মতো ভোলানাথদার মুখে তালা পড়ল।

আগিসের কাজে মুখাংগের সুনামের অন্ধ বেশ ভারি। ঘাড় গুঁজে টাইপ পেটে সাতদিন। কিন্তু তারই কাকে চলে প্রত্যেক কথায় কোড়ন কাটার কাজ। সমস্তা যত গুরুতরই হোক, কথার ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়াই তার স্বভাব, তার বিশেষত্ব। ফল-কাটা ছুরিতে পাঠাবলি দিতেও সে পিছ-পা নয়।

মুখের মুহুরাসিটি যেন সর্বদা ব্যঙ্গ কথার ক্ষতই লেগে আছে।

বহুরে অস্বস্ত বার-ছয়েক বাড়ি বদলায় মুখাংগ। কেন, সে-কথার সঠিক উত্তর আদোয়ে আজও সবাই অসমর্থ। বেশী পীড়াপীড়ি করলে বলে, “এক বাসায় আর ক’দিন থাকি যায়?”

তবুও এই বাসা-ছলিকের দিনে বাড়িওয়ালা যে দখলি-স্বয় দিতে তার পেছনে ঘুরে মরছে, এটা একটু বাড়িবাড়িই মনে হলো সহকর্মীদের।

ভোলানাথদা আবার কীক পেয়ে গুরু করলেন, “জাখো আবার কী মতলব আছে লোকটার। আমাদের কথা তো কোনে নেবে না। তবুও বলে রাখি, নতুন বাড়িতে সংসার গোছানোর আগে একটু খবর নিয়ে পাড়ায়।”

এত সহজে পেছিয়ে পড়বে, তেমন কীচা নয় মুখাংগ। বললে, “খবর নিয়েছি বৈকি। ভুললোক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। এক ছাদের তলায় থেকে এবার অর-জারির ট্যান থেকে যে রেহাই পাব সেটা সুনিশ্চিত।”

“ডাক্তার! বলো কি হে? কঙ্গীর বাড়ি ছেড়ে শেবে ভাড়াটের বাড়ি আনাগোনা? তাজব ব্যাপার!” ভোলানাথদা বিস্মিত ভাবটার ওপর আরও ছ-দশ ডিগ্রী মাত্রা চড়িয়ে সবার দিকে সঙ্গ্রহ দৃষ্টি হানলেন।

ঠিক সেই সময়েরই এক ভুললোক মুখাংগের বোঁজে হাজির। নাতিদীর্ঘ ছুটপুট চেহারা। গলাবন্ধ কোটের পকেট থেকে উকি মারছে স্টেথোস্কোপের জোড়া ডাটা।

মুখাংগের টেবিলের কোণটায় ডান হাতের ভর চাপিয়ে বললেন, “তাহলে আমার বাড়িতে আসা পাকা তো? মাসের প্রথমেরই চলে আসুন।

সুবিধে-অসুবিধে যা-কিছু বলবেন, সব ঠিক করে দেব।”

বিষয়াদিকারীর শারীরিক আবির্ভাবে সুখান্তর ধনতম ভাব কারুরই দৃষ্টি এড়ান না। তা ছাড়া বহুদলের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে অশ্রুতি বোধ যে না করছেই তাও নয়। একটু সামলে নিয়ে বললে, “আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন? আজ রাত্রির আমি নিজেই বেতাম।”

“না না, কষ্ট আর কী? এসেছিলাম আপনাদেরই গৃহ-বিভাগে। একটু দেখা করে গেলাম, এই যা।”

সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে গিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে আগিসের বারান্দাটা পার হয়ে গেলেন ভবলোক।

এক প্রসঙ্গে আগিসের লম্বা ঘটার আর কতটুকু হয়? পাঁচ কথার ভিত্তি চাপা পড়ল সুখান্ত-কাহিনী। তার ওপর আবার ইনক্রিমেন্টের মরহুম। অতএব সেই দিকে কথা গড়িয়ে যেতেই সবার চোঁট চকল হয়ে উঠল।

নবেন্দুরই সঙ্গে সুখান্তর একটু বেশী মাথানাথি। ছুটির পর প্রায়ই কাছের রেস্তোরাঁয় দুজনে এক-আধঘণ্টা গল্পগুজবে কাটায়। ক্রমবর্ধিত সাংসারিক ব্যয় যে কি ভাবে উপস্থিত উপার্জনকে প্রতিপথে বোঁড়া করে দিচ্ছে, সেই কথাই বিশেষভাবে এসে পড়ে নানান আলোচনার মাকে। বাড়িতে সন্তানভারে রুগা জী। সহোদরা মালা এখনও পয়সার-বাসিনী নয়। হ'লে, হাঁড়ি ঠেলার মাংসলের ব্যবস্থা করতে হতো। কাটা কাপে চোঁট ঠেকিয়ে ভারাক্রান্ত মনের মেকী টাকাগুলো সচল করার সন্ধান খোঁজে।

সেদিন ছুটির পর সুখান্ত বললে, “বাড়িটা নিয়েই নি', কি বলা? ভাড়া খুবই কম।”

উৎসাহ দিয়ে নবেন্দু বললে, “নিশ্চয়ই। এ দাও কি ছাড়ে? তবে ভোলানাথদার কথাটাও উড়িয়ে দিয়ে না। এই, একটু খোঁজ-ববর আর কি—”

“বাদ দাও তাঁর কথা। অত দেখতে গেলে চলে না।” তির কণ্ঠে সুখান্ত সাক জবাব দিলে।

কয়েকদিন পর সুখান্ত উদ্ভূত। বৌয়ের মনের মতন বাড়ি হয়েছে। অত্যন্ত নিখুঁতটে বাড়িওলা। একলা মানুষ। হুঁ আজ কয়েকবছর হলো পরলোকগতা। ইকুনিব-কুকারই ডানহাতের ব্যবস্থা করে। আর, সারাদিন খেয়ানাকির মতো রুগী আর রোগকে পারাপার করতে তিনি ব্যস্ত।

ঘন ঘন না গোলো, মাঝে মধ্যে সুখান্তর দলজার কড়ায় নবেন্দুর হাত পড়ে। নতুন বাসার নথর পাকটে খাকা সবেও, সুযোগ-সুবিধে হয়ে উঠছিল না হাজির দেবার। এক রবিবার টালিগঞ্জের ট্রামে একরকম জোর করেই চেপে বসল নবেন্দু।

সুখান্ত কোথায় যেন বেরিয়েছে। তাতে অবশ্য কোনো অসুবিধে হলো না, কারণ অশ্রু-প্রবোনের অনুমতি-পত্র অনেকদিন আগেই নবেন্দু পেয়ে গেছে।

নীচের তলার তিনখানা ঘরই সুখান্তদের। তক্তনা খটখটে। বড় বড় জানালাওলা সামনের ইকুরো দালানটা দক্ষিণ-খোলা। নীচের চলকল আন্দর-রকম ভাবেই তাদের একলার দখলে। এদিক ওদিক উকি ঘেরে নবেন্দু দেখল সব ভৌ-ভাঁ। না আছে কাজ সারার তাড়া, না উছুন ধরানোর উন্মোগ। কৌতূহলী নবেন্দু ঠাট্টা করল, “কি বৌদি, আজ রাত্রিরে ইরিমটর, না, পাছাবী দোকানের রুটি-তরকারির ব্যবস্থা।”

কালের ছেলের হাত থেকে আঁচল ছাড়িয়ে, নবেন্দুর সামনে এসে সজ্জা বললে, “রান্নাঘর বন্ধ দেখে বলছেন? আজ যে আমাদের ওপরে নেমস্তর।”

ওপরে ওঠবার সিঁড়ির দিকে সন্ধানী দৃষ্টি ছেনে নবেন্দু জিজ্ঞাসা করল, “ওপরে ঘর ক'খানা?”

“তিনখানা। ডাকার-বাড়িওলা থাকেন।” জবাব দিলেন সুখান্ত-গিঠী।

তত্বেলোক অত্যন্ত মিত্তকে। ক'দিন ঘাঘংই নাকি এসেব খাওয়ার ব্যবস্থা উঠে-পড়ে লেগেছেন। সুখান্ত প্রথমে আনন্দ দেখনি। কিন্তু তিনি যখন বিশেষ ধরে বসলেন, তখন আর সম্মতি না দিয়ে উপায় রইল না।

কিন্তু রান্নার লোকের সমাধান হবে কি করে? এত লোকের সুকৃতি-খাদ ইকুনিকে সম্ভব নয়। অতএব সুখান্তের সম্মতি নিয়ে সানন্দে এগিয়ে এল মালা, খুশি-নাড়ার কাছে।

হুই-হাসি হেসে সন্ধ্যা বললে, “মালার কিন্তু ঠিক নেন্দুই খাওয়া হলো না। ওকেই যখন পরিবেশন করে খাওয়াতে হবে সবাইকে।”

মোটিমাটি, আদ্যীয়প্রতিম বাড়িএলা সমেত একটা ভালো বাসা পেয়ে যে সবার মনে খুশির জোয়ার, সেটা বুঝিয়ে দিলে সন্ধ্যা আশ্বাসের ইঙ্গিতে।

বিদায় নিয়ে ফিরে আসছিল নবেন্দু। কিন্তু পথ ছাড়ে ঠাড়া ডাক্তার। বাজার থেকে ফিরেছেন। হাতে শ্রী-বিদ টিন। আপিসে এককলক দেখেও ঠিক মনে রেখেছেন নবেন্দুকে। বললেন, “এ-সব প্রাকসনের গুণ, মশাই। পাঁচবছর আগের দেখা কন্যাকেও চিনতে ভুল হয় না। আর, যখন এসেই পড়েছেন...” ডাক্তার জোর করে হাতের মতো অতিথি করে নবেন্দুকে ঘরে নিয়ে গেলেন ওপরে।

উঠেই সামনে রান্নাঘর। রন্ধন-রতা মালার ওপর চোখ পড়ল নবেন্দুর। হাত ছুঁটো তার হাঁড়ি-কড়া-বেড়ির দৌরাঘো ঘুরপাক খাচ্ছে। গুনগনে আছে মূব হয়ে উঠেছে বেগুনে লাল। আঁটসাঁট গড়নের ওপর গাছকোমর বেঁধে মানিয়েছে ভালো। টানা-টানা চোখের ওপর পুরু জ-জোড়া বেশ গিল্লী-প্যাটার্নের তসী এনে দিয়েছে। সাংসারিক কাজে মালার ছুড়ি বেয়ে যে সচরাচর নজরে পড়ে না, এটা সত্যি। দু-চারটে কুশল প্রশ্ন করে ডাক্তারের সঙ্গে পাশের ঘরটায় আসন নিল নবেন্দু।

জমিয়ে বসার বোল-আনা ইচ্ছা-মবেও ডাক্তার মাঝে মাঝে রান্নার দিকে উঠে যাচ্ছেন। এগিয়ে

নিচ্ছেন এটা-ওটা। ওকে দোষ দেওয়া চলে না। অল্প দ্বিতীয় ব্যক্তি কোথায় যে, কাই-করনাস খাটবে? খাটছে মালা। অপরের হোসেনও বেশ সহজ করে নিয়েছে নিজেকে। ডাক্তারের কথার জবাব দিচ্ছে অকুণ্ঠিতভাবে। দু-একটা হুজুমও চালাচ্ছে নিঃশব্দে।

পাঁচরকম আরোজনে খাওয়াটা মন্দ জমল না। বহুবীর মালার রান্না চেখেছে নবেন্দু, কিন্তু আঙ্গুরের স্বাদটা আরও রমালা লাগল। ক্রমশ হাত যে পাকছে, এটা উল্লেখ করে একটু রসও পরিবেশন করল সে। হুই বন্ধু, ডাক্তার, মালা আর তার বৌদি মিলে ভোজ-মজলিসকে মাতিয়ে রাখল।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে ডাক্তার বললেন, “আমার খাটে একটু হাত-পা ছড়িয়ে নিন, নবেন্দুবাবু।” নিজেও এসে বসলেন পাশে। স্বাস্থ্য কয়েক ঘণ্টার নবেন্দুকে অন্তরঙ্গ বন্ধু-বানিয়ে কোলেছেন ডাক্তার। সুখান্ত-মালারা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নীচে নেনে গেছে আগাই।

খাটের পাশের পেওয়ালে টাঙানো একটা ছবির দিকে তাকিয়ে নবেন্দু বললে, “এটা কার ছবি, ডাক্তারবাবু?”

“আমার স্বর্গীয়া স্ত্রীর।”—বড় গম্ভীর শোনাল ডাক্তারের গলা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন ডাক্তার, “আপনার বিয়ে হয়নি, নবেন্দুবাবু?”

“না। কেন?”

নড়েচড়ে সহজ হয়ে বসে ডাক্তার বললেন, “যদি কখনো, নিজে দেখে শুনে করবেন। আগে বাছাই করে নেবেন। সুযোগ-সুবিধে থাকলে ঘর করে দেখে নেওয়ারও আমি পক্ষপাতী।”

এ বরনের অসম্ভব উজ্জ্বল নবেন্দু প্রায় চমকে উঠল। কী বলতে চান ভদ্রলোক? আসল উদ্দেশ্য উন্মোচনের সুবিধে প্রশ্ন করলে, “আপনি বুঝি দেখে-শুনে বৌদিকে ঘরে এনেছিলেন?”

হাসিকিলোর হাসি খেলল ডাক্তারের ঠোটে :
“তা যদি করতাম, তাহলে আর বলব কেন নশাই ?
যতদিন খেঁচে ছিল, আলিয়ে বেরেছে। সে বজ্জাল-
পনার কথা ব’লে বোকাবার নয়। সাথে কি আর
ও-পথ বাড়বার সাহস হয়নি এখনও ! আপনিই
বলুন না, বিয়ের বয়স কি আমার পেরিয়ে গেছে ?”
ডাক্তারের শেষের কথায় আক্ষেপের সুর বেজে উঠল।

দাম্পত্য-হুঁজুটি ব্যক্তির পক্ষে সাব্বনার কোন
মলম বিশেষ কার্যকরী সেটা ভোলানাথের লাইনের
ব্যাপার। নবেন্দু এখনও এ-বিষয়ে আদার ব্যাপারী।
অতএব মুখ খেলার সাহস হলোনা তার। বলা
যায় না, ভুল ওষুধ যদি পাটা বেশি ধগ্ধিয়ে
ওঠে ! তবুও অজ্ঞ কথা পেড়ে প্রসঙ্গ-পরিবর্তনের
চেষ্টা করল নবেন্দু। কিন্তু সে যেন হাওয়ার
বিপরীতে-চুঁচু দিয়ে ঘুঁড়ি নিয়ে হাওয়ার মতোই
ব্যর্থপ্রয়াস। শেষ পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটার দিকে
তাকিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পাড়ল নবেন্দু।

“অনেক রাত হলো। আজ চলি—”

ডাক্তারও পেছন পেছন নেবে এলেন এগিয়ে
দিতে। সদর দরজায় এসে নবেন্দু বললে, “এবার
আমুন আপনি—” কিন্তু ডাক্তার সে-কথায় কর্ণপাত
না করে ইটতে লাগলেন নবেন্দুর সঙ্গে।

একটু এগিয়েই বাস-স্ট্যাণ্ড। একটা বাস এসে

পাড়াতাই নবেন্দু ছুটল ধরতে। কিন্তু ডাক্তার
ছেড়েও ছাড়তে চাননা। হাতটা টেনে নিয়ে
বললেন, “এত তাড়া কিসের ? না-চয় আজ শেষ
বাসেই ফিরবেন।”

নবেন্দুর আপত্তি টিকলো না। কি-একটা বলবার
জগে ডাক্তারের হৌকাহৌকানি ধরতে পেরেছে সে।
উমকে দেবার লোভে পড়ে বললে, “আপনার ব্যুথি
বাড়ি ফেরবার তাড়া নেই ? আর, কহবেনই বা কী
ফিরে ? মেটরিয়াল-মেডিক। খুঁলে বসবেন তো ?”

“হেঁ হেঁ হেঁ—” সপ্রতিভের হাসি হাসলেন
ডাক্তার। বললেন, “ঠিক ধরেছেন বটে।”

নবেন্দু কিছু বলতে যাবার আগেই ডাক্তার তার
মুখ চোপা লিলেন। খচু করে কাটা ভাবটা যেন
গেলেশের ওপর উপুড় হয়ে, ঢকঢকিয়ে সব জলটাই
বের করে দিল। এতকণের ইতস্তত ভাবটা চোখ
বুজে কাটিয়ে উঠে ডাক্তার বলে ফেললেন, “আপনি
নশাই এক্সপার্ট লোক। থাকে বলে সমকদার
আন্বি।...সেখুন-না বলে শুধা-ভাব্যকে আমার
কথটা ! আর, মালাও তো বেশ ভাগরটী...”

আর-বলতে-হবেন-না ভাব নিয়ে বাসের হাতল
ধরে কূলে পড়ল নবেন্দু। পেছনের সীটে বসতে-
বসতে নব পড়ল ভোলানাথের প্রথম বিনের
কথা। বাক্য তো নয়, বাণী !



PHONE • B.B. 1717
GRAM • CALOPTICO

মাথার হস্তশল্য ত্রুটিতেছেন
একবার চকু পরীক্ষা করান না কিং?



ক্যানকাতো অপটিক্যাল

কোঃ প্রাইভেট লিমিটেড
প্রতিষ্ঠান: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু এম.বি.

৪৫, আমদাহাট্ট স্ট্রীট • কলিকাতা-৯

কলঙ্ক

অশ্রুপূর্ণাঙ্কুর

সংসার:

যাবৎ পর্যন্ত না বরষাধি লাভ করছি কিংবদনা
কপিলবস্ত্র। নগরে প্রবেশ করবনা, বিজ্ঞান করবনা,
ভোজন করবনা, ভ্রমণ করবনা। অস্তিমুখেও পা
বাড়াবনা কখনো।

দক্ষিণ-পূর্বদিক চলেছে কণ্ঠক। ছন্দক অগ্নুসরণ
করছে সমবেগে।

অনেকের স্নেহ নেই কিন্তু সামর্থ্য আছে।
অনেকে আবার অসমর্থ হলেও স্নেহশীল। ছন্দকই
একমাত্র ব্যতিক্রম যে একাধারে স্নেহী ও সমর্থ।

রাজাসীন। অতিক্রম করে রাজকুমার অনাম্যার
তীরে বেগুনসদীপে উপস্থিত হল। অগ্নুরেই নরোত্তম
ভার্গব মুনির আশ্রম।

জগজ্জনের চক্ষু, সূর্য দেখা দিল আকাশে।
প্রসন্ন হয়ে সিংহনারাও চোখ মেলেল।

আজ, দেখ কি স্নন্দর বিশ্বাসে ঘুমুচ্ছে
হরিণশিশু। কি নির্ভয়ে কলরব করছে পাখির।
সবস্ত আশ্রমপার্শ্বে কি নিরাবাত শান্তি। সিদ্ধার্থের
বনে হল এই বোধহয় বিজ্ঞানের সত্ত্বত।

ঘোড়া থেকে নামল সিদ্ধার্থ। ছন্দককে বললে,
'তোমাকে আর কি বলব। তুমি হুপূর্ণের মত এই
ক্রতগাবী ঘোড়াকে অমুগমন করেছে। তোমার স্নেহ
ও সামর্থ্যের তুলনা নেই। তুমি জানো আমি এখন
প্রব্রজ্যার পথে, তোমার তাগোয়ান্তি করতে পারি
আমার এমন আর কোনো সহায়সম্পদ নেই। তবু
তুমি আমাকে নিভিকন জেনেও আমার সেবা
করছ। তুমি মহৎ, তোমার স্রীতিই কামবৃক্ষ।

আর কিছু তোমার করবার নেই। আমি আমার
আকাঙ্ক্ষিত আশ্রমে এসে পৌঁচেছি, তুমি এবার
ঘোড়া নিয়ে ফিরে যাও।'

বাকি যা অলঙ্কার ছিল সেই থেকে মোচন করে
ছন্দকের হাতে তুলে দিল সিদ্ধার্থ। এই নাও
রাজমুকুট আর এই তার মধ্যমণি। বললে, 'এই
মণিটি ষাবার হাতে পৌঁছে দিয়ে তাকে প্রণাম করে
বলবে, আমি জরামরণ বিনাশের জন্তেই তপোবনে
প্রবেশ করছি। স্বর্গলাভের আশায় নয়, নয় বা
স্নেহহীনতায়, নয় বা ক্রোধবশে। তাই তাকে
বোলো আমার অভিনিষ্ঠমনে তিনি যেন শোক না
করেন। দিলন যতই দীর্ঘস্থায়ী কল্পনা করা যাক না,
একসময়-না-একসময় বিচ্ছেদ আসবেই, ছিন্ন হবেই
এ বন্ধনবৃত্ত। বিচ্ছেদ গ্রন্থ বলেই তো আমার
নোকে ইচ্ছা হয়েছে।'

'কিন্তু আপনি অসময়ে বনে যাচ্ছেন।' বললে
ছন্দক। 'তাই এ দৃষ্ট ভেবে কে না শোকাকুল
হবে!'

'কেল জীবনে ধর্মের অসময় নেই। আজই এই
মুহূর্তেই আমাকে পরম কল্যাণ অর্জন করতে হবে
এই আমার সিদ্ধান্ত। বৃদ্ধা যখন প্রতিক্ষণী তখন
জীবনে আর আশা কি। তাই যে শোকনাশের
জন্তে নিজস্ব হচ্ছে তার জন্তে শোক করা শোভা
পায়না। বিশ্বের উত্তরাধিকারী পাওয়া যায়, ধর্মের
উত্তরাধিকারীই দুর্লভ।'

'কি বলব আমি রাজাকে।' সিন্তনয়নে তাকাল
ছন্দক।

‘এই সব কথাই বলবে। বলবে আমাকে যেন তিনি শ্রবণ না করেন। শ্রবণেই যন্ত্রণা। বরং আমি যে কত গুণহীন কত অযোগ্য তাই তাঁর কাছে বর্ণনা করো। গুণহীনের প্রতি স্নেহ স্থায়ী হয়না আর স্নেহ চলে গেলে শোকও চলে যায়।’

‘কিন্তু, প্রহু, আমি কিছুতেই সস্থ করতে পারছি না।’ হৃদয়ক সন্তাপগ্রস্ত মুখে বললে, ‘নদীপথে নিমগ্ন হলে যেমন হয় তেমনি আমার চিত্ত অবসন্ন হচ্ছে। যেহেতু তার হৃদয়ের কথা ছেড়ে দিই, যার মন সৌহৃদ্যে তারও সাধ্য নেই অক্ষয় প্রতiroধ করে। যে সুকুমার দেখে রাজপ্রাসাদের কোমল-শয্যার উপযুক্ত সে কি করে কর্কশকুশাঘুরের কুশিলাঘায় শয়ন করবে? হায়, আমি কি স্বপ্নে ছিলাম, দৈবই আমাকে সবলে টেনে এনেছে। নইলে কে এই কপিলবস্ত্র শোকধরণ অথ আপনাকে এনে দিত? সৈবের কাছেই আমি পরাহৃত।’

‘হৃদয়ক’, সিদ্ধার্থ বললে দৃঢ়স্বরে, ‘আমার প্রতিজ্ঞাই সর্বজয়ী। আমার প্রতিজ্ঞার কাছে দৈবও পরাহৃত।’

তবু কিছুতেই হৃদয়ক প্রত্যাহৃত হচ্ছে না। বলছে, ‘নাস্তিক যেমন সঙ্ঘর্ষ পরিত্যাগ করে, আপনিও কি তেমনি করে পূত্রবৎসল স্নেহোচ্ছল পিতাকে ত্যাগ করবেন? কৃতস্থই সংক্রিয়া বিম্বিত হয়, আপনিও কি তেমনি ভুলে যাবেন জননীকে? স্ত্রীই লক্ষ লক্ষীকে বিসর্জন দেয়, আপনিও কি তেমনি কুলোদ্ভবা পতিব্রতা স্ত্রীকে বিসর্জন দেবেন?’

‘বোলো, আরো কিছু বলবে?’

‘বাসনাসক্তই যশকে পরিহার করে, আপনিও কি তেমনি আপনার শ্লাঘা শিশুপুত্রকে পরিহার করবেন? আর আমি? আমাকেই বা কি করে ছাড়বেন আপনি? আপনার চরণমূলই আশ্রয় একমাত্র গতি।’

হৃদয়ক নত হল। কিন্তু সিদ্ধার্থের বিচ্যুতি নেই। বললে, ‘হৃদয়ক, ফিরে যাও।’

‘রানচন্দ্রকে শ্রদ্ধা ত্যাগ করে যেতে পারে, কিন্তু আমি পারছি না। আপনাকে এই অরণ্যে রেখে আমি দলহীন হয়ে নগরে ফিরব এ অসম্ভব।’

‘কিছুই অসম্ভব নয়, হৃদয়ক।’

‘রাজা যখন জিজ্ঞাসা করবেন কুমারকে কোথায় রেখে এলে আমি কী বলব? আপনার গুণহীনতার কথা বলতে বলেছেন রাজাকে কিন্তু যে দোষ-লেশস্পর্শহীন তার সম্পর্কে আমি কি করে মিথ্যা উচ্চারণ করব? আর যদি লঙ্কিতদশে জড়িত হয়ে তা বলি-ও, কে আমাকে আত্ম করবে? চন্দ্রে উদ্ভাপ আছে এ বরং বিশ্বাস করা যায়, আপনাকে দোষ আছে তা অস্বীকার। জনগণের চক্ষে যার এত করুণা সে কি করে পুরবাসীদের ত্যাগ করবে? এসব হোন, গৃহে ফিরে চলুন।’

দ্বিরচিতে হৃদয়বল কণ্ঠ বলতে লাগল সিদ্ধার্থ, ‘বিয়োগজনিত সন্তাপ পরিহার করে। স্নেহবশত আমি না হয় স্বজনদের সঙ্গে যুক্ত থাকলাম, কিন্তু মৃত্যু? মৃত্যু কি থাকতে দেবে যুক্ত? বলপূর্বক পরস্পরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। যিনি প্রচৃত আশা করে বহু হৃৎশেষ, আনাকে গার্ভে ধারণ করেছিলেন আমার সেই স্বার্থপ্রযাত প্রথমা মাতা! আজ কোথায়? আর আমিই বা কত দূরে! পারিদের দিকে তাকিয়ে দেখ। বাসবক্ষে কণকালের চন্দ্রে সমাগত হয় তারপর যে যার দিকে চলে যায়। তেমনি দেখ নেখের ব্যবহার। একত্র মিলিত হয়ে আবার অপস্থত হয়ে থাকে। তেমনি জীবসমাগমও নিত্য বিয়োগাত্মক। যখন পরস্পরকে বিচ্ছেদবন্ধনা করেই সংসার চলেছে তখন স্বপ্নতুল্য মিলনের চন্দ্রে মমতা করা উচিত নয়। হৃদয়! আর সন্তাপ করো না। নিবৃত্ত হও। কপিলবস্ত্রের ফিরে গিয়ে সকলকে আমার কথা, আমার প্রতিজ্ঞার কথা বোলো। বোলো, হয় তিনি জরামৃত্যু জয় করে শীঘ্রই এখানে ফিরে আসবেন, নতুবা একাকী অকৃতার্থের মত মৃত্যুকেই বরণ করবেন। অতএব তাঁর চন্দ্রে আর শোক কি।’

দূরত্বভ্রম কল্পক সব যেন বুকেতে পেল।
এগিয়ে এসে সিদ্ধার্থের চরণযুগল লেহন করতে
লাগল। উক বাম্পে তার ছুই বিশাল চোখ পরিপূর্ণ
হয়ে উঠেছে।

ব্যতিক্রান্তিত চক্রমুত করতল দিয়ে কঙ্ককে
স্পর্শ করল সিদ্ধার্থ। বললে, 'কঙ্ক, তুমি কেন
কাতর হচ্ছ? তুমি বলবেগুণ্ডণ নিয়তব্রত, তোমার
কেন এ অস্থিরতা? তোমার জ্ঞান নিশ্চয়ই ফলায়িত
হবে। তুমি সাহস ও সধিকৃতার প্রতিমূর্তি হয়ে
থাকো।'

ছন্দকের কোষ থেকে তরবারি খুলে নিল
সিদ্ধার্থ। স্বর্ঘরেখাচিত্রিত শানিত অসি। সেই
অসি নিয়ে সিদ্ধার্থ তার কেশচূড়া কেটে ফেলল।
তারপর সেই অসি দৃষ্টান্তে নিক্ষেপ করল।
অবকালের জন্তে মনে হল যেন জ্যোতিঃপুঞ্জ
আকাশের সরোবরে সিতহংস শোভা পাচ্ছে।

নিরোদেশ থেকে স্ত্রী নির্বাসিত করেছি, পাত্র
থেকে আভরণের লাভ্যা, কিন্তু পরিধানের এই
বিলাস-বসনের কি হবে? কনকহংসচিত্রিত এ
শ্রবস্পর্শ সূক্ষ্ম কৌবিক?

সহস্র এক কিরাতে সেখানে এসে উপস্থিত হল।
তার পরনে কটিকৃত কাষায়।

সিদ্ধার্থ বললে, 'তোমার ও বসন আমাকে দেবে?'
'আনার এ ছিন্নচীর?' ব্যাধ অবাধ মানল।

'তোমার এ চীর স্ববিরের চিহ্ন। এ চীর
শুভাবহ। তোমার হাতে জিবাংসু ধম্বক, তাই
তোমার গাত্রে এ শোভা পায়না। যদি এ চীরে
তোমার আদর্শ না থাকে তবে এ আমাকে দান
করো।'

'আর আমি?'

'তুমি নাও আনার এই বহুল্যা শুভবাস।
বিনিময় করো।'

সাহস্রাদে সখ্যত হল কিরাতে। বসনের বিনিময়
করল। রাজকুমারকে নিজের কাষায় দিয়ে গ্রহণ
করল রাজকুমারের কৌবিক।

জীবরক্তকলঙ্কিত অশুচি বসনই পরল সিদ্ধার্থ।
সমস্ত জীবজন্তুসংখ্যা নিজের দেহে বহন করে চলল
এগিয়ে।

কতদূর গিয়েছে, পিছনে কার পদসঙ্গ। কিরে
তাকিয়ে দেখল, সেই কিরাতে।

'এ কি, তুমি আমার সঙ্গে চলেছ কোথায়?'

'এ তুমি আমাকে কী বসন পরালে?' পায়ের
উপর লুটিয়ে পড়ল কিরাতে। 'আমার হাতের থেকে
তীরধ্বক যে বসে পড়ছে। আমার কাষায়
আমাকে কিরিয়ে দাও। ঐ কাষায় পরা থাকলেই
আমি যুগপৎসেই বিশ্বাস জন্মাতে পারতাম, কাছে
গিয়ে বস করতে পারতাম বন্ধুত্বে। এ আমার
তুমি কি করলে? এ বসনস্পর্শে আমার মনের
থেকে যে হিংসার ভাব বিদার নিয়ে যাচ্ছে।'

সিদ্ধার্থ ধূলিপথ থেকে বাধকে তুলে নিল
বাহুপাশে। বললে, 'হে অমৃতপুত্র, আমার সাধনার
পথে তুমিই আমার প্রথম বন্ধু। তুমি আমার তাক্ত
কৌবিককে জীর্ণ করো আর আমি তোমার তাক্ত
কাষায়কে পবিত্র করি। কৌবিককে জীর্ণ করে
হিংসা-দ্বेष-লোভ-মোহকে দূরীভূত করো তুমি আর
আমি কাষায়কে জীবরক্তলাহন থেকে মুক্ত করে
শুভীকৃত করি। নবনির্বাণের বেশ ধর্মান করি ছন্দে।

বতদূর দেখা যায় সিদ্ধার্থের দিকে তাকিয়ে
রইল ছন্দক। রাজ্যভোগ্যাস্পৃহাশূন্য কুমার শেষে
কিনা ব্যাধের স্নানবিবর্ণ বেশ পরল। বাহুপাশে
কঙ্ককে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল সশব্দে।

কতক্ষণ কাঁদবে! কেঁদেই বা হবে কি। নিরাশ-
ছন্দয়ে কিরে চলল নগরের দিকে।

ভগ্নাবশেষ প্রবেশ করল সিদ্ধার্থ।

বর্ষার রাতে এক গোয়ালার ঘরের ছেঁচলার
ধাড়িয়েছেন বৃদ্ধ।

জানলা দিয়ে ভিক্ষুপ্রার্থক দেখতে পেরেছে
গোয়াল। বললে, 'আমি তোমাকে ও বৃত্তসোহন
সমাজ। আমার অভিজ্ঞা-পুণ্ড্র, প্রাণসিক্ত অসি।
হুতরাং হে মেঘ, বৃত্তপাক্ষে বৃষ্টি করো।'

ভগবান বললেন, 'আমি ক্ষোভমুক্ত, অবৈষমী-
আমার অনাচ্ছাদিত গৃহ, নির্ধাপিত অগ্নি। অতএব,
হে মেঘ, যত পারো বর্ষণ করো।'

গোপালক বললে, 'আমার আবাসে দংশমশকের
উপভব নেই। নিবিড় তৃণবন-গোষ্ঠে আমার
গাভীরা বিচরণ করছে। তারা বারিপাত অনায়াসে
সহ্য করতে পারে। সুতরাং হে মেঘ, যত পারো
বর্ষণ করো।'

ভগবান বললেন, 'আমার সুনির্মিত ভেলা।
আমি উত্তীর্ণ, প্রাণন অতিক্রম করে আমি পরপারে
উপনীত। ভেলার আর প্রয়োজন কি। অতএব
হে মেঘ, যত পারো বর্ষণ করো।'

'আমার গোপী কর্তব্যপরায়ণা নির্দোষা,
সর্বোপরি মনোহারিণী। দীর্ঘকাল বাস করছি তার
সঙ্গে, কোনোদিন তার হৃষ্টাচরণের কথা শুনিনি।
সুতরাং হে মেঘ, যত পারো বর্ষণ করো।' বললে
গোপালক।

'আমার চিত্ত বশীকৃত, মুক্ত, ধীর্ঘকাল ধরে
সম্পদে অল্পশীলিত, সুসংযত। পাপের অস্তিত্বশূন্য।
অতএব, হে মেঘ, যত পারো বর্ষণ করো।' উত্তর
করলেন ভগবান।

গোপালক পুনরায় বললে, 'আমার ষোপাঙ্কিত
জীবিকা, আমার সম্ভানগণ সকলেই আমার নিকটে,
তারা সকলেই স্বাস্থ্যসম্পন্ন শীলসম্পন্ন। সুতরাং
হে মেঘ, যত পারো বর্ষণ করো।'

ভগবান আবার উত্তর করলেন, 'আমি কাক
ভৃত্য নই, যথাপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে আমি সর্বলোকে
বিচরণ করি। আমার কাক সেবা করবার
প্রয়োজন হয়না। অতএব হে মেঘ, যত পারো
বর্ষণ করো।'

'আমার সবংসা গাভী আছে, গোকুলরকার
জন্তে তরুণ বৃষ ও তরুণী গাভীও আছে, গাভীকুলের
অধিপতিরূপে বৃষও আছে। সুতরাং হে মেঘ, যত
পারো বর্ষণ করো।' বললে গোপালক।

'আমার সবংসা গাভী নেই, গোকুলরকার

জন্তে তরুণ বৃষ ও তরুণী গাভীও নেই, গাভীকুলের
অধিপতিরূপে বৃষও নেই। অতএব হে মেঘ, যত
পারো বর্ষণ করো।' উত্তর করলেন ভগবান।

গোপালক আবার বললে, 'আমার খিলকসমূহ
যুদ্ধিকায় প্রোথিত হয়েছে, তারা অটল। মুক্তারচ্ছ-
গুলি নবনির্মিত, গাভীগণ তা ভিন্ন করতে অসমর্থ।
সুতরাং হে মেঘ, যত পারো বর্ষণ করো।'

ভগবান পুনরায় বললেন, 'আমি সৃষ্টিভর মত
বহন ছিন্ন করেছি, নাগের মত দলিত করেছি
পৃথিলতা, আমি আর গর্ভে প্রবেশ করবনা।
অতএব হে মেঘ, যত পারো বর্ষণ করো।'

আরো:

তপোবনের দিকে মুখ ফিরিয়ে কল্প ত্রেমাস্থানি
করতে লাগল কঙ্ক। সূর্য্যোদয় হলেও পথে শস্য
বা পানীয় দেখে আগের মত আনন্দিত হলনা,
আহারও করলনা। সমস্ত অভরণ তার ঠিক
আছে কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভূষণ কুমারই নেই, তাই তার মত
হতভী আর কে!

'নিরুপন নভস্তলের মতই শূন্য কপিলবস্ত্র।

রাজপথে নাগরিকেরা ঘিরে ধরল ছন্দককে।
ত্রিগণেশ করল, 'রাজ্যের আনন্দবর্ধন রাজপুত্রকে
কোথায় ফেলে এসেছ?'

'আমি তাঁকে ফেলে আসিনি', শোকাগ্নত কণ্ঠে
বললে ছন্দক, 'তিনিই আমাকে ফেলে চলে গেছেন।
আমাকে শুধু নয়, তাঁর রাজবেশও ত্যাগ করেছেন
অক্রেমে।'

'তবে আমরাও তাঁর অনুগমন করব। তাঁরই
মত প্রবেশ করব কাননে।' বললে নাগরিকেরা।
'নিব্রজিতর ঘোঁরী মত বাঁচতে আমাদের স্পৃহা নেই।'

কুমার কিরে এসেছে এই আশায় পুরকানিনীদের
কেউ-কেউ গব্যাক্ষমীপে সমবেত হল। কিন্তু
শূন্যশৃঙ্গ অবশেষে গব্যাক্ষ বন্ধ করে কাঁদতে লাগল
অন্ধকারে। কেউ-কেউ তাতে সাধনা নিতে রাজি
হলনা। মেঘনির্গত বিদ্যাহরণের মত বেরিয়ে এল

বাউরে। শীনবাসা কলিতকুতলা অশ্রুযুগী। চরণ না আছে অলক্তক না আছে নুপুর, কর্ণে কণ্ঠে বকে বাহুতে না আছে আভরণের শোভাচ্ছটা। ছন্দক ও কব্বককে রক্তকশীন ও নিরাশ্রয় দেখে কেউ শোক করতে লাগল, কেউ বা রুদ্ধহৃৎ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিম্পন্দচিত্তের মত। কেউ বা বক্কে-ললাটে নয় কণাঘাত করতে লাগল। শুধু মহাপ্রজাবতী গৌতমীই হুহুিত হয়ে পড়লেন ভূতলে।

সমনে এসে দাঁড়াল যশোধরা। রোষরক্তিত চোখে বিবর্ণগলাবধরে বলতে লাগল, 'হে ছন্দক, নিহিতা আমাকে ফেলে আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত জন কোথায় গেলেন? তাঁকে কোথায় রেখে এলে? তোমরা তিনজন তো একসঙ্গে গিয়েছিলে, এখন শুধু তুমি আর কব্বক কিয় এসেছ, আমার সেই মনোরথ কোথায়?'

ছন্দক অশ্রুবর্ণণ করতে লাগল।

'অনার্য অমিত্রের মত আচরণ করে তোমার এই কন্দন এখন শোভা পায়না। তুমি নৃশংস, অপ্রিয়। তোমার অশ্রু ও কার্ণের মধ্যে কোনোই সঙ্গতি নেই। তোমার তো আনন্দের দিন, তোমার শ্রম ফলায়িত হয়েছে, অতএব তুমি আনন্দ করো।'

'আনি আনন্দ করব!' বিবাদবিকৃত মুখ তুলে তাকাল ছন্দক।

'তাছাড়া আবার কি! জানতাম তুমি ঔর প্রিয়, বশবৎ, হিতচিকীর্ষী! জানতাম তুমি সাধু ও সজ্জনসদায়। কিন্তু এ তোমার কি ব্যবহার? তুমিই কিনা রাজপুত্রের প্রেরজার উপায়স্বরূপ হলে! এ হুঃখ আমি কোথায় রাখব? কিন্তু তোমার কি! তোমার তো সুখোৎসব!' কটাক্ষে আবার রোষবাণ সজ্জন করল যশোধরা। 'যে নির্বোধ বন্ধু বিপৎকালে উপায়-উদ্ভাবনে সমর্থ না হয় তার চেয়ে প্রাজ্ঞ শত্রু শতশেষে শ্রেয়। তুমি মূর্খ বন্ধু, তাই তোমার জ্ঞাত এই পরিবারে বিপর্যয় ঘটল।'

ছন্দক দাঁড়িয়ে রইল অধোমুখে।

ছন্দককে ছেড়ে কব্বককে নিয়ে পড়ল যশোধরা। বললে, 'কি হত তোমার যদি তুমি অবাধ্য হতে! কিছু না হয় তোমার কশাঘাত ছুটত! কশাঘাত কেন, তুমি তো ভীক্ত ভীরুপ্রহার সহ্য করতে সমর্থ। শুধু কশাঘাতের ভয়েই তুমি আমার হুঃপিণ্ড উচ্ছিন্ন করে নিয়ে পালালে? তুরঙ্গ কব্বকই আমার অনর্থকামী। নইলে আমি যখন প্রস্থগু তখন কি সে আমার সর্ব্বথ চুরি করে?' কব্বক উচ্চনাদে চোঁচাতে শুরু করেছে।

'দেখ এই নীচাশয় অশ্বের ব্যবহার। যখন আমার প্রিয়তমকে নিয়ে যাক্ষিণ তখন একটিও অক্ষুণ্ট শল্য করেনি। মাটিতে ক্ষুরধনি করেনি। উচ্চগ্রামে তোলেনি ত্রেখাশ্বর। তখন উনি মূক ছিলেন! যদি মূক না থাকত যদি যথাসম্ভব উচ্চ শল্য করত তবে আর এই মহৎ সর্ব্বনাশ ঘটতে পারতনা।'

ছন্দক তখন কথা কইল। বললে, 'দেবি, কব্বককে নিন্দা করবেন না, আমার প্রতি রোষও সংহরণ করুন। কি হল আপনাকে তাই বলি। রাত্রির নিস্তরু মধ্যরাত্রে সবাই যখন সুশ্রুতিতে অচেতন তখন সেই শতপুণ্যধার নির্গত হলেন। আমাকে বললেন, কব্বককে নিয়ে এস। দৈবাতিকৃত হয়ে আমি নিয়ে এলাম কব্বককে। একবার বলতে চেষ্টা করলাম, হে রাজকুলবধু, ওঠো, তোমার সৌভাগ্যস্বর্ঘ্য চলে যায়, কিন্তু অদৃষ্টদেবতা আমার বাক্য রুদ্ধ করে দিল।'

কল্পশব্দকৌমল্যে তাকাল যশোধরা।

'তেজোবিক্রমী বলীয়ান কব্বক যার পদশব্দ এককোশ দূর থেকে শোনা যায়, শব্দ-করলেও সেই শব্দ কান্না স্রুতিগোচর হলনা। যেন কোন দৈবপ্রভাববশুস্তের উপর দিয়ে ধাবমান হল, ক্ষুরধারা কুন্মিল্পর্শ হলনা। মৈবই যেন তার হৃদয়বৎ ত্রেখাধনি বদ্ধ করে দিল। আমি' কি করব! দীর্ঘপথ তাঁকে অহুসরণ করলাম কিন্তু যেহে বিমুখ্যাত ক্রন্দকষ্ট নেই। মনে হয় সবই দৈববিহিত। নইলে

সিংহদার উজ্জ্বল হল কেন নিজে থেকে? কেনই বা রাজসাসনে গৃহে-গৃহে যাদের ছাগ্রত থাকবার কথা তারা নিভ্রাভিত্ত হল? তাঁর এই প্রভা। আমার ও কব্জের দেখাকৃত নয়। সবই দৈব-নির্দিষ্ট। এই স্বর্গরোপানবিনয়ী পৃথিবী মেদিন দেবতার মায়ায় বদ্বাক্ষর ছিল। আকাশে শীতরশ্মি পূর্ণিমার চাঁদ, আর ভূমিতে এই লোকচন্দ্র, লোকনাথ—

ক্রোধ চলে গিয়ে হুঃখ দেখা দিল।

পতিপ্রণয়ের কত পূর্বকথা মনে পড়তে লাগল যশোধারার। করুণবরে স্বামীকে সম্বোধন করে বিলাপ করতে লাগল : 'হে পুরুষপ্রধান, অনিন্দ্য সৌন্দর্য, বিনলজ্যোতির্ময়, অনন্তকীর্তি স্মরণোত্তম! হে বাণীমনোহর নির্মলজ্ঞানভ্রম হেমকান্তি সর্বরসাধার—কি করে তোমাকে ধরে রাখব? সংসারের নখর ভোগসুখের বা আমার মত সামান্ত জীর কতটুকু ক্ষমতা?'

'যদি অভয় দেন বলি', বললে ছন্দক, 'তিনি মহাপূণ্যগর্ভ বীর্ঘবান পুরুষ, তাঁর ভজ্ঞে শোক করবেন না। শোক না করে আনন্দে উজ্জ্বলিত হোন, সম্বোধে স্মৃৎ থাকুন। নরোত্তম শীতাই সম্বন্ধরূপে দেখা দেবেন। সত শোকাক্রান্তে ও বিগলিত হবেননা সেই বীর্ঘরূপ।'

চোখের জল মুছল যশোধারা। বললে, 'জানি, প্রিয়বিচ্ছেদও নানাপ্রপঞ্চ। জন্মমৃত্যু সব কিছুই দৃষ্টিবিভ্রম, তিনি সব আমাকে বলে গেছেন। তাঁর আশা পূর্ণ হোক, তিনি পুণ্যজ্ঞানের পরমস্পর্শ লাভ করুন। নির্মল জ্ঞানজ্যোতি লাভ করে আবার তিনি কিরে আত্ম-কপিলবস্ত্রতে।'

করুণ বিলাপের পর যশোধারা সংকল্প করল সিদ্ধার্থের সাধনার মত তাঁর নিজের সাধনাও সিদ্ধার্থ হবে। রাজকুমারের সাধনা যেমন কাননে-কাহ্নারে, যশোধারার সাধনা তেমনি রাজপ্রাসাদের গহন গোপনে, স্বকক্ষের নিভৃতিতে।

দিক্খিলাভের পর বৃদ্ধ যখন ফিরে এলেন

কপিলবস্ত্র তখন অয়্য ভ্রমোদনও গেলেন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে। শুধু ভ্রমোদন কেন, মহাপ্রজাবতী দৌত্যনী ও রাজপরিবারের সকলেই। অস্ত্রপুত্রে নিয়ে গিয়ে আহ্বার করালেন। আহ্বারান্তে পরিজনবর্গ ও অস্ত্রপুত্রিকারা তাঁকে ঘিরে বসল। কিন্তু যশোধারা কষ্ট?

বাছলকে পাঠিয়ে দিলেও, কষ্ট, তার না তো এলনা!

পুত্রনারীরা গেল যশোধারার কক্ষে। বললে, 'একি, ভূমি আসছেন কেন? চলো, বৃদ্ধের উপদেশ শুনবে চলো। চলো তাঁকে প্রণাম করে আসবে।'

যশোধারা বললে, 'যদি আমি শ্রদ্ধার পাঠী হই, যদি আমার কোনো মূল্য থাকে, তবে আমার স্বামী নিজেই আমার কাছে আসবেন। তখন আমি তাঁকে প্রণাম করব।'

পুত্রনারীরা বৃদ্ধকে গিয়ে বলল যশোধারা কি বলেছে। সবাই বৃষ্টি বিরক্ত হল, যশোধারার উক্তিভেদে কেউ বৃষ্টি বা খুঁজে পেল ঠিকতা।

কিন্তু বৃদ্ধ বললেন, 'যশোধারা ঠিকই বলেছেন। আমিই যাব তাঁর কাছে।'

সান্নিপাত আর মৌগল্যায়নকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ চললেন যশোধারার কক্ষের অভিমুখে। শিগ্ৰদ্রব্যকে বললেন, 'বহুদিন আমার অদর্শনে ইনি অত্যন্ত শোকাতুলা। তাঁর শোককে স্বাভাবিক গতির অনুবর্তী হতে দেওয়াই উচিত হবে। যদি বাধা দেওয়া হয় তাহলে তাঁর মন আসক্তিমুক্ত হবেনা। সূত্রমঃ তিনি যদি ব্যাকুল হয়ে আমাকে স্পর্শ করেন তাঁকে বাধা দিওনা।'

শিগ্ৰদ্রব্য সন্মত হল।

বৃদ্ধ যশোধারার কক্ষে এসে দেখলেন যশোধারা স্থিরাসনে সমাসীন, পরিধানে সামান্ত পরিচ্ছদ, কেশদাম কতিত। হুঃখকর্ষিতা ব্রতধারিণী।

বৃদ্ধকে দেখতে পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠল যশোধারা। তাঁর পদযুগল নিবিড়বাহতে জড়িয়ে ধরল। হুল্লুটিত হয়ে বন্দনা করলে।

যশোধারা না মৃত্তিমতী অশ্রুধারা ।

অহরে সারিপুত্র মৌগল্যায়ন ও শুক্লদানকে দেখে লজ্জাহিত হল যশোধারা । আশ্রয়স্বরূপ করে উভিত হল ভূমি থেকে । বিনীতভাবে উপবেশন করল । জানেন আর শোকচিহ্ন নেই, বিভাসিত প্রশান্তিহী ।

পুত্রবধূর হৃদয়ে অভিহৃত শুক্লদান । বললেন, 'এ যশোধারার ক্ষণিক উজ্জ্বল নয়, এ তাঁর গভীর প্রেমের অস্থির নিবেদন । সাত বছর হল সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেছে । সেই গৃহত্যাগের দিন থেকে সমস্ত প্রণোদবিলাস তিনি ত্যাগ করেছেন । যেদিন শুনলেন স্বামী দিবসে একবারমাত্র ভোজন করছেন সেইদিন থেকে একাহারী হলেন । যেদিন শুনলেন

স্বামী কেশজ্জেন করছেন সেদিনই তিনি মস্তক-মুণ্ডন করলেন । যেদিন শুনলেন স্বামী ভূমিশয্যা নিয়েছেন সেদিন থেকে তিনিও ভূমিশয্যা আশ্রয় করলেন । সর্ববিধয়ে স্বামীর অমুগামিনী হলেন । অপরাপর দ্রাঘপুত্র তাঁর পাণিগ্রাহী হলে তিনি বলতেন, তিনি সিদ্ধার্থের, তাই তিনি সর্বথা কুমারী ।

শান্তি ও কল্পনায় ভরা আয়তহুল্লর চোখ তুললেন বৃদ্ধ । আরেকবার দেখলেন যশোধারাকে । বললেন, 'রাহুলমাতা তাঁর উপযুক্ত আচরণই করেছেন । রাহুলমাতাই আমার গুরুদ্ব্যন্তরের সমস্ত পূণ্য ও সমস্ত শক্তির আধারস্বরূপ ।'

[বন্দ্য]

তিনটি উল্লেখযোগ্য সম্মেলন

ঐতিবিক্রম শর্ম

এ বছর কীতের মহাশ্রমে তিন-তিনটি উল্লেখযোগ্য সম্মেলন অর্ঘ্য হ'য়ে গেল এ-দেশে । 'নিখিল-ভারত লেখক-সম্মেলন', 'নিখিল-বঙ্গ ভাষা-সম্মেলন', আর 'নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন' । অর্থাৎ, 'নিখিল-ভারত' নামে নামানো হ'ল সম্মেলনকে নিয়ে, আর একটিকে নিয়ে কিছুটা তরঙ্গোচ্চাঙ্গ দেখা গেল 'নিখিল-বঙ্গের' চিন্তা-সম্মেলন । হল বঙ্গ অথবা একটি । তা হ'লো ভারতের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, বা কী হওয়া উচিত—তাঁই নিয়ে এসেদের বৃদ্ধিহীন বা চিন্তানীলদের এই তিন-তিনটি সম্মেলনে আলোচনা । জাতীয় ভাষার সঙ্গে অথবা সাহিত্য নিয়েও আলোচনা হ'লো 'লেখক-সম্মেলন' ও 'সাহিত্য-সম্মেলন' ।

'নিখিল-ভারত লেখক-সম্মেলন' এ-দেশে বোধ করি এই প্রথম । 'বোধ করি' বললাম এইজন্য যে, নিখিল-ভারতের লেখকরা আগেও কয়েকবার সম্মিলিত হয়েছেন ছোট-খড় অজ্ঞাত অজ্ঞানের মধ্য দিয়ে, কিন্তু, এট রকমের ক্ষমকালো বড় সম্মেলনে এই প্রথম তাঁদের একত্ব হ'তে দেখলাম । এই সম্মেলনের অধিবেশন বঙ্গো কলিকাতার মহাজাতি-

দপনে ২৩-এ ডিসেম্বর থেকে ২৫-এ ডিসেম্বর । অর্থাৎ-সমিতির সভাপতি ঐতিবিক্রম শর্মীর সমবেত প্রতিনিধি-মণ্ডলীকে সার্ব অর্চনা জানালেন সম্মেলনের প্রারম্ভে । তিনিই ছিলেন এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা । সত্তবতো তাঁরই চেঁচায় প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ ও এই সম্মেলনে উপস্থিত হ'য়ে লেখকদের উদ্দেশে তাঁদের হৃদয়িত ভাষণ দিয়ে গেলেন । সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে পৌরোহিত্য করলেন—বিখ্যাত হিন্দী-কবি প্রবীণ, মহাশয় বর্মা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক প্রবীণকরকর অনন্য, বিখ্যাত ওড়িয়া-সাহিত্যিক ঐকালিনী-চরণ পাণিগ্রাহী, শ্রী কে. এল. জর্জ, বিখ্যাত গুরুপ্রাণী-সাহিত্যিক ঐশ্বর্যদত্ত বোম্বাই ও পার্লামেন্ট-সদস্য, বিখ্যাত মারায়ী-লেখক শ্রী বি. ডি. (মামা) ওয়ারেরকার । এই সম্মেলনে কে-সব বিষয় নিয়ে নিখিল-ভারতের লেখক-গোষ্ঠী আলোচনা ও তর্কের পূচনা করেছিলেন তা হলো—(১) লেখক ও ভাষা-সমস্যা ; (২) রাষ্ট্র ও সাহিত্য ; (৩) ভারতীয় কাব্যসাহিত্য ও কথাসাহিত্যের বর্তমান সমস্যা ; (৪) আধুনিকতা ও ভারতীয় সাহিত্য ; আর

(৫) সাহিত্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও জোহরার আশোচনা হয় 'লেখক ও ভাষা-সমস্যা' নিয়ে। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের কয়েকজন লেখক এই ব'লে আপত্তি প্রকাশ করেন যে, ভাষা-কবিত্বের সুশাসিত অনুশাসনের একমাত্র হিন্দীই যদি ভারতের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়ে যায়, তাহ'লে, ভারতের প্রধান ভাষাগুলি যে কালক্রমে একেবারে লোপ পেয়ে যাবে না, সে বিষয়ে কোনো স্থির নিশ্চয়তা নেই। তাঁরা বললেন, হিন্দী সর্বভাষ্যতীয় কথাভাষার বাহন হোক তাতে কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু তাকে যদি সরকারী ভাষা ঘেঁরে ভারতবাসীর একমাত্র জাতীয় ভাষা ব'লে গণ্য করা হয় তাহ'লে তাঁদের মধ্যেই আপত্তি আছে। তা ছাড়া, ইংরেজির বহলে হিন্দীকে সরকারী বহীলা দেবার ক্ষেত্রে যে সমস্ত নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে তাতেও তাঁরা আপত্তি জানালেন বিশেষ ক'রে। বেশির ভাগ লেখকই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ইংরেজির পক্ষে ওকাগতি করলেন এইজন্তে যে, ইংরেজি যখন এতদিন ধ'রে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে চ'লে এসেছে, তখন ওটা আরও বিপ-পঁচিশ বছর থাক'না। তা ছাড়া, আন্তর্জাতিক-ক্ষেত্রেও ওর যখন একটা বিশেষ মূল্য আছে তখন রাতারাতি ওকে বাহ দিতে গেলে যে পথে-পথেই বিভ্রম।। লক্ষ্য করা গেল, বাংলাদেশের কয়েকজন খ্যাতিমান লেখক ইংরেজির পক্ষে তাঁদের গুণু সমর্থনই জানালেন না, ইংরেজি উঠে গেলে আমাদের যে প্রভূত ক্ষতি হবে এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করলেন। হিন্দী-লেখকেরা অবশ্য হিন্দীকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বহু নীতিগত অংগীকার করলেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিবাদ জানালেন ইংরেজির বিপক্ষে। তাঁদের মতে, ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতিদানের অর্থ—আমাদের নিজস্ব ভাষার গুরুত্ব। একজন হিন্দী-লেখক তো পাঠই ব'লে কেললেন যে, ইংরেজিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে বাধার অব্যবস্থা হ'লে, আরো বহুকাল ধ'রে এসেগের রাজনীতিক কর্মক্ষেত্রে একমুখ পাতি-মুর্খোয়ার আধিপত্য যেনে চলা। শেষ পর্যন্ত 'নিবিল-ভারত লেখক-সম্মেলন' অবশ্য ভারতের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে কোনো হুশি প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। কিন্তু, যে-ভাবে এই সম্মেলন, রাজ্য একজন ছাড়া, ব্যক্তি সকল বড়ই ইংরেজিভাষার রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁদের মুক্তিলাভ বিচার করলেন, তাতে ক'রে সম্মেলনের মনোমত প্রস্তাব কি খুবই কম্পট হইলো।

এর পরেই দ্বিতীয় সম্মেলন। অর্থাৎ, 'নিবিল-বন্ধ ভাষা-

সম্মেলন'। ২৯-এ ও ২৭-এ ডিসেম্বর এই সম্মেলনের বৈঠক বঙ্গোপকূলিক-প্রদেশে মহাভারত-সম্মেলন। কপি শ্রীমন্তদেব বহুই ছিলেন এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা। লেখক-সম্মেলনে তিনি যে-ভাবে ভারতের চৌদ্দটি প্রধান ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে বিশেষ নীতি-তর্কের মধ্যে দিয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন, এখানেও তাঁই করলেন। তাঁর মতে, সংবিধান অনুযায়ী যে চৌদ্দটি ভাষা ভারতের প্রধান ভাষারূপে গণ্য হয়েছে, রাষ্ট্রভাষারূপে তাদের স্বীকৃতিদানের পক্ষে বাধা থাকতে পারে না। কেন্দ্রীয়-সরকারের কাজকর্ম ইংরেজিতেই যেমন চলছে চলুক। কিন্তু রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসীর যে ভাষা, সেই ভাষাকেই রাজ্যের সরকারী ভাষা ব'লে গণ্য করা হোক। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা হোক সরকারী ভাষা, আসামে অসমীয়া, উড়িষ্যা ও ওড়িশা, বিহারে হিন্দী—এইরকম আর কি। 'ভাষা-সম্মেলন'-এর মোক্ষা কথা হলো এই। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে 'নিবিল-ভারত লেখক-সম্মেলন' কোনো হুশি প্রস্তাব গ্রহণ করতে না পারলেও, 'নিবিল-বন্ধ ভাষা-সম্মেলন' কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার মতো সংলাপে বেধিয়েছেন। এই সম্মেলনে সাবির অকারে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয়, সংক্ষেপে তা এই : (১) সর্ব-ভারতীয় যে-সব সাতিস-পরীক্ষা গৃহীত হবে তা একমাত্র ইংরেজিতেই গ্রহণ করতে হবে ; (২) ভারতের চৌদ্দটি প্রধান ভাষাকে, সেই সঙ্গে ইংরেজিকেও, ভারতের জাতীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি দিতে হবে ; (৩) বিভিন্ন রাজ্যে সেইসব রাজ্যের প্রচলিত প্রধান ভাষাকে সরকারী-ভাষারূপে গণ্য ক'রে প্রশাসনিক এবং আইন ও বিচার বিভাগীয় কাজকর্মে ব্যবহার করতে হবে—সেই সঙ্গে, ভাষার দিক থেকে রাজ্যে বাড়া সংখ্যালঘু ভাষার ক্ষয় প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখতে হবে ; (৪) আন্তঃরাজ্যে তথ্যাদি বিনিময়ে ইংরেজি অথবা বিভিন্ন রাজ্যে যে-ভাষা চিক ক'রে যেন সেই ভাষাতেই গ্রহণ করতে হবে ; (৫) রাজ্যের সাতিস-পরীক্ষা রাজ্যের প্রধান ভাষাতেই গৃহীত হ'তে পারে, কিন্তু ভাষার দিক থেকে রাজ্যে বাড়া সংখ্যালঘু ভাষার ক্ষয় প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখতে হবে ; (৬) কেন্দ্রের প্রশাসনিক, আইন ও বিচার-বিভাগীয় কাজকর্মে আপাতত ইংরেজিকেই চলতে দিতে হবে, আর রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের চিঠিপত্র বা তথ্যাদির আদান-প্রদান ইংরেজি এবং বেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে রাজ্যে প্রচলিত ভাষাকেও ব্যবহার করতে দিতে হবে ; (৭) আর, কেন্দ্রের সরকারী বিজ্ঞপ্তি, ঘোষণা, সেইসঙ্গে ডাক ও তার বিভাগের এবং রেলওয়ের ফর্ম ও বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদিও

ইংরেজি ও বিভিন্ন বাংলায় ভাষাতে প্রকাশ করতে হবে।

এই সম্মেলন এই বলে আরও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার যেন অধিদপ্ত্রে বাংলাভাষাকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ভাষারূপে গণ্য ক'রে এক ঘোষণা জারি করেন এবং সেই ঘোষণা অনুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে যেন কোন কয়েমি ১৯৩১ সালের বেশি বেড়ি না হয়। যাতে ক'রে ভারতের চৌদ্দটি প্রধান ভাষা, সেই সঙ্গে ইংরেজি, ভারতের জাতীয়-ভাষার মর্যাদা লাভ করতে পারে সেই সম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য 'নিখিল-বঙ্গ ভাষা-সম্মেলন' চৌদ্দজন সদস্য নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করেছেন। এই চৌদ্দজন অল্প চৌদ্দটি ভাষার প্রতিনিধি নন! তাঁরা সকলেই বাংলাদেশের, এবং বাংলাভাষার অমুখারী; যেমন—সংশ্লিষ্ট তান্ত্রাসত্বর বঙ্গোপাখ্যায়, বৃজঙ্গর বঙ্গ, প্রবোধকুমার সাক্সল, নরেন্দ্র দেব, মনোজ বসু, বিদ্যুৎ সৌধী, সাকী আবদুল গুফর, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ঐশ্যোমোহননাথ হাঙ্কর এই কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হয়েছেন।

২৯-এ ডিসেম্বর কলিকাতার এই ভাষা-সম্মেলন শেষ হ'লেই ২৯-এ ডিসেম্বর আমেদাবাদে শুরু হ'লো 'নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন'-এর ৩০শ অধিবেশন। সম্মেলনের সভাপতি ঐশ্যবেশ দাস, আর বর্তমান অধিবেশনের অধ্যক্ষ-সমিতির সভাপতি ঐশ্যবিশ্ব মাইতি সনাত্ত প্রতিনিধিদের অধ্যক্ষী জানালেন। অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন—উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল ঐকান্তইয়াপাল মূলী; সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল লেখক হিসেবেও তাঁর নাম স্বাবীজন-বিদিত। আমেদাবাদের এই বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের ৩০শ অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঐশ্যনিসকুমার সিদ্ধান্ত এবং অন্তান্ত বাহার সভাপতির করেন—ঐশ্যবৃত্তিবৃন্দ মুখোপাধ্যায় (সাহিত্য-শাখা), ঐশ্যমোজ মিত্র (কাব্য-শাখা), ঐশ্যকিয়ারজান বঙ্গ (সংস্কৃতি-শাখা), ঐশ্যমতী মীলা মজুমদার (শিল্প-সাহিত্য শাখা) এবং ঐশ্যকোষর মিত্র (সঙ্গীত ও শিল্পকলা শাখা)। এইমত সভাপতির অভিভাবহ সংবাদ-পত্রে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে এখানে আর তার পুনরুল্লেখ নিম্প্রয়োজন। এই সম্মেলনের প্রধান যে উদ্দেশ্য, অর্থাৎ এমালী বাস্তালীর্ণের সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়ে বাস্তব্য় বাঙ্গালার সঙ্গে সংযোগ-সাধন, তা সার্পক

হয়েছে। তা ছাড়া, বাংলাদেশের লেখক-প্রতিনিধিরা গুজরাতি-লেখকদের সঙ্গে মিলনের মাধ্যমে পারস্পরিক মত-নিমিত্তে যে সংযোগ দেখেছিলেন তাও বড় কম লাভ নহ। গুজরাতি-সাহিত্যে বাংলা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব যে অনেকখানি, আশা করি বাংলাদেশের লেখকরা লেখকবাও একটু ভালোভাবে জেনে এসেছেন।

এই সম্মেলনে রাষ্ট্রভাষার প্রশস্তও গুটে। সেই সঙ্গে বাংলা-ভাষার কথা। মূলীজী তো তাঁর উদ্বোধনী ভাষণেই বলে ফেললেন যে, অন্তান্ত বঙ্গ ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলাভাষা অনেক বেশি উন্নত ও সূক্ষ্ম। আমেদাবাদ কর্পোরেশনের মেয়র পর্যন্ত বললেন—অক্ষরের পার্থক্যের কথা বাদ দিলে দেখা যাবে যে, বাংলা ও গুজরাতি ভাষার মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা আছে। ভারত-সরকার সর্বভারতীয় জাতীয়তা-বোধকে উদ্ভূত করার জন্য একটি সর্বভারতীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার জন্য বে-চেষ্টা করেছেন, মূল সভাপতি ঐশ্যদ্বান্ত লেখকবার উল্লেখ ক'রে বললেন যে, বেবলমাত্র একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দিলে তা সঙ্গত হবে না। কারণ, তাতে বঙ্গ ব্রহ্মের বঙ্গ বাধা। হাই হোক, এই সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তার অভিভাবহে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়েছে যে, জাতীয় সংহতি ও ঐতিহ্য রক্ষা করতে হ'লে ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য করতে হবে। রাজনীতি বা অর্থনীতির ক্ষেত্রে বা সত্ত্ব-বেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা আরো সত্ত্ব নহ। বহুর মধ্যে যে ঐক্য, সম্মেলনের বক্তারা বোধ করি সেই কথাটাই জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন।

ডিসেম্বর মাসের শেষ সত্ত্বই কলিকাতা থেকে আমেদাবাদ পর্যন্ত একনাগাড়ে যে তিনটি সম্মেলনের অধিবেশন হ'য়ে গেল, এদেশে ১৯২৭ সালের ঐতিহ্যসে তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতায় এলেন পাঞ্জাব, গুজরাতি, মহারাষ্ট্র, অন্ধ, বিহার, মাদ্রাজ, কেরল, উৎকল প্রভৃতি বিভিন্ন এলাকার নামক্কার লেখকরা এবং বাংলা-দেশের লেখকরা হুটলেই হুড়ং আবেদাবাদে। ক'দিন ধ'রে সাহিত্যিক মহলে দেখা গেল এমল উৎসাহ আর উল্লীখন।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতার অস্থগীত 'নিখিল-ভারত লেখক-সম্মেলন' সম্পর্কে দু-একটা অন্ত্রিয় সত্য কথা বললে সম্মেলনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেন অধীন এই পর্যায় উপরে গৌণা না ক'রে বসেন। কথা করেকটি ভাষার অন্তই বলা। লেখক-সম্মেলনে প্রমাদবস্ত্রী বেদীন উপস্থিত হয়েছিলেন, সেদিন

উজ্জ্বলতার মকরোহী হবার ক্ষমতা যেন দূর বেশি তৎপর হ'য়ে উঠেছিলেন—তা বড়ই হোঁচ, আর ছোট্টই চোঁচ। উজ্জ্বলতার মতো ধারা সঙ্গীত বা সাধারণ-সচিব-স্বামীত্ব তাঁদের পক্ষে মকরোহী হবার অসম্ভব নয়, কিন্তু কেবল পটিনটাকার বিনিময়েই তারা অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য হবার ছাড়পত্র পেতেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে বেশির ভেতবে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়লাভ থেকে নিজেদের হাতাশালায় ক'রে তুলেছিলেন, পাঠালীদের সুনামের পক্ষে তা নিশ্চয়ই শোভন ও সজ্ঞ নয়। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের বাইরে থেকে কে-সব সাহিত্যিক এসেছিলেন, সোনা গোল, তাঁদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাহিত্যিক-গোষ্ঠী তেমন ক'রে যোগাযোগের সুযোগই পাননি। অনেককে পরিচয় পশ্চাদ্ধাবন করে দেওয়া হয়নি। কর্তৃত্বপূর্ণ ডায়াক্রিমা না ক'রে যদি বিভিন্ন দিনের বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি যোগাযোগ-বৈঠক বা অভ্যর্থনা-শিবিরে বাংলার বাইরের সাহিত্যিক-প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাংলার লেখক-সম্প্রদায়ের মত-বিনিময়ের সুযোগ করিবে সেওয়া হতো তাহ'লে উভয়পক্ষই সন্তুষ্ট হতেন। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের অতিথি-পরায়ণতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু, বাইরের বেস-ব প্রতিনিধি এখানে এসেছিলেন, তাঁরা কি সন্তোষেই প্রধানমন্ত্রীর অতিথি-পরায়ণতায় সন্তুষ্ট হ'য়ে বাড়ি ফিরেছেন? সংসদনের বৈজ্ঞানিক-কর্মীরা ক'দিন ধ'রে তাঁদের ক্ষমতা খুঁট খেটেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু, তাঁদের নির্ধারিত কর্মপন্থায় কি সুরক্ষিত কোনো গরীবজন ছিল, এমন কোনো স্বকর সুখলাভ ভাব কি ছিল যাতে ক'রে বাংলাদেশের সুনাম পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে? সংশয়

বদল, লেখক-গোষ্ঠীর আদিক কৌশলীর প্রতি বিস্তারিত কথা। সংসদনে যোগ দিতে গেলে, হয় পটিনটাকা দিয়ে অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য হও, নহতো: পাটটাকা দিয়ে সাধারণ-প্রতিনিধি হ'য়ে নিজেদের জায়গা বেছে নিয়ে ব'সে পড়ো! এটি প্রকৃষ্টের দাবীরা যেখানে, সেখানে বাংলাদেশের ক'জন লেখক 'লেখক-সংগঠন'-এ যোগ দেবার পৌঁছায়? অর্জন করতে পারেন? এ-দেশের লেখকদের পক্ষে সন্দেহ উজ্জ্বলতার তো অসম্ভব থাকবার কথা নয়! তবে কেন তাঁরা এমন দাবী করতে পারেন? পটিনটাকার জোরে কলিকাতার বাদসাহী-মহলের অনেকে, লেখক না-হলেও, যেখানে সামনের দিকে বদলার সুযোগ পেলেন—অনেক কষ্টে রোজগার, পাটটাকা খরচ ক'রে প্রতিনিধি-টিকেট কেটে এবং সত্যিকারের লেখক হওয়া সত্ত্বেও অনেকের ডায়ো-সে-সুযোগ ঘটলো না! সর্বশ্রমীরা স্বদায়ের শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যোদ্দেশ্যের মাছাছাই একটুই হ'লো! পেচক-বাহন শেষ পর্যন্ত হ'ল-বাহনকে লেগে রাখলে! সংসদনের উজ্জ্বলতার মধ্যে ব্যাতিমান একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের আন্তরিক চেষ্টার, অসম্ভব সেরকাসে, কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক 'বিশেষ আয়ত্ত-কলি' পেয়ে সংসদনে যোগ দিতে পেরেছিলেন, তা না হ'লে সন্তোষের ডায়াক্রিমা খুঁটে যেতেন। বাংলাদেশের লেখক-সম্প্রদায়ের উজ্জ্বলতার বহুর বহুর এইরকম 'নিশি-ভারত লেখক-সংগঠন' হোক, কিন্তু তাতে যেন এটি পোষক-উপকরণ আবার থেকে না যায়।



মৃত্যু ইয়ারোপ: মৃত্যু মানুষ

মানোজ বসু

[পূর্বদিক থেকে]

স্ট্রী নদী শহরে পথ হারিয়ে ঘুরপাক খেয়েছে শতক বার। তার পর বেরিয়ে পড়ে এক ছুটে অনেক দূর গিয়ে লোক পড়েছে। লোক ছাড়িয়ে গায়-গতরে ভারি হলে ধীর মন্থরে চলেছে উত্তর-দক্ষিণ মুখে। রবিবার পেয়ে আনরাও বেক্সলান বাসিন থেকে। স্ট্রীর পথ দেখে আসি। স্ট্রীর দশ দশ চলব। লোক অবধি তো যাচ্ছিই— লোক ছাড়িয়েও দেখা যাক কদর বাওয়া চলে।

কৃতিবাহ নরনারীর ভরা নিয়ে স্টিমার ছুটেছে মাজ মাধ ঘটা অস্থির। স্টিমার ঠিক নয়, বড় হতেহেন স্টিমলক। ঘাট বেশ-খানিকটা দূর— ছাত-ভাঙা বাড়ি, চূড়া-ভাঙা গির্জা দেখতে দেখতে যাচ্ছি। তার পরে এলো জঙ্গল—রাস্তার এদিকে জঙ্গল, উল্টোদিকে জনালয়। ছোটো ট্যান্নিতে ঘাট মার্কের মতো উঠে গেল। ডিটেল নিয়ে যাচ্ছে—ভাড়া সে-ট দিল, ব্যাগ খুলতে দিল না আমাদের কিছুতে।

ট্যান্নি থেকে নেমেছি, স্টিমারও অবনি ঘাট ছেড়ে বেক্সল। আধ ঘটা অতএব চুপচাপ বসে বসে জঙ্গলোভা দেখুন। সারি সারি বেশি পাতা— বসবার অতি উত্তম ব্যবস্থা। জলের হাওয়া বান, আর রোপ পিঠ করে বসুন বেশিতে। ঘাট নয়, রীতিমতো এক পার্ক। নদীর কিনারা ধরে ছায়াতরু সাঝানো, এ-ধারে রকমারি ফুলের বাগান। বড় বড় বাড়ি—কতক বাড়ি নদীর জলের তিতর থেকে গেঁথে তুলেছে। বিরাট তিনটে খিলানের

উপরে প্রাচীন পুল—পুলের উপরে গাড়ি-সাইকেল-মামুষজনের স্রোত। ছোট ছোট নৌকা যাচ্ছে বৈঠা বেয়ে—হাওয়া তেমন নেই বলে পাল গুটিয়ে রাখা। তরঙ্গী আর তরঙ্গ দু-তিনটি করে ফি নৌকোর। রবিবার—তায় বসন্তকাল, উজ্জল রোদ, উষ্ণ আবহাওয়া—ঘরে তাই একজন কেউ পড়ে নেই বোধহয় আজকে। মাতামাতি করতে বেরিয়ে পড়েছে। এমন জীবন আমরা ভাবতে পারি নে।

নদী মানে বড় কিছু নয়—কলকাতার গঙ্গার আধাআধি বড় জোর এখানে। জোয়ারবেলা জল বাড়ছে, স্রোতে ভেসে ভেসে যাচ্ছে নৌকে। একটা-ছোটো লঞ্চ বিষম শব্দে উজান কেটে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। জেটি যেখানটা, ঠিক তার পাশে অতিক্রম উইলো গাছ। প্রশাখা ও পাতা বৃক্ষে পড়েছে কেশবতীর বিস্রম চুলের রশ্মির মতো। এমনি চেহারার জন্তাই বলে উইপিং উইলো (Weeping willow)—সত্যিই আপনায় মনে হবে, নদীকূলে ঝাঁকড়া-চুল শোকাভূষা কে-একজন গাড়িয়ে।

স্টিমার দেখে দ্রুতপায়ে উইলোর ছায়ায় কিউয়ের ভিতর এসে দাঁড়ালাম। বেক্সির উপর বাও ব্যাগ ফেলে এসেছিলেন—এক বুড়ি চৌচামেচিতে সাড়া না পেয়ে এন্দুর এনেছে সেই ব্যাগ হাতে নিয়ে। কড়া রকম বকুনিও দিল বোধ হয়। কিন্তু ভাষা জানা নেই—আদরের বুলি নয়, তাই বা কে বলতে পারে? মানুষজন গঠানাম করছে—

সে কি একজন হু-জন, কিবা এক-শ হু-শ? আর জায়গা নেই, স্টিমার তবু দাঁড়িয়ে। লোক উঠছে, চোয়ার বের করে করে দিচ্ছে ভাদের জন্ত। শেষটা চেয়ারে আর কুলায় না। এক তরুণ আর এক তরুণী—প্রেমিক না আর-কিছু? সন্দেশ অচিরে কোটে গেল—কি কথার উপর মেয়েটা বী-হাতে বিরশি সিন্ধার চড়ু কবিয়ে দিল ছেলের গালে। দিয়ে হাসতে হাসতে তার চোখের গগলস কেড়ে নিয়ে পরল। ঐ বিষম চড়ু এবং চড়ুর সঙ্গে সঙ্গে হাসি প্রেমিকা ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভবে না। হিটলারের দেশের প্রেমিকা তো!

ছাড়ল স্টিমার। পুলের নিচে দিয়ে বাক কাটিয়ে চলল। সবুজ গাছপালায় ভরা ব্রিঙ্ক তটস্থি। গির্জা এখানে ওখানে। ফ্যাক্টরি-পাড়া শুক হল—একের পর এক অবিচ্ছেন দাঁড়িয়ে আছে নদীর জল ছুঁয়ে। লড়াইয়ের খবর হয়ে গিয়েছিল, সবগুলো চালু হয়ে ওঠেনি এখন পর্যন্ত। কোডাকের কারখানা দেখছি। এক কাণ্ড হয়েছে জর্মনি হু-ভাগ হয়ে যাবার পর—এ-জর্মনি এবং ও-জর্মনিতে একই নামের ফ্যাক্টরি। সাবেকি ফ্যাক্টরি হয়তো পূর্ব-জর্মনির মধ্যে; সরকার সেটা নিয়ে নিয়েছেন। মালিকরা পশ্চিম-জর্মনিতে সরে গিয়ে সেখানে পূর্বনামে নতুন ফ্যাক্টরি গড়েছেন।

আর এক নদী এসে পড়ল স্ত্রীতে—স্ত্রী বেশ ডাগর হয়েছে। এত বড় নদীর তীরকূনি কিন্তু পরিষ্কার। বাকের বাকের সীতারের ঘাট। গোলাপ-ফুলের মতো রং, নয় গায়ে সীতারাকে কত ছেলে কত মেয়ে। জলে কাঁপাচ্ছে। যারা কিছু পারে না, পা ডুবিয়ে বসে আছে জলের কিনারায়। ঘাসের উপর ক্যামিসের চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে থানাপিনা করছে, আজ্ঞা জমাচ্ছে। একটা মেয়ে ঐ বুক-পড়া ডাল ধরে আলসে তাকিয়ে আছে চলন্ত স্টিমারের দিকে। উঁচু কাঠের বোকা সাজিয়ে গদাই-লঙ্করি চালে চলেছে বড় বড় বোট। বিশাল এই জলের বুক মোচার খোলার মতন ছোট ডিঙিতে জোড়া

বোটে বেয়ে চলেছে দুটি শিশু—পাশ দিয়ে স্টিমার চলে যায় জল তোলপাড় করে, একবার তারা তাকিয়েও দেখল না।

কৃষ্ণমুতি দেখে অনেক আলস-পাশে ভিড় করেছে। হাতের কলম ছুটে চলেছে, যা-কিছু চোখে আসে লিখে যাচ্ছি খসখস করে। কৌতূহলী সবাই, কিন্তু কথা বলে না।

ভিটজেল বলে, বলবে কি করে? ইংরেজি জানলে তো! ক্রশভাষাটা শিখতেই হবে, ইংরেজির তাই আবার কমে যাচ্ছে। সামান্য সাধারণ লোকের কাটা ভাষা শিখতে পারে বলুন?

আর একটি ইংরেজি-বিশিষ্ট আছে দেখি এখানে। টুক করে বলে উঠল, হোক্‌গে মশাই। সিলেবাসে আছে বটে ক্রশভাষা, কেউ আবার তা শিখি নে। মাস্টাররাও দায়দায় গোছের পড়ায়।

মানুষটার মুখে তাকাই। পূর্ব-জর্মনির যেখানে যাচ্ছি, রাশিয়ার নামে মিনি পড়ে। রাশিয়া অমুক করেছে তমুক করেছে, ক্রশের মতন ভালো ভাত চামের নিচে নেই। তার মধ্যে হঠাৎ এক উপ্টো খুর। আচমকা মনখানা বেরিয়ে পড়ল যেন। হিটলার আর্থ-আর্থ করে মাথা খারাপ করে নিয়েছিল—সেই দেমাকই মানুষটার মুখে।

জল ও ছোট ছোট পাহাড় পার হয়ে গিয়ে আবার জনপদ। রবিবারের বিকালবেলা বাড়ি-ঘরে আজ একটি মানুষও নেই বোধ হয়; বেরিয়ে সব জলের ধারে এসেছে। পোলা খেলছে। ছোট ছোট নৌকো ডাঙায় টেনে তুলছে, তার উপরে বসে মনের মুখে আজ্ঞা দিয়ে সময় হলে আবার জলে ভাসাবে। বাদামি রঙের ক্ষুদে ক্ষুদে ডাঁব খাটিয়েও আছে অনেক। একেবারে কোলের বাচ্চাটি নিয়ে বেরিয়েছে কত মা! ইস্কুলের ছেলে কয়েকটা ঘিরেছে আমার। নতুন ইংরেজি শিখেছে সেই ইংরেজি প্রয়োগ করে : এত কি লেখো?

তোমার কথা।

‘আমার জানলে কি করে ?

জানি—

বলো বিকি আমার নাম।

পল।

হি-হি-হি—হল না। বেহুঁব !

কিন্তু বেহুঁব হতে বয়ে গেছে আমার। বলছি, নাম তোমার পল ই। তুমি মিছে কথা বলছ—পল ছাড়া হতেই পারে না।

তরুণীর পল ঠাণ্ড টেনে যাচ্ছে—জন পনেরো। এক এক নৌকোয়। এমনি পাঁচটা নৌকো। বাটেরে নতুন কিছু হচ্ছে। আর ঐ দেখুন, পাল খাতিয়ে দিয়ে হালের হাতল আলগোছে ছুঁয়ে কর্তা-গিরি গড়িয়ে পড়েছেন, নৌকো ভেসে চলেছে। ছপাশে এবার ঘন অরণ্য : পাড়ের উপর নামুশ নেই, শুধুমাত্র এই জলের উপরে।

নদী এখনটা রীতিমতো প্রবল। বালিনের আটসোটা ছই ক্লের গাঁথনির ভিতরে বন্দিনী স্ত্রী তিনিয়ে চলে, এত কাছেই তার এমন বৃহৎ মুক্তি, কখনও আসে না। তেমনি ভাবতে পারিনি, বালিনের মড়ার মতো নামুশগুলো ছাড়াও যৌবন-প্রবল এত নামুশ রয়েছে দেশ ভরে। অতি-বুড়োরাও এখানে যৌবনে জীবন্ত। জঙ্গলের গাছের ছায়ায় নদীর ধারে ঘুনিয়ে আছে চোড়ার ঝোড়ার; নৌকাটা ধোঁয়েছে এক গাছের সঙ্গে। অথবা শরর থেকে মোটরে এসেছে, মোটর রেখে দিয়েছে অবহেলায় একদিকে। এমনি কত ! বেসরম, বে-আত্র। যৌবনের উচ্ছল আবেগে নাটাল হয়েছেন। জলের কিনারে অতি প্রকাশ্যে জড়াজড়ি হয়ে শুয়ে। নৌকোয় যাচ্ছে—স্বল্পবাস মেয়েটা গাড়ে-গাড়ে এক হয়ে। এর মুখে ওর মুখ চেপে স্টিমারেই যাচ্ছে কতজন পাশাপাশি। কেউ কিছু মনে করে না—অত্যন্ত সহজ সাধারণ ব্যাপার, তাকিয়েও দেখে না কেউ।

কাটা-বাল নদী থেকে বেরিয়েছে। বালে ঢুকে পড়লান, পথ বানিকটা সোজা হবে। বাঁক ঘুরে



উপসংখ্য নৌকোর মতন সামান্য শালের বয়ে হল দেখবার জো নেই

এসে দেখি, ইলিশ-ধরা নৌকোর মতো সামান্য পালের বহরে জল দেখবার জো নেই। ঘুরে বেড়াচ্ছি স্টিমারের পাটাতনে। দেখাশোনা আলাপ-পরিচয়ের ক্ষমতা আসা—একটা জায়গায় ঘট হয়ে থাকতে যাব কেন ? ছোট্ট এক মেয়ে ডাবডেবে চোখ মেলে চেয়ে আছে, তাকে পাকড়াও করলাম। ইংরেজি জানে না, ইংলুলে বাশিয়ান পড়ায়। কিন্তু ডিটেল আছে, সে-ই প্রশ্ন বুনিয়ে দিল। প্রশ্ন বামুলি—চীন-বাশিয়া সর্বকত্র জিজ্ঞাসা করেছে, সঙ্গে সঙ্গে জবাব মিলে গেছে।

—ভারতের প্রধান-মন্ত্রী কে ?

—প্রধান-মন্ত্রী ? জানি, ইয়া বলছি, প্রধান-মন্ত্রী হলেন...

ভুলে গেছে, ভাবছে তাই। যা কড়া বকুনি দিয়ে উঠলেন ; সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে চোঁচিয়ে ওঠে, নেহরু—নেহরু !

ছিপ নিয়ে কসেছে অনেকে। পুরুষ আছে, মেয়েও আছে। মাছ বা পেয়েছে, স্টিমারের দিকে ভুলে

ধরে আমাদের দেখায়। ত্রুদে এসে গেলাম এবার।
কুলহীন—পদ্মা-মেঘনার মতো। মিঙ্গেল (Muggel-
see) ত্রুদ। স্ত্রী নদী ত্রুদ এসে পড়েছে, ত্রুদ কুঁড়ে
বেড়িয়ে ঢলে গেছে। একটা পাহাড়, তারও নাম
মিঙ্গেল। আর বেশি দূর যাব না, পাহাড়টা বেড়
দিয়ে আবার নদীতে পড়ে ফিরে চললাম বালিনে।

চেষ্টানাট-গাছ খোপা খোপা সাধা কুলে ভেঙে
পড়েছে। আমাদের গায়ে দোঁদালিগাছে কুল
ধরে যেমন। দোঁদালিকুল হলসে, চেষ্টানাট সাধা।
কুলের কাণাল এরা। আমাদের অনেক আছে—
হেলাফেলা করি। ঘাটে নেমে চেষ্টানাট-গাছে
চড়ে সবাই কুল ডাঙছে, শুধু হাতে কেউ করে না।

দিনটা খাসা কাটল। বালিনে কণে কণে মনে
হয় মরানাহুরের শহর। শহরের বাইরে প্রাণোলাসে
সরপুর হাজার হাজার তাক্সা মানুষ দেখে এলাম।
বাক্সা ছেলে আর খুখুড়ে বড়ার মধ্যে কারাক
নেই—সবাই মিলে ছুটি কাটাতে গিয়েছে।

যাবার সময় ডিটজেলের একগাদা মার্ক খরচ
করেছি, এবারে দেখ কম খরচে কিসে হোটলে
ফিরতে পারি। বাসে ট্রামে যাওয়া যাক।
ডিটজেল বলে, বাস এখানে নয়। ঐ মোড় অবধি
হেঁটে চলুন, ওখান থেকে যাবে।

পোয়াটাক যাওয়া হল হাঁটে হাঁটে। সারা
দিনের ধকলে পা আর চলতে চায় না, তবু যাচ্ছি।
বাসও এলো একটা। ওরে বাবা, এর মধ্যে
এতগুলো মানুষ ঢোকাবেন, একখানা করে হাত বা
পা ঢেকে কিনা তাই দেখুন দিকি চেষ্টা করে!
অক্সিস-টাইমে আমাদের লালবীতির বাসগুলো নশি
এর কাছে। রবিবার বলেই এমনি, এদেশে
অক্সিসের দিনে নাকি এত ভিড় নেই।

ঘাটের কাছাকাছি এদিকটা এখন এমনি
চলবে। এগিয়ে চलो। যাচ্ছি, যাচ্ছি। রাস্তার
পাশে টেলিকোনের খোপ—ডিটজেল এক দৌড়ে
তার ভিতর ঢুকে কোন করে এলো। ফিরে এসে
বলে, দেখ, বাসে হুবিধে হবে না। অনেক

বদলাবদলি, বিস্তর হান্সাম। ট্রামে চেপে যাব
রেলস্টেশনে, ট্রেন ধরব।

মাথার উপরের রেল-লাইন একটা ধরা হল।
নটা স্টেশন পার হয়ে নেনে পড়লাম। নামছি
পাতালে, পাতালের লাইনে এবার। একটা নাত্র
স্টেশন গিয়ে পাতাল কুঁড়ে কুঁড়ে করে ধরার উপর
উঠে এলাম। আমাদের হোটেলের গায়ে।

বোদে উল্লেশ সন্ধ্যাবেলা খানায় ডেকেছেন।
বিস্তর গুণী-জ্ঞানী আসবেন, আমাদের সঙ্গে
মোলোকাত হবে। জর্মনি দেশটা ভাগ হয়েছে,
লেখকরা কিন্তু হুমনি। রাষ্ট্রদূতদের কী ক্ষমতা,
বাঁটোয়ার। করবে আমাদের! এদেশ-ওদেশের
সীমানা-সংরক্ষ নিয়ে তারা মানান সমস্ত বানান,
শক্তির হুমকি ছাড়ে। লোকের হৃৎকের অবধি
থাকে না। আমরা লেখকরা বানচাল করে দিই
সেই চক্রান্ত, কেউ তাদের ভাবেন্দার নই। তাই
অন্তত দেখলাম জর্মনিতে। এ-জর্মনি ও-জর্মনির
লেখক-শিল্পীদের মধ্যে মেলামেশা খুব। অশেষ
ভালবাসা। পশ্চিম-জর্মনির ষোলজন বাঘা বাঘা
বৈজ্ঞানিক আটন-অস্ত্রের বিপক্ষে রায় দিয়েছেন।
বোদোর বাড়ি পশ্চিম-জর্মনিরও অনেক আসছেন।
আমাদের ঘেরি হয়ে গেছে—পথ সংকণের মানসে
রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ভাঙাচোরা ইট-পাথরের নথ্য দিয়ে
হোটলে ঢুকছি। হঠাৎ দেখি, পা করে মোটর
বেড়িয়ে গেল হোটেলের উঠান থেকে।

ডিটজেল বলে, এই রে; উল্লেশ গাড়ি। বোঁজ
করতে এসেছিলেন, না পেয়ে ফিরে গেলেন।

দৌড়ল সে গাড়ির পিছুপিছু। চেষ্টিয়ে
ডাকছে। বোদোর কানে গেল না। সবাই এসে
হয়তো বসে আছেন, ভারি লজ্জার ব্যাপার।
সেইজন্তে বোদো নিজে ছুটেছিলেন। কোন করে
বাও ডিটজেল, দশ মিনিটের মধ্যে আমরা গিয়ে
হাজির হচ্ছি।

আকাশ ঘন ঘন হাজার ছাড়ছে অনেককণ

থেকে। ট্রেন থেকেই শুনছি। এবার রুষ্টি নামল।
কী রুষ্টি, কী রুষ্টি! বাগিন শহর ডালিয়ে দেয়
বুঁকি! অবিরল জলের মধ্যে ছুটো গাড়ি ছুটেছে।
বোম্বের বাড়ির বাইরের বারান্দায় ক-জন। ছাতা
নিরে রাস্তায় নেমে এলো মোটর থেকে আমাদের
উদ্ধার করবার জন্য। কলকল করে শ্রোত বইছে
রাস্তা দিয়ে। ছাতা ধরে নিয়ে তুলছে এক রূপনী
তরুণী। বোম্বের স্ত্রী মেক্সিকোর মেয়ে—আজকে
বিশেষ রকম সাজসজ্জায় আছেন, নয়তো প্রৌঢ়াই
বলতে পারতাম তাঁকে। এ রূপনী হল বাড়ির ভি
—হোটেলের সেই রাজকন্ডার মতো। মেইড একজন।
চেহারা ও পোশাক-আশাকে বুঝবার কথা নয়—
মুসলমান ঘন বাদন ধুয়ে ধুয়ে আমাদের হাতে
এনে নিচ্ছে।

রসিক মানুষ বোদো। বলছেন, খুঁজে পেতে
হোনাদের জন্য বিশেষ এক খানার জোপাড় করেছি।
এসে, এই পদ থেকে লেগে যাও। কাটা-ছুরি ধরো।
সেই বিশেষ খানা ঢাকা দেওয়া রয়েছে প্রকাণ্ড
পাত্রে। লোলুপ দৃষ্টিগুলোর সামনে সমুপর্ণ
বোদো ঢাকা তুললেন। কী কাণ্ড, হাড় একখানা!
কান্ জীবের এত বড় হাড়, বলতে পারব না।
প্রচণ্ড হাসি। যারা ছুরি উত্তত করেছিল, হাত
নানিয়ে নিয়ে গোপন করে।

এ হাড়কে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে আরও অনেক
ঢাকা-দেওয়া বস্তু। একে একে ঢাকা সরছে।
রকনারি নাস ও সবজি। আর মদ। ইউরোপ-
এশিয়ার দেশ-দেশান্তরে ঘুরলাম, মদের অবাধ
সমারোহ। আমি বড় মুশকিলে পড়ি। মদ ও সব
দেশে গম্বাজলের মতোই মাসলিক। এসেলে-
ওসেলে মোস্তির কথা উঠল তো ছুটে এসে পাত্র
ভরে দিল—পূর্ণপাত্র গলায় ঢেলে মোস্তি মজবুত
করে ফেলুন।

বাইরে মুবলদারা, ঘরের ভিতরে উক্ আয়াহ।
বড়রা অনেকে এসেছেন, এখনো আসছেন। দেরি
করে এসে আমরা লজ্জা পাচ্ছিলাম—কিন্তু আরও

দেরি করেন এবং লজ্জাও পান না, এমনিধারা বীরই
বহু। বক্তৃতার ব্যাপার নেই—এঁর সঙ্গে গল্প
করুন, ওঁর কাছে যান, কিংবা উনিই উঠে এলেন
আপনার পাশে। এমনি সব চলছে। জমজমাট
আজ্ঞা। আধঘণ্টা আগেও যে কেউ কারো মুখ-
দর্শন করিনি, এমন কথা কে বলবে? তাঁদের
মাকুর মতো বোদো একবার ঘর একবার বারান্দা
করছেন। যারা পরে আসছেন, অভ্যর্থনা করে
বসাজ্জেন তাঁদের। এক ভহলোককে নিয়ে এলেন
—হুমুল হট্টগোল—মুখের সামনে হুঁখানা হাত
মেলো ধরেছেন, মুখ দেখতে দেবেন না।

—বলুন, ইনি কে। বলুন, বলুন।

বাগিনে পা দেওয়া অবধি এক বাঙালির নাম
শুনছি—ব্যানাজি। কিছু ব্যানাজি। বোম্বের
পরম বহু। আমাদের সাক্ষাৎ জাহিরের সহপাঠী
—জাহিরও বার বার ব্যানাজির কথা বলছেন। সেই
ভহলোক একটু আগে বাগিনে এসে পড়েছেন
বহু থেকে সোজা মোটর হাঁকিয়ে। বোদো হাত
সরাসে মেথি, খুবই চোখোজানা আমার। একসঙ্গে
আমরা চীনে গিয়েছিলাম। কলকাতা য়ুনি-
ভার্সিটিতে আছেন। ছুটি নিয়ে এখন ভারতের
পররাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন জর্মনির
নানান তল্লাটে।

আশ্চর্য সাহসিক জীবন। চীনে একসঙ্গে
কাটিয়েছি, যুগাকরে জীবনে। বাগিনে এই খাতির
মেখে চমকে যাই। ছাত্র-জীবনেই বিনা পাসপোর্টে
একদা তিনি লওনে গিয়ে হাজির। পুলিশ গ্রেপ্তার
করে কোটে নিয়ে তুলল। হাকিমের কাছে তখন
কাড়া দ্ব-ঘণ্টা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে
বিবোলদার। সেই গল্প শোনা গেল জাহিরের
মুখে। নাংগি আমলে বোদো উষে দেশ ছেড়ে
পালালেন। অনেক জনের এমনি অবস্থা। এদেশ-
ওদেশ করে শেখটা মেক্সিকোর গিয়ে উঠলেন।
বিহু ব্যানাজিও গিয়েছিলেন মেক্সিকো। ভাবদাখ
সেই তখন থেকে।

আমার ক-খানা বই নিয়ে দেখি, দিয়ে আসব। বাংলা জানে না, অতএব বারকয়েক নেড়েচড়ে রেখে দেবে। কিন্তু বাংলা-জানা ধানের দিই, তাঁরাও কি ছাট পড়েন? ঘোষ দিই না, আমার নিজের বেলাতেও ঠিক এট। এক লেখক অগ্ন লেখকের বই পড়েন না—জানালেনা স্বগোত্রের ভো নয়ই। নিজের বইও নয়। লিখে লিখে বই সম্পর্কে এক বিন্দু বোহ নেই। বই উপহারের ফলাফল স্বদেশে বিদেশে অতএব একই রকম। বই ছাড়া আর এনেছি কখনগয়ের কিছু পুতুল এবং টুকিটাকি এটা-সেটা। একটা পুতুল—সাতল-কাঁধে চাষী—দিলাম বোম্বোকে। বোমো বাড় নাড়েন : উহ, আমার জীকে দিন। তাকে ডাকি। বজ্র ধুশি হবে।

—তাঁর জ্ঞাতও রয়েছে।

পকেট থেকে বের করলাম মিনা-করা সেকলে ধরনের কোঁটো। বোমো উল্লাসে চোঁতে লাগলেন : এসো গো—কী এসেছে এই দেখ তোমার জ্ঞাত। মেলিকো থেকে জুটিয়ে আনা স্ত্রী। কোঁটো হাতে নিয়ে মহিলা ছ-তিন পাক প্রায় নেচে নিলেন। সকলের কাছে নিয়ে নিয়ে ঘুরছেন : দেখগো—দেখগো—। ডুইংকর ঔদের আঁট-গ্যালারি বললে হর—নানান দেশের শিল্প-সংগ্রহে সাজানো। আমার যেওয়া জিনিস দুটো তাকের উপর চোখের সামনে রেখে দিলেন।

খানাপিনা ও আলাপ-সাপালাপ চলছে। খুব নাম-করা লেখিকা, কত টাকা রোজগার করেন তাঁর লেখাজোখা নেই—আনা সিগরস (Anna Seghers)। স্বাস্থ্যবতী, মাথার চুল পেকেছে, সগাই হাসছেন, মাড়ুরে মাধুর্য মুখের উপর। আর একজন লেখক ফ্রান্স ফেব্রিয়ান (Franz Fabian)—বড় ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার। এঁরও বয়স হয়েছে, সলাপী, কানে অত্যন্ত কম শোনে। বললেন, হিটলারের আমলে জেলে পুরেছিল। বেরিয়ে এসে ফ্রান্সে পালাই। ফ্রান্স দখল হয়ে গেল তো গ্যানেল পেরিয়ে ইংল্যান্ডে।

কনসেনট্রেশন-ক্যাম্পের ষাণ্ড পেয়েছেন ?

উহ, অতদূর নয়। অত্যন্ত বনেদি বাড়ির মানুষ আমি। ডেবেছিল, জপিয়ে-জাপিয়ে আমার দলে নেওয়া যাবে। তাই শুধুমাত্র আটকে রাখল, গায়ে হাতখানাও ছোঁয়ার নি। জর্মনির যত লেখক মিলে আন্দোলন আরম্ভ করলেন, তখন ছেড়ে দিল। বুকে দেখলাম, লড়াই যত ভরবে মরীয়া হয়ে উঠবে ততই নাংসিরা; তখন মরে গেলেও ছাড়বে না। বুকে-সমঝে মরে পড়লাম।

হীরাণাশিক কত আত্ম জনেছেন একটি ঘরে! কোনদিকে খুব ফেরাই, কাকে বা পিছন ফেলি। স্টিফান হাইন—উপন্যাসে খুব নাম। লড়াইয়ে গেলেন, সেখানেও কাজ করলেন। ভাল ভাল খাতির-সম্মান পেলেন বাহাদুরি দেখিয়ে। তারপর মত ঘুরে গেল। বড় বড় উপন্যাস লিখে ফেললেন লড়াইয়ের পাশবতা নিয়ে। আইসেনহাওয়ারের কাছে গিয়ে সম্মান-পুরস্কার সমস্ত ফিরিয়ে দিলেন নিজ হাতে। বলিষ্ঠ বীর্য-সেহ, দৃঢ়কণ্ঠের কথাবার্তা—ভয়লোকের চেহারা হাবভাব মনের উপর দাগ কেটে যায়। এশীয় লেখক-সম্মেলনে আমার অভিভাবন এক কপি দিলাম তাঁকে। পাঠা উল্টালেন, বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে দু-এক কথা হল। নদী আর লেক ঘুরে আসছি শুনে বললেন, আমি এক পাক। মাঝি তা জানো, নিজের নৌকো আছে। আর একদিন চলো আমি ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। লেক ছাড়িয়ে অনেক—অনেক দূর চলে যাব। নিজের গাড়ি আছে, মোজা নৌকো-বাটে নিয়ে হাজির করব, হালকা পোহাতে হবে না। যাবে?

ছুটে গিয়ে গাড়ি থেকে মাপ নিয়ে এলেন। টিপটিপে বৃষ্টি তখনো। বালিন ও গোটা জর্মনির বড় মাপ। দেশটা কি রকমে দু-ভাগ হয়েছে, আঙুল বুলিয়ে দেখাচ্ছেন। বললেন, মাপটা তোমার দিয়ে দিচ্ছি। জর্মনি ঘুরছে, তোমার খুব কাজে আসবে। বুঝতে পারবে, কত বড় সর্বনাশ হচ্ছে দেশ-বিভাগের এই শয়তানিতে।

জন করেক মেয়ে এক জায়গায় হয়ে আলাপ করছেন। তিন্নী কাটছি আমরা : ঠাদের কথাবার্তা আলাপ করতে পারেন ? সাজগোজ নিয়ে নিশ্চয়—তা ছাড়া আবার কি ! বেয়েদের ডেকে তুলিয়ে দিলেন একজন : শুনছেন—হের অমুক বললেন, আপনাদের আলোচনা নাকি পোশাক-আশাক আর সেউ-পাউডার নিয়ে। উশে-গিল্লির সঙ্গে সঙ্গে জবাব : না গো, আমরা বলাবলি করছি প্রেমে পড়া নিয়ে। হাসি উঠল। তা সত্যি, তুলিয়ে মোটামটি তিনটে সমস্তা বেয়েদের—পোশাক, প্রসাধন আর প্রেম।

আর এক মহিলার সঙ্গে আলাপ করছি। চাটা:শে জর্ম, কিন্তু রং ময়লা।

—আপনি লেখেন ?

—উহ, আমার বানী। ঐ তিনি। আলাপ করুন আমার বানীর সঙ্গে।

বানীকে ভাষণ: গিয়ে বানী-গরবিনী সরে গিয়ে বসলেন। জাঁদরেল লেখক—গাছার উইজেনবর্ন (Gunther Weisenborn). পশ্চিম-জর্মনির হানবুর্গ থাকেন। ওখানকার লেখক-সমিতির সভাপতি। বললেন, আমাদের ওলিকটা দেখে যাবে না ?

আমরা একপায়ে খাড়া, ঘোরাবুটির জন্তেই তো এসেছি। মানুষজন দেখব, খোজার তুলিয়া দেখে যাব হু-চোখ মেলে। হানবুর্গের আর এক লেখক ফ্রাঙ্ক পেরাক (Frank Perak) বললেন, পশ্চিম-জর্মনি যেতে তিসার হাঙ্গানা নেই। ভারতের সঙ্গে ভাবসাব আনাধের। লেখক-মানুষেরা এসেছ, দেখেছেন ছুটে অংশের বিচার করে দেখা উচিত।

সেই কথা রইল। গিয়ে ওঁরা নিবহুণ পাঠাবেন লেখক-সমিতির তরফ থেকে। রাহাখরচের বন্দোবস্ত করবেন। বালিনে আছি কয়েকদিন এখনো, তার মধ্যে সব এসে যাবে।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। হানবুর্গের চিঠি এলো না। ভুলেই যেরেছেন, কিবা হয়তো লেখক-সমিতি

চান না আমাদের। পূর্ব-জর্মনির ণাওঘাতে এসে পশ্চিম-জর্মনিতে ঘোরাবুটি করব, খুব সম্ভব এটা তাদের পছন্দসই নয়।

অধ্যাপক হিউ কামনিফার (Heinz Kamnitzer) এসেছেন। বয়সে তরুণ, বালিন হুনি-ভাসিটিতে ইতিহাস পড়ান। মনোরমা তরুণী ঐ সঙ্গে। আনায় বলছেন, ইংল্যাণ্ডে ছিলে তুমি ? নয়তো এমন ইংরেজি শিখলে কি করে ?

বুঝুন। এ-কথার পৃষ্ঠে ও-কথা জুড়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে বলি, গ্রামার-ভুলের ভয়ে সন্না সম্ভব—তাই হল ওদের মতে ভাল ইংরেজি। তোমাদের শব্দের শেখা, আনাদের ছিল আরের দায়ের। ইংরেজ ঘাড়ের উপরে চেপে ছিল পোনে দু-শ বছর। ইংরেজির ভুফান বইয়ে দিয়েও তো চাকরি মেলে না কত হতভাগার !

নাংসি-আমলে কামনিফার ইঙ্কলের পড়ুয়া। ছেলেদের নাটকবর হয়ে রাস্তায় নিছিল বের করলেন একবার। কর্তাদের নজর পড়ল। আর একবার বেনামিতে লিখলেন নাংসিদের বিরুদ্ধে। নাম না থাকলে কি হবে, ঠিক ধরেছে। ধরে নিয়ে জেলে পুরল। কিছুকাল আটকে রেখে প্রমাপের অভাবে ছেড়ে দিল। ছাড় পেয়ে এক দৌড়ে অমনি লগনে। লড়াই বাবল। একটানা বারো বছর ইংল্যাণ্ডে। লগন ইঙ্কল অব ইকনমিক্সে পড়ছেন, ইংরেজি শিবে নিতে হল সেই সময়।

অধ্যাপক বললেন, বড় ভাল লাগল আপনায় সঙ্গে আলাপ করে। সত্যি, বড় আনন্দ পেলাম।

—কিন্তু আমার লেখা আর আপনায় লেখার তো আকাশ-পাতাল পারাক। আপনায় কায়বার সত্য নিয়ে, ইতিহাসে মিথ্যার ডেকাল চলে না। আর আমি গল্পকার কলম ধরেই মিথ্যে বানাতে বসে যাই।

—আমার চেয়ে ঢের ঢের বড় সত্য বানান আপনায়। নয়তো অত মানুষের মনে ধরবে কেন ? ভিত্তিতে ভিত্তিতে এক নিগ্রো ডহলোক এসে

হুকলেন। লেখক নন, কিন্তু মজলিসি মানুষ। সবাই কাছে ডাকে : আনুন, আনুন। ভারী ভারী এই গুণিজনদের মধ্যে দু-মিনিটে আচ্ছ। রকম তিনি ভুমিয়ে নিলেন।

এবই মধ্যে একসময় উশে-গিরি গ্রানোফোনে বাজনার রেকর্ড চাপিয়ে দিলেন। কুৎ-খানা—বে বার মতো নিয়েথুয়ে থাকছেন। গিরি বড় বড় চোখ মেলে তদারকে ছিলেন, কাকিছুকি দিচ্ছে কিনা কেউ। সন্দেহ মাড়েই বিনা বিচারে বথেচ্ছ চাপিয়ে দিচ্ছেন—আপিলে রেহাই নেই। বাজনা হতেই গিরি ওদিক ছেড়েছুড়ে বলাচ শুক করলেন নিগ্রো ডবলোকটির সঙ্গে। এক পাক হয়ে যেতে স্টিকান হাইন ধরলেন তাঁর হাত। কামনিফারের সুল্লরী বউও নাচছেন একজনের সঙ্গে। সাবুলো এই দু-জোড়া। সবাই উসখুস করছে সুল্লরীর হাত ধরে নাচবার জন্ত। পাত্রে পর পাড়ে রসিকদের কণ্ঠ অবধি টাইটুবর। অধ্যাপক বোধ করি গতিক বুকেই বউয়ের হাত ধরে উঠে পড়লেন রাত হচ্ছে বলে। উশে-গিরি আমার উপর বিষম খুশি—উপহার দিয়েছি, এবং মেল্লিকোর মায়া-সংস্কৃতি ও ভারত-সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগ আছে বলে খুব একচোট গুণগান করেছি। একেবারে মিছাও নয়—গ্রানোফোনে মেল্লিকোর লোকসঙ্গীত শোনালেন, বাংলাদেশের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে অবিকল এমনি সুরই শুনতাম একদিন। বাপের বাড়ির প্রশংসায় গিরি গলে গিয়েছেন। আখায় ডাকছেন : এসো নাচি, এসো না—

আমি কানে শুনছিলাম, আলাপনে মন্ত আর-একজনের সঙ্গে। গিরির কথা শুনতে পেলাম না, কি করব ?

আর এক মহিলা কাছে এসে বললেন, তুমি ইংরেজি জানো, ঠাঠর করিনি। আমিও লেখিকা, বাচ্চাদের বই লিখি। আমার স্বামীও লিখতেন। নামী লোক ছিলেন তিনি—ভিসকপ (Weiscopl)। আমার ক্লাটে চলে তোমরা একদিন। তোমাদের

মলের সবাইকে বলেছি, তোমাকেও বলি। ভারত সম্পর্কে আমার মোহ আছে, তোমাদের একটু জানতে বুঝতে চাই।

আর এক মার্কিন মেয়ে—কী কাণ্ড, বাপের বাপ! আনন্দের সঙ্গে আগের চেনা। দু-হাতে আনন্দের গলা জড়িয়ে ধরে বুকের উপর প্রায় মুখ রেখে হাসিটাড়ি ও রসালাপ করছেন। এ প্রক্রিয়া দেখার অভ্যাস নেই, হঠাৎ কিছু ইংকট লাগে। ঘরময় হাসি উঠল, সকলে বেশ রসিয়ে উপভোগ করছেন। জীমতী আরে প্যাংকে (Aubrey Pankey), ইউনেসকোয় কাজ করতেন, ইন্ডোনেশিয়ায় ছিলেন অনেক দিন, কি কারণে চাকরি গেছে—আপাতত বালিনে এসে আছেন। নিজ হাতে রাধা করে খাওয়াবেন, আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন। বার বার বলছেন, তারিখ দাও কবে যেতে পারবে।

—ভাত খাওয়াবেন তো ?

—হ্যাঁ, ভাতই তো। ইণ্ডিয়ান কারি-পাউডার জোগাড় করে রেখেছি, তাই দিয়ে তরকারি রাঁধব। খুব ভাল রাঁধি আমি, ইন্ডোনেশিয়া থেকে অভ্যাস। খেয়ে দেখবেন।

আনন্দ বললেন, আমিও ভাল রাঁধি। অতি চমৎকার। আমার বউয়ের চেয়ে অনেক ভাল। সে-ও তা স্বীকার করে। বউকে আমি রাঁধতেই দিই না অনেক দিন।

—কি বললে ? হায়, হায়—বউ আছে তোমার ?

আনন্দের গলা ছেড়ে ঘুরপাক খেয়ে জীমতী প্যাংকে যেন ছিটকে পড়লেন এদিকে। আর্ডনাপ করছেন : তোমার বউ আছে, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আর আমার চুখের দিন, কাল্লার দিন। হায়, হায়, হায়! হাসবেন না আপনারা কেউ, আমার সর্বনাশ নিয়ে মজা করবেন না।

আর হেসে সবাই গড়িয়ে পড়ছে। আনন্দও ডেমনি অভিনয়ের ঢঙ বলেন, কুছ পরোয়া নেই—

বউকে আমি ডাইভোর্স করব। সকলের সামনে এই কথা দিয়ে রাখছি।

রাত সাড়ে-বারোটা। একে ছুয়ে নিমন্ত্রিতেরা সকলে বিদায় নিয়েছেন। ক'জন মাত্র আমরা। বৃষ্টি খেমে গেছে। কিন্তু ইঞ্জিনে জল ঢুকে একটা গাড়ি কিছুতে স্টার্ট নিজে না। ঠেলেঠেলে অনেক চেষ্টা করে দেখা গেল। বিহু ব্যানার্জি বললেন, চলো, আমার গাড়িতে তোমাদের হোটেল পৌছে দিয়ে যাব। সরকারি গেস্ট-হাউসে উঠেছি, তোমাদের হোটেলের খুব কাছে।

প্যাকে রাত্তি অবধি নেমে এসে জনে-জনের সঙ্গে শেকস্তাও করে বললেন, আসবে কিন্তু আমার বাড়ি। নিজে বাঁধব। খেয়ে দেখো, তোমাদের দেশি ভরকারির স্বাদ পাবে।

প্যাকের বাড়ির খাওয়ায় অস্ত্র সবাই গিয়েছিলেন, আমার যাওয়া ঘটেনি। স্বামী সঙ্গে আছেন, নামজাদা গায়ক, তিনিও দিলদরিয়া মানুষ। স্বামী আর স্ত্রী আনন্দের নীড় রচনা করে আছেন বাগানে।

[সফল]



১৯৪০-৪১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিবর্তনের আওতা-
কালে কুচবিহার-সহ পশ্চিমবঙ্গের কী অবস্থা ছিল সেটা।
১৯৪১ সালের হিসাব দেখলেই বোঝা যাবে। ১৯৪০-৪১
সালে পশ্চিমবঙ্গের ঘোঁট আয়তন ৪৪ ৩০ হাজার
৮ শত ৮৯ বর্গমাইল। এর মধ্যে নীট আবাদী জমির ঘোঁট
পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার একর।
যোজনসীরা জমির পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ ৪ হাজার ২ শত
একর অর্থাৎ প্রায় সোঁনে হু-মানার হতে। চলতি অনুবাদী
জমির পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ৩২ হাজার ৮ শত একর।

ঐ বছর প্রধান প্রধান ফসলের বে কলন হয়েছিল, সেটা নীচে দেওয়া হল :

পত্র	মোট জমি (একরে)	উৎপাদন (টনে)
চাল	৬৬,২২,৩০০	৩২,১০,৪০০
গম	১,২৪,৩০০	৪১,৩০০
আলু	২১,৩০০	৩,৪৪,১০০
পাট	৬,৪০,২০০	১৪,৫৩,০০০ (গাট)
আখ	৪২,৩০০	৮,৪৪,২০০
ডাল (ছোলা-সহ)	১৩,০৮,৮০০	৫,৪০,৩০০

আগের তথ্যটি অনুবাদী দেখা যাবে যে, এই সময় আমাদের মোট লোকসংখ্যা ঠাঁড়ার ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ১০ হাজার ৩ শত ৮। এর মধ্যে ১ কোটি ৪১ লক্ষ ২৫ হাজার ১ শত ৬১ জনই ছিল কৃষির ওপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ দেশে প্রতি শত জনের মধ্যে ৪৭ জনই ছিল কৃষিকর্মী। এই সময় গড়ে মাথাপিছু নীট আবাদী জমির পরিমাণ ছিল মোটে ১'৪ বিঘা।

এখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য উৎপাদনের উপায় হিসেবে কতকগুলি কার্যব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেমন—

পশ্চিমবঙ্গের কলনের পরিসংখ্যান

চাল	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬
(ক) মোট জমির পরিমাণ (একরে)	২৬,০২,৬০০	২৪,৮৮,১০০	১,০২,০৩,৩০০	১,০৫,৪৮,২০০	২৮,৩২,১০০	১,০২,৪৪,০০০
(খ) মোট উৎপাদন (টনে)	৩২,১০,৪০০	৩৫,৭৮,৪০০	৩০,৪০,১০০	৪২,০৪,২০০	৩৭,৪৪,৩০০	৪১,৪৪,১০০
গম						
(ক) মোট জমি (একরে)	১,২৪,৩০০	১,৩০,৩০০	১,০৬,৪০০	১,৩৩,১০০	১,৪১,০০০	১,৪৪,১০০
(খ) মোট উৎপাদন (টনে)	৪১,৩০০	৪০,৭০০	৩৪,৩০০	৩৮,৪০০	৪৪,২০০	৪৩,৪০০
আলু						
(ক) মোট জমি (একরে)	২১,৩০০	১,০৪,০০০	১,০০,৪০০	১,০৩,৮০০	১,০৪,০০০	১,১৩,৩০০
(খ) মোট উৎপাদন (টনে)	৩,৪৪,১০০	৪,৪১,০০০	৪,২১,১০০	৪,১৩,৪০০	৩,৭৪,১০০	৩,৮৩,৬০০
পাট						
(ক) মোট জমি (একরে)	৬,৪০,২০০	৮,৭১,১০০	৮,১০,৮০০	৪,৩৪,১০০	৪,৪০,৬০০	৭,১০,৩০০
(খ) উৎপাদন (গাটে)	১৪,৫৩,০০০	২৩,৩০,৪০০	২৩,৩৩,১০০	১৪,৫৮,৪০০	১৪,২৮,৪০০	১২,৪৭,৪০০
আখ						
(ক) মোট জমি (একরে)	৪২,৩০০	৪১,৩০০	৪২,৩০০	৪৩,২০০	৪৩,৮০০	৬০,২০০
(খ) মোট উৎপাদন (টনে)	৮,৪৪,২০০	৮,১২,৪০০	১০,৩৮,৩০০	৮,৪০,২০০	১১,২৩,১০০	১২,৮২,৪০০
মোট তৈলবীজ						
(ক) মোট জমি (একরে)	৩,২৪,৮০০	২,১৮,০০০	৩,২৩,৮০০	২,৬১,০০০	৩,১১,৩০০	৩,৩০,১০০
(খ) মোট উৎপাদন (টনে)	৪৮,৩০০	৪২,৪০০	৪২,৩০০	৪১,৩০০	৪৭,২০০	৪২,৮০০
মোট ডাল (ছোলা-সহ)						
(ক) মোট জমি (একরে)	১৩,০৮,৮০০	১৪,৪৪,৪০০	১৪,৪৮,৪০০	১৬,৬১,১০০	১৭,৪৪,২০০	১৮,১৮,৬০০
(খ) মোট উৎপাদন (টনে)	৩,৪০,৩০০	৩,৮৪,২০০	৩,২০,১০০	৪,১৪,৪০০	৪,৩৮,৪০০	৩,৮০,৪০০

সেচ-ব্যবস্থা, সেচের পাশাপাশি বিদ্যুৎ, সার সরবরাহ, বীজ বিতরণ, শ্রমের যোগ ও পোশাক লবন, চাষীদের ওপদান প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য যে, এর সঙ্গে বিপন্নন ব্যবস্থা, পশুপাল্য নির্ধারণ, কলকর কৃষকের প্রশার ও পণ্ড-উন্নয়নের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

এখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে দেখা যাবে যে, সরকারী হিসাবমতে পশ্চিমবঙ্গের ২,২২৩টি ছুত্র সেচ-পরিকল্পনা কৃষি-বিভাগ কর্তৃক রূপায়িত হয়েছে এবং এর ফলে ২,২১,৪৪৪ একর জমি সেচপ্রাপ্ত হয়েছে। ১১৬টি সেচ-পাশাপাশি বিদ্যুৎ হয়েছে, ৩০,৪২০ একর পতিত জমি চাষে আনা হয়েছে, ৪,৪১৬ টন স্পার-কসকেট, ২,২১৬ টন হাটের শুঁড়া, ১,৬২৩ টন খিল, ১,০০,৬২৬ টন শরীরের আবর্তন-সার, ২৭,৬৬১ টন তালানী সার, ২,৮০,৬১৩ টন কচুরীপান-পচা সার, ৬০৩ টন সবুজ সারের বীজ, ৩০,৪০১ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট, ৩৬,৪৩১ টন মিশ্র সার বিতরণ করা হয়েছে। বীজের মধ্যে ৩,১৬৭ টন ধানবীজ, ১,০১৭ টন গমবীজ ও ২,৬৬০ টন আদুবীজ বেগুনা হয়েছে।

পরিসংখ্যান থেকে পশ্চিমবঙ্গের কলন কিভাবে বেড়েছে সেটা দেখা যাক :

১২৫০-৫১ সালের উৎপাদনের উপরে প্রথম পরিকল্পনার শেষে ১২৫৪-৫৬ সালে আমাধের ২,৩৫,২০০ টন চাল বেশী উৎপন্ন হয়েছে, ২,১০০ টন বেশী গম উৎপন্ন হয়েছে, ১৮,৫০০ টন আলু উৎপাদন হয়েছে, ৪,১১,৪০০ গাট পাট বেশী হয়েছে, ৪,৩৩,৬০০ টন বেশী আখ হয়েছে এবং ডালের উৎপাদন ৩৩,৮০০ টন বেশী হয়েছে কিন্তু যেটা তৈলবীজের উৎপাদন ৮,৫০০ টন কম হয়েছে।

যদি প্রথম পরিকল্পনার অন্তর্গত সময়ের গড় হিসাব নেওয়া যায়, তবে দেখা যাবে যে, ১২৫১-৫২ থেকে ১২৫৫-৫৬ এই পাঁচ বছরে গড়ে প্রতিবছর ৪১,১০,১০০ টন চাল, ৪,৭৫,০০ টন গম, ৪,১২,৮০০ টন আলু, ১২,২১,১৪০ গাট পাট, ২,৫৮,১০০ টন আখ, ৪,০১,০৬০ টন ডাল ও ৪০,১০০ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হয়েছে।

কমানের এই গড় হিসাবে দেখা যায় যে, ১২৫০-৫১ সালের উৎপাদনের তুলনায় পরবর্তী বছরে গড়ে ২,০০,৪০০ টন চাল, ৪১,১০০ টন আলু, ৪,০৩,১৪০ গাট পাট, ১,৪২,২০০ টন আখ ও ৩১,৪০০ টন ডালের বেশী ফলন হয়েছে এবং প্রত্যেক শস্তের অধীনে অনেক বেশী জমিতে পরবর্তী বছরে চাল হয়েছে। গমের ও যেটা তৈলবীজের উৎপাদন কম হয়েছে।

আগের তুলনামূলক পরিসংখ্যান থেকে শাইট বোকা যায় যে, পরিকল্পনার অন্তর্গত সময় কেবল আলু, ডাল ও পাট ছাড়া অন্যান্য শস্তের উৎপাদন ১২৫০-৫১ সালের উৎপাদনের চাইতেও কোনো কোনো বছর অনেক নেনে গিয়েছে।

তা ছাড়া বছরে বছরে ফলনের তারতম্য এত বেশী হয়েছে যে, পরিশেষে কিছু উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটে থাকলেও, তাকে পরিকল্পনা হ্রাণ বলা চলে না। কারণ এই বৃদ্ধি পরিকল্পনার দান বলে মনে নিতে হলে, ফলনের ধারাবাহিক ক্রমোন্নতি লক্ষিত হতো। আসলে তা হয়নি।

আমাদের কমানের যে সামান্য উল্লেখিত লক্ষিত হচ্ছে সেটা বসন্ত প্যাথের চাহিশ, বাক্সার-বস, নবানত চাষীদের প্রচেষ্টা, 'গ্রেকিওরনেক্ট'-এর অবদান ও আবহাওয়ায় অবদান বলে মনে নেওয়াই সম্ভব হবে।

এই প্রসঙ্গে প্রথম পরিকল্পনা অস্থায়ী যে-সব কাজ করা হয়েছে তার দরুন ফলন কতটা নাজুতে পাওয়া উচিত ছিল তা খতিয়ে দেখলে, পরিকল্পনার বিশ্বাসের অসাড়তা বুঝতে কোনো অসুবিধাই হবে না। প্রথমে চালের ফলন সবচেয়ে একটু ভগিয়ে বোঝা যাক। সরকারী হিসাবে বলা হয়েছে যে, ২,৯৬০টি ছোট সেচ-পরিকল্পনা ব্যতীতে রূপায়িত হয়েছে,

এবং তাতে ২,২১,৪৪৪ একর জমি উপকৃত হচ্ছে। ধান আমাধের প্রধান ফসল, এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ছোট সেচ-পরিকল্পনার উপকৃত সব জমিতেই ধানচাষ সম্ভব পরিকল্পনার সেবদ্বারা হয়েছে। সেচের দরুন গড়ে ৩ মণ চাল বেশী ফলন হবে থাকলেও, ১২৫০-৫৬ সালে উপকৃত জমি থেকে সম্ভব ১,২২,৩৬৩ টন চাল এই ব্যবস বেশী হয়েছে বলে ধরতে হয় : যদি নতুন চাষে আনা জমি সেচ পেরে থাকে, তবে ফসলের পরিমাণ আরও বেশী বাড়াবে। মনে রাখা সরকারি যে, সরকারী হিসাব অস্থায়ী সূত্র সেচ-পরিকল্পনা ছাড়াও আরও অনেক বেশী জমি—পুস্তান পুস্তিগী উদ্ভাব, সেচ-বিভাগ কর্তৃক রূপায়িত ছোট সেচ-পরিকল্পনা ও বৃদ্ধাকী পরিকল্পনা প্রকৃতি সেচ-ব্যবস্থার উপকৃত হয়েছে। তার দরুন যে চালের ফলন বৃদ্ধি হওয়া উচিত, তার হিসাব এতে করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, ১২৫০-৫৬ সালে ১২৫০-৫১ সালের তুলনায় প্রায় ৩৪,১৪,০০০ একর বেশী জমিতে ধানচাষ হয়েছে দেখা যায়। গড়ে একর-প্রতি ১০ মণ চাল হিসাবে এই অতিরিক্ত জমি থেকে ঐ বছর ১,৪৫,০০০ টন চাল বেশী উৎপন্ন হয়েছে বলে ধরা যায়। তাহলে দেখা যায়, কেবলমাত্র ছোট সেচ-পরিকল্পনা ও অতিরিক্ত জমিতে ধানচাষের ফলেই শুধু ১২৫৪-৫৬ সালে ২,৪৭,৩৬৩ টন চাল বেশী হয়েছে। এর উপর অন্যান্য সেচ-পরিকল্পনা ব্যবস অতিরিক্ত ফলন ধরলে, যেটা চাল-উৎপাদনের পরিমাণ বহু বেশী হবে নিশ্চয়ই। এ কথা ভুললে চলবেনা যে, অন্যান্য বহু পরিকল্পনা চাল-উৎপাদনের বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে : যেনন—সাধারণ বিতরণ, বীজ সরবরাহ, শস্তরক্ষা প্রকৃতি। এ সমস্ত উপায়েই কল্যাণ হিসাব করলে, অতিরিক্ত চালের উৎপাদন একটা অবিশ্বাস্য অর্থে শাড়াবে। কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে, ঐ বছর মোটে ২,৩৫,২০০ টন চাল বেশী হয়েছে। এতে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, হয় সরকারী পরিসংখ্যান-তথ্য ভুল, মজুদা পরিকল্পনার কার্যবাহী ঠিকমতো কর্মক্ষম নয়। অর্থাৎ খরচ অস্থায়ী ফলদানে মশকুত।

অন্যান্য ফসলের সম্বন্ধে হিসাব নিলেও একই গলব প্রতিভাত হবে।

অনেক সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফলনের এই অসঙ্গতির কারণ দেখিয়ে পরিকল্পনাকে বাচানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কিন্তু মনে রাখা সরকারি যে, প্রাকৃতিক চর্যাণ আমাধের চিরসারী এবং তার দরুন সন্ধ্যা ক্ষমকতি না হিসাব করে যদি পরিকল্পনা হয়ে থাকে—তবে আর বাই হোক, তাকে 'পরিকল্পনা' বলা চলে না,

এবং তার উপর নির্ভর করে কলন বাড়ানোর আশা করাও অসম্ভব ।

কেনে আজও কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক সংযোগ নিতান্ত নগণ্য । এক পাতি ও কিছুটা আর্থ চাড়া আর কোনো কৃষিজাত ব্রহ্মাণ্ড শিল্পে ব্যবহৃত হয় না । এমন কোনো শিল্পের আর্থও দেশে প্রসার হয়নি, যা কৃষির উৎপাদন কাজে লাগিয়ে শিল্প ও কৃষির অগ্রগমনে সাহায্য করবে ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কালে দেশে চটপট ছোট-বড় নানা ধরনের সেচ-ব্যবস্থার টাকা খরচ হয়ে গেল ; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় ও জমিতে কোন্ কলনে কত জল লাগবে তার সঠিক হিসাব বিশেষজ্ঞরাও দিতে পারেন না । অত্যাধিক অপরিমিত সেচ হেওয়ার কলে, উপকারের চাইতে অসুকারেরই বেশী সম্ভাবনা । জমির সঠিক জরিপ না থাকার, প্রকৃতপক্ষে যে-সব জমিতে জল দিলে বেশী লাভের সম্ভাবনা, সে-সব জমি জল পক্ষে না—এ আশঙ্কার ফলেই কারণ আছে । অথচ সেচের খাল বননের কলে অনেক উর্বর জমি নষ্ট হয়েচে । জমির 'লেভেল' সেচোপযোগী করাই কোনো ব্যবস্থা না থাকায়, অবধা জল ও টাকার অপব্যয় হচ্ছে । চাষের বরফন অসুধারী জল না পাওয়ার, ধোঁকসলী চাষের পরিমাণ-বৃদ্ধির সুযোগ হচ্ছে না ।

'জমিদারি'র লোপ হওয়ার, জমিও লোপ পেয়েচে । কৃষি-বিজ্ঞানের সঙ্গে যোগ না থাকার, জমিদার উচ্ছেদ করে সু-চারজন আশ্রিতের সাহায্য হয়ে থাকলেও, প্রগতিশীল চাষের প্রবর্তনের কোনো সুযোগই হয়নি ।

জাতীয় জীবনের প্রত্যেক আঙ্গোলেই প্রগতিশীল জীবনের প্রধান অবলম্বন হওয়া সত্ত্বেও, পল্লীতে নিকিত প্রগতিশীল কবী গড়ে তোলার কোনো প্রচেষ্টাই এবাবৎ হয়নি । এদেরই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বপ্রণয় পল্লী-কৃষি নৃতন পথে অগ্রসর হতে পারে । সামান্য বেতনভোগী লরকারী কর্তৃত্বাধী দিয়ে একাজ সম্ভব নয় । অথচ আজও পল্লীর চাষীরা নেতৃত্ববিহীন ও অসংগত ।

চাষীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার নাট, অল্প এদের উপরেই সমব্যয়-স্বাধীনতা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে । কল, সমব্যয়-অভিধান সংখ্যার বেড়ে উঠলেও, চাষীরা সমব্যয়ী হয়ে উঠেছে না । কৃষি-শিক্ষারও ব্যাপক প্রসার সম্ভব হয়নি ।' গোটা-দুইকে মহাবিদ্যালয় ও দুটি কৃষি-বিদ্যালয় বোলা হয়ে থাকলেও, তাতে চাষীরা শিক্ষা পাবে না, শিক্ষা পাবে চাষের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত চাকুরি-সোজী মধ্যবিত্তের দল । পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার অর্থ কোনো ব্যবস্থা নাই । তাই গ্রামের ছেলেরা সাহিত্য, ইতিহাস আর অল্প শিখলেও, উন্নত চাষবাদের কোনো ধারণাই পাবে না ।

১৯৪৬-৪৭ সালে যে উৎপাদন হয়েছে, সেটা আমাদের খাদ্যের চাহিদার তুলনায় কতটুকু তার মোটামুটি একটা ধারণা করা যাক :

মোট চাল উৎপন্ন হয়েছে ৪১,৪৪,১০০ টন । এর মধ্যে পর্যবর্তী বছরের বীজ ও গুদাম-জাত করবার ক্ষমকতি শতকরা মাত্র ত্রাণ বাঁধ দিলে, অবশিষ্ট থাকে ৩৭,৩১,১০০ টন । ১৯৪৬-৪৭ সালের আয়ত্তে আমাদের মোট লোকসংখ্যা ২,৬৪,২৪,০০০ ধরলে, এবং শতকরা ২০ ভাগ লোক ডাঙ থাকেনা ধরে নিলে, জন-প্রতি বছরে ৪৬০ মণ চাল হিসাবে আমাদের ন্যূনতম প্রয়োজন ৪১,৪২,০০০ টন চালের । অ্যাকুরয়েড সাহেবের ন্যূনতম খাদ্যমানের হিসাবে, প্রয়োজন—৬ লক্ষ ৪০ হাজার টন চালের, ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টন চিনির, ১৩ লক্ষ টন আলুর ও ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টন সরষের তেলের । আমাদের উৎপাদন—চাহিদার তুলনায় এখনও কী শোচনীয়, তা এর থেকেই যোগ্য হবে ।

সমস্যা সমাধান সহজ, এ কথা বলা আমাদের উদ্ভেদ নয় । সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাধানের পথ যে আরও কত সূচিক্রিত ও ব্যাপক হওয়ার প্রয়োজন, সেটাই বক্তব্য । এই হিসাবে দেখলে, সত্যিই কি 'পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' সার্থক হয়েছে বলা চলে ? পরিকল্পনা বর্ষার্ধ বিজ্ঞানসম্মত হলে, 'দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা'র মধ্যপথে আজ আমরা দুর্ভিক্ষের ভয়ে এত সঙ্কটিত কেন ?

রূপমাগর

দুর্বার্ষ যোষ

[পুঁ-মখ্যনিভ ৩৪]

কালিকাপুর থেকে গাঙ্গুড়ি; সকালবেলার
রোদে, শালবনের হাওয়া আর সড়কের লালে ধুলোর
সঙ্গে যেন ছোয়াছুয়ি আর ছুটোছুটির খেলার মত
একটা খেলার আবেগে দৌড়তে থাকে নিশীথের
গাড়ি। সড়কের একটা বাঁক ঘোরবার সময়
স্টিয়ারিং ঘোরাতে গিয়ে একটু চমকে ওঠে, এবং
সাবধান হয় নিশীথ। হঠাৎ বড় বেশি আনমনা হয়ে
গিয়েছিল নিশীথ, এবং গাড়ির স্পীড একটুও কমিয়ে
না নিয়ে একেবারে বাঁকের কাছে চলে এসেছিল।
এবং, আর একটু ভুল হলেই, স্টিয়ারিং ঘোরাতে
আর একটু বেশি করলেই...। না, খুব বেঁচে
গিয়েছে গাড়িটা, তেঁতুলগাছটার প্রায় গা ঘেঁষে
চলে গিয়েছে। আর সামান্য একটু এদিক-ওদিক
হলে গাছটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে গাড়িটা চুরনার হয়ে
যেত।

গাড়ির সামনের দীর্ঘ নিশীথেরই পাশে বসে ছিল
প্রতিভা। গাড়িটার স্পীডের মাধ্যম বাঁক ঘোরবার
সময় প্রতিভার শাশ্ব চোখরাটা নিশীথের গায়ের
উপর আচম্কা ছমড়ি খেয়ে পড়েছিল। প্রতিভার
সোনার ফ্রেনের চশমাটাও ছিটকে পড়ে গিয়েছিল।

নিশীথ লজ্জিতভাবে হাসে। —গাড়িটা খুব বেঁচে
গিয়েছে, প্রতিভা। আর একটু ভুল হলেই...

চশমাটা কুড়িয়ে নিয়ে প্রতিভাও হাসে।
—আমার চশমাটাও বেঁচে গিয়েছে।

গাড়ির স্পীড মৃদু করে দিয়ে নিশীথ রাড যেন
উদাসভাবে সামনের আকাশের দিকে তাকায়।
আর, প্রতিভা চোখের উপর চশমাটাকে চেপে দিয়ে
পাশের শালবনের দিকে তাকায়।

দুজনেরই প্রাণ যেন ইন্ধে করে একটা পরিণাম
ভুলে যাবার ক্ষমতা চেষ্টা করতে। দুজনেই ভুলে
গিয়েছে যে, শুধু গাড়িটা আর চশমাটা নয়, নিশীথ
আর প্রতিভার প্রাণ-দুটোও চুরনার হয়ে যেত, যদি
আরও একটু বেশিরকনের আনমনা হয়ে স্টিয়ারিং
ঘোরাতে ভুলে যেত নিশীথ। কিন্তু সেটা যেন
দুর্ঘটনা হতো না; হঠাৎ খেয়ালের আনন্দভার মত
সে-দুর্ঘটনা যেন বেঁচে যাওয়ার মত একটা সুন্দর
পরিণাম হয়ে উঠতো। তাহলে আর এইভাবে, এমন
সুন্দর একটা সকালবেলার আলো-ছায়া, পাখির
ডাকের শব্দ আর শালবনের হাওয়ার ভিতর দিয়ে
ছুটে-ছুটে একটা অগ্নিনিয় পরীক্ষার দিকে এগিয়ে যেতে
হতো না। অদৃষ্টের যত ভটিল প্রেমের জ্বালা বরণ
করবার ক্ষমতা, আর পাগল হয়ে যাওয়ার মত একটা
বিপদের দিকে এরকম অসহায় হয়ে দৌড়তে হতো না।

না, আর বেশিক্ষণ কল্পনা করবার, এবং সামনের
আকাশের দিকে কিংবা পাশের শালবনের দিকে
তাকিয়ে থাকবার দরকার হয়নি। রেল-সাইনের
লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে সামান্য কিছুদূর এগিয়ে
যেয়ে গাড়িটা যখন আরও মধুর হয়ে বাঁ-দিকের
পথে ঘুরে যায়, তখন একটি বাংলা-বাড়ির ফটকের
দু'পাশের দুটি দেওয়ারের প্রকাণ্ড রৌদ্রাক্রম চোখরাও
চোখে পড়ে যায়।

বাংলা-বাড়ির ফটকের সামনে গাড়িটা থামে।
আর, নিশীথ ও প্রতিভা যেন একটা নতুন বিষয়ের
ভারে হঠাৎ অনড় হয়ে শুধু চোখ মেলে দেখতে
থাকে, বাংলা-বাড়ির বারান্দার উপরে যেন দুটি
নতুন ধরনের স্ত্রী মানুষ গায়ে-গায়ে মেখানেনি
হয়ে আর হাসাহাসি করে...

কি করছে ওরা দুজন ? ধীরেন আর সুনয়না ?
একটা টেবিলের কাছে চেয়ারের উপর বসে
আছে ধীরেন। টেবিলের উপর একটা কাগজ।
পেন্সিল হাতে নিয়ে কাগজের উপর কি-বেন লিখছে
ধীরেন। আর সুনয়না ধীরেনেরই চেয়ার ঘেঁষে
পাড়িয়ে টেবিলের সেই কাগজটার কাছে মাথা
তুলিয়ে কথা বলছে। কে জানে, কোন্ স্বপ্নের
আর কোন্ আঙ্কাসের জমা-খরচের হিসেব করছে
ওরা দুজন ?

নিশীথের গাড়িটাকে দেখতে পেয়েই চেয়ার
ছেড়ে বাস্তবাবে উঠে পড়ায় ধীরেন ; আর, সুনয়না
যেন একটা প্রবল খুশির কোয়ারার মত হেসে ওঠে।
—কি আশ্চর্য, সত্যিই তুমি আশ্চর্য করে দিলে,
প্রতিভা।

ধীরেন বলে—কী সৌভাগ্য : আমিও ভাবতে
পারিনি, নিশীথবাবু, আপনি নিজেই কষ্ট করে
একবারে মিসসকে সঙ্গে নিয়ে...

গাড়ি থেকে নেমে নিশীথ আর প্রতিভা এগিয়ে
আসে। ক্যালকাল করে তাকিয়ে যেন এই নতুন
বিশ্বের সুখক সম্মত করতে চেষ্টা করে বিড়বিড় করে
নিশীথ। —তার মানে ?

নিশীথের প্রশ্নটা যেন একটা অবিদ্যমান বিশ্বের
গুণন ! গালুড়ির এই বাংলা-বাড়ির জীবনটা
এ কোন্ ছদ্মবেশ ধরে নতুন রকমের সৌজন্য
সমাদর আর শ্রীতির অভিনয় শুরু করে দিয়েছে ?
এত হাসে কেন ওরা ? এত খুশি কেন ওরা ?

ধীরেন বলে—আনাদেরই উচিত ছিল, একদিন
গিয়ে আপনাদের দুজনকে এখানে এনে, অন্তত
একটু চা খেয়ে যাবার চমত...

চৈতন্য হেসে ওঠে সুনয়না। —বান ধাম, তুমি
ভ্রমতা করতে গিয়ে আনাকে বিপদে কেলছো।

ধীরেন—কেন ?

সুনয়না—আমি যে কালই নিজে কালিকাপুরে
গিয়ে প্রতিভাকে আর নিশীথবাবুকে নেমন্তন্ন করে
এসেছি।

ধীরেন—তাই বল।

নিশীথ হাসতে চেষ্টা করে। —তার মানে,
নেমন্তন্ন না করলে আমরা আসতাম না ?

সুনয়না হাসে। —নিমন্তন্ন আসতেন না। ...তা
ছাড়া...

নিশীথ—কি ?

সুনয়না—নেমন্তন্ন করেও আনার একটা ভয়
ছিল।

নিশীথ—তার মানে ?

সুনয়না—অর্থাৎ, প্রতিভা আসতে পারে বলে
মনে মনে একটা বিশ্বাস ছিল ; কিন্তু আপনি
আসবেন বলে বিশ্বাসই করতে পারিনি।

নিশীথ বোধহয় আবার আরও কিছুক্ষণ আরও
বেশি আশ্চর্য হয়ে সুনয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে
থাকতো। কিন্তু ধীরেনের একটা উল্লাসের ভাবা
শব্দে চমকে ওঠে, আর ধীরেনেরই মুখের দিকে
আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে নিশীথ।

ধীরেন বলে—আর এখানে নয়, নিশীথবাবু।

নিশীথ—কি ?

ধীরেন—এই বাড়ি বেচে দিলাম। চৌহান-
বাবুই কিনে নিলেন। কালকেই বিক্রি রেজিস্টারি
করা হবে।

নীরব হয়ে, আর চোখ দুটো অপলক করে, যেন
প্রচণ্ড একটা কৌতুহলের তোলপাড় শব্দ বুকের
ভিতরে সামলে রেখে শুনতে থাকে নিশীথ, গালুড়ির
ধীরেনবাবু যেন তাঁর জীবনের এক পরম জয়ের তৃপ্তি
গান করে শুনিতে চলেছেন।

—চৌহানবাবু মর দিয়েছেন, মোট ছত্রিশ হাজার
টাকা। আমিও তাইতেই রাজী ; এতেই আমার
সব দেনা মিটিয়ে দিয়ে হাজার পাঁচেক টাকা হাতে
থেকে বাবে।...বাবু, শুভেই হয়ে বাবে।...আপনি
তো জানেন, একটা কোয়ারি আমার লাজ নেওয়া
আছে।...সেখানে আপনিও তো একবার
গিয়েছিলেন, কিসের সালফেট না কার্বনেট খুঁজতে
...হ্যাঁ, সেই গাঁয়ে, সেই করমপুরাতে গিয়ে থাকবো।

কিস্তিতে একটা টাক কিনে নেব। তার পর, একটা বছর খেটেখুটে হু-চারটে ভাল অর্ডার যদি সাপ্লাই করতে পারি, তবে আর কি? ট্রাকের কিস্তি শোধ করে দেব, আর কারবারটাও মোটামুটি ঠাড়িয়ে যাব।...প্রকৃতি? মাসে শ-দুই টাকা হলেই, হয়ে গেল। তার পর...তারপর সুনয়নার হাত। যদি রোজ দুগাঁ-ভাত খাওয়াতে পারে সুনয়না, তবে তাই খাব। যদি, ভাঙ্গা নিমপাতা, জ্বলা কুসের অথল আর ডাল-ভাত খাওয়ায় সুনয়না, তবে তাই খাব।...হ্যাঁ, আর একটা কথা। আপনার টাকাগুলো দিতে খুবই দেরি হয়ে গেল যদিও... সুনয়না বললে মেটে এগারো হাজার টাকা আপনার কাছে থেকে ধার নেওয়া হয়েছে... এইবার সে-টাকটা আপনাকে অন্যায়সে দিয়ে দিতে পারবো।

হো-হো ক'রে হেসে ওঠে ধীরেন। সুনয়না চুপ ক'রে ঠাড়িয়ে আর মাথা হেঁট ক'রে যেন একটা অদৃষ্ট লাজুক-হাসি লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। প্রতিভার সোনার স্ক্রেনের চশমার কাচও যেন কিস্কিক ক'রে হাসে। আর, নিশীথ রায়ের চোখ-জুটো চিকচিক করতে করতে হঠাৎ একেবারে যেন মুক্ত হয়ে যায়।

প্রতিভা বলে—চা খাওয়াবার যে নামও করছে না, সুনয়না? তোমার মতলব কি?

সুনয়না—মতলব হলো, শুধু চা খাইয়ে ছাড়বো না। ছপুর না হবার আগে যেতে পারবে না, আর ভাত খেয়ে যেতে হবে।

ধীরেন বলে—আমি তাহলে এখনই একবার বাজার ঘুরে আসি। থলিটা দাও, সুনয়না।

প্রতিভা হাসছে; প্রতিভার জীবনের বত ভয় অভিমান আর উদ্বেগ কি একেবারে মিথ্যা হয়ে আর লুপ্ত হয়ে গেছে। ঝড়ের ধুলোর মত উধাও হয়ে গেল। প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয় নিশীথ। প্রতিভা যেন সেইসব অদৃষ্ট গল্পের নায়িকার মত, যারা পরীক্ষার অলস অঙ্গার মুঠো ক'রে ধরতে একটুও ভয় পায় না, এবং পরীক্ষার জয়ী হয়ে

নিজেদেরই জুগোহাসিক হাতটার দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে—হাতে একটা কোদাও পড়েনি, কোন জালা জলে না।

ধীরেনবারুও হাসছেন। এই ভক্তলোকের জীবনটাও যে জয়ের গর্বে হাসছে বলে মনে হয়। সুনয়নাকে সঙ্গে নিয়ে করমপুরা নামে এক জ্বলা গায়ে থাকবেন, আর সুনয়নার হাতের রান্না ডাল-ভাত খেয়ে থুগ্ন হয়ে যাবেন। পরশপাথরের মত কি-যেন একটা বস্তু, কী চমৎকার একটা স্বপ্ন কুড়িয়ে পেয়েছেন ভক্তলোক।

সুনয়নাও হাসছে। বর্ষার ঢলে ধোয়া হয়ে গায়ে আবার নতুন রোদ লাগিয়ে যেমন ঝলমল ক'রে হেসে ওঠে শালবন, সেইরকম কলমলে সুখী হাসি। সুনয়নার মুখের দিকে তাকাতো গিয়ে নিজেদেরই চোখের চেহারাটা কিছুনা করতে পারে নিশীথ। নিশীথের চোখ ছাপিয়ে যেন অদৃষ্ট এক তৃপ্তি উল্লে উঠছে। হেসে হেসে প্রতিভার সঙ্গে কথা বলছে যে-সুনয়না, তার মুখের দিকে তাকাতো নিশীথ রায়ের চোখের চাহনি এত তৃপ্ত হয়ে যাবে, এ-যে নিশীথ রায়ের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। নিশীথের চোখ ছুটো যে সুনয়নার মুখের দিকে একটা দল্লভ অভিনন্দনের মত তাকিয়ে আছে।

ঠেঁচিয়ে হেসে ওঠে নিশীথ। —বাঃ, খুব কাণ্ড করলেন আপনারা!

সুনয়না—কিসের কাণ্ড?

নিশীথ—জাঁকিয়ে মুখের সংসার করতে ছকেন করমপুরাতে চললেন; এদিকে কালিকাপুরের অবস্থা যে কাহিল।

সুনয়না—কি হলো?

প্রতিভা বলে—রান্না করবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ, আমাদের রান্না করতে দেখলে ভক্তলোক হেসে হেসে...

নিশীথ—প্রতিভার রান্নাবান্নার রকম যদি আপনি দেখতেন, তবে আপনিও হাসতেন। বেগুন ভাজতে গিয়ে আগে কড়াতে বেগুন ছাড়ি, তারপর তেল।

সুনয়না হাসে। —কি আর করবে বেচারী ?
ওদব কাজের ধার যারেনি কখনো, কিছু শেখেনি :
আর, বেচারী কল্পনাও করতে পারেনি যে, রাশা
করবার একটা লোকও পাওয়া যাবেনা, এমন একটা
ভয়গায়েত্রে এসে ওকে থাকতে হবে।

নিশীথ—তাহলে, আনারই অপরাধ ?

দীরেন বলে—কোন চিন্তা করতে হবে না।
চৌহানবাবুর বাড়িতে রাশা করে যে পাড়ে, তার
ভাইটাই ভাল রাশাবায়া জানে। আমি ওকে ঠিক
ক'রে দিচ্ছি। মাইনে পঁচিশটাকা, খাওয়া : আর
বছরে একজোড়া ধুতি আর একজোড়া গানছা।

সুনয়না—একটা খি-এর কথা বলেছিলেন, মনে
আছে তো ?

প্রতিভা—হ্যাঁ।

সুনয়না—করমপুরা যাবার আগেই আমি সেই
খি-টাকে হোনার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দেব।

নিশীথ—না, এবার এককাপ চা না হলে
আর...

সুনয়না—এখন হয়ে যাবে...এস, প্রতিভা।

দীরেন—আমি বাজার ঘুরে আসি, কেমন ?

সুনয়না—এস।

নিশীথ—আমি একবার চট্ট ক'রে ঘাটশিলা
ঘুরে আসি।

প্রতিভা রাগ ক'রে তাকায়। —ঘাটশিলাতে
আবার কিসের কাজ ?

নিশীথ—ঠিক কাজ নয়, একটা অসুস্থের রাখবার
কাজ। যাবে, শুধু আধখন্টা থাকবে, আর কিরে
আসবে।

সুনয়না হাসে। —যান যান। কোন
ঠিকাদারের কাছ থেকে ঘুস খেয়ে আসবেন না,
তাহলেই হবে।

নিশীথও হাসে। —ঘুস খাওয়ার মত চরিত্রের
কোর যদি থাকতো, তবে তো ধরসোয়ান-
ম্যাকিনিজের বিকৃতির মত একদিনে প্রায় লাখ-
খানেক টাকা...খাঙ্গে ওদব বাজে কথা।

ঘাটশিলাতে গিয়ে আধখন্টার মধ্যে বে-কাছটা
সেরে দিয়ে চলে আসবে বলে মনে করেছে নিশীথ,
সেটা সত্যিই কোন কাজ নয়। কালিকা-মাইনেসের
স্টোরবাবু রমেশের বাবা ত্রিলোচনবাবুর জ্ঞানের
নিমন্ত্রণ। রমেশ বার বার অচুনয় করে বলে
গিয়েছে—একবার দয়া করে গরীবের বাড়িতে
যাবেন, স্তার।

রমেশের বাড়ি ঘাটশিলা, চাকরি করে
কালিকাপুরে। রমেশের বাড়ির যা অবস্থা, এবং
পৈতৃক সম্পত্তি বলতে যা আছে, তাতে রমেশের
চাকরি করবার কোন দরকারই ছিল না। তবু চাকরি
করে রমেশ। এবং, নিশীথ জানে, চরিশ টাকা মাইনে
পেয়েই স্টোরবাবু রমেশ খুশি ; দু'ত ঠিকাদারগুলো
রমেশকে খুশি করবার জন্ত কতবার সেখেঁচে, কিন্তু
রমেশ শুধু ঠিকাদারগুলোকে মুখ খুলে গালাগালি
দিয়ে খুশি হয়েছে। একটাও অস্ত্রার পরসাদা স্পর্শ
করেনা রমেশ। তাই বোধহয় রমেশকে একটু বেশি
পছন্দ করে নিশীথ।

ঘাটশিলা যাবার পথে গাড়িটা উদ্দাম হয়ে
ছুটতে থাকে, কিন্তু নিশীথ রায়ের হাত আর কোন
ভুল করে না। অনেক কথা মনের ভিতরে তোলপাড়
করতে থাকলেও আনমনা হয়ে যায় না। এবং, কেন
যেন বার বার বিকৃতির কথাই মনে পড়ে। আরও
মনে পড়ে, বিকৃতির চরিত্রের বেশ সুনাম আছে।
বিকৃতির সেই চরিত্রের খ্যাতি জেঠামশাই পর্যন্ত
গুনেছেন ; বিশ্বমুখ মানুষই বোধহয় গুনেছে।

বিকৃতির সঙ্গে একদিন তো দেখা হবেই।
ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায়, আর মনে মনে একটা
অস্বস্তির হাদিও হেসে ফেলে নিখিল। নিখিলের
পাশে প্রতিভাকে দেখতে পেয়ে বেচারী বিকৃতির
চোখ দুটো বোধহয় শিউরে উঠবে। নিখিলকেও
একটা ঘুগার জীব বলে মনে করবে ; মুখ ঘুরিয়ে
নিরে আর কোন কথা না বলেই চলে যাবে।
নিখিলের জীবনকে একটা অন্তর্গত বিভীষিকার
বিলাস বলে মনে করবে, কিংবা, মনে মনে ঠাট্টা

ক'রে একটা শিকারের হাসি লুকিয়ে স্বেলবার চেষ্টা করবে বিহুতি। বাঃ, বেশ হয়েছে। যেমন 'দেবা' তেমনই 'দেবী'। নিখিলের মত মানুষের সঙ্গে প্রতিভার মত নারীকেই মানায়। না প্রতিভা, না নিখিল, দুজনের কেউই পৃথিবীর কোন শুচিভাষ্য জীবনের মানুষকে ঠকাবার সুযোগ পেল না; সাধিই হলো না। বেশ ভাল হলো। তাবতে গিয়ে একটা নিশ্চিন্ততার হাঁপ ছাড়বে বিহুতি।

চরিত্রহীন মানুষের প্রতি বিহুতির ঘৃণা যেমন ভয়ানক, চরিত্রশীল মানুষের প্রতি বিহুতির মায়াও তেমনই ভয়ানক। আজও মনে করতে পারে নিখিল, নিরীহ ও নির্দোষ চরিত্রের মানুষকে আরও কতবার এইভাবে রক্ষা করেছে বিহুতি। কলেজের ছাত্র ছিল যখন বিহুতি, তখন ইংলিশের লেকচারার অনিয়মাব্যুৎক ঠিক এইরকম একটা ভয় থেকে রক্ষা করেছিল। মজু নামে খাট-ইয়ারের যে ছাত্রীটির সঙ্গে অনিয়মাব্যুৎক বিয়ের কথা একেবারে পাকাপাকি হয়েছিল, বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছিল, সেই ছাত্রীটির জীবনের কয়েকটা আশ্চর্য-রকমের গোপন ঘটনার বৃত্তান্ত যোগাড় করতে পেরেছিল বিহুতি; এবং অনিয়মাব্যুৎক জানিচ্ছেও দিয়েছিল। একটিও মিথ্যে কথা বলেনি বিহুতি। ঐ মজু নামে ছাত্রীটি বছর চারেক আগে বাড়ির মাস্টারের সঙ্গে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল, এবং প্রায় একবছর পরে বাড়ি ফিরেছিল। ঘটনাটা হলো কানপুরের। কি আশ্চর্য, প্রায় চার-পাঁচবছর আগের সেই কানপুরের একটা ঘটনার বৃত্তান্ত কলকাতাতে বসেই যোগাড় করতে পেরেছিল বিহুতি।

নিখিল এবং আরও কেউ-কেউ বিহুতিকে একটু অসুযোগও করেছিল—এসব ব্যাপারে তোমার এত ইন্টারেস্ট না থাকাই ভাল, বিহুতি। একটা মেয়ের বিয়ে ভেঙে দিয়ে তোমার যে কি লাভ...

বিহুতি বলেছিল—সত্যিই আমি হুঃখিত। কিন্তু, উপায় নেই। বেচারী অনিয়মাব্যুৎক কাছেও

তো আমার একটা কর্তব্য আছে। অনিয়মাব্যুৎক মত একজন শুদ্ধ ও সজ্জন মানুষের স্ত্রী হবে মজু নামে এরকম একটা...একটিই নি, নিখিল—

আমরা বলেছিলাম—কিন্তু তুমি তো আর চিরকাল মজুর বিয়ে বন্ধ করে রাখতে পারবে না। আজ না হোক—কাল, অনিয়মাব্যুৎক না হোক—অল্প কোন ভুলোকেদের সঙ্গে মজুর বিয়ে হয়ে যাবেই।

বিহুতি—হ্যাঁ, হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি আমি সে-খবরও কোনদিন পাই, যেদিনই পাই না কেন, তখন একবার দেখে নেব।

—খ্যা! বিহুতি এবং আরও কোন-কোন বন্ধু আতঙ্কিতের মত চমকে উঠে প্রশ্ন করেছিল।

বিহুতি—হ্যাঁ, চরিত্রের ক্ষত লুকিয়ে, আর একটা সজ্জন মানুষের বিশ্বাস ঝাঁক দিয়ে যদি কোন মানুষ বিয়ে ক'রে কোলে, তবেই বা তাকে ক্ষমা করবো কেন?

নিখিল—কি করবে তুমি?

বিহুতি—জানিয়ে দেব। স্বামী কিংবা স্ত্রী, যে বেচারী ঠকবে, তাকে সব খবর জানিয়ে দেব।

নিখিল—স্বামী-স্ত্রীর জীবনে মিথিমেই একটা অশান্তি এনে দেবে?

বিহুতি—এরকম অশান্তি হওয়াই যে ভাল। ওটা প্রায়শ্চিত্ত, এবং ওতে ফল ভালই হবে।

নিশীথ—ফল ভাল হবে কেমন করে?

বিহুতি—হয় ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, নয় ভালবাসা ভেঙে যাবে।

নিশীথ ভয় পেয়েছিল। —তোমার মনটা তোমার চরিত্রের মতই শক্ত।

বিহুতির চোখ দুটো ফেঁসে উঠেছিল। আমি তাই চাই। এবং এখানেই বোধহয় তোমার ও আমার প্রভেদ।

সেদিন ভয় পেয়েছিল, কিন্তু রাগ করতে পারেনি নিশীথ। এবং আজও ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়; আজও যে রাগ হচ্ছে না। বেচারী নিখিলের মনটা এমন কঠোর বলেই তো

প্রতিভাকে আজ বুকের কাছে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য চলেছে নিশীথের। আঃ, সারাটা রাত কেমন নিদ্রা হয়ে নিশীথের বুকের কাছে মাথা ঠেলে দিয়ে ঘুমিয়ে হইল প্রতিভা : যেন কত শত বছরের একটা চেনা আত্মার শান্তি তৃপ্তি আর নিবিড়তার মধ্যে একেবারে নিশ্চিত হয়ে জীবনটা ধরে নিয়েছে প্রতিভা। বার বার হিনবার প্রতিভার সেই ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়েছিল নিশীথ।

আজ বিহুতির সঙ্গে যদি একবার ধীরেনবাবু আর হুময়্যার দেখা হয়ে যায় ? নিশীথের বুকের সব নিঃশ্বাসের বাতাস যেন এক বিপুল কোঁচকের আবেগে নেচে ওঠে। হেসে ফেলে নিশীথ। মধ্যে লজ্জিত হবে কি বিহুতি ? কিংবা আশ্চর্য হবে ? হুময়্যারক সত্যিই বাঁচিয়ে গিয়েছে বিহুতির চিঠির সেইসব অভিযানয় অভিযোগ। হুময়্যার অদৃষ্ট যে একটা পুণ্যমান দেরে নিয়ে ধীরেনবাবুর জীবনে নতুন আশীর্বাদ হয়ে ধরা গিয়েছে। বাঃ, বেশ করেছে বিহুতি। মনে হয়, খার্ড-ইয়ারের ছাত্রী সেই মজুর জীবনও এখন তার স্বামীর ভালবাসার সান্নিধ্য হয়ে এইরকম একটা মহা-বনের দ্বিধা ছাড়ার পাশে...

হ্যাঁ, নৌরবাবু রমেশের বাড়িটা দেখা যায়। সড়কের দু'পাশে এই ছোট ছোট দুটো মহায়াগাছের দ্বারা পায় হয়ে গেলেই রমেশের বাড়ির বাগানের কাছে পৌঁছে যাবে নিশীথের গাড়ি।

কী কাণ্ড করেছে রমেশ ! সারা বাগান জুড়ে কতবড় একটা মণ্ডপ। মণ্ডপের সোনালী কালর বাতাসে উড়ছে আর চিকচিক করছে। রমেশের বাবার শ্রাদ্ধবাসর, যেন একটা মহামেলা কিংবা মহোৎসবের আসর। মণ্ডপের প্রবেশপথে সত্যি-কারের ছুটি সোনার কলস রাখা হয়েছে ; তার উপর আত্মপল্লব আর নারকেল। বাগানের পশ্চিম দিকের একটা বড়দান গাড়ির পার্কিং-এর জায় খড়ি দিয়ে দাগিয়ে রাখা হয়েছে। অনেক গাড়ি এসেছে। আসবেই তো, রমেশের বাবা ত্রিলোচনবাবু বলতে

গেলে একজন সিবিজরী কন্ট্রাস্টার ছিলেন। এবং টাটানগর ও তার আশ-পাশের যে-কোন গণ্যনাঙ্ক ও সম্মানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এক টাটানগরেরই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যা একশতেরও বেশি। এই কথা রমেশের কাছেই শুনেছিল নিশীথ।

রমেশও এসে এবং হেসে হেসে বিনীতভাবে বলে—আনি ঠিকই বলেছিলাম, স্তার। টাটানগর থেকে ঠিক একশত জন রেসপন্সেবল এসেছেন। সবমুহুর্তে গাড়ি এসেছে গ্রিনেশর ওপর। ওঁরা যে বাবাকে বড় ভালবাসতেন, স্তার !

মণ্ডপের ভিতরে ঢুকতেই দেখতে পায় নিশীথ, হাজারেরও বেশি নিমন্ত্রিত সম্মান বসে আছেন। রমেশ বলে—এখন শুধু কীর্তন ; বেলা দুটো পর্যন্ত কীর্তন চলেবে। বিকেলে ভাগবত-পাঠ। আর সন্ধ্যার পরেই যাত্রা—“বিধবঙ্গল” গাওয়া হবে। খুব ভাল যাত্রা-পাঠি আনিয়েছি, স্তার।

নিশীথ হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে—এবার আমি চলি, রমেশ।

রমেশ অমুনর করে—বিচ্ছুকণ থেকে যান, স্তার !

রমেশের অমুনয়ের বিনিময়ে আর একবার হেসে শুধু বলতে হবে—না, উপায় নেই, রমেশ। আমাকে এখনি গালুড়ি ফিরতে হবে। এই সামান্য কয়েকটা কথা বলে অন্যরাসে এই মুহূর্তে আবার গালুড়ির দিকে ছুটেতে পারতো নিশীথ ; কিন্তু একটু আশ্চর্য হয়ে দূরের ভিড়ের একদিকে তাকিয়ে বলে ওঠে নিশীথ—জ্যেষ্ঠামশাই এসেছেন দেখছি—

হ্যাঁ, রমেশের বাবার বন্ধু ডাক্তার হরপ্রসাদবাবুও মাঝি থেকে এসেছেন, এবং নিশীথকে দেখতে পেয়েই নিশীথের দিকে এগিয়ে আসছেন।

রমেশ—আপনি তাহলে একটু বসুন, স্তার, আমি অস্থানিকের ডিউটিগুলি একটি একটি করে...

নিশীথ—হ্যাঁ।

চলে যায় রমেশ ; এবং জ্যেষ্ঠামশাই হস্তদণ্ড হয়ে

এদিয়ে এসে নিশীথের কাছে লাড়ান। তার পরে আসরের একদিকে চেয়ারের উপর প্রায় গড়িয়ে পড়ে থাকে। প্রকাণ্ড চেহারার এক ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বিরক্তভাবে বিড়বিড় করেন—ঐ যে হাসছে, ঐ যে প্রকাণ্ড-চেহারা ভদ্রলোক, বুকে সোনার চেন বুলছে, ঐ ভদ্রলোক হলো রাজপোখরার সেই অভদ্রচার কুটুম।

নিশীথ হাসে—তাতে আপনার কি? আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন?

জ্যোত্মশাই—হ্যাঁ...বিরক্ত হবার কোন দরকার ছিল না; কিন্তু সত্যিই বিরক্তি বোধ করছি। লোকটা আবার চেষ্টা করে ভাগীর বিয়ের কথা বলে লেকচার দিচ্ছে।

—কে ওঁর ভাগী?

জ্যোত্মশাই—ঐ তো...শীতল সরকারের মেয়েই তো ওর ভাগী। শীতল সরকারের মেয়ের বিয়ে ঠিক করে এইমাত্র উনি খরসোয়ান থেকে কিয়দেহে...যাক্কে, এসব কথার সঙ্গে আমাদের এখন আর কোন সম্পর্ক নেই...প্রতিভা কেমন আছে?...শিবদাসবাবুর চিঠি পেয়েছে?

নিশীথ মাথা নাড়ে। প্রতিভা ভাল আছে, এবং শিবদাসবাবুর চিঠি প্রায় রোজই আসে। জ্যোত্মশাই ব্যস্তভাবে বলেন—আমি এখনই টাটা ফিরবো, নিশি।...তুই কি এখন...

নিশীথ—আমি এখন গাধুড়ি যাব।

চলে গেলেন জ্যোত্মশাই, এবং নিশীথ যেন একটা অবিখ্যাত কাহিনী শোনবার লোভ সামলাতে না পেরে, আস্তে আস্তে হেঁটে, আসরের বড় চেয়ারের এক একটা সারি পার হয়ে সেই প্রকাণ্ডকায় ভদ্রলোকেরই কাছে একটি চেয়ারের উপর এসে বসে।

শীতল সরকারের মেয়ের মামা, সেই প্রকাণ্ডকায় ভদ্রলোক তাঁরই পাশের চেয়ারে আসীন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

—যাক্, শেখপর্দা পাতকে রাজী করাতো

পেরেছি। এক কথায় কি ওরকমের একটা জাঁকরেল পাত্র রাজী হয়, মশাই?

—পাত্র মশাই কি করেন?

—খরসোয়ান-ম্যাক্সানিভের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। যেমন শিক্ষিত, তেমনই কঠোর চরিত্র।

—তার মানে?

—তার মানে, আজকাল এরকম খাটি চরিত্রের ইয়াং-ম্যান আপনি ভূতরতে পাবেনই না। সেই জগ্জেই তো প্রায় হাতে-পায়ে ধরে সাধতে হয়েছে।

—বুঝলাম না।

কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ খেঁদে বান শীতল সরকারের মেয়ের নাম। প্রকাণ্ডকায় সেই ভদ্রলোক। বুকের সোনার চেনে হাত বুলিয়ে নিয়ে নিশীথের দিকে একবার সন্দ্বিষ্টভাবে তাকান। তার পর নিশীথকেই প্রশ্ন করেন—মশাই—এর কি কোন অসুবিধা হচ্ছে?

নিশীথ—কেন?

—আমরা একটা প্রাইভেট বিষয়ে আলোচনা করছি বলে?

নিশীথ—না।

এইবার নিশীথের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করেন প্রকাণ্ডকায় ভদ্রলোক। —হ্যাঁ...কি বলছিলেন? কেন পাত্রকে হাতে-পায়ে ধরে সাধতে হয়েছে?

—হ্যাঁ।

শীতল সরকারের মেয়ের মামা গলার স্বর শুধু করে ফেলেন। —আপনার কাছে খুলে বলতে আপত্তি নেই। একটা সমস্যা ছিল...অর্থাৎ ভাগীটি এক চরিত্রহীন যুবকের সঙ্গে প্রেম করে বসেছিল।

—এ তো ভাল কথা নয়—

—ভাগীর কোন দোষ নেই। বোচাচী জানতোই না যে, ছেলটির চরিত্রে দোষ আছে।

—যাই হোক, না ছেনে-তুনে ভুল করেও তো প্রেম করেছে?

—হ্যাঁ ; কিন্তু শুধু চিত্রিতে । বিশ্বাস করুন, শুধু চিত্রি । শারীরিক কোন ইয়ে-টিয়ে... একেবারেই না । একবার সেই-যে ট্রেনের মধ্যে ছুড়নের দেখা হয়েছিল, তারপর আর ছুড়নের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎও হয়নি ।

—পাত্র না-হয় রাজী হলো, পাত্রী কি বলে ?

—পাত্রী আগেই রাজী হয়েছে । বলানাত্র রাজী হয়েছে । না হয়ে কি পারে, মশাই ! মেয়েটার এরকম একটা উপকার করলো যে, তার ওপর একটা স্বাক্ষর ভাব...

—একটা কৃতজ্ঞতার ভাবও...

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় । আমার কাছেই বলতে-বলতে কৌশল ফেলেছে মেয়েটা, বিভূতিবাবুর মত মানুষ কি রাজী হবে, মানা ? আমি তরঙ্গ দিয়ে এসেছিলাম, রাজী করাবোই ।

—বেশ ভাল হলো । শীতলবাবুও একটা মনস্তাপের কারণ থেকে বেঁচে গেলেন ।

—গেলেন বৈকি । এই দেখুন, আনাকে অনুরোধ ক'রে কী চিঠি লিখেছিলেন শীতলবাবু ।

শীতল সরকারের মেয়ের নাম। পকেট থেকে একটা চিঠি বের ক'রে নিয়ে পাশের ভহ্নলোকের হাটুর উপর রেখে ফিসফিস করেন । —এই নিয়ে পাঁচ বার হলো, শীতলবাবুকে আমি একটা পারিবারিক বিপদ থেকে বাঁচালাম ।

হঠাৎ হাতের ঘড়ির দিকে ডাকিয়েই একটা লাক দিয়ে উঠে গাড়ীর নিশীথ : তারপরেই হনহন ক'রে হেঁটে আসরের ভিত্তির কলরব, মৃদঙ্গের শব্দ আর যত মতপের সোনালী কাগরের ঝিকিমিকি উল্লাসের কাছ থেকে সরে গিয়ে সোভা নিজের গাড়িতে গিয়ে বসে । ফাঁট নিতেও পেরি করে না । আবার ছোট মন্থাবনের ছায়া পার হয়ে গালুড়ির দিকে ছুটতে থাকে নিশীথের গাড়ি, এবং সেই সাথে

নিশীথের জীবনের একটা বিশ্বয়ের হাসি । বাঃ, বেশ ভাল হলো । শেব পর্যন্ত নীরাজিতারও হৃৎকরবার কিছু রইল না । নীরাজিতার জীবনকে নিশীথের মত মানুষের স্পর্শের ভয় থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে যে, তারই কাছে কৃতজ্ঞ হয়েছে নীরাজিতা । হওয়া উচিত । বিভূতির স্বস্তি স্বস্তি জেগেছে নীরাজিতার মনে । ভাল হয়েছে । বিভূতির জীবনের সঙ্গিনী হয়ে ধন্য হতে চায় নীরাজিতা । হবে বৈকি ।

এতক্ষণে যেন নিজেকে ক্ষমা করতে পারে নিশীথ । নীরাজিতারও কোন কন্ঠি হলো না । বরং, নীরাজিতা এখন নিজেরই সৌভাগ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে যে, বিভূতির মত মানুষের জীবনসঙ্গিনী হয়ে সুখী হওয়া অসম্ভবের দেখা ছিল বলেই বোধহয় নিশীথ রাতের চরিত্রটা ঘৃণা হয়ে উঠেছিল ।

বেল-লাইনের লেভেল-ক্রসিং পার হবার সময় আর-একবার হেসে ফেলে নিশীথ । —নীরাজিতা বোধ হয় এখন মনে মনে নিশীথ রায় নামে শুচিতাহীন রক্তমাংসের একটা মানুষকে, একটা অধঃপতিত চরিত্রকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে । একটা হৃৎকরিত মানুষের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থাটা ভেঙে গেল বলেই-না নীরাজিতা বিভূতির মত মানুষের জীবী হবার সৌভাগ্যটাকে পেয়ে গেল ।

বাংলা-বাড়ির ফটকের কাছে গাড়ি থামিয়ে, আর দেওয়ানের ছায়া পার হয়ে ভিতরে ঢুকেই চেষ্টা করে হেসে ওঠে নিশীথ—নীরাজিতার বিয়ে ।

মুননা আর প্রতিভা একসঙ্গে মৃৎ ফিরিয়ে ডাকায় । এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে পাশের ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে ধীরেন ।

নিশীথ বলে—বিভূতির সঙ্গে নীরাজিতার বিয়ে ।

(কন্ঠ্য)

প্রজাতন্ত্র-দিবস ক্রোড়পত্র

অগ্রগতির পথে পশ্চিমবঙ্গ

রুজিত মুখোপাধ্যায়

বিশেষী শাসনের মরণশয্য ভারত থেকে অশস্ত হোলো। ১৯৪৭ সালে। ভারত আবার জগৎসভায় আসল নিলো। সার্বক হোলো স্বাধীনতার উচ্চারণের মুক্তিযোদ্ধা তরুণদের আত্মবলি। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর নক্ষর দেওয়া হোলো পুনর্গঠনের দিকে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে এবং জীবনব্যবহার মান উন্নত করার দিকে। হ্রশো বছরের বিশেষী শোষণের ফলে দেশের সম্পদ অনেক চলে গিয়েছে বিদেশে। সেই ক্ষত সার্বকতার পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা চাই বহু অর্থ, বহু জ্ঞান এবং বহু ধৈর্য। সেই কাজে সরকারের সঙ্গে ছাত্র মিলিয়েছেন দেশবাসী। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় দেশ আরো এগিয়ে যাবে এই আশাই মাঝে লোকের মনে। স্বাধীনতার পর দশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে অনেক কিছু

উজ্জ্বল কাম করা হয়েছে দেশের মঙ্গলের ক্ষেত্রে, দেশবাসীর মঙ্গলের ক্ষেত্রে। বিগত দশ বছরের মধ্যে সব থেকে স্বতন্ত্র দিন ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি। যে দিনটিতে ভারতবর্ষ নিজেকে ঘোষণা করলো ‘সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র’ হিসেবে। এই দিনটি জাতীয় জীবনে গৌরবের দিন। কালের বাতাস অজান্তে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমান ভালে পা ফেলে আমরা যে এগিয়ে চলেছি তারই স্মরণীয় প্রতীক এই দিনটি। এই দিনটিতে আমরা নতুন করে শপথ নিই— দেশকে বড়ো করে তুলবার ক্ষমতা বে বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন—সে-প্রচেষ্টায় আমাদের স্বাধীনতা নিয়েগের। তাই এই দিনটির পরিপ্রেক্ষিতে গত দশ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির একটি ছবি তুলে ধরা হোলো এখানে।



সোনারপুখ-আমগাঁও রেলবিভাগী পরিচালনার সাপেক্ষে কলসের শ্রুতি



বায়-বিবাহের ক্ষেত্রে প্রতিকরণ ঘাটী কাটছে

সবস্বাক্ষরী রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে অন্য নেই সমস্তার। সব সমস্তার সমাধান কোনো মন্ত্রলে সাতারাত্তি হওয়া সম্ভব নয়। এর ক্ষেত্রে প্রয়োজন শ্রম ও সহযোগিতা, ঐশ্বর্য ও ত্যাগ। নানারকম প্রতিদ্বন্দ্ব অসহ্যার সঙ্গে হুঁতগোয়ার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে বেতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গকে। সব সমস্তার সমাধান করা সম্ভব না হলেও, ভারতের সামগ্রিক উন্নতির পক্ষে পশ্চিমবঙ্গও এগিয়ে চলেছে অজান্তে রাজ্যের সঙ্গে সমান পক্ষেপে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিসংখ্যান এবং জাতীয়-উন্নয়ন-কার্যসূচির দরুন এ রাজ্য উৎসাহনের দিক থেকে অনেক উপকৃত হয়েছে। বিরাট জাতিগঠনের দিক থেকে এই কৃতিত্ব বহিঃ সূচনাধার, তবুও পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ বা অবিশ্বাস দূর করার পক্ষে যথেষ্ট। পূর্তাতালভের সীমারেখা থেকে দূরে থাকলেও অগ্রগতির পক্ষে যে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে নেই তার প্রমাণ পাওয়া বাবে স্বাধীনতালভের পর গত দশ বছরের উন্নয়নমূলক কার্য-কলাপের তথ্যাদি থেকে।

পাথ

বাংলাদেশ একদর সারা ভারতের শক্তাওগার ছিল। কিন্তু দেশবিভাগ ও ক্রমাসত জনসংখ্যা-বৃদ্ধির কলে

অবস্থাস্তর ঘটলে শক্ততাদমা বাংলাদেশের। যে রাজ্য সারা দেশকে চাল সরবরাহ করে খুদা বিটিয়েছে দেশবাসীম, সেই রাজ্যকেই হাত পাততে হয়েছে অয়ের ক্ষেত্রে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে এক কোটি একর জমিতে শাকশস্ত্র চাব করা হোতো এবং মাঘাশিষ্ট ০.৪ একর জমিতে শাকশস্ত্র উৎপন্ন হোতো। পরবর্তী কয়েক বছর শাকশস্ত্রে বিরাট ঘাটতি পড়ায়, একই জমিতে অধিকতর শাকশস্ত্র উৎপাদনের চেষ্টা চলে এবং বাইরে থেকে শস্ত আমদানি করে ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সাপ্তাহীক তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে, ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৩৬ লক্ষ টন চাল উৎপন্ন হয়েছিল এবং এই ফলসার ১৯৫৬-৫৭ সালে চাল উৎপন্ন হয়েছে মোট ৪৩ লক্ষ টন। এর থেকেই অবস্থাস্তরের কিছুটা আভাস পাওয়া বাবে।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে অনেক। জনস্বাস্থ্যসেবার ব্যাস্তার উন্নতির ক্ষেত্রে নানাবিধ কল্যাণকর ব্যবস্থা করার ও-রাজ্যে দৃষ্টির হার অনেক কমে গিয়েছে। হুসনামূলক ভাবে

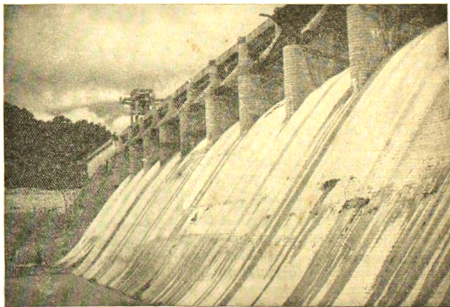
বেলা যায়, ১৯৪৮ সালে বেখানে চুড়ার হার ছিল হাজারে ১৮'১, সেখানে ১৯৪৮ সালে চুড়ার হার হাজারে ৮'২-এর নৈসে এসেছে। এ ছাড়া অধিকতর সংখ্যায় রোষীলের চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। হিসেব নিয়ে দেখা যায় যে, ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা-সংখ্যা ছিল ১৩,৪৭২, সে সময় ১৯৪৮ সালে শয্যা-সংখ্যা বেড়ে ১৮,৬৪৫ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৮ সালে মাত্র ৩টি গ্রাম-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল, বর্তমানে ৩,৩০০ শয্যা সমেত যেটি ২৮২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রামাঞ্চলে কাজ করছে। গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা-ব্যবস্থা সম্ভারনের জন্যে কলকাতা ও বঙ্গ রোগে চুড়ার হার খুব কমে গিয়েছে এবং রাস্তা থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে গত দশ বছরে রোগনির্ধর ও চিকিৎসার প্রসার, হাসপাতাল স্থাপন এবং চিকিৎসক ও পরিবেশিকার উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিল্প ও শিক্ষা

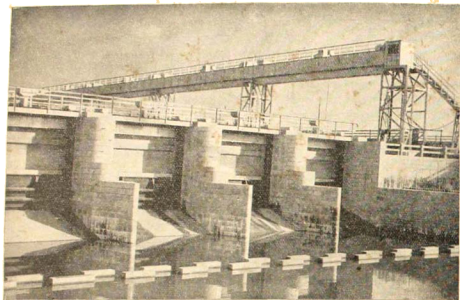
পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নতির দিকে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। রাডো বেকার-সনাক্ত সমাধানের জন্যে

বড় শিল্প খাতে চোট শিল্প ও কৃষি-শিল্পের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারে তার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। বড় শিল্পের মধ্যে হুগলিপুত্রে সোডা ও ইস্পাতের কারখানা এবং কোক-চুরি সর্বস্বত্ব। এগুলির কাজ অতি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। গ্রান্ডে বেকার-সনাক্ত দূর করার জন্যে চোট শিল্প ও কৃষি-শিল্পের প্রবৃদ্ধি ও সম্ভারন একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্যে তাঁতশিল্প, চোবড়ার কাজ ও কাশ-পিতলের কাজের উন্নতিকল্পে নানাবিধ পরিকল্পনা করা হয়েছে। উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্যে হাওড়ায় ১৬২টি চোট ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা একত্রে স্থাপন করা হচ্ছে এবং গ্রামাঞ্চলে গ্রামবাসীদের শিল্প-শিক্ষা-কর্মক্ষেত্রে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থার ও শিক্ষা-প্রণালীর আমূল পরিবর্তনের জন্যে চেষ্টা হচ্ছে। বার্ষিক শিক্ষালাভ করা উচিত তাদের সকলকেই শিক্ষাদান এর উদ্দেশ্য। সপ্তাহীত তথ্যে দেখা যায়—১৯৪৭-৪৮ সালে বেখানে পশ্চিমবঙ্গে ১৪,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, সেখানে ১৯৪৮-৪৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয়েছে ২৩,০০০ এবং গত দশ বছরে ছাত্রসংখ্যা ১২ লক্ষ থেকে ২২ লক্ষে পৌঁছেছে।



সম্প্রতি সমাপ্ত 'বহুমুখী পরিকল্পনা' অন্তর্গত কানাক-ধারের একদল



বঙ্গদ্বীপ পরিষ্কারের অন্তর্গত ত্রিশগাড়া-ঘাট

উচ্চ-বিভাগের সংখ্যা ১১৪১-৪৮ সালে ছিল ১,১০০; ১৯৫৬ সালে হয়েছে ৩,১১০। পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি অনুযায়ী উচ্চ-বিভাগের শিক্ষাকাল ৮শ বছরের জায়গায় এগারো বছর করা হয়েছে। যথেষ্ট কমেই ইন্টারমিডিয়েটের কোনো কোনো পাঠ্যবিষয় খুণেই পড়ানো হবে। তারপর কয়েকে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তিন বছরে ডিগ্রী লাভ করতে পারবে। এ ছাড়া কয়েকটি উচ্চ-বিভাগকে 'সদার্বাসাধক' বিভাগে পরিণত করা হচ্ছে যাতে ছাত্রেরা নিকেষের মনোমতো কলা ও ছাত্রের কাজ শিখতে পারে। এর কালে তারা তাদের পছন্দমতো জীবিকা অর্জন করতে পারবে ভবিষ্যৎ জীবনে।

সেচ, কৃষি ও পশুপালন

'বঙ্গদ্বীপ জলাধার' পশ্চিমবঙ্গের সব খেত বড় এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জলসেচ-পরিষ্কার। এই পরিষ্কার ১৯৫৪-৫৬ সালে সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এর ব্যয় ৬,০০,০০০ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিষ্কারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরিষ্কার—সোনালপুর-আরাপাঁচ অলিনাকী পরিষ্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

এর ব্যয় ১০৫ বর্গমাইল জলাকমি চাষের ক্ষেত্রে উদ্ধার করা হবে এবং ইতোমধ্যেই অনেকখানি জমিতে চাষ চলেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিষ্কার অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে যে ১১৭টি ছোট সেচ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হয়েছে, সেগুলি ব্যয় ১১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ চলবে। এ-ছাড়া সোনালপুর-আরাপাঁচ পরিষ্কারের দ্বিতীয় পর্যায় এবং বাগজল-মুনি-বাতাগাছি কর্মসূচির কাজও শুরু এগিয়ে চলেছে। কাজ শেষ হলে, ৪০ হাজার একর জলা ও পতিত জমি চাষের উপযোগী হয়ে উঠবে। মোটের উপর বঙ্গদ্বীপজলসেচের পর পশ্চিমবঙ্গে ২০০টি ছোট-বড় সেচের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ১২ লক্ষ একর চাষের জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি ও পশুপালন সম্বন্ধে বহুবিধ উন্নতি-সাধন করা হয়েছে। উচ্চাঙ্গের আধুনিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক ও অন্যান্যবিধ উন্নত সার ইত্যাদি কৃষকের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। উন্নত ধরনের বীজ, উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থাপন এবং পতিত জমি উদ্ধার প্রকৃতি গঠনমূলক কাজ করে উৎপাদন-বৃদ্ধির চেষ্টা চলেছে। চাষের ক্রিয়াকর্ম শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে তা বেশ বোকা খার ফসল-বৃদ্ধি পরিমাণ দেখে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিষ্কারের

সেবাদাশে দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে জাপানী প্রণয় ধানচাষ দেখানো হয়েছে এবং ৩৮ লক্ষ একর জমি জাপানী প্রণয় চাষ পথে দেখানো হয়েছে যে, এই প্রণয় প্রতি একরে কতটা বাড়তি ফল পাওয়া যায়।

সবচেয়ে বড় কাজ হয়েছে, ভবিষ্যতী-প্রথা উচ্ছেদ করে কৃষকে জমির প্রকৃত মালিক করা। এ ছাড়া পশুপালন বিষয়েও বড় কাজ করা হয়েছে। গ্রামের পশুপালনের উন্নতিকল্পে হুগলিন্দনের জন্তে ডালো জাতের খাঁড় হুগা হয়েছে গ্রামে গ্রামে। দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে নয়া কৃষি-প্রজনন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। জার্মানি ভবিষ্যৎ সংস্কারের বায়োটিক্সের জন্তে চাই খাতি হুগ। তাই হুগের কলিকাতায় হুগ সববাহ্য করবার জন্তে হরিণখাটায় প্রতিষ্ঠিত হুগ-উপনিবেশটিকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দৈনিক ৪০০ যণ বীজাঙ্ক-মুক্ত হুগ হরিণখাটায় থেকে বিক্রী হয়। এ ছাড়া কলিকাতা থেকে অবাধ্যকর বাটালসমূহ উচ্ছেদ করে গরুজনিক হরিণখাটায় নিয়ে যাওয়া, কল্যাণীতে একটি ৩,০০০ একর ঘাসের ক্ষেত তৈরি এবং কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় ডেরার স্থাপন করে দৈনিক ৪ লক্ষ পাউন্ড মূল্যে বোতলে ভর্তি করে বিক্রী করার জন্তে একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

রাস্তাঘাট ও বাতায়ন-ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামজনিক বড় শহরের সঙ্গে সংযুক্ত করা অর্থাৎ উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করা, নতুন রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতির কাজ এগিয়ে চলেছে ক্ষুণ্ণগতিতে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাস্তা নির্মাণ করে বাতায়ন-ব্যবস্থার উন্নতির দিকে খুব বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কলে প্রায় ২,০০০ মাইল নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়েছে এবং অনেক পুরনো রাস্তার উন্নতি করা হয়েছে। 'জাতীয় সড়ক নির্মাণ পরিকল্পনা' অনুযায়ী ২১৭ মাইল নতুন রাস্তা এবং মোট ৮,২১৭ ফুট বড় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া পূর্ব-বিভাগের পরিচালনাধীন ৩,১০০ মাইল রাস্তা এবং ১৮৮ মাইল মিউনিসিপ্যাল রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বাতায়ন-ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতার বড় রুটে সরকারী বাস চলেছে এবং অল্প রাস্তায়ও ক্রমে সরকারী বাস চালানো হবে। বর্তমানে কোচবিহার ও কলিকাতার রাস্তায় ৪০০ বাস চালানো হচ্ছে। পরিবহন-বিভাগ ১৯৬০ সালের মধ্যে বোই ১০০ বাস চালানোর সংকল্প ঘোষণা করেছেন। দৈনিক ১৫ লক্ষ

যাত্রী সরকারী বাসে বাতায়ন করেন, হুতরাং সরকারী পরিবহন-সংস্থার কাজের উন্নয়ন কিছু কম নয়।

গৃহনির্মাণ ও উদ্বাস্ত-পুনর্বাসন

কলিকাতার এবং গ্রামাঞ্চলে গৃহনির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং শ্রমিকদের জন্তে ৩০১টি একতলা ও ১২৮টি বহুতলা বাড়ি ইতোমধ্যেই নির্মাণ করা হয়েছে। কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট-ট্রাস্ট শির-শ্রমিকদের জন্তে পাঁচশোর বেশি ঘর নির্মাণ করেছে। সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন কলোনিতে ৪০০ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে এবং আর্থ-গ্রামগুলিতে আরো বাড়ি তৈরি হচ্ছে। এ ছাড়া দ্বানীরা, অধিবাসীদের নিজ গ্রামে গৃহনির্মাণের জন্তে নগরবিধি অনুসারে সরকার থেকে মালমসলা এবং অর্থসাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

উদ্বাস্তদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেস-বিভাগের আগে থেকেই হিন্দুরা ব্যক্তিগত থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা শুরু করেছেন এবং উদ্বাস্তরা এখানে আসছেন। ১৯৪৭ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে প্রায় ৩২ লক্ষ উদ্বাস্ত পশ্চিমবঙ্গে চলেছেন। এই ৩২ লক্ষ উদ্বাস্তের গৃহনির্মাণ করা এবং তাঁদের জন্তে কাজ জোগাড় করা, এক কথায় পুনর্বাসন করা, যে কি পরিমাণে কষ্টসাধ্য তা সহজেই অনুমেয়। তবুও এইসব হুতরাগ্য উদ্বাস্তদের জন্তে হুতর করা সহ্য তার চেষ্টা চলেছে। গৃহনির্মাণ এবং ছোট ব্যবসায়ের জন্তে ৪০০-৫০০ সালের কাগজপত্র থেকে দেখা যায় যে, ২২ লক্ষ উদ্বাস্তকে সাহায্য করা হয়েছে এবং তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকার মাত্রফত ১৬,৩৮৮ জন উদ্বাস্ত কাজ পেয়েছেন।

উদ্বাস্তদের শিকার জন্তে ব্যয় করা হয়েছে প্রায় ৭ কোটি টাকা এবং তাতে ফল দেখা দিয়েছে। ১৯৫০ সালে এইসব উদ্বাস্তদের মধ্যে শিবনগর-কম্বের সংখ্যা ছিল শতকরা ৪২.১। পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বেশি—এখানে প্রতি বর্গমাইলে ৮০০ জন লোক বাস করে। এক্ষেত্রে সমস্ত উদ্বাস্তের পুনর্বাসন করা এখানে সহ্য নয়। সেই জন্তে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বড় উদ্বাস্তের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিহারের বেতিমতে ২৭ হাজার উদ্বাস্তকে পুনর্বাসনের জন্তে পানালোর সিদ্ধান্ত করা হয়েছে এবং উদ্বাস্ত-পুনর্বাসনের জন্তে ৪০০-৫০০ সালের ৮০,০০০ বর্গমাইল জমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই ভাবে নানা দিক দিয়ে উদ্বাস্ত-পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে পশ্চিমবঙ্গের জটিল সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা চলেছে।

অনুগায়ী, ১৯৫৭

স্বাধীনতা-সংগ্রামের সত্যবাহিনী উল্লেখিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে। এই উল্লেখ আমোদের পেশের সর্বত্র যে উৎসব অধুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ভারতবাসীদের নিজের স্বাধীনতার উত্তরনের জন্তে নতুন উদ্দীপনা পেয়েছে—শুধু গড়ার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করার নতুন দর্শন গ্রহণ করেছে।

দ্রুতি পদ্ধতিগত পরিকল্পনা ঘটনা করে দেশের অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনের জন্ত যে কাজ শুরু হয়েছিল তা আরও পাকিস্থানী হয়েছে। ১৯৪৭ সালে। কল্যাণভরতা রাষ্ট্রের অঙ্গনে গড়ে উঠেছে নব নব দৌধ। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর শিল্পায়ন জাতীয় ওচ্চ লাভ করেছে। প্রথম পদ্ধতিগত পরিকল্পনার কৃষি-উৎপাদন-বৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও, দ্বিতীয় পরিকল্পনার ত্রুটি শিল্পায়নের উপর সংকটের পেশী কোর দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৭ সালে এই দশকের প্রতি ভারতের অগ্রগতি অস্বস্তি ছিল। এই সময়ে শিল্পায়নের অগ্রগতি শুধু যে অব্যাহত ছিল তা নয়, অস্তিত্ব বহুরের ভুলনার শিল্পোৎপাদনের পরিমাণও গতি অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছে। ১৯৪৬ সালে শিল্পোৎপাদনের সাধারণ সূচক-সংখ্যা ছিল ১০০, কিন্তু ১৯৪৭ সালের প্রথম নয় মাসে তা বেড়ে গিয়ে হয় ১৪৮।

১৯৪৭ সালে শিল্পোৎপাদনের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এ বৎসর বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের জন্ত নানাপ্রকার কষ্ট দেখা দিলেও, কোনো শিল্পেই উৎপাদন হ্রাস পায়নি। এমন কি, যে-সব শিল্প প্রবলতঃ আমদানী-কৃত কাঁচামাল ও আয়তনিক জিনিসের উপর নির্ভর করে থাকে, সেগুলিরও উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাকে। যুহু

শিল্পগুলির উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পায়। ইকিনীয়ারিং, যন্ত্রপাতি-নির্মাণ প্রভৃতির যতো নতুন শিল্পগুলিতেও উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববৎসরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোগ্য-স্ববোধ, শিল্পও পিছিয়ে থাকেনি, আগের চেয়ে বেশী জিনিস তৈরি হয়েছে।

গৌরবেলা ও ডিমাই-এ নতুন ইশাত-তৈরি কারখানা গড়ে উঠে আরও করেছে ১৯৪৭ সাল থেকেই। সরকারী উদ্যোগে আরও ছুটি বড় কারখানার সম্প্রসারণও করা হয়েছে। ১৯৪৮ সালেই ইশাত-উৎপাদন-বৃত্তি এটোয়ার প্রথম পর্যায়ের কাজের ফল পাওয়া যাবে। বিভিন্ন সার-উৎপাদন কারখানার সম্প্রসারণের কাজও অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।

১৯৪৭ সালের আর-একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ভারী যন্ত্র-নির্মাণ পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের সম্প্রসারণ। এর ফলে ভারত ইশাত-কারখানা ও ভারী, হাসানিক ত্রা শিল্প প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিসই তৈরি করতে পারবে।

আমোচ্য বৎসরে উৎপাদন-বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-গুলিতে কর্মসংস্থান হয়েছে বহু লোকের। অতীতের শিল্পে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায়, ১৯৪৭ সালে চৌদ্দ হাজার লোক বেশী নেওয়া হয়েছে। বাইসাইকেল শিল্পে নিয়োগ করা হয়েছে আরও হাজার লোক। মোটর-শিল্পে লেগেছে আরও একহাজার তিনশো পঞ্চাশ লোক। বৈদ্যুতিক ইকিনীয়ারিং শিল্পে তিনহাজার তিনশো, হাসান-শিল্পে প্রায় হাজার, সিঙ্গেল-শিল্পে প্রায় পাঁচশো, যেরন-শিল্পে প্রায় দু'হাজার আরও মেকানিক্যাল ও সাধারণ ইকিনীয়ারিং শিল্পে নিয়োগ করা হয়েছে আরও প্রায় চারহাজার চারশো লোক।



বিজ্ঞান

মাঘ সন্ধ্যায় আকাশ

শ্রীকামিনীকুমার দে

দীর্ঘ শীতের রাত্রি। পরিষ্কার আকাশে তারার মেলা। এই আকাশের নোভা উপভোগ করা যায় নাগরিক পরিষ্কৃতির বাহিরে। মাঘ সন্ধ্যায় কালপুরুষ-মণ্ডল ও তাহারক দিগ্বিহা দুৰ্দ্ধক, সরমা, ব্রহ্মজল, পুনর্ভব, রোহিণী এবং কালপুরুষেরই রিগেল তারা (বাণরাজা) আকাশের এক বিস্তীর্ণ অংশকে সজ্জল ও নন্দনাতিক্রম করিয়া রাখিয়াছে। কালপুরুষ মধ্যাক্ষের দিকে অঙ্গুলর হইতেছে। অশ্রী, লুঙ্ক ও সরমা যে বিরাট সর্বব্যব ত্রিভুজ বসনা করিয়াছে তাহা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—মাত্রাঃ এই ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু।

আমরা প্রায় সকল প্রমানে নক্ষত্রমণ্ডলের সম্বন্ধে পরিচিত হইয়াছি। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পশ্চিমাংশে বাহ্যদের সহিত পরিচিত হইয়াছিল। মাঘ মাসে পূর্বাংশে আসিয়াছে। চন্দ্র-লাভমাস আগে যে মণ্ডল পশ্চিমে অস্ত যাইতেছিল, এখন তাহা পূর্ব দিকে উদিত হইতেছে। নতুন পরিবেশে ইহাদের দেখিতেছি।

মাঘ মাসে পূর্ব মকররশ্মিতে। সূর্য্যর মকর মূর্ত্তের লক্ষ্যেই অঙ্কমিত হইতেছে। কিছু পরে লুঙ্ক-মণ্ডলও অস্ত যাইবে; এখন আর তাহাকে চেনা যাইতেছে না। মীন-রশ্মিকে পশ্চিমাংশে পেগাসাস-এর লক্ষিণে পর্য্যটকীর্ণগ্রন্থ তারার পক্ষত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গুলর করিতে হইবে। পেগাসাস পশ্চিমাংশের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। কালপুরুষ ও পেগাসাস এই সময়ে পূর্ব ও পশ্চিমাংশের বিনির্ভেতা। মেঘরাশি প্রায় বায়ুর উপর আসিয়াছে। মেঘরাশির 'আমরা চিনি, তিনটি তারার ছোট গুলকোণী ত্রিভুজটি দিয়া। ইহারই উত্তরে আর-একটি ত্রিভুজাকৃতি ইষ্টেজুস-মণ্ডল। বৃষরশ্মিতে কৃত্তিকাপুঞ্জ এবং রোহিণী তারা পূর্বাংশে উপরদিকে তাকাইলে দেখা যাইবে। বৃষের উত্তরে অবিগা বা এক্রাপতি-মণ্ডল ও তাহার ব্রহ্মজল তারা। ইহার পূর্বদিকে মিতুন-মণ্ডল। কালপুরুষের রিগেল (কাতিকের) তারার দিকট

হইতে আরম্ভ করিয়া 'এরিডানাস' বা মশী-মণ্ডলকে অঙ্গুলর করিতে হইবে—এই মণ্ডলের শেষ তারা; অংশের এখন মোজা লক্ষিণ দিকে। দুগব্যাধ-মণ্ডলের লুঙ্ক ও ছোট-লুঙ্ক-মণ্ডলের সমতার কথা আগেই বলিয়াছি। কালপুরুষের দক্ষিণদিকে লক্ষ-মণ্ডল। কালপুরুষের পূর্ব দিকে দুগব্যাধ ও ছোট-লুঙ্ক মণ্ডলের মধ্যবর্তীকালে মনোস্টিস (Monoceros) নামক মণ্ডল।

কালপুরুষ-মণ্ডল হইতে দক্ষিণ দিকে যাইয়া নীচে একটি অজ্জল তারা দেখা যাইবে। এটি 'মগস্তা' তারা—মার্গোনেভিস্ নামক এক বড় মণ্ডলে অবস্থিত। তারার মধ্য উজ্জলতায় অগস্তা মিতীদ-স্থানীয়।

ক্যাসিওপিয়ায় উত্তর-পশ্চিম আকাশে দেখিতে পাইতেছি। তাহার পশ্চিমে সিকিট্রকে 'অমর' ভুলি নাই। হংসপুঙ্খ-মণ্ডল অজোমুখ। পেগাসাসের উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে এন্ড্রোমিডা-মণ্ডল অঙ্গুলর করিয়া 'অমর' পাসিফু-মণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হই। পাসিফু মধ্যরেখা অতিক্রম করিতেছে; তাহার লৈতাত্য্যরকে আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে।

মিতুনের পর কর্কট-মণ্ডল—ইহাতে কোনো উজ্জল তারা নাই এবং ইহার তারাবলি বিশেষ কোনো আকৃতি লইয়া সজ্জিত নহে। মিতুনের পূর্বদিকে লক্ষ্য করিলে, সারা মেঘের মতো একই জায়গা দেখা যায়। ইহা কতকগুলি নক্ষত্রের জটলা; নাম—গ্রিসিগ্ লক্ষতপুঞ্জ। ছোট বৃহস্পতি পিণ্ড ও অনেস্তগুলি তারা এই পুঙ্খ দেখা যাইবে। ইহার কিছু দক্ষিণে কীর্ণগ্রন্থ তারার নাম 'পুঙ্খ'। আরও দক্ষিণে বেশ উজ্জল একটি তারা দেখা যাইতেছে। ইহার নাম 'অলেনা'।

এই মাসে পূর্ণিমার চন্দ্র মধ্য-নক্ষত্রে থাকে বসিয়া মাসের নাম 'মাঘ'। মধ্য সিংহরাশির নক্ষত্র। সিংহ দেখাযাত্র উদিত হইতেছে।

সুরলোক

সঙ্গীত-আসর পরিকল্পনা

অ. ক. ব.

শ্রীমতের কলকাতার একটা বড় আকর্ষণ হচ্ছে সন্মেলন, জলসা প্রভৃতি ব্যবহারী উচ্চ-সঙ্গীতের আসর। পাশ্চাত্যে সঙ্গীত বলতে—শ্রীত এবং দ্ব্যর্থের সঙ্গে বুঝাও বোঝায়; জু এই পাশ্চাত্যের কাহণেই নয়, জনসমূহের চাহিদা যেটাবার ক্ষেত্রে উচ্চ-সঙ্গীতের বহু বড় অধুনাঙ্কে কবক-বুড়া এবং/অথবা ভারত-নাট্যধর্মেরও ব্যবহৃত থাকে। এবারেরও ছিল। সঙ্গীতি বেক হুতা ব্যাপী 'বিবিধ ভারত সঙ্গীত-সন্মেলন' অধুনাঙ্ক হয়ে বেশ প্রাণ দিয়েছে-হলে। কল্লী-সন্মেলন হয়ে বেশ একটা দৈর্ঘ্য—তারে সঙ্গীতের আকর্ষণ এবং আয়োজনই প্রধান। তখন উচ্চ-সঙ্গীত-শিল্পী শ্রুতিবিধি বিধের সত্যকম সঙ্গীত-আধিকারী সঙ্গীত-সন্মেলন অত্র বছরের মতো জেলায় ফুল-হলে না হয়ে, অধুনাঙ্ক হলে হাফকা পার্কে বড় প্যাতালে। তিন হাত উচ্চ-সঙ্গীতের আসর হয়ে বেশ ভোক্তার লেনে। এ ছাড়াও ফানি বোকে, বিকলা পার্কে এক অজ্ঞাত কারখানা অনেকগুলি আসর অধুনাঙ্ক হলে।

আধুনিক সঙ্গীতের সন্মেলন বা জলসা যে হয় না, তা নয়; কিন্তু উচ্চ-সঙ্গীত সন্মেলনের হুদনার তাত্কা সংযোগস্থ এক নিয়ম। তার একটি কারণ এই যে, প্রোক্ত-সংযায়ন কবেই উচ্চ-সঙ্গীতের রসের সন্ধান পাচ্ছেন, এবং আধুনিক সঙ্গীতের চাইতে দাম-সঙ্গীতের দ্বারা যে অনেক বেশি এটাই বুঝতে পারছেন। তা ছাড়া সঙ্গীত-সন্মেলনে বাংলার বাইরের যে-দশ বিখ্যাত গায়ী আসেন তাঁদের প্রবল এবং ধর্ম দ্ব্যর্থ সঙ্গ বহুতর চর বহুতর তেতর জু এই শ্রীত অধুনাঙ্কেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ বেশে। সে হুদনার আধুনিক সঙ্গীত-শিল্পীরা অনেক বেশি হুদত।

সবজন্মে আসরে হাফির থাকতে পারিনি—যেহেতু এবং পকেটের পক্ষিতে ফুদোয়নি। পকেটের পক্ষিতে ফুদোয়নেও, হাতের পর হাত কেসে থাকলুম নয়। তাই আদায় হয়ে হয়, ধাঁধের অথবা নই কববার মতো প্রচুর বাঙালি সমূহ নেই, এবং ধাঁধা সারা হাত বাঙালিতে পারেন না বা আসতে চান না—সত্যিকারের এহেন উচ্চ-সঙ্গীত-

যোগীর অজ্ঞান নেই—উদ্বোধনকার কেন তাঁদের দ্ব্যর্থ চেয়ে অথচ আসরের ব্যবস্থা করেন না, বা সম্ভার তুল হয়ে হাত বাঙালীর ক্ষেত্রেই পেরে হয়ে যাবে, এবং তুল প্রোক্তায়া শেষ টান বা দাম হয়ে বাড়ি কিংবে তুলভাবে সুযোগে পারবেন? অতঃপর সারাগতব্যাপী আসর আদি এতেনায়ে তুলে দিতে বলছি না, কারণ তারও একটা আলাদা হল এবং পার্থক্য আছে।

অজ্ঞাত বহুতর মতো এ-বহুতরও সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী তুলবে বহুতর সোলাস আলি খাঁ। খাঁ-সাহেবের প্রোক্তায়া বিক দ্ব্যর্থ বুঝছেন নয়, কিন্তু কতের বাহুতে তিনি আদায়ের এটি বাঙালি হেবেছেন যে, তাঁকে সেখানে নয় শ্রুতি হয়ে জুটে। শ্রুতিবিধি সঙ্গীত-আধিকারী সন্মেলনে তিনি 'সংগতি' নাম যোগ্য করে বিদ্যমান ('মন নয় তাল') এবং মধ্য ('সার ন প্যো') দ্ব্যর্থের খেলায় সাংগিনে। 'সংগতি' নাম আসে তিনি। হাফটি কিন্তু উচ্চ-সঙ্গীত এবং যখনতীর শিল্পে তৈরী অপ্রসিদ্ধ 'তীর' গানেরই অধুনাঙ্ক। এর পর বেশ হাফ সেয়ে তিনি মধ্যমে বাঙালি হাফে খেলায় পোনাবার টান প্রকাশ করলেন, কিন্তু প্রোক্তায়া কববারে, তার বহুতর তাঁর বহু আসরে জবেত-করা 'কা কল' সঙ্গি হাফে নয় বালব' এই ধর্ম-শ্রুতিবিধি তিনি আবার জবেত কর্তে বাধ্য হলেন। এবং চট্টপট জবেত করেই প্রোক্তায়া উর্দে খেলেন, হাতো বা পায়ে 'হরি ও তং মং' শ্রুতিবিধি তৈরি আবার জবেত কর্তে হয়। পতবহুর খাঁ-সাহেবের বালার যখন আলাপ কর্তে সিংহিলাব তুলবাহুতর এই ধর্মের কববারে কব বহুতর তিনি হু-এ প্রকাশ করেছিলেন।

খাঁ-সাহেবের গান ভোক্তার সেনের আসরে বেশি ভালো লেগেছিল। সেখানে তিনি সেয়েছিলেন প্রথমে গুলকেন্দী, পরে কোষল প্রোক্তায়া আদায়ের খেলায়। প্রথমটি গুলকেন্দী বাঙালি এবং দ্বিতীয়টি বিলাসবদী তৈরী বাঙালি সাঙরা একই দ্ব্যর্থ। হুটি হাফটি সোলাস আলি কত্রে অপরূপ জবেত করে উর্দেছিল। কিন্তু যে ধর্ম গুলকেন্দী দ্ব্যর্থ তিনি কবুনে সরাগতের করলেন, সেটি আদায় কবির খাঁ

সাহেবের অঙ্গুষ্ঠানীয় কণ্ঠে গাওয়া বিখ্যাত গান—‘ধুন্যাকৈ তীর’। ও গান আবেহুল কবিরের কণ্ঠে বেমন শুনেছি, অল্প কালও পক্ষেই তেমন গাওয়া সম্ভব নয়।

গোলাম আলি খাঁ সাহেবের গান এবার আমার সবচেয়ে বেশী ভালো লেগেছিল, এর পর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের ভেতরে। চমৎকার শ্যাওলা। আলির জন্মস্থানটি। কান্নাপাড়ের কয়েকটা সাময়িক ছাড়পত্র পেয়ে আমরা জমাবৎ হয়েছি দলীত শুনে বলে। খাঁ-সাহেব খরলেন বিরহের কল্প মাধুর্যে ভরা বেহাগ রাস। কল্প স্বরে আচ্ছন্ন হয়ে আমার চোখে ঘোহের ঘোর নেমেছিল কিনা জানি না, প্রোক্ত-করেদীনের চোখওতো আমার মনে হলো যেন বেহাগ চলছিল হয়ে উঠেছে।

বেহাগের পর খাঁ-সাহেব গাইলেন ঠুংরি—‘ইয়াস শিয়ারি আয়ে’। অর্থাৎ প্রিয়াকে মনে পড়ছে। প্রিয়া-বিশ্লেষ-বিবৃৎ বিরহীর অস্তর-বেধনা অর্পণ স্বরের ধারায় বেন মূর্ত করে তুললেন খাঁ-সাহেব। ডাকালার কয়েকী-প্রোক্তাদের মূধের দিকে। আমার মনে হলো, অনেক কোড়া বিরহী চোখে অল্প চিত্তিক করে উঠেছে—তারের প্রতীকমাণা বিরহী প্রিয়াদের কথা ভেবে। দলীত শুনিতে বন্দীদের মনোপ্রবণের এই পরিকল্পনা হৃদতো সাধু, কিন্তু আমার মনে হয়—এর একটা প্রকর নির্ভর দিকও আছে। কিন্তু সে প্রকর এখনো অবাস্তব।



শ্রীমতী কেশববায়ী কেশব

শ্রীমতী কেশববায়ী কেশবায়ী এসেছিলেন ‘নিমিল ভারত সঙ্গীত-সম্মেলন’-এর অতিথি হয়ে। ডোডার সেনের একটি অধিবেশনেও তিনি গেয়ে গেলেন। তার কণ্ঠে অরজহস্তী এবং কাফী রাগের খেয়াল এবং সর্বশেষে একটি ভজন গান অর্পণ লাগল। ২২কোলা খাঁ সাহেবের উক্তি মনে পড়ল : “তামায হিন্দুজানে এই (অর্থাৎ শ্রীমতী কেশববায়ী-র) কণ্ঠের তুলনা নেই।” উক্তি শুনেছিলাম অনেক বছর আগে, কিন্তু তার সার্থকতা এখনো বঙ্গায় আছে। শ্রীমতী কেশববায়ী-র স্বকর চেহারায নেমেছে বার্কায় আভাস, কিন্তু কণ্ঠকে এখনো তা লক্ষ্যরূপে স্পর্শ করতে পারিনি।

কেশববায়ী-র আগে সেয়ে গিয়েছিলেন পাকিস্তানের বিখ্যাত তরঙ্গ গায়ক-জাভেদ শাহান ও আলি ও নাজাকৎ আলি। এঁরা—বিশেষ করে শাহান—ওর্ধ্ব গায়ক বলে নাম কিনেছেন। এঁদের কণ্ঠ-চাতুর্ঘ (অথবা জিম্মাস্টিক) এবং লয়ে দক্ষতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর, এবং অসামান্য একনিষ্ঠ সাধনার পরিচায়ক। কিন্তু এঁদের গান শুনে মগজেরি শুষ্ক চমক লাগে, হৃদয় তৃত্ব হয় না। স্বরের জাল-বিজ্ঞায়েও এঁদের দক্ষতা প্রকৃত, কিন্তু সে-জাল এখনো মায়াজাল হয়ে উঠতে পারেনি। স্বরের বাহুর চাইতে হৃদয় ওজস্বির দিকেই এঁদের নজর বেশী, সেটা এঁদের কলাবতী রাগের খেয়ালের চাইতে ঠুংরি গানেই বেশী পরিলক্ষিত হলো। এঁরা গাইলেন—‘সেইর’ বিন ঘর হুনা—অর্থাৎ প্রিয় (বা প্রিয়া)-বিহনে ঘর শূন্য। কিন্তু সেইর-বিহীন শূন্য ঘরের কল্প পরিঘৃণিত মনের অবস্থা বেমন হওয়া উচিত, আলি-ভাইয়ের গানে তার তেমন কিছু আভাস পাওয়া গেল না। বা পাওয়া গেল, তা হলো কণ্ঠের মানারকম ছুছ ছটকা এবং জটিল কসরত।

এই কারণে কেউ কেউ এঁদের সম্পর্কে বিরূপ দৃষ্টব্য করেন। কিন্তু আমার মনে হয় এঁরা ঠিকই করছেন। এ বসনে এই ভালো। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

“গাঘিছে কানীনায়, মবীন বুখা,
কানিতে দভাগুহ ঢাকি”—

কণ্ঠে যেগিছে সাতটি স্বর
সাতটি বেনে শোবা পাখি।”

এখন এঁরা কানীনায়ের মতোই গাইতে বাধুন, এঁদের কণ্ঠে সাতটি স্বর পুরোপুরি শোবা পাখিতে পরিণত হোক। কণ্ঠ ও লয়ের বড় রকমের কসরত আছে, সবগুলো আগে এঁদের স্বর হয়ে থাক। মিঠে সেয়ে স্বরের মায়াজাল বুনাবার সময় পরে মিলবে, পরিণত বসনে তা আশানি আসবে। সেহগত প্রেবের মধ্য দিয়ে দেহাতীত প্রেবে

উত্তরগণের যতটাই কালোঘাতির কথা দিয়েই কালোঘাতির অতীত স্বরসোক্তে পৌঁছবার পথ। নাস্ত পথ। দিকহীন। হুয়ের বাহুর ৮আবহুল করিবও এই পথে গিয়েছিলেন। প্রথম জীবনে গ্রিনিও 'কড়া' ধরনের কালোঘাতি গান গাইতেন।

এ বছরের শীতে নবগত শিল্পী উজ্জ্বল কুমারী সুনকা গটনারক কণ্ঠ-সঙ্গীতে সুনকা অর্জন করেছেন। কিছুদিন আগে মহাভারত-সপ্তমে সলাঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলনেই কলকাতার এর প্রথম আত্মপ্রকাশ। অমরতী ও মল্লারের বিশ্রুপে তৈরী অমর-মল্লার খেলায় এবং তেলেনা গেরে তিনি আবারের চমৎকৃত করেছিলেন। সঙ্গীতি জোভার সেনের অধিবেশনে ইনি গেরেছিলেন অমরতী রাগের খেলায়। ইনি সুনাকার সঙ্গীত-বিধান পণ্ডিত বিনায়ক নারায়ণ পট্টবর্ণনের ছাত্রী। সঙ্গীত-চর্চার ক্ষমতার-সরকার থেকে বৃত্তিও গেরেছেন। কুমারী সুনকা অমরতীই উপযুক্ত সঙ্গীত শিক্ষা বেড়াতে পার্শ্ব করে তুলতে গেরেছেন, তাতে তাঁর তবিত্ত উজ্জ্বল বলেই মনে হয়।

পণ্ডিত ভীষেন বোশী পুণ্ডরীক স্বতন্ত্র-সম্মেলনে মালকোব এবং জোভার সেনের আসরে জোভী রাগের খেলায় চমৎকার গেরেছেন। এবং সু-জায়গাতেই ভৈরবী ভজন—'বো ভজ্ঞে হরিকো সধা' গেরে আবারের শ্রীত করেছেন। ইনি ৮আবহুল করিমের প্রিয় শিল্পী ৮সাওয়াই গজবের কাছে ডালাই তালিম গেরেছেন বোকা দায়। আবহুল করিম-খ্যাত 'দিয়ান' গরানার বর্ধা। বজার ঘেঁষেছেন তিনি।

উচ্চ-সঙ্গীতের আসরে বেংলায় যত একমাত্র মহিলা-শিল্পী হিসেবে শ্রীমতী শিখিরকণা ধর চৌধুরী উল্লেখযোগ্য। এবারে কয়েকটি আসরে তাঁর বেংলা-বাক্সা আবারের আনন্দ দিয়েছে। ইনি ভারত-বিখ্যাত বেংলা-বাদক শ্রীকৃষ্ণাধিক যোগের শিষ্য।

বিদগিলা-সঙ্গদাহের সানাই এবারও গুনলাম। প্রথম করেব বছর বেবন অসুত ডালো লেগেছিল, প্রথম বিদগের যোর কেটে গেছে বলেই বোধকরি এদের বাক্সা এখন ততখানি দুহু করে না।

ওজাদ আদীর খাঁ পুণ্ডরীক স্বতন্ত্র-সম্মেলনে হেমকল্যাণ এবং আজানা রাগ গেরে গুনিয়েছিলেন। তিনি গুণী, সে বিঘরে কোনো। দশক নেই : কিন্তু তাঁর বিলম্বিত সুরবিচারে ওজাদি বড়ই দাক, বড় একঘেয়েমি এসে যায়, এবং তাতে দায়ুর্ধের কিঙ্কি অভাব ঘটে বলে আবার বিখ্যাত।

উচ্চ-সঙ্গীতে বাংলার অধিতীয় সঙ্গীতাত্মক শ্রীভাবাপ চক্ৰবর্তী। আদীর ভৈরব রাগে তাঁর বেংলা গান অনবদ্য হয়েছিল, কিন্তু গানখানা অতক্ষণ না গেরে আরেকটু কম সময় গাইলে বোধ হয় আরো ডালো হতো।

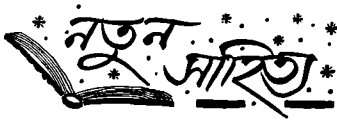
খ্যাতমরী কলক-নৃত্য-শিল্পী গোপনকুমারী জোভার সেনের আসরে কলক-নাচের সঙ্গে কবিত্তর 'অভিলাষ' কবিতার অমরতী বাসবতী ও উপভক্তের কাহিনীটি নৃত্য রূপায়িত করে আবারের দুহু করেছেন। তাঁর সুরভি ও সুরভির প্রশংসা করি।

সেতার-বাজনা গুনলাম বেলায়েৎ খাঁ, নিখিল বোকা-পাখার, আবহুল হাশিম, জাকর খাঁ এবং ইন্দ্রজিত খাঁ'র। এদের এবারকার বাক্সার উল্লেখযোগ্য কিছু গেরেছি বলে মনে হয় না, এদের অসুতসাহী উজ্জ্বল হাই বদুন-না কেন।

কলকাতার আসরে শাস্ত্রাঙ্গদাই যে জনপ্রিয়তম তবলী, এবারেও তাঁর প্রশংসা পাওয়া গেল। এই জনপ্রিয়তার মূলে এর নিচুক বদুন-দৈনুগাই নয়, তাঁর ব্যক্তির প্রশংসাও অনেকখানি। এর বোদেজাকী সলাহাঙ্গর সভাব জোভারের সঙ্গে চুই সেরে ডাক জমিয়ে ফেলে। ওজাদ আদীর তবল-বদুন বা গুনলাম তা খুঁই উচুদের, কিন্তু জনপ্রিয়তায় তিনি শাস্ত্রাঙ্গদাইয়ের সমকক্ষ হতে পারেননি।

কিন্তু এবারে সবচেয়ে বেশী দুহু হারছি বাঁর তবল-সঙ্গীত এবং লহরা তুন, তিনি ভারত-বিখ্যাত বন্দীবাদক শ্রীশ্যামলাল ঘোষের সুযোগ্য কনিষ্ঠ প্রাভা শ্রীনিধি ঘোষ। তিনি বোখাই-প্রবাদী, এদিকে বেশী আসেননি বলে কলকাতার আসরে খুব বিখ্যাত নন। কিন্তু তবলী হিসেবে বাংলার বাইরে তাঁর প্রচুর খ্যাতি। ১৩৩১ সালে তিনি শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে তবলা এবং গান শিখতে শুরু করেন। পরে ১৩৩৫ সাল থেকে বোখাই শহরের ওজাদ আদীর ঘোষের খাঁ সাহেবের কাছে নিম্নমিত তালিম নিয়ে আসছেন। ওজাদ কৈয়াজ খাঁ, ওজাদনাথ ঠাকুর, কেশরবাসী কেরকার, গান্ধী, আদীর খাঁ, ওজাদ আলভিকীন খাঁ, বিলায়েৎ খাঁ, কৃষ্ণাধিক যোগ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, পাখালাল ঘোষ এবং ভারত-বিখ্যাত গুণীদের সঙ্গে তিনি তবলা-সঙ্গীত করেছেন।

সু তবলাতেই যে এর দখল, তা নয়। তিনি নিজে গায়ক এবং সুরকার। তাঁর সুর-সেওয়া গান গেরেছেন শীতা দায় (দস্ত), আলা কৌসলে, হেমকুমার, তালাত হামুদ এবং বামা দে।



শিক্ষার আদর্শ ও গান্ধীজি

ঐকদীপ্তনাথ মুখোপাধ্যায়

শিক্ষা-সমস্যা বর্তমান যুগের একটি প্রধান সমস্যা। ব্রিটিশ-ভারত বিপ্লবের পর একশত বৎসর চলিয়া গেল, এখনও মনো-ভায়ে আত্মা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে দেশবাসীর উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামীজী বসু, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ তত্ত্ববিশারদ এ বিষয়ে নিজেদের কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দেশের শাসক-সম্প্রদায় এতদ্বারা কণ্ঠস্থ করে নাই। স্বাধীনতার পর গড় বৎসরের কাল আমরা স্বাধীন হইয়াছি, কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সংস্কৃত করিতে পারি নাই। স্বাধীনতার পর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজি ছবি সরকারী অফিসের প্রতি ঘরে একপানা করিয়া টাঙাইয়াছি, কিন্তু স্বাধীনতার উপর শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনার ভার, তাহার গান্ধীজির আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। গান্ধীজির উত্তরসূর্য, সুমিয়ারী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান স্রোতঃ ডাঃ জাকীর হোসেনকে আমাদের শাসন-কর্তৃপক্ষ রাজ্যপালের পর প্রধান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু গান্ধীজির শিক্ষা-পদ্ধতি বেশে অবহেরনের ভার বেঙথার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

এ সময়ে মহাত্মা বিনোদ ভাবের নেতৃত্বে একদল কর্মী কুম্ভ গঠনমূলক কার্যে নিজেদের নিযুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গড় বৎসরের তাহার। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ‘সর্বোদয়’ সম্মিলন’ করিয়া সে-বিষয়ে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এবারও কেবল রাজ্যে কালিচি নামক গ্রামে যে সর্বোদয়-সম্মিলন হইয়া গেল, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ হইতে ছয়শত প্রতিনিধি যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু হুঃখের কথা, সর্বোদয়-সম্মিলনে সর্বোদয় সম্মিলন সর্বোদয় আলোচনা দেখা যায় নাই। কালিচি আবার পঞ্চায়েত জন্মস্থান—বৈষ্ণব ও এবার তথায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

সে বাহা হউক, ঐশ্বর্যেশ্বরীম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন উক্ত কর্মী সম্মিলিত মহাত্মা গান্ধীজির ‘শিক্ষা-বিষয়ক উক্তিগুলি’ গ্রন্থ করিয়া বাংলা ভাষায় ‘শিক্ষা’ নামক এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। (পুস্তকের মূল্য হই টাকা চারি আনা; প্রাপ্তিস্থান—ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, ১, ডামাচেরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২)

অনুবাদক শৈলেশ্বরীম্বর গান্ধীজির বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন সময়ের উক্তিগুলি ৮টি খণ্ডে সাজাইয়াছেন। প্রথম খণ্ডে বর্তমান শিক্ষার অপূর্ণতা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীজির মন্তব্য আছে। এইভাবে বিভিন্ন খণ্ডে—নবীন শিক্ষা-পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ, তৃতীয় খণ্ডে—নবীন শিক্ষা, চতুর্থ খণ্ডে—স্বামীজির প্রশ্ন, পঞ্চম খণ্ডে—ভাষা-সমস্যা, ষষ্ঠ খণ্ডে—বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা, সপ্তম খণ্ডে—বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষা এবং অষ্টম খণ্ডে—উচ্চশিক্ষার কথা বিস্তৃত হইয়াছে।

গান্ধীজির কথাই আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি—

“অল্প দেশের ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, ভারতে সমস্ত: যেটি জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি কৃষিজীবী ও শতকরা ১০ জন শ্রমনিরাজীবী। এ দেশে তাই শিক্ষাকে মূলক পুস্তক-আধারিত করা বা এইভাবে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনে শরীর-প্রবের অঙ্গুণবৃত্ত করে ফেলা এক ভীষণ অপরাধ। জীবিকা অর্জনের জন্য নিজ সময়ের অধিকাংশ ব্যয় করি বলে বসন্ত: আশা মতে আমাদের দেশের শিশুদের বাধ্যবাধকতা থেকে ঐ জাতীয় প্রবের মর্যাদা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। আমাদের শিশুদের বেশ প্রমুখ হেরজান করতে শিক্ষা না দেওয়া হয়। কোন ক্রমের পুস্তক বিভাগের ব্যবহার পর আজকের মত কেন যে কৃষিজীবী শ্রমিক হিসাবে অপদার্থ হয়ে থাকে, এর কোন কারণ বুঝে পাই না। আমাদের দেশের বিভাগের ছাত্ররা

পরীক্ষা-প্রবেশ প্রতি জন্ম বিরম্ববনে নয়, কেমন স্থপাতরে সেন গৃহিণীত করে, তার কারণ খুজে পাই না। ভবিষ্যতের যে-কোন পার্যক্ষমে হুতা-কাটাঁকে বাধাতামূলক বিধির হিসাবে অস্বীকৃত করা উচিত। আহার ও বাসপ্রাসঙ্গ্রহণ নিনা যেমন আমরা বাঁচতে পারি না, তেমনি এই প্রাচীন ভূমিতে হুতা-কাটাঁর পুনঃপ্রবর্তন বিনা আর্থিক স্বাধীনতা-প্রাপ্তি ও চিরদারিদ্র্য দূর করা অসম্ভব। আমার মতে প্রতিটি গৃহে চরকা চুল্লীর মতই সমান প্রয়োজনীয়। অপর কোন পথায় জনসাধারণের শোচনীয় দারিদ্র্য নিরাকরণ করা সম্ভবপর নয়। তা হলে প্রতিটি কুঠারে হুতা-কাটাঁ প্রবর্তনের উপায় কি? প্রতিটি জাতীয় বিদ্যালয়ে হুতা-কাটাঁ প্রবর্তন ও বিধিবদ্ধভাবে হুতা উৎপাদনের কথা আমি পূর্বেই বলেছি। আমাদের ছেলেমেয়েরা একবার কোন কাজ শেষার পর অল্পসে নিজ গৃহে এই বিজ্ঞান ঘটাতে পারে।

“লোকে প্রশ্ন করে—এত কাকশিল্প থাকতে আদি তকলীকেই নির্বাচন করলাম কেন? এর কারণ হচ্ছে এই যে, সর্বপ্রথম আমি যে-সব কুঠার-পিল্লের অববেণ কবি, তকলী তাদের অস্তমত এবং এ শিল্প বহু যুগ ধরে চল আসছে। প্রাচীন কালে আমাদের সর্বদর বস তকলী যারা উৎপন্ন হোত। চরকার প্রচলন পরে হয়। এ ছাড়া অতি-সূক্ষ্ম শ্রেণীর হুতা চরকার কাটা যায় না। এইজন্য পুনরায় আমাদের তকলীর শরণ নিতে হয়। তকলী যাহুনের অহুশিষ্ট বৃত্তিকে উন্নতির শীর্ষদেশে উন্নীত করেছিল। এতে কয়ালুরি কার্যকরতার সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগ হয়। তবে তকলীর প্রয়োগ অশিক্ষিত কারিগরদের দ্বিতর সীমিত থাকার এর এযোজনীয়তা ক্রমে পুস্তপ্রায় হয়ে যায়।
• • • ধর্মীয় শিক্ষার প্রশ্ন অতীব জটিল। তবু তাকে বাদ দিলে চলবে না। ভারত কমপি নির্বীরবাসী হয়ে না। উৎকট নাস্তিকবাদ এদেশের মাটিতে বাধা হুলতে পারবে না। তবে ধর্মীয় শিক্ষার সম্বন্ধ নিঃসন্দেহে কঠিন কার্য। এর কথা চিন্তামাত্র আহার শিরঃপীড়া আরম্ভ হয়। আমাদের ধর্মভক্তরা সাধারণতঃ ধর্মজ্ঞানী ও আত্মপরায়ণ। তবু তাঁদের দরবারে উপস্থিত হতে হবে। সমাজের চাবিকাঠি হচ্ছে মোরা, সম্বন্ধ ও ব্রাহ্মণদের হাতে। তবে তাঁদের মনে সর্ববৃত্তির উপর না হলে ইংরাজি শিক্ষার কারণপ্রায় আহারের আশ্রয়িত ধর্মীয় শিক্ষার শিল্পে নিয়োগ করতে হবে। এ কাজ খুব কঠিন নয়। বহাদুরমুন্ডের কপ প্রান্তদেশই যার স্থিত হয়েছে এবং যার দ্বারা ঐ প্রান্তদেশের অধিবাসী, তবু তাদেরই শুদ্ধীকরণ প্রয়োজন। আমাদের মত ধর্মী এই শ্রেণীভুক্ত—তাঁরা যং এ শুদ্ধী-ক্রিয়া

করে নিতে পারেন। কারণ আমার এ মন্তব্য দেশের কোটি কোটি জনগণের জন্য নয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন গরিমা পুনঃসংস্থাপনার আদ্যদের প্রাচীন অবস্থায় প্রত্যাপর্জন করতে হবে।

“আমার কাছে ধর্মের অর্থ হচ্ছে সত্য ও অহিংসা। তাই যা কেন, ধর্ম মানে বোধ হয় জন্ম সত্য। কারণ সত্যের দ্বিতর অহিংসানিহিত এবং অহিংসা হচ্ছে সত্য-আধিকারের অতি প্রয়োজনীয় অপরিসার্ষ অঙ্গ।”

শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য গাছীজি তাঁহার যাক্ষনীতিক আকালেন আরম্ভ করার সময় হইতেই (১৯২০ খ্রী:) দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তখন পরাধীনতার নাগপাণ হইতে দেশকে মুক্ত করাই তাঁহার জীবনের প্রথম কাজ ছিল—তিনি সে কাজ শাক্ষ্যের সহিতই সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের চর্চায়া, স্বাধীন ভারত অধিকদিন তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ-লাভের সুযোগ লাভ করিল না। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টে শক্তি ভারত স্বাধীনতা লাভ করিল ও ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি তিনি সিম্ভীতে অংতহাদীর গুণীতে নিহত হইলেন। তাঁহার অস্ত্রধানের পর হইতে তাঁহার প্রভাব ক্রমে ক্রমে কমিয়া গিয়াছে—যদিও দেশের একমূল লোক—তাঁহাদের সংখ্যা বড়ই কম হউক না কেন—মনে করে গাছীজির নির্দিষ্টপথই ভারতের অর্থনীতিক মুক্তিসাধের একমাত্র উপায়। তিনি দেশের জনগণকে কৃষি-বিমুখ হইতে সোধিয়া শক্তি হইয়াছিলেন এবং মাহুৎকে ক্রমে ফিরিয়া গিয়া কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

আজ আমরা দেশে বহুপ্রকারের বহু বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছি; কিন্তু ছাত্রের কথা—কি শিক্ষক, কি অভিভাবক কেহই বুনিয়াদি শিক্ষার তাৎপর্য বৃদ্ধি না—কাজেই বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে আত্মরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় না। অভিভাবকরা বলেন—কেন ছলে বাইরা ছেলেমেয়ে চাষের কাজ করিবে? সে কাজ তো সে বাড়িতে থাকিয়া করিত। বর্তমান শিক্ষার অর্থ সাধারণ লোক প্রম-বিমুখতা বলিয়া মনে করে। শিক্ষিত ব্যক্তিও যে বেহনতী-প্রম করা প্রয়োজন, নানা কারণে যে খারণা আমাদের মনে লাগে না। তাহার বল সর্বদা আমরা জোগ করিতেছি। দেশবাসী কৃষি-বিমুখ হওয়ায়, স্কুলশ-স্কলনা বেশে সর্বদা আমাদের বাধ্যভাব সঙ্ক করিতে হইতেছে।

দুনিয়াদি বিভাগসমূহে দ্বিবিভার সময় বেখিয়া বিশিষ্ট হইবে, দুনিয়াদি বিভাগের শিক্ষকগণই দুনিয়াদি শিক্ষার অর্থ প্রস্তুত করিতে পারেন না। অথচ শিক্ষণীয় করিলে জানা যায় যে তাঁহারা শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের বাইরা শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন। যতদিন না শিক্ষকগণ এই শিক্ষা-পদ্ধতিতে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন এবং গান্ধীজির মতো আদর্শবাদী না হন, ততদিন তাঁহাদের দ্বারা দুনিয়াদি-শিক্ষার প্রসার হইতে পারে না। দুনিয়াদি বিভাগের শিক্ষকগণকে গ্রাহ্যে প্রত্যেক বাড়িতে ঘাইমা দুনিয়াদি শিক্ষার অর্থ ও উপকারিতা বুঝাইতে হইবে, তবেই বিভাগের চার আসিবে। তাঁহাদিগকে সকল ব্যয়ের জন্য সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; গ্রাহ্যে ছোট-ছোট শিক্ষা-পদ্ধতিরের জন্য গ্রাম হইতে তাঁহাদিগকে উপকরণ ও অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। মোটের উপর শিক্ষক বৃত্তকে মনে করিবেন—তিনি ১১টা হইতে ৪টা পর্যন্ত স্থলে থাকিলেই তাঁহার কর্তব্য-সম্পাদন হইয়া গেল—তাঁহাকে যে বেতন দেওয়া হয়, তাহা শুধু ঐটুকু কাজের জন্য—ততক্ষণ দুনিয়াদি বিভাগের প্রতিষ্ঠার কোন অর্থ হয় না। গ্রাহ্যের কথা, আজ দেশে আদর্শবাদী শিক্ষকের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগগুলিতেও শিক্ষাব্যয়গণকে এই আদর্শবাদের কথা বুঝাইতে ও নিবাহিতে হইবে। ছেলেরাও লেখাপড়ার অবসরে যদি বাপ-মায়ের সঙ্গে কুচি, সো-পাশন প্রভৃতির কাজ করে, তবে তাদের ইচ্ছিত এতটুকু কমিয়া যাইবে না। স্থলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেরদের দ্বারা বা তরকারির চাষ, গরু-ছাগল হাঁস-মুরী প্রভৃতি পালন, তরলীতে স্ত্রী কাটা বা ঠাণ্ডে কাপড় বোনা, কাষার বা ছুতাঘের কাজ প্রভৃতি যদি আরম্ভ করে, তাহা হইলে শুধু ঐসকল কাজের মর্যাদা বাড়িবে না—ঐ সকল কাজের উৎকর্ষ বাড়িবে। অশিক্ষিত কৃষক অনেক! শিক্ষিত কৃষক অধিক কল ফলাইয়া বা অধিক মুখ সংগ্রহ করিয়া অধিক অর্থ উপার্জন করিবে।

আমাদের দ্বিতীয় ধারণা—স্থলে ছেলেরা পাঠাইতে হইলে তাহারা কাপড়, কাষা, ছুতা প্রভৃতি পরাইয়া তবেই পাঠাইতে হইবে। এ ধারণা ত্যাগ করা প্রয়োজন। শিক্ষকগণও শুধু অনাবশ্যক শোখা, ছুতা প্রভৃতি নিজে ত্যাগ করিবেন না, ছাত্র-ছাত্রীরা বাহ্যতে সেগুলি ত্যাগ

করে, সর্বদা সে বিবরে মনোবোষ্ট থাকিবেন। যৌত্রে পুড়িলে বা হুইতে ভিজিলে শরীর ধারণ হয় না, যত দীরে হাতে সজ্জ করা কমতা বাড়াইলে, মাথায় অধিক কষ্টহিস্ত ও স্বাস্থ্যবান হয়—এসকল কথা শিক্ষকগণ যদি নিজেরা সেগুলি আচরণ না করিয়া শিখাইতে দান, তবে সে-শিক্ষা কে গ্রহণ করিবে? খাওচা-পরাহ বাহমা যিনি দিন বাড়িয়া যাইতেছে—শিক্ষকগণ অবহিত হইলে তাহা সংক্ষেপে কমিয়া যাইবে।

কেহিতে ডাঙা চাউল খাওয়া, কেন-মুখ ভাত খাওয়া, চোপানের বসভাষা ত্যাগ করা, বিছুরের বংশে গ্রাহ্যে মুচি খাওয়ার চলন বৃদ্ধি করা, চিনির বদলে গুড় খাওয়া, শোকানের খাবার বর্জন করা, চিঁড়া নুড়ি বাতাসা প্রভৃতি ভোজ্যবাহীন খাদ্যের প্রচলন বৃদ্ধি করা—প্রভৃতি বিধের শিক্ষক-গণকে সর্বদা শিক্ষা দিতে হইবে। প্রয়োজনমতো বাড়ী কাটিয়া বাজা ও নালা তৈয়ারি করা, স্থলঘর ঘেরামত করা, স্থলের পুত্র স্বাস্থ্যের করা, স্থলের মাঠে তরকারির বাগান বা স্থলের বাগান প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে বালক-বালিকাঘের উৎসাহ দিলে, তাহারা বাড়িতে বাইরাও সে-সকল কাজে মন দিবে।

আমরা দুনিয়াদি বিভাগের প্রতিষ্ঠা করার পরও যদি দুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ না করি, তবে বিভাগেরের জন্য অর্থব্যয় নিরর্থক হইবে। গান্ধীজি তরলীতে স্ত্রী-কাটায়া কথা ব্যয় ব্যয় বলিতেন—পরিভাষার কথা, আমরা তাঁহার উপদেশে কর্ণপাত করি নাই। আজ সে-কথা সকলকে চিন্তা করিয়া দেখিয়া দায়িত্ব-নিবারণের উপায় হিসাবে তরলী-ব্যবহার গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রাহ্যে কাষার চাষ করিয়া স্ত্রী সংগ্রহ করিয়া যদি তরলীতে স্ত্রী কাটা ব্যয় ও সেই স্ত্রীর ঠাণ্ডে কাপড় বোনা হয়, তবেই বস্ত্রের দিক দিয়া আমরা ব্যবসারী হইব ও ধরত কমিয়া যাইবে।

স্বাধীনতা-লাভের পর দশবৎসর চলিয়া গেলেও, আজ আবায় নূতন কমিয়া দেশবাদিগণকে আমরা গান্ধীজির 'শিক্ষা'-বিষয়ক উপদেশ সমূহে সচেতন হইতে অনুরোধ জানাই। তাহা দ্বারা তাঁহারা নিজেবাই উপকৃত হইবেন। নচেৎ যে ধর্মের পথে আমরা অগ্রসর হইতেছি, তাহা হইতে বন্ধা পাওয়ার জন্য কোন উপায় নাই।

। শিকারী-জীবন ।

['বীহরেন্দ্রনাথ দাস গ্রন্থঃ । প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং আইসিটি লিমিটেড.

৯০, হাবলির রোড, কলিকাতা । পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২১২ । মূল্য ৩০/-]

বাংলার শিকার-কাহিনী বা শিকার-সম্বন্ধীয় বই থাকিলেও, তাহাদের সংখ্যা খুব কম : এই দিক থেকে আর-একখানি সুনির্দিষ্ট বইয়ের প্রকাশ শুভসম্বন্ধ বলিয়া মনে করি । লেখক ব্রহ্মশব্দ শিকারী, অতিজ্ঞাত প্রচুর ও বলিবার ভরী সরস, চিত্তাকর্ষক ভাষা বটেই, আবার বলিবার সাধারণতা । আবার সাধারণ পাঠক (সমালোচক রাইফেল, বন্দুক লইয়া সস্ত্রাহেয় পর সস্ত্রাহ, ঘাসের পর ঘাস ধরিয়া শিকারের চেষ্টা করিলেও একমাত্র কষ্ট-স্বীকার ছাড়া আর কোনও শিকার তাহার ভাগ্যে ছুটে নাই—সুতরাং সাধারণ পাঠক) লেখকের বর্ণনাভণে চোখের সামনে পদ্মার ডব, চিত্রা বৃন্দ, হাজারিবাগের জঙ্গল বা বাগিচায় ভাসিয়া উঠিতে দেখি ; তাহার পর শিকারের আহুতধিক কষ্ট, ধৈর্য, শিকার-অন্বেষণ ও সাফল্য প্রকৃতির বিবরণ ও লেখকের উপর তাহার প্রভাবের বিবরণ পড়িতে পড়িতে মনে হয় আবারও মনে সেদিন শিকার-পাড়িতে যোগ দিয়াছিলাম ।

লেখক 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন যে : "অনেকেই প্রশ্ন করেছেন—পরিষিদ্ধিগুলো সব সত্যি কিনা ? তার উত্তরে এই কথাই বলেছি, ঘটনা সবই সত্যি—তবে রস ভুলিয়ে তোলায় জল্প মাঝে মাঝে রক্তের পৌচ দিয়েছি বৈশি ।" কথাটা মনে তিনি ভয়ে ভয়ে বলিয়াছেন । এই রক্তের পৌচ না থাকিলে শিকার-কাহিনী এমন সরস ও জীবন্ত হইত না । বইটি লেখকের 'শিকারী-জীবন', সুতরাং এখানে রক্তের পৌচ থাকাই স্বাভাবিক ও থাকা উচিত বলিয়া মনে করি ।

বিখ্যাত লেখক জে. এম. ব্যারি দ্বঃঃ করিয়া বলিয়া-ছিলেন যে

"The Man of Science appears to be the only man who has something to say just now—and the only man who does not know how to say it."

লেখক শিকার করিতেও জানেন ও শিকারের অজ্ঞতা কি করিয়া বলিতে হয় তাহাও জানেন ।

লেখক শিকারের কথা বলিতে বলিতে তাহার নিজের সুখঃখের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাজেগে মনের ভাবভঙ্গি কোন সময়ে কি রকম হইয়াছিল ও আত্মনিবেশনের যে পরিচয় দিষ্টাছেন তাহাতে লেখককে জানা যায় । এইগুলি না থাকিলে 'শিকারী-জীবনে' একটা বিশিষ্ট স্থান দাঁড়া থাকিত । "গ্রন্থাঘাটে এসে ট্রেনের কাছাকাছি লুটিয়ে পড়লাম । তাঁর বাঁশীর আওয়াজ মনে আঁঠুনাশ করে তাঁরের মত বুকে এসে বিধগো—যেন একটা অজানা আশঙ্কার ছুরিকাঘাত । কে মনে ভেঙ্গে আবার চুরচার করে দিতে চায় । ট্রেন ছেড়ে দিলে—হঠাৎ কী জানি মনে হ'ল—বাঘাও বুঝি ছেড়ে গেলেন !"

এইটি রক্তের পৌচ নহে, লেখকের স্বর্গগত তাঁর অল্পভূতি—সত্য হইতে বাধ্য ।

বইটিতে আবারের মতে সামান্ত সামান্ত হুই-একটি জট আছে । লেখক কে-সকল বাঘ মারিয়াছেন তাহাটা লম্বা কত, সব কাছাকাছি তিনি বলেন নাই, আর কি বাঘ—Royal Bengal Tiger বা গুলাবাঘ বা চিত্রাবাঘ তাহাও বহু আচ্ছন্ন বলেন নাই । কত বোলের রাইফেল দিয়া মারিলেন তাহাও বলেন নাই, যদিও তাহার মাউসার-রাইফেলের কথা হইতে কত বোর অনুমান করা যায় । কি করিয়া বাঘ মাণে ও কেন ঐভাবে মাণে দেখ-দেখে পালা শিকারীর মুখে কিছু জনিতে আগ্রহ হয় । ১ম পৃষ্ঠায় 'এয়ারগান-কোবিয়া'—এয়ারগান-ক্রীতি হইবে ; ২০৩ পৃষ্ঠায় 'Tenter Hook'—tenterhooks হইবে ; ২০১ পৃষ্ঠায় 'Hyena'—Hyena হইবে ।

নিবেদনে তিনি লিখিয়াছেন : "আমার সাহিত্যিক বহুদৈর্ঘ্যের সনির্ভর অনুবোধেই আজ শিকারী-জীবনের নির্দোষিত কয়েকটি কাহিনীর প্রথম বও এখন হাত দিলাম ।" অ-সাহিত্যিক, অ-পরিচিত সাধারণ পাঠকগণের অনুবোধ মনে তিনি শীঘ্র শীঘ্র পরবর্তী বওগুলি প্রকাশ করেন ।



- বেণারঙ্গী
- মুর্শিদাবাদ
- ধনেশালি
- জর্জেট
- ঢাকাই

বিবিধ সিলের তাঁতের ধুতি, শাড়ী
 3 বিবাহের শয্যাঘরের
 বিপুল সমাবেশ!

ট্রেডার্স এসেমব্লী

• খুচরা বিক্রেতা কেন্দ্র •
 ১৬৯ বি, রাসবিহারী এডিত্য
 কলিকাতা
 ফোন ৪৬-২৬৭২

• হেড অফিস •
 ৮০, ফ্রান্স স্ট্রীট
 বড়বাজার
 ফোন ৩৩-২৫২৭

• পার্শ্বকর্তা বিক্রেতা কেন্দ্র •
 ১৪৮৭, পণ্ডিত পাট্টী
 বড়বাজার
 কলিকাতা



চিত্রলোক

পদ্মনাভ

চন্দ্রনাথ

প্রযোজনা : জীন স্রুপিঙ্গল-এর পক্ষে শচীন্দ্রনাথ বারিক।
 পরিচালনা : কাতিক চট্টোপাধ্যায়। কাহিনী : ১৭৭৫৮।
 চিত্রনাট্য : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা :
 ববীন চট্টোপাধ্যায়। চরিত্র-চিত্রণে : উত্তমকৃষ্ণায়, সূচিত্রা
 সেন, চন্দ্রাবতী, রেখা, লক্ষ্মী, রাজসম্বী, কবীর গাঙ্গুলী,
 তুলসী চক্রবর্তী, কঞ্চন মিত্র, মিতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তুলসী
 গাঙ্গুলী, হরিদ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান বাঘলা ও আরো
 অনেকে।

পিতাঃ পুত্রঃ পরঃ পুত্রঃ মণিশঙ্করের সঙ্গে মনোভাৱের
 ফলে বিশ্বদুঃখের ভাগ হয়ে থাকার পর অধিরূপিত চন্দ্রনাথ
 সেল তীর্থভ্রমণে। যুরতে যুরতে সে এসে হািমির হোলো
 কান্দিতে। পারিবারিক পাণ্ডা হরিদ্রনাথের বাড়িতে এসে
 উঠলো। হরিদ্রনাথের ঘরসংসার দেখানো করার ক্ষেত্রে
 যে বিবরণী প্রদান করা হলো, তার কিশোরী কন্যা সরস্বতী
 দেখে প্রথম দর্শনেই প্রেমের গড়লো চন্দ্রনাথ এবং তাকে
 বিয়ে করলো। সরস্বতী নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলো
 চন্দ্রনাথ। কিছুকাল পরে হরিদ্রনাথের কাছে থেকে চিঠি
 এলো মণিশঙ্করের কাছে। চিঠিতে প্রকাশ পেলো সরস্বতী
 মা ভ্রষ্টা ও কুলভাগিনী। বাখালদাস নামে বার-সকলে
 সে কুলভাগিণী হয়েছিল যেও এসে হািমির হোলো
 মণিশঙ্করের কাছে টাকার সন্ধান। সব শুনে, পুত্রের
 উপর দিয়ে চন্দ্রনাথ সরস্বতীকে ত্যাগ করতে চাইলো। সরস্বতী
 সে পরামর্শ দিলো বিব্রত খেয়ে প্রাণত্যাগ করার। কিন্তু
 অন্তঃসত্ত্বা সরস্বতী প্রাণত্যাগ না করে এক-বাগড়ে চলে গেল
 কান্দিতে। দেখানো তার ঠাই হোলোনা হরিদ্রনাথের
 বাড়িতে। হরিদ্রনাথের দাবাখেলায় বন্ধু বৃদ্ধ কৈলাস-পুত্রো
 তাকে নিজের মেয়ের মতো যত্নে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে
 রাখলেন। বধাকালে পুত্রবতী হোলো সরস্বতী। এদিকে
 চন্দ্রনাথের ঘন অশুশোচনীয় ভাবে উঠেছিল। অবশেষে

সে সরস্বতীকে কিভাবে আনতে কান্দি গেল। পুত্র-কোলে সরস্বতী
 ও চন্দ্রনাথকে কলকাতার গাড়িতে তুলে দিয়ে এসে অন্তিম
 নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কৈলাস-পুত্রো। সংক্ষেপে এই
 হোলো চিত্রকাহিনী।

অমর দর্শনশিল্পী শরৎচন্দ্রের লেখনী যে-সময়ে এ-কাহিনী
 রচনা করেছিল তখনকার সমাজ-ব্যবস্থার যে সমস্ত ছিল,
 বর্তমানে সে সমস্ত যে একেবারেই নেই, এ কথা বলা যায়না।
 তবে এ কথা সত্যি যে, অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে
 সমাজ-ব্যবস্থায়। সেইজন্মে 'চন্দ্রনাথ' ছবিখানি যে-সমস্ত
 উপকীর্ষ করে গড়ে উঠেছে, সে সমস্ত বর্তমান সমাজ-
 ব্যবস্থায় আরো কোনো সমস্ত কিনা, এ বিষয়ে বিতর্কের
 অবকাশ আছে। সমাজ-পরিবর্তনের কথা বাব দিলে,
 শরৎচন্দ্রের কালজয়ী কাহিনীর যে অপ্রত্যাশিত আছে এবং
 সর্বকালে থাকবে, তারই টানে সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শকরা 'চন্দ্রনাথ'
 দেখতে গিয়েছেন। এবং এইজন্মে ছবিখানি শহরের
 চিত্রগৃহে রক্ত-জয়ন্তী স্তম্ভের অতিক্রম করেছে। শরৎচন্দ্রকে
 বাব দিলে চন্দ্রনাথের যে আকর্ষণ, তা হোলো সূচিত্রা-
 উত্তমের সুগল অভিনয়। কিন্তু সব মিলিয়ে 'চন্দ্রনাথ'
 ছবিটিতে এমন কিছু নেই বা দর্শককে তৃপ্তি দিতে পেরেছে।
 বরঞ্চ বলা যেতে পারে, দর্শককে নিরাশ করেছে।
 শরৎচন্দ্রের কাহিনীর মধ্যে যে দলমবদীয়া কিশোরী সরস্বতী
 দেখা পাই, সে আত্মবিশ্বাসে ছবিতে অল্পপস্থিত। যদিও
 সূচিত্রা সেন প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তাঁর অভিনয়ে
 কিশোরীমূলত লক্ষ্যমাত্র ভাব আনতে, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ
 হয়ে গিয়েছে তাঁর অতিমাত্রায় যৌনচেতনা জাগিয়ে
 তোলাবার অপচেষ্টায়। যে সরস্বতী কাপড় ছাড়া অস্ত্র কোনো
 পোশাকগারে তোলে না, সে-সরস্বতী যে কি করে হালকাপোশাকের
 ব্যানিকিয়ার-করা লম্বা লম্বা মন রাখতে পারে, তা বুঝির
 আগোচরেই থেকে গেল। অবশ্য এ কথা সত্যি যে, কতকগুলি

জাহ্নবীর হুজিরা সেনের অভিনয় হয়েছে কুব্জগ্রাহী। কিন্তু পরিচালকের তুর্ভাবের জন্যে কতকগুলি দৃষ্টে তাঁকে বন্দনামের ভাণী হতে হয়েছে। সাবান-কাচা-অবস্থার সহজা বুদ্ধবার করে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে স্বভৌল পা-স্থানি দেখানোর যে কি প্রয়োজন ছিল (চতুর্থ শ্রেণীর দর্শকদের শিশু দেওয়া আর অসীম মন্তব্য করতে প্রয়োজিত করা চাড়া) তা বুঝতে পারা গেল না। তার পর ঝাঁপটেকে উপলব্ধ করে সরু ও চক্রবাকের কাপড়-চানচানি করার দৃশ্যটি নিছক ঝাঁপটানি বললে কোনো দোষ হবে না। উত্তমভূমারের অভিনয় সর্ব্ব সমতা রাখতে পারেনি। তাঁর প্রথম দিকের অভিনয়ের সঙ্গে শেষদিকের অভিনয়ের পার্থক্য সহজেই

চোখে পড়ে। কমল মিত্র, জহর গাঙ্গুলী আর তুলসী চক্রবর্তী চরিত্রাঙ্কণ অভিনয় করেছেন। নীতিশ মুখোপাধ্যায় চলনসই। মাঝে স্রজকিশোর ও মাঝী হরকালীর চরিত্র-হুটি বেতোবে হরিধন ও বেদুকায়ে দিগে হুটিয়ে তোলা হয়েছে তাতে মনে হয়, সার্কাসের মূল শোলাগুলির কাকে-কাকে যেমন ট্রাউনদের কলহত, গ্রিক সেইরকমভাবে এঁদের হুজুনকে ভাঁড়াবি করতে দেওয়া হয়েছে। এই হুটি চরিত্র হানির খোঁজকের বদলে বিড়কাই বহি করছে। সর্কীতাংল মোটাটুটি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গ্যাঙা একটা গানে পুরনো স্বরের পুনরাবৃত্তি শোনা গেল। আলোকচিত্র ও পঞ্চগ্রহণের কাজ উল্লেখযোগ্য।

পথে হলো দেবী

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অগ্রদূত।
কাহিনী : প্রতিভা বসু। সর্কীত পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়। চরিত্র-চিত্রণে : হুজিরা সেন, উত্তমভূমার, ছবি বিশাল, জহর গাঙ্গুলী, অম্বশূমার, পাখাড়ী সাজাল, চক্রবর্তী, শোভা সেন, ভারতী, কমলা মুখোপাধ্যায়, স্রাম লাহা। বিহির চট্টোপাধ্যায়, শিলির বটব্যাল ও আরো অনেকে।
দার্জিলিং-এর এক নার্সিং-হোমে অল্প মাইনের চাকুরি নিয়ে গেল নতুন-পাস-করা ডাক্তার জহর মুখোপাধ্যায়। সেখানে শাপের বাড়ির খনকুণের ঈশতি চৌধুরীর একমাত্র নাতনী, স্রকরী তরুণী মল্লিকার সঙ্গে তার পরিচয় হোলো। সে-পরিচয় বদানিয়মে পরিণত হোলো প্রণয়ে, এবং বিদ্যালয়কে সাক্ষী রেখে হুজুন হুজুনকে দ্বাবী-স্রী-রূপে প্রণয় করলো। এদিকে ঈশতি চৌধুরী তাঁর নাতনীর বিয়ে ঠিক করলেন বহুপুত্র প্রমথেশের সঙ্গে। প্রমথেশ বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে এসে বিয়ে হবে ঠিক হোলো। মল্লিকা জ্বরভাবে বিলেতে গিয়ে এক-আর.সি.এস. পাস করবার জ্বলে তার বায়ের সব গহনা দিয়ে দেব। জ্বরত বিলেত গিয়ে পড়াশোনা করে আর মল্লিকাকে চিঠি লেখে নিরন্তর। ঘটনাস্রমে সে-চিঠি ঈশতি চৌধুরীর হাতে পড়লো একদিন। তিনি সব জানতে পারলেন; জ্বরতকে চিঠি দিয়ে তিনি জানালেন মল্লিকার পূর্ব সম্বন্ধিতে তার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে প্রমথেশের সঙ্গে। জ্বরত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। বিলেত থেকে সে পাস করে দেশে ফিরবার পথে ভিয়েনায় আসে। সেখানে দেখা হয় প্রমথেশের সঙ্গে আর

তার বান্ধবী আরতির সঙ্গে হয় অল্পবয়সী। কলকাতায় ফিরে মল্লিকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ঈশতি চৌধুরীর কাছে অপমানিত হয়ে ফিরে আসে জ্বরত। তার মুখে সনাতনহুতি জানার আয়তি, সেই সঙ্গে চায় তার সম্বন্ধিনী হতে। জ্বরত কি করবে ঠিক করতে পারে না। একদিন আরতির দিকির সঙ্গে তাদের বাড়ির গানের শিকড়ির সন্ধান করতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ পায় মল্লিকার। জানতে পারে—সাহুর আশ্রয় ত্যাগ করে এসে মানসিক ব্যাধিতে কুপছে সে। আরতিকে জ্বরত জানিয়ে দেব যে, তার হানি মল্লিকার কাছে। তারপর তাকে নিয়ে চলে আসে সনুভূতীয়ে, চিকিৎসার জন্যে। আন্তরিক বয়র ও বহুতায় সে কুত্সাপথবাক্তরী মল্লিকাকে হুহু করে তোলে। পুনর্নিগন হয় হুজুনের। এট হোলো সন্দেহিত চিত্রকাহিনী।

অগ্রদূত-গোষ্ঠী এর আয়ের কয়েকটি ছবিতে দুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু যে আশা নিয়ে 'পথে হলো দেবী' বেধতে গিয়েছিল সে-আশার তাঁরা নিরাশ করেছেন এবার। এখন 'সেভাকলার' বাংলা-ছবি হিসেবে কেবলমাত্র বর্ষাবিজিয়ারে সমাবেশ চাড়া আর কিছুই তাঁরা বিতে পায়নি। অভিনয়ের দিক থেকে একমাত্র হুজিরা সেন চাড়া আর কারও অভিনয় চোখে পড়বার মতো নয়। বিশেষ করে মানসিক-রোগগ্রস্ত চরিত্রটির অভিনয়ে তিনি যথেষ্ট বকতায় পরিচয় দিয়েছেন। উত্তমভূমারের অভিনয় চলনসই। এঁরা হুজুন ছবিকা-নিপিতে থাকার জ্বলে ছবিটি রক্ত-জ্বরতী সগ্রাহ অভিক্রম করেছে। ছবিটির

কাহিনীর মধ্যে নৃত্যীবানার কিছুই নেই। কতকগুলি জায়গায় অসঙ্গতি বড় একটি হয়ে উঠেছে। দার্জিলিং-এর নার্সিং-হোম আর ভিয়েনার হাসপাতাল, এই দু-জায়গাতেই অল্প কোনো রোগীর অস্থগস্থিতি চোখে লাগে। যন্ত্রিকার জাই-এর ডাঙা হাত জোড়া-লাগানো নিবে জরুরের সঙ্গে অপর একজন ডাক্তারের মতবিবোধ বেড়ায়ে দেখানো হয়েছে তাতে হৃদবৃদ্ধির অভাব চোখে পড়ে। যন্ত্রিকা তার দাহুর আঙ্গুর থেকে চলে আসবার পর দাহুর প্রতিক্রিয়া কি হোলো তা না-দেখানোতে, ঐশ্ব্যতি চৌধুরীর চরিত্রটি অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। গেন্ডাকদারে তোলা ছবিতে—যেখানে দার্জিলিং-এর মনোরম পার্বত্য দৃশ্য দেখাবার সুযোগ ছিল, সেখানে শুধুমাত্র রেল-স্টেশন, নার্সিং-হোম এবং অল্প একটু প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখানো

বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। গেন্ডাকদারের বর্ষবৈচিত্র্য বোঝানোর অল্পে যন্ত্রিকাকে বেড়ায়ে বনন-তপন প্রবেশের শাড়ি পরানো হয়েছে, 'তা পুষ্টীপূজাপাঠক হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে, কয়েক জায়গায় তাকে বেড়ায়ে খন্ড শাড়ি পরিয়ে দর্শকের সারনে তুলে ধরা হয়েছে তা অত্যন্ত দুষ্টিকটু হয়েছে এবং প্রকাশ পেয়েছে শালীনতার অভাব-বোধ। পার্শ্বচরিত্রের অভিনয়, এতদ্বারা ছবি বিখ্যাস চাড়া, বনে থেপাশাত করে না। গানগুলির মধ্যে হুসীত হয়েছে একটি কি দুটি। কদ্যাকৌশলের অভ্যন্তর দিক সাধারণ জরুর। শিল্প-নির্দেশনার কিছু কিছু নৃত্যীবানার ছাপ পাওয়া যায়। মোটের উপর, প্রথম বাংলা গেন্ডাকদার-ছবি চাড়া—'পথে হলো বেরী'র বিবরে উল্লেখযোগ্য আর কিছু নেই বললে, কোনো অজ্ঞার কথা হবে না।

। আ গা মী আ ক র্ ষ ৭ ।

পুশ্পধনু

পশারিনী

সমকালীন বাংলার অজ্ঞতম শ্রেষ্ঠ কাহিনীরা একোথাকুথায় সাত্তালের প্রেমধনুর উপভাস 'পুশ্পধনু' চিত্রে রূপান্তর করেছেন অপোষ মিত্র। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন হুসীল মজুমদার। অসম্পূর্ণ করেছেন রাজেন সরকার। বিভিন্ন চরিত্র-রূপায়ণে আছেন—উত্তমকুমার, অরুণমতী মুখোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, অমর যন্ত্রিক, তাহা বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, সর্বারকুমার ও নবাগত শিল্প বামবেদা প্রকৃতি শিল্পী। ছবিখানি বর্তমানে টেকনিসিয়াল স্টুডিওতে রুত সমান্তরিত পথে।

তরুণ কথা-সাহিত্যিক সমবেশ বহু রচিত কাহিনী অবলম্বনে পি. এল. কিশোরের প্রথম অবলম্বন 'পশারিনী'র চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন কৃতী চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক জ্যোতির্ষ রায়। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রযোজক কলী লাহিড়ী স্বয়ং। তরুণ সঙ্গীত-পরিচালক প্রবীর মজুমদার স্বরবোজনা করেছেন এবং নেপথ্য-সঙ্গীত-শিল্পী ধনরাজ ভট্টাচার্য ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় কর্তৃক দিয়েছেন। চরিত্র-রূপায়ণে আছেন—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, শোভা সেন, ছায়া দেবী, রাজলক্ষ্মী, সাধনা রায়চৌধুরী, নির্মলকুমার, অমরকুমার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাস্টার ব্রজেন প্রকৃতি শিল্পী। ছবিখানি বর্তমানে শহর ও শহরতলির চিত্রগৃহে দ্বিতীয় দিন গুনছে।

প্রবেশ নিবেশ

ডেলী প্যাসেজার

হরিশাধন ভট্টাচার্যের প্রযোজনায় গণচিত্রম-এর প্রথম ছবি 'প্রবেশ নিবেশ'-এর চিত্রগ্রহণ ইক্ষুপতী স্টুডিওতে নিয়মিত এগিয়ে চলছে। বিহির সেন বিরচিত এই হাস্যমধুর চিত্রকাহিনী পরিচালনা করছেন নবাগত হুসীল ঘোষ। সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন হুসীল দাসগুপ্ত। বিভিন্ন চরিত্রে রূপধান করছেন—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, পদ্মা দেবী, খিতা চট্টোপাধ্যায়, ছবিভা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণীদাসা, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরকুমার ও নবাগত কুশল চৌধুরী।

নামকরা চরিত্রাঙ্গিনেতা সাধন সরকার তাঁর নিজস্ব প্রযোজনা-প্রতিষ্ঠান থেকে শৈলেশ বে রচিত কাহিনী অবলম্বন করে 'ডেলী প্যাসেজার' নামে একখানি ছবি তুলেছেন। ডেলী-প্যাসেজারের সামাজিক জীবন ও তাগের আত্মহিক দুঃ-দুঃখ, আশা-নিরাশা রূপায়িত

হয়েছে এই ছবিতে। এর পরিচালনার দায়িত্বও বহন করেছেন প্রযোজক সাধন সরকার। হর দিবেছেন তরুণ কণ্ঠশিল্পী কামল মিত্র। বিভিন্ন চরিত্র ছুঁয়ে চলেছেন—হবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, তুলসী লাহিড়ী, প্রদীপকুমার, শীতল বসুগোপাধ্যায়, মলিনা, তপতী ঘোষ, পদ্মা দেবী, রাণীবালা, নিত্যানন্দী, যখন প্রকৃতি তৃতী শিল্পী। ছবিখানি বর্তমানে আগর মুক্তির আশায় রয়েছে।

ডাক্তারবাবু

'মুঁচি জীন' প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় অবদান 'ডাক্তারবাবু' বিতরণশক্তির পরিচালনায় ইস্ট ইন্ডিয়া স্টুডিওতে জুট সমাপ্তির পরে এগিয়ে চলেছে। গ্রাম্য বাংলার সমাজ-জীবন এবং জীবনব্যবহার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমাজ-বাহন্যার পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এবং এই প্রয়োজনের তাগিদে সমাজসেবীরা যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তাকেই ত্রিভি করে চিত্রকাহিনী রচনা করেছেন বিজন ডাক্তার।

। খুচরো খবর ।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলচ্চিত্রের আদান-প্রদান সম্পর্কিত অসমঝাঝার অবদান ঘটাবার ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রযোজক-সমিতি চেষ্টা করছেন বলে প্রকাশ। এই বিষয়ে খোলাসুন্নিভাবে আলোচনা করার ক্ষেত্রে পাকিস্তান থেকে একটি চলচ্চিত্র-প্রতিনিধি-দলকে ভারতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বর্তমানে ভারত-পরিদর্শনরত পাকিস্তানী প্রযোজক-পরিচালক জনাব এস. ফজলি সম্প্রতি বোম্বাইতে এক আলোচনা-সভায় এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, উভয় রাষ্ট্রের চলচ্চিত্র-শিল্পের কর্ণধারদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে সম্ভাব্যজনক স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব হবে।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে মাদ্রাজে যাত্রা ভারত সিনেমা-কর্মচারীদের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার তোড়জোড় চলছে। দক্ষিণ-ভারতীয় সিনেমা-কর্মচারী সমিতি এর উদ্যোগে। ভারতের সমস্ত রাজ্য থেকেই বাড়ি প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দেন ভারত প্রযোজনীর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। সিনেমা-কর্মচারীদের ব্যবহারী অভাব-অতিশয় পর্যালোচনা এবং

নাথ-ভূমিকার অভিনয় করছেন বাংলার সর্বজনপ্রিয় নট উত্তমকুমার; অন্তর্য চরিত্রে রূপসান করছেন—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কাজল চট্টোপাধ্যায়, কদল মিত্র, পদ্মা দেবী ও তাহা বসুগোপাধ্যায়। অরুণকুমার দায়িত্ব নিয়েছেন রাজেন সরকার।

শশীবাবুর সংসার

নবগঠিত 'গ্রেস পিকচার্স'-এর প্রথম অবদান 'শশীবাবুর সংসার' গড়ে উঠেছে আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বন করে। পরিচালনা ও সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন সমাজসেবীরা মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমারী মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী, তপতী ঘোষ, জীবন বসু, পাহাড়ী সান্তানু, বসন্ত চৌধুরী ও অরুণকুমার মুখ্য চরিত্রগুলি রূপায়িত করছেন। ছবি-খানিও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মুশেহজুক চট্টোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণের কাজ নিয়মিত এগিয়ে চলেছে ইস্ট ইন্ডিয়া স্টুডিওতে।

সেগলির প্রতিকাহের কার্যকরী উপায় নির্ধারণই এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

চিত্রলেখা মুভিটোন নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রায়-ব্যোতিস্মুহে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৬তম অধিবেশনের একখানি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করছেন। কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যবহারী খুঁটিনাটি এই প্রামাণ্য চিত্রে স্থান পাবে। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন বর্দি শর্মা এবং চিত্রটির মুখ-প্রযোজক শ্রীবিবেকানন্দ ও ছদ্মহনাথ আগরওয়াল। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। কংগ্রেস-অধিবেশনের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যাতে প্রামাণ্য চিত্রটি দেশে ও বিদেশে মুক্তিলাভ করে তার ক্ষেত্রে চেষ্টা করা হচ্ছে বলে প্রকাশ।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্ততম শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেত্রী তৃপ্তি দিগে পাকিস্তানের সের্ত্ত্বী সিম্প্র প্রযোজিত পূর্ণাঙ্গ উচ্চ 'ভিন্না' জাগো হুয়া সবেয়া'তে নায়িকার ভূমিকার অভিনয় করবার ক্ষেত্রে হৃৎকিত্ত হয়েছেন। পদ্মনাথীর নায়িকাদের

জীবন নিয়ে হেলা! এই ছবিখানি উত্তর ছাত্র বাণেশ্বর ও জিভি ডাঃহেও জগদীশ চন্দ্র বর্গাঙ্কল ঐচ্ছামান-কল্যাণে।
নাচকরা তৃতীণ চলচ্চিত্রকর ওয়াটার্স ল্যাব্‌স্‌ দ্বাৰা
নিৰ্দ্দেশন চিত্ৰগ্ৰহণের। চিত্ৰকীৰ্ত্তিগাননা: কংগন জনাব
ও, ক্যামেরা এবং নিৰ্দ্দেশনমণ্ডর: ডাব বনন কংগন
মদ্যলীল পণ্ডা-শিল্পী। জহরর আবেশের। পদ্মশ্রী
স্বাভাবিক পরিবেশে বসন্তে ডোলা হয়ে ছবিটি।

বাংলা ওবা ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পকে আত্মসমীক্ষিত
খ্যাতির আসনে অগ্রভিত্তি দেবার ভাজে কলিকাতা পৌর
প্রতিষ্ঠান সম্মতি পৌরসভা ভবনে অরুণিচ এক সভায়
'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' চিত্র দুটির সম্বন্ধে
সভাস্থিৎ বারেক নাগরিক সম্বন্ধমাত্র সম্বন্ধিত করেন।
অনুরোধে পৌরোচিত করেন পৌরপ্রধান ডাঃ রিডগা যেন।
পৌরসভার ইতিহাসে এই প্রথম একজন চলচ্চিত্র-সম্বন্ধকে
নাগরিক সম্বন্ধনা জ্ঞাপন করা হোয়েছে। সম্বন্ধমাত্র
প্রত্যক্ষ সম্বন্ধিত হয়ে বলেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁর সম্বন্ধমাত্র
বলছেন: চিত্র দুটির নির্মাণের পিছনে যেমন শিল্পী ও কলা-

কুলাদিত কাল যাতে চলে: স্বপ্নেই এই স্বপ্নের আদিকাল।
স্বপ্নের সময়েই প্রাচীরে যে কিসকম উত্তর ধরনের
শিলাসিঁড়ি স্বপ্ন, তারই প্রকৃতি প্রমাণ এই চিত্র দুটি। যেই
প্রাচীরে সংস্কৃতের আদিক এই স্বপ্নমণি।

ইঙ্গলেণ্ডের সুবিখ্যাত চলচ্চিত্র-প্রযোজক ডে. অ্যান্থনি হ্যাভ অর্গানাইজেশন 'পি উইথ কান্ট্রি সীড' নামক একখানি ইংরেজি ছবি তোলার কাজে একজন দিল্লী ও দল-দলগলীকে ভারতে পাঠিয়েছেন। এই দলে আসছেন চণ্ডীখানির প্রযোজিকা বেদী বসু ও পরিচালক বালা টমাস এবং প্রাক্তন চল্লিশজন শ্রমী ও দলগলী। ছিটের মধ্যে দুইজন সদস্য ভারতে অবতরণকারী একজন ইংরেজ সামরিক বিমান-পরিচালক ও ভূমৈত্রী জগদীশ তরুর মধ্যে মনুষ্য প্রেমের কাহিনীকে ভিত্তি করে চণ্ডীখানি গড়ে উঠবে। কাহিনীর ঘটনাবল্য ভারতের, তাই ভারতীয় পরিবেশে এটি তোলা হবে দিল্লী, অমৃতসর ও আম্বারের বিভিন্ন স্থানে। চলচ্চিত্রগুলিকে বিশেষ অভিযানে ও অভিনয়ী ব্যবস্থানে কিত্তি জনপ্রিয় বসু চল্লিশটি মিথিগে বসু ছবি ভারতীয়দের

ਸਤਨਾਮੀਰ ਅਡਿਟਰ

উৎসর্গ



ଟି.ଜି.ଆର୍.ଡି ଏଞ୍ଜ ନମ୍ବର

ପଞ୍ଚ, କର୍ମବିହାରିକା ଶିଳ୍ପ, କଳିକାତା-୬





স্থিতি

ফুটবল :

৷ আই.এফ.এ. শীট ৷

অংশে স্থগিত প্রতীকার পর কোনরূপে আই.এফ.এ. শীটের ফাইনাল পেনাল্কে সমাপ্ত করা হোলো। ভারতীয় ফুটবলের ক্ষেত্রে 'ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন'-এর নাম সংকল্পবিশিষ্ট। কিন্তু ক্রমশঃ ঐরা কীট-পরিচালনার বে নন্দন দেখাচ্ছেন এতে ভবিষ্যৎ ঐদের হুমাস বজায় থাকবে কিনা তা সন্দেহের বিষয়। আই.এফ.এ. শীট ভারতের অল্পতম শ্রেষ্ঠ ও বনৌ প্রতিনিধিত্ব। কিন্তু ঐরা এটরকম উৎসাহ-উদ্বীপনা-হীন পরিসমাপ্তি যথেষ্ট খেজকনক। হাই হোক, রেলওয়ে-পোন্টিস নামটা নতুন হোলো, প্রতিস্থপিতার ক্ষেত্রে ঐরা মোটেই আনাতী মন, বরং মনেকের থেকে অগ্রগামী, এই ছিল সবার ধারণা। কিন্তু ঐরা যথাযোগ্য খেলা দেখাতে পারেননি। ফাইনালে খেলার মহামেডান শোটিং মল যোগ্য মল হিসেবেই ৩-০ গোলে জয়লাভ করেছেন। এ-পথা সত্যি যে, মল হিসেবে মহামেডান মল রেল-মলের থেকে যোগ্যতর। কিন্তু যে-মল ইন্ডিয়ান নেভি, হাযত্ৰাবাদ শোটিং এবং এরিয়ান-কে ভালোভাবে হারাতে পেরেছেন, সে-মলের পক্ষে মহামেডান শোটিংকে হারানোও শক্ত ছিল না। ১৯৪৪ সালে রেল-মল আর-একবার শীট-ফাইনালে প্রতিস্থপিতা করে বিজয়ী সন্মান লাভ করেছিলেন। এবার এঁরা শীটের খেলার কালিঘাট মলকে ১টি গোলে দিয়ে এক নতুন রেকর্ডের সন্নি করেছেন। অবশ্য বর্তমানের কালিঘাটকে দেখে অতীতের দ্বর্ধ কালিঘাটের কথা মনে পড়লে সত্যিই কষ্ট হয়। মূলে বেতে হয় যে, এঁরাই একদিন দীর্ঘ ও শীটের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বড় বড় মলগুলির পক্ষে রীতিমতো ভীতিকর

ছিলেন। এবার রেলওয়ে মল একে একে বার্মপুর ইউনাইটেড, এরিয়ান জাব, কালিঘাট জাব, হাযত্ৰাবাদ শোটিং ও ইন্ডিয়ান নেভি-কে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠেন। অপর দিকে মহামেডান মল একে একে শোটিং, ইউনিয়ন, ফিল্ডি এক, এ., কর্ত টেলিগ্রাফ ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন। ফাইনালের প্রথমার্ধেই সেগল আহমেদ (২) ও ওমর (১) গোলে করে জয়-পরাজয়ের স্বীকৃতি করে দেন। রেলওয়ে শোটিংসের আক্রমণ-ভাগের প্রধান গুহ প্রাণী বক্যোপাধ্যায় এইমিন মলচেরে হতাশাজনক খেলা দেখিয়েছেন। সেমিন তিনি যে-খেলা দেখিয়েছেন, ভারতের অল্পতম শ্রেষ্ঠ ও অলিম্পিক-ফেরতা কোনো গৌরব ফরোয়ার্ড যে এরকম খেলা খেলতে পারেন, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তিনি সেমিন অল্পতমপক্ষে ৪টি গোলের সুবর্ণ-স্বযোগ হারিয়েছেন। মাকে মাকে তিনি এরকম খেলাই খেলে থাকেন। তাই এখন থেকেই ঐরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

৷ ভূমাত কাপ ৷

'ভোজার্গ কাপ'-বিজয়ী হাযত্ৰাবাদ মল এবার ভূমাতও ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল মলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে এ-বছর ভারতের শ্রেষ্ঠ মল বলে প্রমাণ করেছেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ভারতের সব বড় বড় মলগুলিকেই এঁরা পরাজিত করেছেন। তবে গত ১৯৪১, ১৯৪২ ও ১৯৪৩-র বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল মলকে পরাজিত করাই এঁদের এ-বছরে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলে মনে হয়। তবে একটা কথা, এঁদের মল থেকে তিন-চারজন ভালো খেলোয়াড় চলে বাঙলা সফেও এঁরা যে প্রশংসনীয় প্রতিস্থপিতার সাহায্যে সলিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তার মূলে এঁদের আধিকারই হোক অথবা সস্ত্রীই হোক, তার অল্প আদায়ের আন্তরিক অভিনন্দন

জানাই। কাইনালে হারপ্রাব্য ও ইস্টবেঙ্গলের খেলার থেকেও আরও উপভোগ্য হয়েছিল সেমি-ফাইনালের খেলা। সেমি-কাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। খেলার দিক দিয়ে এ'রা আমাদের স্থানীয় দলগুলির কাছে অসুকরমীয়। আমাদের স্থানীয় দলের হু-একটি ডানে। খেলোয়াড় অল্প দলে বোগদান করলেই, অভাবী দলটি তখন দিশাহারা হয়ে পড়েন এবং নতুন স্ট্রিকের নতুন না দিয়ে অল্প জায়গা থেকে ডাঙা খেলোয়াড়ের আধনামির জন্ত উঠে-পড়ে লাগেন। আর আর একই খেলোয়াড় নিয়ে ধারা পর পর খেলবার চেষ্টা করেন, তাদের ভোকাই নেই। সাবাসে জানা যায় যে, এদের এই খেলা দেখবার জন্য যে পরিমাণ দর্শকের সমাগম হয়েছিল, দ্বিতীয় কোনো খেলাতেই নাকি এত দর্শক-সমাগম হয়নি। অবশ্য প্রথম দিনের খেলাটির নীমাংসার জন্য আবার হুট দলকে বেগতে হয়েছিল। ত্রিতীয়বারের খেলার প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর মোহনবাগান হল ৩-২ গোলে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায়গ্রহণ করেন। কাইনালেও হারপ্রাব্য ও ইস্টবেঙ্গলকে পরস্পর প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সন্ধান দিতে হয়। ইস্টবেঙ্গল হল প্রথমে গোলে করেও, শেষে ২-১ গোলে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন।

নীচে গত কয়েক বছরের কুতী প্রতিযোগিতার নাম নেওয়া হলো :

সাল	বিজয়ী	ধিকার
১৯০০	হারপ্রাব্য পুলিশ	—মোহনবাগান
১৯০১	ইস্টবেঙ্গল	—রাজস্থান
১৯০২	ইস্টবেঙ্গল	—হারপ্রাব্য পুলিশ
১৯০৩	মোহনবাগান	—এন. ডি. অ্যাকাডেমি
১৯০৪	হারপ্রাব্য পুলিশ	—হিন্দুস্থান এডওয়ার্ড-জ্যাকট
১৯০৫	মাদ্রাজ রেঞ্জি: সেক্টর	—আই. এ. এফ.
১৯০৬	ইস্টবেঙ্গল	—হারপ্রাব্য পুলিশ
১৯০৭	হারপ্রাব্য পুলিশ	—ইস্টবেঙ্গল

ক্রিকেট :

এবারের বণ্ডি-টিকিতে বরোদার কাছে বোম্বাই-এর পরাজয় সত্যিই আশ্চর্যজনক। ক্রিকেটে বোম্বাই সবচেয়ে শক্তিশালী দল বলেই এতদিন পরিচিত হয়ে এসেছে। কিন্তু সাইকোফাড ও প্রাক্তন টেস্ট-অধিনায়ক বিশ্ববিখ্যাত বিজয় হাজারের মৃত প্রচেষ্টা এবার তাঁদের নে-দ'র বর্ধ করে দিয়েছে। পাইকোফাড এই খেলায় ১১৮ রান করে তাঁর

হান কোথার প্রমাণ করেছেন। আর শ্রৌচ বিজয় হাজারে ১২৫ রান-আউট করে প্রমাণ করেছেন যে, তথাকথিত তরুণ টেস্ট-খেলোয়াড়দের চেয়ে তিনি কোনো আশে কম নন। মনে হয়, যে-কোনো দলের নিকটেই তিনি টেস্টে ব্যবহার পাবার উপযুক্ত। কিছুদিন আগে সি.এ.বি. শিল্ডের জুবিলি-খেলায় পিথব্রেক্ট বোলারদের বিক্ষে অন্যান্য ভঙ্গিতে খেলে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, এমনও তাঁর মধ্যে কীড়া-নৈপুণ্য আছে।

পূর্বাঞ্চলের লীগে পর পর আদাম, বিহার ও উড়িষ্যাকে পরাজিত করে বাংলা হল মীং-টেলের শীর্ষস্থানে নিজেদের নাম রাখতে সক্ষম হয়েছেন। একমাত্র আমাদের দিকে খেলাটিই টেডেন-গার্ডেনে হয় এবং অল্প খুটি খেলা বধাক্রমে জায়গেসবুধ ও কটকে হয়। বাংলা দলের পক্ষে এবার চারজন টেস্ট-খেলোয়াড় খেলেছেন। স্রুতজাং এবার বণ্ডি-টিকি ঘরে আনা বাংলা দলের পক্ষে খুব একটা অন্তর্য বলে মনে হয় না।

টেনিস :

এবারের 'জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতা'র সিঙ্গল-কাইনালে বিজয়ীর পুরস্কার লাভ করেছেন হুইডেনের হু-নম্বর খেলোয়াড় উল্ক স্মিড-ডায়ভেট ও এখনও খেলোয়াড় রমানাথ কৃষ্ণানকে ৬-৩, ৬-২, ৪-৬, ৪-৬ ও ৬-৩ সেটে হারিয়ে। সেমি-কাইনালে কৃষ্ণান ইংলণ্ডের বিখ্যাত খেলোয়াড় বিলি নাইটকে সেট-সেটে হারিয়ে কাইনালে গঠেন। অপরদিকের সেমি-কাইনালে বিজ ডায়ভেটের হু-নম্বর খেলোয়াড় নরেশকুমারকে অতিক্রম করে পরাজিত করে কাইনালে গঠেন। কৃষ্ণান ও নাইটের খেলার থেকে বিজ ও নরেশকুমারের খেলার যে কীড়া-নৈপুণ্য দেখা গিয়েছিল তা সভাই বিরল। নরেশকুমারের এইসিনকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বোধ করে তাঁর কীবরের প্রেট খেলা। হুর্ভাগ্য নরেশকুমারের। এই খেলার শেষের দিকে তিনি উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেননি। কারণ শেষের দিকে তাঁর পায়ের মাংসপেশীতে টান ধরেছিল। উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁর খেলার কলাকল যে কী হোতো, সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তায় অবকাশ আছে। টেনিসে নরেশকুমারের দ্রুত ক্রমোন্নতি যে কৃষ্ণানের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কাজনক সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্রুতজাং জাতীয়-চ্যাম্পিয়ন কৃষ্ণানকে ধীরে ধীরে অল্পে রাধার জন্ত নিজের খেলাকে যথেষ্ট উত্তম করতে হবে। কারণ শুধুমাত্র সিঙ্গল-এর জাতীয়-চ্যাম্পিয়নশিপ নয়, কুমার-কৃষ্ণান জুটিও ভারতসং

পৃথিবীর মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ছুটি। জাতীয় টেনিসে জুনিয়ার বিভাগে এবার প্রেমজিতলাল বাগলায় কে. মুখার্জীকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হবার পৌঁছান্য লাভ করেছেন। প্রেমজিতলালের ভবিষ্যৎ বিশেষ সম্ভাবনাময়।

মহিলাদের বিভাগে কুমারী দীপা পাণ্ডাবীকে পরাজিত করে মিসেস কে. বি. সিং (প্রবীলা খাড়া) চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। পুরুষদের ডাবলসে কুমার-কলান ছুটি সহকেই টলেণ্ডের বিলি নাইট ও টনি শিকার্ডকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র বিভাগের নৃত্তন প্রতিযোগিতা—গ্রেট-ইর্নামেটে প্রথম বছরে বিজয়ী হয়েছেন পাণ্ডাবীর অজিতকুমার।

নীচে খেলার কলাকল দেখা হোলো :

সিঙ্গেলস কাইনাল

উল্লেখ্য (স্ট্রিডেন)—১-৩, ১-২, ৪-৬, ৪-৬ ও ৬-৩ সেটে রমানাথ কলান-কে (ডারভ) পরাজিত করেন।

ডাবলস কাইনাল

নরেশকুমার ও আর কলান (ডারভ)—১-৪, ৬-৪ ও ৬-২ সেটে বিলি নাইট ও টনি শিকার্ড-কে (ইলও) পরাজিত করেন।

সিঙ্গেলস কাইনাল (মহিলা)

মিসেস কে. বি. সিং—৬-২, ৬-৩ সেটে মিস্ দীপা পাণ্ডাবীকে পরাজিত করেন।

সিঙ্গেল ডাবলস কাইনাল

নরেশকুমার ও মিসেস কে. সিং—৪-১, ৬-৪ ও ৬-২ সেটে বিলি নাইট ও মিসেস কে. বি. সিংকে পরাজিত করেন।

সিঙ্গেলস কাইনাল (বয়স্ক)

প্রেমজিতলাল—১-১, ৪-৬, ৬-৩ সেটে কে. মুখার্জীকে পরাজিত করেন।

ডাবলস কাইনাল (বয়স্ক)

প্রেমজিতলাল ও কে. মুখার্জী—৬-২ ও ৬-৩ সেটে সি. কোলি ও এম. সি. মিত্রকে পরাজিত করেন।

সিঙ্গেলস কাইনাল (পার্সন)

মিস এ. ল্যাঙ্কশেড—৬-৪, ২-৬ ও ৬-২ সেটে মিস্ আশিরাকে পরাজিত করেন।

গ্রেট কাইনাল

অজিতকুমার—৪-৬, ৬-০ ও ৬-১ সেটে পার্শ্বসাহিবকে পরাজিত করেন।

ডেভিস কাপ।

কেন্স রোজওয়াল ও লুই হোড-এর মতো বিশ্ববিখ্যাত খেলন খেলোয়াড় পেশাবাদী বৃত্তি অবলম্বন করলেও, গত টু-কন্সয়ের বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া এবারেও আমেরিকা-কে পরাজিত করে ডেভিস-কাপ পেয়েছে। রোজওয়াল ও হোড-এর সূত্রস্থান পুনর করেছেন অ্যান্সলে কুপার, মল অ্যাওয়ার্ডন ও বার্ডিন রোজ। তবে এরা এভাবে আর নিরন্তর প্রাধান্য বজায় রাখতে পারেননি। (এবারের খেলার কলাকল হয়েছে ৩-২)।

নীচে কলাকল দেখা হোলো :

প্রথম দিন

অ্যান্সলে কুপার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৬, ১-৫, ৬-১, ১-৩ ও ৬-৩ সেটে ডিক সেক্সাস-কে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মল অ্যাওয়ার্ডন (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ১-৪, ৬-৬, ১-৬ ও ৬-২ সেটে ব্যারি ম্যাকে-কে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিন

বার্ডিন রোজ ও মল অ্যাওয়ার্ডন (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৪ ও ৬-৬ সেটে ডিক সেক্সাস ও ব্যারি ম্যাকে-কে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

তৃতীয় দিন

ব্যারি ম্যাকে (আমেরিকা) ৬-৪, ১-১, ৪-৬, ৬-৪ ও ৬-৩ সেটে অ্যান্সলে কুপার-কে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ডিক সেক্সাস (আমেরিকা) ৬-৩, ৬-৩, ১-৬ ও ১৩-১১ সেটে মল অ্যাওয়ার্ডন-কে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

শেষ পাত

শিবরাম চক্রবর্তী

ভালোবাসলেই ভালোবাসা পাবেন। সাবধান !

‘আমাদের কমিউনিজম্, ক্যাসিজম্, গান্ধিজম্
সবই নিছক কথা। নিতান্তই বাতফকড়ি।’
(উদ্ধৃতি)

রিউম্যাটিজম্ও তাই। বাত।

দল বাড়ানো কেবল বোঁদল বাড়ানোর ভঞ্জেই।

জৈনিক প্রাদেশিক মন্ত্রী সম্প্রতি এক লালরঙের
হুত দেখেছেন বলে প্রকাশ।

তুল করে হুত দেখতে ভবিষ্যৎ ভাখেননি তো ?

‘চীনের পথই পথ’—একটি ইস্তাহার।

কিন্তু পথ চিনে যাওয়াই শক্ত যে !

রুশ-সাম্রাজ্যবাদ-বিস্তারের আরেক নমুনা :
“রুশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তিনটি নতুন গ্রহ আবিষ্কার
করে তাদের নাম রাখেন—রাশিয়া, মস্কো, আর
তরুণ কমিউনিস্ট।”

লাও ত্যাগ! এতদিন শুধু কমিউনিস্টরাই গ্রহ
ছিল, এখন আবার গ্রহবাণ্ড কমিউনিস্ট হচ্ছে !

“বিচক্ষণ ব্যক্তিদের মতে বিবাহ হচ্ছে প্রায়
লটারির মতই।”

ঠিক। বিয়ের আগে যে ফার্স্ট প্রাইজ পাবার
আশা করেছিল, বিয়ের পর ভাঙে সাধনা (পুরস্কার)
লাভ ছাড়া আর কিছুই সে পায়নি।

ভালোবাসার দাঁত আন্তে আন্তে বদলেও
আসলে তা হচ্ছে কচ্ছপের কামড়।

“সে-যুগে বিয়ের পরে বাসরঘরে শালীদের কান
মলতে দিতে হতো। ‘না’ বলার উপায় ছিল না।”
(স্মৃতিকথা)

দাতাকর্ণের যুগ সেটা।

‘হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা রূপে চালু করার ব্যাপারে
আনরা বেন মহিষের মতন গোঁয়ার না হই।’

—শ্রীরাভগোপালাচারী

কিন্তু রাজমহিষ এবং মহিষীদের কথা কেউ
বলতে পারে ?

একজনের চিঠি :

‘জানেন, আমার বৌ এমন পাকা রাঁধুনি যে,
রুটির চাটুতেই সে চমৎকার ডিমের কারি রাঁধতে
পারে।’

নিছক চাটুকবিতা—বলাই বাহুল্য !

ফুলে ফুলে কেবল মধুপান নয়, বেরিবেরিও হতে
পারে।

গলার চচ্চা নয়, লাড়ির চচ্চা না-পছন্দে
কালিকোনিয়ার এক যুবক জনৈক গায়ককে গুলী
করে মেরেছে বলে জানা গেল।

‘লাড়ি বে, আছো জুমি আমার গান-এর
ওপারে !’

পুস্তক-সমালোচনার অংশ : “লেখকের ‘ব্যাকরণ দর্শন’ বইটির মধ্যে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে যা পাঠকের নিজের জীবনে কাজে লাগতে পারে।”

বিশেষ করে বিজ্ঞপ্ত প্রকরণ ?

“এখানকার দশ হাজার ছাত্র ধর্মঘট করে ইঙ্কুল কানাই করছে...” (একটি চিঠি)

ক্রাস-রেইরেড নয় তো মশাই ?

গাজীপাহী এক বছর প্রায় : ‘রোজ রোজ একটু করে তক্লিতে মতো কাটিতে তোনার কী হয় ?’
কী আবার হবে ? তক্লিৎ !

অলঙ্কার কাল না দিলে হয় না, লঙ্কার এমনিতেই কাল !

নেহরু কসল ফলানোর দিকে ছোর দিতে কলায় রাজকোটের এক চাষা নিজের পরিচয় মত কপসী বোকে বলার বদলে লাঠলে জুড়ে দিয়েছে বলে প্রকাশ।

জরুরি পরি-স্থিতি, থাকে বলে !

অনেকে অভিজ্ঞতার থেকে কথা বলেন ;
অনেকে কথাই বলেন না—অভিজ্ঞতার থেকেই !

সেতার আর ভালোবাসার ছোট ছোট টানগুলিই বেশি মিষ্টি। আবার, টানাটানিতে সেতার যেমন ছড় খায়, তেমনি ভালোবাসাও।

অনন্ত এমন জিনিস যে কারো প্রয়োজনমত চলে না।

ভগ্ন ক্রমের দাবাই হচ্ছে ক্রমকে ফের ভাঙতে দেয়া। ও-জিনিস জুড়তে গেলেই ভাঙে এবং ভাঙতে ভাঙতে জোড় খায়।

এক পরমা আসলে একটা টাকা, তার থেকে ঘাবড়ানোর ট্যাক্সো বাস যাবার পর।

স্বপ্ন আর যুক্তির দুই টাঙ্গবার জিনিস, গুড় আর লগুড় দুই যেমন বাস্তব।

সাময়িক চালের অনটনের ক্ষেত্রে নেতার। চালের বদলে দেশবাসীকে কলা খাবার উপদেশ দিচ্ছেন, তাতেও নাকি শরীরের বেশ হিত হবে। কিন্তু চাল আর কলা একসাথে বাঁধতে পারলেই না পুরো হিত ?

“আমানে পোষা কুনকী হাতীদের দিয়ে জংলী হাতী পাকড়ানো হয়। কুনকীরা জঙ্গলে গিয়ে বুনেদের শুঁড়ে শুঁড় জড়িয়ে জুগিয়ে বেদার নিয়ে আসে।...কুনকীদের প্রেমে মাতাল হয়ে ঝাটাল হাতীরা বাঁধা পড়ে।”

‘আমার বেলা বে যায়

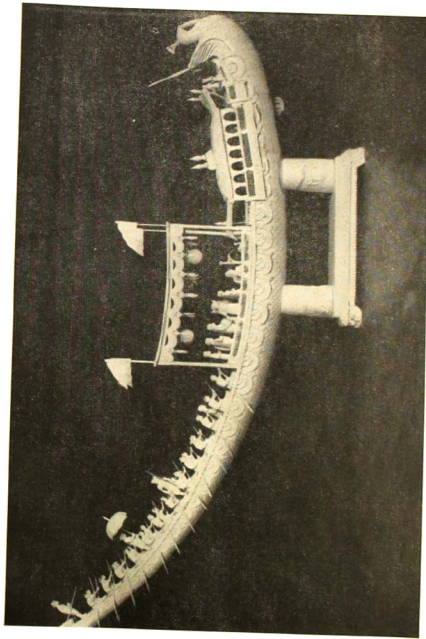
শাঁক বেলাতে।

তোমার শুঁড়ে শুঁড়ে

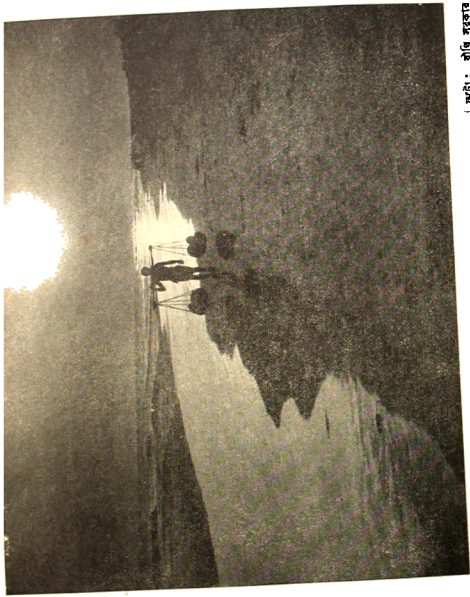
শুঁড় মেলাতে।’

সম্পাদক—শ্রীচাক্র প্রকাশনা

কে. সি. বহু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১, মহেন্দ্র গোস্বামী সেন, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীকেশবনাথ রাই কর্তৃক মুদ্রিত
এবং তৎকর্তৃক ৪২, কন্নওয়াসি স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত



মুর্শিভাবান্দে প্রদত্ত হাতীর দাঁড়ের কার্জনিক



। ফটো : বাণী সরকার

দিনের শেষে

মুক্ত হইল—দীর্ঘকাল ব্যবৎ ইহার নিষিদ্ধ হয় নাই। ১৮৪১-৪২ সনে 'পত্রিভোজার সভা' প্রতিষ্ঠার পর বর্ধমানবিশ্বব্রহ্ম প্রচেষ্টার মূলে স্থানীয়ভাবে পড়িল।

খ্রীষ্টানী-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে নেতি ও ইতিবাচক যে কর্মধারা প্রবর্তিত হয়ে, তাহা উক্তযন্ত্রের বাড়িয়াই চলে। সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, এবং শিক্ষানীতির রূপবলনের কালে বাংলা-শিক্ষা ও অস্থানীয়দের খুশি অসন্তুষ্ট গঠে। লর্ড হাডিঞ্জের নির্দেশে একদল-একটি বঙ্গ-বিভাগের বঙ্গপ্রদেশে স্থাপিত হয়। এইসব বিভাগসমূহে প্রাচ্যোপনিষৎ পুস্তক রচিত হইল, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রসাধন অতিথিক আদ্বায়েহু এলিক কর্তৃপক্ষের অসাধারণ দৃষ্টি পেলো। সন্তবপর হয় নাই। ইংরেজী শিক্ষার সমস্যাটা চমকিত হিলিবে—সরকারের এরূপ ব্যবস্থার সাধারণ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অসম্মত হুঁকিয়া পড়ে। ইংরেজী শিক্ষার বাধন নির্বাহকসমূহ একে প্রবৃত্তি শিক্ষাব্যবস্থাপকগণ 'Filtration Theory' নামক একটি ভাবনার প্রচার করেন। কিছুসংখ্যক লোককে ইংরেজী শিক্ষা দিয়া, তাহাদের দ্বারা হুইট কাক একই সময়ে করানো যাইবে বলিয়া তাঁহারা বড় প্রকাশ করেন : থানা—(১) ইংরেজী শিক্ষিতদের বিভাগসমূহের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া, তাহাদের দ্বারা সাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা, এবং (২) ইংরেজী সাহিত্যের সাহায্যে বাংলা ভাষার অনুবাদ করাওয়া বাংলা সাহিত্য ও বাংলা শিক্ষার সুদৃশ্য উন্নতিসাধন। কিন্তু ইংরেজী বিধি। অধিকাংশই শিক্ষা ও সাহিত্য-চর্চা ব্যতিরেকে অল্প কর্মে নিযুক্ত হইয়া পড়ায় 'কিল্ট্রেশন থিওরি' বানচাল হইয়া যায়। বানবোহেন-বন্ধু উইলিয়ম এডার গত বৎসকেই দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার অসুসন্ধানকালে এই বিচিরণ ব্যর্থতা অসুস্থ করিয়াছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে বহিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই থিওরির ব্যর্থতা কোরালে। ভাষার প্রশাধারি-প্রয়োগে দেশবাসীকে বুঝাইয়া দেন। বাংলা-শিক্ষার প্রতি সরকারী ঔদাসীন্য ও অবহেলার কথা রামনারায়ণ বসু কোয়ার-কুটি-সভার ১৮৪৮ সনের একটি বক্তৃতায় বর্ণনামূলক ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শিক্ষা ও বঙ্গ-বিভাগগুলির প্রতি সরকারের 'সম্প্রতিপত্তি'ব্যবস্থারের তীব্র শিক্ষা না করিয়া পারেন নাই। এই বৎসরে ত্রিভুজেরাধার বেলুন বক্তৃতাটির আইন-সচিব নিযুক্ত হইয়া আমায় পর হইতে বাংলা-শিক্ষা ও বাংলা-চর্চার বোঝা ক্রিয়ায় যায়। সরকারী মূল ও কলেজে বাংলা-শিক্ষা কথকিং প্রবর্তিত হয়। কলেজে বাংলা পত্রিকা অসম্মত প্রবর্তিত হয়। কলেজে বাংলা পত্রিকার উত্তীর্ণ সর্বোৎকৃষ্ট বালককে বেধুন হয় একটি পদক দিবার

ব্যবস্থা করিলেন। বেধুন কলিকাতার ও বঙ্গবঙ্গের গভর্নমেন্ট কলেজসমূহে বার্ষিক পুস্তক-বিভাগীয় সভার গমন করিয়া চারদলের বাংলা ভাষা-সাহিত্য-চর্চায় হস্ত হইতে সর্বদা উপবেশন দিতেন। তিনি কবির বহুস্বপন সম্বন্ধেও বাংলা ভাষার সাহিত্যসম্বন্ধে কবিত্তে অল্পস্বপন জানাইয়াছিলেন। বেধুন বহুস্বপন হন। কিন্তু তিনি বাংলার শিক্ষার প্রতি অল্পস্বপনের মধ্যেই সরকারী মনোভাব পরিবর্তন করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৮৪৪ সনের শিক্ষাবিবর্ধক ডেনপ্যাচে বাংলা-শিক্ষার অধিকৃষ্টে যে মনোভাব প্রকাশিত হই, তাহার মূল রহিত্যে বেধুন সাহেবের পার্থক্য প্রকাশ।

চতুর্থ দশকে সরকার-অনুসৃত প্রশাসনিক নীতির ফলে বাঙালী জিত যে ক্ষুণ্ণতা বা ঔদাসীন্য দেখা দেয় নাই, বরং তাহারা ইহা কাটাইয়া উঠিয়া আত্মপ্রত্যাবলিতে সক্ষম হয়, তাহার মূলে দেখিতে পাই বাংলার চিন্তামূলক ব্যক্তিগণ কর্তৃক অনুসৃত ইতিবাচক বা রচনামূলক কার্য। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' এবং 'ভারতবর্ষীয় সভা' (বেঙ্গল ট্রিটিন ইতিহাস সোসাইটি) পরস্পরের পরিপূরক হইয়া রচনামূলক কার্যে অগ্রসর হয়। পেন্ডোক্ত সভার প্রধান উদ্দেশ্য রাক্ষসনৈতিক হইলেও—শৌর্য-সংস্কার, খ্রী-শিক্ষা প্রভৃতি সমাজ-কল্যাণ বিষয়েও ইহা মনোযোগী হইয়াছিল। আবার, তত্ত্ববোধিনী-সভার মূল উদ্দেশ্য বেন্দোক্ত-প্রতিপাদ একেশ্বরবাদ-প্রচার হইলেও—বাঙালীর শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং প্রাচীন বিচারচর্চায়ও অবহিত হইয়াছিল। আর, বাংলার নব-জাগরণের ইতিহাসে এই দুই সভার কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। তবে 'ভারতবর্ষীয় সভা'র দশক মূল উদ্দেশ্য রক্ষা করা বেশিদিন সম্ভব হয় নাই। তত্ত্ববোধিনী-সভা কিন্তু চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে সে সমাজকল্যাণের কার্যে রতী হয়, তাহার বল অসুপায়িত হইয়াছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' ১৮৬৩ সনে হুগলি জেলার অন্তর্গত বংশবাটীতে স্থানান্তরিত হইয়া অর্ধাভাবে ১৮৬৮ সনে উঠিয়া যায়। কিন্তু সভা-প্রবর্তিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' উক্ত দুই দশকে চলিয়াছিল, পরন্তু সভা রহিত হইবার পরও কলিকাতা (পরে আদি) ব্রাহ্মসমাজের আত্মকৃত্যে প্রায় পঁচাত্তর বৎসর চলিয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার শিক্ষা, সাহিত্য, বর্ণন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সামাজিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, স্বাস্থ্য, খ্রী-শিক্ষা—কত বিষয়েই যে আলোচনা হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। সচিব রচনা প্রকাশের ব্যবস্থাও ছিল এই পত্রিকাধারিত। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উন্নতিতে এবং বঙ্গের দিকে দিকে লোকনিক-প্রচারে তত্ত্ববোধিনী-

পত্রিকার কৃতিত্ব অসাধারণ। এই পত্রিকার মাধ্যমে শাস্ত্রচর্চা, জগৎবেদের মূল সূক্তের অর্থবোধ-প্রকাশ শে-মুন্সের একটি মতবৃত্ত ঘটনা। বিলাতের ইন্সটিটিউটা সোম্পারি অধ্যাপক ব্যাংকলারের সম্পাদনায় জগৎবেদ প্রকাশের যত্ন পরিচাল্য করেন। কিন্তু বেসবিক-চর্চা পুনঃপ্রবর্তনের অল্পতম প্রধান উদ্যোগী মহাবি বেনেব্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বাবোধিনী-পত্রিকার উক্ত মূলসূক্ত ও অর্থবোধ প্রকাশে উদ্যোগী হন, আর অর্থবোধক তিনি নিজেই। যত্ন বেনেব্রনাথ-চর্চার উদ্দেশ্যে তিনি পূর্বেই কাম্বোজে সভার আহ্বানকৃত্যে, চারিজন ব্রাহ্মণ-স্থলকশে পার্শ্বহইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বোসাত্মকশি বেনেব্রনাথ সর্বকণ্ঠে ব্যুৎপন্ন হন। তিনিও বেনাক্ষের বহু ভাষ্য ও অর্থবোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রেনেশান বা নবজাগৃতির যে অল্পতম মূল কথা—প্রাচীন শাস্ত্র অথচ অপরিস্রাভ বিচার পুনরুদ্ধার, তাহা তত্ত্বাবোধিনী-সভা এবং ইহার নেতৃত্বকের দ্বারা বহুমাণে সার্থকভাবে সাধিত হইয়াছিল।

বেপুনের বাংলা-সাহিত্যের চর্চায় সহায়তার কথা একটু আগেই বলা হইয়াছে। এখন, তাহার আর একটি কার্যের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব—বাংলার নবজাগৃতির পক্ষে এ কার্যটি যে অঙ্গগ্রন্থ হইয়াছে, গত শতাব্দীর ঐতিহাসিক দ্বায়েই তাহা স্বীকার করিবেন। এইট হইল তাহার ত্রী-শিক্ষা-প্রবর্তনের কাম্বিনী। এ পর্বত শে ত্রী-শিক্ষার আয়োজন হইয়াছিল, ঐষ্টান মিশনারী গ্রীষ্ম ছিলেন ইহার উদ্যোক্তা, পার্শ্বা তালিকার বাংলা বাইবেল অধ্যয়ন আবশ্যিক ছিল। ভারতীয় সমাজে ঐষ্টান্ত প্রচার যে এক্স প্রচেষ্টার মূল তাহাও কবে একটু হইয়া পড়ে। প্রথম প্রথম হিন্দু-প্রধানেরা ত্রী-শিক্ষার সমর্থক ও সহায় হইয়া তাহাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। এই হিন্দু-প্রধানদের মধ্যে রাজা রামাকান্ত দেব, রাজা বৈষ্ণব রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। রামাকান্ত দেবের উৎসাহে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ত্রী-শিক্ষার সপক্ষে ‘ত্রী-শিক্ষাবিধাবক’ পুস্তক প্রচারিত করিয়াছিলেন। ত্রী-শিক্ষা-প্রচেষ্টার মিশনারীদের দৃঢ় উদ্দেশ্য জানাকামি হইলে, হিন্দু-প্রধানেরা কবে সহিয়া দাঁড়ান। এইসব প্রচেষ্টারের উপর জনসাধারণ বীভৎস হয়। ইহা দ্বারা সমাজের বিশেষ উপকার হওয়া আর সম্ভব হইল না। রামমোহনায় যোগ, শাস্ত্রী কল্যাণহন কল্যাণাধ্যায় প্রমুখ নব্যদের নেতৃত্বক ত্রী-শিক্ষার প্রতি নিকৃতি সাধারণের উৎসাহ অমায়িকার অল্প বিবিধ উপায় অবদান করেন; ‘ভারতবর্ষীয় সভা’র মাধ্যমেও কিকিৎ

চেষ্টা হইয়াছিল। বারাসতে একটি সাধারণ প্রকাশ বালিক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় স্থানীয় অধিবাসী কান্টিক মিত্র ও নবীনকুম মিত্র এবং বাসাসতে ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক শ্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বন্যাহন, বেপুন এই বিদ্যালয়টি সেবিবার পর কলিকাতায় একটি বালিক-বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর হন। বেপুন কলিকাতায় ১৮৬১ সনের বে কলেজ বালিক-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তাহার এই কার্যে রামমোহনায় যোগ, দক্ষিণারজনমুখোপাধ্যায়এবং পণ্ডিত মনমোহন তর্কালঙ্কার প্রথম হইতে সহায় হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়টি পরে বেপুনের নামানুসারে বেপুন মূল ও কলেজ-বিভাগ বেপুন কলেজ নামে আখ্যাত হইয়াছে। বেপুন-মূল-প্রতিষ্ঠা জাতির নবজাগৃতির ঐতিহাসে একটি অদ্বৈত ব্যাপার এই কারণে যে, ইহাতে শুধু কলিকাতা শহরের বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা-বিভাগের পথ স্থাপন হয় নাই, বরঞ্চ বেপুনে ত্রী-শিক্ষার মোক্ষের যোগের আগতি ছিল, এই প্রতিষ্ঠানটি আদর্শরূপ হওয়া এবং সরকারের সহায়দ্বিত্ব ও আহ্বানস্বরে দক্ষন তাহা ক্রমশঃ সমাজে বহুদল হয়। কলিকাতার নিম্বটে ও দূরে বালিক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। বেপুন কলেজের ছাত্রদিগকে যেমন বাংলা-সাহিত্য-চর্চার উৎসাহ দিতেন, তেমনি অল্পদিক ত্রী-শিক্ষা-বিভাগেরও অগ্রপ্রেরণা জোগাইতেন। তাহার উপদেশে অগ্রপ্রতিষ্ঠ হইয়া আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর শিতা ভগবানচন্দ্র বসু বীর কল্যাণের স্বাধীন শিক্ষাসনে তৎপর হইয়াছিলেন। সমাজের অধ্যায়ের ভিতরে চেতনার উদ্রেক না হইলে নবজাগৃতি সম্ভব নয়, বেপুন তাহার পথ করিয়া গিলেন। তাহার দ্বারা ‘ত্রী-শিক্ষা-বিদ্যালয়’ের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। শ্যারীচরণ মিত্র ও রামনাথ সিকদারের মুখ-সম্পাদনায় প্রথম ত্রী-পার্ট ‘মাসিকপত্র’ নামীয় পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া মাসীজাতির চিত্তোৎসাহ করিতে লাগিল। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ‘সংবাদ-প্রভাকরে’ কোন কোন মহিষার কবিতা ছন্দমায়ে প্রকাশিত হইতে থাকে। পরবর্তী বর্ষ ও শতাব্দীতেও নানীয়া যে, কি ধর্মালোচনার কি সাহিত্য্যমূলক যে কতকটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন তাহার ভিত্তি হইল—পঞ্চরশকের এইসকল প্রসঙ্গ।

আমরা এতিনিবৃত্ত প্রভাষ করি—চায়াগাছ বধন বড় হইতে থাকে তখন তাহার কত বাধা, কত বিপদ, কত শত্রু। প্রভাষ জগদীশ, পালন-পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৃত। জাতির আত্মসম্বন্ধ বধন ক্রমিতে থাকে, তখন তাহার বিধ বধ। কিন্তু ইহার ভিত্তিস্থল ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর

করিতে পারিলে তবে ইহার অসম্ভবত্বের শেষকেই আটকাইতে পারে না। চতুর্থ দশকের প্রচেষ্টাসমূহ এই কার্য করিয়াছিল। একদিকে সরকারী ও অপরদিকে মিশনারীদ্বয়ের বাধা—এই-সবল বরাং প্রতি পদক্ষেপে জাতিক আত্মপন্থিত করিবার পক্ষে অত্যন্ত সহায় হইল। পঞ্চম দশকে তিনটি সভা একেবৎসরের মধ্যে স্থাপিত হয়। প্রথম, 'বঙ্গভাষাধ্বাবাদক সমাজ'—ডিসেম্বর, ১৮৪০; দ্বিতীয়, 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (ইহা 'ভারতবন্দী সভা' নামে অধিক পরিচিত)—অক্টোবর, ১৮৪১; তৃতীয়, 'বেথুন সোসাইটি'—১৮৪১। দ্বিতীয়টি পুরাতত্ত্বি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; হুগলেশ্বর শাসন ব্যাপারের আলোচনা এবং শাসন-কার্যে দেশীয়দের অধিকাংশ-প্রতিষ্ঠা—এ সমূহ বিষয় লইয়া এই সভাটি ব্যস্ত। এই সভার উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী দুইটা মাত্রের ও বোম্বাইয়েও রাজনৈতিক সভা গঠিত হইল। মূলমন্ত্রে সমাজের নেতৃস্থানীয়রা 'ভারতবন্দী সভার' আদর্শে কলিকাতায় 'ভাষানাল বহুমোচন অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রথম ও তৃতীয় সভা সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য-বিষয়ি লইয়া ব্যাপৃত। সমাজসেবা ও সমাজোন্নতির আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই 'বঙ্গভাষাধ্বাবাদক সমাজ' বা সংক্ষেপে 'অধ্বাবাদক সমাজের' উদ্ভোগ-আয়োজন। যুগান্তঃ ইংরেজী সহিতোত্তর পক্ষাগ্রহ পুস্তকগুলির সহজ সরল অধ্বাবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা ইহার কার্যারম্ভ হয়। পরে সংস্কৃত হইতে অধ্বাবাদ ও সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে থাকে। আবার, ইহার আশ্রয়কুলে কেহ কেহ সামাজিক ব্যাপার লইয়া মৌলিক গ্রন্থসমাহারও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এ সভা পাঠ্যপুস্তক বা ধর্মপুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; বাংলা সহিতোত্তর উন্নতি এবং সাধারণশিক্ষিত নবন্যায়ের পার্শ্বোপযোগী সরল সহজবোধ্য ভাষায় রচিত পুস্তকাদি পরিবেশনই ইহার লক্ষ্য। সভা পরবর্তী কালের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও প্রাচ্যাত্তিক রাজা রামেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনার 'সমাজ'-এর দ্বিতীয় বর্ষ হইতে বঙ্গসূত্রের সচিত্র মাসিকপত্র 'বিবিসার্ভসংগ্রহ' বাহির করিলেন। এখানিও জনসাধারণের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতে সর্বিশেষ সাহায্য করে। 'অধ্বাবাদক সমাজের' নিষ্ঠাবান কর্মীদের কাহার কথা বলি? পাঠ্য লেখের সমাজ-হিতৈষণার কথা বলাই যেন থাকে। 'অধ্বাবাদক সমাজে' তাহার বৃত্ত দান জাতিতে বিস্তৃত হইতে হয়।

তৃতীয় সভা বেথুন-সোসাইটির কথা এখানে একটু বিশেষ বলিতে হইবে। কেননা, দীর্ঘ-ব্যয়িত্বের নিমিত্তই তমু নর,

সমাজ-স্বাধীন ইহার ক্রমিক প্রভাববিস্তারের দিক হইতেই এই সভার চক্রবৎ পরিচালনায় তের বেশী। বেথুনের মৃত্যুর পর তাহার গুরুত্ব বেশী-বেশী প্রধানেরা তাহারই নাম লইয়া এই সভাটি গঠন করিয়াছিলেন। ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল—দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিভিন্ন সমাজ-সম্পর্কে আলোচনা-আলোচনা এবং মনোভাব একাংশ ও মতান্তর বিনিময়। কিন্তু যেমন প্রতিষ্ঠাকালে, তেমনি পরবর্তী কার্যকলাপে দেশী-বিদেশী উভয়েই ইহাতে সমভাবে সহযোগিতা করিয়াছিলেন। ধর্ম ও রাজনীতি ব্যতীত যাবতীয় বিষয়ের আলোচনাই ছিল ইহার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পৌরসংস্কার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, কবি, শিল্প, স্বাভাৱ্য, ভাষা—কোন বিষয়েরই আলোচনা ইহা হইতে বাদ পাইত না। তবে বিতর্কমূলক কোন বিষয়ের—যেমন বিধবা-বিবাহ আলোচনা এখানে স্থানও হয় নাই। ডাঃ হর্ষকুমার, গুডিন চক্রবর্তী, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পাঠ্যী কুমারমোহন বসোপাধ্যায়, কর্নেল এফ্. গুডউইন প্রমুখ বিগ্গল ব্যক্তির সোসাইটির অবিরেণনে প্রবন্ধ পাঠ্য করেন। সোসাইটির শেষ দশকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রথম দৌড়নে 'ভারতীয় স্বাধীনতা' সম্পর্কে সঙ্গীত-সহযোগে একটি বক্তৃতা পাঠ্য করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা-বিষয়িগণ পাল এখানে প্রবন্ধ পঠিয়াছিলেন। সোসাইটির প্রবন্ধপাঠ্য ও বক্তৃতাদান ইংরেজী, বাংলা ও উর্দু ভাষায় দেওয়া চলিত। গঠিত প্রবন্ধনব্ব্ব বাছাই করিয়া যথেষ্ট যথেষ্ট প্রকাশিত হইত। সোসাইটিতে গঠিত প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ বক্তৃতার কোন কোন নূতন প্রতিষ্ঠানেরও জন্মদাতা হয়। কর্নেল গুডউইন একটি বক্তৃতা দেন ১৮৪৫ সনে। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল এসেইনস্‌দের মধ্যে শিল্পচর্চা ও শিল্পদ্বারা বৃদ্ধি করা। পুরাতন চক্র ও কাল শিল্প সংরক্ষণ এবং নবগণিত স্বাধীনতা-রীতির শিল্পকলায় অঙ্গীকরণ—এই দুইটি বিষয়ের নিমিত্ত একটি শিল্পবিজ্ঞানসাহিত্যী-সভা ও শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রচারা করিলেন। তাহার এই প্রচারা বেশী-বেশী স্বাধীনতার দৃষ্টই মনে ধরিল। বেথুন-সোসাইটির কতিপয় সভা অগ্রণী হইয়া ১৮৪৪ সনের প্রথমেই শিল্পবিজ্ঞানসাহিত্যী-সভা গঠন করিয়া ঐক্স একটি বিজ্ঞানের স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁদা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। উপর্যুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে—১৮৪৪, ১৮৪৫ আগস্ট কলিকাতায় 'ফুল অফ ইণ্ডিয়ার্স অর্ট' প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বিজ্ঞানসভা ১৮৪৪ সনে সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তদবধি দীর্ঘকাল ইহা 'গবর্নমেন্ট ফুল অফ অর্ট' নামে আখ্যাত হইয়া আসিয়াছে। বর্তমানে ইহা 'অর্ট

কলেজ' বা কলা-মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। শিল্পবিজ্ঞানসাহিত্য-মন্ডা শিল্প-বিভাগে চিত্র-এবং বীজ ও আয়োজন করিল। এই বেত্তব্যাক এখনও চলিয়া আসিতেছে। বর্তমান কলা-মহাবিদ্যালয়ের বীজ বেথুন-সোসাইটির সভায়ই উৎপন্ন হইয়াছিল। শিল্প-বিভাগের অল্পবয়স্ক চিত্রবিজ্ঞান নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া জাতীয় রূপ ধারণ করে। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে ইহা একটি অগণীয় অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

বেথুন-সোসাইটির স্থায়ী কৃতকর্মের আংশিক উল্লেখ যাত্রা এখানে করা হইল। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে এখানকার অচিরস্থিত আলোচনা একটি স্টে ছাপ যাইয়া গিয়াছে। পঞ্চম দশকের বিজ্ঞান-চর্চা, সংস্কৃত-শিক্ষা সংস্কার এবং বাংলা-শিক্ষা-প্রসার—এই তিনটি বিষয়ের কথা এখন বিশেষ করিয়া বলিতেছি। বেথুন-সোসাইটি কে-মুগের বিজ্ঞানসেবী ও বিজ্ঞান-সম্মার নিজ নিজ বিষয়ে এখানে সমগ্র সময় চিত্রসহযোগে বক্তৃতা দ্বারা নিজেদের ডিষ্টা-গবেষণা; সভ্যদের নিকট প্রকাশ করিতে থাকেন। বিজ্ঞান, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, স্থাপত্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় বক্তৃতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ বিজ্ঞান-শিক্ষা শুধু নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণারও কেন্দ্র হইয়া উঠে,—আগে বলিয়াছি। মেডিক্যাল কলেজে চতুর্থ দশকের প্রথমে হিন্দুস্থানী ও পঞ্চম দশকের প্রথমে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। বাংলা বিভাগ খোলার বহুদিন চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিবিধ বিষয়ের পুস্তক বাংলা ভাষায় লিখিত হইতে থাকে। শারীরবিজ্ঞান, ডেবলবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, রসায়ন, পরমাণুবিজ্ঞান প্রভৃতির উপরে বাংলা বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকাদি রচিত ও প্রস্তুত হইতে লুপ্ত হয়। বাংলাবিজ্ঞানের শিক্ষক-গণ—মহুসুন ওম্ম, শিবচন্দ্র কর্ণকার প্রভৃতি পুস্তক-রচনাশয়ন দিলেন। ইহার বহুজন বাংলা সাহিত্য কয় সমৃদ্ধ হইল না। 'তত্ত্বসাহিত্যী পরিকা'-সম্পাদক অক্ষরভূষণ দত্ত বিজ্ঞান-পুস্তক-রচনার পূর্ণেই নিপু হইয়াছিলেন। বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রস্তুত, বহুদূর দেখিয়াছি, তাহার কয়েক প্রথম সমান দিতে হয়। শারীরবিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকে পরিভাষা সংযোজিত করিয়াছিলেন মহুসুন ওম্ম। সংস্কৃত-শিক্ষার সংস্কারসাধন পঞ্চম দশকের আর একটি প্রধান কার্য। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর সংস্কৃত কলেজের কতগুলি মৌলিক সংস্কার-সাধন করেন। সে-কথা এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। এতদিন সংস্কৃত কলেজে ভ্রামক ও বৈদ্য সম্ভানগণই পড়িতে পাইত। ঈশ্বরচন্দ্র কায়রনের নিকটই ইহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন। বিভিন্ন স্থান-কলেজে সংস্কৃত শিক্ষাদানের

যে রীতি ছিল, তাহাতে একদল ভেদভেদে যীকৃত হইত না। বিজ্ঞানসাগর সংস্কৃত বিজ্ঞান সংস্কারসাধন করিবার জন্য একদল সংস্কৃত ব্যাকরণ, এবং ইহা সহজসাধ্য করিবার জন্য সরল সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক-রচনার অভিযুক্ত হইলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানেই সংস্কৃত বিষয়কে একটি ক্লাসিকের মর্যাদা দান করায় ইহার শিক্ষার শ্রেণীতে আর কোন বাধা রহিল না। বর্ষ ও বর্ষনির্বিশেষে যে-কোনও এই বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে লক্ষ্য হইল। সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার আগামের জনসাধারণকে ক্রমশঃ সম্মানিত করিয়া তুলিতে লাগিল। বাংলা-শিক্ষা ও বাংলা-সাহিত্য-চর্চার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই সময় সরকারআগেকার নিষ্ক্রিয়তা ত্যাগ করিয়া বাংলা শিক্ষার নতুন ব্যবস্থা করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন। ইংরেজী বিজ্ঞানসারে বাংলা পঠন-পাঠনের অপেক্ষার না থাকিয়া, আদর্শ বিজ্ঞানসার প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করা হয়। সরকার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগরকে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যতীতও, দক্ষিণবঙ্গের শেখার ইন্দ্রপেট্টের পরে নিয়োগ করিলেন। তিনি বিভিন্ন জেলার নিদিষ্টসংখ্যক 'মডেল স্কুল' স্থাপন করেন। তাহার অধীনে একদল সাব-ইন্সপেক্টরও নিযুক্ত হন। উপযুক্ত লেখক দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক-রচনারও ব্যবস্থা করিলেন বিজ্ঞানসাগর মহাশয়। পরবর্তী কালের বাংলা ছাত্রবৃতি বা মাইনর স্কুল এইসকল মডেল স্কুলের আদর্শেই গঠিত। বিজ্ঞানসাগরের পরে ভূদেব মুখোপাধ্যায় পরমাধিকারবলে বাংলা বিজ্ঞানসংস্কারের খেতে উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। এই উপায়ে বাংলা-শিক্ষা ও বাংলা সাহিত্য লুপ্ত প্রসারলাভ করিল। গত শতাব্দীর পঞ্চম দশকে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা সূচিত হয়।

এ পর্যন্ত রচনাশয়ক বা গঠনমূলক কার্যের কথা বলা হইল। কিন্তু পঞ্চম দশক আরও কয়েক কারণে আশাবিগ্নের নিকট 'স্বরূপ' হইয়া আছে। জাতির জীবনে নবজাগরণ-সম্প্রদায়ের সৌন্দর্য-বিশেষের মধ্যে সংস্কৃত-সংসর্গও কয় কার্যকরী নহে। মেডিক্যাল কলেজে, বেথুন-সোসাইটিতে এবং শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষানীতির সঙ্গে আমরা এইমাত্র পরিচিত হইলাম। কিন্তু কোন কোন অবিদ্বৎস্বার্থিতার জন্য সরকার ও নেতৃত্বশ্রেণীর মধ্যে খুবই বিরোধ উপস্থিত হয়। কলিকাতার ১৮৬৩ সনের মে মাসে 'হিন্দু মেট্রো-পলিটান কলেজ' স্থাপিত হয়। 'হিন্দু কলেজ' হইতে নিজ সম্ভানদের ছাত্রাটীয়া আনিয়া হিন্দুগণ এই কলেজে তাহা-দিগকে ভর্তি করিয়া দেন। হিন্দু-কলেজ লইয়া হিন্দুসমাজ এবং সরকারের মধ্যে যে বিরোধের সৃষ্টি হয় তাহার পরিণতি

ঘটে হিন্দু-কলেজের পূর্ব অস্তিত্ব বিশ্লেষণের মধ্যে। সরকার হিন্দু-কলেজ ত্রিভাষা দিহা ইহার কলেজ-বিভাগকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত করেন। হিন্দু-কলেজের অবশেষ হিন্দু-মুসলিম মধ্যে সংরক্ষণের চেষ্টা হইল। কিন্তু কার্যে ইহা প্রেসিডেন্সি কলেজেই অধীনে পরিচালিত হইয়া অসিদ্ধ হইল। হিন্দু-কলেজ লইয়া যে বিরোধ তাহা দেশী-বিদেশী বিরোধের একটি লক্ষ্য মাত্র। হিন্দুবা এতাবৎকাল ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছেন, উচ্চাধিকারকে অল্পমাত্র দায়িত্বপূর্ণ কাজে ও সরকার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে শুধু সাহিত্য-সম্পন্ন নয়, শাস্ত্রাত্মক সমাময়িক ব্যক্তিত্বের আবশ্যকীয়তাও ব্যঙ্গালীরা উদ্ভূত হইয়া উঠে। কলিকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমে এই আবশ্যকীয়তা বহুতর হইয়া উঠিয়া একাধি পাত্র। অ্যাসোসিয়েশনের শাসন-নীতির সমালোচনা-পর্যবেক্ষণের বহু হইয়া কতৃপক্ষের তুল-কটি প্রদর্শন করিতে পারিল। শাসনে বৈষম্য ব্রিটিশ শাসনের একটি বলত। এই বলত দূর করিবার নিমিত্ত যেখান সাহেব চেষ্টা করিত্বিতেন। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজের প্রতিবন্ধকতা হেতু ইহা কার্যে সফল হইতে পারেন নাই। বহুবার পরেই ইউরোপীয়েরা শত অপরাধ করিলেও, তাহাদের বিচার হইত কলিকাতা স্প্রিং কোর্টে। তাহার পরেই এই প্রকার, স্থানীয় অধিবাসীরা এ কার্যে অগ্রহ নিবৃত্তিত নিষ্পত্তি হইত, রামচন্দ্রনাথ যোগ এই নিবৃত্তিদের কথা একবার পুস্তিকার প্রকাশ করিয়াছিলেন। হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেন্ডেন্ট' শব্দটির পর সত্ত্বে এই বিষয়টি নিকিত সমাজের চোখে আঁল দিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন। ১৮৮৫-৮৬ সনে সরকার এই বৈষম্য দূর করিয়া মকদ্দম আদালতেই এসেউরদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সমতায়ে বিচারের প্রস্তাব করিয়া একটি আইনের বসড়া প্রচার করেন। দেশী-বিদেশী সংঘাত উপস্থিত হইল। ইউরোপীয়েরা বহুবার বিতর্ক সভা করিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আহুত্বকূলে জনসভা অধিষ্ঠিত হইল। এইজন্য শাসনপক্ষের বাস্তবিকতার মধ্যে সিপাহী-বুদ্ব অগ্রহ হওয়ার ব্যাপারটি চাপা পড়িয়া যায়। ইউরোপীয় ও নিকিত ভারতীয় সমাজের মধ্যে বেশ রেবাহেবি চলিতে শুরু হয়। হরিপ্রসন্ন 'Racial Antagonism' শীর্ষক কোন কোন সম্পাদকীয় বক্তব্যে এই রেবাহেবির তীব্রতা এবং তাহার কল্যাণ জনসাধারণের সমুখে ধরিয়া দিলেন। বাঙ্গালী নব নব আবশ্যকীয় উদ্ভূত হইয়া কার্যে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু ইহার পথে এক জীবন বাধা আসিল

অশেষীয় সমাজ হইতে। 'সিপাহী-বুদ্ব' লইয়া বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী আওতায় কতই না আলোচনা-বিতর্ক চলিয়াছে। স্বাধীন ভারতের বর্তমান কর্তব্যেরা এবং কোন কোন অকল্যাণীরা এই বুদ্বকে নির্বিশেষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। বাহা ইউর, সে-বুগে বাঙ্গালী সমাজ সিপাহী-বুদ্বকে স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ যে নূতন পথে, বাহাকে প্রগতির পথও বলা যায় তাহাতে উৎসাহের বিষয় ঘটবে এই আশঙ্কায় ইহাকে বহু অতি-সম্পাতই করিয়াছেন। সিপাহী-বুদ্ব হিন্দু-মুসলমানের বিলম্ব ঘটাইয়াছিল, কিন্তু তাহা এক স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথও ছিল না। সামাজিকগণ ইহা ব্যাধি যোগ্যতর স্বাভাবিক হইয়াই উঠিয়াছিলেন; নিত্যন্ত আশার কথা এই ছিল যে, ভিত্তর-বাহিরের এই দুই বিষয় বাধা অতিক্রম করিয়াই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন।

এই উন্নতির পথ স্বাভাবিক করিয়াছিল কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মা চানবাহন হাথের প্রাণের পর এই সমাজ জীবন্ত অবস্থায় কয়েকবৎসর থাকিয়া, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কর্মতৎপরতার পুনরাব চায়া হইয়া উঠে। কিন্তু তখন তত্ত্বাবধিনি-সভা হয় ইহার পরিচালক। তত্ত্বাবধিনি-সভা সমাজের নবমুখের অগ্রদূত কল্যাণ-সাধন করিয়াছে সভা, কিন্তু ইহার অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথের বিবেচনার পক্ষ দপকের শেষদিকে ইহার কার্যকারিতা কমিয়া যায়, এবং ব্রাহ্মসমাজ ইহার কতৃপক্ষীনে থাকার, সমাজের স্বাধীন বিকাশে বিঘ্ন উপস্থিত ঘটে। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৮৯ সনের যে মাসে সভা তুলিয়া দিয়া কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজকে ইহারই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অধ্যক্ষ-সভার অধীন করিলেন; বহু দপকের প্রবন্ধে 'বাঙ্গালীর সমাজিকিত্তে যে স্বাভাবিকতার ভিত্তিতে স্বাভাবিকতারাবোধের নূতন করিয়া উদ্ভব হইতে থাকে, তাহার মূলে রহিয়াছে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ধর্মপ্রাণী সমাজসেবা-প্রচেষ্টা। লোকহিতের এই সমাজ কর্মচলন হইয়া উঠে ঐ সময়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বৃক্ষ কেশবচন্দ্রের সংযোগে এই কর্মতৎপরতা অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হুজিক হইয়াছে, অধনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হুজিক-প্রাণীভিত্ত নবনাগীর সাহায্যমানে আবগয়ন হইল; ম্যাসেরিয়া স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটনাতে, সমাজ হুজিত-সেবার তৎপর; শিক্ষা-ব্যবহার পুণ ধরিয়াছে, সমাজের আহুত্বকূলে শিক্ষা-পদ্ধতির সমাজের নিমিত্ত আলোচনা শুরু

হইল। প্রচলিত খ্রী-শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্বারা ইহার প্রসারলাভ সম্ভব নহে, সমাজ অন্ধ-পুত্র-খ্রী-শিক্ষার অগ্রগণ্য হইল। কলকাতার খ্রীষ্টানী-প্রচারের একটি কেন্দ্র হইয়াছিল, কেশবচন্দ্র সেখানে দিয়া ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে এরূপ বক্তৃতা দিলেন যে, খ্রীষ্টান পাঠ্যীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। যক্ষ্মশীল বিদ্বান ও কেশবচন্দ্রের সমর্থনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮৯৪ সনে বাহাদুর ও বোম্বাই প্রদেশ পর্যটনে গিয়া ধর্ম ও কর্ম উভয় বিষয়েই ঐ ঐ প্রদেশবাসীদের অগ্রপ্রাণিত করিয়া আসেন কেশবচন্দ্র। কলিকাতায় কিরিয়া তিনি বেথুন-সোসাইটির এক অধিবেশনে শ্রী চাবার বিনিয়াজিলেন যে—বোম্বাই, মাহাজি এবং বাঙ্গাল অধিবাসীরা মিলিত হইয়া ভারতবর্ষে অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা প্রবর্তনের উপরে কোন কোন লোককে বিলম্ব জ্ঞোর দিয়া থাকেন। কিন্তু এই স্বাধীন চিন্তা যে একনিষ্ঠ লোকহিতে প্রযুক্ত না হইলে সমাজের কল্যাণসাধন হুর্গট, এ কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে এই স্বাধীন-চিন্তাকে লোকহিতের আরক রূপে শোধান করিয়া লইয়া তবে এত কল্যাণকর হইতে পারিয়াছিল। বাংলার নব-জাগৃতির ইতিহাসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের স্থান আদৌ কম নহে।

সিপাহী-যুদ্ধের বাংলায় শিক্ষিত সমাজ কল্যাণ-পথে বিচা বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। অব্যবহিত পরবর্তী সরকারী ও বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের কার্যকলাপে তাঁহাদের এই যাত্রণা সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছিল। বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ নীল-আন্দোলনে এসেন্সিয়ালের উপর ভীষণ দাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। নীল-চারীর সশস্ত্র ব্যবসায় পল্লী সরকারী বর্ষভারী ছিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশই ছিলেন নীল-চারীদের সশস্ত্র। সিপাহী-যুদ্ধের প্রত্যালে নীলকর ইউরোপীয়দের অ্যাডিস্ট্রাক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা বেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে ভয়ানক অনর্থের স্রষ্ট হই। আবার বিভিন্ন জেলায় নীল-চারীদের উপর অত্যাচার

চরমে উঠিলে, তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। হিম্মতচন্দ্র ‘হিন্দু পেট্রিয়ার্টে’ নীল-চারীদের হু-পের কথা প্রতি সম্ভাষণে সম্পাদকীয় দস্তাবেজ এবং পত্র-প্রেরকের পত্রে প্রকাশ করিতে লগিলেন। পত্র-প্রেরকের মধ্যে বর্ণনাভয়ের নিশিধকুমার যোগ ছিলেন প্রধানতম। বহুদূর জানা যায়, স্থানে স্থানে তিনি নীল-চারীদের বেতহু করিতে উদ্যত হন। এই নীল-আন্দোলনের জের অনেকদূর গড়াইয়াছিল। ‘নীল-দর্পণ’ নাটকে নীনবন্ধু মিত্র নীল-চারীদের হু-ধ-দুর্গণা এবং নীলকরের অত্যাচার-অবিচার বর্ণনা করিয়া অভিব্যক্ত হন। নীলকররা লঙ্কা-এর উপর কাল কাড়িতে আগ্রহান হইল। তাহাদের প্রেরচনার লঙ্কা আদালতে অভিব্যক্ত হন। লঙ্কা নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশ করিয়া বড়ই কাশরে পড়িলেন। তিনি ব্রিটিশ কোর্টের দিগারে অপরোধী সাব্যস্ত হইয়া একহাছার টাংকা অধিমানা ও একমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অধিমানার টাংকা কাশীপ্রসন্ন সিংহ নিজে হইতে দিয়া দেন। হিম্মতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপরে নীলকরের অত্যাচার আক্রোশ ছিল। তিনি ১৮৯১ সনের জুলাই মাসে হঠাৎ দাঙ্গা গেলে তাঁহার বিবরণ হ্রী নিকট হইতে আদালত যাবজ্জন্ত নীলকরেরা কতিপয় লোক করিয়াছিল। খ্রীষ্টান পাঠ্যীরা কিন্তু নীল-আন্দোলনে নীল-প্রজাবাদের সপক্ষে ছিলেন এবং ইহার কথা বিদেশে প্রচারে সাহায্য করেন। পাঠ্যীদের মধ্যে ইউরোপীয় সমাজের বিদগ্ধ-মণ্ডলীও ভারতবাসীদের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে থাকেন। কিন্তু সিপাহী-যুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে সাধারণ ইউরোপীয় সমাজ কেশবচন্দ্রের একেবারে বিরুদ্ধে যায়। সরকারী নীতি দ্বারা এই বিরুদ্ধতা আরো উসকানি পায়। সিপাহী-যুদ্ধ এবং নীল-আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের সহযোগিতা যেমন কর্তৃপক্ষ হৃদয় করে দেখিলেন না, তেমনই শিক্ষিত বাঙালী সমাজের রাষ্ট্রীয় তথা সমাজ-চেতনায়ও তাঁহাদিগকে শত্রুিত করিয়া তুলিল। কিয় বাঙালীর প্রাণে নৃতনের প্রতি এবং বাঙিয়াই চলিল। স্বাধীন-চিন্তা একথা যে স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার সহায় হইবে এবারে তাহা বুঝা গেল।

[অক্ষয়]

বন্ধন-সাহিত্যে প্রেম

মল্লিকা গঙ্গোপাধ্যায়

বোধহয় খুব ছুঁল হয়ে না, বসি বলা যায় যে, ভারতীয় জীবনধর্মের ভ্রমের স্থান সাক্ষী। ভারতীয় ধর্মমতের যেমন, ভারতীয় সাহিত্যেও তেমনি আশ্রয় নুত্বাহীন ভাবনা কবির পক্ষে আশ্রয়ে জীবনের বাস্তব ভ্রমাত্মকত্ব থেকে নিবৃত্ত করেছে। এইজন্যই বোধহয় জীবন-সংগ্রাম এবং সংগ্রামের অপর্যাপ্ত-জ্ঞাত ভ্রমবোধের তীব্রতা আমাদের সাহিত্যে স্থা স্থান পায়নি। এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে জীবনমুখে পৌত্তল্যের মহিমা, নরনারীর দেহমনের বৃত্তিকৃত ব্যঙ্গনা-ক'মন', প্রব বিচিত্র স্বপ্ন-সংঘাত বেড়াতে পাচ্চাত্তা সাহিত্যের উপজীব্য ও অবলম্বন, আমাদের সাহিত্যে তা না। ভারতীয় সাহিত্যে নিরসেক দৃষ্টিতে এই জীবন-সংগ্রামে ভারত পৌত্তল্যমহিমাকে দেখে হননি। সেখানে সনাতন ধর্মবোধ ও সমাজ-অস্থাপনেরই বিধিবিধান বিধান ও বলবান। প্রাণের শক্তিমত্তার চেয়ে 'ত্যাগের চক্র-মাংসপানে মনোচরিত্র কতখানি মহৎ হয়ে উঠতে পারে, প্রকা এবং দুঃখ নিয়ে তাই দেখেছে ভারতবর্ষ। এই কারণেই বৃষ্টি প্রভৃতির পুরুষকে বড় করে অন্যসকল তিনে তৈলপ্রকৃতির হুঁকার শক্তি ও লীলার খেলা দেখা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

খংসাহিত্যে মধুসূদনের কাব্যে আমরা প্রথম পাশ্চাত্যের এই প্রথম জীবনবোধের পরিচয় পাই। বন্ধন-সাহিত্যেও জীবন ও সংগ্রামের ভোগের বীভূশিকা আছে। কিন্তু বন্ধনভিত্তির ভারতীয় মানসিকতা ও ইয়োহোপীয় জীবনবোধের বেগ, এই দুয়ের স্ববুদ্ধতার তাঁর সাহিত্যে মাহুয়ের কামনার স্বপ্নি ও ব্যর্থতার বেদনা দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত জড়ী হয়েছে সনাতন ধর্মবোধ।

প্রকৃতির চক্রান্তে পুঙ্খ এবং নারীর জীবনে পরম্পরের প্রতি অনিবার্য কামনা জেলে ওঠে। নারীর সৌন্দর্য-রসমুখ্য পুঙ্খ চায় জীবনকে ডোগ করতে, নারী চায় পুঙ্খের বাসনছনে ধরা নিতে। বন্ধন-প্রেম-সাহিত্যে নারীর যেহিঁদী রূপ পুঙ্খকে বিজয় করে, তার ব্যক্তিব্যব গর্ভ চুঁ হয়ে যায়, অগ্রে ওঠে দাবানল—সমাজ সংসার সব দহ করে; নিজেও তা থেকে অব্যাহতি পায় না। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ এই যে আত্মসমর্পণ, এই দেহনিষিদ্ধির কাছে পুঙ্খের পরাজয়, অসহায়তা দেখে করুণা লাগে। বন্ধনমত বসন, জ্ঞানী ব্যক্তিরও এই রূপদোষ থেকে নিবৃত্তি নেই। তার উচ্চারণ চক্রপেদ, সত্যসী ভাবনায় চক্রপেদর বদন নব্য-দরবার থেকে গৃহে কিংছেন তখন

শৈবলিনীর কথা মনে হল, তিনি উৎকল হলেন; তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা ব্যর্থ হল, তিনি বুধলেন মহাজ্ঞানে পতিত হয়েছেন, তথাপি এই ভ্রম থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছা হল না। তেমনি ভাবনিক অসংযমের কল আত্মবিদর্ভন মুক্তেও সংসার-ধর্ম স্বতলে দিলেন।

বিহবৃক, চক্রপেদর ও কুরুকান্তের উইল এই তিনগানি এখানে অবলম্বন করলেই বন্ধনসাহিত্যে সৌন্দর্য প্রেমের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যাবে। তিনটি উপভাসেই বিবাহের পত্তেও কখনো পুঙ্খের দিক থেকে, কখনো নারীর দিক থেকে সামাজিকভাবে নিঃসঙ্গত নরনারীর পরম্পরের প্রতি আকর্ষণ অতুচ্চ হওয়ায় দাম্পত্যজীবনে হুম্ব সমস্তার উচ্চ হয়েছে এবং এর সঙ্গে অকাঙ্খিতাবে জড়িয়ে আছে সামাজিক জটিলতা ও সনাতন নীতিবোধ।

মাহুয়ের এই তীব্র আকাঙ্ক্ষার পরিণতি সবচেয়ে বন্ধনের একটি বিশেষ মনোভাব থাকলেও, বিড়খিত মাহুয়ের প্রতি তাঁর অস্বপ্না যে একেবারেই ছিল না, তা বলা যায় না। তিনি কমন্যাক্সের হৃদয়ে বলেছেন—“এখন হঠাৎ আমার বোধ হইতে লাগিল যে অল্প মাঠেই পতন। সকলেরই এক একটি বন্ধি আছে—সকলেই সেই বন্ধিতে পুড়িয়া মরিতে চায়, সকলেই মনে করে সেই বন্ধিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ মাতে বাধিয়া কিরিয়া আসে।”

বন্ধনের 'বিবাস রূপমোহ রিপূর প্রাবল্যে ঘটে আর প্রেমও সেই একই বেশ হতে উঠে। এর ফলস্বরূপ বন্ধনমত জ্ঞান্যন করেছেন সামাজিক দাম্পত্য-বন্ধনেরই। সেই প্রেমই তাঁর আদর্শ। পূর্ববাসের ঐচ্ছ্য্য থাকলেও যদি তা বিবাহে পরিণমাত হয় তাহলে তা আদর্শ বলে গৃহীত হয়েছে, অস্ত্রধার সমাধর্ম্যে কোনো সেই বিলনের অন্তরায় দেখেই তিনি পূর্ববাসের পূর্ববাসেরই স্বাভাবিকতায় চেয়েছেন। কিন্তু তাহলে দিক দিয়ে তিনি বাই বন্দন যা যে আকর্ষণই সন্তেচন সংগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, রূপ-চরনার তার বিশপরীতই ঘটেছে। প্রেমের পরিসমাপ্তিকে বন্ধন কি কোন স্বকণ্ড সাধনার নিয়ে বেতে শেষেছেন? প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর প্রেমে কি শুধু কামনাট ছিল? ঘর, সংসার, স্বামী সর্বত্র ত্যাগ করে যে প্রেমাস্পদের স্বত্ব সে পথে বেরিয়ে পড়েছিল, সে কি শুধু হুঁকার দেহতুকার? আর যে প্রতাপ 'মরিতে বাইতেছি' বলে মুখশব্দে চলে গেল, তার আকাঙ্ক্ষাও কি শুধু রূপের? অভিশপ্ত

অধঃচৈতন্য বাগ্যপ্রণয়ের চপলতা কি শাস্ত, সাধত, অভিজ্ঞ প্রেমের প্রৌঢ়ত্বি লাভ করেনি ?

প্রেমকে অল্প বাগ্যবাহর জড়ই প্রতাপের আধ্ববিসর্জন। শৈবসিন্ধুর সাংসারিক ও মানসিক শাস্ত্রবিশ্বাস মানসেই প্রতাপের বৃদ্ধাবরণ। এ প্রতাপের পরাক্রম নয়, প্রেমের প্রতিষ্ঠা অস্তর। স্বভাব ও সমাজের মধ্য যে মাহুদের অস্থিরতা থাকে অপরূপ করে মহত্তর লড়াইনাটকে দুঃসিমাং করে দেয়, বঙ্কিম নিচর এ কথা বুঝেছিলেন এবং এই লড়াইবর্ধকে স্বীকৃতি না জানিয়েও পারেননি। তা না হলে, হীমা, মতিবিধি, রোহিণীর বার্ষিকতার হাছাকার কখনোই দেখা দিত না। এই হতাশাপ পরিণতির সমাজের দণ্ড বলতে মন চায় না। কৃষ্ণনন্দিনী, শৈবসিন্ধু। প্রতাপ, রোহিণী এদের প্রেমের সমাপ্তিতে ঘটনি কোন পার্থক্য মঙ্গল, আর কিরে আসন্ন শাস্তি, আসা সম্ভব নয় বলে।

বঙ্কিমজ্ঞ সমাজের সঙ্গে মাহুদের লড়াইবর্ধের সাময়িক নিষাদের চেষ্টা করেছেন। তিনি কোথাও সমাকর্ষন লক্ষন করে স্বভাববর্ধকে প্রতিষ্ঠা করেননি। রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্ত্তক সময়েও এ কথা প্রযোজ্য। নরনারীর আশ্রয় সমাজ, শিল্পী ও সামাজিক মাহুদ, স্তবরাং সমাজ-চৈতন্য তাঁর থাকবেই। আর শিল্পের সঙ্গে বাস্তবের মধ্যের কোনদিন বিরসন হয় না। এখন কোন চূড়ান্ত আদর্শ-সমাজ নেই, যা প্রতি মাহুদের মনের দাবি পূরে সমাক পরিপূর্ণ করতে। ব্যক্তির মনোবর্ধের সঙ্গে সমাকর্ষিত্বোপের বিরোধ থাকবেই। আবার প্রায় প্রতিটি ব্যক্তির মানসক্রিয়া অপরের থেকে এতই স্বতন্ত্র যে, ছুটি লড়াইয়ের গতি তালে তালে একই গতে প্রবাহিত হয় না, গরমিল বাধে এবং ভাঙা-গড়ায় অনিবার্য বেদনা বরণ করতেই হয়। আনন্দের লড়াই ঘিরে অল্প দল-সমূহ—

"And bade betwixt their shore to be
The unplumbed, salt, astranging sea."

বঙ্কিম-সাহিত্যে এই মধ্য বহন করে এনেছে তীর বার্ষ পরিমহাপ্তি। কিন্তু মহৎ বার্ষতা কোন আশা কোন শাস্ত্রবাহ বাধাই বহন করে আসে না পার্থক্য জীবনে। বঙ্কিমজ্ঞও শেষ পর্যন্ত কামনার সর্বাংশ ও জীবনের অশাকল্যের উল্লেখ বৃহত্তর কল্যাণ-অভিভূতী প্রেরণার প্রবন্ধ করে বাস্তবস্থানবিস্তৃতির সন্ধান দিয়েছেন। উত্তাপ উচ্ছ্বাস লড়াইকে শাস্ত করে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের বাধা। নগেন্দ্র লক্ষিত অসুতর হয়ে কিরে আসে স্বর্ধবীর কাছে, প্রতাপ অপরূপের উল্লেখ বাজা করে, গোবিন্দলাল ভগ করে প্রাপণে "আদি ভ্রমরবিক-ভ্রমর পাইবাছি"।

প্রেম মূলতঃ হৃদয় অনিবার্য জীবনপ্রবৃত্তি থেকেই জেগেছে, কিন্তু লড়াইবর্ধ, বেদনা এবং আদর্শের অস্তরলগ্নে মাহুদ তাকেই করে তুলেছে তাঁর মহত্ত্বের নিধান। কেহই আশ্রয় আশ্রয়, সেহাখারী মাহুদেই প্রেম লড়াই—সেই অর্থে প্রেমকে যদি বলি সেহাখর, তবু তাকে মুচনপ্রবৃত্তি বলতে পারিনি। প্রেম সেহাখর-সম্প্রতি হলেও তাঁর চরমোৎকর্ষ আন্তরিক মিলনে। প্রধানতঃ প্রেমকে এই মানসোৎকর্ষের দিক দিয়ে বঙ্কিমজ্ঞ দেখেননি।

প্রেমমহাপ্রের্যে বঙ্কিমজ্ঞের যে আদর্শবোধ ছিল সে-বিষয়ে বিশদ আলোচনা ও তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত পাওয়া যায় 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'অসুখীলন' প্রভৃতি প্রবন্ধে। প্রেম হৃদয়ের মূলতঃ তপস্বী বঙ্কিম-সাহিত্যে অনেকখানি স্থান দখল করেছে। যেখানে সামাজিক বাধা নেই সেখানেও কুমার-কুমারীর প্রেমেরও মিলন হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্তবীকৃতকালের ব্যাধানে। আর সামাজিক স্তবীকৃততা যেখানে, সেখানে তো সুখের মিলন ঘটতেই পারেনি। হৃদয়ের অসুখীলন ও বিশেষের অসুখীলন বেদনার মাহুদের যে মতি ডাঙর হয়ে ওঠে, তার মতোই পরিস্রুত ভালবাসার অমিত ঐশ্বর্য।

সুখ, স্বর্ধবীর এবং কলমবিধি—এই তিনটি নারী-চরিত্রে প্রেমের তিনটি রূপ একেছেন বঙ্কিম। নগেন্দ্র অবিবাহিত হলে হৃদয়-বা স্তবের সঙ্গে বিবাহের সুসল হতেও পারত। সচেতন সংস্কার সত্ত্বেও কবি বঙ্কিমের মমতা থেকে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণনন্দিনী বঞ্চিত হইনি। বঙ্কিম-সাহিত্যে নারীর ভালবাসাই প্রধান ধর্ম। দেবীচৌধুরাণী, আনন্দময়ী, সীতারাম সর্বত্রই প্রতিকূল পরিবেশে নারীর চিরন্তন রূপটি সৃষ্টিতে তোলা হয়েছে। কিন্তু হীমা, মাহুদ ভাঙাও নারীর যে স্বাধীন সত্তা—প্রেমের ক্ষেত্রে এই স্বাধীন সত্তার সমুদ্র প্রতিষ্ঠা নেই বঙ্কিম-সাহিত্যে। কেবলমাত্র বিবাহিত স্ত্রীর প্রেমই পরম্ভা, বিবাহবিবাহে প্রেমিকার নয়—বঙ্কিম-সাহিত্যে।

মানসোৎকর্ষের অভাব ও প্রেমের অল্প দুর্গার আবেগ-সর্বমুখাই বঙ্কিম-সাহিত্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্র ও পরবর্ত্তক সাহিত্যে প্রেমের লড়াইবর্ধ ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্ত সাহিত্য হয়েছে। এই বিশ্রীত স্তবীকৃত জড়ই বঙ্কিম ও পরবর্ত্তক রবীন্দ্র-পরবর্ত্তক-সাহিত্যে প্রেমের রূপে ও বাধে বৈধব্য দেখা দিয়েছে। তত্ত্বপরি রবীন্দ্র-প্রেমের বঙ্গল তত্ত্ববাহ কথা-সাহিত্যেই এতকমিত হইনি, আদর্শ-নির্গমিত ভাবের রূপবর্ণ হয়েছে কথো। স্তবরাং বঙ্কিম ও রবীন্দ্র-প্রেমের পরিধি-বিভাবের ক্ষেত্রে বঙ্গ ও ভাবরূপের স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে অসুখাবনীয়।

ডাক্তারের জীবনচিহ্ন

• ডাক্তার ডট্ট •

১। বাংলা ।

কলকাতায় ফিরে এসে দেখি আমার আমাকে মধ্যস্থলে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এবার বদখান। কলকাতায় আমাকে প্রথমে কটপক্ষ আর হাতি নয়। কলকাতা ছেড়ে আমি যে অল কোথায় যেরে চাইনি, এটাই তাদের কাছে বিশেষ অপছন্দের কথা। তবু বনেচলসে যেখানেই পাঠাবার দেখানোই বিনা ছাড়ের আমার যাওয়া উচিত, এটাই চলল। সরকারী চাকরির শর্ত।

কিছু স্বাধীনভাবে ডাক্তারি করার বা আশ্রয় তা আমি পেয়ে গেছি। বহু চাকরি ছাড়তে পারি, কিন্তু প্রাক্টিস ছাড়তে পারি না। যেখানে প্রাক্টিস স্থাপিত হয়েছে, লোকের সঙ্গে জানাশেনা হয়ে গেছে, সেখানে এখানে আমাকে চায় আর আমিও তাদের চাই। তাইও আমাকে বিশ্বাস করে যে, রোগীরাই হল আমি তাদের রক-করাগো—আমার হাতে ডিকিৎসার তার দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত হয়। আর আমিও বিশ্বাস করি যে, তাদের উপর নির্ভর করে থাকলে আমার যেমন ক'রে হোক চলে যাবে। পরিশ্রমের মধ্যে যারাই শোনে যে আমাকে কলকাতা ছেড়ে অস্ত্র যেতে হবে তারাও বলে যে চাকরি ছেড়ে দিন, এখানে বলে নন নিয়ে প্রাক্টিস করুন, কোনো ভাবনা নেই। প্রাক্টিসের এই এক গুণ, ডাক্তারদের মধ্যে যে যাকে বিশ্বাস করে সে তাকে ছাড়া আর কাউকে চায়না। হুতরাং বাহা আমার উপর বিশ্বাস থাপন করেছে তাদের ছেড়ে চলে যাওয়া আমার পক্ষে উচিত হয়না।

সবই বুঝি, কিন্তু এতদিনের চাকরিটা হঠাৎ ছেড়ে দেবো? এ-চাকরির আলাদা একটা মর্যাদা আছে, এর পেনসন আছে। তা ছাড়া বাসে মাসে পাঁচো বেতনটি দেলে। সে লোভ সহজে ত্যাগ করা যায়না।

আমি তখন ভেবেচিন্তে এক মতলব করলাম। চাকরিতে নিযুক্ত থেকেই ডাক্তারি-বিষয়ে আমি অনেক কিছু উচ্চশিক্ষা নিতে চাইবো। সরকারী চাকরির নিয়ম এই যে, কেউ যদি উচ্চশিক্ষা নিতে চায় তাহলে তাকে সেই সুযোগ দেওয়া হবে। আমি উপক্যাসে শিক্ষা নেবার জন্ত আবেদন করলাম। পোস্ট-গ্র্যাডুয়েট শিক্ষা নেবার জন্ত ওখানে ভর্তি হতে পারলে আমার কলকাতাতাই থাকা হবে।

তখন উপক্যাসে মেডিসিন সহজে বিশেষ শিক্ষা দেবার প্রতিষ্ঠানটি সংস্থার দৃষ্টে। খ্যাতনামা রজার্স-ই-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। এ এক নতুন রকমের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, গ্রীষ্মকাল দেশের রোগগুলি সহজে এতে বিস্তারিত রকমের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষা গ্রহণের জন্ত নানা দেশ থেকে আবেদন আসছে। কিন্তু স্থান সংকীর্ণ, নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বেশি ছাত্র এখানে নেওয়া যেতে পারেনা। তাই আবেদনকারীদের মধ্যে অনেক ব্যাচট ক'রে ছাত্র দেওয়া হয়। ওখানেকার নিয়ম এই যে, ভারতের সবগুলি অলাদা প্রদেশ থেকে কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র দেওয়া হবে, তা ছাড়া ভারতের বাইরের থেকে যারা আসতে চায় তাদের জন্তও কয়েকটি স্থান রাখা হবে। এই হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে তিন-চারটির বেশি ছাত্র দেওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব সেখানে আমার চুকতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম। অনেকই আবেদন করেছে।

এই বুঝে আমি এক কাজ করলাম। রজার্সের নিজের হাতে লেখা পার্টিকিউলার্সি আমার আবেদনপত্রের সঙ্গে জুড়ে বিলাশ। পূর্বে বলেছি যে কিছুকাল আমি তাঁর গবেষণার কাজে সাহায্য করেছিলাম, তাতে বুনি হয়ে তিনি আমাকে এক পার্টিকিউলি দিয়েছিলেন। নির্বাচনের সময় নিশ্চয়ই তার একটা কিছু বিশেষ দৃষ্টি আছে বলে ধরা হবে।

এই আবেদনপত্র শেষে হেড-অফিস থেকে আমাকে ডেকে পরীক্ষা। হেড-অফিসের কতী আমাকে খবর দিয়ে বললেন—“যতই ভালাকি করো, এ কোশল তোমার বাটবে না। তোমার মতো লোককে ওখানে নেওয়া হতেই পারে না। ওখানে চুকতে গেলে বিশেষ বিচার ও কৃতিত্বের পরিচয় দেখাতে হয়।”

আমি বললাম—“শিক্ষা পেতে চাই বলেই আমি আবেদন করেছি। এখন নির্বাচিত হই কিংবা না হই, সে আমার জাগ্য। কিন্তু আপনি আমার আবেদনটি যত্নবান্নে পারিয়ে দিন। যদি ফেরত আসে তাহলে তখন বা হই বা না হই।”

তিনি বললেন—“পারিয়ে দিতে অবশ্যই আমরা বাধ্য, কিন্তু আমি তোমাকে কোনোরকম রেকমেন্ড করবোনা।”

আমি বললাম—“বেশ, আপনি এখনই পাঠিয়ে দিন।”

কিছু তবুও বেগা গেল যে, সেখানে থেকে আমি নির্ধাচিত হয়েছি। ভর্তি হবার জন্য আমার উপর আদেশপত্র এসে গেল। ওখানে শিক্ষা নেবার জন্য অনেক ছাঁকিতে হয়, কিন্তু আমি সরকারী চাকরিতে আছি বলে তাও আমাকে দিতে হবেনা। বুঝতে পারলাম, বন্ধুদের প্রণামপত্রই আমাকে তরিয়ে দিয়েছে।

নতুন উদয় নিয়ে ঈদিক্যালো ব্যাচায়ত করতে লাগলাম। বেতে হয় সকাল নটায়, কিংবা সন্ধ্যা ছটায়। তারপর ব্যক্তিগতও বীতিমতো পড়াশোনা করতে হয়। গ্র্যাজুইট নাম্বারের বস্ত্রায় রইল, আবার শুরু হলো পুরো-পুরি ছাত্রজীবন। নতুন বিদ্যা শিখতে যাবি, এর একটা আলোচনা বকম আনলুম আছে।

কিন্তু এবারকার ছাত্রজীবন আরো বেশি কঠোর। যে যে বিষয়ে শিক্ষা নিতে হবে তার অধিকায়ের সহজে কোনো কিছুই জানি না। প্রোটোকোলজি, হেলথিওলজি, ব্যাকটেরিওলজি, এন্ট্রমোলজি, সিরোলজি—আরো কত কি। এবসল বিভাগের সহজে কোনো কথাই জানা নেই। সমস্তই নতুন করে শিখতে হবে, পরীক্ষা দিতে হবে, পাস করতে হবে।

ছাত্র প্রায় সমস্ত-আমি জন। প্রায় সকলেই আমার চেয়ে বয়সে বড়ো, ছাত্রায়জন হবে আমার সমবয়সী। প্রায় সকলেই আমার চেয়ে বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, বোধাধী। হু'-একজন ডিভিশন-সার্জনও তার মধ্যে আছেন। বাইকমোগ-বস্ত্র-ব্যবহারে প্রায় সকলেই আগের থেকে খুবজ্বর, আমি শু-বিস্ময়ে একেবারে কাঁচা। সকলেরই হু-চোখের ডাব দেখে ও কথাবার্তা শুনে যেন হয় তারা লেকচারের সব কথাই বুঝতে পারছে, কিছুমাত্র তাদের কর্তন টেকছেন। অবলীলাক্রমে এ বিজ্ঞার পাস করে বেতে পারবে, এমনি তাদের ডাবখানা। বেবেগুনে গ্রন্থমটার আমি হুচকিয়ে সেলাম। এদের সঙ্গে পান্না বেগুনা আমার গক্ষে সহ্য হবে যেমন করে? শেবে কি আমাকে হাত্যাশপ হতে হবে?

কিছু বদন শিখতে এসেছি তখন যেমন করে হোক এগুলি শিখতেই হবে। ওদের সঙ্গে নিয়ে নিজের বিভাগ বোড়ের চুলনা করে কোনো লাভ নেই। ওটা যেমন করেই শিখুক, আমি আমার মতো করে শিখবো, নিজের বতটুকু বুঝি তাই দিয়ে বধ্যাশা বোঝবার চেষ্টা করবো। ওরা পরস্পরে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতো, লেকচারের পরেই লাইব্রেরি-ঘরে একত্রে জড়ো হয়ে তাই

নিরে তর্কাতর্কি করতে বসে যেতো, কিন্তু আমি বেশানে যেতাম না। যদি কিছু বুঝতে না পারতাম তাহলে মধ্যসরি প্রকেশনহলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম। ঠাণ্ডে অধ্যয়ন বস্ত্র-ব্যবহার দেখে সেই সাহসটুকু আমার মধ্যে এসে গিয়েছিল।

এখানে কয়েকজন প্রকেশনের কিছু পরিচয় বেগুনা দরকার। এমন ধরনের একান্ত বিজ্ঞানসেন্দী সাধকদের আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। চিবিংসাপানে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের সাধারণত আমরা ডাক্তার বলে থাকি, এঁরা কিন্তু কেউই সেই তথ্যকথিত ডাক্তার নন। ডাক্তারি করতে যদিও এঁরা ভালোবাসেন, আনেন, এবং হাসপাতালে আগুন আগুন নিমিষ্ট ওয়ার্ডে সেক-কাজ বধ্যাশিও করতে থাকেন, কিন্তু এঁরা কখনো গ্র্যাজুইট করেন না—অর্থাৎ পদসা নিয়ে প্রায়ই বেগেননা। পদসার দিকে এঁদের লোভ নেই, খ্যাতি-শপের দিকে লিপ্সা নেই, অস্ত্র কোনো রকমের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। এঁরা নীরব কর্মী—সত্যের সন্ধানই জীবনের একমাত্র ত্রুত, সেই কর্মেই নীরব নিষ্ঠার সঙ্গে সারাশক্তি নিবুজ। সেই কাজ হলো বিসার্গ করা, যোগ সম্বন্ধে যে-সব রহস্ত আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি সেগুলিকে আবিষ্কারের চেষ্টা করা। সে কাজে এঁদের কোনো ক্রান্তি নেই, সে কাজের কোনো সমাপ্তি নেই। যেমনি একটা কিছু আবিষ্কার হয়ে গেল অমনি পরমুহুর্তে অস্ত্র একটা কিছু আবিষ্কারের চেষ্টাও হত হলেন। এঁদের বলা যায় প্রকৃত বিজ্ঞানতরতী। হুনিদ্যাবারীর সব কিছু ছেড়ে বিজ্ঞানের সাধনাক্ষেই জীবনের একমাত্র ত্রুত করে নিয়েছেন। সত্যাদিকায়ের আনন্কেই একবার দ্বার্য।

আচার ব্যবহার এবং চরিত্রও এঁদের অতি অদ্ভুত। অস্ত্রতগক্ষে আমি নিজের চোখে যেমন দেখলাম, একেবারে শিশুর মতো সরল। এঁদের কাছে কালো-সাদার কোনো প্রভেদ নেই, ছোটো-বড়োর প্রভেদ নেই, ছাত্র-গুরুর পার্থক্য নেই। সকলের সম্বন্ধেই সমান ব্যবহার, এমন কি আপসিষ্টাও বধ্যাশিওর সঙ্গে পর্যন্ত। অতো বড়ো মাস্তের পদে অধিষ্ঠিত থেকেকও, সে সহজে কোনো যেন শেয়াই নেই। বধ্যাশিকে কোনো কাজের জন্য ডাকতে হলে টেবিলের বকী ব্যক্তিয়ে সকলেই ডেকে থাকে, কিন্তু এঁরা বেগুলায় তাও করেনা, নিজেই ব্যস্তমস্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে কামরার বাইরে গিয়ে অপেক্ষমান বধ্যাশিকে বুঝি মিনতির স্বরে বলেন, এট কাজটি হুচি করে দিতে পারবে? বধ্যাশা-বেচারী হুততো টুলে বসে চুলতে চুলতে

সাহেবকে ঐভাবে বেরিয়ে আসতে দেখে বিব্রত হয়ে খড়ম্ভ ক'রে উঠে পড়ে।

ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহারও ঠিক ঐরকমই। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে তৎক্ষণাৎ তাকে চেয়ারে বসতে বলেন, নিজের সব কাজ কোলে রেখে তাকে নিয়েই পড়েন, শেষ পর্যন্ত হুলি না করে ছাড়েন না। বস্তুত্ব কবাই হোক, তাতে কোনো বিরক্তি নেই। ছাত্র কিছু জানতে চাইছে এটাই মন্ত কথ।

ধর্মের মধ্যে একজন ছিলেন নিগো। তিনি পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছেন, খৃঃ-প্রান্তের বিশিষ্ট যোগগুলি সবচেয়ে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের আবিষ্কার করেছেন। কয়েকটি বইও লিখেছেন। খ্রীঃপ্রধান দেশের যত কিছু যোগ সম্বন্ধে তাকে একজন বিশেষজ্ঞ বলা হয়। যোগনির্ণয়ের ও যোগের পরিচয় সম্বন্ধে তিনি হস্তাক্ষর। তাঁর স্বাম্যবাস্তে দেহাশের সর্বদা নানারকম ছবি এবং চার্ট টাঙ্কানো। তিনি এসব নিয়েই আছেন। প্রায়ই দেখা যায় গভীর অভিনিবেশের মধ্যে কত রকমের চার্ট তৈরি করছেন, কোথায় সন্ধান যোগে কত চিত্রার হার, কত দেশের কোনজাতীয় লোকেরা কি কি যোগে বেশি প্রাণে, ইত্যাদি। ইনি ক্রমে বা লোকটার বেন তা পোনবার মতো জিনিষ—ছবি দেখিয়ে, প্রত্যেক যোগী এনে দেখিয়ে, দিনেমা দেখিয়ে তাঁর বিবরণগুলি প্রকাশ করে বুঝিয়ে দেন। বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা অতি আশ্চর্য।

একজন ছিলেন বোলু। প্রোটোজুলজির প্রফেসর। ব্রেটোপাটো টাকমাথা মাছকটি, নিজের ল্যাবরেটরিতে একটি উঁচু টুলের উপর বসে প্রায় সর্বদাই হাইক্লোপেন চোখ লাগিয়ে আছেন, চেয়ারের আশ্রয় ক'রে বসতে একে কঠিন দেখা যায়। যখন টেবিলের উপর অদৃষ্টে হাইক্লোপেন দেখবার জীভ আসলে, তার সমুখে একটি জলভরা কাচের বীকার। অত্যন্ত গরমের সময়েও তিনি মাথার উপর পাখা চালান না, পাছে হাইক্লোপেনের পতীকা তাতে ব্যাঘাত হয়। সারাদিন এই নিয়েই আছেন। ধাবায় সময় হলে, কাজ করতে-করতে সেখানে বসেই কিছু ঘেমে নিচ্ছেন। বিকাশ পায় হয়ে সন্ধ্যা উপলব্ধ হয়ে যায়, অজান্তে ডিপার্টমেন্টে সবাই ঘর বন্ধ ক'রে চলে যায়, কিন্তু তাঁর ঘরে দেখা যায় তখনও আলো জ্বলছে, হারি নটা পর্যন্ত সেখানে বসেই তিনি কিছু কাজ করেন। আবার গরম দিন সকাল আটটার মধ্যেই এসে হাজির। প্রত্যহই তাঁর গুরুতর কাজের প্রোগ্রাম, একইই অবদার নেই। সর্বদাই দেখা যায় তিনি মহা ব্যস্ত, কথা বলেন খুবই কম, কাজও সঙ্গে বসে হা'মিনিট গল্প করত

তাকে কখনই দেখা যায়না। যে কাজে লেগে আছেন তা বেন অত্যন্ত জরুরী।

একজন ছিলেন দাশগুপ্ত। তিনিও বড়ো কম বান না। তাঁর গবেষণার খ্যাতি ইন্টারন্যাশনাল, আমেরিকা-ইউরোপের সকল দেশে এই-বিজ্ঞানীয় বিজ্ঞানী মহলে তাঁর নাম আবিষ্কারক হিসাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিবেশের অনেক কার্মানে তাঁর লেখা বৌদ্ধিক প্রবন্ধগুলি ছাপা হয়, এক জার্নাল থেকে অল্প জার্নালে তা আবার পুনঃপ্রিন্ট হয়। ইনি সর্বদাই একটা ময়লা এপ্রন গায়ে চড়িয়ে রেখেছেন। ইনিও সর্বক্ষণই মহা ব্যস্ত, হয় হাতে কখনো একটা বাঁধকে ইনস্পেকশন নিচ্ছেন, না হয় গিনিপিস নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন, না হয় বেড়ালকে অজ্ঞান ক'রে বেলে তার কুক-শেট চিরে তার মধ্যে নানারকম বস্তুপাতি লাগিয়ে হাটের ক্রিয়া সম্বন্ধে কি-সব পরীক্ষা করছেন। বাঁধেরে ম্যালেবিয়া ইনইই প্রথম আবিষ্কার করেন। অথচ মনে কোনো গুণম নেই, সর্বদাই হাসিমুখ। ব্যবহার অত্যন্ত অস্বাভাবিক। ছাত্ররা কেউ কাছে গেলে কাঁধে হাত বিরে 'দাধা ভাই' ছাড়া কথাই বলেন না। এজন্যে খুবই গভীর, কিন্তু ছাত্রদের কাছে একেবারে অজ্ঞ ভাব।

একজন ছিলেন অ্যান্টন। প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া চেহারাখানা, কিন্তু বজাখটি বালকের মতো। খুব ধীরে-ধীরে ঘেমে-ঘেমে কথা বলেন, তার মধ্যে অনেক হাসির কথা থাকে, কিন্তু নিজেকে কখনো হাসেন না। ইনি জীবাণু-বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ, আর বিশেষ করে চর্চরোগে অসাধারণ দক্ষ। যে-কোনো চর্চরোগ দেখলেই ইনি নিতু'লভাবে তা ধরে কেসতে পারেন, বিশেষ থেকে তার উৎপত্তি সে-কথাও বলে দিতে পারেন। কত লোক এর কাছে শিক্ষা নিয়ে চর্চরোগ সম্বন্ধে দুঃখের হয়ে উঠেছে, অথচ নিজে ইনি রিসার্চ নিয়েই পড়ে আছেন। এর মতো সর্ববিধের প্রতিভাশালী ব্যক্তি খুব কমই দেখা যায়।

একজন ছিলেন ডি'হেরেল। ইনি কল্লী পণ্ডিত, ব্যাকটেরিওলজ অর্থাৎ জীবাণুতত্ত্ব জীবাণুদের ইনি প্রথম আবিষ্কারক। ইনিই প্রথম প্রমাণ ক'রে দেখান যে প্রকৃতির মধ্যে যেমন যোগজীবাণু থাকে, তেমনই তাদের ব্যবহার মতো জীবাণুতত্ত্বও থাকে—এমন কি, হুই-ই পাণ্যপাণি থাকে। সকল নদীর জলে এবং পশার জলেও প্রচুর ব্যাকটেরিওলজ আছে, এই কথা প্রমাণ করতে তিনি এখানে এসেছেন। মুখে জেকুকাই বাড়ি সম্বন্ধিত অতিশয় ব্যস্তবাসী মানুষটি। গারে খুব পাতলা চার্ট, হানে হানে তার হেঁড়, বুকে বোতাম নেই, বুকের চুলকোনা সব দেখা

যাচ্ছে। একে বদতে কখনো দেখা যায় না, স্বর্গলা-
গীড়ির গীড়ির কাজ করছেন। ঘরের এ-প্রান্ত থেকে
ও-প্রান্ত পর্যন্ত সারে সারে টেবিল পাভা, তার উপর
গোল গোল কাচের কাপড়-ডিশগুলি পুঙ্খ ক'রে
সাজানো। তাকে বলে পেটি ডিশ। অসংখ্য পেটি ডিশের
ঘর তৈরি। তাই নিয়ে তিনি কাজ করছেন, এ প্রান্তের ডিশ
থেকে কিছু জিনিস নিয়ে তিনি ও-প্রান্তের ডিশে নিষ্ক্ষেপ
করছেন। কাজেই তার গদ্যের সুরসভ কখন? ক্রমাগতই
ডিশ পরীক্ষা করছেন আর কাচের পেনসিল দিয়ে দাগ
বাবছেন। ঘরের চতুর্দিকের কাচের শাশিগুলি আঁচা,
পাছে ডিশের মধ্যে বাইরের দুলা এসে পড়ে। ঘরে পাখা
চাষা উপায় নেই, তাতেও ঐ বিপত্তি ঘটতে পারে।
গরমের সময় সেই বন্ধ কাচের বেন ইনকিউবেটরের মতো
গরম হয়ে উঠেছে, তব্বলোক গলদ্বন্দ্ব হয়ে সেই ঘরের মধ্যে
ছুটাছুটি করছেন। ভাবনাটা দেখলে মনে হয় লোকটা
পাগল হবে না কি। কিন্তু কি হুমিষ্ট ঠাঁর ব্যবহার,
ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে অতি অস্বাভাবিক কথাবার্তা।
একবার কিছু বুকিরে দিতে বলল আর বন্ধা নেই,
অনবরত বকে বেতে থাকবেন।

এখানে কয়েক জনেরই মাত্র পরিচয় দিলাম, কিন্তু
আরো অনেকে প্রায় এমনই রকমের। বিজ্ঞানের সাধনা
আর সেই বিষয়ে শিক্ষা কেউকেই এঁরা স্বাধীনতার লক্ষ্য
করছেন। সেই উচ্চতর কর্তব্যের পথই এঁরা বেছে
নিচ্ছেন।

আদর্শ রকমের কিছু দেখলেই আমাদের মন তার
দিকে আকৃষ্ট হয়, আগনা থেকেই তাকে অমুখর করবার
কৌশল। নিজের অজানিতে আমাদের সেইরকম
পানিকটা কৌশল এসে গেল। আগে যেমনভাবে শিক্ষা
গ্রহণ করতাম তেমনভাবে নয়, এখন নতুন উদ্যম নিয়ে
নতুনরকম ভাবে এঁদের কাছে শিক্ষা নিতে থাকলাম।
প্রত্যেক আদর্শের সারিযো যে প্রত্যেক কাজ হয়, সেই কাজও
আমার মধ্যে হতে থাকল। ছবি এঁকে বোকা ও চাট
প্রস্তুত করার দিকে আমার খুব কৌশল এলো। ক্লাসের
বোর্ডে প্রক্সেরা যে-সব ছবি এঁকে বোকাতে, আমি
তৎক্ষণাৎ সেগুলিকে খাতার নকল করে নিতাম, বাড়িতে
এসে সেগুলিকে আরো ভালো করে এঁকে নিতাম।
প্রত্যেক রোগের ব্যাপারে আগে চাট এঁকে ফেলতাম।
তাতে বোকাবার পক্ষে খুবই সুবিধা হতো। বইখান চাইতে
আমি লোকজারের খাতার দিকেই বেশি মনোনিবেশ
করতাম। এমন কি হাসপাতালে বোকাবার কাছে

গীড়ির এঁরা বেসকল ক্রিমিক্যাল উপদেশ দিতেন,
সেগুলিকেও আমি সঙ্গে সঙ্গে নোট করে ফেলতাম,
সেগুলিও আমার খুব কাজে লাগতো। আর মাইক্রোস্কোপে
বেসকল নমুনা দেখানো হতো সেগুলিকেও আমি খাতায়
লাল-নীল পেনসিল দিয়ে এঁকে নিতাম। আমি দেখলাম
যে, বই মুখ করার চেয়ে এঁকে রাখলেই বেশি মনে
থাকে।

শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বইই আমার নতুন জ্ঞান-
সঞ্চার হতে থাকল ততই দেখতে পেলাম যে আগে অনেক
কিছুই আমি জানতাম না, কেবল কতকগুলি নিয়মকে
অম্লসরণ ক'রে কতকটা অন্ধের মতো চিকিৎসা করে
যেতাম। কোন রোগে কোন ওষুধটি কেন দিচ্ছি তার
শেষ পর্যন্ত তালিয়ে দেখার মতো বিজ্ঞা অনেক স্থলেই
ছিলনা। তাতে অবশ্য সাধারণ চিকিৎসার দিক দিয়ে
বিশেষ ব্যাঘাত হরনা। একজন অশিক্ষিত-পটু-সম্পন্ন
অভিজ্ঞ কম্পাউণ্ডারেও সাধারণ রোগে তেমন ধরনের অন্ধ-
চিকিৎসা করতে পারে। কিন্তু সব তথ্যটুকু না মেনে
তেমন চিকিৎসা করাকে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা
বলা যায়না। তাতে বিশেষ করে এঁই বোকাই হতে যে,
অনেক সময় ওষুধের নামারকম অপ্রত্যয়ে হয়ে থাকে।
বাক্যের বহন যেমন দুয়ে ওঁতে সেই অম্লসারে অনেকেই
কার্য-কারণ তালিয়ে না দেখে চোখ বুজে পরম নিশ্চিন্তে
চিকিৎসা চালিয়ে বেতে থাকে। দীর্ঘায়ুধরণ বলা বার
এখনকার দিনের পেনিসিলিন ব্যবহারের কথা। আজকাল
সেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে অনেকে সর্দিতেও দিচ্ছেন
পেনিসিলিন, ব্যতেও দিচ্ছেন পেনিসিলিন, গোস-
পাঁচড়াতেও দিচ্ছেন পেনিসিলিন। সকল রোগেই
তাই। একবারও ভেবে দেখছেন না যে পেনিসিলিনের
জীবাণুনাশক ক্রিয়া ছাড়া আর কোনো ক্রিয়া নেই,
এবং তাও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ জীবাণুর উপরেই
তার ক্রিয়া আছে, বাকি অসংখ্য জীবাণুর উপর তার
কোনোই ক্ষমতা নেই। স্বতঃপা পেনিসিলিন দিতে
হলে আগে জীবাণু বুঝে তবে দিতে হবে, নতুবা ওর
প্রয়োগে সাফল্য মিলবেনা। এমনি অন্ধ আচরণ অনেক
নতুন নতুন ওষুধের বেলাতেই আবহা করে থাকি।
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকেই অনেক গবেষণা ও অনেক
পরিশ্রম ক'রে এক-একটি নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেন
এবং আমাদের হাতে সেগুলি তুলে দেন। আর আমরা
ডালো-বন্ধ কিছু না বুঝে সেগুলির যথেষ্ট অপপ্রয়োগ
করতে থাকি। কিন্তু ঠিকভাবে তালিয়ে বুঝতে পারেনা

রোগের নিদান ও জীবাণুত্রি কিছু ভালো করে কোনে রাখা দরকার। তারই অভাবে আমাদের জ্ঞান চিরদিন বেনে খাপছাড়া রকমের হয়ে থাকে। এইজন্য ডাক্তারি-বিজ্ঞান পাস করার পরেও পানিকটী শোকে-গ্র্যাফুটে শিক্ষা আনত করতে পারলে সবলের পক্ষেই ভালো হয়। আমি যদিও অল্প কয়েক এখানে শিক্ষা নিতে চুকছিলাম, কিন্তু পরে দেখলাম যে এই শিক্ষাগুলি নেওয়া আমার পক্ষে খুবই দরকার ছিল। মইলে আমার জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

উপিক্যাল বেভিসিনের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নয় মাসে। তার পরেই পরীক্ষা। এ পরীক্ষা সহজ নয়। লিখে পরীক্ষা, মুখে পরীক্ষা এবং প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা তিন রকমই আছে। প্রত্যেক বিভাগে তিনজন করে পরীক্ষক।

জানছিলাম যে অন্ততঃ পরীক্ষার মধ্যে বেভিসিনের অর্ধাংশ রোগবিজ্ঞানের পরীক্ষাই সবচেয়ে কঠিন। আমার তাই আগের থেকেই দখত উৎসেণ ও হুশিয়ার হতে থাকল। অত্যন্ত বিবরে স্বচ্ছ-বিজ্ঞার জোরে উৎসেণ বাওড়া যায়, কিন্তু এ বিবরটিতে কিছু ত্রুটিরকমের উপস্থিতিবৃত্তি থাকার দরকার হয়। মনুষ্য সব-কিছু জানাশেনা থাকলেও কার্যক্ষেত্রে খাবড়ে যেতে হয়।

হালও তাই।

খাওয়ার লেখা পরীক্ষার বেলাতে আমি বেশ ভালোই লিখেছিলাম। কিন্তু গওগোল হলো প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপারে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকেই দুটি রোগী দেওয়া হয় রোগনির্ণয় করতে, এবং তার স্মৃতিচিহ্নাংশ কেমন হওয়া উচিত সে-বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করতে। তার পরে রোগী দেখা হয়ে গেলে পরীক্ষার্থীদের উত্তরগুলি পরীক্ষকদের কাছে দাখিল করা হয়, এবং তাঁরা তাদের একে একে জেগে পাঠিয়ে নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

হুটই মধ্যে একটি সেলান চর্চরোগ, সেটি বিশেষ কঠিন নয়। আর একটি রোগী দেখলাম, তার হার্টের সোপে আছে। হার্টের দরকার মুখে কিছু বিকৃতি থাকার, পান্য করা সহজ, সমস্তটা রক্ত বদলীর মধ্যে পরিচালিত হয়না, কিছু রক্ত দরকার ঠাক বিরে আবার হার্টের মধ্যে ফিরে আসে। এতে বৃকে এসবকম শব্দ পাওয়া যায়। রোগীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এ সোপে তার অনেকদিন থেকেই আছে। কিন্তু অপরপক্ষে দেখলাম রোগী খুব শীর্ণ, বেহুঁ প্রায় রক্তশূন্য, আর সেটে একটাও একটি পীলে। লিভারটাও কিছু বেয়েছে। শাফে যার তার খুব ক্ষয় হয়।

রোগীকে দেখেই বোকা যায়, হার্টের সোপ থাকলেও আপাততঃ কনিষ্ক-ম্যালেরিয়াতে সে ভুলছে। আমি তার

সহজ অবস্থাগুলি বর্ণনাও বর্ণনা করে লিখলাম। সেবে চিকিৎসার সম্পর্কে লিখলাম যে, আগে তার ম্যালেরিয়া আর রক্তশূন্যতা আরোগ্য করার চেষ্টা করাই দরকার। হার্টের সোপটির সহজ বর্ণনা দিলেও, তার চিকিৎসা সহজ কোনো কথাই লিখলাম না।

বধাসময়ে পরীক্ষকদের কাছে আমার ডাক পড়ল। কয়েকজন প্রভোক্তার হয়ে যাবার পরে একজন পরীক্ষক আমার লেখা কাগজটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—
“এ ছুমি কি লিখেছ? এ রোগীর এমন গুরুতর হার্টের সোপ রয়েছে, সে সহজে কি চিকিৎসার দরকার তা কিছু লেখনি কেন?”

আমি বললাম—“আগে ওর ম্যালেরিয়া সারুক, তারপর দে-কথা বিবেচ্য। এখানে এই রোগটিকেই আমি প্রধান বিবেচনা করেছি।”

“ম্যালেরিয়া বেশি মারাত্মক, না হার্টের রোগটি বেশি মারাত্মক? যদি বলি যে এই দুটি রোগের মধ্যে একটিকে তোমার বেছে নিতে হবে, তাহলে ছুমি কোনটিকে বেছে নেবে?”

“অবশ্য ম্যালেরিয়াই বেছে নেব, কারণ এ রোগের ওষুধ জানা আছে, শীঘ্র সারিয়ে ফেলতে পারবো। কিন্তু হার্টের ও-রোগের চিকিৎসা করে মারানো খুব কঠিন।”

“অবশ্য এ রোগটিকেই ছুমি অবহেলা করলে। তোমার প্রেক্ষাপক্ষে ও-রোগের কোনো ব্যবস্থা করলেনা। রোগী তোমাথেকে তো একটিনাক্ত রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাকছেন, সে চাইছে যে তাকে ছুমি সকল রোগ থেকেই মুক্ত করে তোলা।”

“আমি ভেবেছিলাম যে, ম্যালেরিয়া সেয়ে সেয়ে এবং গায়ে রক্ত হলে তখন সে আপনা থেকেই অনেকটা মুক্ত হয়ে উঠবে।”

“তাকে কি ওর হার্টের রোগটিও সেয়ে যাবে?”

“তা নয়, তবে আমি এখানে উপিক্যাল বেভিসিনের পরীক্ষা দিতে এসেছি, তাই—”

“তাই কি অন্ত রোগ সহজে কোনো কথাই বলবেনা?”

আমি একবার আর কিছু জবাব দিতে পারলাম না। পরীক্ষকদের মধ্যে মিসো ছিলেন। তিনি এতক্ষণ একটিও কথা বলেননি, চুপ করে বসে থেকে হুঁ-হুঁ হাসিছিলেন। এবার সেই পরীক্ষকটি তাঁর ঘুঘের দিকে চেয়ে হুঁহুনেই হাসতে শুরু করলেন।

ওদের হুজনের ঐ হাসি দেখে আমি খুব খাবড়ে সেলাম। আমার উত্তর নিজের ওদের মনঃপূত হয়নি।

সেখান থেকে উঠে চলে আসতে গিয়ে ঘরের চৌকাঠের কাছ পর্যন্ত এসে আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল, আমি চৌকাঠ ধরে সেখানেই হঠাৎ ধপ্ করে বসে পড়লাম।

মিসো ভাড়াভাড়ি উঠে এলেন। কাছেই একটা বেকের গুপার আবারে তইয়ে দিয়ে মাথাটা নীচের দিকে নামিয়ে ধরলেন। তখনই হুহু হয়ে আমি ভাড়াভাড়ি উঠে বসলাম। ঠর নুনের দিকে চেয়ে বসলাম—“আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আমি হুহু হয়েছি। কিন্তু পরীক্ষার ফেল করলাম তো?”

তিনি বললেন—“না না, তুমি ভালোভাবেই পাস করেছ। এখন শু-কথা ভেলেনা, লাইব্রেরিতে গিয়ে বিজ্ঞান নাও। পরে আমার সঙ্গে দেখা করো।”

লাইব্রেরিতে বসে গুনলাম, ছাত্রদের মধ্যে আরো কয়েকজনের ডায়েরী ঐ হোস্টিটি পড়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হার্টের রোগকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

উদ্বিগ্ন মনে মিথোর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি যেসে বললেন—“তুমি ঠিকই তো করেছিলে। কিন্তু এমন যাবড়ে গেলে কেন? আরো কোরের সঙ্গে তোমার বলা উচিত ছিল যে, সেহে বন্দন বাইরের একটা রোগজীবাণু এসে আক্রমণ করেছে, তখন ভিতরে কী পুরোনো ব্যাধোমেলে দোষ হয়েছে সেদিকে নজর দেবার দরকার নেই, আগে উপস্থিত শত্রুর নিপাত করা চাই।”

পরীক্ষার কল যখন বেয়েলো তখন দেহলার যে আমি ভালোভাবেই পাস করেছি। প্রোটোজুলজি ও ফার্নাকোলজিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। সবশেষে যে এই পরীক্ষার পাস করতে পেরেছে তা নয়। অনেকগুলি ছাত্রই একাধিক বিষয়ে ফেল হয়েছে।

ছেলেবেলাকার কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। তখনও এক পরীক্ষাতে ফাংকট হয়েছিলাম। দেবার ডবল-প্রশ্নোপনেষ্টই আমাকে মাটি করেছিল। এবারেও যেন তাই না হয়। [ততৎ]

চিত্রা

মহাশেতা ভট্টাচার্য

যেদিনীপুর জেলায় দাঁতন ও কটাই-এর সন্নীপস্থ অঞ্চল থেকে বছর বছর একবল নরনারী কলকাতার আসে। ভূম্যল বলে, এরা পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাস। এদের ভাষা গড়িয়া, বেশরাস আচার-ব্যবহার গড়িয়াদের মতো। সাধারণতঃ এদের পদবী—প্রধান, মহাশি, নাথ। গড়িয়া বলে পরিচয় দিতে এদের আপত্তি। পুরুষরা মদ্র মাথা নাড়ে। মেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে—মু বদাল, সোক বেশ যেদিনীপুর জিলা।

তু জান নয়, ভাতের নিরাপত্তাও যেদিনীপুরেরই দেওয়া উচিত। কিন্তু দাঁতন, ঘাটাল বা কাঁশি-সে-প্রতিক্রিতি কোনবারই রাখতে পারে না। তাই, হুহু বর্ণার মুখে, নয় শীতের কসল ছুপে দিয়ে এরা এসে পড়ে। একবারে-মারি-বামারের গছ বেয়েই চোছরা থেকে। অনন্ত, উৎসব, চৈতন্য, অজুর্ এইসব সাউ-প্রধান-মহাশিরা প্রথমে কর্পোরেশনের ফিটাইন-মাসার কাছাদের কাছে ঘোরে। কেউ কেউ সোকা এসে আবারের পাড়-

প্রতিবেশীর ঘরে অন্তস্ত-বেশ-মুখো অনন্ত বা কৈলাসের বদলি বরুণ রাহাঘরে ঢুকে পড়ে। একসময় ধাল-বিল জলা-জলি দশটাকা করে। হিসেবে বিনেছিলেন গায়া, দেইসব হিসেবী ঘোষ-বোশ-সরকার-চাইকোদের অর্থজন বংশধরদের কারো কারো আশঙ্ক বাঁধুনে বাধু রাখবার ক্ষমতা আছে। শিতপুরুষের রেখে মাওরা বাস করবার মতো একখানা-দুখানা বাড়ি, কানিং-এ মেনো জলি—এর কল্যাণে মোটা ভাত আর কুচো-চ্যাংরার গামলা ভাঙ্গানো কোলের প্রতিভ্রতি অজ্ঞেও আছে। সেই প্রতিভ্রতি-ই এইসব তথাকথিত একাত্তরতী পরিবারের বনিয়াদ। এ সব পরিবারের ভাত-কোলাটা একসঙ্গে চলে। এদিকে ঘরে ঘরে আলাদা মিটসেফে বামীর যোজ্জার ঘাফিক চার-পরসার দানাদার থেকে চারটাকা সেরের আপেল পর্যন্ত হাজিরা দেয়। এমনিদ্বারা বাড়িতেই তোকে এইসব বাঁধুনে বাধু। ঐ ভাতটা নামার, কোলাটা বসার, কাল দিয়ে মাছ রেখেও বাঙাল্য দস্তানদ্বাবিতা ননদদের কখনো।

নিজেরা গীটার সঙ্গে পান-সুপরি, লোডা-সংবানের গাওনা নিয়ে কণ্ঠা করে। হুপুরে গাড়িবারান্ধার বসে দেশের লোকতলার গুণর মুক্সিয়ানা চালায়।

তাদের খেয়েবা ঘর ভাঙা: নিরে ঢাক বঁধে। লোকের বাড়ি-বাড়ি কাজ নেই—তোলাকাজ, দিনরাতের কাজ।

এদের মধ্যেই আমি চিন্তাকে প্রথম দেখি। বাঘাদ খাটো, হাং কল্লা, হাতে রূপের বাগা, গলার উপুড়ি দিয়ে হার আঁকা। একটা ছোট্ট মেয়েকে কোমরে দড়ি বেঁধে বসিয়ে রেখে সে কাজ করছিল আবারই পাশের বাড়ি। নির্দোষ চোখাছুঁরির ব্যাপার আছে। হুঁচকুরের তোগা মেয়েটা হা'য়ের পায়ে পায়ে ঘুরবে ঘরে-ঘরে—সে তাঁর অলঙ্কার। চোখে দেখে প্রথমটা আমার গা-ও অঙ্গে গিয়েছিল। এ'কবারে তোগা একটা মেয়ে। বসে আছে গাড়িবারান্ধার দু'শার গুণর। রোগে ভুগে চেহারাটা জ্ঞানভ্রষ্টের মতো। বড় বড় চোখগুলোতে কোনো কৌতুহল নেই। অনেক ক্রান্তি, কখনো আর খেঁচ নিয়ে সে বসে আছে। পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো কাছেই ঠাঁড়িয়ে বসে দেখছে। একটা গানব কোতুহল আর দুর্ভাগ্যে খোঁজাবার একটা নির্ভর তালিমে তাদের ছোট ছোট মুখগুলো বিরকম্ব যেন হয়ে উঠেছে। তাদেরও শেষ দিতে পারি না। বহুদিন ধরে বাড়িভাঙার টাকটাকি শুধু সন্নার ঘরে পড়ছে। রেং-বনতা। হুঁচকুর-বুড়ির ঘর বহুদিন খেঁচলে হয়ে গেছে। একদিকে থাকবার অভিশাপ এই, যে কতকগুলি হাতুখ পরাম্পরকে চুড়ান্ত গুণা করে। বড়দের রেংহীন সম্পর্কের দার বহন করে ছোট ছেলেমেয়েরা। বহু সম্পর্কের শর বহন করে বেড়ে ওঠে বলে শৈশবেই তারা বুড়িয়ে যায়।

চিন্তার বাচ্চা মেয়েটাকে দেখে আর ছেলেমেয়েগুলোর প্রতিক্রিয়া দেখে মনে একটা আঘাত লাগল। নিজের সেউলে খরপ এমন নর করে আর কখনো দেখিনি। লক্ষা শেলাব বলেই নির্ভর হয়ে উঠলাম। সৈন্ড ঢাকবার এমন পদ্দা তো নেই। তাই বললাম—'বঁধে রেবেচ্ কেন? ওর লাগছে না?'

—'কাজ করিব।' বলে চিন্তা জব্বর মতো প্রতিবাদ-হীন দুটিতে তাকাল। পাঁকা-পাঁকা বাসন হাল্ধল, ভাল ভাল বাটনা বাটল। বেশা হুপুরে বেশলার মেয়েটাকে কোলে নিয়ে ধবে বাচ্ছে। ডেমা কাপড়ে বেহাৱী পানপুৱানার অদীশ-দুটি আকর্ষণ করে চিন্তা আছে আছে কখন বাচ্ছে ওখন দেখে বোকা সেল কোলের আধবরা বাচ্চাটার দোদার হবার জন্তে আর একজন আসছে।

পরে না বলে পারিনি—'ঘরে কেউ নেই তোমার? মেয়েটাকে বেধে আনতে পার না?'

—'বোর কেউ নাই।'

ওর কেউ নেই। এই মেয়েটা আর অনাগতটির ডার বহন করে ওকেই বাসার কাজ ধরে ধরে চলতে ও চালাতে হবে এই কথাটা ওর সমস্ত জীবনব্যাপী দিয়ে বেহোয়। ও যখন শৌখের হাড়-কালানো শীতে ভোগে চান করে মধ্যল কাপড় প'রে কাজে হাত দেয়, বেশা দশটা দুটি বাসি ভাত গাড়ি-বারান্ধার মেয়ের কাছে বসে পায়, অথবা হাসান্তে আটটাকা বাইনের জন্তে দশদিন রাটে। ওর অথবা নিঃসহায় দেখেই বাইনেটা কোৱলদার বাহো টাকার রেই-শেঁকে আটে নাযিয়েছেন গিৱী। সব অবস্থাতেই ওকে প্রতিবাদহীন জব্বর মতো সঙ্কল্ল আর নীরব দেখি। সে-টাকা থেকেও বাটা যায়। ও বলে—'বা কলিন করিল। কখনো বলে—কাপড়াদুগা বিল না। ওর অথবা দেখে আমার নিজের লক্ষা করে। বাধ্যবিত্ত বিবেককে ঘূষ বিই ওকে পুরোনো কাপড় দিয়ে, অথবা মেয়েটার হাতে এটা-সেটা দিয়ে। রাত ব্যাঙেটার কাজ সেয়ে ঘরে ক্রিতে—মদ না খেয়ে ঠাণ্ডা হাওয়াই পান-গলা ওকে কাপট্যতে গিয়ে কাপড়খানা ছিঁড়ে দিয়ে চট্টটে হেসে চেঁচিয়ে গান ধরে। সকালে মেয়েটার হাত থেকে রুটি-বিছুট বাড়িগলার খৌয়ের নখ-পরানো কাকটা ছিনিয়ে নেয়। বাচ্চাটার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে, সে অলহাৱ, এ সত্যটা কাকটা খুব জানে। এমনি করে বিবেককে কোড়াতালি হাতবার ছোট্টা আঘাত দিচ্ছে হয়ে যায়—কোড়াতালি সংসারে চলে-না।

এর মধ্যেই এল চিন্তার আর-একটা মেয়ে। চিন্তার দলের অত্যাঁচ বি-রা বেশ গড়িয়ে নিয়েছে-ইতিবাহো। তাদের কাছেই বরং বিলস। ইদানীং আঁটটাকার কাজটাও ছিল না। বি-বের লটলা থেকে উজ্জব কমা সেল যে, চিন্তার দুইই দুর্ভিন্ন চলছে। হাতের ব্যাঙ বাঁধা পড়ছে দশটাকার। আরো বেশলার বি-রা চিন্তাকে বাসন-বাঁধা নিয়ে টাকা ধার দিতে চাইছে। তারা বলল—'ভালো কাপড়-পিন্ডলের বা বাটি-সেলাৱ আছে, তা তো ছাড়তে পারবে না চিন্তা। বুরলাৱ, লাড কহবার এ-ও একটা হ্রসোণ।

ক'দিন বাবে আবার দেখি দুর্ভলতার কাপতে কাপতে কাজে বেরিয়েছে। বলে—বড়টাকে ছোটটার কাছে রেখে এলায় সো, যা। গরীব কি একভাবে মরে? গরীব যে নানা ভাবে মরে, এ কথা বোকবার জন্তে আমি চিন্তার

কাজে বাব কেন? নিজেকে সাধারণ মানুষের বরদী মনে করবার একটা আত্মপ্রসার আছে। প্রাথমিক তার অবস্থিতি অবচেতনে নয়। সম্ভবতঃ তার তদ্বিষয়ে আমি ওর ফুটো কপালে ঝোঁড়াগানি নাগানার চেষ্টা করি। কোনো অস্বস্তি বীজার না করে, শবের উপকার করে পরোপকারী নাম কেনবার বাসনাটাও বোধহয় আমার প্রৌঢ়তভাবে পাওয়া আর-একটা উত্তরাধিকার। সে উত্তরাধিকারের বসন্তও গলা-পটা। তাই আমার চোঁড়া জানা, পুরোনো কাপড়, বাপি কটি অথবা বাড়তি স্বন্দালেন্দ্র আত্মরে চিন্তায় কাটা কপাল এতটুকু জোড়ে না। তেল-চিট্টিসিটে দেখালে ক্যালেন্ডারের চব্বিতে ফুটো ঢাকার মতোই অর্থহীন হয়ে যায়। চিন্তা অবশ্য সময় পেলে ফুটো কথা বলে যায়। বলে—‘কারো সোধই নাই। মৃণালকী।’

সেই শাশের কথা সে বলে জানি না। ব্যাখ্যা করবার উৎসাহও তার নেই। এ বিপুল দিন কাটে। আমার গনিটা দিয়ে যে জীবনপ্রবাহ চলে ভাঁই দেখতে দেখতে রাহুদের পাঁচিলটার কাটলটা বাড়তে থাকে। এ পাঁচিলটা ব্যবোয়গী খুঁটে দেবার জন্তে। পাড়ার বনৌী ফুটো একজন চাকর দ্বিগ্ন হামলা করিয়ে খুঁটে ছাড়িয়ে আনেন। তাই নিয়ে দিবিয়ার বা বাড়ির সামনে পাঁড়িয়ে ফুৎসিত কলহ করে বার। এদিকে নিকলগে প্রসন্নতার কার্ট-টার্ডার গাছটা ব্যবোয়গ ফুল ফোটার। সে ফুলের কে-কটা শব্দে পড়ে তাই শূর্ণ বাঁড়িরে ফুলে নিয়ে বান নিতা-বাবুর পিনী শিবপুজোর জন্তে। মানুষের অর্থহীন আচরণ বেশে গাছটার উপরের ডালাপালাগুলো পোনাবোদ মাথা-মাখি করে বেশে আত্মহন হয়। সকলে সে হাসি পোনেনা এই বা। এরই মধ্যে দেখি চিন্তার শরীরে মাংস দেগেছে। নহুদের গাছপালাগুলোর মতো হুঁরি কিবের সে সমস্ত প্রতিফল লক্ষ্যার্থে কেনন করে প্রাণরস আধরন করেছে। দ্বাধ্য বিবেচনা। গদ্যার উল্লিখিত এখন ডালোই দেখার। সেদিন দেখলান নহুদ কাপড় পরেছে। বলল—খা দিয়েছে। মাইনেও মনে প্রোমোদন পেয়েছে।

সেদিন সকালে খুব কৈ-টে পাড়ার। চিন্তাকে কেন্দ্র করে বলেই মনে হলো। সে এক অভিনব মৃত্যু। ফুট-পাণের মাথখানে নতমুখে পাঁড়িয়ে চিন্তা। ওদিকে বেশ থেকে দূর আগত বৃদ্ধন পুরুষমাত্র একটা ফুটি-বাঁধা বহুদ-ব্যবোয় ছেলের নড়া ধরে চেষ্টিয়ে কি বলছে। জাষ এবং খর্ষ যে তাদের গল্বে এ বৃকতে অস্থবিধে হল না। একজনদের হা করবা, মুখে পান, চুলে, শিখি—চোঁচাচ্ছে সেই দেখী। চেষ্টিয়ে বলছে—‘হুই পাড়কী করিবি তে, দান

দিবি না!’ চিন্তার শেষের মাহুদরা তাকেই সর্বনি করছে। চিন্তার মুখে কোনো কথা নেই। সে শুধু বলছে—‘বোখ স্বভাটা নাই। সু অপরগ।’ ছোট ছেলোটাকে বার-বারই ধরতে থাকে। তাকে কইকা বেগে পুরুষ-মুদ্রন সরিয়ে নিচ্ছে।

হুপুয়ে চিন্তা এল দরবার করতে। বলল—‘বোকে গোটে টাকা ধার দি। সু শোধ করিবি।’

না কেনে না চিনে টাকা ধার দেব, আবার সে টাকা কেনত পাব, এত ভরসা নেই। তবু গোড়াতেই ‘না’ বলি না। ঘটনাটা কেনে নেবার ব্যবোগ একটা, হাজার হ’লেও। কৌতূহলে কি আমমা কতও চেষ্টে কষ?

উবু হয়ে বলে চিন্তা। কথা বলতে বলতে নাসের পটীটা ফুলে ফুলে ওঠে। নাক কেড়ে আর চোখ দুটো নেয়। কথার মাঝখানে সমুদ্রে বার বার বলে—‘মু মহাপাতকী। মু হতভাকী।’

চিন্তার কথাগুলোতে যে-সব কথা জানি তা আমার কানে নহুদ ঝেঁকে। চিন্তা বলে—‘দখন বিধবা হলান, তখন আবার ঐ এক ছেলে গোপাল। আমার চার-দিয়া জমি যো বা। হুইখানা টিনের ঘর, ছাগল ফুটো, গাই একটা। আমার হুয়ের বাসা ছেলে ও, চাষকাজের বি জ্ঞানে গো বা, আমি আবার পাড়ার মাহুদদের পায়ে ধরলাম। মাহামুদর আমি আত্মমাহুদরা বলে কি যো বা—তুই নাবালক বিধবা, জমি আমারের কথা করে দে। আমি রাজী হলান না। আত্মদ্বারা কষে উঠল। বড় উপদ্রব, বড় অশান্তি। এদিকে বোখ কাটা বদল—লছেবেলা মাহুদ আমার আদিনার হাটতে লাগল। আমি গোপালকে নিয়ে দরজা গড়া দিয়ে হামি আর ডগবানকে ডাকি। বড় হুঃখের দিন।...’

বলে আর অল্প অল্প কাঁবে চিন্তা। এমনি সম্বয় কলকাতা থেকে গেল উৎসব। উৎসবের তেহারা ডালো। সে যে কত প্রতিজ্ঞাতি দিল চিন্তাকে! প্রথমে চিন্তার মন টলেনি। দরজার আগল দিয়ে বলে থাকত। তখন উৎসব গোপালকে হাত করল। তাকে মিঠাই কিনে দেয়। ডালো কথা বলে। বেবে বেশে চিন্তার মন নবম হ’ল। এইখানে কাহিনী বাখিয়ে চিন্তা বলল—‘বোবন বড় ছুই গো বা, শরীরের জালা বড় জালা—মু শাতকী হলান।’

তখন দশজন কষে উঠল। বড় তব চিন্তার। দশজনকে ডব, ছেলেকে ডব, উৎসবের হাটে পান-হুশারি দিতে ডব—ডবলা বিল শু উৎসব। বলল। তার কোনো হুইচিন্তা নেই। চিন্তাকে সে বিয়ে করবে। কানে কাটি, গলায় পলাকাটি,

হাতে নতুন পাত্র দেবে। প্রথমে দশজন অনেক কথা বলবে। তাই গোশালকে রেখে তারা কলকাতা বাবে। কলকাতার বিয়ে করবে। ফিরে আসবে দেশে। ঘরে পুস্ক না থাকলে চিত্তার সংসার চলবে কি করে? চিত্তা বলে—‘বাহ! বসিবে এখন নিশ্চয় বলিল তখন আমি বীকার দেলাম গো, মা। হু এমন পাতকী!’ তার পর উৎসব তাপে কলকাতা নিয়ে এস। দশজন ছুটি করে নেবে বলে কাশ-পিত্তের খাল-বাসন যা ছিল বেঁধে আনল চিত্তা। তারপর যা হ’ল তা যে কলকাতার পুরোনো কথা দে চিত্তা জানেন!। তাই বার বার বলল—‘আমার সর্বনাশ করে প্রধান পলাইল। না আমাকে বাহা করল, না কোনো গরম দিল, মারিল ধরিল, টাকাতলা দিল, তারপর এই ছুটি বাক্স দিয়া পলাইল।’

অজ্ঞ সে ফিরে যেতে পারে না?—বলতে চিত্তা বলে—‘আমার নিজের ক্ষমিতে ধান, পুত্রে লাটী বেলে জাওল গজাচু নাহ—আমার কোন মুখ?’

তবু বাবনা কেন?—সেখানেই গরম। এখন তার পাতকীর জন্তে তাকে হুগো টাকা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। গাঁয়ের দশজনকে ভাত-শিরা খাওয়াতে হবে। তা ছাড়া এই মেয়ে-হুটাকে ভ্যাগ করতে হবে। এত পরীক্ষা দিলে তবে তার সমাজ নেবে চিত্তাকে। —‘আমি কোথা থেকে টাকা পাব গো, মা? টাকাও পাবনা তাই বেগেও বাবনা।’

মাজ দারা এসেছে তারা তার দেশের মুসলি। তার মামাশুভ্র আর বাবাতো দেওর। এতদিন ঘরে ছেলেকে বেগেছে তারা। এখন এই ছেলের বিয়ের সময় হয়েছে। মার কত শরির চানবে তারা? ঘরে হুটোর ব্যবস্থা করে দেশে চলুক চিত্তা। প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা তবে জাতিয়া বেগবে। আমি বলি—‘তুমি তোমার ছেলে নিয়ে এখানে থাক না কেন? ছেলে কাজ করুক, তুমি কাজ কর। চলে যাবে।’

মাথা নাড়ে চিত্তা। একে সে পাতকী। তাতে দশজনকে না মানলে তাকে কেউ ধরলে কাঁধ ফেঁদে না। ছেলেকে ভ্যাগ করবে। সে হুটাজ সর্বনাশের কথা কি ভাবতে পারে চিত্তা? পরলোক যে এর চেয়ে অন্ধকার হতে পারেনা তা চিত্তাকে বোঝাবে কে? সে শুধু বলে—‘ঘরে হুটাকে কি করিব? আমার গিরি-গৌরীকে কি করিব?’

হুটী টাকা ধার নিয়ে উঠে যায় চিত্তা। দই-দুই-দুড়কী এনে তার মামাশুভ্রকে খাওয়াবে। চিত্তার হাতে

ভাত তারা খাবেনা। যার কেউ নেই তার উগরান আছে —এ কথা বলে উঠে যার বটে চিত্তা, কিন্তু তার আপাত সমজার ভট্ট ছাড়াইবে কোন উগরান আমি ভেবে পাইনা।

মিঠি-দুড়কী বেয়ে চিত্তার ইহলোকেও কাঙারীরা বাপ-ব্যাটার আবারই রকের ছায়ায় ঘুমনোতে আসে। চিত্তার ছেলেটাও বেশি পান বেয়ে তার বেগতে বল বাবুনদের সঙ্গে।

দশজার সমাধান উগরান নয়, বাবুই করে। বিংশ-শতাব্দীতে আমাদের চেনা বাজাওসোর আশেপাশে অনেক কিছু চলে, বা পাপ। এবং তার বহলও অনেক। চিত্তার ঘরে শুধুই বৈঠক বসে। দশজনে হুটি-পরামর্শ দেয়। টাকা ধার করে দশজনকে পান চা খাইয়ে মরে চিত্তা। দুর্ভ হোসে পানওয়ালাটা। অরীলভাবে ঘনিষ্ঠ হতে চায় চিত্তার সঙ্গে। চিত্তা যে একান্তভাবেই নিঃসবল তা বুঝে তার মুখ পানের পিকের খুশুটা উৎসে উৎসে ওঠে। হুঁয়ার শারীর মৌখনের অভিশাপ নিয়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলে চিত্তা। পানওয়ালা আর চা-ওলার দোকানে হেঁটে মরে। পানওয়ালায় স্বপ্না আছে। বোকা এবং পাশের ভয়ে ভীত না হলে নিঃশব্দেই চিত্তা এ সময়ে গুচ্ছিয়ে নিতে পারতো। বিদ্রাওয়ালদের মধ্যে কেউ কেউ মজা পায়; থেকে-থেকেই টেটিয়ে গান করে ওঠে।

পরদিন আবার বি টিউকওয়ালে জল ধরতে গিয়ে খবর জানে। কোমরের গুঁতোয় কলসী থেকে জল ফেলতে-ফেলতে আসে উত্তেজনা। বলে—‘এমন পাণী মোরটা! বাক্সা হুটাকে বিলিয়ে দিল? একটাকে নতুনবাঝারের কাছে, একটা জগুবাবুর বাজারের ওপারে—হিরিকম মায়েব প্রাপ? ছি ছি ছি!’ চিত্তার পরিশ্রমিত ক্রি-টাকররা নিজেদের যে কতবার স্তায়ধর্মে, স্ত্রীভক্তিভিৎ বোধ করছে তা বেশ বোঝা যায়।

বিলিয়ে তো দিল। কিন্তু নিল কে? গিরি-গৌরীর ছাল-ওঠা মুষ্টির চানার বতো চেহারার কথা মনে করি আর ঐ একটা প্রমই মনে হয়। এত দয়া কার?

বিকলে ইভ নিঃ-ওমাকে বেধিয়ে পাড়ার গায়েন-বুড়া হনহন করে হেঁটে এসে পাপ ধরেন। বোকা বার কিছু একটা বলবার চাপা কোঁড়হলে মুচোখ তাঁর জলজল করছে। বলেন—‘ওনেছেন ব্যাপার? কিসের মধ্যে যে বাস করি!’

এর মতো কৃতী ও বহুদর্শী লোককে এত বজা দিল কিসে, জানবার কোঁড়হল আবার কম। কিন্তু তাঁর বলবার

আগ্রহ হ্রাসমান। বলেন—‘কাল হাতে সে বা ব্যাণার! থাকে বলে কেহু। ঐ উড়োনীটা, তার ব্যাণার দশ জানেনই বোধ হয়—’

উত্তরের ক্ষণে অপেক্ষা করেন না; বলেন—‘তার দুটো আঁতি না কে, কাল এসে বগে কিনা বশ, আঁটি, আঁঠোয়ো টাকার দু-আণার হুটো মেরেক বেচেছে। আবারে লই করতে বলে। আঁটি তো ভাগিয়ে বিলুপ। ব্যাণার দেখেছেন? এসব নের কল্লা তা জানেন তো? নিলে ঐ দোশাখণ্ডো—তারের বড় ব্যাণা এ সবের...তা আঁটি বলি—বা করেছো করেছো—এখান থেকে যদি না যাও তো পুলিশে গর বিয়ে...তা রে পৌ-দৌড় দিলে পুলিশের নাম শুনে—উড়ে জাত ত।’

বলে তিনি সিঁড়িয়াসু হয়ে ওঠেন। বলেন—‘দেখেছেন আনাদের অবস্থা? আপনাদের কোনো চাড় নেই—পাড়-বেগিমে যদি আপনারা সব পোড়াল-ওহাড় করেন।’ বলে হনহন ক’রে হাঁটতে থাকেন কাস্টিম্-এর ডহলোককে লক্ষ্য করে। ঘটনাটার মজা ও বগড়ের দিকটা তাঁকে হুড়হুড়ি দিয়েছে।

সকালে চিন্তা বিদায় নিতে আসে। এবার আর একা নয়। দুপাশে তার স্তম্ভিত্য তার পৌটলাটা নিয়ে চলেছে। ছেলেটাও মাঝে টিনের স্ফটিকের হাতে। চিন্তার পরনে নতুন কাপড়, গারে জামা দেখি। কোন্ টাকার কেনা, জিজ্ঞেসা করিনা। ভয় হয়। বিদায় নিতে এসে চিন্তা আর কানে না। একটা ডবলর কিছু ঘটলে গর, বা নাকি তার ধারণার বাইরে, বাহুব বেনন হতভয় ও হতব্যাক হয়ে থাকে—চিন্তার মুখ-ও ভেবনই। মাঝে মাঝে গভীর মতো তাকায়। বোধহয় সেবে, আঁটিও শুকে ঘোরা মনে করছি কিনা।

মাতাঙ্ক প্রশ্নপাত করে চিন্তা। বলে—‘তুমি বড় ভালো লোক সো, বা।’

তার পরেই চলে যেতে পারতো, কিন্তু হঠাৎ চলে যান। চিন্তা। জানলা দিয়ে তুচ্ছ হুঁচকে বেনিকে দেখে—‘তাকে আকাশ নয়, অনির্দেশ কোনো: দিশা বলা চলে। এখন চোখে পড়ে চিন্তার চোখগুলো: কালো, কোড়া তুচ্ছ মাঝেও উল্কির টিপ আছে। তাকিয়ে তাকিয়ে সেই চোখে জল আসে—নাক টানে চিন্তা।’ সন্ধ্যাবে কেনন শুনশুন ক’রে, যেন এ-কথা দে অনেকক্ষণ ধরেই বলছিল এমনভাবে বলে ওঠে চিন্তা—‘গরীবের ভগবান নাই গো, বা—গরীবের ভগবান নাই।’

তার সঙ্গী দুটোর চোখে হুঁতামি উঁকি দেয়। গলাটা বোলায়েম ক’রে ছোকরাটা বলে—‘ওদিকে বাস পাবেনি সো।’ ...চিন্তার ছেলেটা দেখি বুড়োটার সঙ্গে কথা কাটছে—‘বাস, টেন, জলবাই দশটাকার বামলা—আবার টাক-তিনের জামা কোন্ কিনিলি?’

—‘হব, হব’—বলে ভরসা দেয় বুড়োটা। অর্থাৎ সেই আঁঠোয়ো টাকা থেকেই হবে।

‘যার ভগবান নাই, তার কেউ নাই’—এই শেষ কথা বলে চলে যায় চিন্তা। মাতাঙ্ক পেরোয়। দুপাশে হুটো লোক চলে। ছেলেটা বুড়োটার হাত ধরে চলে। এবার তার বিয়ে হবে। কস্তাসক যে টাকা পেবে, তার থেকেই প্রারম্ভিত, বা এ-টাকার থেকে ও-টাকা মিলেবুলে কোড়া-তালি দিয়ে বা-হয় একটা হবে বাবে চিন্তার কপালে—এই নিয়ে চিন্তা ছাড়া আর তিনজন আলোচনা করে। চিন্তা আছে আছে হাঁটে। এপাশে ওপাশে তাকিয়ে মাতা পেরোয়। প্রায় নৌড়ে ওঠে-মুটে ওঠে। তার পর আর তাকে দেখিনা।

আলফার
বৈচিত্র্য



মহান
৪৬
০৬২৬

লক্ষ্মী ব্রাদার্স
জুয়েলার্স
১, হিন্দুস্থান মার্ট, বামিগঞ্জ
২০৮/৮, ব্রাহ্মবিহারী প্রতিমিত (পশ্চিমবঙ্গ জংগন) কলিকাতা



। শব্দ ।

পাদপ্রদীপ

"The first thing that Bernard Shaw did when he stepped before the footlights was to reverse this process. He resolved to build a play not on pathos, but on bathos."—*Dr. K. Chesterton*

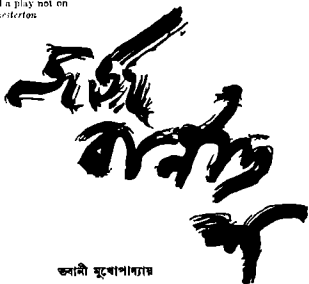
জ্যানেট অর্চার্ড আর তাঁর বানী চার্লস চ্যারিটনের নাম শুণ্ডের মানুষের মধ্যে রাখতে না, কিন্তু ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বার্নার্ড শ'র নাটক মঞ্চস্থ করতে যাত্রা স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, শ'র জীবনচিত্রকে ইংলন্ডের স্বাধীনতা-অভিমানের পটভূমিতে। শ' স্বয়ং এইকালের নাট্যকীর্তি এবং সামাজিক ঐতিহ্যের অনেক বলেছেন, কিন্তু ইংল্যান্ডেই নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসে আজও অবিস্মৃত।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে *A Doll's House* নামকালের সঙ্গে অভিনীত হলেও, ইংল্যান্ডের *Ghosts*-এর আগেই সে দরাসর ঘটেছিল তা প্রদীপক। *Widowers' Houses* নাটকের আগে

মিকা এবং প্রকাশ্যেই বিবাহিত। আর লক্ষ্যবিশেষ করে সংস্কারের আন্দোলন চলে। *Mrs. Warren's Profession* নৈতিক চ'ল, কিন্তু যেকোন প্রগতিশীল নাট্য-রসিক এইসব নাটক মঞ্চস্থ করার হৃদয়ভেদ সাংস্কৃতিকতার চেহারা করেছিলেন ইংলন্ডের ভূমিকার অভিনয়কর ময়। নাট্যকারদের চ্যারিট ও ইংলন্ডের অবস্থা কাহিনী-কারণ নাট্যভিত্তিক ইংলন্ডের পেশা, প্রাচীন রসমকেও ঐতিহ্য-সাধারণে উত্তরা কালপোহেছে।

Plays Unpleasant-এর ভূমিকার শ' নিবেদন — "১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মিল জ্যানেট অর্চার্ড এবং মিঃ চ্যারিটনের প্রযোজনায় *A Doll's House* মঞ্চস্থ হওয়ায় প্রচলিত কল্পনাকে প্রথম ব্যর্থিত আঘাত হানা হ'ল। এই যুগান্তকারী নাটক পৃথিবীর চাবুককে উত্তরা প্রচার করলেন আর এদিকে মিঃ গ্রেটন Independent Theatre-এর মাধ্যমে লন্ডন শহরে নব্য-নাট্য-আন্দোলন শুরু করলেন। এটি Independent Theatre-এ বার্নার্ড শ'র *Widowers' Houses* অভিনীত হয়, কিন্তু প্রথম রজনীর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তখন অস্ট্রেলিয়ায় ইংল্যান্ডের নাটক প্রদর্শন করে পথচল করতেন।

জ্যানেট (জন্ম ১৮৭৫ খ্রী:) মি: এবং মিসেস অর্চার্ড ওয়ার্ডের পৌত্রি। ওয়ার্ড 'ম্যাকলিষ্টার থিয়েটারকম্পানী' এর ম্যানেজার ছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ছোটখাটো উপস্থাপন নৃত্যিক থেকে চ্যারিটনের সঙ্গে মিলিত হয়ে পথ চলে। জ্যানেট *A Doll's House*-এ নোবের ভূমিকার অভিনয়



জবানী মুখোপাধ্যায়

করেন। এই সময়টিকে মিলু জ্যানেট আচার্ণ ও মি: চ্যারিটন নব-নাট্য-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতছিলেন। চার্লস চ্যারিটন চিত্রাশীল এবং পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, ফেরিয়ান সোসাইটির গোড়ার মূলে তার সদস্য ছিলেন, আর ছিলেন হুস্ক নট। তিনি স্টেশ-সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই স্টেশ-সোসাইটির প্রথম নাটক *You Never Can Tell*। এই সময় বার্নাড শ *Saturday Review*-এর নাট্য-সমালোচক, বরস চল্লিশ; সমালোচক হিসাবে ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জ্যানেটের অভিনয় প্রসঙ্গে অনেক কথা তাঁর *Dramatic Opinion and Essays* নামক গ্রন্থে পরে সংকলিত হয়েছে।

ইংল্যান্ডের নাটকের সাফল্যের পর জ্যানেট, চ্যারিটন এবং শ'র অন্তরঙ্গতা গভীর হ'ল। জ্যানেটের বেয়ে নোরাক পাদিত-কস্তার মতো ব্রেথ করডেন শ, এই যোষেটিও ভালো অভিনেত্রী হয়েছিল, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে চল্লিশবছর বয়সে মারা যায়।

বার্নাড শ'র *Candida*-র অভিনয় করেকবছর পিছিয়ে গেল তত্পূ জ্যানেটকে দিয়ে নাম-ভূমিকা অভিনয় করানোর উদ্দেশ্যে। এগিজাবেথ রবিন্স, মিসেস্‌ প্যাট্রিক ক্যাম্পবেল, এমন কি শিবিল বর্নডাইক কাউকে ও-পার্ট দেওয়া হ'ল না, কারণ জ্যানেট নাকি বলেছিলেন—"I could be that woman—for two hours", অবশেষে বরন জ্যানেট এই পার্ট করলেন তখন শ বলেছিলেন—"ও অভিনয় করেনি, স্টেজের ওপর চরিত্রটি ছুঁড়ে দিয়েছে, তবে খিত্যের অক অর্পণ।"

এই জ্যানেটকে বার্নাড শ করেকখানি হুস্কর চিঠি লিখেছিলেন; তার একটিতে আছে—"You cannot be an artist until you have contracted yourself within the limits of your Art."

ইতিমধ্যে বার্নাড শ তিনখানি নাটক লিখে ফেললেও, তার রচনা একটি পরমাণু তাঁর পকেটে যাবনি। *Widowers' Houses* সম্পর্কে সংবাদপত্রে নানাবিধ আলোচনা হয়েছে এই পর্যন্ত। শ'র নাটক সম্পর্কে কোনো বিবেচ্য-কর্তৃপক্ষ তখন উৎসাহিত বোধ করেননি।

দুটি রচনার অভিনয়ের পর *Widowers' Houses* বিশ্বস্তির অতলে তলিয়ে গেল, *The Philanderer* ত্রা মঞ্চস্থ হ'ল না, আর *Mrs. Warren's Profession* সফল্যের কর্তৃক নিষিদ্ধ হ'ল। প্রেইন এই নাটকের কোনো যোগ্য অভিনয়ের পর্যন্ত ব্যবস্থা করতে পারলেন না।

নাট্যশালাকে বিনি জীবনের অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করবেন তাঁর পক্ষে এই অবস্থা মোটেই আশঙ্কনক নয়, শ ডাবলেন তাঁর নাট্যকবলীর অবস্থা তাঁর উপভাসের মতোই হ'ল, বিকশিত হওয়ার অবকাশ নুটি আর পাওয়া যাবে না। বার্নাড শ'র কিন্তু মনে কোনও উৎসে নেই, সমাজ-বাদী এডারক হিসাবে তিনি তাঁর কাজ সানলে করে চলেছেন, সে কাজ তাঁর ভালো লাগে। পরমাণাটি তো পঃসারে সপ নয়? মানসিক আনন্দই প্রধান বস্তু।

শ যখন প্রথম লণ্ডনে আসেন তখন টটেনহাম-কোর্টে টি. ডব্লু. হবার্টসনের *Ours* নামক কমিডিতে সঙ্গপ্রথম এসেন টেবীকে দেখেন, তখন কিন্তু অভিনেত্রী হিসাবে এসেন টেবী শ'র মনে এতটুকু প্রেরণাত করেননি। তারপর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে দেখলেন এসেনকে *New Men and Old Acres* নামক নাটকে। এই নাটক এসেনের জন্ম স্মরণীয়। শ এই অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে লিখলেন—"I was completely conquered and convinced that here was the woman for the new drama which was still in the womb of time, waiting for Ibsen to impregnate it."

এসেন টেবী শ'র চাইতে বড়ল আটবছরের বড়ো, বোমবেছর বয়সে তাঁর প্রথমবার বিবাহ হয় বিখ্যাত শিল্পী ওয়াইল্ড-এর সঙ্গে। পরে এট স্বামীরকে চেড়ে-ছিলেন উইলিয়ার্ড গডউইনের স্ত্রী। বে-বছর শ লণ্ডনে এসে পৌঁছলেন সেই বছর এসেন বিয়ে করলেন চার্লস ওয়ার্ডেলকে।

এসেন টেবীর অভিনয়ে নুত হগেন শ, তাঁর মধ্যে অর্পণ সজাবনার ইঙ্গিত, তিনি লিখলেন—"কী অতীতকে পরিহার করে নতুন নাট্যজগৎ বে শিল্পী সৃষ্টি করতে পারেন তাঁরা হলেন—এসেন টেবী আর হেনরি আর্ডিং। প্রকৃতি তাঁদের সেই উদ্দেশ্যেই গড়েছেন।"

Lyceum Theatre-এ তাঁর হেনরি আর্ডিং অভিনয় করলেন। তখনকার কালে এই বিবেচ্যই সঙ্গপ্রতিবেচিত হ'ত। বার্নাড শ নিয়মিতভাবে এই বিবেচ্যের দর্শকহিসাবে উপস্থিত হতেন—হেনরি আর্ডিং এবং এসেন টেবীর অভিনয় দুখনরনে লেখতেন। শেতী ম্যাকবেথের ভূমিকায় মিলু টেবীকে দেখে শ বলেছেন—"What a Lady Macbeth Miss Terry is! I would trust my life in her hands." আবার *Romeo and Juliet*-এর অলিঙ্ক-দৃশ্য দেখে বলেছেন—"এই দৃশ্য দেখার আগে 'good

night' কথাটি যে এমনভাবে উচ্চারিত হতে পারে জানতাম না।"

এক সভার আভির্ষে তিনি প্রশংসা করলেন। আভির্ষে বলছিলেন, ক্রাসের মতো ইংলেণ্ডে বক্তৃতাধানের বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত হলো উচিত। সংবাদ-পত্র-প্রতিনিধিদের তরফে হতবাক দিতে উঠে বার্নার্ড শ বললেন—"এইরকম ছুটি প্রতিষ্ঠান ইংলেণ্ডে আছে, তার একটি নিঃসন্দেহে 'লাইসিয়াম'।" আভির্ষে এতটা অগ্যা করেননি, এ কথার তার মূখ উল্লসিত হ'ল। শ বললেন—"আর অপরটি হ'ল—হাইড পার্ক।" আভির্ষে এইটুকু শুনে বিমিত হইয়া পড়লেন এবং শ'র প্রতি অতিশয় বিস্ময় হলেন।

তরুণ বার্নার্ড শ ব্রিটিশ স্টেজের সমাজী এলেন টেরীকে চিঠি লিখলেন—কিছু কি লিখবেন, কিভাবে লিখবেন?

শ তখন World পত্রিকার সঙ্গীত-সমালোচক, প্রকৃত-পক্ষে অতিকিৎসক নাম্য প্রাপ্তি, আর এলেন টেরী তখন প্রতিষ্ঠার সর্বেশ্বরলিখক।

এমনও ইয়েটস World পত্রিকার সম্পাদক, তাঁকেই চিঠিটা লিখেছিলেন শ্রীমতী এলেন টেরী—চিঠিটা একজন নবীন সঙ্গীত-ব্যবিতার কিভাবে লগুন শহরে প্রতিষ্ঠা সম্ভব এই বিষয়ে লেখা। সম্পাদক চিঠিবানি সঙ্গীত-সমালোচক বার্নার্ড শ'কে দিয়েছেন জবাব দেওয়ার জন্য—তরুণ সমালোচক ভাবছেন কি লেখা যায়।

কর্ষ বার্নার্ড শ প্রকৃতিতে ছিলেন লাজুক, এই লাজুক স্বভাব তার সহায় হ'ল। তিনি অত্যন্ত নিম্ন গরিবাসক্তিতে বেটুকু সংবাদ শেওরা সম্ভব তাই পাঠালেন, চিঠিতে এতটুকু ব্যক্তিগত ছাপ নেই। এই চিঠির জবাব আর এল না।

দ্বিতীয় পরে এলেন টেরী লিখেছিলেন—"আপনি আমার কাছে প্রথম যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠি পড়ে আপনাকে আমার ভালো লাগেনি। আমি ভেবেছিলাম আপনি অসংলগ্ন, অত্যন্ত স্বতন্ত্র এবং কঠোরস্বভাব।"

এইভাবে যে চিঠিপত্রের সূত্রপাত তা দ্বাবী ছাঙ্গিন বছর ধরে অব্যাহত গতিতে চলেছে। এলেন টেরীর বুদ্ধির পর এইসব চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে, উভয়শক তাঁদের চিঠিগুলি সময়ে রেখেছিলেন। এই চিঠি পড়ে অনেকের সম্বন্ধে হয় যে, এরা ব্যক্তিগত জীবনে অগাণবিশ ছিলেন না। প্রশ্ন হতে পারে, আসল কথা কি? কতটুকু সত্য আছে এর মূলে?

এর উত্তর—উভয়ের মধ্যে যে ঐতিহ্য দর্শক ছিল তা দেহাতীত, চিঠিগুলি পড়ে বোঝা যায়, হুটি বিদগ্ধ মানুষের

ব্যক্তিগত মনোভাব চিঠিপত্রের মাধ্যমে কী প্রকৃতির গতিতে চলেছে, উভয়ে যেখানে দেখা পর্যন্ত করেননি, পাছে ব্যক্তদের ক্ষত শর্শে এই যোগালাটুকু নষ্ট হয়।

উভয়ের প্রথম দখন দেখা হ'ল তখন চিঠির পালা; প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একবার রক্তক্ষের অনিশ্চয়ে উভয়ের মধ্যে ব্যাক-বিনিময় হয়েছিল, কিন্তু টেরী জানতেন না সেই অপরচিত্তিত মাহুগতিক, কে এমন পৌঙ্ক প্রকাশ করলে। অনেক পরে বার্নার্ড শ একটি পরে এই ছোট ঘটনাটির উল্লেখ করেন।

একবার কথা উঠেছিল এলেন টেরী 'ক্যানডিজি'র অভিনয় করবেন—তিনি অবশ্য তা করেননি। তখন চোখের অন্ধুখে কষ্ট পাচ্ছেন এলেন টেরী, বার্নার্ড শ বললেন, "আমি কিছুতেই আপনাকে পড়তে দেখ না। যদি প্রয়োজন হয়, দরকার অজালালে বসে পড়ে শোনাবো, কিন্তু তা হবে না, আমার চরয়ের বা-কিছু স্বক অমুহুতি, আমারদের এই মনমুগ্ন স্বভাবের অবদান ঘটবে সাক্ষ্য সন্দর্ভের ব্যস্ত শর্শে।"

শ টেরীকে রবার্টসনের কমেডি *Ours*-এ প্রথম দেখলেও, টেরী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বার্নার্ড শ'কে সাহায্য দেখার সুযোগ পান। লাইসিয়াম থিয়েটারের স্ববিনিকার ঠাক থেকে শ'কে দেখেছিলেন (লিখেছিলেন—"I've seen you at last. You are a Boy! And a Duck!...How deadly delicate you look!")।

কর্ষ বার্নার্ড শ এবং এলেন টেরীর চিঠিপত্র প্রথম চারবছরের পর দ্বীপ্তিহীন এবং নিশ্চাপ হয়ে এলেও, পত্র-সাহিত্যের এক চমৎকার উপাধরণ এই চিঠিগুলি।

জীবনের শেষের দিকে এলেন টেরী এক বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত হয়েছেন—স্ববির, চুটিপক্তি অগ্ৰহিত—বার্নার্ড শ'র বক্তৃতা তিনি শুনেতে এসেছেন।

বক্তৃতাতে অতিকটে দীর্ঘে দীর্ঘে গণ সন্ধান করে বার্নার্ড শ'র সাহসে এসে পৌঁছলেন এলেন টেরী, এক্ষণে যে রমণী ইংলেণ্ডের রক্তক্ষের অপরী ছিলেন তাঁর এই মূগ্ধগণ দেখে শ'র চোখ ব্যাপাঙ্কর হয়ে এস। তাঁর মূগ্ধে নিবিড় বেদনার ছাপ মুটে উঠল।

উভয়ের উই শেষ দেখা।

শ-টেরী-পত্রাবলী পড়ে মনে হ'তে পারে যে বার্নার্ড শ হয়তো টেরীর সাহায্যে মেনরি আভির্ষে-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চান, এলেন টেরী মবেন সেই বিলম্বের নেহু। কিন্তু বার্নার্ড শ'র মনোভাব তা নয়, তিনি আভির্ষে-এর কাছে সোজা আত্মসমর্পণের মাহুগ নন।

শ-আর্ভিঃ-বিবাহ সম্পর্কে অনেক অতিরঞ্জিত সংবোধ প্রদর্শিত হয়েছে। আসলে প্রতি মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল, একজন বলেছেন—আর্ভিঃ রোমাঞ্চিক অংবাঙ্গী, আর শ বাস্তবান্বিত অংবাঙ্গী।

জর্জ বার্নার্ড শ তাঁর সমালোচনার মাধ্যমে অভিযোগ করতেন—সার হেনরি আর্ভিঃ লেখকদের, বিশেষতঃ শেক্সপীয়ার এবং তাঁর সহকারী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের—(বিশেষতঃ এলেন টেরীকে) হত্যার করেন, শুধুমাত্র আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। অশ্বরের বলিদানে তাঁর প্রতিষ্ঠা। সার হেনরি আর্ভিঃ আধুনিক নাটককে অস্তিত্ব করেন। আধুনিক নাটকের নাট্যকারদের মধ্যে জর্জ বার্নার্ড শ যে সর্বোচ্চ, এ কথা বলা বাহুল্য।

উত্তরের মধ্যে যখন এখন সাক্ষাৎকার হয় তখন আর্ভিঃ পৃথিবীর অভিনেতা-মণ্ডলীর মধ্যে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। বার্নার্ড শ'র মতোই ধীর প্রতিভাবান এবং সাহসিকতার এই সম্মান তিনি অর্জন করেছেন।

দৈনিক বৈচিত্র্য এবং বাচনভঙ্গীর কঠোর জ্ঞান আত্মবিশ্বাস আর্ভিঃকে সৃষ্টি করতে হয়েছে। এডিনবরাগে দর্পকরা তাঁকে ব্যর্থ করেছে, লিভারপুলে অর্থশ্রম-অনশ্রমে বিন কেটেছে—সত্তম শহরের প্রথম অভিনয়ের পরিসমাপ্তি হুটোমালের মধ্যে। হতাশ হয়ে পল্লী-অঞ্চলে অভিনয় করতেন হেনরি আর্ভিঃ।

এই মানুষ যখন ব্যাতি ও প্রতিপত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত তখন হুঁৎ আবিষ্কার করলেন, *Saturday Review* পত্রিকায় এক অর্ধাঙ্গীনের লেখক তাঁকে ব্যর্থ, উপহাস এবং রেবে কটকিত করতেন, লেখকটি বয়সে তাঁর চেয়ে আঠারো বছরের ছোট।

আর্ভিঃ-এর দিন শেষ হয়ে আসছিল, বার্নার্ড শ তখন উদ্বিগ্ন। তবু সাধারণ মানুষ যেন স্বল, বামন হয়ে চাপে হাত—সমালোচকের হুঁতা অসীম।

ইতিমধ্যে বার্নার্ড শ বেসোলিয়ানকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর *The Man of Destiny* নামক নাটকটি লাইসিয়াম থিয়েটারে মঞ্চ করার বাসনা প্রকাশ করলেন। তাঁর ইচ্ছা আর্ভিঃ বেসোলিয়ান এবং এলেন 'সেন্টার' চুম্বিকার অভিনয় করবেন।

আর্ভিঃ-এর সেইকালে অধ্যাতি ছিল—তিনি কিছু আশ্রয় দিয়ে বিবিধ সমালোচক লিখিত নাটকের পাণ্ডুলিপি হস্তান্তর করে রাখতেন। কোনোরকম সে-সব নাটক বন্ধ হওয়ার আগে ধারণা না, এখিকে সমালোচকও মূহ বন্ধ রাখতে বাধ্য হ'ত সুদিনের আশায়।

জর্জ বার্নার্ড শ এই অবস্থার কথা জানতেন, বিশ্বাসও করেছিলেন। বার্নার্ড শ তাই *The Man of Destiny* আর্ভিঃ-এর কাছে পাঠিয়ে সতর্ক ছিলেন যে, আর্ভিঃ দুই দ্বিগুণে তাঁকে হস্তান্তর না করে। তিনি তাই সর্বদা জ্ঞানিয়ে দিলেন—“সম্মান-মূল্যের জ্ঞান আমি তেমন উচ্ছ্রাব নই, নাটকটির অবিলম্বে অভিনয় হওয়াই প্রয়োজন।”

কিন্তু নাটক মঞ্চ-হওয়ার সম্পর্কিত আলোচনা-আলোচনা অতি ডিমে ডালে চলতে থাকে। আর্ভিঃ-এর নাটক পছন্দ হয়নি। নাট্যকারকে তো নই। তিনি ভাবলেন নাটকের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আছে, নেগেটিভিয়ানকে ব্যর্থ করা বার্নার্ড শ'র আসল উদ্দেশ্য নই, তাঁর লক্ষ্য হেনরি আর্ভিঃ।

তারপর শ আগাম টাকা নিতে চান না, এ এক বিশর। আর-সব দেখক কিছু টাকা পেলেই দুই, এ লোকটা বেন কেমনতরো।

অবশেষে আর্ভিঃ লাইসিয়াম থিয়েটারে শ'কে ডাকলেন এই বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকাল। আর্ভিঃ শেক্সপীয়ারের *Cymbeline* অভিনয় করলেন। শ মন্থন করে *Cymbeline* পড়লেন, এলেন টেরীকে লিখলেন কি ডাবে *Imogen*-এর চুম্বিকার অভিনয় করা উচিত।

আর্ভিঃ-প্রবাসিত *Cymbeline*-এর তাঁর সমালোচনা করলেন বার্নার্ড শ।

হেনরি আর্ভিঃ শ'কে আলোচনার জ্ঞান চেয়েছেন সেই সকালে, যেদিন *Saturday Review* পত্রিকায় *Cymbeline*-এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

শ এলেন টেরীকে লিখলেন—“আমি শনিবারের প্রবন্ধ হাতে নিয়ে (সকাল পাঁচটার উঠে) সেই নিশ্চয়ই পড়লেন আর্ভিঃ। ওঁর সঙ্গে দেখা করবো, এ প্রবন্ধ একেবারে দুর্ভেদ্য।”

যাই হোক, আর্ভিঃ সমালোচকের চাইতেও কিকিং ভালো অবস্থার ছিলেন, কারণ ছবি যে বদিয়েছে সে কিকিং সুস্থিত হয়েছে।

উত্তরের সাক্ষাৎকার থিনা বজাটেই কাটলো, এলেন টেরীর ধারণা বার্নার্ড শ আর্ভিঃ-এর উপস্থিতিতে কিকিং উত্ত ছিলেন। এলেন অকিসের দোরগোড়া পর্যন্ত এলেন, কিন্তু শ'র কণ্ঠের শুনে আবার পা টিপে ফিরে গেলেন। এলেন শিখেছেন—“হাসি পান্ডিল, আমি ডেডের আগতে পারলাম না। সহসা যেন হ'ল, এমন এক কৌতুককর অবস্থার হয়তো ভাবাবেগে সংঘত রাখতে পারবো না।

আপনারও দেখলে হয়তো ভুটি হাত দিয়ে গলাটা কড়িয়ে ধরতাম, আলিঙ্গন পরিত্যজন,—ঈশ্বর জানেন, কি করতাম, আর কি করতাম না। মনে হয়, এইটাই, আই. কিং আপল বহুত দুঃখের না।”

একপন্থর পরে এট ঘটনার উল্লেখ করে এলেন নিখেছেন—
—“কি জানি কেমন আপনার কণ্ঠস্বর? যেদিন সকালে লাইসিয়াস বিয়েটারের অফিসে আমি আছি সেত ছিলাম সেদিন আপনার গলা অতি অল্প শোনা গেছে।”

শ নিখেছেন—“আজিকে আমার ভালো লাগে, তবে এমন নির্বোধ লোক আমি আর দেখিনি। লোকটার মস্তিষ্কার খানটাই নেই,—তথু চরিত্র এবং মেজাজ।”

হেস্কেথ প্যারিসকে শ নিখেছেন—“আমাদের দেশের কংগ্রেসকর্ম এই ধরনের হয়েছিল :

“শ। কত তাড়াতাড়ি আপনি নাটক রক্ষা করবেন, সেইটি প্রশ্ন।

আর্ভিঃ। কোনো তারিখ বলা শক্ত। আমার অনেক কাজ, হয়তো আমেরিকা থেকে ফেরার পর... ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবে আপনি যদি আগাম চান—

শ। (পঞ্চাশ পাউণ্ড আগাম-প্রাপ্তির সম্ভাবনার মুখে) ধরবার! কিন্তু সেটা আমার সম্ভব নয়, বেন-নাটক আজ লিখেছি, প্রতিপন্থের পরে সেটা আমার সাম্প্রতিক নাটক হিসাবে অভিনীত হোক, এ আমি চাই না।

আর্ভিঃ। (শুগলের মতো উল্টা) সে ব্যবস্থা করা যাবে, সংবাদপত্রকে বোঝানোর ব্যবস্থা আছে। বেনডল বলে একজন আছেন—

শ। ধরবার, আপনার ভালো লাগে, বেনডল সম্পর্কে আমি সব জানি, আমি নিজেই প্রেসের লস্কো সংগ্রহিষ্ট। একটা প্রশ্ন আপনাকে করি, হয়তো আপনার ডেইলি বহুর বয়সে আপনি ছায়াবেগে অভিনয় করেছেন চমৎকার, কিন্তু এখন এখন আপনি শক্তির সর্বোচ্চ চূড়ায়, তখনও কি সেই অভিনয় আপনার প্রেত বলবেন? আমি আশা রাখি, *The Man of Destiny*-র চাইতে অনেক ভালো লিখবো, এক কিংবা দুটি দিনের বেনী আমি এর প্রবোক্তার অপেক্ষায় থাকবো না।”

এই কথাই সবেই আলোচনার সমাপ্তি ঘটে।

কোনোরকম অস্বাভাব্য কথা পাছে ওঠে তাই লাইসিয়াস বিয়েটারের সমালোচনার শ আরো তীব্র হয়ে উঠলেন। তাঁদের নীতি এবং প্রবোক্তিত নাটকের অতি তীব্র সমালোচনা হতে লাগল।

তারপর এল চরম সংঘর্ষ। আর্ভিঃ হুঁহু একদিন *Richard III* পুনরভিনয় করলেন।

প্রথম রজনীতে আর্ভিঃ বরাবরই স্থিতি করলে পারতেন না, তার ওপরে সেই সময় এলেন টেরী অল্পস্থিতি, লাইসিয়াসের আর্থিক অবস্থাও সত্যি।

এই অভিনয়-রজনীতে আর্ভিঃ হু-একটা অসুস্থ কাণ্ড করলেন, শেল পর্যন্ত পড়ে গেলেন এবং হাঁটুতে আঘাত লাগলো। শ একবারে বরাবর বর্ণনা লিখলেন এই ঘটনার। শ বলেছেন—“আমার কাজটা নির্বোধের মতো হয়েছিল, কারণ আর্ভিঃ যে সেই রাতে একটু অধিক পরিমাণে মত্তপান করেছেন এই কথা আমার বাবার আসেনি। হুঃখের বিষয় আর্ভিঃ কিন্তু আমাকে এতটা নির্বোধ মনে করলেন না, তিনি মনে করলেন আমার এই মত্তব্য মতপানের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ অভিযোগ। তৎক্ষণাৎ

The Man of Destiny এবং সেই সঙ্গে আমিও তাঁর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলাম।”

অন্য চরমকথা বুকেছিল কারণটা কী।

কৌশল থেকে কিয়ে আর্ভিঃ অজ্ঞানমতো স্নানের উল্লেখ করছিলেন, সহসা একটা সিল্ক শায়ে লেগে পড়ে বান, বেননা সবেকো বিছানায় গিয়ে পড়েন, কিন্তু সকালে আর পা নাড়তে পারলেন না, কয়েক সপ্তাহের মত পা-নাড়ার শক্তি হইলো না।

এই ঘটনা সব দিক দিয়ে সর্বনাশ সৃষ্টিত করল। বিয়েটার কিছুদিনের মতো বন্ধ হইল, পরে কয়েকটা পুরানো নাটক অভিনীত হ’ল। সেই দিনে ১০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতি হ’ল আর্ভিঃ-এর।

এই অবস্থার মধ্যে বার্নার্ড শ’র লেখা সমালোচনা প্রকাশিত হ’ল। আর্ভিঃ এবং আর্ভিঃ-এর বন্ধু চটলেন। আর্ভিঃ তাঁতা মাথার লোক ছিলেন, তিনিও বেগে অগ্রসর।

কলম সম্পূর্ণ হ’ল। এঁদের মধ্যে আর মিলন সম্ভব নয়। অপর দুজনের মধ্যে শ্রীতির সম্পর্ক থাকলে কত ভালো হ’ত। এলেন টেরী তীব্র হুঃপিত হলেন। এই দুই প্রতিভার বাহুবের মধ্যে একটা মিলন ঘটানোর স্বপ্ন তিনি বিশেষ চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু এলেন হতাশ হলেন। লিখলেন—“Oh Dear, Oh Dear, My Dear, this vexes me very much. My friends to fight. And I love both of them and want each to win.”

এলেন এই চিরি লিখেছিলেন শ’র নিয়মিত হুঃ-বোঝার স্বভাবে :

"Dearest Ellen, look out for aquala. I have just received a cool official intimation that Sir H. has changed his mind about producing *The Man of Destiny*...I am in ecstasies. I have been spoiling for a row...Kiss me good speed."

The Man of Destiny প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় একদল প্রাণে বার্নাড শ এবং দিল্লি মত খির করলেন *You Never Can Tell* নাট্যকাহিনীর বন্ধ করা হবে। হে-মার্কট থিয়েটারে তখন তার বিরোধীরা চলছিল। ঠাকুরের মধ্যে কুমিলা বটন করা হয়েছিল ঠাকুর "পার্ট" করতে রাজী হলেন না, কারণ নাটকে 'no laughs and no exits',—নাট্যকার বিদ্বেষের স্বাক্ষর নিম্নত হলেন।

এলেন টেরী ডেট্রি ডিটতে লিখলেন—"Do not let anything put that play off. I'm your loving old friend and I know it will hurt your success."

সত্যিই 'তাই হ'ল, অটলতার কোটে গেল—১২-৪ ইটোয়েল Royal Court Theatre-এ অর্থ বার্নাড শ সর্বপ্রথম বীর নাট্য-প্রতিভার স্বীকৃতি পেলেন।

আর্ডি-এর এই উপেক্ষা এবং অসামান্য হতাশার ফলে বার্নাড শ হতাশা কোথাও মিলিয়ে যেতেন। এলেন টেরীকে লিখিত পরামর্শের মধ্যে সেই হতাশার পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, শ এইলম্ব-ডিক্সা করতেন যে হতাশা রাষ্ট্রনৈতিক জীবনেই তাঁর আশ্রয় কেন—কিন্তু সে বিপদ কোটে গেল।

এলেন অম্বল এতদিনে বুঝছিলেন আর্ডি বার্নাড শ'র কোনো নাটক কোনোদিন অভিনয় করবেন না; শ জবাবে বলেছিলেন—"আর্ডি আমার নাটক হতাশা অভিনয় করবে না, আর কুমি ডাক্তার-সে-হুগোও তার বিলবে না।"

আর্ডি-এর জীবনে হুগের দিন ঘনিষ্ঠে এল। লাইসিয়াম

থিয়েটারের একজন অধিপত্যের অবদান ঘটনা, কোম্পানি এক লিথিউজ-প্রতিদানে পরিণত হ'ল।

এলেন টেরীও গভীরভাবে, হৃদয়ী নায়িকার কুমিতায় অভিনয় করার আর দিন নেই। ১২-৪ ইটোয়ের ৭ই নভেম্বর এলেন বার্নাড শ'কে লিখলেন—"Ah, I feel so certain Henry hates me. I can only guess at it...All my own fault. It is I am changed not he."

আর্ডি-এর জীবনের শেষের বড় কণ্ঠ, এলিকে বার্নাড শ'র জঘন্যতা চুক হ'ল আর আর্ডি পরিভ্র, হতাশাবাদ, জায়া। পল্লী-অঞ্চলে জীর্ণ বেচখানি টোনে নিয়ে অভিনয় করতেন। কিন্তু সে-অভিনয় দেখার আগ্রহ আর মশকুর নেই।

ব্রাডফোর্ডের এক বন্ধমক থেকে কোনোভাবে বেটিয়ে এসে হোটেলে গিয়ে আর্ডিকে প্রাণত্যাগ করলেন তার ভেতরে আর্ডি। ডয়েল্টমিনিস্টার আর্ডি-এর আর্ডি-এর কবরস্থ করার জন্য কয়েকজন ডোঁটা করলেন। আর্ডি-এর প্রী কিন্তু বিরোধিতা করলেন, বার্নাড শ'কে অস্বস্তি করলেন এই বিষয়ে মতামত করা চক্ৰ। শ জবাবে সমবেদন জানালেন আর বললেন—"আমি আগনার আইন-উপলব্ধি প্রাপ্তি আগনার ও-প্রচেষ্টা নিবারণ করতান, কারণ যাকে ডয়েল্ট-মিনিস্টারের কবরস্থ করা হয়েছে সেই প্রখ্যাত নাট্যের প্রী হিসাবে আলনি কিছু সংকরী পেশনশ পেতে পারেন।"

সেই আর্ডি শ'র পরামর্শ গ্রহণ করলেন, সেই সঙ্গে পেশনশ।

নাট্যকার হিসাবে শ এই অস্বাভাবিক-উৎসর্গে অসম্মিত হয়ে নিমন্ত প্রত্যাখ্যান করলেন—"আমি এই প্রবেশপত্র ফেরত পাঠালেন। আর্ডি-এর মৃত্যুর সঙ্গে নাট্যকার কোনো সম্পর্ক নেই, যেমন সম্পর্ক ছিলনা তাঁর জীবনে। আমি যদি যাই কতিনের মধ্যে, আর্ডি মড়ে উঠবেন—যেমন আর্ডি-এর আগমনে কতিনের ভিতর শ্রেষ্ঠত্বের চক্ৰ হবেন।"

[সমস:]





মিঠে কথা ও মিছে কথা

আজ্ঞা! মামা, ভগবান নিজে কি জানেন যে, তিনিই ভগবান!” বিহুপদ শুধালে কানাই মনোকে।

সন্তান বললে, “তার মানে তুমি জানতে চাইছ ভগবানের আদ্যোপলব্ধি হয়েছে কিনা। কিন্তু ভগবানের সাইকোলজি নিয়ে টানটানি কেন বলো তো? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি?”

বিহুপদ বললে, “দরকার তেমন কিছু নয়। সেদিন ডক্টর পরমতরঙ্গ বহুদায় ওখানে গিয়েছিলেন। ডক্টর বহুদায়কে জানো তো? পি-এইচ. ডি., ডি. লিট। পতঞ্জলির দর্শনের ওপর উনিই আজকাল অধিষ্টি।”

“শুধু পতঞ্জলি কেন, গোটা ভারতীয় দর্শনের ওপরই শুনেছি ওর অসাধারণ দখল।” বললে অতীন সেন।

“অসাধারণ দখল।” অতীনের কথার প্রতিধ্বনি করে বললে বিহুপদ। “সেদিন কথায় কথায় উনি জীবাত্ম আর পরমাত্মার কথা ভুললেন। পরমাত্মা মানেই তো ভগবান। তাই নয়, মামা? ডক্টর বহুদায় বললেন, ছুনিয়ার যত জীবাত্মা সবই নাকি ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পরমাত্মায় মেশে।”

কাজিকুনার বললে, “বলো কি বিহুপদ? এত জীবাত্মা গিয়ে পরমাত্মায় মেশে? পরমাত্মা ভুলে মোটা হয়ে যায় না?”

অনিতাক বললে, “তা হবে কেন? জীবাত্মা একদিক দিয়ে যেমন চুপকাচ্ছে, অল্প দিক দিয়ে তেজি বেরিয়েও আসছে যে।”

বিহুপদের এইবারে খেয়াল হল কানাই মামা এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেননি। কি যেন চুপচাপ ভাবছেন তিনি; বৈঠকে বসেও অবৈঠকোচিত আনমনা ভাব বৈঠকপতি কানাই মামার।

“কি ভাবছেন, মামা?” শুধালে বিহুপদ। নিকরার স্বপ্নভঙ্গের মতো হঠাৎ কানাই মামার আনমনা ভাব কেটে গেল। তিনি একটু চমকে উঠে বললেন, “ভাবছি ভবতারণ চাকলাদারের মা’র কথা।”

শুনে সারা বৈঠকে একটা অদ্ভুতপূর্ব ভাবের সিঁহরণ খেলে গেল। তাতে ছিল কিছু বিস্ময়, কিছু উদ্বেগ, কিছু কোঁতুহল। কে এই ভবতারণ চাকলাদার? কি হয়েছে তার মা’র? এদের ক্ষেত্রে কেন এত চিন্তিত হয়ে উঠেছেন কানাই মামা?

বৈঠকের সম্মিলিত মনোভাব বুখে নিয়ে কানাই মামা বললেন, “ভবতারণের মা’র গল্পা-প্রাপ্তি হয়েছে। এককালে আমার সহপাঠী ছিল ভবতারণ।”

এইবারে বোকা গেল ভবতারণের মা’র জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে গেছে, কৃতপূর্ব সহপাঠী সম্প্রতি মাতৃহারী হয়েছে, এই বিষয়েই বিষম কানাই মামা।

কিন্তু না, তা নয়। পরে জানা গেল, বহুদায় সন্ত মাতৃহীনতায় তিনি বিষম হতে পারেননি, এইজগতে তিনি বিষম।

“বড় হয়ে অনেকদিন দেখাশোনা নেই—আউট্‌ অন্ট্‌ সাইট্‌, আউট্‌ অন্ট্‌ সাইট্‌।” বললেন কানাই মামা। “আমি দক্ষিণ কলকাতায়, ভবতারণ বহানগরের উত্তর মাথায়। কিন্তু তবু ভবতারণ আমার বাল্যবন্ধু, পাঠশালায় একসঙ্গে পড়িত-মশায়ের বেত বেয়েছি, আর ইস্কুলে মাস্টার-মশাইদের কানমলা। একসঙ্গে ছুরি করে খেয়েছি কাঁচা আম, জলপাই, কংবেল—আরো কত কি। খরাবরই একটু নাড়তক্ত ভবতারণ। সেই ভবতারণের বৃক্‌ নাড়হারা হবার ব্যথা যে কী বিষম বেতেছে তা তোমরা আন্দাজ করে নিতে পারো।”

আমরা তা নীরবে আন্দাজ করে নিলাম।

“এহেন নাড়তক্ত বাল্যবন্ধু চিরতরে নাড়হারা হয়েছে”—বলতে লাগলেন কানাই মামা, “এতে সমবায়ী হয়ে আমার কেঁদে তাসানো উচিত ছিল। কিন্তু চোখে এককোঁটা জল আনতে পারতিনে।”

এই ছুখে প্রায় জল এসে গেল কানাই মামার চোখে।

ভরত শুধালে, “খুব বেশী বয়স হয়েছিল কি? শরীর কি খুব বেশী ভেঙে পড়েছিল?”

কানাই মামা বললেন, “সে হিসেব নিয়ে আর এখন কি হবে, ভরত? উনি যে পথে রওনা হয়ে গেছেন, সে পথ থেকে কাউকে কখনো ফিরিয়ে আনা যায় না। তা ছাড়া ওসব আমি জানি-ও না। ভবতারণের মাকে আমি কোনোদিন দেখিনি।”

“কোনোদিন না????” সুবিমলের প্রশ্ন।

“কোনোদিন নয়। সেইটেই তো ট্র্যাজেডি।” বললেন কানাই মামা। “সেইজন্তেই তো তিনি চিরতরে চলে গেছেন খবর পেয়েও বিধ্বং হতে পারছি না।”

জয়গোপাল বললে, “নাই বা পারলেন। তাতে ক্ষতিটা কিম্বের?”

কানাই মামা বললেন, “ক্ষতি নয়? আমার পরিব্রিত্তির কথাটা একবার ভেবে দেখ জয়গোপাল।

বিধ্বং না হয়েও কি করে ভবতারণকে লিখি: তোমার নাড়সেবীর বিয়োগে মমাহত হইয়াছি?”

এতখানি খাল্লা ভবতারণ চাকলাদারকে দিতে চান না কানাই মামা।

অনিতাত কি যেন চটপট অথচ গভীর ভাবে ভেবে নিয়ে বললে, “অনেক—ক দিন আপনার সঙ্গে দেখা-শোনা নেই বললেন, বোধ করি চিঠি লেখালিখিও নেই। নাড়বিয়োগের খবরটা আপনাকে জানাতে তাহলে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন ভবতারণ চাকলাদার?”

কানাই মামা বললেন, “ভবতারণ তো কিছু জানায়নি, আমি জেনেছি খবরের কাগজ থেকে। আজকেই বেরিয়েছে খবরটা। এই দেখ।” বলে পকেট থেকে খবরের কাগজের একখানা টুকরো বার করে দেখালেন কানাই মামা। খবরটা এইরকম:

বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর নাড়বিয়োগ

বহানগরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী, সমাজ-প্রসিক সেশবরী ব্রীজবরদেব চাকলাদার মহাশয়ের জননী সীতা প্রসিদ্ধী দেবী গতরবি সন্ধ্যা রণ গটিকায় ইষ্টনাম রূপ করিতে করিতে সমজ্ঞান অস্বপ্নবশে যাত্রা করিয়াছেন। চাকলাদার মহাশয় কর্পোরেশনের একজন বিশিষ্ট কাউন্সিলর, এবং বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত পুরোপযোগীরূপে যুক্ত আছেন। বিগত মসহযোগ-আন্দোলনে তিনি কিছুদিন অসহযোগও করিয়াছিলেন।...

সন্তোম বললে, “খবরের কাগজে বেরিয়েছে? ভবতারণখাবু চিঠি লেখেননি আপনাকে? তাহলে আপনি ওকে চিঠি লিখবার কথা অত তাবছেন কেন কানাই মামা?”

কানাই মামা বললেন, “সবাইকে আলাদা করে চিঠি দেওয়া তো আর চাটখানি কথা নয়, সন্তোম। তাই খবরের কাগজে খবর ছেপে দিয়েছে টাকা খরচা করে। যে যেখানে আছে দেখে নিবু। এই খবর দেখে অনেকাই ভবতারণকে শোকে সমবেদনা জানিয়ে চিঠি ছাড়বে। আমি যদি না ছাড়ি, তাহলে

‘ভবভারত’ হয়তো। তাববে কানাইটা কী চানার, নাট্যবিদ্যোপদেশ খবর পেয়েও একটু হুঃখ পৰ্যন্ত জানালে না। সে এক বিচ্ছিন্ন বাণ্যার হবে, হাজার হোক ভবভারত আমার বাল্যবন্ধু।”

অতীত সেন বললে, “তাহলে এমন চিঠি একখানা ছেড়ে দিন কানাই মামা, যাতে সাপও না মরে, লাঠিও না ভাঙে। নিচ্ছে কথা লিখতে চান না, বেশ তো, ‘মর্মান্ত হইয়াছি’ নাই-বা লিখলেন। লিখে দিন ‘চন্দ্রনাথারীণী দেবীর আয়ার শাস্তির জন্তে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে...’।”

“কিন্তু তাতে উল্টো বৃষ্টিতে পারে ভবভারত। বরাবরই সে একটু মেজাজী কিনা?” বললেন কানাই মামা। “হয়তো তাববে, ওর মা’র পবিত্র আয়া শাস্তি পাবে সে তো জানা কথা, তার জন্তে আবার অনাবশ্যক প্রার্থনা করার কাজলানো কেন? হয়তো এতে অপমান বোধ করে সে চটেই উঠবে। বলা তো যায় না।”

আমরা ভেবে দেখলাম কথটা সত্যি। এমন তাব লিখলে সেটা কানাই মামার হুঁতলা বলে মনে করতে পারেন ভবভারত চাকলাদার।

চণ্ডী ভাড়াটী এতক্ষণ কিছু বলেনি, এইবারে বললে, “ঠ্যা মামা, তার চাইতে বরং লিখুন : পরমেশ্বরের তোমাকে এই নিদারুণ শোকে শাস্তি দিন, এই প্রার্থনা করি।”

বিমান একটু ভেবে বললে, “মর্মান্ত হইয়াছি, এ কথটা লিখতে আপনি ঝাঁট সত্যের খাতিরে ‘কিন্তু’ করছেন বটে, মামা—কিন্তু ওটা না লিখলে শোকে সামান্য চিঠি বড় ছাড়া-ছাড়া লাগে। তা ছাড়া আরেকটা বিপদও আছে।”

কানাই মামা একটু যেন উৎক্লিষ্ট হয়েই শুধালেন, “কি বিপদ?”

বিমান বললে, “অনেকেই লিখবে : আপনার মাতৃবিয়োগে মর্মান্ত হইয়াছি। হয়তো যাদের সঙ্গে ব্যবসা বা অন্য কোনো সূত্রে মাত্র দু-দশদিনের আলাপ, তারাও। আর শোকের সময় অনেকের

তো মাথার ঠিক থাকে না, ভবভারত চাকলাদার সে-সব চিঠি হয়তো বিশ্বাসও করে কেলবেন। সুতরাং আপনি যদি চিঠিতে মর্মান্ত না হন, তাহলে উনি হয়তো ভাববেন—”

কানাই মামা বললেন, “ভবভারত তাববে—‘কানাইটা কী ভয়ানক চানার। এত লোক মর্মান্ত হলো, কিন্তু বাল্যবন্ধু হয়েও কানাই মর্মান্ত হলো না!’ সেটাও সত্যি ভাবনার কথা বটে।” ব’লে ভাবতে লাগলেন কানাই মামা।

কান্তিকুমার বললে, “কানাই মামা যদি ধুঁটতা মনে না করেন তো বলি, চোখ কান বুজ লিখে দিন—আপনি মর্মান্ত হয়েছেন। অধিকন্তু নদোয়ায়। বাড়িয়ে লিখছেন সন্দেহ করলেও খুশীই হবেন চাকলাদার মশাই। অধিকাংশ ভ্রততার মূলেই তো ঝাঁকি, তবু সেই ঝাঁকির মাথুর্ধেই দুনিয়া খুশী।”

সোমেন সরকার বললে, “কান্তির কথা শুনে একটা সত্যি গল্প মনে পড়ছে, মামা। ঘটনাটা ঘটেছিল আমাদের-ই অফিসে। আমাদের হেড-ক্লার্ক ভূপতিবাবুকে মিছে ধান্না দিয়ে তার ফল কি হয়েছিল, তার-ই কাহিনী। বলবো নাকি?”

গল্পের নামে সবাই খুশী হয়ে উঠলুম। কানাই মামা পৰ্যন্ত। তিনি বললেন, “নিশ্চয় বলবে। এ আবার ভিত্তাসা করা কেন?”

তখন সোমেন সরকার শোনালে তাঁর কাহিনী।

“ভূপতিবাবুর বিদায়-অভিনন্দনের ব্যাপার নিয়ে আমাদের অফিসের কেতানীদের ভেতর দুটো দল হয়ে গেল।” বললে সোমেন সরকার। “একদল বিদায়-অভিনন্দনের সপক্ষে, একদল বিপক্ষে। বিপক্ষদল বললে—অনেকদিন হাড় জালিয়েছে লোকটা। এখন আপন বিদায় হচ্ছে, আমাদের হাড় বাতাস লাগবে। অভিনন্দনের বদলে চাঁদা ক’রে বরং কুলোর বাতাস দেবার ব্যবস্থা করো। সপক্ষদল বললে—ছি, এমন কথা বলতে নেই। অনেক জ্বালাতন করেছেন উনি, এ কথা একশো বার

সত্য। তবু আমাদের ভক্ততাইকে আমরা করাবোনা কেন ?”

মনোহর বললে নবকুমারী ভদ্রীতে, “উনি অধম হয়েছিলেন, তাই বলে আমরা উত্তম হবোনা কেন ? উনি এতদিন বড়বাবুগিরি করে আমাদের নানা ভাবে আলিয়ে যে চরম অতন্ত্রতা করেছেন, ওঁর বিদায়বেলায় পরম ভক্ততা করে আমরা তার মহৎ প্রতিশোধ নেবো।”

মহীতোষ বললে, “তা ছাড়া উনি তো চলেই যাচ্ছেন। আর তো আলাতে আসছেন না।”

‘যাই হোক, বিরোধী পক্ষের আপত্তি সবও আমরা ঠিক করলুম, হুপতিবাবু পাটনা রওনা হবার আগের দিনই আমরা তাঁকে আমাদের হেড-অফিসের বড় হলে বেশ ঘটা করে বিদায়-অভিনন্দন দেবো। আমাদের রেহাই দিয়ে উনি চলে যাচ্ছেন, এই আনন্দেও হুপতিবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমাদের মন ভরপুর। অভিনন্দনের খরচের ক্ষতি নিজেদের ভেতর আমরা চাঁদা তুলতে লাগলুম। বিরোধী দলের কেউ চাঁদা তো দিলেই না, বরং তাদের ভাবভঙ্গী দেখে আমাদের সন্দেহ হতে লাগল ওর। অভিনন্দন-অমুঠানটাকে তুল করবার ষড়যন্ত্র করছে। ইংরেজী ভাষায় থাকে বলে ‘সাবোটজ’ করা। সুতরাং আগে থেকেই আমরা হুঁশিয়ার হয়ে অগ্রসর হতে লাগলুম, যেন অভিনন্দন-অমুঠানের সময় যে-কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তাকে কাবু করতে পারি।

হুপতিবাবু—চৌধুরী, ভ্যাটাভেল্ অ্যাণ্ড কোম্পানির হেড-অফিসের বড়বাবু—হেড-ক্লার্ক। আমরা তাঁর আঙারে কেরানী, সবাই হুপতিবাবুর দাপটে তটস্থ থাকতুম। ওঁর মতো বেশী বয়স আমাদের নয়। এই মহা অপরাধেই হয়তো আমরা তাঁর কাছে অপরাধী ছিন্‌ম। আমাদের পান থেকে চুনটুকু খসলেই হুপতিবাবু কর্তাদের কাছে গিয়ে নানান কায়দা করে লাগাতেন, তার ফলে আমাদের নাস্তানাবুদ হতে হতো। অধীনদের

আলাতন করে বোধ হয় আনন্দ পেতেন হুপতিবাবু। আর তিনি জানতেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোনো নালিশই কর্তাদের কাছে আমল পাবে না, কারণ কর্তাদের তিনি প্রিয়পাত্র, তাঁর বাবা কর্তাদের কাছে বেখবাক্য। কোম্পানি আর বিরাট বড়। কিন্তু কোম্পানি যখন বিরাট ছোট ছিল, সেই সময় থেকেই তিনি কোম্পানির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। ছুবার হু-চার ভায়াগা থেকে ভালো ভালো চাকরির অফার-ও নাকি পেয়েছিলেন, কিন্তু চৌধুরী-ভ্যাটাভেল্ কোম্পানিকে হুদিনে অকুলে ভাসিয়ে চলে যেতে তিনি রাজী হননি। এ কথাটা আমরা বিশ্বাস না করলেও কর্তারা করেছিলেন। তাই হুপতিবাবুর প্রতি তাঁরা ভয়ানক কৃতজ্ঞ। আর এই কারণেই কোম্পানির সব ব্যাপারে—বিশেষ করে কেরানীদের ওপর হুপতিবাবুর অধীন ক্ষমতা। সেই ক্ষমতার তিনি অপব্যবহার করতেন আমাদের সঙ্গে সর্বদা যাচ্ছেতাই খারাপ ব্যবহার করে। আর, বেকায়দায় পড়ে ওঁর সেই খারাপ ব্যবহার বাধ্য হয়েই আমাদের সইতে হত।

হুপতিবাবুর একবার যখন শক্ত নিউহোনিয়া হয়েছিল তখন আমাদের কেরানীদের ভেতর অনেকে পরমেশ্বরের কাছে যে-প্রার্থনা জানিয়েছিল, তা আপনাদের না-শোনাই ভালো। সেই ঐকান্তিক সমবেত প্রার্থনা মতও হুপতিবাবু সেরে উঠে আবার যথারীতি অকিন্দ আসতে শুরু করেছিলেন, এবং যে-ভদ্রীতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হেসেছিলেন তাতে সন্দেহ হয়েছিল, আমাদের প্রার্থনাটা তাঁর কানে পৌঁছেছিল। আমরা ভেবেছিলুম, অমন শক্ত অস্থখ থেকে সেরে উঠে হয়তো তাঁর মনটা একটু নরম হবে। কিন্তু হলো তার উল্টো। তিনি আগের চাইতে আরো বেশী করে আমাদের আলাতে লাগলেন। তারই মাসছয়ক বাসে এই বিদায়-অভিনন্দনের ব্যাপার।

হুপতিবাবুর এই বিদায় অবশ্য কোম্পানি থেকে

বিদায় নয়, কলকাতা থেকে বিদায় নিয়ে পাটনা গমন। পাটনায় চৌধুরী-ভ্যাটার্ডেল কোম্পানির নতুন অফিসের ভার নিয়ে। হেড-অফিসের চৌকস অফিসার তরুণ ভাড়াই পাটনা যাবার ক্ষণে তৈরি ছিল, কতক পাটনার অফিসটি চমৎকার জায়গায়, ওখানে গেলে মাইনেও বাড়বে, হেড-অফিসের চাইতে ওখানে হাণ্ডটও চালানো যাবে বেশী। কিন্তু কর্তারা তাবলেন, নতুন অফিসের শুক দারিদ্র্য ভূপতিবাবুর মতো আর কেউ নিতে পারবে না; ভূপতিবাবুর তুলনায় তরুণ তো নিতান্ত ছেলোমানুষ, হৃৎপোশা শিঙ।

আমরা তবু পেয়েছিলাম, ভূপতিবাবু হয়তো রাজী হবেন না। কিন্তু আমাদের ভয়কে তুল প্রতিপন্ন করে তিনি পাটনা যেতে রাজী হয়ে গেলেন। সপরিবারে। পরিবার বলতে তাঁর স্ত্রী। সন্তানটি হয়নি ভূপতিবাবুর।

পেলন নেবার বয়স হয়ে গেছে তাঁর অনেকদিন আগেই। কিন্তু কিছুতেই পেলন নিতে রাজী হননি ভূপতিবাবু। তাঁর ধূক-ভাঙা পৎ—জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি চৌধুরী-ভ্যাটার্ডেল-কোম্পানির সেবা করে যাবেন। কোম্পানির প্রায়োভনে যখন তাঁর পাটনা যাওয়া দরকার, পাটনা তিনি যাবেনই। আর পাটনা নান্নেই তো পাটলিপুত্র, নহা পবিত্র ভূমিস্থান। সেখানেই যদি গঙ্গালাভ হয়, তাতে দুঃখ নেই ভূপতিবাবুর।

ভূপতিবাবুর পাটনা রওনা হবার আগের দিন হেড-অফিসের বড় হলে বিদায়-অভিনন্দন সভাটা বেশ জমে উঠল। সভাপতি হয়েছিলেন কোম্পানির বড়কর্তা। তাঁর বাঁ ধারে বসেছিলেন মেজোকর্তা। আর ডান ধারে ভূপতিবাবু। এই তিনজনকে মাঝখানে রেখে বসেছিলেন সেজোকর্তা আর ছোটকর্তা। মনিবদের সঙ্গে এভাবে বসতে সহজে রাজী হননি বশব্ব বিনীত ভৃত্য ভূপতিবাবু। কর্তারাই অনেক বলে-ক'য়ে বসিয়েছিলেন। হেড-অফিসের কেরানী, চাপরাসী, অফিসার প্রভৃতি

সবাই হাজির। আমরা প্রধান উজ্জ্বলারা হ'নিয়ার; কে জানে বিরোধী পক্ষের সহকর্মীরা সভা ভুল করবার ক্ষণে কী কারসাজি করে রেখেছে, যা করবে?

আমাদের অফিসের রণজিতের সামান্য দোকানে মাইক ডাডা পাওয়া যায়; রণজিং বলেছিল, মামাকে বলে সম্মান করিয়ে দেবে। পরিতোষ রণজিতের সামনে বলেছিল, “তা বেশ।” আর আড়ালে আমাদের বলেছিল, “খবরদার। রণজিং একদম্বর ভুলবাক। মামাকে বলে খারাপ মাইক দেয়াবে। মাঝখানে হঠাৎ মাইক ফেল করে কেলেকারি হবে।” তাই মাইক নেওয়া হয়েছিল আমাদের মাঝনের ‘ওরিএন্টাল রেডিও ইলেকট্রিক কোম্পানি’ থেকে। মাঝনের মাইকের কাছে মুখ নিয়ে বড়কর্তা, মেজোকর্তা, সেজোকর্তা আর ছোটকর্তা সবাই ভূপতিবাবুর মগজ এবং জন্মের নানা গুণের কথা বললেন। তারপর স্মৃতি হলো আমাদের মানে কেরানীদের পালা, যাদের হাড়-মাস এতদিন ধরে আলিয়ে আসেছিলেন ভূপতিবাবু। বিদায়বেলায় ভূপতিবাবুর হাড়-আলানো স্বভাব একেবারে তুলে গিয়ে আমরা ছলছল চোখে গদগদকণ্ঠে গঞ্জে, পঞ্জে এবং গানে তাঁকে আমাদের অন্তরের অভিনন্দন জানাতে লাগলাম। কাইলিং-স্কার্ক পরিতোষ স্বরচিত কবিতা পাঠ ক’রে শোনালো। কবিতার নাম—‘বিদায়-বাখা’। লেজার-স্কার্ক অনিমেব হারনোনিয়ার বাজিয়ে গাইলে স্টেনো-টাইপিস্ট চারু মুখুজোর লেখা আর ডেসপ্যাচ-স্কার্ক তাহু সিংহের সুর-সেওয়া গান—‘মোদের কাঁদায়ে যেতেছ চলিয়া, বেদনায় হিয়া উঠিছে ফুলিয়া’... ইত্যাদি। স্টোর-কীপার গগন দাস এগিয়ে মুখচোরা। কিন্তু ভূপতিবাবু চলে যাচ্ছেন এই আনন্দে আশ্চর্য হারে তাঁর মুখ খুলে গেল। তিনি ভূপতিবাবুর চরিত্র-মাধুর্য সম্বন্ধে একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিনিট-দশেক বললেন। কে কার চাইতে ভূপতিবাবুকে বেশী প্রশংসা করবে এবং তাঁর বিদায়ে দুঃখ প্রকাশ

করবে—তাই নিয়ে ঘেন্না প্রতিযোগিতা শুরু হলো। বড়কর্তার ডান দ্বারের চেয়ারে বসে ভূপতিবাবুর চোখদুটি ছলছলিয়ে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে হঠাৎ পড়লো আমাদের অনেকের মাথা ঘামিয়ে থসড়া-করা বিদায়-অভিনন্দন : “হে সুখী! বিনামূল্যে রজাঘাতের মতো সহসা তুমি বিদায় লইয়া পাটনা চলিয়া যাইতেছ। ইহা পাটনার মহা সৌভাগ্য, আমাদের বিরাট দুর্ভাগ্য। হে মহান! তুমি বাহিরে কঠিন, অন্তরে কোমল। আমরা শুধু ছিলাম, তুমি আমাদের পথ দেখাইয়াছ। তোমার বিরহে ওগো প্রিয়, আমাদের হেড-অফিস যুগ যুগ ধরিয়া হাহাকার করিবে। হে কর্মযোগী! কর্মই তোমার ধর্ম ছিল, তোমার পুণ্য-সম্পর্শে আসিয়া আমরা ধস্ত হইয়াছি। আজ আমাদের পক্ষে অনাথ করিয়া, আমাদের বৃকের পাঞ্জর ভাঙিয়া দিয়া, হে দেব, তুমি চলিয়া যাইতেছ। যাইবার পথে, ওগো বন্ধু, হতভাগ্য আমাদের জন্ত দু-ফোটা অশ্রু ফেলিয়া যাইও!”

কিছুক্ষণ ধরে ভূপতিবাবুর লক্ষণ ভালো দেখা যাচ্ছিল না, তিনি কোঁচার খুঁটি দিয়ে ঘন ঘন চোখ মুছছিলেন। এইবার তিনি হুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ভূপতিবাবুও যে এমন কেঁদে বোমামাল হতে পারেন, এ আমরা স্বয়ংও কল্পনা করতে পারিনি। আমাদের অভিনন্দন-পত্র ভূপতিবাবুকে পর্যন্ত

কাদিয়ে ছেড়েছে! গর্বে আনন্দে আমাদের বুক কুলে উঠল।

কথায় বলে ওস্তাদের মার শেষ রায়ে। সর্বশেষে ভূপতিবাবুর পালা—আমাদের অভিনন্দনের জবাব দেবেন তিনি। কিছুক্ষণ কেঁদে বুক হালকা করে নিয়ে তারপর চোখ মুছে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি ধরা গলায় বললেন, “আমার তরুণ বন্ধুগণ! আমার ধারণা ছিল তোমরা সবাই আমার খুশী হয়ে চালা করে হরির-লুট দেবে। কিন্তু আজ এই সভায় আমার আসন্ন বিদায়ের ব্যথায় তোমাদের হৃদয় থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রন্দনের যে অভিযুক্তি দেখলুম, তাতে আমার ভুল ভেঙে গেছে। আমি বৃথলুম, আমি চলে গেলে সে-তুঃখ তোমরা সহ্যে পারবে না। তাই শেষ মুহূর্তে আমি আমার মত পরিবর্তন করলুম। বন্ধুগণ! তোমাদের গভীর ভালবাসার অব্যবহা করে পাটনা চলে যেতে আমি কিছুতেই পারবো না। আমি যেমন ছিলাম, তেমনি বাকী জীবনটা তোমাদেরই ভেতর থাকবো।”

বলে বসে পড়লেন ভূপতিবাবু। কিছুতেই তাকে আর পাটনা যাবার মত করানো গেল না। কর্তারাও বাধা হত্নেই বললেন, “তাহলে তরুণ ভাড়াড়ী-ই থাক!”

গেল তরুণ ভাড়াড়ী। থেকে গেলেন ভূপতিবাবু।

পুরোনো কথা

যম দত্ত

লে-কালের মডারেট

১৯১০-১১ দশকের মীতকালে এলাহাবাদে একটি এক্সক্লিভিভ ১৯। এক্সক্লিভিভ দৈনিক মুন্সের ডায়মণ্ড দ্রুতগতি কলেজের অধ্যক্ষ বৈষ্ণবনাথ বসু ও তাঁহার পুত্র—মুন্সেরের পাবলিক প্রিন্সিপিটচার হেমচন্দ্র বসু দুইজনে দায়ের। হেমবাবুর গায়ে অশাধারণ শক্তি; তিনি

১০ বৎসর বয়সে ৬ ৫ সের ক্রিয়া; এক-একটি মুষর ১৫ মিনিট ধরিয়া ভীষ্টিতেন। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি তখন তাঁহার বয়স ৩৪।৩৫ হইবে। একদিন সন্ধ্যাবেলা একটি তাবাসা দেখিয়া কয়েকজন বাঙালী মতিয়া ভিরিতহেজেন, যথেষ্ট পুরুষ নাই, তাঁহাদের পিছনে গোরা-শওনের কয়েকটি ছোকরা অকিলার লাগিয়াছে, অচতুর্ভুজোচিত ব্যবহার

করিতেছে। ইহাতে হেমবাবু আগাইয়া, তাহাদের এইরূপ কথিতে ব্যর্থ করিলে, তাহাদের মধ্যে যিনি দগ্ধ—হেম-বাবুকে “you shut up! bloody native!” বলেন। ইহার প্রতিবাদে হেমবাবু তাহার গালে একটি পিরাখি-দিহার চড় দাওন ও সে খুবীয়া পড়িয়া থাকে। তাহার লক্ষ্যে ৩০ জন হেমবাবুকে একসঙ্গে আক্রমণ করে ও লাথি-ঘুসি চালাইতে থাকে। হেমবাবু দুইজনকে ঘাড় ধরিয়া এক্ষণে কোরে মাথা ঠুকিয়া দেন যে, একজন অজান হইয়া পড়িয়া পড়ে। এমন সময়ে পুলিশ আসিয়া হেমবাবুকে গ্রেপ্তার করে ও একজিবিগনের বানার লটকা দাওন।

কেননাহাবাবু নিজ পরিচয় ও ঠিকানা দিয়া হেমবাবুকে খালাস করিতে গেলে বানার খেঁটা লাগিয়া বলেন যে—জামিন তৈরি নাই না, সাহেব মাঝার জজ “ঠাণ্ডাঘরে” গ্রেপ্তার করিব।

সে-বৎসর কংগ্রেস উপলক্ষে সুরেন্দ্রনাথ বসুগোপাধ্যায় এলাহাবাদে কাছেরে ছিলেন। বিভাগ্যবশত বসুগোপাধ্যায় সেইদিনই ইনস্টিটিউশনে (একটি বিভাগ্যবশত বসুগোপাধ্যায় বসন অধ্যক্ষ বা সেক্রেটারি, তখন কিছুদিনের জন্ত সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজী ও লজিক পড়াতেন। সেই সূত্রে বৈজ্ঞানিকবাবুর সহিত সুরেন্দ্রনাথের আলাপ-পরিচয়। বৈজ্ঞানিকবাবু সুরেন্দ্রনাথের সম্মানে বাটশেন—পরিমাণে হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা; তাহাকে বিপদের সব কথা বলিলেন। বলিতেই, সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—হেম, বেশ করেছ; আমি সব ঠিক করিয়া দিতেছি। বলিয়া তিনি বৈজ্ঞানিকবাবুকে লইয়া ডাঃ হুন্সলারের কাছে বাটিলেন। ডাঃ হুন্সলার (তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ হইয়া-ছিলেন) হেমবাবুকে ছাড়াইয়া আনিলেন; বলিলেন—মায়াব, বাবুজী! কেননাহাকে ইচ্ছা বন্ধা কিবা। সুরেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিকবাবু ও হেমবাবুকে তাহার ক্যাম্পে লইয়া গোপাল করিতে বলিলেন—একজন বেস্বাসেবককে তাহার ক্যাম্প দেখাইয়া দিতে বলিলেন। যিনিট দশ পরে একজন ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া সুরেন্দ্রনাথ ক্যাম্পে করিলেন ও হেমবাবুর কে-সব স্থান কাটিয়া গিয়াছে তাহাতে ঐশ্বর্য দিতে বলিলেন। আর, তাহাদের জন্ত গরম গরম কুচুরি ও চায়ে বসেবাসের বন্দন মিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ ক্যাম্পে এক বৃদ্ধ দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক লেপনুড়ি দিয়া শুইয়া ছিলেন। তাহার খুব জর। চায়ে বসন আয়োজন হইতেছে। তখন সুরেন্দ্রনাথ হেমবাবুকে কি কি ঘটনা ঘটনাছে তাহা আশ্রয়গোষ্ঠী বলিতে বলিলেন। হেমবাবু ঘটনার কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে সেই বৃদ্ধ

দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ লেশ কেলিবা দিয়া হঠাৎ হেমবাবুকে জাপটাটো ধরিয়া বলিলেন—“বাবা! তোমাকে বুকে ধরে রাখতে ইচ্ছা করছে। বেশ করেছ। তোমার কথা শুনে আমার জর ছেড়ে গেল।”

এই বৃদ্ধ কঠিনপুয়ের মডারেট নেতা অধিকাচরণ বসুধার। ইনি পরে ইং ১৯১৩ সালে লন্ডনের কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ ও অধিকাচরণ উভয়েই মডারেট নেতা। হেমবাবু পরে চাহবাহাদুর হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই পরলোকগত, হতবাক ইঁহাদের নিন্দা বা প্রশংসা করিলে কোনজন্য আইনের আশ্রয় পড়িল না।

কে যেখানে কেন কালো ?

বাস্তবীকরণের মধ্যে আরকানাথ বিজয় প্রথম হাইকোর্টের জজ হইলেন। ইয়াংসার হার তাহার আসে জজের পদ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এলাহাবাদে বসিবার পূর্বেই মারা যান। তিনি অত্যন্ত মজাদারী ছিলেন; আলাদাও অনেক সময়ে বেস’স হইয়া থাকিতেন। একটি আঙ্গুরের মোকদ্দমার তাহাকে প্রতিপক্ষের পক্ষে সওয়াল করিতে হইবে; তিনি ভুলিয়া গিয়া অ্যাপেলগার্টের সভাপতি করিতে লাগিলেন; সাজের উকীল বসন তাহার জম বৃদ্ধাতি দিলেন তখন তিনি জজদের দিকে সপ্রতিভ হাসিয়া বলিলেন যে, অ্যাপেলগার্টের পক্ষে ইঁহার বেশী বলিবার আর কি আছে? এইবার আমি প্রতিপক্ষের কথা বলিব। বলিয়া তিনি নিজের পূর্বের সুকিসকল বণ্ডন করিতে লাগিলেন ও প্রতিপক্ষকে জিতাইয়া দিলেন। এইরূপ স্বরধা-বুদ্ধি উকীল আর দুইটি হইয়াছে কিনা সন্দেহ। ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম জজ হইলেন শত্ৰুনাথ গুপ্ত। ইনি জাতিতে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। ইঁহার বাংলাভাষে বহুদিন থাকার বাস্তবীকরণ হইয়া গিয়াছিলেন—বিশুদ্ধ বাংলা বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। হাটখোলার স্বরভাষি ভবানীচরণ দত্তের সহিত এগাফ পোহায়া ছিল। শত্ৰুনাথ গুপ্তই বসিরাছেন; বরফী খাইয়া ডালো লাগিরাছে; জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কষ্ট। বরফী আছে? খাঁ আছে শুনিলেন। আহার্য্যে খাঁ বরফী হাতে করিয়া গাড়িতে উঠিলেন; ভবানীচরণকে বরফী খাওয়াইয়া তবে তাহার শান্তি। ভবানীচরণের সঙ্গে ভারি থাকার বন্ধন, কোনো মোকদ্দমার হাটখোলার দস্তাবে বসি বেশ পক্ষভূত থাকিতেন—তিনি সে মাফলা শুনিতে না; বলিতেন যে, আমার বিচারবুদ্ধি পক্ষপাত লোভে হুট হুটে গারে—ইঁহারা ভবানীচরণের আত্মীয়।

গৌরীশঙ্কর বে

হারিশনাথ খুব অল্পবয়সে হাইকোর্টের জজ হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ৩৬৩৭ বৎসর—এত অল্পবয়সে আর কোনো ভারতীয় এখন পর্যন্ত হাইকোর্টের জজ হইলেন নাই। এ পর্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টে বা অন্য কোনও হাইকোর্টে ১৩ জন জজ বসিয়া এসময়ত ঠাকুরানী দ্বারীয়া দামলা ব্যতীত অন্য কোনও বোকন্দা হই নাই। এই বোকন্দাঘর হারিশনাথ উদ্ভিগ ছিলেন। তাঁহার সওগাল গুনিয়া তখনকার চীফ-জাস্টিস স্যর বার্নেস-পিকক হারিকানাথকে অজ্ঞ করিবার প্রভাব করেন। হারিকানাথ খুব কালো ছিলেন। তিনি বিচারে বিহারের এক নীলসর সাহেবকে হায়াইয়া দেওয়ার, রাগান্বিত হইয়া ইংলিশম্যান কাগজের সম্পাদক টেলর-সাহেব এক সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করিয়া সত্যকে *a judge as black as my shining shoes* ইত্যাদি লিখিলেন।

টেলর-সাহেব সম্প্রদায়ের লেখাটি ছাপাউতে দিয়াই বোয়াই বেলে বিলাত যাইবার জন্ত রওয়ানা হন। পরদিন ইংলিশম্যান কাগজে এই সম্প্রদায়ের মন্তব্য পাঠ করিয়া স্যার বার্নেস পিকক টেলর-সাহেবের নামে আনাগণ্ডের অবস্থান। করিয়াছেন বলিয়া ঝগড়া করিলেন; ও টেলর-সাহেব কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া টেলিগ্রামে বোয়াই হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার চেষ্টা করেন। টেলর-সাহেব হারিকানাথ বিশ্বের নিকট হাঁটু গাড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করার ও হারিকানাথ স্বপরিচয় করায় পিকক-সাহেব টেলরকে ছাড়িয়া দেন।

কৃষ্ণাঙ্গ পাণ্ডা বেশিতে খুব কালো ছিলেন। শঙ্করাখ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া ‘ভেলের কৃষ্ণা’ বলিতেন। কৃষ্ণাঙ্গ রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি দাঙ্গা বাটলে তাঁহার এক পাখরের মূর্য্য করিয়া তাঁহার মূর্ত্তি-স্বাক্ষর ব্যবস্থা হয়। ইহা কলেজ স্ট্রীট ও হারিশন মোড়ের মোড় স্থাপিত হইয়াছে। খুব তৈরী হইলে, ইহা দেখিতে ঠিক তাঁহার মতন হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করায়, মহারাজা স্যার বীজ্ঞমোহন ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে—যেতপাখরের না হইয়া কটিপাখরের হইলেই হব কৃষ্ণাঙ্গের মতন দেখিতে হইত।

হুইকনেই খুব কালো ছিলেন। এ বলে আবার জাফ, ও বলে আবার জাফ। একবার উভয়েই বিভ্রাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে গিয়াছেন। পাড়ার মাধব লোকের জজনাথের দেখিতে বারান্দার উকিছুঁকি বাড়িতেছে। বিভ্রাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি দেখিতেছ? একজন ভয়ে ভয়ে উত্তর করিল যে, জজ দেখিতে আসিয়াছে। বিভ্রাসাগর মহাশয় তখন ঈষৎ হাসিয়া ইঁহাদের দিকে হাত দেখাইয়া বলিলেন যে ইঁহাদের মধ্যে যিনি বেশী কালো তিনিই জজ।

গৌরীশঙ্কর বে একজন ব্যাটনাবা-অফ-শারবিদ। তিনি প্রায় ৪০ বৎসর থাকে কলকাতায় আসামের ইন্সপেক্টর-জেনারেল (অধুনাতন চার্জ কলেজের) অফ-শারের অধ্যাপক ছিলেন। বহু অফ-শারের বই তিনি কলেজের ছাত্রদের জন্ত লিখিয়াছেন—এইসব লিখিত বই আক্ষকাল আর পাওয়া যায় না। চারবের উপর তাঁহার প্রভাব অসীম ছিল। একটা উদাহরণ দিই। সোমপুর কলেজের প্রেসিডেন্ট অফিসার বধ্যোপাধ্যায় সেকালের এফ-এ পাশ; অর্থাভাবে বি-এ পড়িতে পারেন নাই—শিক্ষকতা করিয়া আজীবন কাটাইয়া গিয়াছিলেন। তিনি গৌরীশঙ্করের ছাত্র। তিনি যেমন খবর পাটলেন যে, তাঁহার প্রিয় অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দেহত্যাগ করিয়াছেন, অসহ্য দুঃখ বোধ করিলেন ও তিনদিন নিরামিষ আহার করিলেন।

আমরা এখন কলেজে পড়ি তখন গৌরীশঙ্করবাবুর সম্বন্ধে অনেক মজার মজার গল্প শুনিব। তিনি নাকি জীবনে তখনও কলিকাতার বাহিরে যান নাই; হাওড়া রেল-স্টেশন দেখেন নাই, ইত্যাদি। কলেজে আসিবার চাপকান একটি ছিদ্দা গেলে আর-একটি করিতে দিতেন। স্যার জ্যাকসনের মুখোপাধ্যায় প্রণীত *Geometrical Conics*-এর প্রমাণের তুল্য তিনি নাকি আপিসার করিয়াছিলেন—ইত্যাদি বহু গল্প শুনিব। সব মনে নাই।

বৈজ্ঞানিক বহু মুদ্রের কলেজের ডিসিপাল। অফ-শার পড়াইতেন। একটি ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের ভেলে মুদ্রের কলেজে পড়িত; পরে শিতার বংশি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া ব্রিটিশ চার্জে কলেজে ডিউ হয়। গৌরীশঙ্করবাবু বীজগণিতের একটি অত বোড়ের উপর সমাধান করিবার জন্ত এই কলেজটিকে ভাঙেন। ছেলেটি অল্পট সমাধান করে একটি নতুন পদ্ধতিতে। গৌরীশঙ্কর-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—এ পদ্ধতি শিখিলে কিছল? আমার বা অন্য কাহারও বইয়েতে তো এ-পদ্ধতিতে সমাধান করা নাই। ছেলেটি উত্তর দিল—সে মুদ্রের কলেজে বৈজ্ঞানিকবাবুর নিকট শিখিয়াছে।

গৌরীশঙ্করবাবু আর কিছু বলিলেন না। বৈজ্ঞানিকবাবু ঐশ্বর্য ও পুঙ্খানুপুঙ্খ কলিকাতায় আসিলে, সীনবন্ধু বিশ্বের বাড়িতে উঠিতেন। গৌরীশঙ্কর-বাবু খোঁজ লইলেন কবে বৈজ্ঞানিকবাবু কলিকাতায় আসিলেন। বৈজ্ঞানিকবাবু কলিকাতায় আসিলে, গৌরীশঙ্কর-বাবু একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন যে—আমনি যে পদ্ধতিতে বীজগণিতের এইরূপ অফ-সমাধানের শিক্ষা দিয়াছেন তাহা আমি আপনায় এক ছাত্রের নিকট

জানিতে পারিয়াছি। আমার বীজগণিতের পরবর্তী সংস্করণে এই পৃষ্ঠাটি দিতে চাই। একজন আপনায় অস্বস্তি পুষ্টে আসিয়াছি। বৈজ্ঞানিকভাবে বলিলে যে, আপনি স্বাক্ষরে এই পৃষ্ঠা আপনায় বইয়ে দিতে পারেন; আমি তো কোনোও বই লিখি নাই, আপনার বইয়ে দিতে থাকিলে বহু চার জানিতে পারিবে; এই পৃষ্ঠাতে আমার তো কোনোও কপি-রাইটের দাবি নাই। গৌরীশঙ্করবাবু বলিলেন যে, আপনার অবিদিত পৃষ্ঠা আমি আপনার বিনা অস্বস্তিতে তো চাপিতে পারি না; চাপিলে, চুরি করা হইবে—সেজন্য আপনার অস্বস্তি হইতে আসিয়াছি।

তাহার পর হুইজেন অনেকগুলি অনুরোধের অধ্যয়ন করিলে আপনাকে বলিল। এই ঘটনা আশ্চর্য ১১/৮/১১+১ সালের। এই গল্পটি আমার পৌনঃপুন্যের পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট বহুবার শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন— দেখ, সেকালের লোক কত honest; আর স্বাক্ষর আপনার বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের লোক বা তাব চুরি করিতে যিদ্ধা করি না—আর এইরূপ কথাটা নাকি পাণ্ডিত্যের পরিচয়।

পাশ্চাত্য-সাহিত্যের পুস্তক

কলিকাতা হইতে বড়সাহা (বর্তমানে সরকারী নাম 'বাল্যশুশ্রূষা ইন্সটিটিউট') দ্বারা উক্ত বইতে তিনটি 'টেলিগিফ' চোখে পড়ে। 'টেলিগিফ' হইতেছে তিনতলা বহন উচ্চ অশ্রুশ্রবণের জায়গার উপর অট্টালিকা—তাহার পাক সিঁড়ি। এইগুলি Great Trigonometrical Survey-র সময় রাখা হয়। ইহার উপর লাল নিশান উড়াইয়া পরস্পরের গৌণিক দূরত্ব বিজ্যোজোলাইট দিয়া মাপা হয়, পরে base line-এর সহিত তিসাব করিয়া ভাষ্যত্বের কালি এবং প্রাথমিক ও অক্ষাংশ বাহির করা হয়। এই সার্ভে হর উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, কত বছর সহিত ও কত সূক্ষ্মভাবে সেকালের ইংরেজ সার্ভেয়ারগণ ১২৪১৫০ বৎসর আগে এই মাপ করিয়াছিলেন, তাহা বর্তমান যুগের বহুপাঠ্যের উত্তম যুগের নতুন মাপের সহিত তুলনা করিলেই বুঝা যায়। বিলাতের সহিত তুলনার প্রাথমিক তুল মাত্র ১' ১" অর্থাৎ ২,১২২ গজের তুল।

প্রথম টেলিগিফ হইতেছে পাইকপাড়ার রাজ্যের বাড়ির নিকটে; বড়সাহার উপরেই। অল্প জনসাধারণ ইহাকে 'লাদাবাবুর গিফ' বলে। দ্বিতীয়টি হইতেছে কামারহাটী খিউনিশিয়ায় অক্ষি ছাড়াইয়া কিছু উক্তরে যাইলে—এক্কেল-নওলাপাড়ার ভিতরে—বড়সাহা হইতে

সেখা যায়। আর তৃতীয়টি হইতেছে—অশ্রুশ্রবণ—এখানে চুনিয়ার রাজার মূখ্য, বড়সাহার উপরে।

এই টেলিগিফের নিকটে স্বরাষ্ট্র-সাহিত্যের বহুপাঠ্য তৈয়ারির কারখানা। এইখানেই যোগদানে 'গজক সেক্সে পাণ্ডিত্যের' ছোড়াছুরি তৈরি হইত—চাপ থাকিত ওয়াশিংটন-এ তৈরি। এই কারখানার বাগানের ভিতর একটি বৃক্ষ, পুষ্করী আছে। পাশ্চাত্য-সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই পুষ্করী কাটান। কোর্নওল্ড স্ক্রাইফ ইহার জল পান করিতেন না; ইহার জল পান করিলে জ্বর হইত, নিশা হইত। একজন পাশ্চাত্য-সাহিত্য ইহার সন্ধ্যারকে দিয়া এই পুষ্করী হিন্দু-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তিনিই যে এই পুষ্করী কাটাংগেছেন তাহার স্মারক-রত্ন একটা পাথর খোদাই করিয়া ঘাটের উপর লাগান। জনসাধারণ ইহাকে 'পাশ্চাত্য-পুষ্করী' বলিত।

কোনো ব্রাহ্মণ আহাৰ সত্ত্বে কোনো কিছু শৈথিল্য করিলে, যেমন পেরোয় খাইলে বা হোটেলের 'মদন-ছাপা' (mutton chop) খাইলে অত্যন্ত ব্রাহ্মণেরা সমালোচনা করিয়া বলিতেন—অমুক মদন-ছাপা খাইবো তো কি করিবে? ওর বাবা পামর-পুষ্করের জল পান করিত; ওরা অনাচারীর বেশ—ইত্যাদি। খাড়া-খাড়া সত্ত্বে এই বড়সাহা বা নিশা-সমালোচনা প্রথম বহুসাহিত্যের আগে অবধি প্রচলিত ছিল। আর এখন কলিকাতার মধ্যপ্রদেশ পেরোয়-রত্ন না দিয়া খাইলে নিশা হয়, 'মহাপ্রদেশ' খাটি করিয়া দিল' বলিয়া সমালোচনা হয়।

আমাদের দেশে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী শহরতলী অঞ্চলে যে আহাৰ্য্যাদি বিষয়ে শৈথিল্য ৬০।১০ বৎসর পূর্বে আরম্ভ হয়, তাহার অন্তর্গত শৈথিল্য পুত্রীধানে উড়াইয়ের মধ্যে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রাজা-পুত্রগণ কলিকাতার সত্ত্বে বাংলা ও উজ্জ্বল দাবি বাহাতে শরশব্দ-বিষাদী না হয়, তৎক্ষণ পুত্রকে সার্ভিট-হাউসে নেতৃত্বানী ব্যক্তিগণের একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকে কোনও কারণসত্ত্বে আমাকে উপস্থিত থাকিতে হয়। কাজ হইয়া গেলে, বৈকালে সমুদ্র-সৈন্যকে বেড়াইয়া রাতিতে বহন বাসার কিরিত্তেছি তখন লালমোহনবাবুর হোটেলের চাপান কবির মতলবে চুপি। সেবি, আমাদের পাঠ্য ছদ্মসাহিত্য এককোণে 'চপ-পিঠা' হকুম করিতেছেন। 'চপ-পিঠা' হইতেছে মাংসের কাউসেট। অল্পসংখ্যে জানিলাম, ইঁহায়া যোগদানে 'চপ-পিঠা' খাওয়া থাকেন, মাংস খান না। বুঝিলাম, বাংলার চোখাছ ইঁহাদের মধ্যে পাণ্ডিত্য হইতে। এইটি প্রগতির চিহ্ন।

আমরা ও বিজ্ঞান

অমরেন্দ্রকুমার সেন

সে-ইংলও এ-ইংলও নয়।

ভাষ্যে তখন পলাশীর যুদ্ধ শেষ হয়েছে, ইংরেজরা বীতিমতো আশান পেড়ে বসেছে। শুধিকে নতুন আমেরিকা ইংরেজের হটাবার ক্রমে উঠেপড়ে লেগেছে।

সে-ইংলও ইন্স আঠারো শতকের ইংলও, আঠারো শতকের শেষ অর্ধ।

আঠারো শতকে যে উল্লেখযোগ্য বিপ্লব ঘটেছিল, ইতিহাসে সেটি কথাসি-বিপ্লব নামে স্মরণীয় হয়ে আছে। আঠারো শতকে আরও একটি বিপ্লব ঘটেছিল। সেই বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর চেহারাটি বদলে গেল; বার জন্তে আকস্মিক জগতে ছোট-বড় নানারকম কলকারখানা গড়ে উঠেছে; রেল, স্টীমার, যোটর, বিমান, হকেট, সিনেমা, টেলিফোন, পেনিসিলিন, অ্যাটমিক রিঅাক্টর কত কি আবিষ্কৃত হয়েছে ও তাদের ব্যবহার আমাদের জীবনে অসহিষ্ণ হয়ে উঠেছে। এখন তো পারমাণবিক যুগ শুরু হয়ে গেছে। তবে এ বিপ্লব—যাকে বলা হয় ‘শিল্প-বিপ্লব’ তার আরও অনেক আগেই হয়েছিল—যখন আধুনিক বিজ্ঞানের অঙ্গরোপন হয়।

প্রাচীনকালে হিন্দু, গ্রীক, চীনা, রোমান ও চ্যান্ডিয়ার পণ্ডিতগণ বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যের সূত্রপাত করে গেছেন, আজও বার বহু অংশ আমরা বর্জন করতে পারিনি। তবে মধ্যযুগের জনসাধারণ প্রাচীন পণ্ডিতদের সেইসব বৈজ্ঞানিক তথ্য বা সূত্রে আস্থাশীল ছিল না। সে-যুগে সভ্য ও কল্মনা বিলিয়ে এক অন্ধৃত বিজ্ঞান গড়ে উঠেছিল। মোহা থেকে কী করে সোবা তৈরি করা যেতে পারে, কোন্ পানির টোট পুড়িয়ে তার ছাঁট কোন্ পাতার রসের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে চিরমোঁহন লাভ করা যায়, অথবা কোন্ জন্তুর হাড়ের চূর্ন কোন্ পানিতে বেটে খেলে অশম্মার রোগকে দূরে রাখা যায়—এই অত্যাধুত সব ওষুধবিদ্য বা কল্যাকৌশল আবিষ্কারের দিকে যাত্রা শুরু ছিল।

তবে শতকে ইংলওর রজার বেকন সেই সময়ের ইংরেজ পণ্ডিতগণকে এক উপায় প্রদানে পূর্বসূরী ওৎসুকিত বিজ্ঞানীদের রচনা গড়ে কোনো একটা ধারণার প্রতি বদ্ধমূল হতে নিবেদন করলেন। তিনি বললেন, পূর্বসূরী ঐসব বিজ্ঞানীগণ অনেক বিঘের সঠিক তথ্য

পরিবেশন করতে পারেননি। ‘আবিষ্কার’ ক্ষেত্রে ঠাঙ্গ অসুস্থান ও কল্মনাকে প্রাধান্য দিয়ে অসুস্থ ও অসতর্ক মত প্রচার করে গেছেন। জনসাধারণ দিনা পরীক্ষার সেইসব মত বিশ্বাস করেছেন। হাকডুলা কী করে জাল বোনে, সেটা কৃতপূর্ব কোনো ব্যক্তির দকশোদ-প্রস্তুত লেখা গড়ে এবং সেইটাই ব্রহ্মসত্য বলে মেনে না নিয়ে, হাকডুলা কী করে জাল বোনে নিজে তা প্রত্যাক করে, তার কার্যকলাপ ভালো করে অঙ্গুসন্ধান করে, নিজেই আবিষ্কার করুন—হাকডুলা ব্যক্তিবিক কী করে জাল বোনে। এইরকম না করলে, জ্ঞানের প্রসার হবে না। তুঃপের বিধক, তখন রজার বেকনের কথার কেউ কান দেয়নি, উল্টো তাঁকে ক্যাডও ভ্রোণ করতে হয়েছিল। সে-ইংলও প্রগতিমূলক কোনো মতবোধ গ্রহণের উপযোগী হয়নি।

পনেরো শতকে ইটালিতে এক বিশ্বকর প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। এরকম অসুস্থ ও বহুসুখী প্রতিভার সমগ্র আকস্মিক দিনেও বিরল। সেই প্রতিভাধর অমর ব্যক্তির নাম লিওনার্দো ড ভিকি। যোনা লিবার প্রতিভাধরে রহস্যময়ী হাসিটি ভুটিয়ে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ছিলেন একাধারে শিল্পী, ভাস্কর, গাণিতিক, স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানী। ছবি আঁকতে আর মূর্তি খোদাই করতে তিনি যেমন দক্ষ ছিলেন, তেমন দক্ষ ছিলেন অস্ত্রস্ত শিল্পী। বাস্পশক্তি দ্বারা আহাঙ্ক চলতে পারে এমন যন্ত্রের আর উদ্ভব-মহেবও নজা তিনি তৈরি করেছিলেন। গুড়বার বয় তৈরিও নাকি করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের কোনো লেখা পড়েই কোনো তথ্য বা সূত্র তিনি বিশ্বাস করে নিতেন না। আগে নিজে অঙ্গুসন্ধান করতে, দেখেবার বা বলা হয়েছে তা কতখানি সত্য। সত্যের সঙ্গে না মিললে, নিজেই তথ্য-আবিষ্কারে মনোনিবেশ করতে।

যোলো শতকে এসে পড়ল। এট শতকে আর-এক বেকন—ফ্রান্সিস বেকন—তার অগ্রগামী রজার বেকনের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বললেন : প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করতে হলে নিজের মাথা নিজে ঘামাও, বুজো খার কর—কী করে কী হচ্ছে।

এট শতকেই গোল্যান্ডের বিজ্ঞানী কোপারনিকাস সনাতনশাস্ত্রীদের মৌলিক বিশ্বাস প্রথম ও চরম অযাযত

হানসেন। যে তাহা অবশ্য হিম্মত। ইতিহাসের স্মরণাত থেকেই বিখ্যাতী ছিল, তিনি সেই কথাই বললেন : স্বর্ষ এক জাগরণে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবী তাকে প্রশংসি করছে। তখনকার কালে গিঞ্জা বলত অস্ত্র কথা। গিঞ্জা বলত, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে স্বর্ষ এবং অস্ত্রাত এমন-নকত ঘুরছে। গিঞ্জার অগ্রগামনের বিরুদ্ধে সে-সুগেত ইয়োহোশে এ কথা বলতে বাসেই শাহসের সরকার হত। কোশানিকাসের পর ইটালির গ্যানিনিও দ্ব্যবীন তৈরি করেন এবং কোশানিকাস যা বলে গেছেন তা প্রমাণ করলেন। এ হল সত্যেরো যাত্রের কথা। তখন জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া ধীরে ধীরে অস্ত্রাত বিজ্ঞানও গড়ে উঠেছে। বাহ্রের শরীরে বস্তু যে নিরা ও উপনিগর কথা নিয়ে চলাচল করে তা প্রমাণ করলেন ইংলণ্ডের উইলিয়ম হার্ডে, আর হল্যান্ডের চমবা-বাবসারী নিউবেনহোফ মাইক্রোস্কোপ বা অতীক্ষণ-যন্ত্র তৈরি করে স্বকণকে তাক লাগিয়ে শিলেন। তখন লগনে রয়্যাল-সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের স্মরণাত এই সত্যেরো শতক থেকেই। এতদিন পর্যন্ত মানুষ কোনো যন্ত্রপাতির স্বত্বিক জানত না, জানত বড়জোর হুতো কাটিবার ক্ষেত্রে চকচক করে বাগড় বোনেবার ক্ষেত্রে তাঁত। হারগ্রিভস্ নামে একজন ইংরেজ ১৭৬৪ সালে হুতো কাটিবার একটা কল তৈরি করে কোলেন, যা দিয়ে একসঙ্গে আট-শতটা হুতো বোনা যেত। এই সময়ে ষটল্যান্ডের জেমস্ ওয়াট স্টীম-ইঞ্জিন আবিষ্কার করলেন। ওয়াটের আগে স্টীম-ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি কোনো কাজে লাগানো যেত না। ওয়াট যে ইঞ্জিন তৈরি করলেন, সে ইঞ্জিন দিয়ে ইট্রিবতো কাজ করা যেত, কলকষা চালানো যেত। স্টীম-ইঞ্জিন বাহ্রের পরিসর অনেক ক্রিয়ে দিল। এই ইঞ্জিনকে ভিত্তি করেই কল-কারখানা গড়ে উঠল। শিল্পের ভিত্তি লোহা আর কয়লা বনি থেকে উঠতে লাগল প্রচুর পরিমাণে। বাষ্প তৈরি করতে স্টীম-ইঞ্জিনের খোরাক চাই কয়লা, আর যন্ত্রপাতি তৈরি করতে চাই লোহা।

ভারত ইংরেজদের হাতে এসে গেল। ইংলণ্ডের শাহসনাম তৈরী মাল কাটাবার ভালো একটা বাজার ইংরেজরা পেয়ে গেল, তখনকার কালে তাদের উন্নতি হতে লাগল। বড় বড় কলকারখানাও গড়ে উঠল। ভারতকে ভালবেসে, ভারতের ভালোবাস্তে ইংরেজ এসেছে রেলগাড়ি চালাননি বা কলকারখানা বসাননি। তারা বা-কিছু করেছিল নিজস্বের স্বার্থের ক্ষেত্রে, নিজস্বের বাঁচবার ক্ষেত্রে। তারা সেই সময়ে ভারত হাতে না পেলে, বাক্যে বলা হয়

‘ইণ্ডিয়ায়াল রিভলিউশন’, তা খটত কিনা কে জানে। ইংলণ্ড ও ইয়োহোশের জনসাধারণ ভেবেছিল, কল-কারখানার প্রচলন হলে বাহ্রের বৃদ্ধি হুড়ে হুয়ে যাবে। তারা এই শির-বিরুদ্ধকে অভিনন্দিত করেনি।

আরোহো শতকের সেই ইংলণ্ডে বার্মিংহাম শহরে ছিল এক ‘লুনার সোসাইটি’। লুনার সোসাইটির সভ্যদের একটা ডাকনাম ছিল—‘লুনারিক’। লুনারিকরা যাসে একবার করে মিলতেন, পূর্ণিমার দিন। বাসের লুনারিক বলা হত তাঁরাই হলেন আধুনিক বিজ্ঞানীদের অগ্রগামী। বার্মিংহামে পূর্ণিমার দিন একে একে এসে ছুটত ইয়েনমাস ডারউইন—চার্লস ডারউইনের স্মৃতিস্মরণ; হ্যাট বোউন, ঝার সাহায্যে জেমস্ ওয়াট স্টীম-ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন; জেমস্ ওয়াট স্বয়ং; বাজকোতিবিশ উইলিয়ম হার্শেল; পটাউ-শিল্পী বোলিয়া ওয়েলউড; বোসেক ব্রিস্টলি, বিনি অক্সিয়েন গ্যাস আবিষ্কার করেছিলেন; নৃতাত্ত্বিক স্কাটলেন গণ্টন—এবং আরও অনেকে।

তখনকার ইংলণ্ডে বাওরা-আসা এখনকার ইংলণ্ডের মতো এখন ক্ষুদ্র বা আবাদমাত্র ছিল না। কিন্তু সে-সব কই ও অসুবিধা উপেক্ষা করে তারা জাহগা থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের এইসব অগ্রহুতগণ যাসে একবার করে ঐ পূর্ণিমার দিনটিতে মিলিত হতেন। বিজ্ঞানের নানা সমস্যার আলোচনা বা তার সমাধানই যে ছিল মূখ্য উদ্দেশ্য তা নয়। অনেক সময়েই শোনা যেত—ওয়াট কোনো গায়েন হুয়ের কটী দিয়ে হার্শেলের সঙ্গে আলোচনায় মস্ত, ইয়েনমাস ডারউইন কোনো বাস্তবিক কৌশলের স্মৃতিনাট্য ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন বোউনকে, ওয়েলউড হুয়ত গ্যাসীয় পর্যায়ের আলোচনার উপমা দিয়ে ব্রিস্টলিকে ধারেল করবার চেষ্টা করছেন। নিজস্ব দিয়ে ছাড়া সবলেই অস্ত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসতেন।

এদের মধ্যে কেউ কেউ অল্প আয়েরিকার বোঝানি ক্রান্তদিনের সঙ্গে হুর্দীর্ঘ পত্রের আদান-প্রদান করতেন। বোঝানি ক্রান্তদিন ক্রান্তনৈতিক রূপে পরিণত হলেও, তিনি নানা বিষয়ে নানা জ্ঞানের ও গণের অধিকারী ছিলেন—তিনি ছিলেন আর-একজন সিওনার্ডো ও ভিকি। আকাশের বিদ্যুতকে তিনিই প্রথম ধরেন বৃষ্টি উড়িয়ে। তাঁর বহুবুঁ প্রতিভার ক্ষেত্রে লুনার সোসাইটির অনেকেই তাঁর পরামর্শ চাইতেন।

বোঝানি ক্রান্তদিন একবার আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে এসে কিছুকাল বাস করেছিলেন। সেই সময় লুনার

সোসাইটির ব্যাট বোটনের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ব্যাট বা ব্যাথিয়ার বোটন হলেন দুনার সোসাইটির তিনজন প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে একজন। অল্প হুজুদ প্রতিষ্ঠাতা হলেন—ইয়েশুয়াস ডারউইন—আর উইলিয়াম মল। টমাস স্কোরমেন, বিনি মার্কিন হুজুয়াস্ত্রের সংস্থান বচনা করেছিলেন, তিনি ছিলেন মলের ছাত্র। মল তখন আমেরিকার উইলিয়াম-বার্ণে অধ্যাপনা করতেন। মল পরে স্কোরমেন ক্রান্তিনির কাছ থেকে একশানি পরিচয়-পত্র এনে বোটনের সঙ্গে আলাপ করেন। বোটনের সাহায্যে মল বার্মিংহামে জাকারী ব্যবসায় শুরু করেন। পরে বোটন ও ডারউইনের সহযোগিতার দুনার সোসাইটি গড়ে তোলেন।

একটা সোসাইটি তো গড়ে উঠল—কিন্তু তার কোনো নিয়মকানুন ছিল না, কোনো খাতিশক্তও ছিল না। কী বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, কোন্ কোন্ বক্তা আলোচনার অংশগ্রহণ করছেন, সে বিষয়ে কিছুই লিখে রাখা হত না। ব্যাট বোটন একবার এইসবের রেকর্ড রাখবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দেখলেন যে এর চেয়ে মলের ভগ্ন দ্বিগুণে বেঁটে চলে বাঙলা অনেক সোজা। এ ছিল বেন মেদাল-পুশির আজ্ঞা।

বোটন ভারী বিশেষ পড়েছেন। বার্মিংহামের সোহো পল্লীতে তাঁর যে ক্লাপার বোতাম, চেন, বগ্লস এইসব তৈরি করবার কাজে ছ'শো লোকের কারখানাটি আছে—কাছাকাছি একটা নদী থেকে জল টেনে তিনি সেই কারখানার জলচাকী ঘোরান, কিন্তু নদী এখন শুকিয়ে বার শুকনই তিনি হুকিলে পড়েন। সেবার নদী বেশি শুকিয়ে যেতে বোটন বেশ হুকিলে পড়লেন। নিক্সার কাছে তিনি নিগাডেলকিয়াতে বোম্বার্ন ক্রান্তিনির কাছ চিঠি লিখলেন আর সেই সঙ্গে একটি স্টীয়-পাম্পের মডেল পাঠালেন। পাম্পটির অনেক ত্রুটি ছিল। ক্রান্তিনি তখন আমেরিকার রাষ্ট্রদূত-সংগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সম্ভবতঃ এগিকে মন দিতে পারেননি। তবে ঘরের কাছেই বিপ্লবের আগমন হল। ডাঃ মল একজন স্কট ইঞ্জিনিয়ারকে জানতেন। এই ইঞ্জিনিয়ার আর কেউ নন, আমাদেব পরিচিত জেমন্ড গুয়াট।

জেমন্ড গুয়াট তখন গ্রাসগো ইউনিভার্সিটির ছাত্রর মধ্যে ছোটখাটো যন্ত্রপাতি আর বাত্মন্ত্রের একটা দোকান চালাচ্ছেন, সেখানে এসব বেগানত হয় আবার বিক্রিও হয়। এই দোকানে তাঁর হুজুদ বহু আজ্ঞা দিতে আসতেন।

একজন হলেন যোসেফ ব্র্যাক, বিনি কার্বন ডাই-অক্সাইড আবিষ্কার করেছিলেন, আর অপর জন হলেন জন অ্যাওয়ার্ডন। অ্যাওয়ার্ডন এতদিন গুয়াটের কাছে একটা নড়বড়ে পাম্প নিয়ে এসলেন। নিউকমেন নামে একজন সাহেব এই পাম্পটি তৈরি করেছিলেন। পাম্পটি খারাপ হয়ে গিয়েছিল,—গুয়াট যদি বেদান্তত করত পারেন। গুয়াট কিন্তু পাম্পটি বেশে খুব বিকৃত হলেন। পাম্পটি যেন এসোবেলোডাবে তৈরি। নিউকমি কোনো কাচা কারিগর পাম্পটি তৈরি করেছে। পাম্পটি মেরামত করতে গিয়ে গুয়াট আত্ম নতুন অঞ্চ আরও ভালো একটা পাম্প তৈরি করেই ফেললেন। তখনও পর্যন্ত হত পাম্প তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে গুয়াটের পাম্প হল দবার সেবা। মল এসব খবর জানতেন এবং তাঁরই চেষ্টায় গুয়াট ও বোটনের যোগাযোগ হল। বোটনের সবস্বত্র সম্মান হল। গুয়াট পাম্প তৈরি করলেন, সেই পাম্প কারখানার জল টেনে তুলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত 'বোটন অ্যাণ্ড গুয়াট' নামে বিরাট এক কারখানা গড়ে উঠল।

শিল্প-বিপ্লবের সূত্রপাতে যে শক্তির দরকার ছিল, জেমন্ড গুয়াট তা সরবরাহ করলেন। সেই শক্তির সাহায্যে অনেক শিল্পের মধ্যে কাপড়ের বল তৈরি হল। কাপড়-শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে হসান-শিল্পও গড়ে উঠল। কৃত্রিম উপায়ে কার তৈরি করলেন জেমন্ড কিংয়ের। সাগফিউরিক অ্যাসিড আবিষ্কার করলেন ডঃ জন কংকে; পাকিন আবিষ্কার করলেন কৃত্রিম অঞ্চ পাল 'হড্' যং; রবারকে ব্যবহারযোগ্য করলেন চার্লস গুডইয়ার; ইস্পাত তৈরি করলেন হেনরি বেসেমার। বার্ণেসেট আবিষ্কার করলেন ফোরিন গ্যাসের সাহায্যে কী করে কাপড় বা স্বেতা সাদা করতে হয়। বার্ণেসেট এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন গুয়াটের সহযোগে।

দুনার সোসাইটিতে আর-একজন ছিলেন ডাঃ উইলিয়াম উইয়ারিং—তামাক-জাতীয় ফলস্রাবত ফুলের গাছ থেকে হার্টের অর্ধাংশ হৃৎযন্ত্রের একটি ভালো ভণ্ড আবিষ্কার করলেন—'ডিক্টিয়াশিন'। উইয়ারিং বেরিয়ার কাগজটও আবিষ্কার করেছিলেন, যার দ্বারা সোসাইটির অপর এক সদস্য গুয়েল্ডউট পটারি-শিল্পের প্রভূত উন্নতি করেন।

ইয়েশুয়াস ডারউইন তো ছিলেনই। তিনি জীবের উদ্ভব পর্যন্ত নানা গবেষণা করতেন। পরে অবশ্য তাঁর নাস্তি চর্চা ডারউইন অভিব্যক্তিবাদের নতুন মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করে জগৎকে চমৎকৃত করেছেন, যার ফলে মানুষের চিন্তাধারায়ই বদলে গেছে।

ভারতীয় কংগ্রেস-বিভাগে এসে পড়ল। দু'বার সোসাইটির সভাপতিত্ব এই বিভাগকে সম্বর্ধন করতে লাগলেন, বিজ্ঞানকগ্রেসে তাঁরা নিক্সোকে বৈজ্ঞানিক কেম্পু ভাট্টের চেয়ে প্যারিসে ডাক্তার আর রোগেশ্বরীর এক বন্ধু-বৃদ্ধ রাখলেন, প্রিন্সটন বোলান্টিনডাবে জ্ঞানদাস অ্যাসেমব্লির পক্ষ নিলেন। ফলে, ইংলণ্ডে হাউস অফ কমন্স-এ টমাস বার্ড উভয়ের মৃত্যুপাত করলেন। তাঁদের কংগ্রেসের তত্ত্বের বগেও ছাড়লেন না।

ব্যক্তিদের পতনের তাহিৎ ১৪ই জুলাই। সেই দিনটির বিতীর্থ বার্ষিক উপলক্ষে কেম্পু বিহের বামিংহামের সংগে নামকরা পানপাশার এক ডোকসডার আয়োজন করেছেন। প্রিন্সটন-সমতে আশিজন গণ্যমান্ত ব্যক্তি, দ্বারা অনেকেই দু'বার সোসাইটির সভ্য ছিলেন, তাঁদের অনেককেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এক বিখ্যাত জনতা সেই পানপাশা আকর্ষণ করে জনাশ-দরজা ভেঙে ডোকসডা পড়তে দেখে, কিছু তাসের লক্ষ ছিল প্রিন্সটন। ডাগিয়াস, প্রিন্সটন তখন উপস্থিত ছিলেন না। প্রিন্সটনের বোকে জনতা গেল 'নিউ বিটিং-হাউস', দেখানকার শাট্রী ছিলেন প্রিন্সটন। দেখানেকও প্রিন্সটন বৈ। গির্জার আগুন লাগিয়ে তারা প্রিন্সটনের বাড়ি কেঁদার-ছিল অভিনুৎ বওয়ানা হল। প্রিন্সটন আগে খবর পেয়েছিলেন, তাই মাত্র আধঘণ্টা আগে তিনি অস্ত্র আশ্রয় নিতে গিয়েছিলেন। প্রিন্সটন না থাকলে কি হবে ?

তাঁর বাড়ি তে: রয়েছে, তাঁর শাইজেরি তে: আছে। অতিরে অগ্নিযোগ করা হল। সেই ঐতিহাসিক অগ্নিকণ্ডে প্রিন্সটনের বিন বংসরের পরিপ্রথম পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

প্রিন্সটন সপরিবারে বামিংহাম থেকে লণ্ডনে এসেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আমেরিকার চলে গেলেন—পেনসিলভানিয়াতে বসবাস শুরু করলেন। এখানে তিনি একখানি মূল্যবান বই লেখেন—'এক্সপেরিমেন্টস অন দি কনসারভেশন অফ এনার্জি ওয়টার'। বইখানি তিনি দু'বার সোসাইটির গ্রিয়ার বন্ধুদের নামে উৎসর্গ করেন।

প্রিন্সটনের ভাগ্য কিছু সুপ্রদর ছিল তাই তিনি নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস-বিজ্ঞানী ন্যাকোয়াসিয়ার বরাত বন্ধ ছিল, তাই গিলোচিনে তাঁকে প্রাণ বিতে হয়েছিল—তবে তিনি দু'বার সোসাইটির সভ্য ছিলেন না। তিনিই শেষ দেখালেন হু'ভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন দিয়ে জল তৈরী। তাঁকে বলা হয়—আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের জনক।

দু'বার সোসাইটি অনাধিকার হারান, কিন্তু মৃত্যু করে গেল বিরাট শিল্প-বিপ্লবের। দু'বারিকরা, আর-এক বিপ্লব, কংগ্রেস-বিপ্লবকে সম্বর্ধন করেছিলেন—জুল করেছিলেন কিট্রিক করেছিলেন, ঐতিহাস ভাব বিচার করবে। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের গোড়াপত্তনে তাঁদের দান কেউ অস্বীকার করবে না।



দ্র. **বেঙ্গল ডেকরেটর**

২২০-চিত্তরঙ্গন এভিনিউ • কলিকাতা - ৬

অন্তরঙ্গ শিশির দেন

ডোডার লেনের ছোটপিসী সরকারী কলেজে কাজ করেন। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমিও মন হুলে তাঁকে সব কথা বলতাম।

আমাদের ঘরনই একটা কিছু পারিবারিক গোপনমাল হোতা ছোটপিসী এসে মিটমিট করে দিয়ে যেতেন। ছোটপিসী উভয়পক্ষের ওনানী পুথক পুথক ভাবে শুনে বা কথশালা করে দিতেন তা মানতে আমাদের কোন পক্ষেই কোন আগন্তিক কারণ হোতা না। হুত ছোটপিসীর প্রশ্ন ব্যক্তিবৈট এটা ছিল একটা অদুত কোশল।

আমার শিখবার টেবিলের পাশে ছোটপিসী অন্তরঙ্গ হয়ে ঘনিষে বলে বললেন : 'কি রে, বিয়ের পর মন বছর পেরিয়ে গেল এখনও যা-ভাই-বোনদের সঙ্গে বোঁ-পে নিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে থাকতে শিখলি নে? কি তোরা শিল্পকর্ম, তা হুই জামিন? যথকে শিক্ষা দিতে পারলিনে—বিশ্বকে নিয়ে নেতে উঠলি!'

আমি একই হেসে জবাব দিলাম : 'পিসী, হুমি এক-পক্ষের অভিযোগ তনেছ, তাই হুমি এত কাঁদার। বিচারের আসনে বসতে হলে বিচারককে উভয়পক্ষের ওনানী শুনেতে হয়। আমি সংসারের কোন কিছুর মধ্যেই নেই—সে কি কম মুখে? না বাধীন হতে চান, ভাই-বোনরা কথা কথার ভনিয়ে বলেন : 'ঐরা কাতও তোরাফা করেন না, ঐরা বাধীন, তাঁদের অভিভাবক ঐরা নিজে।' বেশ তো, ভাল কথা, আমি কেন তাঁদের বাধীনতা-পথের কাটা হয়ে ঠাড়াব?'

পিসী চোখ নাচিয়ে বললেন : 'এ তোরা ব্রেক অভিমানের কথা। তোকে কেউ মানেনা এ-আবার একটা কথা! এ তোরা কল্পিত অভিযোগ। যেহেঁরা আবার কে কবে বাধীন হয়েছ, বাপু—আমি তো কখনও গুনিনি। আমার গুণাণ বছর বয়সেও ত আমি বাধীন হতে পারিনি। নেয়েহের যে পরাধীন হওয়াতেই আনন্দ। এটা সঠিক একটা ধর্ম। একে অবীকার করে আত্মশালন করা মানে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেহাধা বোষণা করা। হুই না বুদ্ধিবীণী?'

'হুমি কলেজে কাজ কর। হুমি দার্শনিক নোশেন-হাওরেক্ষে নিচ্চই তুলে বাওনি। যে বত বুদ্ধিমান ত্যার তত বেদনা বেশী।'

'কিছু হু'ছি এসে যখন মাস্তুলকে বেধনা দেব, তখন?'

'ওই তো বললুম হুমি একপক্ষ তনেছ।'

'তবে-বল্ না তোরা কি অভিযোগ?'

'বাংলাদেশে শাত্তরী-নমন-বোঁ-তে একটা মন্থ সম্পর্ক হুশো বছরের ব্রিটিশ শিক্ষার জৌদুবেও ভাষী হেপাল্যত করতে পারেনি। এটা হুত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জগাশিচ্ছুরী শিক্ষা-ব্যবহারের জন্ত আরও এঘনি বেদমতা হুশ নিরেছে। তারপর বেহেঁরা আবার আজকাল অর্থনৈতিক বাধীনতাও পাচ্ছেন। একদিকে প্রথম ব্যক্তিগতত্ববাদ, অপরদিকে বৌধ-পরিবার-প্রথা। মন 'ত অবতজাবী। হুগের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করতে হবে—তা মইলে মাস্তুলের শিক্ষার গর্ভ কোথায়? ইংরেজী শিক্ষার আমদা শিক্ষিত হব কিন্তু ঘরে এসে আমাদের কোপঠাশা সনাতনী গৃহ-রং-কৌশল হুবিধেমতো আরোপ করব—এই তো চল আসছে!'

'হুই খুব উত্তেজিত হয়ে গড়েছিল দেখছি!'

'মোটও না। হুমি যখন তথা হুললে, তাই আমি আমাদের সামাজিক গলদ হু'চারটে বের করতে চেষ্টা করছি।'

'কিন্তু তোরা এমন হুজিরী-মন হুলরের উপাসনা না করে যদি প্রাত্যহিক শ্রীমতা ও সূহতার মধ্যে তনিয়ে যার—তাহলে দৌটা-হুলর তোরা পকে আদুহতয়ার সমান।'

'পিসী, কল্পিতবী মনের জন্ত উপহুত পরিবেশ চাই। হুলরের উপাসনা মানে ত কতগুলো জাকামো, পাকামো জুদুবেবেগের উদ্ভাস মধ। জাঁপন যে হুংরগুজুরী, তার দায়িহ যে অনেক বড়। সে কথা কি জেতুরা বুকে না?'

'তবে তোরা সাহিত্যের মাধ্যমে অধীকাল কি-পরিবেশন করতে চাস?'

'শিখী আন্ত নতুন নতুন শিখরবস্তর চমৎকারিয়ে পার্ককে সাময়িকভাবে মুক্ত করার কোশল খোঁজে। যেহেঁরাহুহের ছবরাবেরের ডিসেকশন করে পার্ককে হুচ্চকান্তে পারে না।'

'তবে তো তোদের শুতদিন সমাগত। প্রকৃতিকে অবীকার করার বুদ্ধ বোকা করণি হুছি? কবি বলেছেন, যেহেঁরাহুহকে বারো বীকার করে না, তারো প্রকৃতির গুণ্ডর।'

‘আজকের বসন্তাত্মিক জীবন ত শুধু ভাবাবেগকে কেন্দ্র করে এগিয়ে যেতে পারে না। সমাজগঠনে, জাতিনির্মাণে বহুবিধ সমস্যা আছে বা জটিলবেগের চট্টভেদ পড়ে। মানবীয় ওপাশবীর মধ্যে জটিলবেগ একটা দিক মাত্র, ওকে সামগ্রিক জীবন বলে চলে না।’

‘তোমার ত বেবেমাত্রকে অর্ধেক কল্পনা ও অর্ধেক মানবী ঐক্য করে সাহিত্যের মাধ্যমে কত ছড়ি বানানি? আর হঠাৎ এতটা বসন্তাত্মিক হলি কি করে? সমস্যা ত তোর চিরকাল থাকবে। তাই বলে মস্তককে তুললে চলবে কেন?’

‘হান, একে তুমি সাহিত্য বল? নারীসেহের খুঁটিনাটি বিবরণ ও পোশাকে দিয়ে পুরুষকে বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করাই হলি সাহিত্য? হ্যা, তবে সে-সাহিত্যের দুরে আমার শতকোটি প্রণাম।’

‘আসলে তোমার কি চাল, তোমার নিষ্কোষই জানিলাম নে। তোমার সোচ্চারে কি নতুন কথা শোনাতে চান? যদি বলি পুস্কানো কথাই নতুন করে শোনাতে চান নতুন উত্তে। সেই প্রাচীন মস্তকাত্মক আমলের কথা। বোম্ব রেজ নতুন পাবি কোপতে, বল?’

‘তুমি সত্যি কথাই বলেছ, শিশী। নতুন আর পাবে কোপতে, বল?’

‘হ্যাঁ, কি বলতে চাচ্ছিলি—সেই কথায় বল? আমার হাতে সময় বড় কম। অনেক কাজ পড়ে আছে। কত বাতা দেখতে হবে জানি?’

‘ও তো চিরকালে ব্যাপার।’

‘মা-কে কত ভালবাসতুম, শিশী—সে তুমি জান না। ছেলেবেলায় ত মা-কে সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলা ছিল আমার বোম্বকার একটা অভ্যাস। তারপর কলেজে গেলে। অধ্যাপকদের কাছে নতুন নতুন জিনিস শিখতুম। মা-কে আমার চিন্তাধারারও একটা ভাগ দেওয়া চাই, নইলে মনে ভুটি নেই। কিন্তু মুশকিল ঠাঁড়াস বিজ্ঞানের জটিল বিবরণ নিয়ে। মা কেন সহজে আর ভিত্তিতে চান না। চিন্তা-ধারার আলাদা মতো কেন একটা পার্থক্য এসে যাচ্ছে কবল। সাহিত্যপ্রীতির দিক দিয়ে কিন্তু মার সঙ্গে আমার মনের মিল ছিল প্রচুর। আমি নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র হইওঁ আচ্ছ সাহিত্যভাবসী। মানুষের মন নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করি। কিন্তু এর পেছনে আছে আমার মায়ের সাহিত্যবোধ বা সাহিত্যপ্রেরণা। বিজ্ঞানকে নিয়ে আমার মা ঠিক আমার সঙ্গে ভাল দিয়ে চলতে পারলেন না—কিন্তু তাই বলে সাহিত্য-আলোচনার আলাদা মতো কৃতি

নেই। নরনারীর ব্রহ্মচর্য, বেশভাষা, নতুন বানদত-বোধের উদ্বেগ—এসব বিষয়ে মনে আমারের একটা আত্মিক বোণোবোণ ছিল। পরের ভ্রমকে নিজের মনে বলে এগুণ করায় আমারের মনে একটা অস্বস্তি আনত ছিল।

‘তারপর ধর, ইন্দীনায়ে বিয়ে করলুম। মা-র কত আনন্দ! বোনেরের কত আনন্দ। কিন্তু সে কদিন? দাদা ভালবাসতে শুরু করেছে আমার একটি মেয়েকে। এটা মনে ঠিক নয়। গাঙ্গে কৃতি পড়লে মনটা বিগিয়ে ওঠে। মা আর অববিবাহিত ডাইবোনদের মধ্যে একটা পাইই হয়ে একটা স্বতন্ত্র রূপ হয়। সে তো তুমিও কিছুটা স্বতন্ত্রে পারছ।

‘ডেবেইলুম একটা পরিষ্কার আকাশ; কিন্তু আকাশে উঠলো মেঘের ঘনঘটা। সূর্য আমারে পণ মশণ হলো না। আমি বড়। আমার দারিদ্র অনেক। ছোট বারো আছে তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব পরোক্ষ পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার উপর এসে পড়ে। কিন্তু তাতেও আমি বিচলিত হইনি। সেমজাইটি আমারই সঙ্গে কারবারে নেমে পড়ে। তারপর ধীরে ধীরে একদিন দেখা যায় আমারই প্রতিষ্ঠানের ভিতর থেকে সে স্বাধীন হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা ভাল কথা—তাই বলে স্বাধীনতা মানে অসংযম নয়। মাঝে মাঝে কথা-কাটাকাটি হোতো। তারপর মৌনী হনুম। অতঃপর মাঝে মাঝে গাছে বলে আছে সে-গাছেই ভাল কাটতে চায়। পড়ে বাবার পরোক্ষা করে না। এটাই বৃত্তি, অল্প যে-কোন পোষ আমার ভাই-এর অবস্থার বসলে—সে বিনয়ী হতো, নম্র হতো, বাধ্য হতো। কিন্তু ওর উচ্চ বোম্ব ও মান-সম্মান বজায় রাখতে গিয়ে ও হলো একটি অস্বস্তি চরিত্র।

‘কলে, মা আর বোনের ওকে ঠাঁও রাখবার ক্ষমতা ও বা বলে সেটাই ঠিক। নম্র ওর মন রাখার হবে। আমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসে করবার প্রয়োজনই বোধ করেন না। কারণ বোধহয় ওর সবকিছু আমার মতামত অনেক আগে থেকেই গ্রেন্ডিউল্ড হয়ে আছে এই বোধকরি ওদের রাখনা। তা ছাড়া সামান্য একই অংশ নিয়ে আছে তাদের আমারও বাগড়া দেওয়া উচিত নয়। ঠিক কথা। বিরোধের বীজ এখানেই জন্ম নিল। মোট কথা, এক অর্ধাচীন বালককে আমার পেছনে লাগিয়ে দিয়ে সবাই আমার ভুলী-নাচন আরামে উপভোগ করতে লাগলো।

‘আমার যদি কোনরকমে চলে যেতো তাহলে কিছু ভাবতুম না। কিন্তু দিনকে-দিন কারবারে মেনার তলাতল হতে লাগলুম। ইতিমধ্যে প্রত্যহ এসো—আমাকে অত

চাকা ঘাও, আমি চলে যাচ্ছি। এতে ত বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার কথা নেই। এতে আছে স্বাভাবিকভাবেই নয় জোড়। আমার জিনিস আমারকেই কিনতে হবে—কি কঠিন সমস্যা!

‘আমি বাড়ির ভূত গাড়িয়ান। যেহেতু সব স্বাধীন। বাড়িতে কোথায় এবং কবে কি হচ্ছে আমি না। ইনকাম-ট্যাক্সের লোক এলে গাড়িয়ানকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে হস্তগতকালে আসে: ইনকাম নেই তো, সহকারী দূরে কেন? সব বাজে কথা। গল্প-গুজবো ভাব।

‘বাড়ি নিয়ে বাঘা বাঘে গাড়িয়ানের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন হয় কেউ চাঁদার খাতা নিয়ে এসে, বিজলী বাল্ব বা লাইন বারান্দা হলে অথবা ওপরে জল-তোলা বিজলী শাশু বাবাং হলে—কারণ তাহী দিয়ে জল তোলার ব্যবস্থা করতে হবে তো?’

পিসী এখানে একটু নড়েচড়ে বসে বললেন: ‘এখানে একটু কাট-শর্ট। অত ডিটেসিং-এর মধ্যে বাসনে। আমি সব বুঝতে পারছি। কিন্তু একটা কম্প্রোমাইজ বা অ্যাডজাস্টমেন্ট চাই, সেই তো শিক্ষার ভিত্তি বা কালচারের গোড়ার কথা। যারা অবশ্য তাদের নিজে বানিয়ে চলতে হবে তো? ভোর উপর আমার অনেক ভরসা আছে। তাই আছে বহুবিধিত অকুঠ ডালবালা—বা নির্ভেজাল।’

বললেন: ‘পিসী, ছুটিও তো বেবেদাহন—বেবেদাহনের পক্ষে চানবে বৈকি। কত সঙ্গে তুমি অ্যাডজাস্টমেন্ট করবে—যাদের নিজের কথা ছাড়া অন্য কথা পোনার সময় নেই।

‘হা বেবেদের নিজে যেতে উঠলেন। ছেলেকের দিকে ডাকবার সময় নেই। বেবেদের কিশে মুখ, কিশে শান্তি সর্বক্ষণ সেই চিন্তায় ব্যস্ত। তারাই তাঁর পরামর্শদাতা। ছেলেকের দিকে ডাকবার সময় নেই। কোথায় যায়, কি করে, কি ঝার কে তার খোঁজ রাখে। তারপর অনি-বিবাহে তো উৎসব সেসেই দিনে। তার আর বিবাহ নেই। যাদের দত্ত বিপদের দিনে বেবেদাই তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ রক্ষার ভার নেবে। ছেলেকের বেলায় আছে শুধু শাসনের স্রব আর বেবেদের বেলায় সকলসময়ের ক্ষত তোলার আছে আদর-মাশানো উদ্ভাস।

‘সাধারণত দ্ব্যর্থিত পরিবারে বৌ-এর স্থান বাড়ির ক্রি-চাকরের চাইতে খুব বেশী উঁচুতে নয়। পাঁচজনের সংসারে ক্রি-চাকরের মতো বৌ-ও বা খেতে খেতে পেনে লক্ষ্য পায়। ইলানার যখন দ্ব্যর্থাত্মক শেইন হলো—বোনেরা ভাত ও গরুখন্ডের খালা সাক্ষরে বৌ-কে ট্রেবিলে ধরা দেবে—

কোন কাজ করতে দেবে না, কথা বললে না—সব বৌনী সাধু—সেই বৌনীজাব পরম বৈধের সঙ্গে আজও তাতা তাদের ভাবীসাদের সঙ্গে বজায় রেখেছে। ইদানীকে হাঁ, হঁ আর না এত তিনটি শব্দ প্রয়োজন-বিশেষে আমার জাইবোনের মুখ দিয়ে আসার করতে এখনও দৃঢ়মতো গলদপর্ষ হতে হয়—এ কথা কাছের মানুষ খাটা উঠা সন্দেহই কমবেশী জানেন। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখো—একটা মানুষের সঙ্গে যদি কেউ কথা না বলে—সারাদিন ঘরে বসী হয়ে থাকতে হয়—তবে তার ক্রিয়াকর্ম হুর্ণা হয় একবার কল্পনা কর। বৌ-কে জন্ম করবার পক্ষে একটি শিক্ষিত পরিবারের কথা-না-বলা একটা সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র। যে যার মতো একা বা দল বেঁধে দিনেমাংস খাচ্ছে, সাচ্ছন্দ্যমণে খাচ্ছে, গল্পগুজন করছে, হাসি-তামাশা করছে—কিন্তু বৌ-কে যেখানেই মুখ হুঁদু। বৌ-এর সঙ্গে বাড়ির কারও যোগাযোগ নেই। তারপর বাড়ি থেকে বের হবার কথা সেও এক মহাশূন্য ব্যাপার। হকে হকে লোক আসবে, চায়ের পাট নিয়ে বস—এসব তো ফুল-তোলা কাজ। বুড়ো কাকের মূক্যো নেই। বৌ-মাছর কমবেটা কি? চাকর রয়েছে, ঠাঁকুর রয়েছে।’

পিসী বললেন: ‘সবই তো বৃকলু। কিন্তু একটা উপায় তো বের করতে হবে—গলদটা কোথায়?’

‘অভিযোগ বহুবিধ, পিসী। কটা বলব আর কটা বলব না। কোন এমন কত জান? মানুষের বদল বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, আর গড়ে ওঠে একটা বাথোন চিন্তাধারা এবং স্বতন্ত্র ক্রটি। ক্রটিতে ক্রটিতে যখন ক্র্যান্স বাধে, তখনই মানুষ সাধারণ বিচারে হারে পড়ে—কণে স্বার্থপর, কণে স্বাভাবিকজিক, কণে আরও কত কি!’

‘কিন্তু ভারতের সাধারণ বৃহদয় কি? দুটিটি ইন্ডাইডারসিটি—তমু প্রদেশের পর প্রদেশ বিচারে নয়—ঘরের বেলায়ও।’

‘বেখানে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, ইডিওলজির সূক্ষ্ম বিচার—সেখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট কি করে সম্ভব—তুমিই বল?’

‘বুঝি, পাচাতা শিক্ষার শিক্ষিত হয়ে বিতরি অঙ্ক ইন্ডিজিটাইজেশনকে দেখে এ এটো পাট অন দি পাট অঙ্ক এ ঘ্যান (ব্যক্তিক্রান্তব্যবাস মানুষের জীবনে এক বড় অংশ নিয়েছে)। তবে কি দত্তিা সত্তিা যৌথ-পরিবার-প্রথার সূত্র ধরেছে? ভারে ভারে এখন বহু কোথায় এখন পানে কেহ? সবই কি বিহো?’

‘এক হাঁড়িতে শুধু ডাত খেলেই হবে না। চিন্তা-ধারাটাকেও একটা কালচারা আবহাওয়ার উত্তীর্ণ করতে

হবে। সেজন্য প্রত্যেক গৃহেই চাই একটা স্বপ্ন প্রাটিকরন—যেখানে ভাবের আশান-প্রদান করা চলে। সবকিছুই যদি একটা ধারাবাহিক বস্তুতে বিকির্ষিত করে জলে—তাহলে গৃহস্থের জীবনও সুখে থাকে। বিশেষ করে অতঃপর পঞ্চমের। নিদ্রানন্দ গৃহে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ওই বেশ, বাস্তব পর থেকে ভেলে আসছে দুঃখের কুহ আওলেক। কল্পলোক-বিহারী বিচরণ করছে কল্পনার আকাশে। আর এতিকে ইন্দ্রিয়ার ঘর থেকে আসছে একটা অকণ্ঠ নিশ্চিন্ততা, যার স্রুশনা নেই—অতঃপর মহাসাগরের দানবের প্রপাতি আছে ওই স্বপ্নতায়।

‘আজকের অগোচরিত্ব আশা একটা কিনারা আসতে পারেন না, সেইটেই হুংসের। আশারও এতুনি চলে যেতে হবে। এতটুকু সময় হাতে নেই। বিলম্বিত করে থাকতে না পারায় অর্থ কি আছে জানি না, তবে হুংস অর্থে যে প্রচুর সেক্ষণ বলই বাহুল্য। আশারও সমাধি-কীর্তনে যে ভাঙন ধরেছে তা বেশ দৃষ্টে পারছি। একটি নববিবাহিত দম্পতি সম্মান চায়। ২২, তারপর পর পর তিনটি সম্মান হলো। তারপর ২৫ম হলো, বড়ো হলো। তখন ব্যক্তিরা প্রায়শঃ ও দৃষ্টিকোণ এসে তারপর ইঁটি চেপে ধরে আশা করে দেখে। দম্পতিটি ভাবলে: এটি যে ছেলেপিলে বড় করবে, মংগল করবে—সবই তো বিচ্ছিন্ন

হয়ে গেল। বেয়েদের বিদ্যুৎ কানাইয়ের হাতে। ছেলেদের বিদ্যুৎ বৌদের হাতে—আশারের আর নিজস্ব বসন্তে বইল কি! সৃষ্টিই এই নিশ্চয়। প্রকৃতি তার কাজ করে থাকে। প্রকৃতির কাজ জীবাশ্ম। কোথায় তার চোখের জল বর্ষ হলো সেদিকে প্রকৃতির কোন দৃশ্যে নেই। সোপেন-বাওয়ে-এরও মূল কথা এই। বাৎসর্যবসের দিকে একটু নজর দাও—বেতে পাঁবে হুংসের পঞ্চমেরও একটা বিশেষ সময় আছে। ‘ওগু’ সেই সময়টুকু মত, অর্থাৎ ওই বিশেষ সময়টিতে তাদের হেবরস উঠতে পড়ে। আসলে প্রাণিতত্ত্ব খঁচিলে দেখা যায়, পঞ্চম চাইতে বাস্তব একটু দীর্ঘসময় তার কালচারের অঙ্কুরাতে সম্মানবাৎসর্য দ্বারা করতে চায়। কিন্তু তাই কি পারে? বাশ-বা তালবাসতে চাইলেও, ছেলেমেয়েরা নিজেস্বাই বেঁচে দাঁড়ায়। এই তো দেখছি সোপারের রীতি।’

‘শিল্পী বস্তুতা আর দীর্ঘ কোরো না। আজ এখানেই ইতি দাও। একটি অগ্রিম কথা বলি: জ্ঞানবুদ্ধির কল খেয়ে সকলেই আমরা বেশী সুখি। সকলেরই একটা আশ্চর্যেরতা, হামবড়াভাব—বাক্য বলে অটোকেটিক স্মিট্রি। সেখানেই সকল হুংসের মূল উৎস।’

কথা শুনে শিল্পী আবার শিরে একই বুদ্ধ চপেটাঘাত করে বললেন: ‘আজ আর নয় রে—’

ভারতীয়
সিঙ্কের প্রাচীন
প্রাচীন



ইণ্ডিয়ান সিন্ধু টেক্সটাইল
৫, কণ্ঠওয়ালিটা স্ট্রীট, কলিকাতা

শোকের মনস্তত্ত্ব

ডাঃ পদ্মপতি ভট্টাচার্য

শোকের কষ্ট অতি নিরাক্ষণ। এর নিরাক্ষণ অর্থাৎ থেকে জীবনে আবার কেউই রেহাই পাই না। শুধু তাই নয়, এর আঞ্চলিক অর্থাতে অনেক সময় শোকের মানসিক অবস্থা এমন বিকৃত ও বিকল হয়ে যায় যে তার পর থেকে সারা জীবনটাই তাদের ব্যর্থ, প্রাণে বেঁচে থাকলেও তারা জীবন্তের মতো হয়ে থাকে। শোকে এতগামি অর্থাৎ লাগবার কারণ কি, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে তা আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার, এবং তার কোনো প্রতিকার আছে কিনা তাও অতুলনান করে দেখা দরকার।

প্রিয়তমের বিরোগে কিংবা বিরহে আমাদের মনে স্বভাবতই শোক লাগে। কিন্তু এর মধ্যে অনেক তারতম্য আছে, সকল রকম প্রিয়তমের বিরহে সমান শোক নয়। কোনো এক পরিবারের স্ত্রী ঠাঁহুমা যখন মারা যান তখন তিনি সকলের অতি প্রিয় হলেও তাদের মধ্যে প্রায় কেউই তেমন শোক করেনা। কিন্তু পরিবারের সকলের আগ্রহের একটি শিশু যখন মারা যায়, কিংবা সংসারের একটি রোমপেয়ে দুবক যদি অকস্মাৎ প্রাপত্যাপ করে, তখন সকলেই তার শোকে মুহুমান হয়ে পড়ে। পূর্বেরা সকলেই স্ত্রীবিরোগে ও মেয়েরা সকলেই স্বামিবিরোগে অতিরিক্ত শোকের কাতর হয়ে পড়ে। জীবনের নিকটতম সখী চলে গেলে তার শোক সকলের পক্ষেই অসহ্য।

তবে শোকের অর্থাৎ সকলেরই লাগলেও তাতে কে কেমন কাতর হয়ে তার মধ্যে অনেক তারতম্য আছে। যার যেমন প্রকৃতি সে তবুহলেই কাতরতা প্রকাশ করবে; কেউ কম কেউ বেশী। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনগ্রন্থতা এবং মনোবৈকল্যের মাত্রার উপরে তা অনেকখানিই নির্ভর করে। একই প্রকারের শোকে কেউ হয়তো কাষকর্ম এবং বাঙলা-নাওয়া প্রকৃতি একবারেই পরিত্যাগ করে বহুদিন পর্যন্ত জড়বৎ হয়ে অবস্থান করে, আর কেউ হয়তো ভিতরের কাতর হলেও বাইরে বাইরে সব কিছু করে যায়। আবার কেউ কেউ এমন আছে যারা অত্যন্ত শোক খেলেও তা একেবারে চেপে যায়, বাইরের আচরণে ও হাভেভাবে কিছুই প্রকাশ হতে বেশ না।

এই শোকের ভিতরকার নিগূঢ় মনস্তত্ত্বটি কি? যে প্রিয়জন পড় হয়েছে, তারই না মানি কত দুঃখ হচ্ছে ভেবে কি

আমরা কাতর হই? তা নয়। তার অপরিস্থিতিতে আমাদের নিঃশেষই কষ্ট ও নিঃশেষই অশ্রুবিধা হচ্ছে, সেই কারণেই আমরা কাতর হয়ে পড়ি। আমার প্রতিদিনের জীবনযাত্রা যার সঙ্গে ঘড়িত ছিল, যার উপরে আমি অনেক বিষয়ে নির্ভর করতাম, যার কাছ থেকে অনেক রকমের সুযোগ সুবিধা ও আনন্দ লাভ করতাম, যাকে বেগে ও যার সঙ্গে কথা বলে আমার প্রশ্ন ছিল, যাকে নিয়ে হুঃ-হুঃ-এ আমার জীবনের একটা নির্দিষ্ট রকমের 'প্যাটার্ন' পড়ে উঠেছিল এবং সেই প্যাটার্ন অস্থায়ী আমার জীবনযাত্রা একটি নির্দিষ্ট স্বাক্ষরযুক্ত দ্বারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছিল, হঠাৎ একদিন সেই লোকটি চলে গেল, জীবনের অভ্যন্তর সেই প্যাটার্নটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, আমার অভ্যন্তর জীবনযাত্রায় একটা স্বাভাৱিক রকমের ছেঁদ পড়ে গেল, প্রতি পদেই সেই অভ্যন্তর জিনিসের অভাব বেধে করতে লাগল—তাইই এত কষ্ট। এর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে আর্যের প্রকৃতিই রয়েছে অনেকখানি। সেই লোকটি চলে যাওয়াতে আমার নিঃশেষই অশ্রুত ক্রান্তি হয়ে গেল, নিঃশেষই আস্তে যা লাগল, তাইই এত কষ্ট। পৃথিবীতে থেকে অনেক রকমের অশ্রুবিধাই সওয়া যায়, কিন্তু একেবারে নিজস্ব স্বাভাবিক কষ্টকে কেউই সহ্য করতে পারে না। প্রিয়বিরহে আমাদের নিজস্ব ক্রান্তিই হয় অত্যন্ত বেশী। সেই ক্রান্তির মাত্রাটা আমরা যতই অল্পের অশ্রুত করতে থাকি ততই বেশী কাতর হয়ে পড়ি। বেগানে পার্থিব বিষয়ের কোনো ক্রান্তি না হলেও শুধুই প্রেমের অভাবে আমরা কাতর হই, সেখানেও এই একই কথা, সেটিও আমার ব্যক্তিগত জীবনের আঞ্চলিক অভাব ছাড়া অশ্রু কিছু নয়। একজনকে ভালোবাসা গেলে আমি খুবই আনন্দে ছিলাম, নিজেকে অশ্রুত অশ্রুত তারই যাত্রা পরিচালনা করছিলাম, এমন থেকে সে পরিচালনা আর মিলবেনা, তাইই প্রেমাস্পদের বিরহে আমি কাতর হই।

বস্তুত, নিজের জীবনের সার্থকতা কেবল নিজেকে নিয়েই খেলেনা। এমন একজন অপর ব্যক্তি আমার জীবনে থাকে চাই যার সাহচর্য ও সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত জীবন সার্থক হতে পারে। তার কারণ আমার নিজের মধ্যে কোন ভগ্ন, কোন সৌন্দর্য, কোন মহামুদ্রা রয়েছে বনি লুকানো আছে, তার কিছুই আমি নিজেকে জানিনা। অপর কেউ একজন যখন সেই বনি খুঁড়ে বের করে দেখিয়ে দেয়, যখন সে আমার

মনো একটু কিছু অস্বাভাবিক হুঁম বের করে, তখনই আমি তার সোপানে নিজেও ভালো করে ভাবতে পারি। তার ভালোবাসার স্পর্শ পেলে তবেই নিজেকে ভালোবাসতে পারি। জীবনে মাত্রই তাই এখান। হয়ে টিকতে পারেনা, দেখা তাকে হতেই হয়। ব্যাভাব্য না ভেবেচি কি, এইচ, লেটেল একে বলেছেন—*twoness*। তিনি বলেছেন এই *twoness* আমাদের প্রত্যেকের গায়ে নিহিতই পরকার, হৃৎকণ পর্বত *oneness* হয়েচে, যাকে আমরা বলব ঐক্য বা একলন্দে হয়ে থাকে। হৃৎকণ পর্বত আমাদের জীবনই বার্থ। অনেক সাধুগা মগের মগ ছেড়ে নিত্যম একলা হয়েই থাকেন হটে, কিন্তু বাস্তবিক তাঁরা একলা থাকেন না, ভগবানকে বা ঐক্য কোনো কিছু উপস্থিতিকে তাঁদের অপ্রচুরের সাধী করে নে। তাতেই তাঁরা মগ হয়ে থাকেন।

স্বপ্নের বা সন্ধ্যাসীলের কথা বলত, কিন্তু সাধারণ জীবনে মগের মগে আমাদের আপন জন অথবা আত্মিক প্রিয়জন কেউ থাকেই। এমন কেউ থাকে চাই হার অথবা আমার ভক্ত সত্যিকার মনে আছে। সেই প্রিয়জনকে নতুন ধরন আমাদের কাছে থেকে হিনিয়ে নিয়ে যায়, তখন বেন আমাদের নিম্নে ছাপিটাই ছিড়ে যায়, তখন আমরা কাতর না হয়ে পারি না। তার কারণ, সে যাওয়ার আগে আমাদের নিজেকেই অত্যন্ত রক্তমে হারানো। আর কে আমাদের আমার উপভুক্ত মূল্য দেবে, কে আমাদের চিনবে বুকে, আমাদের ভালো-বাসবে? সেই প্রশ্নের সত্যিতে নবন যে সর্বহারা অবস্থা হয়, তাইকেই বলে শোক। এই শোক নিয়ে কবিতা কত রকমের কাব্য লেখেন, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার উভয়ের বিয়োগ্য সাহিত্য রচনা করেন। এই শোকের প্রচণ্ড আবেগের ব্যক্তন স্বত্বকে তাঁরা অভিশপ্ত করে, বিখ্যাতকে পর্বত তাঁরা কমা করেন না। প্রিয়বিরহের বরণ যে কত মনোহর, নিষিদ্ধ মন্ত্রা অচরণ যে কতই নির্মম, তা তাঁরা তাঁদের লেখনীর তেঁরে অতি বিপদ করে ছুটীর ভোলেন। যে নিরতি মায়ের কোল থেকে তার একমাত্র শিশুকে অকালে হিনিয়ে নিয়ে যায়, শরীর বুক থেকে তার জীবনের একমাত্র লগন বানীকে কেড়ে নিয়ে যায়, তাইএর কাছে থেকে তাইকে আর বছর কাছ থেকে কিছুকি অকমাং ছাড়িয়ে নিয়ে যায়, সেই গুণঘাতকের অতীত ছুরির আঘাত যে কতই নিম্নাক তা কবি ও সাহিত্যিকদের রচনার মধ্যে অতি উজ্জলভাবে চিত্রিত হয়। পঠকেরা সেই সব বিয়োগ্য রচনা পড়ে নিজের অঙ্গ সংবরণ করতে পারে না। তার কারণ সকলেই হৃৎকোণী, সকলেই এর সঙ্গে নিজের নিজের অম-

বিতর কিছু ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। নিমিষ্টা কিছু সেই একই, প্রিয়জনের বিয়োগে নিজের জীবনের এক সমুদ্র স্রোত। প্রত্যেকেই তাই বুকতে পারে যে অপর কারো এই ধরনের শোক উপস্থিত হলে তার অতরে ভক্তধর্মি বাবা লাগে।

শোকমাত্রই অপরোদয়ায় স্তব্ধ চার। সেই কারণে শোকসমুদ্র মাত্রই কখনো চূর্ণ করে থাকতে পারে না, সে কাহাণীক করতে থাকে এবং নানা ভাবে শোক প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। মেয়েতো তাইকেই, পুরুষও কী। তার মানে এই যে—তোমরা পাঁচজন সে, আমার ভক্তধর্মি সেগেচে, তোমরাও তাতে একটু কাতর হও, একটু 'আহা' কলো। এ মনোভাব অস্বাভাবিক। কিন্তু কেউ কেউ শোককে একবারে চেপে যায়, বাইরে কাউকেই দেখতে বা ভাবতে দেয়না যে তার শোক লেগেছে। আমরা নিজের মনের দুর্বলতা আমি বাইরের লোককে ভাবতে দেব কেন? এ মনোভাব অস্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক।

হরয়ের অতি নিকট-সম্পর্কীয় নিত্যম প্রিয়জন মারা গেলে তার থেকে যে কত রকমের মনোভাবিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে, অমোহিতানা মনোবিজ্ঞানী তাই নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। অতিরিক্ত গভীর শোক লাগলে মাতৃশোক এমনই বিকল করে ফেলে যে তখন অনেক মূল্যে চিকিৎসকের কিংবা মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নেবার দরকার হয়ে পড়ে। ওই থেকে কারো বা সৈনিক আর কারো বা মানসিক রোগ পর্বত হয়ে যায়। কেউ বা মৈত্রিক নানাতপ বাবা-বেগনা ভোগ করতে থাকে, কারো বা মেয়ে প্রমোহের স্রোত হয়, কারো বা বৃকের রোগ অথবা ব্রাহ্মপ্রণায় স্তব্ধ রোগ অথবা ডায়েটিস রোগের স্রোত হয়। অপরশকে কেউ বা সখি হারিয়ে আত্ম-হত্যা করতে যায়, কেউ বা বৃত ব্যক্তিকে সর্বদা চোখের সামনে দেখতে থাকে এবং ভয় পেয়ে অন্যাহারে অসিত্রায় যির কাটাতে থাকে, কেউ বা নিজেই অপরাধী মনে করে আত্মদানি ও অপ্রশোচনা হা-হুতাপ করতে থাকে, কেউ বা আত্ম নানাতপ অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে।

এই সকল অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া অনেকের বেলাতেই অপ্রতির প্রাথমিকের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ অথবা কয়েক মাস পর্যন্ত চলেতে থাকে। কিন্তু এগুনি প্রায়ই স্থায়ী হয় না, কিছুকাল পরে ধীরে ধীরে আপনাই এর উপশম ঘটে। এরূপ শোকার্ত ব্যক্তির প্রথমটায় অত্যন্ত বেশি বিচলিত হয়ে পড়লেও, ক্রমে বাস্তব জীবনের সঙ্গে ভিতর ও বাইরের বিক ঘিরে তাঁরা নিজেদের একটা সামান্য করে নিতে সক্ষম হয়। ভিতরের মনোবেগ ও ভাবোচ্ছাস বাইরে দৃষ্টে পরিমাণে

অভিযাক হতে থাকায় তার প্রথম কোঁকড়া ভিত্তি হয়ে আসে, বিদ্রোহ প্রকাশের বেনুটা তখন নব্ব হয়ে আসে। স্বতরাং প্রথমটায় অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা গেলেও, পরে তা আপনাই স্বাভাবিক হয়ে যায়।

কিন্তু কারো কারো হাতে আবার উন্টো বকয়ের প্রতিক্রিয়া হয়। কোনো বিশেষ কারণে তারা শোকটিকে স্বাভাবিকভাবে বাইরে প্রকাশ করতে না পেরে তাড়াহাড়ি তাকে ঘন ক'রে ফেলে। জগতের নিপুণ উদ্ভাস বাইরে বেরিয়ে আসবার কোনো উৎস না পেয়ে ভিতরের দিকে ঠেলে মারে, এবং তার ফলে নানাতরঙ্গ স্বাধী বিকারের স্রষ্টা হয়। কেউ বা ঘনে ঘনে একটা দুর্ভাগ্য অভিমান নিয়ে সারা জগতের উপর বিরক্ত ও বিদ্‌যু হয়ে ওঠে, সর্বদাই মনের মধ্যে একটা রাগের ভাব পোষণ করতে থাকে, সব-কিছুতেই তারা বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট। জীবন তাদের স্বধনো অধ্বংস হয় না, তারা নিজেবাও অনেক কষ্ট পায় আর অন্যরকেও অনেক কষ্ট দিতে থাকে। কেউ কেউ আবার সেই মৃত ব্যক্তিকে মনের মধ্যে জীবিতের মতো ছোঁয় করে ঝাঁকড়ে ধরে থাকে, সে ব্যক্তি যারা গেলেও নিজের মন থেকে সে কিছুতেই তাকে মরতে দেখেনা। তার মৃত্যুকে নানা ভাবে সর্বদা নিজের সাধী ক'রে রাখে। তাকে আর চোখে দেখা না গেলেও, তার ছবি অথবা প্রতিমূর্তির উপরে বেন অস্তরের সমস্ত আগ্রহকে সর্বদা উদ্‌যু করে রাখে। জীবনের শখে তারা গতিহীন হয়ে এখানেই ঐ একই অবস্থাতেই সারা জীবনের জন্ত আটক থেকে যায়। এও কোনো মানুষের পক্ষে বাৎসর্য নয়, কারণ জীবন যানাই নিত্য এগিয়ে চলে, কোথাও আটকে পড়ে থাকে না।

এগুলি ছাড়া অনেকের শরীরেও নানারকম রোগের স্রষ্টা হতে পারে। শোকাহত ব্যক্তি মনে করতে থাকে যে জীবনের কারবায়ে আমি বেউলিয়া হয়ে গেছি। যে মূলধন নিয়ে আমি জীবনের কারবারে নেমেছিলাম সেই মূলধনটাই আবার খোঁয়া গেল। অতএব জগতে আবার কিছু ন্যূনাই রইল না, কোনো কাছই রইল না। এই ভাবটি গ্রীক সভ্যনে নয় কিন্তু অজ্ঞানে অসচেতনের উপর ক্রিয়া করতে থাকে। তারই ফলে ক্রমে ক্রমে দেহের ও মনের বাধ্য নষ্ট হয়। এতে বিশেষভাবে দেখা দেয় ভিস্‌পেপিয়া এবং কোলাইটিস নামক রোগ (আমশা রোগের স্রাব নিয়ন্ত্রণের পীড়া)। রোগী সারাজীবন এতে কষ্ট পেতে থাকে, কিছুতেই এ রোগ সারানো যায় না।

অন্য রোগী নিজে জানেনা যে কিসের থেকে এই 'ক্রমিক' রোগের স্রষ্টা হলো। আমেরিকার মনোবিজ্ঞানী বিশ্লেষণে অসুস্থজ্ঞান ক'রে দেখেছেন যে যারা ঐ ধরনের মনোবিকার বা

কোলাইটিস রোগে 'দুগ্ধ', তাদের মধ্যে শতকরা মাত্রই মনের রোগের স্রবপাত হতেছে কোনো প্রিয়জনের 'আকস্মিক মৃত্যুর পর থেকে। সে সময়ে তারা বাহ্য শোকে বিশেষ কাতর হইনি, যে-কোনো কারণে শোককে তারা ঘন ক'রে ফেলেছে। মনোবিজ্ঞানী তাদের চিকিৎসা করতে দিয়ে নেইসকল পূর্ব-মৃত্যুকে উত্তরমুখে ঝাণিয়ে তুলেছেন; তাদের অধমকার শোকের মনোভাবকে নতুন ক'রে উদ্‌দীপিত ক'রে তুলেছেন এবং ঐভাবে সমস্ত পূর্বকথা অরব হয়ে যাওয়াতে তারা আবার নতুন ক'রে শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছে। এইভাবে তাদের মনে নতুন শোক ঝাণিয়ে তোলায় ফলে রোগের চেয়ে শোকটাই প্রবল হয়ে উঠেছে, এবং তাতেই তারা রোগ থেকে অনেক আত্মগোপন করেছে। যে শোক এতকাল অচেতনের মধ্যে গমিত হয়ে ছিল, তা এখন গোলা পথ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, এবং তাতেই তারা অধিকাংশই অস্থ হয়ে উঠেছে।

তাহলে শোকের দ্বারা বাত আশ্বাসের ভবিষ্যতে কোনো অনিশ্চি না হয়, তার জন্ত কেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত?

প্রথম কথা, শোককে আপনো নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়। এখন যেমন শোকের প্রকৃত অবস্থা এখন তাকে সেইভাবে পুরোপুরি অভিযাক হতে দেওয়া উচিত। অতিবয়ো প্রিয়জন দ্বার চলে গেছে, জগৎদ্বার মৃত হয়ে গেছে, প্রিয়বিত্তীন, জগৎ তার কাছে অদূর বিখ্যা মরীচিকা, সে এখন চারিদিকে অন্ধকার দেখছে, অন্ধরে তার হাছাকা র ভাগেছে, হৃৎকর মধ্যে কেবলই তার কান্না ঠেলে উঠছে। সেই কান্নাকে কি জোর ক'রে চেপে দেওয়া উচিত? শোকে মনে করে যে কেই কান্নাকাটি করতে থাকলে শরীরের তাতে অনিশ্চি হয়। এটি খুবই ভুল কথা। জগতের বেদনা ও উদ্‌ভাসকে বাইরে বের ক'রে দিতে পারলে স্বধনই কোনো অনিশ্চি হয় না, বরং তাতে ভালোই হয়। মনের ভার অনেকখানি হালকা হয়ে যায়। এ অভিজ্ঞতা সমস্তেরই আছে। কান্না গেলে কান্ডে কোনো ঘোষ নেই, কোনো লক্ষ্য নেই। ধরা সভা ও শিক্ষিত ব্যক্তি তারা মনে করেন যে চোখের জল ফেলা দুর্বলতার পরিচয়, এটুকু মনের জোর থাকা উচিত যাতে চোখ দিয়ে জল না গড়ে। কিন্তু এমন মনের জোর বেরিয়ে কোনো লাভ হয় না, সাধারণপক্ষে বরং অনিশ্চিই হয়। বিক্ষিত শোকেও শোক গেলে জেলেমাগধের মতো বৈদে ফেলুক, তাতে কান্টা তাদের তাড়াহাড়ি হালকা হয়ে যাবে। প্রিয়জনের বিরহে কেউ শোক প্রকাশ করতে থাকলে বহুস্বাধবো এসে তাকে নানা ভাবে সাধনা দেয়; বলে—

যে গেছে সে গেছে, যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেছে, সকলকেই এমনি যেতে হবে, জীবন অনিত্য, তার জগৎ আর শোক ক'রে লাভ কি, ইত্যাদি। কিন্তু ওতে শোকেরই জন্ম সাধনা পায় না। বরং যারা ঐসব তত্ত্ব কথা বলতে তাদের প্রতি বিতর্ক হয়ে ওঠে। তখন উদ্ভব পাশোয়ার সম্মত হয়, তার বলে বরং মন খুলে একটু সম্মেলনা ও সহযোগিতা প্রকাশ করাই উচিত। মৃত্যুজন্মের ওপাশীয়া কথা উল্লেখ করা, তার বিয়োগে যে প্রকৃতই অনেক ক্ষতি হলেও তাই ভাঙতি বাস্তবতা, এতেই বেশি কাজ হবে। বহু-বাহুব ও অসীম-স্বপ্নের কাছে ভিতরের শোককে অবশেষে উদ্ভুক্ত করে দিতে পারলে তার প্রবণতাই হুতাশাতি অনেক-খানি মিথশ্চর্য হয়ে যেতে পারে। এই হলো মনস্তত্ত্ব। নিজের মনের ভিতরকার শোককে হৃদয় বাইরে বাস্তব করা যাবে ততই তা রূপ লাভ হয়ে আসবে। সুতরাং শোকেরই কাতরোক্তিগুলি বহুবাহুবের পক্ষে বৈধ নয় বরং গোমাই উচিত।

কিন্তু বিতীর্ণ কথা, শোককে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ হতে দিলেও তার অতিরিক্ত বেশি বাস্তবায়িত হতে দেওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ এমন হতে দেওয়া উচিত নয় যে, শোকেরই বাস্তব শিল্পের পর দিন কেবল তার শোক নিয়েই নিমগ্ন থাকবে, কর্তব্যকর্মে অবহেলা করবে। তার প্রিয়জন চলে গেলেও তাকে কিছু পৃথিবীতে থেকেই যেতে হবে, হয়তো সান্নিধ্যের হয়ে তাকে একাই থাকতে হবে, যে অবস্থা তার গাঁড়ালো ওর মনে সাময়িক করে নিয়েই তাকে চলতে হবে। সুতরাং শোকের ভিতর দিয়েও তাকে গোড়া থেকেই সকল কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। এই কারণে সকল যেন সকল পদেই মৃতের উদ্দেশে নানাব্যকম প্রাণত্যাগের ব্যবস্থা আছে। যে দলভারে বেশি নিকটজন ও প্রিয়জন, বিশেষ করে তারই সেই সব সত্য্য করণীয়। মৃতের আত্মার স্মৃতির উদ্দেশেই সেগুলি অগ্রসৃত হয়। কিন্তু তা ছাড়াও ওতে এই বিশেষ উপকারটি হয় যে, শোকেরই ক্ষতি-নিরূপণ হয়ে না থেকে আশ্রয় সাময়িক কর্তব্যের প্রতি অবহিত হতে বাধ্য হয়। শোক পরেও উপস্থিত করণীয়ের প্রতি তাকে মনোযোগ দিতে হয়। এতেই শোকের আগ্রন স্বাভাবিক উপায়ে বীরে বীরে অনেকটা চাপা পড়ে যায়।

অতঃপর কৃতীয়া কথা, মৃত্যু হানকে ভরাট করার প্রচেষ্টা। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গুত্বের কারণে ঠাকুরা বাবলোই সে-জীবন স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। তার থেকে নানাব্যকম স্বাভাবিকতার উদ্ভাবনা হয়। অবশ্য যে ক্ষতি হয়ে গেছে

তার আর কিছুতে পূরণ করা যাবেনা, জীবনের যে প্যাটার্ন নষ্ট হয়ে গেছে তা আর মেহামত করা যাবেনা, যেখানে একটা জিনিস ভেঙে গেছে সেখানে আর তা কোড়া লাগবেনা। কিন্তু তবু বো জীবনের কান চালাতে হবে, কারণেই একের বদলে অল্প এক নতুন প্যাটার্ন সেখানে পড়ে তুলতে হবে। এবং তার জগৎ বাস্তবের অগতে অনেক রকমের স্বাভাবিকতা আছে।

প্রকৃতি যেমন একদিকে আঘাত দিতেও জানে, তেমনি আবার অন্যদিকে তার বাধা দ্বারা তার গুণ দিতেও জানে। শোকের একটা বোকা স্বাভাবিক উপায় স্বাভাবিকভাবেই নিজে আশ্রয় ঘরের মধ্যে বা অন্তরের মধ্যে একভাবে আবদ্ধ হয়ে না থেকে চারিদিকে চোপ চেয়ে একটু খুঁজে বেড়াতে হয়, তাহলেই সে গুরুত্বের সন্ধান নিলে যায়। তখন প্রায়ই দেখা যায় যে খুব দারী জিনিস যদিও একটা হারিয়েছি বলে, কিন্তু তার বদলে যে নতুন একটা জিনিস পেয়ে গেলাম তাও নিতান্ত কম দারী নয়। পুরোনো ক্ষতিটা আবার মিটলনা যত, কিন্তু নতুন এমন একটা কিছু ছুটে গেল, যা নিয়ে জীবনের মোতের অঙ্গুত্ব আবার নতুন স্বাভাবিক এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এই কারণেই অনেকে প্রীতিস্বপ্নের পর বিতীর্ণ-শোকের বিবাহ করে। অগতের কোনো কোনো দেশেই তা নিম্নলিখিত নয়। কেবল আমাদের দেশেই তার নানাতরপ নিম্না করা হয়। বিশেষত কোনো বহু-ব্যক্তি যদি বিতীর্ণতার স্বপ্নসিঁদুর করে তবে তাকে বিবাহস্বত্ব ও স্বাধীন ও স্বাভাবিক বলে খুবই বিতর্ক করা হয়। কিন্তু এ বিতর্কের কোনো অর্থ হয় না। পৃথিবীতে যেকোনো থাকতে হলে পৃথিবী সামনে তার একটা নিবিত্ত থাকে চাই, একটা কিছু আকর্ষণ থাকে চাই, নতুবা জীবন যে দুর্ভব হয়ে উঠবে। লোকের নিম্না এভাবেই স্বপ্ন আশা ও উদ্ভব বিবাহ নিয়ন্ত্রণ জীবন ধারণ করতে থাকে খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রত্যেকেরই জীবনের সম্ভাব্য তার আশ্রয় ব্যক্তিগত সম্ভাব্য, তার স্বাভাবিক উপায় তার নিজেদেরই করে নিতে হবে।

যে যা নিজের সন্ধানকে হারিয়েছে, তার যদি আর কোনো সন্ধান না থাকে, তবে সে অন্তরের সন্ধানকে নিজের সন্ধান বলে গ্রহণ করবে। মা-হারা বিতর্কের বা স্বপ্নের ছেলোমেয়েদের তার নিয়ে সেই দিকে-মনকে নিযুক্ত রাখলে তাদের পক্ষে আরো ভালো। আমাদের দেশের পতিতারা বিবাহের পক্ষেও ঐরকম কোনো মেয়ের ও ভালোবাসার পাতা ছুটে যেতে পারে। পতির অভাব তাতে পূরণ হয়না একথা তো নিশ্চয়ই। কিন্তু

সেইর একটা ইচ্ছা নষ্ট হয়ে গেলে আমরা অল্প ইচ্ছা দিয়ে তার কাছ চালাই। তখন চাইতে পারি কাটা গেছে সেটা হাত দিয়েই তখন হাতের কাছ চালায়ে নেই। দার হুই চোখ গেছে সে কানের দ্বারা ও স্পর্শক্রিয়ের দ্বারা চোখের অভাব দূরীত্ব পায়ে পুনিবে নেই। দ্বারা হাত-কাটা হুই তার কেবল চোখের দ্বারাই অনেক কিছু বলতে এবং বুঝে নিতে পারে। এখানেও যেমনি একটর অভাব অল্পটি দিয়ে পুনিবে নেওয়া যায় এবং তাই করাই উচিত। তার অনেক রকমের উপায় আছে। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায় গোপালের মাচের কথা আছে। তার তিন হুই কেউই ছিল না। কিন্তু সে কেমন করে একটি গোপাল ভূট্টের নিয়েছিল, তাই নিয়ে সর্বত্র সে পরমানন্দে থাকতো।

এখানে আরো একটি কথা, মাতৃ বা পিতৃহারা ছোটো ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে। অনেক বলে যে মাতার কিংবা বাবার মৃত্যুর সময় ছেলেমেয়েদের সেখানে থাকতে দেওয়া উচিত নয়, কিংবা তাদের সে কথা জানতে দেওয়া উচিত নয়। তারা সেই শোক সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু এও ভুল পরামর্শ। তারা যেই কোমলমতি হোক, তাদের সন্তানের মৃত্যু হতে দেওয়া উচিত। মৃত্যু যখন তারা মিত্রদের বাপ-মাঝে চোখে দেখতে পারে না, কিংবা তাদের অঙ্গপরিচিতি সম্বন্ধে জানা কথা শুনে, তখন তারা মনে মনে মানসিকভাবে ভাব পারল গড়ে নিতে পারে, এবং তাই থেকে তাদের মানসিক অস্বাভাবিক ও বিচল হতে পড়বে পারে। সবচেয়ে মেনে নেওয়াই সবচেয়ে প্রচেষ্টা পথ।

যুগে যুগে সুপরিচিত...



অনাহীত কাল থেকেই 'নিম্ব' এর অত্যাশ্চর্য পান-নিগারক ও প্রতিষেধক গুণাবলী ভারতবাসীর কাছে সুবিদিত। নিম্বের এই সব গুণমাত্র গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য নিম্ব টুথ পেস্ট-এ পুনরাবৃত্ত বর্ধমান থাকায় এর উপকারিতা অগাধ। তা ছাড়া আধুনিক গবেষণামূলক গাঢ় ও মার্জিত উৎকর্ষশীল শ্রেষ্ঠ উপকরণগুলিও নিম্ব টুথ পেস্টে সংমিশ্রিত আছে, কারোই অল্প কোমল টুথ গেটের দ্বারা নিম্ব টুথ পেস্টের তুলনাই হয় না।

নিম্ব টুথ পেস্ট

Neem TOOTH-PASTE
Alchemia

একটি "ক্যালকেনিও" অবস্থান

1/54 37

সর্বসিদ্ধিপাতা

ঐবিনয়েরজ্ঞান মজুমদার

তৌনে আমার ঘুম হয় না। পূজার ছুটির পর সেবারে কলকাতার ফিরবার পথে ভোরবেলা বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বস দেখলাম ভূর্ণাপ্রতিমার মহিলাস্বর আস্ত হতে আনাকে হুঁ মারছে। ঘুম চেতে গেল—জরে ভয়ে চোখ বুজে দেখলাম—মহিলাস্বর না হলেও, প্রায় মহিলার মতোই ঘনকৃক বিগাটবগু এক ডব্রলোক হাত দিয়ে আমাকে ঝেঁপেছেন,—“ভোর হয়ে গেল, আর কত ঘুমবেন মশাই—একটু জাগো দিন, বসি।” উঠে তাকাতাড়ি বিছানা ওঠিয়ে ডব্রলোকের বদলার জাগো করে দিলাম। হাতের ব্লাজমেন্ট-বাগাট পাশে রেখে ডব্রলোক বললেন—বাইরে চলে বেরলান অভাগ স্টেশন।

ঘন থেকে চাকরটী খুলে ব্যাগের উপর রেখে ডব্রলোক পাকারি বোতাম দুগতে আরম্ভ করলেন—আমি মাখন-দুপল নিয়ে ব্যবসাসে দুপলাম। ঘুম ঘুমে বাইরে বেরিয়ে সামনের দিকে চেয়ে যে-দিক দেখলাম তাতে আমার অবস্থা মরাকবি কানিধাস কণর খরলোও বর্ণনা করতে পারতেন কিনা! সকেছ, নিবকে দেখে পার্বতীর ‘ন বকৌ ন তমৌ’ অবস্থা এর তুলনায় কিছুই না। আমার অবস্থা দেখে ডব্রলোক কালো কালো ঝাঁত দাব করে হেসে অভয় দিয়ে বললেন, “অবাক হবেন না—খির হয়ে বহন। যা দেখছেন, এ এক-আবদিনে সত্ত্ব হযনি—শাকা পঁচিশ বছরের সাধনার ফল।”

না, অবাক হব কেন? কলকাতার ফুটপাথে সর্গাকে গমন-পথ্য বীলোক দেখেছি—সম্রাতি দেওদরে পৌঁগেগাছে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত পৌঁগে কলেছে দেখে এলাম—তাতে যদি অবাক না হয়ে থাকি তো, কেউ যদি সখ করে দিকি ঠিকি থেকে আরম্ভ করে পাঁচ ঠিকি পর্যন্ত শান্তিনেক কবচ-মাহুলি সর্গকে ধারণ করে চোপের সামনে থালি গারে বসে থাকেন তাতে অবাক হবার কী আছে। বাঁচি থেকে ফিরবার পথও এটা নয়, কালেক্ট সাহস করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলাম।

ডব্রলোক বারকরক আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “মশায়ের কী করা হয়?”

তৌন চলতে আরম্ভ করেছে—বথাসাম্য বাইরের দিকে চোখ রেখে উত্তর দিলাম, “বৎসাম্যাক চাকরি করি।”

“ঐ বৎসাম্যাক চাকরিতে অসাম্যাক হয়ে উঠত যদি একটা

‘সর্বসিদ্ধিপাতা কবচ’ ধারণ করতেন।’ হযতো বিবাস করবেন না, কিন্তু এ আবার নিজের অভিজ্ঞতা, মশাই। তা’হলে শুধুন—” নড়েচড়ে বসে পৌঁগে একবার হাত দুদিয়ে ডব্রলোক বললেন, “হুঁচড়োর উকিল সর্গের আমার পিসির দূর-সম্পর্কের দেওদের ছেলে, সর্গেরের দেব ছেলেটি ম্যাট্রিক পাস করে বসে আছে—চাকরি হয় না। সেবারে কলকাতায় এসে ধরে পড়ল—‘এত হোমরা-চোমরা লোকের সঙ্গে তোমার পড়িচ—বাও-না! বিজ্ঞান-বা ছেলেটার বাহোক একটা ছিলে করে।’ কাকে খোসামোদ করতে যাব মশাই—দিলাম একটা ‘সর্বসিদ্ধিপাতা’ আনিরে, ছেলেটা একবারে বাকে বসে গবেট-বার্কা—তুঁ তিন খাস যেতে-না-বেতে সত্তরটাকা মাইনের একটা চাকরি পেয়ে গেল। গোড়াতেই সর্গেরকে বলেছিলাম—জায়া, কিছু বেশী বরচ কর—একটা একটু-শেশাল আনিরে দেই। কিন্তু সে দিলে না—বললে, ম্যাট্রিক-পাস ছেলে—বেশী আর কী হবে। আরে বাণু, ম্যাট্রিক-পাস তো কী হয়েছে? দৈব যদি সহায় হয়, ঐ গবেট ছেলেই যে পাতশো টাকা মাইনে পাবে না, এমন কথা জোর করে কেউ বলতে পারে? আর এইজন্তই পায়ে বলেছে—ন চ দৈবাণু, পরম বলম্। ও মুক্তমিই বসুন আর খোসামোদই বসুন—দৈবের চাইতে বড় বল আর নেই, আর এমন যে-দৈব তাকেও বেঁধে ফেলা যায় এই কবচ-মাহুলি দিয়ে—তবে হাঁ, ঠিক-ঠিক জিনিষটি পাওয়া চাই।”

“কিন্তু দৈবকে কি সত্যিই বেঁধে ফেলা যায়?”

বিরক্ত হয়ে বিজ্ঞানবাহু বললেন, “বায়না মানে? তবে কবচ ভিকা করতে ইজকে ছুটে আসতে হ’ল কেন কর্ণের কাছে? অমন যে ইজ চজ বাহু বরশ, তজা বিকু মাহেবর পাণ্ডবদের সহায়, তবু কি কর্ণের কিছু করতে পেরেছিল? কবচটি বাওবা, আর তিনদিনের মধ্যে মুক্তমূল লাক।”

“কিন্তু আমরা তো এতদিন জ্ঞানতায় কর্ণের কবচের মানে বর্ষ।”

“তা তো জানবেনই। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—আমের লম্ব কর্ণের গায়ে যে কবচ ছিল, সেটা কি ধবায়ের? তা নয় তো, বরশ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যেত কি করে? তা নয় মশাই—সেটা এই এখনকার মতো কবচই ছিল—এহরাক সর্গের দেওয়া কিনা, সেইজন্ত অত জোর। কিন্তু মূখ্য কী

জানেন—বৈদ্যনাথ মহাভাগবতে এত কথা লিখে গেলেন আর ওই কবচের মরটি লিখে যেতে তুলে গেলেন। উঃ, কী অভিজ্ঞতা করে গেলেন বলুন তো—ওটা জানা থাকলে কি আঁটা ভরনা ছিল? কিন্তু আমিও ছাড়িনি, যশাই—এই নিয়ে আজ ক'বছর গবেষণা করছি—ভেবেচিন্তে একটা সিদ্ধান্তও করে ফেলেছি—স্বর্গদেবের দেওয়া কবচ যখন, যোধ হর 'বহান্নাভও'ই ছিল। গোষ্ঠাকর্তক তৈরি করিয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে।”

“এ বিষয় নিয়ে আপনি অনেক চিন্তা করেছেন—সেখছি! আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—পুণিবীতে এই যে কোটি কোটি মানুষ আছে, তার মধ্যে কে একজন মেম্বারীতে কিংবা ধ্বংসিতে বসে একটা রতিন পাথর কি একটা কবচ ধারণ করলে আর সঙ্গে সঙ্গে এহেববতার কৃপাটি তার উপর পড়ল—এটা কি করে সম্ভব হয়।”

“কেন হবে না—এ তো নিত্যই চোখের সামনে হচ্ছে। আপনারা মর্ডান হয়েছেন—এসব দেখবার চোখও নেই, দৃষ্টিবাহ মনও নেই আপনারদের, আবার পুরানো কিছু সহজে বিশ্বাস করতেও চাইবেন না। আচ্ছা—একটা আগুট্ট-মর্ডান পৃষ্ঠা দেখে, তাহলে ঠিক বুঝতে পারবেন। মনে করুন, আপনার বাচ্চী শতুস্তলা দেবীর জামাঘোষে আপনার ও আপনার মতো খারাপ তার ভক্ত তাদের নিমন্ত্রণ হয়েছে। সকলেরই ইচ্ছা উৎসবের দিন শতুস্তলার পুটিটা মেনে তার উপর একটু বিশেষভাবে পড়ে। চেষ্টার সস্ত নেই—ওর মধ্যে আপনি আবার একটু বিশেষ উজোষ্ট—খবর নিয়েছেন আপনারদের বাচ্চীর ‘মড’ রঙটা ভারী গছন্দ আর ‘মেরে দিলকে পিরারী’ গানখানা শুনে তার চোখ বুজে আসে, মুখে হাসি কোটে। উৎসবের দিন হাতে একগোছা মড-রঙের চন্দ্রমালিকা নিয়ে ঐ রঙের একটা পাঞ্জাবি গায়ে মডায় হাক্কির হয়ে আপনি যদি সিনেমা-চত্রে ‘মেরে দিলকে পিরারী’ গানখানা গেয়ে দিতে পারেন—তাহলে বলুন কতজন তো, শতুস্তলার নজর সেদিন কার উপর বিশেষভাবে পড়বে?”

“কিন্তু সকলেই যদি ঐ একই রকম করে?”

“অসম্ভব। সকলেই ও-ধরনের পাবে কোথা থেকে? বড়জোর তিন কি চারজন হয়তো কোনরকমে জানলেও জানতে পারে। শতুস্তলা দেবী মানবী—তার স্বমত। কয়—তাহলেও আপনারদের মতো তিন-চারজনকে তিনি একসঙ্গে স্বাক্ষরে তিন-চারবছর সামলে রাখতে পারবেন; কিন্তু এহেববতারের ক্ষমতা অসীম, তাঁরা ওরকম লাখ-লাখ লোককে একসঙ্গে অহুগ্রহ করতে পারেন।”

“আচ্ছা, এই লাখ-লাখ লোকের মধ্যে হুঁ-একজন যদি একই বিশেষ অহুগ্রহ প্রার্থনা করে—তার কি কোনো ব্যবস্থা নেই?”

“নিশ্চয়ই আছে। মনে করুন, আপনারাও ঐ তিন-চার-জনের উপর একসঙ্গে শতুস্তলার অহুগ্রহ পড়ায় আপনি খুশী হতে পারছেন না—আপনার একই বিশেষ চাই। বেশ, আপনার বাচ্চীকে নিমন্ত্রণ করে একদিন চৌরঙ্গীর কোনো হোটেলের ডালো করে বাইরে বিন, সেট ভর্তি থাকলে মন খুশী থাকবে, তখন নিজের গাড়ি যদি না থাকে, ট্যাক্সি করে তাঁকে নিয়ে চলে যান লেকে কিংবা বটানিকাল-গার্ডেনে, সেখানে পাশাপাশি বেড়াতে বেড়াতে বালা-সিনেমার নাচক-নাটিকার মতো এ-গাছের ডালটা একটু টানতে-টানতে, ও-গাছের গুটো। পাতা ছিঁড়তে-ছিঁড়তে শুনিবে মিন তাঁর শ্রিয় গানখানি—ব্যাং, শতুস্তলা দেবীর মনের খাতায় আপনার নামটি লেখা হয়ে যাবে সকলের উপরে। এহেববতারের বেলায় এরকম কয়কো বসে পুরস্চরণ। থাকে আপনি খুশী করতে চান তাঁকে আবাহন করে, সামনে ডালো করে নৈবেদ্য সাজিয়ে বিন—হোষ করে থি বাইরে তাঁকে খুশী করে মিন, তারপর তাঁর শ্রিয় মরটি ভূর্জপাতায় লিখে কবচে ভরে ধারণ করুন—বেগবেন শতুস্তলার মতো এঁরও বিশেষ নজর পড়বে আপনার উপর।”

“হী, এ পর্যন্ত বেশ বুঝতে পারলাম—কিন্তু এহ তো মাত্র নয়টি—তবে আপনি এতগুলি কবচ-মাহুগি ধারণ করেছেন কেন?”

“এহ তো মাত্র নয়টি, কিন্তু তাদের এক এক জনের হাতে অনেকগুলি করে বিভাগ আছে—কেউ ধরুন কলেগা সাখলাছেন—কেউ বসন্ত—আর একজন হয়তো বা ম্যাগলেরিয়া নিবারণ করছেন। আবার এঁদেরই কেউ হয়তো অর্ধব্যার করছেন—আর একজন তাই ম্যাগলেগেন। আপনি—যাতে ম্যাগলেরিয়া না হয় এইরকম একটা কবচ পরলেন—ম্যাগলেরিয়া তিনি সামলে দিলেন বাটে, কিন্তু অবশ্য আপনার অর্ধব্যার করিয়ে দিলেন। কাজেই প্রত্যেক বিভাগে প্রত্যেককে সঠিক কগার সস্ত ব্যবস্থা করতে হবে।”

“ওঃ—কিন্তু এতগুলি কবচ-মাহুগি সিনরাত সকল সময় পরে থাকতে আপনার অহুবিধা হয় না?”

“অহুবিধা আর কি—আর যানিকটা অভ্যাগও হয়ে গিয়েছে। তবে হী, রাতে দুদ্যাবার সময় একটু অহুবিধা হ'ত, কিন্তু ভায়ও একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছি।”

“কি হব?”

“একটা তামার বাজ ঠেঁকি করিয়েছি—স্নাত্তে কবচ-মাহুসিঙি তার ভিতর রেখে দিই, বাজের হৃদিকে দুটি তামার তার আছে, তার একটি ডান হাতে আর একটি বাঁ হাতে ধৈর্য রাখি—বাস, দেখেই সঙ্গে সাংযোগও থাকল আবার খুশিও কোনো ব্যাখ্যাও হ'ল না।”

“হুটো তার কেন?”

“আপনার আকস্মিকতার ছেলেরা তো বিজ্ঞান ছাড়া কিছু বুঝতে চান না—আর এটুকু বুঝতে পারলেন না। তার হুটো নেগেটিভ আর পজিটিভ, বাজের মাহুসি থেকে টেনেপুটসিট বেরিয়ে হুটো তার দিয়ে দেখেই সঙ্গে যোগ হয়ে সাংযুক্তি কমপ্লিট করবে।”

“সবতরঙ্গিন শতিনেক মাহুসি গুরে গুরে বেড়ান, স্নাত্তে গারে তার ধৈর্য রাখেন—এতে বাড়ির কেউ আপত্তি করেন না?”

বিজ্ঞপদবাসু চটে গিয়ে বললেন, “কেন, আপত্তি করবে কেন? তা ছাড়া এ কি কিছু অস্ত্রার কাজ যে, আপত্তি করলেই তাই গুলতে হবে?”

“না, না, অস্ত্রার বগড়ি না, আপনার স্ত্রীর হস্ততো দেখে দেখে অস্ত্রাঙ্গ হ'য়ে গিয়েছে—তার দিক দিয়ে আপনি নাও হ'তে পারে, কিন্তু আপনার ছেলেকেই তো আধুনিক—সে দিক দিয়ে তো আপত্তি উঠতে পারে।”

“ওদর হাঙ্গামা আমার নেই মশাই।”

“কেন, আপনি কি বিয়ে করেননি?”

“করেছিলাম বৈকি, কিন্তু সব স্মৃতি কি আর অদৃষ্টে হয়, দাদা—কামরূপ-কাষিখোর আমার বশন্তবাড়ি—চেহাঙ্গির না হোক, বতাবে গিটীট আমার না-কামাখ্যার সাক্ষ্য মানস-পুত্রে, বিয়ের অষ্টদিনের পর বাণের বাড়ি ফিরে গিয়ে বলে বসদ—হর আমাকে মাহুসি-কবচ ছাড়তে হবে, না-হর স্ত্রীর আশা ত্যাগ করতে হবে। বলুন দেখি—কী অস্ত্রার আবহা? তবু তো তখন আমার গারে একশো-উনিশটির বেশি মাহুসি ছিল না।”

“একটা বশীকরণ কবচ-টবচ—”

“সেকি আর বাকি রেখেছি, দাদা, সাতাশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল আর এখন হল গিয়ে সাতচল্লিশ, এই ফুড়ীটা বছরে অন্ততঃ পেল্লশা বকর বশীকরণ কবচ ধারণ করেছে—কিন্তু গিটীটও কামাখ্যার মেয়ে—বসন্তর আমে বোধহয়,—বস হ'বে কি, উটেই আমাকেই বস করে রেখেছে। কতবার ভেবেছি, ভুলোয়, না হয় আর একটা বিয়ে করে ফেলি—কিন্তু কিছুতেই পারি না। গিটী আমার কালো

হলে কি হয়, অমন চোখ-মুখ আর একটুও চোখে পড়ে না—বসন্তই বিয়ের কথা ভাবি অমনি চোখের সামনে সেই চোখ-মুখ ডেসে ওঠে আর সব ভেঙে যায়—নতুন করে আবার বশীকরণ কবচের চেষ্টার উঠে-পড়ে লাগি। শায়ে বলেছে—গৃহিণী, শূত্র গৃহ আর অবগণ্য কোনো ত্যাকাত নেই। তাই ঠিক করেছে—একবার শেষ চেষ্টা করে নেব—তারপর না-হর সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বনেই চলে যাবে। আর সেই শেষ চেষ্টা করতেই এবার গিয়েছিলাম বকেবরে।”

“বকেবরে কেন?”

“খবর পেলাম, কামাখ্যার মন্ত্রিসিঙ এক মহাতান্ত্রিক সাধু এসেছেন বকেবরের মহামন্ত্রাণে—তাই গিয়েছিলাম তার কাছে যদি বশীকরণের একটা কবচ-মাহুসি কিছু পাই।”

“পেয়েছেন কিছু?”

“হাঁ পেয়েছি। বাবা অগ্রহণ করেছেন।” বিজ্ঞপদবাসু দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, “বকেবরের মহামন্ত্রাণে—তান্ত্রিক শ্রীতস্থান—সে এক সাংখ্যাত্তিক জাদুসা, মশাই। তিনদিন বুরলাম—বাবার বেঁধা শেলায় না—অদৃষ্ট হবে থাকলেন। চারদিনের দিন গিয়ে দেখি—কেউ কোথাও নেই, অথচ সাউসাইট করে একটা চিত্রা অঙ্গাছে আর তার সামনে বলে বাবা মড়ার মাথার খুঁসিতে কারণ পান করছেন। শেষে আমার তো মশাই সা-মুচ্ছন্ন করতে লাগল—বুড়ি করে সঙ্গে এক ভাঁড় কারণ নিয়ে গিয়েছিলাম, সাহস করে কাছে গিয়ে ভাঁড়টি সামনে রেখে সাষ্টাঙ্গ হয়ে বসলাম—অধম সন্তানের একটা। গতি কর, বাবা—একটা বশীকরণ দাও, যাতে সে আবাস্টিকে চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসে। বাবা একটা অশ্রীল গালাগালি দিয়ে চিত্রা বেকে একখানা আধগোড়া কাঠ ভুলে ফুঁড়ে খায়লেন—কার্থদানা ভুলে নিয়ে ছুটে পালিয়ে এসে বাঁচলাম।”

“তবে বে বললেন—কবচ পেয়েছেন?”

“কী আশ্চর্য—হিমুর চুলে এসবও বুঝতে পারেন না? ওঁরা বে বলেন কি মনে করেন আর বলেন তা যদি আমি-আপনি বুঝতে পারতাম তা'হলে আর ভাবনা ছিল কি। গোড়া কার্থদানা ফুঁড়ে দিয়েছেন কবচ করবার স্ক্র।”

“অতবড় একখানা গোড়া কার্থের কবচ।”

“আপনার ঘরে কবচ বাবা লাইই বকমারি। সবথ কার্থদানা দিয়ে কবচ করব কেন—ওটাকে ইকবো-ইকবো করে বসন্তগিলি টম্বা করব করব। বাবার খেওরা গালাগালিটাও ইকবে এনেছি—এবার জিজ্ঞাসা করুন ওটাকে নিয়ে আবার কি হবে।”

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বিজয়দেবী হেসে বললেন, “জানি এসব জিনিষ আপনাদের যাবার কোনো কারণেই চুকবে না, আসলে ওটা গালাগালিই নয়—ওটা হল বসীকরণের রত্ন—চুপপত্রে লিখে কবচে ডরে ধারণ করতে হবে, আর প্রত্যাহ অস্ত্রতঃ একশো-আট বার জপ করতে হবে। দেখবেন—এবার আর গিলী ঠেকাতে পারবেন না—ছ’মাসের মধ্যে হুড়হুড় করে চলে আসবেন। আচ্ছা, আপনি বসুন, বর্ণনাম এসে গেছে।” ব্যাগটি হাতে নিয়ে বিজয়দেবী উঠে পাড়িয়ে উদ্দেশ্যে একটা নমস্কার করে বললেন, “এখানে আমার গুরুদেব আছেন—তার সঙ্গে দেখা ক’রে, পুরুষের ক’রে তাত্ত্বিকতা কবচটা ডরে কেনবার ব্যবস্থা ক’রে কলকাতার ফিরব।”

বছরখানেক পরে সতীক বিজয়দেবীকে দেখলাম একটা পিনেবার—কি যেন একটা হাকিনী প্রেমের বই ছিল। ইন্টারভালের সময় বাইরে দেখা হ’লে প্রথমটা চিনতে পারলেন না—পরিচয় দিয়ে একটু একান্তে মিলাসা করলাম, “কি দাদা, বসীকরণ কবচ তাহলে কলছে?”

“কলবে না? আপনাদ্বা বিবাস করেননা তাই—”

সু’হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বিজয়দেবী বললেন, “সাক্ষাৎ শিষ্ট মহাপুরুষের দেওয়া কবচ—ও না কলে যায়? যা বলেছিলাম—ছ’মাস বেতে-না-বেতে হুড়হুড় করে গিলী এসে হাজির হলেন।”

“নিজেই চলে এসেন?”

“হুড়হুড় পরে আগন্তিকি না করে যখন এসেছেন তখন একরকম নিজেই এলেন বলতে হবে বৈকি। ঘটনাটা তাহলে শুনি—কবচ ধারণ করে মাস চারেক অপেক্ষা করলে ওরিক দিয়ে কোনো সাড়া-শব্দ না গেলে গুরুদেবকে গিয়ে ধরলাম। তিনি বললেন—দেখ বাপু, সৈব সবচেয়ে বলবান সত্য; কিন্তু সৈবকে আয়ত্ত করতে হলে চাই পুরুষকায়—আর উচোচী ভিন্ন অপর কারও পক্ষে পুরুষকায় লাভ করা সম্ভব নয়—কাজেই তোমার দিক দিয়েও একটু উত্তো-আয়োজন দরকার। তখন যেন ডাবল্যাম—ট্রিক, এতদূর থেকে বসীকরণের টানটা ধরতো পূর্ণভাবে কামরূপ পর্যন্ত পৌঁছতে না—আমার দিক দিয়ে একটু উত্তো-গের দরকার। পরদিনই কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গড়লাম—সু’বিন পরে কামাখ্যার পৌঁছে এক হোটেলের গিয়ে উঠলাম—অবশ্য শতরবাড়িতে কোনো খবর দিইনি।”

“খবর দিয়ে একেবারে শতরবাড়িতে গিয়ে উঠলেই তো ভালো হ’ত—টানটা আরও বেশী করে পড়ত।”

“শি-বে বললেন—খবর দিয়ে শতরবাড়ি উঠলে তাত্রা যেন কবচ হাংলার মতো বুড়োবয়সে দৌরের জল পাগল হয়েছি—তাতে আমার পুরুষকায় দেখাবার সুযোগ থাকত না, কবচের কবচতাও দেখা হত না।”

“তার পর?”

“হ্যাঁ—তারপর হোটেলের চার-পাঁচদিন চুপচাপ বসে অপেক্ষা করে দেখলাম—কিন্তু ওরিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তখন ট্রিক করলাম, আরও একটু কাছ থেকে দেখে—টানটা হাতে একেবারে বোক্ষম ভাবে পড়ে। সেদিন থেকে রাতে শতর-নাওয়ার পর বাবার দেওয়া ময়টি জপ করতে করতে শতরবাড়ির চারিদিকে ঘুরতে আরম্ভ করলাম।”

“রাতে কেন?”

বিজয়দেবী মিটিমিটি হেসে বললেন, “দিনের বেলা একটু লজ্জা-লজ্জা করত—মসি কেউ দেখে কলে। বাহোশ, তিন রাত্তির—যেন রাববের ট্রিক তিন রাত্তির পরে—”

“আপনার গৃহিণী বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনার সঙ্গে চলে এলেন হুঁকি?”

“না। ট্রিক তিন রাত্তির পরে কামাখ্যার মাঘ মাসের বাড়িভাড়া ঠাণ্ডা লেগে আমার ঘর হ’ল—তিনদিন একেবারে বেহ’ল। হোটেলের ম্যানেজার ডাক্তার বেরিয়েছিল, ডাক্তার বললেন—নিয়োগিয়া। ম্যানেজার আমার সঙ্গে কাগজপত্রের মধ্যে শতরের নাম-ট্রিকান। শেষে তাঁদের খবর দিলে—টাত্রা এসে আমাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। তারপর তো বেহেতেই পাচ্ছেন—গিলীর সেবার স্তম্ভ হয়ে উঠে নিয়ে একেবারে জোড় কলকাতার ঘিরে এলাম।”

“কিন্তু আপনার কবচ-মাহুলিগুলির কি হ’ল—সেওরিক দেখছি না তো?”

“ও, সেগুলো আমার অষ্টোত্তর অবস্থার সময় গিলী হুলে নিয়ে ব্রহ্মপুত্রের জলে ডালিয়ে দিয়েছেন। বাগ্গে—ওর আর কি প্রয়োজন বসুন?”

“তুনেছি, কামাখ্যার গেলে নাকি ডেড়-টেড়া কি-সব যেন—”

“না-না, সে-সব কিছু নয়, ডায়া—সে-সব কিছু না, এ বেশ সেই কবচের গুণে।”

শিকারের টান

ঐতর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়

ছোট শিকার

ছোট শিকারের মধ্যে হাল-শিকারই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। হাঁসের গতিবিধি, স্বভাব ইত্যাদি শিকারীর হৃৎপ্রতিষ্ঠিত। শিকার-ক্ষেত্র ও শিকার-রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত। হাল-শিকারের জনপ্রিয়তা এই কারণেই ঘটেছে।

হাল অনেক জাতের হ'য়ে থাকে। ছোট কচ্ছিদল (common teal) থেকে প্রকাণ্ড গুগল (goose) পর্যন্ত। হাঁসের স্বভাব—রাতিযোগে মাঠে শব্দ বেয়ে ঘুরেদেয়ের সঙ্গে লগ্নই কাছাকাছি কোনো জলাশয়ে দিন কটাবার চক্কর নাশ। শিকারী হৃৎপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে মরি ও জলার মাঝামাঝি একটি উপদ্রুত স্থান বা 'বাটি' বেছে নিয়ে লুকিয়ে থাকেন। মাথার ওপর দিয়ে হাল উড়ে ধাবার সময় শিকার-চোরা চলে।

প্রথম কয়েকবার বন্ধুত্বের আওরান হবার পর হাঁসের দল সতর্ক হ'য়ে পড়ে। তখন লুকানো শিকারীর মাথার ওপর দিয়ে আর ওড়ে না। পাশ কাট্টিয়ে বেগে চলে যায়। এই সময় শিকার অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য। ক্রমে হাঁসের ঝাঁক বন্ধুত্বের পাজার বাইরে অনেক উঁচু দিয়ে উড়তে থাকে। তখন শিকার বন্ধ করাই হৃৎপ্রস্তুত।

অনেক সময়, জলাশয়ের মাঝামাঝি, তীর থেকে পাজার বাইরে হাঁসের দল বদলে, নৌকা বা ভিড়ি চালিয়ে পাজার মধ্যে পৌঁছিবাব চোরা হয়। নৌকার সামনে খাপ-পাতা লাগিয়ে পেটকে প্রছন্ন করা হয়। কিন্তু হাঁসের ঝাঁক এদব ছিনে দূরে থাকতে থাকতেই উড়তে আরম্ভ করে। এই সময় শিকার-চোরা চলে।

হাঁসের দল আমাদের দেশে শিকারালিট কাটাতে আসে। গ্রীষ্ম ষাণন করে—শীতপ্রধান ভিসভের জুয়ার-শীতল ব্রহ্মগলিতে। এইদব অল শীতপ্রধান বরফে আচ্ছন্ন হ'লে উচ্চতর জলাশয়ের স্থানে হাঁসের দল বন্ধিনমুখে বাত্রা করে; উত্তর-ভারতের খাল-বিল-নদীগুলিতে প্রথম প্রথম আশ্রয় নিতে থাকে; ক্রমে আরও বন্ধিনমুখে ছড়িয়ে বিহার, বাংলা ও উত্তরভারতের জলাশয়গুলি অবিকার করে। এই সময় শব্দ পাকে বলে এরা প্রচুর খাদ্য পায়। অবশেষে শব্দ বেতে গেলে এরা প্রচুর ক্ষতি করে 'ব'লে, বাংলাদেশের অনেক গ্রাম থেকেই শিকারী সাগ্রহে আমন্ত্রণ পেরে থাকেন।

শীতের প্রারম্ভে দলে দলে ত্রিকোণাকার বাহু রচনা করে হাঁসের দল মাথার ওপর ঘিরে উড়ে ধাবার দৃশ্য শিকারীর মন চকল করে তোলে। অন্ধকার থাকতে থাকতে বাত্রা করে শিকার-ক্ষেত্রে পৌঁছে ঘুরেদেয়ের পূর্বেই নির্দিষ্ট 'বাটি' অবিকার আর হাঁসের প্রতীক্ষা। কনকনে শীতে, জলা হাওঘার হাত প্রাণি অলাড়। ক্রমে একটি-দুটি করে হাল উড়তে আরম্ভ করে। তারপর দলে দলে আসে। এ দৃশ্য বা দৃষ্টি শিকার-বিলাসীর অবিস্মরণীয়।

মনিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে 'লোকতক' নামে একটি প্রকাণ্ড ব্রহ্ম আছে। এর চারপাশেই চাষ হয়। এ ব্রহ্মটিতে শীতকালে বহু হাল মড়ো হয়, তত হাল আমরাত একত্রে আর কোথাও দেখিনি। কুটিন-রাজস্বকালে এই স্থানে বহুদিনের দুটিতে উচ্চগদহ ইংরাজদের আমন্ত্রণ হ'ত হাল-শিকারের জন্য। আমন্ত্রণ-কর্ত্ত হ'তেন—মনিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্ট (Political Agent)। ইনিই মনিপুর রাজ্যে সর্বস্বত্ব হ'য়ে থাকতেন। রাজা ছিলেন ব্রিটিশরাষ্ট্রীয় নাম-সর্বস্বত্ব ব্যক্তি মাত্র।

এ-বেশে পরিবেশে আমার ভাগ্যও একবার আমন্ত্রণ কোটে। আমি গিরেছিলাম মনিপুরে বহু শিকারের সোভে। এজেন্ট মহাপ্রভুর কাছে শিকারের অহুহতি নিতে হয়। এই যত্নে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। শিকার-ক্ষেত্রে সেখানায় বিরাম সমাবেশ—শিকারী, শিকারীর অহুহর, বাহক, খানসামা-বাবুর্জি দল ইত্যাদি ইত্যাদি। খানসামা নৌকা প্রস্তুত। অন্ধকার থাকতেই চা-এর আয়োজন চলেছে। হৃৎপ্রতিষ্ঠিত পূর্বেই চা-পর্ব সেরে আমরাত শিকারীর দল নৌকাযোগে ব্রহ্মে পাড়ি বিলাস। ইতিপূর্বেই সম্ভারীর দল হাল-বদবার স্থান লক্ষ্য করে রেখেছিল। সেই স্থানটিকে চারিদিক থেকে ঘিরে কোলবার উদ্বেগে নৌকা চালানো হ'ল। নৌকার সামনে নানা জলজ উদ্ভিদ দিয়ে ঢাকা। দূর থেকে দেখলে একদাশ জলাশয়াল ভেসে আসাচ্ছে বলে মনে হয়।

ব্রহ্মটির মাঝামাঝি প্রায় এক বর্গমাইল জুড়ে হাঁসের দল বলে ছিল। সংখ্যার এত বেশী যে, অল দেখাই থাকিল না। কিন্তু ওদের সতর্কতা অক্ষুণ্ণ ছিল। পরিধির পাজার নৌকার দল পৌঁছিবাব পূর্বেই হাঁসের ঝাঁক উড়তে আরম্ভ করে। সে এক অপূর্ণ দৃশ্য। আকাশ ছেঁয়ে অন্ধকার করে নানাভাষী

হাঁস উড়ছিল। বন্ধুর মল আকাশের নিকে উড়ু করে টিগার টিপলেই দিকার। সুড়ানির মল শিকার হুড়িলে জড়ো করবার মত অবসরও ছুটানুটি কমছিল। বটখাশের এইভাবে গুলী-বর্ষণের পর হাঁসের মল ব্রহ্ম ভাগ করে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন শিকার স্থগিত রেখে তাঁর কেশা হ'ল। প্রান্তরাপ-পথ সাহসে হবে। শিকারের স্থান জমা করা হ'ল—এক এক আড়ির হাঁস পৃথক পৃথক সাজানো হ'ল। আর সব আড়ির হাঁসই ছিল। মোট সংখ্যা শুনে দেখা গেল একহাজারেরও বেশি।

এই সংখ্যার আবার ব্যক্তিগত অবদান ১০-১২টির বেশি ছিল না। আমার অনুভূত দৃষ্টিতে এটা শিকার না হ'লে হত্যাকাণ্ড যাত্রা বোধ হ'য়েছিল। এ হত্যাকাণ্ডের ফলে অবশ্যই সে সকলের শক্তকরম সব অনেকাংশে রক্ষা পেরেছিল। কিন্তু এ অসুখানটি নিশ্চয়ই শিকার পরবাস্য নয়।

প্রান্তরাপের পর বৈদ্যর ভাগ শিকারী-ই নিজ নিজ শিকারের ভাগ নিয়ে নিবৃত্ত হ'লেন। বৈদ্যদের নিকে আবার কখন আবার শিকারে নাহি। হাঁস তখন একটু-দুইটি করে সাবধানে ফিরছিল। এবার শিকারে মল ছিল। বেছে বেছে পাখী-পাখীও সত্ত্ব হ'য়েছিল।

শিকার-করা পাখী কয়েকদিন পর্যন্ত তালা রাখবার উপায়—সেগুলির শেট চিরে সব অস্ত্র ধার করে ফেলো, তারপর সেখানে কাঠকলার তঁড়া ভরে দিয়ে বসাবনী রাখা। আবার এই উপায়ে রক্ষিত পাখী, শিকারের ৩০ দিন পরেও রক্ষণ করে থেয়েছি। কোনও বিকৃতির লক্ষণ পাইনি।

ভারতের পূর্ব-সীমান্তে মনিপুর। পশ্চিম-সীমান্তে ছিল সিন্ধুদেশ। এখানেও একটি প্রকাণ্ড ব্রহ্ম আছে। তার নাম 'মানচর'। এ ব্রহ্মেও ঈশ্বরের সমস্ত প্রচুর হাঁসের সমাগম হ'য়ে থাকে। তবে তারের সংখ্যা 'লোকতক'-এর মতক ভুলনীয় নয়। বোধহয় শস্ত্রের বিরসতাই এর মূলে। মনিপুর আর সিন্ধু—উভয় স্থানে সেই একই জাতের হাঁস আসে। কিন্তু শিকারের ব্রহ্ম প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন। পরিবেশ, জলবায়ু ইত্যাদিও বিভিন্ন। মনিপুর সবুজ বনে ঢাকা; সিন্ধুদেশ লুক পাথর গড়া। মনিপুরের অধিবাসী খংকার, মঙ্গলুখ মঙ্গোলিয়ান (Mongolian) শ্রেণীর; সিন্ধুদেশী ধাঁধার লোমশ আর্যব্রহ্ম-ভূক্ত। মনিপুরের খাত তাত-ভাল; সিন্ধুর খাত মোটা কটি আর পিও বেছুর। মনিপুর শস্ত-ভাঙ্গল; সিন্ধু মফয। এইসব কারণে উভয় ক্ষেত্রে শিকারের রীতিও বিভিন্ন। ভারত-বিভাগের পর সিন্ধুদেশ শিকার ভারতবাসীর শব্দে গ্রাম অশব্দ হ'য়েছে।

এককালে কলিকাতার নিকটেই বহু বাল-বিল-মলার ঈতকালে হাঁসের সমাগম হ'ত। সম্প্রতি দেখা যায় যে, সে পরিবর্তিত পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু শহর ছেড়ে কিছুদূরে গেলে এখনও পাখী-শিকার পাওয়া যায়। শহরের কর্মচারীরাও, সম্ভ্রাহায়ে ছুটিট খিমে ভোরবেলায় শিকার-ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে কয়েক ঘণ্টা শিকার-ব্রহ্মা পরী ও মন উভয়ে সজীবিত করে। খোলা হাওয়ায় বেশ মানিকটা হাঁট। আর শিকারকালীন উত্তেজনা—এসব মিলে যে অপরূপ আনন্দের স্রষ্টা করে, তা থেকে বঞ্চিত থাকা দুর্ভাগ্য-বিশেষ। ঈতকালের কলিকাতাই-হ'লি, কলকাতায় লেপ-মুড়ির মতো শিকার-ব্রহ্মাও একটি প্রধান ভোগ।

শিকারের পূর্বাংগে হাঁসের পরই তিতিরের স্থান। তিতিরের বাল মাঠের ধারে-ধারে ছোট-ছোট কোণ-কাড়। এরা বলে থাকলে হুঁমে পাওয়া হুকটিন। শিকারের সময় কয়েক-জন লোক দিয়ে কোণ-কাড় ঠেড়িয়ে পাখীদের উড়িয়ে দেওয়া হয়। উড়বার সময়ই শিকারের শব্দ প্রকট। তিতির হঠাৎ যেভাবে নানা দিকে ওড়ে। এইজন্য তিতির-শিকারের কিপ্রভা অবশ্যক হয়।

আমাদের অকলে জলায় সাইপ (snipe) পাখীরও সমাগম হয়। এই পাখীর শিকারও বেশ আনন্দপ্রসূ। শিকারীর মল সাইপ বেশে জলায় মধ্যে অঙ্গুর হ'তে থাকেন। জলে, পানির পাতা বা ঘাসে লুকিয়ে-থাকা সাইপ হঠাৎ উড়ে 'ক্যাফ্ ক্যাফ্' শব্দে ঘুরে গিয়ে আবার বলে। হঠাৎ ওড়ার মত শিকারীকে বিবেচনায় কিপ্রভ হ'তে হয়। না হ'লে, শূন্যহাতে বাড়ি কোন্ অবস্থার। শিকার-পেশে 'সাইপ-স্টিক' (snipe stick) এক ভজন সাইপ স্থলিয়ে বাড়ি করা শিকারীর খবর।

অপর শিকার-পাখীরের মধ্যে বন-মোরগ, হরিহাল, করলু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এইসব পাখীর মাংস অতি উপাদেয়। হয়ত এদের দুগ্ধাপাতাই স্বাদুতারও মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। হাঁকা দিয়ে ভেঙে এইসব পাখীর মাংস পাউরুটি সহযোগে যে আখান বেশ, তা দেবভোগ্য। নিশ্চয় এই রান্নার কোনোই হৌদনী-ভাঙানী তাঁর শব্দধারীকে বেশে রেখেছিলেন, আর বনবাসী মূনি-ঋষিদের কাছে জগতের শ্রেষ্ঠ রন্ধনী বলে যেন গণ্যেছিলেন। হয়ত এই আহারের মোড় দেখিয়েই দুগ্ধান দুগ্ধা-মুনিকে সপিত্যে পাণ্ডবদের আতিথ্যগ্রহণে প্ররোচিত করেছিলেন।

বাংলাদেশে অনেক জলায় হোগলা জরে। এর ভেতর পান-পায়রা, কয়েম, কুট এইসব জলায় পাখী থাকে। এরাও শিকারের উপাসাধি। লোক নিয়ে হোগলা-বন থেকে

পারি উন্মিষে শিকার করে। অনেকদিন পূর্বে কলিকাতা থেকে ১৯ মাটিরের মধ্যে, আগভঙ্গাটা কৌশলময় মাটিরখানের দূরে কয়েকটি কলার এইসকলকারিও পাউ খাকত। আমবাড়ার পাঁচটার ট্রেন নিয়মের টেলনে ট্রেন ধরে টি ফানে উপস্থিত হতাম। শিকারের সেরে তুপার পর কচি ডিওহাম। এবারে শিকার স্থায়ের মঙ্গল বাক্য হলে ডুবিতাফনের পালা। এই অনেক আতঙ্ক স্মৃতি হাতে মাড়ে মনের মাথা।

পারি শিকারের সময় ট্রেনের নকর বেড়ে নেওয়া প্রয়োজন। বাসিন্দা এর ভর ১৯৯ বা বি.বি. H.B., বহু প্রাণের ট্রেনের পরে এর মন, অত্যাচার ট্রেনের মন, এবং সাধারণ পারিওর মন ট্রেন প্রসঙ্গ। জটিল বা কলারখোড়ার ট্রেন চলা। পারি শিকারের মাড়কা ট্রেন নিয়মের ওপর আমের্যে নিভর করে।

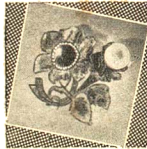
পারি শিকার অভ্যাসের একটি বিশেষ দীর্ঘ প্রচলিত মাড়ে। শিকারী বন্ধুর নিয়ে এক কালো খির হয়ে আসত। সামনে থেকে একজন লোক এগিয়ে দিকে মাটি বা

শিক (pitch) নিয়ে ট্রেনের বেকারীর মাথা একটি বস্ত্র চুঁড় দেয়। সেই মাটিতে পড়বার আগেই শুদী করে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা হয়। এইসকল বেকারী কখনও সামনের দিকে, কখনও জটিল বা খায়ে চুঁড় দেওয়ার ভালে শিকার-কোষের অবস্থার মনকত হয়ে থাকে। চুঁড়বার কল প্রিন্সেপেওয়া কল ব্যবহার করা হয়। এইভাবে অভ্যাসে শিকার পাঁচতর বার সাফল্য ঘটলেই, পারি শিকারের উল্লখযোগ্য লাভজন্য লাভ করা যায়।

ছোট শিকারের সময় কতকগুলি বিবিসিগের ঘেমে চলতে হয়। বন্ধুরের মন—হুয় মাটির দিকে মাড়িয়ে, আর না-হয় আকাশের দিকে উঁচু করে রাখা উচিত। জলের ওপর শুদী-মিকেল মিসিক। কারণ জলের ওপর থেকে পড়লে চুঁড়া বড়দুর পড়বে চলে। পরগোপ-শিকারের সময় ছাড়া মাটির দিকে শুদী চোঁড়ার মনকত হয় না। এ সময়ে সামনে কোনো লোকজন বা পোষা কীছক্ক যেন না থাকে এ-বিধে বিশেষ সাবধান হতে হয়। শিকার খেলতে গিয়ে, এসব আতঙ্ক করা অমানসীয়ে অপর্যব। একপ শিকারী বন্ধু-বান্ধবের অযোগ্য।

সঙ্গমীর প্রতিষ্ঠা

জুয়ানার্স



টি, জি, আড্ডি এণ্ড সন্স

৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬



— রিকমার গান —

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৩৫

তড়িং বাসায় ফিরল বেশ একটু অশ্রুমনস্ক হয়েই ; গানের সুরটা মনের কোণায় কন-কন করছে, গতি হয়ে পড়েছে মন্থর। ওটুকু অবশ্য কেটে যেতে দেয়ি হোল না, নিজেই কুকায়ে রান্নার ব্যবস্থা করা, পড়া : পরের দিন ঐ স্রুটিনের পর কলেজ। রায়ে ইটকির সওয়ারী ফেরত মানার পর কিন্তু হঠাৎ মনে হোল 'বেশ'-এর সুরটা আবার এসেছে কিরে। হঠাৎই যেন অশ্রুমনস্ক হয়ে উঠল। আর কিছু নয়, বর্ধমান ছাড়ার পর অনেকদিন এভাবে গান শোনেনি। 'দেখ'টা আবার বেশি ভালোবাসে তো। ...যাবে না হয় আজ ওদিকপানেই ? অবশ্য 'দেখ'ই যে হবে এমন কথা মন্থ : তবে গানের আড্ডা, ভালো গান শোনা...

কিন্তু...খুব বড় একটা 'কিন্তু' কোণায় যেন রয়েছে পথ আগলে। আজ তো বৃষ্টিও আশুকুলা করছে না ; আর বৃষ্টি হোলেও একটি বিশেষ রিকশাওলা ঐ সময় ঐ জায়গাটিতে থাকবে অপেক্ষা করে এই বা কেমন কথা !

গেল না। হুটে দিন কাটিয়ে দিল, আরও চেষ্টা করে আরও একটা দিন। তার পরদিন ঐদিকের একটা সওয়ারী পেয়ে যেতে মনকে বোঝাল একে তো ভাড়া খাটতেই যেতে হচ্ছে।

যাওয়ার সময় ঐখানটায় একটু আন্তে করে নিয়ে কান পেতে রইল। সেতার হচ্ছে বাঁধা-তবলার সঙ্গে।

ফেরবার সময় মনে হোল ঐখানকার রাস্তা-ইকুতে কে আটা লাগিয়ে রেখেছে। সেতারের সেই সুরটাই এখন হলছে, বেশ একটা মাতন চলেছে যেন। প্যাডেলে পা আসছে ধেমে। কি

করে একটু শোনা যায় ? আজ আবার রাস্তায় লোকলোচল বেশ ভালো রকমই, অর্থাৎ বাতাবিক যেটা। এগিয়ে যেতে হোল। খানিকটা গিয়ে মনে হোল—একটা উপায় হতে পারে—ঐখানটায় খানিকটা গড়িমসি করা—খানিকটা এগিয়ে গেল, আবার রিকশা ছুরিয়ে খানিকটা গেল পেড়িয়ে, কে আর এত লজা করে রাখছে যে সেই একটা রিকশা জায়গাটিতে লিঙ্কে চকর ? আর ভাড়া খোঁজারও তো কতকটা ঐ পদ্ধতি।

ঘুরে খানিকটা পেড়িয়ে গেছে, সেতারটা চৌধুরেন এসে মনে খেনে গেল। বেশ খানিকটা উজিয়ে গেল তড়িং—সময় ছিল—এর পরে কি হবে ? —গান ? সেই মেয়েটির গলায়—দেখ ? ...কাকুর গলায় কিছু একটা গান হোক না...

বাড়ির সামনে দিয়ে আবার ফিরছে, গান বা বাজনা তখনও কিছু ওঠেনি। কয়েক প্যাডেল এগিয়ে গেছে, পেছন থেকে ডাক এল—
“এই রিকশা !”

যাবে না ভাড়া। হাত উঠিয়ে সেটা জানতে গিয়ে মাথাটা ঘোরাতেই পা যেন আপনিই খেনে গেল তড়িংয়ের। হাতটাও নিল নামিয়ে, ঐ বাড়ি থেকেই ডাক। রিকশা ছুরিয়ে নিয়ে গেল।

মাস্টারমশাই আর সেই মেয়েটি—মনী। মাস্টারমশাই বললেন—“তোমাদের সেদিন যে নিয়ে গিয়েছিল। ...আজ কিন্তু মামুলী রেট, তা বল দিচ্ছি বাপু।”

মেয়েটির কিন্তু সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তবে সেদিনকার মতোই কণমাত্র ; তখুনি ফিরিয়ে নিয়ে বলল—
“আমি তাহলে মাস্টারমশাই—”

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে রিকশার এসে বসল।

একটা ছোট বাজারের মধ্যে গিয়ে যেতে হয়। খানিকটা এসে মন্নি প্রশ্ন করল—“রাস্তাটা তো জানাই আছে?”

প্রশ্নটার বিশেষ তাৎপর্য না থাকলেও একটা উদ্দেশ্য আছে, তাই বাংলাতেই করেছে, বেশ খানিকটা ভেবেচিন্তেই। ছোটখাট এক-আধটা কথা বাঙালীরা এসেশীয়দের সঙ্গে বাংলাতে কয়ও, সে-দিশাবে এমন কিছু অস্বাভাবিকও নয় : উত্তর হোল—“হ্যাঁ, আছে।”

বাংলাতেই দিল উত্তরটা তড়িং। দিয়ে ফেলল, কিংবা দুখ নিয়ে বেয়িয়ে গেল বলাই ঠিক; অস্তুমনস্ক ছিলই, তার ওপর রাস্তার ট্রাফিকটা কাটাতে আরও অস্তুমনস্ক হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা খুঁড়ে ঠিক করতে যতটুকু দেরি হোল, চূপচাপই গেল, তারপর মন্নি আবার জিগ্যেস করল—“সরদের সব রাস্তা আছে চেনা?”

সাবধান হয়ে গেছে তড়িং। এমনি হিন্দী ভালে ভানে না বলে সাধারণত অল্পকথার ওপরই কাজ চালিয়ে যায়, এ-ক্ষেত্রে আরও সংক্ষিপ্ত করে উত্তর দিল—“হ্যাঁ, কুছ-কুছ।”

আর একটু থেমে প্রশ্ন হোল—“কতদিন চালাচ্ছ রিকশা?”

“খোড়া রোজ।”

“তবু...”

“চার মাসিনা।”

আর কোন প্রশ্ন হোলনা।...কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ করছে তড়িং। বাজারের পরে রাস্তার ধারে একটা পুকুর, তাইতে খানিকটা কাঁক গেছে, মাঝানাকি এসে মন্নি বলল—“একটু দাঁড়াবে।”—হুকুমের তোন; অস্তুত বেশ একটু গম্ভীর। ত্রেকটা টিপে ধরে ঘুরে চাইল তড়িং।

সেই তীক্ষ্ণ, সপ্রশ্ন দুটিটা এবার একটু বেশিঙ্গল মুখের ওপর ফেলে রাখল মন্নি; প্রশ্ন করল—“তুমি

হিন্দুস্থানী?...নেমে দাঁড়িয়েই উত্তর দাও, আর রিকশা চালাতে হবে না।”

অ-তুটো একটু অবাধ্যভাবে ইচ্ছকে উঠল তড়িংের, কিন্তু কিছু না বলে আন্তে আন্তে নেমে এসে সাননে দাঁড়াল, বোধহয় আলোর পোস্টে লেখেই দাঁড় করিয়েছে মন্নি। একটু বে ধতমত খেয়ে গিয়েছিল তড়িং সে-ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে; প্রশ্ন করল—“কি?”

“তাহলে বাঙালীই দেখছি?”

“হ্যাঁ।”

“রিকশা চালাচ্ছা যে?”

“কি হয়েছে তাতে?”

রাগারাগি না হলেও বেশ সোজামুজি উত্তর-প্রত্যুত্তর চলছে। মন্নি বলল—“কি হয়েছে মানে?...পুলিসে হাণ্ড-ওত্তার করা যায় তোমায়।”

“রিকশা চালাবার জন্তে? বাঙালীর বিরুদ্ধে আইন আছে কোন?”

“চিটিঙ-এর বিরুদ্ধে আইন আছে তো। বাঙালী হয়ে হিন্দুস্থানী স্নেহে ভাড়াটে তোলা; বিশেষ করে মেয়ে-ভাড়াটে।”

“বিশেষ করে মেয়ে-ভাড়াটেই তুলতে বাব কেন?...আপনিই ডাকলেন।”

“হিন্দুস্থানী কেনে ডেকেছিলাম।”

“বাঙালী জানলে ডাকতেন না?”

“তা...হয়তো ডাকতাম, গ্রিক বাঙালী জানলে।”

“তা হলে বাঙালীর রিকশা-চালানো—অবস্থা-গতিকে যে অস্তুয় নয় এটা তো মানছেন?”

“তা মানব না কেন? কিন্তু, কথা হচ্ছে এ-প্রবক্তনা কিসের জন্তে?”

“আপনি ধরে নিয়েছেন প্রবক্তনা, ওটাও তো অবস্থাগতিকের জন্তে হতে পারে...”

রাস্তা দিয়ে লোক যাচ্ছে, দ্বিগুণও, যদিও ট্রাফিক পাংলাই এখানটা। এরা একেবারে পাশ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে, কথাবার্তাও নিছক তর্কে এসে দাঁড়িয়েছে, বরও চাপা, লোক জড়ো করবার উদ্দেশ্য কাকুরই

নেই। তবু হৃৎককন মুখ ঘুরিয়ে দেখেই গেল, একটা খালি রিকশাওলা মাথা ঘুরিয়ে হঠাৎ হর্নের পাল্পাংকানিটা বাড়িয়ে দিল খানিকটা। উত্তরটা পেয়ে মন্ত্রী মুখের দিকে চেয়ে একটু চুপ করে রইল। রাস্তার আগে পিছে দেখে নিল, তার পর দাননে খানিকটা দূরে একটা খালি রিকশা আসতে দেখে রুমাল খুলে ভাড়াটা বের করে বাড়িয়ে ধরল; বলল—“এই নাও। আমি যাব না এ-রিকশায়।”

রাস্তারটাকে ডাক দিল।

তড়িং বলল—“আপনি যাচ্ছেন না যখন ভাড়া নোব কেন?”

মন্ত্রী আন্যোন্নে কিছুটা বাঁ হাতে সরিয়ে নিয়ে বলল—“আচ্ছা। এই অর্ধেকটাও নাও, খানিকটা তো এসেছি।...কিন্তু খবরদার, আর এভাবে...”

তড়িংয়ের মুখটা হঠাৎ বড় বেশিরকম ধমধমে হয়ে গেল। বেশ জিহ্বের ওপরই বলল—“ও-ও নোব না।...না হয় নিকুম, কিন্তু যা ভাবা ব্যবহার করছেন আপনি...”

“ভাবার কি সোব হোল আবার!”—একবার যেন অনিচ্ছাকৃতভাবেই মন্ত্রীর দৃষ্টিটা ওর চেহারার উপর দিয়ে ঘুরে এস। তড়িং উত্তর করল—“প্রথমত, বেশ ভদ্র নয়।...এই ধরুন, আমিও তো আপনাকে জানি না, তার ওপর বরদে দেইটো হলেও ‘আপনি’ কথাটা ব্যবহার করছি...”

অপর রিকশাটা চড়াই ঠেলে এসে পাড়িয়েছে, মন্ত্রী ঘুরে দেখে বলল—“না, চলা যাও।”

তড়িং প্রশ্ন করল—“কৈ, গেলেন না?”

“এইতেই যাচ্ছি।”

“যদি প্রযকনা নেই মনে করেন, তাহলেই চলুন।...কিন্তু সেও তো আপনার মনের ভেতরের কথা; বাইরে থেকে আমি টের পাব কি করে?”

রিকশাওয়ালাটা পাড়িয়েই আছে। মন্ত্রী গলায় একটু অধৈর্যের সুর মিলিয়েই বলল—“আচ্ছা চলুন তো এখন—”

ওরা যাত্রা করতে রিকশাওয়ালাটাও প্যাডেলে একটা চাপ দিল, তারপর একবার মাথাটা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বেশ জোরে শিব দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

ভাড়াটা হাতেই ছিল, তবু বাড়ির গেটের সামনে এসে হাতের তেলোয় একবার বিছিয়ে গুলে নিতে বড় সেরি হতে লাগল মন্ত্রীর, তার পর যেন হঠাৎ হুঁস হতে আবার জড়ো করে নিয়ে বাড়িয়ে ধরে বলল—“এই...হুঁসান।”

পকেটে ফেলে প্যাডেলে চাপ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল তড়িং, মন্ত্রী একটু ভেতরে গিয়ে আবার বেরিয়ে এসে ডাক দিল—“ওমুন!”

তড়িং ত্রেক চেপে ঘুরে চাইল। প্রশ্ন করল—“আমায় ডাকছেন?”

“হ্যাঁ।”

ফিরে এল তড়িং। মন্ত্রী একটু যেন জড়োসড়ো হয়ে গেছে, আমতা-আমতা করে বলল—“একটা হয়তো ভুল করেছি।...কিন্তু কথা হচ্ছে বাঙালী—বিশেষ করে ভদ্রলোক...তাদের তো রিকশা চালাবার কথা নয়...মানে চালায় না তো...”

যেন গুছিয়ে বলার আশা ছেড়ে দিয়েই বলে শেষ করল—“মাফ করবেন আপনি।”

“এতে মাফ করা-করির কি আছে?”—একটু হাসল তড়িং।

“আছে বৈকি, অগ্গায় হয়ে গেছে। ভদ্রলোক বলে ধরে নিয়েই তো আমার কথাবার্তা সেইভাবে কওয়া উচিত ছিল। তারপর না হয়...যদি দেখতাম...”

“কিন্তু অভদ্র এবং চীটু বলে ধরে নেওয়াই তো স্বাভাবিক হয়েছে। আমি অগ্গায় কিছু দেখছি না, মাফ করারও কিছু নেই এতে।”

একটু জিদ করেই মন্ত্রী বলল—“না, হয়েছে অন্তর।...আচ্ছা থাক্ সে-কথা...আমার একটা অমুরাধ...”

গেট আর বাড়ির মাঝখানে একটা মাঝারি-গোছের বাগান, তার গাছপালার কতকটা আড়ালে রয়েছে এরা, কি ভেবে পেছনে একবার দেখে নিয়ে মল্লী বলল—“একটা অদুরোধ রাখবেন আমার ? আসবেন আমাদের বাড়িতে ?”

তড়িৎ একটু বিম্বিত হয়েই বলল—“আসব !... কি করতে ?... না, আসতে পারব না আমি...”

“আমার জ্যাঠামশাই—এখানে আমার যিনি অভিভাবক আর কি—খুব খুশী হবেন আপনার সঙ্গে আলাপ করে। তার কারণ তাঁর বড় আপদোস—শারীরিক মেহনতকে অবজ্ঞা করে আমাদের ভাতটা জীবনযুদ্ধে জেমাগতই যাচ্ছে পেছিয়ে। বরাদ্দই এই দুঃখ তাঁর, এখন আবার রিটারার করে এই আলোচনা নিয়েই থাকেন, এই নিয়েই কাগজে কাগজে প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে—Dignity of labour... কথাটা আপনি বোধহয় বোঝেন ?...”

একটু অন্তরনয় হয়ে পড়েছিল তড়িৎ, প্রশ্নটাতে

আবার সচেতন হয়ে উঠে বলল—“তুনি কখনও কখনও !... কিন্তু ও-অদুরোধ করবেন না আমার, আমি ভেতরে যেতে পারব না। পেটের দায়ে রিকশা চালাচ্ছি, অজ্ঞ কোন উপায় না দেখে। আদর্শ প্রচার করা তো উদ্দেশ্য নয় !... আচ্ছা, আসি তাহলে, নমস্কার—”

প্যাডেলে চাপ দিয়েই আবার সঙ্গে সঙ্গে ত্রেকটা চেপে ধরল ; বলল—“বরং আমার একটা অদুরোধ আপনাকে রাখতে হবে—আমি যে রিকশা চালাচ্ছি একজন বাঙালী, এ-কথাটা আপনি প্রকাশ করবেন না—কারুর কাছেই নয়। অদুরোধটা রাখবেন আশা করতে পারি ?”

মল্লী একটু মুঢ়ভাবে চেয়ে বলল—“তা রাখব না কেন ?—আপনি যদি চান। কিন্তু...”

তড়িৎ আবার প্যাডেলে চাপ দিয়েছিল, বাধা দিয়ে একটু হেসে বলল—“প্রবন্ধনাটা চালিয়ে যেতে সাহায্য করা হবে, এই তো ? তাঁর ক্ষেত্রে এবার আনিই ক্ষমা চেয়ে রাখছি। নমস্কার।” [কথন :]



প্রাগৈতিহাসিক মনুষ্য

রূপেস্ত তট্টাচার্য

অতীতের বহু শতাব্দী ভিত্তিতে আমরা যদি প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সন্ধান করা বলতে পারতুম, তাহলে আমাদের এই কৃতবিশি সত্যতার অপরিসীম কীর্তিতে তার নিশ্চয়ই বিশ্বের সীমা থাকতো না। কিন্তু, কে জানে, সে হৃদয় আমাদের কানে কানে বলতো, বীজকে ফসলের বাহারে তুলে দাঁড়ানি আশা করি। অর্থাৎ, জীবনের যে দুঃখাণ্ডে পথে আমাদের নিত্য বিচরণ, প্রাণী হৃদয়ে অক্লান্ত প্রাণালয়, সেই হৃদয় অভিগমে আছে সে আমাদের কথা নানা ভাবে বিস্তারিত। তার মৈবপ্রবৃত্তি ও মন—দুইএই উত্তরসাপক আমরা। প্রাগৈতিহাসিক গুহাগল্লের, প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষে তাই তার স্বাক্ষরে প্রকৃতবিশ্বের বিজ্ঞান, নিপুণ সমাজনৈতিক ব্যাখ্যা-দৃষ্টি এবং সভ্যসত্ত্ব ঐতিহাসিকের স্বাভাবিক দৃষ্টিপাত।

সে সময়ের কথা বলায়, সে আজ বহু সহস্র বৎসর পূর্বের কথা। বিশেষজ্ঞরা বলেন, পুরাতন প্রস্তর-যুগ বা পুরোপলীথ যুগ (Peliolithic Age) শেষ-ই হয়েছে অল্পত চৌদ্দহাজার বছর পূর্বে। সুতরাং তার শুরু যে আরো বহু শতাব্দী পূর্বে, সন্দেহ নাই। হৃদয় সর্বত্র একই সময়ে নয়, এবং না-হওয়ারই কথা। কিন্তু পুরোপলীথ যুগে মানুষ নিতাইই শিকারী। শিকারে তার জীবিকা। এখানে ওখানে শিকার-অশেষণ তাই ছিল তার একান্ত প্রয়োজনীয়। একথা তার হিংসা-বৃত্তির সঙ্গে সংযোজিত হল কার্যকরী বৃত্তি। প্রস্তর থেকে করলো অগ্নি-উৎপাদন, পাখর ঘষে ঘষে ছাতিয়ার। সুতরাং, আগুন জালিয়ে রেহাই পেতে শিখলো বস্ত্র পত্র অস্ত্রমণ থেকে। অস্ত্র ছুঁড়ে দারতে শিখলো লক্ষকে ঘূর্ণ থেকে। শিলে (গুহাচ্চি) ভাঙির করলো তার গৌরব এবং প্রয়োজন। অলঙ্কারে অহমিকা। কে জানে, প্রকৃতির বিরাট বৈচিত্র্য থেকেই বোধ হয় তার প্রথম মনে হবছিল ভয় ও বিশ্বাস—হৃদয় সেই থেকেই তার ধর্ম কিংবা ধর্মভাবের সূত্রপাত।

ফ্রান্সের লা-মস্তিয়ার (Le Monstier) গুহার দেকালের মানুষের মনোভাবের সবচেয়ে পুরানো নিবর্ণন পাওয়া গিয়েছে। গুহার নিচে যে-সব কবর পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে মনে হয় সেইগুলো আত্মীয়-পরিজনের একত্রে সমাধি।^১ তা থেকে তৎকালীন পারিবারিকতা তথা সামাজিকতা লক্ষ্য

এবং জীবিতের নিকট মৃতের তুলন্য আরোপিত। গুহাই ছিল শুধন তাদের ঘরবাড়ি। অলঙ্কার, অস্ত্রমণ ও খাদ্যচিহ্ন কবরে যে-সব পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে মৃত্যুর পর জীবনে বিশ্বাসের ইঙ্গিত দেয়।^২ এমন কি খুইগারল্যাণ্ডে যে-সব উল্লেকের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে—সেই সব দেহের গুটিয়ে রাখা হোত বলেই মনে হয় হৃদয় তারা জীবন্তের প্রত্যক্ষারও ছিল বিশ্বাসী।^৩

২

প্রস্তর-যুগের প্রধান দুটি ভাগ, যথা পুরোপলীথ যুগ (Peliolithic Age) এবং অগ্নি নব্যোপলীথ যুগ (Neolithic Age)। অবশ্য বিশেষজ্ঞরা সেই দুই যুগের মাজমাঝি একটা সময়কে বলেন মধ্যোপলীথ যুগ (Mesozoic Age) সাধারণতঃ



প্রাচীনতম জাতি। বিশেষজ্ঞের মতে প্রায় ৩০,০০০ বছর পূর্বে কৃত ইয়া, একই জাতির নৃপদগণ। বহুদিন যুগ নব্য-জাতীয় হবিতর থেকে এছাড়া। ১২০২ সনে মোস্তিয়ার তেপ্তানিল অঞ্চল প্রাপ্ত।

মধ্যোপলীথ যুগের কাল ধরা হয় খ্রী: পূ: ১১,০০০ থেকে খ্রী: পূ: ৪,৬০০ পর্যন্ত—অর্থাৎ খ্রোড়োপাদন কৃষ্টি বা নব্যোপলীথ যুগের

আবাহন পর্যন্ত। অবশ্য হুরোপে ঐ: পূ: ৩,০০০-এর কাছাকাছি সময় পর্যন্ত মধ্যপন্থীর কৃত্তি বিস্তারিত ছিল; অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় এখন কি ঐ: পূ: ৮,০০০-এর কাছাকাছি সময়ে পুরোপন্থীর ও মধ্যপন্থীর দু'গের নিছক



পূর্বনাত হাইনস। পুরোপন্থীর দু'গের সোয়াল-কিত। স্পেনের আলসোবিয়া ভদ্রায় কালোয়ায় পশিমে পর্বতের টঙ্কল রক্তকর্ণ অর্ধতঃ।

লিঙ্গার থেকে জীবিকারোষণ ছেড়ে কোথাও কোথাও সর্বত্র ক্ষেত্র খাড়াংগাঙ্গনে কৃষিপত্তন হয়েছিল। সুতরাং সর্বদেশে ও সংকালে একই সময়ে প্রকৃত-দুগ্ধের বিভিন্ন ফলের বোধান ও বিতরণ সম্ভব হয়েছিল, এ কথা ভাববার কোন কারণ নেই। পুরোপন্থীর দু'গের সামান্যতম ছোটো-একটা প্রকৃত-নির্মিত সামগ্র্যভান, মধ্যপন্থীর দু'গে সেই সব সামগ্র্যভানের আরো অধিক সংখ্যার উদ্ভাবন এবং নবোপন্থীর দু'গে কৃষিপ্রধান গ্রামীণ জীবনের অবতারণা মানবমানের ক্রমবিকাশের-ই পরিচায়ক, সর্বত্র মানববৃত্তিহাসে এক-ই সময় ও এক-ই ভাবে প্রচলন প্রমাণিত হয় না। পুরোপন্থীর, মিশর ও বেসোপটমিয়ার ঐ: পূ: ৩,০০০-এর কাছাকাছি সময় এখন নবোপন্থীর দু'গের অবস্থান হয়েছিল, তখন পৃথিবীর বহু স্থানে, এমন কি একালের পরমোচিত হুরোপেও তা আরম্ভ হয়নি।

প্রাগৈতিহাসিক যত্নের নির্ণয় বে-আলোচনা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে নবোপন্থীর কৃত্তি। তার বৈশিষ্ট্য, খাতি কৃষির প্রচলন, পশুপালন, গ্রামীণ সন্ততির প্রথম প্রকাশ, কৃষকোপণ ও পরস্পরের মধ্যে কালের ভাগ্যভাগি (division of labour)। সামগ্র্যভান তখনো প্রকৃতেরই ছিল। হাত-কোষাল (Hoe-culture) দিয়ে ছোটখাট ক্ষেত্র তৈরী; প্রকৃত-নির্মিত কাঁচির সাহায্যে ফল-কর্জন; পাখরের জাঁতায় ফল খাণ্ডোপ-বাগি করা; নবোপন্থী (অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞাত)

জীবনশন; বনে বিচরণের সময় দু'খান ফল-ফলাদ্রি জ্ঞান থেকে সেই সব বাসস্থানের নিকটে রোপণ এবং পারিবারিকতার সম্ভারণ থেকে সামাজিক তথা গ্রামীণ উপায়-উদ্ভাবন নবোপন্থীর কৃত্তির অঙ্গতপূর্ণ বিশেষত্ব। সেই নবোপন্থীর কৃত্তির পরিস্রব্ধিতে প্রাগৈতিহাসিক যত্নের বিচার। এবং তার প্রভাব এমন কি একালের বে আমরা পুরোপন্থীর কাটিয়ে উঠতে পারিনি, আশা করি সেই আলোচনার যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

প্রথমই ধরা থাকে নবোপন্থীর কৃষি থেকে প্রাপ্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কয়েকটি অপরিহার্য দ্রব্য। ভারত বিস্ত্রে পৃথিবীকে তুলা ও চাউল। প্যালেস্তাইন, সিরিয়া ও কুম্ম্যসাপন্থীর দেশগুলো থেকে আমরা পেয়েছি নানাপ্রকার গম। মিসরে, সোমালি, নানাবিধ ফল, এমন কি সম্ভবতঃ সেবু এসেছে চীন, জাপান ও মধ্যোত্তর তথা পূর্ব-এশিয়া থেকে। সেহর বিস্ত্রেই ইন্ডিও ও সিরিয়া। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া থেকে পেয়েছি নানাবিধ শাকসব্জি—ব্যাগেট, হুটি ইত্যাদি। আলুরের অমূল্য সম্ভবতঃ সিরিয়া কিংবা এশিয়া মাইনর। মসুরা ত্র্যাপির আদি উৎপত্তি ভারত ও বীণময় ভারত। বলা বাহুল্য, প্রকৃত যখন যখনে দেশে সন্ধ্যা হয়েছে তখনহারা ফল ও ফলের আদি বৃত্তপাত। আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরে যাঁটি ও



কৃষির মৌলিকস্বকৃতির প্রাচীনতম নির্ণয়। আর্থিক নিয়মে অভিজ্ঞ এই সব নির্দিষ্ট প্রাচীন সন্ততির স্বরূপ। প্রাচীন নবী মিসর-এ প্রাপ্ত।

আবহাওয়ার অবস্থায্যাবী সাহায্য প্রয়োজন থেকে ব্যবস্থা করে নিয়েছে। সর্বজনগ্রাহ্য পট্টকটির মূল উপাদান 'এয়ার' নামক গম-এর আদি উৎপত্তি প্যালেস্তাইনে বাটে, কিন্তু তা মিশর হয়ে বেসোপটমিয়া অভিক্রম করে এখন ইরানে গিয়ে

পৌছলো, তখন তার কিংবা ওগাধুয়ায় সেখানেই প্রথম পাউকটির উপযোগী হয়েছিল। ইরান থেকে এই 'এমার' গন (bread wheat) টাইয়িস্টাইটের উপত্যকা পেরিয়ে এসেছে ভারত। ভারত থেকে চীনে ও মধ্য-এশিয়ায়। সেখান থেকে রূপ লেপ হয়ে মধ্য-যুরোপে। এশার-এর এই শ্রবণবৃত্তান্ত বিস্তারিত গিয়ে টার্নার সাংহের বলেছেন, এমন করে এখান থেকে ওখানে এবং ওখান থেকে সেখানে পৃথিবীর গ্রাথ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে তিন হাজার বছর লেগেছে।^১ হরত অন্ডের হিসেব বহুবারে সংখ্যা নিরূপণ কমনবেই হতে পারে, কিন্তু সমস্ত পৃথিবী-পরিভ্রমণ সম্ভব হ'তে যে বহু শতাব্দী কেটেছে এ-বিষয়ে কারও এতটুকু সন্দেহ না-পাশ্চাত্যই কথা। সেকালে তড়িৎ-জ্ঞান ছিল না, তাই একালের তড়িৎ-সংযোগে জ্ঞান-বিতরণ লোকলের বাহুবের আরও এবং কল্পনা বহিষ্ঠূত।

কেউ কেউ^২ মনে করেন প্রাগৈতিহাসিক কালে বীজ-বপনের সময় নরবির প্রথা ছিল। ঐতিহাসিক এইচ. জি. ওয়েল্‌স^৩ এই মতের সমর্থক।^৪ হরত এখানে কোন কোন আদিম ও অ-সভ্য অঞ্চলে এই রীতি রয়েছে। কিন্তু বীজ-বপনকে লৈবদ্বয়ের মাত্র নিত্যই প্রথম বাণেশি। প্রথম সে ফল কেটেছে; পরে সেই ফল থেকে ব্যবহার করেছে নতুন করে আরো পেতে বীজ। এ-বিষয়ে এইচ. জি. ওয়েল্‌স-এর হুম্বার্ড অডিমন্ট^৫ দৃষ্টি। তিনি বলেছেন, মাহু বীজ বুনছে পরে কিন্তু ফল কেটেছে আগে: He reaped no doubt before he sowed. অবশ্য চাষ-আবাদ থেকে সভ্যতার একটা বিশেষ উপাদান কথা যাতে লবণ ব্যবহারের কথা অস্থান কথা বাহ। মাংসাশী মাহু লবণ ব্যবহার না-ও করতে পারে, কিন্তু তরিতরকারি ও লাকসবুজি ব্যবহারের সঙ্গে লবণ-ব্যবহার অসঙ্গীতাবে ঝড়িত বলেই এই অস্থান খুব অসম্ভব না। খুব বেশিদিনের কথা নয়—একালে, মাহুদের মকছুমি অঞ্চলের অধিবাসীরা ফেজানের লবণাক্ত স্থান বসল নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই করেছে। হুতরাং, কৃষিকারী প্রাগৈতিহাসিক মাহুদের পক্ষেও তা সম্ভব।

পশুপালনও সেকালের সুপূর্ণ অবস্থান। পারিপার্শ্বিক

সঙ্গে সামন্তত্রেপে মাহু বসন হল জীবনধারণ করতে সচেষ্ট, সেই থেকে এতদিক দিয়ে এল তার চাষের প্রকৃতি অর্থাৎ বৃক্ষোপলব্ধ ও ফল-ফলন, তেমনি অন্তরিক্তে যে-সব পত্র তার যাতে ও কাঁচ লেগেছে তাদের শালন। হুহুর হরত তার বিকারে একান্ত প্রবৃত্তক সচেষ্ট। গল, ডেড়া খায়ে সহায়ক। পাখা তার জারবাধী। অর কত ও হুহুদর আগা-বাওয়ার শকট। এইসব গৃহপালিত জীবের আদি তত্ত্বমুখি সঠিক করে বলা শক্ত। কৃষির মতোই কতকগুলো আত্মসমিক অবস্থান কিংবা প্রত্যত্যিক সচেত থেকে বলা হয় হটে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ গৃহপালিত পশু ও লোকলের গৃহপালিত পশুর মধ্যে যোগদেয় টেনে স্থান-কাল-নির্ভর ভ্রমহ ব্যাপার। দৃষ্টান্তরূপ, মনে করুন দুর্ভবলিখ্যাত আরবীর অধের কথা। তার আদি পিতৃনিবাস আরবে নয়, মস্কিন-কল এলাকার। অন্ততঃ বিশেষজ্ঞরা তাই বলেন। তুর্কীপান থেকে সে পৃষ্ঠ-এশিয়ায় এসেছিল। সেখান থেকে মধ্য-এশিয়ার সমূহ ক্ষেত্র এবং তারপর বেসোপটেমিয়ায়। বেসোপটেমিয়া থেকে আরবে গিয়ে আরো উত্তর ধরনের হয়েছে। হুহুরের আদি পিতৃমুখি নিম্নেও মতামত। নেই এখন নয়। যোট কথা হচ্ছে, আবহাওয়া ও বৈচিত্র্যাকার মতো আদর্শ অঞ্চলেই হয়েছে গৃহপালিত জীবতত্ত্বর বস্তুত্ব। চোপুতীর ভ্রম গ্যাংসেই অঞ্চলে উট আশা করি কোনোদিন জগাবে না—কিবা জগাবো গেলেও, গ্যাংসেই প্রাকৃতিক পরিবেশে বাঁচানো সম্ভব নয়। তারপর যদি ছুপানের কথা ধরি, তাহলে বলতে হয়, পশুপালন থেকেই সেকালে তার প্রথম আরম্ভ। প্রবণ নিয়ে হুস্তিতর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু তরল পদার্থ রাখার উপযোগী হাতল-বেওয়া সেকালের যে-সব হুংপার উদ্ধার করা গিয়েছে, তা থেকে বল ছাড়া অল্প পানীয় প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

আন্তন মনোপলীয় হুংপে পূর্বেই এসেছিল। নোপলীয় হুংপে কৃষির সঙ্গে এল রতন করে আরবের বাসনা। প্রথমটাও নিত্যই করতে হয়েছিল নানাবিধ পরীক্ষা। হুংপে থেকে পাঠ এল রতনের মন্ত। মাহুর হাতে গেল এই দারিদ্র্যতার। রতন থেকে কৃষ্টি পেলে হুংপের এ-বাড়ী ও ও-বাড়ী কিংবা সমষ্টিগতভাবে একত্র ভোজনে ভাক পড়তো। মাহুর হাতে পেলেন—বোম্ব হু, পুংবের নিকট আত্মপ্রতিষ্ঠার হুংপে। বাঁচোয়া বাস্তবতা করে রেখে-সেওয়ার প্রয়োজন অতুত্ব করলেন রতনইয়া মাহুর। অনেক সময় অনেক কিছু রাখতে গিয়ে হরত পড়ে যেত। পড়ে গেলেই লব-কিছু তাঁরা ফেলে দিত না। চেয়ে দেখতো। তারপর পড়া এমন কিছু চেয়ে

^১ R. Turner: 'The Great' Cultural Traditions. Vol. I (1941), pp. 35-56

^২ Sir J. G. Fraser: Golden Bough উত্তর

^৩, ^৪ H. G. Wells: The Outline of History (1931: Garden City Publishing Company, New York, U. S. A.), p. 112

একদিন মাতঙ্গ বৃন্দালা বে. এ. তো. এক অসুস্থ ভিনিস : বা খোশ আবেগ আসে, তিহা; আবেগ বেশি খেলে কুখ্যত্ব : কুস গিহে হয় নেগা। ক্রমশঃ অসুস্থ হতে থাকে লুপ্ত। শিশুরা খেতে এই ডাক্তার ভিনিস : দেখাশোনা অস্বস্তিক। হাতের হাতের বহুরের জ্ঞান ও অভ্যাস নিয়ে আবেগ সেই ডাক্তার ভিনিসকেই রক্তমাখি পুথিবীর সংস্কার—সভা বসি আর অসভ্য বসি, পাচাই বসি আর মসই বসি, সেই ডাক্তার অসুস্থতির ভক্ত আবেগ ব্যাঙ্গলতার অধু নেই।

কিন্তু তুমি বাঙাল-ই যে বাঙা নর, অর্থাৎ বেঁচে-থাকার অস্ত্র সিক ও রয়েছে : এই অসুস্থতি থেকেই এগেছে আদিনি মাতঙ্গের শিল্পাভ্যাস। সেই শিল্পাভ্যাস থেকে কখনো এতেনে বাসবাননে সেখানে ছবি, আবার কখনো কতেনে নানোনিঃ কারিগরী শিল্পের প্রসঙ্গ। নবোপলব্ধি হুগ কারিগরী শিল্পের এক বিরাট উদ্ভিতির হুগ। এক অসুস্থ প্রতিষ্ঠার প্রমাণ রয়েছে শিরিষার ও শিরিষার ই: পু: ১, ০০০-৪, ০০০ বননের সুশিল্প। বহুশিরিষার নির্বন্ধ শিরিষার প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী থেকে পাওয়া গিয়েছে। সত্ত্ববত: কাশড় প্রথমে হৈতি হস্তে লং-ভাতীয় কিছু থেকে এবং গৃহপালিত ডেড়ার লোনে থেকে। কিন্তু বুননের পদ্ধতির ভক্ত চাকুতি উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। স্বকিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু প্রাচীন স্থানে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সূচ হিসাবে ব্যবহার করতে হয়েছে হাত; মনে হয়, মাছ-পরাণ পদ্ধতি আবিষ্কার করতে গিয়ে সে হস্তকে কতেনে কাশড় উপযোগী। পাছের নরম বহল শিটেরে সে পরেছে কাশড় এবং কখনো চামড়া শিটেরেও। এগুলো আমরা দেখতে পাই, শিটেরে চামড়া নরম করা হয়।

৪

চবি, পতঙ্গালন, বহু ও শিল্প থেকে সেখানে এল গ্রাম্য-জীবন। সেই গ্রামীণ মণ্ডল্যের কেন্দ্রে রইল চাষ-মাষাণ, কল-রক্ষণাবেক্ষণ, সামাজিক সেসময়, পারম্পরিক সহায়স্বৃতি ও সাহায্য, পারিবারিক জীবন, গ্রাম-প্রীতি বা তৎসংশ্লীষন স্বাসেনিকতা ইত্যাদি। অর্থনৈতিক পর্যায়ে উৎপাদন, শ্রম-বিভাগ ও শিল্পনান্দ থেকে এল ব্যাবিকার-প্রাবল্য এবং স্বকল্পের বাসনা। কোন কোন ভিনিসের প্রতি হল ব্যক্তি-বিশেষের আকর্ষণ বা চাহিলা। সেই চাহিলায় বোগান সেতে এল বিনিময়-ব্যবস্থা, বিনিমি এবং ছোটখাট ব্যকলা। সেই ব্যবব্যবিক জীবনের প্রভাবে রূপান্তরিত হতে থাকেনো সামাজিক জীবন। ব্যক্তিরে সম্প্রদায় হল; তা থেকে নেতৃত্বের উত্থব হল : নিচু সম্প্রদ থেকে নর, বৈদিক বল ও বহল এবং বুদ্ধ-হিবচনার ভিত্তিতে। সমাজচেতনা থেকে হয়েছিল

নৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা বা গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ নিয়মতান্ত্রিকতা বা in-group morality। বহির্পক্ষের সঙ্গে বিনিময়ব্যবস্থা হয়েছে তির পরনের। বার্থ নিয়ে রেবারেবনি উপস্থিত হলে হয়েছে সাংঘাত। নিম্ন গোটীয় মধ্যে কেউ কোন গোণ করলে তার হস্তে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় (clean democracy) বিচার। সেই বিচারের অবিকার পঙ্কলের সনান। ঐতিহ্যের উপর সেই বিচার-পদ্ধতির ছিল কার্যমো। ঐতিহ্য বলতে বুঝাতো কতকগুলো বিষয়ে নিয়ম (taboos), মূল নীতি (basic controls) এবং কতকগুলো সাময়িক বিধি (incidental customs) মেনে চলা। হস্তরাং প্রাগৈতিহাসিক সমাজে ব্যক্তি-স্বাধীনতা এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে সামাজিক বিনিময়ে থেকে স্বকীয় জ্ঞান-পরিমার্গ কেউ সহজে পরিবর্তন করতে পারতো। চলুতি নিয়মকালকে পিতা মেনে মেনে চলছেন, পুরেকও তেমনি মানতে হত। কিন্তু কোন কিছু পরিবর্তন যেমনি সমাজ তার গণতান্ত্রিক কার্যমোতে গ্রহণ করে নিত, সেমনি ব্যক্তিবিশেষের ভাতে অবিকার হত। তার পূর্ব নয়।

নিচেদের কথোপকথন, চালচলন, প্রাত্তিক পরিবেশ, স্বখ-দুখের অভিজ্ঞতা—সেকালের মাতঙ্গও প্রথমে বা লোকপাথার রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছে। নীচে কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক প্রবন্ধ* দেওয়া গেল :

শিশু জন্মাবার পূর্বে বাহ্যেরে জামা করবে না। ভেত্রা তার মাপ তুলতে পারে না। পত্মাভ্রই নিজেই গুহায় গম্ভ্যতে পারে। বাসের বাঙাথাবে, তারা নিশ্চয়ই মাতঙ্গ করবে।

যেহেতু নবোপলব্ধি মাতঙ্গের তীর-পঙ্ক ছিল, বিনিময়জ্ঞান মনে করেন সেখানে পঙ্ক থেকেই তার-ভাতীয় বাঙম্বের প্রথম কল্পনা হয়েছিল। মৃৎপাত্রের মৃৎ চর্বাচ্ছাবিত করে তাকে ঢোলক-ভাতীয় (drum) বাঙম্বের সত্ত্ববত: পরিণত করা হয়েছিল। তখন তারা গান গাইত কিনা সঠিক জানা না গেলেও, মনে হয়, ভাতা ও কঠকরের সামন্ত-বিধান করে গুহন বাঙম্বের অস্ত্রতম আধিব প্রবৃতি। পাথরগো বহন সেই স্বর-সম্পত্তি গ্রাহ্য হয়েছিল, তখন তাকে বলা হয়েছিল সীত। নৃত্য সত্ত্ববত: মাতঙ্গের আদিনি ছকবোই সাক্ষা জানায়, বসিও নৃত্যের উত্থব হয়েছিল গোষ্ঠী-সম্পত্তিত জীড়া থেকে কিনা সামাজিক অসুস্থতা থেকে। প্রাণীর মধ্যে কীকার একটি স্বাভাবিক প্রবৃতি হয়েছিল।

গোমো

শ্রীহৃদয়রত্নম মল্লিক

১

ভনেছিলান মানটি যখন 'গোমো',
হুঁকিনি তো এমন মনোরম ও।
ছোট ছোট চকুদিকে পাগড়ি,
রঙটি ক্যানল, দেখতে বড় বাহার।
নাশে নাশে শুভ্র কুটিরগুলি,—
এঁকেছে কে দিয়ে রঙের তুলি ?
এখানেতে হাওয়া-ই যেন গান,
আলো করে ফল শুধু সন্ধান।

৩

গোমো আমার রাখছে টেনে মন,
চেয়েই থাকি সতৃষ্ণ নয়ন।
ভাবি ওরা কেমন স্থখে থাকে,
গাছে গাছে কতই পাখী ডাকে।
শিয়াল ডাকে লাগছে মিটে ওহে
কিরকিরিয়ে স্বরণা চলে বয়ে।
ফুল ফুলে গন্ধ তাহার পাই
হারা তারার আলোক যেন ভাই।

৪

শান্ত শ্রমল স্নিগ্ধ কোমল ঠাঁই,
একটু কোথাও নিঃশব্দতা নাই।
নাশে নাশে হেথায় আসে বায়
ভনে আমার বড়ই হ'ল রাগ।
হেতায় করা হিংস উপহাস—
মৃত্যু ডাকা—পাপই হল লোভ।
অনুরে ওই পরেশনাথের ঘর
রবে রেখা অহিংস অস্তর।

লোভ ভাতে কি, হউক না নাম গোমো
আবার বলি সত্যি মনোরম ও।
হচ্ছে হতে ইচ্ছা যে আমার—
ওইখানেতে ইস্টাশেন মাস্টার।
ট্রেনটি যে মেল, বেরিয়ে গেল ছই
বুকে আমার আঁকা রঙিন পট।
সাবাস্ ছবি, আঁকলে চিত্রকর
চিরদিনের অনিন্দ্য সুন্দর।

উদ্ভ্রান্ত

শ্রীশ্রীবিদ্যাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

যে দিন পাইনা সেথা সেদিন এ মন
অদ্ভুত অজ্ঞাত পথে করে বিচরণ
তোমার পশ্চাতে ;
অশ্রুজীৱী মায়া যেন আমারে ভুলাতে
বিছায় স্বপ্নের জাল, সে পথে একেলা,
তুনি সেথা নাই তবু সারা সন্ধ্যাবেলা
প্রতীক্ষাকাতর হুঁটি আঁখি
জনে জনে কহে যেন ডাকি'—

হে পথিক, দেখেছ কি প্রিয়ারে আমার
 বিছাৎ চন্দ্রে দেখে যার ?
 অনন্ত। সে মেয়ে
 অধরে আশ্রয় হাসি, আয়ত নয়ন ছুঁটি বেয়ে
 কখন যে অশ্রু করে জানে না তা কেহ
 আল্পে-আবেশে গাঢ় প্রেম-অমুলেহ
 উচ্ছলিত যৌবনের রহস্যে গভীর
 আমার এ তরুণ তারি তরে নিয়ত অস্থির ।

পথযাত্রী চলে যায় এ প্রান্তের কে দিবে উত্তর
 সমুদ্রের ব্যবধান বনে হয় আরোই হস্তর ।

তুমি মোর চিরস্তনী—, আবার এ প্রাণ চিরস্তন
 প্রতি মুহূর্তের তরে আমার বিশ্বাস-সিঁহরণ
 জাগায় জীবন-হৃদয়ে অসহ্য আবেগ বাসনার
 অতৃপ্ত অশান্ত মন, দাবদস্ত দিনান্ত আবার ।

হঠাৎ দেখিছু তোমা সন্ধ্যার আধারে
 চলিতেছ এক পদে, পশ্চাতে চাহিয়া বারে বারে ।
 অনেক লোকের ভীড়,—নাম ধরে ডাকিতে তোমায়
 কষ্ট মোর বৃদ্ধ হল জানিনা সে কিসের লক্ষ্যায় ।
 তুমি শেষে মিশে গেলে পথযাত্রী অচেনার দলে—
 যতক্ষণ দৃষ্টি মোর চলে
 দেখিছু অবাক হয়ে, আশা মোর লোভে কম্পমান
 হঠাৎ নিভিয়া গেল প্রাণীপের শিখর সমান ।

ধীরে ধীরে চলে গেলে দৃষ্টির বাহিরে—
 কায়া নাই বায়া নাই অনন্ত তিনিরে
 উদ্ভাস্ত মুহূর্তগুলি ভেসে গেল জানিনা কোথায়
 সলঙ্ঘিত আশ্ববকনায় ।

আজ আমি ভাবি মনে নাম ধরে কেন ডাকি নাই
 কেন মুছে ফেলি নাই লক্ষ্যের বালাই ;
 কেন মুহূর্তপর্শে তোমা করি আকর্ষণ
 তোমাতে দিইনি বাধা, লোকলজ্জা মিথ্যা আবরণ
 হৃৎহাতে সরিয়ে কেন আমি নাই একান্ত নিকটে ;
 ভোগবতী তরঙ্গিত দেখি ছুই তটে
 গাহন না করি কেন কিরিয়া এলাম
 এত কাছে পেয়ে তবু তুচ্ছ নিয়ে ঘরে ফিরিলাম ।

দেখছি তাকেই

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

যখন চরিত্রহীন সূর্য তার কপট দৃষ্টিতে
দাহ করে শেষ লক্ষ্য। বধু সর্ব্বভের,
বাতাসে ছড়ায় ত্রাস, মাঠে মাঠে প্রতীকার মন
দীর্ঘ করে, কেড়ে নেয় ফুলের সকাল,
তখনো কালের ঝাঁকে সন্ধ্যাসী বটের পাহারায়—
সর্ব্ব ফুলে, হলুদ হাসিতে
দেখছি তাকেই,
সে তখন প্রজাপতি—সব সাধ মেটাবার প্রেম !

যখন আকর্ষণের বেদের কারণ
পান করে সমুদ্র নাভাল,
নর্তকী চাঁদের তীক্ষ্ণ কটাক্ষে অস্থির—তার
অগ্নি কুখার নতো অসংযমী বাহ
আকাশে নিফল হয়ে আছে পড়ে উত্তরে দক্ষিণে—
নগ্ন গ্রাসে ধরা পড়ে রাই; বন, ফসলের গান,
নবী হয় গভিরা হরিণ,
তখনো দেখেছি
আবিগত খই-খই নিরাজয় শাস্তির বেহুলা
বৃক্ক তুলে ভেসে চলা নাও,
পালের উখাও ছন্দে সে তখন আকাশের সঙ্গী !

তারপর আরো পরে
তীর্থের মাহাত্ম্য নিয়ে ফিরে এলে অধিশিষ্ট হাওয়া,
সমুদ্র গুটিয়ে নেয় বাহ,
নতুন দিনের অর্ঘ্যে সূর্য করে প্রকৃতির গুজা ;
এবং তখন
রূপবতী অরণ্যের চোখে চোখে পথিক আকাশ
নেমে এলে বিমুক্ত লক্ষ্যায়,
সর্ব্বভের খিত লাঞ্চে—শিখরে শিখরে
অখের ব্যথায়
সে তখন কথা বলে
ফুলের দাক্ষিণ্য হয়ে আসে ।

আমার সমস্ত স্বপ্নে, গানে, অহুতবে
আমি তার চেয়েছি রূপয়,

আমার ভিক্ষুক দিন বেঁধেছে নিভৃত
ঘরো-ঘরো বিবাসের ঘর, এ-ছ'চোখ
বরণ-প্রদীপ,
তীক্ষ্ণ আশা ঘরের দেয়াল, এ-রূপ
প্রতিষ্ঠার বৌ !
সর্ব্বস্বের মালা গাঁধে
ঘর খুলে বসে আছি, অলক্ষ্যে অথবা ভালোবেসে
আসবে সে আমার ঘরেই ॥

ছোট-খোঁট

• * * চারুচন্দ্র ওট্টোচার্য * * •

ধাঁধা

প্রমাণ করব,—

$$এক = দুই।$$

প্রমাণটা সহজেই করতে পারি যদি নয়। পয়সার
Conversion table-এর সাহায্য নিই।

সেবার আছে,—

১ পুরানো পয়সা = ৫ নয়া পয়সা।

অর্থাৎ, ১ পুরানো পয়সা = ৫ নয়া পয়সা।

বিয়োগ কর ; পাড়াল,—

$$1 \text{ পুরানো পয়সা} = 5 \text{ নয়া পয়সা।}$$

এই Conversion table-এই আবার পাব,—

১ পুরানো পয়সা = ৫ নয়া পয়সা।

অর্থাৎ, ১ পুরানো পয়সা = ৫ নয়া পয়সা।

এবার পাড়াল,—

$$1 \text{ পুরানো পয়সা} = 5 \text{ নয়া পয়সা।}$$

তাহলে ১ পুরানো পয়সা ১ নয়া পয়সারও সমান,
৫ নয়া পয়সারও সমান।

$$\text{অর্থাৎ } 1 = 5$$

কিন্তু নয়। পয়সার Conversion table তো
একটা বিবৃতি পরিচয়। তার উপর ভিত্তি করে যে
সিদ্ধান্ত হবে সেও হবে তাই। ও ভেঙে দিয়ে খাটি
বীজগণিতের সাহায্য নিই। তার উপর কথা
চলে না।

উপাদক সম্বন্ধে একটা সূত্র থেকে পাই,—

$$a^2 - a^2 = a(a - a)।$$

আর একটা সূত্র থেকে আসে, এই

$$a^2 - a^2 = (a + a)(a - a)।$$

তাহলে,

$$a(a - a) = (a + a)(a - a)।$$

এইবার এই সমীকরণের প্রত্যেক পক্ষকে
(a - a) দিয়ে ভাগ কর। তাহলে পাড়াল,—

$$a = a + a = 2a।$$

এখন প্রত্যেক পক্ষকে a দিয়ে ভাগ কর।

শেষ অবধি আমরা পেলুম,

$$1 = 2।$$

কিন্তু একি হল ! এক দুই-এর সঙ্গে সমান ;
একটা রসগোলা খাওয়া যা আর দুটো রসগোলা
খাওয়াও তাই। এ হতেই পারে না। আর এক
যদি দুই-এর সমান হয় তবে বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে
কোনো পার্থক্য থাকে না, অতশাস্ত্র একেবারে
রসাতলে যায়। গলদ নিশ্চয় আছে।

তা তো আছে, কিন্তু কোথায় দেখিয়ে দাও।

বলি, শোন।

$$\frac{0}{a} \text{ কত হয় ? } 0 \text{ হয়।}$$

$$\frac{a}{0} \text{ কত হয় ? অসীম।}$$

আচ্ছা, $\frac{0}{0}$ কত? অনির্ণেয়। এ ঠিক করা যায় না। ওপরের শূন্য নিচের শূন্য কাটাকুটি করে ১ পাড়াল, এ বললে ভুল হবে।

এবার আগের সমীকরণে এস।

$$a(a-a) = (a+a)(a-a),$$

এ অবধি ঠিক আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রতি পক্ষের মান হল ০।

এইবার যখন প্রত্যেক পক্ষকে $(a-a)$ দিয়ে ভাগ করতে যাচ্ছি, তখন আসলে ০ কে ০ দিয়ে ভাগ করার চেষ্টা হচ্ছে। এর ভাগফল তো হয় না।

এইখানে হল কারচুপি। এই সমীকরণে হ্রদিকের ০ হ্রদ্যবেশে আছে।

হ্রদ্যবেশ ঘুড়িয়ে এইরকম একটা সমীকরণ রাখ,—

$$0 \times 1 = 0 \times 100;$$

ভুল কিছু নেই, কারণ প্রতিপক্ষ হল ০।

এইবার প্রতিপক্ষকে ০ দিয়ে ভাগ করে, দুটো ০ কাটাকুটি করে যদি বলতে চাও যে

$$1 = 100,$$

তবেই হবে ভুল, কারণ ০-কে ০ দিয়ে ভাগ করা যায় না।





শূৰ্যমুখী

[ফটা : মণ্ডোনছৰ নল্লী



মিমুল

[ফটা : ঘিৰুজন নাগ

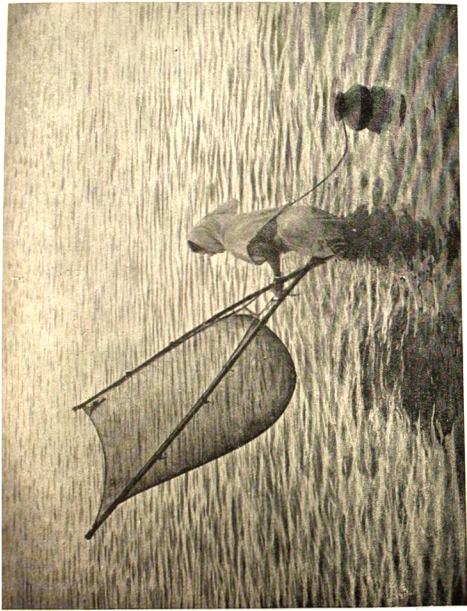


আমের মুমুল

[ফটা : অৰলী চক্ৰবৰ্তী



শুইট মুলতান [ফটা : জীৱানন্দ চট্টোপাধ্যায়



[କଟି : ଶରତ ନାମ]

ସାହସୀକା

সুৰলোক

সঙ্গীত-প্ৰমোদ অতি-কাহিনী

'গোতম'

ওজাহ কৈয়াজ খাঁ সাহেবৰ গান প্ৰথম শুনেছিলাম
 এামোফোন বেকৰ্চে। লেবেল 'হিন্দুস্থান'; বাগ টোড়ী,
 গবজ, পুৰিমা, জহকজ্জী। ধমক দেবাব ভকীতে গবজ-ধুক
 তান শুনে চমক লেগেছিল, কিন্তু কৰ্ত্তব্য তেমন ক্ৰটিমধুৰ
 বশে মনে হয়নি। তখন 'ওভিজন' বেকৰ্চে আবহুল
 কৰিম খাঁ সাহেবৰ গান, ওজাহী গানের ধারা আগে তজ
 নন, তাঁদের কানেও অদৃত বর্ণণ করছে। উজাহ-সঙ্গীত
 উজাহতানটে না করেও কী অসামান্য অনস্ৰিততা অর্জন
 করতে পারে, আবহুল কটিম তার চরন দেখিতে গেছেন।
 তাঁর পাশাপাশি কৈয়াজ খাঁ সাহেবের বেকৰ্চ-সঙ্গীত উজাহ-
 সঙ্গীতের সমকক্ষ এবং তজ মহলে যেমন সমান্ত হয়ছিল,
 সাধারণ শ্রোতাদের কাছে তেমন হয়নি।

আমি তখন পাকা সমকক্ষার ছিলাম না—এখনও নই—
 কিন্তু বাহাহুরি নেবার জজ্জই হোক বা কৌতুহল-তরই
 হোক, বাগ-সঙ্গীতের চৰ্চা যানিকটা সূজ করেছিলাম। মনে
 হ'লো, অমন অতদূৰ ওজাহের গান ডালা-না-লাগাটা
 নিতাজ লক্ষ্য ব্যাপার হবে; এবং যে সাধনৰ আর
 তানের অ-অ-ক-খ'র তালিম নিতেই তখন গলদ্বৰ্ঘ হ'লি,
 তাইই ওপর অমন অনায়াস সজ্জ বিচরণ ধাঁর, তাঁর
 ওজাহিৰ বিৰাটৰ সজ্জ লগবের অবকাশ কোথায়?
 আবহুল কটিমে গানে ছকৰ মুখ হয়েছিল, কৈয়াজ খাঁ
 সাহেবের গানে মুখ হল মগজ।

এ হল কলকাতার বাইরের কথা। পরে কলকাতায়
 এসে কৈয়াজ খাঁ সাহেবের গান সাম্না-সাম্নি শুনগান
 কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হ'লে।

উজাহ-সঙ্গীতের সম্বন্ধে গান শোনা সেই আমায়
 প্ৰথম। হাত পশটায় পর আসবে আসন নিলেন শ্ৰীমতী
 কেশববাঈ কেশবর—সঙ্গীত-সজাট আলাদিয়া খাঁ সাহেবের
 সুযোগ্য শিষ্য। আসর-কমানো সঙ্গৰ্ণ ডাৰিঙি চেহারা,
 চোখে মুখে এবং বদবার ভকীতে গভীৰ আত্মজ্ঞাত্যের
 ডাব। ঐ'র গান অধুনাপুত্ৰ 'ব্রজলীল' লেবেলের বেকৰ্চে
 আগেই শুনে মুখ হয়েছিলাম। সাধনে বলে ভনবার
 সুযোগ শেষে মুখ হলোয়। একে নারী-কৰ্ত্ত—অপূৰ্ব মাধুৰ্যে

ভবা, তার ওপর ওজাহী কালোয়াতিৰ ওপর অমন
 অসাধারণ বহল। বিখ্যাত অজাহিৰা খাঁর ঘটনার
 অসামান্য অতিমিহি কেশববাঈ চমৎকার গেয়ে আসর
 মাত করে দিলেন। তাঁর পরেই গাইবার কথা কৈয়াজ খাঁ
 সাহেবের।

খাঁ-সাহেবের বেকৰ্চ আগেই শোনা ছিল, সে কথা
 আগেই বলেছি। সেই বেকৰ্চ-সঙ্গীতের সঙ্গে শ্ৰীমতী
 কেশববাঈর গানের তুলনা করে মনে হল, এর পর গান
 গেবে খাঁ-সাহেব সুবিধে করতে পারবেন না। আমার
 পাশে জটনক বসিক শ্রোতা বসে ছিলেন। তিনি বললেন,
 “এমন বামাকৰ্ঠের পর বামকৰ্ঠ কি আর জনবে?”

একই পরেই কৈয়াজ খাঁ সাহেব এসে শ্রোতৃমণ্ডলীকে
 অস্তিত্বান করে আসরে বসলেন। শ্ৰোতাপূৰ্ব হৃৎতালিৰ
 আওতাজে ভরে উঠল।

কৈয়াজ খাঁ সাহেবকে চৰ্চিতে দেখেছিলাম আগে, সেহে
 সেই প্ৰশ্ন দেখলাম। দ্বিতীয় মাসে তিনি বিৰাট পুৰুষ
 না হলেও, 'বদবাঈ' (ইংৰাজিতে বদা চলে 'মাজেস্টিক')
 চেহাৰাৰ জগে ঠাঁকে বিৰাট বলেই মনে হল। জববদস্ত
 ভুটি গৌৰ, দু-চোখে সুৰ্য্যৰ আভাস। চেহাৰা ও ডাবভকী
 সঙ্গীত-সজাটচিটই বটে। শিষ্য তানলেনকে জোখে
 দেখিনি, কিন্তু মনে হল, তানলেনের ঠিক এটি ধরনের
 চেহাৰা ওগুয়া অসম্ভব ছিল না।

কেলার আগে আলাপ হলেন খাঁ-সাহেব। কলমের
 সবগুলো তহীতে কলকার বেজে উঠল যেন। বামাকৰ্ঠের
 পর বামকৰ্ঠ জমলে কিনা, এ বিধে কাহণ মনে একটোটা
 মগ্ধ হইল না।

আলাপ শেষ হতে গড়ির দিকে তাকালাম। বেকলাম
 ঠিক মধ্যরাত। পূৰ্বে পৃথতালিৰ মিনিট আলাপ চলছে,
 কিন্তু খাঁ-সাহেব শব্দের বাহুতে এটি তদন্ত করে রেখেছিলেন
 যে—এতগুলো মিনিট কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল, টেরও
 পাটিনি।

সাম্না-সাম্নি গান শুনে কৈয়াজ খাঁ সাহেবের সঙ্গীত-
 সূক্ষণতা সৰ্জ্জ ধারণা পাল্টে গেল। প্ৰেৰলাম, শু

মঙ্গলশ্রী গায়কই তিনি নয়, হৃদয়শ্রীও বটে না। এবং চাকরি-বেতন শুনে এদের হতো গায়কের প্রতিভার পরিচয় পাঁচবাঁ চোঁটা করা মানতে সহজে চোঁচাকার দেখবার প্রয়াস।

কোলাহ-রাগণি দ্বারাও-অবহাতির গতিবিধির দিক দিবে হুতা তেমন শক্ত নয়, কিন্তু পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট এ রাগের আশ্রয় পানিবে, একপেয়েই এড়িয়ে প্রোত্যাদের মনুদ রাখা সাধাবণ প্রতিভার কর্ম নয়।

আমি বামজাতির অস্বপ্নিত, হুতাং হুতাং বা 'শিলাপরি'র খাতিরে বাম-সঙ্গীতের দিকে লক্ষ্যপাতই হুতঃ আবার পক্ষে স্বাভাবিক বা উচিত। জীমতী কেন্দ্র-বস্ত্রের গানরও আমি অসম্মত হই। তা ছাড়া এবাবে বলে, তুলনা জিমিটাই বড় খারাপ। তবু—গোপনে স্মৃতিপথার খেয়াল-পাতার দিখে রাখতে বাধ্য নেই—এদের গুজনের ভেতর যে-কোনো একজনকে বেছে নিতে হলে, আমি বেছে নেবো ওয়াং কৈয়াক থাকেই। এবং তত্বে সঙ্গীত সঙ্গীতী কেন্দ্রবাসীর অসামান্য সৌরভের কিছুটা লাভবান হইব না। জাতি হিসেবে আমার মনে হয়, নিজস্ব সঙ্গীত-প্রতিভার এবং সঙ্গীত-সাধনায়ও সিক্ষিতে নারী-জাতি পুরুষ-জাতির সমকক্ষ নয়। অনেক বড় বড় বস্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে হিম্মতাবী উচ্চ-সঙ্গীতের ক্ষণে, কিন্তু তারা শ্রেষ্ঠ ঋ-সংগেহবদের সমান পর্বতে উঠতে পারেননি। বাঈল ঋ-সংগেহবদের কাছে তালিম পেয়ে বড় হয়েছেন, কিন্তু কোনো ঋ-সংগেহব কোনো বাঈর কাছে তালিম পেয়ে বড় হয়েছেন এমনটি শোনা যায়নি।

এর পর এক ভোজের বৈঠকে কৈয়াক ঋ সাংগেহ একঘণ্টা খেয়াল গেয়ে শোনালেন রামকেশী রাগে—“উন দক লাগে।” (এ গানখানা ঋ-সংগেহব পরে ‘হিম্মতাবী’ বেকার সাড়ে তিন মিনিটের ভেতর গেয়ে গেছেন। হায়, সাড়ে তিন মিনিট!)

গানখানা শেষ হতেই প্রশংসার উচ্চাস-ধ্বনিতে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের প্রেক্ষাগৃহ ভরে উঠল। আমার সামনের সারিতে বসেছিলেন বাংলায় অন্যতম গায়ক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর হুপালে ধারা ছিলেন তাঁদের পরিচয় জানি না। ভীষ্মদেব বয়স মত প্রকাশ করলেন, রামকেশী রাগের এমন চমৎকার রূপায় তিনি আগে কখনো শোনেননি, তখন মনটা গভীর আনন্দপ্রসাবে ভরে উঠল। স্বয়ং ভীষ্মদেব আমার সঙ্গে একমত! অতএব সমস্তদার হিসেবেও আমি ফেলনা নই। কৈয়াক ঋ সাংগেহ বিচার নিষ্কিনে, এমন সময় প্রোত্যাদের তরফ

থেকে সমবেতভাবে একখানা ঝুঁতির ফরমাসের হল। ঝুঁতিয়ে উঠেছিলেন ঋ-সংগেহ, শ্রিতমুখে বসে পড়লেন। ধরলেন তৈরী ঝুঁরি।

আশ্চর্য! এ যেন আলাপা কৈয়াক, একবারে আলাপ। মেজাজের মাহুত। রামকেশী খেয়াল শুনে মনে হয়েছিল, ওজনদার খেয়ালেরই একনিষ্ঠ সাধক কৈয়াক, খেয়াল বই কিছু জানেন না। ভাবতেই পাড়া যায়নি, এতেন অসামান্য খেয়ালীর পক্ষেও হালকা ঝুঁতি-গানের বাহুর হওয়া সম্ভব। প্রব্ধের জিমিটীপন্থার বাত তাঁর ‘জামায়াগের দিনপঞ্জী’-তে কৈয়াক ঋ সাংগেহের ঝুঁতি-গানের অসামান্য প্রশংসা করেছেন। কৈয়াকের খেয়াল প্রতিভা সম্পর্কে তিনি কিছু লেখেননি। অস্বস্ত আমার চোখে পড়েনি। ঋ-সংগেহের খেয়াল গান শুনে—দিনপঞ্জীতে গোশাল লিখতে লক্ষ্য নেই—বিলীপবাসুর কাণ্ডজান সম্বন্ধে লিখিহান হবার রুটতা আমার হয়েছিল। সেই প্রথম রুটতার মস্ত চরম লক্ষ্য পেলার কৈয়াকের মুখে অপর্যুষ ঝুঁরি শুনে। তখন মনে হতে লাগল—এ-কৈয়াক ঝুঁরি ঝুঁরি-ই একনিষ্ঠ সাধক, ঝুঁরিই এঁর ধ্যান-জ্ঞান, ঝুঁরি বই ইনি কিছু জানেন না; তাইলে ঝুঁরিতে এমন অসামান্য সিক্ষি সম্ভব হল কি করে? আরেকদিনের ভোজাই আসরের কথা বলছি। ঐ ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলোই। কৈয়াক ঋ সাংগেহের গান ছিলনা সে-দিনের বৈঠকে; তিনি বসে ছিলেন প্রোতা হয়ে সামনের সারির একটি চেয়ারে।

কেশরবাসী গাইলেন ললিত রাগের খেয়াল। সেদিন তাঁর ভালো ছিল তবিরত, ছিল গাইবার শরীক মেজাজ। বিশেষ করে একেবারে সামনের সারিতেই তাঁর গান শুনাওন বলে বসে আছেন স্বয়ং কৈয়াক ঋ সাংগেহ, যিনি উপস্থিত না থাকলে সঙ্গীত-সম্মেলন তখনকার দিনে শিবহীন ব্যস্তের সমতুল্য। এতেই বোধ কবি আরো উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন কেশরবাসী। চমৎকার করে উঠল তাঁর গান। মধুর গাথীরে অতুলনীয় ললিত রাগের বরুণ তাঁর হৃদয়িত কর্তে বেন মৃত্ত হয়ে উঠল।

যেমন উৎসাহের গাইবে, তেমন উৎসাহের প্রোতা কৈয়াক। তাঁর মাথা দোলাবার ওকি থেকে বোকা থাকিল, নিজের সমগ্র শরীক দিয়ে তিনি সঙ্গীত-রস পান করলেন।

গান বামতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে ঝুঁতিয়ে কৈয়াক ঋ সাংগেহ। কেশরবাসীর অপর্যুষ সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি মন্তব্য উপহাস দিলেন তিনি। বললেন, কেশরবাসী কখন অবলীলাক্রমে একটর পর একটর মুহুর্ত তাল করে অপর্যুষ

দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে কিরে আগছিলেন তখন ঠাঁর (কৈফাফ
খাঁর) মনে হকিল যেন তেঁতুলপাতার ওপর হাতী নাচছে
("ইমুলিকে পতাপার হাতী নাচ রহা খা")—অর্থাৎ, তেঁতুল-
পাতার মতো কোমল, লম্বা, স্বচ্ছ নারী-কণ্ঠের ওপর
শোমালের ওজনকার ভুরুহ তানব্ব হাতী নৃত্য করছিল।
খাঁ-নাগেধ গাঠেই বলেই জানতাম, ঠাঁর চেতরে যে
এতখানি প্রহ্লাথের-কবির হুকিয়ে আছে তা জানা
ছিল না।

এই একমুখী ভাষায় আরেকদিনের কথা বলি। গানের আদর দেব হয়ে গেছে। শুনলাম, কোনো একটি রাগ নব্বন্ধে তারিখ আলোচনা হবে। বতব্বর মনে পড়ে, ঐ রাগটির বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন নামকরণ হবে কিনা। তাই ছিগ আলোচনার অন্ততম বিষয়। কৈবাজ খা সাহেব আগরের একদায়ে বসে ছিলেন। মাথায় টুপি। তব-আলোচনার ব্যাপারে তাঁকে খুব উৎসাহী দেখা গেল না। তিনি অর্ধবগতভাবে বললেন, “এসব আলোচনার কড়কনিতি কি লাভ হবে? আমার মাথার ওপর এই যে কিনিদাসিটি রয়েছে, একে টুপি বললে এ বা থাকবে, চৌপা বললেও ঠিক তাই থাকবে।”

এ যে তাঁর আগোচনা এন্ড্রির খেঁচে নিঃশেষ অজ্ঞতা গোপন রাখার কৌশল, ভাণ্ড নয়। কারণ শুনেছি ফৈদাফৈয়ার সঙ্গীতশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যও একেবারে তুচ্ছ করবার মতো ছিল না। গুণ্যস্বভিত্তি পণ্ডিত ভাতখওকেও তিনি হিম্মতবানী রাখ-সঙ্গীতের স্বপ্ননে অকৃত্রিমভাবে গ্রহণ মৃদাধন সাহায্য করেছেন।

আরেকদিনের কথা বলি। সেদিনই ষোড়শ বাঁ সাহেবের গান শেষবারের মতো। সামুদ্রা-সামুসি ভুলগাম এবং বাইক ছাড়া বাতাবিক কণ্ঠে সেই প্রথম। বাঁ-সাহেব তখন বালিগঞ্জে এক সঙ্গীত-পৌরিশ দলীর ভবনে অতিথি। সেদিন ছিল রবিবার। শব্দ সেলাষ, ভোরবেলা বাঁ-সাহেব ঐ বাড়িতেই ঘরোয়া বৈঠকে গান শোনাবেন। সঙ্গীত-সম্মেলন এক জিনিস আর ছোট্ট ঘরোয়া বৈঠক আরেক জিনিস। সম্মেলন হচ্ছে বায়োরাগারী বাজার, আর ঘরোয়া বৈঠকে অন্তরঙ্গ পরিবেশ। শিল্পকে সত্যি করে শাওণা বায় এটি অন্তরঙ্গ পরিবেশে।

বৈঠকে শ্রোতাদের ভেতৰ বশা গেল। দেখাযা
কাউ হিলেবে কয়েকজন সঙ্গীত-শিল্পী রয়েছেন; তখনলাগ
ঈ-সাহেবের কাছে এঁরা নাড়া বেঁধে তালিহি গ্রহণ
করয়েছেন। ঈ-সাহেব তখন বাজিৰ ভেতৰি। শোন
গেল, তবিলত ভালো বেই বলে তিনি আল গাইয়েন না।

যনটা ঘরে গেল। অবশেষে জ্ঞাতব্যপ সেয়ে তিনি বহন আসরের একধারে এসে বসলেন তখন একটু আশার সন্কার হল মনে। ঋগ্বেদের হেছাশব্দদের গান শুনেলেন পরম স্নেহভরে। তার পর আমাদের কৃপার দিকে তাকিয়ে বোধ হয় ঐর মনে হল, এ চোরাগাছ অনেক সঘেছে, এবার এদের কিছু ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা প্রকরণ। বসলেন, “আমার তবিত্ত খাওয়া। কিন্তু আপনাতা আমার প্রতি স্নেহভরে আমার গান শুনেও এসেছেন। গান না শুনিয়া আপনাদের ফিরিয়ে দিলে আমার অপরাধ হবে, আফসোসেরও সীমা থাকবে না। ছোট করে একটি হালকা গান তাই আপনাদের শোনছি।”

বাংলা গাইলেন—“বাজে খোদি গায়েলিঃ”। ওজনদার গানের মেহনত সইবার মতো তব্বিত ছিল না, তাই হালকা করে স্লো শাগিদে হালকা গান গাইলেন। স্লো থেকেই গানখানা ক্রমে সেপ। বাঁশীর বক্তো মিঠে গলা যাকে বলে কৈদাজ বা সাহেবের কঠ তখন নয়, কিন্তু হৃদয়ের ভেতর নিজেকে একাক্তভাবে জেলে দিতে পেরেছিলেন বলেই বোধ করি তাঁর কণ্ঠধ্বরে জলদগড়ীর মাথুঁর শ্রোতাধের মন আবেশে উঠিবে দিল। তা ছাড়া তাঁর কণ্ঠে খৌড় এবং ‘কোদারি-ব’ হবে অসামান্য শ্রাঘুঁ ছিল, তারও সুসন্না বিদল। চেয়ে দেখি, আব্বাসের ওজাদী গানের পরম বিদগোবী বুড়ো-মশাই তখন হয়ে গুনছেন—ওজাদি-বিতোপ কোবার উৎপে গেছে তাঁর মন থেকে। আসরের শেষে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে খ-সাহেবের গানের প্রশংসায় তিনি পক্ষ্মণ হয়ে উঠলেন। লেবলাষ, ওজাদী গান সবছে তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ বলে গেছে। এই বুড়োমশাই-ই রেকর্ডে কৈদাজ ঝাঁর গান শুনে ঐতাকে উঠেছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! সামনে কৈদাজ বা সাহেবের গান শোনার পর ঠিক সেই রেকর্ডগুলোই বুড়োমশাই যখন আব্বার ভুললেন তখন তাদের ভেতর নতুন রূপ, নতুন মাথুঁর খুঁজে শেলেন তিনি। স্বতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কৈদাজ বা সাহেবের গানের রেকর্ডগুলো তিনি খার খার বহবার গুনছেন, গুনেনও তাঁর আশ খেটনি।

তার কারণ—কি দক্কাত, কি সহিত্য, কি শিল্প—সব
ক্ষেত্রেই প্রকাশের মধ্যে এমন আশ্রয় বাস্তবিকি খুঁজে পাই,
ওখানে তা আশ্রয়ের অন্তরকে পাথে অন্তরঙ্গভাবে লগ্ন
করে। দক্কাতের ক্ষেত্রে শিল্পীর বাস্তবের প্রত্যক্ষ
অসাধারণ। তাই গায়ন-বত গায়ককে সাধন দেখে তাঁর
গান শুনেও বত ভালো লাগে, বেশখা থেকে তত গভীর-
ভাবে ভালো লাগে না।

ঐচ্ছিক বা সাংকেতিক বিগত চলেছেন। গ্রামোফোন বেকের ঐক্য কয়েকখানা গান রচনা করে গেছে। গ্রামোফোনে বেকের ব্যক্তিগত সৌন্দর্য গান যখন শুনিল তখন মনের চেয়েও সামনে এসে উঠে ঐচ্ছিক বা সাংকেতিক চিত্র, অর্থাৎ মন চিত্র বা কল্পনা করে নেয়—সামনে বলে বা-সাংকেতিক গান শুনি। বেকের স্বরস্বরের গানের চেয়ে যে ঐক্য থেকে যায়, সেজন্যে সৃষ্টি ও কল্পনার রূপ দিয়ে ভবিষ্যৎ চিত্র। কিন্তু ঐচ্ছিক বা সাংকেতিক রচনা কেবলমাত্র বা সাংকেতিক বলে ঐক্য গান শোনেমনি

। হায়, কী ভিন্নমত ঐচ্ছিক চিত্রিতেন!। তাঁদের কেবলমাত্র এ সম্ভাবনার অবকাশ নেই।

ঐচ্ছিক ঐচ্ছিক বা সাংকেতিক নেই, ইন্ট্রিনিজিটি ইন্ট্রিনিজিটি হল এখনও আছে, বিভিন্ন অঙ্গান উপলক্ষে যখনই সেখানে যাউ তখনই মনে পড়ে ঐচ্ছিক বা সাংকেতিক কথা। যখন হয় যখন সামনের সারির চেয়ার থেকে ঐচ্ছিক উঠে মাকে জিম্মা কেন্দ্রবাসীর নিকে ডান হাত তুলিয়ে দিয়ে আমাদের উল্লেখ তিনি বলছেন : “ইন্ট্রিকে শক্তির ছাড়া মতে বলা যা...”

কোন : ২২-৪৬৮৭

এস, মুখার্জী এণ্ড কোং

[কাগজ ও মুদ্রণের কালি বিক্রেতা]

পি. ২২-৪, ব্রাহ্মবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা ১

সংশ্লিষ্টব্যক্তিক :

টিটাগড় পেপার মিল্‌স কোম্পানী লিমিটেড

এবং

হংলি ইক কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড



পুস্তক-সমালোচনা

১. সমকালীন সাহিত্য ।

[নবাবল চৌধুরী কবিতা । প্রকাশক : এ. মূলতী আও কোং, ২, কলকাতা বোম্বাই, কলিকাতা । মূল দ্বিঃ ১০০]

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সমালোচনার ক্ষেত্রে সীমাবাদন চৌধুরীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে । নিঃস্বার্থে নিঃস্বের মত, ভালো-লাগা এবং না-লাগাকে নিরাসবদভাবে প্রকাশ করার মতো মানসিক বলিষ্ঠতার তিনি অধিকারী । যদিও সমালোচকের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য এইখানেই, তবু সাধারণ স্তরের লেখক বা পাঠক মাকে মাকে এই নিঃস্বের ভাষণকে শ্রবণের সঙ্গে স্বীকার করে নেননা । এর প্রমাণ ইতিপূর্বে পাওয়া গেছে ।

ঠিক এই কারণে বর্তমান গ্রন্থটি বিশেষ দৃষ্টির সঙ্গে পাঠ করার চেষ্টা করছি । 'আলোচ্য গ্রন্থের সমস্ত প্রাণন ছুঁতে আমাদের প্রস্তুতি ধারণাকে আঘাত হেয়ার যে আঘাতন রয়েছে, অতি সাধারণের সীমাবাদের একটি উর্ধ্ব উঠতে না পারলে, সেই আঘাতনকে শ্রদ্ধা করা কঠিন হয়ে পড়ে । সম্ভবতঃ লেখকের তথাকথিত অপরাধের হুক এইখান থেকেই । কিন্তু আমার বিশ্বাস, লেখক হিসেবে স্রীচৌধুরীর হাতা হুকও এইখান থেকেই ।

বর্তমান গ্রন্থ যে প্রবন্ধগুলি স্থানলাভ করেছে, তার প্রায় সবগুলিই সমকালীন বাংলা-সাহিত্যের মানানসই সমকাল ও তার প্রতিক্রিয়ার পথ নিয়ে গঠিত । এক গভীর দৃষ্টি নিয়ে লেখক এখনকার বাংলা সাহিত্যকে দেখেছেন এবং সাহিত্যকে তিনি সত্যিই ভালবাসেন বলে, তার ত্রুটিগুলির দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । এই কাজ অস্বাভাবিক । কারণ সাধারণ লেখক বা পাঠক, যেকোনো সাহিত্যের গতিশীল বা তার জঘিত্য নিয়ে বিশেষ চিন্তা করেন না, শুধু বানিজ্যটা নগণ বিচার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন, সেখানে কিছুটা নীতিবাক্য উচ্চারণ একটি আপাত-বিশদুপ ঠেকে ।

'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'বাংলা সাহিত্যের সমকাল', 'সং সাহিত্য', 'সাহিত্যে বাস্তবতা', 'স্বাধীন-গঠিত সাহিত্য'

প্রতি প্রবন্ধগুলিতে গভীর মানসিকতার স্বাক্ষর বর্তমান । এইগুলির নাম: 'হানি' তিনি কল্যাণ-গোষ্ঠীর বিক্ষুব্ধ কিছু অভিযোগ উপস্থাপন করেছেন । অবশ্য এই যুগের প্রশংসারও তিনি রূপগতা দেখাননি । তিনি বলেছেন—“গণতন্ত্রের অদ্বৈত ভাষ্যনি বাংলা সাহিত্যে সেই আদ্য প্রথম সুনাম । কল্যাণ-গোষ্ঠীর লেখকগণ তাঁদের দৃষ্টি “সমাজের এমন সব স্তরে প্রসারিত করেছেন যা পূর্বে বাংলা সাহিত্যের বিষয়ীভূত ছিল না । নীচু স্তরের মানুষ, যেন কুমারী মদুর খাউন মুচি হাড়ি ভোম এবং সাধারণভাবে প্রতিক্রিয়া ও কৃষকের জীবনের স্বপ্নস্বপ্নকে সাহিত্যের শাভার কথায়িত করার এই যে চেষ্টা তা সত্যি প্রশংসনীয়”, কিন্তু ঠিক একই সময়ে, এই কল্যাণ-যুগের বিক্ষুব্ধ তিনি কয়েকটি কঠিন কথা বলেছেন, কথাগুলি আপাতদৃষ্টিতে কঠিন হলেও, কিন্তু সেগুলি যে আমাদের নতুনভাবে চিন্তা করার সূচনা দেয় সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । সমালোচনাকে স্বপ্নতার প্রকাশ বলে মনে করি হলেই, কোন কোন ক্ষেত্রে লেখকের সঙ্গে ঠিক একমত না হলেও কথাগুলি আমার ভাল লাগেছে । তিনি বলেছেন—“কল্যাণ-গোষ্ঠীর কল্যাণের মধ্যে বহুসংস্কৃত লক্ষ্যতা যে পরিমাণ ছিল, বিশ্বাসের জেরে সে পরিমাণ ছিল না ।” “হাত বড় বিস্তারিত প্রতিভা নিয়েই আমাদের আশ্রয় করা থাকে না কেন, সেই আমাদের পক্ষেই যদি প্রবীণ দৃষ্টির স্বৈর না থাকে, তাহলে এক সম্ভব না এক সময় তা মিথ্যে বলেতে বাধ্য ।” আমার মনে হয়, সাহিত্যে বিশ্বাস-স্বপ্ন বা স্বাধীনভাবে বিশ্বাস-স্বপ্ন কখনও স্বৈরিত্বের বাধ্যবাধা গণিতের পথ বেয়ে চলে না । সে এলোমেলো উদ্ভাসগণিত চলে বলেই, তার নাম বিশ্বাস । এবং বিশ্বাসের স্বপ্নের মধ্যেই সব সময় কিছু-না-কিছু ভ্রমের স্বপ্ন হয়ে থাকে । তবু লাভ, যেটুকু পরিমাণটি পড়ে—অধিক উর্ধ্ব করে তোলে । কল্যাণ-যুগের

মধ্যে অস্পৃহ্যতা বজাল, কিছু ছিল, কিছু তার চেয়ে বেশি ছিল উত্তর পরিমার্জিত। আভ্যন্তরীণ শিল্পের কথা-সাহিত্য সেই পরিমার্জিত বস্তু।

'রবীন্দ্রনাথ' এবং 'রবীন্দ্র নাথের স্বপ্ন' প্রবন্ধ দুটির মধ্যে ডিফারেন্স বোঝানো যায়। রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'স্বপ্নের সূত্র' এবং 'মানবতাবোধ' রবীন্দ্র কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে নতুন স্তরের উত্থাপন করেছে। ইতিপূর্বে এই সম্পর্কে আলোচনা হয়নি তা বলা যায় না, তবু তা ব্যঙ্গ্যক নয়। আমরা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় গান বা কিছু কবিতা নিয়েই সন্তুষ্ট। কিন্তু তাঁর বিরাট প্রবন্ধ-সাহিত্য। আরও আলোচনা করে প্রায় অসম্ভবিকৃত খোঁজ গেল।

'সাহিত্যে মানবত', 'ভীষ্ম-চরিত্র সাহিত্য' ও 'সং সাহিত্য' প্রবন্ধগুলি উপস্থাপনা। বিশেষ করে 'সং সাহিত্য' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে। সং সাহিত্যের সংজ্ঞা হিসেবে শ্রীত চৌধুরী বলছেন—'তিনি (সাহিত্যিক) যে সাহিত্য পরিবেষণ করছেন তাতে পাঠকের জড়ি ও স্বভাব উন্নততর হওয়ার মতো মালমসলা আছে কিনা, সে হলো সাহিত্যের সৌন্দর্যশূন্য ও মানবতাবোধকে উন্নয়ন করে কিনা, যেখানে সৌন্দর্যশূন্য ও মানবতাবোধ নেই, সেখানে তাৎপর্য অগ্রাহ্য করে কিনা। এই শর্ত যে লেখক পূরণ করতে না পারেন, তিনি আর বাই হোল, সাহিত্য-প্রস্টা নন।' এবং 'যে সাহিত্য মাংসময় সং করেনা, সাধু করেনা, সৌন্দর্যপ্রিয় করেনা সে-সাহিত্য সাহিত্য নয়।' লেখকের প্রকাশভঙ্গি এখানে উপাত্তের মতো জড় এবং কথাগুলিও বিশেষভাবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কিন্তু সাহিত্যের কাজ এ ছাড়াও আছে। মেনে, সাহিত্যের কাজ—প্রকাশ করা ও রক্ষণ করা। এক্ষেত্রে, পার্থক্যে সং করা বা সাধু করা প্রকৃতি কামড়ানি সাহিত্যের পরবর্তী কর্তব্যের পর্যায় পড়ে।

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান প্রবন্ধ-গ্রন্থটির মধ্যে ডিফারেন্স, জ্ঞানের ও বস্তুবিশ্বের গভীরতা আছে। অসম্পূর্ণভাবে নিজের মত প্রকাশ করার মতো বলিষ্ঠতা এই

পুস্তকের প্রতিটি পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে লেখকের প্রতিপক্ষ বিচারের সঙ্গে একমত না হলেও লেখক নিরপেক্ষ পাঠকের অবিচলিত ভ্রাতা দাবি করতে পারেন।

দুটি সামান্য ত্রুটি আমার চোখে পড়েছে। একটি হচ্ছে 'আত্মিকগত'। লেখক ভক্ত প্রবন্ধের মাঝখানে কোথাও কোথাও এমনভাবে কথা বলেছেন যাতে প্রবন্ধের ভাবসাম্য ঠিক রক্ষিত হয়নি, হালকা লেগেছে এবং ব্যতিক্রমী মন্তব্যের ভঙ্গী এসে গেছে। দ্বিতীয়টি 'হ'ল, সমকালীন সাহিত্য আলোচনা করার ক্ষেত্রে তিনি সমকালীন কবিতাকে প্রায় তাঁর আলোচনার বাইরে রেখেছেন। সাহিত্য কেবল কথা-সাহিত্যের জমিসারি নয়। কাব্য-সাহিত্যের দাবি কথা-সাহিত্যের পূর্বভাগে, এ কথা লেখক তাঁর অন্ত একটি প্রবন্ধ-বইতে স্বীকার করেছেন। কিন্তু বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থ তাঁর ব্যতিক্রম হয়েছে।

'সমকালীন সাহিত্য' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্রে এখানে নয়। আর যেহেতু আলোচনা 'হ'ল, তাতে আমার বিনীত মতঃপট্টমকে প্রকাশ করেছি মাত্র। কিন্তু তার বাইরে বহু দৃষ্টান্ত তুলিনি এবং ডিফারেন্স মনের বহু পুস্তকের খোঁজ তিনি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট তুলেছেন। সাহিত্য-পাঠের মান উন্নত করতে হবে, এই প্রবন্ধ-গ্রন্থটি একটি অপরিসংখ্য সংকলন বলে স্বীকৃতির দাবি করতে পারে।

আলোচ্য সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে একটি যোগদ্বয় রয়েছে এবং প্রবন্ধগুলি এমন হয়ে রচিত—যার থেকে বোঝা যায়, লেখকের জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যে সম্পর্ক, তা 'হ'ল সাধনার সম্পর্ক। সাহিত্যকে উপস্থার মতো গ্রহণ করেছেন, এই পুস্তক সব সময় খুব বেশি পাওয়া যায় না। কিছু টিপস গল্প বা কবিতা লেখা বা হুঁসিয়ার অস্বাভাবিক প্রশংসার হাততালি নিয়ে সাহিত্যের ব্যবসা করা যেখানে প্রচলিত মূলধন, সেখানে সাহিত্যকে অবিচ্ছিন্নভাবে জীবনের সঙ্গে গ্রহণ করা, স্বপ্ন করা এবং বরণ করা একটি অপরিসীম ব্যতিক্রম। 'সমকালীন সাহিত্য' গ্রন্থটির মধ্যে এই ব্যতিক্রমের মহৎ দোহর ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

—নৃনাথ দাস

। গড় জীবন ।

[লেখক : অমিত্রধন বসুধার : একাধিক : নাতনা। দূর : আট টাকা]

- অমিত্রধন বসুধার-এর 'গড় জীবন' তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নীল ছুঁইয়া'র মতোই ইতিহাস-আধুনিক। 'নীল ছুঁইয়া'র ঘটনাবলি প্রাক-সিঁপাহীযুগে বাংলাদেশে (১৮৫৫-৫৬ খ্রিঃ)

আর 'গড় জীবন'র ঘটনাবলি বর্তমান শতকের পঞ্চদশকের প্রায় বাংলা (১৯০৫-০৬ খ্রিঃ)। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাস, এইটুকুই বা সাদৃশ্য।

'নীল ভূঁইয়া'র ঘটনাক্রম একান্ত ক'রে বেখানে ব্যক্তি নির্ভর (একবার পিরোজা আর বৃজরক-ই পুরোপুরি সার্পক চরিত্র), 'গড় ঞ্জিৎও'র মৌল সমজ্ঞাতি সেখানে দ্ব্যুত পদ্ধতীরবতী তিন-চারখানি গ্রামের প্রতিনির্ভর কীবনভার উপরে বিস্তৃত। অর্থাৎ পিরোজা আর বৃজরকের অধুপস্থিতিতে 'নীল ভূঁইয়া'র মূল সংঘাতটি দুর্বল এবং অশেষ হয়ে পড়া অবতরভাবী, কিন্তু 'গড় ঞ্জিৎও' বাংলায় কৃষককীবনের মহাকাব্য। সেখানে ব্যক্তিবিশেষের উপস্থিতি বা অধুপস্থিতি ভুলনামূলকভাবে অপ্রধান। অল্প পক্ষে, যে কালোচিত ও তীক্ষ্ণ ইতিহাসবোধ 'নীল ভূঁইয়া'র ঘটনাক্রম এবং প্রতীকী চরিত্র পিরোজা ও বৃজরক-কে অনন্তরূপে ভূষিত করেছে, 'গড় ঞ্জিৎও' সেই ইতিহাসবোধ ও কালোচিতের অধুপস্থিতি অল্পতম ক্রটি হয়ে ধাঁড়িয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসের প্রথমটিকে বিত্তীয়-বহাযুক্ত-প্রত্যগত সৈন্তদের রেল ক'রে কোয়। আর গড়ভিক্সির মতসজাবী সামরিকের কথায় দুর্ভিক্ষের উল্লেখের কালে এ দিকান্তে সহজে পৌঁছানো যায় 'গড় ঞ্জিৎও'র ঘটনারস্ত ১৯৩৬-৩৮ সালে। আর উপন্যাসের শেষাংশে দেশবিভাগের উল্লেখ থেকে এর ঘটনাক্রমের যে অধুপস্থিতি সীমারেখা টানা যায়, সে হল ১৯৪৭ সাল। এই তিনটি বড়র সারা বাংলায় ইতিহাসে বিশেষরূপে ডাঙপর্ণপূর্ণ। দুর্ভিক্ষ, তেভাগা আন্দোলন, সাম্রাজ্যিক দাঙ্গা, ইংরেজের ভারত-ত্যাগ ইত্যাদির প্রভাব দে-সময়ে সারা বাংলায়বেশেই অমুচুত হয়েছিল (বনিও ভুলনামূলক পিচারে তেভাগা আন্দোলন দক্ষিণ-বঙ্গেই আলোড়ন জুড়েছিল বেশি)। 'গড় ঞ্জিৎও'র ঘটনাক্রমের উপর এতসব সমকালীন ব্যাপারের প্রভাব লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে অমিরচূষণ-বর্ণিত পদ্ধতীরবতী বিত্তীয় ভূখণ্ডের বাসিন্দারা সমসাময়িক ব্যাপার দ্বারা সামান্যই প্রভাবিত হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের উল্লেখ অবশ্য 'গড় ঞ্জিৎও' উপস্থিত, কিন্তু তার ভাবাবেগ সংসদীশা জু'রামচল মওলেকীকতার দৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা হল। আলেক সেনের পত্রের দ্বারাও সাম্রাজ্যিক দাঙ্গার স্বীকৃতি মেলে সত্যি, কিন্তু গ্রামের গড়ভূমিতে একটি বিচ্ছিন্ন-কল্পিত আশ্রয়ের মধ্যে তার সমাধান অত্যন্ত জোশো রেঁকে। মনে হয়, structural symmetry-র জন্তে সম্ভাব্য ঘটনাক্রমকে সহজে পরিহার ক'রে যাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অমিরচূষণ 'গড় ঞ্জিৎও'র ঘটনাক্রমকে একটি বিশেষ যুগপটের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করতে অসমর্থ হয়েছেন। একটি আকর্ষণ ইতিহাসবোধ 'নীল ভূঁইয়া'র আখ্যানকে বিশেষরূপে ব্যক্তিগত করেছিল; 'গড় ঞ্জিৎও' সেই ইতিহাসবোধের অধুপস্থিতি ও বৃক্ষ-গভীর

ব্যস্তবতানোধ সমসাময়িক ব্যাপারগুলিকে উপন্যাসের আখ্যানের সঙ্গে অকাঙ্কীহতে আদর্শ বসতে পারেনি।

'গড় ঞ্জিৎও'র কালোচিতের পরে আসে তার ঘটনাক্রম প্রসঙ্গ। দেশবিভাগের সীমারেখা বিখ্যাতকৃত ক'রে চলে গেছে, পদ্ধতীরবতী এমন গ্রামাকল বসতে নদীয়া রেলার উত্তরাংশকেই বোঝায়। কিন্তু বহন আমরা এখানেই পটভূমিতে উপস্থাপিত সাক্ষর উপস্থাপিত ও ওপানের আকর্ষণিক ভাষাপ্রসঙ্গ আলোচনা করি, তখন ঐ কল্পিত ভৌগোলিক সীমারেখা রীতিমতো অশেষ মনে হয়। সাক্ষর উপন্যাসের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ভাষা অজ্ঞাতনের অশপেক্ষা মোটেই পুথক ক'রে বেগানো হয়নি। তর্কের ব্যতিরেকে যদি ধরেও নিই যে, ছিন্নমূল সাক্ষরদের বৃহৎভাষার প্রতিষ্ঠিত করার পর কালক্রমে তারা তাদের স্বাভাব্য হারিয়েছে, তাহলেও আমাদের সমস্তার সমাধান কিন্তু করা হবে না। প্রস্তুতই হবে এবং তাৎসব সঙ্গত কারণেই—বে, যাগের ব্যাপার প্রাণ ব্যতির বন্ধনে গড়ে সামাজিক হ'তে পারলো না, সেই সাক্ষররা একপুস্তকের মধ্যে কি ক'রে বিসর্জন দিল তাদের স্বাভাব্যতা, তাদের এলা বা ভাবার স্বাভাব্যতা? তা ছাড়া সাক্ষর নামে কোন উপজাতির অস্তিত্ব ও আমাদের অবস্থতির ব্যতির।

এমনতরো দু-একটি অসঙ্গতির মধ্যে দিয়ে আমাদের সেই পুরোনো সত্যটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 'গড় ঞ্জিৎও' বর্ণিত কীবনপ্রবাহটি বাংলাদেশের যেকোন যুগপর্বে ও যেকোন প্রত্যন্ত অংশে বিস্তৃত হতে পারতো। 'গড় ঞ্জিৎও' উপন্যাসে চরিত্রসংখ্যার অল্পসংখ্যাবিশিষ্টকর। এতদেব দ্বারাও উপজীবিকা যে কৃষি তা নয়; চিনাখের ছেলে মাথাই যাদের সিংহাসকর রেলস্টেশনের গোষ্ঠার; ইউরক, কটিক, আবহুল গনি-রা নোকে-শেডের বেহনতী কবী; টেঁপির বা উপন্যাসের প্রথম দিকে চালের চোরকারবতী। কিন্তু তা হলেও, সিংহাসকের আধাপরদের পরিণামই বার বিশেষ নয় 'গড় ঞ্জিৎও' বর্ণিত সমাজকীবন একান্ত ক'রে প্রতিনির্ভর। এমন কি চিক্সির ঐক্যবান সমাজ-পরিবারও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই দেখি—মাটির টান হুনিয়ার; আলেক সেন পেলন পারার পর জমিতে ফিরে আসে, ফতেহা আর সুব্রহ্মন্যাসর মতো সাক্ষরনীর্যও বৃহৎভাষার গ্রামকীবনকে আশ্রয় করে, আর সিংহাসকের ইন্দাইল কসাইয়ের ছেলে ইয়াক কৃষক বনতে চায়। বাংলার কৃষিকীবন 'গড় ঞ্জিৎও' তার সমগ্রতার ব্যাপ্ত ও বিকশিত, তার সমজ্ঞাতীর্ণ অদর্শ অস্তিরের প্রতিফলনে এ উপন্যাস নন্দুজ। চৈতন্য সাহার সার্পকতা এখানে শুধু কোন বিশেষ ব্যক্তিরূপের বিশিষ্টতা

নয়। সে সার্থক, কারণ সে দৃষ্ট সার্থক যোগির প্রতীক-ও বটে। প্রকৃতির দাম্ভিকতার উপর যে-কোনও কথিত্বদীন একান্তনির্ভর দেখানো সম্ভব, উৎসাহ আর কাহিনী পরিচয় কলণ কলনের গন্ধে দ্ব্যর্থক নয়। আর তাই পলালের বহুস্তরের তাহগ্রাস হতে কাঁচার জন্তে দাম্ভিকত্যা, চিকিৎসা আর চরুপকাদির চাবীলের বহুস্তে ছয় চৈতন্য সাধারণ কবলে। নির্ভয়, শোভা, অসং মহাজন আর সন্নিহিত ঐক্যপন্থির সংঘাতটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে সেবেছেন ঐক্যপন্থির অমিয়-ভূষণ। তবে সে সংঘাতকে শের অধি নিয়ে বাঙালিতে তুলে প্রবল অনিচ্ছা আছে মনে হয়েছে। এসংগত চৈতন্য-সাহায্যে একটি ভালোমানুষ হিসেবে বেথানোব সন্ন্যাসী-কবির প্রতীক-সংঘাতের তীব্রতাকে অনেক দূর করে দিয়েছে। চৈতন্য সাধারণ পলায়ন-কবির তার দৌর্য্যকে এক সহস্র প্রকাশ করে দেয়। আর তাই দেখি, কবিত্ব-কবির সর্বশেষে প্রতিষ্ঠিত সংঘাতটির অশুদ্ধতা ঘটলে অপ্রত্যাশিত অশোভনের মাথা।

'গড় শ্রীধর' পরিচয়টি উপভাসের স্ট্রেট সম্পদ। সামাজিকভাবে কবিত্বের কবিরের মূল সুরটি ধরার ব্যাপারে লেখক যেমন তীব্র প্রতিক্রিয়ার পরিচয় দিয়েছেন, তিক্ত তেমনই অস্বস্তির প্রকাশ হয়েছে তাদের ব্যক্তিগত স্বত্ব-স্বত্ব, হাসিকাতার বলা-নির্মাণে। ব্যাক্ত্য চিকিৎসার মাত্রার গাথি, গানের আর সঙ্গীতের দুপার—কিন্তু সেটা হল তার বাইরের চুম্বিকা। তার আন্তর সত্তার বিদ্যুৎ প্রকাশ দস্তর। মৃত্যু আর মৃত্যু কতর সন্ধ্যা তার একলা রহি-কেনার উচ্চাভিলাষ বর্ণনার গল্প 'আলো বোম্বদন' কবলে, চোখ তার অঙ্গসজল হয়ে-ওঠে। স্ত্রী সন্যাসকে বেঁধে মৃত্যু-বাঁধীতে তুলসীতলার দীপ আগতে বেঁধে উচিত্যাবোধ আর রূপবস্তুর সংঘাতে তার রূপের তলদেশ মরিত হয়ে ওঠে। কিংবা হৃদয় ও মৃত্যুর অবস্থান-বাহু ক্রুহ হ'লে সে বদন গাঠি হাতে বাঙালি চাবীদের সন্ধান নয়, তখন মৃত্যুর জন্তে যে রূপ তার সূচী ওঠে, সে দেখি আর-এক রূপচক্রের। আর এই দৃশ্য সূচী অমিয়গীর ভাবে চাপ রেখে বাধ পল্লব-বায়ের মনে। এই যে ঘটনাক্রমে মাথামে কীবনীপন্থির বিভিন্ন বিকাশ, এর মধ্যে ঐক্যপন্থি-কবির তীব্র অস্বস্তির চাপ স্পষ্ট। 'গড় শ্রীধর' সংঘাতীত চরিত্রের সমাবেশ, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কীবনমুখে পরাজিত রাস্তা পলায়ক সৈনিক সীতেশ্বর, কিংবা কুচ-কথিত লেকট্যারি হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষার জর্জরিত আলোক দেখ, কিংবা দিবা-বন্ধের চেনার-সাধকের

হস্তিকা টেঁপি—প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সত্যটি উদ্ঘাটিত করতে গেছেছেন অমিয়ভূষণ। বিশেষ করে স্ত্রী আর মাথাইয়ের জটিল সম্পর্কটির চিত্রণ তীব্র মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের স্বাক্ষরবাহী। বিবাহের জৈবিক, মেধগত ব্যাপারটির ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্ত্রীর একটি আঁদম্বল-বর্তমান। মাথাই তার পরিব্রাতা, সত্ত্ব সত্ত্ব আশ্রয়লাভ ও বটে। কিন্তু মাথাই তার কাছে মাথাই-ই, তার পুরুষ সত্যটির প্রতি সে চিরকাল অববর্তিত থেকে এসেছে, যেমন মাথাইও তার মাতার সন্ধানে থেকেছে বহুরূপ উদ্যোগী। সহসা বাঁধের জলে একদিন জানের গারে হস্তের এতদিনকার অবস্রাত অজ্ঞাত রূপ মাথাইকে বিদল করে তোলে। কিন্তু তার ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রচেষ্টাকে নির্ভরভাবে উপেক্ষা করে স্ত্রী হারা চলে আসে বুধেচাড়া। আশাত-বিশ্বাসের এই পলায়ন; কিন্তু 'এত সন্তের বাব জীবন তার মাথাই এমন করে কেন'—কথা-ক'টির পটভূমিতে সে-পলায়ন বিশেষ তাৎপর্ষের অধিকারী হয়ে ওঠে। ঐক্যপন্থির অমিয়ভূষণ-গভীর মানবতা-বোধের অধিকারী। আর সে মানবতাবোধের প্রকাশ হ্রস্ব নয় 'গড় শ্রীধর'। দ্বিধা-পন্থর সম্পর্ক-বিশ্লেষণে মৃত্যু সুলসিঁপির সম্মানধের, ফতিয়ার স্বাধীনতার ব্যাপারে সে মানবতাবোধের উপস্থিতি স্পষ্টই অস্বস্তির চৌকিত্যে পড়ে। প্রসঙ্গত, হাদস-বাহু-স্ত্রীর হৃদয়-তাক্তি পরিবারটির গ্রাম-ভাষার দৃষ্টি অস্বস্তির। 'যাচা চলে বাঁধিল, তামা মাটির দিকে চোখ নাখিরে নিল, বেন সন্ধ্যের পথ অত্যন্ত দিচ্ছিল।'—কথা-ক'টির মধ্যে ঐক্যপন্থির অসীম কাব্যতা সূচনীক্য নয়। এত সহজাত সাংবেদনশীলতাই ইচ্ছাকারের কবিত্ব উপস্থিতিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। কিন্তু এই চরিত্র-প্রাণবন্ত আলোচনার ঐক্যপন্থির একটি অক্ষমতা আমরা লক্ষ্য না করে পারি না। সে হল সত্য-পরিবারের রূপাংগ। 'গড় শ্রীধর' স্ত্রীর পটভূমিতে এমন একটি পরিবারের উপস্থিতি গ্রামীণ-সমাজের দিক থেকে অতিপ্রবেশজনী বটে। কিন্তু সে উপযোগিতা ছাড়া এর আর কোন মূল্য আছে বল মনে হয় না। সমগ্র চরিত্র-নির্মাণ ও বিশ্বকরণ বক্রের ক্রিয়াম। সমান-মাত্রার চিত্রকর, বিশ্বকরণ হিসেবে পরিচিত, কিন্তু তার সে চিত্রাংকণ ও বৈবধ্যকে কোথাও প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি, যেমন প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি স্ত্রী-পরিবারের দেশ-প্রদেশের বহুপটিকে। আর অস্পষ্টতা তো—কি সত্য-মহাশয়, কি রূপ-গায়ন, কি স্মৃতি, কি অনস্মৃতা—সম্প্রদায়ের বর্তমান।

ঐক্যপন্থির সার্থক চরিত্র-চিত্রণে সহায়ক হয়েছে তাঁর রসবোধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—'মাথাই জানে না, তার

পাড়ানোর ভকীটি কোলম্যান-সাহেবের মতো' অথবা রামচন্দ্রের ক্রমিক প্রতিবেদীর অন্তর্ভুক্তি—‘মোলডল বুপি গা। চাগবা লা’ অথবা নিজের পাঠান-রক্ত সম্পর্কে নিঃশব্দ অশ্রুকের পুরকে চিহ্নিত লেখা—‘আর এক কাজ করবা, কলকাতায় পাঠান যদি থাকে খোজ করবা তারা। কাবুলী পাগড়ী ধাখে, না ইপি পরে। মনে রাখবা আমরা পাঠান বংশের’।

‘গড় শ্রীপেত্র’ অন্ততম বড় সম্পদ তার ভাষা। এখানে লেখক আকস্মিক কথোপকথনের বে ভাষাস্বতন্ত্র প্রয়াস পেয়েছেন, তা আশ্চর্যকরমাত্র সার্থক। ‘গড় শ্রীপেত্র’ বাসিকারো যে ভাষার কথা বলে, তা কোন বিশেষ আকস্মিক ভাষা নয়। বরং নানা স্থানের ভাষা-সম্মিলনে তার সৃষ্টি; যেমন—‘নেচ্চা’ [নিম্ন অর্থে], ‘জোলা’ [জলা অর্থে], ‘নাইগা’ [ক্ষত অর্থে]; দক্ষিণবঙ্গের কথাভাষা হতে আহবিত—‘জগোমান’ [ভগবান অর্থে]। ‘মিমেছেলের লচ্চা হায়া’—যা বৈদিকগুণের আকস্মিক ভাষায় বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু উপস্থিতি যেভাবেই হোক না কেন, এ ভাষা-স্বতন্ত্রে অসামান্য শক্তির ছাপ আছে। কোন কোন স্থলে এ ভাষার বিশেষ প্রয়োগই তাঁর চিত্তকে

উল্লেখ্য করে তুলেছে। যেমন বহা বাস, জুরোর গল্পকে খাওয়ারো বৃন্দ—‘কহ যে খাতে তিবি বাবলার দানা, ব্রুপ হবি বটের আঠা’। এখানে জুরোর বিশেষ বাচনভঙ্গীর জন্তে তার সারিত্রা আবও নির্ভর হ’বে চোখে দাঁতে। আকস্মিক কথোপকথনের ভাষাপ্রয়োগেই শুধু শক্তিমান শিল্পী মন অমিরদুবণ, সাধারণ চলিতভাষার মধ্যেও অমিরদুবণের স্তর গভীরতা স্ফুরিত করে পেয়েছেন তিনি। পদ্মর প্রপে রামচন্দ্রের উত্তর—‘খে’ ? না কাজে, এসেলে আর খেত নাট’, কিংবা রামচন্দ্রের মনোভাব—‘এ মাটি তার যা না হাখে জাহান্নামী হয়েছে’, অথবা কাচিনীর অস্ত্র বস্ত্রের বর্ণনা—‘খেকে খেকে পদ্মার নুখ কাগো হাখে উঠেছে তখনো, মূলে কুপে উঠেছে তার নুখ। উপরে ড ড ক’রে বেঘ জাকছে। শূরণটা যদি কারো জানা থাকে, হাতো কারো মনে হতে পারে কেউ যেন অস্ত্র কাউকে বসছে—হাচ্চা করো, হাচ্চা করো’—অসম্মান্য গভীর ভাবগর্ভ-সম্বোধিত হয়ে ওঠে।

‘গড় শ্রীপেত্র’ নাভানার অন্ত্য প্রকাশনের মতোই সহজিত। পূর্ণো পটী অস্তিত প্রকাশ-চিত্ত প্রকাশনীর।

বঙ্গদেশের ছাত্র

পরিপাটী মুদ্রণ

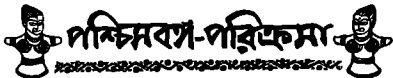
আম্র

নিখুঁত ব্রহ্ম-তৈরির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

॥ কালার স্টুডিও ॥

৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

ফোন : ৫৫-৪৬০৭



জলপাইগুড়ি

মনোজিৎ বসু

কৈশোরের সেই স্মৃতি এখনও মনে থেকে মুছে যায়নি।
যদিও কামুদ-জেলার স্মৃতিগ্রাম-সংস্কার। গগনের স্মৃতিতে
বেড়ারে বের হলান টোম চ'তে। তিফা, লালনগিরহাট
আর বাজাভাতখাওয়া তিনবার গাতি বসল ক'রে গল্পবা-
সানো। সপ্ত নিষেধের কেউ নেই, বাক্য ছিলেন তাঁদের বন্দা
চলে সহকারী। কোচবিহার পর্যন্ত প্রকৃতির তপস্বীত্ব
কোনো বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিনি। কিন্তু, আলিপুরদুয়ার
স্টেশনের আগে থেকেই প্রকৃতির চেহারাটা কেমন যেন পাল্টে
যেতে লাগলো। উঁচু উঁচু টিলা, ঘন কোণকড়, বনজঙ্গল
অন্ত চাংগান। তারপর বাজাভাতখাওয়া স্টেশনে পৌঁছে
তো ঐতিহ্যবাহী বিজ্ঞান ক্যাম্পার। তামলপুত্রে যেমন ঘটি
জোরে না, বাজাভাতখাওয়াও তেমনই জগন-স্টেশন। দুটো
বেলপথ চুপচুপে গেছে, তাই জগন। নীল সেকালের অমন
জগন-স্টেশনে আতঙ্কিত লোক-কোলাহলও সৃষ্টি হয়েছে
না? কিন্তু স্টেশনে নেমে দূরপাল, বাজাভাতখাওয়ার একটা
মুহুর্ত। স্টেশন-মাষ্টারের কাছে সেদিন জিজ্ঞাসা ক'রে
কেনেছিলাম বাজাভাতখাওয়া নাকি দুর্ভাগ্যবশতের বঙ্গ-
বনবিভাগের অঙ্গুষ্ঠ হারক রকম কাঠ চালান সেবার প্রধান
কেন্দ্র। বনবিভাগের দপ্তরও দেখানো। তাড়িয়ে দেখলাম
স্টেশনের দূর-কাছে বহু ভাণ্ডার অঙ্গুষ্ঠ শাল, শিত্র, খয়ের
কাঠের বড় বড় গেলো। লোকজনের কল-কোলাহলও সেই
সিঁকে। কিন্তু, কাঠের চেয়েও সেদিন আমার কাছে ভালো
লেগেছিল স্টেশনের প্রাকৃতিক পরিবেশ। দুয়েই শুক
হয়েছে বঙ্গাল। স্তম্ভ-স্তম্ভ, দুর্ভেদ বনভূমিকে বিলম্ব ক'রে
চলে গিয়েছে একটা শাখা-বেলপথ চত্বরী স্টেশন পর্যন্ত;
আর প্রধান বেলপথটি গিয়েছে সতের মাইল দূরত্ব
কমলালেবু-শাখা পল্লি-শাখা অঙ্গুষ্ঠ। কেমন যেন একটা
আশ্চর্য-মিশ্রিত সৌন্দর্য নিয়ে সেদিন আমি জলপাইগুড়ির
মাটিতে প্রথম পা দিয়েছিলাম। আমার সেদিনকার গল্পবা-
সান ছিল চত্বরী স্টেশন চাড়ির আরও কয়েক মাইল দূরের
একটা চা-বাগান, যে চা-বাগানে তাকাতী করতেন আমার এক

আত্মীয়। বাজাভাতখাওয়া থেকে চত্বরী স্টেশন পর্যন্ত
পথের দু'পাশে সেদিন দুর্ভেদ বন চাড়া আর কিছুই দেখিনি।
কিন্তু, সেই রক্তমিশ্রিত বনাকালের স্মৃতি এখনও আমার মনে
গভীরভাবে বোধশাস্ত ক'রে আছে। ভাণ্ডার ভাণ্ডার এত
মিশ্রিত সেই বন যে, যত্নের আলো প্রবেশের পথ খুঁজে পায়
না, বঙ্গ জীবজন্তুরা স্মৃতিতে থাকে অপ্রত্যাশিত দিকারের
আশায়। মুহুর্ত টেনের হইসেল সেদিন ভ্রমতে পেরেছিলাম
আমার সেই নয় মাইলের বাজাভাতখাওয়া থেকে
চত্বরী স্টেশন পর্যন্ত। পরে কেনেছিলাম, বঙ্গ জীবজন্তুরের
সতর্ক ক'রে এগিয়ে যাওয়ার চত্বরী টেনের ঐ বংশধর।
মাঝে মাঝে নাকি বুঝে হাতি বেরিয়ে আসে বেলপথের
ওপর। ভয়মিশ্রিত হুঁচোখ মেলে দেখি বঙ্গপাড়াও যে
উপভোগ না করেছিলাম এখন নয়। বুঝে ফুলের শোভা
আর বুঝে পানির কলকললী আমার সেই বিশেষ মনকে
সেদিন সত্যিই মুগ্ধ করেছিল। আরও মুগ্ধ করেছিল চত্বরী-
পাহাড়, স্টেশনের কাছেই এক পার্বত্য বন, আর ইতস্তত
বিশিষ্ট সবুজ চাষের বাগান। জলপাইগুড়ি-জেলার সঙ্গে
সেই আমার প্রথম পরিচয়।

বনবিভাগের আগে উত্তরবঙ্গের এই জেলার আয়তন
ছিল ৩,০০ বর্গমাইল। ব্রাডফোর্ড-সারেরের কল্যাণে
এ-জেলার পশ্চিমদিককার পাঁচটি থানা—উত্তরীয়া, পচাগড়,
বোলা, কৌলগড় আর পাটগ্রাম—পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গের ভাগে
পড়ায় জেলার আয়তন এখন হ্রাসবর্তী হয়ে গেছে। এখন
এর আয়তন ২,৩৭৭ বর্গমাইলের সামান্য কিছু বেশি। কিন্তু,
১৯৩১ সালে এ-জেলার লোকসংখ্যা কোনো ছিল আট লাখ
পঁচাত্তির হাজার সাতশ ত্রিশ, দশ বছর পরে, অর্থাৎ ১৯৪১
সালে সেই লোকসংখ্যা সৃষ্টিপেয়ে হয়েছে নান্দা চৌধুরী
পাঁচশ ত্রিশ। উৎসাহ-সমাগম এই লোকসংখ্যা-সৃষ্টির
অন্ততম কারণ।

দুটি মহত্ব আর বারটি থানা নিয়ে জলপাইগুড়ি-জেলা।
মহত্ব দুটির নাম—জলপাইগুড়ি বা দূর মহত্ব, আর

আলিপুরদুয়ার মহকুমা। সদর-মহকুমা থানা সাতটি—
জলপাইগুড়ি, রাজপুত্র, মহনাগুড়ি, নাপ্রাকটা, ধূপগুড়ি, মাল
ও মাটিয়াটী (বা মেটলী)। আর, আলিপুরদুয়ার
মহকুমার পাঁচটি থানা হ'লো—আলিপুরদুয়ার, বাগাইয়াটা,
তালাকটা, কালিগি ও হুয়ারগ্রাম। সদর-মহকুমার আয়তন
—১,২৪৪'২ বর্গমাইল; আলিপুরদুয়ার মহকুমার আয়তন—
১,০৭৮'৫ বর্গমাইল। সদর-মহকুমার বেখানে পাঁচ লাখ
ছেচরিশ হাজারের কিছু বেশি লোকের বাস, আলিপুরদুয়ার
মহকুমার দেখানে তিন লাখ আটশষ্টি হাজার তিনশ ছিয়ান্নলই
জন লোকের বসতি। অথচ, এ-হিসাব ১৯৫১ সালের
লোকগণনার হিসাব। সাম্প্রায়িক ভিত্তিতে এ-জেলার
লোকসংখ্যা এইরকম—বিষ্ণু ৭,৩২,৮৭৮, মুসলমান ৮২,০০২,
শিখ ১,০৭৩, জৈন ৩৭৭, বৌদ্ধ ৬,৪৫০, খ্রীষ্টান ২৫,৭৮১,
আর অল্পাংশ সম্প্রদায়ের নরনারী ২২,০২০।

এ-জেলার গ্রামের সংখ্যা ৭৭৬। তার মধ্যে ৪০১টি
সদর-মহকুমা, আর বাকি ৩৭৫টি আলিপুরদুয়ার মহকুমা।
শহর বলতে দু'টি—আলিপুরদুয়ার, আর জলপাইগুড়ি-শহর
কেবল জেলার সদর-শহরই নয়, দেখানে প্রেসিডেন্সি-
বিভাগের দ্বিতীয় শাসন-দপ্তরও অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা
বলেন 'জলপাই' গাছ থেকেই 'জলপাইগুড়ি' নামটি এসেছে।
সব্বসম্মত কোনো এক সময় এখানে জলপাই গাছের অনেক
বন ছিল। 'গুড়ি'-কথটা 'গাছ' বা 'কাঠ'-শব্দেরই ভোক্তক।
জেলার আরও কয়েকটি আঞ্চলিক নাম 'গুড়ি'-শব্দযুক্ত। যেমন
—ধূপগুড়ি, কাঠালগুড়ি, মহনাগুড়ি, বিগাগুড়ি, ভাতীগুড়ি,
লাটাগুড়ি প্রভৃতি। 'কাটা'-শব্দটাও কাঠ-কাটার ভোক্তক কিনা
কে জানে! কারণ, 'কাটা'-ওঘালা জালার নামও এ-জেলার
হু'একটা আছে। যেমন—তালাকটা, গরুরকাটা, নাপ্রাকটা,
মোলদকটা প্রভৃতি। কাঠ-কাটার জোতনা না করলেও,
কুটান-বৃক্ষের লম্বা যে এই 'কাটা'-র লক্ষ্য করলে তাতে
ভুলোটা লম্বের নৈই। কারণ, কুটান-বৃক্ষই এ-জেলার সবচেয়ে
বড় ঐতিহাসিক বটনা।

সেকালের ইতিহাসে থেকেই জানা যায়, জলপাইগুড়ি-
জেলার বেশির ভাগ জাতিগাই একসময় প্রাচীন কামতাপুর
বা কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এর পূর্বাঞ্চল বিস্তৃত
হয়েছে কুটান-রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত। কুটানী ভাষায়
ভূয়ার্থ বলতে বোঝায় সীমায়, বাসায় বাক্যে আঘাত
দ্বারা বা ঝারও বলতে পারি। খ্রিষ্টিয়-শাসনের আগে
কুটানীরা কামতাপুরের সীমায়-অঞ্চল ঘোর করে দখল ক'রে
নেই। ১৮৬৪ সালের কুটান-বৃক্ষের সময় বনন সেই ভূয়ার্শ-

এলাকা কুটানীদের দ্বারা থেকে টাংরেজদের হাতে আসে,
তখন তাকে পূর্ব-ভূয়ার্শ ও পশ্চিম-ভূয়ার্শ এই দু'ভাগে
ভাগ ক'রে দেওয়া হয়। পূর্ব-ভূয়ার্শ লংকু হ'ল আসামের
গোহালপাড়া জেলার লম্বা, আর পশ্চিম-ভূয়ার্শ পরিণত হয়
একটি বড়ই জেলায়। একজন ত্রেপুটিকমিশনার সে-সময়
ঐ নবগঠিত জেলার শাসনভার গ্রহণ করেন। ঐসময়
আসামের গোহালপাড়া, আর বর্তমান জলপাইগুড়ি-জেলার
রাজপুত্র-থানা ছিল রংপুর-জেলার অধীনে। গোহালপাড়া
অবত পরে আসাম-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়; আর রংপুরের
রাজপুত্র-থানা ও পশ্চিম-ভূয়ার্শ নিয়ে গঠিত হয় জলপাইগুড়ি-
জেলা, ১৮৬৯ সালে। সেই থেকে অবধি ১৮৭৪-৭৫ সাল
পর্যন্ত ছোটগাটো আরও অনেক বনবহল হয়েচে এই জেলার।

জলপাইগুড়ি-জেলায় উত্তরে এখন গাতিশি-জেলা; আর
কুটান-রাজ্য; দক্ষিণ, পূর্ব-পাকিস্থানের রংপুর-জেলা ও
পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার-জেলা; পশ্চিমে গাতিশি-জেলায়
অলকিবেশ, আর পূর্ব-পাকিস্থানের কিছুটা; পূর্বে আসামের
পূর্ব-ভূয়ার্শ। কুটান-রাজ্যে বাবার পাঁচটি রাজ্যে গিয়েচে এই
জেলার পশ্চিম-ভূয়ার্শের মধ্য দিয়েই। এই রাজ্যে পাঁচটি
বেরিফেড চামটি, লম্বীপুর, বলা, বঙ্গা ও হুয়ারগ্রাম
থেকে। এই পাঁচই কুটানের সঙ্গে ভারতের বাবসা-বাদিনা,
কুটানীদের সঙ্গে এসেবের লোকদের চানাপোনা।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রথমেই আগমনের নক্ষরে
পড়বে এ-জেলার বিস্তৃত বনাঞ্চল ও চা-বাগান। পশ্চিম-
ভূয়ার্শের শালবন ও অল্পাংশ গাছগাছড়ার অঞ্চল এ-জেলার
প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এই সব
অঞ্চল থেকে গাছিলিঙের গিগিলোতা, বিশেষ ক'রে ভূয়ার-
ধবল কাকদমজার তপনামুখী দলবেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
এ-জেলার বনভূমিতে বিচিত্র গণপাখিও বিচরণ করে।
সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গেলে তাদের দেখা মেলে সহজেই।
এইসব গণপাখির মধ্যে বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য—হাতি,
চিতাবাঘ, গজার, নেকড়ে, ভাস্কর, দজল, বাইগন, কুনো মহিষ
ও খুয়র, হরিণ, বন-মোরগ, শ্যেতা, মুনাল, তিত্তি, আইপ
প্রভৃতি। এ-জেলার বনভূমলে বিবাক শাপও বড় কম নৈই।
তিন-চার বকমের বোড়া আর কেউটেই তার মধ্যে প্রধান।
গাছগাছড়ার মধ্যে আছে কলের গাছ, কাঠের গাছ, জালানির
গাছ। এই সব বন থেকেই চালান আসে—শাল-কাঠ,
গরুর-কাঠ, পিত্ত-কাঠ, শিমুল-কাঠ, দিরাই-কাঠ প্রভৃতি।
গণবনের আধিকাংশ এ-জেলার যেমন আছে, তেমনই আছে
ঘরবাড়ি ছাড়াই বিজি বকমের ঘাস।

মহানন্দা আর তিস্তা হ'লো জলপাইগুড়ি-জেলার প্রধান দু'টি নদী। এরই তীরে তীরে পাঁচের উঠেছে বহু জনগণ। মহানন্দার উৎপত্তি স্থল দার্জিলিংয়ের মহানন্দাঘাটের কাছে। এই মহানন্দা যেমন একদিকে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং-জেলার মধ্যে সীমান্তের কাজ করেছে, অগ্রদিকে তেমনি পূর্ব-পাকিস্তান ও জলপাইগুড়ি-জেলার সীমানাও নির্ধারিত হয়েছে এই নদী ব্যবহার। শিলিগুড়ির কাছে এই নদীটি বড় বড় পাথর আর ছোটবড় চুহিতে পূর্ণ। লোচরা লোচরো মহানন্দাকে বলে—ঘোঙ্গী (মহানদী?)। এক সময় তিস্তা-নদীটিও ছিল পূর্ণদোনা। সে-সময় পন্যাবাহী বড় বড় নৌকা, এমন কি স্কীমারও দাড়াবার করতো তার উচ্চল জলতরঙ্গের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এখন আর তার সেই রূপ নেই, সে আর বিলুপ্ত। মতীত বোধানের স্বত্বটুকু নিয়ে সে আর কেবল বয়ে চলেছে মনগতিতে। অস্ত্রাঙ্গ নদীর মধ্যে নাম করা দায় করতোয়া, জলঢাকা, ভোরসা, কালহানি, রাঢ়াংক, সাংকো, দুইইটা, দুখমাই প্রভৃতির। মিচুক পার্বত্য-নদী হিসেবে কলুগা, ছুকুচুক, ককুচকা, পিশ, মিশ, চিতিকোতা, চেল, গদখের এ-সব নদীরও নাম করতে হয় এই প্রসঙ্গে। বাংলাদেশের প্রচলিত প্রায় সবরকম মাছই পাওয়া যায় এখানকার নদী, বিল ও পুকুরে। পার্বত্য-নদী-গুলিতে পাওয়া যায় পাহাড়ের কৈ, শিং, বাচা প্রভৃতি মাছ।

জলপাইগুড়ি-জেলার বেশির ভাগ এলাকাই পনিবাটি-সড়ক, অসহ উত্তরমিককার পার্বত্য-অঞ্চল চাড়া। উত্তর-অঞ্চলের মাটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাঁকর-বেগানো। সে-ভূমির দক্ষিণাঞ্চলের মাটিতে বালির ভাগই বেশি। তিস্তা ও জলঢাকা নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় কিছুটা ঝালোমাটিও লক্ষ্য করা যায়।

জেলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বক্শা-জহরী পাহাড়শ্রেণীর দ্বারা অনেকখানি। কারণ, এই পাহাড়শ্রেণী থেকে শুধু কাঠ-ই আসে না—পাথর আসে, চুনও আসে। এই পাহাড়শ্রেণী বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঘন বনে আচ্ছাদিত। বক্শা-জহরী পাহাড়ের কোথাও কোথাও কলার সন্ধানও পাওয়া গেছে এক সময়। কিন্তু, সেই কয়লা বিস্তৃত এলাকা ছুড়ে না থাকায়, তাকে কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। কোনো কোনো জায়গায় আবার লৌহপিণ্ডের ভরও দেখা গেছে। কিন্তু, তাও বিস্তৃত এলাকা ছুড়ে নয়। চুনের কারখানা আছে জহরীতে। সেখান থেকে পাথুরে চুন চালান আসে কলকাতার এক-দুইয়ার অস্ত্র। বক্শা-জহরী পাহাড়শ্রেণী থেকে আর একটি জিনিসের চালান আসে প্রচুর পরিমাণে। তা হ'লো বড় বড়

পাথর আর হুড়ি। এই সব পাথর ও হুড়ি রেলপথ ও রেলপথের পাঁচো তৈরিতে বিশেষ কাজে লাগে। বহু দীর্ঘমন্তরও সন্ধান মেলে এই পাহাড়শ্রেণীর বনে-জঙ্গলে।

স্বাভাবিক পাহাড়শ্রেণী আর অসংখ্য বন থাকায় জলপাইগুড়ি-জেলার বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বেশি। ফলে, প্রচণ্ড গরম যেখানকারি কোনে সবই পড়ে না। নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসই হ'লো এ জেলার শুকনো আবহাওয়ার সময়। কিন্তু, সে-সময়ও মাকে মাকে বৃষ্টিপাত হয়। ফলে, জলপাইগুড়ি-জেলার ঘাট ও গ্রামের প্রায় সব জুড়তেই সম্ভব ও সম্ভব থাকে। শ্রুতের প্রথম শিকড়টা এখানকার আবহাওয়া খুঁই হুম্বর। মার্চের শেষার্শ্বে গরম পড়তে শুরু করে, এবং এপ্রিলের মাঝামাঝি সেই গরম অসহ্য হই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু, গরমের প্রচণ্ডতা বেশিদিন অসহ্য হই না বৃষ্টিপাতের ফলে। মে-মাসে প্রায় আর ইকির মতো বৃষ্টি হয় এখানে। তবে, জুন-জুলাই-আগস্ট মাসেই বৃষ্টি হয় সবচেয়ে বেশি। অনেক সময় বজ্রও দেখা দেয় অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে। যেমন দেখা গিয়েছিল ১৯৪৭, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে। এক সময় এ জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল খুব বেশি। বিশেষ করে বে-এলাকা হংপুর-জেলার সঙ্গে সঙ্গর। এখন অবশ্য ভি-টি-টি অভিযানের ফলে ম্যালেরিয়ার সেই প্রকোপ আর নেই। আগেকার ভুলনায়, পশ্চিম-ভূগার্গ কাদাঝরের প্রকোপও অনেকটা কমে এসেছে। সবথ বেশির মধ্যে বক্শা-এলাকার আবহাওয়াই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কারণ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সেই এলাকাতেই বেশি। তার ফলে, গ্রীষ্মকালেও সেখানে দিনের বেলায় পাথার বড় একটা প্রয়োজনই হয় না; এমন কি, রাত্রির দিকে গায়ে ঢালার পর্যন্ত মজাতে হয়।

কৃষিজাত-সম্পদের দিক থেকে এই জেলা কম সমৃদ্ধ নয়। ধান, পাট, আখ ও তামাকই হ'লো এখানকার প্রধান কৃষিজাত সামগ্রী। শস্তোৎপাদন-কৃষ্টির পরিকল্পনা অহুসারে সাম্প্রতিক কালে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ মেলেছে জেলার সর্বত্র। জালো সার ও উন্নত শ্রেণীর পত্রবীজ বিতরণ করা চাড়াও, কৃষি-সম্পর্কিত আর্থনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগুলির প্রতি বাতে গ্রামবাসীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হই সেসব প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে এ-জেলার গঠী-এলাকায় ২১টি কৃষি-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া, এই সময়ের মধ্যে ট্যাক্টারের সাহায্যে প্রায় দু'হাজার একর পতিত ময়দিকে চাষোৎপাদী করে তোলাও সম্ভবপর হয়েছে। এতে করে জেলার আবাসের পরিমাণও আশেপাশ জুলনার অনেক বেড়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ের মধ্যে যেট

১৯২১ সনক টাকা বরঙ ক'রে এই জেলার ছোটখাট অনেকগুলি সেতু-পরিচরমা কাংকরী ক'রে তোলা হয়। বিশেষজ্ঞরা অণো করছেন, এই সেতু-ব্যবহার কলে বছরে প্রায় সাড়ে ছ'হাজার টন মস্তিস্ক বাতপত্র কলানো সম্ভব হবে। ফলের বিক থেকেও অলপাইগুড়ি-জেলার হুমায় রকেছে। হাঙ্গিনাওয়ার আনান্দ যেন প্রসিদ্ধ, তেবনি প্রসিদ্ধ পলিঃ-পাড়ার কলানোয়।

যুর ছুটি আগে এই জেলার ভূবার্গ-মকলে যাসেরিরা, কালান্দ, আমান্দ প্রভৃতি যে-সব রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল, কনকরল পরিচার ক'রে লোকের বসতি স্থাপিত হওয়া এবং সরকার বাধ্য-বিভাগ ও স্থানীয় পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের কলে সে-সব রোগ বেশ ভালোভাবেই প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে বলা চলে। অর্থাৎ, রোগ আছে, কিন্তু প্রকোপ নেই। এই জেলার রাজ্যসরকার-পরিচালিত পাঁচটি হাসপাতাল ও অনেকগুলি চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। সরকারী এই হাসপাতালগুলির মধ্যে তিনটি রয়েছে অলপাইগুড়ি-নগরে, আর বাকি দু'টি আছে আলিপুর-দুয়ারে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবার্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ও অন্যান্য কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকেও কতকগুলি চিকিৎসাকেন্দ্র, স্বাস্থ্য-উপপালায় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিচালিত হয়ে থাকে। রেলওয়ে থেকেও কয়েকটি হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালিত হয়। এই সব সরকারী ও বেসরকারী চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাফুমুল ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র, বক-পটীকাপার, হৃৎযাতি-চিকিৎসা-কেন্দ্র, মৌনব্যায়-চিকিৎসালায় প্রভৃতিও আছে। গ্রাম্যস্বাস্থ্য-সরকশের ক্ষত ও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিচরমা-সময়ে। গ্রাম্যকলে পানীয় জলের অভাবে দু'র করবার ক্ষত্রে ইতিমধ্যে প্রায় চারপো নলকূপ ও ইয়াবা বসানো হয়েছে।

লোকসংখ্যার ভুলনাথ এ-জেলার শিকিতের হার কিছু বেশি নয়। লোকসংখ্যা বেখানে ন'ভাগের ওপর, শিকিতের হার সেখানে একলাখ বহিঃ হাজারের কিছু বেশি। অর্থাৎ ন'ভাগের মাত্র একভাগ! শিকিত এই জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা একলাখ সাত হাজার, আর মেয়েদের সংখ্যা মাত্র পঁচিশ হাজার দু'শ সাত। উচ্চতর বিদ্যানিকার ক্ষত্রে এ-জেলার কলত্র আছে দু'টি—আনন্দকল কলেজ ও প্রেসমের গার্লস কলেজ। দু'টি কলেজ-ই অলপাইগুড়ি-নগরে অবস্থিত। প্রথমোক্ত কলেজে লস্শিকার ব্যবস্থাও রয়েছে। এই জেলার অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে এইরকম—একাল-শ্রেণী সমবিত মাটি-পার্শাল হাইস্কুল—৮টি; একাদশ-

শ্রেণী সমবিত আ্যাক্রমিক হাইস্কুল—২টি; সনদ-শ্রেণী সমবিত হাইস্কুল—৩টি; সিনিয়র বেসিক স্কুল সমেত জুনিয়র হাইস্কুল—১৭টি; আর, জুনিয়র বেসিক স্কুল সমেত প্রাইমারী স্কুল—৮১টি। মাটি-পার্শাল হাইস্কুলগুলির মধ্যে ৩টি রয়েছে জলপাইগুড়ি নগরে, ২টি আলিপুরদুয়ারে; আর, বীরশালা, দ্বুপতি ও মালে ১টি করে। এর মধ্যে ৩টি মাটি-পার্শাল স্কুল মেয়েদের। আ্যাক্রমিক পদ্যের হাই-স্কুল দু'টির মধ্যে একটি আছে মনোভূতিতে, অন্ত্রি জলপাই-গুড়ি নগরে। এ দু'টিই মেয়েদের। শিক্ষাপ্রসারের ব্যাপারে এ-জেলার সাম্প্রতিক-কালে যে উন্নয়নযোগ্য কাজ হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, ১৯১১ সালে যেখানে মাত্র ২৭টি হাইস্কুল ছিল, বর্তমানে সেখানে ৪২টি হাইস্কুল চালু রয়েছে। অলপাইগুড়ি-নগরে দু'টি মার্শালী-স্কুলও আছে। আধুনিক শিক্ষাসম্বিত হবার ব্যবস্থা আছে এই স্কুল দু'টিতে। বৃত্তিদুলক স্কুলও স্থাপিত হয়েছে কয়েকটি। বেমন—বেসিক ট্রেনিং স্কুল ১টি; উইডিং স্কুল বা বন-বিদ্যালয় ২টি; কল্যাণ্ডার-শিক্ষণ বিদ্যালয় ১টি। ১৯১০ সালে অলপাইগুড়ি নগরে 'অলপাইগুড়ি পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট' নামে যে কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়, তাতে শুধু অলপাই-গুড়ি-জেলার নয়, দার্জিলিং, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ-জেলা থেকেও শিক্ষার্থীরা আসে কারিগরী-বিজ্ঞায় শিক্ষাগ্রহণ করতে। নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষার ক্ষত্রে এ-জেলার ৪০টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। এর ৩০টিই সরকার কর্তৃক পরিচালিত এবং বাকি ১০টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। সংস্কৃত-অব্যাকনের ক্ষত্রে টোলও আছে চারটি। তার ৩টি ছলে সরকারী সাহায্যে, আর চতুর্থটি বেসরকারী অর্থায়ন।

অলপাইগুড়ি-জেলার ৭২৬ মাইলের কিছু বেশি বিভিন্ন শ্রেণীর রাজ্য বা সড়ক আছে। তার মধ্যে পাকা রাজ্য ৪৫০ মাইলের মতো, আর কঁচা রাজ্য ৩৩৩ মাইল। গ্রাম্য-রাজ্যও বড় কম নয়। তার মধ্যে ১২টি পলীপথ বিস্তৃত হয়েছে লবর-মহুদুয়ার; আর, আলিপুরদুয়ার মহুদুয়ার রয়েছে ২৩টি। এই জেলার জাতীয়-সড়ক বা ট্রান্সনাল-হাইওয়ে বিস্তৃত হয়েছে বাগরাকেট থেকে পাতলাখাঙা পর্যন্ত। সেই পথেই পড়েছে চালসা, মনোভূতি, দ্বুপতি, গয়েধকাটা, মলগাঁও ও কালাকাটা। জেলার মধ্যে এই জাতীয়-সড়কের দৈর্ঘ্য ২২ মাইলের কিছু বেশি। তা ছাড়া, এই জেলায় ১০টি রাজ্য-সড়ক ও আরও ৭৫টি উন্নয়নযোগ্য রাজ্য বা সড়ক বিস্তৃত রয়েছে। রাজ্য-সড়ক পনেরটির মোট দৈর্ঘ্য

১৯৪১ মাসের কিছু বেশি। ব্যাভাষ্যের সুবিধার জন্য এই জেলায় বাণ-কট ও কম খেলা হয়নি। মোট ৩৭টি বাণ-কট আছে এই জেলায়। তার মধ্যে ১৮টি বিকৃত হয়েছে বার্নেস থেকে, ২টি আলিপুরদুয়ার থেকে, জলপাইগুড়ি-নগর থেকে ৫টি, দুদারগ্রাম ও ভ্রামসিং থেকে ২টি ক'রে, আর মাল ও খালেকাচা থেকে ১টি ক'রে। বার্নেস, আলিপুরদুয়ার, খালেকাচা, ভ্রামসিং ও জলপাইগুড়ি থেকে মোটরবাশে সরাসরি সার্ভিসিং-জেলার দিলিগুড়ি-নগর পৌঁছানো যায়। ২৪ ইন্টার্ন রেলওয়ের সার্ভিস রেলগণ এই জেলায় বিকৃত। রেলস্টেশন মোট ষাটখিনী। তার মধ্যে স্টেশন-স্টেশন পাঁচটি। বিভিন্ন বিশ্বজ্ঞের সময় সার্বিক কারণে এই জেলায় বাণকোট, নারকাটা, গয়েরকাটা ও হাসিমারায় যে চারটি বিমানঘাটি স্থাপিত হয়, এখন তা বৈমানিক সার্কে, বিশেষ ক'রে বজার সময় খণ্ডনস্থায়ী সরবরাহ ও অস্ত্রাস্ত্র সময় সরকারের চক্রান্ত প্রয়োজনে, ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

এই জেলার বিভিন্ন ভাষাধার উল্লেখযোগ্য সাধারণ-গ্রন্থাগার রয়েছে যেটি উল্লিখিত। তার মধ্যে ১২টি রয়েছে সর্ব-মহৎময়; আর, আলিপুরদুয়ার মহৎময় ব্যক্তি গতি। এই সব গ্রন্থাগার সন্নিবিষ্ট সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক একথা বললে বোধকরি অস্বীকারি হবে না। এই জেলা থেকে কয়েকটি সাপ্তাহিক-সাপ্তাহিক এবং সাময়িক-পত্রিকাও প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। তার মধ্যে 'জননত', 'ত্রিমোহা', 'বার্তা' ও 'আমাদের কথা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর একটি উল্লেখযোগ্য মাসিকপত্রিকা হ'লো 'রাজকর'-সম্পাদিত 'ভান-পিটের আসর'। শিশু ও কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'ভান-পিটের আসর'-এর বিশেষ খ্যাতি আছে। পত্রিকাটি সেই প্রতিষ্ঠানেরই মুখপত্র। মফস্বল-নগর থেকে এরকমের শিশু ও কিশোর-পত্রিকা হারিভাবে চালিয়ে যাওয়া খুব সহজ কথা নয়। কিন্তু, পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের উৎসাহ ও উদ্যমে তা শুধু সম্ভবই হয়নি, সার্থক হয়েছে। আয়োজন-গ্রন্থাগার কেন্দ্র হিসাবে এ-জেলার সিনেমা-হাউস চালু রয়েছে এগারটি। তার মধ্যে এটি আছে জলপাইগুড়ি-নগরে, আলিপুরদুয়ারে ২টি; আর, বানারহাট, বীরপাড়া, মাল, হুসিটনগর, মাটিয়ালা ও ময়নাগুড়িতে একটি ক'রে। এ জেলার উল্লেখযোগ্য হাট-বাজারের সংখ্যা হ'লো ১০৮টি। আর জেলার সংখ্যা ২৬টি। সবচেয়ে বড় মেলা বলে ময়নাগুড়ি-খানার জলপেশে, শিবরাত্রি উপলক্ষে। একমাল দ'রে চলে সেই মেলা, জনদামগম ও হয় প্রচুর। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জাতিগো থেকে পুণ্যার্থী হিন্দু নরনারীরা আসেন

জলপেশ-মন্দিরে পূজা দিতে, মহাকাশ-নিবের মাধ্যম জল ঢালতে। দুটান থেকেও আসে বহু লোকজন। নামাহকম মৌলভীর কেন্দ্র-বেড়াই হ'লো এই জেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

জলপাইগুড়ি-নগরের সার্ভিস-হাউস ও জাকবাংলো ছাড়া, আরও ১৭টি ইলেকশ্বন-বাংলো ও একটি রেন্টে-হাউস আছে এই জেলায়। ইলেকশ্বন-বাংলোগুলি আছে চান্দা, লাটাগুড়ি, গয়েরকাটা, বানারহাট, লতাগাড়া, নারকাটা, জহরী, হাতিপাড়া, ক্রান্তি, রামসাইহাট, ফালাকাটা, মারাইহাট, দুদারগ্রাম, দুপগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কামাচিনিতে। আর, রেন্টে-হাউস আছে কামাখ্যাগুড়িতে।

এই জেলার প্রতীকী জনসাধারণের মধ্যে আদিবাসী ও উপজাতীয় নরনারীদের বিশেষ একটা স্থান আছে। পশ্চিম-বঙ্গের প্রায় সকল শ্রেণীর উপজাতীয় লোকই বাস করে এই জেলায়। তাদের সংখ্যা হবে দু'লাখেরও বেশি। তার মধ্যে একলাখের ওপর রয়েছে ওরাও। অস্ত্রাস্ত্র উপজাতীয়দের মধ্যে রয়েছে মুন্ডা, গাঁওতাল, মেচ, রাজা, চৌটারী প্রভৃতি। এই সব উপজাতীয় লোকদের প্রধানত দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—ওরাও, মুন্ডা, গাঁওতাল, মাল-পাহাড়িয়া, মাহালীরা এক শ্রেণীর; আর—মেচ, লেপচা, কুটিয়া, রাজা, গারো প্রভৃতিরা অপর শ্রেণীর। মৌলভিজনীদের বিচারে প্রথম শ্রেণীর প্রোটো-অস্ট্রালয়েড-শ্রেণীর অধর্ষক; আর, দ্বিতীয় শ্রেণীর উপজাতীয়েরা গড়ে মধ্যোত্তর-শ্রেণীতে। ছোটনাগপুর ও মধ্য-ভারতের অস্ত্রাস্ত্র জাতিগো থেকে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড ওরাও, মুন্ডা ও গাঁওতালের চা-বাগানের প্রমিত হিসাবেই সর্বপ্রথম এ-জেলার আসে। মধ্যোত্তর উপজাতীয় লোকদের মধ্যে এ-জেলার মেচরাই বোধকরি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তারপর রাজা ও গারো। কিন্তু, সংখ্যায় নগণ্য হ'লেও, চৌটারীরা হচ্ছে জলপাইগুড়ি-জেলার সবচেয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর আদিবাসী। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এদের সংখ্যা ৩৩৭। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই সংখ্যা একই আছে। জলপাইগুড়ি ও দুটান-রাজ্যের সীমান্ত জোয়াল নদীর তীরে, সভ্যগণদের বাইরে, ৩১২ বর্গমাইলব্যাপী চৌটারী-গ্রামে তারা বাস করে। চৌটারীদের মধ্যে একটা সন্তান আছে যে, চৌটারীগাড়া ইয়া-সেবতার লীলাক্ষ্মি। তারা ইয়া-সেবতার প্রকৃতি সেবতার পূজা করে, সেবতার কাছে নানারকম গুণবলিও দেয়। কুটিয়াদের সঙ্গে তাদের চেহারাও কিছুটা মিল থাকলেও, অনেক বিষয়েই তাদের পরিমিত। চৌটারীরা যাঁরা থেকে আট-দশ হুট উঠে হুট পুঁতে তাতে তাদের মাচার

ওপর দর তৈরি করে বাস করে। আর, সেই ধাপের মাচার নিচে খোঁচের মতো করে পুথর, সুগন্ধি প্রকৃতি সুগন্ধিত পতঙ্গবিশেষ বেধে দেয়। সবথেকেই একটা অপরিকার ও অপরিস্কার ভাব। টোটেসের প্রধান স্বাভাবিকতা, মাংস, মাংস, মাংস, মাংস, মাংস। পতঙ্গবিশেষ মাংস ও মাছ ও তারা ভাসে। একসময় তারা তটান থেকে মাটির দান নিয়ে এসে তারা সবচেয়ে, এখন তারা এনামেলের দান-কোন দানবাস করতে শিখেছে। প্রাণ-পুথর, এমন কি বালক-বালিকা-নিবিশেষে তারা মনসান ও লক্ষ্মী আনন্দ-প্রদেয় স্বভাব। মনসান তারা বলে—ইউ। একসময় টোটেসের প্রধান উপজীবিকা ছিল কলসালু চাষ। এখন তারা কলসালুকেই প্রধান উপজীবিকা বলে গ্রহণ করেছে। কুট্টা, মাংস, মাংস প্রকৃতি চাষ করতে এখন তারা অভ্যস্ত। কেউ কেউ আবার চা-বাগানের কাজেও লেগে গিয়েছে। টোটেসের তেরটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একই গোষ্ঠীর মধ্যে বিধে-বাহ প্রচলন নেই। কোন্ গোষ্ঠীর লোক কোন্ গোষ্ঠীতে বিধে করতে পারে তা নির্দিষ্ট আছে। লক্ষ্মী বহুরের ছেলের সঙ্গে কুটি বহুরের দুবতীর বিধেও আবার বিধে নয়। এদের মধ্যে সন্ধান দ্বারা আসে পঞ্চ বিধে পাকপাশি হয় না। অনেক সময় এরা লক্ষ্মী বদল করে এবং নতুনভাবে স্বর ও বিধে। বিধের সময় ছেলের তরক থেকেই পণ দেওয়া হয় এবং উত্তরপক্ষের সম্মতিতেই বিধে হয়। প্রাণ দ্বারা পর স্বামীকে একবছর একা থাকতে হয়, তারপর অবশ্য সে অন্য প্রাণ গ্রহণ করতে পারে। স্বামীর মৃত্যু হলে এক সন্ধানি থাকলেও বিধবাদের পক্ষে আবার নতুন স্বামী গ্রহণ করায় বাধা থাকে না।

ওরা ও গাওড়াদের পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কাছে সুপরিচিত হ'লেও, তারাও যেচেরা গ্রিক ভক্তখানি পরিচিত নয়। উত্তর-বঙ্গের রাজারা এখন তৎপল-উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। এই মেলায় রাজাদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ-ত্রিগুণের মতো। অধিকাংশ রাজা-পরিবারই জলপাইগুড়ি গ্রামে ছোট ছোট কুট্টার বাস করে। এই বহুরগণ তৈরি করা হয় সাধারণভাবে। আধুনিক সভ্যতার হোয়াচ এখনও এই সব গ্রামকে স্পর্শ করতে পারেনি। এখনও নানারকম অসুস্থ প্রাচীন প্রথা ও সংস্কারে বিশ্বাসী এরা। যেমন, অবিবাহিত পুরুষদের একটি বড় ঘরে থাকবার ও শোবার ব্যবস্থা। সেই ঘরে অবিবাহিত পুরুষেরা শুধু যে রাতে নিজে ঘাষ তাই নয়, সেখানে তারা সব সময় সারা রাত ঘ'রে নাচগান ক'রে কাটিয়ে দেয়। ঘরগুলি খেতে অনেকটা ঘরের পিঠের

মতো। মানাশার খালাই নেই সেইসব আশ্রয়। অনেকের বিশ্বাস, এই রকমের ঘর ভরে বাস করবার ফলেই রাজারা নানারকমের চোখের অসুস্থ হয়ে পড়ে। সামাজিক কালে সরকারী উচ্চাঙ্গে রাজাদের মন্ত্র উচ্চাচার ওপর কতকগুলি আলো-খাতালুক ঘর তৈরি করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, সংস্কারবৎ এখনও অনেক রাজা এইসব ঘরে বাস করতে রাজি নয়। নৃত্যগীতপ্রিয় এইসব আশ্রয়ানী নন্দারী বেশির ভাগ সামাজিক অসুস্থতা পালন করে নাচ-গান-বাগনার ঘা দিয়ে। কোনো আশ্রয়ের মৃত্যু হ'লে তারা বাগনা বাগিনে মনোযোগে মাততে শুরু করে দেয়। ঐভাবে তারা নাকি অসুস্থতাকেই সম্বল করতে চেষ্টা করে। তাদের বহুরগণ ধারণা—অসুস্থতার কারণই মৃত্যু ও অসুস্থতার কারণ। টোটেসের মতো রাজারাও মাতৃস্বপ্নাদিত উপজাতি। বিধের পর ঘেরোই হয় সম্প্রতির অধিকারিণী; আর, স্বামী ঘাষ পরীক্ষা বাস করতে। আশ্রয়াল অসুস্থ বিধের পর অনেক শিশুগৃহেই থাকে এবং সেক্ষেত্রে তারা শিশুসম্প্রতির একটা অংশ পায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হী বাসিন্দা বাস করলেও, তার সন্ধানসম্প্রতি বঙ্গ-পরিচয় বহুর মাতৃস্বপ্ন, শিশুস্বপ্নের নয়।

উপজাতির যে-এর সংখ্যা জলপাইগুড়ি-মেলাতেই সবচেয়ে বেশি। প্রায় পাঁচ দশ হাজার যে-এর আছে জলপাইগুড়ি-মেলায়। বনে তরলে বাস করতেই এরা ভাসে। ছোটবড় অনেকগুলি পার্বত্য নদী ঘ'রে গিয়েছে যে-এর অধিবাসিত গ্রাম্যকলে। স্বাক্ষরালে সেই সব নদী এখন চ'ল ছাট্টিয়ে ওঠে, তখন তাতে নৌকা-চলাচলের বিশেষ অসুবিধা। কলে, বহুরের কয়েকটা ঘাটই সেখানের অসুস্থ অংশ থেকে মেলায় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকতে হয়। বহুর জীবনস্থানের নিম্নেই ঘর করে মেলায়। কারণ, তারা যে-সব এলাকার থাকে, সেই সব বন-জঙ্গলে চিতা-বাঘ ও বহুর পুথর উপহব বড় কম নয়। তবু, মেলায় সেই সব এলাকা ছেড়ে যায় না। সুযোগ পেলেই তারা জন্তু-ভানোঘর শিকার করে। এক সময় মেলায় প্রধান উপজীবিকা ছিল কলসালু। এখন তাদের বেশির ভাগই চা-বাগানের কাজে নিযুক্ত। তাদের মধ্যে এক সময় সব রকমের বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। যেমন—(১) ভাবী জামাতাকে স্বস্ত্রাঙ্গনে থেকে কয়েক বছর ঘ'রে চাষ-আবাদে কাজে নিযুক্ত থাকা; (২) বলপূর্বক বিবাহ; (৩) কস্তার শিতাকে পণ দিয়ে বিবাহ; আর, (৪) নিজেই পরিবার ও মূলসেবাকে জাগ ক'রে ভাবী বহুর পরিবারভুক্ত হ'য়ে বিবাহপূর্বক অসুস্থতা। তবে, বেশির ভাগই প্রথম প্রকার

বিবাহের পক্ষপাতী। মেসেজের মধ্যে যারা হিন্দী ও কোতলমার অধিকারী, তারা আবার আত্মকাল হিন্দু-সম্প্রদায়ের অধিকরণে বরকে বৌদ্ধ দিতে শুরু করেছে। অন্যত্র আবার নিম্নোক্ত বংশ-গোত্র বংশ হিন্দু-গোত্রনাম ও নিচ্ছে। কেউ কেউ সংস্কারক হবার চেষ্টা করলেও, বেশির ভাগ মেস-পরিবারই ধর্মভীত ও হুশিয়ারি দাবী। সিদ্ধগাছকে তারা বাথো-দেবতার প্রতীকরূপে গৃহীত করে। বাথো-দেবতার গ্রীকে কেউ বলে নন্দী, কেউ বা দুর্গা। বর্তমানে এদের মধ্যে নিকার কিছুটা হ্রাস হয়েছে। দশ-বারো অনুষ্ঠে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেন। তা ছাড়া, একজন যে প্রকৃতি-এ থেকে পড়াশুনা করে বি-এ পাশ করেছেন। বর্তমানে তিনি একটি উচ্চ-বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান-শিক্ষক। আর একজন মেস এন্-এন্-এ পাশ করে অলপাইগুড়ির একটি চা-বাগানে কাজ করছেন। হাতের কাছে, বিশেষত হস্ত-কাটা, তাঁতবোনা এসব ব্যাপারে মেসরা সুদক্ষ। মেসের নিজস্ব একটা ভাষা আছে—মেস-ভাষা নামেই তা প্রসিদ্ধ। এই ভাষা তিব্বতী-চীন ভাষার সম্মিশ্রিত।

বাংলাদেশের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির বাসভূমি অলপাইগুড়ি-জেলায়। অলপাইগুড়ি-জেলার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হলেন অমরেন্দ্র সান্নাল। ১৮৭২ সালে তিনি পাবনা থেকে অলপাইগুড়িতে আসেন ওকালতী করেন। হুদেই-আল-লমের তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও নেতা। রাজনৈতিক অপরূপে তাঁর চারবহুর কাগজও হয়। তখন তাঁর বয়স ষাট বছর। কাগজার থেকে মুক্তিলাভ করে তিনি গ্রন্থ-রচনার মন দেন। তাঁর লেখা 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস' একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বাংলা, ইংরেজি ও ফারসী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। অনন্যতম বহু প্রতিষ্ঠানের সমিতি তিনি ছিলেন বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ। তাঁর বাড়ি সেকালে 'অলপাইগুড়ি হোটেল' নামে বিখ্যাত ছিল। কারণ, অতিথিদের জন্য তাঁর গৃহস্থার সর্বদাই উন্মুক্ত থাকত। জেলাবাসীর কাছে তিনি আরও 'ওমি-সান্নালমণি' নামেই পরিচিত। অন্যদিক্ত প্রায়শঃই রাতকত ঘুমাই ছিলেন বৈষ্ণবপুত্রের ভবিষ্যৎ। কয়েকবার তিনি কলীর আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং একসময় বাংলা-সরকারের অন্ততম মন্ত্রীও ছিলেন। প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত এক শৈববংশে তাঁর জন্ম। প্রায়শঃই তাঁর হান ও শিষ্টাচারের জন্য শুধু অলপাইগুড়ি-জেলাতেই নয়, সারা বাংলাদেশেই প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এই জেলার আর-একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হলেন নবাব মোশাররফ হোসেন। বহুকাল ধরে তিনি কলীর আইনসভার সদস্য

ছিলেন এবং বারকরক অন্ততম মন্ত্রী-পদেও অধিষ্ঠিত হন। দেশ-বিভাগের পরেও আমরা তাঁকে অলপাইগুড়ি-জেলা থেকে পশ্চিমবঙ্গ-বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হতে দেখি। অনেক-গুলি চা-বাগানের মালিক ছিলেন তিনি। দানবীল ও সম্ভ্রান্ত মূলধার অধিকার হিসেবেই তাঁর সমর্থক প্রমাণিত। ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত বৈষ্ণবপুত্রের ভবিষ্যৎ ছিলেন অলপাইগুড়ি-জেলা থেকে বিহারের হলদিবাড়ি থেকে তিনি অলপাইগুড়িতে এসে বসবাস শুরু করেন। একসময় তিনি ছিলেন কোচবিহার-মহারাজার দেহরক্ষী। ১৯২২ সালে অলপাইগুড়ি-জেলা-কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। অসহযোগ-আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'সাম্বতীন্দী' থেকে তাঁর প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। মানবজনা ও খেলাধুলাতেও তাঁর উৎসাহ ছিল অপরিসীম। অমরেন্দ্র সান্নাল মণিয়ার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা সান্নালে সান্নাল ছিলেন অলপাইগুড়ির একজন বিখ্যাত মোক্তার; খিত্তী পুর গ্রন্থাগারে সান্নাল ছিলেন একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মী ও অলপাইগুড়ির হুদেই-আল-লমের অন্ততম প্রধান নেতা; এবং কনিষ্ঠ পুর ডাঃ চাক্রে সান্নাল বহু দিক থেকে অলপাই-গুড়ি তথা বাংলাদেশের হুদেই-আল-লমের। ১৯২২ সালের অসহযোগ-আন্দোলনের সময় চাক্রাব্যু ছিলেন একজন একনিষ্ঠ কর্মী। বহুবার তাঁকে কারাগারীভাবের অন্তরালে যেতে হয়। জেলা-কংগ্রেসের সভাপতিত্ব-পে তিনি বীর কর্মদক্ষতা ও দেশ-প্রীতির বিশেষ পরিচয় দেন। উত্তরবঙ্গের বঙ্গের অলপাইগুড়ি-জেলা থেকে যে বৈষ্ণবক-বাহিনী সেবার্থে রত হয়, চাক্রাব্যু ছিলেন তাঁর পুরোধা। কলিকাতার সান্নাল মেডিকেল কলেজেও তিনি বছর-দুই অধ্যাপকরূপে কাজ করেন এবং ১৯২৪ সাল থেকে অলপাইগুড়িতেই শুরু হয় তাঁর চিকিৎসা-ব্যবসায়। অবিস্তর বাংলায় তিনি বিধান-সভার সদস্যও ছিলেন। জেলার অগ্রান্ত খ্যাতনামা ও কৃতী পুরুষের মধ্যে নাম করতে হয় আরও ক'ম্বলের। যেমন—বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ও 'অনন্ত'-পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিষেন্দ্র সান্নাল, খ্যাতনামা আইনজীবী ও দেশকর্মী উপেন্দ্র হালদে, হুদেই-প্রান্তরক কেশবজেন্দ্র দত্ত ও তারিণীপ্রসাদ বার এবং গোপালেন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রনাথ বগচী, হরিমোহন চন্দ্র, উমাশক্তি রায়, প্রিন্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতানাথ প্রামাণিক প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তির। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শ্রুতি-ইতিহাস ও বৃহদীর্ঘ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীধরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তও অলপাইগুড়ি-জেলার বাসিন্দা। অন্যদিক্ত উপেন্দ্র দাস-গুপ্তের চতুর্থ পুত্র তিনি।

উত্তরবঙ্গের এই জেলার প্রধান শিল্প হ'লো চা; অসংখ্য চা-বাগান রয়েছে এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে। অন্নপকাতীদের কাছে এই সব চা-বাগান কম আকর্ষণের বস্তু নয়। চা-পাছ লাগানো থেকে শুরু করে, চাষের পাতা সংগ্রহ, তাড়াই-মাড়াই করে পানীরে উৎসাহী চা-পাতা ও চা-গুড়ো তৈরি সমস্ত পদ্ধতিই দেখবার জিনিস। বেঙ্গল'র ওপর চা-বাগান রয়েছে এই জেলায়। অসংখ্য নারী-পুরুষ এই সব চা-বাগানের শ্রমিক। মালিকদের মধ্যে বহু বাঙালীও আছেন। চা-বাগান প্রতিষ্ঠার যাত্রা ধরেই ১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে এই জেলার লোকসংখ্যা ক্রমবর্ধমানের দিকে যায়।

কলিকাতা থেকে জলপাইগুড়ি শহরের দূরত্ব ২২৬ মাইল, অবশ্য পূর্ব-পাকিস্তানের দ্বারা গিয়ে। আশ্রম-দিক-রেলপথে গেলে দূরত্ব আরও বেশি হবে। শহরের এক প্রান্তে তিস্তা নদী এবং অন্যপ্রান্তে প্রবাহিতা কল্যা নাথের একটি ছোট নদী। এই দু'টি নদী ব্যতীত শহরের পৌরস্বয় যেমন বেড়েছে, তেমনি অত্যধিক বর্ষায় তাকে বস্তার কবলেও পড়তে হয়েছে কয়েকবার। আগনি ধবি কল্যা-নদীর লৌহসেতুতে গিয়ে কোনো মেঘমুক্ত দিনে ঝড়ান, তাহ'লে সেখান থেকে পাবেন তুষারকবল হিমালয়ের অশ্রু শোভা ঘীর ঘীর আগনার চোখের সাহসে কেমন ভেসে উঠছে। মিউনিসিপালিটির কল্যাণে শহরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে গত কয়েক বছরের মধ্যে। শহরে ইলেকট্রিক লাইট আছে, টেলিফোন আছে, বানোয়াটেরও অভাব নেই। ডাকবাংলো, হোটেল, খন্দালা সবই পাবেন দেখানে। তিস্তা নদীর অপর পারেই বার্নেলখাট রেলস্টেশন।

পুরাকীর্তিরও অভাব নেই জলপাইগুড়ি-জেলায়। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জলপেশের 'জলেশ্বর মন্দির', আর ভিতরগড়ের ধনসংবেশ। জলপাইগুড়ি শহর থেকে জলপেশের শিবমন্দিরের দূরত্ব মাইল নয়েক। তিস্তা নদী পার হয়েই যেতে হয় সেখানে। নিব্বারিত উপলক্ষে জলপেশের মন্দিরপ্রাঙ্গণে যে একমাসব্যাপী বিরাট মেলা বলে সে-কথা তো আগেই বলেছি। মন্দিরের মধ্যে জলপেশ শিবদ্বিগ ভূগর্ভে অনেকখানি প্রোথিত। লোকে বলে, ঐদীর্ঘ প্রথম পতাকীতে

প্রাপ্তোত্তোত্তিপূর্ব অর্থাৎ দৌহাতীর রাজা জলপেশের জলপাইগুড়ির গভীর অরণ্যের মধ্যে ঐ শিবলিঙ্গটি আবিষ্কার করেন। তারপর তিনিই সেখানে মন্দির তৈরি করান এবং তাঁর নাম থেকেই কালক্রমে শিবলিঙ্গের নাম হয় জলপেশ্বর। সে-মন্দিরের চিহ্ন আশ আশ অশপিত নেই। বর্তমান মন্দিরটিও বহু পুরোনো। গ্রাম তিনগো বড়ত, কি তারও বেশি আগে কোচবিহারের রাজা প্রাণনাথরায় বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করিয়ে দেন। তবে বহু রবকল ও সংস্কার হয়েছে এই মন্দিরের। প্রাচীন কালকালের অনেক কিছুই এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। জলপেশের মন্দিরের দক্ষিণে যে পুষ্করি আছে, তা থেকেই একসময় একটি বাহুসেব-মূর্তি উদ্ধার করা হয়। সেই মূর্তি এখন একটি বস্ত্র মন্দিরে অধিষ্ঠিত।

জলপাইগুড়ি-জেলার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি হ'লো ভিতরগড়ের ধনসংবেশ। জলপাইগুড়ি শহর থেকে এই জায়গার দূরত্ব মাইল বেশকিছু। বিস্তৃত স্থান জুড়ে আছে পড়ে রয়েছে অসংখ্য একটি প্রাচীন দুর্গের ধনসংহত। লোকে বলে, এইখানেই নাকি একসময় শৌর্যবিক রাজা পুণ্ড্র রাজধানী ছিল। শৌর্যবিক যুগের যোদ্ধা, কিংবা ঐতিহাসিক যুগের যোদ্ধা, ভিতরগড়ের দুর্গ যে একজন পরাক্রমশালী রাজার ছিল, সে-দিকের সন্ধানের অন্বেষণ থেকে না। কারণ, এর নির্বাণ-কৌশলের মাথাই হয়েছে একটা আভিমান্যের ছাপ, আর স্বপরিচিতির অশ্রু কলা-কৌশলের





নীলগাড়া জঙ্গল

নির্গমণ। পর পর চার প্রস্থ বেটনীর মধ্যে প্রাচীন দুর্গটি অবস্থিত ছিল। আর, তার চারদিকে ছিল পরিখা। দুর্গের দাক্ষিণ্যে ছিল রাজপ্রাসাদ—আর, তারই পাশে ছিল চমৎকার একটি দীঘি। দীঘিটি এখনও আছে, তবে অবহেলিত অবস্থায়। দীঘির দল কোণে ছিল দশটি বাথানো ঘাট। ঘাটগুলি এখন অবশ্য ভগ্নপ্রায়। ঐতিহাসিকেরা অধ্যয়ন করেন, ঐদীর নবম বা দশম শতাব্দীতে তিব্বতীদের আক্রমণ থেকে উত্তরবঙ্গে রক্ষা করার জন্যে তখনই পালবংশের কোনো রাজা এই দুর্গটি নির্মাণ করে থাকেন।

জলপাইগুড়ি-জেলায় ইতিহাসে তিব্বা নদীর তীরবর্তী বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলেরও বিশেষ একটা স্থান আছে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তো তাঁর 'দেবীচৌধুরাণী' গাথ্রে সেই বৈকুণ্ঠ-পুরকে রেখেছেন অমর করে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৭৬২ সালে স্বনাম ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি 'অকিরকুতি'র (অর্থাৎ বর্তমান

বাপু) দেওয়ানী লাভ করেন, তখন তাঁরা তার ইজারাদার নিযুক্ত করেন দেবীসিংহকে। দেবীসিংহ ছিল বড় অত্যাচারী। তার অত্যাচারে অত্যাচারে অকিরকুতি হতে অকিরকুতির কৃষকেরা একসময় বিদ্রোহ করে বসে। সেই বিদ্রোহ দমন করতে নাকি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির লোকজনদের স্বয়ং বেগ পেতে হয়নি। কোম্পানির সেনা-বাহিনী অনেক চেষ্টার পর বিদ্রোহী কৃষকদের ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে বৈকুণ্ঠ-পুরের জঙ্গলে অবরুদ্ধ করে এবং পরে তাদের হত্যা করে দেয়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে আজ বহু চা-বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৈকুণ্ঠপুরের নিকটবর্তী দেবীগড়, দেবীঘাট, দেবীতোবা প্রভৃতি আশপাশ-পাশে অনেক বিদ্রোহী কৃষকদের

দেবীহানীয়া বসিমচন্দ্রের বর্ণিত 'দেবীচৌধুরাণী'র স্থিতি হিসাবেই মনে করে থাকেন।

জলপাইগুড়ি-জেলায় অন্ততম পহর আলিপুরদুয়ার। পূর্ব-পাকিস্তানের পার্বতীপুর রেলস্টেশন থেকে এই আশপাশ দূরত্ব ৮৬ মাইল। শরৎ কালজানি নদীর উপরে অবস্থিত। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হিসাবেই আলিপুরদুয়ারের



নীলগাড়া জঙ্গলে গরু

প্রসিদ্ধি। বর্তমানে এখানে বিদ্যুৎশক্তি সম্প্রদায়িত হচ্ছে। ভুটান-যুদ্ধের সময় ইংরেজদের পক্ষে কর্নেল হেবলেং আলি খা নামে একজন বীরপুরুষের প্রতি প্রত্ন-প্রদর্শনের জন্যই তাঁর নাম অত্যাধিক জাগ্রাতির নাম হয় আলিপুরদুয়ার। কর্নেল হেবলেং আলি-ই ছিলেন আলিপুরদুয়ারের প্রথম শাসন-কর্তা। এই অঞ্চলের পাণ্ডুলেয়া অধিকাংশই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। আলিপুরদুয়ার থেকে মাইল দশেক উত্তর-পূর্বে মহাকালগুড়ির পশ্চিমে একটি প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আলিপুরদুয়ার থানার অন্তর্গত নীলপাড়া ফরেস্ট-রেঞ্জ ও জলদাপাড়া ফরেস্ট-রেঞ্জে অত্যন্ত জীবজন্তুর সঙ্গে গণ্যেরও সম্ভাবনা পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের আর কোনো জেলায় বনভূমিতে বোধকরি বস্ত্র জীবজন্তুর এমন আধিক্য নেই।

জলপাইগুড়ি-জেলায় আর একটি প্রসিদ্ধ স্থান হ'লো

বক্সা। বক্সার সেনানিবাস ছিল ভুটান-পাহাড়ের কোলে প্রায় ১,৮০০ ফিট উচুতে। এর নিকটবর্তী উচ্চতম পর্বত-শৃঙ্গ ছোট-সিঙ্গুলা প্রায় ২,৪৫৭ ফিট উচু। বক্সার পথেই ভুটানের লোক ভারতে আসা-যাওয়া করে। তারা বক্সায় আসে ব্যবসায়ের খাতিরে; সঙ্গে নিয়ে আসে হাতির দাঁত, যুগনাভি, বোম, মধু, কমলালেবু এবং আরও কত কি। আর, দেশে ফেরবার সময় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় এসেলের পশম, ত্রিশাবি, তামাক, কাপড়-চোপড় ও তৈয়্যসমগ্র। বক্সার কাছে একটি পরম-মলের কোয়ারাও আছে, তাসিগাঁও থেকে তার দূরত্ব মাইল-তিনেক হবে। ইংরেজ-রাজত্বেরই বক্সার সেনানিবাস এক সামরিক বন্দী-নিবাসে রূপান্তরিত হয় এবং তার স্থিতি বোধকরি এখনও যশেপ্ৰাণ ভাবতীচন্দ্রের মন থেকে মুছে যায়নি।



নতুন ইয়ারোপ: নতুন মানুষ

মনোজ বসু

(পুস্তকশিখার পৃষ্ঠা)

জর্মন আকাদেমি অব আর্টস দাওয়াত করে এনেছেন হাজার হাজার মাইল দূরের ভারত থেকে। বিকাল চারটেয় স্নান কাহুন নাকি সহর্নি। আকাদেমি অত্যন্ত বনেনি সংস্থা—১৬৯৬ অব্দে প্রতিষ্ঠা, সংড়ে-তিনশ বছরের বেশি হয়ে গেল। তখন নাম ছিল প্রাশিয়ান আকাদেমি অব আর্টস। লড়াইয়ে লড়াই হয়ে যায়। ১৮৭০-এর মার্চ থেকে নতুন করে চালু হয়েছে, নামও বদলেছে সেই তখন থেকে।

আকাদেমির সভ্য রানা-শ্রাব্য কেউ নয়, জর্মনির বাবা-বাঘা শিল্পী-সাহিত্যিক। দেশের মাটির ছুটে: ভাগ হল, কিন্তু শিল্পী-লেখকদের বখরা-বাঁটোয়ারা হয়নি। সাংস্কৃতিক বিভেদ এঁরা স্বীকার করেন না। হুবেই বা কিসে—ভাষা জাতি ধর্ম জীবনচর্যা কোন দিক দিয়েই তিলেক ফারাক নেই। পূব ও পশ্চিম উভয় জর্মনির দিকপালেরা আকাদেমিতে আছেন। হাজির হতে না পারেন, তার জুড়ে অটকাবে না। সভ্য তিন বকমের—সাধারণ সভ্য, লিপি-সভ্য এবং সম্মানী সভ্য। সাধারণেরা আকাদেমির কাজকর্ম অহরহ লেগে থাকেন, উত্তম ভাষার ব্যবস্থা এঁদের জন্ত। বালিনের বাইরে যারা থাকেন, সর্বাঙ্গ হাজিরা দিতে পারেন না, তাঁরা সব লিপি-সভ্য; আকাদেমির সঙ্গে চিঠি-পত্রের মারফতে যোগাযোগ রাখেন। সম্মানী সভ্যেরা প্রায়ই বুড়ো-হাবড়া মানুষ, সাহিত্য-শিল্পের

নেতৃস্থানীয়; তাঁরা মেথার অছেন বলেই দেশে বিদেশে আকাদেমির নামডাক।

শহরের কেন্দ্রে নিজস্ব বিশাল অট্টালিকা, আলিশার উপর বড় বড় হরফে আকাদেমির নাম লেখা। বোনার ঘায়ে হানাবাড়ি হয়ে আছে। ভাড়া বাড়িতে এখন কাজ চলে। দোতলার হলঘরে লম্বা টেবিল বিরে আমরা ঠুঁরা বসেছি। টেবিলের উপর বিবিধ অহুপান সহ চা কফি এবং রকমারি পানের আয়োজন। বিস্তর ভাল ভাল কথা, সে আর কি লিখব—আপনারা চোখ ঠারবেন: নিজেদের ঢাক পেটাচ্ছে, এই দেখ। জওহরলালের প্রশংসা, তাঁর পঞ্চশীলের কথা। টেগোরের অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গও উঠল। অর্ধেক পৃথিবী প্রায় তো ঘোরা হয়ে গেল; যথার্থ বলছি, ভারতের ছুটে নাম বার বার কানে এসেছে—রবীন্দ্রনাথ আর জওহরলাল। আরও এক-আধজন কালেভদ্রে উঠতে পারেন, সে কিছু ধর্তব্যের ব্যাপার নয়। এত বড় ভারতে ঐ ছজন মাত্র মানুষ।

বই উপহার দিচ্ছেন আকাদেমির সভ্যদের লেখা। নাম লিখে হাতে হাতে দিচ্ছেন। জর্মনি বই—নেড়েচেড়ে বেখে দিই। ছবির আলবাম কতগুলো—আকাদেমির শিল্পীদের আঁকা ছবি। ছবির ভাষা সবাই বোঝে—পাতার পর পাতা উপাঞ্জি, মুদ্র হয়ে দেখি এক একটা ছবি। চিত্রবিদ্যার বিভ্রামাগর নই, তবু এটা মনে হচ্ছে ইন্সপেশনিজমের জোয়ার এখন জর্মনিতে। একটা



১৯৬৭ সালে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান (কেন্দ্রে)।

ছবিতে অবাধ হলাম—ঘোরতর হিটলার আমলেও হিটলারকে ছেড়ে কথা কয়নি। তাই দেখলাম, আটোপিষ্টে শিকল বেঁধেও শিঙ্গার হাত পসু করা যায় না।

আনি কি নিই, কি দিতে পারি পাশ্চাত্যের? বই একখানা তো বটেই—আমার লেখা বাংলা বই। কেউ পড়বেন না, বাংলা-জানা একটি জরনও নেই বালিনে, কোনদিন কেউ বাংলা লিখে নেবেন তারও সম্ভাবনা দেখিনে। সেই কথা লিখে দিলাম বইয়ে : এক বাঙালি লেখক একদা এসে আদর-আপ্যায়ন নিয়ে গেছে তার স্মৃতিস্বরূপ এই বাংলা বই। আর দিলাম কৃষ্ণনগরে গড়া মাটির এক বুদ্ধ-মূর্তি। এবং ফাউ হিসাবে মিনিট হয়েকের এক বক্তৃতা : মিলিটারি জাত তোমরা, গোটা ছুনিয়া বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

এবারে তোমাদের মুখে অহিংসার বুলি, সহ-অবস্থানের প্রস্তাব। আমাদের দলে এসে গেছ তা হলে। ইতিহাস পড়ে দেখ, আমাদের লোকজনও সীমান্ত পার হয়ে ভিন দেশে গিয়ে পড়েছে। তাদের হাতে কিস্ত মরণাশ্র নয়, ঘর ভাঙনি তারা। কোন মানুষের। শান্তি ও আনন্দের বাতা তাদের মুখে, সর্ব মানুষের কল্যাণ-ভাবনা তাদের অন্তরে। অহিংসাবাদীর প্রাচীন উদ্গাতা হলেন প্রভু বুদ্ধ। তাঁর এই প্রতিমূর্তি তোমাদের আকাদেমিতে রেখে দিও। এতদিনে তোমাদের সময় এসেছে বুদ্ধবাহী বুদ্ধবার, বুদ্ধের সমাদর হবে এইবার এসেলে।

[ভাষণ—মঙ্গলবার, ১১শে মে ১৯৬৭]

সাড়ে-আটটা। সূর্য ডুবল এতক্ষণে, সন্ধ্যা হবো-হবো। আরও আধ-ঘণ্টাখানেক নেবে ঘোর

হতে। দিনমান নড়তে চায় না। সকালবেলা ধড়নড়িয়ে উঠি, চারিদিক রোদে ভরা। কত বেলা হয়ে গেছে না জানি! ঘড়িতে দেখি পাঁচটা।

বসন্ত কাল। রাতের আঁধু বড় ছোট। এরা কিন্তু নটীর আগগে সকাল বলে মানবে না। হোটেলের ঘরে কাচের জানলা; কাচের এদিকে নেটের পর্দা, তার উপরে ভারী কাপড়ের পর্দা। বেলাবেলা ছোটো পর্দা ফেলে ঘর অন্ধকার করে দিয়ে যায়। অর্থাৎ পাঁচটার আগগেই রাত্রি করে দিল ঘরের মধ্যে। নটীয় শয্যা ছেড়ে উঠে পর্দা সরিয়ে আবার দিনমান বানাও। চায়ের ইচ্ছা করে। তো হুকুম দিয়ে রেখে, ছটায় কিছা যে সময় বসলো সরুচায় বা দেবে। আলুখালু বেশে উঠে কোন গভিকে ধরল খুলে দাও। চোখ বুজ বুজ চাইকু গলায় ঢেলে আবার লোপের নিচে ডুব মারো। কেউ কোন রকম খামেলা করতে যাবে না।

আমার গভিক আলাদা। ঘরে ঢুকই পর্দা ছোটো দিই সরিয়ে। টেবিলের পাশে জানলা। কলম নিয়ে বসি, কিন্তু লেখা এগোয় না। ভয়াবহ শ্বাসের চেহারা চারিদিকে। ইটের পাহাড়, দু-চারটে খাড়া দেয়াল। ছয়োর-জানলা পুড়ে নিশ্চিহ্ন, ঘোর কালো ঐ সব জায়গায়। কংক্রিটের গাঁথনি ভেঙেচুরে গিয়ে ভিতরের লোহালকড় বেরিয়ে পড়েছে। আজ সকালেই দেখলাম, ইট-বালি সরাজে এক ভাঙা অট্টালিকা থেকে, খান আঠেক লরী-ভরতি রাবিশ কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়। লড়াই কবে চুক গেছে, তার পর থেকে কাজ চলছে, শ্রমশ্রমের চেহারা আজও তবু বদলাল না।

গোড়ায় যে ঘর দিয়েছিল, তার সঙ্গে বাথরুম নেই। স্নানের এরা পরোয়া করে না, কিন্তু আমার অভ্যাস আলাদা। অস্থবিধা জানাতে ঘর বদলে দিল। না বুকে অমন ঘর দিয়েছিল, মাপ চাইল তার জন্য। এবারের ঘর কিন্তু সাংঘাতিক আর এক দিক দিয়ে। জানলা দিয়ে চ্যানসেরি দেখা যায়—হিটলারের বাসের জায়গা ও কর্মক্ষেত্র, শেষ দিনের

আশ্রয়স্থল। দূর ও দূরভেজ করে গড়েছিল মাটির নিচে অনেক স্থাপন রম্য কক্ষ। সেই চ্যানসেরির শ্বাসাবশ্বাস বলব না, অবশেষ কিছুট নেই—বড় বড় কংক্রিটের চাই, খানখন্দ আর জঙ্গল। বিজয়ীর সকল আক্রোশ বারবার ফেটে ফেটে পড়েছিল ঐ জায়গার উপর, ইমারতের চিরুমাতে থাকতে দেখনি। জনহীন কবরভূমির মতো। আগাছা ও বড়-ঘাস ভরে আছে, কাটা-তারের বেড়ায় ঘেরা চতুর্দিক। একটা নিচু টালির ঘর তুলেছে একদিকে। বোধ করি ভায়গাটা পরিবার করবার মতলব হয়েছে—লোকজন থাকবে ঐ ঘরে। উইলো গাছ একটা—ছোট গাছ, বছর পাঁচ-সাত বয়স হবে। ছোট ছোট ডাল-পাতা লম্বা হয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে—বিশ্রস্ত বেশবাস নারীর মতো। সেই নারী সারা দিন এবং সমস্ত রাত্রি একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে অঙ্গুলিত চুল ছড়িয়ে দিয়ে কাঁদছে। সত্যি বলছি, সর্বসেহ নির-শির করে ওঠে। বৃষ্টিশূঙ্কে ওরা জানলায় ভারী পর্দা খাটিয়েছে। ওদিকটা ঢাকা থাকাই উচিত।

কিন্তু আমার কেমন নেশায় ধরেছে। ঘরে এসেই পর্দা ঠেলে এক নজরে তাকিয়ে থাকি। আর ভাবি। সাড়ে নটা। সত্যি রাত হয়েছে এবার, আলো জ্বলছে শ্বাসকৃমির কিনারা দিয়ে। ঐ দিকটা রাস্তা। দিনমানে গাড়ি-মাছের সামাজ্য চলাচল, রাত্রিবেলা এখন একেবারে হা-হা করছে। আলোগুলো নির্জন নিঃশব্দ প্রেতপুত্রী পাহারাদার।

তবে দেখুন, অহরহ ঐ জায়গাটার কী কাণ্ড হত হিটলার ছনিয়াময় যখন তাণ্ডব জুড়েছিল। পাতালের মন্ত্রশাক্ষে গুপ্ত পরামর্শ, উপরে মাছ-জনের ভিড় কাঙ্ক্ষকের ছোটোছুটি। অনেক রাতে একবার উঠে কাল ঐ আলোর সারির দিকে তাকিয়েছিলাম। আলোরা নড়েচড়ে বেড়ায় নাকি? আলোর তলার ছায়া-ছায়া—যেন প্রেতের মিছিল। অনেক হাজার মানুষ মরেছে ঐ জায়গা-ইকুতে, ভাঙা বাড়ির নিচে কবরস্থ হয়ে আছে

কতজন। হয়তো বা হিটলারও আছে, এবং তার প্রেমিক। ভিত খুঁড়ে আবার নতুন অট্টালিকা বানাবার যদি মতলব থাকে, সেইসব মানুষের করোটী-কক্সল হয়তো বেরিয়ে পড়বে।

এই হোটেল এডলনে আছি—সবচেয়ে বড় আর বনেদি হোটেল গোটা জার্মানির মধ্যে। দেশ-বিশেষের ধনী-বিলাসী স্ত্রী-পুত্র এসে উঠতেন। সকল রকম আরামের ব্যবস্থা। আরও এক বড় হোটেল এর পাশেই, প্রায় একই দরের। এখন তার কিছুমাত্র চিহ্ন নেই। এডলনের পিছনের একটা হাটা কোনও রকমে টিকে ছিল, সেই অংশে তালিভূমি দিয়ে নতুন আবার এডলন হোটেল চালু করেছে।

যেখানটায় আদত হোটেল, ইট-কাঠের পাহাড় সরিয়ে ফেলে সে জায়গায় মাঠ এখন। ছোটো-চাটো কুলের গাছ মাঠের এদিকে সেদিকে। ভাঙাচোরা একটা দিক খাড়া আছে—কেন যে রেখে দিয়েছে জানিনি। উই উচু—আকাশ ছোয়ার গতিক, ছাত উড়ে গেছে, ছায়ার-জানলা পুড়ে ছাই, ইট-লোহা অবশিষ্ট কয়লার মতন কটকটে রং। নড়বড় করছে, জোরে খানিকটা কড়-বাভাস এলেই খুর-খুর করে ভূঁয়ে পড়বে—এমনিধারা মনে হয়।

দরজা-জানলা আলো আসবাবপত্র এমন কি দরজায় ছিটকিনির কারুকর্ম দেখে বোকা যায় কী বাহার ছিল হোটেলের! চৌকাঠে তিন রকমের বেল কি-চাকরদের ডাকবার জন্ত। কোনটাই বাজে না। ঘরে ঘরে দেয়ালের সঙ্গে খাঁটা কারুকর্ম-খচিত ঘড়ি। সমস্ত অচল, কলকল্লা বিগড়ে আছে বোমার কাঁকুনি খেয়ে। এই ভাঙন-দশান্তেও এডলন পূর্ব-বালিনের এক সেরা হোটেল। সরকারের পরিচালনা। খাবার ভালো, দামটা বেয়াড়া রকমের চড়া। মানুষজন আসে কম। ভূতুড়ে বাড়ি কিংবা চার্জ বেশি—কোন কারণে?

ঠিক আমায় নেশার পেয়েছে। স্ত্রীমতী আবেরি পানকির বাড়ি নেমন্তর আজ সন্ধ্যাবেলা।

সেই যে বোদো উশের বাড়ি হাত ধরে বললেন, বাঙালি তুমি—ভাত আর মশলার তরকারি নিশ্চয় খুব পছন্দ করো। নিজ হাতে রান্না করব, যাওয়া কিন্তু চাই। কিন্তু মাসপথ থেকে মিথ্যে করে বললাম, শরীর বেহুত লাগছে, হোটলে কিরি আমি। নেমন্তর যেতে পারলাম না, পানকির কাছে আমার হয়ে ক্ষমা চাইবেন। অলক্ষ্য টানে হিড়হিড় করে নিয়ে এসে বসাল এই জানলার কাছে। রক্তাক্ত আকাশে সূর্য ডুবে গেল, দুটো পাঁচটা করে ক্রমশ আলোয় ভরে গেল এ-বালিন ও-বালিন।...

সকালবেলা গিয়েছিলাম এক আট-ইঞ্চুল দেখতে। বেঁটেখাটো টাকওয়ালা কর্তামশায় রাস্তায় নেনে দাড়িয়েছেন, কখন এসে পৌছব আমরা। আনকোরা নতুন বাড়ি, আগেকার বাড়ি ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। কলাচর্চা উভয় রীতির—ললিত কলা ও ব্যবহারিক কলা।

নতুন নতুন ডিজাইনের বেতের চেয়ার। খিয়েটার-অপেরার সাজ-পোশাক—সম্প্রতি কিং লিয়র পালার সাজ-পোশাক ও দিন-দিনারি বানাচ্ছে। মেয়েদের পোশাকের নতুন নতুন ডিজাইন বেরোয় এখান থেকে। উমা রাও জীজাতি, অতএব পোশাকে কৌতুহল দেখালেন। সঙ্গে সঙ্গে অমনি অপেরার নাচের সঙ্গী মতো একগাদা মেয়ে রকমারি পোশাক পরে বেরুতে লাগল। জন পনেরো হবে, পোশাকের কলমলানি দেখিয়ে আবার তারা নেপথ্যে লুকাল। দিনকে দিন ফ্যাশান পালটায়, মানুষ এক চেহারা জিনিবে খুশি থাকে না। ক্যামেরা রেডিও এবং আসবাবপত্রেরও নতুন ডিজাইন এরা ভেবেচিন্তে বের করে। হালকিলের একটা রেডিও বের করে বলে, কেমন দেখাচ্ছে বলুন। বাজিয়ে শোনাল বালিন এবং জার্মানির অনেক জায়গায় বসতবাড়ি অভাব; ভেঙে তখনই করে দিয়েছে, এখনো সামনে উঠতে পারেনি। এখান থেকে নানা রকম প্ল্যা:

রাজরাজত্বের কথা চলছে। রাজা খুব কম দেশেই আছে। কিন্তু রাজার সহস্রে সন্তান আছে বিস্তর লোকের মনে—বিশেষ করে সেকেন্দ্রে বুড়ো-বুড়ি যারা। অনেক শতাব্দী ধরে মনোভাব গড়ে উঠেছে, মশ-বিশ বছরে সকলে কাটিয়ে উঠতে পারে না। কাইজার হবে উৎখাত হয়ে গেছে, কাইজার উইলহেলমিনের নামে জার্মানির বিস্তর বুড়ো-বুড়ি এখনও গদ-গদ। দেবতা-গোঁসাইয়ের মতন ভাবে। তবে বেশি দিন আর নয়, ঐ প্রাচীনদের সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে এই সন্তানবোধ। নতুন আমলের ছেলেমেয়েদের কাছে কাইজার নামের খাতির নেই—নতুন তাদের ধ্যান-ধারণা, নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় তারা বড় হচ্ছে।

আমি সায় দিই : ঠিক বটে। আমারও দেখা আছে এমনি বস্তু। কুচবিহারে রাজা নেট—কিন্তু নিজ চোখে দেখেছি, গ্রামের চাষা শহুরে তরিতরকারি বেচেতে এসে ঝাঁক নামিয়ে প্রাসাদের দরজার সামনে গড় হয়ে প্রণিপাত করে। রাজা ঈশ্বরের অবতার, রাজসভার অতএব মন্দির-বিশেষ। মন্দির এক বাড়ি দেখেছি, ছেলে-বউ ঈশ্বর-বিষেবী ঘোরতর কমুনিষ্ট, বুড়ি মা কিন্তু বিপ্লবের এত ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও আইকন আঁকড়ে রয়েছেন একটা ঘরে।

ঈশমতী বললেন, পটসডামে যেও তোমরা অতি অবজ্ঞা দেখবার মতো। দুর্ধর্ষ কাইজারেরা থাকত। শহর জুড়ে দেখতে পাবে আশ্চর্য শিল্প-কৃতির পরিচয়।

এক বুদ্ধমূর্তির সামনে নিয়ে দাঁড় করালেন। চীন থেকে এনেছেন। চিত্তাকুল ভগবান বুদ্ধ। ঈশমতী বললেন, এ মূর্তি জীবন্ত। তোমার আমার মতো। ক্ষণে ক্ষণে মুখের ভাব বদলায়। সকালের প্রথম আলোয় দেখবে হাসিমাখা মুখ, মধ্যায় আবহা আধারে দেখতে পাবে সেই মুখ বিষণ্ণ।

বইয়ে ঠাসা আলমারিগুলো। সকল জাতের বই, একেবারে হালের ছাপা বইও দেখছি। পানরেরা তলার ঘরের ভিতরে সবুজ লতা ফুলে দিয়েছেন

ছাতের উপরের টব থেকে। লতায় লতায় ফড়া-ফড়ি। টেবিলে নানা বর্ণের মোলায়েম লিলি। ঈশমতী বই লেখেন ভারি এক মজার কাহিনায়। লেখেন না, টাইপ করেন। যখন যেমন মনে আসে টাইপ করে যান। সেগুলো কাঁচি দিয়ে এক ইঞ্চি আদ ইঞ্চি এমনি মাপের টুকরো টুকরো করে কাটেন। তারপর আগের লাইনগুলো নাক, নাকেরগুলো শেষে—এমনি ভাবে সাজিয়ে সাদা কাগজের উপর এঁটে আদত দেখা তৈরি হয়ে যায়।

খুব বড় এক মেশিন-ফ্যাক্টরি দেখতে এসেছি। নাম হল : ওয়েব বার্গমান-বোরসিগ (Web Bergman-Borsig)। বার্লিনের আয়তন মোটা-মুটি পয়তাল্লিশ বর্গ মাইল। এক প্রাস্তে এট ফ্যাক্টরি। লিভেল এ লীবার্গ সঙ্গে করে নিয়ে এলো।

ভারী ভারী যন্ত্রপাতি বানায়। বিদ্যুৎতৈরির যন্ত্র—পাওয়ার-হাউসে যেসব টারবাইন লাগে। স্টীমতৈরির নানাবিধ গনবাকার যন্ত্র। হালফিল আবার ছোটখাট কল বানানো শুরু করেছে। যেমন দাড়ি কামানোর বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। সারা দুনিয়ায় ভারী-শিল্পের যন্ত্র বড় বড় ফ্যাক্টরি আছে, এটা তার ভিতরে পড়ে।

ঐ যে বোরসিগ নাম পাচ্ছেন, মন্ত্র বড় ধনিক তিনি। লড়াইয়ের আগে ফ্যাক্টরি ছিল ধনিক-প্রতিষ্ঠান। হিটলারের সঙ্গে খুব আতাত। পুরো দমে অস্ত্র বানিয়ে লড়াইয়ে যোগান দিয়ে গেছে। এখন জাতীয় প্রতিষ্ঠান। সরকার অর্থাৎ জনসাধারণ মালিক। পুরানো মালিকরা পশ্চিম-জার্মানিতে নতুন কারখানা বানিয়েছেন। সে-ও খুব বড় কারখানা।

বোমা মেরে তখনই করে দিয়েছিল। তিন ভাগ একেবারে গুঁড়োগুঁড়ো, এক ভাগ টিমটিম করছিল কোন গতিতে। এখন আবার বোল আনা চাল হয়ে গেছে। আগের চেয়ে ঢের ঢের ভাল ব্যবস্থা

কমিন্সের আরামবিরাম আর সাংস্কৃতিক উপভোগের সকল রকম বন্ধাবদ্ধ—আগে এসব নিয়ে কেউ নাথা খানাত না।

খুব ডিরেক্টর মশায় আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন। হু-কথায় গোড়ার ইতিহাস একটু শুনিয়ে নিলেন। উনিশ শতকে ফ্যাক্টরির প্রতিষ্ঠা। জগৎজোড়া নাম, অচল মুনাফা। কিন্তু সবই প্রায়ে চুরমার হয়ে গেল। এই যত ঘরবাড়ি যন্ত্রপাতি দেখতে পাচ্ছন, ১৯৭৮-এর আগের কোনটি নয়। নতুন করে গড়তে হল। দশ বছরও পোরেনি, ছুনিয়ার এক সেরা ফ্যাক্টরি বলে এর মধ্যেই নামডাক চলেছে। চার হাজার কর্মী—সবাই এক বাড়ির তেলমেয়ের মতো আছি। এক পাক ঘুরে দেখলে নাগুম হবে। ডিরেক্টর নিজে আমি ইঞ্জিনিয়ার বটে, তবু কানারশালয় হাপর টেনে নিজ হাতে কাজ করেছি অনেকদিন। ফ্যাক্টরির সবরকম কাজ জানি।

বলছেন, তোমাদের ভারত সবক্ষেত্র বড় ভালবাসা আমাদের। ভারত উন্নতির পথে ছুটেছে, আমাদের হাতে ভারি আনন্দ। আমাদের রাষ্ট্রও নতুন, তোমাদের পরে জন্ম হয়েছে। বিস্তার কষ্টে গড়ে তোলা হচ্ছে হাজার রকম অনুবিধার মুখোমুখি পাড়িয়ে। ভুক্তভোগী আমরা, দেশ-বিভাগের ধাক্কায় নাস্তানাবুদ হচ্ছি তোমাদের মতোই। তাই বৃষতে পারি, কী কঠিন বিপত্তির সঙ্গে ভারতকে লড়াইতে হচ্ছে। ছুনিয়ার উপর আর লড়াই হবে না, সকল মানুষ শাস্তি ও আনন্দে থাকবে—এই আমরা চাচ্ছি। ভারতও তাই চায়। এক লক্ষ্য আমাদের। অতএব ভারতের মানুষ জোনরা এখানে অতিবিমাত্র নও, একেবারে ঘরের লোক। তোমরা এসেছ, কত যে কাজ হয় এমনি আসা-যাওয়ায়! সামান্য-সামনি হলেই মানুষে মানুষে ওবে তাব জনে—সকলো বই-কেতাবে সে জিনিষ হয় না। এখানকার কর্মীরা ফ্যাক্টরিকে নিজের জিনিষ বলে মনে করে। আসলেও তাই। পরের জন্ম খাটে না,

খাটছে নিজের কাজে। সত্যি কিনা, ভিতরে দিয়ে বুঝবে। এেসা—

ঘুরে ঘুরে দেখছি। এদের খট ফুটেছে আনন্দের মুখে। জবাবও পাচ্ছি। কিন্তু যা প্রলয়ঙ্কর আওয়াজ, কানে ঢোকে না ওদের বারো আনা কথা।

ছ'টা খানাবার। খানাপিনা একরকম সকলের, ইতার বিশেষ নেই। ইঞ্জিনিয়ারদের পোশাক সাদা, কারাক শুধুমাত্র এই পোশাকের রঙে। পোশাকের ঘর—কর্মীরা বাড়ির কাপড়চোপড় এখানে ছেড়ে আসে, কাজকর্মের শেষে সেই কাপড় পরে বাড়ি যায়। কারখানা অষ্টপ্রহর চলছে, তিন ক্ষেপে কাজ হয়। আগে ছিল আট ঘণ্টার খাটনি, মার্চ (১৯৭৭) থেকে এক ঘণ্টা কমিয়ে দিয়েছে। চার হাজার কর্মীর মধ্যে মেয়ে সাড়ে আট শ। পরিচালন-ব্যবস্থা ঠাঠা করেন, তাঁদের মধ্যেও মেয়ে আছে।

বিশাল সাংস্কৃতিক হল। বোতাম টিপে দিল, ঘরঘর শব্দে চারিদিক থেকে কালো পর্দা পড়ে ঘর অন্ধকার করে দিল চোখের পলকে। সিনেমা হয় এই হলে, থিয়েটার হয়। কীমন্ডা থিয়েটার আর নাট-গানের দল করেছে। বাইরের থিয়েটারেও যায়, তার জন্ম নরহুনি টিকিটের ব্যবস্থা। টিকিটের দানের ভিতর এক মার্ক ইউনিয়ন থেকে দেয়, বাকিটা নিজেদের।

লাইব্রেরি। ঘরে বারান্দায় কর্মীদের কোটো। যেমন আর সব জায়গায়, গল্প-উপস্থাসই বেশি চলে। কার্ল মার্কসের বই, লেনিনের বইয়ের জর্মন অনুবাদ। ভারতীয় লেখকদের ভিতর কমলা মার্কণ্ডেয় আব্বাস ভবানী ভট্টাচার্য ও মুল্লুকারাজ আনন্দ আছে। ভারতের নানা ছবি নিয়ে মোটামোটা এক অ্যালবাম—চেক-সংস্করণ থেকে জর্মন করে নিয়েছে। ডক্টর কুবেরের গ্রন্থ ‘ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস’ রয়েছে।

ডিরেক্টর বললেন, আমরা কারিগরি উন্নতি করেছি। এই দিক দিয়ে যত রকমে সম্ভব, আমরা তোমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।

—আমাদের ছেলেরা যদি এখানে আসে, ভাল করে দেখাবে তো ?

—হাতে ধরে দেখাব প্রত্যেকটি জিনিষ। এ আর কী! ভারতের ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে দাও, তাই আমরা চাই।

চীন পোল্যান্ড এবং আরও নানা দেশে ক্যাক্টির তৈরি জিনিষ চালান যায়। প্রস্র কললাম, আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক প্লানে যাচ্ছে না ?

—উজ্জ্বল, অর্ডার পাইনি এখনো। ব্যাপার-বাণিজ্যের চুক্তি তোমাদের সঙ্গে অল্পদিন মাত্র হয়েছে। দিল্লী-কলকাতা-বোম্বাই অফিস বসেছে। হবে এইবার আরও ঘনিষ্ঠতা। নিশ্চয় হবে।

শুধু বালিনে জর্মনির কতটুকু? মফসলে যাব তার জোগাড়-যত্তর হচ্ছে। যা শুনে পাচ্ছি, এলাহি ব্যাপার। দুটো বড় কারে দুটোছুটি হবে দেশের ভিতরে। সঙ্গে যাচ্ছে দোভাবিণী লিঙ্কল এবং সংস্কৃতি-দপ্তরের লীবার্গ। তারাই দেখিয়ে বুঝিয়ে বেড়াবে। কোন পথে কোথায় কবে যাচ্ছি, কোন হোটеле খানাপিনা, কোনখানে রাজিবাস—হিসাবপত্র করে ছকে কেলছে সমস্ত। তারে ও ফোনে হোটেলের বন্দোবস্ত হচ্ছে। টাকাপয়সা লিঙ্কলের কাছে, গিল্পোনার যাবতীয় দায় তার উপর। কমসে কম হাজার তিনেক মাইল চকোর দিয়ে পুরো আটটা দিন পথে পথে ঘুরে আবার বালিনে আসব। হাজার শুনে চমকানেন না—নিভাস্তাই হাজার মাইল পথ ইয়োরোপের উপর নস্টি। সকালবেলা এই জায়গায় বসে চা খাচ্ছি, দুপুরের খানা রাঁধছে চার-শ মাইল দূরের অস্ত্র এক হোটেলো। এবং রাতের বিছানা হয়তো আরও শ-চারেক দূরের এক ঘরে।

খুব বেশি দিন আর থাকছিনে জর্মনিতে। পোল্যান্ড যাবো, পোল লেখক-সংঘ দাওয়াত পাঠিয়েছেন। হুনিয়ার মধ্যে যে যেখানে থাকি, লেখকমাদ্রেই আমরা এক জাতির। কাছাকাছি

এসে পড়েছি, অস্ত্র একটু মুখ শোঁকাওঁকি করে যাব। আবার শুনেই পাই চেক লেখকদেরও ডাক আসি-আসি করছে। চেক আত্মাদি আছে বালিনে, সেইখানে শুনে এলাম। ভাড়াভাড়ি তাই জর্মনির যতটা দেখে শুনে নেওয়া যায়।

রেডিওর নতুন স্টুডিও বানিয়েছে, সেটা দেখাতে নিয়ে গেল। আচ্ছকালকার গবর্নমেন্ট চালানোর সব চেয়ে বড় হাতিয়ার হল প্রচার। প্রচারের তোড়জোড় ইয়োরোপের সর্বত্র। মস্কো-স্টুডিও, লণ্ডনে বি.বি.সি—হুনিয়ার এমনি সব বড় বড় জায়গায় বাক্যদান করে এসেছি। কিন্তু বালিনের নতুন সকল সুবিধার এমন বৃহৎ আয়োজন আর দেখিনি। আগেকার যা-কিছু চুরমার হয়েছিল—গোড়া থেকে গড়ে তুলতে হচ্ছে, হালের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আমদানি করা তাই সম্ভব হয়েছে।

—আপনাদেরও বলতে হবে দু-চার কথা। কাল বলবেন। ইংরেজিতে। লিখতে-টিখতে হবে না। আমরা জিজ্ঞাসা করব, তারই জবাব দিয়ে যাবেন। রেকর্ড করে নেবো।

এইটে বড় ভাল। বক্তৃতার কামেলা নেই, কাগজে এরা কলম হোঁচাতে বলে না কখনো। গুপী-জ্ঞানীদের সঙ্গে একত্র খানাপিনা—কখনো হোটেলো, কখনো আর্টিস্ট-ক্লাবে। খেতে খেতে গল্পগুজব, নানা রকমের আলোচনা। আজ এক দলের সঙ্গে খাচ্ছি, কালকে আবার নতুন সব মানুষ। কত জনের সঙ্গে মন-জানাজানি হল এমনি ভাবে, কত ববর জানলাম। সভার মাঝে পাড়িয়ে লাগসই কথা খুঁজে খুঁজে গলদঘর্ম হওয়া—তাতে এ বস্তু মেলে না।

রেডিও-য় বলবার ক্ষমতা ডাকতে এল পরদিন সকালে। স্টুডিও অবধি অত দূর নয়, পাড়ারই মধ্যে। পায়ে হেঁটে চলেছি, লীবার্গ সঙ্গে এডলনের হোটেলের লাগোয়া ভাঙাচোর অট্টালিকার সারি—সরকারি দপ্তরখানা ছিল

তার পরেই প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ, ভন হিডেনবার্গ
হোমানে থাকতেন। বিস্তর কালক্রম—এখন
বিভীর্ণ পরিত্যক্ত পুরী। আর একটু গিয়ে কাটা-
তার ঘেরা জঙ্গল, জঙ্গল ফুড়ে কংক্রিটের চাই উচু
হয়ে উঠেছে—হিটলারের শেষ আশ্রয়-গৃহ চ্যানসেরি
যেখানটা ছিল। চ্যানসেরির সামন্য-সামনি বড়
রাস্তার ঠিক ওপারে তিকণ মনুজ বাসে-ঢাকা অপরূপ
লন। এখন বসন্তকাল—রঙবেরঙের মৌসুমি ফুল
ফুটে মাঠ আলো হয়ে আছে। এই যে লন,
এখানেও ঘরবাড়ি ছিল। উত্তর গোয়েবলসের
বাড়ি ও অফিস। প্রচার-দপ্তরের কৰ্ত্তা গোয়েবলস,
হিটলারের ডান হাত, ঐ একটা মানুষের দাপটে
হুনিয়ার খুন্দার লেগেছিল, রোজ সকালে কাগজ
খুলে বিশ বার তার নাম পড়তাম। সেই মানুষকে
আজকে পরিচয় দিয়ে বোঝাতে হচ্ছে। গোয়েবলসের
শেষ দিনের কথা ভাবুন। বাচ্চা ক'টিকে কোলে
তুলে নাচাল, চুনে খেল, আদর করে চকোলেট
দিল হাতে : খাে—খেয়ে ফেল। মুখের মধ্যে
পুরেছে, তখন গোয়েবলস বাইরে গিয়ে দাঁড়াল :
কি খবর ? খেয়ে ফেলেছে, শেষ হয়ে গেছে তবে ?
নহাপানের প্রায়শ্চিত্ত করল নিষ্পাপ অবোধ
শিশুরাও। নিছ চোখে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে
তার পরে বিধ খেল গোয়েবলস ও তার স্ত্রী।
এইখানে—এই সবুজ লন, যেখানটায় আজ এত
রঙের বাহার।

লনের ওদিকে নতুন নতুন বাড়ি—সরকারের
নানা দপ্তর। রেডিও-র অফিস এরই একটায়।
দোতলার একটা ঘরে নিয়ে তুলল। যন্ত্রপাতি সহ
তৈরি হয়ে আছে। আমাদের কথাবার্তা রেকর্ড
করে নেবে। সারা দেশে ছড়িয়ে দেবে আমাদের
উত্তর।

আমায় বলল, তোনাদের পেয়ে খুশি হয়েছি।

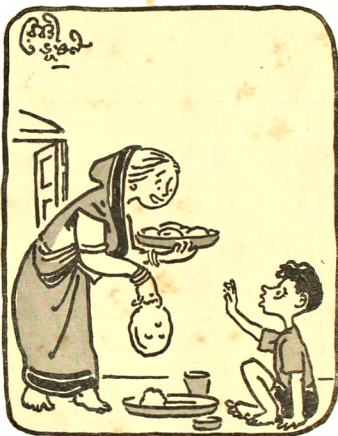
বড় ভাল তোমরা, কারও ক্ষতি করতে চাও না,
মিলেমিশে থাকতে চাও সকলের সঙ্গে। তবু
জিজ্ঞাসা করি, কোন্ বিশেষ বস্তু দেখবার প্রত্যাশা
নিয়ে এসেছ আমাদের দেশে ?

আমার জবাব : তোমরা ছিলে দার্শনিক শক্তিশালী
জাতি। অনেক শতাব্দীর সামরিক ঐতিহ্য
তোমাদের। ইয়োরোপ তো বটেই, গোটা হুনিয়া
বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিলে। শান্তিও হইয়েছে তেমনি।
এবারে দিব্যজ্ঞান পেয়েছ, শান্তিতে থেকে সামলে
নিতে চাও। ভারতেরও ঠিক এই পথ—পকলীল
গ্রহণ করেছি আমরা। সামরিক জাতি চিরকালের
রীতি ছেড়ে কেমন করে অহিংস পথে এগুচ্ছে,
দেখবার আমার বড় কৌতুহল। আরও এক
ব্যাপার, আমার দেশের মতন জর্মন দেশও তু-স্তাগ
হয়েছে। দুই জর্মনির মধ্যে কেমন সম্পর্ক, সমস্তা-
গুলোর কি রকম নিষ্পত্তি হচ্ছে, এই সমস্ত জানতে
চাই আমি। তোনাদের নিমন্ত্রণ যখন গিয়ে
পৌঁছল, তিলেক আমি বিধা করিনি—বৌচকা ঘাড়ে
সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছি।

প্রশ্ন : কেমন দেখছ বলো। কি ভাল লাগল
সবচেয়ে বেশি ?

জবাব : এসেছি মোটে দিন সাতেক।
এঁত বড় দেশের কতটুকুই বা দেখছি! সেদিন স্ত্রী
নদীতে বেড়াতে গেলান, বড় ভাল লাগল।
প্রাণে ভরভরতি হাজার হাজার মানুষ ছুটির দিনে
জলে জললে বেরিয়ে এসেছে। বোমা বেত্রে ঘর-
বাড়ি চুরনার করা যায়, কিন্তু এত বড় জাতকে
মার্মা যায় না। তোমাদের দেখতে পাচ্ছি, নতুন
মহিমায় আবার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। আর
দেখলাম, স্বী ভালবাসা ভারতের উপর। ভারতীয়
বলে একরকমি বাচ্চার কাছেও আমাদের শক্তির।

[জবাব :]



—“মি: বাই! তুই খেতে খোলমালি করতে নেই। বেখর না, আমারে বসিয়ে পনির
ভাত খাওয়া দেবে তুই করেছন...”

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

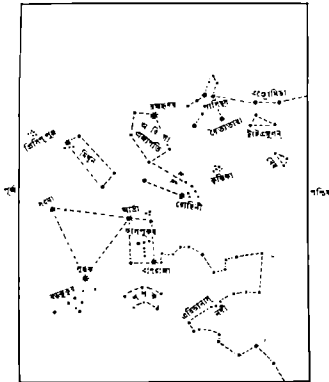
কাল্পনিক সন্ধ্যায় আকাশ

শ্রী কামিনীকুমার দে

আমরা যখন নৃত্যের কোনো মকরমণ্ডল দেখি তখন—
লগ্নে যাতনায় সজ্জিত পদবীতি হইয়াছে। এখন তাহার ভিন্ন
অংশেই আঁসিয়াছে।

বলিয়া: মীনরাশিকেও ভালো চেলা: ঘাই এছে না, সিটাল-
মণ্ডলের কজকাশ অস্তমিত হইয়াছে। মেঘরাশিকে দেখিতে
পাই এছি—আমাদের শরণ আছে, তাহার তিনটি তারা

উত্তর



দক্ষিণ

কাল্পনিক সন্ধ্যায় সূর্য কুন্ডরাশিতে থাকে, ইতরাং কুন্ডরাশি
সূর্যের সঙ্গেই অস্ত যাইতেছে। পশ্চিমাংশে নিয়ে অবস্থিত

মূলগোষ্ঠী ত্রিভুজের আকারে সজ্জিত আছে। কিছু উত্তরে
টাইএমুল-মণ্ডলে তিনটি তারার আর-একটি ত্রিভুজ দেখা

ঘাইতেছে। মাথার উপরে তাকাইলেই ক্লবরাশি ও তাচার উত্তরে প্রজাপতি-মণ্ডলকে দেখিতে পাটবে। যুবের প্রথম প্রভাব লালবস্তুর 'রোহিণী' তারা মধ্যরেখা অতিক্রম করিয়াছে। তাহার পশ্চিমে কৃত্তিকাপুঞ্জকে অনাবরণে চিনিতে পারিতেছি। প্রজাপতি-মণ্ডলের উজ্জ্বল তারা 'ব্রহ্মহনু'ও দুটি আকর্ষণ করিতেছে।

যুবের দক্ষিণে কালপুঙ্ক-মণ্ডল মধ্যরেখার নিকটে। এট মণ্ডলে আয়তাকার-ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব কোণে লালবস্তুর আর্ত্রী এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নীলবস্তুর বাণরাজ্য (Migel) প্রথম প্রভাব তারা। 'শরণ' থাকিতে পারে, আর্ত্রী একটি প্রকাণ্ড তারা—ইহার আয়তন তিন কোটি সূর্যের সমান। কালপুঙ্কবের দক্ষিণে শবক-মণ্ডলের দুইটি তারা দেখিতেছি। বাণরাজ্যের নিকট হইতে নদী-মণ্ডলের (Eridanus) তারাগুলিকে অতুলরণ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলিতে থাকিলে, এই সুদীর্ঘ মণ্ডলের শেষ অংশ আর দেখা ঘাইবে না। সর্বশেষ প্রথম প্রভাব আর্চের্নার (Achernor) তারাকে আমরা ভুলি নাই। সন্ধ্যায় কিছু পরে আর্গোনেডিস-মণ্ডলের অগস্ত্য তারাকে সোজা দক্ষিণে দেখা ঘাইবে। তারাদের মধ্যে লুঙ্কবের পর অগস্ত্য তারার উজ্জ্বলতা সর্বাধিক। কালপুঙ্কবের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বড়বুকুর-মণ্ডলের লুঙ্কব (Sirius) তারাকে চিনাইয়া দিব্যে প্রয়োজন নাই, উজ্জ্বলতাই তাহার পরিচয়। ইহার উত্তরে ছোটবুকুর-মণ্ডলের সরমা (Procyon) আর-একটি প্রথম প্রভাব তারা। আর্ত্রী, লুঙ্কব এবং সরমা এক প্রকাণ্ড

সমবাহু ত্রিভুজের তিন কোণ আছে, ইহা আমরা লক্ষ্য করিতেছি।

কালপুঙ্কবের উত্তর-পূর্ব দিকে মিশুন-মণ্ডলকে দেখিতে পাটতেছি। মিশুনের পূর্ব দিকে বকট-মণ্ডলের গ্রিনিপ্, বা মৌগাবপুঙ্কবে অতুলজন করিতে হইবে।

আকাশের উত্তর-পশ্চিম দিকে সিঙ্গিস্ক-মণ্ডলকে আর ভালো চেনা ঘাইতেছে না, কিন্তু ক্যাসিওপিয়া-মণ্ডলকে আমরা বেশ দেখিতে পাটতেছি। উত্তর-পূর্ব আকাশে সপ্তবি-মণ্ডল উদিত হইতেছে।

শেখাশাস্ক-মণ্ডলে পশ্চিম দিকের তারা-হুইটিকে আর দেখা গাটতেছে না। ইহার বর্গাকৃতির উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া এণ্ড্রেমিডা-মণ্ডল এবং তাহার পরে পাসিফু-মণ্ডলকে দেখিতেছি। ইহার সকলেই এখন পশ্চিমাংশে।

সিংহ-মণ্ডল উদিত হইয়াছে। এট মণ্ডলে দুইটি তারা মিলিয়া বে কান্তের আকৃতি করিয়াছে, তাহাতে প্রথম প্রভাব মধ্য (Regulus) দুটি আকর্ষণ করে; কান্তের পূর্ব দিকে তিনটি তারা সমকোণী ত্রিভুজ করিয়া আছে—সমকোণের উত্তরে পূর্বকক্ষনী এবং পূর্বে উত্তরকক্ষনী। বাকি একটু অধিক হইলেই এট তিনটি তারা ভালো করিয়া দেখা ঘাইবে।

এট মাসে পূর্ণিমার ১৩ কক্ষনী-মন্ডলে থাকে, সেইজন্য মাসের নাম ফাঙ্কন।

[এই মাসে কালপুঙ্ক ও তাহার চারিদিকের মণ্ডলগুলিই একটু নিচে গিয়াছিল।]



কপদ্মাগর

দুর্ভাগ্য ঘোষ

[পূর্বসংবাদিতঃ পঃ]

খবরটা যেন একটা চরম মীমাংসার খবর। বিহুটির সঙ্গে নীরাজিতার জীবনের নিলম হবে, খুবই ভাল খবর। এ খবর শুনে কেউ চমকে ওঠে না, ঝুটুটিও করে না। কারণ চোখের চাহনিতে তুচ্ছতা বা বিক্রমের ছায়া কাপে না। বেশ কিছুকণ ধরে একটা স্বত্বিময় নীরবতা যেন থমথন করে। নিশীথের মুখের এই স্তব্ধবার্তার মধ্যে একটা পরিণামের প্রাণ যেন ঠাপ ছেড়ে বলছে, সব ভাল যার শেষ ভাল।

খবরটা যেন অনেকগুলি মানুষের জীবনের একটা উদ্বেগেরও অবসান। কেউ আর এই অভিযোগ করতে পারবেনা যে, আমি সুখী নই। প্রতিভা আর সুনয়নার মুখের হাসি যেন শাস্ত্র অভিনয়নের হাসি। ভালই হয়েছে; যা হওয়া উচিত ছিল তাই হয়েছে। নীরাজিতার ভাবনায় ও কল্পনায় আর এমন কোন যন্ত্রণার দংশন থাকতে পারে না, যার জন্য কোন মানুষের বিরুদ্ধে তার মনে অহরহ একটা আক্রোশের আলা ছটকট করবে। নীরাজিতার কোনই ক্ষতি হলো না।

ধীরেন বলে—খুব ভাল হলো।

ধীরেনের কথাগুলি যেন ধীরেনের একলা উপপক্তির কথা নয়। এই চারটি মানুষেরই মন নীরবে ধীরেনের মত স্তব্ধতার অধুভবে ভরে গিয়েছে। নীরাজিতা কিংবা বিহুতি, দু'জনের কেউ ওদের জীবনের এই স্তব্ধ পরিণামের রূপ, ওদের বিয়ে বৈধবার জন্য নিমন্ত্রণের চিঠি দেবে বলে আশা করা যায় না ঠিকই; ভয় আছে ওদের দু'জনেরই মনে। এই চারজন মানুষের ছায়ার মধ্যে ক্ষত আছে, এবং

সে ক্ষতকে খুবই ঘৃণা করে দু'জনে। কিন্তু নীরাজিতার এই ঘৃণা আর এই ভয়কে ঘৃণা করতে এই চারজন মানুষের মনে কোন উচ্চার ছায়াও নেই; বরং, মনে হয় যে, এবং সম্ভাব্য একেবারে স্পষ্টভাবে আর একটা কথা বলে সবাইকে হাসিয়ে দেয় নিশীথ। —বিহুতির সঙ্গে নীরাজিতার বিয়ে অবধারিত ছিল বলেই...

সুনয়না হাসে—কি ?

নিশীথ—প্রতিভার সঙ্গে আমার বিয়েটা হয়ে গেল।

ধীরেন বলে—এবং, সুনয়না আমাকে ভাল-ভাত খাওয়াবার গ্যারান্টি দিয়ে একটা গাঁয়ের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে।

গালুড়ির এই বাড়িতে এই চারজন মানুষের নিরুদ্বেগ ও কৃতার্থ জীবনের হাসি আরও অনেকক্ষণ মুখর হয়ে থাকে। খাওয়ার পাট সারা হবার পর যখন কালিকাপুরে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় নিশীথ আর প্রতিভা তখন শুধু ওদের দু'জনের মুখের হাসি নয়, ধীরেন আর সুনয়নার মুখের হাসিও যেন অদৃষ্ট এক অধুভবের আবেশে ছলছল করে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকায়; চোখে চোখে যেন একটা ক্ষমার উৎসব তেজে উঠে নীরবে বলছে, যদি কোন ক্ষতি করে থাকি তবে ক্ষমা কর।

আবার কালিকাপুরের দিকে; গালুড়ির রেল-লাইনের লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে নিশীথের গাড়ীটা আবার সড়কের দু'পাশের শাল আর সেগুনের ছায়ার ভিতরে এসে পড়তেই নিশীথ বলে—এইবার একটা কথা সাহস করে বলবো, প্রতিভা ?

প্রতিভা হাঙ্গামে। —প্রতিভার কাছে ভয় করে কিছু বলবার ছিল নাকি?

নিশীথও হাসে। —ছিল।

প্রতিভা—কি কথা?

নিশীথ—নীরাঞ্জিতার কথা। নীরাঞ্জিতা যে খুশি হয়ে বিহুতিকে বিয়ে করতে চেয়েছে, এ খবর শোনবার পরে মনের একটা ভাঙ মিটে গেল। বেচারার তো কোন দোষ...

প্রতিভা—ঠাং, বল—

নিশীথ—নীরাঞ্জিতা চরিত্রহীন মানুষকে ভয় পায় আর ঘৃণা করে, এটা নিশ্চয় এর অপরাধ নয়। বিহুতির মত মানুষের সঙ্গে এর বিয়ে হওয়াই উচিত ছিল, খুব ভাল হলো।

রাজপোখরাতে ডালিয়া বাগানের কাছে একটা ছোট চোরার উপর বসে আর সামনের ছোট একটা টেবিলের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে প্রতিভার কাছে লেখা একটা চিঠিতে ঠিক এই কথাগুলি লিখলেন শিবদাসবাবু: খুব ভাল হলো, প্রতিভা। আজ নীরাঞ্জিতার সঙ্গে বিহুতির বিয়ে হয়ে গেল। আমি খুব কৃত্তি করে বিয়েতে খেটেছি। মাস রাঁধবার ভার আমার উপরেই ছিল।

শিবদাসবাবুর চিঠি লেখা যখন সারা হয়, ঠিক তখনই অলঙ্কারের বারান্দার আলপনা পিছনে ফেলে রেখে আর বিহুতির পাশে পাশে হেঁটে সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায় নীরাঞ্জিতা।

অলঙ্কারের শব্দরবমুখর কটক পিছনে ফেলে রেখে বিহুতির গাড়িটা যখন গাড়ীর গুঞ্জন তুলে আস্তে আস্তে কাউন্সের দ্বারা পার হয়ে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন ডালিয়ার বাগানের কাছে শিবদাসবাবুর চেহারাটার দিকে হুঁজনে একসঙ্গে তাকায়, বিহুতি আর নীরাঞ্জিতা। তারপর হুঁজনেই হুঁজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে।

বিহুতির গাড়ি এখন আর পথের কোথাও

থানবে না। রাজপোখরা থেকে সিনি: সিনিতে বিহুতির বাংলা-বাড়িটা এখন অনেক আসে। আর অনেক ফুলের স্তবক ঘরে ঘরে সাজিয়ে নিয়ে বিহুতি আর নীরাঞ্জিতার জীবনের শুভমিলনের আনন্দ বরণ করবার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে।

শুভ মিলন নিশ্চয়; কিন্তু শুধু শুভ বলতে রাজি নয় খরসোয়ান ম্যাপানিজের বিহুতি।

বিহুতি বলে—শুধু বিবাহ বলতে আমার আরও ভাল লাগে।

নীরাঞ্জিতা—কি বললে?

বিহুতি—চরিত্রের দিক দিয়ে যারা শুধু, শুধু তাদেরই বিয়েকে একটা শুভ ব্যাপার বলা যেতে পারে। কিন্তু ট্র্যাভেলি এই যে, বোর চরিত্রহীন মানুষগুলোও নিজেকে বিয়েকে শুভ-বিবাহ বলে রঙীন কাগজের চিঠিতে বড় বড় হরপে বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে নেমস্তম্ভ করতে একটুও লজ্জা পায় না।

নীরাঞ্জিতা হেসে ওঠে। —তাত নিজেকেই ঠকানো হলো।

বিহুতি—কিন্তু এ-ও এক আশ্চর্য, ঠকতেও লজ্জা পায় না। দৃষ্টান্ত...

গাড়ি ডাইভ করছে বিহুতি; এবং একই সীটের উপর বিহুতির পাশে বসে আছে নীরাঞ্জিতা। গাড়ির ভিতরে যে আলোটা জ্বলছে, সে আলোটাকে জড়িয়ে একটা ফুলের মালা ছলছে। চকিতে একবার নীরাঞ্জিতার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বিহুতি বলে,—আমি দৃষ্টান্ত হিসাবে কাদের কথা বলছি; নিশ্চয় বৃত্তে পেরেছ নীরা?

নীরাঞ্জিতা হাসে—খুব বৃত্তে পেরেছি; কিন্তু ওদের কথা আমাদের আলোচনা না করাই ভাল।

বিহুতি—ঠিক কথা।

চূপ করে বিহুতি, এবং নীরাঞ্জিতাও চূপ করে চলন্ত গাড়ির শব্দের সঙ্গে জীবনের এক বিপুল কৌতূহলের চকলতা বিশিয়ে দিয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে। বিহুতি, খরসোয়ান ম্যাপানিজের বিহুতি, যার বৃত্তের বাতাস শরৎকালের সকালবেলার

বাতাসের মত, একফোঁটা ধুলোর চিহ্ন নেই যে বাতাসে; সেই মানুষ যেন নীরাজিতারই অদৃষ্টের ইচ্ছিতে পরিয়াতার মত এসে নীরাজিতাকে একটা ভয়ানক ভুলের গ্রাস থেকে মুক্ত ক'রে দিয়ে নিজেরই জীবনের সন্তানী ক'রে নিয়েছে। কালিকাপুরের নিশীথের তুলনায় কোন দিক দিয়ে ছোট হওয়া; দূরে থাকুক, বরং সব দিক দিয়ে বড়, এই বিহুতি যে নীরাজিতার জীবনে একটা আকস্মিক পৌরুষের উপহার। খরসোয়ানে মাস্তানিছের বিহুতি বোড়গারে বড়, পন-প্রতিষ্ঠায় বড়, চরিত্রে বড়। নীরাজিতার মনে ছাধে করবার কিছু নেই। সব দিক দিয়ে ভিত হয়েচে নীরাজিতার। সব খবর জানেন পিসিমা, তাই আশীর্বাদ করবার সময় তিনি আনন্দের আবেগে কঁদে ফেলেছেন।—কোনদিন তো শিবপুজো করিসনি নীরা, তবু তোর ওপর শিবের কী দয়া! নইলে এত সহজে ওরকম ধারণা হড়াবের একটা। মাস্তাবের মতলব থেকে বাচতে পারতিস না। সৌভাগ্য বলে সৌভাগ্য! পুণিয়া বলে পুণিয়া! নইলে কি বিহুতির মত সঙ্করিত ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়?

ভাবলে এখনও ভয় করে। কালিকাপুরের নিশীথ, টুন, কী অদ্ভুত ছলনা জানে লোকটা! যার শরীরটা এত কলুষ ছুঁয়েছে, তার মুখটা কী অদ্ভুত কপটতা ক'রে খাটি ভালবাসার হাসি হেসেছিল। কিন্তু ভাগা ভাল: পিসিমা সেদিন একটুও বাড়িয়ে বলেননি; শিবেরই দয়া; নীরাজিতার জীবন একটা উজ্জ্বল পৌরুষের স্পর্শে অপমানিত হবার ভয় থেকে বেঁচে গিয়েছে।

মনে মনে নিজের বেকুব মনটার উপরেও রাগ করে নীরাজিতা। না বুকেবুকে, একটুও সন্দেহ না ক'রে, ঝৈনের কামরাতে দেখা একটা মানুষের চোখের চাহনির সেই আশ্রয়টাকে কেন হঠাৎ ভাল লেগে গিয়েছিল? মনটা লোভী হয়ে উঠেছিল; সে-কথা ভাবতে মনের উপরই রাগ হয়। কিন্তু সেই ভুলের মনটাকে কমা ক'রেও দিতে পেরেছে

নীরািজিতা। কি ক'রে বোকা যাবে? দেখে বুঝতে পারা যে নিতান্তই অসম্ভব। ফুলের পাপড়ির উপর যে শিশিরের ফোঁটা টলমল করে, সেটা সাপের বিষের ফোঁটাও হতে পারে বলে সন্দেহ করতে পারে কে? সন্দেহ করবার এত বড় শক্তিও বা কজন মেয়ের আছে?

তবু কি নিজেরই সেই ভুলের মনটার উপর রাগ হয়? নিশীথের মুখটা মনে পড়লে এখনও নীরাজিতার মনে একটা ঘৃণাভরা রোষের আলা ছটকটিয়ে ওঠে। অলঙ্কারের ফটক তালাবদ্ধ হয়ে একটা কঠোর উপেক্ষা দিয়ে মানুষটাকে তাড়িয়ে যে শান্তি দিয়েছে, সেটা কি আর এমন শান্তি? আরও শান্তি হওয়া উচিত ছিল; এবং বুকেতেই পারা যাচ্ছে, সে শান্তি পেয়ে যাবে লোকটা। প্রতিভার মত মেয়ের চরিত্রের কাছে অপমানিত হতে হতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, হয়েই যেন যায়, লোকটার চরিত্রহীন আত্মার প্রাণটা!

—কি ভাবছো, নীরা?— হঠাৎ প্রশ্ন করে বিহুতি; এবং সেই প্রশ্নের শব্দে যেন একটু চমক লেগে কঁপে ওঠে নীরাজিতা।

বিহুতি—বাড়ির কথা ভাবছো বোধ হয়? এবং সেই ক্ষণে এক গম্ভীর হয়ে...

নীরািজিতা হেসে ফেলে। —বাড়ির কথাই ভাবছি; কিন্তু সে বাড়ি অলঙ্কার নয়।

বিহুতি—তবে?

নীরািজিতা—যে বাড়িতে থাকি।

বিহুতি—সেটা আমার নিজের স্নেহভাগ্যের টাকায় কেনা বাড়ি। সে বাড়ির ফটকের কাছে এসে দাঁড়াবারও ওদের সাধি নেই।

নীরািজিতা যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। —ওরা...ওরা তোমার বাড়ির কাছে আসবে কেন?

বিহুতি হাসে—তুমি কাদের কথা ভাবছো?

নীরািজিতা—আমি ভাবছি,...ঐ ওদের কথা... যাদের বিয়েকে একটা ভয়ানক অন্তি কাণ্ডের পৃষ্ঠান্ত বল তুমি এখনই...

বিহুতি—না না, ওদের কথা বলছি না। শিবদাস দত্তের নেয়ে আর নিশীথ কোন্ সাহসে আমার বাড়িতে আসবে?—ওরা নয়; আমার ছুটি দরিদ্র ভ্রাতা আছে, ছুটি হতভাগা, সদাগর অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী। বাট-সত্তর টাকা মাইনে পায়।

নীরাঞ্জিতা—ঠাকুরপো'রা কি কেউ...

বিহুতি—না, কেউ না। ওরা কেউ আসেনি। ওদের আসা নিষেধ।

নীরাঞ্জিতা—তোমার বিয়েতেও যদি ওরা না আসে...

বিহুতি—ওরা তো আসতেই চায়। কিন্তু আমি আসতে দেব কেন? ওরা ভাল করে জানে যে, বড়দার চরিত্রে কোন মায়াজারা দাণাপনা নেই।

নীরাঞ্জিতা অপ্রস্তুতের মত কুণ্ঠিতভাবে বলে— আমি সত্যিই সব খবর জানি না। কিন্তু ধারণাও করতে পারছি না, কেন তুমি ওদের সম্পর্কে এত...

বিহুতি—ওরা আসলে আর যেন নড়তেই চায় না। বড়দার সঙ্গে দেখা করার কাজটা তো এক সেকেন্ডেই হয়ে যায়, কিন্তু তারপর আরও সাতটা দিন ধরে পড়ে থেকে বড়দার অন্ন ধ্বংস করতে চায়। এসব আমি নিতান্ত অপছন্দ করি।

নীরাঞ্জিতা আরও কুণ্ঠিতভাবে, যেন একটু ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করে—সিনির বাড়িতে কি তাহলে শুধু মা একাই এসেছেন?

বিহুতি—মা? কার মা?

নীরাঞ্জিতা—তোমার মা?

বিহুতি—আমার মা তো দেশের বাড়িতে থাকে।

নীরাঞ্জিতা—তা জানি। বাবার কাছে শুনেছি...

বিহুতি—কি শুনেছ?

নীরাঞ্জিতা—তোমার মা এখন হালিসহরে তোমাদের পুরনো বাড়িতে একাই থাকেন।

বিহুতি—ঠিকই শুনেছ।

নীরাঞ্জিতা—আমি ভেবেছিলাম, তোমার বিয়েতে মা নিশ্চয় সিনিতে আসবেন।

বিহুতি—আসবার উপায় নেই।

নীরাঞ্জিতা—কেন?

বিহুতি—আসতে দিচ্ছে কে? দেশ-গায়ের একটা বড়ি মাথুবৎ আমার সিনির বাড়িতে থাকতে দিলে ম্যাকেলি গিল্টার আর ফারিস মনে করবে যে, অনর্থক একটা বড়ি চাকরানিকে খাটিয়ে-খাটিয়ে কষ্ট দিচ্ছে বিহুতি।

—সর্বনাশ!— নীরাঞ্জিতার বুকটা যেন বেকাঁস চমকে উঠে ছোট একটা আতঁনাদ ছেড়ে কাঁপতে থাকে।

—সর্বনাশ মানে?— টিয়ারিং শব্দ করে আঁকড়ে ধরে, নীরাঞ্জিতার মুখের দিকে চকিতে একটা শব্দ চাহনি ছুঁড়ে দিয়ে, এক গভীর গলার স্বর গমগমিয়ে প্রশ্ন করে বিহুতি।

নীরাঞ্জিতা—সাহেবরা এরকম ধারণা করলে কতক না কেন। তা বলে বুড়ো মা কি তার ছেলের কাছে থাকবে না? এ তো বড় আশ্চর্যের কথা।

বিহুতি—একটুও আশ্চর্যের কথা নয়, নীরা। মা যে কী ভয়ানক উৎপাত সৃষ্টি করতে পারে, সেটা তুমি নিজের চোখে না দেখবার আগে বিশ্বাস করতে পারবে না।

নীরাঞ্জিতা—শুনিই না: কী উৎপাত করেন?

বিহুতি—আমার সিনির বাড়িতে মা'কে একবার আসতে দিয়েছিলাম। সাতদিন ছিল। কিন্তু সেই সাতদিন শুধু কৈসেকটে আর গালাগালি দিয়ে আমাকে হারখার করেছে।

নীরাঞ্জিতা—বুকলাম না।

বিহুতি—আমার ছুটি দরিদ্র হতভাগা ভ্রাতাকে আমি টাকা দিয়ে সাহায্য করি না, এই হলো আমার পাপ; এবং কেন সাহায্য করবে না আমি, এই হলো আমার মা'দেবীক অভিযোগ।

আবার কিছুকণের নীরবতা। সিনি পৌছতে দেখি আছে। দূরে পাহাড়ের মাথার উপরে মেঘের গায়ে কিকে জোংরার সাদা হোয়া সূটিয়ে পড়েছে এবং নীরাঞ্জিতার চোখের দৃষ্টিও যেন সাদা হয়ে

বিহুতির হাত ছুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে। ইয়া, রিকট, বেশ শক্ত হাত। স্টিয়ারিং-এর লোহার সঙ্গে বিহুতির হাতের মুঠো ছুটো লোহার গিঁটের মতই শক্ত হয়ে এঁটে আছে।

নীরাঞ্জিতার চোখ ছুটো সাদা হয়ে গিয়েও যেন জোর করে একটা রঙীন কল্পনার ছবি দেখবার চেষ্টা করছে। সিনির বাড়িটা কি সত্যিই বিহুতির একলা জীবনের কঠোর শাসনে একেবারে নীরব হয়ে আছে? হাসিমুখে এগিয়ে এসে নীরাঞ্জিতাকে হাত ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে যাবার কেউ নেই? বিহুতির বো দেখতে কী সুন্দর, এমন একটা কথা বলবারও কোন মানুষ থাকেনা সেখানে?

বিহুতি বলে—আমার বাড়িতে তুমি কোন ব্যক্তি গণগোল সুনতেই পাবে না, নীরা। হৈ-হুলা আমি নিতান্ত অপছন্দ করি।

অবে কি সিনির বাড়িতে কোন উৎসবের আয়োজন নেই? খরসোয়ান ম্যাক্সানিজের বিহুতির জীবনের একটা মধুর পরিণামের ঘটনাকে স্মৃতি জানাবার জন্য কেউ সেখানে আসবে না?

বিহুতি বলে—আমার একটা আশঙ্কা আছে, নীরা।

নীরাঞ্জিতা—কি?

বিহুতি—মস্ত বড় একটা ব্যক্তি খরচের পাল্লায় পড়তে হবে।

নীরাঞ্জিতা—কিসের জন্য?

বিহুতি—একটা স্মৃতিভোজ দিতেই হবে। অস্তুত হারিস লিষ্টার আর ম্যাকজিক একটা কক্টেল দিতেই হবে; তা ছাড়া আর আট-দশজন কি আই পি গোছের ব্যক্তি আছেন। তাঁদের একটা খানাপিনা না দিলে নয়। অস্তুত তিন-চার শো টাকা খরচ হয়ে যাবে।

সিনির দিকে মোড় ফেরবার সাইন দেখাচ্ছে যে পোস্টটা, সেটাকে লেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গাড়ির হেড-লাইটের আলো পড়ে দেখাটা অস্বাভাবিক—
ই সিনি, সেভেন মাইল্‌স্‌। কিন্তু নীরাঞ্জিতার

চোখের সামান্য চাহনির উপর যেন রক্তাক্ত আভাষের ছায়া লুটিয়ে পড়েছে। লেখাটাকে কতগুলি লাল আঁচড়ের দাগ বলে মনে হয়।

ই সিনি; নীরাঞ্জিতার জীবন খরসোয়ান ম্যাক্সানিজের বিহুতির জীবনের ঘরের দিকে দৃষ্টি করে ছুটে চলে যাচ্ছে। কারণ, বিহুতির গাড়ি বেশ স্পীড নিয়ে ছুটছে। কিন্তু নীরাঞ্জিতার বুকের ভিতরের একটা ভীতি। যেন এই স্পীড সত্ত্ব করতে না পেরে এখনই গাড়ি থেকে সড়কের ধুলোর উপর কঁপ দিয়ে পড়ে যেতে চায়।

বিহুতি বলে—অবশ্য, সে আশঙ্কার কতি পুথিয়ে নেওয়াও যাবে?

—কি বলছে। তুমি? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার শুদ্ধ-বিবাহের আনন্দ সামান্য একটা তিন-চারশো টাকার খরচকে এত ভয় করে কেন?— কথা বলতে গিয়ে হাঁসকাস করতে থাকে নীরাঞ্জিতা।

হেসে ওঠে বিহুতি।—কোন ভয় করি না। দশ-পনেরো জনকে কক্টেল দিতে আর খাওয়ানো তিনশো টাকা খরচ হয় হোক; কক্টোঁটার মূলটামকে বলবো, পুরো তিন হাজার টাকা খরচ হয়েছে।

নীরাঞ্জিতা—তাহতে কি হবে?

হো-হো করে হেসে ওঠে বিহুতি।—তাহতে মূলটাম তখনই খুশি হয়ে তিন হাজার টাকা আমার হাতে তুলে দেবে, আর ধন্য হয়ে চলে যাবে। অর্থাৎ আমার নীট লাভ হবে দু'হাজার সাতশো টাকা।

ই-সিনি! এইবার মোজা সিনির সড়ক ধরে ছুটে চলেছে বিহুতির গাড়ি। দূরে ছোট ছোট অনেক আলোর ভিড় দেখা যায়। বোধ হয় বাবুদের কোয়ার্টার; কিংবা অফিসারদের বাংলার আলো ফলাচ্ছে।

সাদা ধবধবে একটা বাড়ির সামনের লনে আলোর কাছে এক-একটা ক্যাম্প-চেয়ারের উপর গড়িয়ে পড়ে আছে কয়েকটি বেতাজিনীর শরীর।

জাতিয়ার আকারের ছোট প্যাট, আর দেখতে কাঁচুলির চেয়েও ছোট আকারের নেটের রাউজ গায়ে—কতগুলি সাদা ধবধবে আলোয়ের কূল নেশাতুর হয়ে পড়ে আছে।

বিহুতি হাসে। —একটা মজার কথা বলি, শোন নীরা। ঐ যে দেখছো, ওদেরই মত একটি বস্ত্র একবার আমার হাত ধরতে এসেছিল; কিন্তু তাকে ছুটি কথায় এমনই অপমান করে দিয়েছিলাম যে, খাস বিলিতী সেই মিস মহোদয়! এদেশ ছেড়ে সোজা বিলেতে চলে গেল।

—শুনেছি, শুনেছি, শুনেছি! — বলতে বলতে নীরাজিতার গলার স্বরে যেন চৌচিয়ে ওঠবার ভঙ্গ ছটকট করে ওঠে। বিহুতির মুখের দিকে অদ্বুতভাবে তাকিয়ে অদ্বুতকন্ঠের একটা অলঙ্কারে হাসি হাসতে থাকে নীরাজিতা। —তোমার এই রোরির গল্প টাটানগরের মামীর কাছে শুনেছি; কলকাতাতে বউদির কাছে শুনেছি; রাজপোখরাতে ঘরভরা ভদ্রলোকদের কাছে বাবা ভোরে ভোরে চৌচিয়ে এই গল্প বলছেন, তা'ও শুনেছি।

বিহুতি হাসে। —তবে তুমিও কি একটু...

নীরাজিতা—কি?

বিহুতি—আশ্চর্য হওনি?

নীরাজিতার গলার স্বরে যেন একটা ধোঁয়াটে উল্লাসের শব্দ ঝঙ্ক করে আসে ওঠে। —খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। আর, সেই ভাঙেই মামাকে বলেছিলাম যে...

বিহুতি—কি?

নীরাজিতা হাসে। —বলেছিলাম, বিহুতিবাবুর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে দেওয়াতে পারেন, তবেই আমার বিয়ে হতে পারে। নইলে বিয়েই হবে না। পৃথিবীতে আর কাউকে আমি বিশ্বাসই করবো না।

বিহুতি—কি আশ্চর্য, তোমার সেই অভিমানই শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো, নীরা।

নীরাজিতা—জয় বলতে হয়। শেষ পর্যন্ত তুমিও

বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে যে, নীরাজিতা আর যে ভুল করুক না কেন...

বিহুতি—হ্যাঁ নীরা, যখন কোন সম্ভব রটল না যে, নীরাজিতা আর যা ভুল করে থাকুক না কেন, সে ভুল করেনি নিশ্চয়, যে-ভুল করলে মানুষ অমানুষ হয়ে যায়, তখন...সত্যি কথাটা একটু বেহায়ারা মত বলতে ইচ্ছে করছে নীরা, তখন তোমাকে মনে মনে বড় ভাল লেগে গেল। মনে হলো, তোমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে বোধ হয়। কিন্তু...

নীরাজিতা—কি?

বিহুতি—কিন্তু ওভাবে এক নারীকে শুধু মনে মনে ভালবাসাও ঠিক উচিত হবেনা বলে মনে হলো। কে জানে, নীরাজিতাও তো পরস্পর হয়ে যেতে পারে; কার না কার সঙ্গে বিয়ে হয় যাবে নীরাজিতার। তাতে চিরকাল মনের ভিতরে এই লজ্জা থেকে যেতে যে, আমি মনে মনে এক পরমারীর অশ্রু অশ্রুপাগ পুষেছি। তাতে পৃথিবীতে কোন মেয়েকে বিয়ে করতে আমার বিবেকে বাধতো। মনে হতো, বেচারার প্রতি অশ্রায় করছি। কিন্তু...

কথা শেষ না করেই চকিতে আর একবার নীরাজিতার বিখিত মুখটার দিকে তাকিয়ে বিহুতির চোখজুটোও যেন একটা নিখুঁত শুদ্ধতার গর্বে হেসে-হেসে ককক করে। —কিন্তু আমার গর্ব ও আনন্দ এই যে, জীবনে প্রথম যাকে মনে মনে ভালবাসতে চেয়েছিলাম, তাকেই বিয়ে করলাম। আমার চরিত্রের সম্পর্কে আমার একবিন্দুও অভিযোগ নেই, নীরা।

কী কাঁঠার শুদ্ধতার সাধনা! নিজের চরিত্র সম্বন্ধেও বিহুতির মনে কোন কনাময় দুর্বলতা নেই বিহুতির এই শুদ্ধ পৌকবের উপর কোন চরিত্র-ঘাতক কলুষের ছায়াও পড়েনি কোনদিন। গরিব হবারই কথা।

বিহুতির গাড়ি চমৎকার একটা উজ্জলতা

কাজে এসে পড়েছে। বিহুতির বাৎসার ফটকের কাজে হুঁজুন লোক ধাড়িয়ে আছে। চাপকান-পরা ছুটি মানুষ। বোধহয় বিহুতিরই চাপরাসী আব বেচারা।

বিহুতির গাড়ি খামে। পিছনে আরও একটা গাড়ির শব্দ প্রচণ্ড চব্বির শিঙর তুলে ছুটে আসছে শোনা যায়। হ্যা, নীরাঙিত: আর বিহুতির ভাবনের স্তব ও শুক্ক মিলনের জ্ঞান রাতপোখরার মলককের যত গীতি আর আশীর্বাদের সম্ভার নিয়ে

যে গাড়িটার আসবার কথা, সেই গাড়িটাও প্রায় এসে পড়েছে।

স্টায়ারিং-এর ঢাকা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে এইবার নীরাঙিতার একটা হাত ধরে বিহুতি।
—এস, নীরা।

নীরাঙিতার হাতটা যেন কেঁপে ওঠে। বিহুতির হাতটা কত ঠাণ্ডা! যেন একটা নিখুঁত লোহার আগ্রহ নীরাঙিতার নরম হাতটাকে শক্ত করে আকড়ে ধরেছে।

[জমক:]



কল্কি

অন্তিম কল্কি

উনিশ

এ কে এল আশ্রমে !

আশ্রমবাসী তপস্বীর দল বিশ্বযুদ্ধ নেত্রে তাকিয়ে রইল। কে এই ইন্দ্রপ্রতিম রাজকুমার ! নিরাভরণ দেহ, বেশবাস ঐহীন, তবু চকিতে সকলের চকু ও চিত্ত বহন করে নিয়েছে।

নীল মেঘ এল মনে করে মনুর পঞ্চম বেলে কেকাধনি সূক্ত করল। দোহন শেষ হয়ে গেলেও পুনরায় হৃদয়করণ করতে লাগল হোমধেনু। কাঠ ও কুণ সংগ্রহ করে যারা যাচ্ছে আশ্রমপথে তারাও কিনা কাজ ভুলে দাঁড়িয়ে পড়েছে। শম্প ভুলে গা বেঁসে কাছে এসেছে মুগশিঙ।

চারদিকে তাকাল সিদ্ধার্থ।

সত্যি, ইনি কি অষ্টবস্ত্রের কেউ ? না কি অধিনীকুমারদের একজন ?

‘আজই আমি প্রথম আশ্রম দেখছি।’ বললে সিদ্ধার্থ। ‘আপনারা কারা ?’ জিগগেস করল তপস্বীদের।

‘আমরা চরুধর। আর এঁরা মুগচারী। নানা জাতের তপস্বী আছে এ আশ্রমে।’ বললে কেউ-কেউ।

‘আমি তবজিজ্ঞাসু। ধর্মবিধি কিছুই জানিনা। তপস্যার কি বা করণ-প্রকরণ তাও নয়। বলবেন আমাকে ?’ শিকারীর বিনয় নিয়ে বললে সিদ্ধার্থ। ‘প্রথমে বলুন কী আপনাদের সংকল্প ?’

‘স্বর্গলাভ।’

‘উপায় কি ? প্রক্রিয়া কি ?’

‘কৃষ্ণ।’

‘তুধু কৃষ্ণসাধনই ধর্মসাধন ?’

‘ছাড়া আবার কি। সুখের পথে স্থল নেই। দুঃখের পথেই সুখের সাক্ষাৎকার।’ বললে তপস্বীর দল। ‘ধর্মের মূল্যই হচ্ছে দুঃখ, মূল্যই হচ্ছে ক্লেশ।’

‘কি জাতীয় ক্লেশ বলবেন ?’

‘বলছি। ভুলে যে অন্ন ভ্রমে অর্থাৎ যে অন্ন অকৃষি-উৎপন্ন, আর ফলমূল আর পত্রপুষ্প—শাস্ত্র-মতে এট মূনিদের খাদ্য। কেউ-কেউ গরিবের মত তৃণ ভক্ষণ করে, কার বা পাখির মত উজ্জ্বলি। আর বন্দীকে পরিণত হবার কথা কে না শুনেছে ? কেউ-কেউ বা বায়ুতৃক ভূজঙ্গের মত দিন কাটায়।’

সিদ্ধার্থ যেন সন্তুষ্ট হতে পারলনা। বলল, ‘আরো আছে ?’

‘বিচিত্র। অভিনব। কেউ শস্ত পাখর দিয়ে চূর্ণ করে খায়, কেউ বা পাত দিয়ে তৃণ ছাড়িয়ে। কেউ বা পরের ভাস্ক্রে রান্না করে যদি থাকে কিছু উৎসৃষ্ট। কেউ ভলেই বাস করে, দুবার শুধু অজ্ঞতি দেবার সময় আশ্রমের মুখ দেখে। কেউ আবার জলাশয় ত্যাগই করেনা। জলভন্তর দন্তে-কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হয়।’

‘এত সব কষ্টের শ্রেষ্ঠ ফল তুধু স্বর্গ ?’ যেন আত্মগতের মত বললে সিদ্ধার্থ। ‘স্বর্গও তো ক্ষণকালের। তুধু একটা ক্ষণস্থায়ী অবস্থার ভগ্নে এত কৃষ্ণ ?’

‘তপস্বীদের এই শ্রমফলকে আপনি মানাহ বলতে চান ?’

‘আপনারাই বিচার করে দেখুন।’ সিদ্ধার্থ বলতে লাগল শাস্ত্রধরে : ‘ঐ-পুত্র বিস্ত-বিষয় ত্যাগ

করে বাঁধা বন্ধন ছিন্ন করেছেন ভাবছেন তাঁরা
ধর্মকামনার বন্ধনের মধ্যেই নতুন করে বাঁধা
পড়ছেন। তাহলে ভোগের ক্ষেত্রে তপস্কা, হুংখ দ্বারা
হুংখেরই অধেষণ !

‘ভোগ হুংখ ?’

‘অবিমিশ্র হুংখ, যেহেতু সে ভোগও অশাশ্বত।
জন্ম যেখানেই হোক, মরণেই হোক বা মর্ত্যেই হোক,
মৃত্যু নিশ্চিত। আর মৃত্যুই মাণুষ্যের কাছে
সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। ভোগ-আকাঙ্ক্ষাই পুনর্জন্মের
আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ যে বস্তু
সবচেয়ে ভীতিপ্রদ তারই আগ্রহনা।’

‘তা হলে আমাদের এই জন্ম বার্থজন্ম বলতে
চান ?’ তপস্বীদের মধ্যে একজন প্রতিবাদ করে
উঠল।

‘অমৃত বুদ্ধি-জ্ঞান বলবনা।’ বিনয়স্বরেই বলতে
লাগল সিদ্ধার্থ। ‘যা হীন যা ভুল্গ তা পরিহার করে
শ্রেয়তরের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা নিশ্চয়ই
প্রশংসনীয়। কিন্তু এমন জন্ম এমন চেষ্টাই করা
উচিত যার পর আর-কোনো জন্মের আর-কোনো
চেষ্টার প্রয়োজনই থাকেনা। নইলে যে জন্ম শুধু
বেড়েই চলেবে যে চেষ্টার কোনোকালে নিরোধ হবেনা
তা আমার মতে অর্থের নামাস্তর।’

‘বৃদ্ধিতে পারলুমনা।’

‘সিদ্ধি বৃদ্ধিরে। পরলোকে সুখভোগই যদি
ধর্ম হয় তা হলে ইহলোকে ধর্মাচরণ করে অর্থেরই
প্রশ্রয় দিচ্ছেন। কেননা ঐহিক ধর্মাচরণ আপনারদের
মতে বিভুল কৃষ্ণ। শরীরপীড়াই যদি ধর্ম হয় তবে
দেহদুঃখমাত্রই অধর্ম। তবে পরলোকে দেহদুঃখ
কামনা করে অর্থেরই উপাসনা করছেন।’

‘আপনি তাহলে কি বলতে চান ?’ তপস্বীরা
ছিরে পাড়াল।

‘বলতে চাই চিন্তাই বেহের নিয়ামক, স্মৃতরাং
চিন্তকেই সর্বগ্রাে সংযত করা বিধেয়। চিন্তহীন
দেহ কাঠহুলা।’ সিদ্ধার্থ বৃষ্টিপূর্ণ হয়ে বলতে
লাগল, ‘আহারভুজিই যদি পুণ্যের উপায় তাহলে

তৃণভোজী যুগ সবচেয়ে পুণ্যবান। আর যাত্রা
সত্রিই পাণাব্য। অথচ ভাগ্যক্রমে বিলাসবিধয়ে
বকিত তাদেরও তবে পুণ্য হচ্ছে। যদি বলেন
মনের সং অভিপ্রায়ই আসল কথা তাহলে তা হুংখে
হলেও পুণ্য সুখে হলেও পুণ্য। স্মৃতরাং সর্বতোভাবে
সুখে থেকেই সং অভিপ্রায় করাই সম্ভব। যদি
বলেন সুখে থেকে সং অভিপ্রায় করা যে পুণ্য তা
প্রামাণিক নয়, আমি বলব হুংখে থেকে সং
অভিপ্রায় করলেই যে পুণ্য তাও প্রামাণিক নয়।’

‘অতি সুন্দর কথা।’ কেউ-কেউ উল্লসিত হয়ে
উঠল।

‘জল জলই। জল কখনো পাণীকে পবিত্র
করতে পারে না। বাঁধা জলকে তীর্থ ভেবে স্নান
করেন তাঁদের শুধু একই চিন্তভুটিই সম্ভব, কর্মভুজি
দূরপর্যাহত। জলে দেহমার্জন হতে পারে কিন্তু
পাপখালন হবার নয়। মহাশ্যারা যে স্নান স্পর্শ
করেছেন তা তীর্থ নয়, যে স্তম্ভ তাঁরা অর্জন করেছেন
তাঁই তীর্থ।’

সবাই সিদ্ধার্থকে নিয়ে আনন্দ করতে লাগল।
এমন সুন্দর সত্য কথা তো কেউ বলেনি। সবাই
শুধু আমরা অভ্যাসের দাসত্ব করে চলেছি, কেউ তো
বলেনি এমন জ্ঞানের কথা, এমন নির্বাণের কথা।
সবাই বললে, আপনি এখানে থাকুন।

কয়েকদিন থাকল সিদ্ধার্থ। থেকে সেবে নিল
যাবতীয় তপস্কার রীতিনীতি, আসন-সাধনের নানা
কৃত্যাকৌশল। তপঃক্লেশের বিচিত্র কঠোরতা।

তপোবন তো নয় কৃষ্ণসাধনের কর্মশালা।

ক’দিন পরেই আশ্রম ত্যাগ করল সিদ্ধার্থ।
আশ্রমের বাইরে এক মাসলিক বৃক্ষের নিচে এসে
বসল।

বিরে বসল তপস্বীরা। বললে, ‘আপনি কেন
আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন ? আমরা জীবনেজু দেহ
আর আপনি তার প্রাণবায়ু। এতদিন আশ্রম
পরিপূর্ণ ছিল, এখন শূন্য রিক্ত শোকাচ্ছর বলে মনে
হচ্ছে। কেন আপনি বিযুহ হচ্ছেন ? কেউ কি

আপনাকে নির্ধাতন করেছে? কাউকে কি আপনি নিষ্ক্রিয় পতিত বা অসুচি দেখেছেন? তবে কেন এ আশ্রম আপনার অনাদরের কারণ হবে? দেখুন সন্নিকটেই হিমালয়। আর কে না জানে হিমালয়ের সারিধা তপস্কার বিবৰ্ধক। শ্রুতিসেবিত পুণ্য হিমালয়।

সিদ্ধার্থ বললে, 'আপনাদের অতিথিবাংসলো আমি শ্রীত ও সম্মানিত। আপনাদের বাক্য আমাকে স্নিহ-স্নাত করেছে। আমি ধর্মপথের সত্য আগন্তুক, আপনাদের দেখে ধর্মের প্রতি অমুরাগ আমার আরো দৃঢ় হয়ে উঠেছে।'

'তবে এখানে থাকতেই আপনার অভিরুচি হোক।'

'কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আমার মৌল বিরোধ আছে।'

'বিরোধ?'

'হ্যাঁ, আপনারা প্রেরণের পথে আর আমি নিবৃত্তির ও নিরোধের অভিলষী।'

'আমরা প্রবৃত্তিপরায়াণ?' চমকে উঠল কেউ-কেউ। 'এত যেখানে তপস্ক্রেশ সে তো প্রেরণিতিক নিধন করবার ক্ষেত্রেই।'

'কিন্তু আপনারা স্বর্গলিপু। স্বর্গলাভের আশায়ই আপনাদের ধর্ম ও প্রবৃত্তিছাড়া কি। স্বর্গলাভ অর্থই পুনর্জন্ম-স্নাত। আর আমার সাধনা পুনর্জন্মের অবসান। তাই আমাকে এ তপাবন ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।' সিদ্ধার্থ সকলের দিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তাকাল। 'মনে ভাববেন না আমি কার প্রতি বিদ্বেষ হয়ে চলে যাচ্ছি। কার প্রতি আমার রোষ নেই অসন্তোষ নেই। পূর্বযুগবিহিত ধর্মে আপনারা প্রতিষ্ঠিত, আপনারা মহাবিশ্বদূষ। আপনাদের প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা একবিন্দু নান নয় কিন্তু আমার বিরোধ নীতিগত। আমি সর্বমুক্তির উপাসক।'

'তা হলে আপনি বিছাকোঠে অরাড় মুনির আশ্রমে যান।' কে একজন বললে।

'তিনি কে?' জিগগেস করল সিদ্ধার্থ।

'পরমজ্ঞেয় লব্ধি অরাড় মুনি। তাঁর কাছ থেকে আপনি যথার্থ তত্ত্বমার্গ শুনতে পাবেন। কিন্তু কে জানে হয়তো আপনার মতি তাঁর বুদ্ধিকেও অতিক্রম করে যাবে।'

'সে কি কথা?'

'হ্যাঁ, আপনার সংকল্প আকাশসদৃশ। আপনি যুবাবয়সেই জ্ঞানপরিগ্রহের সোমদর্শন করতে পেরেছেন। কামার্ভরাট যজ্ঞ ও তপস্কার দ্বারা স্বর্গগমনের আকাজ্ঞা করে, কিন্তু সার্বিক ব্যক্তি সর্ব-আদান্তিক উচ্ছিন্ন করে মোক্ষ অভিলষী হয়। আপনি সেই সার্বিকোন্মত। আপনার অগাধ গাভীর্য ও দীপ্তি সেট লক্ষণই প্রকট করেছে।'

মুহূ হামল সিদ্ধার্থ। বললে, 'অরাড়ের আশ্রমেই তবে যাত্রা করি।'

শারিপুত্র, বোধিসাতের পর বলছেন বুদ্ধ, আমি চতুরঙ্গসমবিত ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছি। তপস্বী হয়েছি, পরমতপস্বী ব্রহ্ম হয়েছি। পরমব্রহ্ম জ্ঞানী হয়েছি, পরমজ্ঞানী প্রবিবিক্ত হয়েছি। তাঁরপর অচলক, নগপ্ররভিত, মুক্তাচারী, হস্তাবলম্বী হয়েছি। ভদ্রস্থ, আনন্দ, তিকা গ্রহণ করুন বললেও ভিক্ষায় গ্রহণ করিনি। কোনো নিমন্ত্রণ নিইনি, মংস্ত মাংস আহার করিনি। মাত্র এক গৃহ থেকে সংগৃহীত ভিক্ষায়ের শুধু একগ্রাস ভোজন করেছি। একদিন অস্তুর, দুদিন অস্তুর, সপ্তাহ অস্তুর আহার জুটেছে। ভূগভোজী ভূপতিভ-ফলভোজী গোময়ভোজী হয়ে দিন যাপন করেছি। শবাজ্ঞান গায়ে দিয়েছি, বকল পরেছি, শুয়েছি কটেকশয়ায়। উৎকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ পায়ের গোড়ালির উপর ভর রেখে সারা দিনরাত্রি আসন করে থেকেছি। কখনো রয়েছে উৎপ্রস্টিক হয়ে, অর্থাৎ দণ্ডায়মান অবস্থায়। পাপধৌত করবার আশায় তীর্থক্ষেত্রে নিমজ্জিত থেকেছি, প্রাণায়ামপ্রধান হঠব্যোগ করেছি। শারিপুত্র, এই আমার পক্ষে পূর্বতপস্বিতা।

বহু বর্ষ ধরে আমার দেহে পূলাবালি সঞ্চিত হয়েছে। রাসীকৃত হয়ে জট বেঁধেছে। অঙ্গের সঞ্চিত রক্ত-নল মাস্তিত করিনি, কেউ করে দেবে তাও চিন্তা করিনি ক্ষণকাল। শারিপুর্ত, এই আমার পক্ষে পূর্বকল্পতা বা কঠোরসাধন।

শারিপুর্ত, আরো আছে। আমি সাবধানে পরিক্ষেপ করেছি যাতে আমার দ্বারা ক্ষুদ্র কীটাপুণ্ড না আঘাত পায়। সামান্য চলবিন্দুতেও আমার করুণা ভাগ্যত ছিল। শারিপুর্ত, এই আমার পক্ষে পূর্বকল্পিততা বা পাপে ঘৃণা।

যেনন অরণ্যে নাহুয দেখতে পেলে একান্তচাট্টা মৃগ পালিয়ে যায়, আমিও তেননি গোপালক বা পশুপালককে দেখে বন হতে বনে গমন হতে গমনে পালিয়ে বেড়িয়েছি। যেন কেউ আমাকে দেখতে না পায়। সামান্য কাঁদাহরণকারী ভূগাহরণকারীরও চোখে আমি না পড়ি। ওরাও যেন কেউ না পড়ে আমার দৃষ্টিতে। শারিপুর্ত, এই আমার পক্ষে প্রবিধিকৃততা অর্থাৎ বিবেকবৈরাগ্যসাধন।

শারিপুর্ত, আরো আছে, আরো আছে।

বোধিজ্ঞানলাভের পরে যোগ-অভ্যাস ও কৃচ্ছ্র-সাধন নির্বর্থক। এইটো তো বৃদ্ধবাণী। তবু সাধনার প্রথম ভীমেনে কৃচ্ছ্রসাধনকেই অবলম্বন করেছিল সিদ্ধার্থ। তার অরণ্যশিক্ষালয়ের প্রথম পাঠই কৃচ্ছ্রসাধন।

পথ অতিক্রম করে আসতে হবে, পরিহার করে নয়।

চলো তবে যাই অরাড়ের আশ্রমে। বোধি মুক্তিসাভের কি উপায় !

ন নগ্গচরিত্বা ন জট। ন পদ্মা
নানাসকা বণ্ডিলসাম্যিকা বা
রক্তো চ জলঃ উক্কটিকপপধানঃ
সোধেত্তি মজ্জঃ অবিত্তিকম্বঃ।

নগ্গচর্যা বা জট, পদ্ম বা অনশন, ভূমিশয্যা বা উৎকটিক উপলব্ধি কিছুই সংশয়বিদ্ধ মানুষকে শোধন করতে পারেনা।

অলঙ্কতো চেপি সমঃ চরেষ্যা
সন্তোদন্তো নিযতো ত্রক্ষচাত্তী,
সংসেহু হুতেহু নিধায দণঃ
সো ত্রাক্ষণো সো সমণো স তিক্খু।

যিনি উত্তম বেশভূষায় অলঙ্কৃত হয়েও শমভা আচরণ করেন, যিনি শাস্ত্র শাস্ত্র সংযত ও ত্রক্ষচাত্তী এবং সর্বহৃদের প্রতি মৈত্রীচিত্ত, তিনিই ত্রাক্ষণ, তিনিই তিক্খু।

হুডি

জপ ও মঙ্গলহোম শেষ করে শুদ্ধোদন বেরিয়ে এল দেবায়তন থেকে। জনগণের আর্জস্বনিতে তাঁর দ্বন্দ্বয় বিকীর্ণ হল।

সেখল ছন্দক দাঁড়িয়ে আছে অধোমুখে। আর কঙ্কক শূন্য, রিক্ত, সর্বস্বহীন।

'বলো কোথায় তাকে রেখে এলে ? কোথায় সেই আশ্রমাস্তান ? হয় তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস নয় আমাকে দেখানো নিয়ে যাও। তাও যদি না পারো নিয়ে চলো আমাকে প্রেতলোকে। কিন্তু, কোথায়, কোথায় আমার তর্পণের জল ?'

রামহারা দশরথের মত বহু বিলাপ করতে লাগল রাজা।

রাজ্যের নব্বী আর বৃদ্ধ পুরোহিত সাংঘনা দিতে এল। বললে, 'নরবর, শোক ভাগ করুন। বিনদিত মাল্যের মত রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করে বনে চলে যাওয়া নতুন নয়। ঋষি অসিতের কথা কি আপনার মনে নেই ? বলেছিলেন, স্বর্গে বা রাজ্যে কোথাও কুমারকে অধিষ্ঠিত করা যাবেনা, আরো মহৎ যে লক্ষি, মহৎ যে সঙ্ঘোষি সে তারই অধিকারী। তবু বলুন তো, দেখি একবার চেষ্টা করে।'

'কি চেষ্টা করবেন ?'

'শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের সঙ্গে যুদ্ধে তাকে আহ্বান করব। দেখি তাকে পরাজিত করতে পারি কিনা।'

'তাই দেখুন। পুত্রলালস বশ্ত পাখির মত আমার দ্বন্দ্বয় অশাস্ত্র হয়ে রয়েছে।'

মন্ত্রী আর পুরোহিত দ্বারা দিত হয়ে চলে এল আশ্রমে। ভার্গবকে বিধি মত পূজা করে বললে, 'আমরা শুদ্ধভক্তি শুদ্ধযশা রাজা শুদ্ধোদনের পরিজন। আমরা একজন ধর্মশাস্ত্রে আরেকজন অস্ত্রবিজ্ঞায় সুপণ্ডিত।'

'বলুন, কেন আপনারদের আগমন?'

'ইন্দ্রকল সেই রাজার পুত্র এখানে এসেছিলেন।

তিনি ভরা ও মৃত্যুভয় উত্তরণ করতে গৃহ ছেড়েছেন।

তিনি কি আছেন এখানে?'

'সেই দীর্ঘবাহু নবীন শ্রমণ এসেছিলেন এখানে।'

বললেন ভার্গব, 'তিনি বয়সে তুষ্ণ কিন্তু জ্ঞানে প্রবৃত্ত। আমাদের এই ধর্মে পুনর্জন্মের আকাজ্ঞা আছে জেনে তিনি এই ধর্মে আকৃষ্ট হননি। তিনি মোক্ষের সন্ধানে অরাড়মূনির আশ্রমের দিকে যাত্রা করেছেন।'

মন্ত্রী আর পুরোহিত পথ জেনে নিল। দ্রুত ধাবমান হল সেদিকে।

চলতে-চলতে দেখতে পেল পথিমধ্যে বৃক্ষমূলে বসে আছে সিদ্ধার্থ।

মন্ত্রী আর পুরোহিতকে চিনতে মুকূর্তমাত্রেরি হলনা, কিন্তু সিদ্ধার্থের এতটুকু চাকল্য নেই।

পুরোহিত বললে, 'তোমার পিতা আমাদের পাঠিয়েছেন। তোমার শোকে তোমার পিতা হতচেতন, মাতাও দুরবস্থা। স্ত্রী আর পুত্রের কথা কি বলব! সমস্ত জগৎসংসার ছন্দচ্যুত। তুমি ধর্মের ক্ষেত্রে নিজস্ব হয়েছ, ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রত্যাবৃত্ত হও। সর্বকূতে দয়ার নামই ধর্ম। পিতার প্রিয়বিধানই ধর্মবিধান। আর কিছু নয়, শুধু পিতার প্রতি অনুকম্পা দেখাবার ক্ষেত্রেই ফিরে চলে।'

সিদ্ধার্থ স্তব্ধ হয়ে রইল।

বললে আবার পুরোহিত, 'ধর্ম শুধু বনেই সিদ্ধ হয় এ ঠিক নয়। যারা সত্যিকার যতী তারা নগরেও সিদ্ধ হতে জানে। বুদ্ধি আর প্রযত্ন-প্রয়াসই সিদ্ধির উপায়। শুধু অরণ্য আর গৈরিক-বাদই উপায় নয়। বরং এরা ভীকৃত্যের নিদর্শন।'

তবু সিদ্ধার্থের মুখে কথা নেই।

'কষ্টহার আর বাহুতে কেয়ুর পরে রাজলক্ষীর কোলে বসে মুকুটধারী অনেক রাজাই গৃহস্থ-অবস্থায় মোক্ষলাভ করেছে। তুমি তাদের নাম শোননি? আমি তাদের কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। তারা ক্রুর হ'ই তাই বলি আর বজ্রবাহু। বৈভ্রাজ, অবাচ, অস্ত্রিদেব। ক্রম, সেনজিৎ আর জনক। কেউ তারা গৃহ ছাড়েনি, রাজাধিপত্য ছাড়েনি। তুমিও ছেড়োনা। তুমি একসঙ্গে চিত্তশ্রী ও রাজ্যশ্রীর ভজনা করো। চিত্তের রশ্মি ও রাজ্যের রশ্মি আকর্ষণ করে যুগপৎ। ভীষ্ম, রাম ও পরশুরাম পিতার শ্রীতিয়েই কি করেছিলেন তুলে যেওনা। তুমিও তাদের মত পিতার অভীষ্টপূরণ করো। নিজের স্নেহ নিয়ে অহুসরণ করে পিতার স্নেহ।'

এবার মুখ খুলল সিদ্ধার্থ। বললে, 'পুত্রের প্রতি পিতার কি স্নেহ তা আবার অজানা নয়। তৎসংকেও আমি ব্যর্থ ছরা ও বিপদ্রিতে ভীত হয়ে স্বপ্নন ত্যাগ করেছি। আগেও বলেছি, এখনো বলি, প্রিয়জনের সঙ্গে অন্তিমে বিচ্ছেদ যদি না হত তাহলে আমি তাদের ছাড়তামনা। কখনো, অনন্তকাল লগ্ন হয়ে থাকতাম। স্বপ্নজীবী স্বপ্নের মতই যখন মিলন আর বিচ্ছেদই যখন নির্ধারিত তখন শোক করা বুধ। শোকের কারণ পুত্র নয়, পিতা নয়, স্বামী নয়, শোকের কারণ অজ্ঞান। কার কে আত্মীয়? পরলোকে আত্মীয় ত্যাগ করে মানুষ ইহকালে আসে, ইহলোকে আত্মীয় ত্যাগ করে পরলোকে যায়। ত্যাগেই বার অভ্যাস তার আবার বিচ্ছেদে শোক কোথায়?'

'কিন্তু সন্ন্যাসের তো কালাকাল আছে?'

'আবার সেই পুরোনো প্রশ্ন। অর্থ-উপার্জনের কাল আছে, কাম-ভোগের অকাল আছে, কিন্তু মহাকাল চিরকালই জগৎকে আকর্ষণ করেছে, সে কারণ পরমশ্রোয়ালভের কালাকাল নেই। উদার স্নেহে পিতা আমাকে রাজ্য দিতে চাচ্ছেন কিন্তু লুক্ক ব্যাধিগ্রাস্তের মত অপথ্য গ্রহণ করতে আমার স্বচি

নেই। রাজ্য স্বার্থেরও নয় শত্রুরও নয়। আপাত-
চক্ষে মনোহর হলেও আসলে ভয়াবহ। যাতে শুধু
উদ্বেগ আর মত্ততা আর আত্মি তা কার কামনীয় ?
পরমসহযোগকে ক্রমে লালন করে অরণ্যে তৃণ-
ভোজনও মুখকর। সংসারে অদৃষ্ট পাপসপের সঙ্গে
মহুস্ত হয়ে বাস করা মূর্খতা।

‘তবু তুমি চলে।’

‘সমাজিকায় বনে একবার প্রবেশ করে আর কি
ফিরে যাওয়া চলে ? ইন্দ্রপুরীর দ্বার খুলে গেলেও
সেখানে সে তাকায়না কৌতুহলে। প্রতিজ্ঞাই বড়ো
কথা, প্রত্যাখ্যাত নয়। এমন কে নির্ভীক আছে যে
একবার কাষায় পরে আবার কৌশিক পরবে ?
উল্লীর্ণ অরু কি কেউ পুনরায় আহ্বার করে ?
অলস গৃহ থেকে বেরিয়ে এসে আবার কি
কেউ ঢোকে সেই অগ্নির জ্বলে ? গৃহ থেকে
রাজ্যের মোকের কথা যে বলেছেন তা অলীক
কল্পনা ! মোক্ষধর্ম শমনপ্রধান আর রাজ্যধর্ম মৃত্যু-
প্রধান। শান্তির সঙ্গে শান্তির কি নিল হয় ?
শনে মতি চলে রাজ্য শিখিল হবে, রাজ্যে মতি
হলে শান্তির সমাধি। শ্রুতির সঙ্গে উজ্জের বা
উজ্জের সঙ্গে আশ্রনের কি নীমাংসা চলে ? যেসব
রাজার কথা আপনারা বললেন তাঁরা যা পেয়েছিলেন
তা প্রকৃত মুক্তি নয়, নয় সেই সর্বোচ্চ বা সর্বোত্তম
অবস্থা। শুধু, আমি অস্থিরচিত্তে চলে আসিনি।
যে বন্ধন একবার ছিন্ন করেছি তাতে আর আবদ্ধ
হতে চাইনা।’

‘কিন্তু এক কথা।’ বললে পুরোহিত, ‘তুমি
প্রত্যক্ষপটকে কেন তাকিয়া করছ ? পুনর্জন্ম
আছে না আছে তার ঠিক কি। যখন কোনো
নিশ্চয়তা নেই তখন সম্মুখস্থ রাজ্যসম্পদ ভোগ করে
যাওয়াই বিধেয়। যদি এ জন্মই শেষ জন্ম না হয়,
যদি অল্প জন্ম আবার লাভ হয়, তখন সেই অল্প জন্মই
আবার উপভোগ করা যাবে। আর এ জন্মই যদি
শেষ জন্ম হয়, তবে তো কথাই নেই, বিনা সাধনেই
মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটবে। সংসারে যা দেখতে পাচ্ছ
সবই স্বাভাবিক। অগ্নির উজ্জ্বল জ্বলের দ্রব

প্রস্তরের কাঠি কটকের তীক্ষ্ণ সখট স্বভাব
থেকে। স্বভাব থেকেই শুভাশুভ উৎপত্তি-
অশুৎপত্তি। গর্তস্থ জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বভাবই
উৎপন্ন করে। এই অবস্থায় প্রসন্ন করে কি হবে ?
কি হবে তপস্যায় ? যদি কেউ বলে ঈশ্বরই সৃষ্টি-
কর্তা তা হলে প্রয়াসের কি প্রয়োজন ? জগতের
প্রবৃত্তির যদি তিনি কারণ হন নিঃশ্রুতিরও কারণ
হবেন। সেই অবস্থায় তপস্যা নিরর্থক। শাস্ত্রমতে
মায়াব তিন অং নিয়ে জন্ম নেয়, পিতৃকণ কবিকণ
আর দেবকণ। পুত্রোৎপাদন করে পিতৃকণ থেকে
বেদ অধ্যয়ন করে কবিকণ থেকে আর যজ্ঞ সম্পন্ন
করে দেবকণ থেকে মুক্তি পায়। সেই মুক্তিই
আসল মুক্তি। শাস্ত্রসম্মত উপায়ে তুমিও মুক্তিস্থানের
চেষ্টা করে। তপোবন থেকে গৃহে ফিরে গিয়েছে
এমন রাজার উদাহরণও কম নেই। ধর্মের ভয়ে
তপোবন থেকে ভবনে ফিরে যাওয়া ঘোবের নয়।’

‘কিন্তু আমি কিরিনা।’ ধীরস্থরে বললে
সিদ্ধার্থ। ‘পরলোক আছে কি নেই তা আমি
নিজের উপস্থিতি দ্বারা নির্ণয় করব। পরের বাক্যে
নির্ভর করে আমি সিদ্ধাস্ত করতে চাইনা। যে
দার্শনিক মত অস্পষ্ট সংশয়জনক বৈধম্যমুগ্ধ তা আমি
গ্রহণ করবনা। অন্ধকারে এক অন্ধ আরেক অন্ধকে
পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে এ আমার বুদ্ধির পক্ষে
অসম্ভব। পরের বিশ্বাস পরের, আমার নয়।
এখনো তবদর্শী না হলেও তাবৎ সংশয়ের মধ্যে
আমি একমাত্র শুভেই বিশ্বাসী। ধূলাবায় স্বার্থের
চেয়ে শুভাচারে চুঃখও বরলীল। নির্দোষ হওয়াই
সিদ্ধ হওয়া। যে নির্দোষ সে কখনো অন্তত নিখ্যা
উচ্চারণ করবেনা। তদ্ব্যবহিত পরে হব এখন
শুভাশিষ্ট হই। অতএব সূর্য যদি বিচ্যুত হয় হিমালয়
যদি খলিত হয়, তবু তবদর্শন না করে অধর্মের মত
ভোগোদ্ভূত হয়ে আমি গৃহে ফিরবনা। বরং
প্রদীপিত হস্তাশনে প্রবেশ করব কিন্তু গৃহে নয়।
আপনারাই ফিরে যান।’

বৃক্ষমূল ছেড়ে উঠে পাড়াল সিদ্ধার্থ
উদাসীনের মত চলে গেল বনপথে। (বন্ধ)



চিত্রলোক

শেঠী

রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত

প্রযোজনা : কানন ভট্টাচার্য ; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : হরিশংকর ভট্টাচার্য ; সহকারী : জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ; আলোকচিত্র : দি. কে. মেহতা ; শব্দযোজনা : দেবেন ঘোষ ; সম্পাদনা : সন্তোষ গাঙ্গুলী ; শিল্প-নির্দেশ : ব্রজেন পাল ; অংশগ্রহণ—হুচিরা পেন, উত্তমকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, শিশির ঘটাবাল, রেবা দেবী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি :

এ চিত্রের কাহিনী গ্রহণ করা হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'র প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব থেকে। তবে উপরি-উক্ত পণ্ডিত থেকে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অংশ ও ঘটনা এ-চিত্রের মূল উপজীব্য। সুকান্তেই যে ঘটনা চিত্রনাট্যকার সর্পকদের সাহায্যে উপস্থাপিত করেছেন, তা 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে কোথাও আছে বলে মনে হয় না। তবে এর সাহায্যে তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার একটা স্নিক উন্মোচিত করা হয়েছে, এবং শ্রীকান্ত-চিত্রের একটা বিশেষ রূপ এর সাহায্যে প্রতিফলিত করা হয়েছে। তার পরের ঘটনা শ্রীকান্তের বন্ধু এক রাজার ছেলের নিমন্ত্রণে নিকার-বাড়া ও শিয়ারী বাইচীর সঙ্গে গাফাতার। সেখানে শিয়ারী বাইচী ওরফে রাজলক্ষ্মীর পত্ন অশ্রোথ উপেক্ষা করে অব্যবহার্য রাখে একা মহাশয়গণের গ্রামাঞ্চল। তার পরের অংশে সংযোজিত হয়েছে শ্রীকান্তের গলাঙ্গী হওয়ার ঘটনা এবং পরে বঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার রাজলক্ষ্মীর দেবার আরোগ্যলাভ। পরিচালকের শ্রীকান্ত নামের গলাঙ্গলের মেয়ের বিয়ের টাকার জন্য পাটনায় রাজলক্ষ্মীর বাড়িতে যাওয়া, এবং সেখানে স্ফাণ্ড-ব্যাকের সাহায্যে শিয়ারী বাইচী হওয়ার ঘটনা সর্পকদের সাহায্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে। পরে শ্রীকান্তের বর্ণা-বাতার চিত্রের পরিসমাপ্তি।

সার্বিক চলচ্চিত্র-রচয়িত্য কাহিনীর যে একটা বিশেষ দরদান আছে একথা অনস্বীকার্য। চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক প্রত্যেকেই সর্পকদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'শ্রীকান্ত'

কাহিনী ব্যাপক ও বিরাট। একটিনার চিত্রের মাধ্যমে সমগ্র কাহিনীর হৃদয়-পরিবেশন সম্ভব নয়। সে কথা আমরাও স্বীকার করি। তবে অবশ্য সূত্র রস না হোক, কিছুটা রস পরিবেশিত হবে মনে করে অনেকেই এ চিত্র দেখবার জন্য গিরেডিকেন, কিন্তু অস্বস্তিকের সঙ্গে জুটতে 'ডিউগড'। তবে যদি পরিচালকের মনে এই ইচ্ছা থাকে যে, নারক-নাগিকার বিশেষ একটি স্তন্যমের (?) সাহায্যে সর্পকদের পক্ষেটিকে সামান্য পরিমাণে হালকা করে দেবার, তবে অবশ্য এ সমালোচনার ভাণ্ড অস্ত্ররসম হবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমেই হোক আর হুঁচিরাপুত্রমেই হোক, আমরা চিত্রটি ঠিক সে-কারণে দেখতে বাইনি।

দুর্ভাগ্য চিত্রনাট্য-রচনাই প্রাধান্য: চিত্রটির একটি সার্বিক শিল্পদৃষ্টির প্রধান অঙ্গরায়। চিত্রনাট্য এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যাতে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী উভয় চরিত্রের সত্যাকার রূপ উন্মোচিত হয়নি। কাহিনীটিকে অতিরিক্ত নাটকীয় করার জন্য কোনখানেই মানা রাখেনি এবং কেমন যেন খাশছাড়া লাগে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের বিশিষ্ট কয়েকটি চরিত্র—যেমন ইন্ড্রনাথ, অরুণাধিনি প্রভৃতিতে বাদ দিয়ে এইরকম একটা চিত্র-দৃষ্টির উদ্ভূত দৃষ্টান্তে আমরা অধ্যাহরণ। তৎকালীন সমাজের গোঁড়াধির রূপ সর্পকদের সামনে উপস্থিত করার জন্য পরিচালক কতকগুলি ঘটনা সংযোজিত করেছেন, যেগুলো 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। পরিচালকের প্রচেষ্টা সাধু সফল হয়নি। কিন্তু শীঘ্র সত্যে তেঁদের হাজার হাজার চিত্র দেখিয়ে সর্পকদের সমাজের এবং অত্যন্ত মূল্যবান ফিল্মের অপব্যয় সমান নিকমীয়। তা চাড়া এই অতিরিক্ত সংলাপ মূল কাহিনীর অনেক রসভর করেছো পরিচালক এ চিত্রে মূল উপন্যাসের এমন কতকগুলি অংশ নিয়ে পরিহার করেছেন, যার ফলে রাজলক্ষ্মী-চিত্রের একটা

দিক সর্পকের কাছে উন্মোচিত হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এখন শ্রীকান্ত তাঁর মাতের গলাভালের মোয়ের বিয়ের তক্তা টুক; অন্যতে লুটিনায় ঘান তখন রাজলক্ষী একখানে বলছেন,

“মেয়েমাছুম ভিকাল যা বলে থাকে, আমিও তাই বলি।
একটা বিয়ে করে বাসারী হও—সংসারখর্ম প্রতিশালন কর।
প্রসন্ন করিলাম, সন্তি স্থিতি হবে তাতে।”

সে মাথা নাড়িয়া, কানের ছল ছলটিয়া, সোৎসাহে কহিল,
নিশ্চয়! একশ’বার! এতে আমি শুধু দুবনা ত সংসারে কে
হবে তুমি?

• • • আমি তা হ’লে কালিবাটে গিয়ে পুড়ে গিয়ে আদর।
কিন্তু যেতে আমি বেশ পছন্দ করবো, বলে দিচ্ছি।”

কিছু হতাশাবশতঃ পরিচালক রাজলক্ষীর মধ্যে মজার এই
চিরঞ্জন রূপটি হুটীয়া তুলিতে একেবারেই অসমর্থ হয়েছেন।

রাজলক্ষীর ভূমিকার অভিনয় করেছেন হুচিরা সেন।
তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করতে পারলাম না। পাঠকদের
মনে রাজলক্ষীর যে চিত্র আঁকা হবে আছে, তাঁর সঙ্গে এ চিত্রের
রাজলক্ষীর কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। চিত্রটিতে

রাজলক্ষীর মনে শ্রীকান্তের প্রতি যে গভীর ভালবাসা, রাগে
অশ্রুধারা না বাঁধবার সত্ত্ব যে আনন্দিক ব্যাভূতঃ—হুচিরা
সেনের অভিনয়ে তাঁর কোনো প্রকাশ নেই। বিশেষ করে, তাঁর
অভিনয়ের কয়েকটি মুহূর্তসময় (যেগুলি হয়েছে তাঁর ভালো
লাগে, কিন্তু সর্পকের মোটেই ভালো লাগে না—বরং
বিরক্তিকর হয়) সব সময়েই তাঁর অভিনয়ের একচেয়েমির
কথা বরণ করিতে গিয়েছে। প্রতিমুহূর্তে সর্পকের মনে হবে
সেন রাজলক্ষী কথার মধ্যে শ্রীকান্তকে পরান্নিত করতে প্রয়াস
পাচ্ছেন। এ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করার আগে এটি হুচিরা
সেনের ডাবা উচিত ছিল যে, এটি একটি সত্য কলেজী
প্রেমের গল্প নয়—যে কথটা সর্পকের সব সময়েই মনে
হয়েছে। উত্তমস্থায়ী শ্রীকান্তের ভূমিকায় সংযত এবং
স্ব-অভিনয় করেছেন। অস্ত্রাক্তর অভিনয় মোটামুটি ভালো।

কলা-কৌশলের দিক থেকে চুটিটি পরিষ্কার। তবে
যদিমুদ্র-গ্রন্থণ আরও একটু বেশী ভালো হলে স্থিতি হতাম—
বিশেষ করে, অশ্রুধারার মুদ্রটি। সঙ্গীতে জানপ্রকাশ যোগ
তাঁর পূর্ব-স্থান অল্পর রেখেছেন। এ-চিত্রের আবহ-সঙ্গীত
আমাদের অনেকদিন মনে থাকবে।





স্থিতির

ফুটবল :

এবার ভারতের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা হায়দ্রাবাদের গোলামহল স্টেডিয়ামে বহুদিনের ব্যতিক্রম পূর্ণ হয়েচে ; চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন হায়দ্রাবাদ-দল ফাইনালে বোম্বাইকে ৩-১ গোলে পরাসিত করে। একদিনের সেমি-ফাইনালে বাংলা-দল বোম্বাইয়ের কাছে ১-২ গোলে পরাজয় বরণ করেন। অপরদিনের সেমি-ফাইনালে সার্ভিসেসকে ১-০ গোলে পরাজিত করে হায়দ্রাবাদ ফাইনালে ওঠবার যোগ্যতা অর্জন করেন। হায়দ্রাবাদের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। অপরদিকে বাংলা-দল এবার বেশ শক্তিশালী দল হিসাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। বাংলা-দল বোম্বাইয়ের কাছে পরাজিত হয়েছেন কতকটা দুর্ভাগ্যক্রমে। কারণ বাংলার ফরোয়ার্ডরা প্রথম ১৫ মিনিটের মধ্যে গোলের যে স্বযোগগুলি অপব্যবহার করেছেন, সেগুলি থেকে অন্ততঃ তিনটি গোল অন্যদলেই হতে পারতো। বাংলার খেলা অমরা রোজই কোলকাতার মদনমোহন রোডে, বাইরে দিয়ে তাঁদের খেলা কি ভাবে পাল্টে যায় সেইটাই আশ্চর্য। দুর্ভাগ্য নিমিত্ত নখীর। কারণ তাঁর ওপরেই এবার বাংলার দলের অধিনায়কদের ভার পড়েছিল। সেমি-ফাইনালে বিজিতদের যন্ত্র সাপোর্টী-কাপটিও সার্ভিসেস-দল বাংলা দলের কাছে থেকে দ্বিজে নিয়ে গেছেন ১-০ গোলে জয়ী হয়ে। ব্যক্তিগত খেলা হিসাবেও বাংলার কেউ একটা খুব পারদর্শিতা দেখাতে পারেননি। অবশ্য এবার ব্যক্তিগত ক্রীড়া-নিপুণতার খুঁঁই লাগে। কারণ, এবারে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ওপর লক্ষ্য রেখেই এশিয়ান গেম্‌স-এর জন্য ভারতীয় ফুটবল-দল তৈরি করা হবে। অল্পব্যয়ের স্বত্বে এবারেও ভারতীয় দল প্রশংসনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, এই আশাই করি।

ক্রিকেট :

পাকিস্তান বনাম ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দলের প্রথম টেস্ট-ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। খেলাটি হয়েছিল ওয়েস্ট-ইন্ডিজের 'রিক টাউন' নামে। এ খেলার ২৭ বছরের চ্যাম্পিওন যে অন্যতর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেলেন তা বিশ্বাসীর মনে চিরকাল এক কীতি হিসাবে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। দীর্ঘ ১৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট কোনো ব্যাটসম্যানের পক্ষে উইকেটে অপরাজিত অবস্থায় টিকে থাকা, বিশেষ করে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে 'কল-সমন'-এর পর, সত্যি বিস্ময়কর। এর তত্ত্ব আশা বিশ্বাসীর কাছে তিনি সত্য অন্বিনন্দিত। পাকিস্তান-দল তাঁর কাছে সবিশেষ জয়ী। হানিফের রান-সংখ্যা (৩৩৭) টেস্টের ক্রিকেট-ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান বলে পরিগণিত হয়েছে—কিন্তু তিনি যে দীর্ঘদায় উইকেটে অবস্থান করেছেন তা-নিবিচাল্যই বিশ্ব-রেকর্ড হিসাবে অগম্যমান লাভ করেছে। মাত্র ১৭ বছর বয়স থেকেই হানিফ টেস্ট খেলতে মুক্ত করেন এবং তখন উন্নততর ক্রীড়া-নিপুণতার পরিচয় দিতে থাকেন। তাঁর প্রথম জীবনের খেলা অন্যতা ভাবতে দেখবার স্বযোগ পেয়েছিলেন। তখনকার খেলার মধ্যে দৃঢ়তা থাকলেও অবশ্য নেতিদুলকও ছিল। তখন তিনি তাঁর খেলার আরও বিকাশ ঘটানোর এবং ডব্লিউতে আরও ঘটাবেন এই আশাই রাবি। অবশ্য এমিল দিয়ে পাকিস্তান-দলও যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁদের ব্যক্তিগত নতুন ক্রিকেটেও তাঁরা নবাগত। সে দিক দিয়ে অত কমবয়সী খেলোয়াড়দের খেলতে স্বযোগ দিয়ে তাঁদের জন্ম তৈরি করা—দুঃসংসারের অবশ্যই অগ্রসরীণ। এবার এরা নাসিমুল গনি বলে যে-খেলোয়াড়টিকে প্রথম স্বযোগ

কিউয়েন, বহুসংখ্যক দিক দিয়ে তিনি হানিকের
রেকর্ডকেও ভাঙ করেছেন। ভারতের বিখ্যাত প্রথম টেস্ট
খেলার সময় হানিকের বয়স ছিল ১৭, আর নাসিফুলের
বর্তমান বয়স মাত্র ১৭। বিশ্বের ক্রিকেট-ইতিহাসে এত কম
বয়সে টেস্ট খেলেছে এমন খেলোয়াড়ের খেঁজ আরও পাওয়া
যাযনি। ওয়েস্ট-ইন্ডিজের সঙ্গে এই খেলাটি খরে হানিক
তার টেস্টের হাজার রান পূর্ণ করেছেন। ওয়েস্ট-ইন্ডিজ
ও পাকিস্তানের ৬ দিনের টেস্ট খেলার ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দল
৮ উইকেটে ১৭৩ রান করে ইনিংস শেষ করেন; পরে ১০৬
রানে ইনিংস শেষ করে পাকিস্তান দল ফলো-অন করতে।
অতঃপর ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দল কোনো উইকেটে না হারিয়ে ২৮ করলে,
সমগ্রভাবে খেলা শেষ হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য খেলা দেখান
উইক্‌স ও নবাগত সি. হাট্টার। দুজনে যথাক্রমে ১২৭ ও
১৭২ রান করেন। এর মধ্যে সি. হাট্টার হলেন নবাগত।
খেলার ফলাফল দেখে মনে হয়, ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দল যদি উপযুক্ত
কোচ-বোকার সাংগ্রহ না করে পুরোনো বোলারদের ওপরই

ক্রমশঃ ভরসা করতে চান, তাহলে ভবিষ্যতে তাঁদের আরও
নিরাশ্রয় দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতে অবশ্যই হবে।

নীচে সংক্ষিপ্ত ফলাফল দেওয়া হলো :

প্রথম ইনিংস

ওয়েস্ট-ইন্ডিজ : (৩ উই : ভি :) ১৭৩ (এডার্টন উইক্‌স
১০৭, সি. হাট্টার ১৭২, বি. শিব ১৮; মাহমুদ হোসেন ১৫০
রানে ৪ উই; ফজল মাহমুদ ১৪৫ রানে ৩ উই :)

প্রথম ইনিংস

পাকিস্তান : ১০৬ (ইমতিয়াজ ২০, হানিক—১৭,
মাহমুদ ১৭; দিল ক্রাইস্ট ৩২ রানে ৪ উই; কোলি শিব
২৩ রানে ৩ উই :)

দ্বিতীয় ইনিংস

পাকিস্তান : (৮ উই : ভি :) ৬৫৭ (হানিক মহম্মদ ৩৩৭,
ইমতিয়াজ আমেদ ২১, সৈয়দ আমেদ ৬৫; ভ্যানস্টাইন
১০২ রানে ২ উই; অ্যাটকিন্সন ১৩৬ রানে ২ উই :)

দ্বিতীয় ইনিংস

ওয়েস্ট-ইন্ডিজ (বিনা উইকেটে) ২৮

ব্যাডমিন্টন :

কিছুদিন আগে ইন্ডোনেশিয়ার ইন্ডোনেস-স্টেডিয়ামে 'পূর্ব-
ভারত ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ'-এর খেলা শেষ হয়ে গেল।
বিখ্যাত করেছেন খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় অংশ-
গ্রহণ করে প্রতিযোগিতাকে খণ্ডে আকর্ষণ করে তুলেছিলেন।
যদিও তাঁদের অনেকের খেলার তুলনামূলকভাবে আগের চটক
আর ছিল না। এবারের প্রতিযোগিতার ভারতের দুই
কর্তৃমান খেলোয়াড় শেট ও নাটেকার যোগদান করেননি।
ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার ১নং খেলোয়াড় তান চো হুং উই
বন্দেমবানী ২নং খেলোয়াড় এ. ডি. ইউজুবকে স্ট্রেট-সেটে
পরাজিত করে বিজয়ী পুরস্কার লাভ করেন। গতবারেও
চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছিলেন তান চো হুং। কিন্তু
গতবারের খেলার তুলনায় এবার তাঁর খেলা অনেকাংশে
নিশ্চল ও মন্থর বলে মনে হোক। তাবলসে অবশ্য যেওয়ান
ও সাবদান অলি শার্টনারকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন
হেমাভি ও বিক্রম ভাট জুটি। বেশ কিছুদিন পর আবার ঐ
ধরনের এক প্রতিযোগিতায় হেমাভিকে অংশগ্রহণ করতে দেখা
গেল—ওপু একা নয়, সঙ্গীক। বয়স হেমাভি মন্থর হয়ে পড়লেও
খেলোয়াড়ি মেধিহীনতা তা বহুদিন মনে রাখার মতো। আর



হানিক মহম্মদ

একজন প্রতিযোগী এবার চমকপ্রদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়েছেন— তিনি হলেন পাকিস্তানের সামলাস আলি। সেনি-কটিনাসে তান জো হকের বিরুদ্ধে সামলাস আলি যে ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখান তা লড়াই চমৎকার। প্রথম সেমটি তিনি তান জো হকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন, কিন্তু শেষরক না করতে পারায় অবশেষে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয় তান জো হকের দৃঢ়তার কাছে। অপরদিকে অমৃত দেওয়ানের সঙ্গে এডি ইউসুফের খেলাটি হয় প্রাণবন্ত। দেওয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দর্শকদের অনাবিল আনন্দ দান করে। হোমারিও সামলাসের সঙ্গে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখান সে-বুডিও ক্রীড়া-দর্শকদের মনে বহুদিন ধরে রসের পোষাক জোগাবে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে কাইনালে মিসেস মীরা দাসকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন মিসেস নীলিমা ডিক।

ছুনিয়ার বিভাগে গুতবারের চ্যাম্পিয়ন রমেন ঘোষকে পরাজিত করে এবার চ্যাম্পিয়ন হলেন হুহুমার দেব। ছেলেটির ভবিষ্যত আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠুক কামনা করি।

নীচে কাইনালের ফলাফলগুলি দেওয়া হলো :

সিঙ্গলস ফাইনাল

তান জো হক (ইন্ডোনেশিয়া) ১৫-১০, ১৫-৩ পরেটে এডি ইউসুফকে (ইন্ডোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

সিঙ্গলস ফাইনাল (মহিলা)

মিসেস নীলিমা ডিক (বাংলা) ১১-২, ১২-১০ পরেটে মিসেস মীরা দাসকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

ডাবলস ফাইনাল

গুজানন হোমারিও ও বিক্রম ডাট (বাংলা) ১৫-১১, ১৫-৩ ক্রসেটে অমৃত দেওয়ান (ব্রিট) ও সামলাস আলিকে (পাকিস্তান) পরাজিত করেন।

ছুনিয়ার সিঙ্গলস ফাইনাল

হুহুমার দেব (বাংলা) ১৫-১১, ১৫-৬ পরেটে রমেন ঘোষকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল

অমৃত দেওয়ান ও মিল এন. হুইনি ১০-১৫, ১৫-৫, ১৫-৬ পরেটে বিক্রম ডাট ও মিল এইচ. হুইনিকে পরাজিত করেন।

জাতীয় অ্যাথলেটিক্স :

এবারের জাতীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা কটকের বারবাটি স্টেডিয়ামে লম্বা হুয়েছে। এবং এই প্রতিযোগিতায় নানা বিবরে ভারতের অ্যাথলেটদের ক্রীড়া-নৈপুণ্যের ক্রমোন্নতির পরিচয় ফলাফলের মধ্যে বহিষ্ঠ হয়েছে।

এবারে পুরুষদের ২৪টি বিষয়ের মধ্যে ১৫টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। ২১ জন প্রতিযোগী পূর্বের রেকর্ডকে রান করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় সাকলাই এবার মার্ডিসেসের প্রতিযোগীদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়েছে। এবারে ১০ জন প্রতিযোগী এশিয়ান রেকর্ডকে রান করে গিয়েছেন। মেয়েদের ক্ষেত্রে ২ জন এশিয়ান রেকর্ড ভেঙেছেন এবং ৬ জন প্রতিযোগী আগের ভারতীয় রেকর্ড রান করেছেন। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল মোট ৯টি। বলা বাহুল্য, সামগ্রিক বিভাগ এবারেও দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। সামগ্রিক দশই কম-বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে তার কৃতিত্ব দলের অন্তর্ভুক্ত করে রান করে দিয়েছে, তিনি হলেন মিলমা সিং। ইনি ৪০০ মিটারে যে রেকর্ড করেছেন, তার সময়—১২৫.২২ মিনিটের অধিষ্টিপকের সময় থেকে ৩ সেকেন্ড কম। ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে এই ফলাফল লড়াই বিষয়কর নৈপুণ্য। এ ছাড়া ইনি ২০০ মিটারেও নতুন রেকর্ড করেছেন এবং ৪৫.৪০০ মিটার রিলে-রেসে নতুন রেকর্ড করার সহায়তা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত ক্ষেত্রে খুব সুবিধে করতে না পারলেও, প্রেস্ট-মেই প্রতিযোগিতায় প্রায় সব কাঁটি আপনই নিয়েছেন,—সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন আমাদের গুণভার্য্য সিং ম্যারথন রেসে। দীর্ঘ ২৬ মাইল ৩৮ গজ তিনি ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট ২৮.৭ সেকেন্ডে অতিক্রম করে বিশ্ববিখ্যাত এমিল জ্যাটোগেকের সবরের মার ৫৫.২ সেকেন্ডে পিছনে রয়েছেন। তাঁর সাকলাই যে কত বিরাট কৃতিত্বের পরিচয় তার প্রমাণ হয়েছে এক লক্ষ্যকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। কারণ তাঁর ঐ সাকলাই কর্কর্ডার্স কেউই প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি। তাই ঐ দীর্ঘ ২৬ মাইল ৩৮ গজ আবার তাঁরা মাপার আয়োজন করেছিলেন; গুণভার্য্যের রেকর্ড তাঁরা প্রথমে অস্বাভাবিক করতে রাজী হননি। কিন্তু অবশেষে তাঁরা নিঃসন্দেহ হয়ে মেনে নিতে বাধ্য হলেন। এ সম্বন্ধে যে অতবড় একজন ক্রীড়া প্রতিযোগীর পক্ষে কতখানি অসম্মানজনক হতে পারে, সে পারণ্য বোধ হয় তাঁদের ছিল না।

নীচে কেবলমাত্র নতুন ভারতীয় রেকর্ডগুলি দেওয়া হোক।		গোল্ড-স্ট		— রথেনজ (মাসার)	
হোল্ডিং :		ডিসকাস বিক্ষেপ		— পব্জ (মাসার)	
পুরুষ		বর্ষা বিক্ষেপ		— বকসিস দিঃ (মাসার)	
২০০ মিটার বোঁড়	— মিলথ দিঃ (মাসার) — ২১'২ সে.	১০০ মিটার বোঁড়	— মিলথ দিঃ (") — ১৬'৪ সে.	— ১০০ ফু. ৬'৪ ইঞ্চি	
৪০০ " "	— মিলথ দিঃ (") — ১৬'৪ সে.	৪০০ মিটার বোঁড়	— মিলথ দিঃ (") — ১৬'৪ সে.	— ১০০ ফু. ৬'৪ ইঞ্চি	
৪০০ " "	— অক্স দিঃ (") — ১৬ মি. ৪'২ সে.	৪০০ মিটার বোঁড়	— অক্স দিঃ (") — ১৬ মি. ৪'২ সে.	— ১০০ ফু. ৬'৪ ইঞ্চি	
২,০০০ " স্ট্রিপল ডেজ	— পাল দিঃ (") — ২ মি. ১২'৪ সে.	২,০০০ মিটার বোঁড়	— পাল দিঃ (") — ২ মি. ১২'৪ সে.	— ২ মি. ১২'৪ সে.	
১১০ " হ্যাটেল	— হ্যাটেল (") — ১৪'৪ সে.	১১০ মিটার বোঁড়	— হ্যাটেল (") — ১৪'৪ সে.	— ১৪'৪ সে.	
৪০০ " "	— অক্স দিঃ (মাসার) — ১২'৪ সে.	৪০০ মিটার বোঁড়	— অক্স দিঃ (মাসার) — ১২'৪ সে.	— ১২'৪ সে.	
২,০০০ " ডবল	— ডবল দিঃ (মাসার) — ১ মি. ২০'২ সে.	২,০০০ মিটার বোঁড়	— ডবল দিঃ (মাসার) — ১ মি. ২০'২ সে.	— ১ মি. ২০'২ সে.	
মাসার দিঃ	— মাসার দিঃ (পশ্চিমবঙ্গ) — ২ মি. ২০'২ সে.	মাসার দিঃ	— মাসার দিঃ (পশ্চিমবঙ্গ) — ২ মি. ২০'২ সে.	— ২ মি. ২০'২ সে.	



কল্যাণীতে আপনার বাড়ী তৈরী করুন



যেখানে সব্বের সমস্ত সুবিধাগুলি বর্তমান অথচ অসুবিধাগুলি
নেই, কল্যাণী হল ঠিক এমন একটি স্থান। শান্ত পরিবেশ ও
আলো-বায়ুর স্বস্তি এখানেই আপনার বাড়ী তৈরী করুন।

এখন ২-টির ওপর ট্রেন প্রত্যহল কল্যাণীতে থেকে
প্রত্যাহারিত হয়। কল্যাণীতে কল্যাণী মহা
দ্রুত রাস্তা পালা রাস্তাও আছে। ভবিষ্যতে
বৈজ্ঞানিক ট্রেন যাবার আশা রয়েছে।

কল্যাণী থেকে যাত্রা ৩২ মাইল দূর
বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা, পানীয় জল, শক্তি, হাট পুল,
হাসপাতাল, বাতার, ডাকঘর, ভূগর্ভস্থ লাইট প্রভৃতি
সমস্তই কোন উপকরণেই অভাব নেই এখানে।

বিভিন্ন বিষয়ের সমস্ত যোগাযোগ করুন :

(১) শাসনিক হিসাবসমূহ অফিসার, কল্যাণী পোঃ
কল্যাণী (নকশা) কেন্দ্র : আউটপাড়া-৪৮
(মনি অফিসে ১, পাঠিয়ে কল্যাণীতে মান পাঠান
হবে), (২) এককালিনি অফিস,
জেনারেলস্টেট ডিপার্টমেন্ট, লার্ডসফর,
কল্যাণী, ফোন : ২০-৪৪০১।



১৯৮৫, বঙ্গবন্ধো জাতীয় উন্নয়ন
একটি সেতু সংগ্রহের অফিস খোলা হয়েছে। কল্যাণী সংগ্রহের সমস্ত
বিষয় সম্পর্কে উক্ত অফিসে সমস্ত পাঠান।



কল্যাণী

শেষ পাত

শিবরাম চক্রবর্তী

“কেবল সংস্কারের ঐক্য নয়, অস্তরের টানেও
এসিয়া হচ্ছে এক। এবং চিরদিন তাই থাকবে।”

—পণ্ডিত মেহর

‘এবাস্ত পরমা গতি।’

একজনের চিঠি :

“হুটি সিনেমা-ছবির গল্প একরকমের বলায়,
লেখকদের একজন খেসারতের দাবি জানিয়ে
অন্যদের সম্পাদকের নামে উকিলের চিঠি
দিয়েছেন। এখন কী করা যায় বলুন তো?”

লেখা উচিত : হুটি গল্প আস্তে এক নয়।
অনেক জারগায় অনৈক্য আছে।

মনস্তাত্ত্বিকদের মতে প্রেম করে বিয়ে না হলেও
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় সময়েই বেশ মিল হতে দেখা
যায়।

সেহতাত্ত্বিকদের মতে নিশ্চয়ই সেটা গৌজানিল !

‘বিজ্ঞাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল
এক।’ —বৈকুণ্ঠ পদ্মাবলী

তাহলেও এক লাখ পরখ করতে পাওয়া,
লক্ষ লক্ষ পরখীয়ার থেকে প্রাণের এই কথাটা
জানতে পারা নেহাত মন্দ কি ? বিজ্ঞাপতি দাদা,
তুমি একটি লাখী চ্যাপ্—!

মহাত্মা গান্ধির নামে পৃথগাটের নামকরণ করতে
মাত্রা ছাড়ানোমেন্ট মিউনিসিপ্যালিটির মানা করে
দিয়েছেন। কিন্তু লোকজনদের গান্ধিজীর পথে
চালাতে হলে, এ ছাড়া আর কি উপায় আছে ?

‘কেশা, ফিরে এসো। তোমার স্বামী তোমার
জন্তে কাতর। তোমার সব-কিছু ভুলে গিয়ে
আবার তোমাকে ফিরে পাবার জন্তে উৎসুক।’

—বিজ্ঞাপন

আরেকটি কেশাকর্ষণের কাহিনী !

“Our people are the atta and Govt.
the loaf.” —রাজাজী

আর, যারা জনতা আর সরকারকে নিয়ে
লোকালুফি খেলে তারাই বুঝি সব লোকসার ?

জটিল প্রত্যক্ষদর্শীর মতে ব্রহ্মের কারণ-সমস্তা
এখনো মোটেই যেটেনি, বুঝি কখনই তা মিটবার
নয়।

দর্শনমতেও, ব্রহ্ম চিরকালই কারণ-সলিলে
ভাসবে !

সুন্দর মুখ দেখলেই যার বুক ধাঁৎ করে ওঠে,
সারা ছুনিয়াই তার কাছে ধাঁৎনাতলা !

“হিন্দু পুরস্কারীও আজকাল মুসলিম খানাপানি পছন্দ করছেন। মুগির কাটলেট থেকে তারা শুরু করেন...” (উক্তি)

আর শেষ করেন সামী কাবাবে ?

‘ভারত-সরকারে গন্ধ এবং যোগ্য লোকের অভাব নেই।’

সেইজন্মেই এত দক্ষযজ্ঞ।

‘নেতাদের প্রতিশ্রুতির কোনই দাম নেই।
কথার খেলা মাত্র।’

কথার খেলাপ মাত্র ? এই কথা বলতে চান ?

‘লেখক-শিল্পীদের কেন সংঘ গড়ে ওঠে না
জানো ? তারা মজদুরদের মতো পরস্পর হাত
মেলাতে পারে না—আবার দানাও বীধতে জানে না
মিছুরির মতন।...’ (ভূনৈক লেখকের পত্রাংশ)

হায়, কেন যে আমাদের দানাপানি নেই,
ভানা গেল এখন।

‘আট-পা-ওয়াল’ একটি ছাগলিও জন্মাবার
পাঁচ মিনিট পরেই দেহরক্ষা করেছে বলে মক্ষমলের
এক খবরে প্রকাশ।

‘অজ্ঞে নিত্য শাশ্বতোয়’ এটিকে বোধহয় বলা
যায় না ?

“আমাদের চিঠিপত্র আজকাল বিমানযোগে
উড়ে যায়।” (সাধারণ জ্ঞানের বই থেকে)

কিন্তু বিমান আমাদের বাসায় না থাকলেও,
মেয়েলী হাতের-লেখায় খানের চিঠিগুলি কেন যে
আমাদের লেটার-বক্স থেকে উড়ে যায় কে বলবে।

খান-পোস্টকার্ডের দান বেড়েছে। প্রেমপত্র
লাভের আশা ছাড়লাম, তবু যদি পাওনাদারের চিঠি
একটু কম আসে !

ছেলেধরার হিড়িকে পুত্রসমভিব্যাহারে পাথে
বেরিয়ে জনতার হাতে বেধড়ক মার খেয়ে ভূনৈক
জনক নাকি নিজের ছেলেকে ত্যাগপুত্র করার কথা
ভাবছেন।

‘ভেন ত্যক্তেন হৃদীধা—’।

“ছাত্ত বানাবার সহজ উপায় হচ্ছে যব কিছা
হোলা নিয়ে...” ইত্যাদি।

আরো ছুটি সরল পদ্ধতি আছে, যেমন, সাত-
তলার ছাদ থেকে লাফ দেয়া ‘আর রাষ্ট্রভাষা
পড়ানো।

অধ্যাপক কে. টি. শাহার বিবেচনায়, মাদা-ই
হোক আর বাদামি-ই হোক, সব ক্যাপিটালিস্ট-এরই
পালক একরকমের। পোষণের নামে শোষণ করতে
কেউ, তারা কিছু কন যান না।

আজ্ঞে, একরকমেরই প্রতি পালক ?

“সরকারী পয়সায় দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানো
ভারতীয় আমলাদের চিরকালের সখ।”

বুরোক্রাসি মানেই ইুরোক্রাসি ?

আদমের কালে বীদরের থেকে আদমির পর্দায়ে
পৌছতে মানুষের কোটি কোটি বছর লাগলেও—
এখনকার মেয়েরা যে-কোনো মানুষকে মুহূর্তের
মধ্যেই বীদর বানাতে পারে।

এবারকার কমনওয়েল্‌থ-সম্মেলনে লণ্ডনের মুখপত্রগুলি পণ্ডিত নেহরুকে ডোমিনিয়নগুলির মুখপত্রদের মধ্যে keyman (চাবি-স্থানীয়) বলায় ভারতের অনেকে ভাবিত হয়েছেন। এর পর পণ্ডিতজী আর কোনোদিনই কমনওয়েল্‌থকে তালুক দিতে পারবেন না : এবং চাবি তো, তাই ঐ অস্ত্রোপায়ের তালার ভিতর গিয়ে আটকাতে পারেন—হুয়োবশীদের এই ভয়।

‘আপনি KEY হারাইতেছেন আপনি জানেন না !’

•

দিল্লির চিঠি :

‘দোলের দিন আসছে। এখানকার ছেলেবুড়ো সবাই চাচা নেহরুকে রঙ আর আবির মাখাবার ক্ষমতা এখন থেকেই কোমর বাঁধছেন।’

‘আবিরাবীর এধি...!’

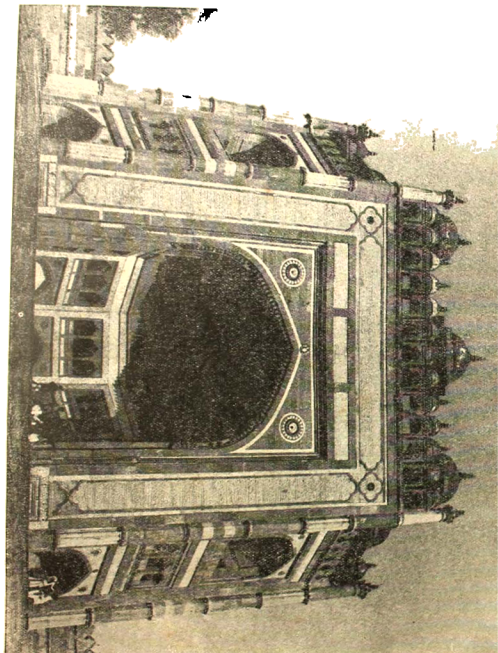
•

জনৈক লেখিকার মতে ‘কৌলিন্দ’ কিছু অভিজাতশ্রেণীর একচেটে নয়, সাধারণ MASS-এর মধ্যেও গুণের বিচারে ঢের ঢের কুলীন রয়েছে। তারা হোলো গে ‘মাস্কুলীন’।

সম্পাদক—শ্রীচাক্রা ভট্টাচার্য

কে. সি. বহু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১, মহেন্দ্র গোখরাই সেন, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীকেশবনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত
এবং তৎকর্তৃক ৪২, বর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত





বঙ্গুধারা

প্রথম বর্ষ

চৈত্র, ১৩৬৪

২২ অশ্ব, ৬টি সংখ্যা

আলুবাড়ি বৌদ্ধবিহার ও লোহিত-সম্প্রদায়ের লামা

অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্রলাল নাথ, এম.এ.

সম্প্রতি দুই জন-জয়ন্তী উপলক্ষে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে মানুষের উৎসাহ জাগ্রত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তিব্বতী লোহিত-সম্প্রদায়ের লামা এবং দার্জিলিঙে তাঁদের একটি বৌদ্ধবিহার সম্বন্ধে আলোচনা করব।

দার্জিলিঙের ম্যাল থেকে টেনসিং নোরগে রোড (তৃতীয় ক্যালকাটা রোড) ধরে দুই-এর দিকে চলতে গেলে হুপালের—বিশেষ করে বাগানের উপত্যকা, পেশক রোডের পাশে ও হুইচ্চ টাইগার-হিলের নয়নজিয়ার দুই যেকোনো পথিকের নয়ন-মনকে তোলে পার্বত্য করে। জৌহাটা চাও মোট সেড় মাইল রাজা হাটতেই রাংখার বা পাশে পাছাড়ের নীচে যে স্থান বৌদ্ধবিহারটি চোখে পড়ে, সেটি হলো লোহিত-সম্প্রদায়ের লামাদের ‘আলুবাড়ি বৌদ্ধবিহার’—এ সম্প্রদায়ের লামাধ্যাক্ষ বলেন ‘মাক-ধোগ (Mak-dhog) গুফা’—অর্থাৎ কিনা যে ‘বিহার’ মানব-সম্প্রদায় হতে দুই ও জানাহানি দূর করে জগতে এনে দেবে ‘শান্তির ললিত বাগি’।

এ রাংখার গাড়ির চাচল না পাকায় আলুবাড়ি বৌদ্ধ-বিহার গ্রীষ্ম ও শরৎকালে অধিকাংশ ভ্রমণকারীর কাছে অজানা থেকে যায়। অথচ এ বৌদ্ধবিহারটি স্থাপত্য-শিল্পের দিক দিয়ে দার্জিলিঙের বৌদ্ধবিহারগুলির মধ্যে অন্যতম।

এ বৌদ্ধবিহারটি স্থাপন করেন কার্ঘ্যাবাসী বর্ণগত গায়সাহেব এম. সি. লামা। তাঁর জীবৎকালে তিনি দার্জিলিঙের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন এবং ইন্দ্রনাথ

‘Yolmo’ সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন। এ বৌদ্ধবিহার-নির্মাণে যে অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল তার প্রায় সমস্তই দিচ্ছেছিলেন এই স্বনামধন্য ব্যক্তি।

আলুবাড়ি বৌদ্ধবিহার চারতল-বিশিষ্ট তরুতর একটি ভবন এবং কারো কারো মতে এ বিহারটি দার্জিলিঙের এ ধরনের বৌদ্ধমন্দিরের মধ্যে তৃত্বতম। বিহারের সংক্ষেপে তিনটি বয়সের লোকসম্মিলিত দুই এক-এক প্রদান নিত্য সংকলিত ও যোগাযোগের দুই বড় মন্দির এবং দুকের একমাত্র ছোট ছোট মন্দির। এ বিহারের বড় মন্দির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বিহারে অবস্থিত এবং পদ্ধতি-চালনের উপর স্থাপিত পদ্মসজ্জার ‘ত্রিকোণে বস’ হয় ডল বিনপোচে (Binpoche) বুদ্ধ মূর্তি। এ মন্দির স্থাপনে রয়েছে অগণ্য চাকতি মূর্তি, যা পদ্মের কোঠাল উপর করে। এক তলয় বয়সে বিভিন্ন দেবতার আর তিনটি মূর্তি। বিহারের অভ্যন্তরে দেওয়ালের গায়ে যে সমস্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা শিল্প-রচনার দিক দিয়ে খুবই উল্লেখযোগ্য।

যেকোনো ভ্রমণকারী বিহারের প্রধান লমাকে প্রত্যক্ষ করে এই দেওয়ালে-চিত্রগুলোর অর্থ ও বিশ্ববাস যদি জানতে পারেন তাহলে তাঁদের যে কৌতুহল উপনীত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বৌদ্ধদের বিকাশ অল্পবয়সী জীবনের ছয়টি স্বরূপে সূচিয়ে তোলা হয়েছে এই দেওয়ালে-চিত্র-গুলিতে। প্রথম বা সংক্ষেপে করে বয়েছেন দেবতারা। দ্বিতীয় করে বয়েছে অশুরেরা। আর তৃতীয় করে চিত্রিত করা হয়েছে জীবজগৎকে—যে জগতের প্রধান বৈশিষ্ট্য



আম্বেডি বৌদ্ধবিহারে প্রধান লামার বাসভূমি

[অধ্যাপক এল. নরসিং বৌদ্ধের প্রাপ্ত

হলে' জন্ম, জন্ম ও মৃত্যু। এ তিনটি স্তর নিয়ে যে জগৎ, তাকে বলা হয় অস্তিত্বের উৎস'র স্তর।

তারপর অস্তিত্বের নিচতর স্তরে রয়েছে প্রথমে—পত্র-জগৎ। এই স্তরের অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সাধারণতঃ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তার নীচে রয়েছে প্রেতজগৎ, তিস্ততীরা যাকে বলে ইবাদকদের (Vidaks) জগৎ। তারা কীংকালে দানধর্ম করেনা এবং অত্যন্ত কপণ স্বভাবের হয়, তারাষ্ট মৃত্যুর পরে এ জগতের অধিবাসী হয়। এ জগতের অধিবাসীদের যে চিত্ত অন্ধিত হয়েছে তা অত্যন্ত হান্ধাক্ষীপক। তাদের গলাটা অত্যন্ত সরু এবং পেটটি বেশ মোটা। তারা প্রয়োজনমতো পান বা ভোজন কিছুই করতে পারে না; তার ফলে তারা নিত্য নিরন্তরী ক্ষুধা ও তৃষ্ণার আগ্নায় অবির থাকে।

সর্বনিম্নে রয়েছে যে জগৎ, তাকে বলা হয় নরক। কীংকালে যারা পাপকাৰ্য করে বা প্রত্নর দেহ তারাই সাধারণতঃ এ জগতের অধিবাসী হয়।

এ বিহারটি হলো নিংমাণা (Nyingma-pa) বা প্রাচীন অসংস্কৃত লামা-সম্প্রদায়ের, যাঁদের সাধারণতঃ বলা হয় লোহিত-সম্প্রদায়ের লামা। এ সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞানতে হলে তিস্ততে বৌদ্ধধর্ম-প্রবর্তনের আদি ইতিহাস, তৎকালীন বৌদ্ধধর্মের অবস্থা এবং লামাতন্ত্র-প্রবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় অপরিহার্য। সংক্ষেপে এ সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করছি।

চোং-চেন-গেম্পো (Srong-chen-Gampo) নামক তিস্ততের রাজার রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম সর্বপ্রথমে সেই দেশে

প্রবেশলাভ করে। সে সময় সে দেশে এ বৌদ্ধধর্ম-প্রবর্তনের জন্য ধর্মের প্রভাব খুব বেশী কাৰ্যতরী হয়েছিল, তারা হলেন রাজার দুই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পত্নী। বিদ্যাহের পূর্বে তাঁদের একজন ছিলেন নেপালের অধিবাসিনী, আর একজন চীনদেশের।

বৌদ্ধভক্ত অম্বাষাৰ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং নাগাজুনের দ্বারা বিশেষভাবে সমর্থিত মহাবান ধর্মমতকে অবলম্বন করেই সর্বপ্রথমে তিস্ততে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রচার হয়। বলা বাহুল্য, এ ধর্মমতের সঙ্গে নানা পৌরাণিক কাহিনী, অতীন্ড্রিহাদ এবং তাত্ত্বিকতা সংযুক্ত ছিল।

তিস্ততে প্রথম বৌদ্ধধর্ম অম্বপ্রবেশের অন্ততঃ এক শতাব্দী পরে সে দেশে লামাতন্ত্র (Lamaism) প্রবর্তিত হয়। এর অধ্যাবর্তী সময়ে সে দেশে তন্ত্র-ধর্মেরই রাজত্ব ছিল। এ সময় লামারা 'কালচক্র'-মতে দীক্ষিত হন। এই কালচক্র হলেন সকল বস্তুর উৎস এবং আদি-অন্ত-হীন সর্বপ্রধান দেবতা।

অত্র তিস্ততে এ লামাধর্মের প্রথম প্রচার করেন তন্ত্রমতে বিশ্বাসী বিশ্বাস্ত তাত্ত্বিক পুরোহিত পদ্মসত্তব—তিস্ততীদের লিঙ্গাসমতে ষার জন্ম হয়েছিল পত্র হতে। তিস্ততীরা তাকে বলে থাকেন ওক্ হিন্‌পাচে বা 'সুলাবান ওক্'। লামাতন্ত্রের মধ্যে এ মহান ওক্‌র মূর্তিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জ্বাদুবাডি বৌদ্ধবিহারে—যে সবচেয়ে পূর্বেই উন্মেষ করা হয়েছে। এ প্রচেষ্টা ধর্মমতের সর্বক্ষেপে এখানে আরো হু'একটি কথা বলছি।

তিস্ততের তৎকালীন রাজা সাং-ডে-চেনের (Sung-de-chen) আমন্ত্রণে সাম-এ (Sam-ye) নামক স্থানে সর্বপ্রথম বৌদ্ধবিহার স্থাপন করার জন্তে পদ্মসত্তব তিস্ততে গমন করেন। পদ্মসত্তব ছিলেন নালন্দার যোগশিক্ষা-বিভাগের একজন প্রধান অধ্যাপক। ১৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নেপালের কাটমণ্ডু এবং কিউং-এর পথ ধরে সাম-এ-তে পৌঁছেন। তিস্ততীরা বিশ্বাস করে, তিনি যখন সাম-এ-তে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিল 'বোৰ্ণে' বা বস্ত্র; যন্ত্রশক্তি দ্বারা তিনি শুধাকার 'শরতান'সের (বৌদ্ধধর্ম-প্রবর্তনের পূর্বে তিস্ততবাসীদেরই শরতান বলা হয়েছে) শরাদ্ধিত করেন এবং য-মতে দীক্ষিত করেন। তারপর তিনি সাম-এ-তে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করার (১৪২ খ্রীষ্টাব্দে) সর্বপ্রথমে লামা-সম্প্রদায় গঠন করেন।

লামাতন্ত্রকে বলা যায় মিশ্র বৌদ্ধধর্ম। এই ধর্মযন্ত্রিতে প্রধানতঃ সাধাধ্য রয়েছে পৌরাণিক অনেক কাহিনী,

অতীশ্চিদান (myalicism) এবং তান্ত্রিকতা। এই ধর্ম লামাদের অপভ্রান্ত্য এবং দেবকৃত নদিশের (canonised saint) পূজার বিষয়ী।

বিখ্যাত ভারতীয় বৌদ্ধতন্ত্র অতীশার তিস্ত-গমনের পর হতেই লামাতন্ত্র বিভিন্ন সম্রাটের দিক্ত হয়ে যায়। অতীশা বৌদ্ধধর্মের স্বকীয় নিরম্রত পালনের ওপর পূব বিশ্বাসী ছিলেন। তিস্ততে তিনিই প্রথম বৌদ্ধ-ধর্মদর্শনের মধ্যে তুচ্ছতাক (magic)-প্রয়োগের দিক্তে বিরোধ করেন, এবং নিজ অম্মগামীদের স্বপ্রকার ভোগম্রহ হতে বিরত থেকে তিরকৌমার্শ পালন করবার উপদেশ দেন। অতীশা দ্বারা গঠিত সংস্কারগ্রাণ্ড এই নূতন বৌদ্ধ-সম্রাটদের নাম হলো খাদাম্পা (Khadampa), অর্থাৎ দে সম্রাট লামা ঐয়া নবপ্রবর্তিত আইন অম্মদ্বারে চলতে বাধ্য থাকবেন। অবশ্য খাদাম্পা-সম্রাটদের এই আচরণের কর্তোয়তা তিরকাল স্থায়ী হলো না। সাড়ে তিনশো বছর পরে চোং-খাপা (Chong-khapa) নামক বৌদ্ধভক্ত দ্বারা এই সম্রাটদের স্বীকৃতি পুনরায় সংস্কারগ্রাণ্ড হয়।

তখন এ সম্রাটদের নিয়মত্রের কর্তোয়তা অনেকটা সিবিগতা প্রাপ্ত হয়। এদের কর্তোয় সম্রাটধর্ম ক্রমে কতকগুলো আচার-অম্মটানে পূর্ববর্তিত হয়—তখন এদের নূতন নামকরণ করা হয় গেলুকপা (Gelukpas) বা শীত-সম্রাটদের লামা। আর যে সম্রাট লামা এ-সম্রাট সংস্কারের আওতার না এনে তাঁদের পূর্ববর্তী আচার-অম্মটান পজার রাখলেন, তাঁরা হলেন নিইংমা-পা (Nyingma-pa) বা লোহিত-সম্রাটদের লামা।

নিইংমা-পা সম্রাটদের মধ্যেও অবশ্য বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ রয়েছে। তবে সকল শ্রেণীর নিইংমা-পা সম্রাটদের লামাই চগ-ছেনবো (Dzog-chhenbo) বা মহাপরিণাম (The Great End) হতে বিশ্বাসী।

নিইংমা-পা-সম্রাটদের মোটামুটি বিশেষ হলো এই :— (ক) ওক রিনশোচের প্রতি তাঁদের অবিশ্বাসিত শ্রদ্ধা এবং তাঁর উচ্চেষ্টে বিশেষ পূজার্তনা; (খ) তাঁদের সর্বেশ্রেষ্ঠ দেবতা হলেন কুন্টু খেংপো (Kuntu Sangpo : সংস্কৃত নাম—সামন্ত ভদ্র), যিনি হলেন সর্বেত্তম মঙ্গলের প্রতীক ;



আনুবাচি বৌদ্ধবিহারের আর্থনা-কক্ষের দেওয়ালদ্বারা তিস্তী শিখরদ্বারা তৈরিত। লামারা নূতন করণা তিস্তা কথিতছেন।

[কটো : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আচার-বিহরণের দৌলত প্রাপ্ত

(গ) তাঁদের অল্পতম উপদেবতা হলেন ডুকপা-খোগ-এ (Dukpa-Khogye); (ঘ) তাঁদের প্রধান ত্র্যাকর্জী দেবতা হলেন পালগ-ডি-নগ্-অ (Palgon-de-nga); এবং (ঙ) তাঁদের অমৃত বক্তব্য ইপির নাম হলো উরগ্যান পেনজে (Urgyan-Penze)।

বলা বাহুল্য, এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য তাঁদের একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত করেছে। অতীত, বিশেষ করে পীত-সম্প্রদায়ে (yellow sect) লামাদের মতো তাঁদের জীবন-ব্যতীত এত কড়াকড়ি কোনো নিয়ম নেই। কারণ পীত-সম্প্রদায়ের লামারা তাঁদের সম্প্রদায়ের নিয়ম অস্থায়ী কখনও পারম্পরিক করতে পারেন না, এমন কি তাঁদের বাসগৃহে খ্রীষ্টোক্তের প্রবেশ পর্বন্ত নিষেধ। অথচ লোহিত-সম্প্রদায়ের লামারা সংসারী লোকের মতো বিবাহ করেন এবং সন্তানাদি নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন।

লোহিত-সম্প্রদায়ের লামাদের বিবাহের রীতিনীতি অনেকটা হিন্দুদেরই মতো। ঘটকের মারফতে কস্তা-নির্ধাচনের পর কস্তার পিতার নিকট প্রথমে প্রস্তাব পাঠানো হয়; তার পর বিহতের পিন কস্তাকে বরের বাড়িতে এনে লামা পুরোহিতদের দ্বারা মন্ত্র পড়ানো হয়। তখন বরকস্তা বিবাহস্থলে আবদ্ধ হয়।

বুদ্ধার পরে লোহিত-সম্প্রদায়ের সংস্কার-প্রবীণ পীত-সম্প্রদায়ের লামাদেরই মতো। তিব্বতে আলানী কার্ণের অভাব বলে বুদ্ধকে সেখানে সাধারণতঃ শোড়ানো হয় না (একমাত্র ধনীশ্রেণী ছাড়া)। দাক্ষিণিতে অবশ্য লোহিত-সম্প্রদায়ের লামাদের অধিসংস্কার হয় এবং সংস্কারের পর ভ্রম সংগ্রহ করে এক জায়গায় যেখে তার ভ্রমর স্মৃতি-কৃপ তৈরি করা হয়। অবশ্য অর্ধশালী লামাদের বোলাই এই রীতি অল্পস্বত্ব হয়। এ ছাড়া তিব্বতে বুদ্ধার পরে লামাদের পারলৌকিক কার্যের জন্য আরো কয়েকটি উপায় অবলম্বিত হয়। প্রথমতঃ, কেউ কেউ বৃত্তমহকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। দ্বিতীয়তঃ, মৃতদেহের অস্থি সংগ্রহ করে সেগুলোকে চূর্ণ করা হয়। তারপর সেই অস্থিচূর্ণকে চাঁউলের গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে পিণ্ড তৈরি করা হয় এবং সেই পিণ্ডগুলো শকুনকে খেতে দেওয়া হয়। যদি শকুনেরা সেগুলো খেয়ে যায়, তাহলে তারা মনে করে মৃতের আত্মার সদৃশ্যিত হয়েচে।

এ প্রবন্ধ উপকলন-গ্রন্থের আদি অধ্যায়ক এস. মল্লুর নিকট হতে অনেক সাহায্য পেয়েছি। সেজন্য ঠাকৃ কৃতজ্ঞতা জানাই। —লেখক



ডাক্তারের জীবনচিহ্ন

• ডাক্তার ডট্ট •

১ ফেলো।

উপক্যাপ মেডিসিনের বিজ্ঞা নিয়ে যে আমার পড়া উপকার হয়েছে 'তা শিক্ষা নেবার সঙ্গে সঙ্গেই পর পর কয়েকটি ঘটনা থেকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পায়লাম।

একটি হলো, আমার নিজেরই ডাইএর এক বিচিত্র বকমের অস্থির। প্রথমে দেখা গেল যে তার মাঝে মাঝে অর হচ্ছে আর মাঝে মাঝে চেড়ে থাকে। হুইনিং দে ভালো থেকে কাজে বায়, তার পরেই হঠাৎ করে তিন-চারদিন বিছানায় শুয়ে থাকে, আবার সেয়ে উঠে যেমনি হুইনিং কাজে যেতে শুরু করে অমনি আবার অরে পড়ে। শুধু অর নয়, অরের সঙ্গে শরীরে নানাবরন হরণা, সর্বাঙ্গে ব্যথা, মাথাব্যথা ইত্যাদি। সে সময়ে তাকে একবারে কারু ক'রে ফেলে। অরের মাত্রাও দু'বেলা, তার হরণাও অদৃষ্ট।

আমি বললাম এ নির্ণাত ব্যালেগ্রিয়া, কুইনিং পাও, সেয়ে বাবে। কুইনিং দে যথেষ্টই বেলে, কিন্তু অর যেমন হচ্ছিল তেমনি হতে থাকল। আমি তখন উপক্যাপের পড়াশোনা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, কুইনিং খেতে বলা ছাড়া ওর এই অরের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু গ্রাহ্য করছিলাম। সেটা দৃষ্টান্ত সেয়ে আমার ডাই তার পরিচিত অস্ত্র একজন ডাক্তারকে এনে দেখাতে লাগল। কিন্তু সেই ডাক্তারের চিকিৎসাতত্ত্ব বিশেষ কিছু ফল হোলোনা। অর ঐভাবেই চলতে থাকল। যে ওষুধই দেয় তাতে অর চাড়েনা।

সেই ডাক্তারটি তখন শহরের একজন বড়ো ডাক্তারকে ডেকে এনে তার সঙ্গে কনসাল্ট করলে। তিনি বললেন, ওষুধ খাইয়ে কিছু হবেনা, কুইনিং ইন্সেকশন দিয়ে দেখ। কিন্তু তাতেও ফল না হওয়াতে তিনি বললেন, সবরত কোনোই জীবাবর অর, কোলাই ড্যাঙ্কিন প্রকৃতি বাক। তাতেও কিন্তু কিছুই ইতরবিশেষ হলোনা।

তখন দ্বিতীয় একজন বড়ো ডাক্তারকে ডেকে এনে দেখানো হলো। তিনি নানাবরন ওষুধ দিয়ে ব্যর্থ হয়ে কয়েকদিন পরে গভীর হয়ে প্রায় দিলেন যে, ইহতো বুদ্ধিহীন-পুসিয়ে কোথাও টি-পি আকরণ করবেছ, কিছুদিন অপেক্ষা করে না দেখলে ঠিক বোঝা যাবেনা।

বাড়ির দরপে অত্যন্ত ভাবিত হয়ে উঠল। আমি ততোটা গ্রাহ্য করছিলাম বা যখন নিশিনা দেখে আমাকে কেউ আর কিছু বললো। 'তা ছাড়া বড়ো বড়ো ডাক্তার এসেই যখন কিছু করতে পারছেননা, তখন দেখানো আমি কি-ই বা করতে পারবো।' এদিকে একমাস-দুইমাস হতে চলল, অশ্রু অরের কিছু দিনারাষ্ট হোলোনা। এক এক জন এক এক বরন বলে যাচ্ছে, অর সবলোই চিন্তাশূল হয়ে উঠছে। আমি নিজের কামেলা নিয়ে ব্যস্ত আছি দেখে আমাকে কেউ কিছুই বলছেননা।

সেদিন বর্বিবার। আমি বাড়ি-ঠাই আছি। আমারও মনে মনে একটা হুসিহুসা লেগে রয়েছে, যদিও মূলে কাউকে কিছু বলি না। সেদিন অবসর থাকায় মনে করলাম যে ওর অরের প্রকৃতিটা কেমন 'তা নিজে একবার ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখা যাক। যে ঘাট বদল, আমি একবার নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে দেখি ওর কিছু দিনারা করতে পারি কিনা।

সোপার ঘরে গিয়ে বসে ওর অর-লেখাবর খাতাখানা চেয়ে নিলাম। কোন তারিখে পড়টা পর্যন্ত অর উঠেছে নেমেছে আর কেমন ওর গতি তারই একটা সংলগ্ন করে নিতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম যে অরের গতি খুব এলোমেলো, হুইনিং আছে হুইনিং নেই। খাতায় তখন দুইদিকে দেখে গেলে তার প্রকৃতি ঠিক বোঝা যাবেনা। এ অরের একটা চাই প্রস্তুত করা হরকার। তাহ'লে ইহতো পড়ক আন্দাজ পাওয়া যাবে।

ছকুকাটা কণজ এনে আমি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত অরের এক লফা চাই প্রস্তুত করলাম। সেই চাইখানি যখন জোখের সামনে বেলে পরলাম, তখন একদৃষ্টিতেই চিনতে পারলাম, এতো হুবহু বিলাপিয়া ফিভারেব চাট্টের নতো। যাকে বলে 'শৌনোপুনিং অর'। এমন চাই আমি নিহত কত একেছি।

কিন্তু শৌনোপুনিং অরও কয়েক বকমের আছে। এটি তার মধ্যে কোন বকমের বলে মনে হচ্ছে? আমি দেখলাম এর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট চক রয়েছে, — ঠিক তিন দিন অর থাকে, পরের হুইনিং থাকেনা। আবার তিন দিন পরে অরটা

বাড়তে থাকে, আবার পরের দুদিন আর থাকেনা। এমনিই চলে আসতে আগাগোড়া। এমন ধরনের চার্ট দেখলে 'রাইট-বাউট ফিভার' বলেই মনে হয়।

সেটা কি ব্যাঙ্গ্য সংক্ষেপে বলি। আমাদের ঘরে-দোরের যে-সব ঈদুর ঘুরে বেড়ায়, তাদের কারো কারো শরীরে 'শাইরোকীটা-ক্রাটীড' একরকম বিযাক্ত জীবাণু থাকে। সেই ঈদুরে মাছকে কামড়ালে ঐ জীবাণুর দ্বারা এই ধরনের এক পৌনঃপুনিক জ্বরের সৃষ্টি হয়। জাপানে এ-জ্বর খুবই হয়, একে তারা বলে 'সোডোকু'। আমাদের দেশেও পল্লীগ্রামের লোকে একে বলে 'হুইয়ের জ্বর'। যে ঈদুরকে সাপে ধরেছিল 'তাকে বলা হয় 'হুই'র, সেই সাপের দিব্যশক্তিই জ্বরের সৃষ্টি, তাই লোকের ধারণা। কিন্তু সেটা বাস্তব কথা, আসল কারণ ঐ জীবাণু। ডাঃ দাশগুপ্ত পরীক্ষা করে দেখেছেন যে কলকাতার ঈদুরদের মধ্যে শতকরা কুড়িটি ঈদুরের দেহে এই জীবাণু পাওয়া যায়।

চার্ট দেখে আমার দেখে মাথায় বড়মূল হয়ে উঠল, এ নিশ্চয় ঈদুর-কামড়ানোর জ্বর। আমার ভাইকে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলাম—“তোকে কখনো ঈদুরে কামড়েছিল?”

“তার মনে?”

“তার মনে রয়েছে গুনের সমস্ত কোনোসিন হাতে কিংবা পায়ে ঈদুরে কামড়ে দিলে বলে টের পেয়েছিলি?”

“তা হবে।”

“হবে নয়, রিক মনে করে বল।”

“তাই যেন মনে পড়ছে। প্রায় দেড়শাশ-দুশাশ আগে রাতে ঘুমেতে ঘুমেতে কিসে যেন আমার হাতের আঙুলে কুট করে কামড়ে দিলে। ঘুম ভেঙে তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বলে দেখলাম। কিছুই দেখতে পেলামনা। আঙুলে একটা কামড়ের দাগ দেখেছিলাম মাত্র, কিন্তু কোনো জ্বলাধরা ছিলনা। মনে করলাম 'পি'পড়ে-টি' পড়ে হবে। তার পর ঘুমিয়ে পড়লাম। সেটা ঈদুরে-কামড়ানোও হতে পারে।”

“সেই ঈদুরের কামড়েই তোর এই জ্বরটি হয়েছে। এ হলো ঈদুর-কামড়ানোর জ্বর।”

বাড়ি থেকে আমার কথা শুনে হেসে উঠল।

কিন্তু পরের দিন আমি উপিক্যাল থেকে ডাঃ দাশগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে এসাম। তিনি এসে চার্ট দেখে বললেন—“জ্বরের প্রকৃতি দেখে তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু রক্ত পরীক্ষা করে দেখা উচিত। আমি পিরা থেকে ঘানিকটা রক্ত নিয়ে যাবছি। এই রক্ত সিনিগিলের শরীরে ইন্জেকশন করে দেব। যদি ঐ রোগই হয় তাহলে পনেরো দিন পরে

সেই সিনিগিলের রক্তের মধ্যে প্রচুর শাইরোকীটা দেখতে পাওয়া যাবে।” এই বলে তিনি রক্ত নিয়ে গেলেন।

আমি বললাম—“কিন্তু আরো পনেরো দিন পর্যন্ত রোগীকে কটে দিয়ে কি লাভ আছে। তার আগেই কি একটা আর্দেণিক ইন্জেকশন দিয়ে দেখা যায়না? যদি ঐ রোগ হয় তাহলে নিশ্চয় তার কল পাওয়া যাবে।”

তিনি বললেন—“তা দিয়ে বেশতে পারেন।”

সেইদিনই আর্দেণিক ইন্জেকশন দেওয়া হলো।

তৃতীয় দিনে জ্বরটি ছেড়ে গেল, এবং তার পর আর জ্বরই হলোনা। ছটি মাত্র ইন্জেকশনে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

এ যে খুব গুরুতর রোগ তা নয়, দুই-তিনটি মাত্র ইন্জেকশনেই আরোগ্য হয়ে যায়। কিন্তু রোগটিকে ঠিক ধরা চাই। আমি যদি উপিক্যাল মেডিসিন লব্ধে বিশেষ শিক্ষালাভ না করতাম তাহলে এ রোগ কখনই ধরতে পারতাম না। কলকাতার ভালো ভালো একাধিক ডাক্তারই দেখেছেন, কিন্তু তাঁরাও এ রোগ ধরতে পারেননি। ওর ঐ পৌনঃপুনিক রকমের জ্বরের চার্ট, ওর বিশিষ্ট লক্ষণগুলি, আর ঈদুর-কামড়ানোর ইতিহাস—এগুলি জানা না থাকলে কেউই এ রোগ চিনতে পারেনা। আমার যদি এই নতুন রকমের শিক্ষাটি না থাকতো তাহলে আমার ভাইকে আরো বহুকাল পর্যন্ত এই জ্বর ভোগ করতে হতো, এবং শেষ পর্যন্ত কি হতো তা বলা যায়না।

পনেরো দিন পরে ডাঃ দাশগুপ্তর কাছে গবর পেলাম, রক্তে প্রচুর শাইরোকীটা পাওয়া গেছে।

আরো একটি রোগীকে আমি ঐভাবে আরোগ্য করতে পেয়েছিলাম। তিনি আমার এক বন্ধু, তিনিও একজন কৃতবির ডাক্তার।

ঘুমঘুমে জ্বর হচ্ছিল ঠায় অনেকদিন থেকে। প্রথমটা জ্বর বলে বুঝতেই পারা যায়নি। শরীরটা ব্যাথা যোধ হতে থাকে, গা মাঝমাঝ করে। ক্রমশই স্পষ্ট বোঝা গেল যে জ্বর হচ্ছে। ম্যালেরিয়া মনে করে কুটিনি প্রকৃতি পাওয়ানো হলো, কিন্তু তাতে জ্বর না কমে উত্তরোত্তর আরো বাড়তেই থাকল। তখন অস্ত্রাভ্যাস ডাক্তারদের ডাকা হলো, তাঁরা বললেন টাইফয়েড কিংবা প্যারা-টাইফয়েড। তারই ধরাধারিতি চিকিৎসা হতে থাকল। কিন্তু এক মাস পার হয়ে বাবার পরেও সেই জ্বর কখনো, সমানেই চলতে থাকল।

জ্বরের সঙ্গে আর কোনো লক্ষণ নেই, কেবল শিভারটি বেড়েছে। তখন সবাই মায়াব্র করলেন কোনোই জ্বর। তার চিকিৎসাতেও যখন সেই জ্বরের কিছু উপশম হলোনা, তখন তাঁরা নিভায়েই জ্বর এমিটিন ইন্জেকশন দিতে শুরু

করলেন। তাতেও কিছু কাজ হচ্ছেনা দেখে হুতো
মুগ্ধ হতে পারে বলে মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলেন।

এই সময় আমি ধর শেয়ে একদিন ঠাক দেখতে
গেলাম। দেখানে গিয়ে রোস্টার মুখেই সব কথা শুনলাম।
তিনি নিজেও বুঝ ভাবিত হমে পড়েছেন, কি রোগ হয়েছে
কিছুই বোঝা যাচ্ছেনা।

আমি কিছুক্ষণ ছেবেটিস্তে বসলাম, আত্মপাত্তা জ্বরের
একটা চার্ট ক'রে ফেলা যাক, তাহ'লে হয়তো কিছু বোঝা
যেতে পারে। আমি কাগজ-পেন্সিল নিয়ে চার্ট প্রস্তুত
করতে বসে গেলাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল চার্ট তৈরি করতে। এই
চার্ট দেখে বুঝলাম, জ্বরের কোনোই ছন্দ নেই, কোনোদিন
বাড়ে, কোনোদিন কমে। টাইফয়েড প্রকৃতির চার্ট এমন
হতেই পারেনা। একটিমাত্র জ্বিন্দ লক্ষ্য করলাম এট যে
প্রায়ই দৈনিক দুবার ক'রে জ্বরটা বাড়েছে।

এ জ্বরে মৌকালীন বলা বেতে পারে। এই জ্বরের
সঙ্গে সঙ্গে যদিও পিলে বাড়েনি, কিন্তু নিজারটি ক্রমশ
বাড়েছে। কালাজ্বরের কথা আমার আগের থেকেই মনে
হচ্ছিল, হঠাৎ মনে পড়ল ইপিক্যাল হাসপাতালে এমন
কালাজ্বরের রোস্টা দেখেছি যার পিলে না বেড়ে কেবল
নিজারটাই বেড়েছে। কর্নেল মিলো তাই বেশির আয়াদের
বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে কালাজ্বরে কেবল যে পিলেই বাড়ে
হবে তা নয়, এমনও ব্যতিক্রম হতে পারে।

আমি রোস্টিক বসলাম—“আমার মনে হচ্ছে তোমার
এ কালাজ্বর।”

“সে কি? ও-কথা আজ পর্যন্ত কেউই বলেনি, কেবল
তুমিই বললে। কেমন ক'রে জানলে কালাজ্বর?”

“এই মৌকালীন জ্বরের চার্ট দেখে আর এত বড়ো
নিজার বেধে। কালাজ্বরের জীবাবৃদ্ধির সঙ্গে পিলেও যেমন
একটি বাস-বঁধবার স্মারক, নিজারও তেমনই একটি বাস-
বঁধবার স্মারক।”

“তুমি একথা অল্প ডাক্তারদের সাহায্যে বলতে
পারবে?”

“নিশ্চয় পারবো।”

পরের দিন সেলাম ডাক্তারদের আসবার নিমিষ্ট সময়।
আমার বক্তব্য তাঁদের কাছে বললাম।

তারা গভীর হয়ে বললেন—“বেশ তো, বক্ত পরীক্ষা
ক'রে দেখা যাক।”

আমি বললাম—“এক ঘাসের জ্বরে বক্তপরীক্ষার কালা-
জ্বরের চিহ্ন না দিলেও পারে। হুই-ডিন ঘাসের কমে

সেই বিশেষ চিহ্ন প্রকাশ পায়না। তবে বক্তের কালচার
করা যেতে পারে। কিন্তু তারও কল জানতে পনেরো-দুড়ি
দিনের কমে হবেনা। ততদিন পর্যন্ত কি রোস্টিক এমন-
ভাবে ভুগতেই দেওয়া হবে? বক্তপরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত?”

“আপনি তাহ'লে কি করতে বলেন?”

“আমি যদি কালাজ্বরের ইন্জেকশন হু'একটি দিয়ে
দেখতে। তাতে কোনো ক্ষতি হবে বলে আমার মনে
হয়না।”

“আমরা কেউই সে দাবিই নিতে রাজি নই। যদি
আপনি নিজে দেই দাবিই নিতে চান, আমাদের কোনো
আশংকা নেই।”

“আমি সে দাবিই নিতে সম্মত আছি।”

“কিন্তু হুটী যাত্র ইন্জেকশন আপনি দিতে পারেন,
তাতে যদি কোনো কল না হয় তাহ'লে আর দিতে
পারেন না।”

“আচ্ছা বেশ, তাই হবে।”

বক্ত পরীক্ষা না ক'রে কালাজ্বরের ইন্জেকশন দেওয়া
নিষেধ নয়। কিন্তু এখানে সে নিষেধ প্রযুক্ত করতে গেলে
আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। আমার মনে
দুঃখের সঙ্গে গিয়েছিল যে এটি নিশ্চয় কালাজ্বর। তাই
আর অপেক্ষা না ক'রে সেইদিনেই একটি কালাজ্বরের
ইন্জেকশনের গুহুর আনিয়ে নিলাম। তৎক্ষণাতঃ
আবিষ্কৃত ‘ইউরিয়া স্ট্রিমিন’ তখন এ-রোগে প্রচলিত
হচ্ছে, আর ওতে সুনিশ্চিত কল হতে দেখা যাচ্ছে। তারই
প্রথম যাত্রাটি আমি ইন্জেকশন দিলাম।

পরের দিন থেকেই সেলাম গেল জ্বর কম হচ্ছে। তুমি
পরে আরো একটি ইন্জেকশন দিলাম। দ্বিতীয়
ইন্জেকশনের পরে জ্বর একেবারে ত্যাগ হয়ে গেল।

কালাজ্বরের প্রকৃতি সবুজ ডালোবধন শিক্ষাপ্রাপ্ত
না হলে আমি এতটা সাহস করনই করতে পারতাম না।

। চৌদ ।

ইপিক্যাল মেডিসিনে পাস করতে পারার আমাকে
আর দক্ষতায় বৃদ্ধি করা হলোনা। কলকাতারই পুলিশ-
হাসপাতালে বিশেষ এক কাজ দেখে গেলাম।

তখন চিকিৎসার ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরি-পরীক্ষার যুগ
চলেছে। প্রত্যেক হাসপাতালেই ল্যাবরেটরি স্থাপিত
হয়েছে, রোস্টিকের বক্ত প্রকৃতি দেখানোর বহালমত পরীক্ষা
করে দেখা হয়, বেশি জটিল রকমের পরীক্ষার প্রয়োজন
না হলে কলোকে বা অল্প বৃহৎ ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়

না। সাধারণ রকমের পরীক্ষাগুলি স্থানীয় ল্যাবরেটরিতেই ক'রে নেওয়া হয়, এবং তার জন্য আলাদা একজন ল্যাবলজিস্ট বা ল্যাবরেটরি-পরীক্ষক নিযুক্ত থাকে। বলাকথা পুলিসের হাসপাতালে কিন্তু তখনও কোনো ল্যাবরেটরি ছিলনা। কর্তৃপক্ষ তাই একজন শিক্ষিত ল্যাবরেটরি-পরীক্ষকের সন্ধান করছিল। আমি পাস ক'রে বেগিয়ে আসতেই আমাকে সেই কাজের জন্য বনোনীত করা হলো।

আমার খুব হুবিধা হয়ে গেল। অতঃপর কলকাতাতেই আমি থাকতে পারো, প্র্যাকটিসের দিক থেকে কিছু বিষ হবেনা। প্রত্যাহ কেবল হুগুনের সময়টিতে কাজ করতে হবে হাসপাতালে, সকালে সন্ধ্যায় প্র্যাকটিস করবার ঘণ্টেই অবসর পাবো। হাসপাতাল অনেক দূরে হলেও একটি মোটরগাড়ি থাকলে কোনোটি চিন্তা নেই। আর প্র্যাকটিসের মর্যাদা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও মোটরগাড়ি রাখা খুব সরকার। অতঃপর সেই ব্যবস্থাটি করা হলো। হুগুর বাথেরটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত আমি হাসপাতালে কাজ করতাম, তাৎপর্য ফিরে এসে ডাক্তারখানার বসতাম। কিন্তু এই সময় থেকে ডাক্তার রায়ের ঘোষার বাড়ী আমার বন্ধ হয়ে গেল। তার আর স্নেহসঙ্গ রইল না।

প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে হাসপাতালে নিজের ল্যাবরেটরি সজ্জিয়ে বসলাম। তখন ঐ হাসপাতালের সড়কর্তা ছিলেন কর্নেল স্যে। যেমন জান্না ব্যক্তি, তেমনই নিখুঁত নির্ল-চরিত্র। আর, সকল বিষয়েই তেমনই উৎসাহী। ল্যাবরেটরির জন্য যখন যেটি প্ররকার বস্তুসমূহ তৎক্ষণাৎ তাই আনিতে দিতেন। দামী মাইক্রোস্কোপ থেকে গুল ক'রে ইনফিউউবের, স্টেরিলাইজার, ইলেকট্রিক সেক্সি, কিউজ প্রভৃতি একটি ভালো ল্যাবরেটরির পক্ষে আধুনিক বা বা সরঞ্জাম থাকা সরকার সমস্তই আনিতে দিগার। নতুন উদ্ভব নিয়ে আমি নিজের কাছে পুরোপুরি বনোনিবেশ করলাম।

শু মু নিজের কাছেই নয়, হাসপাতালের চিবিংসার কাছেও আমি যতঃপ্রণোদিত হয়ে যথেষ্ট সাহায্য করতাম। কর্নেল স্যে যখন রোগী দেখতেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গুরতাম। তিনিও এতে খুব হুপি হতেন, প্রত্যেক বিষয়ে আমার মতামত নিতেন, কোন রোগ সন্দেহ নতুন কি নিশে এলোই জানতে চাইতেন। তিনি জ্ঞানছিলেন যে আমি ভালোভাবে পাস করছি, কোনো কোনো বিষয়ে কান্ট্রি হয়েছি, কাজেই তিনি আমার মতামতের একটা বিশেষ দৃষ্টি দিতেন।

আর আমি? তাঁর এই আচরণে আমার ভিতরে ভিতরে একটা গর্ভভাবই এসে গিয়েছিল। সেটী ছেলে-বেলাকার সেই ডবল-শ্রমোণনের মনোভাব। যাকে মাঝে আমার মনে হতো যে আমি তাঁকে নতুন কিছু শিখিয়ে দিগার। তাঁর সেই কথেকার আমলের সেকুলে শিক্ষা, এইসব আধুনিক ধরার তিনি কিছুই জানেন না। আমার এই গর্বের ভাবটি তিনি বুঝতে পারতেন কিনা, আর বুঝতে পেরে মনে মনে হাসতেন কিনা, সে কথা আমি বলতে পারিনা। অস্তুতপক্ষে বাহু আচরণে তা কিছুই দেখতে পাইনি। তিনি খুব চাপা একুতির ছিলেন।

কর্নেল স্যে যে আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী আর অনেক অভিজ্ঞ-এ কথা অনেক সময়েই আমার মগ্নর থাকতেন। যেন তিনি ভুল স্বাক্ষ করছেন, আমি তাঁকে সেটা দেখিয়ে দিছি, এই ভাবটাই কোনো কোনো সময় এসে যেতো।

একবার একটা মেনিঞ্জাইটিস রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। তাঁর বক্তৃপরীক্ষার মেনিঞ্জাইটিস বলেই রোগ-নির্ণয় করা হয়েছিল। ঐ রোগের লক্ষণগুলিও বেশ পরিষ্কৃত। রোগীর জোবহুটি রক্তবর্ষ, ঘাড় সর্বসা শক্ত হয়ে আছে, মাঝে মাঝে বিকট চিংকার করছে, কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে যেখানে-সেখানে খুঁ খুঁ করে পুছ ফেলছে, মাঝে মাঝে বাট থেকে লাফিয়ে পড়তে চাইছে। বাটের সঙ্গে কাপড় দিয়ে তার হাত-পা বেঁধে রাখতে হয়েছে। এদিকে কোনো জ্ঞান নেই, ডাকলে সাড়া পর্যন্ত দিচ্ছেনা।

কর্নেল স্যে সেই রোগীকে দেখে মাথায় বরষ দিতে বললেন, কড়া মাথায় ঘূমের গুধু দিতে বললেন, নতুন ইনজেকশন দিয়ে ঘূমের ব্যবস্থা করতে বললেন, পিরাম ইনজেকশন এবং আরো কয়েকরকম ইনজেকশনের ব্যবস্থা করলেন। এইসব মামুলী নির্দেশ দিয়ে তিনি অস্ত্র রোগী দেখতে অগ্রসর হলেন।

আমি তখন তাঁকে বললাম—“এ রোগীর লম্বার পাণ্ডায় ক'রে মেকদণ্ডের ভিতর থেকে জল বের ক'রে দেওয়া উচিত।”

তিনি হেসে বললেন—“তাতে কোনো ফল হতে ছুনি নিজের চোখে দেখেছ?”

আমি বললাম—“নিজের চোখে দেখিনি বটে, কিন্তু কেভাবে সকলেই তাই বলে। রোগী তাতে আরাম পায়, ঘুমিয়ে পড়ে, আর স্বপ্নানো করুনো রোগটা সেরেও যায়।”

“আমি তো কখনো রোগটা শারতে দেখিনি।”

“তবু সেটা স্বতঃনির্গত পর্যন্ত করা যায় তা আমাদের কর উচিত।”

কর্নেল দে তাই শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার পরে আবার দিকে চেয়ে বললেন—“আচ্ছা, তোমার উপরেই আমি এর চিকিৎসার ভার দিলাম। যা যা তোমার করা উচিত যেন হয় করো।”

আমার খুব আনন্দ হলো। লাখার পাণ্ডার করা অনেক দেখেছি, কিন্তু নিজের হাতে কখনো করিনি। এখানে সেই সুযোগটি পেয়ে সেলাম তাক বটে, আর আমার মনে মনে ধারণা ছিল যে বোষ্ট্র এতে শেত্রও উঠতে পারে। চেষ্টা করতে দোষ কি।

প্রথমবারের লাখার-পাণ্ডারে বেশ কৃতকার্য হলাম। মেকবণ্ডের মধ্যে জলের চাপ বেশি ছিল, পাণ্ডারের মোটা চুঁচটি ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়তেই তত্ত্বব্ব ক'রে অনেকখানি জল নির্গত হয়ে গেল। তার কপে দেখা গেল যে বোষ্ট্রের মাথার যন্ত্রণাও উত্তেজনার ঘাড়া বেশ কমে গেল। আমার এই কৃতকার্যতায় বেশ খুশি হয়ে উঠলাম।

পরের দিন কিন্তু অত সহজে কিছু হলোনা। হুই-তিন বার হুই-তিন বারনে চুঁচ চুকিয়ে বার্য হয়ে যদি-বা শেষে কিছু জল নির্গত হলো, তা বন্ধ-বিজ্রিত। আর তাতে এবার কঠোর কিছু উপনয় হলোনা।

চতুর্থ দিনেও একই ব্যাপার। অনেক বোচাখুঁড়ির পরে তবে একটু জল বার্য হয়, কিন্তু তাতে কিছুক্ষণের জন্তে বোষ্ট্র অসাড় হয়ে থাকে ছাড়া আর কোনো উপকার দেখা যায়না।

তবে এই ব্যবস্থায় দেখা গেল যে বোষ্ট্র সাত-আটদিন পর্যন্ত বেঁচে রইল। তার পরে সে মারা গেল। অল্প এ কথা এখানে বলাই বাহুল্য যে, বেনিছাইটিসের ডালো ডালো আধুনিক ওষুধগুলি তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

কর্নেল দে একই হেসে আমাকে বললেন—“তোমার চিকিৎসার কিছু কন নিশ্চয়ই হয়েছে, তা আমি স্বীকার করছি। লাখার পাণ্ডার না করলে হয়তো হুই-একদিনের মধ্যেই লোকটি মারা যেতো, এতে দে সাত-আটদিন পর্যন্ত বেঁচে রইল। তাই বা দশ কি, চেষ্টা দখোইই করা হলো, কিন্তু যে বাঁচবেনা তার আর কি করা বাবে।”

আমি বৃথলাম, তিনি আমাকে সাহায্য দিচ্ছেন।

কর্নেল দে এইভাবে আমাকে অনেক বিষয়ে ঘনেষ্ট উৎসাহ দিতেন। শুধু তাই নয়, আমার কাক্সের তিনি সমর্থনও করতেন। পুগিসের লোক ছুটি নেবার জন্তে কখনো কখনো মিথ্যা রোগের তাল ক'রে দেন। তাদের তিনি পরীক্ষার জন্তে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আমি নানারূপ পরীক্ষা ক'রে যাকে সত্যই অল্প বলতাম

তাকে তিনি ছুটি দিয়ে দিতেন, যাকে বলতাম হুই তার ছুটি নামকুর করতেন। আমার প্রতি খুবই তাঁর বিশ্বাস ছিল। কখনো কখনো বাইরের বেলে আমাকে কিছু পাইরেও দিতেন। ডালোবাসতেন আমাকে।

একবার এক জায়গায় তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন, বোষ্ট্রের আঙুল দুটিতে রক্ত এনে পরীক্ষা করবার জন্ত। কি রোগ হয়েছে ধরতে পারা যাচ্ছেনা। তাঁর রক্ত পরীক্ষা করা দরকার। কথাটা খুবই সামান্য, কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখলাম তা রূপকথার কাহিনীর মতো অসামান্য। কেমন ক'রে সেই একটি দিনের কতক মিনিটের কাহিনীটুকু এখানে দশক বৃক্রে পারছিলা, কারণ আজ পর্যন্ত তার কোনো আদিত নেই অস্তও নেই। আদি-অন্ত না থাকলে কোনো কাহিনী হয়না। কিন্তু বতটুকু দেখেছি ততটুকুই বলি।

অল্প এক নবাব-হুহিতার। মন্ত খনী, আদিপুত্র অকলে বিজীর্ণ ভূমিতে পাঁচিল-ঘেরা বাগানের মধ্যে মন্ত রাজপ্রাসাদ। গাড়িতে সেলেক্ট কটক পার হয়ে বাগানের আকারীকা পথগুলি অতিক্রম ক'রে প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছতে পাঁচমিনিট সময় লেগে যায়। প্রাসাদের মধ্যে ঢুক হঠাৎ দিশাহারা হয়ে যেতে হয়, কোনদিক দিয়ে কোথায় যাবো ঠিক করতে পারা যায়না। চারিমিকেট মোটা মোটা বায়, গোলাকারে বেষ্টিত। বারান্দা অতিক্রম করেই বিরাট হলঘর, আসবাবপত্র ঠােলা।

কর্নেল দে আগের থেকে টেলিফোনে বলে রেখেছিলেন, একজন হস্তোদয় আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল। ঘরের পর ঘর এবং বাগানকার পর বাগানকা অতিক্রম ক'রে চললাম। একে সাতমহলা বাড়ি বলা যেতে পারে, মহলের পর মহল অতিক্রম ক'রে চলেছি। লোকজন কাউকে দেখছিলা। ঘরগুলি জাকা, আবছা অন্ধকারময়, রক্তমারি আসবাবপত্রে সাজানো।

অবশেষে দোতলার এক প্রকাণ্ড ঘরে আমাকে নিয়ে গেল। সেই ঘরে এক তরুণী রোগিনী শুয়ে আছে, তার পাশে একজন নার্স ঠাড়িয়ে আছে। সে-ঘরটিও অন্ধকার, বাইরে থেকে এসে ঠাডালে ঘরের মধ্যে পরিভার কিছু বেশা যায়না। কিন্তু রক্ত নিতে হলে আমার প্রচুর আলো চাই। আমি নার্গকে বললাম জানলাগুলি খুলে দিতে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছুটি উত্তর দিকের জানলা খুলে দিতেই সমস্ত ঘরখান: আলোয় ভরে গেল।

আলোতে এবার রোগিনীকে ডালো ক'রে দেখতে সেলাম। কিন্তু তার দিকে চেয়েই আমি অবাক হয়ে

থেকেও একই রক্ত নিতে হবে। হুই হাতেরই রক্ত নেওয়া দরকার কিনা?”

মেয়েটির মৃগশানি ভরে উৎসেগে অত্যন্ত স্তব্ধ হয়ে এলো। তার চোখের পেট অশ্রুপূর্ণ পল্লবগুলি জলে ডিঙে এলো, চোখ দিয়ে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ে পড়ি। সে আমার দিকে থেকে চোখ ক্রিয়ের ন্যায়ের দিকে বড়ো কাতরভাবে চাইলে। কিন্তু ন্যায়ের মনে কোনো মহামায়া নেই, সে অশ্রুবিন্দুর হাতশানি ধরে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—“কিছু লাগবেনা, এক সেকেন্ডের তো কাজ, আমি জোর করে চেপে ধরছি। ছুনি বরং একই চোপ বুজে থাকো, এছুরি হয়ে যাবে।”

আর আমিও তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। এবারেরও ব্যর্থ হলে আর রক্ত নেই। মাঝা-মমতাকে ঘুরে হটিয়ে দিয়ে আমি এবার অস্ত্র হাতের আঙুলের ডগ্যেতেই সজোরে হুঁচ চুকিয়ে দিলাম। এবার আশাহুত্ব ভাবেই রক্ত ছুটে বেরোলো। বটে, কিন্তু মেয়েটি বিভণ্ড কোরে চমকে উঠল। তার চোখের কোল দিয়ে এবার জল ঝরে পড়তে লাগল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ক্রমাল দিয়ে নিজের চোখ মুছে ফেললে। হাসিনুখে আমার দিকে চেয়ে বললে—“আমি দরকার হবে নাকি?”

আমি লক্ষ্যই মাটি হয়ে গিয়ে বললাম—“না, এতেই বশেষ হবে।”

বধারীতি বন্ধের স্রষ্টা প্রকৃতি নিয়ে আমি চলে এলাম।

এটাইকুই মাত্র আমার রূপকথার কাহিনী। অনেক বড়ো বড়ো অপরোক্ষ কবিতা, তাতে অনেক উৎসেগ আর অনেক দাবিদ, কিন্তু সেট দরঙ্গ ক্ষেত্রেও কখনো কিছুমাত্র কাতর হইনি। আর সেদিন সামান্য আঙুল ছুটিয়ে এককোটা রক্ত নিতে গিয়ে আমি এতট পিচলিভ হইতে পড়লাম, সে কথা বলবার নয়। বহুদিন পর্যন্ত আমার অশ্রুপ হতে থাকল ঐ ফুলের মতো মেয়েটিকে অনর্থক বাধা দেওয়ার কথা। সেট বাধা বহুদিন পর্যন্ত বাজতে থাকল আমার অন্তরে। বাক্যে বাধা দিয়েছি, জীবনে তাৎক একবার মাত্রই দেখেছি। মনে হয়েছিল যে, বিশ্বশ্রীর সৌন্দর্য্যটির সে পুষ্টি এক পরাক্রা। ভাগ্যক্রমে মৈবাং আমার নজরে পড়েছে।

কিন্তু সেট মূল্যবো মেয়েটির কোনো পথই আর জানিনি। সে এমন কোথায়? সে কি আজও বেঁচে আছে? কিছুই বলতে পারবোনা। রক্তপরাঙ্কার তার রোগ ধরা পড়েনি। কর্নেল দে'র কাছে শুনেছিলাম, তিনি নাকি টি-বি বলে লক্ষ্য করছেন। তার পরেই তিনি ওখান থেকে উচ্চতর পদে বরগি হয়ে গেলেন।

কেনন করে সেট নব্য-বক্তার ধরন আর আমি সেতে পারি? কিন্তু, সে ধরন কিছু না পাশ্চাত্য ভালো—তাতে হয়তো আবার ঐ রূপকথার মোহটুকু নষ্ট হয়ে যেতো।

সমাপ্ত

জীব

অজিত সরকার

হুপুয়ের ডাকে শুভা একখানা টিটি শেল। গায়ে-দেওয়া টিটি—হালকা বাধ। বাধ না বুলেই টিকানার হরকণালো দেখে শুভা বুঝলো মালতী গিথেছে পত্রখান।।

মালতী তার দূরসংসর্গের নন্দ। বিয়ে হোলো এই সেদিন, অগ্রহায়ণের কী-একটা তারিখ ঠিক মনে করতে পারছে না শুভা। বিয়ের পরে এই প্রথম পত্র গিথেছে তাকে। আসে লেখার অবসর হয়নি, না, তার উপর রাগ করেই অভিমানিনী লেখেনি, কে জানে। তবে রাগ করার যে সত্যিই একটা কারণ আছে তা শুভাও স্বীকার করে। মালতীর বিয়েতে শুভা উপস্থিত ছিল না, সেইকল্পেই রেগেছে বোধহয়। মোহটা অবশ্য শুভার নিজের নয়, এর জন্তে দায়ী তার স্বামী, মালতীর দাদা—

হুগ্রকাম। শুভার তো খুবই ইচ্ছে ছিল বিদ্যেবাড়ির ঠে-ঠে-এর মধ্যে আরো কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসার। কিন্তু হুগ্রকামই নানারকম অল্পবিধার ওজর তুলে বিয়ের আগেই তাকে গ্রাম হ'তে এখানে নিয়ে এল। তার ওজর-আপত্তিগুলো যে মিথো মেনে-কথা বলতে শুভার বিবেকে বাধে। সত্যিই তো, বেচারা ক'বার আর কলকাতা-ঘর বাতায়ত করবে? রাজ্য তো আর কম নয়—সেড়লো মাইলের ওপর। তা ছাড়া, পূজোর সময় বাসা ছেড়ে এখানে গিয়েছিল শুভা। পূজো গিয়েছে আশ্বিনের প্রথম দিকে। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে আশ্বিন, কা্তিক আঃ অগ্রহায়ণ আরও কয়েক দিন—যেটো আড়াই মাস শুভা বাস করে ছিল না। এখি যাক ডাইফোটার সময় দিনকয়েক-

জন্মে একবার বাপের বাড়িও গিয়েছিল। একদিকে সে বাপের-বাড়ি বতরবাড়ী করে বেড়াচ্ছে আর একদিকে হুপ্রকাশ আশিষ ঘাড়ে ধোঁটেলে খেয়ে, না হয় নিজের হেঁথে খেতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে, পোঁষায় চোপ হাতিয়ে খাবলসী হবার পত্তপ্রম করে।—এও না হয় হুপ্রকাশ শব্দ করতে রাজী ছিল, কিন্তু মাসে মাসে বাড়িভাড়া বের টাকাটা লাগছে তার কী জবাব! শুভা আর তার বকাশ্রী বাচ্চু নেই বললে যে হুপ্রকাশের বাসাবানা নির্জন প্রাঙ্গণের মতো হাঁ-হাঁ করছে, বাড়িটার আয়তন দেখে তা অবশ্য কেউ বলবে না। তবে বাড়িটার আয়তন ছোটবড় ঘাই হোক, বাড়িভাড়ার অফটার আয়তন যে অনেক বড় তা হুপ্রকাশ প্রতিমাসেই বেশ টের পায়। শুভা আর বাচ্চু না থাকলে বাড়িটা যে হাঁ-হাঁ করে না, তাই বা কে বলল? হুপ্রকাশের নিজের অভিজ্ঞতা হ'তেই ও জানে সে-সময় বাজার জনতাও যেমন অত্যন্ত অসহ, ঘরের নির্জনতাও তেমনই অত্যাশঙ্ক। আফিস-স্কোরার পরে ট্রামের কম্পার্টমেন্টখানা অস্তায় রকমের ছোট মনে হয়, আবার বাসার ফিরে বিপদিত বিছানার নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে ঘরখানার বিবৃতিও সেইরকম অসহন বলা হৈক। কাজেই হুপ্রকাশের অপসিঁত্ব তুচ্ছ নয়। শুভা আড়াই মাস বাসার থাকবে না বলে বাড়িওয়ানো তো আড়টাই মাসের ভাড়া ছেড়ে দেবে না। শুভা চলে যাওয়ার পর বাসা ছেড়ে দিয়ে হুপ্রকাশ যে কিছুদিনের জন্তে কোনো ধোঁটেলে গিয়ে উঠবে তাও সম্ভব নয়। বাসা ছেড়ে দিয়ে আবার বাসা কোণাড় করা যে কী ব্যাপার তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। হুপ্রকাশ তো হাড় হাড় বোকে, দিনকাল যা পড়েছে তাতে এক ঘরনী ছেড়ে আরেক ঘরনী পাওয়া হত মূলভ, একটা ঘর ছেড়ে আরেকটা ঘর পাওয়া ঠিক ততখানি হুল'ভ। তাই ঘরনী হাতের কাছে না থাক, ঘর হাত-ছাড়া করা বুঝবানের কাজ নয়।

সবই ঠিক—সবই মানি। হুপ্রকাশকে দোষও কিছু দিছি না। কিন্তু তবু তো মাং-আজ্ঞার বলে একটা জিনিস আছে। আড়াইটা মাস যখন কেটে গেল তখন পনেরোটা দিন কি আর কাটত না? অহুবিধা যে হ'ত তা অবশ্য কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু তবু তো শুভার মনের দিকটা হুপ্রকাশের একই বিবেচনা করা উচিত ছিল। আর তা ছাড়া লৌকিকতা বলেও একটা জিনিস আছে। মালতী অবশ্য হুপ্রকাশের হুসম্পর্কের বোন। কাজেই তার বিয়েতে শুভার অল্পবিস্তিটাকে লোকে খুব একটা ব্যাপার চোখে দেখবে না। কিন্তু বছর বেড়েক আগে যে ব্যাপারটা

ঘটে গেছে তা থেকে শুভা তো কিছুতেই মালতীর মাথের তার সম্পর্কটাকে ভুল লৌকিকতার গভীর মধ্যে বেঁধে রাখতে পারে না। হুপ্রকাশ কি আর তা জানে না? নিশ্চয়ই জানে। শুভা নিজেই বরং তা ভুলে যেতে পারে, কিন্তু হুপ্রকাশের ভুলে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। হুপ্রকাশের কাছ হ'তেই শুভা শুনেছে মালতী তার মরো-মরো অহুখটার সময় কী সেবাটাই না করেছে! বত না সেবা, তার চেয়ে বেশী উৎসেগ, বেশী বিবাহ, আর অনেক বেশী নীষব চোবের জল। তার সেই কাশা থেকেই হুপ্রকাশ বুকেছিল মালতী কতখানি ভালবাসে তার এই নতুন-বৌদিকিরে। বিয়ে হওয়ার পরের দেড়টি বছর শুভা যখন বাপের বাড়ি আর বতরবাড়ি—এই দুই তাঁরে তার তত্ত্ব-ভর্তীটা নিয়ে ঘন ঘন পায়পায় করছিল তখন বতরবাড়ির যেখানটাতে সে তার মনের নোঙর নামিয়েছিল—সেটা ছিল মালতীর-ই এক্তিয়ারে। মালতী-ই তার নববধূ-স্বীবনের অবগুর্নটাকে নিজের হাতে সরিয়ে দিয়ে তাকে শহজভাবে বাস নেবার সুযোগ করে দিয়েছিল। তার কাছেই শুভা নিজের ঘনটাকে বেলে ধরেছিল। সমবরসী এই নেহে-মুটিং মধ্যে তাই খুব অল্পসময়েই গভীর প্রীতি জন্মে। শুভা যখন মরণাশ্র তখন মালতীর সেই বিশ্বস্তা আর কাশা হুপ্রকাশকে বুঝিয়ে দিয়েছিল তারের প্রীতির শিকড় কত তলচাহী! শুভা ভালো হয়ে উঠলে হুপ্রকাশই তাকে বলেছিল এসব কথা। আর হুপ্রকাশ যেগুলো বলে নাই, শুভা সেগুলো শুনেছিল মালতীর কাছ হ'তে। বড় হুকর করে বলতে পারে মালতী। তাকে রাগাবার জন্তে কতদিন কতরকম করেই না সেগুলো বলেছে। তার কথায় প্রতিবাদ করতে গিয়ে লজ্জা-গরব-মেশানো কী এক অথাক পুলকান্বিতিতে শুভার সাঝাটা মন ভরে উঠত।—বড় ভালো মেয়ে মালতী। ওর বিয়েতে শুভা যেতে পারল না! হুপ্রকাশকে দোষ দিতে সে চায়না, কিন্তু নিজের হুপের দগাটাই বা শুভা ভালো কি করে। এর ওপর মালতীও যদি রাগ করে তাহলে চিঠি লিখতে বেরি করে, তাহ'লে সে-বেচারি নিরুপাধ!

পরের একটা দিক আছে আছে ছিঁড়তে লাগল শুভা।

বেশা বুঝি একটা-দেড়টা হবে। হুপ্রকাশ সেই কখন—সেই শাড়ি নাটার সময়—বাসা হতে বেরিয়ে গেছে। চাহুরিরা হ'তে ভালহৌসি—ট্রামে করে যেতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। হাতে বানিকটা সময় মেয়েই তাই হুপ্রকাশ বেরিয়ে যায়। হুপ্রকাশ চলে যাওয়ার পর হু'একটা যা

ইকিতাকি কাজ ছিল শুভ তা দেখে নিয়েছে। বাচ্চুকে তেল মাখিয়েছে, হান্ন করিয়েছে, কাজল পরিয়েছে, খাটিয়েছে, তার পর গোলনার ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে রেখে নিজেও নেদে-গেয়ে নিয়েছে। হুপ্রকাশ দিয়ে না আসা পর্যন্ত এখন আর করবার কিছু নেই। হুপ্রকাশও কিরবে সেই সন্ধ্যা নাগাদ। মাকের এই সারাটা দিন এক-একা কেমন করে যে শুভা কাটাবে তা তার প্রতিদিনকার সমস্ত। প্রতিদিন এই হুপ্রশ্রদেরায় ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ করে দিবে বিছানার ওপর শুয়ে শুভা আকাশ-পাতাল চিন্তা করে কেমন করে তার সারাটা দিন কাটবে। বাণিলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে সে নির্জনতার চুৎসন্ধান লষ্ট অসুতব করে। মনে হয়, ঘরটার জমট নিঃশব্দতাবেন থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। কে জানে সেটা ঘুমন্ত বাচ্চুর নিশ্বাস, না তার নিজেরই। চাঁৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করে শুভার। কিন্তু তাই না কেমন করে হয়! লোকের কী ভাববে?...বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে শুভা। তারপর অনিচ্ছাসহকারে নতুন-কেনা রেডিওটা ধুলে দেয় খুব উঁচু পর্দায়। ঘরের অস্বস্তি নিঃশব্দতা যদি তাতে কিছু ঢাকা পড়ে তো পড়ুক। বাচ্চুও ঘুমছে অনেকক্ষণ থেকে; রেডিওর শব্দে যদি তার ঘুম ভাঙে তো তাও ভালুক! হাতে বাহোক একটা কাজ পাওয়া যাবে। এমন শূন্য নির্জনতা আর বিরবন্ধির অবসর তার কাছে গুহ্যের হয়ে উঠেছে।

খাম চিড়ে চিঠিখানা বের করতে করতে একটা বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো শুভা। আশ্চর্যের হুপ্রশ্র। তবু বাহোক একরকম কেটে বাবে। মালতীর চিঠিটা হুপ্রশ্রের ভারটাকে অনেকখানি হালকা করে দেবে। তার চিঠিতে তার শব্দরাড়ির খবর পড়ে, তার মনের অবস্থার কথা জেনে, তাকে উত্তরে কি লিখবে সে-সব ভাবতে ভাবতে আশ্চর্যের হুপ্রশ্রটা সে অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারবে।

চিঠিটা ধুলে বসল শুভা। মালতীর হাতের লেখা ভালো। নীল কাগজের ওপর ছোট ছোট অক্ষরে অনেক কথা লিখেছে মালতী। আসে যে-সব চিঠি লিখতো সেগুলো সাদা কাগজেই লেখা। এবারের কাগজগুলো চিঠি-লেখা প্যাডের। বিয়েতে উপহার পেয়েছে নিশ্চয়।

আগোটা একই কম হচ্ছিল বলে সাহনের জানলার পুরু পর্দাটা সরিয়ে দিল শুভা। সরিয়ে দিতেই এককালি আলো আর একরকম বাতাস হেসে লুট্টে পড়ল ঘরের জিতরে। এতক্ষণ যেন গুয়া পর্দার ওপারে থেকে আড়ি পেতে শুভার মনের গুহ্য গোপন কথাগুলো তখন নিশ্চল। এবার

শুভার সাথে মৃণালিনী হতেই দত্তা-পড়ার লক্ষ্যটা যেন ঐরকম হাসির বেগে ডানিয়ে নিয়ে যেতে চাইল।—সেদিন শুভার মাসতুতো ভাই প্রদীপ এখানে বেড়াতে এসে তাদের বাসার এই আলো-হাওয়ারই প্রশংসা করে গেছে খুব।

ঃ বলবার সময় না-হয় বলতে পাও, কলকাতার বাসা করে আছি। কিন্তু সত্যি বলছি দিদি, কলকাতার বাসা যে কাকে বলে সে অভিজ্ঞতা এ বাড়িতে থাকলে তোমার কোনকালেই হবে না, আর হবার দরকারও নেই। নাহে তোমরা কলকাতায় আছ, কিন্তু চারপাশে এই যে সব নারকেল গাছ, শুবুজ ঘাস, ধুলে-মাটির রাস্তা দেখছি—এতে তো বলতে হয় এমনও তোমরা গ্রামেই আছ। কলকাতার মাঝে যদি কোথাও বাসা করতে তাহলে বুদ্ধিতে! তিন-চারতলা বাড়ির নীচের তলায় কিংবা দোতলার স্থানটা সুইচিং পেতে হয়ত। চারপাশে বড় বড় বাড়ি—আলো-পাতাল সে-ঘরে ঢুকবার কোনো লম্বই পাথ না। এতোক দিন মনে হবে আজ বুদ্ধি মেথলা করে আছে। হুয়ের আলো পোকা এসে কোনদিন ঢুকতে পারবে না তোমাদের ঘরে। নানা আকাংক্ষা পথে আসতে আসতে, হাজার জায়গার রোঁজর বেতে বেতে আলো বসন ঘরে এসে পৌঁছবে তখন তা রাস্তা, বিঘ্ন, হুঁচুতুর। আলো যদি বা এভাবে আসে, বাতাস তো কোনরকমেই আসতে পারে না। শুধু একটা শ্যাংক্বেত বাপসমতটা সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখবে ঘরটাকে। সকাল-সন্ধ্যা এই যে স্বচ্ছ দেখতে পাও, রাতে জানলা ধুলে নীল নীল আকাশে তারার বে চোখ-ইসারা বুদ্ধিতে পার, নারকেল গাছের পাতা-কালর হুপিথে এই যে বাতাস এসে ঘরঘর হট্টোপুটি করছে, কলকাতার বাসার এটা সত্যকথা নয়।...

শুভা এখনও কলকাতার দেরূপ দেখে নাই। শুধু প্রদীপের কোনো কথাই সে অবিশ্বাস করল না। তাদের বাসার যে প্রশংসা প্রদীপ করল, তারও বিরুদ্ধে তার বলবার কিছু নেই। কিন্তু প্রদীপ ঘোড়ার উপর ঝাটুয়ার দিবে ডাকিয়েই বাসার প্রশংসা করছে, মনের বস্তির দিকে যে ঘোটেই নজর দেয়নি। প্রদীপ বোধহয় এখন জানেই না শুভার বরষা ঘেরেঘের এখন সঙ্গীর কত দরকার। কত দিক দিয়ে কতজনকে জড়িয়ে ধরবার ইচ্ছে করছে তার শুধু হুপ্রকাশ তার কতখানি অভাব পূরণ করতে পারে তার উপর সেও তো ঘরে থাকে খুবই অক্ষণ। আর আসে ঐ বাচ্চু। মাস পাঁচ-ছয় তার অববিভাঘ ঘটেছে তাহে ঘরে। ঘুমন্ত বাচ্চুর শিক একবার সন্তুষ্টমুখে তাকে শুভা। কতক্ষণ হল ঘুমিয়েছে ছেলেটা। ও যেন খুব তবো

আমাদিকে চিনতে তুমি পারছ, কিন্তু আমরা যে কে তা তুমি স্বপ্ন করতে পারছ না। দাখার বোম্বাডেই শুধু অস্তবকম হল। সবার শেষে দাখা নিজের দিকে আত্মগুপ্তে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে চিনতে পারছ?' আগের আগের মতো এবারও তুমি ঘাড় নেড়ে জানালে, চিনতে পেরেছ। দাখা শুধো, 'বল তো আমি কে?' তখন তুমি কি করলে জানো? অল্প একটু ঘেসে মুখটা খালিশের মতো লুকোখার চেষ্টা করলে। আমরা সবাই মুগ্ধপাশে হেসে উঠলাম। তোমার চেতনা অনেকখানি শুষ্ট হয়ে এসেছে দেখে সবাইই মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। তোমার মা-ও তো তখন এসেছিলেন। বিদ্যানার পাশে তিনিও সেদিন দাঁড়িয়ে ছিলেন। তুমি এখন তাঁকে...

মালতীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই শুভা মশরাত্তে শুধো: 'হাঁ সে, থাকেও সেদিন চিনতে পারিনি?'

: সেই কথা-ই তো বলছি। তুমি এখন তাঁকে চিনতে পারলে না, তখন আমাদের সবাইই ধারণা হল, জান তোমার এখনও কিছুই হয়নি। তা যদি হ'ত তাহলে মাকে নিশ্চই চিনতে পারতে। কিন্তু দাখাকে যখন তুমি চিনতে পারলে তখন আমাদের মতো তোমার মার মনও খুশি হয়ে উঠল। আর, থাকে এখনে চিনতে পারনি বললে লজ্জা পাচ্ছ কেন? থাকে চিনবার কথা তাঁকে যখন এত সহজেই চিনতে পেরেছ তখন তোমার লজ্জা কি? মাউই-বা এতে বাগ করা তো প্রেরণ কথা, খুশি হয়ে উঠেছিলেন দু'ব, তাঁর মৃণ-চোখের ডাংডকী দেখে মুগ্ধ হয়ে আমাদের কিছু বাকী ছিল না।

জান বৌদি, যে ক'দিন তোমার জান আছে আছে ফিরে আসছিল সে-ক'দিন বিকালে হাসপাতাল বেতে আমাদের কী বজাই না লাগত। ডেকুমাইল-মু'মাইল পর ভেঙে আমরা একপল ছেলো-মেয়ে চারটে'র আগে হাসপাতালে গিয়ে হাজির হতাম। তারপর বৌদি-না চারটে'র বঁকা পড়েছে অবনি ঝড়ঝড় করে সবাই মিলে তোমার বিদ্যানার কাছে গিয়ে মারবন্দী হয়ে দাঁড়াইতাম। এতগুলো আত্মীয়-বন্ধনকে একসাথে দেখে তোমার মনে কী হ'ত কে জানে, কিন্তু আমাদের দিকে তোমার চোখের অবাক চাউনি দেখে আমাদের মনগুলো বেদনার ক্রম তনটন করে উঠত। শুভা বৌদি, তোমার এই অশ্রুটা হৃদয়ার জন্তে আমরা যেন সবাই তোমাকে কবী ভালবেসে ফেলেছি।

: তাতে তোমার যদি কিছু কৃতি হয়ে থাকে তাহলে তুমি না-হয় তোমার ভালবাসা কিয়মতে নে।

: লাভ-কৃতির কথা যখন তুললে তখন বলে বাখাই

ভালো, তোমাকে ভালবেসে কৃতি আমাদের কিছু হয়েছে। জান তো, অপাঠে যান পাঠে নিবিছ—আমাদের হয়েছে সেই অপাঠে যান। এমন একজনের গুণের ভালবাসা ভালবাসা সে তুলেও দে ভালবাসার কথাকে মনের কোণে ঠাঁই দেবে না।

: মনের কোণে ঠাঁই দেবে কি না-হবে, সে তুমি জানসি কেমন করে? তুমি কি লোকের মন বুঝতে নিখোঁড়?

: না, তা আর কই নিখোঁড়। নিখোঁড় কি আর তোমাকে ভালবাসতান। তবে কিনা, মনের ভিতর কার কি আছে তা না জানলেও, একজন যখন নিজের অজান্তেই মনের কথা বলে মেলে তখন সেইকু বুঝবার কনভা ভগবান লক্ষলক্ষার খাতির নে দিয়ে পারবেন কই?

: দাখা বাপু তোমার বৌদি। কী বলছি খোলাসা করে বল। আমি আমার কখন বললাম, তোমাকে আমার ভালো লাগে না।

মালতী সোজাশুভ্রি এ কথাও জবাব না দিয়ে অস্ত্র মূরে বলল: জান বৌদি, তোমার জান কোয়ার দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনে কী কাণ্ডবানা ঘটেছিল।

শুভা মুখে কোনো কথা না বললেও, তার চোখের ডাংবে শুষ্টই প্রকাশ পেল, সে তার অর্ধচেতন মনের আচার-আচরণগুলো সোনবার জন্তে বাগ হয়ে উঠেছে।

: সেদিন তুমি অল্পস্বল্প কথা বলতে পারছ। কিন্তু স্বপ্ন তখন তেমন জোরালো হয়নি। চুপ করে মূরের কাছে ব'লে কান বাড়া করে একমনে তখন আর তোমার ঠোঁটের নাড়াচাড়া দেখে অনুমান করে নিতে চাচ্ছি তুমি কি বলছ। ঐরকম অশ্রুধরে তুমি ব্যবকবেক ডাকলে—'এই—সোন।' ডাকছিলে তুমি দাখাকে। দাখা তোমার মূরের কাছে সরে এসে শুধো, 'কী বলছ?' অনেককণ থেকে তুমি বললে, 'নিশে বাবে ব'ল।' আমরা সবাই উৎকণ হয়ে শুনিছি তুমি কি বলতে চাও। দাখা আমার শুধো, 'কোথার?' এবারও তুমি অনেককণ চুপ করে থাকলে। উপরের কড়ি-বগাভালোর দিকে একস্টে তাকিয়ে থেকে আশান মনেই বলে উঠলে—'গাড়ী...কলকাতা...'. কত কি সব ছবি, কত কি কল্পনা, কত কৃতির ইকরা তখন তোমার মনে আনাগোনা করছিল। তুমি নিজেই সে-সব জান না।—এতগুলো মোকের শাক্যতে তোমাদের গোপন দাপত্যান্যাসের ইকরা-ইকরা কথা তোমার অর্ধচেতন মন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে দাখা একটু বিস্ত্র বোধ করল।...

শুভাকে ঠাঁই করবার জন্তে মালতী তখন আরবেগে

মাথের বলতে থাকে : কত লমি-রবিবারের গভীর রাতে দালাব গলা জড়িয়ে ঘরে আবদারের স্বরে বলতে—‘চল-না গে: আমার কলকাতা নিয়ে। যেমন-তেমন একটা বাসা দি আর পাওরা হবে না? মন দিয়ে খুঁজলে...’ অভিমানে দোহাটির কথা নাক দিয়ে বেগুতে লাগল।—‘তুমি এক চট্টরে নিয়ে মালতী চানতে থাকে।—’ অভিমাত্রিকীর মনে রাখতে দালাবের কথা দিতে হল যে তাই হবে। কিন্তু এত সহজে যে হয় না, তা হুগলেরই জানা আছে।

জান বৌদি, জু কলকাতা যাওয়ার কথা হাস করে দিয়েই ছুঁমি কান্ড হুগনি। দালাব তেমনি করে আবার কাছে বেরে বললে, ‘দেবে না সেই...?’ দালা ভাবলো, ‘এই যে, আমার হুগি কি একটা বলে বসে।’ তবু তোমার জিজ্ঞাসাটাকে তো আর দাম-চাপা দেওয়া যায় না। তাই তাৎপর্যে, ‘কী দেব তোমাকে? কী নেবে?’ ছুঁমি বললে, ‘স্যা—ও—ল।’

তোমার জবাব শুনে দালা আমাদের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে তোমার রোগশীর্ণ মুখের সমস্তটা ডানহাতের আবেগ-কম্পিত আঙ্গুলগুলো দিয়ে স্পর্শ করতে করতে হাসিকান্না-মেশানো বিহ্বল স্বরে বলল, ‘দেবো দেবো, সব দেবো তোমাকে। এখন একই ছুঁল করে ঘুমোও গেলি!’

সত্যি, সে-সময় ছুঁমি শোনার-হরিণ চাইলে দালা তা এনে দিতে আশপাত করতে পারত, সে-সময় ছুঁমি চাইলে কিনা একছোড়া ভাঙল। তোমার প্রতি অহুঙ্কারের ফেঁদে, প্রেম দালা বঁটার বেগের মতো ভেঙে পড়ল বেন।

আর কি জান বৌদি, হাসপাতালে তোমাদের এরকম হাসপাতালাপে আমাদের কারও অস্তিত্ব বোধ হত না। আমাদের ছোটদের কথা নয়-হয় ছেড়েই দাও, বাড়ির অজান্তে যে-সব বয়সেরা যেত তারাও ভেঙে কিছু মনে করত না। হাসপাতালটাকে আমরা সবাই সংসারের বাইরে মনে করতাম। ওটা বেন তোমাদের বাসরঘরের মতো হয়ে ঝাঁড়িয়েছিল। আমাদের সবাইই মনে ছিল, এখন বখন তোমার নানারকম বোধগুলো নষ্টন করে একে একে জেসে উঠছে, তখন বাইরে থেকে কোনরকম বাধার সৃষ্টি করে সেগুলোকে ব্যাহত করা ঠিক হবে না। লক্ষ্যবোধ বখন তোমার মধ্যে আবার ফিরে আসবে তখন যে ছুঁমি আর এরকম করবে না তাতে আমাদের কারও সন্দেহ ছিল না। হাসপাতাল হতে বখন ছুঁমি ঘরে কিভাবে তখন নববধূর লক্ষ্মানব্রতা নিজেই কিভাবে, ওটা আমরা সবাই জানতাম।...

মালতীর চিঠিখানা পড়তে পড়তে শুভার সেইসব

পুরোনো কথাগুলো স্মৃতিভাবে মনে পড়তে লাগল। রোগ-শীর্ণ তার মুখের ওপর স্বামীর আবেগকম্পিত হাতের সাদা স্পর্শ টুকু মনে মনে করনা করে লক্ষ্য-স্বর-মেশানো কী এক অব্যক্ত পুলকাহুতিতে শুভার সারাটা মন ভরে উঠল। চিঠির ঐ অংশটা পড়ে সে তাই আশনার অজোড়ই কুহিন রাগ-মেশানো হাসির স্বরে বলে উঠল—‘ওমা, রাহুদী দে-কথাটাও চিঠিতে লিখেছে!’

মালতীর কৌতুকপূর্ণ ইঙ্গিতটার কথা ভাবতে ভাবতে শুভার মূখানা হান হয়ে এল। সে যা চেয়েছিল তা কি পেয়েছে? বোধহয় পেয়েছে। কিন্তু এমনটা যদি সে চেয়ে থাকে তবে সে ভুল করে চেয়েছিল, জানত না বলে চেয়েছিল। এখন নির্জন নিঃশব্দ নিঃশব্দ জীবন তার বয়সী ঘরে সজ্জনে কখনও চেয়ে নিতে পারে না।

একটা কক্ষপাশ দশকে প্রলম্বিত হয়ে বেরিয়ে এল শুভার নাক দিয়ে।

সেদিন দুপুরটা মালতীর চিঠি পড়ে আর অতীত স্মৃতি রোমন্থন করেই কেটে গেল শুভার। জবাবে কী লিখবে তাও আবছাভাবে ঠিক করে রাখল। মাঝে হু’একদিন বাপ দিয়ে আরেকটা প্রপূরে কাগজ-কলম নিয়ে বসল শুভা মালতীর চিঠির শুভাব লিখতে।

বেশ বড় চিঠি লিখল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের জীবনের ধূসর নুহুঙলোর কথা জানাল মালতীকে। একাকীঘরে যে শুভার তার মনের বেগন-বাহিনীকে রক্ত করে রেখেছিল, আর লিপিলেখার অবসরে তা রক্তপ্রবাহের মতো বেরিয়ে আসতে লাগল তার কলমের মূর্খ দিয়ে।

দশমানে লিখল : ‘এখন ভূট জিজ্ঞেস করতে পারিস, এত কষ্টের মধ্যে এখনও এখানে পড়ে আছি কেন? জবাবে যদি সত্যিকথা বলতে হয় তো বলি, পড়ে আছি শুধু ভোর দাগার মূর্খ জেয়ে। সে-যেটার তো পুত্র-পরিবার নিয়ে নীড়-বাঁধার স্বপ্ন আছে। দৈবের ইচ্ছায় অনেকের মতো জীবিকার জন্তে তাকেও ঘরদোর ছেড়ে এই বিশেষে আসতে হয়েছে। বিয়ের পর যে সেবুচব্বর গাঁদের ঘরে ছিলাম তখন সস্তা-সস্তা-সস্তা-ওকে আনাগোনা করতে গিয়ে মনটা বড় কলম হয়ে উঠত। তাই এখন আমার গায়ে ফিরে যেতে মন সরে না। আমি গায়ে থাকলে জীবিকা আর জীবন-দানসী—এই দু’তাল সামলাতে বেচোয়ার প্রশস্ত ঘটবে। ওর মুখ চেয়ে তাই এখানেই পড়ে থাকব।

বড় ঘরের মধ্যে সারাটা দিন একা থাকতে আমার যে কী কষ্ট হয় তা কি ও জানে না! আমার বাপার হুবিধে করে দিতে কত-কি যে ও করতে চায় তা কি বলব। এই তো

— রিকমার গান —

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৬৪

এরপর মল্লী খুঁজেছে। বাঙালীর ছেলে, রিকশা চালায়, ভয় বলেই মনে হয়, হয়তো একটু-আধটু শিক্ষিতও; 'dignity of labour' বাক্যটা ইচ্ছা করেই ব্যবহার করেছিল মল্লী, যাচাই করবার জন্য, উত্তর পেল—“তিনি কখনও কখনও”; সব নিলিয়ে একটা কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক; তার ওপর যে অস্বাভাবিক ব্যাপারটুকু হয়ে গেল—ভেলেটি তাতে যে দূততার সঙ্গে আত্মমর্দীনার পরিচয় দিল তাতে একটা শ্রদ্ধা অমূল্য। নিমিত্ত অমূল্য আসে; মল্লী খুঁজেছিল।

কিন্তু খোঁজা মানে তো যে রিকশাগুলার ওপর নজর পড়ে, একটু ভালো করে চোখ বুজিয়ে নেওয়া। দিনের বেলায় তড়িতের রিকশা বেরোয় না। রাত্রে অত নজরে রাখাও শক্ত। রাত্রে নিয়মিতভাবে বেরুবার মধ্যেও পড়ে শুধু সপ্তাহে তিনদিন করে গান লিখতে যাওয়া আর আসা। মল্লী যতটা পারে তাতে দৃষ্টি সতর্ক, কিন্তু ফল হয় না। তারপর ক্রমে ক্রমে কোঁকটোও গেল কেটে। একটা নিছক কৌতূহলই বৈ ত নয়। সামান্য একটু যে অহুতাপ তাই বা কতদিন থাকে বাস্তবের?

গোড়ায় গোড়ায় কয়েকদিন মাস্টারমশাইয়ের কক্ষ থেকে বেরিয়ে মনটা যেন অহেতুক প্রত্যাশায় হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠেছে—দু’দিন যে রিকশাটা পাওয়া গিয়েছিল, আবার হয়তো পাওয়া যেতেও পারে; তারপর সে-ভাবটাও গেল মিটে। আর একটা কথাও তো চিন্তার মধ্যে এসে পড়ে,—ধরা যাক, যেতে যেতে হঠাৎ পড়ে গেল চোখে;

ডাক দেওয়া যাবেনা তো। সমস্ত ব্যাপারটুকু আস্তে আস্তে মন থেকে মিলিয়ে গেল।

মাসতিনেক বেরিয়ে গেল।

তবু পড়তে পারত নজরে; কিন্তু মল্লী যেন খুঁজেছে, তড়িৎ ওদিকে তেননি সাবধানে পরিহার করে গেছে। মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির ও পথটা ছেড়েই দিয়েছে একরকম। যদি বা গেল, ঐখানটায় গিয়ে উল্টদিকে খুব ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি প্যাডেল করে বেরিয়ে গেছে। সহরের অস্থানিক মল্লীদের বাড়ির রাস্তায় একেবারেই যায় না।

যে ব্যাপারটুকু হয়ে গেল তার একটু ধাক্কা লেগেছেই মনে। একটা হালকা আশঙ্কাও যে লেগে রয়েছে এটা না মেনে উপায় নেই। এদিকে কাজটা করে করে একটা বেপরোয়া ভাবও এসে গেছে; একটা অস্থির আত্মবিশ্বাস। মেহনতের হলেও অল্পসময়ের কাজ, আত্ম-পেশীগুলো দৃঢ় হয়ে উঠেছে; স্বাধীন উপলব্ধিকা, তার সঙ্গে স্বাস্থ্যের আনন্দ, তবু একটা কুঠা কোথায় যেন লেগেই থাকে, মনে হয় বাঙালী মহলে এই সত্যটুকু নিয়ে দাঁড়াতে না হলেই যেন ভালো। ওর আর একটা ভয়, বাঙালী মহলে জানাজানি হয়ে গেলে কি করে যেন কথাটা মানপুরে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অবশ্য মল্লীকে সেদিন যতটা খুল তাকে হালকা মেয়ে বলে মনে হয় না; কথাও তো দিল একরকম; তবু ভয় হয় কে জানে, মেয়েই তো, ভেতরে কতটা হুঁসল, কতটা লঘু কে তার খবর রাখে? হয়তো সহরে চারিয়েই পাড়েছে খবরটা বাঙালী মহলে—হয়তো বা এই আকারেই যে একটি বাঙালী

বুক পশ্চিমা সঙ্গে রিকশা চালিয়ে বেড়াচ্ছে—
প্রবক্তা করে; মুখে মুখে আরও কী ভাবে শাণা-
পন্নবিত হয়েছেন খবরটা কে জানে?

সব মিলিয়ে রিকশাটা যেন ধীরে ধীরে গোণও
হয়ে এসেছে ও-জীবনে। অন্ততঃ আর একটা ক্ষেত্রে
ওর মনটা বিন-দিনই কৌতূহল-আনন্দে প্রসারিত
হয়ে উঠছে। অখিলের বাড়ি নিয়ে, বিশেষ করে
পড়াশোনার দিকটা। এটাকে অবলম্বন করে ওর
ব্রাতি জীবনযাত্রার একটা বেশ বড় গোছের
পরিবর্তন এসে গেছে।

অখিলের বাড়িটা ছোটখাট পরিবারের পক্ষে
ঘণ্টেই হলেও একটা অস্ত্রাব অনেকদিন থেকেই
অনুভব করছে সবাই; একটা বৈঠকখানা। যখন
বাড়িতে হাত দেওয়া হয়, তখন বেশ হিসাব করে
খরচপত্র করতে হচ্ছে, প্রয়োজন মেটে এই গোছের
একটা বাড়ি ভুলে ফেলতে হয়েছিল, কাঁচা উঠান,
ইটের দেয়াল, খোলায় ছাউনি। তারপর আস্তে আস্তে
পাকা উঠান হয়েছে, রান্নাঘর আর কীড়ার ছেড়ে
বাকি ঘরগুলার খোলায় চাল সরিয়ে ছাতও দেওয়া
হয়েছে। ওরই মধ্যে একটা ঘর ভেতর-বার
দুটিকেই ব্যবহার হয়। এইতেই ছেলে-মেয়েরা
পড়ে, কেউ এল-গেল, বসে। চলে যাচ্ছিল
একরকম।

এরপর কারবার বেড়েছে, নানারকম লোকের
যাতায়াত হচ্ছে, একটা আলাদা বৈঠকখানার
প্রয়োজন অনুভব করছে সবাই। এখন টাকার
সেরকম অনটন নেই, তবে কাজের চাপেই সময় করে
উঠতে পারছিল না অখিল, সম্প্রতি হাত লাগিয়েছে।
খানিকটা উঠেছে ঘরটা।

এইসময় একদিন একটা ব্যাপার হোল।
বর্ষাকাল, পাহাড়ের দেশের বর্ষা আরও অনিশ্চিত,
আকাশ ভালো দেখেই বেরিয়েছিল তড়িৎ, ফিরে
এল প্রবল বর্ষণ মাথায় করে। রিকশা-সুড় সোজা
বাড়িতেই এসে উঠেছিল, মাথা গা হাত না মোছা
হলে সরোজিনী একেবারে রান্নাঘরে ডেকে নিল।

ব্রতি পড়লেই এখানে ঠাণ্ডা, ভিজছেও খুব, উম্মনের
সামনে একটা ছোট টুল দিয়ে বলল—“বোস।”

উম্মনে চায়ের কেটলি চড়িয়ে দিয়েছে। ব্রতি
চা আর চিনির কোটা এনে সামনে রেখে দিয়ে
চোকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কথা নেই কাকুর
মুখে, সরোজিনীর মুখটা বেশ গভীর।

কতকটা নিশ্চকতার অবস্থিটুকু কাটাবার জন্তেই
তড়িৎ বলল—“খুব ভিজে গেছি আজ।...ঠাণ্ডা
ব্রতিটা নামল কিনা?...খানবেও যে কখন...”

ব্রতি প্রশ্ন করল—“বাসায় যাবেন?”

কণ্ঠস্থের একটু ব্যঙ্গ আছে।

সরোজিনী কেটলি নামিয়ে চা ছেড়ে নিল।
ভাবটায় বোধ হচ্ছে যেন কান পেতে রয়েছে উত্তরটা
কি হয়।

তড়িৎ বলল—“যেতে হবে না?”

সরোজিনী ঘুরে বলল; বলল—“না, যাওয়ার
তো কথাই আসে না এই তুর্ধোগ মাথায় কবে,
তোমার এ-আনাড়ের কাজও ছাড়তে হবে, ঠাকুরপো।
কাজ বলব কি আনাড়ের লব বলব তাও তো
বুঝতে পারছিনে, অন্য উপায় থাকতেও যেমন
কামড়ে পড়ে আছে।...কিন্তু ধরো যদি অহুখেই
পড়ে গেলে, বিদেশ বিহুই, কেউ আত্মীয়-স্বজন
কাছে নেই...”

“এর চেয়ে আত্মীয়-স্বজন আর কোথায় পাব?”
—একটা কথা বলতে পেয়ে যেন বাঁচল তড়িৎ।
সমস্ত ব্যাপারটুকু হালকাও করে দেওয়ার জন্য জুড়ে
দিল—“কটা আত্মীয়-স্বজন ডেকে একেবারে তৈরী
ঠাই দেয়?”

সরোজিনী চা হাঁকতে-হাঁকতে বলল—“তা বেশ
তো, এমন আত্মীয়-স্বজনের কথাও তো শোনা
উচিত; ছেড়ে দাও একাছা।”

“আপনি বললেন—যদি অহুখে পড়ি তো
দেখবে কে...”

“তাই অহুখে না পড়লে চলবে না?”—চাঁট
হাতে তুলে দিতে দিতে বলল সরোজিনী। ব্রতি

টিপ্তনী করল—“বাঃ, কত আখীয়, পরীক্ষা করতে হবে না ভালো করে ?”

চারে চুপক দিয়ে ওর দিকে চোখ তুলে চেয়ে হাসল তড়িৎ।

অখিল এসে উপস্থিত হোল। কারখানায় ছিল, দেখান থেকেই তড়িৎতকে এদিকে রিকশা নিয়ে আসতে দেখেছে; একটা কাজে আটকে ছিল। এসেই উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করল—“খুব ভিজে গেছে নিশ্চয় ?”

সরোজিনী বলল—“বেশি আর কৈ ? এখনও শখ নেটেনি, বাসায় যাবেন বলছেন।”

“সে কি !”—বলে একরকম শিউরে উঠল অখিল; বলল—“বাওয়ার তো কথাই ওঠে না এ-রাত্রি,—প্রায় পোটাক পথ—আনি আর একটা কথা ঠিক করে ফেলেছি তড়িৎ, তোমায় ও বাসাও ছাড়তে হবে।”

“ও-বাসা ছেড়ে... ?” প্রশ্নটা অর্ধেক পথে ছেড়ে দিল তড়িৎ।

অখিল বলল—“এ-বাসায় আসা। অবশ্য এও জানি তুনি তাতে রাজী হবে না, হলে রিকশা ছেড়ে টুইশনি নিতে রাজী হতে। তবে আনি তার ব্যবস্থাও ঠিক করে ফেলেছি। আমার বেশ একটু আয়ও বাড়বে মাঝখান থেকে।”

তড়িৎ মুখ তুলে চাইল।

“বাইরের ঘরটা তুলছি তো। ওর সঙ্গে আরও দুখানা ছোট ছোট ঘর জুড়ে—কাঁড়ার আর রান্নাঘর—চারিদিকে একটা দেয়াল টেনে আলাদা বাসাই করে দিচ্ছি তোমায়। এসে থাকো, ভাড়া দাও। আর আপত্তি থাকতে পারে না।...না, আর ছাতটাও পেটাব না এখন। ভাড়া বেশি পড়ে যাবে...”

সরোজিনীকে মাশী মানল—“কি গো ?”

সরোজিনী মাথা নীচু করে শুনছিল, একটু মুখ টিপে হেসে বলল—“তা বইকি ; এমন কি আখীয় যে ছাড়বে আসরা ?”

আখরমশটা অনেকদিন চালিয়েছিল তড়িৎ। তারপর বড় ঘরটা শেষ হয়ে যখন কাঁড়ার-রান্নাঘরের বন্দে খোঁড়া হবে, অখিলকে বলল—“বাঃ, আর কত লক্ষ্য দেবেন ছোট ভাইকে ?”

এসে উঠল ঘরটাতে।

ঐ পর্য্যন্তই অবস্থা : আর সব ব্যবস্থা নিজেই। সব ব্যবস্থা। বলতে প্রধানত আহ্বারের ব্যবস্থা ; সেটা আগের মতো কুকারেই চলছে। ঘরটা বড়, ক্যাবিনের পার্টিশন দিয়ে হাত-তিনেক চওড়া একটা ফালি আলাদা করে দেওয়া হয়েছে, তাইতেই কাঁড়ার, তাইতেই কুকারটা পাকশালার কাজও করে যায় আপন মনে। ওদিকটা তড়িৎয়ের চৌকি পাতা, একটা টেবিল, দেওয়াল কার্টের শেলফে বই, একটা লোহার চেয়ার।...ঘরটি বাড়ি থেকে কি ভেবে একটু আলাদা করেছে কেঁদেছিল অখিল, হাত চারেকের একটা বারান্দা দিয়ে মূল বাড়ির সঙ্গে যোগ করা ; এতেও পার্থক্যের ভাবটা বজায় রয়ে গেছে।

মিটে আসতে লাগল পার্থক্যটুকু। জোর করে আপন হয়ে যেমন ঘাড়ে পড়া যায় না, তেমনি আবার সহজে আপন হয়ে গিয়ে তো মূরে পড়ে থাকো কঠিন। একদিন ও বাড়ির বাইরের ঘর থেকে ছেলেমেয়েদের পড়ার চৌকিটা এ-ঘরের এক পাশে এসে উঠল, টেবিলের পাশে বিমলের পড়বার চেয়ারটা, তড়িৎয়ের শেলফের পাশে, বিমলের বইয়ের শেলফটা এসে হাজির হোল। পড়ার হাঙ্গামটা মিটে গিয়ে ও ঘরটা খাটি বৈঠকখানা হয়ে রইল।

অখিল বলল—“এষে উন্ট উৎপত্তি হোল, তড়িৎ। দেখানে যেটুকু সময় পাচ্ছিলে তবু নিজেই করে পাচ্ছিলে।”

যেটা অসুভব করছে অন্তর দিয়ে সেটা বলতে পারল না তড়িৎ—একটু সময় দিয়ে যদি এতগুলিকে নিজের করে পাওয়া যায় তো নিতে হয় না ?...মুখ কৃটে কিন্তু বলা যায় না ; বলল—“সময় তো

নিজেরই রইল, অখিলদা; ও আর কে কেড়ে নেবে?”

অখিল ওর কোন কাজেই বাধা দেয় না, হেসে বলল—“বেশ, যেমন বোকে।”

আর রবিবারে-রবিবারে নয়, বিমলকে পড়ানোটা নিয়মিত হয়ে গেল। সকালে ছাত্র-মাস্টারটি এলে ওরা বারান্দায় বেরিয়ে যায়। তড়িং কুকারে রায়। চাপিয়ে ভেতরে নিজের বই নিয়ে বসে। সে চলে গেলে, বিমল ভেতরে এসে তার চেয়ারটিতে বসে যায়। বাকি সব ছুটি পেয়ে চলে যায় বাড়ি।

বাড়িতে সে-কথাটা সবাই অল্পভব করছিল, সরোজিনী একদিন সে-কথাটা প্রকাশ করেই বলল, হয়তো অখিলের নির্দেশেই—“ঠাকুরপো, আমার সাতখুন মাপ, যা মনে হচ্ছে বলি ভাই, তারপর তোমার যেমন অভিরূচি। অবিশ্তি আগেও বলা হয়েছে...”

তড়িং হেসে বলল—“বলুন।”

“আর হাত পুড়িয়ে এরকম ভাবে কতদিন যাবে? চোখের আড়াল হচ্ছিল, সেখতে হচ্ছিল না, সে একরকম ছিল...”

তড়িং হেসেই বলল—“হাত যদি পোড়, সে তো রক্তির হাত, বৌদি...”

“রত্নিই বা সবটুকু করতে পায় কোথায় সব দিন? গিয়ে নেখে নিজেই চাপিয়ে দিয়েছে কখন, না হয় নিজেই নামিয়ে নিয়ে বসে গেছে খেতে।... যাক সে কথা, এটা তো অস্বীকার করতে পারো না যে, বিমলের ভারটা নিজের কাঁধেই নিয়েছে একরকম তুলে...”

“মস্তবড় একটা ভার!”—বলে একটু চুপ করে রইল তড়িং, তারপর আবার বলল—“তাও কোথায়? মাস্টার তো এসে পড়াচ্ছেই বৈকি।”

“কার পড়ানোটা আসল তা কি আমরা বুঝি না ঠাকুরপো? বিমলও বলে। তাই বলছিলেন যখন নিয়েছে তার তখন পুরোপুরিই নাও না কেন?”

নিকটর বেখে বলল—“তোমার আপত্তিটা কোথায় বোধ হয় আন্দাজ করতে পারি—বসন্তের চাকরিটা যাবে, ছেলে পড়িয়ে নিজের পড়া চালাচ্ছে বোচারি। কিন্তু তা কেন? ও যেমন কবি আর অলককে পড়াচ্ছে তেমননিই পড়াবে—বই বাড়ছে এদের, বেশি সময় দরকারও তো, বিমল পুরোপুরি তোমার হাতে থাকুক।”

“একটা আপত্তি না হয় ঐ করে নিটল, কিন্তু আরও তো থাকতে পারে, বৌদি।”

“কি, বলো।”

একটু লজ্জিতভাবে চোখ তুলে হাসল তড়িং; বলল—“পুরো ভার নেওয়া মানে টিউটারি সম্বন্ধে এনে ফেলা তো? পড়াব, তার বদলে খেতে পাব, থাকতে পাব। আমি কিন্তু সে-সম্বন্ধ নিয়ে এ-বাড়িতে আসিনি, বৌদি। তার পর, যা পেয়েছি তাতে ও লাভের সম্বন্ধে লোভ নেই আমার। যেমন আহি থাকতে দিন না আনার।”

আবার একটু হাসল।

হুজনেট একটু চুপ করে রইল। ঠিক হাসি নয়, একটি নিবিড় তৃপ্তি সরোজিনীর সুবখানি আলো করে দিয়েছে, এক সময় ঘাড়টা একদিকে একটু হেলিয়ে নিয়ে বলল—“কী এমন রাজ্যপাট পেয়েছ ভাই, দাদা-বৌদির হাতে?.. বেশ, যেমন পছন্দ সেইভাবেই থাকে। আপন ভাবো বলেই বেখে কষ্ট হয়—কুকারে খাওয়া, এক কোণে রয়েছে বলে ঘরের ভাড়া দেওয়া...”

“না বৌদি, ঘর-ভাড়া আমি আর দিতে পারব না, অখিলদাকে ভুমি বলে দিও...”

—ওর কথায় বাধা দিয়ে এমনভাবে চমকে উঠে কথাটা বলল তড়িং, আপত্তিটাও ওর মুখে এমন অদ্ভুত ধরনের যে, সরোজিনী একটু বিস্মিত ভাবে চেয়েই খিলখিল করে হেসে উঠল, ওর প্রশ্নটাও একটু গোলমালে হয়ে গেল—“ওনা, কেন?”

সামলে নিতে থাকিল, তার আগেই তড়িং

সেইরকম বিপর ভাবেই বলল—“না, বৌদি, একে তো দিতে আমার হাত কাঁপছিলই, তার উপর উনি মুখটা এমন করণ করে—একটু হেসে হাতটা বাড়িয়ে ধরলেন যেন—যেন...না বৌদি, ভাড়া আমি দিতে পারব না এ-মাস থেকে !...”

এরপর কবে কি করে রায়ার কুকারটা সম্পূর্ণ রতির এলাকায় চলে গেল, তারপর সেখান থেকেও কোথায় অদৃশ হয়ে গেল তার আর কোন হিসাব রাখা হয়নি।

বর্ধায় রিকশার কামাইও হয় মাঝে মাঝে। এইরকম দিনে শুধু যে বাইরের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল হয় তাই নয়, বাড়ির সঙ্গে যোগাটা হয় আরও নিবিড়। এবার বর্ধাটা পড়েছেও বেশি করে। একবার যদি

আরম্ভ হোল তো আর খামডেই চায় না ; চারদিন, পাঁচদিন, সাতদিন—চলেছে তো চলেছেই। দিনের বেলায় যদি-বা একটু ধরন হোল, সন্ধ্যা থেকে তো আর বিরাম নেই।

সবই বেশি ক্রমে বসে, তড়িতের ঘরে, কি বাইরের ঘরে, গল্পগল্প হয়, ক্যারাম খেলা চলে। চা-পানের সমস্তা শীতল হাওয়াও রান্নাঘরেই ক্রমে ভালো। তড়িং অস্থযোগ করে—“রিকশাটি বের করতে যাব, অমনি যেন টনক নড়ে আকাশে, একে খুন্সি বলব না বৌদি ?...মুখ টিপে টিপে হাসছে যে ?”

রতি ছোট্ট করে বলে—“আমি আকাশেরই দিকে। অমনি তো ছাড়বে না বদ অব্যোমটা...”

[ক্রমশ :]

ধূতরাষ্ট্র

শক্তিপন রাজগুরু

—“সাম্ভাষি, সাম্ভাষি ! হোই...ই ই !”

বন্দন ঘুরছে মাথার উপরে ঠোকা এক বোঝাই খুরশো : লক্ষণ নাহুস-হুস দেখ নিয়ে কোলাব্যাঙের মতো খুশ খুশ করে লাফাচ্ছে আর হুকার ছাড়াচ্ছে। মাঠের মাঝে এক দক্ষতর হুক করেছে।

ভগ্নাণ থেকে পথো বেনে ধমক দেয়—“খানো বগছি, কাফা—এগিয়ে এলেই ঠাণ্ডা করে দোব—”

খুরশোমান তিনহাত খুরশোটাকে একটু বামিয়ে জ্ঞানদেয় লক্ষণ বুড়ো—“মাইরি আর কি ! অঘোর জনিতোই জোরদগল করে চারাপান পুঁততে আসবে, মাগ্না ছেড়ে দোব ? লাগব আইচো হে—”

পথো হকুম দেয়—“ধরে ঠাঁধ বুড়োকে।”

বলামাত্র ক'জন মুনিস-মাহিন্দার এর্গিরে যার ওর দিকে, একধাক্কা পগারের মাথা থেকে চিটকে পড়ল লক্ষণ—খুরশোটা ওরা কেড়ে নিল।

হাঁটুভোর পামনা-মেওরা ধানজমির পচা কাঁদার ঠেসে দরছে ওক, পিঠে কাঁধে অহুতব করে কয়েকটা কিশ-চড়ের ঝাঝ।

কাঁপছে লক্ষণ ; বুড়ো অর-আসা ডালুকের মতো কাঁপছে সে। সমস্ত নিষ্কল রাগ আক্রোশ হঠাৎ নুকফাটা কান্নার ঝরে পড়ে। চারিখিকে পদ্যের লোকজন—পদ্যের অবস্থা সঙ্কল, বাহবলের অভাব নেই ; সে এক। ঠাঁধছে ওরা লক্ষণকে।

—“পিছনোড়া করে ঠাঁধ। বজ্ঞ বেড়েছে, যত বাতির করি তত মাথার চেপেছে !”

কাঁপছে লক্ষণ—কাঁদার গা-মাথা ভর্তি হয়ে গেছে, কাপড়খানার রংও চেনা যায় না, নাক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। বুড়ো ডালুকের মতো আলের উপর সেই অবস্থার বসে কাঁদছে লক্ষণ।

—“আমাকে মারলি। ঠাঁধে মারলি, লদা ? ধর্মে মইবে তোর ? কোলেপিঠে করে মাছব করতেছি যে বে। ওরে বাবা—হেই ধরম, ছুঁমি দেখো—”

ঠাঁধে ঠাঁধে করে কপাল চাপড়তে থাকে। হাতের খুরশোটা ওরা কেড়ে নিয়েছে। বাহবল ছিনিয়ে নিয়েছে তার।

একপুরুষ আগেই বেনেদের জমজমাট অবস্থা ছিল

চালু কাবরায়—অমলম পসার ; চকমেলানো ঘাঁঠ, তেমনি মত মত দিখা । ভিন্ন হবার আগেই মা-লক্ষীর আসন টলে ছিল । অধি-জ্ঞাতা দীর্ঘ-পুঙ্খ বিক্রমপুরে গেল অনেক, কারবারেও ভীটা পড়েছে । ভাইদের মধ্যে লক্ষণ সবথেকে ছোট, সেও সেই ফলাও অবস্থার কিছু বোধেছিল—মহা ধান্যের লক্ষীপুঙ্খের সব হাজার জাত-ভোজন হতো ; পালে-পার্বণেও তেমনি মুখধান—ওর সেই বিশাল ঘুরপো-টাকে করানো হয়েছিল ভোজ-বাজ উপলক্ষে । অতীতের সজ্জির বিনভানোরও নীরব শাকী । লক্ষণের ভাগে পড়েছিল ভীটা । এতবড় ভোজ আর হরনি—এত সমারোহ স্বপ্নের স্বভাৱ আর তাগের নেই ; শরিকান সম্পত্তি টুকরো টুকরো হয়ে উল্লস গেছে । লক্ষণ অকস্মাৎ আবিষ্কার করে ওই ঘুরপোই তার পরম অস্ত্র । সেই থেকে পরগণামের কুঁঠাবের মতো গ্রাছই বের করে ওখানাকে দ্বারে অদ্বারে । এতকাল ওই বৃহৎ ঘুরপো দেখিয়ে কাজ সেরে এসেছে । আজ ভাইপোরা সেই জমিও নিয়েছে ছিনিয়ে, নিল শৈতক সম্পত্তি ওই ঘুরপোটাও । নিফল আকোশে ঝাঁপেছে বুড়ো । হুঁশিরে হুঁশিরে ছোট ছেলের মতো কাঁদছে ।

লক্ষণের চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের দিন-গুলো । বিধবসম্পত্তির অধিকাংশই গেছে বহাজনের ঘরে ; বাকী সম্পত্তি ভাগ করে পুঙ্খ হয়ে গেছে তারা । দাংরা গত্যু হতেছে । এই অভাব-অভিযোগ—লোকলক্ষ্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে তারা । চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে । ঘেনের ছেলে লক্ষণ পুত্র টাটে বসেছে শতখানেক টাকা মালগর চাল-ডাল ভেল-হুন খোল ইত্যাদি ডালার মালগর সাজিয়ে নিয়ে ।

হু-চান্দজন খন্ডেরপত্রও আসে, তবে বোটা খন্ডেরদা সব ভেগেছে । কাজও বা বাকী পড়ে আছে । কারবার গুটানোর সঙ্গে সঙ্গেই সে বাকী পাওনাও ডামাদি হয়ে গেছে । ভিড় করে বাউরী-বরদা কেসে-তীতীয়াই : “এক পয়সার ভাষা, এক পয়সার হুন দাওনা গো—”

লক্ষণ ঠাড়ি ধরে ওজন করতে করতে বলে ওঠে, “দেখ শিকিন বাপু, ঠিক হচ্ছে কিনা ?—থাক, থাক, হুঁধোখন ! যা আমার কুললক্ষী !”

গ্রামের বিবেচ্যে লক্ষণ বুড়োকে হুঁধোখনের পাট বেগুয়া হয়েচে, তারই বিহার্শেণ দিচ্ছে সে দিনরাত ।

—“কাঁকা !”

পিছন দিয়ে চাইল লক্ষণ ; পশা এসে ঠাড়িয়েছে । ইজিতটা বোঝে লক্ষণ । ভিতরের দরকার দিকে চেয়ে

বুড়ো করে এক পাট নুড়ি ওর আঙলে দিয়ে হাতে করে একটু ভেলিঙকু হুঁড়ে দেয় ।

—“ওদিকে নয়, এইদিকে চলে যা ।”

অর্ধাৎ ভয় ভয় গৃহিণীকে । নিরাপদ ঘুরে পড়া চলে গেলে আবার হুক করে লক্ষণ—“থাক, থাক, হুঁধোখন—মা আমার কুললক্ষী !—”

—“কই, দাওগো হুন । ওই বেক বাপু তোমার কাজ ! উহুনে ডাল চাশিরে আটছি যি গো—” জেলেনই তাড়া দেয় ওকে ।

ছেলেপুলে নেই । কাড়া-বাড়া সংসার । তবু ছোটগিটী বড় বিপাকে পড়েছে । লক্ষণও ভাইপো-বড়বউ-নন্দে ফেলতে পারে না । একমুঠো খেতে পারে না তারা, অথচ গ্রামের মধ্যে তারাই ছিল সজ্জিমানী । আগেকার দিনগুলো এখনও ভোলেনি লক্ষণ ; যেন পড়ল হু হু করে ওঠে দুক ।

—“ওইতো ভুয়ার কাজ !”

ভাইপোদিকে ডেকে আনে মাকে মাতে । আজও এনে খেতে বসেছে লক্ষণ । ছোটগিটীর বা পাটো গোলে ফুলে উঠেছে, ছোটখাট মাছবাট ভাই বেনামান রঁকে ; পানযোক্তার মুখ বর্দাই ভতি ; মিনমিনে ধরে বলে ওঠে—“কত যোষণার করো বলদিকি—যে হু-হুটো পুজো ডেকে আনবা ?”

—“হুন ভয় নাই, হুটোগিটী । মা-লক্ষীর বরপুত্র আমরা । আবার দেখবা চারদিক চৌরস হয়ে উঠবে ।”

—“ইয়া । লরভো কি ! সুধা থেকে জোটাযো বলতে পাযো ?”

লক্ষণ হঠাৎ বলে ওঠে—“যা রাত্রা বেঁধেছো হুটোগিটী—হুগের ডালে বেন কীরের বাপ আইছে, এই নাহলে রাত্রা !”

ছোটগিটীর মুখে হাসির আভা ফুটে ওঠে—“তাই নাকি !—ডোকে আর কি দোব রে পদা ? ডাল দিই—ভাত ডাল কেনে ? বেবে দে ।”

যেন মনে হাল লক্ষণ—ওলুধ ধবেছে ।

“থাক, থাক হুঁধোখন ; যা আমার কুললক্ষী !—ইঁকে ওঠে লক্ষণ ।

—“আ মরণ ! জিবে কি কিছুই আটকাহন্যো ভুয়ার ? ছেলেরা রইছে !”

ছোটগিটী অকারণেই ঘোষটা টানবার চেষ্টা করে । হাসছে লক্ষণ—“ঠাকুর-দেবতার পালা বটে, ছোটগিটী—দেখবা কী পাট করি ! হুঁ হুঁ বাচ্চা ! সাথে কি আর বড়হুজো বলে—তুই যেন আসল দুভরাতো ।”

সেবাস্থি অশীম ভক্তি লক্ষণের। গ্রামের আটচায়ে নবরাত্রি হরিনাম সংকীৰ্ত্তন চলছে—গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আসছে লোকজন, হঠাৎ লক্ষণের মাথায় বেনের হুড়ি গজিয়ে ওঠে—

“বুধলা নুহুকা, তেলেকাজা-বেঙনির দোকান দিই একটা : হুঁচাব পরসা লাভও থাকবে।”

—“হুং হুড়ি তো তোর?”

হাসে লক্ষণ—“হবে না? বেনের ছেলে যি গো।”

তোড়কাজ করে লক্ষণ দোকান তুলেছে,—পরকারির বেড়া, বড়ের চাইনি দিয়ে। মেলায় বেকা দোকান গড়ে তুলেছে। একটা আমকারির তক্তায় বেয়েছে বেঙনি-চপ : ডালবড়া।

পলার এট দোকানে এট প্রথম হাতেখড়ি। তাকা ভেজে চলছে। পরা পাকা দোকানীর মতো পরসা হিসাব করে হাম নিচ্ছে—বেচে শেব করে উঠতে পারছে না।

—“বাঃ, বাহবা ভাটপো রে! একবার ‘ওবো’ ‘ওবো’ দাও—”

সেই সভ্যতেই লক্ষণ গ্রাম দশটাকা লাভ করলো।

—“স্বয়ংক্রিয় আছিল বাপখন? গুলোমূর্তা ধরবি কড়িমূর্তা হবে। নে চারটাকা। স্বরচা বাব দিয়ে আধামাছি বরদা।” চুপি চুপি বলে—“বেশি, তোর ছোটবুড়ী বেন টের না পায়।”

পালা হিসেবী ছেলে—ঘাড় নাড়ে সে।

লক্ষণ মনে মনে দুইই হয়েছে—তবু হু-বশ টাকা বৌঠানের অভাবের সমস্যা দিতে পারছে। নবরাত্রি উপলক্ষে পলাও কেমন বেন কাজ পেয়ে যায়। খুড়ো-ডাইপোতে চুড়িতে ব্যবসা চালাচ্ছে।

লক্ষণ বামুন-সম্মনকে প্রশ্ন করে আগ বাড়িয়ে তুলে দেহ ছুটো ডালবড়া—“সেবা করুন আজ্ঞে—”

পর: আড়ালে বলে ওঠে—“বিলিয়ে দিবা নাকি চুটকা?”

হাসে লক্ষণ—“বিনপূরের দাসগঞ্জীর নাম এতেই, বাবা : কমে না, বেড়ে ওঠে।”

গল্পরায় পদো—“হ্যাঁ, ভারি বেড়েছে আশ্বাসের।” তাই হা-হা হই-হই করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কি আছে আর?”

কবাবা লক্ষণের মনের অন্তরে আঘাত দেয়; ডাই-পোর দিকে চেয়ে থাকে—এ বেন তাদের বাপের বেজকজা বিনোদ দাসের কুখের কবাজুলো। কি বলতে দিয়ে ধামলো লক্ষণ—“নে, কেনাবেচা কর, বন্ধের পেলেছে।”

এককালে বিড়কী পুহর ছিল—চারিধিকে পাঁচিল-ধোয়া

বসতবাড়ির ঠিক পিছনেই। আক পাঁচিল ঘসে পড়ে বেআক হয়ে গেছে। ওঠেই দুই এসনও বেনেওঠির মধ্যে আছে, বাকী সব গেছে।

লক্ষণ বাড়ি কিয়ই অবাক হয়ে যায়। ছোটগিঞ্জী বাড়িতে নেই, ঘাটের ঠিক থেকে তার গলা শোনা যায়—বেশ মিঠেকড়া স্বর, ওদিক থেকে বৌঠানও হুজ করে—“তোর ডাতার তো পেটখোরাণী” পাশ-লোকানদার পেয়েছে। আশ্বাস বোয়ামীর দোকানে দশটা লোক খাটতো, আজ তারই ছেলে কিনা তেলেকাজা ফুলতীর লোকানে ফুটকরমাস খাটতে গেছে! চ্যাম, চ্যাম:—

—“বেতে দাও কেনে? চারটাকা রোক নিচ্ছে হাত পেতে তা জান না?”

ছোটগিঞ্জীর মিনমিনে গলা ভুপে যায় বৌঠানের ভরাট গর্জনের সাহায্যে—বানের তোড়ে পড়কুটো জেলে চলছে।

—“চার টাকা! টাকা দেখান হুই আমাকে বাজানাকী! কত টাকা দেখছি তা জানিস? ও টাকা ছুই দেখ—বাতের লক্ষ্য!”

লক্ষণ ছুট উঠে—“ছোটগিঞ্জী? হুজ কি? ঘাটে ঠাড়িয়ে গরের কেলেকারি!”

উঠে এল ছোটগিঞ্জী—“ভুলে তো? সব্বের ভুলে তো? হুযি তো ডাইপো বলতে অজান। ওদিক কালসাপ পুখো হুখকসা দিয়ে তা জানো না? বাজানাকী! আমাকে এতবড় গাল দেবে?”

কৈদে কলে ছোটগিঞ্জী। ঝাতে বা মেরে ককা-খলা বৌঠানের মতাব।

—“দ্যাং! ” লক্ষণ তিত্তিবিরক্ত হয়ে বের হয়ে আসে বাড়ি থেকে।

মুলোট বের হচ্ছে নামসংকীৰ্ত্তন-পেবে। পক্ষগ্রামী লোকজন—দল দল সম্ভারার এসেছে; খোল-করঙালের শব্দ কেঁপে উঠেছে চারিধিক। ...বহুকে ঠাড়াল লক্ষণ। কীৰ্ত্তনের তালে তালে নাচছে লোকজন। হঠাৎ কি বেন হয়ে গেল তার। বাড়িতে কলরব মগড়া। কাড়া হাত-পা, মার প্রহনের কন্ড এত এচোটোর কোনো অর্থই খুঁজে পায় না লক্ষণ। চুলোয় বাবু তাদের কগড়া। কি এক আনন্দে গর্জন করে ওঠে—“কয় নিতাই!”

হুহাতে মূর্তো-মূর্তো ডালবড়া তুলে নিয়ে আসদানে হুঁড়ুছে লক্ষণ—হুতার করে বাজে থাকে—“কয় নিতাই!”

কীৰ্ত্তনের সম্ভারার লোকজনও হুড়িয়ে মুখে পুরছে, আবার চীৎকার করে নাম গাইছে। কলরব-কোলাহল

স্বপ্ন হয়েছে চারিদিকে। বেতুনি-সুসূরি-ভালবড়ার বৃষ্টি চলছে।

—“ছোটকাকা!”—পলা বাধা দিতে যায়।

—“চোপসও!”—লক্ষণ ঘেন ঘেতে উঠেছে।

ছুটেতে ছুটেতে আসতে ছোটগিরী: পায়ের গোদেবর ভাঙে কোরে চলতে পাত্রে না: মুখে চোখে উৎকর্ষ।

—“কি হ’ল গো ছুটে-খুড়ী?”

পাড়ার ছেলেমেয়েদের একের অব্যাস দেবার সময় নেই: আতনার কহছে সে—“সব গেল বাবা—”

আটচালার সামনে এসে অবাক হয়ে যায়। লক্ষণ উদ্ভাব বেগে গড়াগড়ি দিচ্ছে কর্তনের আগে আগে—ঘেনে বেয়ে উঠেছে: ধুলোবালি লেগেছে খালি গা-মাথা: যাকে মাঝে জ্বলনি দিচ্ছে—“জ্ব নিতাই, গৌর নিতাই—”

হোকানের মালপত শূন্য হয়ে গেছে। গড়াগড়ি দিচ্ছে লক্ষণ—“পতিতপাবন নিতাই!”

গালে হাত দিয়ে ঠাঁড়িয়েছে ছোটগিরী—“কেট মা, কি হবে গো! বিন্দু কেপে গেল নাকি রে পদা?”

‘নিউই ওঠে ছোটগিরী, আক্ষেপ হয় নিজেরই—“কেন ওলব কথা বলতে পেলাম, ঠাসুর!...”

বেনেচরির একজন কে ইতিপূর্বে গৃহভ্যাগ করে গয়্যাদী হয়েছিল। ছোটগিরীর আজ ভয় হয়—কে জানে কি করে বসবে ও!

ওরা ভুলে হয়েছে লক্ষণকে। দুঃখ দুঃখ নাচছে লক্ষণ বনবাঘবের মতো: গ্রামের ছেলেবুড়োর দল ভকে দিয়ে রয়েছে।

—“ওকে ডেকে পাও গো!” ভরে ভয়ে ছোটগিরী কাকে অনুরোধ করে।

লক্ষণ বলে ওঠে—“ফিরে বাও, ছোটগিরী—আমি চললাম। জ্ব নিতাই!”

খিতাং খিতাং খোল-করতাল বাজছে। গ্রামসংকীর্ণনে বের হল তারা।

বেপরোয়া লক্ষণ। যাকে যাকে বেচাল হয়ে ওঠে, নইলে এখনিতে বেশ সংসারী। বোকানঘরটার পদোই বসছে আকাকাল।

লক্ষণ বলে—“ঝুলা কিনা, শাখরে বলেছে—বারিঙ্কো বসতি লক্ষী, তর্কং কৃষিকর্ষণ।...বুড়ো-ভাইপোতে লাগলাম গো, ভাইপো টাটে বহুক, আমি ঝইলাম চাবে।”

—“বা-লক্ষীকে কাক দিয়ে বলতে যেবেনা?”

হাসে লক্ষণ—“এককালে মা তো অচলাই ছিল গো—আবার সব আবার।”

লক্ষণ হুটো গরু কিনেছে, একজন মাহিন্দার রেখেছে। নিজেকে খাটে অহুয়ের মতো। কোমর অবধি খাড়াই হুটো গরু যর থেকে লাঙল ছুড়ে ছেড়ে দিয়ে লক্ষণ দাওয়ার বসে চা শাখ।

—“হ-হ! দেখছে ছোটগিরী, কেমন গরু কিনেছি? মাঠকে বাবার কল ছটকট করছে।”

সমস্ত ব্যাপারটা ছোটগিরীর মন:পূত হয়নি। বুড়ো-বরসে লোকান ছেড়ে দিয়ে মাঠে হাড়খাইনি ষাটার কোনো খুঁকিই সে পায়নি।

—“খামো দিকি! যেমন ভুমি তেমনি তোমার গরু। ভাপুর মাস শেষ হতে চললো তোমার চাব এখনও বাকী: ইনিকে খায়ের লোক চাব সেয়ে গা এলান দিছে।”

হাসে লক্ষণ—“পরের কানভাকানি ভুমি বজ্জ লাও ছোটাবউ, শাখরে আছে—শাওনের পুরো ভাদরের বারো, এই ক’দিনে বত পারো!...চাষের এই তো মরমুম। মূনিং-মাহিন্দার সজা।”

গরু-মাঠল নিয়ে বের হতে লক্ষণের আটটা বাজল।

আটচালার চাবলাস সেয়ে লোকজন ভাস-পাশা নিয়ে বসেছে। বছরের মধ্যে বর্ষাকালে হুটো মাস আর ঈতকালে মাসবানেক কাজ, রোয়া আর কাটা। বস, তাহপরিই গ্রাম্য দলাদলি আর সুংসা নিয়েই মাতে।

লক্ষণ হ’কো টানতে টানতে মাঠে চলছে—আগে আগে চলছে গরু হুটো লাঙল-সমতে।

—“ও বুড়ো!”

দশবাক্ত হয়ে ওঠে লক্ষণ—“না বাবা! বুড়ো-বুড়ো করোনা। এখনও হুবিগে জমি পাখিনা দিতে বাকী।”

—“বিক্রাদশমীতকু সোয়াপোতা চলবে নাকি বুড়োর! এসো একহাত হয়ে বাক।”

—“উহ! লক্ষণ তাড়াতাড়ি পার হয়ে চলে যেতে চাব। কে উঠে গিয়ে হাত-বেরে তার—“হেই” বুড়া, তোমার পানার চাল একই দেখবো না?”

লক্ষণের মুখ গর্বের হাসিতে ভরে ওঠে—“তোদের সঙ্গে কি খেলবো? তবে বৈদ্য নয় কিন্তু—”

বসেছে লক্ষণ ছপে—বারো পাখা সতেরো...

পনার চেয়ে পনার বায়ের বুদ্ধি আরও তীক্ষ্ণ। আগেকার সফর কিছু সে রেখেছিল দরিয়ে। সংসার, হাঁড়িকুড়ি ডির হয়ে বাবার পরও তা বের করেনি। পদোর লোকানপর কমল: বেড়ে উঠেছে। হিসেবী ছেলে।

কাকার কাছে থেকে ব্যবসার মূলতত্ত্ব কতগুলো শিখেছিল—ঘরখানা বসে-ক’রে নিয়ে বেশ কলাও কারবার কেবেছে।

বেনেগিরাও গায়েগতরে বেটে খান থেকে চাল করে, বড়ি দেয়, মুড়ি তৈরি করে দোকানে বেচে—সেইসঙ্গে তেলডাঙ্গা ইকিটাকিও। ক্রমশঃ কাজকাণ্ডার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন এসে নিজেও খাটছে তাদের সঙ্গে, যাতে তারা কান্না না দিতে পারে। ক্রমশঃ আগের পাঠকের-বন্ধেরাও ফিরে আসছে দোকানে। পদোর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। টাকা!...নোট আবার যাগরাত করছে ন' করছে।

লাঙ্গল-জোয়াল নিয়ে গরু হুটে। ঘরে ফিরে আসতেই ছোটগিরাও তাঁ'ন হয়। লোকটা গেল কোথায়? বেলাও বেড়ে চলেছে, মাঠে জলধাবার নিয়ে ঘাঙিল—ধাঁড়াল সে।

—“সে কোথা যে?” গরু হুটোকেই বেন প্রশ্ন করে। অবোলা জীব পাতনা থেকে ছানি খাবার জন্ত হাসফলে করছে। তাদের বাঁধন বুলে দিয়ে বের হল ছোটগিরা।

—“কই গো—ও হুটোকতা—”

হঠাৎ চক্কল হয়ে ওঠে লক্ষণ। পাশার ছক থেকে লাক দিয়ে ওঠে—“হলো ত? এঁবায়!”

ডাকটা এগিয়ে আসছে এটিকেই। ছোটকর্তা ত্যাগাইএর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে—“তোমো বলবি ছোটকর্তার পেট কামড়াছিল।”

কাতরাত্তে থাকে—“ওরে বাবা:...”

ছোটগিরা মানুসী হয়ে এসে ওর ব্যাপার দেখে বম্বুকে ধাঁড়াল।

—“ঘরকে বেতে নাই? পথেঘাটেই পড়ে থাকবা।

সেবা করবার নোক কি কেউ নাই জুমার?”

লক্ষণ কথা বলে না। কাতরাত্তে থাকে—“আর বাঁচবে না, হুটোবউ।”

—“চল, ঘরকে চল। বসোদিকি ই-বরসে মাঠে খাটালি সর?”

কথাটা ছোটগিরাই বলে—“ঘরখানা চেড়ে যে, পশো—জুর কাকটা দোকান পেবে।”

—“যানে? এত খরচ-বরচ করলাম। কি ছিল তোমার ঘরে?”

বোঁঠানও বের হয়ে এসেছে। ঝাঁ ঝাঁ করে লাগে সেও—“কি বলি ছোটবউ? ঘর লিবি? সারানোর পাঁচশো টাকা কেসে ঘর নিয়ে যা।”

—“খরচ করতে যে বলেছিল সিদি?”

পদোর ছোট ভাই নবা একনম্বর জুতা। দোকানে

ধানের বগা তুলছিল গাড়িতে। লাফ দিয়ে নেমে আসে—“এখানে এলে মাথা পেড়ে হুপ না? চলে আয় কে বাগের বাটা আছিল।”

কথাটা শুনে লক্ষণ চমকে ওঠে। বাপ হুলে কথা! খাটের-পরিষে মাছুর করেছে; নাবালক হুটোকে ধাঁড় করিয়ে দিচ্ছে—বাবলা বরতে ঘর চেড়ে দিয়ে নিজে মাঠে কালা খাটতে গেছে—তাঁকে এত খড় কথা! মাথার প্রক্ত ওঠে যায়।

—“আই, জোপ হও!” হাজার দিয়ে ওঠে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে লক্ষণ হাস। নবাও একটা দালকাই হুলে কপে ধাঁড়িয়েছে—“বেরিয়ে এসো—”

ঘরের কাছে নজর পড়ে সেই বিশাল খুরশোখানার উপর। নবার গর্জন ভেসে ওঠে—“চলে এসো—সেখনি কারি ঘর।”

লক্ষণ হাস লাক দিয়ে এসে রাজার নামলো; বিশাল চেহারা মাগে বরখর করে কাঁপছে, হাতে সেই তীরখার শোক্ত খুরশোখানা—“নিকালো, আতি নিকালো ঘর থেকে—”

দিকী বাত শিবেছে লক্ষণ বাঁকুড়ার মহাজনের গহিতে গিয়ে। মূর্তি দেখে নবা থাবড়ে গেছে। কাছে এগোতে সাহস হয় না। চীৎকার করছে বোঁঠান—“ওরে, সরে যা নবো! ওগো কে কোথায় আছে? বেগে যাও গো—আমার হুয়ের কাছাড়িকে মানুসেরে বেরে কেসলে—”

পশো হ'সিয়ার দোক—রাগ হলেও তা একশা করছে না। ধমকে ওঠে নবাকে—“বান্দর কোথাকার! কাকার সামনে বান্দরামি। যা, ঘরে যা। মা, নামবে ছুনি? ঘরের কেলেকারি বাইরে হটাকো? বা হয়েছো কাকা-ভাইশোতে নুকাবো আমরা। খুরশো নামাও ছোটকাকা!”

নামলো লক্ষণ—“বল, ভুই বল, পদা—তোমার বা-ভাইএর এইসব কথা।”

পশো দোকান থেকে খানিকটা চিনি বের করে আনে—“বাও দিকি ছোটবুড়ী, একটু সরবত করো। মানুসটাকে আগিরে মারলে সবাই। চলো গো ছোটকাকা, ঘরে চলো। ছুনি বললে, আজই এখুনিই আমি বের হয়ে যাবো; এই সামান্য কথাই জন্তে—কেলেকারি কথা! বেনেওটির পজ হাসানো। হিঃ হিঃ!”

লক্ষণ অস্বস্তিরপূর্ণ হয়ে বের হুকলো। সত্যি, পদোর কথাগুলো খুব সত্যি।

মানিক একটা ডাঙার রক্সা হ'ল। খুরশোর মহিষা সেদিন টের পেল লক্ষণ। এক খুরশো বের করতেই ঠাঁও হয়েছিল নবো।

পায়ে আঁধি করে—“ডাইশাদিকে মাকে মাকে শাসনে
হাওতে হু গো—হাজার হোক, অক্ষকালকার ছেলে—
বড় বেয়াড়া।”

পরের মনের রং মনেই থাকে। হঠাৎ সেদিন ক্ষেত্র
শেয়ে যায়। লক্ষণ দাস চুটোচুটি করছে—ছোটগিটার
দারুণ অস্থির। গানের বিটু ডাক্তার জবাব দিয়েছে—
—“শহরের বড় ডাক্তার আনো, বুড়ো। বয়স হয়েছে,
এমনই নিউমোনিয়া রোগ—বড় সোকা নয় তো?”

আকাশ থেকে পড়ে লক্ষণ। আজ অল্পজব করে, জীবনে
একজনের প্রয়োজন কত বেশী। টাকার জন্ত হতে হবে
চুটে বেড়াচ্ছে সে।

পরের কাছে কচাটা পাড়তেই পড়ে। বলে—“টাকা
কোথার পাবো বলো?”

চূপ করে বইল লক্ষণ। ইচ্ছে করলে পলো তাকে
শ-হুয়েক টাকা অন্যথাসেই দিতে পারে, এড়িয়ে গেল
পলো। বোঠান বলে—“তোমরা ওর টাকাই দেখেছে।
ঠাহুরশো, কোথা পাবে ও বাছা।?”

লক্ষণ মনস্থির করে ফেলেছে। এভাবে বিনা চিকিৎসার
মহত পেবেনা, টাকার জোগাড় সে করবেই।

সবই করশো লক্ষণ। শব্দ থেকে ডাক্তার এলো মোটরে
করে, হল ওপু কানকিছুই বাদ গেল না। অবাধ হয়ে
যায় পলো—এত টাকা লক্ষণ দাস বরং করত পারলো ওই
বুড়ীর জন্ত! কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ছোটগিটার
চল গেল।

জন্ম হয়ে বলে থাকে লক্ষণ। জীবনের একটা দিক তার
জন্ম হয়ে গেছে, পাখর হয়ে গেছে অস্তরের সমস্ত অস্থূতি।
কানদার কেউ নেই। সিঁথিতে নিজেই উপুড় করে দিল
দি’দ্বয়ের কোঁটা। নিজেই এগিয়ে গেল চিতার আগুন থিতে—
খুঁ খুঁ লগছে চিতা—বুকফাটা আর্তনাম করে ওঠে লক্ষণ—
—“একই কলো গেলো চুটোবট! কেলে সেলা আমাকে।”
হো-হো করে কানদে লক্ষণ। আজ সে নিতান্ত একা,
স্বপ্নের একান্ত অসহায় সে।

তার কিছুদিন পরেই ঘটেছে ব্যাপারটা। লক্ষণ আর
গ্রামে বড় একটা বের হরনা। সেই ঝাঙ্গি-পান নাচন-
কোদন ধরে গেছে, অহোবাহ-সংকীর্তনে আর শোকান
ধেখনি এবার ভাগবত-স্মৃতির, হরির-দুটও হয়নি বুঝোতের
বিন। বাজপড়া ভালগাছের মতো ঠাঁড়িয়ে আছে পুরে।
হুঁচোখ ঢেঁলে কাজা আসে তার।

ব্যাপারটা আবিষ্কার করে পলো-ই। নানোসোলের
শৈল্পিক জমি লক্ষণ দাস বিক্রি করে ছোটবউএর চিকিৎসা

করিয়েছে। গ্রামের সেবা জমি—এক চাক বেনেরের
ত্রিংশ দিয়ে গেল। অকালশোষ জমি—সেই জমির ওর
অংশ বিক্রি করেছে মদন মুখোজ্যে।

পদের কথার জবাব দিল না লক্ষণ, মুখ ভুলে চাইল মাজ।

—“বহুত জমি আমাকে বলেনি কেন?”

—“আগেই বলেছিলাম; যা না, অগ্রজের নামলা
করগা, জমি তো পড়ে আছে কাছারিতে।”

—“হুনে নামে দিলি করেছে। হাজার টাকা ওর
দাম হয়?”

—“বেশ করেছে। আমার খুই।”—উঠে পড়ল লক্ষণ।
সারা মনে আগুন জ্বলছে। নিজের স্বীয় চিকিৎসা
করিয়েছে জমি বেচে, তার জন্ত কৈফিয়ত দিতে হবে!
গর্জন করে ওঠে—“দোকানঘরের ভাড়া দিবি বলেছিলি—
হু’বছরের বকেয়া ভাড়া শোধ করে থর ছেড়ে দে।”

নবা লাক দিয়ে ওঠে—“নেই দেখা।”

পলো চিবিয়ে চিবিয়ে বলে—“সেটা কোট্টে বুকে নিয়ে,
ছোটকালা। বটননামার ও-ঘর আমার ভাগে পড়েছে।”

—“তোর।”

—“হ্যাঁ।” হাতবাজ থেকে কাগজ বের করে দেখায়।
গ্রামের ভাড়া পক্ষজনের শইকরা গটননামা-পানা। তাতে
কান বুকে নিশুণভাবে বসিয়েছে ওটা।

গ্রামে ‘ডারই প্রসার-প্রতিপত্তি; কেউ বিশকে সাক্ষী
দিতে যাবে না। সকলেরই মুখ বন্ধ করে রেখেছে।
নিজেরও কাগজপত্রের ঠিক-ঠিকানা কিছুই নেই। ছোটগিটার
মাতা বাবার পুর থেকে সব চতাকার ছয় হয়ে গেছে।

কথা কইল না লক্ষণ; অবাধ হয়ে চেয়ে থাকে মাজ।

—“সব নিগি, পলো?” আর্তনাম করে ওঠে লক্ষণ—

“হুটো দিন সবুর করতে পারলি না?”

বোঠান চীৎকার করছে—“হে-না! বিনসের মুখ কামা
ঘবে; হকের খন সব ভুসিয়ে নিয়েছিল! বাছাদিকে পথে
বসিয়েছিল ওই বুড়া বাঁশ।” কখন! ডোণে লাগলো?”

নীরবে বের হয়ে এল লক্ষণ—হুঁসছে মনে-মনে।
সেই বেগরোয়া মন বেন অতীতের পাখর ঢেঁলে বের হয়ে
আসতে চায়। চূপ করে থাকবে না সে, এত অশযান
নীরবে হজম করবে না—অসহায় হয়নি সে। এখনও গায়ে
তার বলইকু কমনি। অল্প হুতরাটের মতো লৌহ-ভীষকে
চুঁ করে বেবার শক্তি তার আছে।

পরদিন সকালেই লোকজন লাগিয়ে বাড়ির সীমানার
মত থানা বুঁড়ছে লক্ষণ। দোকানে বাবার পথে কোমরগট
বন্ধ করে রেখে গেছে, এ কারগা তার। নবা ঝাঁপাচ্ছে—

লক্ষণ কোনো কথা বলে না। ক্রমশঃ আরোহণিরির যাত্রা বাড়িয়ে আছে—হাতে সেই শৈতবিক বিধান পুরণো। কান্না ঘবে সমস্ত মরতে লাগে করেছে। স্বপ্নকর করে পুরণোথান। বোধের আভাস।

পথো সাবধান করে নবাবে—“কাছে বাসনি। হুঁতাক করে দেবে।”

—“পথ বন্ধ করবে তাই বলে?”

পথ। জবাব দেয়না। করবার কিছুই নেই তার, পুঙ্খের পাড় দিয়ে নিজের সীমানার পথ করে নেওয়া ছাড়া; তাই করতে থাকে সে।

লক্ষণ যেন ভিতলো মনে হচ্চে।

—“গর্তে জল জমে বাড়ি ক্রমে পড়বে যে বুড়ো?”
নরীণ গীতরা বলে ওঠে।

লক্ষণ হাসছে—“পত্নীক। ডায়ে-ডায়ে করে বের হয়ে পড়বে। আমার কি? মাগ না ছেলে, ঢেঁকি না ফুলো! নিজের নাকই কাটবে, তবু শরের ব্যাড়া ডাক হোক।...কই যে—দার, ক্যান্ডা থাকে আটকা। বেশ কেমন বল। নিবি আর দোকান ঘর?”

বড় জন্মে পড়েছে পদা; পশার মা অনবরত চীৎকার করে চলেছে নিরাপক দূর থেকে—“মরবি, মরবি এইবার! একজন গোছে, তুইও যাবি—”

হাসছে লক্ষণ—“হা: হা: ! শকুনির শাপে গল মরেনা, বোঁঠান...”

সেদিনের অপমানের শোধ আজ পদা নিয়েছে। কড়ার গণ্ডার নিয়েছে। বটননামার বুকে ঝাঁকা করেকটা আচড়ের কোড়েই তালতলার মাঠের হুঁবিষে জমি বিবাক সৌত করিয়ে নিয়েছে।

কিনকিন বৃষ্টি নেমেছে। আকাশ ছেয়ে নেমেছে কালো মেঘ থেকে বৃষ্টির ধারা। নরীণ গীতরার কথাই বলে গেছে। বিড়কির পুকুর ছাপিয়ে জলধারা সেই পথ-কাটা খালে চুকে বাড়ির পাঁচিলে বেগেছে, স্নাতদেতে হঠাৎ উঠেছে ঘর, বৃকভোর কেঁদেছে জল বসেছে।

পুরোনো দেওয়ালের ফাটল থেকে সেদিন জল পেয়ে বের হয়েছিল একটা পুরোনো গোবরো। বোঁঠান চীৎকার করে—“কালে থাকবে চুকে!”

হাসে লক্ষণ—“খাফ-না।” এ যেন অস্ত্র বাহুল্য, নিজের ক্রমে চোখের উপর দেখেও থাকে না। গলে গলে পড়ছে পোতার মাটি। খইখই করছে জল। বৃষ্টির শব্দে ছেয়ে গেছে আকাশ-বাতাস।

মাঠে কাড়ান নেমেছে—নতুন বীজধান লক্ষণ করছে বৃষ্টিধোয়া সবুজের নেপায়। পথো-নবা লোকজন নিয়ে এসেছে, দখল নিয়ে আজই রোরাপোতা করে যাবে তারা। খবর পেয়ে উদ্ভাসে ছুটে আসে লক্ষণ বন্ধন শব্দে সেই শৈতবিক ব্রশি ঘোরাতে-ঘোরাতে। সবকিছু শেষ করে দিতে বাবে। কিন্তু পারেনি।

হেঁদে গেছে লক্ষণ। খেঁজুরগাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে তাকে গুয়া। ওর চোখের সামনে নিজের জমি কেড়ে নিল পদা। হাতের পুরণোও কেড়ে নিয়ে তাকে বেঁধে রেখেছে। কাগায় ডেড়ে পড়ে লক্ষণ। অসহায় নিম্নল কাগা।

এামের কেউ জবাব দেয় না। লক্ষণ ঠোঁটে কিয়ছে মার্ট থেকে—কৌতুহলী ছেলের দল পিছু নিয়েছে। কাদামাথা মূর্তি—বন্ধ পেগেছে তাই ঠাট। পুঞ্জহাতে বিক্রমণে কিয়ছে লক্ষণ বিচিত্র মূর্তিতে। ছেলেরা ডাবে এও বোধহয় লক্ষণ পুড়োর কোনো এক অভিনয়।

—“নিপাত যাবি—নিপাত যাবি তোরা! হেঁট ধরন, চুমি দেখো!”

বর্গা নেমেছে রাতের অন্ধকার চেয়ে। স্তম্ভিমর গায়ের নুকে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ ভেগে ওঠে—বেনেগড়ের জল ফুলে উঠেছে প্রচণ্ড টেউএর তোড়ে।...কার অট্টহালি জেগে ওঠে। বের হয়ে আসে প্রতিবেশীর দল।

একখানা চালর বগলে করে হয়ে পাড়িয়ে হাসছে লক্ষণ—আবছা অন্ধকারে দেখা যায় তার বর্গা দেহ। হাসছে—অট্টহালিতে জেগে ওঠে কোন্ সর্বনাশা উরাস!

—“না, চুরমার হয়ে যা! বেনেগটিকে চুরমার করে দে!”

খালের জলে হড়হড় করে ক্রমে পড়েছে লক্ষণের পৌত-ওঠা পুরোনো ঘরখানা। জমি-জারাত—ছোটবউ সবাই চলে গেছে, বাকী ছিল ওই ঘরটুকু—তাও নিঃশেষ হয়ে গেল। কে যেন ডাকছে—“সরে এসো, বুড়ো—সরে এসো গুমান থেকে। এখনই ক্রমে পড়বে গদিকটা।”

লক্ষণের জন্মপন নেই—হাসছে সে। আকাশের বিকে হাত জুলে গর্জন করছে বৃদ্ধ:

“নভো বহিষ অনলধারা;

ধরাভিত্তি হোক স্থানচ্যুত।

আরে আরে! কুর-কুলাধার...”

জীর্ণ দেওয়ালটা কাগছে—সুরভর করে মাটি ঝগছে; যে-কোনো মুহূর্তে এগিয়ে পড়বে সম্মুখে। লক্ষণের কোন-দিকে দৃষ্টি নেই—যেতে উঠেছে ক্রমের আনন্দে।



। খোলে ।

বিকিত্তা বিবাহ

"As man and wife we found a new relation in which sex had no part. It ended the old gallantries, flirtations, philanderings for both of us." — Shaw

এলেন টেরীকে ১৮৯৩-এর আটপে আগস্ট একটা চিঠিতে লিখলেন বার্নার্ড শ :

"এক দশবতী আইরিশ মহিলা আমাদের সঙ্গে এসেছেন, যেহেতু চতুর্ভা এবং চব্বিশে দুর্ভা আছে,—...তার প্রেমে পড়ে দ্বন্দ্বকে সত্তাবিত করতে চাই। আমি শুধু প্রেমে পড়তেই ভালোবাসি, মনে রেখো ওর অর্ধ-সম্পর্কে নয়, হস্তরং আর কেউ তাঁকে হৃদয় বিবাহ করবে, অবশ্য আমার পরে যদি ওর সখ।"

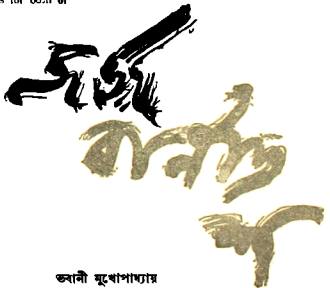
চিঠিখানি স্টার্টফোর্ডের সেন্ট এনন্স, হের্টফোর্ড থেকে লেখা।

দেই বছর গ্রীষ্মে স্টার্টফোর্ড ফেব্রুয়ারির এক দরোহা বৈষ্ণব

ব্যবস্থা হয়েছিল। ওয়েব-সম্পত্তিরা কয়েক সপ্তাহের অন্ত St. Andrew Rectory-তে বাসা বেঁধেছেন। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে তাঁরা এটরকম পরী-আগাসে কিছুকাল কাটান। কয়েকজন ফেরিমান বাড়ব-বাড়বীও আসেন। এইবার এসেছেন টেডেলিয়ান, গ্রাহাম ওয়ালস, বার্নার্ড শ, শার্লোট পারকিন্স স্টেটসম্যান আর শার্লোট পেট্রন-টাইনসেও। স্থানটি মনোরম, অল্পদূর সবুজ গাছপালা আর বৈদ্যুণ্যী বেহীত এই শান্তিহীন সমাজসেবী সংস্কারকের বৈঠক বলেছে। শার্লোট পারকিন্স স্টেটসম্যানের কিছু পরীগ্রন্থিত এই মনোরম পরিবেশেই সইলো না। শ্রীমতী ওয়েব এবং পেট্রন-টাইনসেওর হাতে অভিযাসবায় তার হিটে তিনি পাগলে এসেন।

ফেব্রুয়ারির কিছু বেগ সইলো। প্রাতে চারঘণ্টা কাছ, অপরাহ্নে চারঘণ্টা সাইকেলে ভ্রমণ, মাঝে মাঝে জেহনাস্থিক সোভালিগ্রন-চর্চা এবং সন্ধ্যায় পড়াশোনা।

এই হৃদয় পরিবেশেই যোমেলের স্বযোগ এস। বার্নার্ড শ শ্রীমতী টাইনসেওর প্রেমে পড়ে গেলেন। তার শিল্পের হোবস পেট্রন-টাইনসেওর ব্যক্তি আইরিশ ব্যাপ্তিয়ার হিসাবে। এদের পারিবারিক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানেই বার্নার্ড শ একদা কর্মচারী ছিলেন, আর শার্লোটের জননী মেয়ী কিরবি দশবতী ইংল্যান্ড-মহিলা। শার্লোটও যথেষ্ট বিজ্ঞানমিণী। অসংখ্য পানিপ্রাণীদের উৎসাহ করে তিনি সোভালিগ্রনের আকর্ষণে আকৃষ্ট ভূষে রইলেন। মিসেস ওয়েবের সঙ্গে এই ঘরে পরিচয়।



ভবানী মুখোপাধ্যায়

একদিন মিসেস ওয়েব বললেন—“লগুন হুল অব একনমিস্‌গ-এব একটা মিষ্টি বাড়ি চাই।”

মিস্ টাইনসেও বললেন—“বেশ তো, আমি একহাজার পাউন্ড চাপা দেব।”

এমনই নানা দ্বন্দ্ব উজ্জয়ের মধ্যে এখন গভীর অন্ধরত্নতা—একদিন শার্লট বললেন—“পলী-অফসে আমার একটি বাগা আছে, কয়েকজন কেমিষ্ট্রিয়ানকে নিমন্ত্রণ করে কয়েকদিন সেখানে কাটালে কেন্দ্র হয়?”

মিসেস ওয়েব বললেন—“কিন্তু, তবে প্রতিবছর গ্রীষ্মে আমি পলীগ্রামে একটা বাগা নিই, প্রতিবছরই ক্রফনকেমিষ্ট্রিয়ান নেতা অতিথি হয়ে আসেন—একজন গ্রাহাম ওয়ালাস, অপর ব্যক্তি চর্চ বার্ডেন। এই ব্যবহার আপত্তি না থাকে তো তুমিও চলে।”

—“না, আপত্তি আর কি? বাওটা বাবে।”

মিসেস বিয়েট্‌স ওয়েব লিখেছেন তাঁর *Our Partnership* গ্রন্থে :

“বেরেট রোমান্টিক, নিঃশব্দ সিনিক্যাল মনে করে। বেরেট একধারে মোহাম্মদি এবং ব্যাডিক্যাল। সমষ্টিবাদ সে সে বেশ বোকে তা নয়, আললে প্রকৃতিতে সে বিমবী। তাঁর মধ্যে উদাসিনতা বা গৌড়ামি নেই। ইতিমধ্যে সে ‘swallowed all formulas’ (সব পদ্ধতি-প্রকরণ গিলে ফেলেছে), কিন্তু নিজের মতবাদ বিস্তার করতে পারেনি। পুরুষের সে ভালোবাসে, কিন্তু অধিকাংশ বেরেটের সম্পর্কে অসঙ্গতি। তাঁর এই বাধ্যতানুলক দ্রব্ধর্ষে তাঁর যৌবনের অংশটি, কিন্তু আবার সাদাশিমে বিবাহের সে গম্ভীরতা নয়। বেরেট দুঃখভাষা, সহ্যশক্তিহীন এবং পৃথিবীর বেদনা বিদ্রুত করে আনন্দের কলস বুদ্ধি করতে তাঁর প্রকৃত আগ্রহ আছে। ...আমি ভেবেছিলুম গ্রাহাম ওয়ালাসের সঙ্গে ওর মানাবে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ওর বলাগা না; কয়েকদিনের ভিত্তর শ’র নিত্যসহচরী হয়ে উঠলো।”

এই সময় শ তাঁর *You Never Can Tell* নাটক শেষ করছেন। সাইকেলের টিউবের ফুটে মেরামত করছেন আর বহুজনের কাছে নিজের নাটক পাঠ করে শোনাজেন। কিন্তু এরই অবসরে মিস্ টাইনসেওর সঙ্গে দীর্ঘপথ সাইকেলে ভ্রমণ করছেন, যা পায়ে হাঁটছেন।

এইভাবে উজ্জয়ের মধ্যে নিবিড় অন্ধরত্নতার স্রষ্টা হল।

শ’র মানসিক ঈর্ষ এবং প্রশান্তির পরিচায়ক এই কালে রচিত *You Never Can Tell*। শীরা বাস্তব: উজ্জ্বল

জানতেন তারা এই পারস্পরিক প্রীতির অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে বিস্তৃত হলেন। শ’র মানসিক অধরা এই সময় প্রেমপড়ার অগ্রসর নয়, মেয়েদের মহিমায তিনি উচ্চাঙ্ক হয়ে কিছুদিনের জন্য বিজ্ঞান উপভোগ করবেন মনে করেছিলেন।

শার্লট কিন্তু তাঁর কাছে নতুন ধরনের শ্রীলোক। শ ভেবেছিলেন, আরো পাঁচেকশয়ের বেরেটের মতোই এর বড়ো হবে, কিন্তু দেখলেন মানবীয় বহু সন্তানের তিনি অধিকাংশী। বার্নার্ড শ সেই বছর অক্টোবরে এলেন টেরীকে লিখেছেন :

“আমার এই আইরিশ বিভ্রান্তিানীকে কি বিয়ে করব? বেরেট.....বাস্তবায় বিবাহ করে, বিবাহে বিবাহী নয়। তবে আমার ধারণা, আমি তাকে রাজী করতে পারি। তাঁর পর শত শত ভাল বিনামূল্যে চালাবো। বেরেটকে আমি ভালোবাসি, সে আমাকে ভালোবাসে, কিন্তু তুমি কি অন্তর থেকে আমাকে স্বাম্যস্বাম্যর চক্ষে দেখতে পারবে? পারবে না।”

বিয়েট্‌স ওয়েব বলতেন, শার্লটের চরিত্রে ‘volcanic tendencies’ আছে। বেরেট অতিমাত্রায় ক্রোধান্বিত এবং সামাজিক বেনামেশুর ব্যাপারে বেশ বিচার-বিশেষনা করে চলে।

প্রথমিই শ আবার এলেনকে লিখলেন :

“ও আমাকে প্রকৃত ভালোবাসে না। আগলে ও অতি চতুর। তাঁর এই বদ্ধন স্বামীত্বের মূল্য সে বোকে। বাধ্যবাধ্য পদ্ধতির জীবন নিয়ে মার মৃত্যুকাল পর্যন্ত ও বিশেষ ক্ষুণ্ণতা ভোগ করেছে। সব-কিছু জানার পূর্বে বিবাহের শৃঙ্খলে জীবনকে পাখার চোঁটা বেন অতিমাত্রায় দুর্বল। কয়েকবছর আগে ও প্রেমের ব্যাপারে আঘাত পেয়েছে, সেই আঘাতে ক্ষত্রিত হয়েছিল (বেরেট অতিশয় ভাবালু), তাঁর পর পড়ল আমার *The Quintessence of Ibsenism*—তাঁর মধ্যে শেল জীবন-বেদ, মুক্তি, সিদ্ধি, আনন্দবাদ ইত্যাদি। তাঁরও অনেক পরে দেখলো গ্রন্থকারকে। তুমি তো জানো, পত্রলেখক হিসাবে সেই ব্যক্তিটি সহনীয়। শুধু তাই নয়, বাইবেলিকল নিষে ভ্রমণেও সহনযোগ্য সহচর। পলীপথে ভ্রমণের আর সঙ্গী কোথায়! বেরেটের আবারো ভালো লেগেছে, প্রকৃতিতে সে ছলনাময়ী নয় যে

• *The Story of San Michele* রচিত Axel Munthe-এর সঙ্গে শার্লটের প্রথম প্রেম সফলিত হয়, এবং পরে বিচ্ছেদ ঘট।

বিপরীত ভান করবে। আমিও তার অগ্রাণী হয়ে পড়েছি। এই অংশে ও আমার বৃত্তি ও সাধনা। তুমি আমার অন্তরে উত্তাপ এনেছ, যাও ফলে আমি সকলের অগ্রাণী হয়ে পড়েছি। যেহেতু আমার কাছাকাছি আছে এবং নিঃসন্দেহে উৎকর্ষ। এইতো অবস্থা। তোমার প্রেমময় দিব্যজ্ঞান এই বিষয়ে কি বলে?”

উত্তরে এসে নিখেছিলেন—“আমি চতুরা নই। কোনোদিন ছিলাম না। আর, তোমাদের সকলকে সেগে মনে হয়—চতুর না হওয়াই বড় ভালো। যদি কাউকে ভালো না বালো অথচ বিবাহ করে, তাহলে তোমার সবটাই হবে অসুখ, তোমার সমস্ত কিছু থাকবে না। বিবাহের পূর্বে নারী হয়তো ভালোবাসতে না পারে, সে ভালোবাসে উত্তরকালে (যদি অবশ্য আগে ভালোবেসে না থাকে)।”

ন এবং পার্গেটের প্রকৃতিতে অনেক পার্থক্য ছিল, রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ ছিল না, কিন্তু ‘লগন ব্লব অব একনমিক্স’-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ছিল অসীম উৎসাহ। সর্বস্বাস্থ্যবাহী যে সর্ববিধ সন্তানের অধিকারী, এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। কনকী, মাল্লিতকর্তিত বুদ্ধিমান মানুষ তিনি গচ্ছ করতেন। সব বিষয়ে একটি ম্যাপায়া অবলম্বন করে চলতেন। একদিক্সাবে তাঁকে ‘সব’ বলা চলে, কিন্তু সেই দিক্সাবে বার্নার্ড শ, বিয়েটি স ওয়েব এবং কেবিরান সোসাইটির কার্যকরী সমিতির সকলেই তাই। একমাত্র সিভিল ওয়েবকেই ‘সব’ আখ্যা দেওয়া যায় না। পার্গেট দু-পর্বটনে আগ্রহাবিতা, কিন্তু সর্বনীর স্থান দেখার কোঁকুহল সেই; আর বার্নার্ড শ কিন্তু বিপরীত। সমস্ত হলে তিনি কোনোদিন লগন ত্যাগ করতেন না, অথচ বিশেষে পর্যাপণ করে সর্বনীর স্থান দেখতে ছুটতেন, একমুহূর্ত সেহি সহ্যতো না। এর কারণ নাকি বিশেষী ভাবার তাঁর অজ্ঞতা, আর্থান ভাবন-শিকার চোঁরা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, তিক্‌সনারি দেখে কোনোমতে কাজ চালাতেন, করানী জানতেন কিন্তু বলতে পারতেন না।

পার্গেট প্রকৃতিকে অস্বাভিক, ককশাময়ী, মহাহুত্ব। যাদুধঃক আদন করার তাঁর অসীম ক্ষমতা ছিল। পড়তে ভালোবাসতেন, ন এবং তিনি যে-সব সম্ভাষ্য একা থাকতেন তখন শ পাঠ করতেন, দেলাই করার অবসরে তিনি শুনতেন। আকর্ষ পন্নী-জীবন। বহুদর সবে ধর্মের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছেড়েছিল, বালো এক ক্ষয়নরলে ধর্মের কিছু আকর্ষণ মনে ছিল, গরিবত বরলে বৈদ্যময় শৌখিন ধর্মগ্রহ

পাঠ করতেন। ১৯১৪ ইষ্টাব্দে পার্গেট *Knowledge in the Door: a Forerunner* সাক্ষাৎ ধর্মবিশয়ক পুস্তিকা রচনা করেন। বার্নার্ড শ’র মতো তিনি সজীত-বসিকা ছিলেন না; এমন কি, খিস্টোবেও তেমন আগ্রহ ছিল না। আর সবচেয়ে বিবাহ ছিল শ’র অসংখ্য গুণমুখ চক্রে প্রতি। বীরপুত্রের এই আগ্রহে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করতেন। বার্নার্ড শ’র বাড়িতে চকরা প্রবেশ করলে শ্রীমতী পার্গেট শ’কেই অনাড়ত বলে মনে করত। আর সবচেয়ে বিশব হত, তাহলে হাত থেকে বার্নার্ড শ’কে ছাণ করা। শ’র নির্দেশ ছিল এই বিশপে উদ্ধার করা। পার্গেট প্রচার-বিশূণ ছিলেন, কিন্তু বার্নার্ড শ প্রচার গচ্ছ করতেন। এমন কি দিগটাগ্রাও তোলাতেও সহ্যে রাজী হ’তেন না।

সামীর রচনার তাঁর সমালোচনা করতেনও পার্গেটের বাপতো না। যে বই সকলে প্রশংসা করত, পার্গেট তার নিন্দা করেছেন। সাম্প্রত্য আলোচনায় য়েব থাকতো, অবশ্য সেই বিষয়ে বার্নার্ড শ’র প্রাধান্য বৈ। অথচ উভয়ের মধ্যে সার্থক সখ্যতার স্রষ্টা হয়েছিল।

১৮৯৭-এর বয়সকাল।

ওয়েব-বস্পতিরা তখন Tower Hill, Dorking-এ সাময়িকভাবে বাস করতেন, সঙ্গে আছে নিন্ পেইন-টাউন-সেও। বার্নার্ড শ বসিত এই পরিবারের স্বাতী অতিথি, নিমমিত-ভাবে থাকে থাকে লগনে খাতায়াক করতেন। রাতে ট্রেনে বসে এসে টেরীকে চিঠি লিখতেন।

“মিস সি.টি. আমাকে ধরে ফেলেছেন। বলেছেন, আমি নাকি তাঁর দেখা মানুষের মতো প্রের্তন আছোকেত্রিক ব্যক্তি। তোমাকে যদি এইখানে অনন্তে পারতাম, মিসেস ওয়েব, মিন্ সি.টি. বিয়েটি স (লগনের বিপণের কক্সা), ওয়েব আর আমি—হায়রে, চারজন অনেকজন ! জানি না তুমি কি মনে করতে,—আমাদের এ চিরন্তন রাজনৈতিক হাট। প্রাতে আহব্রা লিখি, প্রত্যেকেই অল্প বিভিন্ন বন্ধ আছে, সহজ সাধাণিখে আহ্বার। তারপর বাইনিকলে শ্রমণ। প্রমিক ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানে ওয়েব-বস্পতির অসম্মা উৎসাহ—। মিন্ সি.টি.—এই নীপনয়না আইবিশ যেহেটর কাছে সব-কিছু ‘ডেরী ইন্টারেক্ট’—আমি সর্বসা জ্ঞাত, সান্ত। সর্ববাই এসেনকে নাকি পত্র লিখছি। তিনঘণ্টা এইভাবে থাকলে তুমি হয়তো মারা পড়বে। যদি—যদি...”

এই বছর শরৎকালের মধ্যে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তর হয়ে উঠল। বনমাউথে ওয়েব-বস্পতির অতিথি

হিসাবে হুজুন দিন কাটাচ্ছেন, প'র তার পরল এবং বিরল নাটক (Plays—Pleasant and Unpleasant) প্রকাশ-ব্যবস্থায় হস্ত। মাঝে মাঝে মিস্ টাউনসেণ্ড বলেন—“What an utter brute you are—”। শ' এলেনকে এক পরে লিখেছেন—“তোমার সখ্যে ও বিশেষ আগ্রহশীল, তোমার জনপ্রিয়তা; কিন্তু এর কারণ নয়, সে এতদিনে আবিষ্কার করছে যে আমার ‘স্বাধ আচ্ছ’ বা ‘বিশেষ সরকারের’ অর্থ অনেকক্ষেত্রে তোমাকে চিরিৎসা।”

১৮৮৭-এর গোড়ায় মিস্ টাউনসেণ্ড প'র সেক্রেটারি হয়ে পাড়ালেন। সস্ত্র হলে সেবা করতেন। লণ্ডন কুল অব একনমিস্-এব ওপরকার হাটে মিস্ টাউনসেণ্ড থাকতেন। শ'র সভ্যতা অনেকসময় সেখানেই কাটতো। একসঙ্গে পাতে হেঁটে যেতেন। শ' লিখেছেন—“মিস্ শিটি-র নিউকাসলিয়া ছিল, এখন আর তেমন নেই। আগে আমার সঙ্গে হাটতে পাড়ি যেতিন প'র হাসিয়ে বলত—‘আমি এম্ব্রাস হেনের মতো ছুটতে পারিনা’; এখন শীঘ্রপথ বিনা ক্লান্তিতে আমার সঙ্গে চলতে পারে।”

এইভাবে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে চললো, এলেন যন্ত্রের প্রেমের আঘাত এতদিন শারীর্যের ঘন থেকে ঘীর ঘীর মিলিয়ে এল। এতদূরী টোরাগের ওপরকার প'র নির্দিষ্ট উপস্থিতি সবে ও উভয়ের মধ্যে বিবাহের প্রসঙ্গ ওঠেনি।

এলেনের চোখে কিন্তু আসল ব্যাপার ধরা পড়েছে। এলেন লিখেছেন—“তোমাদের দুজনকে স্পষ্টে পাচ্ছি,— চন্দ্রকার দুগাশা, তোমাদের পরস্পরিত আলোক বিচ্ছুরিত—এ আমার ইগা নয়, কিন্তু আমার চোখ সম্মল হয়ে উঠেছে, তোমাদের মধ্যে একজন হতে ইচ্ছে হয়, যে-কোনো ঘন হলেই হয়—কিন্তু শ্রিয়তম, তুমি যদি ভর মতো স্থনী না হয়ে থাকো তাহলে বলব, অব্যর্থ কালহরণ করছ। তুমি স্থনী হচ্ছে? হওনি? আমাকে জানিয়ে।”

এই চিঠি লেখার কিছু পরেই লাইদিরাম থিয়েটারের পর্দার ফাঁক দিয়ে বার্নার্ড শ'কে দেখেছিলেন এলেন। এই বছরেই চিশেথের *Cymbeline* অভিনয়ের শেষে গ্রীনকমে মিস্ টাউনসেণ্ডকে নিয়ে আগার মন্ত এলেন টেরী শ'কে চিঠি বেন,—উত্তর শ' লিখলেন—

“মুশকিল এই যে, মিস্ টি. স্বয়ং তোমাকে না দেখলে, তাঁকে দেখতে পাবে না। সাধারণতঃ তিনি ক্রমবহিলা-জাতীয় প্রাণী, তাঁর দিকে দৃষ্টিতে কেউ একাদিকবার তাকাতে না, নিজের ক্ষেত্রে এইভাবেই তিনি প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চ, মধুর তাঁর

প্রকৃতি। তার বেশি কিছু হতে চান না। একবার ঘনিষ্ঠতা ঘটলে, এইমত নুশোলের মতো ঘন থেকে সরিয়ে নেবেন। তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখানোর মতো হৃদয় সংকরণের মধ্যে নয়। মেয়েটি একটি সাধারণ বোকা মাত্র নয়, বাকিবে মহীধানে।”

এলেন লিখেছেন—“আমার শ্রিয়বজুর স্বর্গের পোনার তত্ত্ব আবি আচ্ছ হয়ে উঠেছি। ওহে চতুরপ্রবর, তাঁর প্রতি আঘার মনোভাষী দৃষ্টিতে তুমি বুঝবেন। আমার হৃদয় তাঁর তত্ত্ব অবনত হয়ে আছে—”

শ' কিন্তু চান না যে এঁরা দুজনে বিধাত নীতি এবং মুখ সর্পকের মতো পরিচিত হবেন, সহজ সাধারণ ভাবে পরস্পরের পরিচয় হওয়া উচিত। এই চিঠিতে এলেন বিরক্ত হয়েছিলেন, এবং এর পরের চিঠিতে শ' যেভাবে এলেনকে অগ্রময় করে-ছিলেন তা উপভোগ্য। বার্নার্ড শ' মিস্ টাউনসেণ্ডকে কী চোখে দেখেছেন তা এই চিঠিগুলিতে সহজে বোঝা যায়।

শ' যে-ঘরটিতে কাজ করতেন সেটি অতি ছোটো, অতি বিশুদ্ধ অথবা। কি শৈতে কি গ্রীষ্মে বিবাহের আনন্দা খোলা থাকতো, ঘরের আলবাব বা বইগরে অল্পদূরীত্ব সম্মত। টেবলের ওপর প্রচুর চিঠিপত্র, রচনা পাণ্ডুলিপি, বই, বাম, চিঠিলেখার কাগজ, সামগ্রিকপ্রদাদি, মাখন, তিনি, আগল, ছুরি, কাটা, চাকচ, এমন কি অপরীত বোকার কাপ পর্বত জনানো। সব-কিছুর ওপর থুলা সম্মত। কোনো কিছু স্পর্শ করার উপায় নেই। মাঝে মাঝে পরিহার করার কৌশল চাপতো, তাতে দৃষ্টিতে ছ'দিন লেগে যেত। সে কাল করতে বার্নার্ড শ'র ভালো লাগতো। শ'র জননী কেনোদিন এখানে আসেননি, ভগিনী লুসী অগ্রম থাকেন, তিনিও আসেন না। মাঝে মাঝে সেই ভাকার বাতুলটি ছ'চারটি টাকার মন্ত আসেন, রত-জানান্য করে চলে যান। এই নোঙরা ঘরটিতেই বার্নার্ড শ'র দিন কেটে যায়।

এমন সময় সহসা শরীর ভেঙে পড়ল। ভূতার ফিতা খুব টান করে বাধার কুলে পাবে যা হও, কিন্তু অতিরিক্ত পরিগ্রহ এবং দ্বিতী পরিবেশে সময় কাটানোর মন্ত এই অস্থূহতা আরো কেড়ে ওঠে। মিটিং, বিরেটার, কমিটি ইত্যাদিতে অধিকাংশ সময় কেটে যায়—এরও পরিগ্রহ।

পায়ের বা পরীকা ক'রে অস্ত্রোপচারের পর দেখা গেল ‘নেক্রসিস অব বোন’ (অস্থিকর) হচ্ছে, পায়ের হাড় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তখনকার প্রচলিত চিকিৎসা-পদ্ধতিতে কিছুতেই

যা আর উপাধ না। অঠোতো নাম কাল বার্নাড শ 'জ্যেডস্' পরে চলাফেরা করেছেন। এলেন টেরী লিথলেন—"পারের মস্ত আমি শক্তি হচ্ছি, তুমি বর: মিস্ পি.টি.-কে বলে, তিনি এসে তোমার দেখানো করুন।"

নার্নোটেক অগ্ররোধ জনোনের প্রয়োজন হল না, তিনি সংবাদ পেয়ে বার্নাড শ'র মিউজরব কোয়ার্টার ভবনে ছুটে এলেন। পারিশ্রাবিক অবস্থা দেখে তিনি অভিভূত হতে পড়লেন, নার্নোটেক তখনই তাঁকে পলী-ভবনে নিয়ে গিয়ে পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে চান।

বিবাহ সম্পর্কে শ'র মতামত অতি বিচিত্র এবং মূল্যবান। পরবর্তী অংশে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সংযোগ পাওয়া যাবে।

শ বলেছেন—"যে কারণে বিবাহ স্থির করলাম, কোনোদিন তাবিনি এই কারণে আমি বিবাহ করব। আমার চাইতে অপর এক প্রাক্তির কথাই বেশি ভাবতে হয়েছে। এখন আমার পরামর্শ নির্ভরশীল।"

ইংলণ্ডের রাজসিংহালানে তখন কুটন ডিস্টোরিয়া আশীন। অকৃতকার্য পুঙ্ক এবং ব্রহ্মচারিণী রমণী একত্রে দিন কাটাবেন, এ ব্যবস্থা লম্বাঘের কাছে দৃষ্টিকটু এবং অসহনীয়। সেবা-ব্রতের সাধু উদ্বেগ কেউ বুঝবে না। তিনি বললেন—"কোমার বাড়ি যদি নিয়ে যেতে চাও তাহলে তোরা ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে বিবাহের নোটিশ শেপ করো।"

আপত্তি না তানিয়ে নার্নোটেক টাউনলেও বিবাহের মস্ত আবেশন করলেন। ১৮৯৮ ইষ্টাকের ১লা জুন, লওন-কাউন্টির স্ট্যাণ্ড ডিস্ট্রিক্টের রেজিস্ট্রারের অফিসে আইন-নিষ্ঠ বিবাহ হবে।

সাক্ষী হিসাবে গ্রাহাম ওয়ালশ আর হেনরি স্টুট উপস্থিত। পায়ে অর্ধ বার্নাড শ দুটি জ্যেডসে ডর দিয়ে এসে হাজির হয়েছেন, শারী মিস্ নার্নোটেক পেইন-টাউনলেও-ও উপস্থিত।

শ বলেছেন: "রেজিস্ট্রার আগ্রহ ডাবেননি আমিই পায়, ভেবেছিলেন এইমাত্র বিবাহের শোভাযাত্রার অংশ-গ্রহণকারী ভিক্ষু নাত্র। ওয়ালশ গ্রাহাম স্টুট লম্বা, সুতর্য: এই উৎসবের মাহক হিসাবে রেজিস্ট্রার তাঁর সঙ্গে আমার বাগুস্তার নিয়ে মিল্লিলেন আর কি! ওয়ালশ বেচারী দেখলেন সাক্ষীর শব্দে এই ব্যবস্থা কিং কঠোর, শেষমুহুর্তে ইন্তরত ক'রে, উপহার আমার মস্তই রাখলেন।"

রেজিস্ট্রারের অপরাধ নেই, বার্নাড শ এইদিন একটি পুরাতন শব্দটির জন্য গায়ে দিয়ে বিয়ে করতে এসেছিলেন, বহুতা কিন্তু উত্তম শাসনক্ষম করেছিলেন।

বিবাহের পর নবন্যপতি পিটকোর্ড-হাসলমেরারের পলী-ভবনে গেলেন। নিলেদ শ শ্বানীর ভগবাগ্য উদ্ধারের মস্ত অক্লান্ত পরিশ্রম হুক করলেন। বিভিন্ন বিবাহের বিভিন্ন মধুম্মাষিনী।

অনববৎ সমাজ



ক্যালকাটা অপটিক্যাল কোং (প্রাইভেট) লিঃ

ফোন - ৩৫ - ১৭১৭ প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কার্শিক চন্দ্র বসু প্রভৃতি
গ্রাম - কালকণ্ঠটাকা • ৪৫ নং আন্তর্জাতিক স্ট্রীট • কলিকতা - ৯



নেপালের ভীমফেদী উপত্যকা

মহাশিবরাত্রে নেপাল তীর্থে

ঐকজিতকুমার ঐমানী

ভারতীয় বঙ্গোপ স্টেশনে রাাত্রি ষাটটির সকালে নেপালের যম্মৌল স্টেশনের ছোট ট্রেনে উঠে গুন নেপালম, সাতবার গাড়ি পাঠানো হ'ল। একে সন্ধানই পত্রপতিনাথের দিব-
রাতের মেলায় ভীড়, তার আগের একখানি কেল-ট্রেনের
গওগোলে একসঙ্গে তিনখানা ট্রেনের যাত্রী এসে জমা
হয়েছিল মোকামার শীঘ্র-ঘাটে। গভীর হু'গারের স্থানীয়ও
এ অযোগ্য ছাড়েনি। তারা মোট-প্রতি দু'টাকা নেবে
ভানিয়ে তবে মাল তুলেছে যাত্রীদের। আমানের চার বছর
মালগছ থাকিছু শিঠের স্থানিতে ও হাতে হাতে। তাই
নিশ্চিত।

নেপাল সরকারের ছোট ট্রেনে উঠতে পেরেছি কলকাতা
শহরের চল্লি ট্রেনে বাসে ওঠা-নামার অভ্যাস আছে বলে।
অনেক যাত্রী ট্রেনে উঠতে চেষ্টা করার আগেই তিল-খারগর
আধণা হইল না। যেমন গাড়িতে ছিল তেমন গাড়ির
হইল তারা। পক্তি-সামর্থ্যহীন কয়েকজন পূণ্যার্থী বুঝা
যাত্রীদের নিকে চেয়ে মনটা কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।
এরই মধ্যে দু'একজনকে উঠিয়ে নিতে চাইলাম, কিন্তু তারা
সাহস করল না এভাবে বেতে। কয়েক ঘণ্টা পরে আবার
একখানি মালগাড়ি ছাড়বে যাত্রীদের নিয়ে বাবার সঙ্গে
ভুলে কিছুটা সাহস্য পেলাম। যে-কোনো গাড়িই হোক,
স্টেশনে পড়ে না থাকলেই হ'ল। এ পরে সকলেই একাধ।

কতরকম বছরের কত যাত্রী অন্যাহারে, ভীড়ে, মাইলের
পর মাইল পায়ে হাঁটা পরে দু'কতে দু'কতে কোনরকমে
তীর্থের মন্দিরপার্শ্বে বা কোনো উন্নত আশ্রয় নেয়। নিষ্টি-
কণে ঘান ও পুন্ডা সেয়ে ফুল ফুড়িয়ে আবার সেই কষ্ট
সহ করে ফিরে যায়। পথপ্রবে, ভীড়ে, স্টেশনালিতে,
হুটিনাথ কত যাত্রী জীবন নিয়ে আর খরে করে না।
এ দেখেছি তেরশো-পঞ্চাশের হরিবারের কুন্তলোয়, দেখেছি
গাড়োয়ালের পথে, আবার নেপালের পত্রপতিনাথের মেলাতে
গিয়েও হস্তে তাই দেখে। এই ভাবেই দু'প দু'প ধরে যাত্রীরা
কেন্ এক অবস্থা প্রেরণায় বেরিয়ে পড়ে তীর্থের পথে।
এই ভাবেই বেতে দেখেছি অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে, বধকে,
অন্ধকে। আবার স্ত্রোপাত্তীবিনীসেরও। শুধু মন্দির ও
বিগ্রহে ঘর্ষনেই তাদের সব প্রেরণার অবসান। আর কোনো
কিছুতে চান নেই তাদের। প্রকৃতির সৌন্দর্য নয়, মন্দিরের

শিল্পকার্য নয়, ইতিহাস নয়, কাহিনী নয়। তীর্থের পথে এই
ধরনের যাত্রীই বেশি।

অমলাকীর্ণ তরাই অকালের ছোট ছোট স্টেশন বীরগছ,
জীতপুর, সীমরা শিঠনে কেসে অবলম্বনগত এসে পৌছলাম
বধন—তখন বেলা দুপুর। প্রপথ রৌদ্রে সব কলমে রয়েছে।
ঘামে, ধুলোয়, অন্যাহারে ও ভীড়ের স্টেশনালিতে আমানের
শরীর ও মনের উৎসাহ প্রায় স্তিমিত। এখানকার বাসের
একটি লোক আমানের নিয়ে এসে তুললো একটি হোটেল।
সকালের নিক একসকাল বাস ও গাড়ী চলে গেছে। গাড়িগুলি
কিরে আসার সময় হয়ে এসেছে বলে। লোকটি আগে থেকে
যাত্রী ভোগাড় করে রাখতে চায় বুদ্ধলাম। প্রানের জন্ত
জামা খুলতে গিয়ে তিনলান, যাত্রীর ভীড়ে ওল পাওয়া
দুসর। কলের কাছে যাত্রীদের, বিশেষ করে স্ট্রীলোকদের
গওগোল ও বচনা। লোকানের মালিককে অহবোধ করে
তাদের ভোলা মলে কোনরকমে ঘান সেয়ে কেললাম।
আহার খুব উপায়ের না হ'লেও পরিমাণে কিছু কম হ'ল না।

পাশে একটি অশ্বখগছের তলায় অনেকগুলি ভদ্রমহাশা
কৌপীনধারী সাধু ধুনি জালিয়ে বসে গেছে। এত সাধু-
সন্তানীর ভীড় এর আগে কখনও দেখিনি। কুনেছি,
সাধু অহুয়ারী মোটা, কবল, টাকা ও বাওরা-শওয়ার
ভালো ব্যবস্থা হয় মেলায় সময়। সেতে-অংশতে ট্রেনের
মালগাড়িগুলি প্রায় সব সাধু-সন্তানীতে ভর্তি দেখেছি।
অনেক সাধু পায়ে টেটেও চলেছে। স্টেশনে গাড়ি থাকলে
তাদের মধ্যে অনেক চেল-সাধুও ভোর করে সাধুদের
মালগাড়িতে ধরে তুলে নিয়ে নিজেরা উঠে পড়ছে। অনেক
আবার উঠতে চায়নি বলে চেলারা শিঠন থেকে গালিও
দিয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য হ'লান, কেরার সময় বধন অনেক
সাধুকে কাঠমাঠর বিদ্যাবন্ধরের বিদ্যার মাপকাঠি বলে
থাকতে দেখলাম।

সকালের গাড়িগুলি একে একে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে
যাত্রীদের গোলমালও বাড়ছে। বাসে উঠতে আমানের
বেলা তিনটে বেজে গেল। আমানের ডাকগাড়িটি ছাড়বে
সকলের শেষে। ভ্রাইভারের পিঠনে একটুখানি ঘেরা
জাঘরায় মুখোমুখি আমরা বসলাম। যম্মৌলে সাময়িক
আরও চার বছর হল ফিলে এখন আমরা আটজন। বাসট



দুহীক্ষেতে তীর্থযাত্রীদের বিশালদ্বার

নাশি উভয়দিক। কোনরকমে তমঃপেক লোক বগতে পারত, কিন্তু হাটু রাখার চাঙ্গা এত কম যে আউলনের বেশী বসা যাব না। গাড়ি স্বখন ছাড়ল, গুনে বেধি বারোজন লোক চুককি। আনাদের কোনো আশঙ্কি ছিল না যদি হাটুর উপর আরও হাজন উঠে বসত। কিন্তু করবই বা কি! আমাদের নাথঙলি গাড়ির প্রায় চালের সঙ্গে ঠেকে আছে। গাড়ি চলতেই বৃকতে পারলাম, শুধু হাটুতে হাটুতে নঃ, কপালে কপালে হোকাটুকি হবারও আশঙ্কা আছে।

সেই উচুনাচু পার্বত্য পথে গাড়ী চলছে—পথে পড়ে শাব, নসী, তরনা, গাহাড়ের ঝাঁক। নেপালের রঞ্জোল থেকে স্বেলে অন্ডলপগর ও অন্ডলপগর থেকে বাসে ভীমফেলী—আমাদের বাক্সপথ। বিকালের দিকে গাড়ি এসে বাড়াল একটি গাহাড়ের হুড়ুয়ের সামনে। বাত্রীরা বাবা পণ্ডপতিনাথের নামে চৌকায়কানি দিতে লাগল : গাড়ি সামনের হেড-লাইট জ্বলে হুড়ুয়ের ভিতর ঢুক পড়ল। বেগ ধানিকঞ্চন সময় লাগল আলোর বেরিয়ে আসতে। ভীমফেলীতে পৌছবার অনেক আগেই সন্ধ্যা পেরিয়ে যায় হ'ল। উপত্যকাটি ঘেরা গাহাড়ের কোলে বলেই রাতের অন্ধকার এত গভীর হেখাছিল। গাহাড়ারালের অতি দুর্গম পথে বাসে চড়ে ভব ও আন্তঃ আমাদের অনেকটা কেটে গিয়েছিল। কিন্তু অন্ধকার পার্বত্য পথ খুব নিরাপদ বোধ করছিলাম না।

গাড়ি থেকে নামপত্র নামাখার সময় ভাবছিলাম, এই রাত্রে গাহাড়ী মায়গায় কোথায় আশ্রয় পাব। পথে তীর্থযাত্রীদের সাহায্যের অন্ত অনেক নেপালী ছাত্র ও

বেচ্ছাসেরকরের এগিয়ে আসতে দেখেছি। পণ্ডপতিনাথের বাড়ী শুনে একজন নেপালী ডঃলোক সামনের একটি শাকাবাড়ির দেতলার খয়ের তালি খুলে আমাদের রাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। ভাবলাম, কোনো পাণ্ডা বা খালি হলে—পরে কিছু দক্ষিণা দিলেই চলবে। ধানিকঞ্চন পরে একটি ছোট ছোলে আমাদের খোজ দিতে আসতে এ কুলটা ভেঙে গেল। এটি যে একটি ফুলবাড়ি তা বৃকতে পেরেছিলাম হেরালের ব্র্যাক-বোর্ড ও খয়ের বেকঙলো থেকে। ছোলেটি ফুলের ছাত্র, উপস্থিত বেচ্ছা-

সেবক। ফুলের নাম ভীম-আখার হাইবুল এক ডঃলোকটি ফুলের প্রধান শিকক। শহরের আবহাওয়ার আমরা একটু ষার্থযে'বা হয়ে পড়েছি। তাই অব্যক্তি কোনো উপকার নেলে, এই খয়নের একটা সন্ধ্যা মনের মধ্যে এসে পড়ে। তবু সংখ্য—কোনো মতলব নেই তো ?

ভীমফেলী থেকে থানকোট হাইল চোদ পার্বত্য হাটোপথ। পরদিন কুলী-এজেন্সি অফিস থেকে কুলী-ক্রটি পাঁচ টাকা জমা রেখে একশফলাই একটি লাঠি কিনে চড়াই-পথে উঠতে হুক করে দিলাম। পথ খুরে খুরে ক্রমে উঠে এসেছে এক বিশ্রামস্থানে—দুহীক্ষেতে। কয়েকটি খাবারের দোকান ও মলের দ্রুবিধা থাকায় অনেক যাত্রী এখানেই স্নানাহার শেষে নিতে বসে গেছে। দুহীক্ষেতে থেকে আবার উঠতে আরম্ভ করে সীমাগড়ি গাহাড় ভিত্তিয়ে একসময় আন্তে আন্তে নেমে এসাম কুলিখানি গ্রামে। পথে তঃনছিলাম, এখানে হোটেল পাওয়া যাবে। কিন্তু তার কোনো সন্ধান না পেয়ে একটি দোকান থেকে চাল, ডাল, আনু কিনে ও তার সঙ্গে তৈজসপত্রাদি নিয়ে রাত্রা চাপিয়ে দিলাম। এগবে আমরা খুব সম্ভ্রান্ত ছিলাম।

যতী দুহীকের মধ্যে একটি গাঁকে পেরিয়ে আবার হাটা আরম্ভ করে দিলাম। শরীরে বেশ তৃপ্তি ফিরে এসেছে অনেকটা আহার পেয়ে। কুলিখানি থেকে পথ অনেকটা সমতল, মাঝে ধানিকটা উচুতে উঠে একেবারে পরিষ্কার পায়চলা পথ নেমে গেছে চেংলাঙ গ্রামে। খোকা-খোকা টকটকে লাল একরকম ফুল দুটে রয়েছে পথের ধারের গাছগণিতে। প্রকৃতিসেবী যেন পথ আলো করে রেখে

দিয়েছেন যাতে বাত্মীরে পাহাড়ের চক্কতা না লাগে। নাম অনুসারে 'চরকচুল' এবং এখানকার লোকেরা এগুলি আহ্বারের কাজেও লাগায়। শেষের অনেকটা পথ খুব আহ্বারময়ী চলে এলায়। বেলা পড়ে সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঝেঁতে কাপুনি ধরলো।

অনেক চেষ্টার পর ধর্মপালার দোতলায় একটি ঘর পাওয়া গেল। নামেই সোতলার ঘর। অল্পকালে অনেকগুলি উঁচুনিচু গোয়ালের মতো ঘর পরিয়ে মল-কাশা ঝাড়িয়ে অতি সাবধানে কাঠের ভাঙা মি'ডি দিয়ে উপরে উঠে আসতে হ'ল।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে রাত কেটে গেল।

সকালে বাঁধাছালা দেয়ে চেংলাড়ের ধর্মপালা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। চারিদিক ছায়াপার ভরে আছে। পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না। গতকাল কুলিখানির আগে সীঙ্গাগড়ি পাহাড় পেরিয়ে এসেছি, আজ চম্পাগড়ি পাহাড় ভিত্তিরে করেচক্কতার মধ্যে বানকোট পৌঁছে যাব। 'গড়ি' অর্থে খাটি-পাহারাকে বোঝায় বলে মনে হয়। মাত্র আর মাইল দু-আড়াইয়ের মধ্যে ঠাটা পথ শেষ হয়ে যাবে। চম্পাগড়ি পাহাড়ের জনসাকীর্ণ চড়াই পথটুকু বেশ কঠোর। কৌপীনসার ভরসাধা এক সাধু চিমটে বাকিয়ে, কয়েকটি চেলা-সাধু সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। বেশ হাসিখুঁচি মিলখোলা ভাব। সন্ধ্যার সঙ্গে গল্পও হ'ল অনেক। কোন্ তীর্থে কতবার গেছেন, কোথায় কিরকম ভাওয়া পাওয়া যায় ইত্যাদি নানান অভিজ্ঞতার কথা শুনে শুনে চলেছিলাম। তাঁদের গাঞ্জার ছিলিমের তৃষ্ণায় আমাশের মাঝে মাঝে বলে কিছু সময় দিতে হয়েছিল।

চম্পাগড়ি পাহাড়ের (১,৭০০ ফুট) উপর থেকে ডেউএর মতো নেপালের তুমারচন্দ্র চূড়াগুলি অসুত হুল্লর দেখায়, নীচের দিকে দেখা যায় নেপাল উপত্যকা ও বানকোট থেকে কাঠমাণ্ডুর সূর্য পথ। এখান থেকে ঝাড়াই মাইল-বানেকের পথ নেমে গেছে বানকোটে।

রাজ্যল থেকে কাঠমাণ্ডুর যে ৭০ মাইল 'ত্রিভুবন রাজপথ' তৈরি হতে শুনেছিলাম, তা যেতে পেলাম বানকোটে পৌঁছে। অনেক দুর্গমে ডিমায়াই দিয়ে নিরেট পথেবের হুপ নাটিয়ে পথ-তৈরির কাজ এগিয়ে চলেছে। আজ বসন্তীনাথের পথে বোম্বাই, গংকাতরীর পথে উত্তরকাশী এবং কৈলাসের পথে ধরতলা পর্যন্ত গাড়ি-চলাচলের পথ-তৈরির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নেপালের এ পথটুকু তৈরি হবে গেলে ভারতের সঙ্গে বাতায়াত, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির সুবিধা হবে। কোনো প্রাঙিতে উঠে বসলেই এখন বানকোট

থেকে শাক্য রাজ্যের উপর দিগে ছ'মাইল পথ কাঠমাণ্ডু চলে আসা যায়।

কাঠমাণ্ডুর অতিবেড়তা-বিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অল্পমতি নিয়ে ত্রিপুরাবার বাগমতী নদীর ধারে গেষ্ট-হাউসে আশ্রয় দেয়ে গেলাম। কাঠমাণ্ডুর বেশ স্বন্দর ভাড়াগার এই গেষ্ট-হাউসটি, কৃচ্চাওয়া-মহাদানের পাশে বিনমলতা একখানা শাক্যাবতির একবারে উপরের ছাটটা আমাশের চক্ক চেঁড়ে দেওয়া হ'ল। এ যেন কলকাতার চৌরঙ্গির মনোনের সামনে 'গ্র্যাণ্ড হোটেল'। কার আমাশে পথকে আশ্রয় করে বেরিয়ে গড়ি, আর কার যোগাযোগে সকল বাগ-বিশদ কাটিয়ে একসময়ে সবচেয়ে সেরা আরাম ও স্বাস্থ্যের মধ্যে এসে পড়ি তার বোগমতী খুঁজে বার করার কনতা আমাশের নেই! শুধু আশ্রয় নয়, তার সঙ্গে ছুটে গেল আহ্বারও।

দোতলায় ঠিক আমাশের নীচের অংশে এক নেপালী ডহমহিলার সঙ্গে আমাশ হ'ল। তন্দর হুটি ভেটে ছেটে মেয়ে ও বারো-ত্রয়োদশের একটি ছেলে নিয়ে তাঁর পল্লার। যামী সন্তানবিভাগে চাকরি করতেন। কয়েক বছর আগে কাতে বেরিয়ে হঠাৎ হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। নেপাল সরকার থেকে উপস্থিত এখানে আশ্রয় পেয়েছেন, বতরিন না একটা শাক্যশাকি ব্যবস্থা হয়। ইনি নিজেও একসময় রাজনীতি নিয়ে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন জানা গেল। মহিলার নাম তরা দেবী। কলকাতায় মাতৃহৃৎ হওয়ায়, বাঙালীর সংসারের আচরণ-ব্যবহার কোনো-কিছু জানতে বাকী নেই তাঁর। এত বাঙালী-ভক্ত সে, বাঙালীর মতো ছেলের নাম রেখেছেন শীমেশ। তিনি ও তাঁর ছেলে পরিষ্কার বাংলা বলতে পারেন। আমাশের পেয়ে ঠিক হ'ল যে, আমাশের আটমনের আহ্বারের ভার তাঁর ওপরেই ছেঁড়ে দিতে হবে।

সন্ধ্যার অনেক আগে থেকে আকাশে মেঘ ভরময়ে হয়েছিল। বৃষ্টি বন্দন নামল তখন আমাশ; তারাতরী ও লীটকে সঙ্গে নিয়ে একটি বাবারের গোসানে সকলে মিলে চুকে পড়েছি। হাতে চাষের গেলান নিয়ে রাজ্যের দিকে বসে বৃষ্টি-পড়া দেখছি ও উপভোগ করছি। ঠিক সেই সময়ে প্রকৃতিদেবী আমাশের গন্তকালের হাটপাথের বাত্মীরের ওপর নির্মম নির্ভর আঘাত হেনে চলেছিলেন তা তখন জানতে পারিনি। বাড়ি ফিরে সংবোধন হয়ে, সীঙ্গাগড়ি পাহাড় ভিত্তিরে কুলিখানি বিশ্রামস্থলে পৌঁছবার আগেই হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে এক অগভ্র কড় উঠে পতগতিনাথের বাত্মীদলকে আক্রমণ করে। সেই ঝড় ও হলের সঙ্গে ক্রিস্ট-বলের মতো



কৃষ্ণ-নীলকণ্ঠ অবলম্বনে বিহু-মূর্তি

বড় বড় শিল্পী পড়তে থাকে। তাতে প্রায় পাঁচজন নিহত ও প্রায় হাজার ঘায়ে আহত হয়।

অমর্য্য মঠ ও মন্দিরের বেশ নেপাল। খোড়া-মৌসুমের কোনো খেলপুতী থেকে কন ঘাবে না। দেশাল-রাজ্যের পূর্বে সিংহ ও শক্তিমা, পশ্চিমে আলমোড়া ও গাজীয়ালা, উত্তরে হিমালয়ের উত্তর ভূবার-চূড়ার শিখরে তিস্তা এবং দক্ষিণে ভারত। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতচূড়াগুলি—গৌরী-শঙ্কর, হিমালচুন্দী, এভারেস্ট, কাকনজয়া, খলগিরি, মাকালু, মানাসলু, অন্নপূর্ণা—এই নেপাল-সীমানার মধ্যেই পড়ে। কাঠমান্ডু সন্দ্বর্শন থেকে মাত্র লাড়ু চার হাজার ফুট উঁচু।

১৭৩২ সালে গোরখা-রাজ পৃথ্বীনারায়ণ নেপালের ছোট ছোট রাজ্যগুলি অধিকার করে প্রথম সমগ্র নেপালের শাসনভার গ্রহণ করেন। বর্তমান রাজা হলেন সেই কংশেরই ঈশ্বর মহারাজাবিরাজ মহেন্দ্র বীরবিক্রম শাহ দেব। পুঙ্খানুপুঙ্খম্বে প্রধানমন্ত্রী বা রাণা শাসকেরা প্রজাদের ওপর যে অন্যায়, অত্যাচার করে আসছিলেন, আজ তার অবলম্বন হয়েছে। শাসন ও সেবায় গেছে। শেষ পরিণতি ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসের গণবিদ্রোহ—নেপালের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় অধ্যায়।

১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে হুইকারল্যাণ্ডের দ্বিতীয় শহরে মহারাষ্ট্রাবিরাজ ত্রিভুবন বিক্রমের আকস্মিক মৃত্যুর পর তার ছেলের হাতে দেশের শাসনভার এসে পড়ে। আন্দোলনের পর আজ পাঁচ বছরের মধ্যে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থির

এসেছে। উপস্থিত শাসনকার্য পরিচালিত হচ্ছে দেশের জনগণের দ্বারা গঠিত মন্ত্রী-সভার সাহায্যে।

বেড়গো বছর ধরে অনেক বড়বড় ও হতাশা-ভর মতো যে রাজত্ব চলে আসছিল, তারই গোড়ার দিকে প্রধান-মন্ত্রী ছিলেন ভীমসেন থাপা। কাঠমান্ডুর কেন্দ্রস্থলে ময়দানের পশ্চিম দিকে ময়দেমের মতো যে উঁচু ভবনটি (বারা) তিনি নির্মাণ করান, তা আজও আছে। ১৮৩৭ সালে ভীমসেন আত্মহত্যা করেন। সামনেই রাজ্যের ওপর অবশেষে সেনাপতি সন্ন বাহাদুর রাণার একটি প্রজ্ঞাপত্রটি চোখে পড়ে। ১৮৪৬ সালে সন্ন বাহাদুর রাণা প্রধানমন্ত্রী হন এবং ১৮৭৭ সালে ৪২ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর সময়ে

দেশের অবস্থা খুব শাস্ত্রপূর্ণ থাকায় নেপালের রাজা প্রধানমন্ত্রী সন্ন বাহাদুরকে প্রথমে ‘মহারাজা’ উপাধি দেন।

ময়দানের উত্তরদিকে একটি পুত্রবিহীন মাকে ছোট একটি মন্দির আছে। উপস্থিত অব্যবহার্য হয়ে পড়ে থাকায় মন্দিরের দ্বারদ্বার খুঁটি খুব অপরিষ্কার হয়ে আছে। পুত্রবিহীনের নাম রানী-শোপনী। নেওয়ার রাজা প্রতাপমল্ল তাঁর রানীর নামে এই পুত্রবিহীনি খনন করান। পিছনে ত্রিভুবন ও হস্ত সামন্তের নামে ‘মি-হস্ত কলেক’-এই উঁচু ফটাঘড়ি। এই কলেকের পাশ থেকে নেপাল-পরিভ্রমণের জন্য নোটর, জীপ ও লরী ভাড়া পাওয়া যায়।

ময়দানের মাইল দুই উত্তরে মহারাজার প্রাসাদ ছাড়িয়ে নাগার্জুন পাহাড়ের কোলে বালান্দ্র গ্রাম। বালান্দ্রতে ছোট একটি জলাশয়ের ওপর নগ্নত বসন্ত স্নানের শাখার ভগবান বিক্রম অর্পণ হলের একটি শ্রবণ প্রজ্ঞাপত্রটি আছে। এখানে এক আয়ণার বাইশটি মূখ দিয়ে নির্গত হচ্ছে—বাইশধারা। দ্বিত্বেশের ঘাটে বড় বড় ‘মহাশোল’ মাছের মতো একরকম ‘শহর’ মাছ একটি পুত্রবিহীনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাগার্জুন পাহাড়ের মাথায় একটি দরবার বা প্রাসাদ আছে। নৃত্যবধের জন্য সখ করে অনেক এই পাহাড়ের মাথায় বিবাহের আসর বসায় বলে ঘুরে ঘুরে নোটর উঠবার পথ আছে।

বালান্দ্র মতো কৃষ্ণ-নীলকণ্ঠে প্রায় ফুট-লম্বা আর-একটি বিরাট বিহু-মূর্তি আছে। বালান্দ্র আরও উত্তরে কাঠমান্ডু থেকে মাইল-দুয়েক পথে শিবপুরী পাহাড়ের কোলে এই

বুঢ়া-নীলকণ্ঠ—এটি এগারোটি কণাশুক সাপের লম্বা। এই প্রস্তর-খোদিত বিমূর্ত্তি দুটির অশুভ নষ্টন-সৌন্দর্য দেখলেই যুক্ততে পারা যায় এককালে নেপালের শিল্পীরা ভাঙ্ক-শিল্পে উন্নত ছিল। শোনা যায়, রাজার বাগের কেউ এই বুঢ়া-নীলকণ্ঠের মূর্তি দেখতে পাতেননা বলে অভিযোগ আছে। তাই এখনি নকল করে বালাহর মূর্তিটি তৈরি করানো হয়। কিন্তু আকস্মিকভাবে বুঢ়া-নীলকণ্ঠের মূর্তিটি নয়টির ফলে এগারোটি কণাশুক সর্পকুলীতে পরিণত হতে দেখা যায়।

এই পথেই যিন বারো হাটাগথে এগোলে পাওয়া যাবে প্রসিদ্ধ মূর্তিনাথ তীর্থ (১২,০০০ ফুট উচ্চতার)। অল্পপূর্ণা ও ধবশিখরি পর্বতের তুষারগলা মলধারা সেবান থেকে নেনে আসাচ্ছে। গওকী নদীর উৎসস্থান পাওয়া যাবে আরও যিন-চারেকের হাটাগথে। কাঠমাণ্ডু থেকে পশ্চিম-নেপালের শোখারা উপত্যকা পর্যন্ত অর্ধেক পথ এরোগেনে এগিয়ে, ওখান থেকে বাকী অর্ধেক পথ—ব'খানেক মাইল—ভাড়াপানী, টুহুচা হয়ে মূর্তিনাথ বাবারও হুঁশিয়া আছে। অথবা নেপালের উত্তরাংশে ভারত-সীমানার নওভানোয়া স্টেশন থেকে প্রায় যিন-চৌদ্দ হাটাগথে মূর্তিনাথ তীর্থ-দর্শনে যাওয়া যায়। কথিত আছে, বহু ত্রুশা মূর্তিনাথে এক হজ করেছিলেন। তাই তীর্থযাত্রীরা সেখানকার তপ্পরুও গ্রহণ করে মোক্ষ বা মূর্তিনাথের আশায় গিয়ে থাকে। অনেকে এই মূর্তিনাথের পথ থেকে শালগ্রাম-শিলা হুঁচিয়ে নিয়ে যায়। আবার অনেকে ভয়ে ভয়ে না, নিতাপূজা বা সেবা করতে পারবেনা বলে। ১৯৪০ সালে কঙ্গাদী পর্বতারোহীল অল্পপূর্ণা-শুক-বিকরে রক্তকাণ্ড হয়েছিলেন এই মূর্তিনাথের পথেই। বেশ একপল্লা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর বুঢ়া-নীলকণ্ঠের চাষীগলী ও ধানক্ষেতের মাক দিয়ে মৌগাড়া করে থাকার সময় এই অল্পপূর্ণা-অভিধানের কথাই বারো বার মনের মধ্যে এসে পড়ছিল।

কাঠমাণ্ডুর দক্ষিণে পাটন বা ললিতপুর বহু প্রাচীন বহর ও বৌদ্ধ-বর্ণজিগের বাসস্থান। নেপালের বিখ্যাত নেওয়ার-শিল্পীদের বোধান ও বাসস্থান এই বিকটায় দেখা যায়। এসময় স্থাপত্য ও ভাঙ্ক-শিল্প-স্থলভার পরিচয় ছড়িয়ে আছে নেপালে উপত্যকার সর্বত্র। কাঠ ও চোলাইয়ের ওপর খোদাই ও কাশশিল্পে এরা খুব প্রাচীন। এদের হাতে তৈরী মন্দির ও ধববাড়ির দরজা-জানালা ও কারিগরের ওপর কাজ দেখবার মতো। পাটনের পথে কয়েকটি প্রাচীন প্রাসাদ ও চিড়িধাখানা হয়ে আবার এগিয়ে চললাম। ওনেছিসাম, এখানে মহারাজ অনেক পাঁচটি বৃশ নির্মাণ

করিয়েছিলেন। সাদা গোলাপের ওপর চারকোড়া চোখ-আঁকা বৌদ্ধবৃশ ও শ্যাংগোতা-আঁকারের হিন্দু-দেবদেবী প্রকৃতির প্রায় একই ধরনের মন্দির নেপালে আছে অসংখ্য। তারই মধ্যে এখানকার মহাবুদ্ধ-মন্দিরটির একটু বিশেষত্ব আছে। বুদ্ধগায়ার মহাবোধি-বিহারের মতো সাতশ খাতায এ মন্দিরটি 'বিভীষ বৃশগয়া' নামে পরিচিত। ১২২০ বিক্রম সংবৎ অর্থাৎ ১২৩৭ সালের এক ভীষণ ভূমিকম্পে মন্দিরটি গোড়া থেকে ভেঙে পড়ায়, আবার এটিকে তৈরি করা হয়। এখানকার এক গল্পীতে শাংগোনি অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দু-দেবদেবীর মন্দির রয়েছে। যেমন—বিকুমলির, রুক-মন্দির, বিবেকর-মন্দির, মহাশিব-মন্দির, ভীম-মন্দির প্রকৃতি। ভীম-মন্দিরে হুংগালেনের রক্তপানেরত ভীমের মূর্তি ও হুতী, হোপদী, মহাকালী, কালভৈরবের মূর্তিও আছে। কাছাকাছি রাজার হু'শানে আরও দুটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে। একটি বীননাথের মন্দির ও একটি মংগ্রেহ্রনাথের মন্দির। নাথপনীরের গুহ বীননাথ ও মংগ্রেহ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধ ও যোগীপুরুষ। প্রতিটি মন্দিরগারে অপরূপ কারুকার্য।

মহারাজাদিরাজের রাজ্যভিত্তিকের চন্দ্র চারিদিকে প্রবর্তি চলছে। পাকা রাজ্য তৈরি হচ্ছে বলে ভাড়া ইট ছড়ানো হয়েছে। তারই ওপর দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা কাপতে-কাপতে নির্জন নিশ্চল পথ দিয়ে গোট-হাউসে থিয়ে এলাম—ওজন ত্রাণি অনেক। কাঠমাণ্ডু শহরের পথে পথে বৈরাটিক আলো আছে যথেষ্ট, কিন্তু চলার মোড়ের অভাবে উপস্থিত আলোর শক্তি এত কম যে ঘরের বৈরাটিক আলো মনতে থাকলেও সময় সময় কান করতে হয় বাড়ি মানিয়ে।

আজ ১০ই মার্চ মহাশিবরাত্রের দিন। কালেকের বড়বুড়ীর পর আজ সকালের দিঠে রোহে দুয়ের তুষারচন্দ্র হুঁচাগুলি খুব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। রাজার ধারে অনেকগুলি বড় বড় গাছ কুমিলাং হয়ে পড়ে আছে গভরাডের কড়ে। কাঠমাণ্ডুর অনতিদূরে একটি ছোট পাহাড়ের মাথায স্বয়ম্বু-নাথের প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির বা পুষ্পের হুঁচাটি বহুবুধ থেকেই প্রত্যেক যাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাহুথয়ের পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে একটি শিডিগণ উঠে গেছে মন্দির পর্যন্ত। বহু দেবদেবীর মূর্তি ও বৌদ্ধবৃশ চারশায়ে ছড়িত রয়েছে। একেবারে পাহাড়ের মাথায় বিরাট মাদ গোলাকার গম্বু ও কক্ষকে পিতলের চূড়ার চারশায়ে চার কোড়া সর্বদী বুদ্ধের আঁকা চোখগুলির দিকে তাকাতো বিষয়ে অভিভূত হয়ে পাড়িয়ে থাকতে হবে। এই ধরনে ছোট-বড় চোখ-আঁকা বৃশ বাড়ির ভেতর এবং পথে পথে



শহুবায়ে বনির

অন্য চক্রে আছে সারা দেশে। স্বয়ং মতো মাই-একটি বিরাটাকার বৌদ্ধস্থ আছে পত্তপতিনাথের মাইল-সেডেক পথ বোধানাথে। বহুপত বছরের পুরাতন ১২০ ফুট উঁচু এই স্থপতি ভিক্ষুদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। সারা গোলাধের ওপর ঝাকা চোপগুলির বেন সম্মান-পক্তি আছে। স্থপের গায়ে সারি সারি বহু 'ধর্মচক'। স্থপ-গ্রন্থিনকালে ঝাকীসের হাতের স্মার্ক ধর্মচকগুলো বহু-বহু আওরাক করে ঘুরতে থাকে।

বহুতে কয়েকজন ভিক্ষু বৌদ্ধকে স্থপ গ্রন্থিন করতে

সঙ্গে তাদের সঙ্গে পুরে আলাপ করলাম। একহাতে ছোট ঢোল ও অন্য হাতে ছোট কটা বাজিয়ে ও তার সঙ্গে মিঠে গলায় মন্তোজারন করে বোনাল আমাতের। বেশ মধুর হয়ে উঠেছিল কিছুটা সময়। সামনে একটি কক্ষকে বড় পিতলের বাক্সের প্রতীক রাখা হয়েছে। স্থপের ওপর পিতলের ছড়ায় রৌদ্রা সো ক পড়ে আরো স্বকৃষ্ণ করতে থাকে। পাশ দিয়ে একটি ঝাড়াই সিঁড়ি মেনে গেছে নীচে। সিঁড়ি খুব ঝাড়াই হওয়ায় ঝাড়ীসের ওঠা-নামার কিছু স্থিতির অল্প রেলিং লাগানো হয়েছে। সিঁড়ির নীচে প্রস্তর-খোদাই ভূনিম্প-স্ত্রায় অতিশয় দ্রুতি বড় গ্যামী বৃদ্ধবৃতি। ওপরেও এই ধরনের কয়েকটি বৃদ্ধবৃতি আছে। ভারতে মুসলমান আক্রমণের সময় বহু হিন্দু দেশে পাতিয়ে আসে। তাদের সঙ্গে চলে আসে নানান পুঁথি ও আসে ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি। সেই সময় ভারতের সঙ্গে দেশালের শিল্প-প্রতিভার সম্বন্ধ ঘটে আরো উন্নত শিল্প পরিণত হয়।

স্থপের ঝাড়ী-মাওরা সেরে বিদ্রাম নিতে বসছি। ভোপধনি ভনতে গেয়ে আবার উর্ধ্ববাসে দ্রুতে চলে এলাম চুচকাওরাক-মহলানে। রাজপরিবারের কুলসেবতা পত্তপতি-নাথের সম্মানে হাজার-একটি ভোপধনি করা হ'ল এবং তারই প্রতিধনিত ছোট উপত্যকাটি কৈশে কৈশে উঠতে লাগল। রাজা মহেন্দ্র বীরবিক্রম সেই সময় মহলানে স্থায়ী রাখানো একটি বকে উপস্থিত ছিলেন।

মহলানের পূর্বে সিংহ-ধরবার (সেকোটাব্রিজেট) পাশে রেখে মাইল দুইক পথ চলে গেছে পত্তপতিনাথে। চারদিক

থেকে অগ্নি। হাতী চলছে তাদের পুত্র ও প্রবর্তি জানাতে।
 পুনিশবাহিনীর বশীত সতর্কবাহী বেছে চলছে অনবরত।
 অগ্নি হাতীদের পিতৃন পিতৃন আমরা ও চলছি। ভাবছি—
 কত বাঙালী-মহাশয়ী, সাধু-বৈরাগীর লব তে। অগ্নি
 হয়েছে কাঠমার আগার হাটপাশে—সবাই যেন কোথা
 মিলিয়ে গেছে। কত অগ্নিসংঘের অগ্নি তে তাদের কত
 আগনার হয়ে পড়েছিল। তাদের কথা যেন পড়ে মনটা
 যেন কেনম ভাব হয়ে উঠল পথ চলতে চলতে। অত্ৰিধায়
 পড়তে বেছে ভীমকলী থেকে কত বসন্তা স্রীলোকদের বেছে
 হুণী ভাড়া করে, চাড়ে লাঠি ওড়ে দিয়ে হাতা হুণী করে
 দিয়েছি। কোথায় ইন্দ্রকশন নিয়ে আর কত পড়ে
 কতরাজে—এসিয়ে গেছি—পাশ থেকে উঠে আগার সম
 আরে যোবে হাত তুলেছে যোবন নমস্কার করার ভক্তে।
 পাথর আগ্রহ করে সাধু ধুকছে চলার ভক্তে,—চল খাইয়ে
 কমণ্ডলুতে অন্ন ভল দিতেই কমণ্ডলু সবিয়ে নিয়েছে, পাছে
 বৈদ্যা দিয়ে ফেল আমরা নিয়েরা কমণ্ডলু পড়ে। সন্ধ্যাক,
 যেসবারে কৃষ্ণা স্রীলোককে কইকর পথ পার করে দিয়েছি।
 কে হাটতে পারছে না, তাকে কাটি করে তুলে দিয়েছি।
 কার সোকা হুয়িয়ে গেছে বলে 'তার মরণ নিচ্ছ' ভানতে
 গেরছে—তাকে আমাদের কোঁটার
 নক্সি তেল দিয়েছি এবং তার বসলে
 আধিবন পেয়েছি—কৃষ্ণার বাথর পাশ।
 চলার সংখ্যার মহামা। পরে আবার
 জানিয়েছে, কোনো দুর্গম পথই আর
 তাকে আটকাতে পারবেনা বাবা
 পত্নপতিনাথ-দর্শনে। ভাবি—নক্সিখের
 তো আমরা কেউ নই, তবে কেন নক্সি
 নিয়ে এসেছিলাম!

পত্নপতিনাথ পৌঁছে দেখি চারিদিকে
 কেবল গোলমাল আর আইকে র
 জীংকার। আশেপাশে বহু তাঁবু পাড়ছে
 হাতীদের। মন্দিরপ্রাঙ্গণের ভেতর বহু
 সাধু সারাবাজের মতো মোটাশোটা
 কাগের ঝড়িতে আগুন জালিয়ে বসে
 গেছে। পৌরায় চোখ জালা করছে
 লাগল। মন্দির-চত্বরে এত হাতী বসে
 গেছে যে, এক দরজা দিয়ে ঢুকে আর-
 এক দরজা দিয়ে বেরতে দশমই কষ্ট
 পেতে হয়। মন্দিরপ্রাঙ্গণের চারপাশে

গণেশ, ভৈরব, নন্দী ও কৃষ্ণীর মূর্তি। পশ্চিম দরজায়
 বিরাটাকার একটি শিল্পের মূর্তির দিকে আগে হাতীদের
 গুটি পড়ে। নেপালের অস্ত্র পাগোডা-আকারের মন্দিরের
 তুলনায় পত্নপতিনাথের মন্দিরটি আকারে অনেক বড় এবং
 ইহা তৈরি হয় প্রায় সাতশো বছর আগে। মন্দিরের চূড়াটি
 তামার ওপর সোনার পালিশ-করা এবং দরজাগুলি রূপের
 পাত দিয়ে বোড়া। মন্দিরের ভেতর হাত-দুখেক উচু
 শিখরিকের ওপর চতুর্মুখী পত্নপতিনাথের মূর্তি। এখানকার
 প্রচলিত রীতি অথবা বৈষ্ণব বর্ণ-হিন্দুরাই পত্নপতিনাথের
 মন্দিরে প্রবেশাধিকার ও দর্শনলাভ করতে পারে। অগ্নয়
 ভীড়ে ঠেলাঠেলিতে দু'হাতে পুতার উপকরণ নিয়ে দর্শন দেয়
 ও কিছু ছল ছল হাতীদের ডালোডাবে দর্শন করতে সাহায্য
 করে মন্দিরের নীচে নেমে এসে। পুতার উপকরণ
 কিনে সামান্য দু'এক টাকা পাশের পকেটে রেখেছিলাম
 বাইরে যেখানে পকেটে হাত দিয়ে দেখি পকেট
 খালি। মন্দিরে তোকার সমস্ত দু'হাতে টাকা-পয়সা পকেটে
 রেখে এক বন্ধুকে বলেছিলাম পকেটমারের সন্ধাননা
 করা। মন্দিরের দরজার সামনে যেউ পকেট মারতে পারে
 তা আমাদের ধারণাতীত। পরে অবশ্য অস্ত্র হাতীদের



পত্নপতিনাথের মন্দির

কাছ থেকে এইরকম ছবি যাওয়ার নানান সম্ভব কাহিনী শুনেছিলাম।

যোরাযুগিতে শরীর ক্রান্ত। বিশ্রামের সময়ের খেলেও পথদিন সকালে আবার পতপতিনাথের দিকে ঘেঁষতে হ'ল—দিনের আলোয় পতপতিনাথের মন্দির দেখেবা ব'লে। মন্দিরের পাশে বাগমতীর পুল পেরিয়ে যুদ্ধের পাথরের সামান্য সিঁড়ি উঠে গেছে গোরকনাথ-মন্দিরে। কোল সস্ত্রদ্বয়ের এক মহান যোদ্ধার নামে এই মন্দির। গোরকনাথ ছিলেন শুক যন্ত্রেশ্বরনাথের শিষ্য। শাশু দিয়ে একইরকম সিঁড়ি দিয়ে নেমেছে পীঠস্থান জন্তেশ্বরীর মন্দিরে। মন্দিরের ভেতর ঢাকা বেড়া একটা হুও আছে। তাইই একটু অংগ সরিয়ে হাতীলের স্তম্ভস্পর্শ করতে দেওয়া হয়। এ ছাড়াও পতপতিনাথের আশেপাশে আরও দর্শনীয় স্থান আছে; যেমন, পার্বতীর স্নানের ঘাট—গৌরীঘাট, কিরাতকপী শিবের স্থান—কিরাতেশ্বর, শিবের সুগরূপ বিজয়স্থান—সুগরুদী, সেনাদেব নাগের নামে—সেনাদেব বন প্রভৃতি, এবং জামের দলে জড়িয়ে আছে এক-একটি কিংবদন্তী।

জন্তেশ্বরী মন্দিরের ধারে বাগমতী নদী পেরিয়ে মাইল-তেড়েক পথে পড়ে বোখানাথের বিরাট বৌদ্ধমূর্তি, বয়স্খানাথ প্রদেশে ধার কথা আগেই বলেছি।

ডাঙ্গাও বা ডুঙ্গুর নেশালের আর-একটি প্রাচীন গ্রাম। রানী-শোখরীর কাছ থেকে জীপগাড়ি করে একদিন ঘেরিয়ে পড়লাম। পতপতিনাথের পাশ দিয়ে আরও পূর্বে মাইল-ছয়েক পথ। গাড়ি এসে পাড়াল সিং-শোখরী নামে এক বিরাট পুষ্করিণীর সামনে। পাটনে ও কাঠমাড়ুর যতো এখানেও নানান প্যাগোডা-আকারের প্রাচীন মন্দির চোখে পড়ল। এখানকার দত্তাশ্রয় মন্দিরটি পুণ্যার্থীদের একটি

ধাম-বিশেষ। ডাঙ্গাও-এর হই নাকি বিখ্যাত এবং সাম্যেও খুব সত্য। তাই ফেরার সময় কিছু হই নিয়ে এসেছিলাম তারাদেবীর কথাবতো।

নেপালের মোটাটুটি হইবা স্থানগুলি ঘোরার ঠাক ঠাকে তারাদেবীর সঙ্গে যুঁয়ে বেড়িয়েছি—কাঠমাড়ুর রাজপ্রাসাদ, সিংহ-দরবার, অ্যাসেমলি-হাউস, রেডিও অফিস, মূখীখানা (টোমারি), টুটিবেল বা কুচকাওয়াজ-মহলান, ভুগোল পার্ক, পোস্ট-অফিস, বুল, কলেজ এবং মহাকালের মন্দির, জন্তকালীর মন্দির, অন্নপূর্ণা-মন্দির, গোশাল-মন্দির প্রভৃতি নানান মন্দির, বুল বোড, নিউ বোড, ইন্ড্রক, ছম্পীঠ প্রভৃতি রাস্তা। বলা বাবুল্য, বীনের বা বীথ আশানের সঙ্গে ছায়ায় যতো লেগে ছিল সবক'টা দিন এবং তাতে আমাদের উপকারও হয়েছে যথেষ্ট। সময়মতো নেপালের দৃষ্টিভঙ্গিরকণ কিনে নিরেছি তলায় হাড়ি-কেওরা পৌষিন ভূতো ও কালকার-করা কাঠের ছবির ক্রয়।

নেপাল-পরিভ্রমণ শেষ করে আবার ইটাপাথেই বাড়ি-কেয়া ঠিক ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাত্র তেইশ টাকায় নেপাল-সরকারের রেলপথের সীমরা স্টেশন পর্যন্ত বিমানে চড়ার মোড়টুই সামলাতে পারলাম না। বিমান-কম্পটি পতপতিনাথের খুব কাছেই। এই বিমানগুলি সাধারণতঃ মাল-পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হয় ব'লে হাতী-বহনের উপযোগী দুবন্দোবস্ত না থাকায়, শারীরিক অসুস্থি হলেও, মাত্র কুড়ি মিনিটে সীমরা এসে পৌঁছেছিলাম বেশ-আনন্দেই। মনে বেন একটু আঘাত পেয়েছিলাম বহন বিমান থেকে নেমে আমাদের এল উঠতে হয়েছিল ট্রেনের মালগাড়িতে। এখান থেকে ওটা ঘুর করে নেওয়া হবে পরের রত্নৌল-গামী গাড়ির সঙ্গে।

এখন-যুগান্তে বৃহত্ত আমোদিতপ্রাণি শেখক হৃৎক নৃত্য



কৃষ্ণচন্দন

অশ্রুতরক্তের স্নেহ

এক

চলেছি বটে অরাড় মূনির আশ্রমে, কিন্তু
কে আমাকে কি শিকা দেবে? আমার কোনো
গুরু নেই।

সিদ্ধ হয়ে বৃদ্ধ চলেছেন বারাণসীর অভিমুখে।
পথে এক তপস্বীর সঙ্গে দেখা।

কি তেজঃপুঞ্জ লাভণ্য! অবীহৃত কনকের
প্রশ্রবণ। তপস্বী কাছে এল এগিয়ে।

'কি নাম তোমার?' জিগগেস করলেন বৃদ্ধ।

'আমার নাম উপক। কিন্তু আমার নামে
কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা এক প্রশ্ন আছে,
সে প্রশ্ন হচ্ছে এই, কেন আপনি সংসার ছাড়লেন?
কে আপনার গুরু?' মিত্রতায় হাত ধরল উপক।
'কার দীক্ষায় আপনি আশ্রয়বান? সে কি ভার্গব,
না অরাড়, না কি উগ্রক রামপুত্র?'

'আমার কোনো গুরু নেই। কোনো শিকা-
দীক্ষার ধার ধারিনি আমি।'

'তবে?'

'আমি স্বয়ং অভিজ্ঞানক। আমি সর্বজ্ঞ, সর্ব-
বস্তুকর্তৃক অম্পুষ্ট।' বললেন বৃদ্ধ। 'অর্গে-
মর্তে আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আমি
অনন্তসদৃশ।'

'চলেছেন কোথায়?'

'বারাণসী।'

'কি উদ্দেশ্যে?'

'ধর্মচক্র প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে। ভূমি আসবে
আমার সঙ্গে।'

যেতে পারলনা উপক। পথায়ুর দিয়ে চলে
এল বন্যহার। সেখানে, কেন কে জানে, ব্যাধপঞ্জীর
উপাশ্বে এসে ডেরা বাঁধল। গায়ের নোড়লের
আনন্দ আর ধরেনা। হাতের কাছে এতবড়
একজন সম্রাসী, আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে সেবা করা
যাবে।

সাধুসেবার বেতে উঠল মোড়ল। শিকারে
আর মন নেই।

'শিকারে যাবেনা বাবা?' স্থলরী ঘূবতী মেয়ে
চাপা এসে প্রশ্ন করল।

'সেই তো কথা। আমার কি সাধুসেবা করে
দিন কাটালে চলে?' হুণে বাণ তরল মোড়ল।
'সাধুরা নিশ্চয় থাক কিন্তু বনের পাখির নিস্তার
নেই।'

মোড়ল দূরবনে শিকারে গিয়েছে, ঘরে একা
চাপা। সহসা সন্ধ্যাকালে দরজায় কার করাঘাত।

চকল হয়ে দরজা খুলে দিল চাপা। কিন্তু একে
চোখের সামনে!

দিনমণি কি এখনো আস্তে যায়নি? পথ ভুলে
কি মাটিতে নেমে পড়েছে! আর তা কিনা এক
অপজাত ব্যাধের আভিনায়!

'কই আমার আজকের ভিক্ষে কই?' উপক
ধমকে পাড়াল।

ভুধু আজকের ভিক্ষে? না কি চিরন্তন কালের
ভিক্ষের সে কাঙাল? মনে হল বিশ্বের সমস্ত রূপ
কি একই দেহে একত্রিত হয়েছে? সমস্ত তরঙ্গ কি
একই সমুদ্রে?

টাকা ফল ছিল ঘরে। নিতে মন সরলনা
চাপার। বুকের ফলকে সামান্য বলে মনে হল।
নিলও নিতনা উপক।

কি চাইবার বুকে আর তার বাকি নেই।
কিসের জন্তে সে প্রব্রজ্য নিয়েছে ভিক্ষাচর হয়েচে
এতদিনে তা প্রতিভাত হল। এত দীর্ঘ পথ
পরিভ্রমণ না করলে নিলতনা এ কাকনলতা!

ডেরায় ফিরে গিয়ে উপক কুমিশ্রায়া নিল।
জলকণাও স্পর্শ করলনা। যদি ঐ ব্যাবকন্তাকে
না পাই দেহ ছাড়ব। আমি বুঝেছি কি আমার
ভিক্ষার বস্তু। কাকে পেলে আমার অস্থায়ী
স্বত্বের দিন।

সাত দিন পরে বন থেকে ফিরে এল মোড়ল।

নেদের কাছে তপস্বীর খোঁজ করল। জিগগেস
করল, 'ভিক্ষা নিতে এসেছিল সাধু?'

'একদিন, প্রথমদিন শুধু এসেছিল।' বললে
চাপা, 'তারপর আর আসেনি। প্রথমদিন যে
এসেছিল কিছুই নেয়নি সেবা-ভিক্ষা।'

'সে কি, উপোস করে আছে নাকি?' মোড়ল
ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'না কি চলে গিয়েছে দেশ
ছেড়ে?'

বুকের মধ্যে খাকা খেল চাপা। দরজায় এসে
ধাড়িয়েছিল ভিক্ষের জন্তে, শূন্যহাতে ফিরিয়ে দিল।
এ শূন্যতা নির্দয় প্রবন্ধনা ছাড়া কিছু নয়।
এ শূন্যতার পূরণ-মোচন হবে কিসে?

যা ভেবেছিল মোড়ল, সাতদিন একাদিক্রমে
উপোস করে আছে উপক। দীর্ঘ ককালসার হয়ে
গিয়েছে।

'এ কি, আপনার কেন এ ক্ষীণ দশা?' প্রশ্ন
করল মোড়ল।

'আমার ভিক্ষা মেলেনি।'

'গিয়েছিলেন আনার ঘরে?'

'গিয়েছিলাম। আপনার মেয়ে অত্যন্ত রূপণ,
দেয়নি ভিক্ষা।'

'সে কি কথা? ঘরে ফলমূল আছে—'

'কে চায় আপনার ফলমূল?' নির্ভীক কণ্ঠস্বরে
উত্তরনা আনল উপক। 'আপনার কুটিরবাসিনী
মেয়েই আমার ছোট ভিক্ষা। তাকে যদি না পাট
তবে মৃত্যুকেই বরণ করব। প্রমোদশয়া না পাই,
নিয়েছি এই মৃত্তিকাময়।'

কথা শুনে স্তম্ভিত হল মোড়ল। সংসারত্যাগী
সাধু আবার সংসারে শৃঙ্খলিত হবে। সমস্ত
ত্যাগের ঐশ্বর্যকে আহুতি দেবে ভোগের আগুনে?

'বিয়ে যে করবে, তোমার শিল্পে কোনো নিপুণতা
আছে?' জিগগেস করল মোড়ল।

'কিছুমাত্র নেই।'

'তাহলে দ্রীর ভরণপোষণ করবে কি করে?'

'জানিনা।'

'তোমার স্পর্ধা তো কম নয়—'

'দাবানলের মত স্পর্ধা।' উপক বললে নিঃস্প-
স্বরে। 'আমি খুঁজব এ আকাজকার পরপার। হয়
মিলন নয় মৃত্যু।'

'আমার শিকারের ভার বহন করতে পারবে
তুমি?' মোড়ল জিগগেস করল সরাসরি।

'শিকারের ভার?'

'হ্যাঁ, শিকার করে যে-সব পশুপাখি হত্যা করব
তুমি তা বহন করবে, বহন করে নিয়ে যাবে
বাজারে। সেখানে তা বেচবে উত্তমমূল্যে। এই
হবে তোমার সংসারজীবিকা। রাজি আছে?'

'রাজি থাকলে?'

'রাজি থাকলে পাবে চাপাকে।'

'এর চেয়েও হেয়জীবিকায় রাজি আছি।'
উপক উঠে বসল। 'বলেছি তো আমি দেখতে চাই
এ বাসনার দীপাবিহা।'

উপককে ঘরে নিয়ে এল মোড়ল।

'বাবা, সেই সাধু না?' চাপা বিষয় মানল।

'হ্যাঁ না, সেই সাধু।'

'তবে তার এই নতুন পোশাক কেন? কই
তার চীবর? তার দণ্ড-কমণ্ডলু?'

'বাজারে নিয়ে গিয়ে তাকে নতুন বস্ত্র কিনে

দিয়েছি, গ্রামাণ্ডারী বহু। আর সে দণ্ড-কমণ্ডলু
বইবে না না, আমার শিকারকরা বাসের ভার
নিয়ে যাবে বাজারে।

‘সেকি কথা?’

‘সে এখন সংসারের হাটে বাসনার সোনা
কুড়াবে। বিয়ে করবে।’

‘বিয়ে করবে?’ যেন কঙ্কার দিয়ে উঠল চাপা :
‘কাকে?’

‘তাকে।’

এ এক অভিনব রোমাঞ্চ! বিয়ে করা বলে
নয়, সন্ন্যাসীকে বিয়ে করা বলে। শুধু চিতা বলে
নয়, চন্দনকাঠের চিতা বলে।

চাপা-উপকের বিয়ে হয়ে গেল। জগ্মাল
নবশিঙ। নাম হল হুভঙ্গ।

কিন্তু ব্যবহার মোটেই হুভঙ্গ নয়। কেবল
কাঁদে। এমন কাঁদুনে ছেলে সেখেনি কেউ
সংসারে। প্রাণপণে কি যেন সে প্রতিবাদ করে
চলেছে। তাকে সামলাতেই চাপার দিন যায়।

কিসের প্রতিবাদ! কে জানে হয়তো সমগ্র
পরিহাসের প্রতিবাদ!

‘ওরে বংশ শাস্ত হ।’ ছেলেহুলানো সুরে গান
ধরে চাপা।

‘ওরে ও ব্যাধের পুত্র, ওরে ও তপস্বীর পুত্র—
শাস্ত হ।’

ব্যাধ তপস্বী হয় শুনেছি কিন্তু তপস্বী কখনো
ব্যাধ হয়? হুভঙ্গ আরো তারবারে আর্তনাদ
করে।

সেই আর্তনাদের থেকেও চাপার গান বেশি
মর্মান্তকী। ওরে ও তপস্বীর পুত্র, ওরে ও ব্যাধের
পুত্র, শাস্ত হ। এ কি একটা গানের কথা?
এ শুধু উপককে উপহাস করবার চেষ্টা! তপস্বীর
ছেলে হয়েও তুই ব্যাধের ছেলে—এ যেন হুভঙ্গের
জন্মের উপর বিকৃতি।

একদিন দুদিন উপেক্ষা করল। কিন্তু যখনই
ছেলে কাঁদে তখনই ঐ গান ধরে চাপা। এ ছাড়া।

ছেলেকে যেন বশ করার নম্র নেই। এ ছাড়া
ছেলের যেন নেই কোনো পরিচয়।

অসহ্য হল উপকের। বললে, ‘মনে কোরোনা
তোমার এই ব্যঙ্গের থেকে আমাকে রক্ষা করবার
কেউ নেই।’

‘আছে নাকি? শুনি, কে?’

‘আমার সেই পুরোনো সংকল্প।’

‘কিন্তু সেই সংকল্প তো এতদিনে ব্যাধের শরে
ক্ষতবিক্ত হয়ে গেছে।’ চাপা আবার বিক্রম
করল।

‘ব্যাধশরের সাধ্য নেই সে গভীর স্তর স্পর্শ করে।
আমি এখন চললাম গৃহ ছেড়ে।’ উপক কঙ্কার
দিয়ে উঠল।

‘রহামুনি, তুমি যে আসলে ব্যাধই তার আর
পরিচয় দিওনা।’ চাপাও প্রতিহত হল। ‘ব্যাধ
বলেই তো তোমার এখনো এত ক্রোধ। তুমি
শিকারী, তুমি দংশনপিপাসু। কিন্তু ক্রোধে
ওজিলাভ হয় এ তুমি কোথায় শুনেছ?’

‘ক্রোধে না হোক তেজে হবে। আমি ফের
প্রজ্ঞায় প্রবেশ করব।’

‘বলো কি। তাহলে আমার এই সৌন্দর্যের কি
হবে?’

‘মূল্য তো পেয়ে গিয়েছে। জাল ফেলে বন্দী
করেছ নিরীহ পক্ষী। কিন্তু পক্ষীও জানে তার পথ
পাবার উপায়। জানে তার মহাবৃক্ষের ঠিকানা।’

‘কিন্তু তোমার পুত্র? হুভঙ্গ?’

‘সে তোমার কাছে থাকবে। পরাজিতকে
সম্মানিত করবে। ব্যাধের পুত্রকে তপস্বীর পুত্র
করে তুলবে।’

‘বটে? তোমার পুত্রকে তোমার চোখের
সামনেই আমি হত্যা করব।’

‘কহো। পুত্রশোকের ভয় দেখানো আমাকে
কথা। শোকে বা ভয়ে আর আমি কাতর নই। সর্ব-
বিভয়ীকে দেখতে চলেছি আমি। তিনিই আমার
পরিজ্ঞাত।’

‘সে কোথায়?’ আকুলতায় ভেঙে পড়ল চাপা।

‘নিরন্তর নদীর তীরে স্থখবিমানন ধর্মপ্রচার করছেন। আমি সেই মহাজীবনের শরণ নেব।’

মনে মনে প্রণাম করল চাপা। বললে, ‘লোকোত্তমকে আমার বন্দনা জানিও। প্রেরণা করে আমার হয়ে দক্ষিণা দিও তাঁকে। তিনি শুধু মহাজীবন নন, তিনি মহামরণ।’

বৃদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হল উপক।

‘তুমি সর্ববিজ্ঞী কাকে বলছিলে!’ বললেন বৃক, ‘তুমিও সর্ববিজ্ঞী।’

কিন্তু চাপা পরিত্যক্ত হবার পাখী নয়। শুভ্রহৃৎ বাবার কাছে রেখে সেও গৃহত্যাগ করল। বৃদ্ধকে প্রদক্ষিণ করে উপক চাপার দক্ষিণা দিতে যাচ্ছে, সেখান সামনেই চাপা—মৃত্যুমুখী দক্ষিণা।

আমি আবার সেই দণ্ডধারী তপস্বী। আমি মৃগয়াতরু নই। তুফার মহাপ্রলয় নিকষিত হয়েও সংকটের জোরে চলে এসেছি পরপারে।

শুধু তুমি নও, আমিও। গিরিশিখরে আমি পুষ্পিত! লাবণ্যলতিক। নই, আমি চীবরধারিণী সন্ন্যাসিনী। অধ্বনস্পর্শ পাবকলিখা।

রাজগৃহের শ্রমণ বালকের প্রত্যাহ প্রভাবে রাজা বিধিসারকে ফুল জোগায়। আট নুঠো ফুল দিয়ে আটটি কাহন উপার্জন করে।

কিন্তু সেদিন ফুল জোগাতে এসে দেখে পথিপার্শ্বে বৃদ্ধ। হাতের ফুল রাজাকে পৌছে না দিয়ে ঢেলে দিল বৃদ্ধের পায়ে।

বাড়ি কিনে এল কিন্তু সঙ্গে কাহন নেই। জী বিরক্ত হয়ে জিগেস করল, ‘কাহন কই?’

‘আজ জীবিকার ধনকে জীবনের ধনের পায়ে সমর্পণ করেছি।’ বললে শ্রমণ। ‘আজ আর দেশের রাজাকে নয় দেশকালপাত্রের রাজাকে অর্ঘ্য দিয়েছি সে ফুলে।’

‘করেছ কি?’ ভয়ে পাণ্ডু হয়ে গেল জী। ‘রাজা তোমাকে তো শান্তি দেবেনই, আমাকেও রেহাই দেবেননা।’

‘তোমার দোষ কি?’

‘আমি তোমার জী এই আমার দোষ। ভাববেন এ পূজায় রয়েছে আমার সমর্থন, কিনা আমারই প্ররোচনা।’

‘তবে, বেশ, যাও রাজার কাছে। নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করে দণ্ডের নিষ্কৃতি নিয়ে এস।’ বললে মালাকর। ‘সমস্ত দণ্ডভার আমি একাই বহন করব।’

জী তখন গেল রাজার কাছে। রাজকক্ষে কেন আজ-ফুল এসে পৌছয়নি শোনালো তার কাহিনী। বললে, ‘এতে আমার কোনো অপরাধ নেই। সমস্ত দোষ আমার স্বামীর। আমার প্রতি কষ্ট হবেননা। নির্ধারিত দণ্ড একা আমার স্বামীর প্রাপ্য।’

‘তাই নাকি? সমস্ত ফুল আজ বৃদ্ধচরণে গিয়ে পৌঁছেছে?’ বিধিসার উল্লসিত হয়ে উঠল। ‘ফুলের কি ভাগ্য, শ্রমণের কি ভাগ্য, রাজার কি ভাগ্য! আজ তার ফুল প্রমাদ নয়, আজ ফুল প্রসাদ। ডাকো, ডাকো শ্রমণকে।’

রাজার অমুচরেরা ধরে নিয়ে এল শ্রমণকে। শ্রমণ ভাবলে, কি না-জানি অভিযোগ করেছে জী। কি না-জানি দণ্ড আছে কপালে।

উদারহস্তে শ্রমণকে পুরস্কৃত করলেন রাজা। দণ্ড কোথায়, দান, উপঢৌকন।

শ্রমণের জীর দিকে তাকালেন বিধিসার। বললেন, ‘এ উপহারের ভারও কি একাই তোমার স্বামীর? নাকি এতে তোমার অংশ আছে?’

জী মাথা হেঁট করল।

কিন্তু ভ্রম্যে আমার কি হবে? মনে মনে বিচার করল শ্রমণ। আমার পূরন্ধ্যার আমার নিজের হাতে। সে আমার চিন্তের সন্তোষ, আমার চিন্তের তৃপ্তি।

শ্রমণের কাহিনী অপরাহ্নের বর্ষসভায় বৃদ্ধের কাছে বললে ভিক্রা।

বৃদ্ধ বললেন, ‘শুক কথ্য কত সাধু বা কথ্য নাশুতপস্বিত। সেই কর্মই কর্ম বা করলে পশ্চাৎ

অনুত্তপ্ত হতে হয়না। সেই কর্মই কর্ম যার ফল পূর্ণকিত তিত। সেই কর্মই কর্ম যার পরিশেষ অনন্ত মঙ্গল।

রাষ্ট্রপ

ভার্গবের আশ্রম বলেছে স্বর্গের কথা, অরাড় কালানের আশ্রম না জানি কি সংবাদ দেয়।

গঙ্গা পার হল সিদ্ধার্থ। প্রবেশ করল রাজগৃহে।

নগরের রাজপথে সাদা পড়ে গেল। এ কে পুরুষাভীতদীপ্তবাহু! ভেঙ্গে গাষ্টীর্থে প্রাশান্তিতে কল্পায় এ কে অমিত-অনৃত!

যে চলে যাচ্ছিল সে ঠাড়িয়ে পড়ল। যে ঠাড়িয়ে ছিল সে চলতে লাগল পিছু-পিছু। যে বাসে ছিল সে উঠে ঠাডাল। করুণা, মন্তকে, স্নিগ্ধবাক্যে সবাই করতে লাগল অর্চনা। যারা সজ্জিত তারা লজ্জিত হল। যারা মুখের তারা স্তব্ধ হল। যারা রূপ তারা স্নিগ্ধ হল। সাক্ষাৎ ধর্মের সান্নিধ্যে সকলের দেহ-প্রাণে লাগল পূর্ণাশ্রম।

কে এ? প্রাসাদের অলিন্দ থেকে রাজপথের জনতা লক্ষ্য করে প্রশ্ন করল বিহিসার।

এক তরুণ সন্ন্যাসী।

আর কোনো পরিচয় নেই? কোন দেশে ঘর, কোন বাশের প্রকাশপ্রদীপ?

ইনি শাক্যধিপতি শুদ্ধোদনের পুত্র। এঁর সহস্বেই বিপ্রগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন হয় ঋষ্ঠ জানী নয় ঋষ্ঠ রাজা হবেন। তিনিই রাজা না নিয়ে প্রব্রজ্য। নিয়েছেন। তাঁকেই জনতা নিনিমেষে নিরীক্ষণ করছে।

কি অব্যক্ত আশায় উদ্দীপ্ত হল বিহিসার। আদেশ করল, পরিব্রাজকের গতিবিধি লক্ষ্য করবার ক্ষম্ভে চর নিযুক্ত করো। কি করে কি বলে কোথায় যায়।

রাজপথে প্রকাণ্ড ভিঁকা করছে সিদ্ধার্থ। মুখে কথা নেই, অল্প একটুখানি মাত্র সামনের দিকে

তাকাচ্ছে নরচোখে, ভিঁকাপাত্র তুলে ধরছে সকলের সামনে। কিন্তু বাহুল্যে আকাজকা নেই। স্মৃতি-বৃত্তির পক্ষে যেটুকু মাত্র প্রয়োজন শুধু সেটুকুতেই অভিল্যব।

যথাপ্রাপ্ত ভিক্ষা সংগ্রহ করে নির্জন এক নিষ্করিণীর ধারে এসে বসল সিদ্ধার্থ। প্রসন্নমনে গ্রহণ করল সেই ভিক্ষাত্ত। তারপর উঠল পাণ্ডব-পর্বতে। উত্তম নিঃসঙ্গতায়।

তারপর বসল পশ্চাসনে। ধ্যানস্তিমিতমনে। চর গিয়ে খবর দিল রাজ্যকে। শাক্যসিংহ বীর্ঘবান সিংহের মত পাহাড়ে উঠেছেন।

একবার দেশে আসিসেই রহস্যময় আগন্তককে। যদি পারি তো নিরস্ত করি তাকে।

সঙ্গে কোনো অনুচর নিলনা বিহিসার। সঙ্গবজ্রিতকে দর্শন করবার জ্যেষ্ঠ নিজে একাকী হল। পর্বতশৃঙ্গে পৌছে বসল শিলাসনে। নিভের পঙ্কিয়ার দিয়ে সিদ্ধার্থের কুশল জিজ্ঞাসা করল। বসল, ‘আনাদের শ্রীতি বাশান্ত্রকর্মিক। বড় ইচ্ছে করছে তোমাকে ছুটি শ্রেয়বাক্য বলি।’

‘বলুন।’

‘তোমার কেন এমন মতি হল? বিরাট তোমার বংশ, সূর্য তোমার আদিপুরুষ। বহুস তোমার নবীন আর তোমার নেহ অপ্রপুত্রভেদী দীপ্তিনান শশাঙ্কের মত। যে নেহ রক্তচন্দনে চর্চিত হবার যোগ্য তার আবরণ এই কাষায়?’ বিহিসার চকল হয়ে উঠল। ‘যে হস্ত সাত্ত্ব্যোজর রশ্মি গ্রাস করতে উপযুক্ত সে হস্ত ভিক্ষুকের ভিঁকাপাত্র বহন করে বেড়াবে?’

‘কি তবে করণীয় উপদেশ করুন।’ বিনয়-স্নিগ্ধস্বরে প্রশ্ন করল সিদ্ধার্থ।

‘এও আবার জিগগেস করতে হয় নাকি?’ উত্তেজিত হয়ে উঠল বিহিসার। ‘বলপূর্বক পিতৃরাজ্য অধিকার করো। রাজা হয়ে আরুঢ় হও সিংহাসনে। তোমার যে রাজা হবারই কথা। তেননি শুনেছি ভবিষ্যদ্বাণী। বলপূর্বক আক্রমণ

করতে না চাও, ধৈর্য ধরে উত্তরাধিকার প্রতীক্ষা
করো। তাতেও যদি স্পৃহা না থাকে—'

চোখ তুলে তাকাল সিদ্ধার্থ।

'তাড়ালে এন আবার সঙ্গে, আবার রাজ্যের
অর্ধভাগ ভোগে করে। রাজ্যশাসনে আবার
প্রতিনিধি হও। ঐঠা'—বিহিসার উঠে পড়ল।
'ধনসম্পন্ন ছেয় বস্ত্র নয়। শক্তির প্রয়াসী হওয়া
পুরুষের পক্ষে গৌরবকর। তুমিও পুরুষ, পুরুষার্ধ
সম্পূর্ণ করো।'

এটুকু বিলম্বিত হলনা সিদ্ধার্থ।

'শোনে।' রাজা আবার বলতে লাগল, 'অর্থ
ও ধর্মকে পীড়িত করে যে কান তা কেউ তোমাকে
অহুসরণ করতে বলছেন। তেমনি ধর্ম ও কামকে
পীড়ন করে যে অর্থ তাও বর্জনীয়। তেমনি কে
স্পৃহা করে সেই ধর্ম যা কাম ও অর্থকে পীড়ন
করে? ধর্ম অর্থ ও কামের সামঞ্জস্যসাধনই
পৌরুষ। যে এই ত্রিবিধ সম্পদকে প্রজ্ঞাসহকারে
সমানুপাতে উপভোগ করে সংসারে সেই মহৎ
শিক্ষক।'

তবু সিদ্ধার্থের এটুকু উদ্বেগ বা ঠংসুকা নেই।

আবার শিলাসনে বসল বিহিসার। বললে,
'তোমার এই ভিক্ষুবেশ দেখে আমার মনে অহুকম্পা
হচ্ছে, অশ্রুজলে আঁঠু হচ্ছে চকু।'

তখন নিবিচার সিদ্ধার্থ বলতে লাগল, 'সন্দেহ
কি, আপনার বাক্য স্তম্ভগর্ভ। আপনার মৌহাদ্যের
উত্তরে আমিও মৌহাদ্য দেব, ঐস্বার্থের উত্তরে
ঐস্বার্থ। সমস্ত অনঙ্গলের কারণ হচ্ছে কাম আর
প্রভুত্বের বাসনা। আমি ছুইই ত্যাগ করেছি।
ত্যাগ করে গ্রহণ করেছি এই যতিধর্ম। আমি
জন্মমৃত্যুভয়বিমুক্ত। একমাত্র নোক্ষই আমার লক্ষ্য।
সেই আমার একমাত্র সত্য, আমার সর্বোত্তম
ধন। রাজন, আমি তারই সন্ধানী।'

'কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে দেখ', বললে বিহিসার,
'বিষয়ই তো একমাত্র ভোগ্য।'

'কিন্তু খাতি নয়, হলহাল। সাগরের পার আছে

ভুজার পার নেই। আমি বুকেছি এর অনিত্যতা।
সত্যকে একবার জেনে কে আবার এ অনর্থের
উজনা করবে? সর্পের গ্রাস থেকে মুক্ত হয়েছে
যে শব্দক সে কি আবার সর্পের গ্রাসের জগা উৎসুক
হয়? যে অন্ধ একবার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে সে কি
আবার অন্ধবেশে বাসনা করবে?'

রাজা স্তম্ভমুখে তাকিয়ে রইল।

'রাজন', বলতে লাগল সিদ্ধার্থ, 'আমার প্রতি
অহুকম্পার কোনো প্রয়োজন নেই। সর্বতোভাবে
ত্রিবির্গসেবাই পুরুষার্ধ—আপনার এ উক্তি
আমার শ্রদ্ধা নেই। ত্রিবির্গও নয় ও অতৃপ্তির
আকর। যেখানে জরা নেই ব্যাধি নেই জন্মমৃত্যুর
ভয় নেই কর্মের পুনরাবৃত্তি নেই আমার বিবেচনায়
তাই পুরুষার্ধ। অন্তরেই অনোধ পবিত্রতা রাজ্য-
সম্পদের চেয়ে স্বর্গবাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। পরের
হুঃখসৃষ্টিদ্বারা যে আনন্দ সে স্বঃখ আমার কামনীয়
নয়। আর সেই স্বঃখেও উত্তেজের আর আশঙ্কার
শেষ নেই। সে স্বঃখতার দৃঢ়তা বহন করতে
পারেনা। রাজন, মৃত রাজা ও মৃত ভিক্ষুকের
মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই।'

'আমি কি তবে চলে যাব?'

'আপনার থেকে বিদায় নিতে আমার হুঃখ হচ্ছে,
কিন্তু ধারা মুক্তির পথের দিশারী তাঁদের সন্ধানই
আমার যাত্রা। আমি সম্প্রতি অড়ার মূন্নির আশ্রমে
চলেছি, আজই এ স্থান ত্যাগ করব। স্তবরাং,
আমার বিচ্ছেদ কমা করবেন, কমা করবেন আমার
কঠোর সত্যবাক্য। আপনার মঙ্গল হোক।
কল্যাণকর্ম করুন, অর্থ ও সজ্ঞনদের প্রতিভূণ
করুন। স্তায় ও ধর্মই আপনার দণ্ডহস্ত হোক।'

সম্মানে যুক্তকর হল বিহিসার। বললে, 'যাও,
তোমার অভীষ্টসাধনের পথে বিষ হব না। কিন্তু
এক কথা। বলো রাখবে?'

'বলুন কি কথা?'

'শুধু একটিমাত্র অনুরোধ। তুমি বিনাবিড়ে
তোমার কাম্যবস্ত্রলাভে সমর্থ হও। আর—যখন

সিদ্ধিলাভ করে প্রত্যাগত হবে তখন, এই আমার প্রার্থনা, আমি তোমার শিষ্য হব।'

'তাই হবে।' উঠে ধোড়াল সিদ্ধার্থ। বৈশম্পয় আশ্রমের দিকে যাত্রা করল। সেইখানেই অরাড়-মুনির বাস।

রাজা কিরে চলল প্রাসাদে।

হায়, আমাকে এতটুকুও ঈর্ষা করলনা সিদ্ধার্থ।

যেতে-যেতে ভাবতে লাগল বিবিধার। অনাগ্রাসে অনমনয়ে চলে গেল অরণ্যে। কেনই বা ঈর্ষা করবে? চক্ষুখান কি অন্ধকে ঈর্ষা করে? যুক্ত কি অন্ধকে, বৃদ্ধ কি রোগগ্রস্তকে? হায়, আমি ওকে করুণা দেখাতে গিয়েছিলাম! যে অজ্ঞ ঐশ্বৰ্যের মধ্যে থেকেও কামনার দ্বারা পরাকৃত সেইই তো করুণার পাত্র! [ক্রমশঃ]

মহাবিশ্বের সৃষ্টি-সন্ধানে

সলিল বসু

প্রথম যুগে মানুষের দৃষ্টি ছিল পৃথিবী স্থির ও অবিচল আর একেবারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। এই কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে চলেছে সাতটি জ্যোতিষ্কের চক্রাবর্তন—সূর্য, সূর্য আবার পাঁচটি গ্রহ। আকাশের কোলে অগণিত নক্ষত্রগাজি স্থির ও গতিহীন। এই ছিল সেকালের সহজ সরল বিশ্বরূপ। ধর্মবাক্যেরা বলতেন—ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, তাই তার বাসস্থান পৃথিবীর এত ব্যতির। কিন্তু ক্রমশঃ এই কণার মধ্যেই মানুষের অহুসঙ্ঘিৎসার শাখনা মিলেদেন। বিজ্ঞানকর্মীরা যুগে যুগে বারে বারে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে মূল বিশ্বতত্ত্বকে জটিলিত করে তুলতে লাগলেন। ধর্মবাক্যেরা বিব্রত হলেন; অমুশাসন দিলেন; গবরদার, কোনো প্রশ্ন জরো না, শুধু বিশ্বাস রাখো,—এ সবই মহা কলঙ্গাময় ঈশ্বরের অলৌকিক বল্লভের নিদর্শন। কিন্তু মানুষের মনের প্রশ্নকে শুধু বিশ্বাস দিয়ে চাপা দিয়ে যেওনা যাব না। তাই একদিন কেম্পদার, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা এই পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্বরূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন, প্রচার করতে চাইলেন সূর্যকেন্দ্রিক নতুন বিশ্বরূপের ছবি। ধর্মবিশ্বাস ও বৈজ্ঞানিক অহুসঙ্ঘিৎসার একটা প্রচণ্ড সংঘাত হ'ল—কেম্পদারের মাকে জীবন্ত পুড়িয়ে দাড়া হ'ল 'ডাইনী' বলে, কোপারনিকাসকে লোকালয় থেকে গাণিয়ে দিয়ে গোপনে গবেষণা চালাতে হ'ল আর গ্যালিলিওর শেষজীবন কাটলো কার্ডিনালের কারাগারে অন্ধ হয়ে। তবুও শেষ অবধি ধর্মবাক্য-মণ্ডলীকে হ'টতে যেতে হ'ল—সপ্তদশ শতাব্দীর স্থানীয়বাক্য 'সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্ব-পরিচয়না' যেনে দিলো।

মানুষের বিজ্ঞান-অগ্রগতি আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো, বাড়তে লাগলো জ্ঞানের সীমানা। সূর্য ও তার পরিবেষ্টন-কারী গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি নিয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের এই সৌরমণ্ডল। পৃথিবী এই সৌরমণ্ডলের একটা গ্রহ মাত্র। সূর্যকে ঘিরেই যখন এই পরিচরমা-যাত্রা, তখন নিশ্চয়ই গ্রহ-উপগ্রহাদির জন্মরহস্য লুকিয়ে আছে ঐ সূর্যের মধ্যে। কিন্তু কবে, কেমন ক'রে এই জন্ম হ'ল? আবার নতুন প্রশ্ন জাগে মানুষের মনে। সূর্যেই বা জন্ম কেমন ক'রে, সূর্যই বা এল কোথেকে? God said, let there be light and there was light—এই বিশ্বাসের মধ্যে তো সাহস মিলছে না। আবার চকল হ'য়ে পড়ে বিজ্ঞানীর মন। এইসব প্রশ্নের প্রথম উত্তর দেবার চেষ্টা হ'ল ১৭৯২ সনে, উত্তরদাতা হ'লেন ফরাসী-বিজ্ঞানী George Louis Leclerc, Comte de Buffon। বৃহন ঠাঁর ৪৪ খণ্ডে সমাপ্ত *Natural History* পুস্তকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন বিশ্বতত্ত্ব। তিনি বললেন—বহুযুগ আগে সূর্য শুধু একাই ছিল, তার কোনো গ্রহ-উপগ্রহাদি ছিল না। হঠাৎ একদিন কেমন ক'রে একটা ধূমকেতু তার চলার পথে এসে আছড়ে পড়ল একেবারে সূর্যের গায়েই উপর। তারপর অবশ্য ধূমকেতুটা আবার তার নিজের পথে চলতে শুরু করলো, কিন্তু সূর্যের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে সূর্যের দেহ থেকে যে কতকগুলো খণ্ড আশেপাশে ঠিকরে পড়েছিল, সেগুলো আর সূর্যের মধ্যে কিরে গেল না। এই খণ্ডগুলো সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন দূরত্বে বৃত্তাকার পথে ঘুরতে লাগলো, কালক্রমে এইগুলোই হ'ল গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি—আর আমাদের পৃথিবীও এমনি একটি গ্রহ মাত্র।

এই মতবাদ প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই জার্মান দার্শনিক ইম্মানুয়েল কান্ট বিবরণস্বতন্ত্র এক নতুন তত্ত্ব প্রচার করলেন, যার মাধ্যমে শুষ্ক গ্রহ-উপগ্রহ নহ, বরং সূর্য-কক্ষের রহস্যও তিনি ব্যাখ্যা করিতে পারলেন। তিনি বললেন— বর্তমান সূর্যের কেন্দ্র থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ শনির চেয়ে কিছু বেশী ব্যাসার্ধ নিয়ে যদি একটা বৃত্ত আঁকা যাবে, তাহলে যে পরিমাণ জায়া হবে—সবটা ছুড়েই বহুগুণ আগে ছিল শুষ্ক বিরাট একটা গ্যাसीয় মণ্ডল। সে যুগে ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো আবিষ্কৃত হয়নি। এই বহুবাস্তব গ্যাঁসমণ্ডলটা কিন্তু স্থির ছিল না, আস্তে আস্তে আকর্ষিত হ'ত নিজ কেন্দ্রবিন্দু চারদিকে। বর্তমানে দিনে যেতে লাগলো, গ্যাঁস-মণ্ডলী থেকে তাগের বিস্তারিত হ'তে লাগল মধ্যমস্ত্রে। বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্র বলে যে, কোনো পদার্থকে তাপ দিলে আরতন বাড়বে, আর ঝাঁপ করলে আরতন কমে। তাই উত্তাপ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই গ্যাঁস-মণ্ডলীর আরতন কমেতে লাগলো; এই আরতন করার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘূর্ণন-গতিও বাড়তে লাগলো। এই ঘূর্ণনগতির বৃদ্ধি ও গ্যাঁসমণ্ডলীর সংকোচন চললো একই সঙ্গে, ফলে মণ্ডলীর কিছু কিছু অংশ বুল সঙ্কোচনশীল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়তে লাগলো। এইভাবে বুল অংশটি পরবর্তী যুগ হ'ল সূর্য আর বিচ্ছিন্ন অংশগুলোর পরিবর্তিত রূপই হ'ল গ্রহ-উপগ্রহাদি। এই মতবাদকে ডিভি ক'রে করাঙ্গী গণিতজ্ঞ Pierre Simon, Marquis de Laplace ১৭৯৯ সনে *Exposition du Systeme du Monde* নামক পুস্তকে বিব-পরিকল্পন-তত্ত্ব প্রকাশ করলেন। কান্ট ও লাপ্লাসের বৃত্ত তথ্যই 'নীহারিকাবাদ' (Nebular Theory) নামে পরিচিত। কারণ তখনকার দিনে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল নীহারিকাগুলো শুষ্ক গ্যাসের সমষ্টি।

এই নীহারিকাবাদকেই ইউরোপের বিজ্ঞানীরা গ্রহ গঠনবহুর ধ'রে গ্রহাধানবোধ্য বলে মনে করতেন। উদাহরণ শতাব্দীর ষাটোষাষি সময়ে ইংরাজ পদার্থবিদ ব্যাল্ফরেল 'কান্ট-লাপ্লাস'-এর নীহারিকাবাদের গাণিতিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করলেন। কিন্তু উন্নত বিজ্ঞান-আধিকারের ভিত্তিতে দেখা গেল যে, এই মতবাদ একেবারে অচল। প্রথম কারণ হ'ল, বিভিন্ন উপগ্রহাদিতে যে পরিমাণ পর্যায় রয়েছে তা যদি কোনো সময়ে গ্যাঁসীয় আকারে সমস্ত সৌরমণ্ডল ছুড়ে ছড়ানো থাকত, তাহলে বহু-পরিমাণ এতই কম হ'ত যে, তার সামান্য মহাকর্ষণ দিয়ে সংকোচনশীল গ্যাঁস-মণ্ডলীর বিচ্ছিন্ন অংশগুলো থেকে সমষ্টিগতভাবে বিভিন্ন গ্রহ-সৃষ্টি সম্ভব হ'ত না। পরন্তু বিচ্ছিন্ন অংশগুলো গ্যাঁসীয় পুঙ্

হিসেবেই বর্তমান সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকতো। এখন যদি ধরা যায় যে, গ্রহসমষ্টিই বর্তমানে ১০০ ভাগ বেশী বস্তু সেই গ্যাঁস-মণ্ডলীর মধ্যে ছিল, যার মাত্র ১ ভাগ থেকে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহাদির সৃষ্টি হ'য়েছে আর বাকী ৯৯ ভাগ সম্ভবিত হ'য়ে গিয়ে জড়ো হয়েছে সূর্যের মধ্যে, তাহলে মতবাদটা কি ঠাড়াই? কিন্তু তা দিতেও ব্যাপারটা ঠিক ব্যবহারিক কল্যাণের সঙ্গে মিললো না, কারণ অতঃপরিমাণ বর্তমানে যদি ঘূর্ণনগতি বৃদ্ধি হ'তে হ'তে সূর্যের মধ্যে গিয়ে মিশে যেত, তাহলে সূর্যের কৌণিক গতিবেগ (angular velocity) হ'ত বর্তমান বেগের ৫,০০০ গুণ বেশী। আর তার ফলে সূর্য প্রতি ঘণ্টা ৭ বার করে নিজের অক্ষরেখার চারদিকে ঘুরতো। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সূর্যের একেবারে প্রাক্কিণেই সময় লাগে ৪ সপ্তাহ। অর্থাৎ গত শতাব্দীর নব্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'নীহারিকাবাদ' বাতিল হ'য়ে গেল।

বিজ্ঞানীরা তখন আবার বুফনের সংঘর্ষণ মতবাদটা নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। কিন্তু একশো বছরের মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, তাই ইংল্যান্ডের জেমস জীন্স ও আমেরিকার চেম্বারলীন ও হুটন প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা বুফনের সংঘর্ষণ-মতবাদের কিছুটা সংস্কার করলেন। প্রথমত, সূর্যের সঙ্গে সংঘর্ষণকারী জ্যোতির্ভট্টা একটা বৃহত্তর তারা, দু'মকেতু নয়; কারণ দু'মকেতুর আরতন ও শক্তির পরিমাণ খুবই নগণ্য। দ্বিতীয়ত, সূর্যের মূল দেহ থেকে কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন করতে হ'লে একদম সরাসরি সংঘর্ষের প্রয়োজন নেই। চাক্ষুর ও সূর্যের আকর্ষণে যেমন পৃথিবীর নদী ও সমুদ্রের জলে জোয়ার আসে, তেমনি বৃহত্তর নক্ষত্র কাছে আসার সঠিক আবিষ্কারের জলন্ত গ্যাঁসীয় সূর্যের দেহের অংশও ক্ষীত হ'য়ে উঠেছিল। আগন্তুক নক্ষত্রটি যতই এগিয়ে আসতে লাগলো, সূর্যের উপর তার আকর্ষণ-শক্তি ততই বাড়তে লাগলো, আর শেষ অবধি ঐ ক্ষীত অংশটা মূল সূর্যের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়লো। কিন্তু আগন্তুক নক্ষত্রটি সরাসরি সূর্যের সঙ্গে সংঘাত না করে সূর্যের কাছে লক্ষ মাইল দূর দিয়ে চলে গেল, ফলে বিচ্ছিন্ন অংশটি সূর্যের মধ্যে ফিরে আসতে পারলো না বা নতুন নক্ষত্রের সঙ্গেও মিশতে পারলো না; সূর্যেরই চারদিকে ঘুরতে লাগলো। কালে কোনো এক সময় গ্যাঁসীয় অংশটি ঠাণ্ডা হ'তে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হ'য়ে পড়লো। এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলোই হ'ল এক-একটি গ্রহ। সৌরমণ্ডল-সৃষ্টির এই মতবাদটা 'বিশ্বীভাবাদ' নামে পরিচিত এবং ১৮৪০-৪২ সন অবধি বিজ্ঞান-জগৎ এই মতবাদটাকেই মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু এই মতবাদের ভিত্তিতেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি বাগ্যা করা সম্ভব হইল না। আগন্তুক কোনো নক্ষত্রের আকর্ষণেই যদি সূর্য থেকে অংশগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তবে ষড়ভুজো সূর্যকে ডিম্বাকার গঠে (elliptical orbit) প্রদর্শিত করবে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কোনো গ্রহই ডিম্বাকার গঠ অঙ্গুলরগত করে না, তাইবের কক্ষ-গঠ আর বৃত্তাকার। এখন প্রশ্ন হ'ল—কেন এমন হবে? এ ছাড়া আর একটা ভাববার কথা আছে। চন্দ্রহীন রাতে আকাশকে ঘেঁষে। অন্ধকার বেধার কথা, আসলে ততটা অন্ধকার দেখায় না। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, তারার আলোর পরিমাণ বাধা দিতেও কিছুটা অতিরিক্ত আলো আকাশে দেখা যায়, তার সাধারণ নাম 'রানি-নীলি' (Zodiacal light)। গ্রহগুলোর বৃত্তাকার কক্ষ ও রানি-নীলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা একটা গ্যাস-মণ্ডলীয় পরিকল্পনা করলেন। কাস্ট-লারাসের অধিকরণে আধুনিক বিজ্ঞানীরা বললেন, জলন্ত সূর্যের চারদিকে বহুবর্ণাশী একটা গ্যাসের আচ্ছন্ন ছিল। আগন্তুক নক্ষত্রের আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ষড়ভুজো বসিও ডিম্বাকার গঠেই প্রথমে সূর্যপ্রসিধি আরম্ভ করে, কিন্তু এ গ্যাসীয় মণ্ডলীয় সবে সংঘর্ষ ক্রমশঃ কক্ষগত বৃত্তাকারে পরিণত হয়। আবার এ গ্যাস-মণ্ডলী কালে বিরাট মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে আর তার যে সামান্য অংশ পৃথিবীর আশেপাশে রয়েছে, তা থেকে সূর্যের প্রতিফলিত আলোই বহুপরিচিত 'রানি-নীলি'। এইভাবেই সূর্য ও কাস্ট-লারাসের মতবাদের শুরু তথ্যের দ্বাৰা করে নিয়ে বিজ্ঞানীরা আধুনিক মতবাদ গড়ে তুললেন।

১৯৩০ সনের পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানের একটা নতুন যুগের সূচনা হ'ল পরমাণু-শক্তির ব্যবহারিক আবিষ্কারে। পরমাণু-তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের হল ডিম্বাকারকেই পরিবর্তন করছে হ'ল। পরমাণু-বিজ্ঞানের নতুন সৃষ্টি থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কলাকলও বাদ গেল না, পরন্তু দেখা গেল বিরাট মহাবিশ্ব পরমাণু-তথ্যেরই একটা বৃহত্তম সংস্করণ। এতদিন পর্যন্ত জানা ছিল যে, পৃথিবী যে-ই উপাদানে ও অঙ্গপাতে তৈরি, বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহাদি এবং তারকা-লোক ও তাই নিয়েই তৈরি। ভূগর্ভার্শ্ব রাসায়নিকবিদ্যের মতে অক্সিজেন ও অক্সিজেন-সমর্থিত পদার্থ, সিলিকন, সোহা এবং কিছু ভারী উপাদানেই পৃথিবীটা তৈরি, হিলিয়াম ও হাইড্রোজেনের মতো হালকা গ্যাসের পরিমাণ সেখানে খুবই কম। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম যুগে ধারণা ছিল—সূর্য ও বৃষ্টি এ একই

পদার্থে তৈরি, তফাত শুধু পৃথিবী ও গ্রহ-উপগ্রহাদি ঠাণ্ডা আর সূর্য গরম। ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান বরহিন গবেষণা করে সিদ্ধান্ত করলেন যে, এ মতবাদ ঠিক নয়। তিনি দেখালেন যে, সূর্যের ৩৬ শতাংশেরও বেশী পরিমাণ হাইড্রোজেন, আর বেশ কিছু পরিমাণ হিলিয়ামও সেখানে রয়েছে। পৃথিবী যে পরিমাণ ও প্রকারের সাহায্যে তৈরি, সূর্যের মধ্যে তার পরিমাণ ১ শতাংশের চেয়ে খুব বেশী নয়। আর এটা শুধু সূর্যেরই সংস্কৃতি নয়, বিভিন্ন তারার বর্ণালী-বিশ্লেষণ ও অস্ত্রাভ্যাস গবেষণার দ্বারা একই রকম সংস্কৃতির অভ্যাস পাওয়া গেল। উন্নত বিজ্ঞান-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এও জানা গেল যে—বিরাট মহাপুত্র বাস্তবিকপক্ষে সূত্র নয়, সেখানে ছড়ানো রয়েছে স্বল্প ঘনিকণা ও গ্যাসের সমষ্টি, যার ঘনত্ব ১০ লক্ষ ঘনমাইল পরিমণ্ডলে (space) প্রায় ১ মিলিগ্রাম মাত্র। তবে এই সামান্ত্রিক গ্যাস-মণ্ডলীয় রাসায়নিক সংস্কৃতি কিন্তু মল্ল-লোকের অমূল্য। যদিও এই গ্যাস-মণ্ডলীয় ঘনত্ব খুবই কম, তবু বর্ণালী-বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বর্ণালোব-পদ্ধতি এই মণ্ডলীয় অবস্থান বিজ্ঞানীরা ধরতে পেরেছেন। বর্তমানে এও প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে যে, এর মধ্যে বেশিরভাগ পরিমাণটাই হ'ল হাইড্রোজেন আর কিছু পরিমাণ হিলিয়ামও আছে। তবে ঘনিকণার পরিমাণ খুবই কম। এই বিচরণশীল ঘনিকণাগুলো হ'ল লৌহ-বৌগিক, বিভিন্ন অক্সিড-অক্সাইড, বাস্কা-জাতীয় সিলিকন-বৌগিক ও জলকণা বা বরফকণা।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই নতুন জ্ঞানের ভিত্তিতে ১৯৪৬ সনে কার্ভান বিজ্ঞানী কার্ল জন উইজলার নতুন বিশ্বদৃষ্টি-পরিকল্পনার সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীর বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে গবেষণা করে রচনা করলেন নতুন বিশ্বদৃষ্টি-মতবাদ। সৃষ্টির আদিতে বিস্ফোরণে জুড়ে ছড়ানো ছিল শুধু স্বল্প গ্যাস-সমষ্টি ও কিছু কিছু ঘনিকণা। এই অবস্থার উল্টো ছিল মাত্র কয়েকশো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড আর ঘনত্ব ছিল খুবই সামান্য। বহু দিন বেতে লাগলো, তাপ-বিকিরণের ফলে গ্যাস-মণ্ডলীটা ততই ঠাণ্ডা হতে লাগলো। প্রাথমিক বিজ্ঞানের সূত্র বলে যে, কোনো সামগ্রীকে তাপ দিলে আরতন বাড়় আর ঠাণ্ডা করলে আরতন কমে। এই নিয়মেই সেই গ্যাস-সমষ্টির আরতন কমেতে লাগলো। এই আরতন কমান চেষ্টায়, মহাকর্ষণের নিয়মেই সেটা আঙে আঙে ঘুরতেও শুরু করলো। সন্ধ্যাকান বহু বাড়়তে লাগলো, সূর্য-গতিও ততই বাড়়তে লাগলো; তার ফলে, গ্যাস-মণ্ডলীয় বিভিন্ন অংশ

বিভিন্ন হ'য়ে যেতে লাগলো। এই গ্যাস-মণ্ডলীর বিভিন্ন সংশ্লিষ্টগোত্রের তাপ-বিকিরণের ফলে সন্ধান চলে। এই নিরস্ত বুদ্ধিপ্রাপ্ত সন্ধানের ক্ষেত্রে গ্যাস-মণ্ডলীর কেন্দ্রে ক্রমশঃ তাপ বাড়তে লাগলো। কিন্তু তাপ বাড়লে, তাপও বাড়বে; যেমন সাইকেলের টায়ারে পাম্প করলে, হাত দিয়ে দেখা যায় গরম হয়ে গেছে। কেন্দ্রে তাপ ও তাপ বাড়তে-বাড়তে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হ'ল, যা থেকে মুক্ত হ'ল পরমাণু যেকোন বা ভাঙন বিক্রিয়া (Atomic Fusion or Fission Reaction) ও আরও বেশী উত্তাপ। এক একটি গুণনের ও গরমের পরমাণু কেন্দ্রে ভাঙা-গড়া'র পথে আর-এক গুণন ও গরমের পরমাণু-উৎপত্তি চলছে অবিরাম। এই এক-একটি উত্তপ্ত জ্যোতিষ্কই হ'ল 'তারা', আর আমাদের সূর্য হ'ল এমন একটি তারা।

এখন কথা হচ্ছে—গ্রহগুলোর সৃষ্টি হ'ল কি করে? গ্যাস-মণ্ডলীর যখন সন্ধান চলেছিল, তখন ধূলিকণা-গুলোও কিন্তু একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিল না। এই ধূলিকণা-গুলোর গড় ব্যাস ছিল ০.০০০১ সেন্টিমিটার আর সংখ্যা ছিল অসংখ্য কোটি কোটি। এই কণাগুলো কিন্তু স্থির ছিল না, ছুটোছুটি করে বেড়াতে বহুশক্তে। এই ছুটোছুটি'র ফলে কণিকাগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ হওয়া স্বাভাবিক, আর বাতবিশপক্ষে তা হ'য়েওছিল। এমন, দুটো একই আকারের কণিকার যদি সংঘর্ষ হয়, তাহলে দুটোই আরও করেবড়ও বিভক্ত হ'য়ে যাবে। কিন্তু যদি একটা বড় কণিকার সঙ্গে তার চেয়ে কিছুটা ছোট কণিকার সংঘর্ষ হয়, তাহলে ছোটটি বড়টির দেহের হ'য়ে যাবে, মহাকর্ষের সাধারণ নিয়ম মতো। এইভাবে আস্তে আস্তে মহাশক্ত থেকে ছোট কণিকা হ'য়ে নিষ্কণ, আর বড় কণিকার সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়তে থাকবে। কিন্তু বহুদিন এই সংঘর্ষ ও ছোট-কণিকা-আত্মসংগে চলছিল, ততদিন এই জ্যোতিষ্কগ-গুলো ছিল উত্তপ্ত। কিন্তু এই সংঘর্ষ-প্রক্রিয়া বহু হবার পর আস্তে আস্তে তাপ-বিকিরণের ফলে উপরিভাগ ঠাণ্ডা হ'তে লাগলো ও গড়ে উঠলো বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ। এই গ্রহগুলো কিন্তু নিকটই জ্যোতিষ্কের মহাকর্ষণের সীমানার গ'ড়ে বাওঁঘা, তারই চারদিকে ঘুরতে লাগলো। এমনি একটি জ্যোতিষ্ক সূর্যের চারদিকে সফরশীল অনেক গ্রহের মধ্যে পৃথিবীও একটা। বিজ্ঞানী উইলসাকার অঙ্ক ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সৌরমণ্ডলের গ্রহসমষ্টির মধ্যে যে পরিমাণ পদার্থ আছে, 'দৃষ্টকণা থেকে সে পদার্থে পৌঁছতে সবর দেসেছে আর ১০০ কোটি বছর।

এখন প্রশ্ন হ'ল—সূর্যের চারপাশে এখন যে অল্প ধূলিকণা ছড়ানো ছিল, তা থেকে আর একটা গ্রহ-সৃষ্টি না হ'য়ে এতগুলো গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি? জ্যোতিষ্কতার ক্রমোন্নতির ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই সূর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহের এবং গ্রহ থেকে তার উপগ্রহগুলোর দূরত্ব পরিমাপ করা সম্ভব হ'য়েছিল। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, গ্রহগুলো সূর্য থেকে একটা-দামধেনার দূরত্বে কোনো কোনো নেই, পরস্পর আছে একটা নির্ভুল অন্তর হিসেবে। কোনো একটি বিশেষ গ্রহের সূর্য থেকে দূরত্ব ও তার পূর্ববর্তী গ্রহটির সূর্য থেকে দূরত্বের অল্পপাত সব-ক'টি গ্রহের সঙ্গে প্রায় একই। শুধু তাই নয়, যদি বা বৃহস্পতির অনেকগুলো উপগ্রহ যদিও আছে, কিন্তু উপগ্রহগুলোর মূল গ্রহটি থেকে দূরত্বের অল্পপাত প্রায় সমান। বিজ্ঞানীরা মহাকাশের এই অঙ্ক-কথা দেখে বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে যেতেন, কিন্তু এর কোনো সম্ভাব্যজনক উত্তর খুঁজে পাননি। সংঘর্ষ-মতবাদ বা বিস্ফোতিবাদ অনুসারে এই ব্যাখ্যার কোনো কারণই ব্যাখ্যা করা যায়নি। কিন্তু উইলসাকার এই 'শতাব্দীর সমস্যা'র সমাধান করেন। সূর্যের চারপাশের ধূলিকণা সূর্যের চারদিকে বিভিন্ন দূরত্বে বিভিন্ন কক্ষপথেই ঘুরত—অর্থাৎ কোনটির পথ বৃত্তাকার, কোনটির ডিম্বাকার, প্রকৃতি। বিভিন্ন কণিকার মধ্যে সংঘর্ষের ফলে আস্তে আস্তে বড় বড় বও সৃষ্টি হ'তে লাগলো। বড় বওগুলো মহাকর্ষণ-শক্তি-বৃদ্ধির ফলে যে শুধু চারপাশের ছোট বওকে আত্মসংগে করতে লাগলো তাই নয়, সূর্যের সঙ্গেও তার আকর্ষণ-অল্পপাতেও পরিবর্তন হ'ল। এই পরিবর্তনের ফলে কোনো কোনো গ্রহের কক্ষপথেরও পরিবর্তন হ'তে লাগলো। কোনো বও হয়তো নতুন কক্ষপথে এসে তার চেয়ে বড় একটা গ্রহের সঙ্গে সংঘর্ষে বিলুপ্ত হ'য়ে বা ছোট বওকে আত্মসংগে ক'রে বৃহত্তর বও সৃষ্টি করতে লাগলো। গ্রহের আকারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহাকর্ষণ-শক্তিও বৃদ্ধি হচ্ছিল বটে, কিন্তু কোনো বিশেষ আকারের সঙ্গে মহাকর্ষণ-শক্তির পরিমাণটা নির্দিষ্ট অর্থাৎ আকর্ষণ-শক্তির দূরত্বের বাইরের কোনো ছোট বওকে আত্মসংগে করার মতো ক্ষমতা তার নেই। এমনি ক'রে সূর্যের চারপাশের বিস্তৃত ধূলিকণাগুলো থেকে একাধিক গ্রহবওের সৃষ্টি স্বাভাবিক, আর একগুলো দূরত্বের পরিমাণও হবে মহাকর্ষণ ও অন্তর কতগুলো সূর্যের নিয়মমতো। এমনি ক'রে একই গ্রহের চারপাশে একাধিক উপগ্রহেরও সৃষ্টি হ'তে পারে। বাতবিশপক্ষে সূর্যের চারপাশে এমনি এক একটি নিয়মতান্ত্রিক গ্রহ-উপগ্রহ-সমষ্টি গড়ে উঠেছে।

এই হ'ল আধুনিক বিজ্ঞান-মতে মহাবিশ্ব-সৃষ্টির গোপন কথা। সংঘর্ষ-মতবাদ বা বিস্ফোতিবাদ-মতে গ্রহভঙ্গার সৃষ্টির ঘটনাটা ছিল আকস্মিক; কারণ দুটি তারার মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে, সংঘর্ষ বা আকর্ষণ পরিধির মধ্যে তাদের এসে পড়ায় সত্তাবনা খুবই কম। কিন্তু বর্তমান মতবাদ অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে, তারা-সৃষ্টি বা তাকে ঘিরে গ্রহ-উপগ্রহ-সৃষ্টি খুবই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের ছায়াপথে অর্ধাং নীহারিকাপুঞ্জ হর্বের মতো আর ৬০০ কোটি তারা রয়েছে। এমনি সব তারার গ্রহসমষ্টি আছে কিনা সে-সবকে মানুষ এখনও ঠিক জানতে পারেনি।

মহাবিশ্বে আবার ছায়াপথের সংখ্যা আর দশ কোটি, অর্থাৎ সপ্তদশ মহাবিশ্বে কোটি কোটি গ্রহ থাকে। সত্য, আর তার মধ্যে কতক কোটি গ্রহে কি জীবের অস্তিত্ব নেই? সৌরমণ্ডলে পৃথিবী চাড়াও মরল ও শুষ্ক গ্রহে জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। আগামী দশ-বারো বছরের মধ্যেই মানুষ-সমেত মরল ও শুষ্ক গ্রহে রকেট-প্রেরণের সম্ভাবনা রয়েছে। তখন আমরা জানতে পারব ওসব গ্রহের প্রকৃত স্বরূপ। আর মহা-বিশ্বের জীব-নির্মানের রোমাঞ্চকর সব ধেবে অনাগত বিজ্ঞান-ভবিষ্যৎ ও আগামীকালের বিজ্ঞান-শিল্প।

শিকারের টান

ঐত্রেয়শ্রদ্ধার মুখোপাধ্যায়

বাঘ-শিকার

বড় শিকারের প্রসঙ্গে বাঘের কথাই সর্বপ্রথম মনে আসে। এই জন্তুটির প্রতি ভয় মানুষের মনে সংস্কারগত হয়ে থাকিবেছে। বাঘের কিপ্রভা, শক্তি, ক্রুরতা ইত্যাদি প্রখ্যাতের বিষয়। বহুকাল ধরে, বহু গ্রামের পাণাশাপি বনে আঘাতা বাঘের সাক্ষাৎ ও পরিচয় পেরে এসেছি। আঘাতকার জন্তু বাঘকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু, বাঘের কার্যকলাপ অস্ত্রাস্ত্র জীব-জন্তুরই মতো আহার্য-সংগ্রহ আর আত্মরক্ষার চেষ্টা মাত্র। প্রকৃতির বিনামূলি বাঘ মাংসাস্থি। অস্ত্রাস্ত্র প্রাণিবধ ছাড়া তার আহার্য-সংগ্রহের আর কোনও উপায় নাই। বাঘ যেমন হিংস্র, চতুর্হী-পাশ্চীও তেমনই হিংস্র। এরাও গোকাহাচক খণ্ড করে খায়। আমরাও বাঘের আহার্য-পদার্থরূপ বলে বাঘকে ক্রুর, হিংস্র ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে থাকি। কীট-পতঙ্গদের ডিম্বাণ্ডিত আর ডাবা থাকলে, ওরাও পাখীদের ওপর এইরকম সব বিশেষণ প্রয়োগ করত।

পূর্ববঙ্গ বাঘের দেহ প্রায় ৭ ফুট দীর্ঘ হ'য়ে থাকে। লেজের দৈর্ঘ্য হয় ২১ ফুট। বাঘের দৈর্ঘ্য-প্রকাশের প্রথা—লেজবৃত্ত দেখে। পূর্ববঙ্গ বাঘের উচ্চতা ৬ ফুট। ওজন ৪১৫ মণ। বিভ্রাল যেমন অনায়াসে একটি ইঁদুর মুখে নিয়ে যায়, তেমনি অবনীলাক্রমে বাঘ একটি ৩৫ মণ ভারী মহিষের দেহ নিয়ে চলে। এই ভারী দেহকে টেনে খাড়া পাথর বয়ে ওঠে। বাঘের খাবার এত শক্তি যে, এক আঘাতে একটি

মহিষ নিহত হয়। মানুষের কথা বহুলা মাত্র। এই বিরাট দেহ সত্ত্বেও বাঘ প্রায় বিভ্রালেরই মতো লম্বাঘাতি আর কিল্প। কী প্রচণ্ড শক্তি থাকলে তার এটা সম্বল হ'তে পারে, তা অগ্রেম্বে। হস্তরাজী ক্ষীণসৌরী গায়েঘের পক্ষে বাঘ-শিকার বিশেষ সাহসিকতা আর শিকার-সম্ভারের পরিচয়; তার ওপর জনকলাপকাঠী কাজ বলেও গণ্য।

সাধারণতঃ বাঘ মানুষ দেখলেই সরে যায়। এর ব্যতিক্রম—‘মাগু-বেকা’ বাঘ। কিন্তু সাধারণ বাঘও আহত হলে, মানুষের ভয় ভুলে তার সতেরে আক্রমণ করে থাকে। আহত বাঘের সামনে বাঁধা—শিকারের একটি প্রধান বিপজ্জনক অঙ্ক। কিন্তু আহত বাঘকে বধ না করে ফেরা—শিকারীর শুল্ক ওকতর অন্তরায়। যিনি এই বিপদের সম্মুখীন হতে চান না, তাঁর বাঘ-শিকারে নামাই অশুভচিত। আহত বাঘ অনেক সময় বিকলাক হ'য়ে বেঁচে থাকে; বহুতর-বধে অক্ষম হ'য়ে শেন পর্বত মাগু খেতে আহত করে। শিকারীর ভীকতা বহু মরহত্যার কারণ হয়ে পড়ে।

আমি নিরস্ত্র বা অস্ত্রহীন অবস্থায় কতকবার বাঘের সামনে পড়েছি। প্রত্যেকবারেই বেঁচেছি যে আমি যে-মাত্রায় ভয় পেয়েছি, তার চেয়ে বেশী মাত্রায় বাঘই ভয় পেয়েছে; গরিতে উপস্থানে পা-তাকা দিয়েছে। মানুষের ভয় মনে বাঘেরও সংস্কারগত। মাংসাহারী উদভপুষ্টির পর বাঘ অনেকটা নিরীহ প্রকৃতি অবলম্বন করে থাকে। সে সময় ছোট ছেলে বেড়ে গেলেও বাঘ সরে পড়ে। কিন্তু অল্প

বায়ের সম্মুখে যাওয়া নেটেই স্থিত হইল নহ। 'সুখার তান্দ্রায় মাগুনেরই মেলাত বিগুণ্ড থাকে—তা বায়েরও যে থাকবে না, সে আশা অযৌক্তিক।

বাখিনি একটি নিবৃত্ত স্থান বেছে শাবক প্রসব করে। এককালে ২টি থেকে ৪টি পর্যন্ত বাচ্চ হত। ভূমির হবার পর থেকে, বাচ্চগুলি আহাৰ্য পত্রব্যয় লক্ষ্য না হওয়া পর্যন্ত বাখিনি ভয়ঙ্কর। বাঘও তার কাছাকাছি আসতে সাহস করে না। প্রথমে বিতরের খাওয়ার ভয়, তার পর তাদের বিকার বিবাহার ভয় বাখিনি অপর্যাপ্ত পত্র হত্যা করে। ক্রমে শিকার কৈশোর অবস্থার আসতে-আসতে নিম্ন নিম্ন আহাৰ্য লক্ষ্যন ও আহরণে লক্ষ্য হত। এর পর থেকেই এরা মার কাছছাড়া হ'য়ে বাগীচভায়ে বনে বিচরণ করতে থাকে। এইসব ছোকরা বাঘ বড় কৌতুহলী প্রকৃতির। এই কারণেই অনেক মারা পড়ে। ঠেকে ঠেকে বাকী দারা টিকে যায়, তারাই কৌতুহল-বনন ও আদরকায় লক হ'য়ে বনে রাজত্ব করে। কিশোর বাঘ অভাব বন ছেড়ে বনাঙ্কুরে ও বাগছা-আশা করে থাকে। কোথা অল্প বায়ের বদলায় থাকলে, সে অপূর্ণত্ব ব্যক্তিত্বকে আক্রমণ করে। ছোকরাটিকে তখন স্থানত্যাগ করতে হয়। কিন্তু ইনি স্ত্রী-স্বাভীয়া হ'লে তখনে মিলে-মিশেই ঘরকন্না পাটনে।

একবার আমাদের এক বনে একটি লক্ষ-সাবালক ব্যাঘ-কিশোর আমাদের পিছু নেয়। আমরা সে বনটি অতিক্রম করে অস্তর হাঙ্গিলাম। দুপুরবেলা। হঠাৎ এই বাঘটি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। আমাদের মধ্যে একজন রাইফেল উদ্ধত করতে, আমি তাকে নিবৃত্ত করি। কিন্তু সাবালান হ'য়েই আবার চলতে থাকি। বাঘটিও আমাদের পিছু-পিছু আসতে থাকে। খুব-চোখে কৌতুহলের ছাপ। কিছুদূর গিয়ে আমরা একটি গাছতলায় আহারার্থিণী ভক্ত বসি। বাঘটিও অনতিদূরে বসে আমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে থাকে। আমরা ৬৪ দিকে বাংদের হাড়, পাউকটির টুকরো ইত্যাদি ছুঁড়ে দিই। সেগুলি নেড়ে-চেড়ে ভাংবে, পেবে বাংদের হাড়গুলি চর্বণ করতে থাকে। আমরা উঠে আবার চলতে আরম্ভ করলে, সেও আবার লম্ব নেয়। বন ছেড়ে নদীতে নৌকায় ভঁটা অবধি সে আমাদের লগে-লগেই ছিল। নৌকা ছাড়বার পরও অনেকদূর পর্যন্ত আমাদের দিকে বেনে করণ ধীরেই তাকিয়ে ছিল। সন্ধ্যা-বিচ্ছেদের কাতরতা বেনে ওর কিশোর-স্বন্দর মুখখানিতে ফুটে উঠেছিল।

নৌকায় বাড়ি বলে যে, বায়ের কৈশোরে লগহারা। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমাদের বিরহ-কাতর সঙ্গীটি

পূর্ববোধন-প্রাপ্তে বর্ধন অবলম্বন করবে। তার পর থেকে পরস্পরে ডকা-ডকক সম্পর্ক প্রবর্তিত হবে।

হরিণ, শূকর প্রভৃতি শত্রুনাশী জীবের লক্ষ্য-নিয়মণে বায়ের স্থান নির্দিষ্ট। এইজন্য বাঘ মাগুনের উপকর্তী। বনের পাশাপাশি শত্রুকেও গিলতে পত্র পাখবার সময় হলে হলে নানা শত্রুভোজী জীবের সহাগন ঘটে। পর্যাপ্ত আহাৰ্যের লোভে বাঘও এদের পিছু নেয়। কয়েকটি পত্র নিহত হ'লেই তারা সে অকল ত্যাগ করে। এইসব গ্রামবাসীরা তাদের অকলে শিকারীদের বাঘ-শিকারে নিহত করে থাকে। আমরা কয়েকবার এই অবস্থার পড়ে শিকারের পরিবর্তে অতিথি-সংস্কারের কৃতি পেয়ে গিয়েছি।

স্বতন্ত্র বাঘ-মায়েই শিকারের উপযোগী নয়। যে বাঘ মায়ে বেতে আরম্ভ করেছে, বা নিয়মিতভাবে গন্ধ-বায়ু-হত্যায় অভ্যস্ত হ'য়েছে—মাত্র সেই বাঘই শিকারের যোগ্য। নিম্ন শিকার-সাক্ষ্য-চিক বা উফি (leophy)-সংগ্রহের চেষ্টা প্রকৃত শিকার-পর্যায়ভুক্ত নয়।

বাঘ সাধারণতঃ মায়েকে এড়িয়ে চলে বটে, কিন্তু শিকারের সময় পালাবার পথ বন্ধ দেখলে সে ক্ষেপে ওঠে। পালাবার চেষ্টায় সাধনে থাকে তার তাকেই আক্রমণ করে। বায়ের দৃষ্টি আর প্রবণতাক পায়। বেনে লুকিয়ে থাকবার আর নিশেবে বনে বিচরণের ক্ষমতা ওদের প্রচুর। বাঘ-শিকারে এইসব প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করতে হয়। তার ভয় চাই বায়ের লক্ষ্যন, তার গতিবিধি-নিরূপণ, তাকে শিকারোপযোগী স্থানে আনবার ব্যবস্থা—আর তার পর হির লক্ষ্য। বাঘ যদি নিহত না হয়ে, আহত মাত্র হয়ে বনে গা-ঢাকা দেয়, তাহ'লে সেটাকে বধ করবার ভয় তার পিছু নেওয়া অপরিসীম। আর—এর চেয়ে বিশঙ্কক কার্য খুব কমই আছে। শিকারীকে আসতে দেখলেই আহত বাঘ নিঃশব্দে তার প্রতীকার লুকিয়ে থাকে। এ সময় তাকে দেখতে পাওয়া কঠিন। শিকারী নিকটবর্তী হ'লেই বাঘ গর্জনে তাকে আক্রমণ করে। তখন লক্ষ্য হির রেখে গুলী-করা বিশেষ বৈধ, সাহস আর ক্রিয়শীল-সাধক। বহু শিকারী এই অবস্থার প্রাণ হারিয়েছেন।

বাঘ-শিকারের রস—এইসব পরিস্থিতি অতিক্রমের চেষ্টা আর বিপদের সত্তাবনাতেই নিবৃত্ত। বাঘ নিহত হলে, তার চামড়া ছাড়িয়ে সেটিকে কোনো চর্মশিল্পীর কারখানা থেকে 'কিওর' (cure) করিয়ে আনা হয়। সেটিকে তারপর বাড়িতে সবে সাজিয়ে রাখা হয়। অভ্যাগতদের সঙ্গলস কৌতুহল আর প্রশ্ন আমরা উপভোগ করে থাকি। চামড়াটির প্রতি

দৃষ্টিশাল্য করতে, যে-সব প্রতিভুল অসম্ভা অতিক্রম করতে হয়েছিল, সে-সব মনে পড়ে—শিকার-রঙ্গের পুনরাবদান বেন শেতে থাকি। শিকার-সামগ্র্য-চিত্র এইসব ট্রফি শিকারীর বিশেষ আগ্রহের সামগ্রী।

কোনো কোনো ধনবান শিকারীর বাড়িতে এইসব ট্রফি লাগিয়ে হাথবার মস্ত একটি পৃথক ঘর থাকে। এইরকম ঘর ক্রমে মিউজিয়াম (museum)-এর মতো হতে পড়ায়। ধনবর্ধের এই অভিযাত্রিই ষোড়শ সপ্তচরে স্বম বিরক্তিকর।

বাঘ-শিকারের যে-সব প্রথা প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যে ‘মাচান’-শিকারই সবচেয়ে নিরাপদ। বাঘের স্বভাব—কোনও একটি মস্ত বাঘ ক’রে বেহুটি একটি নিভৃত স্থানে স্থানিয়ে রাখা। কয়েকদিন ঘরে গেলিক ভঞ্জন করে। এই স্থানটি সন্ধান ক’রে তার কাছাকাছি কোনো বড় গাছের ডালে শিকারীর বদবার উপযোগী একটি মাচা প্রায় ১০-১৫ ফুট উঁচুতে বাধা হয়। অনেক শিকারী এই উদ্দেশ্যে কাঠের ক্ষেমে নেওয়ার দিবে বোনা ‘মাচান’ সঙ্গে রাখেন। সেটি গাছের ডালে শক্ত করে বেঁধে, তার ওপর লম্বা বসতে হয়—বাঘের প্রতীক্ষার।

মাচানে শিকারীর একলা বসাই ভালো। বড়জোষ একজন মাত্র সঙ্গী নিতে পারেন। বাঘ তার সজিত আহ্বারের পাশে এসে ভোজন আরম্ভ করলে, গুলী-প্রয়োগ বিধেয়। তার ঘাড়ের সন্ধিস্থলে লক্ষ্য করতে হয়। এইখানে বুকটের আঘাতে বাঘ তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হয়ে থাকে। তার পর আর-একটি গুলী-প্রয়োগের অবসর থাকে—মার তান্তেই শিকার-সামগ্র্য ঘটে।

গুলী-বিদ্ধ হয়ে নিশ্চল অবস্থায় পড়ে থাকা বাঘের নিকটে অন্ততঃ আধঘণ্টা অপেক্ষার পর হাওয়া ছুঁতুমূল। অনেক শিকারী বাঘকে ভূপাতিত করার অব্যবহিত পরেই কাঁচে গিয়ে সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছেন। মৃতপ্রায় বাঘ প্রতি-হিংসার শেষ চেষ্টায় উত্থর। গুলীর আঘাত পেয়ে বাঘ পড়ে আছে কেবলেও, তার নিকটে হাথার পূর্বে আর-একটি গুলী-প্রয়োগ ছুঁতুমূল। অধিকন্তু ন দোষায়।

এইভাবে বাঘের পঞ্চপ্রাণটি লম্বা নিঃশব্দে হবার পর শিকারী বীরমূর্খে এই ভবকর জন্তুরি দেখে লব্ধি পা ভুলে চরম তৃপ্তি প্রকাশ করেন। ক্যামেরা-বাধী সঙ্গী থাকলে, এই অবস্থায় ফটো নেওয়া হয়। দে-ফটো বাঁধিয়ে বদবার ঘর সামান্যে থাকে।

মাচান থেকে উল্ল প্রাণ্য শিকার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাত্রেরি ঘটে। আবছা আলোয় বা রাত্রের রাইফেলের নির্ভুল

লক্ষ্যভেদ একরকম অসম্ভবই। এমনকি মৃত পশুদেহ বা ‘মর্ডি’ আলোকিত করার ব্যবস্থা থাকে। দেহটির উপর একটি বৈদ্যুতিক বাতি লাগিয়ে মাচানের নিচে রাখা একটি ব্যাটারির সঙ্গে সেটিকে তার দিয়ে যোগ করা হয়। তারের একটি অংশ শিকারীর কাছে থাকে। এখানে হুইচও থাকে। সেটি টিপলেই মৃতদেহটি আলোকিত হয়। বাঘ দে-সময় ভোজনরত থাকলে সে অব্যবহিত চোখে থাকে—আর, গুলী-প্রয়োগের সুযোগ বেশ।

রাইফেলের নলে একটি বৈদ্যুতিক টর্চ (torch) উপযুক্তভাবে লম্বাও করেও শিকার চলে। শব্দ শুনে বাঘের উপস্থিতি আর অবস্থান বুঝতে পারলেই রাইফেল উত্তর করে তার দিকে কোরানো হয়। তার পর টর্চের হুইচ টিপলেই আলোর রেখা বাঘের গায়ে পড়ে। বহাখানে লক্ষ্য ও গুলী-প্রয়োগ এইবার সম্ভব হয়।

একটু চোলের আলো থাকলে, রাইফেলের মাথাই লক্ষ্য করার মস্ত যে গুটি (foresight) থাকে, সেখানে একটু তুলনা থাকিয়ে বেঁধে দিলে সেটি স্পষ্ট বোঝা যায়। এইভাবে বহাখানে লক্ষ্য করা চলে। কিন্তু মোটের ওপর রাত্রের শিকার, শিকারটির দেহে ঠিক মর্দম্বেদ আঘাত খটা অনিশ্চিত। গুলী কবহার পর রাতিপেশ না হওয়া পর্যন্ত মাচানে থাকাই অমুক্তি। সকাল হ’লে পর বহি বেরতে পাওয়া যায় যে বাঘটি পড়ে আছে, তাহ’লে আরও একটি গুলী-প্রয়োগ তার মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে পড়ে থেকে নানা সন্ধানী।

মর্ডির ওপর বাঘ আসে সন্ধ্যার বেলাে কিবা রাত্রিপেশে। মাচানে সমস্ত রাতি বসে থাকা শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। কিন্তু বনের নিভৃততায় মাচানে সামান্য নড়াচড়ার লক্ষও বেশ দূর থেকে পোনা যায়। অনেক সময় এই লম্বা বাঘ আহ্বারের লোভে ছেড়ে বনভ্রাণী হয়। বুগা বাঁধিযাপনের পর শিকারী মাচান থেকে বেয়ে বাঘের পনচিহ্ন-লক্ষ্যে এই ঘটনা বুঝতে পারেন, আর স্মরণে আসলে ফেরেন।

মাচান-শিকারের আর একটি প্রথাকে ‘কাড়াই’ (hearing) বলা হয়। বাঘের স্বভাব—মাংসাহারের পর নিকটস্থ জলাশয়ে জলপান, আর তার পর কাছাকাছি কোনো নিভৃত স্থান বেছে বিধানিত্রা। মর্ডির সন্ধান নিয়ে, দেখান থেকে বাঘের পনচিহ্ন-অঙ্গুণের তার সে বিশ্রামস্থানটি অন্ধান করা হয়। তারপর সেই স্থানটিকে বেড় একদল লোক (beaters) সোরগোল করতে করতে জল চৌড়িয়ে অঙ্গুণের হা মাচানের দিকে। এখানে অসং শিকারী প্রস্তুত হ’য়ে, কাড়াই আরম্ভের পূর্বই যেন। সামনে একটু ঠাণ্ডা জায়গা দেখে মাচান বাধা

হয়। কিন্তু সে স্থান থেকে বেন নাচানিট স্পষ্ট দেখা না যায়, সে ব্যর্থতাও প্রয়োজন।

বাঘ এ সময় গুরুভাতনের পর ঘুমোতে অসম। গেলমাগেলে ভোগে সে সংসারবশে বিপরীতমুখে নিঃশাড়ে পালাবার চেষ্টা করে। মাচানের সামনে খোলা জায়গাটির প্রবেশের পূর্বে সে একবার চারিদিকে তীক্ষ্ণ তুরীপাত করে নেয়। বাচান সেখানে গেলে সে অন্তিমিক দিগে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু মাচানিট ঠিকভাবে ঘড়িত হয়ে থাকলে আর দিকারী সে সময় নিশ্চল থাকলে, বাঘ সেদিকে তাকায় না। অতঃপর মাচানের নিকটে এসে পড়ে। এইবার গুলী-প্রয়োগ চলে।

এই প্রাথমিক দিনের আলোয় দিকার-চেষ্টা চলায়, লাক্সোর সন্তাননা অবিকলতর। তবুও—চলন্ত বাঘের মর্মস্থলে আঘাত লক্ষ্যকর। এই কারণে বড়-বোলের রাইফেল-ব্যবহার হুক্তি। প্রথম গুলীটি ঠিক মর্মস্থলে আঘাত না করলেও, আঘাতের বলে বাঘ পড়ে যায়। তৎক্ষণাৎ মর্মস্থল-লক্ষ্যে আর-একটি গুলী-প্রয়োগ সম্ভব। আহত বাঘ না পড়ে গা-ঢাকা দিলে, আঘাতী অঙ্গকার পর সাবধানে গাছ থেকে নেমে তাকে দখলিবি অঙ্গসরণ আর বধ কর্তব্য।

মাচান থেকে নিকট গুলী সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যমুখে হ'লে বাঘটি অতিক্রম পলায়ন করে। সে বাঘ পরে অত্যন্ত সাক্ষ্যকরী হয়। কাড়াই-এর সময় সে লাইন কেটে বিপরীত-মুখে পালায়। সামনে কোনো লোক থাকলে, প্রাণচয়ে তাকে আক্রমণ করে থাকে।

মাচান থেকে দিকার অঙ্গেকাকৃত নিয়োগ ব'লে, অনেক দিকারী ছোট-বোলের রাইফেল (বেন ০'৩০", ০'৩০" ইত্যাদি) ব্যবহার করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এর পরিণামে, আহত অবস্থায় বাঘের পলায়ন-সম্ভাবনা বেশী। ম্যাগাজিন (magazine) রাইফেল-ব্যবহারও অমৌক্তিক। কারণ—একটি গুলী-ছোড়ার পর অপরটিকে মলে আনিবার দ্রুত বোল্ট (bolt)-চালনায যে সময় যায়, তৎক্ষণে বাঘ অদৃষ্ট হতে পারে। প্রথম গুলীটি বাঘকে সামান্য আঘাত মাত্র করে থাকলে, সেই আহত বাঘের অঙ্গসরণ-পর্ব আবশ্যক। আর ছোট-বোলের বা ম্যাগাজিন-রাইফেলের ওপর নির্ভর ক'রে একবারে নাশা একরকম আশঙ্ক্যবাহী নাসামুদ্র।

লেখকের অভিজ্ঞতায়, বাঘ-দিকারে ০'৬৬" বা ০'৬০" বোলের রাইফেল প্রস্তুত। রাইফেলে নরম-মাথার (soft nose) বুলেট ব্যবহার্য। শক্ত-মাথার (hard nose) বুলেট বাঘের দেহ ভেদ করে বেঘিরে যেতে পারে; সেহেত

কোনো মর্মান্তিক অঙ্গ হইত। পথে না পড়তেও পারে। বুলেটের শক্তি আনন্দিকভাবে বেহে মলিত হয়। নরম-মাথার বুলেট দেহের ভেতরই থেকে যায় ব'লে সব নক্তি দেহেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই বুলেট দেহে প্রবেশের পর ক্রমশঃ বুলগগ্র হয় ব'লে এর আঘাত সাংঘাতিক।

আহত বাঘকে অঙ্গসরণের পূর্বে দীর্ঘভাবে কর্দমশক্তি-নির্ণয় আবশ্যক। যেহেতু বাঘ পলায়ন করেছে মেনিকৈ তার শক্তিতে থাকবার মতো স্থান অস্থান ক'রে, তার চারিদিকে পদচিহ্নের সন্ধান আবশ্যক। পদচিহ্ন না থাকলে, অস্থিত স্থানেই বাঘ আছে বুঝতে হবে। সেই স্থানটির অভিমুখে অতি সাবধানে, রাইফেল প্রস্তুত আর উত্তত ক'রে দীর্ঘ দীর্ঘে অঙ্গসরণ হ'তে হবে। রক্তচিহ্ন থেকে, আঘাতের গুরু আর স্থানের অস্থান সম্ভব। দিকারীর সঙ্গী এক বা দুইজন কোনো গাছ বা উঁচু জায়গায় উঠে সামনের কোণ-কাড় লক্ষ্য করে বাঘের অবস্থান-নির্ণয়ের চেষ্টা করতে থাকবেন। বাঘ তার বিপুল দেহ নিয়ে সামান্য মাত্র কোণের আঁকাগেই সম্পূর্ণ আত্মগোপন করতে পারে। দিকারী অতি সতর্কভাবে চারিদিকে লক্ষ্য রেখে অঙ্গসরণ হ'তে থাকেন। অনেক সময় কোণে নড়াচড়া মেনে বাঘের উপস্থিতি বুঝা যায়। গাছের ওপর থেকে সঙ্গীরা ঠিক স্থানটির নির্দেশ দিলে, সেইমতো গুলী-প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়। কখনও কখনও বাঘ অতিক্রমে পাপ থেকে গর্জন ক'রে দিকারী বা তাঁর সঙ্গীদের আক্রমণ করে। এ সময় প্রাণ দ্বিগ্ন রেখে, দ্বিগ্ন লক্ষ্যে কিপ্রহরে গুলী-প্রয়োগ প্রয়োজন। এটি অতি সতর্কতায় পরিচালিত। বহু দিকারী ও দিকার-সঙ্গী এই অবস্থায় সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছেন। বাঘ এ সময় আঘাতের বহুগা ও ডগ্ন ভুলে আতঙ্কিত হয়ে অঙ্গ অগ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। যে আঘাতে মহিষের মতো প্রকাণ্ড ক্ষত হত হয়, সামান্য নরমেই সে-আঘাতের ফল সহজেই অস্থিরে। গুলী-আঘাতের পর অস্থিত: আঘাতী পরে আহত বাঘের অঙ্গসরণ আরম্ভ করা হুক্তি। এই সময় অতিক্রম হ'লে বাঘের আঘাত-স্থান বিকল হয়; বাঘের সতর্কতারও কিছু উপশর হয়। বাঘ নিঃশেষ ক্ষতস্থান চাটতে থাকে। শুধন তার নিকটে বাওরায় বিপদের আশঙ্কা কিছুমাত্রায় অস্তর। এক্ষেত্রে বড়-বোল, মিল রাইফেল অপরিহার্য।

হাতির শিঠে চড়ে দিকারের প্রাণও প্রচলিত আছে। একতর হাতিকে উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণ হাতি বাঘের পদ পেলে চকল হ'য়ে ওঠে; বাঘ তেড়ে

আঙ্গলে পালাবার চেষ্টা করে। শিকারী হাতি বাঘের সামনে নিশ্চল থাকে বলে তার শিঠ থেকে ঘির লক্ষ্যে গুলী-বর্ষা সম্ভব হয়। বলা বাহুল্য যে, এ প্রকার শিকার বিশেষ ব্যঙ্গশব্দগত। বাঘের গতিবিধি লক্ষ্যের পর, তার আশ্রয়স্থানটি ১০-১২টি হাতি নিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। তারপর দীরে দীরে হাতিগুলিকে সেই আশ্রয়স্থানের দিকে চালনা করা হয়। শিকারীরা যে-সব হাতিতে থাকেন, সেগুলিকে উপযুক্ত স্থান বেছে পাড় করানো হয়। অগ্র হাতিগুলি সেইমুখে আসতে থাকে। বাঘ ঘোড়ারিতি বিশরীতমুখে পালাবার চেষ্টায় শিকারীদের সামনে পড়ে; যে হাতির সামনে আসে, সেই হাতি থেকেই প্রথম গুলী চলে। তার পর বাঘ-বধ না হওয়া পর্যন্ত সব হাতি থেকেই গুলী-বর্ষা চলে। আহুত হয়ে বাঘ গা-ঢাকা দিলে, আবার এইভাবেই সেটাকে তাড়িয়ে শিকারীদের সামনে আনবার চেষ্টা হয়। শিকারী তাঁর সচল বাচন থেকে নির্বিঘ্নে শিকার সমাপন করে থাকেন।

মড়ির অস্ত্র অনেক সময় মহিষ বেঁধে রাখা হয়—বাঘের চমাকের পরে। ৪-৫টি পর্যন্ত মহিষ বনের ভিত্তি ভিত্তি স্থানে রাখা হয়। সন্ধ্যাবেলায় বেঁধে সকালে সেগুলিকে ফিরিয়ে আনা হয়। বাঘ কোনও একটিকে বধ করলে—সেটিকে কাড়াই, বা হাতী থেকে, বা মাচান থেকে শিকার করা হয়।

দক্ষ শিকারী সময় সময় খুব ভোরে একজন সঙ্গী নিয়ে, যে-সব মহিষ রাখা হয়েছে সেগুলির পরিদর্শনে যান। কোনওটি বাঘের হাতে প্রাণ দিয়ে থাকলে, ভোজনরত বাঘটিকে দেখতে পাওয়া অসম্ভব নয়। বাঘ অনেক সময় আহারে ব্যাঘাত ঘটায় সন্ধ্যায়ে তেড়ে আসে। সে সময় একটু ঠাণ্ডা মাথায় গুলী-শ্রেণীসেই নির্ভার পথে। কোনো কোনো চতুর্, অভিজ্ঞ বাঘ দূর থেকেই শিকারীর আগমন লক্ষ্য করে গা-ঢাকা দেয়। তখন শিকারীর নিশাঘে সরে পড়াই ভালো। ব্যাপসম্বন্ধ ঐরা কাড়াই-এর লোকজন সংগ্রহ করে কাড়াই আরম্ভ করার প্রয়োজন।

মাগুনের মস্তা বাঘের মণ্ডেও ব্যক্তিগত আচার আর বড়াবে পার্থক্য দেখা যায়। হস্তরায় একটি বাঘ কোনো পরিস্থিতিতে যেরূপ আচরণ করে, অপর একটি বাঘও যে সেই-রকম পরিস্থিতিতে অস্বস্তি আচরণ করবে, তা বলা যায় না।

হেটে বাঘ-শিকারে যে-সব পাওয়া যায়, সে সব অস্ত্র কোনো প্রকারে শিকারে থাকে না। এ শিকারে অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা দুই-ই চাই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাঘ শিকারীকে

দূর থেকেই লক্ষ্য করে, আর নিঃশব্দে সরে পড়বার চেষ্টা করে। তখন তার পরচিহ্ন সাধনান সেধে বৃত্তে হয়, কোনওদিকে গিয়েছে। অতর্কিত থেকে তাকে আগলাবার চেষ্টা হয়। অনেক সময় দুই বা তিনজন শিকারী বিভিন্ন দিক থেকে বাঘটিকে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করেন। বাঘটি একজনকে এড়িয়ে পালাতে চিনে, অপর একজনকে পালায় পড়ে। হু-একবার এইভাবে বাঘ পেলেই বাঘ উগ্রমুখি ধারণ করে। তখন শিকারী নিয়ে ঠাণ্ডা না থাকলে, বিঘ্ন বিপদের সম্ভাবনা। আবার অরণ রাখতে হবে যে, বড়-বোয়ের দু'নলা রাইফেল এ-শিকারে অপরিহার্য। এই প্রকার শিকার-ব্যায়ের পূর্বে রেং (range) কিস্ততা অভ্যাস করা মুক্তিযুক্ত। রাইফেল তুললেই যেন সেটি লক্ষ্যস্থিতি উদ্ভূত হয়। কারণ ঘির হয়ে পাড়িয়ে শিকারীকে লক্ষ্য করবার সুযোগ বাধ করাচি-ই সে। তর্জন-গর্জন, লক্ষ-কম্প, এমন কি সবেগে আক্রমণের ভয়ও প্রস্তুতি অবশ্যক। এসব ক্ষেত্রে রাইফেল-চালনা অভ্যাস-সাপেক্ষ। এর তুর্পি অব্যবহৃত হয়। তারপর অস্ত্রান্ত প্রকার শিকার যেন নিরাশ্রয় বেধে হয়।

পূর্বে রাজ্য-রাজত্বের হাতিশালায় শিকারী হাতি সংগ্রহ পালিত হ'ত। বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রত একবারও শিকার-অভিযানের ব্যবস্থা হ'ত। দূর বনে বাঘের সন্ধান নিয়ে তার কাছাকাছি শিবির-সংস্থাপন হ'ত। বহু শিকার-বিলাসী আহম্মিত হয়ে সাগ্রহে যোগ দিতেন। বিঘ্নব্যাপী শিকারান্তে শিবিরে রাত্রি গান-বাঁজন প্রভৃতিতে শিকার-শ্রম-অপনোদনের ব্যবস্থাও থাকত।

এসব সাময়িক বিলাস আজ লুপ্ত। আজ 'অফিস' নামে আনন্দ তামসিক নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করেছি। শ্রম-সাপেক্ষ শিকার-অভিযানের স্থান আনন্দ পিকনিক (picnic)-যাত্রা প্রতিস্থিত করেছে। আজ আমাদের আনন্দ—সৈনিক শ্রমবিমুখ, স্বীকৃতিসর, অর্ধসর্ব বদিক-সম্প্রদায়।

এ অযোগ্যতা আমাদের বন্ধ করতে হবে। বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, খোলা মাঠ, জলা—এসবের রসাহুতুতি পুনরুদ্ধারিত করতে হবে। ছুটি নিম্নে ব্যাঘ্যাবধেণ পুরী, দাখিলি, মধুপুর ইত্যাদি স্থাপন-সম্মত স্থানে ভীড় না ক'রে ছোট বা বড় শিকার-সন্ধানে সময়টি কাটালে সত্যই শরীর, মন ও প্রাণ পুনরুদ্ধারিত হবে।

পৃথিবীর নানা দেশ থেকে শিকার-বিলাসী ভারতে প্রতিবৎসর শিকার-রস-ভোগের উদ্দেশ্যে আসেন। ভারতবাসী আমরা—নিজেদের সে-রসে বঞ্চিত করে রেখেছি।

ছোট-খোঁট

• * * চারুচন্দ্র ওট্টোচার্য * * •

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে মা ও মেয়ে

১৯০৬ সালে পদার্থবিজ্ঞায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল তিনজনকে ভাগ করে—ম্যাডাম কুরী, তাঁর স্বামী পিঁরী কুরী ও বেকারেল। এই প্রথম একজন মহিলা নোবেল পুরস্কার পেলেন।

১৯১১ সালে রসায়নবিজ্ঞান নোবেল পুরস্কার পুরোপুরি পান ম্যাডাম কুরী। এর আগে বা এর পরে কোনো পুরুষ বা কোনো নারী ছাঁবার নোবেল পুরস্কার পাননি। সুইডেনে এই পুরস্কার নিতে যখন তিনি গেলেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর কন্যা ইরিন। যে সভায় এই পুরস্কার দেওয়া হল, বালিকা সেই সভায় উপস্থিত ছিল।

চল্লিশ বছর পরে সেই ইরিন ওইখানে আবার উপস্থিত হয়ে নিজে নোবেল পুরস্কার নিলেন। ইরিনের সঙ্গে তাঁর স্বামীও পুরস্কার পেলেন। স্বামী-স্ত্রী ও তাঁদের কন্যা-জামাতা চারজনকে পুরস্কার পাওয়া, নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে এক অস্বাভাবিক ব্যাপার।

পিঁরী কুরী ও ম্যাডাম কুরী পুরস্কার পেয়েছিলেন স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারে; তাঁদের কন্যা-জামাতা—ইরিন কুরী-জোলিও ও ফ্রেডরিক কুরী-জোলিও পুরস্কার পেলেন কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করে।

স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা

স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হল এক হুল ফুলি অমৃৎসরগ করে। রনটুজেন এক্স-রশ্মি আবিষ্কার করলেন। দেখলেন, এতে ফটোগ্রাফিক কাচ আক্রান্ত হয়। বেকারেল কাগজ-মোড়া ফটোগ্রাফিক কাচের

উপর ইউরেনিয়াম নাইট্রেট রেখে দেখলেন ফটোগ্রাফিক কাচ আক্রান্ত হল। তিনি ঠিক করলেন, ইউরেনিয়াম নাইট্রেট থেকে এক্স-রশ্মি বেরচ্ছে। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। শেষ অবধি বেকারেল বুঝলেন, ইউরেনিয়াম নাইট্রেট থেকে এক নতুন ধরনের রশ্মি বেরচ্ছে—যে রশ্মির এক্স-রশ্মির মতো ফটোগ্রাফিক কাচের উপর ক্রিয়া আছে।

পোলাও তখন রাশিয়ার অধীন, রাশিয়ার অত্যাচার চর্কুরিত। বিদ্রোহ দেখা দিল; বিদ্রোহীদের মধ্যে ছিলেন মেরি স্কলডেফাভা নামে একটি মেয়ে। রাশিয়া বিদ্রোহ দমন করল; মেরি পালিয়ে এলেন প্যারিসে। সেখানে তিনি এক বিজ্ঞানালয়ে ভর্তি হলেন। পিঁরী কুরী সেখানকার শিক্ষক ছিলেন। কয়েকবছর পরে তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ে হল ১৮৯৫ সালে। তার পরের বছর বেকারেল ইউরেনিয়াম সংকেত তাঁর আবিষ্কার ঘোষণা করলেন। কুরী সম্পত্তি বেকারেলের আবিষ্কারের আকৃষ্ট হলেন। তাঁরা এখন সম্মান করতে আরম্ভ করলেন, ইউরেনিয়ামের মতো অল্প পদার্থ থেকেও আপনা-আপনি তেজ বেরায় কিনা।

পিটরেও নামে এক খনিজ পদার্থ থেকে ইউরেনিয়াম পাওয়া যাচ্ছিল। ইউরেনিয়াম বার করে নেবার পর যে অংশটা ফেলে দেওয়া হচ্ছিল, কুরী-সম্পত্তির নজর পড়ল সেইটের উপর। তাঁরা দেখে অবাক হলেন যে, মূল ইউরেনিয়ামের চেয়ে ওই অংশের তেজ বেশি। তাঁরা ভাবলেন, নিশ্চয় ওই খনিজ পদার্থের মধ্যে এমন একটি কিছু আছে যার

শক্তি ইউরেনিয়ামের অনেকগুলি বেশি, কিন্তু যাকে এডমিন অগ্রাহ্য করে কেলে দেওয়া হচ্ছিল। অম্লসন্ধান চলল, শেষ অবধি তাঁরা ওর মধ্যে পেলেন রেডিয়ম বলে এক নতুন ধাতু, যা ওই পিচব্লেন্ডে অতি অল্পপরিমাণে রয়েছে, কিন্তু যার থেকে তেজ বেরাচ্ছে সমপরিমাণ ইউরেনিয়ামের লক্ষ গুণ বেশি। কিন্তু তখনও ওই রেডিয়ম বিসৃষ্ট আকারে পাওয়া গেল না।

ওদের এই আবিষ্কারে বিজ্ঞান-স্রগতে একটা মাড়া পড়ে গেল।

কিন্তু কুরী-দম্পতির সুখশাস্তি বেশিদিন টিকল না। ১৯০৬ সালে একদিন এক রাত্তা পার হতে গিয়ে অধ্যাপক কুরী গাড়ি চাপা পড়লেন, মুহূর্ত-মধ্যে প্রাণ হারালেন। ম্যাডাম কুরী এখন একলা তাঁর সাধনায় মগ্ন রইলেন। ১৯১১ সালে বহু পরিশ্রমের পর তিনি বিসৃষ্ট রেডিয়ম পেলেন, যার ক্ষেত্রে তাঁকে দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা

একটা ব্যাপার দেখা গেছে যে, একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে তেজ বেরয় তা তিন রকম রশ্মির মিশ্রণ—আল্ফা, বিটা ও গামা। তবে পোলোনিয়ম নামে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে মাত্র আল্ফা-রশ্মি বেরয়।

ইরিন কুরী-জোলিও ও ফ্রেডরিক কুরী-জোলিও

পোলোনিয়ম থেকে নির্গত আল্ফা-রশ্মি দিয়ে বিভিন্ন পদার্থকে আঘাত করতে লাগলেন। দেখলেন, ওই সব পদার্থ কিছু সময়ের জন্য তেজস্ক্রিয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখন আল্ফা-রশ্মির বদলে তাঁরা বেগবান নিউট্রন ব্যবহার করতে থাকলেন। বহু কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরি হতে লাগল। এইরকম কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তাঁরা নোবেল পুরস্কার পান।

রেডিয়ম একটি স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ; ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় এ বিশেষ ফলপ্রসূ। এখন দেখা গেল, কয়েকটি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ কতক কতক উৎকট ব্যাধি সারিয়ে দেয়। একটা ঘটনার কথা বলি।—

পাঁচ-ছ'বছর আগেকার কথা। একজন বছরের এক বৃদ্ধার মাত্রাণ্ডক রকমের গলগণ্ড রোগ হয়। ডাক্তার বললেন, এ রোগ সারে না, অন্তত আমাদের দেশে এ সারাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। মৃত্যু অনিবার্য। শেষে ওই ডাক্তার বিলত থেকে এরোপ্লেনে টাটকা-তৈরি তেজস্ক্রিয় আয়োডিন আনালেন। কণী তা ব্যবহার করে মেরে উঠলেন।

আমাদের দেশে সম্প্রতি শান্তিপূর্ণ কালে অ্যাটমীয় শক্তি আহরণের যে-সব যন্ত্র বসছে তা থেকে ওই রকমের কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রস্তুত করে চিকিৎসাক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা হচ্ছে।



আলংকার
বুক স্টোর

যোগা
৪৬
০৬২৬

লক্ষ্মী ব্রাদার্স
জুয়েলার্স
১, হিন্দুস্থান হাট, বালিগঞ্জ
২০৮/৮, রাসবিহারী এলিভিউ (পটুয়াখাটি জংশন) কলিকাতা

পুরোনো কথা

পায়রার সখ

যম দত্ত

পায়রা শোবার সখ আমাদের দেশে নবাব-বানশাহসের আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কোনো কোনো নবাব-বানশাহের সখের কথা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। বাংলাদেশেও পায়রার সখ বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।^১ অন্ধ রাজ্য হুছে বাইলেন; যদি তিনি হুছে জয়লাভ করেন তো সারা পায়রা ছাড়িয়া দিবেন; এই পাড়া উড়িয়া গিয়া রাজধানীতে তাঁহার জয়ের সংবাদ দিবে। রাজা তখন রাজধানীতে গিহিবেন মঙ্গল-বাৎ শুনিতে শুনিতে—নানা পতাকা শোভিত, সুপারিগাছ কলাগাছ শোভিত রাতপথ দিয়া হাতি চলিয়া আসিবেন। হুঙ্কার হইল; কিন্তু তুলকাম বা কর্মচারীর বিবাহদাতকতায় কালো পায়রা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। হুছে পরাভব হইয়াছে ভাবিয়া রানীমহল অলে জুমিয়া প্রাপত্যাগ করিলেন। বাঁধা শূণ্ণগৃহে ফিরিলেন। এইরূপ বহু ভাগ্যের বহু গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। সারা পায়রা জয়ের; কালো পরাজয়ের প্রতীক। কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দুগণও পায়রা পোষার বেওয়াজ ছিল। কামাখ্যা-মন্দিরে এখনও পায়রা-বলি হয়। বহু তর পায়রা-বলির ব্যবস্থা নাকি আছে। পায়রা হইতেছে ‘লক্ষীর বরণাক্রী’— শুভ লক্ষণ বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

সিলেট জেলায় শাহজালাল ইংরাজী ১৪শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তৎকালর রাজ্য গৌরগোবিন্দকে পায়রার সাহায্যে পরাজয় করেন। শুনা যায়, গৌরগোবিন্দের কার্ণাঘনী হইতে বাংলায় ‘গৌয়ার গোবিন্দ’ কবীর উৎপত্তি হইয়াছে। শাহজালাল বিভিন্ন স্থানে সৈন্ত সমাবেশ করিয়া হুছে করিতেন; এক পায়রা ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের একস্থানে সম্মিলিত হইতে নির্দেশ দিতেন। অন্যতে কোনো একটি মাথপার সহজেই তাহার সৈন্ত-সংখ্যা বেশী হইত; তাহার। গৌরগোবিন্দের অল্পসংখ্য সৈন্যের সহজেই পরাসিত করিতে পারিত। গৌরগোবিন্দের পরাজয়ের পরে শাহজালাল একদ্বায়ে কোরান, অপর দ্বায়ে তুলোয়ার ধরিয়া বন্দী হিন্দুদের বলিতেন—কোনটি পছন্দ কর? তাহার। যদি বলিত

তুলোয়ার, তৎকথাত তাহাদের মাথা কাটিয়া ফেলা হইত। যদি বলিত কোরান, তাহাদিগকে গোমাল পাওয়াইয়া মুসলমান করা হইত। এইরূপে সিলেটে মুসলমানের সংখ্যা ও অধুনাও খুব বেশী হয়। এখনও মুসলমানের। শাহজালালের পায়রার বংশধর পায়রা পোষা মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করে।

বর্ধমান নগরে মহারাজাধিরাজের রাজপ্রাসাদের মদুহ-মহলের দিকে একটি খুব উঁচু সোতালা-সমান খালকাটা পাঁচিল আছে। এই পাঁচিলে হাজার হাজার পায়রার বাস। তাহাদের খাওয়াইবার সময় তখন মটর ছড়াইয়া দেওয়া হয় তখন তাহার। উড়িলে খুব ঢাকা পড়ে, মনে হয় বেন পর-কালের একটুক্কো মেঘ আকাশে উড়িয়া বাইতেছে, তাহার। ছাড়া মাটিতে পড়িতেছে। দৈনিক ১ মণ মটর নির্বার ব্যবস্থা ছিল। এইসব পায়রা কিন্তু জাতের পায়রা নহে; ইহাদের অধিকাংশ গোলা-পায়রা। পূর্বে ইহার। জাতের পায়রা ছিল বলিয়া দুই-একজন বুড়র খুঁচে জনিঘাছি; জন্মে বাহিরের গোলা-পায়রার সঙ্গে জোড় বাইয়া ইহার। গোলা-পায়রার পরিণত হইয়াছে। ভারউইন-এর মত গোলা-পায়রা হইতেই বিভিন্ন জাতের পায়রার উৎপত্তি—সেভস্ত সহজেই তাহার। গোলা-পায়রার পরিণত (revert) হইতে পারে। আনন্স ধন ইং ১৯১৮ সালে বর্ধমানে ঘাই, তখন এইসব পায়রাদের মধ্যে কিছু কিছু জাতের পায়রা ছিল।

কলিকাতার ধনী বড়লোক তো বটেই, অনেক ছোটখাটো মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরও পায়রা পোষার সখ ছিল। এমন কি, দুই-চারিজন বস্ত্রাঙ্গীও পায়রা পুসিত। এই পায়রা-পোষার সখ এখন খুব দ্রুত কমিয়া বাইতেছে। যদি একটা তারিখ দিতে হয়, আমরা বলিব যে, প্রথম-মহানুষ্ঠের সময় হইতে এই সখ কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। কমিবার প্রধান কারণ দুইটি—ত্র্যামূল্যের বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক দুর্য, আর হুহু-শোবার বেওয়াজ বৃদ্ধি।

কলিকাতার উনিবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কেবলমাত্র পায়রা-উড়ানোর সখ বড়লোকদের মধ্যে খুব বেশী ছিল। সখ কমিয়া ভালো জাতের পায়রা-পোষা ও তাহাদের বাচ্চা-তোলায় বেশী কম ছিল। রামবাবু বড়লোক; তাহার পায়রার। আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে লাগিল, কতকগুলি আবার

^১ অতীতকাল-কালে যদিক বনপতি ও রামবন্ধের বাঘি রাণীরা পায়রা-উড়ানোর বিশেষ সেবিত পাওয়া যায়।

ভিগবাতি খাইতে লাগিল। এই ভিগবাতি-খাওয়া পাথরার নাম পেরোবান পাথর—ইহাদের বেশিরভাগের পালকেও ২: লাগতে ভাউন; দু-সানোও দুই-একটা থাকিত। পাথর বাড়ির ভাংবাবুও পাথরা আছে; রামবাবুর পাথরা উড়িতে দেখিয়া তিনিও তাঁহার পাথরা উড়াইয়া দিলেন। তাহার পাথরা বেশি ভিগবাতি খাইতে পারে ও কতকগুলি আকাশে উড়িতে পারে দেখা যাউক। তাহার পাথরা বেশিকণ উড়িতে পারিলে ও বেশি বার ভিগবাতি খাইবে, তাহারই ভব হইবে। বেশিরভাগ আশোবে পাথরার লড়াই হইত। অনেকসময় কিন্তু বাজি রাখিয়া এই পাথরা-উড়ানো হইত। অত্যন্ত দুই-চারিজন বড়লোক মধ্য হইতেন। সময়ে সময়ে এই লইয়া বাব-বিশবাব, কগড়া-বাঁটি হইত।

বাজির আবার যুদ্ধ যুদ্ধ নিয়ম তৈয়ারি হইত। যেমন রামবাবুর ১০০ পাথরা—উড়িতে উড়িতে ইহাদের মধ্যে ২০টি দেখিয়া পড়িল। ইহার মধ্যে বাজা পাথরা কয়টি—তাহাদের বাদ নিতে হইবে। ভাংবাবুর ১০০টি পাথরা উড়িতে লাগিল—কোনটিই দেখিয়া পড়িল না। ভাংবাবুর ভব হইল। আবার রামবাবুর পাথরাদের মধ্যে ৪টি পাথরা বারে বারে ভিগবাতি খাইতে লাগিল—তাহার স্ত্রী রামবাবু বেশি নব্বই পাইলেন। ভাংবাবুর ৭টি পাথরা দুই-একবার ভিগবাতি খাইল—নব্বই কণ পাইলেন; ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখনও দুই-চারিজন বড়লোক আছেন তাহারা এই পাথরা-উড়ানো লড়াইয়ের নিয়মকানুন ভালোভাবে বলিতে পারেন। সব ছাড়াগাও একই নিয়মে বাজি ধরা হইত না।

রাখিকান্দা দত্ত একজন সেকালের বিখ্যাত ক্রন্দ-গাহিয়ে। তাঁহার গলার ঘর, বাহাকে ‘মর্যাদা গলা’ বলে, তাহারই ছিল—গান গাহিলে, দিকি মাইল দূর হইতে শুনিতে পাওয়া হইত। কথা স্পষ্ট—দূরের কথারও বেশ, ঘরও মধুর। তাহারা সঙ্গীতজ্ঞ তাহাদের মূখে শুনিয়াছি যে, এইজন ক্রন্দ-গাহিয়ে বাংলায় খুব কম ছিল। তিনি নিজের বাড়িতে গাহিতেন, কোনও মন্থনিলে গাহিতেন না; অথরোধ করিলে বলিতেন—আমার গাওয়া নিজের সখের স্ত্রী; অপরকে শুনিয়া নাহি তিনিবার বা বাহবা পাইবার স্ত্রী নহে। একজন তাঁহার নাম বড় একটা লোকে জানে না। রাখিকাবু বড় সৌমিন লোক ছিলেন—তখন কলিকাতায় থাটা পাইখানা—বড় দুর্গা; একজন পাইখানায় বাইবার পূর্বে চাকরকে পাইখানায় আতরের কোয়া দেওয়াই শুদ্ধি দিতে বলিতেন।

একবার সীমা দত্তর সঙ্গে বাজি রাখিয়া পাথরার লড়াই

হয়। রাখিকাবু হারিয়া গেলে, সীমাখাবু বাড়ির ছেলেরা খুব ‘হুয়া! হুয়া!’ বলিয়া চাদের উপর হইতে চাঁৎকার করিতে ও শব্দ বাধাইতে থাকে। রাখিকাবু শুনিতে পারেন। তাহার পর পুনরায় বাজি রাখিয়া পাথরার লড়াই হয়—এবারে রাখিকাবু জয়লাভ করিয়া ঢাক-ঢোল রামনিয়া বাজাইতে থাকেন। ইহাতে সীমাখাবু নিজেকে খুব অপমানিত মনে করেন ও রাখিকাবুর সহিত কথাবার্তা ও নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া সেন—দুটিও তাহারা একই বংশের সন্তান। কয়েকবৎসর এইভাবে চলিবার পর পুনরায় সন্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন পাথরা-উড়ানোর সখ উত্তমস্বরেরই কথিয়া দিয়াছে—খুঁড়ির লড়াই হইত।

পানিহাটীর নরেন দত্তর খুব পাথরার সখ—বিশেষ করিয়া লেখা পাথরার সখ ছিল। তাঁহার লেখা পাথরার তোড়া নাকি কেদেগে মিলে না। তাহার সোনারুই ও সোনারুই বলিয়া একতোড়া কানুনি-বহের লেখা পাথরা ছিল। শুইরানের মধ্যে এই পাথরার কথা নবাব ওয়াফি আলি শাহকে বলিলে, নবাব এই পাথরা সংগ্রহের তত্ত্ব ব্যত ইয়া পড়েন; হাজারটাকা তোড়া দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। নরেনবাবু পাথরা বেচিবেন না, নবাবশাহেবও ছাড়িবেন না। পরে নবাবের ম্যানেজার নবাব আমির আলি ঃ শাহেব একদিন নরেনবাবুর কাছে এই পাথরা দেখিতে আসিলেন; বলিলেন—আপনি যখন পাথরা দিবেন না, তখন একলপ্যাহের স্ত্রী দিন, নবাব-বাহাদুরকে দেখাইয়া কেন্দ্র দিব ও ইহাদের বাজা হইলে লইয়া বাইব। নবাব-বাহাদুর এই পাথরা-তোড়া দেখিয়া খুব বাহবা সেন ও ইহাদের শারে কলার খুঁড় পরাইয়া সেন। সোনারুই ও সোনারুই মারা গাইলে, তাহাদের গাফ করিয়া রাখা হইয়াছিল। আমরা এই গাফ-করা পাথরা দেখিয়াছি। এত বড় ও এত ডালা লেখা পাথরা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। পাথরার বিশেষজ্ঞগণও ইহাদের প্রশংসা করিতেন।

তাঁহার পাথরার বাজা কলিকাতার বহু সৌমিন লোক লইয়া হইত। যে-সব বাজা বড় উড়িতে নিবিয়াছে, তাহারা আবার উড়িয়া ফিরাইয়া গাইত। পাথরা দেখিয়া নরেনবাবু তিনিতে পারিতেন, তাহাকে এই পাথরা দিয়াছেন; তাহাকে জিটি দিয়া পাথরা লইয়া হইতে বলিতেন। কিন্তু তিন তিন বার পাথরা কেন্দ্র আসিলে জিটি দিতেন—পাথরা কেন্দ্র দিতেন না; বলিতেন—ইহারা আমার আশ্রয় ত্যাগ করিতে চাহে না, স্ত্রী বাজা লইয়া যাও। পাথরার তাহার হাত হইতে ডিঙানো ছোলা পাইয়া হইত।

তিনি নিজে ষাড়াইয়া লম্বাল-বিকাল পাখরা বাঁধাইতেন। কোন্ গুহুতে মটর, কোন্ গুহুতে ডিম্বা ছোঁগা বা মটর দিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করিতেন। পাখরাদের তন্ত্র তিনি মণ মণ ছোঁলা, মটর, তুটো, বিভিন্ন প্রকারের কড়াই বা ডাল কিনিতেন। পাখরাদের খাবার ভালার কোনো কোনো দিন অন্নমাত্রায় আমা-ধরা ইঁটের চঁড়া বা সেঁচালের বালিকাম-ভাঙা দিতেন। পাখরার ষাওয়া সবচেয়ে তাহার এক নোট-বই ছিল। এই নোট-বই ছাপাইবার উদ্দেশ্যে তাহার বোহির লইয়া গিয়া হারাইয়া ফেলেন। ইহাতে তিনি মর্ষাহত হইয়া বলেন যে, আমার সস্ত্রা জীবনের অভিজ্ঞতা চলিয়া গেল। পাখরার চিকিৎসা লক্ষ্যেও নানা টোটকা ঔষধ খানিতেন।

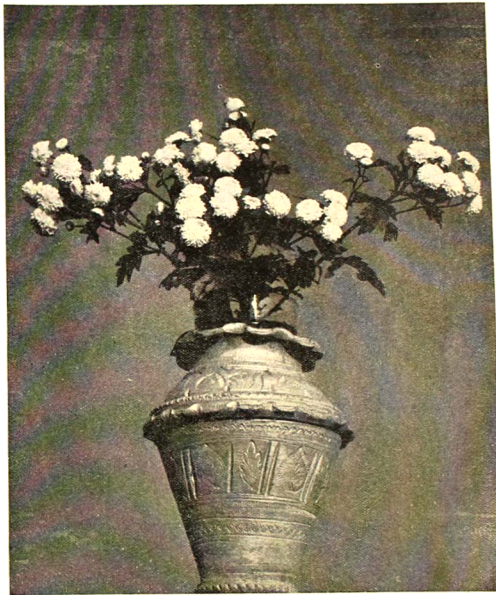
সম্যাপী ঘোষ বলিয়া এক নোকা-মারি ছিল। এককোড়া গলা-ফুলা পাখরা তাহার ছিল—এই গলা-ফুলা পাখরার গলা এক বেলী ফুলা যে, সে-পাখরা বেঁট হইয়া ছোঁলা, মটর ইত্যাদি খাইতে পারিত না। ‘বক্ বক্ বক্ বক্ বক্ বক্’ করিয়া তাহারো বখন গলা ফুলাইত, তখন বনে হইত বনে একটি ছোট ছোটল তাহারের গলার ভিতর ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সম্যাপী মারা হাইলে, এই পাখরা কাহারো চুপি করিয়া লইয়া যাই।

খাশা পালের গোটা ফুঁড়ি মুখী পাখরা ছিল। খুব ভালো জাতের ও আকারের মুখী। কেহ চাহিলে অমনি দিত—কিন্তু বাহ্যকে দিত তাহার পাখরার সখ কি রকম, আগে পরীক্ষা করিয়া লইত। কোনো বড়লোক তাহাকে এককোড়া মুখীর মূল্য ১০ টাকা দিতে চাহিলে খাশা বলিয়াছিল যে—আমার সখের পাখরা টাকার হুমীরের মুখে ছাড়িয়া দিতে পারি না, হুমীর পাখরা বাইয়া ফেলিবে। ইহাতে সেই বড়লোক খাশাকে এক চড় মারেন। খাশা পাল ১০ টাকা মানিয়া চাহুতি করিত। (পার্বক বহুধাও করিলে, এই বড়লোকের নাম বলিতে পারি।)

বিভিন্ন জাতের পাখরা-পোষার সখ (পাখরা-উড়ানো নহে) উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে থাকিলেও, নবাব ওয়াজির আলি সাহেব কলিকাতায় আসা হইতে তুঁড়ি শাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নবাবের মৃত্যুর পর বহু ভালো জাতের পাখরা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।





চন্দ্রমল্লিকা

[ফটো : জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়]



কপদাগর

দুর্বার্ষ যোদ্ধা

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

খরসোয়ানের রাত্রি যখন একেবারে নীরব হয়ে যায়, আর বিহুতির এই চনৎকার চেহারা বাড়তি মাকরাতের চাঁদের আলো গায়ে ছড়িয়ে ধবধব করে, তখন ইস্পাহাতের আলনারার একটি দেৱাজ টেনে ব্যান্ডের জন্য বইগুলি এক এক করে খুলে ব্যালনের অন্ধের সংখ্যাগুলির দিকে তাকায় আর মনে মনে হিসাব করে বিহুতি। এবং সেৱাজ বন্ধ করেই মুহূর্তের ডাক দেয়—নীরা!

এতক্ষণ ধরে এই ঘরের ভিতরেই একটা সোফার উপর বসে ছিল নীরাঞ্জিতা। কিন্তু জানে না বিহুতি, কখন ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে নীরাঞ্জিতা, এবং এখন কোন্ ঘরে কোথায় বসে আছে আর কি করছে, তাও কল্পনা করতে পারে না। ডাক দেবার পর সাড়া না শুনতে পেয়ে আবার ডাক দেয় বিহুতি—নীরা, কোথায় গেলে তুমি?

কি আশ্চর্য, নীরাঞ্জিতা কি ভুলেই গেল যে, খরসোয়ানের এই রাতটা আজ বিহুতি ও নীরাঞ্জিতার জীবনে সত্যিকারের প্রথম শুভরাত্রি হবার সৌরবে চিহ্নিত হয়ে যাবে? খাওয়ার পাল্লা সারা হবার পরে, এই তো ঘণ্টা দুই আগে, বিহুতি একেবারে স্পষ্টভাবে এবং চোখের চাহনিতে কেন কুষ্ঠা না রেখে নীরাঞ্জিতার কানের কাছে ফিসফিস করে হেসেছে: আর বেশি দেরি হবে না, নীরা, কিন্তু তুমি ভুল করে ঘুমিয়ে পড়ো না। আমি শুধু ব্যান্ডের জমার বইগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই...

না, ঘুমিয়ে পড়েনি নীরাঞ্জিতা। জাগা চোখ-জুটোকে অপলক করে নিয়ে এই ঘরের ভিতরেই সোফার উপর চুপ করে বসেছিল; এবং মাঝে মাঝে

বিহুতির মুগের দিকে তাকিয়ে কে-জানে-কি লেখবারও চেষ্টা করেছিল। তার পর সোফা থেকে উঠে আর নেট ও পাউডারে সুরভিত করা সেই সুন্দর চেহারা একটা ক্রাস্ট ও বিগিড শোভাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পিছনের বারান্দারি রেলিং-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। খরসোয়ানের আকাশের চাঁদটাকে দেখতে নিশ্চয় খুবই অকৃত নবন হয়েছে নীরাঞ্জিতার; তা না হলে এই দুই ঘণ্টা ধরে রেলিং-এর কাছে একই জায়গায় একটায় দাঁড়িয়ে থাকে কেন, আর চোখ ভুলে শুধু আকাশের দিকেই বা তাকিয়ে থাকে কেন নীরাঞ্জিতা?

নীরাঞ্জিতার চোখের দৃষ্টিই বা এত কঠোর রকমের শান্ত কেন? ঠোঁট দুটো ঠাণ্ডা কেন? আঙুলের নতুন আংটিটা এত জিল মনে হয় কেন? হাতের আঙুলগুলি কি হিনের ছোঁয়া লেগে সিটিয়ে গিয়েছে?

কমাল দিয়ে গলার দান মুছতে গিয়ে নীরাঞ্জিতার হাতটাও কেঁপেছে। আর, রাগ করে কপালটাকে টিপে ধরেছে নীরাঞ্জিতা। ছিঃ, এত ভয় কিসের? বৃষ্টি নিছিনিবিছ এরকম টিপ টিপ করে কেন?

—নীরা! তুমি এখানে এসে কি করছো?

বিহুতির ডাক শুনে চমকে ওঠে নীরাঞ্জিতা। বিহুতির মূহু গলার স্বরে যেন একটা বিরক্ত বিশ্বাসের বাতাস ফিসফিস করে উঠেছে। ঠিকই তো, বিহুতির একটু বিরক্ত হবারই কথা। বিহুতিকে হঠাৎ একলা করে দিয়ে ঘর ছেড়ে এখানে চলে এসে নিজেও কেন একলা করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীরাঞ্জিতা! নীরাঞ্জিতা কি জানে না, এই কিছুক্ষণ আগে বিহুতি চোখের চাহনিটা স্বত কুষ্ঠাহীন হয়ে, কি বিপুল

আশায় উৎসর্গ হয়ে নীরাজিতাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেছিল ?

খরসোয়ানের এই নীরব রাতের আকাশের চাঁদ যে নীরাজিতার জীবনের এক পরম অঙ্গীকারের সন্কেত হয়ে স্রবণ করিয়ে দিচ্ছে—সময় হয়েছে, নীরাজিতা। আর অপেক্ষা করতে হবে না। যে বিহুতির চরিত্রের গৌরবকাহিনী শুনে নীরাজিতার বাইশ বছর বয়সের শরীরটা শ্রদ্ধার আবেশে বিচলিত হয়ে মানার কাছে একেবারে বেহায়া হয়ে বলেই নিতে পেরেছিল যে, বিহুতিবাবু সঙ্গে যদি হয়, তবে হয়ে যাক; তা না হলে এখন আর আনার বিয়ের কথা নিয়ে আপনাদের কোন চেষ্টা আর কোন চিন্তা করবার দরকার নেই।

খরসোয়ান মাল্লানিভের সেই বিহুতি আজ নীরাজিতার শরীরের সেই শ্রদ্ধার আবেশ বরণ করবার জন্য নীরাজিতার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু...কি-যেন বলতে চায় নীরাজিতা। স্মৃতিত মুহুর্তটাকে হঠাৎ একটু কঁকড়ে দিয়ে আর আঁচলটাকে ছুঁপাক দিয়ে হাতে জড়িয়ে রেলিং-এর কাছ থেকে এক-পা পিছনে সরে যায়।

বিহুতি হাসে। খরসোয়ানের এই ভয়ানক শাস্ত্র রাতের চাঁদটারই মত নীরব ও ধবধবে সাদা হাসি। নীরাজিতার কাছে এগিয়ে আসে বিহুতি, আর নীরাজিতাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে।

—আঃ, নীরাজিতার বুকের একটা অদৃষ্ট রকবের আতঙ্কের নিবাস যেন হুঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু বিহুতির বুকের যত অশ্রুভবের পেশী আর স্নায়ুগুলি যেন নীরাজিতার সেই তীক্ষ্ণ শরীরের আর্দ্রনাদ শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। নীরাজিতার কানের কাছে কিসকিস করে বিহুতি। —আমার নীরা যে এইরকম ভয় পাবে, শিউরে উঠবে আর হেজিটেট করবে, এ আমি জানতাম...আমি জানতাম...আমি...

বলতে বলতে বিহুতির মুখের সেই শাস্ত্র হাসি যেন উগ্র আঙনের আভার মত জ্বলতে থাকে। বিহুতির প্রাণ যেন ঠিক এইরকম একটি লজ্জিত,

স্মৃতি, কল্পিত, আতঙ্কিত ও ঠাণ্ডা কোমলতার ছোয়া আশা করেছিল। এইরকম একটি অনিচ্ছা-ভীর্ণ শরীর; এক-পা পিছনে সরে যাওয়া একটি চকিত বিশ্বয়; শরীরের উপর এইরকম একটি চরিত্রময় আবরণের অনাহত শাসন বাচিয়ে রেখেছে যে নারী, সেই নারীর ভালবাসাকেই যে ভালবাসা বলে মনে করে বিহুতি। খুশি হয়েছে বিহুতি; বিহুতির করুণা আজ নীরাজিতার শুদ্ধ শরীরের সব অশ্রুভব আর লজ্জা আপন করে নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বিহুতির হাত ছুটো ধস্ত হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু নীরাজিতা যেন এরই মধ্যে হাঁপাতে শুরু করে গিয়েছে। বিহুতির দু'হাতের এই বন্ধনের বেড়া থেকে একটু আলগা হবার জন্য মাঝে মাঝে ছটকট করে উঠছে নীরাজিতা।

বিহুতি বলে—কি, নীরা ?

নীরাজিতা—ছাড়, একটা কথা বলছি, শোন।

বিহুতি—বল।

নীরাজিতা—শরীরটা ভাল বোধ করছি না।

ভাল লাগছে না।

বিহুতি হাসে। —ভয় করছে, নীরা ?

নীরাজিতা—হ্যাঁ।

আরও দুঃস্থ আগ্রহে নীরাজিতাকে বুকের উপর চেপে ধরে বিহুতি। ভয় করছে নীরাজিতার ? কী সুন্দর ভয়। বিহুতির চোখ ছুটো যেন এইরকম একটি ভয় ছিন্নভিন্ন করবার সৌভাগ্যে মত্ত হয়ে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। নীরাজিতার টোট-ছুটো ঠাণ্ডা। কী চমৎকার শীতলতা! বিহুতির নিম্নাসের পিপাসা যেন ঠিক এইরকম একটি শীতলতাকে লুকুৎ ধংশনে বিস্কৃত করবার জন্য উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

—এস, নীরা! — নীরাজিতার হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে চরম আল্লানের ভাষা ধ্বনিত করতে গিয়ে বিহুতির গলার স্বর যেন আরও মুগ্ধ হয়ে কেঁপে ওঠে।

আর, নীরাক্ষিতার স্মৃতিতে চেহারাটা দ্বিধাশীন আত্মসমর্পণের মত বিহুতির সেই আত্মাননের স্বরে যেন বন্দী হয়ে বিহুতির পাশে পাশে ঠেটে ঘরের ভিতরে চলে যায়।

এবং তারপর, খরসোয়ানের রাতের চাঁদ যখন ঘরের পাহাড়ের মাথার কাছাকাছি এসে খুলেলা বাতাসের আবরণে ময়লা হয়ে যায়, এবং বিহুতির এই চমৎকার বাড়ির চেহারাটাও ঠিক আর ব্যবধ করে না, তখন বাধকদের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আর স্নানসারা শরীরটাকে নতুন করে সাজাতে গিয়ে কিছুক্ষণের মত শুক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নীরাক্ষিতা। ভেজা শাড়িটা যেন একটা রক্তাক্ত শ্মতির জ্বালাময় লজ্জার কুণ্ডলীর মত গুটিয়ে রয়েছে। অলঙ্কারের মেয়ের আতঙ্কিত শরীরটার প্রত্যেক লজ্জা আর বেগনার্ভ চমকগুলিকে পরমগোচ্য প্রসাদের মত আনন্দসাৎ করতে গিয়ে কি প্রথম আনন্দে জ্বলজ্বল করেছে অলঙ্কারের মেয়ের স্বামী ঐ বিহুতির চোখ দুটো! কিন্তু অসছে কেন নীরাক্ষিতার স্নানসারা ঠাণ্ডা শরীরটা? কি আশ্চর্য, শরীরটাতে এখনও ময়লার হোয়া লেগে আছে বলে মনে হয়।

খরসোয়ানের জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে আর মিশিয়ে দিয়ে নীরাক্ষিতার প্রাণটাও হেসে উঠতে পেরেছে। পুরো তিনটে মাস পার হয়ে গেল, তবু রাজপোখরার অলঙ্কারের কাছে ফিরে গিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসবার জন্য নীরাক্ষিতার প্রাণে যেন কোন দাবিই নেই। শীতলবাবুর কাছ থেকে অনেক চিঠি এসেছে : কবে আসতে চাও নীরাক্ষিতা? দিন ঠিক করে শুধু একটা চিঠি দিও; তোমাকে আনবার জন্য সেদিনই গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

কিন্তু অলঙ্কারের এরকম এক-একটা স্নেহাত্মক আত্মাননের ব্যাকুলতার স্বর শুনেও বিচলিত হয়না নীরাক্ষিতার মন। চিঠির উত্তরে শুধু চিঠি দেয়

নীরাক্ষিতা : বাব, কিন্তু দেখি কবে যেতে পারি। ওর যে এখন খুব কাজের চাপ; একটুও সময় নেই।

বউদির চিঠি এসেছে : বিহুতিবাবুর না হয় সময় নেই, কিন্তু তোমার সময়ের অভাব কোথায়? বিহুতিবাবু না হয় কাজের চাপ কমে গেলে আসবেন। কিন্তু তোমার একবার আসতে অসুবিধে কিসের?

বউদির চিঠির উত্তরে যে কথা লিখে জানিয়েছে এবং আজও চিঠিতে লিখেছে নীরাক্ষিতা, সে-কথা বউদিকে আশ্চর্য করে দিয়েছে। এবং বউদিও মন্তব্য করেছেন, এরকমটি দেখিনি। দুটি দিনের জন্য ছাড়াছাড়ি সহ্য করতে পারে না, এ যে একেবারে কপোত-কপোতীর প্রেম!

নীরাক্ষিতার চিঠির বক্তব্য পাঠ করে অলঙ্কারের মানুষগুলি ঠিক হুঃবিত হতে পারেনি; বরং মনে মনে একটু খুশিই হয়েছে। নীরাক্ষিতা সত্যিই রাজপোখরাতে আসতে চায়, কিন্তু একলাটি আসতে চায় না। যেদিন আসবে সেদিন হুঃজনে একসঙ্গেই আসবে। বিহুতির কাছছাড়া হয়ে দুটো দিনের জন্য অলঙ্কারের জীবনও সহ্য করতে কষ্ট হবে নীরাক্ষিতার; বেশ তো, আরও কিছুদিন দেরি করুক, তারপর হুঃজনে যেন একসঙ্গেই আসে।

অলঙ্কারের মানুষেরাও এই তিন মাসের মধ্যে কয়েকবার এসে নীরাক্ষিতার খরসোয়ান-জীবনের হাসি আনন্দ আর তৃপ্তির ছবি দেখে গিয়েছে। সারাদিন বইপড়া আর ফুলের আদরের যত কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকে নীরাক্ষিতা। টবের ফুলের গাছগুলিকে দিনে তিন-চার বার করে যত্ন করা; সকাল সন্ধ্যা হুঃবেলা ফুল ফুলে মনের মত করে তোড়া বাঁধা, আর সেগুলি ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখা; এই কাজ।

সন্ধ্যাবেলা যখন ঘরে কেরে বিহুতি, তখন বিহুতিও দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়, এবং বিহুতির চোখের চাহনিতে স্বন্দর একটি তৃপ্ত অহঃকারের হাসিও জ্বলজ্বল করে। নীরাক্ষিতা যেন বিহুতিরই

জীবনের সাক্ষ্য-অভ্যর্থনা হয়ে আর শুল্কর সাথে স্নেহে অপেক্ষায় রয়েছে। বিহুতি এসে চেয়ারের উপর বসে পড়তেই নীরাজিতা নিজের হাতে বেবি-টেবিলটাকে টেনে নিয়ে এসে বিহুতির সামনে রাখে; টাটকা তোলা ফুলের তোড়া দিয়ে সাজানো একটা ফুলদানি টেবিলের উপর রেখে দিয়েই চলে যায় নীরাজিতা। তার পর চাঁ-এর পট নিজের হাতে তুলে নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখে। তারপরেই বিহুতির পাশের চেয়ারে বসে পড়ে নীরাজিতা।

বিহুতি—রাজপোখরা থেকে কোন চিঠি এসেছে ?

নীরাজিতা—হ্যাঁ।

বিহুতি—কি লিখেছে ?

নীরাজিতা—ঐ একই কথা।

বিহুতি হাসে।—বেশ তো, তুমি দু'দিনের জন্য একবার ঘুরে এসো না কেন, নীরা ?

নীরাজিতা—না, যদি যাই তবে দু'জনে একসঙ্গেই যাব।

বিহুতি—বেশ তো, তবে চল, কালই চল।

চমকে ওঠে নীরাজিতা।—কাল! কেন ? তোনার কি সময় আছে ? ছুটি নিয়েছ নাকি ?

বিহুতি—ইচ্ছে করলেই ছুটি পেতে পারি।

নীরাজিতার চোখের চাহনি হঠাৎ এলোমেলো হয়ে যায়; যেন নীরাজিতার কল্পনার একটা ছবি হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। বিহুতি যদি ছুটি পায়, তবে বিহুতির সঙ্গেই রাজপোখরাতে যাবে নীরাজিতা। এটা তো নীরাজিতারই ইচ্ছার কথা। এতদিন এই কথাই বলছে আর চিঠিতে লিখেছে নীরাজিতা। কিন্তু সেই ইচ্ছার পথ মুক্ত হয়ে যেতেই নীরাজিতার উৎসাহ যেন চমকে উঠে দু'পা পিছনে সরে যেতে চাইছে। রাজপোখরাতে যেতে চায়না নীরাজিতা।

বিহুতি—কেন নীরা ? হঠাৎ আনমনা হয়ে গেলে কেন ?

নীরাজিতা যেন আনমনা ভাবনার কোঁকে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে চোঁচিয়ে ওঠে।—না, এখন গিয়ে কোন লাভ নেই।

বিহুতি—লাভ নেই ! তার মানে ?

হেসে ওঠে নীরাজিতা।—তার মানে, এখন রাজপোখরার বাগানে পাক। আমার গন্ধ ধনধম করে না। আম পাকতে এখনও পেরি আছে।

বিহুতি—তা হলে বল, আর মাসখানেক পরে রাজপোখরাতে যেতে চাও ?

নীরাজিতা—আঁা ? ...তা যেতে হবে বলে আশা করতে দোষ কি ?

বিহুতি—কি-রকম যেন এলোমেলো কথা বলছো নীরা ?

চমকে ওঠে নীরাজিতা।—এলোমেলো কথা ?

বিহুতি—হ্যাঁ ; মনে হচ্ছে, যেন কারও ওপর রাগ করে কথা বলছো।

নীরাজিতা ঝংকার দিয়ে হেসে ওঠে।—সত্যি কথা। রাগ হচ্ছে নিজেরই ওপর।

বিহুতি—কেন নীরা ?

নীরাজিতা—বাবা আর বউদিকে এই সামান্য একটা কথা লিখতে পারলাম না যে, হ্যাঁ, অমুক দিন রাজপোখরাতে যাব। তা ছাড়া.....বাড়ির চিঠিগুলোও এমন একঘেয়ে কথায় ভরা যে...

বিহুতি—কি ?

নীরাজিতা—রাজপোখরাতে যাবার জন্য মনে কোন উৎসাহ জাগে না।

বিহুতি হাসে।—এর আসল রহস্য কি, দেউতা আমি ব্যত পেরছি।

নীরাজিতা—কি ?

বিহুতি—খরসোয়ানের এই বাড়ির জীবনকে তুমি বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছো।

নীরাজিতা মাথা হেঁট করে লাজুক হাসি লুকাতে চেষ্টা করে।—থাক্ ওসব কথা; আর এক কাপ চা খাও।

এর পর খরসোয়ানের সন্ধ্যাটা যেন দু'ভাগ হয়ে

যায়। ভিতরের একটা ঘরের ভিতরে ঢুক ইম্পাতের আলমারি খোলে বিহুতি। অনেক কাগজপত্রের ফাটল আর ব্যাঙ্কের অনেকগুলি জমার বই বের ক'রে নিয়ে অস্তুত একটা ঘণ্টা ধরে একটা হিসাবের আনন্দে তন্ময় হয়ে থাকে। আর, নীরাজিতা আস্তে আস্তে বারান্দার উপর পায়েচাঠি করে বেড়ায়। নাকে মাখে ধমকে ঠাডায় আর রেলিং-এর উপর ছুঁহাতের ভর রেখে যেন আকাশের তারা গুণে গুণে একটা অস্তুত হিসাবের কাজে প্রাণটাকে ব্যস্ত করে রাখে।

আর, বৃকের ভিতরের একটা ছঃসহ রাগের আলার সঙ্গে যেন সনস্ত নিশ্বাসের জোর দিয়ে লড়াই করতে থাকে নীরাজিতা। রাগ হয় নিজের উপর; নিখো নয় নীরাজিতার এই ধারণা। আর, কে জানে কেন, রাগ হয় অলঙ্কারের সেই ফটকটার উপর। রাগ হয় পৃথিবীর একটা বাস্তব সত্যের ভয়ানক নিষ্ঠুরতার উপর। নিশীথ রায় নামে সেই মানুষটার চরিত্রে শোধ থাকে কেন? মানুষটাই নিষ্ঠুর। ওকে ক্ষমা করা যায় না।

ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায় নীরাজিতা। এবং এই লজ্জার মধ্যে যেন ভয়ানক গোপন অপমানের দংশন আছে। সে লোকটার উপর আবার রাগ হয় কেন? নীরাজিতার কাছে এসে ক্ষমা চাইবার ক্ষমতা কোন চেষ্টা করলো না; বলতে গেলে একটা মুহূর্তও অপেক্ষা করলো না; একেবারে নির্লজ্জ লোভের ডাকাতির মত যাকে সামনে পেলে তাকেই, প্রতিভার মত মেয়েকে বিয়ে ক'রে ঘরে চলে গেল। প্রতিভা কি ওর ঘরের সুখের লোভটাকে এতদিনে হতাশ করে দিয়ে, সেই ভক্তলোকের কাছে... কি-যেন সেই ভক্তলোকের নাম, বিলেত থেকে ফির এসে কলকাতায় এখন একটা হোটেল করেছে যে ভক্তলোক? প্রতিভার কীতির কথা যার কাছে থেকে শুনতে পোয়েছিল নিশীথ?

চলে গেলেই তো পারে প্রতিভা। কালিকাপুর মাইনস-এর ম্যানেজার নিশীথ রায়ের বাংলা-বাড়িতে

মিষ্টা নায়ার খেলা জমাবার চেষ্টা না ক'রে তার চরিত্রের সেই প্রাক্তন বান্ধবের কাছে চলে যেতে লজ্জা কেন? ঠিকানা কি জানা নেই? নিশীথ রায় নামে মানুষটাকে শান্তিতে থাকতে দিক না কেন প্রতিভা।

কী অস্তুত চিন্তা! চিন্তার রকম দেখে নিজের এই মনটাকেই ঘেঁরা করতে ইচ্ছে করে। নিশীথ রায় নামে সেই ভক্তলোকের জীবনের ভালমন্দে কণা ভেবে খরসোয়ানের এট মাফা-জীবনের আনন্দ নষ্ট করে কেন নীরাজিতা?

যার কথা ভাবা উচিত, যার জীবনের সঙ্গিনী হয়ে খরসোয়ানের এই তিনটি মাসের দিন ও রাতের সঙ্গে হেসে খেলে প্রাণটাকে নিশিয়ে দিয়ে সুখী হবার চেষ্টা করেছে নীরাজিতা, তার হিসাবের কাজ শেষ হতে মাঝে মাঝে রাত হয়ে যায়। তারপর খাওয়া; এবং তার পর...

অসহ্য! নীরাজিতার জীবনট। যেন বাথরুমের একটা নিরুরের সামনে ঠাড়িয়ে, ভেজা তোয়ালে দিয়ে শরীরের সব ঘুণা মুছে মুছেও শুদ্ধ হতে পারে না। মনে হয়, বৃকের ভিতরে কোণে কোণে নয়লা লেগে আছে।

বাথরুমের মিররটাই শুধু জানে, এক এক দিন কেঁদে ফেলেছে নীরাজিতা। এবং নীরাজিতাও ওর চোখের জল দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। কেন? কিসের যত্নগা? শুদ্ধচরিত্র স্বামীর চোঁয়া বরণ ক'রে কোন নারীর গা বিনবিন করে উঠতে পারে না; তবে কেন অলঙ্কারের নেয়ের এই শান্তি?

দেখতে পাওয়া যায়: একটু দূরে একটা পেড়া বস্তির ছাই আর কয়লা ছড়িয়ে পড়ে আছে। খরসোয়ানে এসে এই চমৎকার বাড়ির জীবনের সাতটা দিন পার হতে না হতে এমনই এক সন্ধ্যায় ঐ বস্তিটাকে আশ্রয় লেগেছিল। বস্তির বৃকটা যেন হঠাৎ আতঙ্কে ছিঁড়ে গিয়ে ভয়ানক চিংকার ক'রে উঠেছিল। বস্তির লোকেরা ইাড়ি ক্যানেক্সার আর বালতি হাতে ছুটে এসেছিল।

জল চাই ; আশুন নেভাবার জন্ত এই বাড়ির বাগানের ঐ প্রকাণ্ড ইদারা থেকে জল নেবার জন্ত ফটকের কাছে এসে ভিড় করে চেঁচিয়ে উঠেছিল বস্তির লোকেরা—পানি চাহিয়ে, সাহেব। ঘর অল যাতা শ্রাম, সাহেব। মেহেরবানি কিজিয়ে, সাহেব।

কিন্তু কী চমৎকার নির্বিকার বিহুতির সেই চোখের দৃষ্টি। বস্তির আর্তনার স্তনে একটুও বিচলিত হয়নি বিহুতি।—হঠাৎ যাও, গোলমাল মত্ করে।— শুধু একটি কথা বলে দিয়ে চুপ করে গিয়েছিল বিহুতি।

বিহুতির সেই নির্বিকার চোখের দিকে তাকিয়ে নীরাজিতাও অনেকক্ষণ স্থব্ধ হয়ে পাড়িয়েছিল। তার পর কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্নও করেছিল—ওদের জল নিতে দিলে কি ক্ষতি হতো ?

বিহুতি গম্ভীর হয়ে বলেছিল—কি লাভ হতো ?

নীরাজিতা—অস্তুত ছ'চারটে ঘরের আশুন নেভাতে পারা যেত।

বিহুতি—বুঝলাম, কিন্তু তাতে আনার কি লাভ ?

নীরাজিতার কান ছুটো একটা কঠোর বিশ্বাসের আঘাতে যেন কিছুক্ষণের জন্ত বধির হয়ে গিয়েছিল।

নীরাজিতার এই বধিরতা যখন ভেঙেছিল তখন স্তনভেদে পেয়েছিল, স্তনস্তন করে যেন আপন মনের একটা স্বপ্নের সুরে কথা বলছে বিহুতি—আমার অনেকদিনের ইচ্ছা এতদিনে সফল হলো।

নীরাজিতা—তার মানে ?

বিহুতি—ঐ বস্তুটাকে দেখলেই আমার চোখ-ছুটো বিনশিত করতো।

নীরাজিতা—কারণ ?

বিহুতি—কারণ, ঐ বস্তুতে যারা থাকে তারা... তারা হলো কতকগুলো ছন্দিত মেয়েলোক। ওটা একটা নরকগোছের জায়গা।

উত্তর দেয়নি নীরাজিতা। শুধু বিহুতির সেই শান্ত স্তব্ধ ও পবিত্র চেহারাটার দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়েছিল। এবং, মনে মনে যেন নিভেরই একটা ভুল আর্তনাদের লম্বা সহ্য করেছিল। বিহুতির মত মানুষকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না নীরাজিতা, কিন্তু সেটা বিহুতির দোষ নয়। বিহুতি ভুল করছে, বিহুতির অজ্ঞান হয়েছে, এতটা ভাবতে সাহস করতে পারেনা নীরাজিতা। ভ্রমলোক কারও চরিত্রের কলুষ সহ্য করতে পারে না ; এর জন্ত ভ্রমলোক এইরকম একটা মমতাহীন কাণ্ড করে ফেললো। করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সত্যিই তো মমতাহীন নয়।

আজও খরসোয়ানের এই অন্ধকারময় শান্ত সন্ধ্যায় নীরাজিতার স্মৃতিতে চেহারাটা বাতান্নার নিভতে পাইচারি করে ঘুরে বেড়ায় আর মাঠের বাতাস মাঝে মাঝে হহ করে ছুটে আসে। নীরাজিতার বুকের ভিতরের একটা বোবা বাতাস যেন হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে।—নিশীথ রায়ের বুকটাও কি এইরকম শান্ত কঠোর ও নির্বিকার ?

বিশ্বাস হয় না ; সে মানুষটার বুকটা দুর্বল নিশ্চয়। এইরকম একটা বস্তির কতকগুলি চরিত্রহীন শ্রাণীর আর্তনাদ স্তনে সে লোকটা বোধহয় নিভেই জলের ক্যানেশুয়ার হাতে নিয়ে...

আবার সে ভ্রমলোকের কথা চিন্তা করে কি বুঝতে চাইছে নীরাজিতা ? একটা মমতাময় বুক থাকলেই মানুষ সন্দেহিত হয়ে যায় না।

এই তো, আজ প্রায় এক মাস হলো, কোন্ একটা কোলিয়ারির এক কম্পাসবাবু এসেছিলেন। কম্পাসবাবুর মেয়ের বিয়ে ; কিন্তু বিয়ের সব খরচ যোগাবার মত টাকা নেই। এদিক-ওদিকের ছ'চারটে মাইন্স-এর ভ্রমলোকেরা প্রত্যেকে দশ-বিশ টাকা সাহায্য করেছেন। এখন, আর একশো টাকা হলেই নিশ্চিত হয়ে যান কম্পাসবাবু।

বিহুতি আর নীরাজিতা যখন সকালবেলা ডুই-রকমে বসে গল্প করছিল, তখন এলেন

কম্পাসবাবু। এবং, বেশ আশাবিত একটা ভাব নিয়ে, চোখের পৃষ্টিটাকে অদৃষ্টভাবে ছলছলিয়ে একশো টাকা সাহায্যের আবেদন শোনালেন। সব কথা শোনবার পর বিহুতি শুধু একটি কথা বললো—‘মরি’।

—আজ্ঞে ?— ভ্রলোক আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

বিহুতি শুধু মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয়—না, হবে না।

চলে গেলেন কম্পাসবাবু। এবং নীরাজিতা আবার বোধহয় একটা দুঃসহ বিশ্বাসের বেদনা সহ্য করতে না পেরে প্রস্থ করেছিল—ভ্রলোককে কিছু টাকা দিলেই পারতে।

বিহুতি—তাত লাভ ?

নীরাজিতার গলার স্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে। —একটা অভাবের মানুষকে সাহায্য করা হলো, এই লাভ।

বিহুতি—আমার টাকাগুলো চ্যারিটির ফাণ্ড নয়, নীরাজিতা।

কিছুক্ষণ আনমনার মত অন্তরিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকবার পর কেমন-যেন একটা আকোশের স্বরে চোঁচিয়ে ওঠে নীরাজিতা।—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

বিহুতি—হ্যাঁ।

নীরাজিতা—এই ভ্রলোককে তুমি চেন ?

বিহুতি—খুব চিনি।

নীরাজিতা—ভ্রলোকের মেয়েটিকে চেন ?

বিহুতি—অনেকবার দেখেছি। বেশ হাসিখুশী চেহারা, দেখতেও বেশ মেয়েটা।

নীরাজিতা—মেয়েটি কেমন ?

বিহুতি—তার মানে ?

নীরাজিতা—চরিত্র কেমন ?

বিহুতি—নিমাইবাবু, স্ত্রামবাবু, ঈশ্বরীবাবু সকলেই তো বলেন, খুব ভাল স্বভাবের মেয়ে।

নীরাজিতা—তার মানে, সত্যিকারের ভাল চরিত্রের মেয়ে।

বিহুতি—তাই তো।

নীরাজিতা—তা হলে, অদৃষ্ট একটা সচ্চরিত্রতার রুক্ষ খুশি হয়ে মেয়েটির বিয়েতে তোনার একশো টাকা সাহায্য করা উচিত ছিল না কি ?

বিহুতি—তুমি কম্পাসবাবুর তরফে ওকালতি করছো বলে মনে হচ্ছে।

নীরাজিতা হঠাৎ বলে ফেলে—আমি তোমাকে বুঝতে চাইছি।

বিহুতির চোখে দৃষ্টি একটা ভ্রুষ্টির দ্বারা কেঁপে ওঠে। —আমাকে বুঝতে কি তোমার কিছু ব্যক্তি আছে ?

নীরাজিতা—তাই তো মনে হচ্ছে।

বিহুতি—তবে বুঝতে চেষ্টা কর।

নীরাজিতা—সেই জ্বলেই জিজ্ঞাসা করছি, কম্পাসবাবুকে ওভাবে এক কথায় ‘না’ বলে কিরিয়ে দিলে কেন ?

বিহুতি—লোকটা ভয়ানক চালাক, এবং অসৎ।

নীরাজিতা—কেন ?

বিহুতি—লোকটার ছোট একটা বাড়ি আছে। লোকটা অনারাসে বলতে পারতো যে, আপনি দয়া করে বাড়িটা বন্ধক রেখে আমাকে কিছু টাকা দিন। তা হলে বুঝতাম যে, গরীব হলেও লোকটার নম্রতা আছে। কিন্তু যারা টাকা দান চায়, তারা মায়াব নয়।

নীরাজিতা—কিন্তু যারা টাকা দান করে, তারা তো অমায়াব নয়।

বিহুতি—আমার মতে তারাও অমায়াব।

নীরাজিতার চেহারাটা যেন নিঃশব্দহীন একটা স্তব্ধতার প্রতিমূর্তির মত বিহুতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এবং বিহুতিই হঠাৎ বিভ্রবিত্ত করে ওঠে। —আমি নিশ্চয় রায় নই, নীরা।

নীরাজিতা—তার মানে ?

বিহুতি—মেয়েমায়াবের দুঃখের কথা শুনলেই যে চরিত্রহীনদের মেরুপণ্ড মায়ায় গলে যায়, আর

পকেট খালি করে টাকা। চালে, সে মানুষ আমি নই।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আস্তে আস্তে হাসতে থাকে নীরাজিতা। খরসোয়ানের এই চমৎকার শুদ্ধতার জীবন, যে জীবন তাঁদের আলোতে ধবধব করে, সেই জীবনের ভার যেন অলঙ্কারের মেরের অদৃষ্টের উপর অনড় হয়ে বসে কড়কড় শব্দ করছে। অলঙ্কারের মেরের সাহেব পাঞ্জরগুলি পটপট করে বাজছে। কি ভয়ানক যন্ত্রণা! সেই যন্ত্রণাকে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকির হাসি দিয়ে জ্বলিয়ে দেবার জন্য শেষ পর্যন্ত চেঁচিয়ে হেসে ওঠে নীরাজিতা।

বিভূতিও হাসে। —এখন বুঝতে পেরেছ বোধ হয়।

নীরাঞ্জিতা—হ্যাঁ।

বিভূতি—তবে? তুনি নিছিনিছি তর্ক করলে আমার বেশ খারাপ লাগে, নীরা।

নীরাঞ্জিতা হাসে। —আর তর্ক করবো না।

আর তর্ক করেনি নীরাজিতা। কারণ আর কিছু বোকবারও বোধহয় বাকি নেই। খরসোয়ান ন্যাকানিছের এই বিভূতির জীবনে সোনারূপার কোন বালাই নেই; আছে শুধু একটি ঐর্ষ্য, পরশনানিকের মত যে ঐর্ষ্য সব ঐর্ষ্যের দেয়া—চরিত্র।

নীরাঞ্জিতার এই বিশ্বাসও মাকে মাকে বিস্ত্রিত হয়েছে। দেখেছে নীরাজিতা, বিভূতি নামে এই মানুষটির চরিত্রে যেন শানিত হীরার ধার আছে। তা না হলে, লিস্টারের বাড়িতে কক্টেল আর নাচের নিমন্ত্রণ পেয়েও সারাটা সন্ধ্যা নীরাজিতার কাছেই চুপ করে বসে থাকতে পারলে। কেমন করে বিভূতি?

—না, নীরা; ওসব হুল্লোড়ের মধ্যে যেতে একটুও ইচ্ছে করে না।

—কেন?

—কোথা থেকে তিনটে খিঙ্গি-খিঙ্গি মিস্ এসে

ঠাই নিয়েছে লিস্টারের বাড়িতে? ওসবের ছায়ার কাছেও যেতে নেই।

—কেন?

—গেলে বিপদে পড়তে হবে। খিঙ্গিগুলোর পেটে এক গেলাস ছইখি-সোডা পড়লেই আর রক্ষা নেই। হাত ধরে টানটানি শুরু করে দেবে।

বিভূতির কথাগুলিকে শুদ্ধা করবার জন্য যেন প্রাণপণে চেষ্টা করে নীরাজিতা। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে বিভূতির গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। নীরাজিতার মনটাও যেন ব্যাকুলভাবে কামনা করছে, বিভূতির কথাগুলি শুনতে শুনতে খুশিতে ভরে যাক-না কেন মন।

ঠিক সেই সময় বাইরে বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ায় একটা মৃতি; এবং সেদিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পারে নীরাজিতা, সেই কম্পাসবাবু এসেছেন।

বিভূতি—কি ব্যাপার? আবার কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন?

কম্পাসবাবুর হাতে একটা হাড়ি। হাসছেন কম্পাসবাবু। —আজ মেয়ে-জানাই এসেছে, স্তার। তাই এই সামান্য...

—কি?

—জয়নগরের মোয়া। জানাই নিয়ে এসেছে। সবশুদ্ধ পাঁচ হাড়ি এনেছিল। নিমাইবাবুর বাড়িতে, শ্যামবাবু আর ঈশ্বরীবাবুর বাড়িতে এক এক হাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছি; আর, এটি স্তার আপনার জন্য...

হো-হো করে হেসে ওঠে বিভূতি। —বেশ বেশ; এনেছেন দখন, তখন রেখে যান।

বারান্দার মেঝের উপর হাড়িটাকে নামিয়ে রেখে এবং হাসিমুখে একটা নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন কম্পাসবাবু।

আর, নীরাজিতার চোখ ছুটো যেন দাঁড় দাঁড় করে অলসে থাকে। হাড়িটার দিকে নয়, বিভূতি নামে এই শুদ্ধচরিত্র মানুষের মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে নীরাজিতা।

বিহুতি হাসে। —কম্পাসবাবুকে দেখে তুমি খুব চটে গিয়েছ বলে মনে হচ্ছে।

নীরাঞ্জিতা—হ্যাঁ।

বিহুতি—কেন?

নীরাঞ্জিতা—তোমার মত মানুষকে কত সহজে ঘৃণা করতে পারে একটা সামান্য মানুষ।

বিহুতি—ঘৃণা?

নীরাঞ্জিতা—হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি? নইলে তোমাকে এক হাঁড়ি মোয়া দিয়ে যাবে কেন সেই মানুষ, যার মেয়ের বিয়েতে তুমি একশো টাকাও দিতে পারলে না, আর মানুষটাকে এক কথায় হাঁকিয়ে বিদেয় করে নিলে?

বিহুতি হাসে। —কিন্তু লোকটা আমাকে ঘৃণা করতে এসে যে এক হাঁড়ি মোয়া রেখে যেতে বাধ্য হলো।

নীরাঞ্জিতা—খুব লাভ হলো বোধহয়?

বিহুতি—খুব না হোক, অন্তত পাঁচটা টাকা লাভ হলো।

নীরাঞ্জিতা—তা হ'লে বল তোমার অপমানের কী হলো পাঁচটাকা। যে-কোন মানুষ ইচ্ছে করলেই পাঁচটাকা তোমার হাতে তুলে তোমার গায়ে...

আর বলতে পারেনা নীরাঞ্জিতা। যে কথটা নীরাঞ্জিতার মুখের কাছে চলে এসেছে, ক্রমাল দিয়ে চেপে যেন সেই কথটাকে নীরব করে দেয়।

এবং সেদিনই খরসোয়ানের মাকরাতের নীরবতার মধ্যে বাথরুমের মিররের সামনে দাঁড়িয়ে বার বার থুতু ঝেলে যেন বৃকের ভিতরের একটা ঘৃণার উল্গার শাস্ত করতে চেষ্টা করেছিল নীরাঞ্জিতা।

—নীরা? নীরা?— আন্তে আন্তে হেঁটে আর মুহূর্তের ডাক দিতে দিতে এই সময় রোজই যেমন নীরাঞ্জিতার কাছে এসে দাঁড়ায় বিহুতি, ঠিক সেভাবে নয়। যেন একটু বাস্তব ও উদ্ভিগ্ন হয়ে, হস্তবস্ত হয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে আসে বিহুতি। রোজই এই সময় চোখের চাহনি নিবিড় ক'রে নিয়ে যে-ভাবে

হাসে বিহুতি, আজ ঠিক সেভাবে নয়, যেন একটা অস্বস্তিকে কোনমতে রুক্ষ হাসি দিয়ে হাসিয়ে নীরাঞ্জিতার কাছে এসে দাঁড়ায়। এই সময় নীরাঞ্জিতার হাত ধরতে গিয়ে বিহুতির হাতটা রোজই যেমন একটু নরম হয়ে যেতে চেষ্টা করে, আজ কিন্তু ঠিক তেমন ক'রে নরম হয়ে যাবার চেষ্টা করে না। বরং, বিহুতির হাতটা যেন সন্দেহে ও অভিযোগে বেশ একটু কঠিন হয়ে নীরাঞ্জিতার হাত ধরে।—আমি এতটা ভাবতে পারিনি, নীরা!

আশ্চর্য হয় নীরাঞ্জিতা—কি?

বিহুতি—তুমি বাইরে একরকম আর ভিতরে আর-এক রকম, ছিঃ!

চমকে ওঠে নীরাঞ্জিতা। —এরকম অদ্ভুত সন্দেহের মানে?

বিহুতি—তোমাকে আমি কোনদিন অবিশ্বাস করিনি, কিন্তু আজ করতে হচ্ছে।

নীরাঞ্জিতার চোখ জলে ওঠে। —স্পষ্ট ক'রে বল! কিসের অবিশ্বাস।

বিহুতি গভীর হয়। —দোষ করেও তোমার এত রাগ করে কথা বলা একটুও ভাল দেখায় না।

নীরাঞ্জিতা চৈতন্য ওঠে—কিসের দোষ? চরিত্রের?

বিহুতি হেসে ফেলে। —ছিঃ, সে সন্দেহ থাকলে কি আজ তোমার হাত ধরে কথা বলতাম?

নীরাঞ্জিতা—সন্দেহ করলেই পারতে।

বিহুতি—সন্দেহ করবো কেন? আমি ইন্ডিয়ট নই। তা ছাড়া...

নীরাঞ্জিতা—কি?

নীরাঞ্জিতার কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে কিসকিস করে বিহুতি। আর, নীরাঞ্জিতার শরীরটা যেন ঘৃণাক্রান্তের আলার খরখর ক'রে কঁপে ওঠে। খরসোয়ানের জীবনের সেই প্রথম রাতের আত্নশ্রদ্ধা বৃকের ভিতর গুমরে উঠেছে। বাথরুমের মিররটা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। রক্তাক্ত বেদনার স্মৃতি লুকিয়ে রেখে ভেজা শাড়ির কুণ্ডলীটা অসাড় হয়ে

পড়ে আছে। নীরাঞ্জিতার বাইশবছর বয়সের এই শরীরটার অনাহত চরিত্রনিষ্ঠার প্রমাণ পেয়ে কি উৎকট খুশির হাসি ফেসেছিল অলক্তকের মেয়ের বাবী।

বিহুতি বলে—সে কথা নয়। আমার অভিযোগ হলো... আমার সন্দেহ... তুমি আমার আলমারা খুলে ব্যাঙ্কের জমার বইগুলো নাড়াচাড়া করেছ আর দেখেছ।

নীরাঞ্জিতা—কেন এমন সন্দেহ হলো ?

বিহুতি—আলমারার চাবিটা যেখানে থাকে, আজ চাবিটাকে সেখানে পেলাম না।

নীরাঞ্জিতা—তুমি মনে করে দেখে, চাবিটা কোথায় রেখেছিলে।

বিহুতি—চাবিটা টেবিলের দেয়ালে ছিল। কিন্তু চাবিটাকে বালিশের তলা থেকে পেলাম।

নীরাঞ্জিতা—তুমিই বালিশের তলার চাবিটাকে রেখেছিলে। কিন্তু ভুলে গিয়েছ।

বিহুতি—না ; আমার ভুল হয় না।

বিহুতির মুখের দিকে তাকিয়ে আর ছুঁচোখের চাহনিকে যেন পুড়িয়ে পুড়িয়ে কথা বলে নীরাঞ্জিতা—তোমার ব্যাঙ্কের জমার বইগুলো যদি আমি দেখে থাকি তো দেখেছি। তাতে তোমার ক্ষতি কি ?

বিহুতি—তাতে আমার লাভ কি ? ও সব জিনিস তুমি ছুঁলে কি আমার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স ডবল হয়ে যাবে ?

নীরাঞ্জিতা—এতদিনে... এইবার বুঝলাম।

বিহুতি—কি বুঝলে ?

নীরাঞ্জিতার চোখের চাহনি যেন ঠক ঠক ক'রে কাপে। হাতের কমানলটাকে মুখের কাছে তুলে নিয়ে আস্তে একবার কামড়ে ধরে। তারপরেই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে। —তুমি সন্ধ্যার !

বিহুতি—ঠাট্টা করছে বলে মনে হচ্ছে।

নীরাঞ্জিতা—তোমার মত মানুষকে ঠাট্টা করবে ? ছিঃ !

নীরাঞ্জিতাকে আস্তে আস্তে বুকের কাছে টানে

বিহুতি ; আর নীরাঞ্জিতাও বিহুতির কাঁধের উপর মাথাটা এলিয়ে দেয়—আর অদৃষ্টভাবে, যেন ডুকরে ডুকরে হাসতে থাকে। বিহুতি বলে—রাজপোখরা থেকে চিঠি এসেছে।

নীরাঞ্জিতা—কে লিখেছে ?

বিহুতি—তোমার বাবা।

নীরাঞ্জিতা—কি লিখেছে ?

বিহুতি—সব ভাল খবর। একটা মজার খবরও আছে।

নীরাঞ্জিতা—কি ?

বিহুতি—সেই চরিত্রহীন দম্পতি রাজপোখরাতে এসেছেন।

—কে ? কে ? কারা এসেছে ?— ছটকট ক'রে, বিহুতির হাতের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অদৃষ্টভাবে চেঁচিয়ে ওঠে নীরাঞ্জিতা।

বিহুতি—নিশীথ আর প্রতিভা। আশপাঙ্গলা বেকুব, সেই শিবদাস দত্ত একেবারে নির্লজ্জ হয়ে রোজই উৎসব করছে।

বিড়বিড় করে নীরাঞ্জিতা—জঘন্না ! কি-ভয়ানক ঘৃণাসাহস।

বিহুতি—কি বললে নীরা ?

নীরাঞ্জিতা—বেশ ব্যুত্রে পারছি, বাবাকে অপমান করবার জ্ঞান, চরিত্রহীনতার বড়ই দেখাবার জ্ঞান ওরা রাজপোখরাতে এসেছে।

বিহুতি—ছেড়ে দাও ওদের কথা।

নীরাঞ্জিতা চেঁচিয়ে ওঠে—না, কথখবো না।

বিহুতি আশ্চর্য হয়। —কি বললে ?

নীরাঞ্জিতা—আমি কালই রাজপোখরার বাব।

বিহুতি—কিন্তু আমার তো ছুটি বেওয়া সম্ভব হবে না, নীরা।

নীরাঞ্জিতা—তুমি ছুটি নিয়ে পরে এস, আমি কালই চলে যাই।

বিহুতি—কিন্তু...

নীরাঞ্জিতা যেন উতলা হয়ে ভয়ানক এক প্রতিশোধের স্বপ্নের সঙ্গে কথা বলতে থাকে।

—কিন্তু আবার কি? একবার অপমানিত হয়ে শিক্ষা হয়নি; আবার এসেছে; অলঙ্কারের মৌজাগ্যকে ঠাট্টা করতে এসেছে একটা... এইবার আরও ভাল শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে।

আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন শীতল সরকার।
—এ কি অদ্ভুত কথা বলছিস তুই? শিবদাস দত্তের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া হোর পক্ষে যে নিতান্ত একটা অপমান?

নীরাজিতা হাসে—অপমান না ছাই।

তাকে ওঠেন শীতল সরকার। —এখন যে ও-বাড়িতে নিশীথ আছে।

নীরাজিতা—থাকুক না।

শীতল সরকার—আজ যে ও-বাড়িতে শিবদাস দত্তও নেই, প্রতিভাও নেই। বাপ-মেয়েতে চাইবাসা চলে গিয়েছে; প্রতিভার এক মর-মর বামীয়ার সঙ্গে শেখ দেখা করে আসবার জন্ত।

নীরাজিতা—শিবদাস দত্তের কাছে আমার কোন কাজ নেই; প্রতিভার কাছেও না।

—তবে?— এইবার আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠেন শীতল সরকার। এবং বড়বউদিও হস্তদণ্ড হয়ে ছুটে আসেন।

—এ কি কাণ্ড, নীরাজিতা? তুমি আবার ও-বাড়িতে যাবার জন্ত, মিছে কেন... বউদি যেন একটা দুঃসহ উদ্বেগে বিব্রত হয়ে বার বার আপত্তি করতে থাকেন।

নীরাজিতা—কাজ আছে।

বউদি ছটফট করেন। —বিভূতিবাবু যে আজই, আর কিছুক্ষণ পরে এসে পড়বেন।

নীরাজিতা—আমুক।

নীরাজিতা হাসে। —নিশীথবাবুর কাছেই একটা কাজ আছে।

শীতল সরকার—ওরকম মানুষের কাছে তোমার কি কাজ থাকতে পারে?

নীরাজিতার ঠোট-দুটো অদ্ভুত রকমের শক্ত হয়ে

যেন একটা দুর্বল আক্রোশের আবেগে কঁপে ওঠে।

—কমা চাইব।

—কি!— শীতল সরকারের আঁতলায় যেন অলঙ্কারের সব অহংকারের শাশি চূর্ণ করে দিয়ে কাঁপতে থাকে।

অলঙ্কারের ফটক পার হয়ে, হস্তত্ব ভীত ও করুণ অলঙ্কারক পিছনে ফেলে রেখে, ষাউএর ছায়া পার হয়ে, এবং ডালিয়া-বাগানের কিনারা ধরে হেঁটে হেঁটে শিবদাস দত্তের নীরব বাড়িটার বারান্দায় উঠে বাইরের ঘরের একটি চেয়ারের দিকে অপলক চোখ তুলে আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নীরাজিতা।

ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নিশীথ, আর, বোধহয় ভিতরের ঘরের দিকে চলে যাবার জন্ত মুখ ফিরিয়ে নেয়।

নীরাজিতা হাসে। —আমি তুল করে চলে আসিনি। জানি, কাকাবাবু বাড়িতে নেই, প্রতিভাও নেই। আমি ইচ্ছে করে তোমার কাছেই এসেছি।

নিশীথ আশ্চর্য হয়। —আমার কাছে?

নীরাজিতা—হ্যাঁ।

নিশীথ—বল।

নীরাজিতা—হয় কাছে এস, নয় কাছে যেতে বল। তা না হ'লে কি ক'রে বলি।

নিশীথের চোখের বিষয় এইবার যেন একটা রহস্যের ভয়ে ছনছন করতে থাকে। —আজ আর ও কথা তোমার বলা উচিত নয়।

নীরাজিতা—আজই যে বলবার সুযোগ পেলাম।

বারান্দা থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে আর এগিয়ে যেয়ে, এবং দরজার কাছে এসেই ঘরের ভিতরে যেন একটা কাঁপ দিয়ে লুটিয়ে পড়ে নীরাজিতা। চেয়ারের কাঁধটা ধরে আর নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে হুঁপিয়ে ওঠে। —কমা চাই, নিশীথবাবু!

নিশীথ—তুমি কমা চাইছো কেন নীরাজিতা? আমি যে সত্যিই... লোকে যাকে বলে...

চেঁচিয়ে হেসে উঠতে গিয়েই হুঁপিয়ে কেঁদে
কলে নীরাজিতা। —লোক যাকে বলে
চরিত্রহীন।

নিশীথ রায়—হ্যাঁ।

চোখের উপর রুমাল চেপে ধরে বিড়বিড় করে
নীরাজিতা—আপনার বন্ধু বিহুতিবাবু একেবারে
নির্ধৃত পবিত্র-চরিত্রের মানুষ।

নিশীথ—তা বৈকি। বিহুতির শরুও বিহুতির
চরিত্রের অপবাদ করে না।

নীরাজিতা—খুব ভাল কথা। কিন্তু...

নিশীথের কাছে এগিয়ে এসে, আর, নিশীথের
প্রায় বকের কাছে মাথা হেঁট করে ঠাড়িয়ে থাকে
নীরাজিতা। আর, নিশীথ যেন অসাড় পাথরের
মূর্তির নত স্তম্ভ হয়ে ঠাড়িয়ে নীরাজিতার সেই
হেটমাখার হৃদয় খোপাটার নিকে অদৃষ্ট এক
মনতার চাহনি তুলে তাকিয়ে থাকে।

অসন্ত অসন্ত মাথা তোলে নীরাজিতা।

—নিশীথবাবু!

নিশীথ—কি?

নীরাজিতা—মতিয়াই বুঝতে পারলেন না? না,
একটুও ইচ্ছে হয় না?

নিশীথ—কমা কর, নীরাজিতা!

নীরাজিতা—কেন?

নিশীথ—উচিত নয়।

নীরাজিতার মুখটা করণ হয়ে হাসতে থাকে।

—আনি ঠিক এই ভয় করেছিলান, নিশীথবাবু।

নিশীথ—ভয়?

নীরাজিতা—হ্যাঁ; ভয় হয়েছিল, আপনি সুরোগ
পেলেই প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু...

নিশীথ—কি?

নীরাজিতা—কি চমৎকার প্রতিশোধ!

শিবদাস দত্তের বাড়ির ফটকের সামনে রাস্তারই
উপর ঠাড়িয়ে একটা বোটেরগাড়ির হর্ন যেন ঝট
ঝিকারের গর্জনের মত হাঁফ ছাড়ছে। ডালিয়া-
বাগানের বাতাসের ভিতর দিয়ে ছুটে এসে সেই

গর্জনের শিহর এই ঘরের নিরালার উপর আঘাত
পড়ছে।

হো হো করে হেসে ওঠে নীরাজিতা। —বুঝতে
পারছেন নিশীথবাবু?

নিশীথ—কি?

নীরাজিতা—হর্নের আওয়াজটা চেনা-চেনা মনে
হচ্ছে না কি?

চমকে ওঠে নিশীথ। নীরাজিতা বলে—
আপনার বন্ধুর গাড়ির হর্ন।

নিশীথ—কে? বিহুতি এসেছে?

নীরাজিতা—হ্যাঁ।

নিশীথ—তুমি তুল করে বড় অজ্ঞায় করলে,
নীরাজিতা।

নীরাজিতা হাসে। —অজ্ঞায়?

নিশীথ—হ্যাঁ, বিহুতি বেচারি হয়তো তোমাকে
তুল বুঝবে।

নীরাজিতা—কি তুল বুঝবে?

নিশীথ—একটা বাচ্চা ধারণা করতে পারে
বিহুতি, তুমি যেন ইচ্ছে করে আমার কাছে কিছু
আশা করে...

নীরাজিতা—ঠিকই ধারণা করবেন আপনার
বন্ধু।

খরদোয়ান মাস্তানিঙ্কের বিহুতির গাড়ির হর্ন
উদ্দান হয়ে বাজতে থাকে। নিশীথ বলে—চল
নীরাজিতা—

রুমাল দিয়ে কপালটাকে একবার মুছে নিয়েই
নীরাজিতা বলে—চল।

আর, ডালিয়া-বাগানের কিনারা দিয়ে নিশীথেরই
পাশে পাশে হেঁটে ফটকের কাছে এসে হেসে ওঠে
নীরাজিতা। —তুমি কখন এলে?

বিহুতি—এখনই; তুমি এখানে কখন এলে?

নীরাজিতা—অনেকক্ষণ হলো।

বিহুতির চোখের উপর যেন ধোঁয়াটে আগুনের
হাওয়া ভাসতে থাকে। —তার পর...?

নীরাজিতা—তুমি বল।

বিহুতি—খরসোয়ানের বাড়িতে কিসে যেতে চাই?

নীরাজিতা—নিশ্চয় চাই : কিন্তু...

বিহুতি—কি?

নীরাজিতা—তার আগে দেখতে চাই, তুমি নিশীথবাবুর কাছে কখনা ডেকেছ।

—নীরাজিতা!—চিংকার করতে গিয়ে বিহুতির গলার স্বর যেন দাউ দাউ করে অলে উঠে।

নীরাজিতা হাসে। —ভেবে দেখ।

বিহুতি—নীরাজিতা!

নীরাজিতা—ভেবে দেখ।

কি ভয়ানক শিঙ ও শাস্ত হাসি হাসছে নীরাজিতা। এবং অলঙ্কার খোলা ফটকটাও যেন বিহুতির সৌভাগ্যের, অহংকারের আর পবিত্র

চরিত্রের দিকে তাকিয়ে একটা খোলা ঠাট্টার হাসি হাসছে।

স্টায়ারিং-এর চাকার উপর নাখাটা কুঁকিয়ে দিয়ে আনমনার মত কি-য়েন দেখতে থাকে বিহুতি। হাতের শক্ত মুঠোটা অলখা হয়ে যাচ্ছে। তার পরেই গাড়ি থেকে নেমে, আর সড়কের কাউ-এর ছায়ার একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়ায়।

নিশীথের দিকে একটা অসহায় ও ভীত চাহনি তুলে ডাক দেয় বিহুতি—একটা কথা শুনে যাও, নিশীথ।

খিসখিল করে হেসে যেন একটা মিষ্টি খুন্দির ধমক ছাড়ে নীরাজিতা। —তুমি নিশীথবাবুর কাছে এসে কথা বল।

সমাপ্ত



দ্র. বঙ্গল ডেকারেটর
২২৬-চিত্তরঞ্জন এভিনিউ • কলিকাতা - ৬



মঙ্গোলিয়ার সাংস্কৃতিক-দল

শ্রীমতী বাণী দেবী

কিছুকাল আগে আমরা কমানিয়ার একটি সাংস্কৃতিক-প্রতিনিধি দলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। এবার পরিচয় পেলাম আর-একটি সাংস্কৃতিক-গোষ্ঠীর। এরা এসেছিলেন মঙ্গোলিয়া থেকে। শুধু মঙ্গোলিয়া বললে ভুল হবে। বলা উচিত, 'পীপল্‌স্‌ রিপাব্লিক অব মঙ্গোলিয়া' থেকে। একদিন সারা পৃথিবীতে যে মঙ্গোল-জাতি সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল, যে-জাতির অগণিত অসংখ্যই নৈশ্র চীনদেশের থেকে মঙ্গোল-সাইবেরিয়া থেকে দিল্লী পর্যন্ত প্রচুর বিস্তার করেছিল, পূর্ব-এশিয়ার সেই মঙ্গোল-জাতি আজ পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র জাতিতে পরিণত। মঙ্গোল-সাম্রাজ্য আজ তিন ভাগে বিভক্ত—(১) সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত স্বঃশাসিত 'টুভিনিয়ান' অঞ্চল; (২) চীন-প্রশাস্ত্রের অধীন স্বঃশাসিত 'মঙ্গোলিয়ান' অঞ্চল বা অন্তর্মঙ্গোলিয়া; আর, (৩) পীপল্‌স্‌ রিপাব্লিক অব মঙ্গোলিয়া বা বহির্মঙ্গোলিয়া। মঙ্গোলিয়া বলতে এখন কেবল পীপল্‌স্‌ রিপাব্লিক অব মঙ্গোলিয়াকেই বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে

প্রাচীন মঙ্গোলিয়ার এই অংশই আজ কেবল একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে পরিচিত। অর্থনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাশিয়ার সঙ্গেই এর সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ।

মঙ্গোলিয়ার সাংস্কৃতিক-প্রতিনিধি-দল ভারত-সরকারের আমন্ত্রণে এসেছে এসেছিলেন মার্চ মাসের (১৯৫৮) প্রথম সপ্তাহে। দশদিন তারা এদেশের রাষ্ট্রীয় অতিথিরূপে নানা আনন্দাশ্রয় ঘুরে বেড়িয়ে শেষে কিংগ্‌স গার্ডেন এক মনোরম আতিথ্য, খ্রীষ্টি ও শুভেচ্ছার পুষ্টি নিয়ে। রাজধানী দিল্লীতে উরা হোলি-উৎসবে যেতে গিয়ে আবার-স্বপ্নময় দর্শন করেছেন; লালকোঠা, হুতব-মিনার, জুয়া-মসজিদ ঘুরে দেখেছেন; আগ্রা, লাক্ষো ও কলিকাতায় দেখেছেন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দীর্ঘস্থানগুলি। আর, সেই সঙ্গে দিল্লী, লাক্ষো ও কলিকাতার অধিবাসীদের কাছে বেঁচে গিয়েছেন তাঁদের সূতা,

উপরের ছবিটি প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের শেষে তাঁর দলবিশেষের দল।

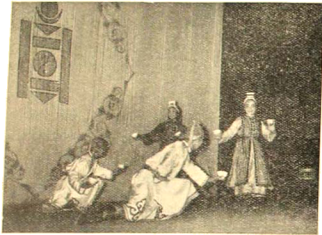
সীত ও বাতের ছায়ায় ও হৃদয়ধূর্ধে ভরা অঙ্গুর এক অশ্রুতির রেশ।

কলিকাতায় মঙ্গোলিয়ার এই সাংস্কৃতিক-প্রতিনিধি-দল এসে পৌঁছান ১১ই মার্চ সন্ধ্যাবেলা। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার, স্থানীয় চীন ও বানিয়ার বাসিন্দা-স্বত্বাস এবং কয়েকটি সাংস্কৃতিক-গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তাঁদের অভ্যর্থনা করা হয় হাওড়া-স্টেশনে। ঐদিন তারা 'রবীন্দ্র-ভাষ্যসী'তে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের 'নৃত্য-নাটক-সমীত আকাদেমি' পরিদর্শন করেন, এবং বাংলাদেশের সমীত ও নৃত্যকলায় সঙ্গে পরিচিত হন। তারা 'মহাবোধি শোসাইটি'তেও গিয়েছিলেন। ১২ই ও ১৩ই মার্চ সন্ধ্যায় তারা ভারতের প্রধানবস্ত্রীর জাতীয় সাহায্য-তহবিলে সহায়তা করবার উদ্দেশ্যে মিউ-এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে সমীত, নৃত্য ও বাতের যে মনোময় অগ্রষ্ঠান দৃষ্টি করে গেলেন, বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'লো তাই।

এই সাংস্কৃতিক-প্রতিনিধি-দলের নেতা ছিলেন মিঃ হুল্টুই। মঙ্গোলিয়ার বিদ্বৎসার তিনি একজন প্রধান ধারক ও বাহক। মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রীয় সম্মানে তিনি কৃষিত। তাঁকে বাস দিয়ে এই স্থলে ছিলেন আঠারো জন যেরূপকথ পিল্লী; তারা হলেন—মিঃ ওয়ুঝাব (ভেপুটি নীহার ও রাষ্ট্রীয় সম্মানে কৃষিত একজন পিল্লী); মিঃ ব্লিগ্জেন (ক্যামেরাম্যান ও রাষ্ট্রীয় সম্মানে কৃষিত একজন আর্ট-ডিরেক্টর); মিঃ হামসিন হুয়েন (কলা-পিল্লী); মিসেস্ সোল্গোম্বা, মিঃ বামিয়ান ও মিঃ সোলগোরবাত্ (রাষ্ট্রীয় সম্মানে কৃষিত কলা-পিল্লী); মিসেস্ হুগ্লেগ্গমা ও মিঃ পুরেভমেরক্ (সমীত-পিল্লী); মিসেস্ সার্নেন্সোণ্ডার, মিসেস্ ম্যাসাঘাভা ও মিঃ বাগ্ বাওঝা (বাচ্চর-পিল্লী); মিঃ আল্ভায়েরেল, মিসেস্ বোল্গোর, মিঃ বাম্গাইখান ও মিঃ হামসিন (নৃত্য-পিল্লী); আর, মিসেস্ মাক্সিগ্ হুয়েন (মার্শাল-অভিনেত্রী)। তাছাড়া ছিলেন দু'জন সোভারী।

মঙ্গোলিয়ার এই সাংস্কৃতিক-প্রতিনিধি-দল মিউ-এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে যে দৃষ্টি অগ্রষ্ঠান ক'রে গেলেন—নৃত্য, সমীত ও বাত হিলাবে তাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমই থাও বাক্ নৃত্যের কথা। হুসিনকার অগ্রষ্ঠানই বাত দিয়ে শুরু, আর নাচ দিয়েই তার পরিসমাপ্তি। 'যোড়সংঘার-নাচ' দেখালেন নৃত্যশিল্পী বাংসাইখান ও লামখিল। মঙ্গোলিয়ার ছেলোমেরঘেরা খোড়ায় চকুতে দেখে পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকেই। খোড়ায় চ'তে তারা শুণু ছুটে যায় না, নৃত্য-ভঙ্গিমায বেদ উড়ে যায়। অপরোচী-সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্য বোধ করি তারা এমনি ক'রেই পালন করতে দেখে।

'যোড়সংঘার-নাচ'-এর মধ্য দিয়ে তরুণ নৃত্যশিল্পী দু'জন যে প্রাণোচ্ছলতার পরিচয় দিলেন, এক কথাই তা অঙ্গুর। তাঁদের অঙ্গলকালন ও পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে ছুটে উঠেছিল চমৎকার একটা বীরবাহক ভাব। মিসেস্ হুগ্লেগ্গমা দেখালেন একটি লোক-নৃত্য, যার নাম সেওয়া হেবেছিল 'স্বর্ধ কিরণ সেব পৃথিবীতে'। মঙ্গোলিয়ায়কে বলা হয় 'স্বর্ধকিরণের বেশ'। বে-সেপের আকাশ বছরের বেশিরভাগ সময়ই স্বর্ধ-কিরণে উজ্জ্বল। আর, এইকালেই বোধ করি ভ্রমশেপের লোক-সঙ্গীত কনক-রবির কথাই থাকে বেশি। স্বর্ধকিরণে মাহুয়ের সহজাত আনন্দের ভাবটি অঙ্গুর সৈধিক ছন্দে মধ্য দিয়ে কণাচিত করেন মহিলা-পিল্লী। তারা এই নৃত্যছন্দে মধ্যমধ্যে ভারতীয় লোক-নৃত্যের হৃদয় একটা মিল খুঁজে পাওয়া গেল। সোল্গোরবাতের 'মঙ্গোলিয়ার নৃত্য'-টি বৈচিত্র্যপূর্ণ না হ'লেও, আমরা তার মধ্য দিয়ে মঙ্গোলিয়ার গ্রাম্য নাচের একটা পরিচয় পেলাম। কিন্তু, বাংসাইখান, হামসিন ও আল্ভায়েরেলের সম্মিলিত 'পশ্চিম-মঙ্গোলিয়ার নৃত্য'টি নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্যপূর্ণ। সামলস্কার চাকচিক্য, লণ্ণ ও এর অঙ্গলকালনে এবং ভাবব্যঞ্জনা নাচটি বিশেষ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। বাংসাইখানের 'উন'সংক' নাচটির মধ্যে ছিল গাভীরূপ একটি অভিনয়ের প্রকাশ-ভঙ্গিমা। এই নাচের মধ্য দিয়ে দু'জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা-নৃত্যশিল্পী একটি প্রাচীন আত্মনৈতিক সরবরাহী নৃত্যই আমাদের উপহার দিলেন। পিল্লীসের সামলস্কার মঙ্গোলিয়ার প্রাচীন রাজকীয় ঐতিহ্যের নিদর্শনরূপ। আবারও সবচেয়ে অধিক ক'রে দিলেন মিসেস্ সোল্গোর একটি 'ভারতীয় নৃত্য' পরিবেশন ক'রে। ভারতনাট্য্যের হুহু 'মুদ্রা' তিনি শুণু আরওই করেননি, সেই 'মুদ্রা'র কয়েকটি তিনি যে নিপুণতার সঙ্গে ছুটিয়ে তুললেন, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করাই করিন হ'তো। সম্পূর্ণ ভারতীয় শোণ্যক সম্বন্ধিত হ'য়ে, তিনি যেভাবে তাঁর হাত, পা, চোখ দিয়ে ভারতীয় নৃত্যের বিশেষ একটি ভাবকে মূর্ত ক'রে তুললেন, এ দেশের সর্ধকিরণের মনে তা যেন গভীরভাবে রেখাপাত ক'রে রইলো। একজন বিশ্বেশিল্পীর পক্ষে এইভাবে ভারতীয় নৃত্য আরও করা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মিসেস্ সোল্গোর ও মিঃ হামসিনের 'বেতিয়াং নৃত্য'-টিও বেশবার মতো। প্রমিক-সম্পত্তিরা সারথিনের হাড়ভাঙা বাটুনির পর এনে আঙনের চারপাশে নাচতে চায় তাদের চিরপ্রিয় 'ইওংখার' নামক সমবেত নৃত্যটি। সেই ভাবটিকেই সহজ নৈপুণ্যের পক্ষে ছুটিয়ে তুললেন এ'রা দু'জন। আর একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ নাচ দেখলাম



ব্যাংক-ইন্ডের একটি 'মহোলিয়ার নৃত্য'

ব্যাংক-ইন্ডের 'মহোলিয়ার নৃত্য'। দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে সীমাবদ্ধি বাঁধি নিয়ে অশ্লীল প্রাণোচ্ছ্বাসে তপ দিলেন একটি লোক-নৃত্যের। ছেলেরা দু'হাতের ওপর দুটি বাঁধি নিয়েছেন, আর মেয়েরা একটি বাঁধি মাথার এবং অপর দুটি দু'হাতের ওপর রেখে কখনও ঘিরে, কখনও বা ক্রান্ত মোচের চলেছেন। এভাবে ভাবনামা বাঁধার মধ্যে একটা বাহ্যিক অঙ্গ বৈধি। সবচেয়ে 'ভাগ্য অর্থ ভ্রামণ' বা 'পামা-বাসকের নৃত্য'। এ নাটকের মধ্যে দিয়ে অস্তিত্ব ছন্দ ও গানিত্যের চেয়ে অভিন্ন ভক্তিমাই প্রকট হ'য়ে উঠেছিল। সল, নাচের মাধ্যমে আমলের কাছে তেমন ক'রে ধরা পড়েনি। গোপালের বর্ষটিকিয়া ও তপসজ্ঞার নিপুণতায় কিন্তু প্রত্যেকটি নৃত্য-শিল্পীই স্বতন্ত্র একটা চরিত্রের পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন।

এর পরে আলা বাবু কর্তৃক প্রদর্শিত। মহোলিয়ার সঙ্গীত প্রদর্শন দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো। কতকগুলি গান বিলম্বিত করে গাওয়া হয়। এ গানগুলি তাই হ'য়ে ওঠে ভাবপ্রধান। আবার কতকগুলি গান গাওয়া হয় উচ্ছ্বাসিত ক্রান্ত লয়ে। সে গানগুলি যেন সঙ্কীর্ণ তেমন ছন্দপ্রধান। ক্রান্ত লয়ের গানগুলি সাধারণত দু'তিন বকরের হ'য়ে থাকে। যেন, ওদেশের বিখ্যাত 'জামুনি সাগ' বা সচরের চার জুতুর ভাবপ্রধান সঙ্গীত। এই পরমের গান হঠাৎ ছয় তিনটি বকর—সাহাব, মধ্যম ও সবাপ্তি। আর তাদের মাজা হয়

কখনও ২৪, কখনও ৪৪, আবার কখনও ৪৪ বা ৬৪; তবে বেশিরভাগ গানেই ২৪ বা ৪৪ বা ৬৪ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কাজাব্দু, উইগাব্দু, শায়বেং, শরিগাব্দু প্রভৃতির সঙ্গীতে ৬৪ বা ১২৮ মাত্রার চন্দ্র থাকে। ক্রান্ত লয়ের গানগুলিতে শিল্পীরা সাধারণত তাঁদের কণ্ঠস্বর বর্ত-পরকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কখনও আবার তাঁদের অর্ধশ্রুত স্বরগুলিতে গানের বাঁধি প্রত্যয়ের মর্মমূলে দিয়ে একটা গভীর অর্থবৃত্তির আমেজ এনে দেয়। মহোলিয়ার ভাবামাণ সাংস্কৃতিক-প্রতিনিধি-মন্ডলের একজন শিল্পীর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, মহোলিয়ার বৈশিষ্ট্য-ভাগ লোক-সঙ্গীতই রচনা করেছেন শিল্পীরা জনসাধারণ। যেন, কোনো মেধাগলক, কৃষক বা বোতাসওয়ার। তাঁদের ঠাধা

গানগুলিকেই শেখার গায়কেরা জনপ্রিয় ক'রে তুলেছেন। এইভাবেই প্রচলিত হয়েছে মহোলিয়ার স্বতন্ত্র লোক-সঙ্গীত। তবে, খ্যাতনামা কবিরাও ওদেশে নানাপ্রকার গান রচনা করেন। তার মধ্যে শাস্তি ও বৈধী সম্পর্কিত গানগুলিকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়।

কলিকাতার অস্থানে আমরা মহোলিয়ার কর্তৃক সঙ্গীত-শিল্পীদের কাছ থেকে যে-গানগুলি শুনে সে-সময় ছিল, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—পুরভঙ্গোব্দু-এর তিনটি লোক-সঙ্গীত, সোণভোমার দুটি লোক-সঙ্গীত, আর হামনি বরেন্দ-এর একটি ভাবপ্রধান গীতিকা। পুরভঙ্গোব্দু গাইলেন 'শাধা-সমবিত গাছ', 'বাসানী বোড়া' ও 'মাতৃকৃষি' শীর্ষক তিনটি গান। প্রথম গানটিতে দু'টে উঠেছিল একটি মেয়ের প্রতীকার আত্মলতা। একটি গাছের নিচে গাড়িয়ে সে যেন তার প্রেমাস্পদের প্রতীকার ব্যাকুল হ'য়ে গান গাইছে—যে প্রেমাস্পদ নিজে আসবে বরষের এক বেশ থেকে। গানটি সঙ্কীর্ণ হ'লেও, ভাবের মাধ্যমে অনেক নাড়া দিতে যায়। দ্বিতীয় গানটি ছন্দপ্রধান আনন্দমূলক লোকগীতি। গানের বাঁধি কোনো ক্ষেত্রেই বোধ্য নয়; কিন্তু ছন্দপ্রধান এই গানটি বর্ণনাত্মকই যে আনন্দ দিয়েছে তা প্রেক্ষাগৃহের মর্মমূহ করতালিগান শুনেই বোঝা যায়। তৃতীয় গানটিতে মাতৃকৃষির প্রতি প্রাণবিরোধের আকৃতিই দু'টে উঠেছিল

গান্ধীর পাক্ষীপূর্ণ অর্পণ কর্তব্যে। গানের বক্তব্যবিষয় বাংলা করলে পাঠ্য—

“গরীবলী মোর মাছুড়ি,
আমি যে গো তার সন্ধান—
ভালোবাসি তাকে, চরম চুম্বিয়া
গাছি আমি তারি অঙ্গন।
এই ঠাই যোর সকলের স্রিয়,
অনন্দি’ হোখার উচল গ্রাম।”

মহিলা-সঙ্গীত-শিল্পী জোগ্জোয়া মহোদ্যায়ের একজন রাষ্ট্রীয়-সন্মান-স্বীকৃতি অর্পণ কর্তব্যের অধিকাংশী। তিনি ‘চৌহালসান’ পুস্তকরও গেরুছেন। কর্তব্যের দাণিত্যের মন্তই তিনি এখানকার প্রোত্বেসের উৎসাহিত করতালিলনিত্তে অভিনবিত হয়েছিলেন। তাঁর কর্তে আদ্যা বাংলাধাবপূর্ণ ও চন্দ্রপ্রধান একটি হস্তরগাঙ্ক গানও গুনতে পেরেছিলাম। তাঁর গাওয়া ‘অবশালক’ গানটিও ভাব ও চন্দ্রের দিক থেকে অম্বর। বাংলা করলে বাণী হবে এইরকম—

“অবশালকের প্রব যেমন কঠিন
তেমনি সন্ধানের।

গ্রীষ্মের উতাপ লক্ষ করে
শীতের শিহরণ উৎপেক্ষা করে
সে কেবল অস্ত্রান্ত পরিভ্রম করে যায়।

লালন-পালনের মধ্য দিয়েই

সে এইভাবে বাড়ির ভোলে মাতীর সম্পদ।”

জোগ্জোয়া আদ্যের বিশ্বাস হতবাক করে দিলেন একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কয়েক কলি গের। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেম, তিনি যে কথদিন বিদ্রোহে ছিলেন, ঐ কথ-বিশেষ অবশর-লবের মধ্যই তখনকা চীনা তরুণীর কাছ থেকে কথিগুরু ঐ বধ্য-সঙ্গীতের গাইন কর্তি আদর করেছেন। যদিও গানের বাণী হৃদয়ভায়ে উচ্ছাবিত হয়নি, তবুও তিনি বেভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বর আদর করে তা পত্রি বেষন করলেন, নিঃশব্দেহে তা গ্রন্থ-সঙ্গীত। ‘তারি দাণি’ ও ‘প্রাবণ-হাতে’ কথা কথটি অবত প্রোত্বেসের নুতনে অধিষ্ঠা হয়নি।

মহোদ্যায়ের রাষ্ট্রীয় সন্মানগ্রাপ্ত কলা-শিল্পী বোলগোবিন্দ, যে ওকেশের একজন

উচ্চসরের পাক্ষ সে-বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নেই। দুটি লোক-সঙ্গীত গের তিনি প্রোত্বেসের অমুগ্ধ গ্রন্থ-লো কুড়িয়েছেন। তাঁর গাওয়া ‘ভাঙ্গিনি দাণ’ বা ‘বহুরের চার কুড়’ গানটির মধ্য দিয়ে আদ্যা যে উচ্চর কর্তব্যপূর্ণের পরিচয় পেলাম, তার সঙ্গে বাংলাদেশের শিল্পী-স্রষ্টি, বিশেষ করে ভাটিষালী গানের বিলম্বিত হুতের বেশ একটা মিল আছে। তাঁর দ্বিতীয় গানটি চন্দ্রপ্রধান ও শালাযতপূর্ণ।

এবার বাঙলার কথা। পিছানো ছাড়া এই দলে ছিল পাঁচরকমের বাঙলার। তার একটির নাম ‘মোহিন-হোরা’। দুই-তার-বিশিষ্ট একটি তার-বাঙ। বেহালায় ছুড়ের মতো একটি ছুড় দিয়ে বাজানো হয়। আর, আর ভর্তে সারেহীর স্বরের মতো। আর একটির নাম ‘নেক’। তিন-তার-বিশিষ্ট চন্দ্রকার একটি তার-বাঙ। এটি বাজানো হয় আদ্যের দেশের সেতারের মতো হাতের আঙুলে আঙা পরিবে। বেধতে অনেকটা ব্যাকোর মতো, আর স্বরও সেইরকম। বেহালায় স্বরের সঙ্গে এর স্বরের বেশ একটা মিল আছে। আর একটি তার-ব্রও এইরকম। তবে, তারের লগা। বেশি। আর, বাজানো হয় ছোট্ট খণ্ডের মতো একটা ছুড় দিয়ে। পকম বাঙলারটির নাম ‘ছোচির’। সেধতে ছোট্টখাটা একটা মাইলোকোন। বাজানো হয় লোহার লক লক হুটি কঠি দিয়ে। মলতরকের স্থমিষ্ট স্বরের সঙ্গে এর স্বরের মিল লক্ষ্য করবার মতো। বাঙলার দিক থেকে লবভয়ে বেশি কঠির প্রকাশ করেন মহিলা-শিল্পী মাদ্যাবল্য তাঁর



ভাল-টপের শ্রীমতী ‘মহোদ্যায় বহাবী-ব্রত’

তিন-তার-বিশিষ্ট 'শেও'-বায়ে। রাষ্ট্রীয় সম্মানের অধিকারী স্বামিন্যায়ের দুই-তার-বিশিষ্ট 'মোহিনীমোহর' বাননাও তখনে ভালো লাগলো। এইসব বাজনারই দলের কর্তৃপক্ষীত ও নৃত্যাভিহানে সফলতার কাজ করেছিল।

মহোলিয়ার এই সাংস্কৃতিক অহুতানে আমরা যিসন্স মাত্রিগুহরেন-এর 'ইলাস্ট্রিক রাবার'-এর কলকৌশল দেখলাম। কিছুকাল আগে কলিকাতায় যে 'হাদিয়ান সার্কাস' চলটি এসেছিল, তাতে গ্রিক এইজাতীয় 'প্রান্তিক গার্ল'-এর কলকৌশলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছিল। সেইকি কসরত-এর পিক থেকে মহোলিয়ান-শিল্পীর নৈপুণ্য প্রকাশ পেলো, তুলনায় রাশিয়ান প্রান্তিক গার্ল অনেক বেশি কৃতিত্ব প্রকাশ করেছিলেন।

মহোলিয়ার এই সাংস্কৃতিক অহুতানের দশ্য দিয়ে আমরা মহোলিয়ার লোক-সঙ্গীত, লোক-নৃত্য ও প্রচলিত বাজবজের যে পরিচয় পেয়েছি, ক্ষেত্রবিশেষে তার মধ্যে রাশিয়া বা চীনের লোক-সংস্কৃতির প্রভাবও অস্পষ্ট নয়। কিন্তু অবিকার্য্য ক্ষেত্রেই শিল্পীরা তাঁদের দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচয় দেখারই চেষ্টা করেছেন। ভারীহাভাবে উল্লেখ্য এইসব শিল্পী যে বিদেশের ভালো জিনিষ গ্রহণ করতেও কৃতিত্ব নন, ভারতীয় নৃত্য ও বহীজ-সঙ্গীতের আংশিক পরিবেশনের দশ্য দিয়ে তাঁরা যেন সেই কথাটাই প্রমাণ করে পেলেন।

প্রথম দিনের অহুতানে পশ্চিমবঙ্গের বিধান-পরিষদের সভাপতি ভট্টর স্বনীতিক্রমার চট্টোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয় দিনের অহুতানে কলিকাতার মেয়র ভট্টর দ্বিগুণা সেন শিল্পীদের অভিনন্দিত করেন। বাংলার ব্যতনামা গায়ক শ্রীপঞ্চরত্নমহার মন্ডিকও প্রথম দিনের অহুতান-পেয়ে রত্নমন্ডিক শিল্পীদের মধ্যে ঠাড়িয়ে বেড়ায়ে ব্যালি গলায় বহীজনাগের 'আদি বনজ আগ্রহ ধারের' গানটি গাইলেন, তা শুধু উপভোগ্যই হয়নি, তার দশ্য দিয়ে মহোলিয়ার শিল্পীদের যেন তিনি শুভরূপ বসন্তের উচ্চালে প্রাণের আত্মরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানালেন।

মহোলিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হুজুগটান। মূলত এঁরা খোকার ভাত হলেও, শিল্পকলার দিকে এঁদের যেন স্বেচ্ছাত একটা আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণের পরিচয় পাওরা যায় তাঁদের চিত্রশিল্পে, ভাস্কর্যে, সাহিত্যে, নাট্যাভিনয়ে, সঙ্গীতে, নৃত্যে ও বাজে। এঁদের নাট্যাভিনয়ে কিংবা সঙ্গীত-নৃত্য-বাজের অহুতানে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার

গুণাবলি প্রকট হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক ও অর্থনীতিক কারণে মহোলিয়ার অধিবাসীরা আজ রাশিয়া ও চীনের প্রভাবমুক্ত না হ'লেও, সাংস্কৃতিক বিষয়ে এঁরা নিম্নস্ব ধারা বজার রাখতেই লড়ে। মুখবিশ্রহের দশ্য দিয়ে মহোলি-জাতির প্রাচীন ইতিহাস রচিত। কালের পরিবর্তনে এঁরা সামন্ত-রাজাদের বিক্ষোভ ঠাড়াতেও কবুর করেননি, দেশব্যাপী বিপ্লবের সূচনা করেছেন। অতীত দিনের সেইসব কাহিনীই হথ মহোলিয়ান নাটকের প্রধান উপজীব্য। সেই সঙ্গে, আধুনিক কালের নাট্যকারেরা শান্তি ও যৌদ্ধীর বাণী প্রচার করতে অনেক শ্রীতি-নাট্যও রচনা করেছেন। মহোলিয়ার বর্তমান রাজধানী-উলান বাতোর-এ যে রাষ্ট্রীয় নাট্যশালা আছে সেখানে নিম্নবিত্তভাবে নাট্যের অহুতান ও গবেষণা হয়ে থাকে। ১৯৩০ সালে, ওদেশের শিক্ষা-মন্ত্রক থেকে একটি ঐতিহ্যে খোলা হয়। সেখানেই গড়ে ওঠে পেশাদারী নাট্যকে দল। সেই ঐতিহ্যেই বর্তমানে রাষ্ট্রীয়-নাট্যশালায় পরিণত হয়েছে। 'গান অব মহোলিয়া', 'স্বখে বাতোর' প্রভৃতি শ্রীতি-নাট্য ওদেশে বিশেষ জনপ্রিয়। রাষ্ট্রীয়-নাট্যশালার অধীন যে-সব পেশাদারী নাট্যকে-দল রয়েছে তার শিল্পী-সংখ্যা নাকি চারশোর ওপর। এঁরা মলিয়ার, সেকলীয়র, গোপোল, শেকত্ প্রভৃতির ক্লাসিক নাটকগুলিকেও নিম্নদের ভাষায় রূপান্তরিত করে অভিনয় করে থাকেন। লোক-সঙ্গীত-সংগ্রহের বিষয়েও রাষ্ট্রীয়-নাট্যশালা বিশেষ ব্যস্ত। এ-ব্যাপারে ওদেশের কবি ও সাহিত্যিকদের উৎসাহও বড় কম নয়। ১৯৪৭ সালে মহোলিয়ার শিল্পীরা প্রাণে অহুতিত আত্মরীতিক উৎসবে, ১৯৪৯ সালে থ্যাংপেট, ১৯৫১ সালে বার্লিনের 'নির্ভাল বিথ হু-উং-সেং' বোগ যেন এ-এ কয়েকজন শিল্পী বিশেষভাবে পূরুষত হন। মহোলিয়ার সঙ্গীত-রচয়িতা ও সঙ্গীত-শিল্পীদের নিয়ে ওদেশের সাংস্কৃতিক মন্ত্রক সম্প্রতি একটি 'ইউনিয়ন'-ও গঠন করেছেন। জাতীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচারে এই ইউনিয়ন বর্তমানে বিশেষভাবে লড়ে। এঁদের 'দি মহোলিয়ান স্টপলস্ রিশাবলিক' নামে একটি ডুইকেটরী কিন্স ১৯৪২ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার 'কার্গোভ-ভারী'তে অহুতিত 'আত্মরীতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে' পুরস্কার লাভ করে।

পর্যটন ঐক্যব্রতের সঙ্গীত

১

ভাব নিয়ে আর তাহার সাথে ভাবনা নিয়ে,
হাজার কি হাজার মাইল এলাম বেড়িয়ে।
দেখে এলাম মানুষ যাদের আর পাবনা খোজ,
রেখে গেল মনে তবু নানান রঙের পৌচ।
ছোট ছোট পাহাড়গুলি দূর সবুজের—
সেখানেও উপনিবেশ দেখছি মানুষের।
সেখানেও এমনি ধারা জীবন যাপন,
উঁচুতেও নীচুর মত ভয় ও ভাবনা।

২

লঙ্কা গাছে লঙ্কা রাস্তা, মাঠে যে লালে লাল—
এক সাথেতে জমিট যেন গোটা দেশের কাল।
প্রচুর কসল—ছোটপুটে, সরিষা যব গম,—
সম্পূর্ণ তার দেখায় জমি—উল্লাস চরম!
সুত্রিকাতে উল্লসতা, 'কেনাল' ভরা জল—
দিচ্ছে দেশের রূপ ফিরিয়ে নিপুণ কৃষি বল।
স্বাধীনতা কি এনেছে? দেখতে যদি চাই—
ঘাটে মাঠে হাটে বাটে বারেক ঢোক বৃলাও।

৩

স্টেশনে নগর ভাঁসা আমরুদের কি সার!
সাথ নেটেনা দেখে কিনে—রূপের কি বাহার।
আম কেঁদে যায় দেখে যাকে—এমনি যে নিখুঁত—
তাদের দেশের লোকে কি তাই—নাম দিলে আমরুদ?
'সাহারা' বেশ বড় লেবু—অল্প তাহার রস—
কমলা লেবুর তুলা তো নয় সুমিষ্ট রস।
নারকুলে কুল আকারেতে স্বাদে চমৎকার—
কুলের-গরব করা দেখি সত্যি সাজে তার।

৪

এটা জানেন, দেশ বিনে দেশের সকল সমাজদার,—
বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ রসের ভিয়েনদার।
খেলাম কলাকান্দা এবং খেলাম ভাল পেঁড়া—
বলবে। তবু সন্দেহেতে বঙ্গদেশই সেরা।
দেবের-ভোগ্য 'শোনা হাসুয়া' ব্যাতি বহু দূর—
বহু যেন পুরী ধানের আনন্দ লাভুর।
দস্ত হলে। হস্তদস্ত, আড়ষ্ট এ জিত্ত।
'জিজিয়া'-কর বসিয়ে দিতাম হলে 'আরাজীব'।

৫

'নিয়ন' আলোয় আলোকিত হেরিছ 'কানপুর'—
সিপাহী সংগ্রামের ব্যাতি যাহার সুপ্রচুর।
এলাহাবাদ কেন আবার? প্রয়াগ বলি আজ,
হিসেন যেথায় কুলপতি ঋষি ভরদ্বাজ।
অক্ষয় বট কাম্যকূপের ঠাই সে মনোরম—
পুণ্যভোয়া গঙ্গা এবং যমুনা সঙ্গম।
সুদূরেতে জলছে ছোট কুটারে আলো—
ভবন দীপই ভুবন সাথে মুহূর্ত পাভালো।

৬

দিল্লী সহর দিল্লী নগর দেখে এলাম ফের
হস্তিনাপুর ইন্দ্রপ্রস্থ মহাভারতের।
এখানেও কাকের ডাকে করছে অতিষ্ঠ—
কবির চেয়ে ওরাই দেখি সংখ্যা গরিষ্ঠ।
সহর তো নয় স্বপ্ন দেখে ইলাম কৃতার্থ—
নয়ন ভরে দেখে এলাম ঐক্য পার্থ।
পাণ্ডবের সঙ্গে কদিন করে এলাম বাস
যজ্ঞ-হবি গঙ্গী হাওয়ায় টেনেছি নিশ্বাস।

মতন ইয়ারোপ: মতন মানুষ

মনোজ বসু

[প্রথম অঙ্ক: ৩য় দৃশ্য]

ডিটজেলের কথা অনেক শুনেছেন। মিটি হাসি সর্বত্র মুখের উপর। কথা বলতে বলতে খেমে যায়, তুল ইংরেজি বলছে মনে পড়ে হঠাৎ। অতি আন্তর একটা একটা কথা হিসাব করে বলে তখন। লাজুক অপ্রতিভ চাইনি। এ ছেলে যেমন সত্যভূগের। দুনিয়ার মতো দিকটায় নজর পড়েনি কোনদিন।

তাই বলছিলেন। ডিটজেল চুপ করে শোনে। হাসি নিতে মুখের উপর বিষন্ন ছায়া ঘনিয়ে আসে। বলে, শুনেছি চাই ?

না থাক। ভিন্ন কথা তুলি : তাতে তোমার আঙটি কিসের গো ? বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেছে ? কবে কোথায় ? কবে কবে দেখাচ্ছ বলে।

ডিটজেল বলে, বিয়ের সময় চিঠি পাঠাবো তোমায়।

—সময় থাকতে পাঠিও। উড়ে চলে আসব বিয়ে দেখতে। হনিমুন করবে তোমরা ইণ্ডিয়ায়—কলকাতায়, আনার বাড়িতে। এই আমি নেমন্তন্ন করে যাচ্ছি।

ঘাড় নাড়ে ডিটজেল : সত্যি কি আর আসছ ! আচ্ছা, দেখা যাবে সেই সময়। বাবা নেই, বাবা থাকলে কী আয়োজন করতেন আমার বিয়েয় ! তাঁর কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে যায়।

আবার বলে, বলছিলে না সংসারের ময়লা দিকটা আমি দেখিনি। শোন তবে—

নাংসিদের বড় জাঁকজমকের সময়টা। ছোট

ছেলে ডিটজেল, ইত্থলে পড়ে। বাপ ভিন্ন দলের, তাঁকে ছেলে নিয়ে পুরেছে। ক্লাস বসবার মুখে বলতে হয়—হেইল হিটলার, হিটলারের জয় হোক। জয়ধ্বনি দিয়ে পড়াশুনা শুরু। ডিটজেল কিছুই বলে না, ঘাড় নিচু করে থাকে। মাস্টারের নজর পড়ে গেল একদিন : তুমি যে বড় চুপচাপ ? বলে। হিটলারের জয় ! ছোট ছেলে সাপের মতন কৌস করে উঠল : বাবাকে যে লোক অত কষ্ট দিচ্ছে, তার জয় আমি দেবো না। ককনো দেবো না আমি।

বটে, তেঁপোনি বড় হয়েছে ! সপাসপ চাবুক, —গা কেটে কেটে রক্ত পড়ছে। দাঁতে দাঁত চেপে ছোট ছেলে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। —ককনো না, মরে গেলেও না।

সেই ছেলে ডিটজেল। শাস্ত্র হাসির আড়ালে অত ব্যথা লুকিয়ে আছে, কে জানত ! গভীর কণ্ঠে বলল, বাবা থাকলে আমার বিয়ের দিনে কত খুশি যে হতেন !

থিয়েটারে যাচ্ছি। ভাঙাচোরা বালিনে অপেরা-থিয়েটারের ঝকঝকে বাড়ি উড়িবিড়ি তুলে ফেলেছে। ইয়োরোপে দেখা যাচ্ছে অপেরা-থিয়েটারের বড় কদর। শুধু ইয়োরোপ কেন, চীন ও মধ্য-এসিয়ার দেশে দেশেও এই বস্তু। শুধু খেয়ে প'রে মানুষ বাচে না, রসের উপভোগ চাই। ভয় করেছিলেন, সিনেমা এসে থিয়েটারের টুঁটি টিপে মারবে। কোথায় ? রক্ত-মাংসের কাঁচা মানুষের অভিনয়—তার সঙ্গে টকর দিয়ে পাতে ছবি !

যাচ্ছি থিয়েটারে সকলে মিলে। ডিটজেল নিয়ে যাচ্ছে। ফুটিটা আজ তার বাড়াবাড়ি রকমের। কানে কানে বলে, কানে দেখতে চাচ্ছিলে, আজকে আসছে সে থিয়েটারে। একসঙ্গে পালা দেখব।

তাই নাকি ? উঠানে নেমে এসে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি : দাঁড়াও ডিটজেল এক নিমিট। দৌড়ে ঘরের ভিতর গিয়ে জয়পুরি কাজ-করা একটা কোটো পকেটে পুরলাম। বই ছাড়াও এসব বস্তু এনেছি ছ-নশটা। আনতে হয়—সুদুই এক তরফের আতিথা ও আদর-ভালবাসা ভোগ করব, এমন মতলব ভালো নয়। অতি সামান্য একটা বস্তু হাতে তুলে দিলে কী রকম করতে লাগে, সে যদি দেখতেন !

কনে থিয়েটারের বরাণ্ডায় দাঁড়িয়ে। সতৃষ্ণ চোখে পথ চেয়ে আছে। কলেজে পড়ে। নীলোৎপলের মতো। চোখের মনি, বড় মিষ্টি মেয়ে। নাম হল ইনগেবোর্গ স্কিমিড (Ingeborg Schmidt)। শাখা-শাড়ি-সিঁহুর পরিয়ে পায়ে আলতা দিয়ে কমলাবাগা নাম রাখলে বোমানান হয় না। পালকি থেকে নেমে কুঝুঝু গুজরিপকম বাজিয়ে মাথায় আধ-ঘোমটা—উঠানে গিয়ে যদি দাঁড়ায় ঘরবাড়ি আলো হয়ে যাবে।

কোঁটা হাতে দিলাম, সিঁহুরকোঁটা দিয়ে নতুন বউয়ের ঘেমন মুখ দেখে—সুদূর ভারতের অজানা বন্ধু এই অতি সামান্য উপহার দিচ্ছে তোমায়। মেয়েটা জীবনের কথা বুঁজে পায় না, অতিভূতের মতন চেয়ে রইল। বললাম, খুব সুখী হবে তোমরা জীবনে।

ডিটজেলের তুল ইংরেজি পুলকের আতিশয্যে একেবারে অবোধ হয়ে উঠল। বলে, তাই বলছ তুমি ? ঠিক তাই হবে, তোমার কথা ফলবে নিশ্চয়।

ভেবেছে কি বলুন তো ? প্রাচ্যদেশের মানুষ, কৃত-ভবিষ্যৎ নথদর্পণে—ওদের ললাট গণনা করে বলছি, এইটে ধরে নিল বোধ হয়।

মুশকিলে ফেলল। অতিথি আমাদের টিকিট একেবারে পরলা সারির। ওরা ছুটিতে, নিছতে বসার জন্ত হোক কিংবা কম পরসার জন্তেই হোক, বেশ খানিকটা পিছনের টিকিট করেছে। ভাল দেখা যায় না সেখান থেকে, স্তন্যতণ্ড পাওয়া যায় না তেমন। ওদের অস্থবিধা নেই—দেখতে এসেছে নিজেকে, এ-ওর মুখে তাকিয়ে থাকবে ; স্তন্যবে প্রাণ ভরে নিজেকে বিসফিসানি কথা। কিন্তু ভরসা করে আনায় ডিটজেল বসিয়ে দিল মেয়েটার পাশে : আলাপ-পরিচয় করুন। এবং নিজে চলে গেল আমার সামনের সারির সিটে। আলাপ... তাই তো কি নিয়ে আলাপ চালাবেনা যায় কলেজের ছাত্রী এই তরুণীর সঙ্গে ? কি পড়ো তুমি, বাড়িতে কে কে আছেন ? ইণ্ডিয়ান সম্পর্কে জানা আছে কিছু ? বিয়ের পরে চলে যাবে একবার ইণ্ডিয়ায়, তোমার বরকে বলে দিয়েছি। কলকাতায় গিয়ে আমার কুঁড়েঘরে উঠো। একেবারে লেকের উপরে—এখানে হনিমুন হবে। পাঁচ আঙুল দিয়ে ভাত খাই আমরা। ভয় নেই, সমস্ত শিখিয়ে দেবো। মজা পেয়ে যাবে তখন, কাঁটা-চামচে ধরতে আর মন যাবে না।

এমনি ছ-পাঁচ কথা। দুটো-পাঁচটা কথায় ফুরিয়ে গেল। বুদ্ধিমতী শাস্ত্র স্বভাবের মেয়ে—কথা সামান্যই বলে, হাসে কেবল নিটিনিটি। নাটকের একটা অঙ্ক শেষ হতেই টুক করে নিজের প্রথম সারিতে গিয়ে চোপ বসলাম। ডিটজেল তখন প্রিয়াকে নিয়ে করিডরে ঘুরছিল। হলে চুকে বলল, এ কি ? ভারি অগ্ন্যায় কিন্তু—

—থিয়েটার দেখতে নিয়ে এলে। আমি যে কিছুই দেখতে পাইনে ঐ পিছন থেকে।

থিয়েটারের পরে হোটেল অবধি এলো আমাদের সঙ্গে। —খেয়ে যাবে আজ আমাদের এখানে, নয়তো কিছুতে যেতে দেবো না। তাই হল, ছুটো টেবিল জুড়ে নিয়ে একসঙ্গে বসলাম সকলে। খাওয়ার পরেও টেবিল ছাড়ি না। গল্প, গল্প। ঘড়ির

আওয়াজে চমক লাগে : ওহে ডিটজেল, ওটো তোমরা, এগারোটা বাজে ।

ডিটজেল কানে নেয় না : এগারোটা তো কি হয়েছে ? আওয়ারগ্রাউও ট্রেন রাত দুটো অবধি । বড়জোর আধঘণ্টা লাগবে আমাদের পৌঁছুতে । একে পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ি চলে যাবো, অন্য কোন কাজ নেই ।

আরও ঘটানাকৈ কাটিয়ে দুটিতে মধুগুজন করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ।

খবরের কাগজের অফিস দেখাতে নিয়ে গেল । কাগজের নামের বাংলা করলে পাড়াবে 'নতুন জার্মানি' (Neues Deutschland) । বিরাট অট্টালিকা, অগণ্য বিভাগ । সরকারের পরিচালনা । দরজায় পুলিশ মোতায়েন : ইচ্ছে হলেই যে ছুট করে ঢুকে পড়বেন, সেটা হচ্ছে না । অতি-সাবধানী এরা, অহরহ সতর্ক । অকারণ নয়, সেটাও বুঝি । মাথার উপর যেন খাঁড়া ঝোলানো আছে, তিলেকের অন্তর্কর্তৃত্ব দেবে ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে । দুটো দিনে আমাদের হাঁপ ধরে যায়, আর বারোমাস তিরিশ দিন যাদের ঘরবসত তাদের দশটা বিবেচনা করুন । কেবল জার্মান বলে নয়—ইয়োরোপের অর্ধটা দেশে কিংবা বোরাঘুরি করে এলাম—আমার ধারণা, সম্ভ্রাহকুল কমবেশি সকলেই । বেপারোয়া এর মধ্যে সুইজারল্যান্ড । ব্যাপার-বাণিজ্য দেশার ছড়িয়ে বসেছে—লড়াইয়ের মধ্যে কোন দিন মাথা গলাতে যায় না ।

যাকগে । বড় টেবিলের চতুর্দিকে চারিয়ে বসেছি । সম্পাদকীয় বিভাগের এক-একটি মানুষ আমাদের ঝাঁকে ঝাঁকে ভাঁজে দিয়েছে । চা-কফি কেক—ফ্রাণ্ডউইচ ফল-পাকড়ের যথাবিধি সঙ্গতি হচ্ছে । এবং নানান কথাবার্তা, যথাসম্ভব খবরাখবর নিচ্ছি ।

—আপনাদের তো সরকারি কাগজ । ব্যক্তিগত মালিকানার কোন কাগজ আছে ?

—নেই । তবে সমিতি আছে বিস্তর, তারা অনেক কাগজ বের করেছে । খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিসন—যাতে জনমত গড়ে ওঠে, সে সব প্রতিষ্ঠানে সরকারি কর্তৃত্ব । আমাদের নীতি এই ।

—দুই জার্মানির মিলনের আশা করেন কত দিনের মধ্যে ?

—সেটা শুধু আমাদের উপর নির্ভর করছে না । আমাদের প্রোগ্রাম হল বৃহস্মতের মধ্য দিয়ে শান্তির পথে একীকরণ । লড়াইয়ের সাজসরঞ্জাম আমরা অনেক কমিয়ে দিয়েছি । কিন্তু অপর পক্ষ শুড়পে বেড়ালে মিলমিশ হওয়া তো মুশকিল । বয়্, গবর্নমেন্ট আমাদের স্বীকার করেনা, যোল আনা কর্তৃত্ব চায় আমাদের উপর । কিন্তু বৃহতে পারি, আমাদের সোশ্যালিস্ট গবর্নমেন্ট ও-ভরফের গণহাদুঘকে প্রভাবিত করছে । লড়াইয়ের কৃত্রিম আবহাওয়া জিইয়ে রেখে ওদেরই বরফ বেশি দিন টিকে থাকে মুশকিল ।

এরই মধ্যে দুঃখ করে বলে, বন্ধে তোমাদের রাষ্ট্রপুত্র আছে । তাদের প্রোগ্রামাণ্ডা-যন্ত্রের সমস্ত কোলাহল তোমাদের কানে যায় । আমাদের সঙ্গে তো আধা-সরকারি সম্পর্ক—হালফিল এদেশে-ওদেশে ব্যাপার-বাণিজ্যের কিছু ব্যবস্থা হয়েছে । এই মাত্র । অথচ তোমাদের নীতি আমাদেরও নীতি ; তোমাদের পথ আমাদেরই । গোয়া ইন্ডিয়ায় একটা অংশ, পর্তুগিজদের কিছুমাত্র দাবিদাওয়া নেই—এই কাগজেই আমরা কতবার লিখেছি । ভারতীয়েরা আমাদের চেয়ে হীন, কোন সূত্রে কেউ একথা উচ্চারণ করলে আইনের বলে তার শাস্তি হতে পারবে—জানো এ খবর ?

বার্লিন আকাদেমি অব সায়েন্সের একটা হল ও গোটাকরেক ঘর নিয়ে ভারত-চর্চা বিভাগ । ডক্টর রুবেন হলেন কর্তা । লড়া-চওড়া দেহ, প্রশস্ত কপাল—সাহেব হলেন অতিরিক্ত সংস্কৃত পড়ার দরুনই

বোধ হয় মুখের উপর টুলো-পাতিতের ছাপ পড়েছে।
ডক্টরের কোটের উপরে নামাবলী ঝুগিয়ে দিলে
বিন্দুমাত্র বেমানান হবে না। ভারতে, এবং
কলকাতায় এসে গেছেন বহুর ছুয়েক আগ—
সেই সব গল্প হল। ছাত্র-ছাত্রী সবাই ভারত সহজে
অন্ধাবান, ভারতের কথা জানতে বুঝতে চায় ভাল
করে। খরচপত্র করে নথিতে ইংল্যান্ড পড়তে
আসবে কেন? আমাদের পেয়ে একেবারে বর্তে
গেছে,—আমাদের সঙ্গে বাতর্জিত করে কিছু দুর্গত
ভারত-রস পান করতে চায়। কাছে এসে বসবার
জন্ত, ছুটে। কথা বলবার জন্ত ছেলেমেয়েগুলো
আকুলিবিকুলি করছে। বালিন শহরের কেন্দ্রে হঠাৎ
এক বিচিত্র ভারত-পরিবেশ। দেশে ঘরে কিরে
এসেছি, এমনিধারা মনে হচ্ছে। এক হাসকুটে মেয়ে
ভাষা—হিন্দি অতি চমৎকার শিখেছে; ইংরেজিও
ভাল বলে। কারিন গ্রুনার (Karin Gruner)—
একেবারে ছেলেমানুষ; অনেক দূরের গ্রামে বাড়ি,
বালিনে একা থাকে। ঢালাক নেচে, কথাবার্তা বড়
মিষ্টি, কলকাতায় আসতে চায়। —চিঠিপত্র দেবেন
কলকাতায় ফিরে গিয়ে, ভুলে যাবেন না। লখা চিঠি
চাই—কলকাতার অনেক কথা থাকবে তাতে। আর
এক মেয়ে—গিসেলা বোরিশ (Gisela Borisch) :
আরও একটি ইভা ট্রিয়লভ (Eva Triallv)।
ঠিকানা আর নাম লিখে দিয়েছে আমার খাতায়
ভারতীয় লেখকের কাছ থেকে কোন একদিন দু-ছত্র
পাবার আশায়। দেবার সংস্কার শিখছে। একালের
ভাষাও শিখতে চায়, কিন্তু শুধুমাত্র একটি হিন্দির
মাষ্টার আছেন—ডাক্তার আনসারি। পাকেচক্ষে
ভ্রমলোকের এই অবস্থা—ছাত্র পড়াতে হবে কোনদিন
স্বপ্নেও তাবেননি। টি-বি হয়েছিল, চিকিৎসার জন্ত
চেকোশ্লোভাকিয়ায় আসেন। ওখানকার হাস-
পাতালের নাম আছে। রোগ সেরে গেল তো কী
করা যায়—এক ডাক্তারি কলেজে ঢুক পড়লেন।
পাস করে বেকলেন ডাক্তার হয়ে। কিন্তু লুক্কের
মাছুষ, হিন্দি অল্পবিস্তর জানা আছে, য়ানিতাসিটিতে

হিন্দি পড়ানোর চাকরি ছুটে গেল। প্রাগ থেকে
এখন বালিনে। দেশে ফিরবেন আরও কিছুকাল
কাটিয়ে।

টমাস সিলবারেস্টিন (Thomas Silberestín)
ছেলেটি বাংলা শেখার জন্ত পাগল। নিজের চেষ্টায়
একটু আর্থটু শিখেছে। কষ্টে-কষ্টে ছাপা বইয়ের
ছ-চার পৃষ্ঠা পড়ে ফেলতে পারে। এমন আরও
আছে। কাতর হয়ে বলে, বাংলাভাষার লেখক
এসেছে তো বাংলা শেখার উপায় কিছু বাতলে দিয়ে
যাও। আমার নিজের ভাষা বাংলা, এবং ভালমানুষ
বাঙালি পাঠকদের অতি সহজে ভোলানো যায়, এই
ছুটি কারণে বাংলা লিখি—তাই সেখান আনায় একে-
বারে লাহানশা ধরে নিয়েছে। মুখের একটি বাক্য
ছাড়লেই বালিন শহরে তৎক্ষণাৎ বাংলার চেয়ার-
স্থাপনা হয়ে যাবে! হোটেলের ঠিকানা আর ঘরের
নম্বর নিয়ে নিল, পরদিন সকালে সেই অতদূর ধাওয়া
করেছে। —বাংলা শেখার কোন ব্যবস্থা হতে পারে
কিনা বলো। আমার একটা বই দিয়ে দিলান তার
হাতে। আর কি করতে পারি—কী আমার ক্ষমতা!
ছনিয়ার কত বেশের কত লেখক নিয়ে দোরগোল,
হতভাগা আধুনিক বাংলা-লেখকের একটি নাম
অবধি কেউ জানে না। দেশে দেশে এই কাণ্ড
ঘেঁষি। সেই এক বৃদ্ধা টেগোরে—তার পরে
একেবারে উৎখাত হয়ে গেছে বাংলার সাহিত্য।
হাসবেন না, এমন প্রশ্ন পেয়েছি বিদ্বজ্জননের মুখেও।
অবাক হয়ে বলেছেন, তোনাদের সাহিত্যের অত বড়
ঐতিহ্য নিঃশেষ হয়ে যায় কেমন করে?

মরীয়া হয়ে আমি এক চিঠি পাঠালাম
আকাদেমির সেক্রেটারির নামে : ক্রটিহীন
তোমাদের আতিথ্য। কিন্তু এত পাহাড়-সমুদ্র
ভিড়িয়ে এসেছি শুধুমাত্র খানাপিনা এবং ছ-পাঁচটা
ভাল জিনিষ দেখে মধুবাক্য উদ্গিরণের জন্ত নয়।
স্বচ্ছাটা ছ-ভরকের হলোই মিভালি পাকাপাক
হবে। আমরা কি করছি তারও কিছু পরিচয়
পাওয়া উচিত। ইংরেজি ছাড়া বুঝবে না—তা

ভাগ্যবশে গোটা চারেক গল্পের ইংরেজি তর্জমা সঙ্গে আছে। একটি অত্যন্ত ছোট—সুযোগ দাও, দ্বীপী-সমাজে পড়ব। অথবা রেডিও বা অন্ত কোনখানে। ছ-সাত মিনিটের বেশি লাগবে না।

এ চিঠি আমাদের গল্পের কেউ জানেন না। ডিউকলের হাতে দিয়েছি : নৌছে দিও ভাই। সুবিধা হল, সেই রাতেই এক মজলিস কবি স্টিফান হার্মলিনের (Stefan Hermlin) বাড়ি। রাতের বালিন—নির্জন অরণ্য-ভরা শহরের একটা দিক। সেই অরণ্য ভেদ করে ভিন্ন পাড়ায় গিয়ে উঠলাম। এই প্রান্তে কবি-নিয়য়।

প্রবীণেরা আছেন, হালকিলের ছোকরা লেখকও অনেক এসেছেন। পরিচয় এবং ছ-দশটা কথা-বার্তার পর কবিতা পড়া শুরু হল। এটাই আসল বাপার আজকের আসরের। একটা পড়া হয়ে যায়, ইংরেজি তর্জমায় নোটামুটি ভাবটা বুলিয়ে নেন। অনেক বেদনা ও রক্তক্ষয়ের পর নতুন জন্মিন জন্ম নিচ্ছে—ইতিহাসের বহমান ধারা উন্টো-নুখো পাক নিয়েছে। একালের লেখায় তারই প্রতিচ্ছায়া পাই। আমাদের স্বাধীন-মশায় গোটা দুয়েক হিন্দি কবিতা পড়লেন—পড়া নয়, একরকম গান গেয়ে শুনানো। একটা লাইন হয়ে যায়, ইংরেজিতে মর্মার্থ বোঝান। প্রচুর তারিফ কুড়ালেন।

অধনের পালা। বোমো উশে প্রস্তাব করলেন, হের বনু গল্প পড়বেন এইবার। আমার সেই চিঠি লেখার ফল। এবং যা আলফা, আপত্তি উঠল আমাদেরই গল্পের ভিতর থেকে। —উহ, বনু মশায় বাংলাদেশ থেকে আসছেন, টেগোয়ের কবিতা আবৃত্তি করুন একটা।

আপত্তি টিকল না। রাও নেভেচুচেড়ে দেখেছেন আমার গল্পটা, অভয় দিলেন : সময় বেশি লাগবে না, গল্প পড়ায় দোষটা কিসের ?

অতি-ছোট গল্প আছে আমার কতকগুলো, তারই একটা। ইংরেজি হয়ে কাগজে বেরিয়েছিল। সেই

কাগজের কপি ছিল সঙ্গে। ভয়ে ভয়ে পড়ছি। নমুনা অপছন্দ হলে এরা ভাববে, গোটা বাংলা-সাহিত্যই বৃষ্টি এমনি যাক্কেতাই। পড়া হয়ে গেছে, তখন আনি আরও ঘাবড়ে যাচ্ছি। কী সর্বনাশ, এসব কি বলে! ঠাট্টা—না কি অতিথির খাতির ? ডক্টর আনন্দ জুইধ—অতি প্রবীণ ঔপন্যাসিক, আকাধেমির চেয়ারম্যান ছিলেন যিনি এককালে —এমন ভাষায় বললেন যে মনে মনে মাথা খুঁড়ছি, ঘরের মধ্যে একুনি দিখা হোক, আমি তদ্ব্যেবে প্রবেশ করি। বলছেন, বাংলার গল্প এমন উচ্চতর।

ইতিমধ্যে সামলে নিয়েছি। আর—তখন ছাড়ব কেন ? —এ আর কী দেখেন, আরও বহুতর আছেন, তাক্কেব কলম তাঁদের। এই যে গল্প—আমারও এটা সর্বোত্তম নয়। হাতের কাছে পেয়েছি—আর আকারে ছোট, সেইজন্য শুনিতে দিলাম।

বোমো উশে উঠে দাড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করেন : কবিতা হল, গল্প হল—আমরা উপন্যাস লিখি, এইবার তবে উপন্যাস পড়া হবে আমাদের। বেশি নয়—আমার একটা আর আনন্দের একটা।

হাসি উঠল। রাত আড়াই প্রহর। মজলিসের ইতি এইবারে। কবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার লাইব্রেরি দেখাচ্ছেন। কোন একটা বিশেষ ঘর নয়, সারা বাড়ি ছড়ানো বইয়ের আলমারি। একতলায়, দোতলায়, শোবার ঘরে, খাবার ঘরে, বারাগায়, এমন কি শিঁড়ির চাতালের উপরে। তার মধ্যে গোটা দুই-তিন আলমারি ঠাসা সংস্কৃত বই—জর্মন টীকা-টিগ্ননী। যেহেতু আমরা ভারতীয়, কবি ক্রমাগত আমাদের সেই দিকে টানছেন। ‘ভাবচ্ছন্দ শোভতে—’ ইত্যাদি নীতিবাক্য শ্রবণ করে আমরা পাকসাঁট মারছি। ক’টি মেয়ে ওদিকে আমরা ডাকছেন : গল্প তো শোনালে—এবারে ইংরেজিতে নয়, বাঁটি বাংলার একটা কবিতা বলো। টেগোয়ের

কোন কবিতা। মানে বুঝ না, বুঝতেও চাটনে—
আওয়াকটা পাবে।

বেশ ভাল লাগছে। বাংলা সাহিত্য একেবারে
গোলায় যায়নি, এই ক'টি মানুষ অন্তত কিছু
জানলেন। পরের দিন আরও কিছু প্রমাণ পাওয়া
গেল। ব্রেকফাস্টের পর সন্ধ্যা বেরিয়েছিলাম
লিভেলের সঙ্গে। স্ট্যালিন-আলি—পূর্ব-বালিনের
ইঙ্গুপুতী, দরকারি বেরদকারি হাজার-লক্ষ বস্তুর
বাপার-বাগিছা দেখানটায়। অধম আদার ব্যাপারি
মাত্র, স্টুট-মুতা এবং গোটাকয়েক বোতামের
প্রয়োজন। আমার বোতাম ছিঁড়েছে। কাল
বেরিয়ে যাচ্ছি বার্লিন ছেড়ে, তার আগে মেরানভের
প্রয়োজন।

অর্ধেক পথ গিয়ে লিভেল বলে, পাসপোর্ট
নিরে এসেছ? পাসপোর্ট ছাড়া জিনিষ দেয় না।

—এই রে!

লিভেল অভয় দেয়, ফিরতে হবে না। আমার
কার্ডে নিয়ে নেবো। স্টুট বলেই হবে, ক্যামেরা-
ট্যামেরা হলে হত না।

দাম দিয়ে জিনিষ পকেটে পুরে বেরিয়ে আসছি,
দোকানের একটা মেয়ে হস্তদণ্ড হয়ে ডেকে ফিরাল।
ভুল হয়ে গেছে, কার্ড না দেখেই জিনিষ দিয়ে
দিয়েছে। কার্ড দেখিয়ে যাও।

খন্ডের ভিড়ের ভিতর ভুল হওয়া বিচিত্র নয়।
কিন্তু ভাবছি, অষ্টপ্রহর মানুষ অবিবাসের
আবহাওয়ার সতর্ক হয়ে চলাচল করে, জীবনের
রস-কষ কিছু যে আর রইল না এদের পোড়া
ইয়োরোপে।

আরও কিছু ঘোরাবুরি করে দোকানপাট দেখে
জিনিষপত্র নেড়েচেড়ে ফিরে এলাম। বেলা
হয়েছে। ত্রীমতী চারীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বার্লিনে
এসে। স্বামী বহুর বড় এডভোকেট। ত্রীমতী,
বড়দূর বুকেত পাড়ি, এখানে আছেন সমাজ-সেবার
কাজকর্ম নিয়ে। সাধু মহিলা, কথাবার্তায় মন

প্রসন্ন হয়, আজ দুপুরে সমাদরে তিনি আমাদের
খেতে বলেছেন। ততক্ষণ কি করা যায়—ঘরে ঢুকে
খাতা টেনে নিয়েছি ছ-চার ছত্র টুকে রাখার মতলব
করে।

লিভেল টোকা দিল পরজায়: মাপ করো,
তোমার বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাত করলাম। কাগজের
লোক এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

খবরের কাগজ নয়, সাহিত্য ইত্যাদির
পাঁচশিলশিলি কাগজ, হুগার হুগার বেরোয়। নাম
হোচেন-পোস্ট (Wochenpost)। বিস্তর প্রচার,
রক্তের মধ্যে সকলের মেরা।

বলে, ভাল একটা গল্প পড়েছ কাল। তাই
শুনে এলাম।

—পড়েছি একটা বটে। কিন্তু হুল শুনছে।
ভাল নয়, অতিশয় মন্দ।

ওরা হেসে বলে, তা সে যাই হোক। গল্পটা
চাই। জর্মানে তর্জমা করে কাগজে ছাপবে।
সেইজন্তে এসেছি।

অনেকক্ষণ গল্পগুস্তব হল। ভারতের সাহিত্যের
সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়। বলে, ভারতের গল্প
এর আগে না পেয়েছি এমন নয়। কিন্তু লেখকরা
কেন জানি ভেবে বসেন, সমস্তার গল্পেরই কদর
আমাদের কাছে। তোমার এই ছোট্ট গল্প তো
রাখছি, মধ্যবিস্ত জীবনের একেবারে ঘরোয়া কোন
গল্প দিতে পারো?

তা-ও ছিল। 'একদা নিশীথ কাল'র ইংরেজি
তর্জমা। দুই গল্প ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম তো
জর্মনির মকমলে। পরের ব্যাপার শুনুন।
ন-দিনের দিন বার্লিনে ফিরলান হাজার হাজার
মাইল ঘুরে। এসে এক চিঠি—এ কাগজ থেকে
দিয়েছে। 'একদা নিশীথ কাল'র তর্জমা হয়ে
গেছে, ছেপে বিক্রি। দক্ষিণ পাঁচ-শো মার্ক অল্প
ঠিকানা থেকে নিয়ে এসে। ছোট্ট গল্পটা পরে
যাবে। দেশে ফিরে গিয়ে অল্প লেখকের লেখা
পাঠিও। এবং তোমার নিজেরও। ইত্যাদি।

টাকার দরকার ছিল। জরনিয়ে এসে কাননের প্রভৃতি হু-পাঁচটা। যান্ত্রিক জিনিষ নেবো না, কেনন করে হয়! বেমকা ছুটে গেল। ওদের আটচল্লিশ মার্কে নাকি একশো। টাকা—তবে তো বিস্তার হয়ে গেল একটা গল্পেই।

ঠিক ত্রুপুরে ঐমতী চারীর বাড়ি খেতে চলেছি। শোনা গেল, বিয়ের বাধিকী। স্বামী বেশে রয়েছেন তো দেশের মানুষজন ডেকে খাইয়ে নিচ্ছেন। অতএব কিছু হুস কিনে নেওয়া গেল।

ঐমতী মিরানিখ বান, কিন্তু ভোজে বাছবিচার নেই। গুরুতর আয়োজন—ভারতীয় রান্নায় একটা দিন মুখ বসলানো গেল। এই উল্লাটে যে ক'টি ভারতীয় পাওয়া যায়, সকলকে ডেকেছেন। এবং নিজের যে ক'টি বিশেষ বন্ধু ও বাঙ্কবী।

লজ্জার সেই ডাক্তার আনসারি এসেছেন। সংসার করে বসেছেন, সেটা এই টের পেলাম। বউ হল ডাশা। কাল দেখলাম ডক্টর কুবেনের ইংল্যান্ডের ক্লাসে—তখন ভেবেছি নিরীহ ছাত্রী শুধুমাত্র। চেকোস্লোভাকিয়ার মেয়ে—বড় হাসে। একটু কথ্য বলে, আর হেসে ফেলে। হুঃখের কথায় হাসি, ভাবনার কথায় হাসি। হাসি তার নিঃসারের নতো। নিজেই পরিচয় দেয় : জানো না বুঝি—ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, আনসারি আমার স্বামী।

—কদিন হল বিয়ে ?

—পাঁচ মাস। খুব ধানিকটা হেসে নিয়ে বলে, গায়ের মেয়ে—প্রাণ থেকে অনেক দূরে বাড়ি। শহরে থেকে স্থানিতাসিটিতে পড়তাম। ইণ্ডিয়ায় সবচেয়ে জানতে বুঝতে চাই, চুকে পড়লাম হিন্দির ক্লাসে। আনসারি মাস্টার—পাঁচ বছর পড়াশুনোর পর পুরোপুরি ডাক্তার হয়েও মাস্টারি করছে, স্থানিতাসিটি ডেকে ভাল মাইনের চাকরিটা দিয়েছে। হস্তায় বটাকয়েক হিন্দি শেখায়। চেক বলতে পারে আমাদের চেয়েও ভাল। এতদিন

ধরে আছে আর খুব ঢালাক-চতুর, কেন পারবে না বলে। ?

খিলখিল করে আবার একটোটে হেসে নেয়। বলতে লাগল, হিন্দি শিখতে গেলাম—মরণ হল আমার। তারপরে, বুঝতে পারছ, বিয়ে হয়ে গেল। দেখ, আমার নাম কিন্তু ডাশা নয়। সংক্ষেপ করে সবাই ঐ বলে ডাকে। শোনান্ধে জরনের নতো। বালিন স্থানিতাসিটির সঙ্গে হু-বছরের চুক্তি করে এখানে হিন্দি পড়াতে এসেছে, আমিও সুবিধা পেয়ে কুবেনের কাছে শিখছি। তারপরে ইণ্ডিয়ায় চলে যাবো। বড় গরম দেশ তো ইণ্ডিয়া ?

—বালিনে গরম বলে আইচাই করছ, আমাদের সে গরম ভাবতে পারবে না। বিশেষ করে তোমার শওরবাড়ি ঐ লক্ষ্যে অফলটায়।

ডাশা মুহূর্তে বলে, সে যাই হোক, যেতেই তো হবে নিজের দেশে। গরমের জন্ত ভাবিনে। তোমরা সব রয়েছ, আমিই বা পারব না কেন ? হু-দিনে অভ্যাস হয়ে যাবে। ভাবছি কাজকর্মের কথা। ও যদি কাজ পায়, আর আমিও একটা পাই, তবে আর ভাবনা থাকে না।

ইন্দোনেশিয়ার একটি মেয়ে ঘরকন্নার ব্যাপারে ঐমতী চারীর ডানহাত। বসে কখনো ছুটনো কোটে, ছুটোছুটি করে কখনো এটা সেটা নিয়ে। বড় ঘরের মেয়ে—নাকি পুরানো এক রাজ-পরিবারের। সাজপোশাকে কিন্তু ঠিক উষ্টো, বংশ-পরিচয়ে লক্ষ্য পায়। সমস্ত ছেড়েছড়ে ঐমতী চারীর কাজে ভিড়ে গেছে। আলাপের মুখে আমাদের নিমন্ত্রণ করে : যেও ইন্দোনেশিয়ায়, আমাদের বাড়ি থাকবে। ঠিকানা দিল—জাকার্তার কাছাকাছি একটা জায়গা। লিখেও এনেছিলাম। ভুবনের কত জায়গার মানুষ ঠিকানা দিয়েছে—সেই ভিড়ের ভিতর কোনখানে মেয়েটার নাম-ঠিকানা ওলিয়ে গেছে। নানটাও আজ মনে নেই।

বালিন ছেড়ে বেরাছি। হাজার হাজার মাইল

মুহুর। সকালেবেলা, তায় রবিবার। ঘুম ভাঙেনি এখনো শহরের। মার্কস-এঙ্গেলস পার্কে রঙ-বেরঙের ফুল মাথা হুলিয়ে এ-একে তারিফ করছে বৃষ্টি। নদী পাশ হয়ে এসলাম। গাছপালায় ভরা পথ। লড়াইয়ে নিহত সোবিয়েত-সেনাদের নামে বিশাল পার্ক ও মশুমেন্ট। সাদা রঙের ট্রাম, পুরানো টঙ্কর। ছুনিয়ার বিস্তার জায়গা দেখলান, কলকাতার ট্রামের মতো কোথাও নয়। বড় বড় কারখানার পাশ দিয়ে ছুটেছি, খেলার ফ্লোড় লেগে গেছে এরই মধ্যে। পরিষ্কার চারিদিক, কুটো-গাছটা পড়ে নেই পথের কোনখানে। সব কারখানার সামনে লাল পশ্চাৎপটের উপর হলদে বা সাদা হরকে লেখা নানা স্লোগান। তরুণী বেয়েটা এই সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে একা একা। মেঘলা আকাশ। বিশাল কবরখানা অনেকটা জায়গা জুড়ে। পাসপোর্ট-কন্ট্রোল—পাসপোর্ট দেখে চেহারা সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে এক এক সেলাম হুকছে।

একই এরোড্রোমের দুই ভাগ—একটা সোবিয়েতের, একটা জর্মনির। ফসলের ক্ষেত চলে গেছে যতটা দূর অবধি নজর চলে। আমাদের বিলে কচি ধানবন ঘেমন দেখতে পাই আবারের প্রথম। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলেছি এবার, পিচ-দেওয়া অতি সুন্দর পথ। বড় বড় পাইন গাছ, তলার কুপসি জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে কাঁচাপথ এনিক-সেদিক চলে গেছে।

ডাইনে ড্রেসডেনের পথে বাকলাম। আটোবান—অর্থাৎ বেপরোয়া মোটর ছুটানোর পথ। মাঠের মাঝে মাঝে গ্রাম,—রাভা টালি-দাওয়া ঘরবাড়ি, গির্জার লম্বা চূড়া উঠেছে আকাশ হুঁড়ে। গির্জা ঘিরে এক একটি গ্রাম, গ্রামের মধ্যে ইলেক্ট্রি সিটি। মধ্য-ইরোরোপের সকল গ্রামের মোটামুটি এই চেহারা। ল্যামল ফসলের ক্ষেত দিকপ্রান্ত অবধি—খামারবাড়িতে এই উঁচু ঘর একটা, ভিতরে খড় বোকাই। আবার জঙ্গল। একটা জিনিষ দেখছি

—জঙ্গলে মানুষের প্রচুর গতিগম্য, তলা সাফ-সাফাই। আড়াআড়ি রাস্তাগুলো উঁচু হয়ে উঠে মাথার উপরের পুল দিয়ে এপার-ওপার গেছে, ছ'পথের গাড়িতে ধাক্কাধাক্কি না হয়। সেই পুল ভেঙে গিয়ে বাতিল হয়ে গেছে অনেক রাস্তা। বোমার ভেঙে দিয়েছে। নতুন পুল বানিয়েছেও অনেক ইতিমধ্যে।

বালির অকল, একটুকু মাটি খুঁড়লে বালি। বালি খুঁড়ে গাদা দিয়ে রেখেছে জায়গায় জায়গায়। এই ধরনের বালি নাকি ছুনিয়ায় খুব কম মেলে। লেন বানাতো লাগে, জর্মনির লেন্সের এমন কদর সেইজগৎ।

শ-ডিনেক বাইল এসে ড্রেসডেন। নাম শোনা আছে নিশ্চয়। কিছু না হোক, ড্রেসডেনের আট-গ্যালারি। অতৃতপক্ষে গ্যালারির ছবি একখানা—রাকয়েলের ম্যাডোনা। স্বাধীনতার পরে ভারতের আর কোন লেখক এদিকে এসেছেন, বলতে পারিনে। এই আনরাই হয়তো। রূপকথায় রাকসে-খাওয়া পুরীর গল্প শুনেছেন, নমুনা কিছু দেখে যান ড্রেসডেনে। রাকপথের দুধারে অট্টালিকা। ভেঙেচুরে জঙ্গল হয়ে আছে। দিন-দুপুরে যেতেও গা ছনছন করবে। সাড়ে সাতশো বছর ধরে গড়ে-তোলা প্রাচীন শহর এক রাতে চুরমার করে দিল। তেরোই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পুরো রাত্রিও নয়, সন্ধ্যা থেকে বারোটা-একটা। আর মানুষ মরল সত্তর হাজার। অত কম সময়ের ভিতর বোধকরি সত্তর হাজার পিঁপড়েও মারা যায় না। তাহলে বুঝুন, মানুষ কত সব কারুগী বের করেছে ভুবনের তার কমাতে। আরও করছে।

একটা বস্তু ড্রেসডেনে—জুইঙ্গার। জর্মনে যার মানে হল ঘেরা-উঠান। আট-গ্যালারি যে অট্টালিকায় তারই উঠান একটা। উৎসব ব্যাপারে রাজবাড়ির মেয়ে-বউরা ঘেরা-উঠানে জমায়েত হতেন। দোতলার অনেকগুলো ঘর নিয়ে ঘড়ি ও জ্যোতিষিক জিনিষপত্রের মিউজিয়াম। ঘড়ির



ফ্রেডেরন : সেন্ট ল্যাভরে ঘর বের গড়ে-তোলা প্রাচীন শহর এক হাতে চুম্বকার করে ছিল। তেথোই ফ্রেডেরন, ১৯৪৭।

সংগ্রহ বাগুয়ড্রি-সূর্যঘড়ির আমল থেকে। পুরানো কালের গ্রেব-ম্যাপ এবং গ্রেনকক্স দেখার সেকেন্দ্রে দাদামাটা যন্ত্রপাতি। এসব বস্তু ছুনিয়ার আর কোথাও দেখব না।

এল্‌ব নদী ধরে স্টিনারে চললাম পিলনিজ। নদীর তিক উপরে স্তাননি রাজাদের বাগানবাড়ি এটা। চীনা ধরনের অট্টালিকা, চীনের স্থপতি এনে বানানো। রাজরাজ্জার কাণ্ডই আলাদা, বিবরণ দিতে গেলে তো মহাভারত হয়। থাক এখন।

তিন দিনের দিন ছুটল আবার মোটর। বিদায় ফ্রেডেরন। ছুটেছি মাইসেন-মুখে। পাঠক মশায়েরা চোখ ঠারছেন : তোমার কলমও যে ঐ মোটরের বেগে ছোটালে। সত্যি তাই, জর্মনির অধ্যায়টা

তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিতে পারলে বাঁচি। ভাগ্যিস আগের কতক লেখা আছে এই সম্পর্কে।

মাইসেনের পোসিলেন-ফ্যাক্টরি। পুরানো ফ্যাক্টরি। আঠারো শতকের গোড়ার পোসিলেনের আবিষ্কার—ফ্যাক্টরিরও প্রতীষ্ঠা সেই সময়। ছুনিয়ার ভাল খন্দের মাঝেই মাইসেনের নাল চাইত। গ্যোটে-শিলারের বাসনপত্রে, দেখে এলাম, মাইসেনের ফ্রেডমার্ক। টেলস্টয় এসে গেছেন এই ফ্যাক্টরিতে। প্রথম-মহাযুদ্ধ অবধি কলকাতা শহরেও এদের ঘাঁটি ছিল। কলকাতার সে-আমলের কর্মকর্তা এখন বুড়া-পুথ বুড়ে হয়ে গেছেন। আলাপ-সালাপ হল। নিব্বাস ফেললেন কলকাতার নামে।

ভিরেক্টর এক ব্রকম পোসিলেন দেখালেন,

শতকবার আছড়েও ভাঙা যায় না। কী কাণ্ড করেছেন মশায়, নিজের পায়ে কুড়াল মারা! বাজার এই মাল চাপু হলে ফ্যাঙ্করি যে উঠে যাবে। জিনিষ না ভাঙলে বেশি খরচ হবে কিসে?

কার্গনার্গস-স্তম্ভ বড় শিল্পকাজ। দূর থেকে দেখবেন, অগণ্য চিমনি উঠছে আকাশে। থিয়েটারেরও নাম খুব। আগেকার নাম চেমনিজ (Cheminiz)। র বী শ্র না থ এখানে এসে 'ডাকঘর' পালা করে গেছেন। ইদানীং এই মাসখানেক ধরে থিয়েটারে এরা 'শকুন্তলা' করছে। বালিন অবধি ধরাপাড়া করেছে, আমরা এসে পালাটা যেন দেখে যাই। বিস্তর ঘর করে জমিয়েছে। জর্মনে শকুন্তলা নাটকের কুড়িরকম টা কা-টি র নী—স ম ন্ত ও লো মি লি য়ে দেখে তবে পালা বেঁধেছে। তবু খুঁ ত খুঁ তা নি যায় না, ভারতের লেখকদের দেখিয়ে তাদের মতামত যাচাই করতে চায়।

নিখুঁত তা বলতিনে, কিন্তু নিষ্ঠা দেখে অবাক হই। শকুন্তলা সেজেছে, নেয়েটি র নাম রোজমেরি (Rosemarie Schnabl)। লাইপজিগ কলেজ অব ড্রামাটিক আর্ট-এর ছাত্রী। ডিগ্রী পাবার আগেই ধরে এনে পালার নাটিকা করেছে। আঠারো বছর বয়স মোটে। অথচ সুপ্রাচীন কঠিন এই নাট্য-চরিত্র নতুন কালের রসিক বিদগ্ধসমাজে কী আশ্চর্য

নিপুণতায় হাজির করেছে, চোখে না দেখলে প্রত্যয় পাবেন না। অভিনয়ের পরে নাটকে দলের অনেকে হোটলে চলে এলেন। ঘড়িতে ছটো বাজছে, চারিদিক নিরুন্ম, ঊঁদের আলাপ শেষ হয় না। ভারতের অভিনয় ও নাটকের সমস্ত কিছু দেখে বুকে



শকুন্তলা অভিনয়। ডানে থেকে : শকুন্তলা (Rosemarie Schnabl), অবস্থা (Viola Mayer-Voldro), ক্রিস্টাল (Christl Rosenthal)

যাবেন, এট যেন সম্বল করে এসেছেন। ফলে সে রাতে অনাঙ্গের খাওয়ার ক্ষুরস্ব হল না, এক রকম নিরপু উপোষ গেল।

পরের দিন ভাইমার। গ্যোটে আর শিলার থাকতেন যেখানে। আধা-শহর জায়গা, ইলম (Ilm) নদীর উপর। বাড়িতে বাড়িতে বাগান, ফুলের সমারোহ চারিদিকে। গ্যোটে ও শিলারের চরবাড়ি, মিউজিয়াম, পাড়ার যে কক্ষিখানায় ওঁরা পানভোজন করতেন আজ্ঞা দিতেন। লেখক আনন্দে কাছে ভাইমার তীর্থভূমির মতো।

আবার এই জায়গারই অদূরে বৃকেনওয়ার্ড। আলো আর অন্ধকার পাশাপাশি দেখুন। নাৎসিদের কনসেনট্রেশন-ক্যাম্প ছিল একটা-দুটো নয়, তিনশ' মতন। পোল্যান্ডে ছিল, চেকোস্লোভাকিয়ার ছিল। সকলের দেহা বৃকেনওয়ার্ড। মানুষের দ্বিত্বতায় বাণ-ভালুকও মানুষ হতে লজ্জা পাবে। বন্দীদের যতদিন পার বাড়িয়ে নাও, তারপরে অশ্রু চয়ে পড়লে কেন খাওয়াতে যাবে? মাণ নেবার অজুহাতে যন্ত্রের উপর দাঁড় করিয়ে চূন করে এক গুলিতে দাও সাবাড় করে। কিন্তু লড়াইয়ের ব্যাকারে অকারণ গুলির খরচাই বা কেন? গলায় দড়ি কুলিয়ে পাইকারি হারে তো লটকে বেওয়া চলে। সারি সারি ইলেকট্রিক চুল্লি হা করে আছে, নড়ার গাণ। চালান করে তার ভিতরে, যত জঞ্জাল মুহূর্তে সাকসাকাই হয়ে যাক। তাড়াভাড়ি সাকসাই করা কেন, ভেবে দেখ, যদি কিছু কাজে আসে। নড়ার চুল কেটে কণ্ঠ বানিয়ে পাঠিয়ে দাও ব্রটে। সৈন্যরা হাতে ফুল-লতাপাতার উকি আঁকে, মরা

সৈন্যের চামড়া খুলে নিয়ে হাত-বাগ ও আলোর চাকনিতে বসানো যেতে পারে। বাহার খুলবে। উঃ, কী কাণ্ড—বৃকেনওয়ার্ড দেখে এসে দু-তিন রাত ঘুমোতে পারিনি। বীভৎস দৃশ্যগুলো চোখের উপরে ঘুরত।

লুমবার্গের গির্জায় এক সময়ে সারা ইয়ো-রোপের ভিড় ছিল। ভজন্যর জ্ঞান নয়, তার ব্যবস্থা গায়ে গায়ে রয়েছে। লোকে যায় একটিবার চোখের দেখা দেখতে। দেখে দেখালে-আঁকা ছবি আর ভিতর-বাইরের মূর্তিগুলো। সজ্জা হয়ে আসে, ছটায় আবার বন্ধ হয়ে যাবে—হাঁপাতে হাঁপাতে তথায় গিয়ে হাজির। এতদূরের মানুষ এসেছি, আমাদের একটু আলাদা করে দেখাচ্ছে বোকাছে। গ্রাম জায়গা—কক্ষিখানায় চাবাভুখো মানুষদের সঙ্গে বসে কিছু খেয়ে নিলাম। এক আশ্রয় অভিজ্ঞতা।

তার পরে জেনা—জাইস ক্যামেরা ও লেন্সের কারখানা যেখানটায়। এলাহি ব্যাপার। ছনিয়ায় এর জুড়ি নেই। স্বচ্ছ শুল্কর নদী। পুলের ধারে গাড়ি থানিয়ে এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরে আবার লগা দৌড়।

লাইপজিগে এলাম, বেশ রাত্রি হয়ে গেছে। ইয়েরোরোপের মেলাক্ষেত্র—অনেক শতাব্দী ধরে এখানে মেলা হয়ে আসছে। ছাপাখানার এইখানে প্রথম আবিষ্কার। সেই থেকে দিন-কে-দিন ছাপার হরেক কায়দা বের করছে। বইয়ের খুব বড় খাঁটি। জার্মানির 'বাদামি সোনা' অর্থাৎ লিগনাইটের আকর এই অঞ্চলে। লাইপজিগের কথা একটু ফলাও করে বলতে হবে। [সবঃ]

তারা একটি স্থলকোণী বিচলু করিয়া অবস্থিত, তাহারা এখন পশ্চিমাকাশে খুব নীচে দলিয়া দৃষ্টিগোচর নহে।

সূর্যকে পশ্চিমাকাশের মাঝামাঝি স্থানে দেখা যাইতেছে। সূর্যের লাগু রোহিণীতারা এবং কৃত্তিকাপুঞ্জ আকাশের স্থপরিচিত। উত্তরে অশ্বাশুভি-মণ্ডল ও তাহার এখন প্রভার তারা ব্রহ্মরুদ্র। সূর্য ও অশ্বাশুভির পূর্বাধিকে মিথুন মধ্যের উপর আসিয়াছে। মিথুনের পূনর্বর্ষ তারা হুইটির উজ্জ্বলতা প্রায় সমান। ইহারের মধ্যে উত্তরের নীল তারাটিকে (Castor) দৃষ্টবিনে হৃৎতারা রূপে দেখা যাইবে। দক্ষিণের শীতল তারাটির (Pollux) উজ্জ্বলতা সামান্য বেশি এবং ইহাকে এখন প্রভার তারা গণ্য করা হয়।

সূর্যের দক্ষিণে কালপুঙ্খ-মণ্ডল তাহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। কালপুঙ্খের কটিদেশে তিনটি তারা এক রেখায়—এই রেখা-বরাবর উত্তর-পশ্চিমে দিয়া কৃত্তিকাপুঙ্খকে এবং দক্ষিণ-পূর্বাধিকে লুঙ্কক তারাকে পাই। পূনর্বর্ষের দক্ষিণে সম্মা তারা। দেখিতেছি—বজ্রকূহর-মণ্ডলের লুঙ্কক, ছোটকূহর-মণ্ডলের সম্মা এবং কালপুঙ্খের আর্দ্রা এক বিরাট সমবাহু ত্রিভুজের তিন কোণে রহিয়াছে। বজ্রকূহর-ই জনসের শরে মৃগব্যাধ-মণ্ডল। ক্রতু বহুস্পাদি মৃগব্যাধ-রূপে কালপুঙ্খ-মণ্ডলে স্থিত মৃগরূপী অশ্বাশুভিকে শরবিদ্ধ করিয়া বিয়াক্ত করিতেছেন। পুনর্ভার মরণ কতি লুঙ্কক, মরণ, পূনর্বর্ষ, ব্রহ্মরুদ্র, রোহিণী, বাণরাজ। এই ছয়টি প্রথম প্রভার তারা এক কৃত্তিকাসের উপর রহিয়াছে এবং ইহার দ্ব্যন্তরে প্রথম প্রভার আর্দ্রা তারা। সম্মা আকাশে ২০টি প্রথম প্রভার তারার মধ্যে সাতটি তারাই আকাশের এই অংশকে সন্ধ্যা করিয়া রাখিয়াছে। দক্ষিণদিকে প্রথম প্রভার অগস্তা তারাকে দেখিতেছি। অগস্তা মধ্যরেখা অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাকাশে আসিয়াছে।

ছাত্রাশুভ উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্যাসিওপিয়া, শাসিন্দু, অশ্বাশুভি-মণ্ডল অতিক্রম করিয়া সূর্য ও মিথুনের অন্তর্ধর্তী স্থান দিয়া কালপুঙ্খের পূর্বাধিকে মনোদ্যাক্স-মণ্ডলে অবস্থ করিয়াছে এবং পরে দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে।

কালপুঙ্খের দক্ষিণে শশক (Lepus)-মণ্ডলকে দেখিতেছি। শশকের দক্ষিণে কল্যাণ নামক মণ্ডল।

ক্যাসিওপিয়া-মণ্ডলের হৃদিত W আকৃতির উত্তর-পশ্চিমদিকে এখনও দেখা যাইতেছে। আর কিছু সময় পরে ক্যাসিওপিয়া-মণ্ডল অস্ত যাইবে। শাসিন্দু-মণ্ডল এবং তাহার দৈত্যতারাশকেও পশ্চিমাকাশে দেখিতেছি।

সিংহরাশি পূর্বাকাশের মাঝামাঝি কাছগার আসিয়াছে। ছয়টি তারা কাছের আকার এবং তাহার পূর্বাধিকে তিনটি তারা সমকোণী ত্রিভুজের আকারে আছে। সমকোণের উত্তরের তারাটি পূর্বাধিক এবং পূর্বাধিকের তারা উত্তরধিকতর। সিংহের পশ্চিমদিকে কণ্টারানিতে প্রিন্সিপুঙ্খকে চিনিয়া লইবার চেষ্টা করি। উত্তরধিকতর এবং মধ্যের পরের তারা যোগ করিয়া যে রেখা পাই, তাহাকে পশ্চিমদিকে বাড়াইয়া দিলে আমরা একই সাদা মেঘের মতো স্থানে পৌঁছাই—ইহাই প্রিন্সিপু বা মোচাক নক্ষত্রপুঞ্জ। দৃষ্টবিন বা বাইনোকুলিয়ার দিয়া এখন অনেক তারা দেখা যাইবে। কল্যাণাশি উদিত হইতেছে। ইহার প্রথম প্রভার চিত্রা-তারার নিকট এই মাসের পূর্ণিমার চন্দ্র থাকে। সেইজন্ম মাসের নাম চৈত্র।

পূর্ণোত্তর দিকে সপ্তর্ষিকে দেখিতে পাইতেছি। সপ্তর্ষির মনীষি তারা হইতে সিংহের উত্তরধিকতর দিকে যাইতে থাকিলে এক-তৃতীয়াংশ দূরে কেনিস্ ডেনাটিসি (Canes Venatici) নামক মণ্ডলে একটি মাকারি উজ্জল তারা দেখিতে পাই, ইহার নাম ‘কর কেরোলি’*। হুই-তৃতীয়াংশ দূরে কোবা বেরিনিয়াস নামক তারাপুঞ্জ শিশিরসিক্ত মাকড়সার জালের মতো দেখায়; বাইনোকুলিয়ার দিয়া তারাগুলিকে লষ্ট দেখা যায়।

দ্বর্দীর্ঘ জলসর্প-মণ্ডল উদিত হইয়া পূর্বাকাশে দক্ষিণদিকে বিয়াক্ত করিতেছে। বৃহত্তম বৃহশপতিকও সন্ধ্যাগমনের পূর্বাধিকে তুলারানিতে দেখা যাইবে। এই মাসে অপর কোনো গ্রহকেই আমরা সন্ধ্যাকালে দেখিতে পাইব না।

* ‘কর কেরোলি (Cor Caroli)’ অর্থ ‘চার্লসের জন্ম’—এই দ্ব্যর্থ ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস-এর সম্মানার্থে দেওয়া হইয়াছিল।

স্বাস্থ্যকথা

রোগ ও তার প্রতিরোধ ডাঃ পদ্মপতি ভট্টাচার্য

প্রকৃতির মধ্যে যেমন কচুড়ির দুর্গন্ধ, মাগুসের জীবনের মধ্যে তেমনি রোগের আক্রমণ। দুইরকম ভাবে আমরা রোগে দুগ্নি—একরকম হয় বাতাবিক বাতায়ের হানি, আর একরকম হয় হঠাৎ কচের মতো এক একটা দুর্গন্ধ ব্যাধির আক্রমণ। অল্প বাতায়হানি ঘটলে তা হুতই পারে, কিন্তু বাতায় ভালো থাকলেও সংক্রামক রোগ আক্রমণ করতে পারে। তবে বাতায়ের অবনতিই বর্তমানে অধিকাংশ রোগের চিহ্নমূল কারণ।

মাগুসের বাতায় কি আগেকার কালে ব্যাধি হতোনা ? হতো বৈকি। কিন্তু খুব আদিমকালে এখনকার মতো এতটা বেশি হতোনা। আর যাও বা হতো, তার প্রকৃতি ছিল অল্পরকম। তার কারণ, খুব আদিমকালে মাগুসের জীবনে কোনো ক্রিমিতা ছিল না। শুধু যেমন অক্রিম জীবন বাপন করে, মাগুসও তাই করতো। ঠিক কিভাবে তারা জীবনযাপন করতো তা সম্পূর্ণ না জানলেও, এইই অল্পত বোকা যায় যে তাদের গায়ে কাপড়-খাদ্য ছিল না, পায়ে ছতো ছিল না, তারা অন্যভাবে কৃষ্ণতে ভিত্তে পারতো, সবরকমের প্রাকৃতিক উপহব সহ্য করতে পারতো, ঈত পড়লেই তাদের ঠাণ্ডা লাগতোনা, গরম পড়লেই অমনি সর্দি-গর্বি হতোনা। আর কাঁচা ভিনিগ খেয়েই তারা হজম করতো, আমাদের মতো উত্তন খেলে হরেকরকম মশলা দিয়ে সুগরোক্ষ পকবান রন্ধে তারা পেতে জানতো না। তারা প্রকৃতির সবরকম অবস্থার সঙ্গেই বাতাবিক সামঞ্জস্য রাখতে পারতো, আমাদের এখনকার মতো একটুতেই বিবল হয়ে পড়তো না। সবই অভ্যাসের ব্যাপার, অভ্যাস করলে সবই সহ্য যায়। প্রকৃতির সকল অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে তারা অক্রিমভাবেই অভ্যস্ত ছিল। আর অনিদ্রাই ছিল তাদের নিদ্রা, তাতে তাদের কিছু ক্ষতি হতো না।

কিন্তু এখনকার দিনে আমরা ক্রিমিতায় অভ্যস্ত হয়েছি, বাতাবিকিত অভ্যস্ত হয়েছি। ঈত সহ্য করতে চাই না, কাঁচাই খাওয়া গরি। গরম সহ্য করতে চাই না, কাজেই

ইলেক্ট্রিক পাখা ঘোরাই। বরষা ভিত্তে চাই না, কাজেই ওয়াটারপ্রুফ চড়াই। পায়ে চৌকর খেতে চাই না, কাজেই ছতো পায়ে দিয়ে থাকি। তারপর বাতাকে যে কতরকমে ক্রিম করে পাই, তার কোনো ইচ্ছা নেই। তা ছাড়া প্রকৃতির সাহায্যে বনে-ওকালে সাহায্যে-পথেই আমরা বাস করতেই চাই না, নিশেরা বড়ো বড়ো শহর সাজিয়ে বহু মাগুস একলাক ছুটে সেখানেই নাখা গুজে বাস করি। এ সময়ই হলো ক্রিম, আর এতেই এখন আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু জীবনধারণের ব্যবস্থা ক্রিম হলেই তাজা মধ্যে যখন-তখন অনেক ক্রটি-বিঘ্নাতি এসে পড়ে, সব সময় তাল সামলাতে হয়না। আর অনিদ্রাও এখন আমরা অভ্যস্ত নই, কাজেই একটুতে ব্যাথা বিগড়ে যায়, শরীর ব্যাধি হয়। সৈবৎ একটু কৃষ্ণতে ভিত্তলেই অমনি মশল করে। সৈবৎ কিছু পানার বাতিকে হলেই অমনি পেটের সোপ হয়। সৈবৎ ঠাণ্ডা লাগলেই অমনি সর্দিগর্বি ধরে। স্তবৎও এখনকার দিনে বাতায়হানি হবার হেতু কারণ হয়েছে। আমরা আর আগেকার মাগুসের মতো অক্রিম নই। এমন কি, অভিনয় করতে গিয়েও তেমন অক্রিমতা আমনে পানিনা, অক্রিমতাও ক্রিম হয়ে যায়। তাই এখনকার শিনেমার নায়ক-নায়িকারা অক্রিম অভিনয় দেখাবার চরু কেউ কেউ গ্রামা চাষা-বুসাদের সঙ্গে থেকে তাদের মতো জীবনযাপন করতে শিখছেন।

কিন্তু তখনকার অক্রিমের দুর্গন্ধও মাগুসের বাতায় ব্যাধি হতো, অল্প ব্যক্তি হঠাৎ মারাত্মক অসুখ পড়ে যেতো। কেন তা হতো ? হঠাৎ দেখা যেতো, কোথাও কিছু নেই, এক-একটা সম্ভ্রান্তের মধ্যে মড়ক লেগে গেল—এক-একটা পুতুর যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ মরে যায়, তেমনি ঝাঁকে ঝাঁকে মাগুস মরে এক-একটা বস্তি উল্লাহ হয়ে যেতে লাগল। তাই বেশে মাগুস প্রথম ভাবতে শুরু করলে যে কেন এমন অসুখ ঘটবে। নীরোগে মাগুসের মধ্যে রোগ আসে কোথা থেকে ? রোগকে নিবারণ করতে হলে তার কারণটা তাদের জানা চাই।

প্রথমে তারা দেখলে যে স্থল, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বৃষ্টি—এরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এরাই আমাদের নিমিত্ত পোষ্য, ঈচ্ছা করলে এরা আমাদের ভালোও করতে পারে, অথবা মন্দও করতে পারে। সুতরাং এদের সম্বন্ধে বাৎসরিক পারলেই আমরা রোগদ্ব্যর্থের হাত থেকে এড়াতে পারবো। তখন নিরোগ থাকবার জন্যে তারা এসেই পূজা করতে শুরু করলে। কিন্তু তাতে কিছু রক্ষা হলোনা।

তখন তারা ভেবে দেখলে যে দেবতারা নয়, কিন্তু ভূত-প্রেত, দৈত্য-গণের প্রকৃতি অমঙ্গলকারী শক্তিরাই অদৃশভাবে হঠাৎ এসে পড়ে থাকে, হুবিধা পেলে তাইই এসে আক্রমণ করে। অতএব তখন তারা ভূত-প্রেতের পূজা করতে আরম্ভ করলে, মহতর ও কাঁড়কুঁড়ের ব্যাপার শুরু করে দিলে। অনেককাল এইভাবেই চলল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে তাতেও কিছু কিনারা হলোনা। রোগ তবু মাড়লের হতেই থাকল, মড়কের আক্রমণও তেমনি হতে থাকল। মৃত্যু কত কথাই ভেবে দেখলে। কখনো বললে, দারুণ বাতাস কোঁপে রোগ হয়। কখনো বললে, অনিষ্টকারীরা ধাক্কা মেরে রোগে রোগ হয়। কখনো বললে, কোনো রোগী থাকলে ছুঁলে কোলেই রোগ হয়। কিন্তু এর কোনোটিই সত্য বলে প্রমাণ হলোনা।

তখন থেকে বুদ্ধিমান মানুষ রোগের প্রকৃত ও বাস্তব কারণ খুঁজে পেতে আরো চেষ্টা করতে লাগল। নানারকম পরীক্ষা করতে করতে তারা বুঝতে পারলে যে রোগের কারণ অতি হৃদয়, এত হৃদয় যে তা আমাদের দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত, সেই কারণেই তাকে আমরা ধরতে ছুঁতে পারি না। আমাদের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে পারলে তাকে নিশ্চয়ই ধরা যাবে। এই সময়ে স্কিউডেনহোফের হঠাৎ মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের আবিষ্কার করলেন, দারুণ অতি হৃদয় মিলিলেও বেশ বড়ো ক'রে দেখা যেতে লাগল। তখন রোগের শরীরের পৃষ্ঠ-রক্ত ও মল-মূত্র প্রভৃতি নিয়ে সেই যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল যে তার মধ্যে অগণ্য রকমের এমন সব হৃদয় মিলিল রয়েছে, বা কোনো হৃদয় লোকের শরীরের মধ্যে একবারেই নেই। তখন সেইসব হৃদয় মিলিল নিয়ে গুরু আনোয়াক্সের শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখা গেল যে, তার কলে তার ও বাহ্যিকের মতোই অহু হু হু পড়েছে। অতএব কিলের থেকে যে সেই সব রোগ সন্ধ্যা তার প্রত্যেকটির সম্বন্ধে ভালোভাবেই প্রমাণ হয়ে গেল। সেই হৃদয় মিলিলগুলির নাম দেওয়া হলো germs কিংবা bacteria, বাংলায় থাকে বলি 'জীবাণু'।

তার পর ক্রমে ক্রমে এখন আমরা সেইসব bacteria

বা জীবাণুদের সম্বন্ধে সব কথাই জানতে পেরেছি। আমরা জানেছি যে ডির ডির রোগের ডির ডির জীবাণু থাকে। তাহা ডির ডির রক্তম উপায়ে আমাদের দেহের মধ্যে ঢুকলে রোগ জন্মায়। হুতরাং রোগ নিবারণ করতে হলে কাঁড়কুঁ বা মাড়ুলি-তালিচা কিছু কাষ হবেনা, ঈসব জীবাণুদের নাশতে হবে। ওরা যখন যেমন রাষ্টা দিয়ে আমাদের দেহের মধ্যে ঢোকে তখন সেই রাষ্টা বন্ধ করতে হবে। ওরা কখনো-বা ঢোকে বাতাসের ভিতর দিয়ে, কখনো-বা ঢোকে চল ও থাকের ভিতর দিয়ে, কখনো-বা ঢোকে কাপড়চোপড়ের ভিতর দিয়ে, আর কখনো-বা ঢোকে মশা-মাছির কামড়ের ভিতর দিয়ে। অতএব যখন যেমন রোগের প্রাণুর্ভাব হচ্ছে তখন সেই রোগের উপযুক্ত এইলকল সংক্রমণপথের সম্বন্ধেই আমাদের সাবধান হওয়া বরকার। প্রত্যেক রোগের নির্দিষ্ট সংক্রমণের রাষ্টাগুলি আমাদের বন্ধ করতে হবে। কলেরার সময়ে কলেরার সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে, মালােরিয়ায় সময়ে মশার কামড় সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে।

এইলকল ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে যথেষ্ট দুকল ও পাওয়া গেছে। এখন আর আগেকার মতো অমন ব্যাপকভাবে মড়ক লাগতে পারেনা। সমাজের মধ্যে কোনো কোনো রোগের হুতপাত হলেই তাকে আমরা বাহিরে দিতে পারি, বেশির অগ্রসর হতে গিইনা। রোগকে ঠেকাবার অনেকরকম উপায় আমরা জানে গেছি। আধুনিক বিজ্ঞানের এই কৃতিত্ব।

কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে। রোগের সম্বন্ধে সমস্ত রহস্য জানা হয়ে গেলেও, এখনও আমরা সকল রোগের আক্রমণকে একেবারেই হটিয়ে দিতে পারি নি। তার কারণ—বাতাসকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, নিশাশ আমাদের দিতে হলেই, তার সঙ্গে সন্নিবাসি প্রকৃতি রোগের অদৃশ জীবাণু নাকে এসে ঢুকবেই। মশা-মাছিকে সর্বদা ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, হুবিধা পেলে তারা উড়ে এসে বসবেই। গুলো-বালিকেও একিয়ে চলা সম্ভব নয়, আর লোকালয়ে বাস ক'রে অহু লোকের সন্স্পর্শ বাহিয়ে চলাও সম্ভব নয়।

অথচ আমরা হুইই থাকতে চাই, রোগে আক্রান্ত হতে চাইনা। তাহলে কি উপায় করা যায়?

বর্তমান যুগের বাহ্যবিজ্ঞান তারও সমস্ত উপায়ই বলে দিয়েছে। হুই হুই থাকতে চাই তাহ'লে আমাদের সেই বিজ্ঞানের নির্ণয়গুলি মেনে চলতে হবে।

বর্তমানে আমরা জানেছি যে হুই থাকতে হলে কেবল একতরফ থেকেই নয়, দুইতরফ থেকে আমাদের হুনিয়ায় হতে হবে। একদিকে নিজের বরকে শক্ত ক'রে সামলাতে

হবে, আর অগ্রদিকে শত্রুর আক্রমণকে ঠেকাতে হবে। নিজের গায়ে যদি তখন কোন না থাকে তাহলে বাইরের শত্রুর আক্রমণকে কাছাকাছি এড়িয়ে এড়িয়ে থাকা যাবে? রোগের আক্রমণকে শত্রুর আক্রমণের সঙ্গেই তুলনা করা উচিত। যথেষ্ট শাশনই যদি শত্রুর দল দ্বারা আক্রমণ করবার ক্ষমতা ওঁতে পড়ে থাকে, তাহলে তাদের নিধারণ করবার ক্ষমতা কি কি উপায় অবলম্বন করতে হয়? প্রথমত, নিজের গায়ে কোন বাড়াবাড়ি হয়; আর দ্বিতীয়ত, শত্রুদের সঙ্গে একটা সন্ধি করে রাখতে হয়। তা সত্ত্বেও যদি আক্রমণ এসে পড়ে তাহলে অবশ্য তখন লড়াইতে হয়, কিন্তু সেই লড়াইতে আনন্দা সহজেই জয় হতে পারে। কারণ গায়ে রয়েছে যথেষ্ট ঘোর।

অতএব প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে নিজের ঘরকে শক্ত রাখা। তার ভিত্তি কি করতে হবে? সেহেতু সব দিক দিয়ে ঘরটিকে শক্ত করতে হবে। যেন কোনো দিক দিয়ে কিছুই সে কাবু না হয়ে পড়ে। তার ভিত্তি দুটি উপায় আছে। প্রথমকি নিয়মের বশে রাখলেই তার কলকব্জার মধ্যে কোনো গুণগোল হয়না, তার কলকব্জা ঠিক-ঠিক চলে চলে থাকে, তার কোনো ছন্দপতন হয়না। নিয়ম থাকা মানে ভয়ে ভয়ে সাবধানে পুঁজুপুঁজু করে থাকা নয়। নিয়ম থাকা মানে প্রকৃতির সঙ্গে ভাল রেখে চলা। প্রকৃতিতে যেমন প্রত্যহই নিয়মমতো দিন হয়, রাত্রি হয়, গুরু-পরিবর্তন হয়—সেই প্রকৃতিতেও তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা চাই। অর্থাৎ জাগার সময় জাগা, ঘুমের সময় ঘুমোনা, খাবার সময় খাওয়া, কাজের সময় কাজ, বিশ্রামের সময় বিশ্রাম, ইত্যাদি। এ বিষয়ে কোনো গাফিলতি করলেই গুণগোল বাধবে। আর দ্বিতীয় উপায়, সেহেতু খাটতে হবে। প্রকৃতির রাঙো সবাই খাটছে, তোমাকেও তেমনি খাটতে হবে। খাটলেই সে ভালো থাকে, না খাটলেই বিগড়ে যায়। সেই কারণে প্রত্যহই তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে, পরিশ্রমের কাজ কিছু না থাকলে ব্যায়াম করতে হবে। ইঁড়মি করলেই জং ধরবে, যেমন লোহার দরং জং ধরে।

তার পরে হলো শত্রুদের সঙ্গে আপোনে বন্ধা করার কথা। বর্তমান বিজ্ঞান তার অনেক উপায় বাংলায় দিয়েছে। তার বৈজ্ঞানিক নাম 'prophylaxis'। টাইফয়েডের প্রাদুর্ভাবের সময় টাইফয়েড-বীজাণুদের প্রতিরোধক ইন্জেকশন নিয়ে নাও, আর তোমার টাইফয়েড হবে না। কলেরার সময় তার প্রতিরোধক ইন্জেকশন নিয়ে নাও, আর কলেরার আক্রান্ত হবে না। বসন্ত-রোগের সময় আগের থেকে বসন্তের টীকা নিয়ে নাও, আর বসন্ত হতে পারবে না। যেখানে হুয়ার

প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে সেখানে বি.সি.ভি. ভ্যাক্সিন নিয়ে নাও, হুয়ার আক্রান্ত হবার ভয় থাকবেনা। এমনি অবিকার্য সংক্রামক রোগের জন্যই প্রতিরোধক ব্যবস্থা রয়েছে। লোকালয়ের মধ্যে বাস করতে হলে তার সুযোগগুলি নিতে হবে।

এই হলো বর্তমান যুগের স্বাস্থ্যনীতি। বর্তমান পর্যন্ত মানবদেহ সম্পূর্ণ রোগমুক্তী হতে না পারে, ততকাল পর্যন্ত আমাদের এইমত নীতি মানতে হবে।

অন্তান্ত রোগগুলির কথা ছেড়ে দিয়ে আপাতত বসন্ত-রোগের কথাই ধরা যাক।

এ-রোগের দুই কারণ হলো: একজন অতিদুশ ভাইরাস, যাকে ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখাই থাকেনা। এ-ভাইরাস ভাইরাস বাতালে ভেলে বেড়াই, একজন এ রোগে আক্রান্ত হলে তার থেকে ভাইরাস বেরিয়ে বাতালে উড়ে এক কোণ দূরে অবস্থিত অগ্রজনের নাক চুকে পড়তে পারে, এবং তাতেই রোগ মন্ত্রায়ে। এমন হুম ভিঁসিলে আক্রমণ নিবারণের উপায় কি?

তার উপায় মাত্র বহুকাল পূর্বেই আবিষ্কার করেছিল। তারা দেখেছিল যে, একবার এ-রোগ যদি দুইভাবে আক্রমণ করে তাহলে আর তা পরে কখনো প্রবলভাবে আক্রমণ করতে পারেনা। এই আইডিয়া থেকেই বসন্ত-রোগের টীকা নেবার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। তখন এই কাজ করা হতো যে, কারও বসন্ত হলে তার গায়ের গুটি থেকে সামান্য একটু পুঁজুর নিয়ে তা সুস্থবাক্তির সেহের একস্থান ডিরে সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। তাতে সেখানে একটা মত গুটি আউরে উঠতো এবং সঙ্গে সঙ্গে দুইভাবে বসন্ত-রোগ জন্মাতো। কিন্তু তার থেকে সে ব্যক্তি সহজেই সেরে উঠতো এবং তার পরে আর সে মারাফতভাবে আক্রান্ত হতেনা। এই ছিল প্রাচীন পদ্ধতি। তার পরে জেনার (Jenner) আবিষ্কার করলেন আধুনিক পদ্ধতি। এতে এই কাজ করা হয় যে, বসন্তের বীজ নিয়ে তা আগে গরুর গা ডিরে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এতে গরুর গায়ে বসন্তের গুটি বেরোয়। তখন সেই গরুর বসন্তের বীজ নিয়ে মানুষের ভ্রত টীকার বীজ তৈরি করা হয়। গরুর বসন্তের বীজ মানুষের বসন্তের বীজের চেয়ে অনেক শক্তিশীল হয়ে থাকে। সুতরাং তার দ্বারা মানুষের গায়ে যে গুটি বা টীকা ছুটে বেরোয় তা পূর্বেই দুই ধরনের হয়। অতঃপেই বসন্ত আক্রমণই আসল মারাফত বসন্তের আক্রমণকে অন্যরূপে ঠেকাতে পারে। এই হলো এখনকার দিনের টীকা-নেবার পদ্ধতি। গরুর বসন্তের বীজ মিশারিন-মিশ্রিত

হয়ে টিউবের মধ্যে ভরা থাকে, তার বাসাই সীকা দেওয়া হয়।

বঙ্গ-রোগে সবলের পক্ষেই মারাত্মক। শিশুদের পক্ষে হো-বাট্টেই। সুস্থরাগে বড়ের পরে ছদ্মনাম বা একহাজারের মধ্যে প্রত্যেক শিশুরই সীকা দেওয়া অবশ্যকর্তব্য। বাড়িতে কারও এ রোগ হলে, সেখানকার আত্মত্বের শিশুকেও সীকা দেওয়া হতে পারে—যদিও সে সীকা প্রাপ্তে গঠন। সীকা-এই বস্তুই এই যে, সীকা দেবার ততীত্ব দিনের পর থেকে সেই চাচাটি লাগে হলে ফুলে ওঠে এবং সেখানে গুটি জন্মতে দেখা যায়। চতুর্থ দিন থেকে জ্বর হয়, সে জ্বর চার-পাঁচদিন পর্যন্ত থাকে। পশুদিনে সীকাটি থেকে ওঠে এবং তার পর থেকে তা চাকাতো আরম্ভ করে। প্রথম একবার সীকা উঠে গেলেই নিশ্চিন্ত, তার পর থেকে আর পাঁচবার পর্যন্ত সীকা

দেবার প্রয়োজন হয়না। কিন্তু এই গো-বংশের সীকারে গুণ শারীরিক পক্ষ থেকে না, সেই কারণে মাঝে মাঝে নতুন করে আবার সীকা দেবার প্রয়োজন হয়। পাঁচবার অধিক সীকা নিলেও চলতে পারে, কিন্তু সবলের লোকেরা অনেকে প্রতিবছরেই সীকা নিয়ে থাকে। তাতে কোনো ক্ষতি নেই, কারণ আগেকার সীকারে গুণ হতকাল বরাদ্দ থাকবে ততকাল নতুন কোনো সীকা-মোট উঠবেই না। যদি কোনো বারে সীকা উঠতে নেবা বাহ তখন বুঝতে হবে যে, সেবার সীকা দেবার প্রয়োজনই ছিল।

এখনকার দিনে বঙ্গ-রোগের সীকা-দেওয়া সবলের পক্ষে খুবই সহকার। আজকালও যদি আগেকার মতো কেউ বঙ্গ-রোগে অক্রোধ হয়, সেটা খুবই লজ্জার কথা—বাক্তির পক্ষে এবং সমাজের পক্ষেও।

ফোন : ২২-৪৬৮৭

এস, মুখার্জী এণ্ড কোং [কাগজ ও মুদ্রণের কালি বিক্রেতা]

সি. ২২-৪, বালাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১

পান্ডিত্যবোধক :

টিটাগড় পেপার মিল্‌স কোম্পানি লিমিটেড

এবং

হুগলি ইক কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড

নতুন সাহিত্য

। চীন থেকে ভারত ।

[লেখক : দ্বিতীকনাথ ভট্টাচার্য]

'চীন থেকে ভারত' বইখানি বৃহদ্বিখ্যার ২,৫০০ তৃতীয়-বর্ষে প্রকাশ করে গ্রন্থকার দ্বিতীকনাথ ভট্টাচার্য আমাদের যত্নবাহ অর্জন করেছেন। চীনদেশের সর্বপ্রাচীন বৌদ্ধগীত ও সাধক হিউয়েন সাঙ (৬০২-৬৬০) নিজে ভারতে ১৫ বৎসর কাটিয়ে (৬৩০-৬৪৫) বড় অদ্ভুত গ্রন্থাণ্ড ও সংগ্রহ করেন এবং বসন্তে ফিরে চীনভাষায় তাঁদের অত্বান করেন—সেই ত তাঁর অধ্যায়-অভিধানের অশুর্ষ কাহিনী। ১৮১৫ সালে, Hemusat ভাষ্যের প্রথম চীনভাষার অধ্যাপক নিখুঁত হন এবং তাঁর পর Stanislas Julien Ed. Chavannes ও Paul Pelliot পর্যন্ত এক শতাব্দী পরে বহু ফরাসী তথা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারত ও চীনের লক্ষ-নির্ঘ করেছেন। তাঁরা একবারে বীকার করেছেন যে হিউয়েন সাঙ সে-যুগের সাক্ষী হিসাবে ভ্রষ্ট স্থান অবিকার করে আসছেন। অথচ তাঁর জীবনী ও বোজনামুচা—এতকাল পরে—প্রথম বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপহার দিলেন। তিনি বিজ্ঞানের কৃতি ছাত্র—বহুত সেইজগৎই যানচিহ্নের সাহায্যে। এমন লক্ষিত্ত অথচ বিপদভরে এই ভ্রম-কাহিনী লিখে গেছেন।

তাঁছাড়া এ শুধু কাহিনী নয়—এ যে সাধকের তীর্থযাত্রা। সে-কথাও গ্রন্থকার সর্বদা মনে রেখে গভীর দ্রষ্টার সঙ্গে নৌকিক ও অলৌকিক সব কিছু লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ভৌগোলিক তথ্য—পশ্চিম চীন থেকে শোবি-মরুভূমি ও উত্তর পাহার পার হয়ে, পারস্তের সীমান্ত বেয়ে, হিন্দুস্থান পৌছানো—সেই ত বেনে মহাকাব্যের এক বিরাট কাণ্ড—পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের চেয়ে কম বিশ্বকর নয়। কিন্তু সাধকপ্রবর সাঙ মহাপ্রস্থান শেষ করে আস্তে ১৫ বছর (৬৪৫-৬৬০) একান্ত সাধনার চীনভাষায় এক বিরাট বৌদ্ধসাহিত্য রেখে গেছেন। তাঁর সেই অমর কীর্তিস্তম্ব আর নয় চীন ও বাবীন ভারতের সাহস্রবর্ষের বেনে আস্থান করছে নতুন সত্যাবি ও যৈমী-সাধনার পথে।

১২২৯ সালে গুলজেব তৃতীকনাথের সঙ্গে চীন-ভ্রমণের সময় মহাভা সাঙের মাতৃভূমি লো-ইয়াং (Lo-yang) পরিদর্শন করার পৌত্যা হয়েছিল। তাঁর দৃষ্টি-ভিত্তি কত মই মন্দির দৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠিত দেশ দগ্ন হয়েছিল। তাপানের বৌদ্ধমন্দিরও দেখেছি ভারতের অদ্ভুত পুথির প্রেরণ কয়েকখানি তাঁর দিগে বৈশে পরিভ্রাজক সাঙ প্রাচীন-স্মৃতি উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছেন। এসব গল্প শিল্পচর্চা অর্থনীতিমাত্রকে শোনাই এবং তিনি তাঁর অমর ভূমিকায়ে সাঙকে সার্থক স্থাপন করে গেছেন।

গ্রন্থকারকে 'কথিত' পরিচোপ করবে ভক্ত সাধুবাণ কবি, এবং সেই সঙ্গে অগ্রসরণ—অবিলম্বে আর একখানি যথেষ্ট তিনি চীনদেশের অল্প তীর্থযাত্রীদের কাহিনীভিত্তি ও বাংলায় প্রকাশ করুন। II-Tsang-এর প্রায় দেড়শ বছর আগে কা-হিয়েন (Fashion) ভঙ্গ-যুগে এসে মনোজ্ঞ বিবরণ লিখে গেছেন, এবং প্রায় পাণ-যুগের প্রায়ের ই-চিঙ (I-ching) ভারতের তথা বাংলায় আশ্রিত বিচারে অধ্যয়ন করে কি বিপুল গতিত্ব ও শাস্ত্রচর্চায় কথা লিখে গেছেন—বাংলাদেশের সেই এখন নতুন-ভাষে বোঝানো সরকার। সেই সঙ্গে এটিও গ্রন্থকার স্পোতে পারেন যে, ভগবান তথাগতের কল্যাণ-ভ্রমী শিরদল হিমালয় ও গোবী মন্দির ভীষণ নিঃশব্দ উপেক্ষা করে—প্রায় হুঁহাতার বছর আগে কাশ্মীরভাষা ও বর্ষভ্য, হুয়ারজীং ও গুণবর্ধন, বোধিবর্ধ ও শীপচর—চীন ও তিব্বতে দর্শনচর্চায় করে এসেছেন। তাঁরা পর্বের সঙ্গে নিয়ে গেছেন ভারতের শিল্প ও সত্ত্বিত্ব, বিজ্ঞান ও আবেশ, কাকরণ ও সাহিত্য—যার লক্ষ্যন এতদিন দিয়ে গেছেন শাস্ত্রাত্ম পণ্ডিতগণ; কিন্তু এখন সেই গৌরবময় ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করতে হবে এই ভারতের কৃতি সাধকের। তাঁদের উন্মুখ করবে আমি জানি—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'চীন থেকে ভারত'।

এই গ্রন্থখানি প্রবীণ সম্পাদক দ্বিতীকনাথ গভোপাধ্যায়

দ্বাদশের 'গল্পভারতী'তে প্রকাশ করে তাঁর পত্রিকার নামটি সার্থক করেছেন এবং আদ্যাবধি আন্তরিক পত্রব্যাপ অর্জন করেছেন।

বইখানির বহুল প্রচার হোক—হুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে—এই আদ্যার প্রার্থনা।

ঈকানিলাস নাপ

। নিষ্টিমন ।

[লেখক : শ্রীমন্তব্রজ বসিক। প্রকাশক : সাহিত্যচর্চা, ৩৭, পাণ্ডুরিথ ষাট স্ট্রীট, কলিকাতা ৩। দ্বিতীয় : ছাঁচকা]

গত দশ বছরের মধ্যে বাংলা কবিতার প্রবাহে বেশব নতুন কবির দৃষ্টিসৌকর্য নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যময় বলে আদ্যার মনে হয়েছে। তাঁদের নাম উল্লেখ করবার ইচ্ছে হয়; কিন্তু লেখক সত্যের স্বার্থে হচ্ছে নানা কথা ভেবে। প্রথমত দশ বছর সময়ে একটু বেশি বিস্তারনয়—অনেক কবি এই সময়ের মধ্যে অল্প কয়েকটি লেখাতে যে উজ্জল সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন, যে-কোনো কারণেই হোক তাঁদের সে প্রতিভাটি ব্যাহত হয়েছে; কেউ-কেউ প্রায় হীন হয়ে গেছেন। বিতীত, প্রিয় পশ্চিমান এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁদের লেখা শুক হয়েছে। এই দশ বছরের কালপর্বের আগেই, কিন্তু তাঁদের অশোকাক্ত পরিণতি ও দীপ্তি দেখা গেছে আলোচ্য সময়-সীমানারই মধ্যে,—সুতরাং তাঁদেরও নাম এইবারে উল্লেখযোগ্য,—এক সে কথা যেনে নিলে একটি দীর্ঘ তালিকার দায়িত্ব স্বীকার্য হয়ে ওঠে,—যা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তৃতীয়ত, বৈশিষ্ট্য-মন্দের উল্লেখ যান্নেই বৈশিষ্ট্যহীনদের দিকে বিশেষভাবে তর্জনী নির্দেশ করে দেওয়া। তাতে নবীন সাধকরা দূর হবেন, যদিও সমালোচক যে সর্বদা অন্ত্রান্ত নন, সে কথা সকলেই জানেন। এই তিন কারণে বরণ করে সেসকল কোনো তালিকার কথা না তোলাই ভালো। এতৎসঙ্গেও দীপীশ-হবার রায়, হুমীল গঙ্গোপাধ্যায়, মুকুন্দের মাইতি বা এঁদের চেয়ে আদ্যপ্রকাশে কিঞ্চিৎ প্রবীণ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাব বহু, শঙ্খ ঘোষ ইত্যাদি নতুন কবির নাম অনিবার্যভাবে মনে আসে। গত দশ বছরের মধ্যে বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গে এঁদের কথা উল্লেখ করতই হয়। কলা বাহুল্য, পূর্ববর্তীদের সাধনার ঐতিহ্য থেকে এঁরা পুষ্টি-লাভ করেছেন,—তাঁদের মতন এঁদেরও কিছু-কিছু মূল্যসোধ আছে, কেউ শাস্ত্র প্রকৃতির পিপাসু, কেউ-বা মানব-সংসারের মহুচ্ছন্ন বৈষম্য সম্বন্ধে বেশি সজাগ। রমেন্দ্রনাথ বসিকের দ্বিতীয় কবিতা-সংগ্রহ 'নিষ্টিমন' পুরুষ-পুণ্ডিতে এইসব কথা মনে এসে। এবং আদ্যদ্ব্যতা না হারালে ভবিষ্যতে তিনি যে সত্যিকার ভালো কবি হয়ে উঠবেন, এই 'নিষ্টিমন'

বইখানির মধ্যেই তাঁর ইশারা আছে। 'শবরী' এবং 'পূর্বদ্ব্য' এই দুই বিভাগের প্রথমটিতে চম্পক এবং দ্বিতীয়টিতে শান্ত—যেটো একত্রিংশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে এই বইখানিতে। প্রথম বিভাগের লেখাগুলি পড়ে মনে হলো রমেন্দ্রনাথ যেমন প্রিয়দর্শন, তেমনই প্রণাম্য। জীবনানন্দের প্রকৃতিমগ্নতার ভক্ত তিনি; সুমধুরকণ ও কল্পনানিধানের প্রকৃতিচিত্রেরে যদিও এই নবীন নিদর্শনপ্রাপ কবির সঙ্গে সমকালীন তরুণদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় মাইতির-ই যৌথ হয় সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশি। আর, এইবারে প্রবীণ হেমচন্দ্র বাগচীর কথা বার-বার মনে পড়ে। হেমচন্দ্র অবিশিষ্ট নবীনদের মধ্যে প্রবীণ,—যেমন কিঞ্চিৎ সময়েরই স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার বা অশোকবিজয় রাহা। রমেন্দ্রনাথের 'নিষ্টিমন'-এর তৃতীয় কবিতার নাম 'স্মরণ আর জ্ঞান'। শুধু স্মরণ আর জ্ঞান নয়, পুরুষের পিপাসা এবং সংবেদনশীল মনের তাকনা আছে তাঁর কবিরের মূলে। 'প্রভাত থেকে গোবুলি' নামে এ-বইয়ের চতুর্থ কবিতা তাঁর বীকানন্দের বার্তামত। 'মেঘ আসে', 'ডেউ ডেউ', 'নরম নিবিড়' প্রকৃতি নাম থেকেই তাঁর প্রবণতার ধারণা করা চলে। 'জলজিবি' বা 'বনলতা সেনকে' কবিতা-শিরোনাম থেকেই জীবনানন্দ সম্বন্ধে তাঁর অহরণ্যের লক্ষণ বোঝা যায়। কিন্তু ঠিক এই নিদর্শনবাহুল্যের প্রসঙ্গ দ্বারা এই কবিতা-পাঠকের মনে আরোমব প্রর বেশা দিতে পারে। প্রকৃতি বিপুল, সম্ভেহ নেই। আকৃতিত্বায়, সাবাদিক পীড়নে এবং নানান আবির্ভাবিতে ক্ষুদ্র মনের গুণের প্রকৃতির প্রসঙ্গ মৃগজীবির স্ব-প্রভাবের কথাও সকলেই জানেন। সংকবির পক্ষে সে বিষয়ে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রকৃতির তপনস্বভায়ে কবিরের ব্যাহুল্যটা ঘটা বুঝি স্বাভাবিক। রমেন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ভক্ত পাঠকরা হয়তো সেইসঙ্গে আরো আশা করবেন যে, আকর্ষণ এই বিশ্বপ্রকৃতির পটে তাঁর নিজের মূর্তি ভবিষ্যতে আরো বেশি করে আদ্যশ্রিত্য যৌথনা করুক। অর্থাৎ একালের আরো জ্বলন্ত কবিরচনে সমন্বিত হবে মাহুদ আর মাহুদের চারি-দিকের জগৎ একইসঙ্গে দেখা দিবে,—যাক হোক,—একালের

মানবমনের স্বচ্ছ-কাগজের মধ্য দিয়ে চিরকালের প্রকৃতির লেখাখানা হ্রাস করে তিন তিনি। জীবনানন্দের পুনরাবৃত্তি নয়,—রবীন্দ্রনাথের নয়, কালিদাসের নয়, বার্তাবার্তার নয়,—রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘সব লেখা লুপ্ত হয় বারংবার সিন্ধবায় তরে’! তবু বাঙালী কবিরের ওপর কিছুকাল থেকে জীবনানন্দের প্রভাব লক্ষ্য করেই একথা বিশেষভাবে মনে পড়েছে; রমেন্দ্রনাথের ‘মিষ্টমন’ আবার ভালো লেগেছে বসেই এইসবের কথাটা প্রকাশ করা গেল। কিন্তু পরামর্শ পেওয়া বা ফরমান জানানো হতো সহজ, পথ দেখানো ততো নয়। স্রষ্টার কাছে পর্যন্ত শুধু বিমোহ নিবেদন জানাতে পারেন। ততোধিক দাবি করা অশিষ্ট মাজাজানহীনতার পরিচায়ক। অতএব এর বেশি কিছু আর বলবার নেই।

মানব-সংসারের দিকে এই প্রকৃতি-অনুপ্রাণিত কবি যে আসে তাই কেন্দ্রবিন্দু, তা নয়। তিনি লেগেছেন—

‘পরের জীবন কাঁধে ইটকাতে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে
জোনাকির মত আশা মরা বস কণিক হোঁকারে...’

—কবিতার মেঘ

আবার, বইয়ের দ্বিতীয় বিভাগে ‘শিক্ষক-সংগ্রাহ্যে’ লেখাটির মধ্যে—

রেশমের গড়া কড়া কাঁকরের চালে
পর ভ্রমের সিনেও বিরোধে কর্দে-শক্তি
কর্মবিরতি যে তাগেরই;

এবং সেই দ্বিতীয় বিভাগেরই ‘জীবন-ভিজ্ঞান’তে তিনি পুনরাবৃত্তি জানিয়েছেন—

কিছু হুঃ কিছু হুঃ জীবনের নিবে পং ঢলা
মেখে মেখে পৃথিবীর প্রাচীন হৃদির তানলা।

তাই হুম পথে পথে বেয়ে ওঠে নৃপুং-নিকপে
অস্তরের অধির বহুলা পুরে কর্ণন-কাকনে!
সিনে হ্রাসে কালো আলো বিচিত্রের তীরে বসে ভাল,
চলন্ত পথের মাঝে কত ভাগে জীবন-ভিজ্ঞান!

চতুর্থ মঞ্চতায় কিছু কিছু বাধা যে না ঘটেছে তা নয়, শেষের বছরটাও মাকে-মারে অব্যাহত আঘাত পেয়ে যতে, কিন্তু সেসব সবেও ‘মিষ্টমন’-এর তুল্য কবির উদ্বিগ্ন সজাবনার ভ্রমে পাঠকের পক্ষে প্রতীকটো আশ্বস্তিক। বইখানির অরলক্ষ্য মনোহর, কিন্তু ছাপার কাজে প্রচণ্ড-সেবার কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। —হুমসার দিত্র

॥ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয় পর্ব) ॥

[লেখক : অধ্যাপক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। প্রকাশক : বুকস্ট্যান্ড এন্ড ইন্সটিটিউট প্রিন্টিং, ১, নতুন ঘোষ লেন, কলিকাতা ১। দ্বিতীয় পর্বের আট টাকা।]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বহু মাসের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা এবং এক বিপুল পটভূমিকার বিচিত্র উপায়ান নিয়ে গঠিত হয়ে গড়ে উঠেছে। এই ইতিহাসের উৎস-সম্প্রদায়ের প্রয়াস নিঃসন্দেহে দৃঢ় এবং সেখানে সেই প্রয়াসকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিবদ্ধ আলো দিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়, সেখানে সেই প্রয়াস দৃষ্টান্তরূপে দেখা দেয়। কারণ কেবল ঘটনাই তার ব্যাখ্যা পথ নয়—ঘটনার আবহাওয়ার পেছনে যে সংঘাত, যে বিবর্তন রয়েছে, তার বিচার-বিবেচন ও তার আংশিক মূল্যবোধ-নির্ভর প্রকৃতি বিবরণি সেখানে বড়ো হয়ে ওঠে। কাজেই পরবর্তী প্রয়াস অপেক্ষাকৃত কঠিন সাধনার দাবি রাখে।

‘বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা’ এমনি এক সাধনার পরিপূর্ণ সার্থক ফল। গ্রন্থটির সমগ্র আয়োজন—এক পত্রীর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়ে দেখার আলোয় উজ্জ্বল। এবং তা এতই উজ্জ্বল যে, কোনো মনুষ্য কোণেও এতটুকু ছায়ায় অন্ধকার নেই। প্রবন্ধ-

সাহিত্যের নীচের কারবারে এসেও, লেখক ঠিকি হেবার চেষ্টা করেননি। নির্বিচ্ছিন্ন আত্মবিক্রমের সঙ্গে তাঁর রচনা তিনি উৎসাহিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যের সত্যিকারের পাঠক এর মত তাঁর গুণ নিচের বীকার করবে।

এখানে ভারতচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাহিত্যের এই বিজ্ঞান আখ্যায়িক তাঁর আলোচনার ক্ষেত্র। তিনি বিংশশতাব্দীর রায়ে এসে থেবেছেন। সত্যতঃ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তী আখ্যায়িক নিয়ে তিনি পুরে অগ্রসর হবেন। ভারতচন্দ্রের পর থেকে বিংশশতাব্দীর পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের এই যুগের কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও নাটক এই চারটি বিষয় নিয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে সাধারণভাবে এই যুগটিকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ বলা যায়। এই আধুনিক যুগ এখনও চলছে। আধুনিকতার সংজ্ঞা কি—সেই সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “ব্যবহারিক অর্থে অব্যবহিত অনুভব কালের সঙ্গে দাঁকি-মুঠ তাই আধুনিক” এবং

“সংস্কৃতি-ইতিহাসে আধুনিকতা। একটি কালখণ্ডকে অভিজ্ঞা নয়,—নানা লক্ষণ চিহ্নিত একটি বিশেষ অবস্থাকেই আধুনিকতা নামে অভিহিত করা হইবে থাকে।” এবং এই আধুনিকতা “অতীত নিঃশব্দ একটি বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব” নয়।

লেখক আধুনিকতার এই মানদণ্ড দিয়ে পরবর্তী সমগ্র সাহিত্যকে ও তার পটভূমিকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই আধুনিকতার পরিচয় শুধু হইবে একটিমাত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র করে এবং সেই বিদ্যুতি হ'ল “বিশুদ্ধ মানবতাবোধ”। এ আধুনিক মূলকে তিনি তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন: ১ম—(১) বয়ঃসন্ধির প্রারম্ভিকাল, (২) বয়ঃসন্ধি ও যৌবন-মুক্তির কাল এবং (৩) মুক্ত যৌবনের পার্থক্য পরিণতির কাল। সমগ্র গ্রন্থটি ছুড়ে এই তিনটি কালের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রদর্শন।

পুস্তক উল্লেখ করা হইবে যে, বাংলা সাহিত্যের বিরাট পটভূমিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ আলো দিয়ে প্রকাশ করা এই গ্রন্থের প্রাথমিক উদ্দেশ্য, সাহিত্যকে অসংস্কৃততার সঙ্কেত মিলিয়ে বিচার করা নয়। কারণ গ্রন্থটির নামেই বলা হইবে এটি সাহিত্যের কথা নয়, ইতিহাস।

সাহিত্যের ইতিহাসের এই যুগকে তিনি সাম্প্রদায়িক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণই বৃত্তিদ্রব্য। সাহিত্য সমালোচনাই প্রতিচ্ছবি এবং প্রতিচ্ছবি, এবং এই সমগ্র সাম্প্রদায়িক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার দর্শন।

মোগল শাসনকালে বাংলার অবস্থা কি ছিল তাই নিয়ে তিনি প্রথম শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন, এই যুগটি সবদিক থেকে একটি বিনষ্টের যুগ। সামাজিকভাবে তখন একেবারে নিষ্করণের নেমে পড়েছে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা চরম। এই যুগের অন্ধকার রাত্রি থেকে বৃত্তিদ শাসনের প্রাথমিক পর্যন্ত যে সময় চলে গেছে, তারি মধ্যে যে সামান্ততম সংস্কৃতির উত্তির আভাস দেখা গিয়েছিল, তা হ'ল কারলী ভাষা-শিক্ষার কথা দিয়ে। কিন্তু কোনো ভাবেই এই ভাষা সেইসময়কার কাব্যকে (মনসকাব্য ও বৈষ্ণব পরাবলীকে) প্রভাবিত করেনি, কিন্তু তার উপাদানকে কিছুটা স্পষ্ট করেছে।

পরবর্তী যুগ অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের সশ্রমে আগার প্রথম যুগকে লেখক শ্রীমত চৌধুরী পুনরুজ্জীবনের উৎসযুগ (রেনেসাঁর প্রথম যুগ) বলেছেন, এবং এই পুনরুজ্জীবন হয়েছে ইংরেজের ব্যক্তিগত চরিত্রের সম্পর্কে আগার সঙ্গ নয়; কারণ সেইসময়কার যে-সময় ইংরেজের চরিত্রের চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেই চিত্র অত্যন্ত অস্পষ্ট। লেখকের স্বপ্ন বিশ্লেষণই সত্য। তিনি বলেছেন,

“বসতি-বিশেষ ও অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ততা, নীতি ও জীবিত্যের চম্পবেশে অস্বস্ত্য নরহত্যার কলকে বৃত্তিদ-ভারতের ইতিহাসকে অনশন্যে রানিধূগ করেছে।”

তুৎ বাঙালীর এই পুনরুজ্জীবনের কথাটি ঐতিহাসিক সত্য। এবং এই পুনরুজ্জীবনের মূল ছিল, ইংরেজি ভাষার জ্ঞানভগ্ন ও জীবনগতের আলোকে আগার যুগোপ। আগার ছাত্রত্বের মনস্তত্ত্বের সন্ধানের মাটিতেও ইংরেজি ভাষার কলে পেয়েছি রামমোহন রায়কে, মাইকেল মধুসূদনকে এবং বিভাগ্যসারকে। স্বতন্ত্র, এই তিনটি মাহুদ বাংলায় মনোভাগ্যের প্রধান হোতা। অধ্যাপক শ্রীমত চৌধুরী এই দশবিধের সমসাময়িক কাল ও তারই পটভূমিকার তাদের সাহিত্য ও জীবনকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

বাংলা নীতি-কবিতা, সংবাদপত্র, উপন্যাস ও প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের সবগুলি বিভাগ সম্পর্কে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, লেখক বাংলা সাহিত্যের বহু অতিপরিচিত, পরিচিত এবং প্রায় অপরিচিত লেখকের একটি মূল্যবান গ্রন্থপঞ্জি রচনা করে, তাঁদের রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে এবং তার সহকালীন অবস্থা বিবরণ করে আমাদের সত্যই ধন্যবাদার্থী হয়েছেন।

যুগকে জানা—সর্বকালের মানুষের অস্বস্ত্য প্রধান প্রচেষ্টা। এই যুগ প্রতিচ্ছবিত হয় তার সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে। এবং একটি যুগ, সে কোনো স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশ নয়; সে যুগ তার অতীতের উপর এবং তার আগামী কালের উপর দৃষ্টি রেখে লোকের অঙ্গোচ্চরে এগিয়ে চলে। এই এগিয়ে-চলার চম্পবেশে জানা এবং জানানো উভয়ই কঠিন কাজ, এবং গভীর অধ্যয়নের কাজ। লেখক শ্রীমত চৌধুরী এই কঠিন কাজের অগ্রগতির উত্তীর্ণ হয়েছেন একথা বলা বেড়ে পারে, কারণ পরবর্তী কালের সন্ধানী পাঠককে এই গ্রন্থের কাছ থেকে প্রকৃত সাহায্য নিতে হবে। বাংলা সাহিত্যের বাজারে এই গ্রন্থটিকে একটি বহুমূল্যবান পণ্য বলে বীকার না করে উপায় নাই।

এই গ্রন্থের ভাষা আমার খুব ভালো লাগে। প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভাষা যে কবিতার ভাষা বা কথা-সাহিত্যের ভাষা হবে না, সে কথা বীকার। শুধু তাই নয়, ভাষা যদি একটু পুরনো আদিকেরও হয় তাতেও অভিযোগ করার কিছু নাই। কিন্তু ভাষার মধ্যে পরিবেশ থাকা চাই এবং বলার কথাকে যত্নের ও বদ্ধ করে বলা চাই। এই গ্রন্থটির মধ্যে এই গুণের কিছু অভাব বেটেছে।

কিন্তু এই সামান্য অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, এই গ্রন্থটি যে সাহিত্য-পাঠকের কাছে একটি মূল্যবান সম্পদ তা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়।

—সুহৃদ আইতি

। বাদশাহী আমল ।

[হারিশাখ বানিসের অমণ-বৃত্তান্ত-অধ্যয়ন বিষয় বোধ কর্তৃক লিখিত । প্রকাশক : ইতিহাস ব্যাসোদিষ্টেউ পাথগিনি : বোং জাইবট লিমিটেড, ২৩, বহোলা বাথী বোড, কলিকতা ৭। মূল : পাঁচ টাকা]

ভূম্যায় ঘটনা ও সন-তারিখের বৃত্তান্তকে আত্ম আর ইতিহাস বলা হয় না। ঘটনা ও তারিখ কোন দেশের ইতিহাস-রচনার অন্ততম উপাদান হলেও সম্বন্ধীয় নয়। ঘটনা ও সন-তারিখের কাঠামোয় একটি দেশের চলমান জনপ্রবাহের স্থখ-দুঃখ-শোলাচিত ধারাবাহিক জীবন-কাহিনীই নামাশ্বর ইতিহাস। বৃহত্তর লোকসমাজের জীবনযাত্রা ও ধ্যান-ধারণার কথাই হলো ইতিহাসের বিষয়বস্তু। অর্থাৎ যাত্রা কাল করার, সেই ভাণ্ডারান হাফা-রাফাভারান নব, যাত্রা কাল করে সেই জনসাধারণ-ই আত্ম ইতিহাসিকের লক্ষ্য। সুস্থের কথা, ইতিহাস এখন যাত্রা কাল করে তাদেরই দিকে। কাল করার যাত্রা তারা ক্রমশ বিদায় নিচ্ছে।

এতদিন পর্যন্ত ঘটনাগর্ভী, তারিখের কিরিত্তি, রাফা-বামশাহ্বের কাহিনী নিয়েই ইতিহাস লেখা হতো। সাম্প্রতি ইতিহাসিকরা তাঁদের কুল বুকেছেন এবং ইতিহাসের লক্ষ্য সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছেন। দৃষ্টিকোণ ও রচনাপদ্ধতি নিয়ে ধর্ম ও সাম্প্রতিক ইতিহাসিকরা জিম্মত, তবু একটি ব্যাপারে তাঁরা সকলেই একমত যে, বৃহত্তর জনসাধারণের জীবনযাত্রার মৌল রূপের স্বাক্ষর-ই আসলে ইতিহাসের উপলক্ষ। সে কারণে ইতিহাস-রচনার পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে।

শক্তির এই ক্রমবর্ধমান ইতিহাস-সচেতনতা প্রণয়নীয়ভাবে লক্ষ্য করার মতো। এবং সেখানে আবাসের যেনের তথাকথিত বিবিধরী ইতিহাসিকদের দৃষ্টিগোচরী পৃষ্ঠভূমীর অপরিসরনীয়তা বৈশাখ্যক। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, সমাজব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস এবং পুণ্যকাহিনী, লোকপ্রতি, সাহিত্য, পিলাসেব, শিল্পকলা, মুদ্রা ইত্যাদিতে যে প্রচুর উপাদান বর্তমান, তা দিয়ে ভারতবর্ষের তথ্য ভারতীয়দের একটি স্বন্দর বিজ্ঞানশ্রমত ইতিহাস রচনা করা হাব, অথচ দুঃখের বিষয় তেমন একটি উন্নয়নযোগ্য আনন্দধারক সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও রচিত হলো না।

উপর ইতিহাস-রচনার যে-সব উপাদানের কথা বলেছি, তার মধ্যে অন্ততম, শুধু অন্ততম নয়, অন্যতম প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য উপাদান হলো বিশেষ পৃষ্ঠকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত। এই বিশেষ পৃষ্ঠকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত ইতিহাসের যে কত প্রয়োজনীয় উপাদান হতে পারে তা ইতিহাসের ছাত্রমাত্রাই

জানেন। আবাসের এই ভারতবর্ষে একসময় বিশেষ পৃষ্ঠকরা প্রচুর সংখ্যায় এসেছিলেন। তাঁদের সেই ভ্রমণকাহিনী, প্রাচীন বিশেষত মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস-রচনার সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান।

ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাং, আল-বেরুনী, ইবন বতুতা, টমাস হো, তাতানিয়ের প্রভৃতি বহু বিখ্যাত বিশেষ পৃষ্ঠকদের নামাবলীর অন্ততম হলুদ নাম ফা-সোরা বানিয়ের। বানিয়ের জাতি কহানী, ঠাঁছু গ্রামে জন্মেছিলেন। ১৩৮৭ সাল থেকে ১৩৯৭ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের নামা ভ্রমণায় ভ্রমণ করেন। বেগে কিসে গিয়ে করাচী সম্রাট জহাংন লুই-এর অহমতিক্রমে তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করেন।

বানিয়েরের নাম একটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য, সেটি হলো তাঁর মুক্তিভিত্তি ও সংস্কারমূলক মন এবং অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি। 'বানিয়ের একজন সামান্য পৃষ্ঠক বা সৌখিন টুরিস্ট ছিলেন না। তিনি ছিলেন পার্শ্বিক-পৃষ্ঠক। যা তিনি চোখে দেখতেন তা নিয়েই বুদ্ধি নিয়ে বিচার করে দেখতেন। যা তিনি শুনতেন, তা নিয়েই বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করতেন। তাঁর সমকালীন অন্যান্য পৃষ্ঠকদের দেখার সঙ্গে তাঁর দেখার একটা বিরাট পার্থক্য আছে। ...বানিয়েরের পৃষ্ঠভূমীর ব্যতিক্রম, বানিয়েরের বর্ণনাভঙ্গী ও বিশ্লেষণ-ভিত্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছেই তাঁদের দৃষ্টিগোচর হবে।'

অন্যান্য সমসাময়িক পৃষ্ঠকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে বানিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের পার্থক্য তাঁর মুক্তিভিত্তির পৃষ্ঠভূমী ও বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণশক্তিতে। বস্তুত, বানিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে মধ্যযুগের, একটু অন্তর্ভুক্ত মূল্যমানযুগের, ভারত-বর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপকরণ এত আকর্ষণকভাবে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান যে, তাতে সন্তোষ শতকের এই সার্বজনীন পৃষ্ঠকদের কাছে প্রচাষ মাথা নত না করে পাঠ্য দায় না।

'বাদশাহী আমল' এই মূল্যবান ভ্রমণবৃত্তান্তের অন্বেষণ; পুরোপুরি অন্বেষণ বললে কুল হবে, কারণ অন্বেষণ শব্দটি বিনয় বোধ ভ্রমণবৃত্তান্তটির সেই সমস্ত অংশই অন্বেষণ করেছেন, যার মধ্যে সামাজিক ইতিহাসের মালমশলা আছে এ প্রদেশ বানিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অন্বেষণ

কর্তৃত্ব যোগ্যপ্রমাণ সমাচারের সঙ্গে বর্তমান অস্থাবরতার পৃষ্ঠভূমির পার্থক্যও লক্ষণীয়। হাই হোজ, সংক্ষেপে সত্ত্বপন শতাব্দীর প্ৰেক্ষণের, বাস্তবায়ী আমলের সামাজিক ইতিহাসের যাকিউ শতকলমযোগা মূল্যবান উপাধান বানিয়েয়ের ভ্রমণ-পুস্তকের মতো আছে, তার সংগ্রহই সম্পূর্ণভাবে বর্তমান যোগ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তা ছাড়া, প্রত্যেকজনীর চাক-চিহ্ননী যোগ্য করে অস্থাবরতা এ-হেন বই-এর মূল্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আলোচ্য ভ্রমণপুস্তকের বানিয়েয়ের যে বিশেষণী পৃষ্ঠভূমী ও মঙ্গলোৎসব পর্ববৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তার অল্প ঠাক প্রকাশ্য করতেই হয়। উদাহরণত, 'হিন্দুস্থানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি', 'হিন্দুস্থানের পরিচয়কারক' বা 'শিল্পী ও শিল্পকলার অবস্থা' সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তা বীতিমতো ভাবব্যাহত মতো। তিনি লিখেছেন: 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন পরিচয় দিচ্কা করা হত না, নিরাপত্তাও ছিল না। সম্পত্তি সব হলো সন্ধানের। রাষ্ট্রের ও ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির মালিক সন্ধান। সন্ধানের অন্তরে থাকা কাজ করেন তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন অধিকারই বীত হত না। তাঁদের সন্ধানের পর ব্যবসায়ী সম্পত্তির মালিক হন সন্ধানী নিজে' (পৃ. ৭১)। কু-সম্পত্তিতে এই ব্যক্তিগত মালিকানার অভাবকে তিনি হিন্দুস্থানের গারিহোর অল্পতম কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। এ-প্রস্তাব তিনি যা বলেছেন তা বিপরীতভাবে উল্লেখযোগ্য: 'খনি ও মৌল সাম্রাজ্যের সোনাকপোর ও সম্পদের আদি-অন্ত নেই, তাহলেও সোনা যে অল্প দেশের তুলনায় মৌলসম্পদের পূর্ব বেশি আছে তা মনে হয় না। বরং হিন্দুস্থানের সোতদের দেশে মনে হয়, তারা অন্তর্ভুক্ত অনেক দেশের সোতের তুলনায় বেশী গরিব। মনে হবার কারণ আছে। প্রথম কারণ হল: সোনা অনেক পরিমাণে গলিয়ে নেই করে কোলা হয়, অর্থাৎ সোনা গলিয়ে মেয়েদের নানারকমের অলঙ্কার তৈরি করা হয় এবং হাত, পা, মাথা, গলা, নাক, কান সর্বত্র অলঙ্কার করার জন্য সোনা অশচর করা হয়।...আমাদের ও অর্থাহারে থেকে ও ভারতবর্ষে সোনার গহনা পড়ায় সোত ও অভ্যাস দুই প্রকার। দ্বিতীয় কারণ হল: সন্ধানী দেশের সমস্ত সম্পত্তির মালিক, বিশেষ করে কু-সম্পত্তির। সামাজিক কর্মচারীদের বেতন হিসাবে তিনি কু-সম্পত্তির ভোগাধিকার দান করেন।...এইভাবে কু-সম্পত্তির অধিকারী থাকা হন—স্বাধার, জাহাঙ্গীরদার ও জমিদার— তাঁরা প্রজাদের একমাত্র হর্তাধিকারীরা হয়ে বান, চাষীদের উপর তাঁদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় থাকে, এমন কি নগর ও

গ্রামের বণিক-মেদী ও কারিগরদের উপরেও। এই কর্তৃত্ব ও আধিপত্য তাঁরা যে কি নির্মমভাবে প্রয়োগ করেন, নিষ্ঠুর অত্যাচারীর মতন, তা কল্পনা করা যায় না। এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ করারও কোন উপায় নেই। কারণ যিনি রক্ষক, তিনিই ডকক:—এই অবস্থাকে আমরা 'খাসব' ছাড়া আর কি বলতে পারি? এই পদবই হল হিন্দুস্থানের প্রগতির পথে সবচেয়ে বড় অঘটন। ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক অবস্থা, ব্যক্তিগত জীবনাদি, যাচার-ব্যবহার সব কিছু এই কারণে এত অগ্রহত বলে মনে হয়' (পৃ. ১০৮-১)।

অন্তঃপর তিনি বলেন: 'আমার পুত্র বিশ্বাস, সোনাকপো এইভাবে মনুষ্য করে রাখার অভ্যাস যুক্তিহীন নিত্যাধিত্য এবং খরচ না করে টাকা জমিয়ে রাখার প্রকৃতির অল্পই হিন্দুস্থানের গারিহোর এত বেশি। উপাধিত অর্থ দিয়ে সেন্সেন না করে যদি তা ঘরে সঞ্চয় করে রাখা হয়, তাহলে পর্যাপ্ত ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও কোন দেশের গারিহোর দ্ব্য হতে পারে না' (পৃ. ১০৮)।

কু-সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অভাব সম্পর্কেও তাঁর বিশ্বাস: 'ইংল্যান্ডে যে সব রাষ্ট্রে সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার আছে এবং যে সব রাষ্ট্রে নেই, তাদের অবস্থা তুলনা করে দেখে আমরা সূচক বিশ্বাস হচ্ছে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সীকার না করলে রাষ্ট্রের মারাত্মক ক্ষতি হয়।... এই কারণেই শুধু হিন্দুস্থানের না, এশিয়ার প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের জমিক অবনতি হয়েছে' (পৃ. ১০২-১০)।

যে দেশের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা এ ধরনের শোচনীয়তার কলঙ্কিত ও বিপর্যক, সে দেশে যে শিল্পকলার সুখ-সুখের বিকাশ সম্ভব নয়, সে সম্পর্কেও বানিয়েয়ের প্রাক্ক-মনোচিত বিশ্লেষণী পৃষ্ঠভূমীর পরিচয় দিয়েছেন (পৃ. ১১১-১৩)। শুধু তাই নয়, 'সতীসাহ' ও 'সহমরণ'-এর মতো ভারতীয় বিশ্বাস ও সংস্কারমূলক নিষ্ঠুর প্রথাও তাঁর সত্যসন্ধানী পৃষ্ঠকে ঠাকি দিতে পারেনি। তাঁর চোখের দেখার সতীসাহ ও সহমরণের ঘটনাসমূহ দৃষ্টান্তবাহী, তাঁর দেখার চোখে তা চিত্তাশীর্ণ। তাঁর বীণজিসমূহ মন সতীসাহ ও সহমরণ সম্পর্কে এতদেবীয় সোতদের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হরনি। তিনি এ সম্পর্কে নিজে চিন্তা করে মন্তব্য করেছেন: 'বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানের মেয়েদের মনে নানারকম কুসংস্কারের বীজ বপন করা হয়। প্রত্যেক মেয়েকে মা শিক্ষা দেন যে বামীই হলেন একমাত্র দেবতা এবং স্ত্রুত স্বামীর ডগাধাপনের সঙ্গে নিজের বেহাশিণির সেওয়ার চেয়ে জীবনের নহতর কর্তব্য

আর কিছু হতে পারে না। এটাই হল সনাতন গ্রন্থ। কোন নারী এ প্রকার বিরোধিতা করতে পারে না, কহা উচিত নয়, মহাপাপ। আনার ধারণা, পুরুষরাই হল এইসব গ্রন্থ ও সংস্কারের মষ্ট। মেয়েদের দাগীর মতন পণ্যবস্ত ক'রে রাখার মন্ত, তাদের সেবা-ভক্ষণা আশায় করার মন্ত, বাতে তারা কোনদিন কোন কারণে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারে সেই-জন্ত পুরুষেরাই মাথা ঘামিয়ে এই সব গ্রন্থ আবিষ্কার করেছে।

বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্ত শুধু বাঙ্গালী আশলের 'সামাজিক ইতিহাস' হিসাবেই মূল্যবান তা নয়, সুখপাঠ্যতার দিক থেকেও এ বই গল্প-উপন্যাসের চেয়ে কোনো অংশে নান নয়। জটিল হিন্দু-কেন্দ্রী-ভট্টীর সূত্রে দিল্লার ঐ নামে ঔরঙ্গজীবের হারেমের খোজার প্রয়াসকাহিনী, ঔরঙ্গজীব-ভট্টী রৌপন-আরার প্রেম সম্পর্কিত গল্প, গণ্যকারকের মজার গল্প, হারেমের মেসার বর্ণনা প্রভৃতি পাঠ করলে কৃতনিশ্চয় হওয়া যায় যে, এ বই 'যে-কোনো উপন্যাসের চেয়ে সুখপাঠ্য'। তা ছাড়া ঔরঙ্গজীবের চরিত্র সম্পর্কে প্রাথমা গঠন করবার পক্ষেও বার্নিয়েরের মতো সন্ধানের একজন অজরক প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তিগত বিবরণ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। শুভাকাজী পরামর্শ-মাতার পরামর্শ শুনে ঔরঙ্গজীব বা কলচ্ছিলেন (পৃ. ৪২-৪৩) কিংবা পিতা শাহজাহানকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে ঔরঙ্গজীবের চরিত্রের একটি উজ্জল দিকের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং ঔরঙ্গজীবের বোধহুটি বীকার করে নিয়েও সমসাময়িক বার্নিয়ের তাঁর সম্পর্কে বা বলেছেন তা নেহাত অত্যাধিক বসে বসে হয় না। ঔরঙ্গজীব সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : 'সমস্ত বোধ-প্রতি নিয়েও তাঁর মতন একজন প্রতিভাবান, শক্তিশালী, বিচক্ষণ ও মহান সম্রাট হিন্দুধর্মে খুব কমই লম্বেছিলেন' (পৃ. ৭৮)। এ প্রসঙ্গে আধুনিক ঐতিহাসিক-বৈদ্য পবেষণা স্তরযোগ্য।

বার্নিয়েরের এবং বিধি হুতিনিষ্ঠ মন ও বিশেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 'বাঙ্গালী আমল'-এর পাতায় পাতায় প্রকীর্ণ; এবং

তাঁর বইটি আদ্যন্ত পড়লে বোঝা যায়, কেন ১৮৫৩ সালে, যাক থেকে একশো বছর আগে, কাল মার্জ ও ক্রিডারীশ এঙ্গেলদের মতো প্রথম বনৌষধ ঔকে ব্রজা ব্রানি-ছিলেন, উজ্জ্বল ডাঙ্গার প্রঃসা করেছিলেন তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের। বরত, ডাঙ্গারীসের সামাজিক প্রঃ, ঐতিহাসিক, আচা-ব্যবহার ইত্যাদির ব্যাখ্যায় ও বর্ণনায়, মাত্রের চরিত্র ও প্রকৃতি বিবরণে তাঁর লক্ষ্যবস্তুবস্তির অসাধারণ ও অস্বপ্নের গভীরতার অব্যাহত হতে হয়। এ সম্পর্কে জীবনর যোষের উক্তি আকর্ষিক অর্থেই সত্য : 'যেমন তাঁর অসাধারণ লক্ষ্যবস্তুবস্তির তেমনি তাঁর লক্ষ্যে বর্ণনার ক্ষমতা। কোন সংস্কার বা বার্থের দিক থেকে তিনি কোন ঘটনার বা বিষয়ের বিচার করেন নি। বা কেনেছেন, উত্তরভারত থেকে লক্ষ্য-ভারত, লক্ষ্যভারত থেকে পূর্বভারত পর্যন্ত তা নিরপেক্ষভাবে বৃত্তবার চেষ্টা করেছেন নিম্নের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও দৃষ্টি বিঃ। ... তাঁর অস্বপ্নবাসী দৃষ্টি রাজসরবার থেকে বাইরের বাজার-ঘাট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সম্রাট, স্বামীশ-ওবরাহ থেকে ভারতের সকল শ্রেণীর লোকের জীবনব্যাপ্তি তিনি লক্ষ্য করেছেন এবং তাদের কথা সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের মতন বর্ণনা করেছেন। ... এইরূপই বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তকে নিঃসন্দেহে মোগলযুগের, বিশেষ করে সম্রাট পরাকীর অর্থাৎ ঐক্য-পূর্ণযুগের ভারতের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশেষ মূল্যবান মৌলিক উপাদানগ্রন্থ বলা যায়।'

তাই 'সামাজিক ইতিহাসের অঙ্গরাগিণী থায়া, তাঁরা এই 'বাঙ্গালী আমল' থেকে নধ্যযুগের ভারতীয় সম্রাট ও সম্রাতি লক্ষ্যে অনেক নতুন তথ্য ও চিত্রার পোষাক পাবেন।'

আর, ক্রঃসোদা বার্নিয়েরের জীবনী, পূর্বাভাস ও ভ্রমণ-বৃত্তান্তের যচ্ছন্দ-স্বন্দর অধ্বাধের মাধ্যমে সেই তথ্য ও চিত্রা যোগানোর মন্ত 'বাঙ্গালী আমল'-এর প্রণেতা জীবনর যোষ আমাদের কাছে পাবেন অস্বপ্ন-উজ্জল দৃষ্টবাস।

—কল্যাণদেবী লক্ষণ

। অমৃতকল্যাণী ।

[লেখক : সুনীতি বসু। প্রকাশক : সুনীতি প্রকাশনী, ৬, হার্ডি সেন, কলিকাতা ২০।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ২০০ (১ চিত্রাই)। মূল্য : মাত্র তিন টাকা]

বাংলা শিশু-সাহিত্যের আসরে মনোজিৎ বসুর নাম সুপরিচিত। 'অবনীন্দ্রনাথ', 'গল্পের মনোজিৎ', 'ছোটদের মনোজিৎ', 'বঙ্গজীবনের দীপনিধি', 'বীরবন্দনা', 'ভারত স্বাধীন

করল যারা', 'বাবু লুই হাটশিলা-বাংলা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি একাধারে কবি ও গল্পলেখক। শিশু ও

কিশোর মনস্তর সম্পর্কেও তিনি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। রূপক-কাহিনী-রচনাত্তেও তিনি সিদ্ধহস্ত। সম্প্রতি তাঁহার রচিত ছোটদের উপযোগী কবিতা গল্প হিন্দী-ভাষায় অনূদিত হইয়া ‘সালভারতী’তে প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু, বাংলা কথা-সাহিত্যের আসরে মনোভিৎসবাবু খুব বেশিদিন অবতীর্ণ হন নাই। অবশ্য, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি বহুদিন হইতেই প্রবন্ধ লিখিতেছেন। সাম্প্রতিক কালে উাহাকে কাব্য-সাহিত্যের আসরেও দেখা হইতেছে। কিন্তু, আলোচ্য গ্রন্থখানির মাধ্যমেই তিনি বোধকরি সর্বপ্রথম উপক্ৰান্ত-রচনায় হাতে দিলেন। বইখানি পড়িবার পূর্বে আশঙ্কা ছিল যে, একজন শিশু-সাহিত্যিকের গম্ব কি একখানি সার্থক উপক্ৰান্ত-রচনা সম্ভব? কিন্তু, বলিতে বাধা নাই যে, মনোভিৎসবাবু আমাদের সে-আশঙ্কা দূর করিয়াছেন। তাঁহার রচিত ‘অমরজয়ন্তী’ সত্যিই একখানি সার্থক গ্রন্থ।

উপক্ৰান্তের সজ-বিচারে ‘অমরজয়ন্তী’কে অবশ্য উপক্ৰান্ত না বলিয়া বড়গল্প বলাই বাহুল্য। ইহাশ্রীঃ কালে এমন হৃৎপাঠ্য বড়গল্প খুব বেশি বাহির হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ভাষার প্রাকলভ্যতা ও চরিত্র-চিত্রণের নিপুণতা ‘অমরজয়ন্তী’কে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। গ্রন্থের মূল উপজীব্য একটি প্রণয়-কাহিনী। সেই কাহিনী-বিভারে মনো চরিত্রের সন্নাহেণ হইয়াছে। প্রত্যেকটি চরিত্রই লেখকের রচনা-নৈপুণ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া নায়ক

অমর, নায়িকা অমরী, নায়িকার মা ইন্দ্রাণী, সখীত-সখক রমেশচন্দ্র, অমরর বন্ধু নির্মল, অমরীর প্রণয়-প্রার্থী এতিমিয়ার অতঃ ও অমরীর দাচ্ চন্দ্রনাথবাবের চরিত্র। অমর ও অমরীর প্রণয়-কাহিনী রচনা করিতে গিয়া লেখক সর্বমুখ্যে যে সংসার ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন, মিসনেব্দে তা প্রণয়-সখীত। সখীত-নায়েক বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর পরিচয় দিতে গিয়া লেখক কোথাও স্যাধারণ পাঠক-ভিত্তিক ভারাক্রান্ত করিয়া তোলেন নাই, অবশ্য তাঁহার বিশ্লেষণের নিপুণতার বিভিন্ন রাগ-রাগিণী সম্পর্কে সাধারণ পাঠক কৌতূহলী হইয়া উঠিবেন। শিশুর কলিকাতা মহানগরীর বৃক্ক বসন্ত-সমাগম, খবরের কাগজের অফিস, ভেলি-প্যাসেজেরদের কথাপকখন, অমরনি হইতে অর-উত্তোলনের কলাকৌশল, নৃতন-জনপ-সঙ্গীর ব্যবহাণনা ইত্যাদির বর্ণনা লেখকের বাস্তব-জ্ঞানেরই নিখুঁত প্রতিকলন। ইন্দ্রাণীর দাচ্চন্দ্রের মনোবেদনা, চন্দ্রনাথবাবের ও রমেশচন্দ্রের যোগপ্রবণতা, অমর ও অমরীর তরুণ-জুসরের সংবত উদ্ভাস ও প্রণয়ের গভীরতা, অমিয়ার শেখরনাথের আদর্শ, নির্মলের বন্ধুদ্বিত্তি—সমস্তই পাঠক-মনকে জ্বালাতুত্বিত্রির এক গভীর আনন্দে তৃপ্ত করিয়া তোলে। তাই, এ কথা বলিতে বাধা নাই যে, মনোভিৎসবাবু ‘অমরজয়ন্তী’ একখানি হৃৎপাঠ্য সার্থক গল্পগ্রন্থ হিসাবে বাংলা কথা-সাহিত্যের আসরে সমাদৃত হইবে।

বইখানির প্রচ্ছদগণ্ট পিঙ্কলীনভিত্তি। কাগজ, চাপা ও বাধাইও ভালো।

—কেতনাথ দাস



। পৌষ-ফাগুনের পালা ।

[লেখক : সোমেন্দ্রনাথ রায় । প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১৮০ (১ ফ্রাটন) । মূল্য : দ্বিগুণীকা]

'পৌষ-ফাগুনের পালা' একগানি প্রথমধূর বড়গল্পের বই। লেখক সোমেন্দ্রনাথ রায় যে একজন হুমিধূর গল্পকার সে পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি তাঁর রচিত একাদিক ছোটগল্পে। কিন্তু তাঁর এই উপগ্রাসধর্মী বড়গল্পটিই বেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। কাহিনীর ভাল বুনতে গিয়ে জাহ্নগায় জাহ্নগায় তাঁর চরিত্র-বিশ্লেষণের যে ক্ষমতা দেখতে পেলাম, তাতে ক'রে ভরসা রাখি তিনি বাংলার কথ-সাহিত্যকে উত্তরোত্তর স্ফীত করবেন।

গল্পের আরম্ভটি বড় হৃদয়। তা ছাড়া, যে-আশিষে কাহিনীকারের মাধ্যমে তিনি এক সংসারযজ্ঞিত অভিজ্ঞতায় ধনী ভিক্ষী ও এক সংসারাবদ্ধ সংস্কৃত-অপাণ্ডকের প্রণয়-কাহিনীর বহু উপাটন করেছেন, তাঁর মধ্যেও কিছুটা অভিনব আছে। তথাকথিত 'হাই-ব্রাউ সোসাইটি'র বর্ণনায় লেখক কিছুটা কল্পনার সাহায্য নিলেও, বাস্তবতা একবারে উপেক্ষিত হয়নি। ন্যায়ক হরিপদের চেয়ে নারিকা শেলির মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে সোমেন্দ্রনাথ বেন অধিকতর রুচির বোধিয়েছেন। পার্শ্বচরিত্রগুলিও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। প্রণয়-কাহিনী রচনা করতে ব'লে লেখক যে-ভাষার সাহায্য

নিরেছেন তা কাব্যহৃদয়-যজ্ঞিত। জাহ্নগায় জাহ্নগায় উজ্জ্বলের প্রাবল্য থাকলেও, রোমাঞ্চিকতার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট অমার্জনীয় অপরায়ন। যেমন নারিকা ডিগ্টি লিখেছে প্রদর্শীর উদ্দেশ—“কালিদাসের কাল হ'লে আকাশের মেঘকে ভেঙে বলতে পারতাম, ওগো প্রিয় লগা, পৃথ-অ্যাপ্তি সলিল মল্লতাং পরিপাতঃ। যেহাট্টে তোমার! একবার বাগবাজারের নদু মিথির গলির ব'রে নদীরে বাড়িটাগ হাও বাড়া। পৌছে দিয়ে এলো আমার আকুল আমরণ বিশেষ এক ব্যক্তির কাছে। অবশ্র আমার অশ্রুই আবেগের উত্তরে হয়তো জ্বাবে আসত একালের ডাংবার, আশকল আর মেঘবৃন্তের ভরসায কেউ বলে নেই বাপু। কোথায় উত্তর মেঘ, কোথায় পূর্ব মেঘ, কোনটা বাবে অলকাপুহী, কোনটাই বা বাগবাজারের দিকে, ওর টাইম-টেবিল কারেই ক'রে রাখেননি কোন কবি। তাঁর চেয়ে ঘেঘরগা কাগজে আকরিত লিপিতে পোষ্টোফিসের মারকং জানিয়ে নাও সেই বিশেষ ব্যক্তিকে, যা-কিছু জানাতে চাও।”

বইগামির ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। প্রচ্ছদপটটিও অভিনবরসে বাঁধি রাখে।

—কবাবিৎ নব

পরিপাটী মুদ্রণ

আর

নিখুঁত ব্রহ্ম-তৈরির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

॥ কালার স্টুডিও ॥

৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

ফোন : ৫৫-৪৬০৭



চিত্রলোক

পদ্মনাভ

আগামী আকর্ষণ

কিশোর কবি

বাংলাদেশের কোনো এক ছবিখাত কবির জীবনী অবলম্বন করে 'মা-চিহ্ন' নামে একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান 'কিশোর কবি' চুক্তিগত কণাচিত্র করছেন। যে কবির জীবনী নিয়ে চুক্তিগত গল্প উঠছে, তাঁর সম্বন্ধালীন থাকা এখনো ভবিষ্যত আছেন তাঁদেরও দেখা যাবে এই চুক্তিতে। তখন পুস্তিকার পরে মজুমদারের নির্দেশনায় দ্রুত সমাপ্তির পাথে এগিয়ে চলছে চুক্তিগত। সঙ্গীত-পরিচালনার পছন্দ নিয়েছেন হেমন্তকুমার। বিভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে সঙ্গীতকুমার, শোভা সেন, কমল মিত্র, পাহাড়ী সত্যেন্দ্র, প্রণবকুমার এবং সাধন সরকার প্রভৃতি শিল্পীকে।

নরগের আগে

মহাকবি বাল্মীকির, 'নামে কিবা আসে যায়?' কিন্তু বাংলা-চবির বাজারে নামই সর্বথ। সেইজন্মে চবির উৎসর্গের চেয়ে নামের চমক বেশি চোখে পড়ে অধিকাংশ বাংলা-চবিতে। কয়েক বছর আগে 'নরগের পরে' নামে একটি চবির জনপ্রিয় হয়েছিল মর্কটের কাছে। মনে হয়, সেই জন-মিহনকে কাগে লাগাবার জন্মে 'নরগের আগে' নামে চুক্তিগত চলছেন 'হিমালয়ান প্রডিউসার্স'। শ্রীচরণকুমার নামে অনেক পরিচালক চুক্তিগত কাজ নির্মিত এগিয়ে নিয়ে চলছেন ইন্দ্রপ্রসাদ ঠাকুরগোড়াতে। মূল দুটি চরিত্রে দেখা যাবে অতি ভট্টাচার্য ও প্রণতি ঘোষকে এবং অজ্ঞাত চরিত্র তপস্বিত করবেন চন্দ্রাবতী, ভারতী, নমিতা সিংহ, গীরাঙ্গ ভট্টাচার্য, তুলসী চক্রবর্তী, অমর নরিক, অহর, নবদীপ, নৃপতি প্রভৃতি শিল্পী। সুরপরিচালনা আছেন অপরূপ লাহিড়ী।

ও আনার দেশের মাটি

মুক্তিগত প্রতিষ্ঠানের প্রথম চবির 'ও আনার দেশের মাটি' বাংলার লোক-সঙ্গীতকে উপলব্ধি করেই গড় উঠছে।

সঙ্গীত-পরিচালক অপরূপ লাহিড়ী বাউল, ভাটিয়ালী, ভারী, সারী, ব্রজকথা, ডাঙরাইয়া, চট্টা প্রভৃতির সমাবেশ ঘটিয়েছেন চুক্তিগত এবং খ্যাতনামা লোক-সঙ্গীত-শিল্পীরা নেপথ্য-কণ্ঠে গানগুলি গেয়েছেন। বাজারজার আবেশ আনবার জন্মে চুক্তিগত অনেকখানি অংশ ঠাকুরগোড়ার প্রাকৃতিক পরিবেশে তোলা। প্রধান চরিত্র দুটিতে মানদী সোম ও জীবনকুমার নামে দুজন নতুন শিল্পীকে দেখা যাবে। অজ্ঞাত চরিত্রের রূপ দেবেন চবির বিখ্যাত, পাহাড়ী সত্যেন্দ্র, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী প্রভৃতি শিল্পী। 'পথিক' চন্দ্রনামের আড়ালে কয়েকজন উৎকণ্ঠা-কলাকুশলী চুক্তিগত পরিচালনা করছেন।

ঠাকুর হরিদাস

তপস্বীপ্রতি প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় চিত্র-নিবেদন 'ঠাকুর হরিদাস' গড়ে উঠছে তপস্বী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরম ভক্ত বৈকুণ্ঠ-সাপেক্ষ স্বরূপ হরিদাসের পূণ্যজীবন অবলম্বন করে। নাম-কৃষিকার অভিনয় করছেন নির্দলকুমার এবং অজ্ঞাত চরিত্রের রূপ দেবেন চবির বিখ্যাত, কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, তপস্বী ঘোষ, শোভা সেন ও সীমান বিষ্ণু প্রভৃতি শিল্পী। সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন অনিল বাগচী। চুক্তিগত প্রযোজক-পরিচালক গোবিন্দ রাহু কালকটী মজুমদার ঠাকুরগোড়ায় পুরোপুরি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীতারকেশ্বর

শক্তি প্রোডাকশনের তত্ত্বাবধানে চবির 'শ্রীশ্রীতারকেশ্বর' বংগী আশের পরিচালনায় ইন্টারন্যাশনাল ঠাকুরগোড়ায় দ্রুত সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলছে। হৃদয় পাহাড়ীলী কাহিনী অবলম্বন করে নৃপেশ্বরক চট্টোপাধ্যায় চুক্তিগত চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে তপস্বী করছেন কাজ

বন্যোপাখ্যায়, তুলসী চরুবর্তী, কমল বিশ্ব, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্র ভট্ট, জহর, নৃপতি, নবদীপ, রেণুকা, পদ্মা, শোভা, অপরী, বাগদা ও প্রীতান বাবু প্রভৃতি শিল্পী। বহুদিন পরে কালী নমস্কার ইন্দ্রনাথের গান শুনে শুনে পাবেন চিত্র-রসিকেরা এই চবিত্তে। গানের স্বর শিখিয়েছেন পবিত্র চট্টোপাধ্যায়।

যৌতুক

‘চন্দ্রনাথ’-খ্যাত শচীন ব্যতিক্রম প্রযোজনার উপগ্রন্থ

খুঁজো খবর

সত্যজিৎ রায়ের আশ্চর্য হাসির ছবি ‘পরশপাখর’ ক্যানে শব্দে আসন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-প্রতিযোগিতায় একমাত্র ভারতীয় ছবি হিসেবে যোগ দিতে সক্ষম। আগামী মে মাসের ২৪ থেকে ১৮ই পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। চবিত্তির প্রযোজক এল্. বি. ফিল্ম ইন্টারগ্রাশনালের প্রমোদ শাহিড়ী ভারতের তরফ থেকে যোগ দেবেন এই প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে ছবিটিতে কালী ডাংঘার সাব-টাইটেল যোগ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। আশা করা যায়—‘পথের পাচালী’, ‘অপরাজিত’, ‘কাবুলীওয়ালা’ ও ‘জাগতে বহো’ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক পুরস্কার কৃতিত্ব ভারতীয় ছবির পক্ষে অঙ্গসরণ করে ‘পরশপাখর’ বিশ্বের দরবারে ভারতীয় ছবির মান আরো বাড়াতে সক্ষম হবে।

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-সরকারের তরফ থেকে প্রেসিডেন্টের স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। সেই পদকের অধিকারী হবার প্রত্যাশায় প্রত্যেকটি রাজ্য থেকে ছবি-নির্বাচনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে আঞ্চলিক কমিটি ১৯৭৭ সালের পরকের মধ্যে ‘আধারে আলো’, ‘সৌহকপাট’ এবং ‘হারানো স্বপ্ন’ ছবি তিনটিকে নির্বাচিত করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

‘সৌহকপাট’ ও ‘পরশপাখর’-এর প্রযোজক এল্. বি. ফিল্ম ইন্টারগ্রাশনাল প্রযোজনা-ক্ষেত্রে অভিনব আনবার

গল্পোপাখ্যায়ের জনপ্রিয় উপগ্রন্থ ‘যৌতুক’ চিত্র-রূপায়িত হচ্ছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে। জীবন গাঙ্গুলী পরিচালিত এই ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিদল বিশ্ব। প্রধান চরিত্র চিত্রিত রূপ দেবেন উত্তমকুমার ও সুমিত্রা দেবী এবং অগ্রাঙ্ক চরিত্রে বেলা বাবে মলিনা, শিলা পাল, জীবন বহু, তুলসী চরুবর্তী, কালী সরকার ও কমল বিশ্ব প্রভৃতি শিল্পীকে। স্বরযোজনা করছেন হেমন্তকুমার।

সঙ্গে ইতোমধ্যেই অভিনবিত হয়েছেন। এঁদের নবতম প্রচেষ্টা আরো অভিনব আনবে বলে প্রকাশ। বিবৃতিস্বরূপ বন্যোপাখ্যায়ের বিশেষ-উপগ্রন্থ ‘চন্দ্রনাথ’ চিত্রে রূপায়িত করার অভিপ্রায় ঘোষণা করেছেন এঁরা। ছবিখানি পুরোপুরি ইন্টরমান-কলার পদ্ধতিতে তোলা হবে। শুধু তাই নয়, বহু-বিচিত্র-বর্ণ-লব্ধ এই ছবিখানির অধিকাংশই তোলা হবে ভারতের বাইরে ব্রিটিশ ইস্ট-আফ্রিকা। এই সম্পর্কে ব্যবসায় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার জন্য প্রযোজক ইতোমধ্যেই হনলুলুতে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। প্রাথমিক কাজ শেষ হলে, ছবিটির মূল চরিত্রাভিনেতা কালী বন্যোপাধ্যায় ও অগ্রাঙ্ক কল্যাণেশ্বরীর একটি দল নিয়ে প্রযোজক রচনা করেন ব্রিটিশ ইস্ট-আফ্রিকার বহিঃস্থের কাজের ভার। এই প্রচেষ্টা বাংলা-ছবিতে নতুন দিকবর্ধনের পথিক, হুতরাং বাংলা-মাঝেই এই প্রচেষ্টার সঙ্গে প্রযোজক-ক আঞ্চলিক দলবান জানাবেন।

বোম্বাইয়ের চিত্র-পরিচালকরা ‘ভিরেইন্স গীজ’ নামে পরিচালকদের একটি সংস্থা-গঠনের সিদ্ধান্ত করেছেন। ঐক্যই বোম্বাইয়ের পরিচালকদের একটি অধিবর্গের আয়োজন করে এই নতুন সংস্থা-গঠনের কাজ পাশাপাশি করা হবে। জানা গিয়েছে, বোম্বাইতে যেটি পরিচালকদের সংস্থা গঠন। এর মধ্যে যাত্রা দেখানো নিষিদ্ধ চিত্র-পরিচালনা করে থাকেন।

মানময়ী পার্লস ফুল (চিত্র-সমালোচনা)

দেবকুমার মুখোপাধ্যায়

‘লৌহকশাট’-এর অন্তরালবর্তী মাথবগলির স্ব-স্ব-খ, আপ-আজ্ঞার কাহিনী এখনও ফিরছে লোকের মুখে মুখে। ‘পরশপাখর’-এর দৃষ্টি রেখ এখনও প্রচলিত ফুলেই রসিকজনের চিত্তে। তপন সিংহ আর সভ্যজিৎ রায়ের অনন্তশোষণ প্রতিভার দ্বারা এখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছে চিত্রাঘোষীদের জন্যে। এরই মাঝে মৃত্যুলাভ করেছে রবীন ঘৈষের ‘মানময়ী পার্লস ফুল’। একদমই এই কাহিনী চিত্ররংগে আলোড়ন এনেছিলো সার্বক হাসির ছবি হিসাবে। এর মঞ্চ-সাক্ষ্যের কথাও সুবিদিত। কাজেই এই পুরাতন কাহিনীটী অবলম্বন করে পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্র যে ছবি নির্মাণ করেছেন, অভ্যাসের পরিবর্তিত আবহাওয়ায় তার সাক্ষ্য সম্পর্কে সন্দেহ ছিলো। কিন্তু বলতে বাধ্য নেই, ‘মানময়ী পার্লস ফুল’ সর্বজনীন আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে।

*

এই চিত্রের কাহিনী—দুটি বেকার যুবক-যুবতীকে নিয়ে। দুজনেই গ্রাফুয়েট এবং চাকরির প্রত্যাশী। নারক মানসমন্ডরন মৃগাকী তার মনে পাওনারের অগাধা অস্থির করে চায়ে-পেশন থেকে পান-করা পুটান নাখিকা নীহারিকা চ্যাটার্জী চাট মিস্টার কার্নাওয়েজের হাত থেকে রেহাই পেতে। কিন্তু দুজনের কারওই চাকরি ভোটে না। অবশেষে পঞ্চম ধারে এক চাকরির বিজ্ঞাপন ওদের দুজনেই নজরে পড়ে : কলকাতার বাইরে মানময়ী পার্লস ফুলের জন্ত গ্রাফুয়েট শিক্ষক-শিক্ষিত্রী চাই। কিন্তু একটি শর্ত—যাবী-তী হওয়া চাই। উত্তরিতবুদ্ধি-সম্পন্ন মানস প্রস্তাব করে নীহারিকা চ্যাটার্জীর কাছে যাবী-তীর অভিনয় করার জন্ত। নীহারিকার প্রত্যাখ্যানের আঘাতে মানসের গুণবৃত্তির স্বপ্ন দ্বার ভেঙে।

এসিক মিস্টার কার্নাওয়েজ তার পূর্ণপ্রস্তাব স্বরণ করির লিখে শাসির দ্বাৰ নীহারিকা চ্যাটার্জীকে—একমাসের অধা তার ঋণ শোধ করতে না পারলে হয় মিসেস কার্নাওয়েজ আর নয় সিভিল জেল। সত্যিকারের মিসেস কার্নাওয়েজ হবার সম্ভাবনা থেকে রেহাই পেতে মিথো-মিথো মানসমন্ডরনের স্ত্রী সাজতে বাসী হলো নীহারিকা।

পঞ্চ হারানিদি নামে এক চাকর সঙ্গ্রহ করে ওরা এলো চাকরিতে যোগ দিতে। মানময়ী পার্লস ফুলের প্রতিষ্ঠাতা নামোদর চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী মানময়ী দেবী আর কস্তা চন্দা

অভ্যর্থনা করলেন ওদের। ওদের সবার সঙ্গে পরিচয় হলো। আর পরিচয় হলো ফুলের সেক্রেটারি রাতেন্দ্রলাল বাড়রী ওরফে রাঙ্কু সঙ্গে। সে-ই যাবী-তী শিক্ষক-শিক্ষিত্রী-নিয়োগের মতলব দিয়েছিলো, কারণ তার সন্দেহ ছিলো—নামোদর চৌধুরীই কস্তা চন্দা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে কোনো অবিবাহিত গ্রাফুয়েট শিক্ষক এসে। মৃত্যুবার ইন মি কোর্ট অব হিঁজ অন্যর দি সাব-ভিভিন্ড্রাল অফিসার অব বহরতলা—কেডেনিউ-পাল রাঙ্কু অহরণ ছিলো চন্দার প্রতি। মানস আবার পর থেকে সন্দেহবাত্তিক প্রহ রাঙ্কু আরো বেশী করে নজরে রাখতে লাগলো চন্দার সঙ্গে।

এসিক বদন সহকারের ফুলের চেয়ে বেশী ছাত্রী হয়েচে মানময়ী পার্লস ফুল, এই আনন্দে নামোদর চৌধুরী আর তাঁর স্ত্রী মানময়ী আশ্চর্য্য। মানসের সঙ্গে ওরা পাড়িয়েছেন নাতির সম্পর্ক আর নীহারিকার সঙ্গে নাতবোরেহ। ফলে ঠাট্টা-ইহারকি চলে। আর নীহারিকা নামোদর-সম্পত্তির প্রাপ্যখালা আনন্দোজ্ঞাসের মধ্যে ঠাট্টায়ে উঠলো। ঘরোয়া গ্রাম্য রসিকতায় তার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে সে গালিয়ে যেতে চায়, কিন্তু কার্নাওয়েজের কথা মনে হলেই ইচ্ছা সংবরণ করতে হয়।

মানস নীহারিকার উদ্যম হোঁচাচ খাটিয়ে চলার অজ্ঞ জন্ম-ভয় দূরে সরে রইলো। বিভ্রালয়ের কায়ে চন্দার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বাড়লো। রাঙ্কু সন্দেহ গেলো বেড়ে। সে গোপনে ওদের গতিবিধির ওপর নজর রাখলো আর নীহারিকার মনেও ছড়িরে ছিলো সন্দেহের বিষ।

মানস এখন দেখলো চন্দার সাহায্যে সে ফুল চালাতে পারবে, নীহারিকাকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে সে তার অজ্ঞ ছাত্রি হুপাশিন করলো। মজুর হলো ছুটি। ঘটা করে বিলাস-অভিনয়র বেওরা হলো নীহারিকাকে। অভিনয়কন-সভায় তার উল্লেখ যে-গান গাইলো চন্দা, নীহারিকা এখন জানলো সে-গান মানসের লেখা—তার মন ডরে উঠলো বেদনায়ে। চন্দার প্রতি কিছুটা ঈর্ষাও জাগলো তার মনে, কারণ মানসের প্রতি ভালবাসার উত্তাপ সঞ্চারিত হচ্ছিল তখন তার মনে।

করিৎকর্মা রাঙ্কু ওদের চাকর হারানিখিকে কিছু টাকা কবুল করে ওদের সম্পর্কের রহস্তটা জেনে নিলো ভালোভাবে। তার পর নামোদর-সম্পত্তির কান কপাটা ফুলে দিড়েই ওরা

নীহারিকার দ্বাৰা আপ গুণের সম্পর্কটা ভালো করে বাচাই করে দেখতে এলেন।

গিয়ে দেখলেন, সম্পূর্ণ আত্মদর্শনের ভরিতে মানসের বহুলাংশ নীহারিকা। তার অস্ত-আত্ম চোখের ভিত্তিতে মানসের গুণের 'পরে তুলে পরে আবেশকম্পিত করে' বলছে সে—তুমি যেতে না দিলে আমি কি পারি যেতে? সন্দেহের ছায়া অশ্রুপাণিত হলো ওদের মুখ থেকে, যন থেকে : নীহারিকার মিনতি-ভরা করে নেই লেশমাত্র কৃত্রিমতা, নেই একবিম্বও ছলনার আভাস।

•

অনেক সাংসারের ঐতিহ্য-মণ্ডিত এই পুরাতন কাহিনীর বর্তমান চিত্ররূপ গিয়েছেন 'মোটোপলিটান শিকচাল'। পরিবেশনের রূপ একশানি উপভোগ্য হালকা হাসির ছবি হিসাবে সার্থক হয়েছে 'মানময়ী পার্ল শুল'। দু-এক ভাবগাম্ভীর্য সামান্য প্রবণতি ছাড়া চিত্রনাট্য-রচনার গুরুতর কোনো জটিলতা বাধেননি বিনয় চট্টোপাধ্যায়। তবে কনভোলুশনের দৃষ্ট এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপর কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় দৃষ্ট বাহ দিয়ে চিত্রটির মৈত্রী বন্ধনে কমানো যেতো। তাতে চিত্রনাট্যের কোনো ক্ষতি তো হতোই না, বরং সমগ্রাত্মক ছবির পক্ষে প্রয়োজনীয়—কিন্তু এ দৃষ্টিতে আভিনয় বৈশিষ্ট্যগুলি, তাদের হেটু কোম্পেন্সি চিত্রনাট্যকারের পরিস্থিতিবোধেরই পরিচয় পাওয়া যেতো আরো বেশী। নীহারিকার সন্তান-সন্তানবন। হয়েছে যেন করে দামোদর-বংশতি যেখানে উদ্গমিত হয়ে উঠেছেন, সেখানে এই ব্যাপারটাকে নিয়ে ওদের বাড়াবাড়ি দৃষ্টিকটু থেকেছে। পরিচ্ছন্ন রচিত ব্যক্তির আভিনয়টুকু বাহ মিলেই চলেতো। এ ছাড়া পরিচালনার একটি গুরুতর ত্রুটি নজরে পড়ে। হাতাক-ডালি-সেওয়া ব্লাউজ পরে যে-নীহারিকা, চাকরি পাওজাম্বায় বকমারী রঙেরবস্ত্রের বহুদৃশ্য গোপালক পরতে আরম্ভ করে সে কেমন করে? এতে ওদের অভাবের চোরাটো বর্ণকমল

রেখাপাত করতে পারে না। হেমচন্দ্র চন্দ্রের মতো ব্যাভিনায় পরিচালকের নজর এড়িয়ে গেছো এমন এতটা জটিল—এটা আশ্চর্যের বিষয়। তাহলে সরকারের সংশ্লিষ্ট-পরিচালনার এমন কিছু নতুনই নেই। কলা-কৌশলের অজ্ঞাত দিকের কাজগুলি ভালোই।

অভিনয়ে সর্বাঙ্গে নাম করতে হয় নীহারিকার কৃমিকায় অকম্বর্তী মুখোপাধ্যায়ের। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীদের অন্তর্গত অকম্বর্তী মুখোপাধ্যায় মালোটা চিত্রে অসুখ সঙ্ঘত অভিনয়ে সর্বকালের মন কেড়ে নিয়েছেন। শেষ দৃষ্টে যেখানে মানসের বৃক কাশিরে পড়ে কল্ল কায়রির ভেঙে পড়ে নীহারিকা, সেখানে তার অভিনয়-দৃষ্ট কল্লয়ের সবটুকু উত্তাপ করে পড়ে সর্বক-কল্লয়ের গভীরে। পুত্রিত অধরের বস্ত্রাখরো বেলনাগ, ভাবত নহনের অশ-দৃষ্টল অভিব্যক্তিতে নীহারিকার কায়র মিনতি সর্বকচিত্ত স্পর্শ করে গভীরভাবে। মানসের কৃমিকায় উত্তমকৃন্দারের অভিনয়ও সাবলীল। অস্ত অনেক চরিত্রের চেয়ে এই চরিত্রের উত্তমকৃন্দাকে অনেক বেশী প্রাণবন্ত মনে হয়। মিলটার কান্ট্রোলের কৃমিকায় নীহারিকার ভট্টাচার্য একটি টাইপ-চরিত্রের রূপাধার সফল হয়েছেন। মলিনা তাঁর বাস্তবিক অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। মানময়ীর চরিত্রে তাঁর অভিনয় চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে। তাহুর আবির্ভাবে লোকে হাসলেও, রাঙ্ক চরিত্রটির প্রতি তিনি খুব স্নিহিত করেননি। বৃদ্ধ হামোদর চৌধুরীর চরিত্রে তাহুর পাল্লমীর অভিনয় উপভোগ্য হলেও, যানে যানে আভিনয়-ধোম নজরে পড়ে। চল্লার চরিত্রে কমলা মুখোপাধ্যায়কে মোটামুটি মন লাগে না। পার্শ্বচরিত্রগুলির অভিনয় কোনোটিই ব্যাখ্যাপ বলা চলে না। অভিনয়ের মান সাধারণভাবে উঁচুই বলতে পারা যায়।

সার্থক হাসির ছবি হিসাবে বেশ কিছুদিন সার্থক আকর্ষণ করবে বলে মনে হয় 'মানময়ী পার্ল শুল'।

শচীন বেববর্ষণের সম্বর্ধনা

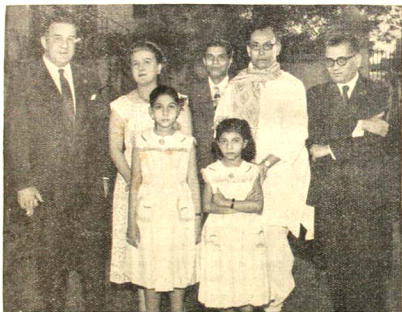
[নিজস্ব প্রতিনিধি লিখিত]

বাংলার করণ্য সঙ্গীত-শিল্পী কুমার শচীন বেববর্ষণ এবার 'সঙ্গীত-নাটক আলাপনিত' পুরস্কার লাভ করেছেন—এবারের সর্বোচ্চ-সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে। সবুজ বেশে শ্রীমত বর্ষণের অগণিত গুরুত্ব ভক্ত এ সংবাদে বিশেষ আনন্দিত হয়েছেন।

কুমার শচীন বেববর্ষণ দ্বিপুত্রের রূপরিহারের সন্তান এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন। এম-এ পড়ার সময় তিনি পুরোপুরিভাবে সঙ্গীত-সাধনার আত্মনিবেশ করেন। অজ্ঞানত কলকাতা যে, উৎসবের চট্টোপাধ্যায়,

ওসমান বাসল খাঁ প্রভৃতি গুপী গায়কের কাছে তিনি শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতে শিক্ষাগ্রহণ করেন। কিন্তু শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতেই তিনি নিঃস্বের জ্ঞান ও অগ্রসঙ্গিত্ব সাধন করিতে পারেননি, অতীতেই তিনি লোক-সঙ্গীত সংগ্রহে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তাঁর সুশিক্ষিত কণ্ঠে স্থলস্থিত জনমতে তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে একটির পর একটি পল্লী-সঙ্গীত। পটীনসংঘ অবিখ্যাতভাবে অত্রি সংসদ সময়ে রেকর্ড-ভাগতে উক্ত সম্মান ও অকল্পিত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। পরবর্তীকালে যখন

সভার আয়োজন হয়। গ্রামোফোন-কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার মি: জে. ই. জর্জ স্ট্রুত দেববর্ষের গুণাবলীর বিশেষ প্রশংসা করে তাঁকে সতর্কতা জ্ঞাপন করেন, এবং তাঁকে একটি এইচ-এম-টি রেডিওগ্রাম উপহার দেন। রেকর্ডিং-অধিকর্তা স্ট্রুত মি: কে. সেন স্ট্রুত দেববর্ষের শিল্পী-জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে তাঁর মৌলিকতার বিষয়ও উল্লেখ করেন। গায়ক পটীন গুপ্ত শিল্পীদের গণ হতে স্ট্রুত দেববর্ষকে সতর্কতা জ্ঞাপন করেন।



সতর্কতা সভার স্থায়ী পটীন দেববর্ষ সহ গ্রামোফোন-কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার মি: জে. ই. জর্জ, হিসেল জর্জ, মি: কে. চ্যাটার্জী ও মি: সি. কে. সেন। সতর্কতা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ও কামল প্রোগ্রামিং।

তিনি চলচ্চিত্রে সঙ্গীত-পরিচালনাও সম্পন্ন করে উঠলেন তখনও তিনি তাঁর অগণিত ভক্ত-শ্রোতার অল্প কিছু কণ্ঠের গান রেকর্ডে পরিবেশন করতে কার্যপা করতেননি।

‘সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি’র নির্বাচন ঘোষিত হলে, শিল্পীর অগ্রতন গুপ্তগ্রাহী গ্রামোফোন-কোম্পানির তরফ থেকে এক সতর্কতা-সভার আয়োজন করা হয়। ২৩, রাজা সত্যোদয় রোড, আলিপুরের প্রশস্ত অধনে স্থাপিত পরিবেশে এই

প্রকৃতির শিল্পী সকলকে দৃষ্টব্য জ্ঞাপন করেন। গ্রামোফোন-রেকর্ড যে নতুন নতুন শিল্পীদের সুযোগ-সুবিধা দেয় এবং তাঁর নিঃস্বের জীবনের সাফল্যের ও তাঁর গান-গুলির জনপ্রিয়তার অস্তিত্ব তিনি গ্রামোফোন-রেকর্ডের প্রতি প্রত্যক্ষ প্রকাশ করেন।

সভার বহু জনপ্রিয় গায়ক-গায়িকা, চিত্র-পরিচালক, সঙ্গীত-পরিচালক প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।



স্থিতির

ফুটবল :

হকি-লীগের প্রায় শেষ অবস্থায় ফুটবলের নানাবিধ ধরাদ্বয়ের কোলকাতার মাঠের আবহাওয়া গরম হয়ে উঠেছে। প্রথম কারণ, বিখ্যাত খেলোয়াড়দের অপ্রত্যাশিত দল-পরিবর্তন। দ্বিতীয় কারণ, ইংলণ্ডের বিখ্যাত ব্র্যাকপুল টিমের একটি খােলের জন্য কোলকাতা সফরের কথাবার্তা। তবে শেপোল্ড অস্ট্রানটি ডব্বিতে খেটে উঠবে কিনা সে-বিষয়ে খেঁচ সন্দেহ আছে। কারণ, ব্র্যাকপুল দল যে বিরাট অর্থের হাবি করেছেন, তার চাহিদা মেটানো বা মেটানোর চেষ্টা আমাদের আই.এফ.এ.-র পক্ষে একরকম দুঃসাধ্য। কারণ, এদের চাহিদা হচ্ছে হু'হাওয়ার স্টার্লিং অর্থও প্রায় ছাল্লিশ হাজার টাকা। স্টেডিয়াম-বিশীন কোলকাতার সীমাবদ্ধ আদনগুলি থেকে বড়জার পর্যন্তিন হাজার টাকা পাওয়া যেতে পারে; তা থেকে সরকারী দাবিগুলি মিটিবে ছাল্লিশ হাজার টাকা সেওখা বড় সহজ কথা নয়। একদমই উপায় হতে পারে, টিকিটের মূল্য বাড়ানো। কিন্তু ব্র্যাকপুল টিমের পূর্বখ্যাতি আর নেই। তা ছাড়া, সমস্ত গীমটার মধ্যে একমাত্র অকারণ-সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, ফুটবল-বাংকর স্ট্যানলি ম্যাপুল। যদিও ম্যাপুল পড়তির দিকে, তবুও ফুটবল-ক্রীড়ামোদীরা আমরও ম্যাপুলের নামে পাগল। কিন্তু শুধুমাত্র ম্যাপুলের জন্য এ আয়োজন কি সম্ভব হবে, না, আই.এফ.এ. অন্য শিকারে উপনীত হবেন, তা এখনও ডব্বিষ্টের রিজাস।

অন্তিমার বেখা: বাঘ, বড় বড় দলগুলি বাইরের বড় খেলোয়াড়দের নিয়ে দল ডারী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু

এবার এবিক দিনে শেপোল্ড: ইউনিয়ন দল আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। বরষার তরুণ বাংলাী খেলোয়াড় লিয়েই এদের কাজ চলে গেছে। কিন্তু আজ ইংলণ্ড এদের নম্বর কেন এত উঁচুর দিকে উঠলো, সে কথা চিন্তার বিষয়। কারণ এইভাবে ছোট ছোট দলগুলি স্থানীয় তরুণ খেলোয়াড়দের যদি প্রয়োজন মনে না করে, তবে আমাদের স্থানীয় খেলোয়াড়দের খেলার মান যে কোথায় গিয়ে পড়াবে তা ভাবতেও ভয় হয়।

এবার আই.এফ.এ. ফুটবল-লীগে তিন বছরের যুগু ওঠা-নামা বছর একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাবে নীচের দলগুলির খেলার আকর্ষণ একেবারেই কমে যাবে। কারণ নীচে অধস্থানকারী দলগুলির আর নামার কোনো চিন্তাই থাকবে না—তখন যেভাবে, যেমনভাবে খুঁচী নীচের দলগুলি খেলতে শুরু করবে। কেবলমাত্র চ্যাম্পিয়নশিপের প্যারাং ওপরের দলগুলি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এর ফলে নীচের দলগুলির খেলার গুরুত্ব আর একেবারেই থাকবে না। কিন্তু এই অনর্থক কৃত্তিকর সিদ্ধান্তের প্রস্তাব ইংলণ্ড কেন এলো, এবং যদিও বা এলো, শুধু তিনবছরের জন্য কেন এলো, তা বুঝতে পারছি না। তবে এর পক্ষে থাকা আছেন—এ যদি তাঁদের ব্যক্তিগত বার্থেব আওতায় পড়ে, তা অবশ্য আলোচ্য কথা। দ্বিতীয় ডিভিশনের দলগুলিরই বা কী অবস্থা হবে? যে অহু-প্রেরণা নিয়ে দ্বিতীয় ডিভিশনের ওপরওপার দলগুলি খেলার চেষ্টা করে, সে অহু-প্রেরণা তাদের কোথায় থাকবে? আর এ প্রাণহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল্যই বা কি? হুতরাং ব্যক্তিগত বার্থসমূহের বিলম্বে ধখারীতি পূর্বের নিমে

বঙ্গের খেলাই বাঙালীরা। দেখা যাক, আমাদের দুটোবল-
হিটম্যানের ভবিষ্যতে কি করেন।

হকি :

এবারের হকি-লীগের খেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো। ওপক-
তলায় এমন কোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে মহামেহমান স্পোর্টিং,
কাস্টল, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের মধ্যে। এদের
মধ্যে একটিকে পরাজিত হ'লে দুটি 'ড্র' করে মোট তিন শাফেট
হারিয়ে মহামেহমান এখন বিপর্যাস অবস্থানে রয়েছে। এবং গড়-
বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল তিনটি ড্র করে মোট
তিন শাফেট হারিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ও মোট দু'শাফেট হারিয়ে
কাস্টল দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। রাইটন-বিম্বটী এবং
গতবারের লীগ-রানার্স ইস্টবেঙ্গল দলও খুব খানিকটা পেছিয়ে
নৈ। চ'শাফেট নষ্ট করে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। তবে ওপরের
তিনটি দলের মধ্যেই চ্যাম্পিয়নশিপ নিবন্ধ থাকবে বলে মনে
হয়। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে গোলমুগ্ন
ভাবে খেল লীগে তাদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খেলা
শেষ করেছে। কিন্তু তাহলেও খেলার মধ্যে কেমন যেন
প্রাণের সাতা পাওয়া হয়েছে না। নীচের দলগুলির মধ্যে
বি. সি. প্রেস দলকে দ্বিতীয় ডিভিশনে নামতে হবে। অর্থাৎ
যে দল দু'বর্ষ ধরে পরিত্যক্ত ছিল, সে দলের এইরূপ পরিণতি
খুবই দুঃখজনক। প্রেস দল তাদের বারোটি খেলার মধ্যে
একটিও শাফেট অর্জন করতে পারেনি। তবে এদের সঙ্গে
অল্প কোন দলটি সহযোগিতা করবে, এমনও ঠিক বলা
হচ্ছে না। কারণ পুলিশ, ডাবলীপুর, অরোরা, রেজার্ণ
প্রায় সমান বিপদের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে রয়েছে। আর
যারা আগামী বছরে প্রথম ডিভিশনের অঙ্গদ্বক—তারি হলো
আর্মিবিদ্যালয় ও ইস্টার্ন হেলথের দল। গতবছরেই
আর্মিবিদ্যালয় দল দ্বিতীয় ডিভিশনে নামতে বাধ্য হয়েছিল।
এ বছরেই তারি বেন-নানার লোপ ভুলে নিলো। ইস্টার্ন
রেল দলও বহুদিন পর প্রথম ডিভিশনে খেলার সুযোগ
অর্জন করলো। আগামী বছরের অল্প এদের সাফল্য কামনা
করি।

'বাঙালি হকি প্রতিযোগিতা'র বঙ্গদলনের অল্প বাংলা-
দলের চূড়ান্ত নির্বাচন হয়ে গেছে। পুলিশ-দলের গোল-
রক্ষক মেজিসের ওপরেই এবার অনিবার্যত্বের গুরু হারিয়ে
অর্পণ করা হয়েছে। নীচে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম
লেখা হলো :

বেণ্ডগ (অনিয়ারক), বেনদুগ, তি. ব্যানার্জী, রতনিক,

ওকবর, রতিন্দ্র, উত্তরকন, ইঞ্জিনিয়ার, হুদুগ, আনোয়ার,
শাবনরান, গেরা সি. হানিদ।

ক্রিকেট :

আনাইকার কিস্টন মাঠে তৃতীয় টেস্ট-ম্যাচে ওয়েস্ট-
ইন্ডিজ দল পাকিস্তান দলকে বেশ ভালোভাবেই হারিয়ে
শেষ করেছে। প্রথম ইনিংসে পাকিস্তান দলের ৩২৮ রানের উত্তরে
ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দল ৩ উইকেটে ৭২০ রান করে রান ছেড়ে
দেয়। এই খেলায় ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দলের বাইশ বছর বয়সের অল্প
জ্যোতিষাট্টাচন্দ্র গারগিও সোবার্ণ ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের
রেকর্ড করেছেন। তাঁর রান-সংখ্যা লেন হার্টনের ৩৬৪ রান-
সংখ্যাকে অতিক্রম করে ৩৬৪ হয়, এবং সমগ্র হার্টনের
থেকে ৩ ঘ. ১২ মি. কম লাগে—অর্থাৎ মোট সময় লাগে
১০ ঘ. ৮ মি.। পাকিস্তান দলের হানিদ প্রথম টেস্টে যে
দীর্ঘসময়ের রেকর্ড করেছিলেন, তার উপযুক্ত করার হয়েছে।
আন্তঃ একটি রেকর্ডের সঙ্গী হ'তে, হানিদ বনর্ড হার্ট ব্যক্তিগত
২৬০ রানের মাধ্যমে রান-আউট না হয়ে খেলেছেন। রক্তমাখা
ও পললকোঁড়া দুটি দে ৪৪১ রান করেছিলেন, হার্ট ও সোবার্ণ
মাঝে ৬ রানের অল্প সেরেকর্ড ভাগ্যে পারেননি। হাই
হোক, এও দ্বিতীয় সর্বাধিক রেকর্ড হিসেবে গণ্য করা হবে।
তবে এও একটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, চারটি টেস্টের ডুটিতে
বিশ-রেকর্ড হয়েছে। পৃথিবীর অল্পতম ব্যাটসম্যান পাকিস্তানী
বোলার-মুহম্মদ আলী ও বান মাহমুদ অজাও পরিচয় করে
এদের পর এক সোবার্ণের বিলম্ব আক্রমণ রচনা করে গেছেন।
কিন্তু অল্প সোবার্ণ অনমনীয় দৃঢ়তায় ১০ ঘ. ৮ মি. তাঁদের
আক্রমণ ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে রেকর্ড করতে সক্ষম হয়েছেন।
ওয়েস্ট-ইন্ডিজের 'ডব্লু'-তৃতীয় অবলম্বগ্রহণের পর ব্যাটী-এর
অভাব হচ্ছেটা খুব বেশী করে চোখে নাও পড়তে পারে।
চতুর্থ টেস্ট-ম্যাচে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ দল পাকিস্তানকে এক
ইনিংস ও ১৭৭ রানে হারিয়ে 'রাবার' লাভ করেছে। নীচে
তৃতীয় টেস্টের সর্বাধিক কল্যাণল দেওয়া হলো :

পাকিস্তান : ৩২৮ (ইমতিয়ান আবেদ ১২২, সৈয়দ
আমেদ ৭২। অ্যাটকিনসন ৪২ রানে ৫
উইকেট) ও ২২৮ (ওয়াশির বহরম
১০৬; কারদার ৭৭)

ওয়েস্ট-ইন্ডিজ : ৭২০ (৩ উইকেটে অতিক্রম করা পারিষদ
সোবার্ণ নট-আউট ৩৬৪, সি. হার্ট ২৬০,
ওয়ালকট নট-আউট ৮৮)

রবজি ট্রফি (সেমি-ফাইনাল)

মিল্লীর ক্রিকেট বা কোটলা মাঠে রবজি ট্রফির সেমি-ফাইনালে প্রথম ইনিংসের রান-সংখ্যার ফলাফলে বাংলা-দল ল্যাভিসেলের কাছে গোচরীয় পরাজয় বরণ করেছে। প্রথম ইনিংসে বাংলা-দলের ৩৯০ রানের বিরুদ্ধে সার্ভিসেস দল ২ উইকেটে ৩৭০ করলে, খেলাটির জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। মোট ৪ দিনের আয়তায় ৩ দিনেই খেলাটির সমাপ্তি ঘটে। প্রথম ইনিংসে বাংলা-দলের ঘটনা অত্যন্ত হতাশাজনক

হয়। মাত্র ৬৭ রানের মধ্যে তিনটি উইকেট লভ হয়। এর পর তরুণ উদীয়মান খেলোয়াড় কল্যাণ মিত্র ৬ টেস্ট-খেলোয়াড় পাত্র কাদকার ব্যতিক্রমী আশাব্যাক্ত খেলা খেলেন। এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন বি. চন্দ্র, এ. ভট্টাচার্য, সি. সেন। সার্ভিসেস দলের ঘটনা ভালোই হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট নিশাঙ্গণ ব্যর্থতার পরিণতি দিয়ে বাংলায় দুঃস্বপ্ন খেলোয়াড়রা সার্ভিসেসকে জয়লাভের দিকে এগিয়ে দেন।

for every home...



ভিত্তিও একটি অপরিহার্য জীবন। যেখানে যখন ও
৪০০ আয়ের জন্য প্রতি দ্বারা ও মনে "বিশ্ব মাইল
কয়েক" রেডিওগুলি পরিচিত।
মডেল ৪২৮০-এ সি. অক্ষয় সি.সি. মেনের ৪০০ ও মালিক ৪
৩৫০০০০০. হার্ডওয়্যার-আলোচনা মডেল ১০১" লাইট
পার্কিং ও অক্ষরকে আনুমানিক ক্যামেরা, দুটি ৪২৫, বৈদ্যুতিক
এ সি. ও ভাই বাজারী সেটের পাওয়া যায়।



The Gramophone Company

The Gramophone Company

OVER 50 YEARS SOUND EXPERIENCE IN INDIA

BUY FROM AUTHORISED H.M.V. RADIO DEALERS ONLY



শেষ পাত



জনৈক শিক্ষাবিদ্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষার
পাট একবারে তুলে দেবার কথা ভাবছেন।

ছাত্ররা এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত।

সেখা গেছে অনেক দোকানদার খদ্দেরের দৃষ্টি-
আকর্ষণের জগ্রে তাদের চোখ না টেনে কান ধরে
টানটাই বেশি পছন্দ করেন। তাঁদের ব্যবহারটা,
বলতে হবে, ঠিক অ-MIKE নয়।

মেয়েরা যদি কাউকে গ্রহণ করে তো তাকে দাস



করে, আর যদি ছেড়ে দেয় তো সে উদাস হয়ে
যায়।

পণ্ডিত নেহরু বোম্বাইয়ের এক জনসভায়
বলেছেন যে, দেশে তাঁর চেয়েও বেশী বুদ্ধিদান
লোকের অভাব নেই।

তাঁরা হচ্ছেন অতিবুদ্ধি, তাঁদের গলায় দড়ি!

পশ্চিমবাংলায় মালেরিয়া শতকরা ৬৬ ভাগ
কমে গেছে বলে কংগ্রেস নিম্নের সরকারী কৃতিত্ব
দাবি করেছেন।

বর্ষার চেয়ে মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াই এর
কারণ।

ইলেকট্রনিক ব্রেইন এতদিন নিখুঁতভাবে হিসেব-
নিকেশের কাজ করে আসছিল, এখন নাকি তা
কবিতা লিখতেও বেশ পারছে বলে প্রকাশ।

নিশ্চয় অতি আধুনিক কবিতা।

জনাত্তিকে শোনা :

‘ওহে পরমাণবিক, তোমার কাছে কি আরেকথা-
ফুর আছে?’

‘কেন বলুন তো?’

‘আমার চাই—আস্তরকার খাতিরে।’

নাবালকদের কাছে হিরোইন (Heroi)
চালাবার অপরাধে প্রাণদণ্ড-দানের বিধি প্রেসিডে
আইসেন আওয়ার মঞ্জুর করেছেন। হিরোইনে
নেশা বালক-বালিকাদের পক্ষে হচ্ছে বিষতুল্য।

ছায়াছবি হিরোইন। এ-বিষয়ে উনিশ-তুলা

“এ যুগে শুধু একটিনাত্র বুদ্ধ চলতে পারে, তা
লজ্জা বারিব্রোর বিকল্পে। এ-বুদ্ধ নিত্যকার।”
—পণ্ডিত নেহরু



আরেকটি নিত্যকার বুদ্ধ প্রায় তার কাছাকাছি
যায়—সেটা হচ্ছে দাড়ির বিকল্পে।

আচার আর আছাড়ই স্বভাবতই একটু প্রভেদ
আছে। একটা লোকে লুকিয়ে খায়, আরেকটা
খেয়ে লুকায়।

‘বোনের সার্থকতা এই শীতের মরুভূমি।
বোনের থেকে বোনা সোয়েটার পাই যখন।’
(মনান্তিকে শোনা)

শুধু বোনা-ই পাই? আর, বোনাই পাইনে?
নাঃ

কঠিনক ভাস্করের মতে প্রেমে পড়েই মেয়েরা
ঠান্ রোগা হতে থাকে। তাদের আহাৰ কমে যায়,
ড়ি দেখা দেয়। কণ্ঠা বেরিয়ে পড়ে।
মেয়ের হারও দেখা দেয়—উৎকণ্ঠা।

একজনের জিজ্ঞাসা: “পাকিস্তানে এত বিবাহ-
বন্ধনের কারণ কি, তা কি আপনার জানা
আছে?”
আজকে, বিবাহ।

‘বয়স্কাউট আন্দোলন শুধুই ভোটদেয় জল নয়,
অধিক-বয়সীরাও এতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে
পারেন।’

বয়স্ক OUT নয়, বলছেন?

‘ঔষুপুণ্ডলি সব যায় কোথায়?’

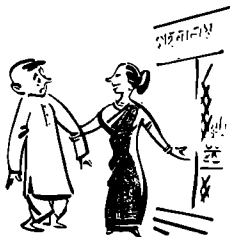
—একটি বিজ্ঞাপনের মাথা

যে-সব মাথা থেকে আলগা হয়ে আসে,
মনে হয়, সেখানে আর তারা ঘিরে যায় না।

‘ডি-গ্রেডের শিয়নের ঢাকরি নিয়ে হুক করে
নিছক নিজের চেষ্টায় অনেককে এ-গ্রেডের
গেজেটেড-অফিসার হতে দেখা গেছে।’

কিন্তু তার পরেও তো আবার ডি-গ্রেডেশন হতে
দেখা গেছে অনেকের!

‘পথে গহনার দোকান দেখেই বো টানতে
লাগলো। ছাড়ান্ নেই, অমিয়কে ঢুকতেই হলো
শেষটায়।’ (গজাংশ)



‘পাখি, তুমি গহনারণ্যে পথ হারাইয়াছ!’

একজনের জিজ্ঞাসা : 'একজিমার কি কোনো ওষুধ আপনার জানা আছে ?'

না। তবে একজিমাবার দাবাই আমি বলতে পারি। একজিমা।

প্রকাশ, কলকাতার কোনো খোঁহিখানার এক কর্মচারী লটারিতে বেশ মোটা টাকা পেয়েছেন। ভহলোক কারখানায় ইঞ্জির কাজ করতেন।



আশ্চর্য কি ! ইহুি ভাগ্যে ধন—এ তো জানা কথাই।

'নাথার একটি চুলও উপেক্ষার বস্তু না। হয়ঃ এই চুলের সূত্র ধরিয়াই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বড় বা অপরাধের কিনারা হইতে পারে।' (উক্তি)
পারাই তো ! শ্রীমতীরা তো এই করেই শ্রীমা-
ধারীদের পাকড়ান।

'নিয়তি এমনি ওরে,
দাত দিয়ে তুলেছে যে এক টন্
তারো দাত যায় পড়ে।'

(একটি কাব্যংশ)

আগে টন্ টন্ করে !

'সেদিনের স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ ঘানা-বে
ইউ-এন-ও'র একাশীতম সদস্য করে নেবার প্রস্তাব
স্বত্তি-পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল, কি
বিরাট চীন এখনো তাঁদের দ্বারে অপেক্ষমান।'

(উক্তি)

হায়, চীনের বেলাই যতো ঘানার ঘানা !

জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে আমাদের বিশ্ববিজ্ঞানীয়
গুলি একালে ডিগ্রী-বিক্রয়ের এক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে
পরিণত হয়েছে। ডিগ্রী-বিতরণ ছাড়া তাদের যে
আর কোনো কাজ নেই। ফলে, শিক্ষার মান ক্রমে
নীচের দিকে নেমে চলছে।

ডিগ্রী বাই ডিগ্রী ?

সম্পাদক—ঐসাকচন্দ্র ভট্টাচার্য

কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১, মহেন্দ্র গোস্বামী সেন, কলিকাতা ৬ হইতে ঐক্যবন্ধন সাহা কর্তৃক মুদ্রিত
এবং শুদ্ধকর্তৃক ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত